সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ৩রা আশ্বিন, ১৩৫৪ সাল।   Saturday, 20th September, 1947.   [৪৬শ সংখ্যা

বাঙলার আশা ও আদর্শ

গত ২৮শে ভাদ্র পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী কলিকাতার শান্তি-সেনাবাহিনীর সমাবেশে বক্তৃতা করেন। রাজাজী বাঙলাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহাদের গৌরবময় অবদানের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, 'শুভেচ্ছা ও শুভবুদ্ধিতে সমগ্র ভারতে বাঙলাদেশ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। অতীতে এই বাঙলা দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে সমগ্র ভারতের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে। আজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রেও বাঙালীকে আগাইয়া যাইতে হইবে। সমস্ত শ্রেণীর ও সর্বসম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকের প্রতি সম্প্রীতি প্রকাশ করিয়া নূতন স্বাধীন ভারতে বাঙালীকে আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে।" রাজাজীর এই উক্তির গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করি। বস্তুত ভারতবর্ষের বর্তমানে কঠোর পরীক্ষার দিন সমাগত হইয়াছে। পাঞ্জাবে এবং দিল্লীতে সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ নরঘাতকদের দীর্ঘ দিন ব্যাপিয়া যে উন্মত্ত লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কল্পনা করিতেও মানুষ শিহরিয়া উঠে। শত্রুর আক্রমণের চেয়েও তাহা ভয়াবহ এবং ধ্বংসাত্মক। বৈদেশিক আক্রমণে মানুষের এতটা নৈতিক অধোগতি ঘটে না এবং মানুষ পশুতে পরিণত হয় না। কিন্তু পাঞ্জাবে ও দিল্লীতে জঘন্য পশুবৃত্তির চরমতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি জগতের দৃষ্টিতে ধিক্কৃত ও কলঙ্কিত হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে পৈশাচিক উন্মাদনার এই পশুবৃত্তির জাল হইতে বাঙলা নিজকে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে স্বদেশপ্রেমিক সন্তান-গণের ত্যাগময় আদর্শের যে প্রেরণা ছিল, তাহা তাহাকে বেশী দিন অভিভূত রাখিতে পারে নাই। বাঙালী আবার আত্মস্থ হইয়াছে এবং বাঙলার স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের আত্মোৎসর্গের ফলে বাঙলা দেশ এই প্রলয়ঙ্কর সংকটের মুখ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। আমাদের শচীন মিত্র, স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর ঘোষ, আমাদের সুশীল দাশগুপ্ত সত্যই আমাদের গৌরবস্থল। ইঁহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়া বাঙলা দেশকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এবং সমগ্র ভারতে মানবতার মহিমা সম্প্রসারিত করিয়াছেন। শুধু কথায় জাতি বাঁচে না; জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রাণ দিতে হয়। বৃহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ দিবার এরূপ প্রেরণা ভারতের আর কোন প্রদেশ দেখাইতে পারে না। মানুষকে বাঁচাইবার জন্য মরণকে এভাবে ডাকিয়া লইতে ভারতের আর কোন্ প্রদেশের যুবকেরা সাহস পায়? প্রাদেশিকতার প্রশ্ন আমরা তুলিতেছি না, সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা মনে প্রাণে ঘৃণা করি; কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙলার যুবকদের এই আত্মদানের জন্য গর্ব আমাদের আছে। ভারতের নানা স্থানে যে উদ্দাম অরাজকতা দেখিতেছি, তাহাতে সত্যই আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়। এক্ষেত্রে বাঙলার যুবকেরাই আমাদের ভরসা। শুভেচ্ছা প্রকাশ এবং সদুপদেশের মূল্য আমরা জানি, সেইসব শুভেচ্ছা এবং সদুপদেশের অন্তরালে হিংস্র রক্তপিপাসা কিভাবে লুক্কায়িত থাকে, আমরা তাহাও দেখিয়া লইয়াছি। সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয়ে ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থের ঘৃণ্য কারসাজী আমরা যথেষ্ট দেখিয়াছি। শাসকদের সদিচ্ছা প্রকাশের অন্তরালে বর্বর পিপাসা পূর্তির দুষ্প্রবৃত্তি কেমনভাবে কাজ করে, সে অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে। আমাদের ভরসা শুধু বাঙলার যুবক দলের উপর। আমরা জানি, বৃহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা প্রাণ দিতে ডরাইবে না। তাহাদের প্রাণদানের বলিষ্ঠ প্রেরণা মহাবলশালী ব্রিটিশের সাম্রাজ্য শক্তি একদিন বিধ্বস্ত হইয়াছে, মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক বর্বরতা ও হিংস্রতাকেও তাহারাই বিধ্বস্ত করিবে। আমরা তাহাদিগকেই আহ্বান করিতেছি। হিংস্র বর্বরের দল তাহাদেরই ভয়ে নির্জিত থাকিবে। নতুবা সমাজের স্তরে স্তরে ভেদ বিদ্বেষের যে বিষ আসিয়া জমিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস কিছুই নাই। যে কোন দিন সে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারে। বাঙলার যুবকেরা এই বিষকে সমাজদেহ হইতে উৎখাত করুক। তাহাদের প্রাণপূর্ণ উদার আদর্শে বাঙলার মুখ উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইয়া উঠুক এবং প্রগতিবিরোধী দুষ্প্রবৃত্তিজাল বীর্যময় তপস্যায় দগ্ধ হউক।

মানবের নৈতিক পরাজয়

সম্প্রতি ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের হাঙ্গামা, তজ্জনিত লোক বিনিময় এবং তাহার সমাধানকল্পে গভর্নমেণ্টের প্রয়াস ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দান করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি অনুধাবন করিলে দেখা যায়, তিনি ভারতের বর্তমান নৈতিক অধোগতিতেই বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছেন। তিনি আবেগভরে বলিয়াছেন, 'পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ শান্তভাবাপন্ন। কিন্তু পাঞ্জাবের লোকেরা গত কয়েক দিবসে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছে; অথচ স্বাভাবিক সময়ে একটি মশা অথবা সাপও ইহারা মারিতে চায় না। ইহাতে মনে হয়, বর্তমানে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে লোকের মানসিক অবস্থা রূঢ়ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে।

এই বিপর্যয়ের মূলে একটা প্রচণ্ড আঘাত রহিয়াছে। ইহাদের মানসিক অবস্থা বুঝিতে হইলে এই আঘাত কিরূপে হানা হইয়াছে, তাহা বিদিত হওয়া প্রয়োজন।” পণ্ডিতজীর অন্তরের গভীর বেদনা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি; বস্তুত ভারতের গত কয়েক বৎসরের ইতিহাস একটু বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলেই এদেশের লোকদের আকস্মিক এই নৈতিক অধোগতির মূলগত আঘাতের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইতিহাসে এই সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এ জগতে ধর্মের নামে যত অশান্তি ও উপদ্রব ঘটিয়াছে, অন্য কোনভাবে ততটা ঘটে নাই। ধর্মের নামে দুষ্প্রবৃত্তি-পরবশতার বিষ যদি রাজনীতিকে স্পর্শ করে, তবে দেশ ও জাতি ধ্বংস হয়। ইউরোপ ধর্মের নামে দৌরাত্ম্য এবং নরঘাতক উপদ্রবের তাণ্ডবে একদিন বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছিল। ভারতেও আজ সেই বিষ সমাজ-চেতনাকে ভাঙিয়া দিয়াছে। মানুষ হিসাবে মানুষ পারস্পরিক বেদনায় একান্ত আশ্বস্ত অন্তরে অনুভব করিতেছে না; সদাসর্বদা পরস্পরের প্রতি একটা সন্দেহ সংশয়ের ভাব মানুষের অন্তরে থাকিয়া যাইতেছে। বাঙলা দেশের কোথায়ও অবশ্য, বর্তমানে সাম্প্রদায়িক তেমন কোন অশান্তি নাই; তথাপি একথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ সংশয় ও অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নাজিমুদ্দীন সংখ্যালঘু সমাজকে আশ্বস্ত করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমরা আশা করি, পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন হইতে যাহাতে এই অনিশ্চয়তার ভাব দূর হয় এবং সর্বত্র মানবোচিত সমাজ-চেতনা সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তিনি তৎপ্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিবেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অশান্তি ও উপদ্রব যদি ঘটে, তবে বিচ্ছিন্ন সামান্য ব্যাপার বলিয়া তাহা উপেক্ষা করা শাসকদের পক্ষে উচিত হইবে না। দেখা যায়, বিচ্ছিন্ন দুষ্কার্যের বিষ সমাজদেহে সঞ্চারিত হইয়া ব্যাপক আকার ধারণ করে। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার প্রবৃত্তিকে সর্বতোভাবে উৎখাত করিতে শাসকদিগকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। অপরাধীর দণ্ডদানের নীতি সমাজ সংস্থিতির সকল নীতির মূলে রহিয়াছে, একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। মানুষের স্বাভাবিক নৈতিক বোধ যে ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হয়, সেখানে রাজদণ্ডই শুধু সমাজকে স্বাভাবিকতায় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু উপদেশে কোন কাজ হয় না। শাসক-গণ এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় বাঙলা দেশের শান্তি অক্ষুণ্ন থাকুক, ইহাই আমরা কামনা করি। মানবের নৈতিক পরাজয় যেন বাঙলা দেশে আমাদের দেখিতে না হয়।

মনস্তাত্ত্বিকতার মূলে

পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এবং মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বারংবার এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গে শান্তিরক্ষার জন্য তাঁহারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন এবং কঠোর হস্তে সকল রকম অশান্তি দমন করিবেন। শাসকদের পক্ষ হইতে অশান্তি দমনে নিরপেক্ষভাবে কঠোরতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে রহিয়াছে, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি; কিন্তু সেই সঙ্গে সমষ্টি-জীবনে নৈতিক চেতনা জাগ্রত করাও দরকার। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সাম্প্রদায়িক যে ভেদবাদকে নানাভাবে প্রচার করা হইয়াছে, তাহা সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মনস্তাত্ত্বিকতার ধারাকে একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে। গ্রাম অঞ্চলের নিরক্ষর শ্রেণী রাষ্ট্রের সমগ্রতার দৃষ্টিতে কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করিতে সহজে সমর্থ হয় না; সুতরাং বর্তমানের পরিবর্তিত পরি-প্রেক্ষিতে তাহারা অবস্থার বিচার করিয়া চলিতেও পারে না। এই কয়েক বৎসরে তাহাদের মনের গতিকে ভেদবাদমূলক প্রচার কার্যের দ্বারা যেভাবে ঘুরান হইয়াছে, আজও বাস্তব জীবনে তাহাদের মনের গতি সেইদিকে মোড় ঘুরিতে চায়। মূলত এইখানেই অস্বস্তির কারণ রহিয়াছে। পাকিস্থান লাভের জন্য সাম্প্রদায়িক ধারা ধরিয়া তাহাদের মধ্যে প্রচারকার্য চালান হইয়াছে; এখন তাহারা শুনিতেছে যে, পাকিস্থান তাহারা অর্জন করিয়াছে। এতদ্দ্বারা তাহারা সহজভাবে ইহাই মনে করিতেছে যে, পাকিস্থান লাভের পর হইতে মুসলমানেরাই দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হইয়াছে এবং তাহারা যাহা খুশি করিতে পারে। এই ধারণায় অপর সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের কাহারও কাহারও মনে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব আসিয়া পড়িতেছে এবং এই অবজ্ঞার ভাব নানা আচরণের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়া অপর সম্প্রদায়ের মানবোচিত মর্যাদাবুদ্ধিকে আঘাত করিতেছে। এই অসঙ্গত ঔদ্ধত্য দূর করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গ সরকারের বর্তমানে ইহাই প্রতিপন্ন করা কর্তব্য হইবে যে, পাকিস্থান শুধু মুসলমানেরই নয়, তাহা হিন্দু এবং মুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই রাষ্ট্র। এই হিসাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থানের আদর্শগত কোন ব্যবধান নাই। উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়েরই রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ সমানভাবে জড়িত রহিয়াছে। এই সম্পর্কে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড দলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড পাকিস্থানী আন্দোলনে বিশেষভাবে অ[illegible] করিয়াছে। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যাঁহাই বলুন না কেন, মুসলিম ন্যাশনাল দলের পাকিস্থানী আন্দোলন সম্পর্কি[illegible] নীতি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদিগকে [illegible] স্পর্শ করে নাই এবং স্বাধীনতা সংগ্রা[illegible] আত্মোৎসর্গের কোন বৃহত্তর আদর্শও সমাজ জীবনে প্ররোচিত করে নাই; বস্তুত [illegible] ভেদ-বিদ্বেষের মারাত্মক পথেই তাহা[illegible] অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। আমরা দেখিয়া স[illegible] হইলাম, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসি[illegible] নিজেরা বর্তমানে গার্ডদলের কর্তৃ[illegible] করিয়াছেন। আমরা আশা ক[illegible] বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত তরুণদের [illegible] পরিবর্তন সাধনে তাঁহারা তৎপর হইবে[illegible] সাম্প্রদায়িকতার ভাব হইতে এই বা[illegible] তাঁহারা রাষ্ট্র সেবার অসাম্প্রদায়িক বৃহত্ত[illegible] কর্তব্যের পথে পরিচালিত করিবেন। পূর্ব বঙ্গের কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলের স্বার্থ রক্ষা করা এবং দুর্গতের সেবার প্রগতি[illegible] প্রচেষ্টাতেই গার্ড দল উদ্বুদ্ধ থা[illegible] গার্ডদলের আদর্শ এইভাবে সম্প্রসারিত [illegible] কংগ্রেসের সঙ্গে এই দলের সহযোগিতা [illegible]মেই সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে। তখন এইসব [illegible]নরা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজ করিতে সমর্থ হইবে। তরুণদের সে যুক্ত উদ্যমে দেশের নৈতিক আব[illegible] ফিরিতে বিলম্ব ঘটিবে না। তরুণেরা [illegible] প্রাণ। প্রকৃত শিক্ষায় তাহাদের নৈতিক [illegible] সুদৃঢ় হইয়া না উঠিলে কোন রাষ্ট্রেরই [illegible] সাধিত হইতে পারে না। পূর্ববঙ্গ [illegible] তরুণদের মনোবৃত্তিকে রাষ্ট্রের প্রতি [illegible] সাধনের উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে [illegible] হউন। বস্তুত রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্প[illegible] সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও সৌহার্দ্য বর্তমানে প্রথম স্থান অ[illegible] করিয়াছে। পাঞ্জাব এবং দিল্লীর [illegible] অরাজকতা হইতে এ সত্য আমরা যেন বি[illegible] না হই। যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করি[illegible] তাহা যেন নিজেদের দুষ্প্রবৃত্তির দোষে হ[illegible] পাইয়া না হারাই। ভারতের স্বাধীনতার শ[illegible] বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িক অশান্তিতে আমাদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছে এবং ইতিমধ্যেই স্বাধীনতা লাভে আমাদের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের প্রভু[illegible] পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার যুক্তি খুঁজিতেছে। ইহাদের চক্রান্তজাল ব্যর্থ করিতে হইবে [illegible] তজ্জন্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতিই [illegible] প্রয়োজন। আজ যাহারা ভেদ-বিভেদের [illegible] দিবে, তাহারা দেশের শত্রু। ইহাদের স[illegible] সজাগ থাকা প্রয়োজন।

শহরে শান্তি রক্ষা

গত এক বৎসর কাল কলিকাতা শহরে দুর্দৈব ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াছে, তাহার এখানকার নাগরিক জীবনের স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। স্থায়ী শান্তির সময় যেসব ঘটনা আমাদের নজরে পড়ে না, এখন তেমন একটা ঘটনাই এই বিশাল শহরকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। গত ২৪শে ভাদ্র দক্ষিণ কলিকাতার একটি ঘটনায় শহরে অনর্থ বাধিবার উপক্রম হয়। ব্যক্তিগত বচসার ফলে একজন শিখ স্থানীয় একজন বাঙালী যুবককে মারাত্মকভাবে আহত করে। ইহাতে ভবানীপুরের বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা ও বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী ও শহরের পাঞ্জাবী সমাজের নেতৃবর্গের চেষ্টায় এই ব্যাপার বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই। পাঞ্জাবী সমাজ এই দুষ্কার্যের তীব্র নিন্দাবাদ করেন এবং তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহারা কঠোর হস্তে এই শ্রেণীর দুষ্কার্য দমন করিবেন। এই সম্পর্কে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী সমাজের নেতৃগণ সকলেই এই কথা বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত একটা বিবাদের উপর অন্য কোন অর্থ আরোপ করা ঠিক হইবে না। আমরাও তাঁহাদের এই উক্তির সমর্থন করি।

বাঙলার অন্ন সঙ্কট

পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে চাউলের অভাব এবং অত্যন্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমাদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে। বন্যাপীড়িত চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। নোয়াখালিতে চাউলের প্রতি মণ করা ৬০৲ টাকা চট্টগ্রামের কোন কোন স্থানে ১ শত টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। ঢাকা জেলার অভ্যন্তরভাগে অনেকের পক্ষে চাউল সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গ সরকারের খাদ্যবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এন এম খান সেদিন যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অবস্থার গুরুত্ব অস্বীকার না করিলেও নৈরাশ্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলেন, পূর্ব বঙ্গবাসীরা যদি পারস্পরিক শুভেচ্ছাপরায়ণ হইয়া চলে এবং লোভের প্রবৃত্তি সংযত রাখে, তবে আসন্ন সংকট অতিক্রম করা বিশেষ কঠিন হইবে না। মিঃ খানের উক্তি হইতে মনে হয়, তাঁহার বিশ্বাস এই যে, লোকের ঘরে এখনও খাদ্যশস্য মজুত আছে, যদি তাহারা সেগুলি ছাড়ে, তবেই সংকট কাটিয়া যায়। এদিকে পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্টের খাদ্য সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী কিছুদিন পূর্বে সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ততোধিক আশ্বাস রহিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না, তবে সরকারী গুদামে খাদ্যশস্যের অভাব যে ঘটিয়াছে, তাহা তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সঙ্কটের কারণ নাই একথা বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ উভয় স্থানের গভর্নমেণ্টকেই এই সঙ্কটের প্রতীকার সাধনের জন্য সর্বতোভাবে তৎপর হইতে হইবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সময় সাপেক্ষ; আসন্ন সংকটের প্রতিকার তাহাতে হইবে না। বর্তমানে চাষীদের হাতে যেখানে খাদ্যশস্য মজুত আছে, তাহার সমস্ত সংগ্রহ এবং সংগৃহীত খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য সরকারকে বিশেষভাবে ব্রতী হইতে হইবে। শস্য সংগ্রহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা একটি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, স্বয়ং মন্ত্রীরা শস্য সংগ্রহের অভিযানে বাহির হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল এখন পূর্বাপেক্ষা সম্প্রসারিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, তাঁহারাও জেলায় জেলায় গিয়া শস্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন। মন্ত্রিগণের প্রত্যক্ষ চেষ্টায় জনসাধারণের মধ্যে কর্তব্যের প্রেরণা জাগিবে। সেক্ষেত্রে উৎপাদনকারী চাষীরা যমন আশ্বস্ত হইয়া উদ্বৃত্ত শস্য ছাড়িয়া দিবে, তেমনই অতিলোভী পুঁজিদারেরাও সংযত হইবে। সরকারী সরবরাহ বিভাগের দুর্নীতি এতদিন বাঙলাদেশের সর্বনাশ করিয়াছে। এই রাক্ষসী অনাচার পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে আর মাথা তুলিতে পারিবে না, আমরা ইহাই আশা করি। দুর্নীতির পথে দরিদ্র শোষণ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি যদি এখনও নির্মমহস্তে দমিত না হয়, তবে আমাদের স্বাধীনতা সত্ত্বেও আমাদিগকে পশুর অভিশপ্ত জীবনই বহন করিতে হইবে এবং বাঙলার শ্মশানে প্রেতের বিভীষিকা বিস্তৃত হইবে।

বিহার ও বাঙলা

বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ কিছুদিন আগে কলিকাতায় আসেন। গত ২৮শে ভাদ্র রবিবার তিনি কলিকাতার বেতার কেন্দ্র হইতে কলিকাতাবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বিহার ও বাঙলা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রসঙ্গচ্ছলে তিনি এই নৈকট্যের গভীরতা ব্যক্ত করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মহাত্মাজী কলিকাতাকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে রক্ষা করিয়া বিহারকেও রক্ষা করিয়াছেন; কারণ বাঙলা দেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটিলে বিহারেও তাহা সম্প্রসারিত হইবার আশঙ্কা ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিহারের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক নানা দিক হইতেই রহিয়াছে এবং একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বিহারের সমৃদ্ধিতে বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান সামান্য নহে। বহু বাঙালী এখনও বিহারে বসবাস করিতেছেন এবং বিহারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে সাহায্য করিতেছেন দুঃখের বিষয় এই যে, সাম্প্রদায়িকতার ন্যায় প্রাদেশিকতাও বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেখা দিয়াছে; কিন্তু ভারতের জাতীয় মর্যাদার দিকে তাকাইয়া আমাদিগকে এই প্রাদেশিকতার মোহ হইতে নিজদিগকে মুক্ত রাখিতে হইবে। এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যেও যদি আজ সংহতি বোধ সুদৃঢ় না হয় এবং জাতীয়তার প্রেরণা জ্বলন্ত আকার ধারণ না করে, তবে আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আমরা কিছুতেই সমুন্নত করিতে পারিব না। তাহার ফলে সমগ্র ভারতের অখণ্ড রাষ্ট্রীয়তার যে আদর্শ এখনও আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা পরিম্লান হইয়া পড়িবে। বস্তুত ভারতের রাজনীতিক জীবনের বর্তমান বিভাগ, বিভেদ, দ্বন্দ্বকে আমরা স্থায়ীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁহারা আত্মদান করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি অবমাননার পাপে নিজেদের বিবেককে পীড়িত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। বিহারের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণও নিজেদের বিবেককে অক্ষত রাখিয়া তাহা পারিবেন না। এই প্রসঙ্গে বিহারের প্রধান মন্ত্রীর অপর একটি বক্তৃতার কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর রাঁচীতে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন হয়, সে অধিবেশনে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেন। স্বাধীনতা লাভের পর বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সেই প্রথম অধিবেশন। শ্রীযুক্ত সিংহ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বলেন, "আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। অতীতে আমাদের এই স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহাদের কথা বিস্মৃত না হই। ৯০ বৎসর পূর্বে বাবু কুমার সিং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং আত্মদাতার সম্মান লাভ করেন। আমরা তাঁহার কথা ভুলিব না। আমরা কেমন করিয়া বীর বালক ক্ষুদিরামকে ভুলিব? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করিবার জন্য সে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ৪০ বৎসর পূর্বে এই তেজস্বী বালক আমাদিগকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে প্রথম সঙ্কেত প্রদর্শন করে।" স্বদেশপ্রেমের অগ্নিময় আদর্শে বিহারের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়, আমরা ইহাই কামনা করি। বিহারী ভ্রাতৃগণ কংগ্রেসের আদর্শে যদি নিষ্ঠিত থাকেন এবং প্রাদেশিকতা তাঁহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে, তবেই ইহা সম্ভব হইতে পারে।

বন্যাপ্লাবিত চাটগাঁয়

বীণা দাস

চাটগাঁয় চলেছি—কংগ্রেসের চট্টগ্রাম-বন্যা-সাহায্য-ভাণ্ডারের সম্পাদিকা হিসাবে অবস্থাটা একবার নিজের চোখে দেখে আসবার জন্যে। সঙ্গে রয়েছে ২৫০০. টাকার একটি চেক, বেঙ্গল সিভিল প্রোটেক্সন কমিটির দেওয়া কিছু ঔষধ আর দুধ, আর ছোট একটি পুরোণো কাপড়ের পুঁটুলি। এর বেশী কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। মধ্যবিত্তদের দরজায় নিজেদেরই এবার যেতে লজ্জা করল: গত একটা বছরের মধ্যে কতবার যে গিয়েছি! কখনও নোয়াখালির জন্য, কখনও কলকাতা, কখনও বা শুধুই কংগ্রেস। সত্যি সত্যিই তাদেরই বা সামর্থ্য কতটুকু, কতখানি চাপই বা সহ্য হয়। খুব বাছা বাছা কয়েকটি ধনীর বাড়িই তাই এবার ঘোরা সাব্যস্ত হ'ল। একেবারে নিরাশ হইনি নিশ্চয়ই,—না হ'লেও আড়াই হাজার টাকাই বা হাতে রয়েছে কি করে? কিন্তু এও কি একটা টাকা! চাটগাঁয় যেতেই সকলে যখন জিজ্ঞাসা করবেন, "কি এনেছেন?" উত্তর দেওয়াই তো শক্ত হবে। মনে মনে ভাবছিলাম কি তাদের বলব! সত্যকারের অবস্থাটা বলা কি সমীচীন হবে? বলা কি ঠিক হবে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের বহু ধনকুবেরের দরজায় পূর্ববঙ্গের সাহায্যপ্রার্থীদের জন্য "প্রবেশ নিষেধ" লেখা হয়ে গিয়েছে। সেই গল্পটা কি করা চলবে—হাওড়ার এক বিখ্যাত ধনীর বাড়িতে তিন ঘণ্টা ধরে বসে তর্ক করে গলা শুকিয়ে উঠে শেষ অবধি একটি পয়সাও হাতে না নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। কিম্বা "আলিপুর বার"-এ যে একটা রসিদ বই দেওয়া হয়েছিল, কিছুদিন পরে সেটা একেবারে খালি ফিরে এল—সঙ্গে একটা চিঠি—"চট্টগ্রামে কেউ সাহায্য দিতে রাজী নন—সাম্প্রদায়িকতার কারণে!"—বলতে কিন্তু ইচ্ছা করে না। এমনিতেই তো পূর্ববঙ্গের অনেকেরই মন আজ ভেঙ্গে রয়েছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ বাইরে মেনে নিলেও মনের মধ্যে প্রসন্ন আনন্দে গ্রহণ করে নিতে পারছেন না—যা পারা হয়তো ঠিক সম্ভবও নয়। তার ওপর যদি এমনি সব হৃদয়হীনতার কাহিনী তাঁদের কাছে পৌঁছে দিই সেগুলো যেন হবে "মরার উপর খাঁড়ার ঘা!"

ট্রেণে বসে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে কেবলি দেখছিলাম পাকিস্থানের পতাকাগুলো চারিদিকের বাড়িতে, গাছে, বাঁশের পোলে তখনও উড়ছে। সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতে কুণ্ঠিত হলাম না একটুও। স্বাধীনতার প্রতীক মাত্রই আমাদের বহুদিনের পরাধীনতা-ক্লিষ্ট মনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তবু এও সঙ্গে সঙ্গে মনে না করে পারিনি—ওই সবুজ পতাকাগুলোই দুই বাঙলার মধ্যে বিচ্ছেদের সংকেত নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথা থেকে এগুলি উড়তে আরম্ভ হল? পোড়াদা থেকে বুঝি? না কুষ্টিয়া?—মনটা ব্যথিত হয়ে উঠতে চাইলেও প্রশ্রয় পায় না মোটেই—ধমক দিয়ে বলি "আবার আমরা মিলব, নিশ্চয়ই মিলব!—এখন চুপ করে থাক তুমি"—ট্রেণে স্টীমারে, স্টেশনগুলোয় কারুর ব্যবহারেই কোনও পার্থক্য পাই না,—সেই তো আমাদের চিরদিনের চির চেনা পথঘাট মানুষ—কথাবার্তা ব্যবহার। কপালে "লেবেল" না আঁটলে অনেক সময় তো চেনাও যায় না, কে হিন্দু কে মুসলমান, কে বাঙালী, কে পূর্বপাকিস্থানী! ঠিক সেই কারণেই চাঁদপুরে ট্রেণে উঠে মুস্কিলেও পড়তে হ'ল। গাড়ীতে আমি রয়েছি, আর রয়েছেন অন্য দুটি মহিলা। একটি মহিলাকে তাঁর স্বামী নিজে গাড়ীর মধ্যে তুলে দিয়ে গোছগাছ করে দিয়ে গেলেন। তিনি নেমে যাবার একটু পরেই আমার সহযাত্রী R. W. A. C.র দুটি ছেলে কামরায় উঠে আমাকে বল্লো, "চলুন আমাদের গাড়ীতে। আমরা "রিজার্ভ" করেছি, সুবিধা হবে আপনার।" উত্তরে দু একটা কথা বলতে না বলতেই আগের ভদ্রলোকটি অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে গাড়ীর কাছে এসে বল্লেন, "এসব মোটেই পছন্দ করি না, একটুও পছন্দ করি না,—লেডিস কামরায় উঠে এমনি আড্ডা দেওয়া।" ছেলে দুটি নেমে যেতে যেতে আপত্তি করলো "কি 'ননসেন্স' বলছেন আপনি!" "কী! 'ননসেন্স'! এত বড় কথা! চলুন, এক্ষুনি যেতে হ'বে আপনাকে লীগ অফিসে, বিচার হবে!"—ছেলেটিকে হাতে ধরে টানতে এতক্ষণে বুঝলাম ভদ্রলোক মুসলমান! মনে হ'ল এক্ষুণি এই নিয়ে সাংঘাতিক কিছু ঘটে যায় বুঝি। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে মাঝে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে সজোরে সরিয়ে দিয়ে R. W. A. C.রই আর একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এগিয়ে গেলেন, বল্লেন "যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে বা বলে থাকে আমি ওদের জন্য ক্ষমা চাইছি।" দেখলাম ঠিক এমনি অবস্থায় এতখানি নত হওয়াই দরকার ছিল। না হ'লে ওখানেই হয়তো একটা হুলস্থূল আরম্ভ হয়ে যেত কে জানে। আমার অবশ্য তর্ক করার ঝোঁকই এসেছিল মাথায়, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে এগিয়ে গিয়েছিলাম। মুসলমান ভদ্রলোকটিকে দেখে নিলাম ভাল করে, ঔদ্ধত্য, নৃশংসতা আর নির্বুদ্ধিতা সবগুলোই ফুটে উঠেছে মুখে। মনে পড়ল এরই prototype দেখেছি কলকাতায় হিন্দুদের মধ্যেও। একটি হিন্দু যুবক আমাকে মুখের উপর বলেছিল, "১৫ই-এর পর আমরা মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া সুরু করব।"

সাতকানিয়া থানার কাঞ্চনা গ্রামের জমিদার বাড়ি — ফটো—প্রভাত দাশ

পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামের একটি গৃহে জল প্রবেশের পূর্বক্ষণ ফটো—মধুসূদন দাশ

"তার ফল পূর্ববঙ্গে কি হবে জানেন?"

"তা কি জানি! সে এমনিও হবে,—আমরা প্রতিশোধ নেবই।"

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনের পর যারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গেছে তার মধ্যে সেই ছেলেটিও আছে কিনা জানতে ইচ্ছা হয়।

চাটগাঁয় পৌঁছলাম সকাল ৮টায়। সেদিনই বেলা ১১টায় নৌকা করে ওঁরা আমায় পাঠিয়ে দিলেন আনোয়ারা থানা এবং অন্যান্য বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখবার জন্য। বন্যা-বিধ্বস্ত জায়গা এর আগে কখনও দেখিনি। তবে এমনিতর ধ্বংসের স্তূপের মাঝে এর আগেও গিয়ে দাঁড়িয়েছি—নোয়াখালির গ্রামগুলিতে। কিন্তু সে মানুষের কাজ—এ প্রকৃতির। দেখলাম প্রকৃতি নির্মমতায় মানুষকেও যেন ছাড়িয়ে যায়। মানুষের বহুদিনের আশ্রয়স্থল মাটির ঘরগুলি সব তো ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেই—কিন্তু তার চেয়েও যা নিষ্ঠুর—নিঃশেষে নষ্ট করে দিয়েছে তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল শস্য-ভরা ধানের ক্ষেতগুলি। দুদিকের ক্ষেতগুলোর দিকে তাকানো যায় না। বেশীর ভাগ ক্ষেতেই মরা ধানের গাছগুলো জলে পচে ভেপসে পড়ে রয়েছে—যেগুলো আজ ভাদ্রমাসে সোনার শীষে ভরে থাকার কথা ছিল। আমাদেরই তাকাতে কষ্ট হয়, কৃষকদের মনের অবস্থা তো কল্পনাই করা যায় না। কম পরিশ্রম করে এরা এই ধানের ক্ষেতে শস্য ফলাবার জন্য! এর প্রত্যেকটি শিষ যেন ওদের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া। আউষ ধান তো সবই গেছে। আমনের চেষ্টা কিন্তু এখনও ওরা ছাড়েনি। অনেক কষ্টে দূর থেকে যথা-সর্বস্ব দিয়ে 'জালা' কিনে এনে ক্ষেতে লাগিয়েছে, কিন্তু সেও হবে কিনা সন্দেহ। অনেক জায়গায় ক্ষেতগুলো তখন কিছুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় ফেটে গিয়েছে—সেখানে চারা বাঁচবে না। এখন তো আবার কাগজে দেখলাম ক্রমান্বয়ে কদিন আবার অতিবৃষ্টি হয়ে আমনের সব কচি চারা নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক দিন আগের ইকনমিক্সের বইএ লেখা "Bengal Agriculture is a gamble in rainfalls" কথাটা বারে বারে মনে আসছিল। এই জুয়ো-খেলায় এমন সর্বস্ব খুইয়ে-বসা চাষীদের মূর্তি দেখে আর "ধনধান্যে পুষ্পেভরা" মাতৃভূমির বন্দনা গাইবার কথা মনে আসে না। ভাবছিলাম কতদিনে ভারতবর্ষেও প্রকৃতিকে জয় করতে শিখবে মানুষ? এসব জায়গায় আমাদের মত এমন দুর্বল, অজ্ঞ, ভিক্ষা-সর্বস্ব মানুষের আজ সাধ্য নেই কিছু করবার। আজ দরকার সেই সব জোরালো মানুষের, জোরালো হাতে যারা প্রকৃতির বল্গা টেনে ধরে' দাঁড়াতে পারবে—মানুষকে সত্যিকারের বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু সেদিন—সে সব মানুষ যে কতদিনে আসবে। আপাতত আমাকেই গ্রামের লোকেরা একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে আঁকড়ে ধরতে চায়। এই জিলারই মেয়ে—কলকাতায় থাকি—আইনসভারও সভ্য (সঙ্গের সঙ্গীরা আবার এতখানি করে পরিচয় দিতে লাগলেন!)—আমাকে ঘিরে তাই ওদের আশার আর বিশ্বাসের অন্ত নেই। না জানি কি ওদের করব আমি! সবাই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চায়, নিজের অভাবের আর লোকসানের সবখানি কাহিনী, সবটুকু ছবি—আমার দুটি কানে আর দুটি চোখে ব্যাকুল আগ্রহে ঢেলে দিতে চায়। কারুর কম বলা হ'লে ভাবে তার ভাগে বুঝি ফাঁকি পড়বে। রাগ হয় নিজের উপর—ইচ্ছা হয় ছুটে ওখান থেকে চলে আসি। কেন এলাম? কিছুই যদি দেবার নেই—কোনও প্রতিকারই যখন করতে পারব না—কি দরকার ছিল এই লোকদেখানো ঘুরে বেড়ানোর—এই মুখের সহানুভূতির? কেবলি মনে আসছিল গান্ধীজীর সেই নিদারুণ সত্য কথাগুলো—"Before the hungry, even God dare not appear except in the Shape of food!" ভেবেছিলাম চাটগাঁয় নিজের চোখে সব দেখে গিয়ে বুঝি আরও বেশী করে চাঁদা তুলতে পারব। কিন্তু ফল যেন হ'ল উল্টো। ওখানে গিয়ে ওই বিরাট ক্ষতি আর অভাবের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দোরে দোরে দশ বিশ টাকা ভিক্ষা করাটা একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা বলে মনে হ'তে লাগল। আনোয়ারা, সাতকানিয়া, পটিয়া, বোয়ালখালি, এই চারটে থানায় যতগুলো

পটিয়া থানার জঙ্গলখাইন গ্রামের কবি ৺বিপিন নন্দীর সাধনা গৃহ
ফটো—তরুণ লাইব্রেরী, পটিয়া

মাটির বসতবাড়ি ভেঙেগেছে সেগুলো একটুখানি বাসযোগ্য করে তুলতেই বোধ হয় কয়েক লক্ষ টাকা লেগে যাবে। এছাড়া একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে পাঁচ ছটা হাই স্কুল, বহু এম ই ও প্রাইমারী স্কুল। পুকুরও প্রায় প্রত্যেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে, সাতখানিয়ায় কয়েকটা গ্রামে পুকুরগুলো আবার বালিতে বুজে গেছে, তাদের জলের অভাব সাংঘাতিক। কয়েকটা টিউব ওয়েল এক্ষুণিই প্রয়োজন। তারপর বন্যার আসল যা কারণ সেই শঙ্খনদীর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়া—প্রতি বৎসর সেটা পরিষ্কার করা দরকার। না হ'লে এমনি বা এর চেয়েও প্রবল বন্যা প্রতি বছর হওয়া একরকম অনিবার্য। কিন্তু তার জন্যও তো দরকার বিপুল অর্থের। সমস্যার সমাধানের কোনও উপায়ই তো দেখতে পাওয়া যায় না। নবজাত "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের শূন্য ভাণ্ডার আর তার চেয়েও বেশী অব্যবস্থার আর বিশৃঙ্খলার দিকে চেয়ে ভরসার ক্ষীণতম রেখাও মনে জাগে না। চাটগাঁর সকলেই বলেন, এই হিসাবে ১৩৫০এর মন্বন্তরের চেয়েও এবার সামনে আরও দুরবস্থা। সেবারে লোকের হাতে টাকা ছিল, কাজ ছিল—এবার তাও নেই। সারা বছরের গোলাভরা যা কিছু সঞ্চয় সব তো গেছেই—সামনের ধানহীন ক্ষেতগুলো ধু ধু করছে—বাজারে চাল কিনতে পাওয়া যায় না—গেলেও দাম—কোথাও টাকায় এক সের, কোথাও তিন পোয়া, কোথাও আরও বেশী। ভাঙ্গা বাড়ির কথা লোকে এখনও তত ভাবছে না—কোনও রকমে বেড়া দিয়ে ছাউনি দিয়ে মাথা গুঁজে রয়েছে। সবার মুখেই কিন্তু শুধু একটি কথা "চালের ব্যবস্থা করে দিন, কোনও রকমে, যে কোনও রকমে!" বন্যার "রিলিফ" যৎসামান্যই পেঁছেছে। প্রথম ধাক্কার সময় গবর্ণমেণ্ট থেকে আর কংগ্রেস থেকে সামান্য কিছু চাল দেওয়া গিয়েছিল—কিন্তু সেও অতি—অতি সামান্য! এখন আর চালের কোনও ব্যবস্থাই নেই। Friend's Service Union থেকে কিছু দুধ দিয়েছে। তারি জন্য কতকগুলো কেন্দ্র খোলা হয়েছে বিভিন্ন গ্রামে। ১—১২ বৎসর অবধি ছেলেমেয়েরা একরকম এই খেয়েই রয়েছে আজকাল; পেটভরে ভাত যে কতদিন ধরে খায় না ওরা। এর মধ্যে এও শুনলাম, কোথাও কোথাও নাকি দুধ নিয়েও কালোবাজারী ব্যবস্থা চলেছে—চায়ের দোকানে বিক্রি হয়েছে! বিস্মিত হ'লাম না শুনে,—১৩৫০এর সমস্ত কাহিনী আজও তো ভুলিনি!। "সেই দেশেরই মানুষ আমরা!"—সাতটা দিন একটার পর একটা গ্রাম ঘুরে—একটানা একটা দুঃস্বপ্নের মতই কেটে গেল। তারপরই কলকাতার টেলিগ্রাম গিয়ে পেঁছিল জরুরী কাজে ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু টেলিগ্রাম না গেলেও চলে আসতাম। ওখানে থেকে ওদের ভার বাড়িয়ে ওদের ক্ষুধার অন্নে ভাগ বসিয়ে লাভ কি! কর্মীর দরকার চাটগাঁয় নেই। যার দরকার তার কিছুমাত্র ব্যবস্থাও করতে পারব কি? পারার কোন উপায় আছে কি? ফেরার পথে নিজেই নিজেকে বারে বারে প্রশ্ন করতে লাগলাম। বন্যাপ্লাবিত বুভুক্ষু চাটগাঁর সকরুণ ছবি সমস্ত অন্তরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত কেবলি আলোড়িত করে তুলছিল। তার মধ্যেও আবার বিশেষ করে চোখে ভাসছিল একটি দরিদ্র মধ্যবিত্ত মুসলমানের করুণ মুখখানি। ওর ভাঙ্গা বাড়িতে যখন গেলাম একটি কথাও সে বলেনি, খালি আমাকে দেখে ওর দুটি চোখ উপচে গাল বেয়ে ঝরে পড়েছিল অনেকগুলি জলের ফোঁটা। আর মনে পড়ছিল—আমাদের গ্রামে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের দুধ দেওয়া যখন দেখছিলাম—হঠাৎ আমার দূরসম্পর্কের এক কাকার মেয়ে একটি ছোট ছেলে কোলে করে ছুটতে ছুটতে এসে আমার দুটি হাত ধরে বারে বারে ব্যাকুল সাহায্য চেয়েছিল, ওর রক্তহীন পাণ্ডুর মুখখানি ঘুরে ফিরে কেবলি চোখে ভাসছিল। তখন অত লোকের সামনে ওকে কিছু দিতে পারিনি। সঙ্গে বেশী কিছু ছিলও না তো। পথের খরচ রেখে পাঁচটি টাকা পরে ওকে একজনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পেল কিনা কি জানি। না, নিষ্ঠুর দিদির কথাই ওর মনে রয়ে গেল? ভগবানকে বিশ্বাস করা তো কতদিন হ'ল ছেড়ে দিয়েছি। তবু এমনি সব দুর্বলতার মুহূর্তে কেবলি মনে হয় কারুর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলি, "ভগবান, আর কিছু চাই না, শুধু পৃথিবী থেকে, আমাদের দেশ থেকে দারিদ্র্য তুমি মুছে দাও—এত সব করুণ মুখ আর সহ্য করতে পারি না!"

—ফেরার আগে খবর পেলাম, কলকাতায় আবার হাঙ্গামা আরম্ভ হয়েছে, মহাত্মাজী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেছেন। গোয়ালন্দে পেঁছে দেখি আমাদের স্পেশ্যাল স্টীমার পেঁছবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। অগত্যা ঢাকা মেলে গিয়ে বসে রইলাম। মেয়েদের কামরা একেবারে খালি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙিয়ে একটি মুসলমান ভদ্রলোক আমাকে বল্লেন, "আপনি একা যাচ্ছেন? এদিকে তো অবস্থা খুব ভালো না, —কাল পোড়াদা অবধি অনেক যাত্রীকে যেতে দেয়নি আটকিয়েছে।"—বল্লাম, "কিছু হবে না। পাশেই তো ছেলেদের কামরা। আপনি বরং মাঝের দরজাটা খুলে রেখে যান!"—যাবার সময় আবার বলে গেলেন, "সাবধানে থাকবেন কিন্তু। আমি এই গাড়িতেই আছি, দরকার হ'লেই ডাকবেন।" মনে পড়ল চাঁদপুরের সেই মুসলমানটির কথা! সংসারে সেও আছে, আবার এও আছে! কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে আবার নিজেকে নিজে বল্লাম, এসব বিচ্ছেদ ক'দিনেরই বা। একেবারেই বাইরের জিনিস! আবার আমরা মিলবই—নিশ্চয়ই মিলব—। এখনও মনে মনে আমরা একই"—।

উনপঞ্চাশ অধ্যায়

পরের দিন সকালে স্বেচ্ছাসেবকদল চিংড়ী-পোতায় সামন্ত মহাশয়ের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। সামন্ত মহাশয় সাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তিনি নিজে এবং পাশের বাড়ির তাঁহারই বন্ধু যোগেশ নিয়োগী মহাশয় এই দুইজনে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণের আহার ও বাসস্থানের ভার গ্রহণ করিলেন। গ্রামের ভিতর ই'হারা দুই-জনেই বিশেষ সম্পন্ন গৃহস্থ। এখানে আসিয়া অজয় বা সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—বাসস্থানের ভাবনা নাই—অনাহারের দুশ্চিন্তাও নাই—নিজেদের কাজ সারিয়া আসিয়া অর্থাৎ প্রত্যহই পুলিশের হাতে কিছু কিছু উত্তম মধ্যম খাইয়া নিশ্চিন্ত মনে আহারে বসিতেছে। এ-বাড়িতে সামন্ত গৃহিণী ও ও-বাড়িতে নিয়োগী গৃহিণী আহারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অজয় নিজে সামন্ত মহাশয়ের ভাগে পড়িয়াছে। এমনি করিয়া কয়েকদিন চলিল। প্রত্যহই তাহারা দলে দলে সকালবেলা বিলাসপুর ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিত। পুলিশও যদৃচ্ছা প্রহার করিতে কোনদিনই কার্পণ্য করিত না। অজয়রা প্রত্যহ মার খাইয়া ফিরিয়া আসিত বটে, কিন্তু উহার একটি ফল হইল এই যে, তাহাদের এই সংবাদ আশেপাশে ১৫।২০ খানি গ্রামের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়া বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। প্রত্যহ তাঁহারা ক্যাম্পের সম্মুখে গিয়া পেণীছিবার বহুপূর্বেই হাজার হাজার লোক আসিয়া ক্যাম্পের আশেপাশে ভীড় করিয়া দাঁড়াইত। স্বেচ্ছাসেবকগণ যখন পড়িয়া পড়িয়া মার খাইত, তখন হাজার হাজার জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিত বন্দে মাতরম্। স্বেচ্ছা-সেবকগণ সেই ধ্বনিতে যেন আরো অনেক-খানি করিয়া নিজেদের ভিতর শক্তি অনুভব করিত। প্রত্যেকদিন বেলা ১২টার সময় সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিত। আজ অজয় সত্যাগ্রহ করিতে যায় নাই। গতকল্য তাহার উপর প্রহারের মাত্রাটা একটু অধিক পরিমাণে বর্ষিত হওয়ায় আজ বিশ্রাম লইতেছিল। বেলা গোটা দশেক বাজিয়া গিয়াছে—অজয় তখনও নিজের বিছানায় শুইয়া শুইয়া সত্যাগ্রহের নূতন নূতন পদ্ধতির কথা চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় সামন্ত গৃহিণী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। অজয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। সামন্ত গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে আছ যে বাবা—শরীর ভাল আছে তো? বলিতে বলিতে তিনি অজয়ের কপালে হাত দিয়া তাহার শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। অজয় বলিল—আজ্ঞে না বিশেষ কিছু নয়—শরীরটা তেমন ভাল বোধ হচ্ছিল না—বলে আজ আর বেরুইনি। সামন্ত গৃহিণী তাহারই অদূরে মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—কেমন করে ভাল বোধ হ'বে বলতো, রোজ রোজ পুলিশের হাতে এমনি করে মার খেলে শরীর কয়দিন টিকতে পারে। অজয় কোন কথার জবাব না দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সামন্ত গৃহিণী বলিলেন—না, না হাসির কথা নয়। রোজ রোজ তোমরা এতগুলো ভদ্রলোকের ছেলে পুলিশের হাতে এমনি করে মার খাবে—এ ভাবলেও যে আমার কান্না পায় বাবা!

অজয় বলিল—এছাড়া যে অন্যপথ নাই—অত্যাচার যে সহ্য করতেই হ'বে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন—কি জানি বাপু—তোমাদের সবকথা আমি ভাল করে জানি না—বুঝতেও পারি না। কিন্তু এই পোড়া দেশে যে কোনদিন কোন ভাল কাজ করবার উপায় নাই—তা আমি জানি। একটা ঘটনা শোন—আমার এক ভাইপো কলকাতার ডাক্তারী ইস্কুল থেকে পাশ করে এসে—আরও ৫।৭টি ছেলে নিয়ে গ্রামের ভিতরে একটি সেবাদল গড়ে তুললো। সে আজ তিন বৎসরের কথা। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে রোগে শোকে মানুষের সেবা করতো। বড়লোকদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে এনে গরীব দুঃখীকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো—এই ছিল তাদের কাজ। এছাড়া অন্য কিছু যে কোনদিন করে নাই তা আমি বেশ জানি। কিন্তু তবু কিছুদিন পরে পুলিশের সুদৃষ্টি তাদের উপরে পড়লো। ধরে নিয়ে গেল আমার সেই ভাইপোটিকে। ছয়মাস বিনা-বিচারে আটকে রেখে—তবে মুক্তি দিল। কি অপরাধ তার—সেও জানলো না—অন্য কেউ তো নয়ই। অজয় ইহারই উপরে দাঁড় করাইয়া পুলিশ ও গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একটি জোরাল বক্তৃতা দিবে বলিয়া সোজা হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিতেছিল কিন্তু ভিতর হইতে ডাক আসিল—গিন্নিমা—ভাত নামাবে না—ধরে যাবে যে!

—এই যাই। তুমি একটু বোস বাবা—আমি ভাতটা নামিয়ে আসি। বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। খানিক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন—একা মানুষ—সব সময় সব দিকের তাল রেখে উঠতে পারিনে।

অজয় সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—মাঝে মাঝে ভারী সঙ্কোচবোধ হয় আমাদের—এতগুলো প্রাণী রোজ রোজ আপনাদের উপরে কি অত্যাচারটাই না করছি।

সামন্ত গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন—ওকথা বলো না বাবা—কিসের কষ্ট? তোমরা এই কটা দিন আছ, কি সুখেই না আছি। নইলে সংসার তো আমাদের কাছে অরণ্য—বলিয়া তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিলেন—দুই চোখ যেন তাঁহার ছলছল করিয়া উঠিল। অজয় বুঝিল হয়তো হৃদয়ের কোন দুঃখের স্থানে তাঁহার ঘা পড়িয়াছে—তাই কি বলিয়া কথার মোড় ঘুরাইয়া দিবে ভাবিতেছিল। কিন্তু তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—তোমাদের মত কয়েকটি ছেলেকে যে দুদশ দিন খেতে দিতে না পারি এমন নয় বাবা! তাছাড়া যদি দুএকটা মাস ধরেও তোমরা থাক—আমরা খুশিই হ'বো। কি হ'বে আমাদের সংসার দিয়ে. —দুটি প্রাণীর কতটুকুই বা প্রয়োজন বলতো? যার জন্য সঞ্চয়—যার জন্যে এতদিন ধরে কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে সংসার গড়ে তুললাম, সেই যদি এমনি করে ফাঁকি দিয়ে গেল? কণ্ঠ তাঁহার রুদ্ধ হইয়া আসিল—দুই ফোঁটা চোখের জল দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। অজয় খানিকটা অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—বলিল, বলতে যদি এত কষ্ট হয় মা—কি কাজ সে কথা বলে?

—আমাকে মা বলে ডাকলে বাবা—সত্যি আজ থেকে তুমি আমার ছেলে। বামুনের ছেলে তুমি কি বলে তোমায় আশীর্বাদ করতে হয় তাতো জানি নে বাবা!

—মা যেমনি করে ছেলেকে আশীর্বাদ করে—তেমনি করেই করবেন।

সামন্তগৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—এবার আমাদের দুঃখের কথা তোমাকে সব খুলে বলি বাবা। অনেক বয়স পর্যন্ত আমাদের কোন ছেলেপিলে ছিল না। প্রথম প্রথম তিনটি সন্তান সূতিকা ঘরেই শেষ হয়ে গেল। কিছুদিন পরে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন—কোলে দিলেন—একটি মেয়ে—সেই আমার শেষ সন্তান। সেইটিকেই দিনে দিনে মানুষ করে তুলতে লাগলাম। মেয়ে বড় হ'লো—বাড়িতে মাস্টার রেখে লেখাপড়া শেখান

হ'তে লাগলো। এমনি করে তের ছাড়িয়ে চৌদ্দয় সে পা দিলো—কর্তা আর আমি দুজনে তার বিয়ের চিন্তায় মেতে উঠলাম। ছয় সাত মাইল দূরে মকিমপুরে একটি ভাল ছেলের খোঁজ পাওয়া গেল। ছেলেটির মা বাপ নাই—এক খুড়োর সংসারে থাকতো—লেখাপড়ায় ভাল। কর্তার ইচ্ছা ছিল—তাকেই লেখাপড়া শিখিয়ে জামাই করে নিজের বাড়িতে এনে রাখবেন। তাই ছেলেটি ইস্কুল থেকে পাশ করার পর—গোপনে গোপনে অর্থ সাহায্য করে তাকে কলেজে ভর্তি করে দিলেন। এমনি করে বছর দুই গেল। এদিকে পাশের বাড়ির যোগেশবাবু আর আমাদের কর্তার ছোটবেলা থেকে একেবারে হরিহরাত্মা ভাব। ও'রা সদ্গোপ আর আমরা মাহিষ্য—কিন্তু গাঁয়ের লোকে বলতো ও'রা দুটি একমা'র পেটের ভাই। ও-বাড়ির গিন্নিও খুব ভাল লোক। ও-বাড়ির ছেলেমেয়েরা দিনরাত এ-বাড়িতেই খেলাধূলা করতো—খাওয়া দাওয়া করতো। ও-বাড়ির ছোট ছেলে অনন্ত ছিল আমার সব চাইতে বাধ্য। সারাটা দিন আমার কাছে থাকতো রাত্রে নির্মলার সঙ্গে ভাগাভাগি করে আমার কোলের ভিতরে শুতো। নির্মলার চাইতে ও ছিল বছর চারেকের বড়। কর্তা অনেকদিন আমার কাছে বলতেন—অনন্ত যদি আমাদের স্বজাতের ছেলে হ'তো—কি চমৎকারই না হ'তো তা হ'লে। বাকিটুকু আমি বুঝে নিতাম—হেসে বলতাম যা হবার নয় তা ভেবে লাভ কি? ওরা অমনিতেই দুটি ভাইবোন। বছর কয়েক চলে গেল। নির্মলার বয়স তখন পনর। অনন্ত সেবার ম্যাট্রিক পাশ করলো—ঠিক হ'লো সে কলকাতার কলেজে গিয়ে ভর্তি হ'বে। ইদানীং দুজনারই বয়স হয়েছিল—তাই আগের মত আর তেমন সহজভাবে মিশতে পারতো না। সেদিন অনন্ত কলেজে ভর্তি হবার জন্যে কলকাতায় যাবে। রাত্রি তখনও ভোর হয়নি হঠাৎ জেগে দেখি নির্মলা আমার পাশে নাই—দরজা দেখি খোলা। তাড়াতাড়ি উঠে জানালার কাছে গেলাম। বাইরে তাকিয়ে দেখে আমি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। জ্যোৎস্নার আলোকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম—নির্মলা আর অনন্ত বাইরের শিউলী গাছটার তলায় পাশাপাশি আছে দাঁড়িয়ে—কারু মুখে কোন কথা নাই। কিছুক্ষণ পরে নির্মলা নীচু হ'য়ে অনন্তর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। অনন্ত তার মাথাটি নিজের বুকের উপরে টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি আর দেখতে পারলাম না বাবা—নিজের বিছানায় একেবারে চুপ করে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে নির্মলাও ঘরে ঢুকে আমারই পাশে শুয়ে পড়'লো। আমি শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল সব ভাবতে লাগলাম। এতো ভাল নয়—আর তো প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কর্তাও শুনে মহা চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। তারপর ও-বাড়ির কর্তা আর এ-বাড়ির কর্তায় পরামর্শ করে ঠিক করলেন—আগামী ফাল্গুনে মাসেই নির্মলার বিয়ে দিতে হ'বে। মাস দুইয়ের ভিতরেই মকিমপুরের সেই ছেলেটির সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা হ'য়ে গেল। তখনও বিয়ের মাসখানেক বাকি। মেয়ে কিন্তু দিন দিন শুকিয়ে উঠতে লাগলো—আগের মত সে আনন্দ নাই—স্ফূর্তি নাই—কেবল দিনরাত ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকতো। আমার মনের ভিতরে যে কি হ'তো তা আর তোমাকে কি জানাব বাবা—মুখ ফুটে বলতেও পারতো না কিছু। ইতিমধ্যে একখানা চিঠি ধরা পড়ে গেল। আমাদের পাড়ার ছোট একটা ছেলে একদিন বিকালবেলা নির্মলার ঘর থেকে কি যেন কাপড়ের ভিতরে আড়াল করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি অন্যপথে গিয়ে ছেলেটিকে ধরলাম—অনেক লোভ দেখিয়ে তবে চিঠিখানা আদায় করলাম, চিঠি পড়ে আমার মাথা ঘুরে গেল বাবা—অভাগী অনন্তকে বিয়ের সমস্ত খবর জানিয়েছে। লিখেছে—এ বিয়ে হ'লে সে বিষ খাবে। তাকে যেমন করে হোক সে যেন বাঁচায়। যে অনন্তকে একদিন নিজের ছেলের মত করে ভাবতাম—এখন মনে মনে তারই মুণ্ডপাত করতে লাগলাম। চিঠির কথা তুলে একদিন নির্মলাকে খুব বকলাম। একটা কথাও না বলে শুধু চোখের জল ফেলতে লাগলো। আরও দিন পনর পরে আমার নামে অনন্তর মস্ত বড় এক চিঠি এসে হাজির। লজ্জার মাথা খেয়ে, সে কোন কথা জানাতে ছাড়েনি। লিখেছে—আজকাল হিন্দু-সমাজেও এক জাতের ছেলের সঙ্গে অন্য জাতের মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে—তাতে জাত যায় না—অধর্ম হয় না। আমি যেন অমত না করি—তার বাবাকে—কাকাকে বুঝিয়ে বলি। অবশেষে লিখেছে—কাকীমা ছোটবেলা থেকে আমি তোমার কাছেই মানুষ—তোমার কাছে কোনদিন কিছু গোপন করিনি, আজও সব জানালাম—যদি আমাদের বাঁচাতে চাও তো এছাড়া আর পথ নাই। চিঠি পড়ে আমি রাগে একেবারে আগুন হ'য়ে উঠলাম। কর্তাকে দেখালাম। ও-বাড়ির কর্তা গালাগালি করে ভয় দেখিয়ে ছেলেকে লিখলেন। আমি শুধু মনে মনে ডাকতে লাগলাম—ভগবান বিয়েটা কোন রকমে শেষ করে দাও—তারপর ক্রমে ক্রমে সব অমনি ঠিক হ'য়ে যাবে। বিয়ের তিনদিন আগে হঠাৎ অনন্ত কলকাতা থেকে বাড়ি এসে হাজির হ'লো কিন্তু এসে অবধি আমার সঙ্গে দেখা করেনি—তবে, শুনেই আমার প্রাণ কাঁপতে লাগলো। তার বাবা তাকে মারতে গেলেন—ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে শাসালেন। সে একটা কথাও বলেনি—শুধু চুপ করে বসেছিল। সেদিন সারারাত্রি আমি সতর্ক হ'য়ে রইলাম—মনের ভিতরে নানা সন্দেহ হ'লো। রাত্রি তখন অনুমান তিনটা হ'বে হঠাৎ আমাদের বাইরে কিসের একটা শব্দ হ'লো—নির্মলা ধীরে ধীরে উঠে বাইরে গেল, আমি আবার সেই জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেখি সেই শিউলিতলায় আবার অনন্ত এসে দাঁড়িয়েছে—নির্মলা তারই পায়ের কাছে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না—বাড়িভরা আত্মীয় কুটুম্ব—চাপা কণ্ঠে ডাকলাম—নির্মলা শিগগির ঘরে আয়। আমার সাড়া পেয়ে অনন্ত পালিয়ে গেল। নির্মলা ঘরে এসে খাটের একপাশে চুপ করে বসে রইলো। আমি যাচ্ছে তাই করে গালাগালি দিতে লাগলাম। সকালবেলা কর্তা শুনে—তেড়ে মেয়েকে মারতে গেলেন। সেদিনটা কোন রকমে কাটলো। পরের রাত্রেও শেষের দিকে জেগে দেখি—নির্মলা ঘরে নাই—মন রাগে ও দুঃখে একেবারে ভরে উঠলো। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ভগবান এতগুলো সন্তানকে সূতিকা ঘরেই টেনে নিলে—এটাকেও নিলে না কেন শুনি? দরজা খুলে বাইরে বেরুলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে একেবারে সর্বশরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। দেখি শিউলী গাছটায় কে যেন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে—ছুটে কাছে গিয়ে দেখি নির্মলা। চীৎকার করে, অজ্ঞান হ'য়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরে এলো—তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

যারা শ্মশানে গিয়েছিল তারা সব কাজ শেষ করে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে। এবার সামন্ত গৃহিণী অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—দুই চোখের জল অঝোরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে দুই চোখ মুছিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—সেদিন থেকে অনন্তকেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রথমে সকলে মনে করিলেন—সে কলকাতায় পড়তে গেছে। কিন্তু যখন সেখান থেকে জানা গেল—সে সেখানে নাই, তখন মাসখানেক পরে তার খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হ'লো। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। মাস দুয়েক আগে কে একজন খবর দিয়েছিল যে, মাদ্রাজের কোন্ রামকৃষ্ণ মিশনের এক আশ্রমে না কি এমনি একটি ছেলে আছে। খবর পেয়ে লোক পাঠানো হ'লো কিন্তু লোক ফিরে এসে জানাল সে অনন্ত নয়। দুই কর্তা মাঝে মাঝে আমাদের বাইরের ঘরটায় এসে যখন চুপ করে বসেন তখন দুজনারই চোখের জলে বুক ভেসে যায়—কেউ একটা কথাও বলেন না। সেই থেকে সংসার আমাদের মরুভূমি হ'য়ে গেছে বাবা। পাপ যে এতে কিছু ছিল না—অন্যায় ছিল না—এ আমি আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অজয়। কিন্তু সেদিন এ বুদ্ধি আমার একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়েছিল। তাদের আমি আর দোষ দিই না বাবা—সব দোষ আমাদের

নিজের। ভাল তো তারা বাসবেই। সমাজের যদি এতটা বাধা—জাতের যদি এতই ভয়—তবে এমনি দুটি কচি প্রাণকে এমন করে ছোটবেলা থেকে মিলতে মিশতে দেওয়া কেন? জাতের যদি এতই ভয়—তা হ'লে সদ্‌গোপ আর মাহিষ্যের এমন পাশাপাশি বাস করা কেন? মাহিষ্যের গাঁয়ে মাহিষ্য থাকবে—সদ্‌গোপের গাঁয়ে সদ্‌গোপ থাকবে—এই তো তা হ'লে আইন হওয়া উচিত। সদ্‌গোপ আর মাহিষ্যে যদি বন্ধুত্ব করায় দোষ না হয়—সদ্‌গোপের গিন্নীতে আর মাহিষ্যের গিন্নীতে যদি ভাব করা দোষ না হয়, তবে কি কেবল যারা সত্যি সত্যি ভালবাসবে—তারাই দোষী? এতো চলতে পারে না বাবা। একই হিন্দুর ভিতরে যদি এত তফাৎ—তা হ'লে হিন্দু নাম রাখলেই তো হয়। অজয় মাথা নাড়িয়া বলিল—ঠিক বলেছেন। কিন্তু এ অন্যায় চিরকাল চলবে না মা। মুনি ঋষিরা জাতটাকে ঠিক এমনি করে ভাগ করে দিয়ে যান নাই। মাঝখানে যাঁরা টিকি নেড়ে—অতি কবাকাষি করে—সমাজের উপরে শুধু আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনই দিয়েছেন—তার প্রাণের দিকে একবারও চেয়ে দেখেন নাই—এ তাঁদেরই কীর্তি! আজ উচ্চ শিক্ষিতের মাঝে—এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের বিয়ে তো আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে!

—কিন্তু এ বুদ্ধিতো একদিনের জন্যও আমাদের আসেনি বাবা? নিজ হাতে তাই নিজেদের ছেলেমেয়েদের হত্যা করেছি। সামন্ত গৃহিণী পুনরায় চোখের জলে বুক ভাসাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরের দিন ভোরবেলা বিলাসপুর হইতে একজন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া খবর দিল: গত রাত্রিতে পুলিশ সত্যাগ্রহ শিবিরের ঘরখানি নিঃশেষে পোড়াইয়া দিয়াছে। পুলিশ যে একান্ত ঠেকিয়া পড়িয়াই এই কর্মটি করিয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। কারণ এই কয়েকদিনের সত্যাগ্রহে তাহারা অনেকখানি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। নির্দয়ভাবে প্রহার করিলেও যখন সত্যাগ্রহীরা নিরস্ত হয় না তখন অন্য কি পন্থা লইবে তাহা বোধ হয় তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এদিকে সত্যাগ্রহের সময় শত শত লোক আসিয়া জুটিত—তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইত। এমনি করিয়াই স্থানীয় অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে পুলিশের ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। যাহা হউক একটি কাজ এমনি করিয়া শেষ হইয়া গেল। আজ সারাটা দিন ধরিয়া এখন কোথায় কেমন করিয়া লবণ আইন ভঙ্গ করা যাইবে তাহারই পরামর্শ চলিতেছিল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা মহকুমা শহর হইতে খুঁজিতে খুঁজিতে একজন স্বেচ্ছাসেবক সামন্ত মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তাহার নিকটে খবর পাওয়া গেল—মহকুমা শহরের ক্যাম্পের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। অজয়দের সবাইকেই আগামী-কল্যের ভিতরে সেখানে ফিরিয়া গিয়া সেই ক্যাম্পের ভার লইতে হইবে। সুতরাং বিদায়ের সাড়া পড়িয়া গেল। এখান হইতে দশ বার মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া বাস ধরিতে হইবে। রাত্রে আহারাদির পর এখান হইতে যাত্রা করিবার সময় স্থির হইল। সংবাদ শুনিয়া সামন্ত-গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি দুধ চিনি প্রভৃতি যোগাড় করিয়া কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন তৈরী করিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিজে বসিয়া আহার করাইলেন। বিদায়ের পূর্বে—তাঁহার দুই চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। অজয় বিদায় লইতে আসিলে—একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—মা বলে ডেকেছো—দুদিনেই ভুলে যেও না বাবা। যেখানে থাক—মাঝে মাঝে খবর দিও—আর যদি কোন দিন সময় পাও দেখা করো।

সত্যই তো এই কয়টা দিনে এ বাড়ীতে একটা মায়া বসিয়া গিয়াছে। তাই তো বিদায়ের সময় অজয়ের মনটাও কেমন একপ্রকার ব্যথায় টন্‌ টন্‌ করিতে লাগিল। সে জবাব দিল—কিন্তু সে কথা তো আজ বলতে পারবো না মা। খবরও হয়তো দিতে পারবো না—দেখাও হয়তো আর হবে না—তবু যেখানেই যখন থাকি—সব সময় মনে রাখবো যে—বাংলা দেশের এক কোণায় আমার আর এক মা রয়েছেন—যিনি সত্যসত্যই আমাকে নিজের সন্তান ব'লে ভাবেন—আপনার মার মত মঙ্গল কামনা করেন। সামন্তগৃহিণী অজয়ের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অজয়রা যখন পথে বাহির হইল—তখন রাত্রি ১টা বাজিয়া গিয়াছে। ঘণ্টা দুই পরে তাহারা লোকালয় ছাড়াইয়া একেবারে রূপনারায়ণের তীরে আসিয়া পড়িল। নদীর ধারে ধারে তাহারা চলিতেছিল। দক্ষিণে বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। দুই একবার দূরে সমুদ্রের ভিতর দিয়া কয়েক-খানা জাহাজ চলিয়া গেল। তাহারই আলো এতদূর হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেশ একটানা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল—আকাশে ছিল চাঁদ পূর্বে রূপনারায়ণ—দক্ষিণে ফাঁকা মাঠের পরে সমুদ্র—এই চমৎকার আবেষ্টনীর মাঝে এক অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারই মাঝে চলিতে চলিতে পঁচিশটি প্রাণী গাহিয়া উঠিল:

"ভোরের বাতাসে বাজে মাদল—
জাতির শোণিতে রণ বাদল
আমরা চলেছি সেনানীদল
চল্‌রে সমুখে চল্‌।
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌॥"

পুলিশের লোক প্রস্তুত হইয়াছিল। পর দিন তাহারা ক্যাম্পে পৌঁছিবামাত্র তাহাদের পঁচিশ-জনকেই গ্রেপ্তার করিয়া সাব্‌ জেলে লইয়া গেল।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

ইতিপূর্বে অমিয় তাঁহাদের নিজের মহকুমা শহরটিতে পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগিয়া গিয়া-ছিলেন। কল্যাণীও মহকুমা সহরটিতেই সেখান-কার নাম করা মহিলাকর্মী বিভাবতী দেবীর সহিত গিয়া যোগ দিলেন। শহরটির ভদ্র-মহিলাদের ভিতরে একটি সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে মহিলাকর্মী আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। মহিলাগণ বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বিদেশীদ্রব্য বর্জন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা মাঝে মাঝে লবণ তৈরী করিয়া আইন ভঙ্গ ও নিয়মিতভাবে মদ-গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন এই মহকুমা সহরটিতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে অমানুষিক প্রহার ও গ্রেপ্তার চলা সত্ত্বেও দিন দিন মফঃস্বল হইতে দলে দলে নূতন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। স্বেচ্ছসেবকেরা দল বাঁধিয়া মদ-গাঁজার দোকানের চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইত—পুলিশের প্রহারে রক্তাক্ত হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িত—তবুও স্থানত্যাগ করিত না। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইলে সেই মুহূর্তেই অন্য লোক আসিয়া শূন্যস্থান পূরণ করিত। গোয়ালন্দের অবস্থা হইয়াছিল আরও ভয়াবহ। অমিয় এবং আরও কয়েকজন স্থানীয় নেতা মিলিয়া দুই স্থানেরই আন্দোলন পরিচালনা করিতেন। মাঝে মাঝে পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক-গণকে জোর করিয়া নৌকায় তুলিয়া লইয়া পদ্মার স্রোতের ভিতরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত। কখনও কখনও দূরে পদ্মার চরের উপরে ছাড়িয়া দিয়া আসিত। ইহা ভিন্ন মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্পে চড়াও করিত—প্রহার করিয়া আহার্য ও অন্যান্য জিনিষপত্র নষ্ট করিয়া দিয়া যাইত। এমনি করিয়া মাস দুই চলিয়া যাইবার পর একদিন অমিয় গ্রেপ্তার হইলেন এবং কয়েকদিন পরে তাঁহার বিচার করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট জেলে প্রেরণ করা হইল। কল্যাণীও রেহাই পাইলেন না, কিছুদিন বিলম্বে তিনিও বিভাবতী দেবীর সহিত গ্রেপ্তার হইয়া এক বৎসরের কারাভোগের দণ্ড গ্রহণ করিয়া জেলে গিয়া ঢুকিলেন। আরও মাস দুই পরে অমিয়কে ডিষ্ট্রিক্ট জেল হইতে দমদমের একটি স্পেশাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। অমিয় যখন দমদম জেলে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন দমদম জেলে পাঁচ-ছয় শতের বেশী স্বদেশী কয়েদী ছিল না, কিন্তু প্রতিদিনই

থেকে। না, নারীদেহের প্রতি লুব্ধ হ'বে না না কোনমতেই।

আশ্চর্য, আজ রাতে এতোক্ষণেও এমন ঘরে কোন অতিথি জোটে নি। মণীশ না ঢুকলে সে হয়ত জানলায় ঠেস দিয়ে সেইভাবে রাস্তায় চেয়ে থাকত। কিংবা তারই আগে কেউ এসে গেছে কিনা কে জানে। সামনে খাটে বিছানা পাতা। চাদরটা ফর্সা—বেশ পরিপাটি করে পাতা। দুটো মাথার বালিশ। তার ওপরে ইতিপূর্বে কেউ মাথা রেখেছে বলে তো মনে হয় না। আজই হয়ত বিছানাটা বদলেছে ললিতাবাই।

বাইরে তখনো অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ললিতা পাশের ঘর থেকে ফেরে নি। খাটের কাছে একটা ইজিচেয়ার। ভিজে কাপড়জামা পা দিয়ে সরিয়ে রেখে মণীশ চেয়ারটায় বসলে। ললিতার ঘরখানা মন্দ নয়। দেয়ালগুলো পরিষ্কার; তাতে দু'তিনটে ছবি টাঙানো—দেহ-বিলাসের ইঙ্গিতে প্রখর। আয়নাটা দামী। এক কোণে দুটো ট্রাঙ্ক। ওদের একটা থেকে ললিতা কাপড় বার করে দিয়েছে। ওরা বাক্সে পুরুষের পরবার নতুন কাপড়জামা, আশ্চর্য! একটা দেয়াল-আলমারি। তাতে চিনেমাটীর প্লেট, কাপ; কাচের গ্লাস, ডিকেণ্টার। বিলিতি মদের বোতল দুটো।

এতোদিন কৌতূহল ছিল, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি কৌতূহল মেটাবার। তাই বলে আজ কি সে প্রস্তুত হয়েছিল নাকি? কে জানত মণীশ একদিন সত্যি রূপোপজীবিনীর ঘরে ঢুকবে। কিন্তু ঢুকেছে যখন সে একবার, তখন সম্পূর্ণ সাহসই সে দেখাবে। ললিতা বুঝুক এমন লোকও তার ঘরে আসতে পারে, যে দেহ-বিলাসী নয়।

ললিতা ঘরে ঢুকলো। হাতে তার একটা প্লেট। ছোট গোল টেবিলের ওপর প্লেটটা রেখে বললে, খান।

এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিলো তারপর মণীশের পায়ের কাছে বসলে হাঁটু দুটো হাতের বেড় দিয়ে জড়িয়ে। মেয়েদের বসবার এই ভঙ্গিমা মণীশের বেশ ভাল লাগে। মণীশ লক্ষ্য করলে ললিতা কাপড় বদলেছে, আর কাপড় পরেছে বাঙালী আটপৌরে ধরণে।

ললিতা আবার বললে, কৈ, নিন। আরম্ভ করুন।

প্লেটে সাজানো সিঙাড়া, কচুরি, নিমকি ও চাররকম মিষ্টি। বেশ এক পেট ভবে তাতে।

মণীশ বললে, তোমার ঘরে যেই আসে, তাকেই কি এভাবে সংবর্ধনা করো না কি?

চট করেই জবাব দিলে ললিতা, তা কেন? সবাই তো আর আমার ঘরে শুধু বৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্যে আশ্রয় নিতে আসে না। নিন খান। ললিতার কণ্ঠে অনুরোধ।

মণীশ তবু ইতস্তত করে।

ও। খেতে বুঝি প্রবৃত্তি হচ্ছে না? তবে থাক। ললিতার কণ্ঠ ভারী লাগে।

মণীশ ললিতার দিকে একবার তাকিয়ে খাবার মুখে দেয়। বলে, তোমার ঘরে ঢুকতে পারি, আর তোমার দেওয়া খাবার খেতে পারি না?

পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে ললিতার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, টাকাটা তোমায় আগাম দিলাম। যে বৃষ্টি পড়ছে, তাতে সারা রাত তোমার ঘরে কাটাতে হবে।

ললিতা টাকাটা নিলে। বললে, অনেক বেশি দিলেন।

—তা হোক। একটা রাতে তুমি দশ টাকার বেশিই কামাও।

ললিতা নির্বিকার। ললিতার এই ভাবটা ললিতার পেশাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ললিতাকে আঘাত করার ইচ্ছেটা তাই প্রখর হয় মণীশের। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। জলের গ্লাস মুখে এনে বললে, ব্যাপার কি বলতো? অন্য সব ঘরই তো বন্ধ। শুধু তোমার ঘরেই এতোক্ষণেও কেউ আসে নি।

—কেন, এই তো আপনি এসেছেন।

—আমি বলছি, আমার আগে কেউ এসেছিল কিনা?

—যারা এসেছিল তারা উপরে ওঠে ঘরের দরজা বন্ধ দেখে চলে গেছে।

—দরজা বন্ধ ছিল কেন?

—এমনি। বর্ষার রাতে শুধু বাইরে চেয়ে থাকতেই ভাল লাগছিল আজ।

—ও-বাবা, এ যে গভীর কাব্য! ব্যবসা ভুলে আবার এ-সব চলে নাকি তোমার? খাটের ওপর একটা বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে, অন্য বালিশটা ললিতার দিকে ছুঁড়ে বল্লে, আমি এই খাটে শুলাম। তুমি এই বালিশ নিয়ে অন্য কোথাও শোও গে।

ললিতা একটু হেসে বললে, বারে, খাট তো একটাই। শোবারই বা আর জায়গা কোথায়?

মণীশ উঠে পড়ে বললে, তাহলে তুমি এখানে শুতে পারো, আমি চেয়ারটায় যাই।

—থাক, হ'য়েছে। আমার শোবার ঢের জায়গা আছে। আপনি শুন এই খাটে। রেকাবি, গ্লাস ও মণীশের ভিজে কাপড়জামা নিয়ে ললিতা পাশের ঘরে গেল।

খানিক পরে ফিরে এল ললিতা। দেখে মণীশ শুয়েছে। বললে, আলোটা নিবিয়ে দেব?

মণীশ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলে, শোন ললিতা।

ললিতা কাছে এল।

মণীশ তার হাতখানা ধরে একটু টান দিয়ে বললে, বসো খাটে।

ললিতা বসল মণীশের পাশ ঘেঁষেই। মুচকি হেসে বললে, কি হল আবার? এবার এক বিছানায় ঠাঁই হবে বুঝি?

—তোমাকে নিয়ে এক বিছানায় ঠাঁই করবার লোকের অভাব নেই, সে অভাব না হয় আজ একটু হলই। সে যাক্; এখন তুমি জবাব দাও কেন তুমি এ পথে এলে? তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি সবে এ পথে নেমেছ।

ললিতার চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে এসেই প্রখর হয়ে উঠল। সকৌতুকে ভ্রূকুঞ্চকে বললে, ওরে বাবা, এ যে বড় শক্ত প্রশ্ন? কেন, এ পথ খারাপ নাকি? তিয়াত্তোর বছরের বুড়ো থেকে তের বছরের ছোকরা পর্যন্ত সব পুরুষকে চেনা যায়—কি দিয়ে তারা গড়া।

মণীশ ললিতার হাতখানায় মৃদু চাপ দিয়ে বললে, কথা এড়িও না। জবাব দাও—কেন এলে, কেমন করে এলে এ পথে?

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে ললিতা হাই তুলে বললে, ছাড়ুন। আমার ঘুম পেয়েছে শুতে যাই। আর বলেন তো এইখানেই শুই।

মণীশের তবু এক কথাঃ জবাব দাও ললিতা আমার কথার।

ললিতা এবার ফুঁসিয়ে উঠল। জবাব দাও, জবাব দাও! কেন জবাব দেব? জবাব দিয়ে লাভ কি? বেশ করেছি এসেছি এ পথে। আমার খুশিতেই আমি এসেছি। তারপর অনেকটা স্বগতভাবে বললে, কী হবে দেহটাকে পবিত্র রেখে। এক মুঠো চালের জন্যে বাপমাও তো মেয়েকে দেহের বেসাতি করতে সাহস দেয়। তবু তো ছিলাম মুখ বুজে। কিন্তু যেদিন ছোট ভাইটি রাত তিনটে থেকে কণ্ট্রোলের দোকানে ধন্না দিয়ে বেলা এগারটায় শুধু হাতে ফিরে এসে ক্ষিদের জ্বালায় অজ্ঞান হয়ে গেল ও এর জন্যে বাবা-মা আমাকেই ইঙ্গিতে দোষী সাব্যস্ত করলেন, সেদিন থাকতে না পেরে চলে গেলাম সেই লোকটার বাড়ি। চালের কণ্ট্রাক্ট তার। গুদামে পোরা চালের বস্তা থেকে আমাকে এক আঁচল চাল দিয়েছিল—তার বহু দিনের পোষা লালসার তলায় আমার দেহটাকে নিষ্পিষ্ট করে। সে চাল বাবা মা'র নিতে বাধে নি। সেদিন সেই তো ছিল ন্যায়। আজ বাবাকে কাপড়জামা পাঠালে তা ফেরত আসে। উত্তর জানান, কাপড় না পরে থাকি সেও ভাল, তবু অমন মেয়ের দেওয়া জিনিস ছোঁব না।

ললিতা যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পায়। হাতটা মুক্ত করে দুচোখে আঁচল চেপে চকিতে পাশের ঘরে চলে যায়। ভেতর থেকে খিল দিলে ললিতা, মণীশ শুনলে।

মণীশ স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। কতো কী ভাবলে অনেকক্ষণ। যে ধুতি জামা ললিতা তাকে দিয়েছে তা তার পিতার ফিরিয়ে দেওয়া জিনিস। ললিতাকে উপহাস করেছিল; সেই উপহাস

বাজল মণীশের বুকে।...বৃষ্টি তখনো পড়ছে, রিমঝিম শব্দ। কখন ঘুম এল তার চোখে।

তখনো ঊষার আলো ফোটে নি। মণীশের ঘুম ভাঙল। এমন সময় ওঠা তার অভ্যাস। কারখানায় হাজির হতে হয় সূর্যোদয়ের আগে।

পাশের দরজায় ধীরে ধীরে টোকা মেরে মণীশ ডাকলে, ললিতা, ললিতা!

ললিতা যেন জেগেই ছিল। ডাকতেই দরজা খুলে দিলে। বললে, এখুনি যাবেন নাকি?

মণীশ বিস্ময়ে ললিতার দিকে চাইলে। ললিতা এত ভোরেই স্নান সেরেছে—একটা শান্ত শুভ্র শ্রী তাকে ঘিরে।

—কি, অমন চেয়ে আছেন যে?

—তোমাকে দেখছি। যাক, আমার কাপড়-জামাগুলো? আমায় এখুনি যেতে হবে।

ললিতা ভেতরে গেল। কাপড়জামা এনে দিলে—শুকনো। বললে, রীতিমত শুকিয়ে দিয়েছি মশাই। কাপড় ছাড়ুন, আমি আসছি।

খানিক পরেই ফিরে এল ললিতা। হাতে এক পেয়ালা চা, রেকাবিতে লুচি ও হালুয়া।

মণীশ আশ্চর্য হয়ে বললে, এসব কখন করলে?

হেসে ললিতা বললে, যখন করি না কেন, তা দিয়ে দরকার কি? ভোর না হতেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চান। সুতরাং এখুনি তৈরী করা ছাড়া উপায় কি ছিল?

মণীশ আগ্রহভরে সেগুলো খেলে। তারপর হাতমুখ মুছে বললে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে যাচ্ছি না। রোদ ওঠার আগেই কারখানায় হাজিরি দিতে হয়। মেসে গিয়ে পোষাক বদলে কারখানা ছুটতে হলে এখুনি তোমার এখান থেকে যেতে হয়। কালকের স্থির-প্রতিজ্ঞ মণীশ চাঙা হয়ে উঠল। ললিতার হাত নিজের মুঠোয় সাদরে ধরে বললে, শোন ললিতা, আমি তোমায় এখানে থাকতে দেব না। কাল আমি অনেক ভেবে নিজের মন স্থির করে নিয়েছি। আমি তোমায় আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো। তুমি শুধু বলো হ্যাঁ: বল, যাবে আমার সঙ্গে

মণীশের হাতের মুঠোয় ললিতার হাতখানি গরম হয়ে উঠে পরমুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

নিস্পৃহকণ্ঠে ললিতা বলে, আপনি পাগল হয়েছেন?

—পাগল আমি হই নি। বল, তুমি যাবে আমার সঙ্গে।

—তা কি করে হয়? বাড়িউলি কেন ছাড়বে?

—সে আমি ঠিক করব। আমি কাল বিকেলে আসব একটা বাড়ি ঠিক করে। তোমাকে কালই নিয়ে যাব। তুমি শুধু বলো, হ্যাঁ।

ললিতা মণীশের পায়ে পড়ে প্রণাম করলে।

মণীশ বললে, তাহলে মনে রেখো, কালই আমি আসব।

ললিতা বুঝি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

রাস্তায় নেমে একটা পকেটে হাত পড়তেই মণীশ দশ টাকার নোট পেল একটা। ব্যাগটা বুক পকেটে রয়েছে ঠিক। তাহলে কালকের টাকা ললিতা ফিরিয়ে দিয়েছে। কাল ললিতা সরাসরি টাকা নিয়েছিল বলে মনটা তিক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা ফিরিয়ে দেওয়ায় ললিতার প্রতি আকর্ষণ আরও দুর্বার হয়ে উঠল মণীশের। ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ যে সে করছে না এই কথা মনকে সে বেশ দৃঢ়ভাবেই বোঝালে। বিপথ থেকে এমন একটি মেয়েকে বাঁচানো কতো মহৎ কাজ একটা। মণীশ নিজের পৌরুষ ও সাহসের জন্যে নিজের কাছেই কতো না বড় হয়ে উঠল।

পরদিন বিকেলে মণীশ গেল সেখানে। কিন্তু দেখলে ললিতার ঘরে তালা দেওয়া। বাড়িউলির খোঁজ নিলে। সে বললে, উ ললিতাবাঈ তো চলি গয়ি। এক বাঙালী বাবু, বহুত বড়া আদমি উয়ো, উহিঁকো পাশ উ গয়ি। এক চিঠি রখ্ গয়ি আপকে লিয়ে।

চিঠিটা মণীশকে এনে দিলে। আর একটা মেয়ে বাড়িউলির পাশে কখন যেন চলে এসেছে। সে হাসলে এমনভাবে মণীশের দিকে চেয়ে যে, মণীশের মনে হ'ল সে তাকে উপহাস করছে।

মণীশ চিঠি নিয়ে নিচে নেমে রাস্তায় পড়ল। চিঠিটা তখুনি খুললে। ললিতা লিখেছেঃ শ্রীচরণেষু, আমায় ক্ষমা করবেন। আপনি পাগল হ'তে পারেন কিন্তু আমি পারলাম না। নিজের জীবন সম্বন্ধে আমিও ভেবে দেখলাম অনেক। ছোটখাট সংসার ছিল আমাদের। অর্থ ছিল না, কিন্তু শান্তি ছিল। কুমারী মনের পবিত্র স্বপ্ন আমারো ছিল। কিন্তু তেরশ পঞ্চাশে সব ওলট-পালট হ'য়ে গেল। গোটা বাঙলা দেশে পুরুষ ছিল না বোধ হয়, তাই পঞ্চাশের দিনগুলো অমন ক'রে কাটল। মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপের জিবের চাটুনি ইতস্তত লালায়িত হয়ে উঠেছিল। পঞ্চাশের পাঁকে কতো সরীসৃপ কিলবিলিয়ে উঠল দেখলাম। ধানের ফসল পঞ্চাশে হয়নি, কিন্তু অন্য অনেক ফসল প্রচুর ফলেছিল। সেই ফসলের আমিও শস্য। এক ধনীর গোলায় যাবার জন্যে অনেক অনুনয় বিনয় চলছিল; এতোদিন যাইনি, আজ গেলাম সেখানে।

ইতি ললিতাবাঈ।

—নাঃ, মেয়েরা একবার বিপথে গেলে তাদের আর ফেরানো যায় না। অনেক বইতে মণীশ যেন পড়েছে একথা। সত্যিই তাই; মণীশ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই তো সে কথার যাচাই করলে।

কিন্তু নিষ্কৃতিও যেন পাওয়া গেল। উঃ, কতো বড় অসামাজিক একটা কাজ করতে গিয়েছিল সে! মণীশের প্রতিজ্ঞা-শিথিল সামাজিক মন আশ্বস্ত হল।

কায়দ্-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্না

১৮৭৬ সালে বড়দিনের দিন মহম্মদ আলি জিন্না সিন্ধু প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা খোজা সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর পিতা বোম্বাই প্রদেশের বড় চামড়ার ব্যবসায়ী ছিলেন। করাচী এবং বোম্বাই-এ লেখাপড়া শিখতে শিখতে ষোলো বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে যান। লিংকনস্ ইনে আইন পড়তে আরম্ভ করেন, কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি একজন ব্যারিস্টার। দেশে ফিরে দেখলেন ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ার ফলে পিতার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। সৌভাগ্যক্রমে বোম্বাইয়ে তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী পেয়ে যান। এই পদে তিনি এরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দেন যে, একজন উচ্চ পদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারী তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের পদে পাকা-পাকি বহাল করতে চান এবং সেজন্য দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন দিতে রাজী হন। সেই চাকরী তিনি গ্রহণ করেননি, শোনা যায়, তিনি বলেছিলেন যে, শীঘ্রই তিনি ব্যারিস্টারী করে দৈনিক ঐ অর্থ উপার্জন করবেন। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন এবং অচিরেই ভাল ব্যারিস্টাররূপে নাম করেন। তখন বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার ছিলেন স্যার চিমনলাল শীতলবাদ এবং কলকাতায় তখন চিত্তরঞ্জন দাশও নাম করছেন। ব্যবসায় আরম্ভ করে জিন্না সাহেব বলেছিলেন যে, কোটি টাকা না জমানো পর্যন্ত তিনি ব্যবসায় ত্যাগ করবেন না। অবসর গ্রহণ করবর পর তাঁকে বিচারপতির পদ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে রাজী হননি। বিচারপতি চাগলা কিছুদিন জিন্না সাহেবের জুনিয়ার ছিলেন। জিন্না সাহেবও কিছুদিন দাদাভাই নওরজীর সেক্রেটারী ছিলেন: ১৯০৬ সালে। দাদাভাই নওরজী যখন বিলাতে সেন্ট্রাল ফিন্সবেরী থেকে পার্লামেন্টে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছিলেন তখন জিন্না সাহেব তার জন্য ভোট সংগ্রহ করেছিলেন। তখন তিনি লিংকনস ইনে ছাত্র। বিখ্যাত ধনী স্যার দীনশ পেটিটের কন্যাকে জিন্না সাহেব বিবাহ করেন। তাঁদের একটি কন্যা আছে। এই কন্যার সংগে বিবাহ হয়েছে একজন ধনী খৃষ্টান পার্শীর, তার নাম মিঃ নেভিল ওয়াদিয়া।

কংগ্রেসের সভ্যরূপে জিন্না সাহেব রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার পর তিনি বড়লাটের আইন পরিষদে কয়েকটি খোলাখুলি বক্তৃতা দেন, সেজন্য তিনি এতই জনপ্রিয় হন যে, চাঁদা তুলে বোম্বাইয়ের লোকেরা একটি "পিপলস্ জিন্না

হল" স্থাপন করেন। কংগ্রেসের সভ্য থাকলেও তিনি মুসলিম লীগের মিটিংএ যোগদান করতেন। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে হিন্দু-মুসলিম যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, তাতে জিন্না সাহেবের দান বড় কম নয়। এই সময় থেকেই জিন্না সাহেবের রাজনীতিতে নাম হয়। তখন থেকেই জিন্না সাহেব শ্রেষ্ঠ ইজিপশিয়ান ও টার্কিশ সিগারেট খেতেন। রোলস্ রয়েস চড়তেন এবং সেভিল্ রোয়ের সুট ব্যতীত পরতেন না।

কোন দলভুক্ত না হয়ে ১৯২৬ সালে স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধি হুসেনভাই লালজীকে আইন সভার নির্বাচনে পরাজিত করেছিলেন। এ ঘটনা তখনকার দিনে বোম্বাইয়ে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু জিন্না সাহেবের জন্য খবরের কাগজ মারফৎ অনেক ভাষণ দিয়েছিলেন। মাঝে রাজনীতিতে তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মায় এবং তিনি বিলাতে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। এই সময় তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। বিলাতে থাকবার সময়ে তাঁর রাজনীতির গুরু দাদাভাই নওরজীর মতো পার্লামেন্টে প্রবেশ করবার জন্য অনস্থ করেছিলেন।

এই হ'ল পাকিস্থানের শাসনকর্তা কয়দ্-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্নার প্রথম জীবন।

ইউনেস্কোর সাময়িক পত্রিকা

ইউনাইটেড নেশানস্ এডুকেশনাল সোশ্যাল অ্যাণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশান, এই প্রত্যেকটি ইংরাজী কথার প্রথম অক্ষর নিয়ে ইউনেস্কো কথাটি গঠিত হয়েছে। জানা গেছে যে, শীঘ্রই ইউনেস্কো ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসম্বলিত সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত করবেন। পৃথিবীর কোথায় কি বিজ্ঞানের গতি প্রগতি হচ্ছে ভারতীয়দিগকে তার সংগে পরিচিত করিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। প্রথমে বাংলা ও হিন্দি ভাষাতেই কাগজ প্রকাশিত হ'বে এবং কলকাতায় অফিস হ'বে। অল্প লেখাপড়া জানা অথবা নিরক্ষর ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করবার জন্য ইউনেস্কোর একটি ছোট ভ্রাম্যমান দলও তৈরী করা হ'বে, সম্ভবতঃ আগামী বৎসরেই।

বকশিশ

বকশিশ, যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল টিপস, তার সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলন বোধহয় মার্কিন মুলুকেই। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে, মার্কিন যুক্তরাজ্যে বৎসরে প্রায় ২০০০০০০০০ ডলার বকশিশ হিসেবে জনসাধারণের ব্যয় হয়, তাও কেবলমাত্র হোটেল ও রেস্তোরাঁর ওয়েটার ও ওয়েট্রেসদের জন্য, এ ছাড়া আছে ট্যাক্সিচালক, লিফ্টম্যান, দারোয়ান, টুপি ও কোট রক্ষক, নাপিত ইত্যাদি। নিউইয়র্কে একজন ওয়েটারের গড়ে সপ্তাহে বেতন ষোলো ডলার, কিন্তু বকশিশ

নিউইয়র্কের ট্যাক্সী চালক, অল্প বখ্‌সিসে সন্তুষ্ট নয়

ধরে তার বেতন দাঁড়ায় প্রায় ছত্রিশ ডলার। নাইট ক্লাবের ওয়েটার সপ্তাহে শুধু বকশিশই পায় ৭০ ডলার। দেখা গেছে যে, নারী অপেক্ষা পুরুষেরা বকশিশ দিতে বেশী উদার।

সর্বাপেক্ষা বড় নাম

ম্যাসাচুসেটস্ প্রদেশের ওয়েবস্টার শহরে একটি হ্রদ আছে, হ্রদটি বোধহয় আয়তনে দুই বর্গমাইল হ'বে। কিন্তু নামে বোধহয় সর্বাপেক্ষা বড়। নামটি উচ্চারণ করতে না পারায় বাংলায় দেওয়া সম্ভব হলো না, ইংরাজীতেই দেওয়া হচ্ছেঃ

Lake Chargoggagoggmonchauggagogg—Chaubungagungamaug.

কথাটির অর্থ হ'ল "আমরা আমাদের দিকে মাছ ধরি, তোমরা তোমাদের দিকে মাছ ধর, মাঝখানে কেউ মাছ ধোরো না।"

বিজ্ঞানের কথা

আগামী দিনের জগৎ

অমরেন্দ্রকুমার সেন

সোমবার ৬ই আগস্ট, ১৯৪৫, মানুষের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। অণু ও পরমাণু কণিকার মধ্যে কি শক্তি নিহিত আছে তাই আবিষ্কার করতে বহুদিন ধরে মানুষ ব্যস্ত ছিল। অবশেষে সেই শক্তি মানুষ জয় করেছে এবং প্রয়োগ করতেও অযথা বিলম্ব করেনি। বহু বৈজ্ঞানিকের অনুরোধ উপেক্ষা করে মার্কিন সামরিক বিভাগ উপরোক্ত তারিখে হিরোশিমা শহরের ওপরে ফেলল অ্যাটম বোমা। ষাট হাজার জাপানী পুরুষ, রমণী ও শিশু মারা যায়, আহত হয় এক লক্ষ
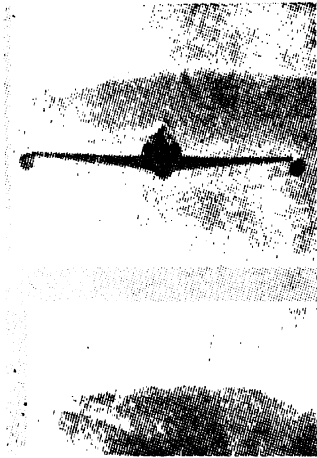
জেট চালিত প্রোপেলারহীন বিমান

আর যে শহরে আড়াই লক্ষ লোকের বাস ছিল, সে শহর ধ্বংস হয়ে যায় বোমার ভীষণ বাত্যা আর অগ্নিকাণ্ডে। জাপানকে পরাজয় বরণ করতে হ'ল।

এটুকু শুধু বুঝতে পারা যায় না যে, হিরোশিমা শহরে বোমা ফেলবার পূর্বে, বোমর ভীষণতা সমঝিয়ে দেবার জন্য কি কোন এক বিরল বসতি পূর্ণ অঞ্চলে বোমাটি ফাটানো যেত না? অতি বিস্ফোরক বোমা ও বিষাক্ত গ্যাস-বোমা থেকে নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু অ্যাটম বোমা থেকে নিষ্কৃতি নেই। তথাপি জিজ্ঞাসা করব বিজ্ঞান কি সর্বদা ধ্বংসই করে? পাস্তুর কি বৈজ্ঞানিক ছিলেন না?...আর কথ লিস্টার, জেনার, আর্লিখ, ডোম্যাক আর অ্যালেকজাণ্ডার ফ্লেমিং? গত মহাযুদ্ধে যে বোমারু বিমান শত শত টন বিস্ফোরক বোমা বহন করে নিয়ে গেছে লণ্ডন থেকে বার্লিনে, কিংবা মিউনিক থেকে স্মলেংকে এখন সেই বোমারু বিমান বহন করছে পেনিসিলিন, কিংবা নির্জলা খাদ্য। পেঁছে দিচ্ছে গ্রীসে, হোয়াংহোর উপত্যকায় কিংবা কর্ণফুলী নদীর তীরে।

যে ফ্লাইংবম্ব দক্ষিণ ইংলণ্ডকে পর্যুদস্ত করে' তুলেছিল এখন সেই ফ্লাইং বম্বকে শান্তি-কালীন উপযোগী করে' ইয়োরোপ থেকে অ্যামেরিকায় ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই বোমার গতি হ'বে ঘণ্টায় হাজার মাইল, অ্যাটলাণ্টিক সমুদ্র পার হ'তে সময় লাগবে চল্লিশ মিনিট জাহাজে যেখানে সময় লাগে চারদিন। জার্মাণদের ভি-২ রকেট বোমা মনে আছে কি? তার গতি ছিল ঘণ্টায় তিন হাজার ছয়শ' মাইল, শব্দের গতির পাঁচ গুণ। এই বোমা দ্বারা ইয়োরোপে ও অ্যামেরিকায় কম দূরত্বের মধ্যে ডাক পাঠানোর পরীক্ষা চলছে।

ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম হ'ল অ্যাটম বোমার শক্তির উৎস। কয়েক হাজার টন কয়লা অথবা তেলের কাজ কয়েক পাউণ্ড মাত্র ইউরেনিয়াম সম্পন্ন করতে পারে। পরমাণুতে নিহিত এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হ'বে, এ্যাটম বোমা হ'ল অ-নিয়ন্ত্রিত শক্তির চরম বিকাশ। তফাৎ হ'ল এই যে, এক টিন পেট্রলে দেশলাই জ্বালিয়ে দিলে তাতে আগুন ধরে' টিন ফেটে চতুর্দিকে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু এই পেট্রলে নিহিত শক্তি মোটর চালায়, মানুষের কত কাজ করে।

গত যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে যে সমস্ত জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে এখন শান্তির সময়ে সে সমস্ত জিনিস ও আবিষ্কার নানাপ্রকার কাজে লাগছে।

বিমানের সর্বোচ্চ গতি ছয়শত মাইল পার হয়েছে। এখন কলকাতা থেকে দিল্লী বিমান গড়ে আড়াইশো মাইল বেগে যায়, খুব শীঘ্র গড়ে চারশো মাইল বেগে কলকাতা থেকে দিল্লী উড়ে যাওয়া যাবে। কলকাতায় সকালে প্রাতরাশ সেরে দিল্লীতে পেঁছে জরুরী কাজকর্ম ও মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বিকেলে চায়ের আগে কলকাতায় ফিরে আসা যাবে।

যুদ্ধের প্রয়োজনে সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় বিশ হাজার আধুনিক বিমান ঘাঁটি নির্মিত হয়েছে। এখন এই সব বিমান ঘাঁটিগুলির সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে। কলকাতায় টিকিট কিনে বিমানে চড়ে সাতদিনের মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে' সেই বিমানেই আবার কলকাতায় ফিরে আসা যায়। মানুষ গতি বাড়াতে সর্বদা সচেষ্ট, ঘণ্টায় ছয়শত মাইলে সে সন্তুষ্ট নয়, অথচ বিমানের গতি আর বেশী বাড়ানো যাচ্ছে না, সেই জন্য জেট-প্লেন আবিষ্কৃত হয়েছে। বন্দুক অথবা রাইফেল ছুঁড়লে তারা পাল্টা একটা ধাক্কা দেয়।

ইলেকট্রণ মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষারত বৈজ্ঞানিক

বন্দুক থেকে গুলী বেগে বেরিয়ে যাবার আগেই এই ধাক্কা খেতে হয়। জেট্-চালিত-বিমানের কোনো প্রোপেলার নেই। জেট প্লেনের সামনে দুটি খোলা নল থাকে। সেই নল দিয়ে বেগে হাওয়া ভেতরে প্রবেশ করে, সেই হাওয়াকে চাপ দ্বারা ঘনীভূত করে' জ্বালানি তেলের দ্বারা উত্তপ্ত করা হয় এবং সেই বাতাসকে বেগে গ্যাসরূপে পশ্চাৎদিকে একটি নল দ্বারা বার করে' দেওয়া হয়। এই জন্য যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে ঐ বিমান অনায়াসে ঘণ্টায় সাড়ে পাঁচশত মাইল বেগে যেতে পারে, তবে সর্বোচ্চ গতি আট নয়শ' মাইল পর্যন্ত হ'তে পারে। এই বিমানের

দুই প্রান্তে দুটি তেলের ট্যাঙ্ক থাকে, তেল খরচ হয়ে গেলে ভার কমাবার জন্য ট্যাঙ্ক দুটি ফেলে দেওয়া যায়। গত যুদ্ধের সময় মার্কিন সমর বিভাগ পি-৮০ নামে জেট-চালিত জঙ্গী বিমান ব্যবহার করেছিল। বর্তমানে অনেক বিমান চালাতে আরম্ভ করবার সময় এই প্রকার জেট দ্বারা স্টার্ট দেওয়া হয়, এতে সুবিধা এই যে, অনেক অল্প জায়গায় বিমানকে জমিচ্যুত করা যায় এবং অনেক কম সময়ে গতি বাড়ানো যায়। বিমানের এই ক্রমবর্ধমান গতি পৃথিবীকে ছোট করে এনেছে। যে স্থানে আগে সময়ের অভাবে যাওয়া সম্ভব ছিল না এখন সে সব স্থান থেকে অনেক কম সময়ের মধ্যে ভ্রমণ সম্পূর্ণ করে ফিরে আসতে পারা যাবে। এখন যেমন কলকাতা থেকে ভ্রাম্যমান পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা ট্রেনে রওনা হয়ে বর্ধমানে মাল বিক্রয় করে আমাদের দেশেও কয়েক বৎসরের মধ্যেই যদি কেউ তাঁর কলকাতার বাড়ির ছাদ কিংবা টেনিস লন থেকে উড়ে গিয়ে তার নিজের গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে মাঠে নামে, তাহলে গ্রামের লোকেরা আশ্চর্য হলেও আমরা আশ্চর্য হবো না।

রেডিওর ও টেলিভিসনের ক্রমোন্নতি লক্ষণীয়। সেদিন খুব বেশী দূরে নয় যেদিন রেডিও সেটের দরে টেলিভিশন সেট বিক্রয় হ'বে অথবা কলকাতার স্কুলের ছেলেরা ক্লাসে বসে' সাঁওতালদের গ্রাম্যজীবন টেলিভিসনে দেখবে ও তাদের গান শুনবে কিংবা সেই অবসরপ্রাপ্ত লোকটি দার্জিলিংএ বসে কলকাতার মাঠের ফুটবল খেলা দেখবেন। রেডিও-প্রেরক যন্ত্র ও গ্রাহক যন্ত্রের এতদূর উন্নতি হচ্ছে যে, পৃথিবীর যে কোন যায়। চলন্ত যে কোন যানের গতি র‍্যাডারে ধরা পড়ে। পথভ্রষ্ট বিমানকে র‍্যাডার দিক নির্ণয় করে দিতে পারে। র‍্যাডার আবহাওয়ার পূর্বাভাসও দিতে পারে। তবে সবচেয়ে উপকার র‍্যাডারের কাছ থেকে বিমান যা পাবে, তা হ'ল সম্পূর্ণ অন্ধকার অথবা কুয়াসা ভেদ করেও বিমান নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করতে পারবে।

পরমাণুর যে কেন্দ্র তার নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত যে কণিকা থাকে, তার নাম প্রোটন, আর এই প্রোটনকে বৃত্তাকারে যে ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণিকা প্রদক্ষিণ করে, তার নাম ইলেকট্রন। যাঁরা রেডিও নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা ডায়োড, ট্রায়োড ইত্যাদি ভাল্‌ভ অথবা ডুম নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। এগুলি ইলেকট্রনিক্স ডুম ছাড়া আর কিছুই

র‍্যাডার-চক্রে দূরস্থ দ্বীপের সঙ্কেত পড়েছে
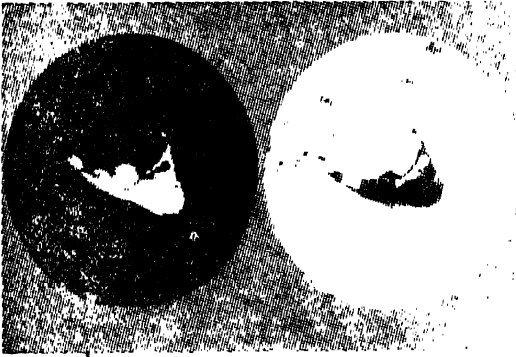
প্লাস্টিকাবৃত যন্ত্রপাতি, সব রকম জলবায়ু সহ্য করতে পারে, মর্চে ধরে না

সেইদিনই ফিরে আসে ঠিক সেই রকম যদি কেউ বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে কোনো ব্যবসায়ীকে তুলা বিক্রয় করে সেইদিনই বোম্বাই ফিরে যায় তাহলে বিস্মিত হ'বার কিছুই থাকবে না।

বিমানে ব্যবহার করবার জন্য এক প্রকার নিরাপদ তৈল আবিষ্কৃত হয়েছে, এই তৈলে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি পড়লেও জ্বলবে না কারণ এই তৈল ১০০ ডিগ্রি ফার্নহাইট পর্যন্ত পর্যন্ত উত্তপ্ত না হলে উদ্বায়ী হয় না।

বিমান জগতে আর একটি কৌতূহলকর আবিষ্কার হ'ল হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার যে কোনো জায়গা থেকে সোজা উপরে উঠে তারপর ইচ্ছামতো যে কোনো দিকে উড়ে যেতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে শূন্যে যে কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। হেলিকপ্টার একশত মাইল বেগে উড়তে পারে এবং বেশী লোক এখনও বহন করতে পারে না। গত যুদ্ধে যে কোনো স্থান থেকে আহতদের সরাতে হেলিকপ্টার খুব কাজ দিয়েছিল। মার্কিন দেশে কোনো কোনো শহরে বাস সার্ভিসের মতো হেলিকপ্টার সার্ভিস আরম্ভ হয়েছে। বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান পৃথিবীর যে কোন স্থানে শোনা যাবে এবং মানুষের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কোন পার্থক্যই ধরা পড়বে না।

রেডিও টেলিফোন দ্বারা এখনই ত চলন্ত বিমান, জাহাজ অথবা ট্রেন থেকে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, ক্রমে এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। গত যুদ্ধের সময়ে কলকাতা শহরের রাস্তায় অনেকেই সামরিক বিভাগের লোকদের ছোট ছোট যন্ত্রের সাহায্যে কথা বলতে দেখেছেন। এগুলির নাম 'ওয়াকি-টকি'। এগুলির সাহায্যে এখনও বেশীদূরে কথা বলা যায় না, তবে দূরত্ব জয় করতে আর কদিন!

আজকাল আমাদের কাছে র‍্যাডার এবং ইলেকট্রনিক্স কথা দুটি অপরিচিত নয়। রেডিও ডিটেকসান অ্যাণ্ড রেঞ্জিং কথা থেকে র‍্যাডার কথাটি তৈরী করা হয়েছে। র‍্যাডার হ'ল একরকম যন্ত্র যার সাহায্যে বিমান, জাহাজ অথবা ডুবো জাহাজ থেকে ধোঁয়া, বৃষ্টি, কুয়াসা এবং অন্ধকার উপেক্ষা করে অন্য বিমান, জাহাজ অথবা কঠিন কোন জিনিসের অবস্থান জানা নয়। এক কথায় বলতে গেলে ইলেকট্রনিক্স হ'ল গ্যাস অথবা বায়ুশূন্যে আধারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ। আজকাল নানাপ্রকার ইলেকট্রনিক্স ডুম আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ইলেকট্রনিক্স ডুম দ্বারা অনেক কাজ করা হচ্ছে। বিমান নির্মাণে কতকগুলি অংশ উত্তপ্ত করতে আগে অনেক সময় লাগত, খরচাও অনেক বেশী হত; কিন্তু এই কাজ ইলেকট্রনিক্স অথবা বেতার-রশ্মি খুব সহজে অনেক অল্প সময়ে এবং আরও ভাল করে সেই কাজ করে দেয়। রবারের বর্ষাতি ও টায়ারের কারখানায় এই রশ্মি অনেক কাজ করে দেয়। চিকিৎসা জগতে ইলেকট্রনিক্সের দান বড় কম নয়। এক্স-রে একপ্রকার ইলেকট্রন রশ্মি ছাড়া আর কিছু নয়, খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ স্থির করতে, আবশ্যক হলে শরীরে কৃত্রিম জ্বর উৎপন্ন করতে, অনেক প্রকার রোগ জীবাণু নষ্ট করতে ইলেকট্রন রশ্মি আজকাল অপরিহার্য। চিকিৎসা জগতে ইলেকট্রনিক্সের সর্বাপেক্ষা বড় দান ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। যে সমস্ত রোগ-জীবাণু এতদিন সর্বশ্রেষ্ঠ অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যেত না সে সব এখন ইলেকট্রন
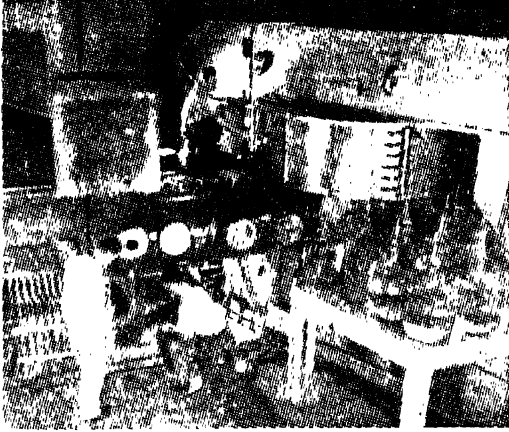
সাইক্লোট্রন যন্ত্র, যেখানে অণু পরমাণু ভাঙ্গা হয়

খেলার মাঠ থেকে টেলিভিসন দ্বারা শ্রোতা ও দর্শকের কাছে খেলার দৃশ্য পাঠানো হচ্ছে।

মাইক্রোস্কোপে দেখা যাচ্ছে। যে সব রোগ, তাদের জীবাণুকে এতদিন দেখা যেত না বলে, সুখে রাজত্ব করে এসেছে;—এইবার সে সব রোগকে জয় করা যাবে বলে আশা করা যায়। যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা।

ইলেকট্রিক রশ্মির সাহায্যে বাড়ি-ঘর গরম রাখা, দরজা জানালা খোলা, বন্ধ করা, দূরে কোন জায়গায় সতর্কীকরণ ধ্বনির ব্যবস্থা করা, অগ্নিসংকেত জ্ঞাপন করা, এমন কি যন্ত্র সাহায্যে ইঁদুর ধরা পর্যন্ত সম্ভব হচ্ছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ডক্টর আর্ভিং ল্যাংমুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, মানুষের সাহায্য ব্যতীত ফলের বাগানের কাজ ইলেকট্রন রশ্মি দ্বারাও চালানো যাবে। যে পেনিসিলিন শুকে করতে ২৪ ঘণ্টা লাগে, সেই পেনিসিলিন মাত্র ৩০ মিনিটে শুষ্ক করা যাবে। রবারের সঙ্গে কাঠ ও প্লাস্টিক জোড়া যাবে। খাদ্য-দ্রব্যের প্যাকেট ও ঔষধের প্যাকেট হাত না লাগিয়ে ইলেকট্রনিক্স রশ্মি দ্বারা সীল করা যাবে। টেলিভিসন ও ইলেকট্রনিক্স একসঙ্গে যুক্ত হওয়ায় টেলিভিসনের পরিধি বেড়ে গেল। ইলেকট্রনিক্সের আর একটি প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যাবে দূরপাল্লার টেলিফোনে কথা জোরে ও স্পষ্ট শোনা যাবে; দূরত্ব আরও বাড়ানো যাবে। চুংকিংএ কারও অসুখ করলে ভিয়েনার বিশেষজ্ঞে পরামর্শ কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

প্লাস্টিকের যুগ আরম্ভ হয়েছে। বেক-লাইট, সেলুলয়েড, মাইলোনাইট, সেলোফেন, প্লিও ফিল্ম, প্লেক্সিগ্ল্যাস, নাইলন, কোরোসিল ইত্যাদি এক একপ্রকার প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের তৈরী সম্পূর্ণ বাথরুম, রান্নাঘর, নানাপ্রকার আসবাব বিক্রয় হচ্ছে। আগামীদিনে আস্ত একখানা বাড়িই বিক্রয় হবে, এখন যেমন কাঠের বাড়ি বিক্রয় হচ্ছে।

পেনিসিলিন ও সালফোন্যামাইড আবিষ্কার হবার পর ভেষজ জগতের এক নতুন দিক খুলে গেছে। যে সব ব্যাধি ছিল অজেয় তারা এখন পরাজয় মানছে, যারা এখনও পরাজয় স্বীকার করেনি, তাদেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে। এই সঙ্গে হর্মোন বিজ্ঞানের উন্নতিও লক্ষ্যনীয়। হর্মোন চিকিৎসার সাহায্যে নরনারীর দেহের ও মনের আমূল পরিবর্তন করা যাবে, তার নমুনা এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। যাকে বলা হয় প্লাস্টিক সার্জারী তার সাহায্যে তো মানুষের দেহ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা যাচ্ছে। যাদের নাক খ্যাঁদা, তাদের নাক বাঁশির মতো না হলেও কিছু উঁচু করে দেওয়া যায়। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা সদ্যোমৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। সব দেশেই এখন চেষ্টা চলছে সুপুরুষ ও দীর্ঘায়ু মানুষ সৃষ্টি করতে। অনেকে কৃতকার্যও হচ্ছে।

নতুন যে সব কীটঘ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মশক-কুল ক্রমশঃ ধ্বংস হচ্ছে, মাছিও হবে। সেইদিনের আশায় চেয়ে রইলুম, যেদিন মশা ও মাছি পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল হবে, সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া ও কলেরাও হবে নির্মূল।

গাছের পাতা সূর্যকিরণ আহরণ করে নিজের মধ্যে শর্করা, শ্বেতসার, প্রোটিন, ফ্যাট ও সেলুলোজ তৈরী করে। মানুষ চেষ্টা করছে গাছের পাতার এই কৌশল আয়ত্ত করতে। গাছের পাতায় আছে ক্লোরোফিল, যার মাধ্যমে সমস্ত কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এই ক্লোরোফিলের মতো মাধ্যম খুঁজে বার করতে হবে।

মানুষ একদিন হয়ত বার্ধক্য জয় করতে পারবে। যেদিন তার চুল পাকবে না, দাঁত পড়বে না, মৃত্যু আসবে সুহজে। বৃদ্ধ হলে মানুষের মস্তিষ্কে একপ্রকার পদার্থ জন্মে, যার নাম দেওয়া হয়েছে "বার্ধক্যের রং", সেইটি ঠিক সময়ে নিষ্কাষিত করতে পারলে বার্ধক্যকে অন্তত দেড়শ' বৎসর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যাবে। অথবা এ-সি এস সিরাম প্রয়োগেও অতদিন বাঁচা যাবে। এ বিষয়ে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা গভীর গবেষণায় লিপ্ত আছেন।

মানুষের 'ক্রোমোসোম' 'জেনি'র অথবা বংশকণার সমষ্টি। ভবিষ্যৎ মানুষের দোষ-গুণ এই বংশকণাগুলির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এখন যখন কৃত্রিম প্রজনন চালু করবার চেষ্টা চলছে, ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যেদিন দোষযুক্ত বংশকণাগুলিকে সংশোধন করে অথবা বাদ দিয়ে আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞান শুধু তার কাজ করে গেলে চলবে না। বিজ্ঞান উন্নতি করে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্য অতএব এমন সমাজ-বিজ্ঞান গঠন করতে হবে, যাতে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রেখে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি উন্নতি উপভোগ করতে পারে।

ভারতবর্ষ শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও সে গরীব। বিজ্ঞানের যে সব উন্নতির বিষয় আলোচিত হলো, সে সব ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হতে দেরী আছে, কিন্তু তার পূর্বে বিজ্ঞানের সেই সব শাখা প্রযোজ্য হওয়া উচিত, যার দ্বারা এদেশ থেকে মারাত্মক রোগগুলি অবিলম্বে দূর হয়, জমিতে ফসল দ্বিগুণ অথবা ত্রিগুণ করতে ত' হবেই, তারা যেন আকারে বড় হয়, খাদ্যপ্রাণে যেন পরিপূর্ণ থাকে, গো-কুলের সংস্কার সাধন করতে হবে, যাতে প্রত্যেক লোকের অন্তত আধসের করেও দুধ জোটে। এসবের জন্য আধুনিক বিজ্ঞান কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত করে রেখেছে, এখন আবশ্যক তাদের কাজে লাগানো।

ব্যক্তিগত—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থখানি প্রবন্ধের সমষ্টি। বই, বাস্তুঘুঘু, ফেরিওয়ালা, বড়বাজার, গোলদীঘি, খাদ্য ও সাহিত্য, মন-খারাপ, ব্যক্তিগত—আটটি প্রবন্ধ ইহাতে আছে। কিন্তু প্রবন্ধ বলিয়া পরিচয় দিলে ভুল পরিচয় দেওয়া হইবে। এক জাতীয় প্রবন্ধ আছে যাহাতে আলোচ্য বিষয়বস্তুই প্রধান, জ্ঞান বিকিরণ তাহার লক্ষ্য। আর এক জাতীয় প্রবন্ধ আছে, বিষয়ের গৌরব যাহার প্রধান সম্পদ নহে, লেখকের ব্যক্তিত্বই সেই স্থান অধিকার করে। কাব্যে যেমন লিরিক, গদ্যে তেমনি এই জাতীয় রচনা। লেখকের ব্যক্তিত্বই এই শ্রেণীর রচনায় রসের মানদণ্ড বলিয়া ইহাকে বাংলায় সাধারণ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলা হয়।

বিমলাবাবুর 'ব্যক্তিগত' গ্রন্থ সেই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ঘনীভূত চাঁছি। এই শ্রেণীর রচনা লিখিবার জন্য যুগপৎ মন ও লেখনীর লঘুচলন আবশ্যক—অনেকটা যুধিষ্ঠিরের অমৃত্তিকাস্পর্শী রথের মতো। কর্ণের মাটিতে পুঁতিয়া-যাওয়া রথ যেন বিষয় গৌরবের ভারে ভারাক্রান্ত প্রবন্ধ। ব্যক্তিগত রচনা লিখিতে গেলে যে লঘুভাব, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, তির্যক হাস্যরস, fancy-র উদ্ভ্রান্তকর এলোমেলো হাওয়া প্রভৃতি যে সব গুণের আবশ্যক বিমলাবাবুতে সে-সব অতি প্রচুর পরিমাণে আছে। আমাদের মনে হয় এতদিনে বিমলাবাবু যেন তাঁহার শক্তির যথার্থ ক্ষেত্রটি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই শ্রেণীর লেখক ইংরাজি ভাষায় যথেষ্ট আছে—Lamb তাঁহাদের শিরোমণি। বাংলা ভাষাতে এই শ্রেণীর রচনা অল্প। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কিছু কিছু আছে। আধুনিকদের মধ্যে কেহ কেহ লিখিয়াছেন। বিমলাবাবুকে তাঁহাদের অগ্রণী বলা চলে। প্রজাপতির পাখার স্বচ্ছ লঘু বিচিত্র বর্ণময় চাতুর্য যেমন ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো যায় না, দেখিয়া বুঝিতে হয়—এই রচনাগুলিও তেমনি সমালোচনা করিয়া বুঝাইবার নয়—পড়িয়া বুঝিবার। ট্রামে বাসে যখন হাতে সময় পরিমিত, অফিসফেরৎ যখন ক্লান্তিতে আর কোন কাজে মন লাগে না—তখন পাঠককে এই বইখানা খুলিতে অনুরোধ করি। তবে ট্রাম বাস হইতে যথাস্থানে নামিতে ভুলিয়া গেলে এবং যথাসময় রেডিওর চাবি ঘুরাইতে অন্যথা হইলে—আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিব না। ১৭১।৪৭

—প্রমথনাথ বিশী।

শহীদ প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম—শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। অশোক লাইব্রেরী, ১৫।৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তিকায় প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কয়েকখানি ছবি আছে।

১৬৯।৪৭

টিকটিক ও চড়াই—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, চলতি নাটক নভেল এজেন্সী, ১৪৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানা কয়েকটি হাস্যরসপুষ্ট ছোট গল্পের সমষ্টি। কিন্তু নিছক রস পরিবেষণই গল্পগুলির উদ্দেশ্য নহে। প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই কোন না কোন ভাবের রাজনৈতিক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নভাবে শ্লেষ ও বিদ্রূপের মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছে। এইজন্য বইটিতে পাঠক আমোদ ও শিক্ষা দুই-ই লাভ করিতে পারিবেন।

—১৩৫।৪৭

লেডিজ ওন্‌লি—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—চলতি নাটক নভেল এজেন্সী, ১৪৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

"লেডিজ ওন্‌লি" নূতন ধরণের উপন্যাস। উহার নায়ক-নায়িকাগণ অধ্যায়ক্রমে তাহাদের স্ব স্ব কাহিনী বর্ণনা করিয়া সমগ্র গল্পটিকে রূপদান করিয়াছে। লেখকের লিপিকুশলতার গুণে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন ঘটনার প্রতি কৌতূহলী করিয়া রাখে। আয়না, দীপালি, নীলা প্রভৃতি নারী, ভাস্করকে কেন্দ্র করিয়া আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছে। চরিত্রগুলি বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

—১৩৪।৪৭

তরুণের স্বপ্ন—দ্বিতীয় পর্ব। শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—চলতি নাটক নভেল এজেন্সী, ১৪৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

'তরুণের স্বপ্ন' প্রথম পর্বের সমালোচনা আমরা যথাসময়ে করিয়াছি। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও সুবিপুল ত্যাগব্রতের পটভূমিকায় রচিত এই বিরাট উপন্যাসটিতে প্রবীণ গ্রন্থকারের যথেষ্ট ক্ষমতা ও যত্নের পরিচয় সুস্পষ্ট। উপন্যাসপ্রিয় পাঠকদের নিকট বইটি সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সমগ্র গ্রন্থ তিন পর্বে সম্পূর্ণ হইবে। আশা করি, শেষ পর্ব যথাশীঘ্র আত্মপ্রকাশ করিবে। —১৩৬।৪৭

AN ASPECT OF INDUSTRIAL ABSENTEEISM AND ITS METHOD OF CONTROL—By Dr. Arun Ganguli, Z. D. S. (Vienna). Price one Rupee.

শ্রমশিল্পে মজুরদের অনিয়মিত উপস্থিতির দরুণ শিল্পে যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। উহা উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায়। মজুরদের অসুখ-বিসুখ এবং অন্যান্য অনেক কারণ ইহার জন্য দায়ী। আলোচ্য পুস্তিকাটি এই বিষয়ের আলোচনাপূর্ণ একটি নিবন্ধ। ১৬১।৪৭

Burma—India's closest Neighbour—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ক্যালকাটা বুক হাউস, ১।১এ, কলেজ স্কোয়ার (ইস্ট), কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিবরণ সংক্ষেপে এই পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে। 'বৃহত্তর ভারত' গ্রন্থমালার ইহা প্রথম পুস্তিকা। তিব্বত, ভারত, আফগানিস্থান ও সিংহল সহ এক বৃহত্তর ভারতের পরিকল্পনার পটভূমিকায় ঐ সকল স্থানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবরণসম্বলিত অন্যান্য পুস্তিকা প্রকাশেরও আভাস আলোচ্য পুস্তিকার ভূমিকায় দেওয়া হইয়াছে। —১৫৮।৪৭

আর্জেণ্টিনার স্বদেশসেবক পেরোঁ—শ্রীদিলীপকুমার মালাকর প্রণীত প্রাপ্তিস্থান, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা

স্বদেশপ্রেমিক পেরোঁর সম্বন্ধে এবং আর্জেণ্টিনার গণমুক্তি সংগ্রাম সম্বন্ধে লেখক এই পুস্তিকায় আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও অনেক তথ্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ।

—১৫৭।৪৭

ইন কিলাব—পাক্ষিক পত্রিকা। সম্পাদক ডি বোস। কার্যালয়, পি১০, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা—১৩। প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই আনা।

'ইনকিলাব্' প্রগতিকামী রাজনৈতিক পত্রিকারূপে নূতন বাহির হইয়াছে। আমরা পত্রখানার উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

১৬৭।৪৭

মৌচাক—স্বাধীনতা সংখ্যা। শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। কার্যালয়, এম সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মৌচাক বালক-বালিকাদের উপযোগী সুপ্রাচীন মাসিক পত্রিকা। উহার স্বাধীনতা সংখ্যাটি সমালোচনার্থ পাইয়া প্রীত হইলাম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বাপর প্রায় সব ঘটনাই চিত্রাদি সহ সরলভাবে কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া এই সংখ্যাটিতে বিবৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি সংখ্যাখানাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ছেলেমেয়েরা এই সংখ্যাখানি পাঠ করিয়া ভারতের ত্যাগব্রতী মুক্তি-সাধকদের সম্বন্ধে বহুবিষয় জানিতে পারিবে।

—১৭০।৪৭

রাসলীলা—শ্রীনিখিলচন্দ্র রায় এম এস-সি প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট, ১৭।২, কালীঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'রাসলীলা' সরলপ্রাণ ভক্ত ও ভগবানের মধুর মিলনচ্ছবি ও ঐকান্তিক ভগবৎপ্রেমের অভিব্যক্তি। গ্রন্থকার বহুবিধ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই অপূর্ব ভগবৎ-লীলা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা সরল, হৃদয়গ্রাহী এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ভক্তজন এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন এবং সাধারণ পাঠকগণও উহা পাঠ করিয়া রাসলীলার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

—১৭৫।৪৭

সন্ধিক্ষণ—শ্রীঅরুণ সরকার প্রণীত। জাতীয় শিল্পী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

কবি অরুণ সরকার কবিতা খুব অল্পই লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যে সকল প্রকাশিত কবিতা আমাদের দেখার সুযোগ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা অল্প হইলেও প্রতিটিই রসোত্তীর্ণ হইয়াছে এবং সমগ্রভাবে তাঁহার প্রকাশিত কবিতাগুলি তাঁহার কবিজীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনারই আভাস দিয়াছে। আলোচ্য বইটি তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। কিন্তু উহা তাহার বাছা বাছা কবিতার সংকলন নহে। উহাদের সাহিত্যিক মূল্য ছাপাইয়া রাজনৈতিক মূল্য মাথা উঁচু করিয়াছে। তবু ভাব, ভাষা, ছন্দ ও শব্দ চয়নের দিক দিয়া কবিতাগুলি

প্রশংসা পাইবার যোগ্য। কবিতাগুলি ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে কংগ্রেসের নিষিদ্ধ অবস্থায় রচিত। দেশবাসীর বুকে তখন অসহনীয় বেদনার বোঝা, তখন শাসনের পীড়নে মুখ বন্ধ। এই দুর্যোগের স্বাক্ষর বইয়ের অধিকাংশ কবিতাই বহন করিয়া আনিয়াছে। কাজেই বইটির এখনও অসময় আসিয়া যায় নাই। কিন্তু বইখানা বড় দরিদ্রের বেশে বাহির করা হইয়াছে। কবিতার প্রাণৈশ্বর্যের বাহক হিসাবে উহার বহিরঙ্গের সৌষ্ঠবের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করিবে? —ত্র্যম্বক

আমাদের বাঙলা—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

বিগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশের বুকের উপর দিয়া দুঃখ-দুর্দশার একটানা প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাম্প্রদায়িক বিভীষিকা ও রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যা একের পর এক বাঙলাদেশকে বিপর্যস্ত করিয়া চলিয়াছে। তার উপর লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালনায় কলিকাতা নগরীতে রক্তপ্রবাহের বীভৎসতা মনুষ্যত্বের উপর সমাধি রচনা করে এবং অতি দ্রুততালে বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। এই সকলই নিতান্ত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। এই সকল ঝড়ঝঞ্ঝায় বাঙালীর মনে স্বভাবতই ক্ষোভ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হইতে পারে এবং হইয়াছেও। 'আমাদের বাঙলা'র লেখক সেই ক্ষোভকেই ভাষা দিয়া রূপায়িত করার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজনৈতিক প্রগতির চুলচেরা বিচারে বইটিকে হয়ত কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীলতার বদনাম পোহাইতে হইবে। কিন্তু নানা দিক হইতে বঞ্চিত দিশাহারা বাঙালীর একাংশে যে ক্ষোভ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা একেবারে মুছিয়া ফেলাও যায় না। আলোচ্য বইটি তাহারই প্রতিনিধিত্ব লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তবে লেখকের ভাষা স্থানে স্থানে সংযমের বাঁধ ভাঙিয়াও ছাপাইয়া গিয়াছে। কোন কোন দেশবরেণ্য নেতার প্রতি যে উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যতদূর সম্ভব অপ্রকাশ্য থাকিলেই ভাল হইত। ১৫৫।৪৭

CALCUTTA BUILDING REGULATIONS —By Bhola Nath Roy, M.A., B.L., and Anil Krishna Roy, B.E., A.M.I.E., B.A., to be had of S. K. Lahiri & Co., Ltd., 54, College Street, Calcutta. Price Rupees Three only.

কলিকাতার দালান-কোঠাদি তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্পর্কে আইনের সকল খুঁটিনাটি লইয়া বইটি রচিত হইয়াছে। যাঁহারা কলিকাতা শহরে বাড়ি করিয়াছেন ও করিবেন, সংশ্লিষ্ট আইনের বিধিবিধান বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য ঐ সকল ভাগ্যবানদের সকলেরই এই বইটি রাখা উচিত। তাহাতে আইনঘটিত ব্যাপারের অনেক জটিলতার সমাধান তাঁহাদের নিকট সুসাধ্য হইবে। ১৫৪।৪৭

আমাদের নেতাজী—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। কিশোর কিশোরীদের উপযোগী মিষ্টিভাষায় ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে জীবনীগ্রন্থ লেখার নৈপুণ্য লেখকের আয়ত্তাধীন। 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং আলোচ্য সুভাষ-জীবনী গ্রন্থে লেখক এই নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বইটিতে কিশোরদের স্বপ্নলোকের এক সর্বত্যাগী নেতৃপুরুষের জীবনালেখ্য বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহার কার্যকলাপগুলি রূপকথার মত মধুর-ভয়ঙ্কর, অথচ সত্যের উপর দৃঢ়বদ্ধ। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বই এযাবৎ বাহির হইয়াছে। তবে, আলোচ্য বইটির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে একটি গোটা নেতৃজীবনকে দুঃসাহসের জয়যাত্রীর ভূমিকায় সর্বত্র চিত্রিত করা হইয়াছে। বাঙলার কিশোর প্রাণে প্রেরণা জোগাইতে বইটি সর্বাধিক সহায়তা করিবে। ১৬৩।৪৭

জাপানী বন্দী শিবিরে—মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

আই এন এ'র মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু আজাদী ফৌজের সংগ্রাম সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে দুইখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং দুইখানাই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বহু পাঠকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। তাঁহার লেখনীর প্রধান গুণ এই যে, তিনি অতি প্রাঞ্জলভাবে বিনা আড়ম্বরে, বেশ কৌতূহলদ্দীপক করিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন। তদুপরি, সকল ঘটনাই তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ হওয়ার দরুণ পাঠকের মনকে উহা সহজেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। তাহা ছাড়া, তাঁহার দুইখানি বইতেই জায়গায় জায়গায় এমন সব মর্মস্পর্শী চিত্র ও ঘটনার সমাবেশ আছে যাহা শুধু রসের বিচারে উপভোগ্যই নহে, তথ্যের দিক দিয়াও মূল্যবান, অথচ আর কোন সূত্রেই ঐ সকল বিষয় জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থে, আজাদী ফৌজে যোগদানের পূর্বে লেখকের জাপহস্তে বন্দীজীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী লিখিত হইয়াছে। অন্য বই "আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে"ও শীঘ্রই অন্য কোন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। আমরা আশা করি তাঁহার এই উভয় গ্রন্থই পাঠকগণ কর্তৃক সমাদৃত হইবে। ১৬২।৪৭

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী—শ্রীগোপাল ভৌমিক প্রণীত। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে, ১৯০৮ খৃস্টাব্দে কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয় এবং প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। ইঁহারা মুক্তি-যুদ্ধের প্রথম শহীদ। ইঁহাদের অনুসৃত পন্থা আজ ভুল প্রতিপন্ন হইলেও, ইঁহাদের বীরত্ব ও ত্যাগ সর্বজনগ্রাহ্য। কর্তব্য সম্পর্কে উচিত-অনুচিতের চুলচেরা বিচার সাধারণত যাহারা করে না, বাঙলার সেইরূপ অগণিত জনসাধারণের প্রাণে ইঁহারা মরণ-বিজয়ীর সম্মানের আসন পাইয়াছেন। আজ স্বাধীনতা-প্রাপ্তি উপলক্ষে দেশবাসী ইঁহাদিগকে নূতন করিয়া স্মরণ করিয়াছে এবং শ্রদ্ধা জানাইয়াছে। ইঁহাদের বিস্তৃত জীবন-কাহিনী দুষ্প্রাপ্য হইলেও, এই উপলক্ষে ইঁহাদের সম্বন্ধে দুই চারিটি পুস্তক-পুস্তিকা সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীগোপাল ভৌমিক লিখিত আলোচ্য বইটিতে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে তথ্য আহরিত হইয়াছে। বইটির ছাপা কাগজ ভাল এবং কয়েকখানা চিত্রে সমৃদ্ধ। ১৫৬।৪৭

শিবের শিঙ্গা—শ্রীকরুণারঞ্জন ভট্টাচার্য প্রণীত. প্রাপ্তিস্থান——পণ্ডিত ভবন, পোঃ নরপতি, জেলা শ্রীহট্ট। মূল্য আট আনা।

'শিবের শিঙ্গা' কয়েকটি গদ্য কবিতার সমষ্টি। মানবতার চেতনা-উদ্দীপক ভাব কবিতাগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কবিতাগুলি আবেগ-উচ্ছল। এই তরুণ কবির মধ্যে যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই কবিতাগুলিতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। ১৭৪।৪৭

কেন এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা?—শ্রীরামরেণু মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সরস্বতী লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১া০।

বর্তমান ভারতের সর্বত্র যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি দেখা দিয়াছে তাহার উৎপত্তি কোথায় এবং উহার গতি ও প্রকৃতি কি রূপ ধারিতেছে, তাহা লেখক এই পুস্তকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে সাফল্যলাভ করিয়াছেন এবং এই হিসাবে পুস্তকখানিকে দাঙ্গার ভূমিকাও বলা চলে। লেখকের সহিত সকলে একমত নাও হইতে পারেন, কিন্তু লেখকের যুক্তি ও প্রমাণ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। বর্তমান সময়ে এই পুস্তকের দ্বারা এই বিষময় আবহাওয়া বহুল পরিমাণে প্রশমিত হইতে পারে, সে আশা রাখি, সেইজন্য এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ৯৭।৪৭

জাঁ ভালজাঁ—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত উপন্যাস লে' মিজারেবল'। বর্তমান গ্রন্থখানি তাহারই সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ। এই উপন্যাসের আরও একাধিক অনুবাদ বাঙলা ভাষায় আছে। ইহাতে উপন্যাসখানির জনপ্রিয়তার প্রমাণ হয়। হুগোর উপন্যাসের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দীন দুঃখী হতভাগ্যের মহাভারত বলিয়া, 'লে মিজারেবল' বিশ্বসাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। সকল দেশেই দীন দুঃখীর জীবনপ্রবাহ একই খাত দিয়া প্রবাহিত, কাজেই এদেশের বালক বালিকাদের পক্ষে ও দেশের কাহিনী বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। গ্রন্থকার অনুবাদে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। অবান্তর বাদ দিয়াছেন, আবশ্যক বাদ পড়ে নাই। ভাষা সরল ও স্বচ্ছ। ছাপা, বাঁধাই উত্তম। ১৯।৪৭

আমাদের স্থাপত্য শিল্পে যুক্ত সাধনা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বিরোধে ও বিদ্বেষে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি হয় প্রেমে ও যোগে। তবে এই দেশে যে মুসলমান যুগে অপূর্ব সব প্রাসাদ মসজিদ প্রভৃতি গড়িয়া উঠিল তাহা হইল কেমন করিয়া? মথুরা, কাশী প্রভৃতি তীর্থে তো দেখি বিরাট সব হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান শিল্পের যোগ ঘটিল কিরূপে? অথচ যোগ ঘটিয়াছে নিঃসন্দেহ। কারণ মুসলমান যুগের জাতীয় মন্দিরে যে শিল্প দেখা যায় তাহা বাহিরেরও নহে এবং ঠিক মুসলমানের একার সম্পত্তিও নহে। ভারতের দীর্ঘকালের যে পুরাতন স্থাপত্য শিল্প ছিল তাহাই বা গেল কোথায়? হিন্দুরও নিজস্ব একটি বিরাট শিল্প সাধনা নিশ্চয়ই ছিল।

এলিফান্টা, ভাজা, কার্লা, ইলোরা, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি গুহার শিল্প অতুলনীয়। কোণার্ক, ভুবনেশ্বর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সব মন্দির, সাঁচী প্রভৃতি বৌদ্ধ সব স্তূপ, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে যে শিল্প দেখা যায় তাহা অপূর্ব। এইসব শিল্প তো বাহির হইতে আসে নাই। কোণারকের মন্দিরকে অনেকে তাজমহল হইতে শ্রেষ্ঠ আসন দেন। সুদূর অজ্ঞাত প্রদেশে অবস্থিত হওয়ায় কোণারক আক্রমণকারীর হাত এড়াইয়াছে বটে, কিন্তু কালের হাত হইতে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। তবু তাহার যতটুকু আছে তাহাই মানবের চির-বিস্ময়ের বস্তু।

গুজরাটের ভরুচ অতি পুরাতন ও মহনীয় স্থান। ইহার প্রাচীন নাম ছিল ভরুকচ্ছ। ১৯২০ সালে যখন আমেদাবাদের পণ্ডিত হরিপ্রসাদ দেশাইর সঙ্গে ভরুকচ্ছ দেখিতে গেলাম তখন দেখিলাম এখানকার একটি প্রাচীন সূর্য-মন্দিরই এখন মসজিদে রূপান্তরিত। এইরূপ-ভাবে হিন্দু মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর করা আরও বহুস্থানে ঘটিয়াছে। শুধু কি কেবল ধ্বংসই হইয়াছে? হিন্দু মুসলমান শিল্পীর যুক্ত সাধনা ও সৃষ্টি কি তবে কোথাও নাই?

হিন্দু ও তুর্কীর দল প্রথম সাক্ষাতে স্বভাবতই পরস্পর পরস্পরকে শত্রু বলিয়াই মনে করিয়াছে। তাই তুর্কেরা এই দেশের সব রচনা তখন ধ্বংসই করিয়াছে। পরে ক্রমে উভয়ে পরিচয় ঘটিয়াছে ও ক্রমে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রীও জন্মিয়াছে। তখন উভয়েই মিলিত হইয়া কাব্য সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝার বিখ্যাত গ্রন্থ রাজপুতানার ইতিহাসে দেখা যায় যখন প্রতাপসিংহের সঙ্গে মোগল-দের যুদ্ধ হয় তখন প্রতাপসিংহের পক্ষে অগণিত মুসলমান সৈন্য ছিল এবং মোগল পক্ষেও কম হিন্দু যোদ্ধাও লড়াই করে নাই। কাজেই দেশাত্মবোধেও হিন্দু মুসলমান এক হইতে পারিয়াছে।

গুজরাট আমেদাবাদে গিয়া দেখিলাম হিন্দু মন্দিরের শিল্পের আদর্শেই মসজিদগুলি নির্মিত। সেখানে মন্দির ও মসজিদ রচনায় হিন্দু ও মুসলমান গুণীদের সম্মিলিত সাধনা। হ্যাভেল বলেন, যথার্থ শিল্পী ও গুণীদের মধ্যে কোথাও কোন সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে না। উদারভাবে তাঁহারা সর্বদাই একত্র হইয়া সর্বত্র সংস্কৃতি, শান্তি ও মৈত্রীর সাধনা করিয়াছেন। যোগ না হইলে যে সৃষ্টিই হয় না। (Indian Architecture, পৃঃ ৯)।

মুসলমান বা সারাসিনিক ও ভারতীয় শিল্পের মধ্যে বহু স্থলে ঐক্য থাকিলেও এই কথাটি যেন না ভুলি যে, ভারতীয় শিল্প সাধনাতেও বাহিরের বহু সাধনা আসিয়া ক্রমে ক্রমে মিলিয়াছে। অশোকের সময় হইতে বহু শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর বহু জাতিরই নানাভাবে পরিচয় ঘটিয়াছে। তবে ভারতে যখন তুর্কীরা আসিল তখন ভারত আর শিষ্যস্থানীয় নহে, তখন ভারত শিল্পগুরু। ভারতের তখন বাহির হইতে কিছু নিবার আর প্রয়োজন নাই। সে তখন অপরকে দিতেই সমর্থ। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত তাতার ও মধ্য এশিয়ার যোদ্ধারা যতই ভারতের নিকট-বর্তী হইতে লাগিল ততই তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাব বাড়িয়া চলিল। কালক্রমে তাহাদের শিল্প নামতঃ আরব ও মোগল রহিলেও তাহা আসলে হিন্দু শিল্পের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইল (ঐ, পৃঃ ১০)। সিন্ধুনদ অতিক্রম হইয়া আসিবার পূর্বেই "সারাসিনিক বা মুসলমান শিল্প ভারতীয় ভাবে ভরপুর হইয়া উঠিল। ফারগুসন বর্ণিত গজনবীর শিল্প ও পাঠান শিল্পই তাহার প্রমাণ। গান্ধার দেশে মহমুদ গজনীর বংশীয়েরা ভারতীয় শিল্পীদের দিয়াই অপূর্ব প্রাসাদ মন্দির প্রভৃতি রচনা করাইলেন। সেই সব শিল্পীরা তো আফগান যোদ্ধা নহে তাহারা শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধ শিল্পী-দেরই বংশজাত। (ঐ, পৃঃ ১১)।

ভারতীয় শিল্পকে য়ুরোপীয়েরা যতটা হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর মুসলমান রাজারা কিন্তু তেমন করিয়া তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চাহেন নাই। ভারতে আসিবার পূর্বেই আরবেরা নানাভাবে হিন্দু-সংস্কৃতির দ্বারা গভীররূপে প্রভাবিত হইয়া-ছিল। ধর্মের অনুশাসনবশতঃ চিত্র ও মূর্তির দিকে তাহারা ঘেঁষিতে না পারিলেও হিন্দু-স্থাপত্য ও অন্যান্য নানাবিধ শিল্পের প্রতি তাহাদের গভীর অনুরাগ ছিল। বাগদাদের প্রাসাদ ও মসজিদগুলি একসময়ে স্থাপত্য শিল্পের পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইত। পরে মোগলেরা মুসলমানদের শিল্পতীর্থ এই বাগদাদও ধ্বংস করে। বাগদাদের গৌরবের মহত্তম যুগে বাগদাদীয় শিল্প সম্পদ দেখিতে অভ্যস্ত আলবিরুনী ভারতীয় শিল্প দেখিয়া অবাক হইয়া যান। তিনি বলেন, "ইহা দেখিলে আমাদের সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান। এইরূপ কিছু রচনা করার কথা দূরে থাকুক ইহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই" (ঐ, পৃঃ ১১)।

হিন্দু চিত্র শিল্পের ঐশ্বর্য দেখিয়া আকবরের সময়কার ঐতিহাসিক আবুল ফজলেরও ঠিক এইরূপ বিস্ময় হইয়াছিল। আবুল ফজলও বলেন, "হিন্দু শিল্পের ঐশ্বর্য আমাদের কল্পনার অতীত। জগতে ইহার তুলনা বিরল।" (ঐ, পৃ ১১—১২)।

মহমুদ গজনী যদিও মন্দির ধ্বংস করিয়াছেন তবুও ভারতীয় শিল্পমাহাত্ম্যে তিনি বিস্ময়াভিভূত না হইয়া পারেন নাই। সেই কথা ফেরিস্তাও উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারত হইতে বহু শিল্পীকে মহমুদ গজনী বন্দী করিয়া লইয়া যান। ইহাদের দিয়া তিনি তাঁহার প্রখ্যাত সব মসজিদ রচনা করান। হারুণ অল রসীদের সভায় হিন্দু দূত ও শিল্পী ছিলেন। বাগদাদের রচনায় ও বাগদাদের শিল্প ঐশ্বর্যে তাঁহাদেরও হাত আছে। ইহার পাঁচশত বৎসর পরেও সমর-খন্দ রচনার সময় মোগল তৈমুর ভারতীয় শিল্পীদের ব্যবহার না করিয়া পারেন নাই। (ঐ, পৃঃ ১২)।

ইন্ডো-মহমেডান স্থাপত্যের তেরটি প্রাদেশিক বিভাগ আছে। তাহার মধ্যে গুজরাট গৌড় ও জৌনপুরের রচনা প্রণালী দেখিলেই মনে হয় যে, ঐসব শিল্পীদের সকলেই ভারতীয়, হয়তো তাহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মেও হিন্দু। (ঐ, পৃঃ ১৩)।

কালক্রমে গৌড়ীয় শিল্পশৈলী ও চালা-ঘরের বঙ্কিম শোভা মুসলমান রাজাদের পাষাণ মন্দিরে ও প্রাসাদেও দেখা দিল। ইহা দেখাইতে গিয়া হ্যাভেল তাঁহার গ্রন্থে ২০৬ পৃষ্ঠার সম্মুখে ১০১নং প্লেটে আগ্রা প্রাসাদের সোনালী গম্বুজ ও দিল্লীর মোতি মসজিদের চিত্র দিয়াছেন। তাহাদের নাম দিয়াছেন Bengali Roofs and cornices।

১৯৩৩ সালে, ২৫শে জানুয়ারী লণ্ডনে India Societyতে শিল্প আলোচনার জন্য এক সভা হয়। তাহাতে Sir Francis

Young-husband সভাপতি ছিলেন। সেই সভায় American Institute for Persian Art and Archeologyর ডিরেক্টর Mr. A. U. Pope ভারতীয় ও পারস্য দেশীয় স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে বলেন, (Some Inter-relations between Persian and Indian Architecture)

ভারত ও পারসিয়ার মধ্যে মিল হইতে অমিলই প্রথমে চোখে পড়ে। কিন্তু আসলে তাহাদের বিরোধ হইতে মুক্ত সাধনাই মানব সংস্কৃতি সাধনার বড় কথা, যদিও যোগ ঘটিয়াছে অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে। আর তাহাদের মধ্যে অমিলটাকে প্রথমে যতটা দারুণ মনে হয় পোপের মতে তাহা আসলে ততটা কিছুই নয়। পোপ আরও বলেন, "পারসিয়া সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, ভারত বিরাট বিচিত্র অপূর্ব সৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন। পারসিয়া বস্তুতান্ত্রিক ও যুক্তি-বদ্ধ, ভারত ধ্যানে ও ভাবে সুদূর প্রসারিত।" (Indian Art and Letters, Vol. IX, No. 2, পৃঃ ১০২-১০৩)।

প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ধর্ম ইরাণের রীতিমত ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। সীস্তানে কুই-ই-খাজাতে স্যার অরেল স্টাইন বৌদ্ধ ভাবের প্রাচীর চিত্র পাইয়াছেন। বহরামগুর ভারত হইতে ৪২১—৪৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় বার হাজার নৃত্যগীতকলাবিদ ও শিল্পীদের লইয়া (ঐ, পৃঃ ১০৪) গিয়াছেন। পারস্য-সম্রাট প্রথম খুসরু (৫৩১—৫৭৯) ও দ্বিতীয় শাপুরের ভারতের সঙ্গে যোগ ছিল ও ভারতীয় পণ্ডিত ও শাস্ত্রের সমাদর তাঁহারা করিতেন। তক-ই-বোস্তানের স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পের অনেকটাই পুরাপুরি ভারতীয়। (ঐ, পৃ ১০৪)। সাসানীয় যুগের পারসীয় খিলানে ও গম্বুজে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট (ঐ, পৃ ১০৮)। মশাদ নামক স্থানে (১৪১৮ খৃঃ) গোহর শাহের মসজিদের খিলানে আগাগোড়াই ভারতীয় খিলান রীতির প্রভাব মিলিবে। ইহার খিলান ও গঠন প্রণালীতে বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট (ঐ, পৃ ১১০)।

তাজমহলের অষ্টভুজ ভিত্তিতে রচনা প্রণালীর বহু পূর্বেই পারসিয়াতে অষ্টভুজ ভিত্তির রচনা প্রণালী দেখা যায়। দশম শতাব্দীতে বগদাদের খলিফ-এল-মুক্তির প্রাসাদে দ্বাদশ শতাব্দীর জেবেল-ই-সঙ্গের রচনাতে অষ্টভুজ ভিত্তির রচনা প্রণালী দেখা যায়। গুল পাইগন মসজিদের (১১০৪—১১১৮ খৃঃ) গম্বুজ ভিত্তিও অষ্টভুজ। ১৩০৭ সালে সুলতানিয়াতে উলজইতুর মকবরা অর্থাৎ সমাধি মন্দির রচিত হয়। তাহার ভিত্তিও অষ্টভুজ। কুম ও ইসপাহানের আরও বহু সমাধি মন্দির এই সময়েই রচিত। সেগুলির ভিত্তিও অষ্টভুজ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাবিজের নিকটে উজুন হসন এমন এক অষ্টভুজ ভিত্তির প্রাসাদ রচনা করেন যাহা ইয়োপীয়গণের বিস্ময়ের বস্তু ছিল। পারস্যে মশাদ নিশাপুর ও গুলপইগনে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও নানা প্রণালীর অষ্টভুজ ভিত্তির উপরে স্থাপিত গম্বুজের মসজিদ রচিত হয়। পুরাতনকালে পারস্য দেশে এই অষ্টভুজ ভিত্তির রচনা দেখা যায় না। আরাকিমিনিদ বা সাসানীয় যুগে সে দেশে ইহা কোথাও মেলে না, অথচ ভারতে অষ্টভুজ ভিত্তিতে রচনা অতি প্রাচীন শাস্ত্র-সম্মত ও বিশেষ পবিত্র (ঐ, পৃ ১১১)।

মেসোপোটামিয়া ও আসীরিয়াতে অতি প্রাচীন যুগে গম্বুজ রচনার প্রচলন ছিল। তবু পারসিয়াতে গম্বুজ হয়তো ভারতীয় বৌদ্ধেরাই লইয়া গিয়াছেন (পৃ ১১২)।

কেহ কেহ মনে করেন বৌদ্ধদের যে চৈত্য স্তূপ রচনা, তাহাতে দেহস্থিত পঞ্চভূতের প্রকৃতিস্থিত পঞ্চভূতের মধ্যে বিলয়ের ইঙ্গিত আছে। তাই তাহার তলায় নিরেট চৌকা অংশ মাটির প্রতিরূপ। তাহার উপরে যে বুদ্বুদবৎ রচনা তাহা জলের প্রতীক। এই বুদ্বুদই হইল গম্বুজের আকর। জীবন বুদ্বুদবৎ ক্ষণস্থায়ী ইহা বুঝাইতেই পারসিয়ায় মসজিদে গম্বুজ বা বুদ্বুদকে সর্বোপরি দেখান হইত। ভারতীয় এই জিনিসই আবার পারসিয়া হইতে যখন ভারতে ফিরিয়া আসিল তখন ভারতীয় শিল্পীরা তাহাকে প্রসন্ন মনে পুনরায় গ্রহণ করিলেন তাহাও ভারতীয় শিল্পীদের পরম গৌরবের কথা (ঐ, পৃ ১১৬—১১৭)।

হয়তো মিনার রচনার আদি স্থান ভারতেই। কিন্তু এই সূত্রে পারসিয়ার সঙ্গে ভারতের অনেক লেন-দেন ঘটিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় মিনার হইল দিল্লীর কুতুবমিনার (১১৯০ খৃঃ)। তবে ইহাতে হিন্দু শিল্পেরও প্রভূত ঐশ্বর্য বিদ্যমান। এই মিনারে ভারত ও পারসিয়ার সাধনাকে যুক্ত দেখা গেল (ঐ, পৃ ১১৭—১১৮)। মোগল যুগে চিত্রকর্মে, বস্ত্র বয়ন রচনায়, কার্পেট ও উদ্যান পরিকল্পনায় পারসীয় বহু শিল্প রীতি ভারতে প্রবর্তিত হইল (ঐ, পৃ ১১৯)। আবার পারসিয়ার "অনা উ" প্রভৃতি মসজিদে সুস্পষ্ট বৌদ্ধ গুহার ও চৈত্য শিল্পের প্রভাব দেখা গেল (ঐ, পৃ ১১৯)। পারসিয়ার গম্বুজের চূড়াতে যে বর্তুল অলঙ্কার থাকে তাহাকে কলসা বলে। পারসী ভাষায় কলসার কোনো অর্থ নাই। এই কলসা ভারতীয় মন্দির চূড়ার কলস ছাড়া আর কিছুই নয় (ঐ, পৃ ১১৯)। পারস্য দেশে পদ্মপলাশ রীতির গম্বুজ ভারতেরই প্রভাবে। মীর চকমদে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যাজদ মসজিদ এই পদ্মপলাশ প্রণালীতে রচিত (ঐ, পৃ ১১৯)

ফার্গুসন বলেন, মুসলমানদের পূর্বে ভারতে কন্দাকৃতি (bulbous) গম্বুজ ছিল না। হ্যাভেল সাহেব তাঁহার গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, বৌদ্ধ গুহাগুলিতে সেরূপ কন্দাকৃতি গম্বুজ প্রচুর দেখা যায়। অজন্তা গুহায় ১৯নং এবং ২৬নং চৈত্যের ভিতরে সেরূপ গম্বুজ আছে (Havell, Indian Architecture, পৃ ২৪)। বৌদ্ধ গম্বুজ ও তাজমহলের গম্বুজের মধ্যবর্তী রূপে দেখা যায় তাঞ্জোরের মন্দিরের (১১শ শতাব্দী) গম্বুজে (ঐ, পৃ ২৫)। এই গম্বুজের উপরে যে কলস আছে তাহাই পারসিয়ার কলসা (ঐ, পৃ ২৬)। এই কলস কথাতে বুঝা যায় ভারত হইতেই পারসিয়াতে এই বিদ্যা গিয়াছে (ঐ পৃ ৩১-৩২)।

আলবিরুনী এবং মহম্মদ গজনীর মতে ভারতীয় নৃপতিদের শিল্পকলা ছিল জগতে অতুলনীয়। আরব, তাতার, মোগল ও পারস্য-বাসী শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পীদের কাছেই শিক্ষা লইয়াছেন। তাই হ্যাভেল বলেন, তাজমহল ভারতীয় প্রতিভারই ফল, "Tajmahall belongs to India, not to Islam" (ঐ, পৃ ২১)।

তাজের ভারতীয়ত্বের একটা বড় প্রমাণ তাজ পশ্চিমমুখী নহে (ঐ)। R. F. Chisolm দেখাইয়াছেন তাজের চারি কোণাতে চারি মিনার মধ্যে গম্বুজযুক্ত। মূল মন্দির ঠিক যবদ্বীপের চণ্ডী সেবার পঞ্চরত্ন মন্দিরের নক্সার সঙ্গে মেলে। হিন্দু শিল্প শাস্ত্রের পঞ্চরত্ন মন্দিরেরও এই রূপেই গঠন প্রণালী (ঐ, পৃ ২২)। অজন্তার চিত্রেও ঠিক তাজের নক্সার নমুনা মেলে। প্রথম গুহা চিত্রে বুদ্ধের কাছে মা ও শিশুর চিত্রে এবং অনুরাধাপুরে ও বোরোবুদুরে বুদ্ধ মূর্তির সঙ্গে অনুরূপ নক্সা পাওয়া যায়। শুধু তাজে নহে আকবরের সেকেন্দারাতেও এমন সব শৈলী দেখা যায় যাহাকে ঠিক মুসলমানী বলা চলে না। আকবর জাহাঙ্গীর শাহজহান এই তিনজনেই সংস্কৃতি হিসাবে অনেকখানি ভারতীয় ছিলেন (ঐ, পৃ ২৭)।

তাজ শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাস খুঁজিতে ভারত ছাড়িয়া পারস্য দেশে বা মধ্য এসিয়াতে ঘুরিয়া মরা বৃথা (ঐ পৃ ৩০)। তাজের নির্মাণে যেমন কান্দাহার কনষ্টান্টিনোপল ও সমরকন্দের কারিগর ছিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে মুলতান লাহোরের কারিগরেরও অভাব ছিল না (ঐ, পৃ ৩১)। দিল্লীরও বহু কারিগর ছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষার মধ্যে ভারতীয় শৈলীই চলিত ছিল। একজন বড় ওস্তাদ ছিলেন চিরংজীব লাল, তাঁহার অনুবর্তী ছিলেন ছোটেলাল, মন্নুলাল ও মনোহরলাল (ঐ, পৃ ৩২)। ইঁহারা সবাই হিন্দু।

Arthur Upham Pope বলেন, মনরিক নামে এক পাদরীই প্রথম একটা কথা তোলেন যে, পর্তুগীজ পাদরীদের মুখে নাকি শোনা গিয়াছে তাজমহলের নির্মাতা ছিলেন "ভেরো নিয়ো" নামে এক য়ুরোপীয় জহুরী। য়ুরোপীয় কারিগরেই যদি ভারতে তাজমহল রচনা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা য়ুরোপে

কেন সেইরূপ কিছু করিলেন না? তাজমহল রচনার বিষয়ে বলিবার যথার্থ অধিকারী তাবের্নিয়ার ও বর্নিয়ে। তাঁহারাই কাছাকাছি সময়ে এই দেশে ছিলেন। তাঁহারা তো এইরূপ কোনো কথাই বলেন নাই। মানরিক পরবর্তী লোক। পাদরী মানরিকের আরও বহু বিবরণই পরে মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িয়াছে (Some Interrelations between Indian and Persian Architecture, Indian Art and Letter. Vol No. 1, New Series p. 120). তাহা ছাড়া ভেরো নিয়ো ছিলেন জহুরী জহুরীরা সূক্ষ্ম শিল্পে যতই বিচক্ষণ হউন তাঁহারা বড় স্থাপত্য রচনায় অপারগ (ঐ. পৃঃ ১২০)।

কাগজে পত্রে দেখা যায় ওস্তাদ ইশা ছিলেন তাজমহলের প্রধান কারিগর। দেখা যায় তিনি শিরাজ ও আগ্রা উভয় স্থানে থাকিতেন। পোপ বলেন, তিনি পারস্যের হইলেও তাজ পারস্য শিল্প নহে।

But that the chief architect was Persian would not make the Taja Persian building

(ঐ পৃঃ ১২১)

আসলে তাজমহলকে বলা উচিত প্রেমের পরিপূর্ণতম শ্রদ্ধাঞ্জলি। ইহাকে ভারতীয় ও অভারতীয় উভয়বিধ শিল্প ও সংস্কৃতির যুক্ত সাধনা বলা চলে।

"It ought also to be regarded as a monument of artistic and intellectual co-operation, the profitable exchange of technique and ideas between kindred cultures, a proof that civilization is a common task, of which the progress depends upon sympathy and co-operation between Allied peoples." (A. U. Pope, ঐ পৃঃ ১২২)।

অর্থাৎ সভ্যতার সৃষ্টিতে সকলকেই যুক্ত হইয়া সাধনা করিতে হয়। নানা দেশ, নানা জাতি ও নানা ধর্মের পরস্পরে দরদ ও সহ-সাধনা থাকিলেই এইসব কাজ অগ্রসর হয়। এই তাজের সৃষ্টিতে ভারত ও পারসিয়া পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষা ও সাধনা দিয়া সহায়তা করিয়াছে ও ইহাতে উভয়েই সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাহিরে বিরোধ মনে হইলেও ভারত ও পারসিয়ার সংস্কৃতির মধ্যেও অন্তরে অন্তরে একটা বান্ধবতা আছে। পোপ বলেন, তাহারা Kindred in Culture (ঐ, পৃ ১২২)।

উদার মোগল সম্রাটদের অন্তরে হিন্দু ও অভারতীয় এসিয়ার সংস্কৃতির প্রতি সমান টান ছিল। হিন্দু ওস্তাদেরাও অনুরূপ উদারতার সঙ্গে বাহিরের সব কারিগরের সঙ্গে যুক্ত সাধনা করিয়া গিয়াছেন। গম্বুজ রচনার কাজ পরিদর্শক কন্‌স্টান্টিনোপলের হইলেও তাজের গম্বুজ "বাইজেনটাইন" আরব বা পারসিয়ার গম্বুজ নহে ইহার আকার ইঙ্গিত সবই হিন্দু (Hindu both in form and symbolism, Havell, Indian Architecture, পৃঃ ৩৪)।

তাজের পুষ্পিত মোসাইক কাজের ডিজাইনের অনুপ্রেরণা পারসিয়ার হইলেও সেই সব শিল্পী ওস্তাদেরা ছিলেন সবই হিন্দু। তাজের বাগান রচনাও হইয়াছিল এক হিন্দু শিল্পীর (ঐ, পৃ ৩৪) পরিকল্পনায়।

আরব বা পারসীয় নামে বুঝা যায় কারিগর সেই সব দেশের, খুব সম্ভব তাহারা ভারতীয় মুসলমান, ও শিল্পীদের অনেকেই হিন্দু। (ঐ, পৃ ৩৪-৩৫)। যুক্ত সাধনাতে তাজমহলের মত এমন যে অপূর্ব সৃষ্টি হইল তাহার অনেকটা গৌরব শাহজাহানের প্রাপ্য। শাহজাহানের পরেই সেই সৃষ্টির ও দৃষ্টির অবসান ঘটিল। আওরংজেব নানা উপায়ে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াই ধর্মের নামে শিল্পকে নির্বাসিত করিলেন আর গোঁড়া মুসলমান কারিগর ছাড়া আর সব শিল্পীদের তাড়াইয়া দিলেন (ঐ, পৃ ৩৭)। ইহার পরেই মোগল দরবারে শিল্প সৃষ্টি সমাপ্ত হইয়া গেল। হিন্দু শিল্পীরা আওরংজেবের পরে ভারতে নানা হিন্দু রাজার অধীনে যেসব সুন্দর প্রাসাদ ও মন্দির রচনা করিলেন তাহার বিবরণ ও চিত্রও হ্যাভেল সাহেব দিয়াছেন (ঐ, পৃ ৩৮)।

সাজ-সজ্জায় অলঙ্কারে এই দেশে হিন্দু ও মুসলমান মণ্ডন শিল্পের যে যুক্ত সাধনা দেখা যায় তাহাও ভবিষ্যৎ বিদ্যার্থীদের গবেষণার বস্তু হওয়া উচিত। আজ তাহা এখানে বলার অবসর নাই।

ভারতের যোগ ও যোগীর পরম মাহাত্ম্য। নদীর সঙ্গে নদীর যেখানে যোগ সেই তীর্থে মুক্তি। মুক্ত দৃষ্টি না হইলে সৃষ্টি হয় না। শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসী তবু তিনি বলিয়াছেন, শিব শক্তি যুক্ত না হইলে কিছুই হইতে পারে না। ভারতে যখন হিন্দু ও মুসলমান সাধনার মিলন ঘটিয়াছে তখনই নানা ঐশ্বর্য সৃষ্ট হইয়াছে। যখন এই দুইয়ের বিচ্ছেদ ও বিরোধ ঘটিয়াছে তখন কেবল প্রলয় ও সর্বনাশ ঘটিয়াছে।

৬
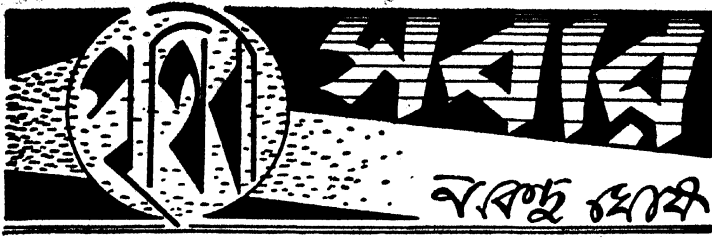
রাতের বেলা ঘুম এলো না মংরার। ক্ষতটা টনটন করছিল, শরীরটা জ্বর জ্বর মনে হচ্ছিল। তার চোখের সামনে বারংবার ভোরবেলাকার ছবিগুলো ভাসছিল। বিলের ঘোলাটে জল, রুপোলী মাছ, পুলিশ, রাইফেলের গুলী, রক্ত, মৃত্যু। আর শুকরা আর মেঘুর রক্তহীন, পাণ্ডুর মুখ। তার মাথা গরম হয়ে উঠেছিল, দেহের রক্ত যেন মাথায় চড়ে গিয়েছিল।

ঝুমরী ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল হঠাৎ। ঘুমের ঘোরেই স্বামীর দেহের পরিচিত স্পর্শটা না পেয়ে তার সুষুপ্ত চেতনা হঠাৎ বিদ্রোহ করল, অভ্যাসের ব্যতিক্রম সইতে পারল না, ফলে ঘুম ভেঙে গেল।

"এই জী—জাগা আছিস্ তু?"

"হয়"—

"ক্যানে? তুর ঘা কি দুখ্ দিছে?"

"না।"

"তভে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল ঝুমরী, "ক্যানে তু রাইত জাগবু, শরীলটা খারাপ করবু?"

"বিহানের বাৎ সভ্ মনে পইড়ছে বহু"—ক্লিষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল মংরা।

"ভাবিস্ নাই উসব বাৎ জী—ভাবিস নাই"—উঠে বসে স্বামীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ঝুমরী মমতা ভরা কথা বলেছিল।

অসহায়ভাবে মাথা নেড়েছিল মংরা, "হামু তো চাহুঁছি—কি ভাইবব না কিন্তুক পাইরছি না যি"—

"না না ঘুমা তু, ঘুমা, হামার কথা শুন্।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা রে বহু, চ্যাষ্টা কইরছি—"

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল মংরা। খানিক বাদেই ঝুমরী আবার ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু মংরার আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, তার ঘুম এল না। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনতে শুনতে বিছানার ওপর এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে। নাছোড়বান্দা ভূতের মত ভোরবেলার ঘটনাটা বারংবার তার মস্তিষ্কে আঘাত করতে লাগল, বারংবার শুকরা ও মেঘুর রক্তহীন মুখচ্ছবিটা অন্ধকারের পরদার ওপর ধোঁয়ার মত কাঁপতে লাগল। মৃদু বাতাসের সঙ্গে বারংবার যেন সেই বিলের বুক থেকে নিহতদের তীক্ষ্ম আর্তনাদ ভেসে আসতে লাগল; বিলের পচা জল আর ঘাস-লতা, বারুদ আর রক্তের গন্ধও যেন সে টের পেতে লাগল। এমনিভাবে কাটল রাতটা, যখন ভোর হল তখন সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, রাঙা রোদের সঞ্জীবনী স্পর্শে নতুন করে প্রাণ পেল।

ঘণ্টাখানিক বাদে বাইরের দাওয়ায় বসে সে ভাবছিল। কি করা যায় এবার? মাছ মারতে গিয়ে প্রাণ গেছে অনেকের, হার মেনে পালিয়ে আসতে হয়েছে বাকী সবাইকে। কিন্তু আবার যেতে হবে, রক্তের দাম আদায় করত হবে, নিজেদের হককে আদায় করতেই হবে। রসিক মাঝি হয়ত বাধা দেবে তাদের, যার রক্তে নিমকহারামী প্রবেশ করেছে তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। শুধু তাই নয়, রসিক মাঝি তার শ্বশুর হলেও ক্ষমা করা যায় না তাকে। জমিদারের টাকা তাকে কেনা গোলাম করে ফেলেছে, জমিদারকে খবর দিয়ে সে চল্লিশ জন লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। না, উপায় নেই, সবাইকেই একথা জানাতে হবে। যে মোড়ল অন্যান্য সবার বিচার করত আজ তারি বিচার করতে হবে। নইলে তাদের জানোয়ার করে ফেলবে এই রসিক মাঝি, নইলে আরো লোকের মৃত্যুকে ডেকে আনবে সে।

"মংরা—মংরা"—

সোমা আর টোমা ছুটে আসছিল।

"কি হৈল বা?" মংরা অবাক হয়ে তাকাল তাদের দিকে। সোমা এসে দাঁড়াল, দ্রুতকণ্ঠে বলল, "পুলিশ!"

"পুলিশ!" বিদ্যুতের একটা প্রবাহ যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত খেলে গেল, চেতনায় ঝম্ করে শব্দ হল।

"হাঁ—" সোমা মাথা নাড়ল, "তু আর টোমা অখনি পলা—তুদের জখম আছে, পুলিশ ধরা লিবে—যা, ভাগ্"

"পুলিশ!" বিড়বিড় করে বলল মংরা, "কাঁহা দেখলু তু?"

"হৈ পুবদিকের ক্ষ্যাত ভাঙগা আইসছে, হামরা দেখলম"—টোমা তাড়া দিল, "জলদি চল মংরা—জলদি"—

মংরা উঠে দাঁড়াল। আর ভাববার সময় নেই, পালাতেই হবে।

"ঝুমরী—ঝুমরী"—উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল সে।

ঘর নিকোচ্ছিল ঝুমরী, গোবরমাটি-মাখানো হাতেই বাইরে এল।

"কি বুলছিস জী?"

মংরা বিকৃত হাসি হাসল, "পুলিশ আইসছে—হামি আর টোমা খাড়ির উপরে, শিবতলায় লুকাছি গিয়া—বুঝলু?"

"পুলিশ!" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ঝুমরী, তার দুচোখে ত্রাসের কালো ছায়া দেখা দিল, নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল সে, অস্ফুট কণ্ঠে বলল "পুলিশ! তুদের জেহলে লিবে? আয় বাপ্—আয় বাপ্"—

সোমা এদিক ওদিক সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাড়া দিল, "আরে তুরা ইধার যা না বাপু—ইখানে দাঁড়াইয়া কি ধরা দিবু নাকি—হ্যাঁ?"

মংরা সোমার দিকে তাকাল, "আউর যারা জখমী আছেক—তারা?"

"তাদেরও বুলাছি—"

মংরা মাথা নাড়ল, ঝুমরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, "ডরাস নাই বহু, ডরাস নাই—"

ঝুমরী জবাব দিল না, পরিষ্কার বোঝা গেল যে, স্বামীর কথায় সে আশ্বস্ত হল না, তার চোখের ঘনীভূত ত্রাস একটুও তরল হল না তাতে।

মংরা অকম্পিতকণ্ঠে বলল, "ভালা কাম করাছি—জেহলে লিবে তো লিবে। দুখ্ করিস নাই, অখনি যাছি হামরা—"

নড়ে উঠল ঝুমরী, শুষ্ককণ্ঠে বলল, "যাছিস?"

"হয়"—

"যা তভে, যা। পুলিশ চলা গেলে ভাত লিয়া যামু হামি, খবর দিমু"—

মুহূর্তকাল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল মংরা, পরে ঘুরে দাঁড়াল, টোমাকে ডাক দিয়ে বলল, "চল্ ইবার—জলদি"—

সোমা কয়েক পা এগিয়ে গেল ওদের সঙ্গে, তারপরে থেমে বলল, "আচ্ছা যা, বোডা বঁচাবে তুদের, হামি দেখি রসিক মাঝি কিছু বুলে কিনা ফির"—

মংরার মুখের পেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠল, মাথা নেড়ে সে নিঃশব্দে সমর্থন জানাল, তারপরে আর একবার ফিরে চাইল স্ত্রীর দিকে। দাওয়ার ওপরে একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ঝুমরী। কষ্টিপাথরে খোদিত অপরূপ নারী মূর্তির মত। মংরার শরীরটা একবার কেঁপে উঠল, তাড়াতাড়ি দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে সে আবার দ্রুতপদে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

চলতে চলতে টোমা বলল, "যদি পুলিশ এঠি আসা পড়ে—তভে কি করবু রে মংরা?"

মংরা হাসল, "কি আবার, ধরা দিমু, শ্বশুরবাড়ি যামু"—

"আয় বাপ্—ইটা কি কহুঁছিস!"

"ঠিক কহ্‌ছি"—

"না"—টোমা মাথা নাড়ল, "মাছ না মারা হামরা ধরা পড়মু না"—

মংরা বন্ধুর দিকে তাকাল। সত্যি তো কাজ যে এখনো অপূর্ণ রয়েছে। বিলের মাছ না ধরে সে কিছুতেই ধরা পড়তে পারে না। হার মেনে ধরা পড়লে তার পৌরুষ ধুলোয় মিশিয়ে যাবে, তার চেয়ে তার মরা ভাল।

টোমার একটা হাত চেপে ধরে সে আবেগের সঙ্গে বলল, "ঠিক, ঠিক বুলছিস দোস্ত—মাছ না মারার আগে ধরা দিমু না। পুলিশ যদি ধইরতে আসে তো ফির পালামু না তো লড়াই করা জান দিমু"—

টোমা উদ্ভাসিত মুখে বন্ধুর দিকে তাকাল, নিঃশব্দে সমর্থন জানিয়ে চলতে আরম্ভ করল।

"চল্—চল্ জলদি"—

"হয়"—

উঁচু-নীচু ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ছুটল ওরা। আল দিয়ে গেলে দেরী হবে বলে সোজা ছুটল। আধ মাইল খানিক চলার পর একটা খাড়ি পড়ল সামনে। খাড়িটা এখন শুকিয়ে এসেছে, সহজেই সেটা পার হল দু'জনে। তারপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘন জঙ্গল। আম-জাম, নিম, বট, অশ্বত্থ, বাবলা আর তাল-গাছের ভীড় সেখানে। বট আর অশ্বত্থ গাছ-গুলো খুব প্রাচীন, তার ডাল থেকে অজস্র ঝুরি নেমে জায়গাটিকে জটিল করে তুলেছে। আর তারি একটার নীচে বহুপ্রাচীন ভাঙ্গা একটা বেদীর ওপর কয়েকটি শিলাখণ্ড। ঐগুলিই শিব ও পার্বতীর পার্থিব রূপ, তাদের গায়ে ভক্তদের দেওয়া তেল-সিঁদুরের দাগ রয়েছে, রয়েছে শুকনো বেলপাতা ও ফুলের রাশি। দেব-মহিমায় নিঃশব্দ ও স্তব্ধ হয়ে আছে জায়গাটা।

"এইটা?" প্রশ্ন করল টোমা।

"হয়—কিন্তুক ক্যানে, পসন্দ হছে নাই?" মংরা পাল্টা প্রশ্ন করল।

"হাঁ--হছে"—চারদিকে তাকাতে তাকাতে মাথা নাড়ল টোমা।

মংরা গাছপালার নিবিড়তাকে ভেদ করে গ্রামের দিকে তাকাল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওদিকটা। পুলিশ আসলে ঠিক দেখা যাবে, সতর্ক হবার বা অন্যত্র সরে পড়বার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, চমৎকার জায়গাটা।

"লজর রাইখতে হবি—বুঝলু? খুব হুঁশিয়ার"—মংরা বলল।

টোমা হাসল, "হুঁশিয়ার তো আছি রে শালা—কিন্তক মা মেরী বিগড়া গেলে কি করমু? আঁ?"

মংরাও হাসল, বলল, "মা মেরীক মানৎ করবু—কাঁদিবু"—

দুজনেই এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। তারপরে এক সময়ে চুপ করল, বসে বসে দুজনে চুটি টানতে লাগল সামনের দিকে তাকিয়ে। আশঙ্কায় বুকটা তখন তাদের একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে আর জঙ্গলের বাইরে রোদের আঁচ বাড়ছে। আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে শিরসি গ্রামের অর্ধচন্দ্রাকৃতি। ক্ষেতের ওপর দেখা যাচ্ছে দু-একটা গরু ও ছাগল, একটা-দুটো ন্যাংটো ছেলেকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানোও দেখা গেল। শান্ত, সমাহিত চারদিককার ছবি।

সত্যি পুলিশ এল। চারজন সশস্ত্র পুলিশ ও একজন দারোগা। সোজা এসে রসিক মাঝির বাড়ির সামনে তারা থামল। অন্য সময়ে বাইরের কেউ গ্রামে এলেই হয়ত ভীড় জমে যেত। পুলিশ বা কুকুর—বাইরে থেকে যে-ই আসে, সে-ই সাঁওতালদের আকৃষ্ট করে। কিন্তু আজ আর তা হল না। আজ পুলিশ আসছে খবর পেয়েই সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল, পুরুষেরা সব অন্দরমহলে গিয়ে বসে রইল, ছেলেমেয়েরা দাওয়ার ওপর বসে জ্বলজ্বল করে তাকাতে লাগল।

"মাঝি—এ্যাই রসিক মাঝি"—একজন পুলিস হাঁক পাড়ল, মাটির ওপর ভারী বুটজুতো শক্ত করে চেপে ধরে।

রসিক মাঝি ছুটে এল ভেতর থেকে, পুলিসদের দেখে ব্যস্ত হয়ে ছেলেকে ডাকল, "পুষা, আরে হেই পুষা—জলদি চৌপায়া লিয়া আয় — জলদি — দারোগা সাহেব আইসছেন"—

দারোগা সাহেব মোটা মানুষ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এই গ্রামে আসতে আসতে। চৌপায়া আসতেই তার ওপর সে জাঁকিয়ে বসল, ঘামে ভেজা কালো মুখটাকে ময়লা রুমাল দিয়ে ভালো করে মুছল।

"সেলাম হুজুর—সেলাম"—দু' তিনবার সেলাম জানাল রসিক মাঝি। যেন সে বোঝাতে চাইল যে দারোগা সাহেবের দোর্দণ্ড প্রতাপের কথা সে ভালোভাবেই জানে।

রসিক মাঝিকে প্রত্যভিবাদন না জানিয়েই দারোগা বলল, "কি? ব্যাপার কি মাঝি?"

"কি হুজুর?" শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল রসিক।

"সাঁওতালেরা তো খুব গণ্ডগোল আরম্ভ করল, এ্যা?"

"জী"—

"জী কি রে ব্যাটা?"—ধমকে উঠল দারোগা, "তুই না মোড়ল, তবু কেন হয় এসব?"

রসিক মাঝি ম্লান হাসল, "হামি তো নামে মোড়ল, ছোকরারা হামাক্ মাইনছে না আজকাইল"—

"তা বুঝলাম, এখন খোলাখুলি কথা হোক কয়েকটা মোড়ল।"

"কি হুজুর?"

"তুই যে এ গণ্ডগোল করাসনি তা আমরা জানি—কিন্তু কে কে করেছে তা তো জানিস্। আমাদের সেই সব ব্যাটাদের নাম বলে দে"—

রসিক মাঝির মেঝের ওপর মাথা ঠুকতে ইচ্ছে হল। একবার অন্যায় করলেই অন্যায়ের পালা শেষ হয় না। সমাজ ও মানুষ তখন অন্যায়কারীকে আরো অন্যায়ের পথে নিয়ে যায়, ঠেলে দেয় রসাতলের দিকে। কিন্তু না, রসিক মাঝির শিক্ষা হয়েছে, বহু মানুষের মৃত্যু ও দুর্দশার কারণ হয়েছে সে, আর না। এরা এখন হাজার প্রলোভন দেখাক কিংবা ভয় দেখাক, তবু আর বিশ্বাসঘাতকতার পথে সে যাবে না। সে যা করে ফেলেছে তার জেরই মিটছে না, নতুন করে আর কোনো অপরাধই সে করবে না। লোভ এবং অহমিকার বশে সে যা করেছে তার ফল হয়েছে বিয়োগান্ত—নিজের এবং আর সবার অধিকতর সর্বনাশ সে কিছুতেই করতে দেবে না। এর জন্য যদি নির্যাতিত হতে হয়, তবে সে নির্যাতন তার গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তই হবে।

মাথা নাড়ল রসিক মাঝি, "জী না"—

"মানে?" দারোগা সাহেব ভ্রু কুঞ্চিত করল।

"যারা গোলমাল করছিল তারা ই গাঁয়ের লয়"—

"তুই মিথ্যে কথা বলছিস মোড়ল।"

বিনীতভাবে রসিক হাসল, "সি যা মনে করেন হুজুর—হামার কথা তো বুললাম। লাই, ই গাঁয়ের কেহ লাই"—

"বটে!"

"জী"—

"তুই বলবি না কিছু?"

"হামি তো জানি না কিছু"—

"হুঁ"—দারোগা হাসল, "জেনেশুনে না বললে কিন্তু জেলে যাবি ব্যাটা"—

রসিক মাথা নাড়ল, "যামু জেহলে"—

দারোগা সাহেব জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল রসিকের দিকে, একটু ভেবে নিজেকে সংযত করে সে বলল, "নেহাৎ বড় সাহেবের অন্য হুকুম তাই—আচ্ছা, আমিই খুঁজে বের করব আসামীদের—চল হে সবাই"—

উঠে দাঁড়াল সে।

পুলিসেরাও উঠে দাঁড়াল।

দারোগা সাহেব ধারালো হেসে বলল, "না বললি মাঝি। বললে নিরপরাধীরা বাঁচত, কিন্তু এতে উলটো ব্যাপার হবে, এলোপাথাড়ি যাকে তাকে ধরে নিয়ে যাব আমি। আমাকে ধরতেই হবে একদল লোককে"—

রসিক ঘাড় নাড়ল, নির্ভয়ে বলল, "জী আচ্ছা।"—

দারোগা সাহেব চলে গেল বুট জুতোর শব্দ তুলে। রাইফেল ঘাড়ে তুলে পুলিসেরাও তার অনুসরণ করল।

ঠিক সেই সময়েই সোমা এসে রসিকের সামনে দাঁড়াল, তারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকাল।

রসিক মাঝি সোমার সেই তীব্র দৃষ্টির অর্থ যেন বুঝতে পারল, বুঝতে পারল তার দৃষ্টিতে প্রতিফলিত গভীর ঘৃণার কথা।

মৃদুকণ্ঠে সে বলল, "বুলি লাই, হামি কারো নাম করি লাই"—

সোমাকে যেন সে কৈফিয়ৎ দিল, অপরাধ বোধটা তার এখন এমন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে যে কৈফিয়ৎ দিয়ে সে যেন নিজেকে সবার শুভানুধ্যায়ী প্রমাণ করতে চাইল।

দারোগা সাহেব থমকে দাঁড়াল। মংরার বাড়ির সামনে।

দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল ঝুমরী, আগের মতই খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করছিল পুলিসদের। পুলিসরা চলে গেল কিনা তা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বামীকে খবর দেবার মৎলব আঁটছিল সে।

সাঁওতালের মেয়ে, কঠিন শ্রমে গড়া দেহ। সুগঠিত, পরিপুষ্ট, যৌবনোজ্জ্বল। দারোগা সাহেবের মনে একটু রঙ ধরল হঠাৎ। সময়টা বসন্তকাল। এই সময়টাতে কালো কোকিলের গান শুনে মুগ্ধ হয় সবাই, কালো মেয়ের রূপ দেখেই বা বিভ্রান্ত হবে না কেন?

থমকে দাঁড়াল দারোগা সাহেব।

"বাঃ"—বিড়বিড় করে বলল সে।

রামধারী সিং থানার মধ্যে সবচেয়ে অনুগত লোক, সে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "বলেন তো গেরেফতার করিয়ে লিই হুজুর"—

দারোগা সাহেব হাসল, কিছু বলল না।

কিন্তু ঝুমরী কথা বলল। দারোগা সাহেবের দৃষ্টিকে সে লক্ষ্য করেছিল, দৃষ্টির অর্থটাও বুঝেছিল। হঠাৎ সে খুঁটি ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে বসল, "কি দেখছিস তুরা জী—আঁ?"

"তোকে"—দারোগা সাহেব বলল।

"আপনার কাজে যা হুজুর—কাজে যা"—

কয়েকজন সাঁওতাল এবার বাড়ির দাওয়া থেকে নেমে এল। কি ব্যাপার দেখার জন্য।

দারোগা সাহেব হেসে বলল, "আমার কাজ এখানেই রে মাগী"—

হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠল ঝুমরী, একটুও ভয় না করে সে বলল, "ফির মজাক্ কইরছিস। খবরদার বুলছি"—

"খবরদার কি রে হারামজাদী—এ্যা।"

"গাল দিস লাই—ফির উসব বুললে অউর খরাপ লজর দিলে তুকে তীর মারমু হামি"—

একটু ঘাবড়ে গেল দারোগা সাহেব। দারোগা পদের আড়ালে একটা ভীরু মন ছিল তার মধ্যে। ভড়কে গেল লোকটা। সাঁওতাল মেয়ে, কে জানে বাবা, হুট করে একটা বিষ-মাখানো তীর ছুঁড়লেই বা কি করা যেতে পারে?

দারোগা সাহেবের নিষ্ফল আক্রোশটা তাই অন্যদিকে গতি ফেরাল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে নিকটবর্তী লোকদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে গর্জন করে উঠল সে, "রামধারী সিং, গেরেফতার করো সব শালাদের"—

সব 'শালাকে' নয়, শেষ পর্যন্ত আটজন নিরপরাধ লোককে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল ওরা। এতদূর এসে কাউকে গ্রেপ্তার না করে ফিরলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব খুব খুশী হবেন না। তাছাড়া সাঁওতালদের ভয় পাওয়ানোর জন্যও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা উচিত। জংলী জাতটাও যদি হঠাৎ বিগড়ে যায়, বড় বড় কথা বলে দাবী আদায় করতে আরম্ভ করে, তাহলে তো মহাবিপদ হবে।

জঙ্গলের মাঝে মধ্যাহ্নের স্তব্ধ গাম্ভীর্য। বাইরে চড়া রোদ্দুরের নীচে ঢেউ খেলানো ক্ষেতটা যেন ঝিমুচ্ছে। উঁচু উঁচু মাটির ঢিপি-গুলোকে মনে হচ্ছে কচ্ছপের পিঠের মত। জঙ্গলের ভেতর শালিক, ময়না, শ্যামা ও দোয়েল কিচির মিচির করছে, এডাল থেকে ওডালে উড়ে যাচ্ছে। পশ্চিমের দিক থেকে গরম বাতাস আসছে, গাছের শুকনো পাতা ঝরিয়ে, উড়িয়ে, এসে জঙ্গলের ভিতরকার ছায়াময় পরিবেশে যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

"তাইলে আইজই বুলবি সভাইকে?" টোমা প্রশ্ন করল।

"হয়—আইজই"—ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মংরা, তার ললাটের ওপর কঠিন রেখার মাঝে একটা কঠিন সংকল্প ঘোষিত হল।

চুপ করে রইল দুজনেই। অনেকক্ষণ।

হঠাৎ খচমচ্ শব্দ শোনা গেল।

"কুনঠে বৈসা আছ জী—এ জী"—

ঝুমরী।

গাছের আড়াল থেকে ছুটে বেরোল মংরা, ঝুমরীর কাছে গিয়ে তার একটা হাত চেপে ধরল, "আসাছিস তু? আসাছিস!"

ঝুমরী খুব মিষ্টি করে হাসল, মাথা নেড়ে বলল, "হয়—আসাছি"—

ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করল মংরা, "পুলিস! পুলিস আসাছিল!"

"হয়—আঠজনকে গেরেফ্তার করাছে"—

"হুঁ"—

স্বামীকে আশ্বস্ত ও চিন্তামুক্ত করার জন্য দ্রুতকণ্ঠে ঝুমরী বলল, "গিছে ভুতগুলান—চলা গিছে"—

"বাঁইচলম্ রে বাপ্"—

টোমা এসে কাছে দাঁড়াল, হেসে বলল, "হামাদের মা মেরী বড়া জাগর্ত ঠাকুর জী—দেখলু তুরা?" কথা বলতে গিয়ে তার নজর পড়ল ঝুমরীর বাঁ হাতের ওপর। একটা গামছায় কি যেন বেঁধে নিয়ে এসেছে সে। থালা বাটি মনে হচ্ছে।

"গামছার ভিতরোৎ কি আছেক্ গো মংরার বহু।"

"দামড়ী অউর ডাইল"—

"হাঁ?"

"হাঁ।"

টোমা যুক্তকরে প্রণাম জানাল, সকৌতুকে বলল, "হামাদের মা মেরী তুহি আহিস্ গো মংরার বহু—উঃ, জান বঁচালি ভাই।"

সবাই হেসে উঠল।

পান্তাভাত আর ডাল। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে চেটেপুটে খেল দুই বন্ধু। ওদের খাইয়ে ঝুমরী বাড়ী ফিরে গেল। ঠিক হল যে ওরা দুজনে সন্ধ্যে হলে ফিরে যাবে। কে জানে, যদি আবার ফিরে আসে পুলিসেরা!

বাড়ী ফিরে একটুও দেরী করল না মংরা।

সন্ধ্যার পর সবাইকে সে খোলা মাঠের দিকে নিয়ে গেল। সাদা, শুকনো মাটির ওপর তারা বসল, তাকাল মংরার দিকে। সে ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, "তুদের একটা কিস্সা কহছি শুন্। সাচা কথা—বিলোৎ ফিরার পথে যাই দেখাছি তাঁই কথা শুন্—"

সবাই উৎসুক হয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে সব বলল মংরা। গতকাল সকালে বিল থেকে ফেরার সময় সেই বাঁকের মুখে নৌকোর কথা। জমিদার, পুলিশ আর রসিককে এক নৌকোয় দেখার কথা। তার আগেকার কাহিনীও বলল সে—জমিদারের কাছে ঘুষ নেওয়ার কথা। সোমা সে কথায় সায় দিল।

সব কথা শেষ করে মংরা বলল, "বুলতে ছাতি ফাটা যায়, সরম লাগে, কিন্তুক্ বুলতেই হবু কি"—

সবাই বলল, "বেইমান—বেইমান সর্দার—হামরা উকে মানমু নাই—"

সবাই বলল, "বেইমান—বেইমান সর্দার—হামরা উকে মানমু নাই—"

মাটিতে পদাঘাত করে ভগ্নকণ্ঠে বলল মংরা, "জিমিন্দার সর্দারক্ কিনা লিছে—কিনা লিছে—তাই উ মাছ মাইরভে নাই, শোধ লিবে নাই—"

পরম ঘৃণায় মাথা নাড়ল সবাই, "বেইমান—বেইমান সর্দার—"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সবাই। আকাশ থেকে জ্যোৎস্নার জোয়ার এসে নীচেকার সব-কিছুকে প্লাবিত করেছে। চারদিকে অশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর ডাক। ঝিরঝিরে বাতাস। বিন্না ঘাসের ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট কুঁড়েগুলো থেকে আজও ক্ষীণ বিলাপের ধ্বনি ভেসে আসছে। আর বুকের ভেতরটা ঘৃণায়, রাগে, প্রতিশোধ-কামনায় জ্বলে ছাই হতে চলেছে।

মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল সোমা, "ই সর্দারক্ কি মানবু তুরা?"

সবেগে মাথা নাড়ল সবাই, "না, না জী—"

সোমা আবার বলল, "ই সর্দার বাঁইচা থাইক্‌লে তো আউরো জান যাভে—হক্ ছিনায়া লিবে—হামাদের কুত্তা বুলবে সভাই—"

"হয়—হয়—ই সর্দারক্ হামরা মানমু না—উর মরা ভালা—"

মংরা কান পেতে শুনল সব কথা। কি যেন ভাবল সে, ভেবে শিউরে উঠল, তাকাল সবার দিকে। কালো কালো মানুষদের চোখে ঘৃণা আর ক্রোধের আগুন।

"মরা ভালা উর?" প্রশ্ন করল মংরা; যেন সবাইকে যাচাই করতে চাইল সে।

সবাই মংরার দিকে তাকাল। পরস্পরের চোখের মধ্যে কি যেন পড়ল ওরা, কি এক দুর্বোধ্য সাংকেতিক লিপি। তারপরে সবাই—এক সংগে মাথা নাড়ল। (ক্রমশ)

র‍্যাডক্লিফের বাঙলা বিভাগ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অনুসারে কাজ হইয়াছে, তাহা কংগ্রেসের সভাপতির প্রতিশ্রুতির বিরোধী হইলেও কংগ্রেস তাহা মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং এই বিভাগ ব্যবস্থা বে-বনিয়াদ হইলেও মনে করিতে হইবে, ইহার সম্বন্ধে যাহারা এই বিভাগে অসংগতরূপে নিপীড়িত হইবে তাহাদিগের পক্ষে ইহা "না দলিল, না উকীল, না আপীল"। কিজন্য চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল পাকিস্তানকে দেওয়া হইল, তাহার কোন সংগত কারণ না থাকিলেও তাহার বিরুদ্ধে ভারতের বর্তমান সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের সচিবগণ প্রতিবাদ করেন নাই। এই বিভাগ ব্যবস্থায় পশ্চিম বা হিন্দু বংগ যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে আপনার আয়ে আপনার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নহে। সেই অবস্থার পরিবর্তন না হইলে পশ্চিম বংগকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। অথচ বাঙলাই পূর্ব পাকিস্তানের সীমায় অবস্থিতি হেতু পাকিস্তানের আক্রমণের লক্ষ্য হইবে। ইতোমধ্যেই দেখা যাইতেছে, পাকিস্তানের শাসকগণ যশোহর হইতেও কলিকাতায় খাদ্যোপকরণ আমদানী করিতে দিতেছেন না। অথচ খুলনা ও যশোহর হইতে কলিকাতায় প্রতিদিন মৎস্য ও তরকারী আমদানী হইত।

এই অবস্থায় পশ্চিম বংগ বিহারের বংগভাষাভাষি জিলা বা জিলার অংশ বাঙলাভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিতে না করিতে বিহারের কংগ্রেসী সংবাদপত্রও যেভাবে বাঙালীদিগকে গালি দিতে ও ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা পূর্বে পাঠকগণকে দিয়াছি। তাহাতে বুঝা যায়, টাটানগরের ঘটনা তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বিহার সরকার যে পুরুলিয়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও বাধা দিয়াছেন, তাহা এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। অথচ কত বিহারী বাঙলায়—অর্থাৎ পশ্চিম বংগে জীবিকার্জন করে, তাহা কাহারও অবিদিত থাকিতে পারে না। সুরাবর্দী কোম্পানীর "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ফলে বিহারী-হত্যায় যে বিহারে বিহারী হিন্দুরা উত্তেজিত হইয়া তথায় মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতেই বাঙলায় বিহারীর সংখ্যা সহজে অনুমান করা যায়। অথচ বিহারের কংগ্রেসী সংবাদপত্র টাটানগরের ঘটনার বিকৃত ও মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিয়া বাঙালী-বিদ্বেষ-বিষোদ্গার করিয়াছেন ও করিতেছেন! পশ্চিম বংগের স্বাবলম্বী হইবার জন্য অধিক ভূমি প্রয়োজন। কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কংগ্রেসের সভাপতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কোন হিন্দুপ্রধান অঞ্চল পাকিস্তানভুক্ত করিতে দেওয়া হইবে না—বাঙলার সম্বন্ধে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। তথাপি কি হিন্দুস্থানের সরকার বাঙলার প্রয়োজন ও কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি বিবেচনা করিয়া পশ্চিম বংগকে মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জিলা দুইটির বংগভাষাভাষী অংশ পশ্চিম বংগে প্রদানের যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করিবেন না?

দেখা যাইতেছে, কেহ বা বলিতেছেন—বাঙলা যতদিন বিভক্ত হয় নাই, ততদিনই ঐসকল বাঙলাভুক্ত করিবার সার্থকতা ছিল—এখন আর নাই; কেহ কেহ তো ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন অনাবশ্যক ও অবাস্তব প্রস্তাব বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন। বিহার সরকার যে মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার লোককে হিন্দী ভাষাভাষী করিবার জন্য সোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ সকল স্থানে গণশিক্ষা বিস্তারের কার্যে শিক্ষার্থীদিগের মাতৃভাষা বাঙলার দাবী পদদলিত করিয়া তাঁহারা হিন্দীকেই শিক্ষার বাহন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা কি বাঙলা ভাষাভাষীদিগের সম্বন্ধে অবিচার বলা যায় না?

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসপন্থী প্রভাবশালী পত্র 'আজ' এই প্রস্তাব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"বিভাগফলে স্বল্পপরিসর পশ্চিম বংগকে আত্মনির্ভরশীল করিবার অভিপ্রায়ে বাঙালীরা বিহারের বংগভাষাভাষীপ্রধান ৫টি জিলা চাহিতেছেন। এই ব্যবস্থায় পশ্চিম বংগের যেমন উপকার হইবে, বিহার তেমনই দুর্বল হইবে। তাহা হইলে যুক্ত-প্রদেশের বিহারী ৫টি জিলা (ভোজপুরী ভাষাভাষী বারাণসী, বালিয়া, গোরকপুর প্রভৃতি) বিহারভুক্ত করা প্রয়োজন হইবে। আবার পূর্ব পাঞ্জাবের পক্ষ হইতে যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিমাংশ লাভ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু কতকাংশ বিহারে ও কতকাংশ পাঞ্জাবে দিলে যুক্ত-প্রদেশের যে ক্ষতি হইবে তাহা পূর্ণ করিতে হইলে মধ্য-প্রদেশের বেরার ও অন্যান্য মারাঠী ভাষাভাষী প্রধান অঞ্চল প্রস্তাবিত মহারাষ্ট্র প্রদেশে দিয়া অবশিষ্ট অর্থাৎ হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। কংগ্রেস যখন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি মানিয়া লইয়াছেন, তখন এই ব্যবস্থা যত সত্বর সম্পন্ন হয়, ততই মংগল। তবে এই ব্যবস্থায় হয়ত কোন কোন প্রদেশ আর্থিক হিসাবে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না—তাহাদিগের জন্য কেন্দ্রের সাহায্য প্রয়োজন হইবে। কেন্দ্রী সরকারের সেরূপ সাহায্য প্রদানের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।"

'আজ' সমগ্র বিষয়টি যেরূপ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়াছেন, বিহারের কংগ্রেসপন্থী পত্রের সেরূপ ভাবের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘযুক্ত পশ্চিম বংগ কি মানভূম প্রভৃতি বংগভাষাভাষী প্রধান বিহারভুক্ত জিলাগুলি তাহার প্রাপ্য হিসাবে পাইবার দাবীও আশা করিতে পারে না?

পশ্চিম বা হিন্দু বংগের স্থানের আরও এক কারণে প্রয়োজন—অধিবাসী বিনিময়। মিঃ জিন্না পাকিস্তান দাবীর সংগে সংগে অধিবাসী বিনিময়ের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সে প্রস্তাবে উৎসাহ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু বাঙলা বিভাগের পূর্বে এবং পাঞ্জাব বিভাগের পরে—ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগে অধিবাসী বিনিময়ের প্রয়োজন প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাঙলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে মুসলমানরা "লড়কে" ও "মারকে" পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদগ্র চেষ্টায় হত্যা, নারী হরণ প্রভৃতি করিয়াছিল, পাঞ্জাবে তাহারা, বিভাগের পরে, পাকিস্তান অমুসলমানহীন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিভাগের পূর্বে গান্ধীজী নোয়াখালিতে—তাঁহার অহিংসা নীতির অগ্নি পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি সেই

নীতির মাহাত্ম্য এক সম্প্রদায়কে স্বীকার করাইতে পারেন নাই। পরীক্ষা শেষ না করিয়াই তাঁহাকে নোয়াখালি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দেশ বিভক্ত হইবার পরে তিনি আবার নোয়াখালিতে যাইয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিবেন বলিয়া তথায় যাইবার পথে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতায় মিঃ সহিদ সুরাবর্দীকে তিনি "কোল" দিয়াছিলেন এবং তাহার পরে নোয়াখালিতে না যাইয়া পাঞ্জাবাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল—কলিকাতা শান্ত না করিয়া তিনি নোয়াখালিতে যাইবেন না এবং কলিকাতা শান্ত না হইলে তিনি কোন্ মুখে পাঞ্জাবে শান্তি স্থাপন জন্য গমন করিতে পারেন? দিল্লীতে যাইয়া তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে তিনি পাঞ্জাব যাত্রা স্থগিত রাখিয়া দিল্লীতে অগ্নি নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দিল্লীতে যাহা হইতেছে, তাহার আভাস আমরা গান্ধীজীর কয়দিনের উক্তি হইতে পাইতে পারি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কোথাও দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইতেছেন, কোথায়ও বিপন্না তরুণীদিগের উদ্ধারসাধন করিতেছেন—এই সকল সংবাদ যেরূপ ভাবে বিতরিত হইতেছে, অমৃতসরের বা লাহোরের সংবাদ সেরূপ বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে না। আমরা এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না যে-ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে—"পীড়িতপক্ষের সংবাদপত্রে ব্যথিতের আর্তধ্বনি বা শাসন-নীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন—ভারতীয় রাষ্ট্র সঙ্ঘের সরকার সেই ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তিত করিয়াছেন—"মরিচাপড়া তরবার" ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, গান্ধীজীও ধৈর্যচ্যুত হইয়া বলিয়াছেনঃ—"হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রকেই অন্য রাষ্ট্রবাসীদিগের কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কোন পক্ষই আপনার অসহায়তা জানাইয়া এবং কাজ গুণ্ডা শ্রেণীর লোকের বলিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না।"

তাহার পরে তিনি বলিয়াছেনঃ—

"একদিকে মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি—আর একদিকে পণ্ডিত জওহরলাল ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ—হিন্দুস্থানে ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিত তুল্য ব্যবহার লাভ করিবেন। এই ঘোষণা কি মিষ্ট কথায় পৃথিবীর লোককে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা মাত্র? তাঁহারা কি ঘোষণানুসারে কাজ করিবার জন্য প্রাণপণ করিবেন। যদি তাহা না হয়, তবে হিন্দু, শিখ, জামিল ভাইবন্ধুরা তাহাদিগের [illegible] পাকিস্তান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে কেন? কোয়েটায়, নবাবশায় ও করাচীতে কি হইয়াছে? পশ্চিম পাকিস্তান হইতে যে সকল বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, সে সকল হৃদয়-বিদারক।"

তিনি বলিয়াছেন—চারিদিকে অন্ধকার। আমরা কিন্তু কোয়েটার, নবাবশার ও করাচীর শোচনীয় ঘটনাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ পাই নাই। কেন?

অবস্থা যেরূপ তাহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে যে, এক একটি বড় যুদ্ধে যত লোকের প্রাণান্ত হয়, ইতোমধ্যেই পাঞ্জাবে তত লোকের প্রাণান্ত হইয়াছে। যাঁহারা "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" কলিকাতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—তাঁহারা সহজেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন। যদিও মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের বিবৃতিতে কলিকাতায় ঐ সময় হতাহতের সংখ্যা ৪ হাজার বলা হইয়াছিল, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের গভর্নর স্যার হেনরী টোয়াইনাম বলিয়াছিলেনঃ—৪ নহে ৪০; কারণ, তাঁহার জানা আছে, কলিকাতার রাজপথে ৪ হাজার শব গণনা করা হইয়াছিল; আর ৪ হাজারের অধিক শব গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। আর পূর্ববঙ্গের যে হিসাব মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘই দিয়াছেন, তাহা ভয়াবহ।

শান্তি সর্বথা কাম্য, সন্দেহ নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—এ দেশে বহুদিন শান্তিতে প্রতিবেশীরূপে বাস করিয়া আসিয়াছে। যাহারা শান্তি ভঙ্গ করিয়াছে তাহারা ক্ষমার্হ নহে, দণ্ডার্হ।

কলিকাতা সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে বালেশ্বরের সন্নিকটে ইংরেজের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগকারী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহকর্মীদিগের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে। তাহা কি তবে অভিনয় বলিয়া মনে করিতে হইবে? যে ধাতুতে যতীন্দ্রনাথের মত লোক গঠিত সে ধাতুতে অভিনয়ের স্থান নাই। ইংরেজের গুলীতে আহত যতীন্দ্রনাথ যখন হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন তিনি তৃষ্ণার্ত হইয়া পানীয় জল চাহিলে চার্লস টেগার্ট যখন তাঁহাকে এক গ্লাস জল দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া যতীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"তোমার দত্ত জলে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হইবে না। আমি তোমার রক্তপাত করিতেই চাহিয়াছিলাম।" মহাভারতের সেই ঘটনা মনে পড়ে—ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি তৃষ্ণার্ত হইয়া পানীয় চাহিলেন। দুর্যোধন স্বর্ণভৃঙ্গারে সুবাসিত স্নিগ্ধ জল আনিয়া দিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া অর্জুনকে ডাকিতে বলিলেন। গাণ্ডীবী আসিয়া ধরণীকে লক্ষ্য করিয়া শর ত্যাগ করিলেন; অর্জুনের শরভিন্ন ধরাতল হইতে ভোগবতীর ধারা উদ্গত হইয়া পিতামহের মুখে পতিত হইল—তাঁহার মৃত্যুতৃষ্ণাশুষ্ক কণ্ঠ স্নিগ্ধ ও সরস হইল। যতীন্দ্রনাথ ভুলিতে পারেন নাই। ভারতবাসী যদি জালিয়ানওয়ালাবাগ ভুলিতে পারিত, তবে সে কখনই ইংরেজকে এদেশ ত্যাগে বাধ্য করিতে পারিত না। ইংরেজের সহিত সম্প্রীতিতে এদেশে থাকিয়া দাসত্ব ভোগ না করিয়া সম্ভোগ করিতে পারিত।

আমরা একান্ত ভাবেই কামনা করি—

বাঙলায় ও ভারতবর্ষে "নিবে যাক নরকাগ্নিরাশি।" কিন্তু এখনও তাহার কথা জানা যাইতেছে না। হয়ত অধিবাসী বিনিময়ে সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে।

অধিবাসী বিনিময়ের প্রয়োজন বোধ হয় অনুভূত হইবে। সেজন্যও পশ্চিম বঙ্গে অধিক ভূমির প্রয়োজন। প্রদেশ বিভাগ কমিটির সদস্য শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগের রিপোর্টে দেখাইয়াছেন, পূর্ব বঙ্গের ভূমি পশ্চিম বঙ্গের ভূমির তুলনায় অধিক উর্বর। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গে অধিবাসিগণকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে হইলে তাহাদিগের ব্যবহার্য ভূমির প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইতোমধ্যেই পূর্ব বঙ্গের সরকার পশ্চিম বঙ্গ হইতে চাউল প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে তরকারী ও ফল পাঠাইতে বাধা দিতেছেন। খুলনা ও যশোহর হইতে যে কলিকাতায় অনেক শাকসব্জী, মুগ

ও কল্যাই দাইল, নারিকেল প্রভৃতি ফল এবং খুলনা হইতে মৎস্য প্রতিদিন কলিকাতায় আমদানী হইত, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পূর্ব বঙ্গ কেন—পাকিস্থানেরও যে কোন অংশ যদি খাদ্যাভাবে বিপন্ন হয় এবং পশ্চিম বঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য থাকে ও তাহা রপ্তানি করিলে পশ্চিম বঙ্গের লোককে দুর্মূল্যতার দুঃখভোগ করিতে না হয়, তবে পশ্চিম বঙ্গ হইতে খাদ্যশস্য প্রেরণ কখনই নিন্দনীয় হইতে পারে না। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে কি প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল আছে? ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের স্মৃতি আজও দূর হইয়া যায় নাই।

পূর্ব বঙ্গের সরকার যাহাই কেন করুক না, পশ্চিম বঙ্গের সরকার লোকের খাদ্য ও পরিধেয় সুলভ না করিলে কর্তব্যভ্রষ্ট হইবেন। গত যুদ্ধের সময় বিলাতে যেভাবে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বর্ধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গে খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বর্ধিত করা যায়। সেজন্য আয়োজনে আর বিলম্ব করা সংগত নহে।

পশ্চিম বঙ্গের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন—সেচের। সেচ ব্যয়সাধ্য বটে, কিন্তু বাঙলার নানাস্থানে, বিশেষ বর্ধমান বিভাগে যে সকল পুরাতন পুষ্করিণী ও বাঁধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে সে সকলের সংস্কারসাধন অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য। সে সকলে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কোন প্রদেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য লইয়া থাকিতে পারে না। দেখা গিয়াছে, যে বৎসর বৃষ্টি অধিক হয়, সে বৎসর বাঁকুড়া জিলার 'ডেঙ্গা' অর্থাৎ উচ্চ জমিতেও ধান্য হয় এবং তাহার ফলন নিম্ন জমির ফলনের তুলনায়ও অধিক হয়। তাহাতেই বুঝা যায়, সেচের ব্যবস্থা হইলে বাঁকুড়ায় অনেক 'পতিত' জমি 'উত্থিত' করা যায়। কেবল বাঁকুড়া নহে—বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বীরভূম সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়।

আবার বাঁকুড়ায় সরিষার ফলন যত অধিক হয়, বাঙলায় অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে আর কোথাও তত হয় না। সে অবস্থায় বাঁকুড়ায় যদি সরিষার চাষের ব্যবস্থা করা হয়, তবে তথায় সঙ্গে সঙ্গে তেলের কলও হইতে পারে। তাহাতে বাঙলার তৈল সম্বন্ধে অন্য প্রদেশের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনের যেমন হ্রাস হয়, তেমনই বাঁকুড়ার দারিদ্র্য দূর হইতে পারে।

এইসকল কার্যের জন্য সরকারের গবেষণা ও সাহায্য প্রয়োজন—সঙ্গে সঙ্গে লোকের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টাও প্রয়োজন।

পশ্চিম বঙ্গের সরকার জানাইয়াছেন—তাঁহারা গঠনমূলক পরিকল্পনা রচনায় প্রবৃত্ত আছেন—শীঘ্রই সেই পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইবে। কিন্তু সে পরিকল্পনা যদি সরকারের দপ্তরখানায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা রচিত হয়, তবে তাহার মূল্য যে অধিক হইবে, এমন মনে হয় না। সে বিষয়ে রুশিয়ার সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়। রুশ সরকার দেশের বিশেষজ্ঞদিগকে পরিকল্পনা রচনার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙলা সরকার কি তাহা করিতে পারেন না?

অধিকার অর্জন করা সহজসাধ্য নহে। অধিকার অর্জন করিলে তাহা রক্ষা করা তদপেক্ষাও দুষ্কর হইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের অতি দুর্দিনে যে সচিবসঙ্ঘ কার্যভার পাইয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদিগের কার্যফলে দেশের লোকের আস্থা না হারান, সে বিষয়ে যদি তাঁহারা অসতর্ক হয়েন, তবে কেন্দ্রী সরকারের সমর্থনও তাঁহাদিগকে ও বাঙলার জীবনকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

আজ পশ্চিম বঙ্গে খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয়ের একান্ত অভাব। শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ হইলেও তরীতরকারীর উৎপাদন বৃদ্ধি তাহা নহে। কলিকাতায় মৎস্যের মূল্যবৃদ্ধি লইয়া যে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, এই প্রসঙ্গে আমরা তাহারও উল্লেখ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেরূপ ব্যবস্থায় মৎস্য বৃদ্ধি করা হয়, তাহা বিবেচনা করিতে বলি। মৎস্যের ডিম ফুটাইয়া 'পোনা' বৃদ্ধির সময় প্রায় শেষ হইল। এখনও সে কাজে অবহিত হইলে কিছু সুফল লাভ করা যাইতে পারে।

পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা জটিল ও বহু। সেই সমস্যার সমাধান চেষ্টায় যত বিলম্ব হইবে, দেশের দুরবস্থা এবং সমস্যার জটিলতা তত বৃদ্ধি পাইবে। সে বিষয়ে বাঙলার সচিবসঙ্ঘের কর্তব্য যে সুস্পষ্ট তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

ফরমায়েসি লেখা

ইদানীং আমি রাজনীতি নিয়ে বড় বেশি আলোচনা করেছি। কেউ কেউ তাতে আপত্তি করে বলছেন, এমনিতেই উঠতে বসতে চলতে ফিরতে রাজনীতির জ্বালায় আমরা অতিষ্ঠ—দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক যাই ধরি, তাই রাজনীতি-কণ্টকিত। তার উপরে আপনারা যাঁরা বাজে কথা লেখেন, তাঁরাও যদি হঠাৎ কাজের কথা বলতে শুরু করেন, তবে আমরা যাই কোথায়? আমার বন্ধুদের প্রতি এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। রাজনীতি জিনিসটা ক্রমেই বড় গুরুপাক হয়ে উঠছে। আগে এক রকম ছিল ভালো। ইংরেজের উদ্দেশে দুটো কড়া রকমের গালাগাল দিতে পারলেই মোটা-মুটি রাজনীতির জ্ঞান প্রকাশ পেত। জিনিসটা স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল ছিল। ভূরিভোজনের পরে তাম্বূল চর্বণের সঙ্গে ইংরেজকে দুটো গাল দিতে পারলে হজম ক্রিয়াটা সহজ হ'ত। কিন্তু ইংরেজ গিয়ে অবধি আমাদের রাজনীতি যে আকার ধারণ করেছে, সেটা না হজমের পক্ষে ভালো, না মানসিক শান্তির পক্ষে।

এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, আমি নিজেও কাজের কথার চাইতে বাজে কথাকে ঢের বেশি মূল্য দিই। উঁচু দরের কথা অর্থাৎ বাজে কথা সব সময়ে আয়ত্তে আনতে পারিনে বলেই বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে আমাকে নীচু দরের কথা অর্থাৎ কিনা রাজনীতির আশ্রয় নিতে হয়। মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা শুধু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নয়, সাহিত্য শাস্ত্রেও রীতি। একজন নেতৃস্থানীয় ইংরেজ বলেছিলেন-- Politics is the last resorts of a scoundral. আমার বেলা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে দেখছি--- Politics is the best resort of a spent-up writer নিত্য নিত্য বাজে কথা আমি কোথায় খুঁজে পাই, বলুন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সহজ কথা নয়তো সহজ বলা। আপনারা চান বাজে কথা, সেটা প্রায়ই বাঁকা কথা, কাজেই বাজে কথা বলা আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাজে কথাকে রসগ্রাহ্য করে পরিবেশন করা অতিশয় উঁচুদরের আর্ট। আলু-পটলের ডালনা রাঁধতে পারেন সবাই, কিন্তু সাত-পাঁচ মিশিয়ে ছেঁচকি রাঁধতে পারেন শুধু 'ওস্তাদ' রাঁধুনি। আড্ডার আসরে আমি বাজে বকুনিতে মহা ওস্তাদ, কিন্তু দেখেছি, যে কথা জিবের ডগায় অনায়াসে আসে, কলমের ডগায় তার প্রকাশ অতিশয় আড়ষ্ট, তখন রূপ যায় বদলে। কালির কালিমা মেখে কথাগুলির মূর্তি কিম্ভুত কিমাকার হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমি যে দরের বলিয়ে, সে দরের লিখিয়ে নই।

আমার বন্ধুরা মাঝে মাঝে আমাকে এটা

ওটা নিয়ে লিখবার ফরমায়েস করেন—অর্থাৎ এক-আধটা 'বাজে' বিষয়বস্তু বাৎলে দেন। তাঁদের ফরমায়েস অনুযায়ী এক-আধটা বিষয়ে আমি লিখেওছি, জানিনে সেটা তাঁদের পছন্দসই হয়েছে কি না। আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে মেজাজ সম্বন্ধে লিখতে বলেছিলেন, তাঁরই অনুরোধে গত সপ্তাহের খাতায় আমি কিঞ্চিৎ মেজাজ প্রদর্শন করেছি। ফরমায়েসি লেখা ঠিক আমার ধাতে সয় না। নিজের দিক থেকে তাগিদ না এলে অপরের তাগিদে লেখা বড় কঠিন হয়ে ওঠে। ফরমায়েসি জিনিস লিখতে গেলে প্রমথ চৌধুরী বর্ণিত ফরমায়েসি গল্পের ঘোষালের মতো দুরবস্থা হয়। মনিবের ফরমাস মতো কেবলই গল্পটার কান মোচড়াতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ছড়া কিম্বা পদ্য লিখবে কোন লোকের ফরমাসে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে। তা, আপনারা যাই বলুন, আমিও তেমন শর্মা নই। বরং রবীন্দ্রনাথকেই বহু লোকের ফরমাসে বহু পদ্য লিখতে হয়েছে, কারো বা বিবাহ, কারো বা মৃত্যু উপলক্ষে। জলযোগের দই থেকে শুরু করে বাটা কোম্পানীর জুতো পর্যন্ত বহু পদার্থের গুণগান তাঁকে করতে হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। তিনি ছাই ধরলেও সোনা হয়ে যায়, নিতান্ত বিজ্ঞাপনী ইস্তাহারও সার্থক সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একবার আমি তাঁকে এ্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল সোসাইটির সভায় বক্তৃতা করতে শুনেছিলাম। সে বক্তৃতা শুনে যে বাঙলা দেশে ম্যালেরিয়া নিবারণ হয়নি—সে কথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, কিন্তু সাহিত্য-পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছিল।

'বাজে' বিষয় নির্বাচনে সহৃদয় পাঠকরাও আমাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করেছেন। কিছুদিন আগে আমার একজন পাঠক অনুরোধ জানিয়েছেন, বাঁশের বাঁশী সম্বন্ধে কিছু লিখতে। জিনিসটা সময়োপযোগী। গত পঁচিশ বছর ধরে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের নিরন্তর লড়াই চলছিল। ভেবেছিলাম, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে এখন দেশে শান্তি স্থাপিত হবে—ইংরেজিতে যাকে বলে piping times of peace. এখন আর কোন কাজ নয়—বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশী কাটবে সকাল-বেলা। দুঃখের বিষয়, আমি বাঁশী বাজাতে জানিনে, কিন্তু পত্রলেখক বন্ধুটি জানেন, সে খবর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, আমাদের সাহিত্যে বাঁশের বাঁশীর স্থান কোথায় এবং কতটুকু। বাঙলা দেশ বৈষ্ণব কাব্যের দেশ। সে কাব্যের নায়ক বংশীধারী। যাক্‌গে ওসব পুরোনো কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলব যে, বাঁশীর যে সুর সেইটিই সাহিত্যের মূল সুর। এ বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী মানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সাহিত্য বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছিলেন। তার প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, আজকে যখন বক্তৃতা করতে আসছিলুম, তখন আমাদের পাশের বাড়িতে বিয়ের সানাই বাজছিল। বলেছিলেন, সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যা বলতে চান, তা সমস্তই ঐ সানাইএর সুরে প্রকাশ পেয়েছিল। সেদিন শ্রোতারা যদি সেই সানাইএর বাঁশী শুনতেন, তবে আর রবীন্দ্রনাথকে অত বড় বক্তৃতা করতে হ'ত না। আমি অন্তত এইটুকু বলতে পারি, আমি যদি ঠিক বন্ধুটির মতো বাঁশী বাজাতে পারতুম, তবে ইন্দ্রজিতের খাতা লিখে কক্ষনো সময় নষ্ট করতুম না। আমি অকেজো মানুষ। জীবনে আমার একটিমাত্র সাধ—সংসারে সবাই হবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত, আমি শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো সারাদিন বাজাইব বাঁশী। কবি যতই চেঁচিয়ে ডাকুন না—ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা—আমি তবু উঠব না, আমি বাঁশী বাজাব। আগুন লেগেছে তো ফায়ার ব্রিগেড ডাক, আমাকে কেন? আমাকে বাঁশী বাজাতে দাও। কলকাতা জ্বলুক, আমি রাজা নীরোর মতো বাঁশী বাজাব।

আমাদের নেতারাও যদি সারাক্ষণ পলিটিক্সের বিউগল না বাজিয়ে বাঁশের বাঁশী বাজাতেন, তাহলে দেশ রক্ষা পেত। কবি বলেছেন—বাঁশে যদি বংশী নাহি বাজে, বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে। অতএব আমার কথা শুনুন, আপনারা সবাই মিলে বাঁশী বাজাতে শুরু করুন, নইলে শুধু বংশ নয়, সমস্ত বঙ্গ ধ্বংস হবে।

রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　　　**স্বরলিপি :** ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

এ মোহ-আবরণ খুলে দাও, দাও হে ॥
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি ;
চাও হৃদয়-মাঝে চাও হে ॥

II পর্সাঃ নঃ ধপা -া | -হ্মপা -ধপধপা -হ্মপা হ্মগা | গহ্মা -া -রগা -হ্মপা |
এ মো হ ॰ ॰ ॰ ॰॰॰॰ ॰ ॰ আব র ॰ ॰॰ ॰॰

I -ধা -পহ্মা ধ-পা -া I পনা -ধনর্সা নাঃ -ধপঃ | হ্মপধা -নর্সা -র্রাঃ -র্সনঃ |
॰ ॰ ॰ ণ্ ॰ খু॰ ॰॰॰ লে ॰॰ দা॰॰ ॰॰ ॰ ॰ও

I নর্সা -র্রর্সর্রর্সা -নধা ধনা | -র্সনর্সনা ধপহ্মা -পা -া II { -া পপা পর্সাঃ র্রাঃ |
দা॰ ॰॰॰॰ ॰ও হে॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰॰॰ ॰ ॰ ॰ সুন্দ র মু

I র্সাঃ র্সর্রাঃ র্সা -া | র্সনা -র্রা র্সা না | নধা পা হ্মপা গা II
খ ত ব ॰ দে॰ ॰ খি ন য় ন ভ॰ রি

I পরা -া গা -পা | -াঃ ধঃ পর্সা -া | র্সর্গা র্রা নর্সর্রা -র্সনধা |
চা ॰ ও ॰ ॰ হৃ দয় ॰ মা॰ ঝে চা॰॰ ॰॰ও

I ধনর্সনা -ধপহ্মা -পা -া IIII
হে॰॰॰ ॰॰॰ ॰ ॰

পিক্‌নিক্‌

এস লিবিন

[এস লিবিন-এর জন্ম (১৮৭২ খৃঃ) রাশিয়ায়। তিনি জাতে ইহুদী। বহু বৎসর কাটিয়েছেন ইউনাইটেড্‌ স্টেটস-এ। লিখেছেন ইডিস্‌ ভাষায়। বহুসংখ্যক ছোট গল্প লিখে তিনি যশস্বী হয়েছেন। সে সব গল্পে ইহুদী শ্রমিক জীবনের চিত্র চমৎকার ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকটি গল্পে হাস্যরস এবং করুণ রসের অপূর্ব মিশ্রণ। 'পিকনিক' গল্পটি ইহুদী শ্রমিক জীবনের একটি অতি সুন্দর চিত্র।]

যে টুপি তৈরির কাজ করে স্মুয়েল তাকে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করেন পিকনিকে যেতে চায় কিনা, তা হলে সে এমনভাবে আপনাকে তেড়ে মারতে আসবে যেন আপনি তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে বলেছেন। ব্যাপারটা কি তাই বলি। সে আর তার স্ত্রী সারা একবার এক পিকনিকে গিয়ে যা নাকাল হয়েছিল বেচারা স্মুয়েল জীবনে তা ভুলবে না।

অগাস্ট মাসের শেষের দিকে সেদিন ছিল রবিবার। স্মুয়েল তার কাজ থেকে ফিরেছে। সে যেন মনে মনে কিছু একটা ঠিক করে এসেছে। বেশ সাহস সঞ্চয় করে স্ত্রীকে ডেকে বল্লে, সারা, শোন।

কেন, যাচ্ছি।

একটা মজার প্ল্যান করেছি। একটু ফুর্তি না করলে আর চলছে না।

কি মজা করবে? বাইরে কোথাও স্নান করতে যাবে?

ধ্যাৎ, সেটা আবার একটা মজা হল নাকি?

তাহলে, কেমন করে বলব তুমি কি ভেবেছ? ওহো—রাত্তিরে খাবার জন্য বরফ-জল কিনবে, না?

তাও নয়।

তাহলে সোডা লেমনেড্‌?

স্মুয়েল মাথা নেড়ে অস্বীকার করলে।

সারা অবাক হয়ে বল্লে, তাহলে আর কি হতে পারে! এক পাইণ্ট বিয়ার নয় তো?

আবার ভুল কচ্ছ।

ছাড়পোকা তাড়াবার জন্য কার্বলিক এসিড্‌ কিনবে?

এটা মন্দ বলনি। কিন্তু আসলে আমি তা ভাবিনি।

এবারে কিন্তু সারার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙগল। অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে, বেশ, তবে কি আর হবে? আকাশের চাঁদ? তুমি কি ভাবছ তা তুমিই জান বাপু। আর কেন? কথাটা বলেই ফেল, নিশ্চিন্দি হওয়া যাক্‌।

এবারে স্মুয়েল আস্তে আস্তে বললে, সারা, তুমি তো জান আমরা একটা লজ্‌-এর মেম্বার।

সারা ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, তা তো জানি। এই তো সেদিন পুরো এক ডলার চাঁদা দিলে। তার জন্যে এদিকে আমার কতখানি টানাটানি গেল। কি হয়েছে? আবার চাঁদা দিতে হবে নাকি?

না না, আন্দাজ করতে পারলে না তো, বলে স্মুয়েল একটু যেন ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বল্লে, আমি তোমাদের নিয়ে পিকনিকে যেতে চাই।

পিকনিক! সারা চেঁচিয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত তোমার পিকনিকে যাওয়ার সখ হল?

দেখ সারা, সারা বছর খেটেই মরি অথচ দুঃখ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা এসবের হাত এড়াতে পারি না। জীবনে কখনো একটু আমোদ করার সুযোগ পেয়েছি? এই তো গ্রীষ্মকাল শেষ হতে চলল একটু সবুজ রং-এর ঘাসও দেখলাম না। দিন রাত অন্ধকার ঘরে বসে ঘামছি।

স্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, তা তো ঠিকই বলেছ। তাহলে কি করতে হবে?

সারা চল বাইরে কোথাও একটু যাই। অন্তত একটি দিনের জন্য জীবনটাকে উপভোগ করবার চেষ্টা করি। বাচ্চাগুলিও খোলা বাতাসে গিয়ে একটু হাঁফ ছাড়ুক। পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও চল এই বদ্ধ আবহাওয়া থেকে বেরোই।

হঠাৎ সারা জিজ্ঞাসা করলে, কত খরচা লাগবে?

স্মুয়েল একটা মোটামুটি হিসেব দিলে। বাচ্চাদের মধ্যে রিজেল আর ডলোস্কির টিকিট লাগবে না। ইয়োজেল, রিভেল, হেনেল আর বেরেলের জন্য লাগবে তিরিশ সেণ্ট। আর তোমার, আমার যাওয়া আসার ভাড়া কুড়ি সেণ্ট। তারপর গিয়ে খাওয়া খরচা ধর আরো তিরিশ সেণ্ট। কয়েকটা কলা, এক টুকরো তরমুজ, বাচ্চাদের জন্য এক বোতল দুধ আর কয়েকটা রোল কিনে নিলেই হবে। একটু দাগ লাগা আনারস যদি পাওয়া যায় তার দাম পাঁচ সেণ্টের বেশী হবে না, তাও একটা নেওয়া যাবে। মোটের উপর আশি সেণ্টের বেশী লাগবে বলে মনে হয় না।

সারা হতাশার ভঙ্গিতে বলে উঠল, আশি সেণ্ট? ওরে বাবা, ও টাকায় যে আমাদের দু'দিনের সব খরচা চলে যায়। আশি সেণ্ট দিয়ে একটা বরফের বাক্স কিনতে পার কিম্বা তোমার এক জোড়া পাজামা হয়ে যায়।

স্মুয়েল একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বল্লে, বাজে কথা বোলো না। আশি সেণ্ট-এ আমরা একেবারে ধনী হয়ে যাব না। ঐ টাকা আমাদের থাকা না থাকা সমান। চল সারা, আমরা বছরে অন্ততঃ একটা দিন মানুষের মতো কাটাই। দেখবে শত শত লোক কেমন করে তাদের জীবন উপভোগ কচ্ছে। শোন সারা, আমেরিকায় এসে অবধি তুমি তো কিছুই দেখোনি। ব্রুকলিন ব্রিজ দেখেছ? কিম্বা সেণ্ট্রাল পার্ক? এম্পায়ার বিল্ডিং-এর নাম শোননি? দেখেছ সেটা?

দেখতে তো ইচ্ছে করেই, কিন্তু দেখলাম কই? শুধু বাড়ি থেকে হাটে যাওয়ার রাস্তাটাই চিনেছি।

স্মুয়েল বলে উঠল, আমিও তোমারই মতো হতাম তো। কিন্তু কাজের জন্য আমাকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়। আমেরিকা কি বিরাট দেশ! আমি তবু যা হোক কিছু কিছু দেখেছি। কোথায় এইট্‌থ্‌ ষ্ট্রীট, কোথায় বা এইটি ফোরথ্‌ ষ্ট্রীট তা আমার জানা আছে। টিনের কারখানা দেখেছি, দেশলাই-এর কারখানা দেখেছি। কিন্তু সারা, তুমি তো পৃথিবীর কিছুই জানলে না। চলো সারা, পিক্‌নিকে যাই। দেখো এর জন্যে তুমি কক্‌খনো অনুতাপ করবে না।

বেশ, যা ভাল বোঝ তা-ই করো। এবারে স্ত্রী হেসে জবাব দিলে, চলো যাই!

স্মুয়েল আর তার স্ত্রী পরের দিন পিক্‌নিকে যাবে বলে স্থির করলে।

পরদিন খুব সকাল বেলায় বাড়ির সকলের ঘুম ভাঙগল। ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেল। বাচ্চাগুলোকে তো একটু মেজে ঘসে পরিষ্কার করতে হবে। সারা ডলোস্কিকে স্নান করাচ্ছে। সারা বছরের জমানো গায়ের ময়লা কি একদিনে পরিষ্কার হয়! যত জোরে গা ঘসছে ডলোস্কি যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ি ফাটিয়ে চীৎকার কচ্ছে। স্মুয়েল ধুয়ে দিচ্ছিল ইয়োজেল-এর পা। কিন্তু স্মুয়েল দেখলো এই পায়ের উন্নতি কিছুতেই হচ্ছে না। তখন সামান্য গরম জলে পা ডুবিয়ে ইয়োজেলকে বসিয়ে রাখলে, তাতে ওটাও কান্না জুড়ে দিলে। যাই হোক্‌ এভাবে তো বেলা ১২টার সময় বাচ্চাদের জামা কাপড় পরিয়ে তৈরী করে নিলে। এবারে সারা স্বামীর দিকে নজর দিলে। পাজামা ঠিক করে কোটের দাগগুলো কেরোসিন দিয়ে ঘসে ঘসে তুলে দিলে। ভেস্টে বোতাম ছিল না, তাতে বোতাম লাগিয়ে দিলে। আর নিজে সেই বিয়ের সময়কার পুরোণো ফ্যাসানের সাটিনের যে পোষাকটি ছিল তা-ই পরে নিলো। ঠিক দু'টোর সময় সবাই মিলে গাড়িতে চড়ে রওনা হলো।

গাড়িতে চেপে সারা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু ফেলে আসিনি তো?

স্মুয়েল একটি একটি করে বাচ্চাদের গুণে দেখে বল্লে, সব ঠিক আছে, ঠিক আছে।

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডলোস্কি

ঘুমিয়ে পড়লো। আর সব বাচ্চারাও ওদের জায়গায় চুপচাপ বসেছিল। বেড়াতে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে সারাকে আজ এতো খাটতে হয়েছে, ক্লান্তিতে তার ঝিমুনি এসে গিয়েছে।

খানিকটা পথ বেশ চুপচাপ কেটে গেল। হঠাৎ সারা বলে উঠল, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। মাথাটা ঘুরছে।

আমারও কেমন কেমন লাগছে। খোলা হাওয়া বোধ করি আমাদের সইছে না, স্মুয়েল জবাব দিলে।

তা-ই হবে। আমার ভয় হচ্ছে বাচ্চাদের আবার অসুখ বিসুখ না হয়।

তার কথা শেষ হতে না হতে ডলোস্কি জেগে গেল। দেখে মনে হোলো ও যেন ভালো বোধ কচ্ছে না। কান্নাটা কেমন গোঙানির মতো শোনাচ্ছে। তাই দেখে ইয়োজেলও কান্না জুড়ে দিলো। মা ওকে বকুনি দেওয়া মাত্র অন্য সব বাচ্চাগুলোও কান্না শুরু করল। গাড়ির ভেতরে কান্নাকাটি গোলমাল। গাড়োয়ান ফিরে ফিরে স্মুয়েলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। বেচারা স্মুয়েলের হাতে খাবারের থলে। বেচারী এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল, থলেটা ধপ্ করে হাত থেকে পড়ে গেল। খাবারগুলো নষ্ট হয়ে গেছে কিনা কে জানে! ওর যেন মাথার ঠিক নেই। গাড়িতে স্থির হয়ে বসে সে কোন্ দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সারা চুপ্ চুপ্ বলে বাচ্চাগুলোকে শান্ত করবার চেষ্টা করছিল; কিন্তু সে যে বিষম চটে আছে তা ওর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দেখেই স্মুয়েল বুঝে নিয়েছে। কপালে ঢের দুঃখ আছে আজ' কাজেও তা-ই হল।

সারা বাচ্চাদের নিয়ে নেমেই একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, পিক্‌নিক, পিক্‌নিক ছাড়া আর চলল না। এতে বড় ও'র লাভ হবে। আরে, তুমি হলে মজুর, মজুরদের আবার বেড়ানো কি?

সমস্ত ব্যাপারে স্মুয়েল নিজেও খুব বিরক্ত হয়েছিল। সে কিছু জবাব দিলে না। ইয়োজেলকে এক হাতে আর অন্য হাতে সেই থেঁতলে যাওয়া খাবারের থলেটা নিয়ে স্মুয়েল পথ চলতে লাগল।

রাস্তায় বাচ্চাগুলি কান্নাকাটি করছিল। চুপ্ চুপ্ বাছারা! এই তো একটু পরেই মা তোমাদের রুটি, চিনি খেতে দেবেন। একটু চুপ করো, স্মুয়েল ওদের থামাবার চেষ্টা করছিল।

সারা ডলোস্কিকে কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বেরেল ও হেনেলও টলতে টলতে হাঁটছিল।

সারা বলে উঠল, তুমি আমার অর্ধেক আয়ু কমিয়ে দিয়েছ।

পার্কের কাছে এসে স্মুয়েল বল্লে, চল সারা, একটা গাছের ছায়ায় বসি।

আমি আর এক পা-ও চলতে পাচ্ছি না, বলে সারা ফটকের কাছেই ধপ্ করে বসে পড়লো। স্মুয়েল কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তাকিয়ে দেখলো ক্লান্তিতে সারাকে যেন এক বৃদ্ধার মতো দেখাচ্ছে। আর কিছু না বলে স্মুয়েল স্ত্রীর পাশে বসে পড়লো। বাচ্চাগুলো ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে, হাসছে, খেলছে। স্মুয়েল একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

পার্কের চারদিকে ঘুরে ঘুরে মেয়েরা ছুটির দিন উপভোগ কচ্ছে। একদল আবার গাছের ছায়ায় বসে আছে। কোথাও বা সুন্দরী মেয়েদের ঘিরে রয়েছে অল্পবয়স্ক ছোকরারা, আবার কোথাও বা সুন্দর যুবকদের সঙ্গদান করতে ব্যস্ত রয়েছে অল্পবয়স্ক যুবতীরা।

একটু দূরে থেকে একজন মজুরের সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছিল। কাছেই একটা লোক দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছিল। সারা এরই মধ্যে ওর জীবনকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছে। টুকরো টুকরো করে জীবনটাকে নিয়ে ভেবে দেখল কত দুঃখ কত কষ্টের ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। হঠাৎ স্বামীর কথা ভেবে তার কান্না পেয়ে গেল, ও বেচারীরও তো একই অবস্থা। স্মুয়েল চুপ চাপ তার পাশে বসে আছে। সে যেন কিছুই ভাবছে না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শুধু গাছ ফুল আর ঘাস দেখছে ও বসে বসে বেহালার বাজনা শুনছে।

সারা, শোন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্মুয়েল আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু হল। ওরা ওখান থেকে সরে যাওয়ার আগেই ভীষণ জোর বৃষ্টি এসে পড়ল। চারদিকে লোকজন ছুটাছুটি করে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিল; কিন্তু স্মুয়েল হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বাচ্চাদের ধর, ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল সারা। স্মুয়েল দুটিকে তুলে নিল আর বাকী ২।৩টিকে সারা কোনপ্রকারে নিয়ে একটা আস্তানায় গিয়ে উঠল। ডলোস্কি আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার জুড়ে দিল। মা ক্ষিধে পেয়েছে, খাব, বলে অন্য বাচ্চাগুলোও চেঁচামেচি শুরু করে দিলে।

স্মুয়েল তাড়াতাড়ি গিয়ে থলেটা খুললে। ভেতরের জিনিসগুলোর যা অবস্থা হয়েছে দেখে তার চক্ষু স্থির। বোতল ভেঙ্গে সমস্ত দুধ থলের ভেতর ঢেউ খেলছে; কলা আর কেক্ তো ভিজে একেবারে চুপসে গেছে, আর আনারসটার যা অবস্থা হয়েছে দেখতেই ঘেন্না ধরে। সারা থলের ভেতরটা এক নজর দেখে নিলে। দেখে রাগে কাঁপতে লাগল, মুখে কোন কথা জানাল না। কেমন করে এর প্রতিশোধ নেবে তাও ভেবে পাচ্ছিল না। এতো লোকের মাঝে চেঁচিয়ে বকুনি দিতেও লজ্জা করছিল। তবু স্বামীর কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল, দাঁড়াও না, তোমার ভালমানষিটা বের করব।

বাচ্চাগুলো আগের মতোই চেঁচাতে লাগল, মা, ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দাও।

স্মুয়েল স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললে, দেখব নাকি দোকানে গিয়ে কিছু রোল আর এক গ্লাস দুধ আনতে পারি কিনা?

সারা জিজ্ঞেস করলো, পয়সা কিছু আছে? পিক্‌নিকের যোগাড়েই তো সব খরচা করে বসে আছ।

পাঁচ সেণ্ট-এর মতো আমার কাছে আছে।

বেশ, তাহলে শিগ্গির গিয়ে কিছু কিনে নিয়ে এস। বেচারারা না খেয়ে আছে।

স্মুয়েল দোকানে গিয়ে এক গ্লাস দুধ আর কয়েকখানা রোল-এর দাম জিজ্ঞাসা করলে।

মশাই, কুড়ি সেণ্ট হবে, দোকানী জবাব দিলে।

দাম শুনে স্মুয়েল চমকে উঠল যেন ওর আঙ্গুলে ছ্যাঁকা লেগেছে। নেহাৎ বেজার মুখে স্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

কি, দুধ আনলে?

ওরা কুড়ি সেণ্ট দাম চাইল।

এক গ্লাস দুধ আর কয়েকটা রোল কুড়ি সেণ্ট? ওরে বাপরে! ওরা গলাকাটা ডাকাত নাকি? আর একবার পিক্‌নিকে আসতে হলে দেখছি আমাদের বিছনা পত্তর বিক্রী করে আসতে হবে।

বাচ্চাগুলো কিন্তু ক্ষিধের জ্বালায় ক্রমাগত চেঁচিয়েই যাচ্ছে।

তা হ'লে এখন কি করব? বিভ্রান্ত হয়ে স্মুয়েল জিজ্ঞাসা করলে।

সারা চেঁচিয়ে উঠল, কি আবার করবে? এই মুহূর্তে বাড়ি ফিরে চল।

বাচ্চাদের নিয়ে পার্ক ছেড়ে ওরা গাড়িতে এসে উঠল। সারা কিন্তু পথে একটি কথা বল্ল না। বাড়ি গিয়ে স্বামীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

দাঁড়াও না, এর শোধ তুলে তবে ছাড়ব। আমার এই সাটিনের পোষাক, থলে, আনারস, কলা, দুধ সমস্ত তুমি এই পিক্‌নিকের কল্যাণে নষ্ট করে দিয়েছ, তাছাড়া কতখানি হয়রানি মিথ্যে মিথ্যে। মজা আমি দেখিয়ে নেব।

স্মুয়েল বল্ল, খুব বকে যাও। তুমিই ঠিক বলেছিলে পিক্‌নিকে যাওয়া আমাদের পোষায় না। আমরা হলাম মজুর, কারখানা ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবা আমাদের পোষায় না।

বাড়ি এসে সারা তো তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। স্মুয়েল বেচারীর খুবই ক্ষিধে পেয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাদের খাইয়ে দাইয়ে সারা ওকে আর খেতে দিলে না। পেটে ক্ষিধে মনে অশান্তি নিয়ে স্মুয়েল বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। সারা রাত ঘুমের ভেতরে এপাশ ওপাশ করছে আর বলে উঠছে, পিক্‌নিক, পিক্‌নিক, আঃ পিক্‌নিক।

অনুবাদ : শ্রীপ্রমীলা দত্ত

রবীন্দ্র-কাব্য-জীবন-প্রবাহ

কবি-স্মরণ-সংকলন

সংকলয়িতার নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও তিরোভাব

—এই দুটি-দিনই আমাদের সমভাবে পালনীয় ও স্মরণীয়। কি পঁচিশে বৈশাখে, কি বাইশে শ্রাবণে কবির জন্মোৎসব বা কবির স্মৃতি-তর্পণ শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে, সুরুচিও সংযমে তাঁর দেশবাসীর অবশ্য করণীয়। কিন্তু প্রতি বৎসর ঐ দিন-দুটিকে ঘিরে নানা স্থানে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, লক্ষ্য ক'রে দুঃখ পেয়েছি, তাতে তাঁর সৃষ্টির মর্মকথাটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বহু বৃথা বাক্যের নিরর্থকতায় পড়ে যায় চাপা; প্রাতিষ্ঠানিক বাগাড়ম্বরে তাঁর বাণীমূর্তি হ'য়ে পড়ে নিষ্প্রভ। তাই অনেক সময় ভেবেছি, কেমন ক'রে এ-সব অনুষ্ঠানে তাঁর কাব্য-জীবন-প্রবাহের মূল ধারাটি ধ'রে, তাঁর যে-সৃষ্টি, ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে সৃষ্টির অতীতে, তার একটু পরিচয় দেওয়া যায়,—যাতে সার্থক হয় আমাদের স্মরণ, তাঁর সেই নিরন্তর প্রকাশের পথে, অন্তরের উপলব্ধিতে।

এই কথা মনে নিয়ে আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের যে-কাব্যসৃষ্টি, তার অরুণোদয়ে ক্ষীণধারা নির্ঝর-উৎস থেকে, মধ্যাহ্নদিনে দুকূলপ্লাবী খরনদীস্রোত বেয়ে, শান্তসমাহিত সন্ধ্যায় মহাসাগরসংগম পর্যন্ত, যে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য নিয়ে পরম পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে, তারি একটু পরিচয়, আর তারি একটু ব্যাখ্যা—কবির আপন মুখের কথাতেই—দেবার চেষ্টা করেছি। বলবার দরকারও মনে করছি না যে, তাঁর অখণ্ড কাব্য-জীবন-প্রবাহের এ-পরিচয় খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। আমি শুধু কবি নিজে যে-কথা বলেছিলেন 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র ভূমিকায়—

> "আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সংগে সংগেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে।.........একটা ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে"

—সেই কথাটি মনে রেখে এই সংকলনটি করেছি। এ থেকে পঁচিশে বৈশাখের বা বাইশে শ্রাবণের কোনো একটি অনুষ্ঠানেরও যদি সামান্য সহায়তা হয়, তাতেই আমার তৃপ্তি। ইতি ২২শে শ্রাবণ। ১৩৫৪॥

—অমল হোম

পুনশ্চ—

ম'নে রাখা ভাল যে, কবির দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্যপ্রবাহের মূল ধারাটিকে একটি দিনের মধ্যে ধরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হবে না। ঠিক এই অনুষ্ঠানপদ্ধতিটিকে সমগ্রভাবে রূপদান ক'রতে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন তা সুলভ না হ'লে, এখানে যা সংকলিত হোলো, তা স্থান কাল অনুযায়ী সংক্ষেপিত ক'রতেই হবে। সে-ভার রইলো অনুষ্ঠাতাদের হাতে। তাঁরা তাঁদের অভিরুচি ও আয়োজনমতো এ পদ্ধতি পরিবর্তিত করে নেবেন। কবির কাব্যধারাগতির বোধসহায়তায় আমি যেখানে কোনো একটি কাব্যের বা তার কবিকৃত ব্যাখ্যার একাধিক উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছি, তাঁরা সেখানে সেটি অনায়াসেই বর্জন করতে পারেন। তাতে তাঁর সৃষ্টির মূল ঐক্য-সূত্রটি ধরার পক্ষে অসুবিধা হবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস।

—সংকলয়িতা॥

[বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অনুমোদনক্রমে]

> "নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, তা হ'লে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানা খানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে,—সে আর কিছু নয়,—
>
> আমি কবি মাত্র।"
>
> ২৫শে বৈশাখ। ১৩৩৮॥

—২৩শে শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত—
প্রথম ধারা—**উদ্বোধন। কৈশোরক। যৌবনস্বপ্ন॥**
১। **"প্রভাত-সংগীত"**। ২। **"কড়ি ও কোমল"॥**
—৩০শে শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত—
দ্বিতীয় ধারা—৩। **"মানসী"**। ৪। **"সোনার তরী"॥**
—৬ই ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত—
তৃতীয় ধারা—৫। **"চিত্রা"**। ৬। **"কল্পনা"॥**
—১৩ই ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত—
চতুর্থ ধারা—৭। **"ক্ষণিকা"**। ৮। **"নৈবেদ্য"**। ৯। **"স্মরণ"॥**
—২০শে ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত—
পঞ্চম ধারা—১০। **"উৎসর্গ"॥**
—২৭শে ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত—
ষষ্ঠ ধারা — ১১। **"খেয়া"**। ১২। **"গীতাঞ্জলি"**।
১৩। **"গীতিমাল্য"**। ১৪। **"গীতালি"॥**
—এই সংখ্যায় প্রকাশিত
সপ্তম ধারা—১২। **"বলাকা"**।

উপক্রমণিকা

"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারই হউক জয়!
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়॥
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে,
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমারি হউক জয়!
এস দুঃসহ, এস এস নির্দয়,
তোমারই হউক জয়!
এস নির্মল, এস নির্ভয়
তোমারই হউক জয়!
প্রভাতসূর্য এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয়,
তোমারই হউক জয়॥"
—"গীতালি"। রবীন্দ্ররচনাবলী। একাদশ খণ্ড॥

—"বলাকা"—

॥১৩২৩॥

১০৬। পাঠ—

"—'বলাকা' রচনাকালে যে-ভাব আমাকে উৎকণ্ঠিত করেছিল...আমি আজ পর্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্টা করেছি। বুকের মাঝে যে আলোড়ন হ'ল, তার কী সার্বজাতিক অভিপ্রায় আছে, তা আমি ধরতে চেষ্টা করেছি। পশ্চিম-মহাদেশ-ভ্রমণের সময়ে সে-চিন্তা আমার মনে বর্তমান ছিল। আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি; একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি; সে ডাককে কেউ মেনেছে কেউ মানেনি। 'বলাকা'য় আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। 'বলাকা'র কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ হয়েছিল।..........

"'বলাকা' বইটার নামকরণের মধ্যে এই 'বলাকা' কবিতার মর্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হ'য়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল—কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না, কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল, সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং 'বলাকা' বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে।"(১১৪)

১০৭। আবৃত্তি—

* * *

—"মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দ-রেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ-সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা-বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে।'

"হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

---

(১১৪) "শান্তিনিকেতন পত্রিকা"। ১৩৩০। পৌষ। ১৩২৮ সনে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের "বলাকা" অধ্যাপনাকালে কবির আলোচনা॥

"শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্পষ্ট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখী ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ-গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে!(১১৫)

১০৮। পাঠ—

—"আপাততঃ একটা বইয়ের মধ্যে যে কবিতাগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো বিচ্ছিন্ন মনে হয়, তারও মধ্যে এমন একটা যোগ আছে, যদি দেখবার চেষ্টা করা যায়, তা'হলে দৃষ্টি পড়ে। এই সেদিন 'চিত্রা' পড়তে পড়তে আমার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। মনে পড়ে গেল সেই দিনগুলি। ওই কবিতা-গুলোকে যারা কল্পনা বা তত্ত্ব ব'লে মনে করে, তারা যে সত্যি কি ভুল করে, তা বলতে পারি না। ওটা একটা experience; এমন একটা গভীর অনুভূতির থেকে ওগুলো এসেছিল, সেই কথা আবার মনে পড়ছিল 'চিত্রা' দেখতে দেখতে সেদিন। কে যেন গড়ে তুলছে একটা সৃষ্টি আমাকে কেন্দ্র ক'রে। আমার হাসিখেলা, আমার সব কিছুকে নিয়ে একটা সৃষ্টি চলেছে। সে যেন কোন্ যন্ত্রীর হাতের বীণা,—তাকে অবলম্বন ক'রে শিল্পী ক'রে চলেছে সুরসৃষ্টি। নিজেকে দেখা, 'আমি' বলে নয়—objectiveভাবে দেখা। আমি গড়ে উঠেছি তার হাতে। সেই গড়া, সেই সৃষ্টি, শিল্পীর শিল্প। তাই থেকে প্রশ্ন করেছি—'ভাল কি লেগেছে'? আমাকে অবলম্বন ক'রে যা গড়তে চেয়েছ, তা কি হয়েছে? যে সুর বাজাতে চেয়েছ, আমার মধ্যে কি তা বেজেছে? এই আমার 'জীবন-দেবতা'তে প্রশ্ন—তোমার সৃষ্টিতে তুমি খুশি হ'তে পেরেছ তো? 'মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম'? এটা সত্যি একটা কবিত্বের কথা মাত্র নয়,—খুব গভীর ক'রে মনে-করা,—'লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ'? কিন্তু সে experienceএর কথা কি ক'রে বোঝাব!

"যেমন মনে পড়ে 'বলাকা'র কথা। সেই এলাহাবাদে ছাদের উপর বসে আছি, বসেই আছি;—দীর্ঘ সময়, রাত্রি ব'য়ে চলেছে, তারাগুলো আকাশের এপার থেকে ওপারে চলে গেল। আমি ব'সে ব'সে যেন অনুভব করলুম কালের স্রোত,—যে কাল ব'য়ে চলেছে তার প্রবল বেগ। সে আমি বোঝাতে পারিনি,—সেই অনুভূতি বোঝানো যায় না। কত রকম চেষ্টা তো করলুম, নদীর সঙ্গে, স্রোতের সঙ্গে তুলনা ক'রে;—বয়ে চলেছে কাল-প্রবাহের মতো, তার মধ্যে বস্তুগুলো যেন জলের ফেনার মত পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে উঠছে, কিন্তু বলতে কি পেরেছি? সেদিন রাত্রে যেমন ক'রে অনুভব করেছিলুম, তা বলা হয়নি।

"ও-কবিতা যারা বিশ্লেষণ ক'রে পড়বে, তারা পাবে ওর মধ্যে ছন্দ, উপমা, তত্ত্ব কত কি,—কিন্তু তাই দিয়ে ওকে বোঝা যায় না। আরও একটা কিছু যোগ করতে হবে,—যে পড়বে তার নিজের অন্তর থেকেই; তার মনের মধ্যে যদি সেই রকম স্থান থাকে, যেখানে এর অনুভূতিটা বাজে, —তা না হ'লে ও হবে না। কবিতা দেখবার একটা সত্যকারের দৃষ্টি থাকা চাই, নৈলে ওর true perspective পাবে না।........কতকগুলো বাঁধা নিয়মের মধ্যে চিন্তাগুলো যাদের বাঁধা, তারা সব কিছুকেই সেই ছাঁচে ফেলে দেখতে চায়। আমি বরং দেখেছি যারা unsophisticated, তারা পরিষ্কার বলে—'ভাল লাগছে, কিন্তু জানিনে কেন লাগছে, হয়তো মানে বুঝিনে, শুধু এইটুকু বুঝি যে, আনন্দ পাই,'—তারাই অনেক বেশী বোঝে। মনের ঠিক জায়গাতে লেগেছে, নাই বা বুঝলুম কি ক'রে লাগল, কেন লাগল বিকলন ক'রে ক'রে...........(১১৬)

"—হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে

(১১৫) "বলাকা"।৩৬। রবীন্দ্ররচনাবলী। দ্বাদশ খণ্ড॥
(১১৬) "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"। মৈত্রেয়ী দেবী। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত কবির আলোচনা॥

পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে;
ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে।
আলোকের তীব্রছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্র তারা যত
বুদ্বুদের মতো!...

"হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী,
চলেছে যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া?
সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে-অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা,—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে;
বারংবার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হ'তে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

"যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে,—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে,
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;—
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষে নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন॥" (১১৭)

* * * * *

(১১৭) "বলাকা" ।৮। রবীন্দ্ররচনাবলী'। দ্বাদশ খণ্ড॥

১০৯। পাঠ—

"সমস্ত ইউরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে,—কতদিন ধ'রে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে-মানুষ কঠিন ক'রে বন্ধ করেছে,—আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচন্ড ক'রে তুলেছে;—তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একটিন বিদীর্ণ ক'রবেই ক'রবে। এক এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হ'য়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হ'য়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করছে।......কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে? এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে। ......এই পাপের মূর্তি যে কী প্রকান্ড আমরা কি তা দেখব না? এই পাপ যে সমস্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং আজ তাই বিরাট আকার নিয়েছে, এ-কথা কি আমরা বুঝব না?......এ পাপ কতদিন ধ'রে জমছে, কত যুগ ধ'রে জমছে। প্রতিদিনই কি আমরা তারই মার খাচ্ছিনে?......সেইজন্যই তো এই প্রার্থনা—'মা মা হিংসীঃ'। বাঁচাও, বাঁচাও—এই বিনাশের হাত থেকে বাঁচাও।......এই সমস্ত দুঃখ শোকের উপরে যে অশোক লোক রয়েছে, অনন্ত-অন্তের সম্মিলনে যে অমৃতলোক সৃষ্টি হয়েছে,—সেইখানে নিয়ে যাও। সেইখানে মরণের উপর জয়ী হয়ে আমরা বাঁচব,—ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা বাঁচবো। সেইখানে আমাদের মুক্তি দাও।

"আজ অপ্রেম-ঝঞ্জার মধ্যে, রক্ত-স্রোতের মধ্যে এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার ক'রতে ক'রতে আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে ব'য়ে চলেছে।......এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হ'য়ে আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে দিয়েছে।" (১১৮)

১১০। আবৃত্তি—

"দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হ'তে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্চ্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন;
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কান্ডারী
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ।

* * * * *

"অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে-দেশ,—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল
যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠিছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
ঊর্ধ্বে আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হ'তে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে ল'য়ে উন্মত্ত দুর্দিন
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন।" (১১৯)

১১১। পাঠ—

"এই কথা জেনো যে......সমস্ত মানুষ যে এক,—সেইজন্য......মানুষের সমাজে পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ ক'রে নিতে হয়।......এই-জন্যই আমাদের সকলকে দুঃখ ভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে,—সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই ক'রতে হবে। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল, দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ ক'রবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না।—সে চেয়ে দেখবে দুর্যোগের রাত্রে দূরদিগন্তে মশাল জ্বলে উঠেছে,—বেদনায় মেদিনী কম্পিত ক'রে রুদ্র আসছেন,—সেই বেদনার আঘাতে তার হৃদয়ের সমস্ত নাড়ী ছিন্ন হ'য়ে যাবে।......তাই একথা আজ বলবার কথা নয় যে, অন্যের কর্মের ফল আমি কেন ভোগ ক'রব? হ্যাঁ, আমিই ভোগ ক'রব,—আমি নিজে একাকী ভোগ করব,—এই কথা বলে প্রস্তুত হও।......দুঃখকে গ্রহণ করো। (১২০)

১১২। আবৃত্তি—

"হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত
ওরে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হ'তে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ!
রাখো নিন্দা বাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু এক মনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।
দুঃখের দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি
ভেসে যায়, তারা স'রে যায়
জীবনেরে ক'রে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ;
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ
তারপরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে,—
"তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্!
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।" (১২১)

১১৩। পাঠ—

"আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি,—এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।......যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছিল। তা শেষ হ'য়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনও আরম্ভ হয় নি। আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘর-ছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে।......সেই ঘর-ছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে-কাল সর্বজাতির লোকের,.....ব'লছে 'প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই।'

---

(১১৮) ১৩২১।২০শে শ্রাবণ শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবি-প্রদত্ত উপদেশ।
"শান্তিনিকেতন।" ২য় খণ্ড। 'রবীন্দ্ররচনাবলী'। ত্রয়োদশ খণ্ড॥
(১১৯) "বলাকা"। ৩৭॥

(১২০) ১৩২১।৯ই ভাদ্র শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবি-প্রদত্ত উপদেশ। 'শান্তিনিকেতন'। ২য় খণ্ড॥
(১২১) "বলাকা"। ৩৭॥

পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নতুন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।" (১২২)

১১৪। আবৃত্তি—

"মৃত্যুর অন্তরে পশি' অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?" (১২৩)

১১৫। সংগীত—

—হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ, চির প্রাণ
জয়ী রে আনন্দ গান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ময় রে!
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হ'ক,
আশার অরুণালোক
হ'ক অভ্যুদয় রে॥" (১২৪)

(১২২) ১৩২৮ সনে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের "বলাকা" অধ্যাপনাকালে কবির আলোচনা। 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'। ১৩২৯। জ্যৈষ্ঠ॥

(১২৩) "বলাকা"। ৩৭॥

(১২৪) "গীত-বিতান"। প্রথম খণ্ড॥

সাহিত্য সংবাদ

অঞ্জলি সমিতি
দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রতিযোগিতাসমূহ

অঞ্জলি সমিতির উদ্যোগে নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতাসমূহের আয়োজন করা হইতেছে। রৌপ্যাধার, পদকাদি পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য প্রতিযোগিতা সম্পাদক, অঞ্জলি সমিতি, বাগবাজার, চন্দননগর—এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ছোট গল্প, সাধারণ প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সমালোচনা ও কবিতা।

নাম ও লেখা পাঠাইবার শেষ দিন ৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭।

রচনা প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় যুবশক্তি সঙ্ঘের উদ্যোগে রচনা প্রতিযোগিতা হইবে। রচনার বিষয়ঃ—

১। আধুনিক সভ্যতার উপর বিজ্ঞানের প্রভাব।
২। কৃষি-বনাম-শিল্প।
৩। ভারতে জাতীয়তাবোধের প্রসার ও তাহার বর্তমান অবস্থা।

ইংরাজি ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই লেখা চলিবে। প্রতি বিষয়ে বাঙলায় ২টি এবং ইংরাজিতে ১টি করিয়া সর্বসমেত ৯টি পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ৩১শে অক্টোবর করা হইল। রচনার ফলাফল ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। পূর্ণ বিবরণের জন্য আবেদন করুন। সেক্রেটারী, বঙ্গীয় যুবশক্তি সংঘ, ১৬৪-ই, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা

প্রবন্ধ (১) "মেঘনাদ বধ কাব্যে দেশপ্রেম"।
(২) "মাইকেলের বঙ্গভূমির প্রতি কবিতার মর্মবাণী" ফুলস্কেপ কাগজের ৫ পৃষ্ঠার মধ্যে।
কবিতা (১) মাইকেল প্রতিভা।
(২) স্বাধীন ভারত। ২ পৃষ্ঠার মধ্যে।

রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ—১৫ই আশ্বিন। প্রত্যেক বিষয়ের প্রথম পুরস্কার ফাউণ্টেন পেন, প্রশংসাপত্র। দ্বিতীয় পুরস্কার—পুস্তক ও প্রশংসাপত্র। রচনা মনোজ্ঞ হইলে সাহিত্যিক উপাধি দান করা হইবে। রচনা প্রত্যেক সাহিত্যিক ও ছাত্রছাত্রী পাঠাইতে পারিবেন। রচনা পাঠাইবার ঠিকানাঃ—শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, সম্পাদক, যশোহর সাহিত্য-সঙ্ঘ, যশোহর।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সাধনা

আমার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হ'ল। রায় যতীন্দ্রনাথের টাকী, সনৎকুমারের টাকী, অনিলকুমারের টাকী, ২৪ পরগণার সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান এই টাকীর অধিবাসী আপনাদের সঙ্গ লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হ'লো। যাঁদের কৃপায় এ সম্ভব হ'লো, তাঁদের চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ নিবেদন করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা পরম কৃপাপরায়ণ, তাঁদের এ কৃপা আমি জীবনে বিস্মৃত হব না। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল; আর সম্বল আপনাদের কৃপা; নইলে কিছু বলবার শক্তি আমার নেই; আর, ইচ্ছা করলেই সব কথা বলা যায় না। আপনারা আমার কাছে যে কথা শুনতে চেয়েছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই; তবে আপাতত জানা যে জিনিস নেই, সে জিনিসও বেদনায় চেতনা হয়, স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করে জাগে। আপনাদের বেদনা, আমার স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করে যদি চেতনা দেয়, তবে আমার অজানা বস্তুর সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটতে পারে। আত্মীয়তার আলোক লোপ ঘটিয়ে দেয়, চোখ ফুটিয়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিশ্বময় আত্মীয়তায় পরিস্ফুর্ত সত্য। সকলকে আপন করে অমৃতময় জীবন লাভ করবারই সে পথ। স্বামীজী বলেছেন, 'প্রেম প্রেম এইমাত্র সার', সে কথাটা ভুলবেন না। ঠাকুরের অমৃতময়ী বাণী আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, 'কলিতে নারদীয়া ভক্তি'। বস্তুতঃ ঠাকুর এবং স্বামীজী এই দুইজনের উক্তির তাৎপর্যেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিধৃত রয়েছে। প্রেম একটা কথার কথা শুধু নয়। আমাদের অন্তরের গূঢ় বৃত্তিনিচয় অভীষ্টলাভের পরম সঙ্গতিতে যখন পরিপূর্তি লাভ করে, তখনই প্রেম এবং ভক্তির সাধনা সার্থক হয়। প্রেম অনুমান বোঝে না, ভক্তিও ব্যবধান মানে না। অনুমান ও ব্যবধানকে অতিক্রম করে আত্মতত্ত্বের এই প্রত্যক্ষ চেতনা, সকল সন্ধানের এই যে সার্থকতাময় পরম উপলব্ধি, একেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের মূলীভূত বস্তু বলা যেতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূলীভূত গূঢ় বেদনার একান্ত অনুভূতিতেই সে রসময় দেবতার দিব্য জন্ম ও কর্ম সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হ'তে পারে। প্রেমকে আশ্রয় করেই তাঁর প্রকাশ, আর আমাদের মনপ্রাণে সেই প্রেম লীলার বীর্যময় অনুধ্যানেই সে দেবতার পরম বিলাস।

স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, যিনি অজ, অনাদি এবং অব্যয় তাঁর আর জন্ম কেমন, তাঁর আবার কর্মই বা কি? আমাদের মতো তাঁর তো কোন প্রয়োজন নেই, তিনি আত্মারাম এবং আপ্তকাম। এ সব কথাই সত্য; কিন্তু সে সঙ্গে এ সত্যটিকে ভুললে চলবে না যে, তিনি লীলাময় এবং পরম স্বতন্ত্র পুরুষ। আমাদের মত গুণ-কর্মের নিগড় বাঁধা তাঁর স্বভাব নয়। সকল ভাব তাঁর থেকেই আসছে, তাঁকে ছেড়ে কোন ভাবই আমাদের মনে প্রাণে খেলাতে পারে না। আমাদের ভাবসমূহের সার্থকতায় তিনিই পরমার্থস্বরূপ। আমাদের অন্তরে বিভিন্ন ভাবের ছোঁয়াচ দিয়ে তিনি দূরে সরে যাচ্ছেন, আমরা তাঁকে ধরতে পাচ্ছি না, চিনতে পাচ্ছি না, উপাধি জ্ঞানে সাময়িকতার বিভ্রমের মধ্যে পড়ছি; এইভাবে দেশ কালের ব্যবধান তাঁর থেকে আমাদের সরিয়ে ফেলছে; কিন্তু আমাদের ও তাঁর মধ্যে এই যে ব্যবধান, এ নিত্যকার হতে পারে না। ভক্তের অনুগ্রহের জন্য তিনি অজ ও অনাদি তাঁরও চিন্ময় আবির্ভাব ঘটে থাকে। ভক্তের অন্তঃকরণের স্বচ্ছ দর্পণে শ্রীভগবান তাঁর প্রজ্ঞানঘন প্রত্যক্ষতায় অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন। আচার্য শংকর তাঁর গীতা ভাষ্যে একথাটা খুলে বলেছেন, তিনি 'দেহবান ইব, জাত ইব' লোকানুগ্রহ-লীলায় প্রকাশ পেয়ে থাকেন। এই তাঁর অবতার। অবতার অনেক রয়েছে, গীতা এবং ভাগবতে এ সব আপনারা দেখেছেন; কিন্তু শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তেমন অবতার বস্তু নয়। যুগ-প্রয়োজন সব অবতারের মূলে থাকে, কিন্তু শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলায় যুগ প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে তিনি সর্বযোগেশ্বররূপে ধরা পড়ে গেলেন। এ লীলায় তাঁর সনাতনতত্ত্ব দীপ্ত হয়ে উঠলো। নিজের বিভূতি দিয়ে নিজকে লুকিয়ে ফেলেন, এ তাঁর স্বভাব; কিন্তু এ লীলার অন্তর্নিহিত প্রেমের পরম প্রভাবে তিনি যেন আনন্দে নিজেকে ভুলে গেলেন। বিভূতি দিয়ে নিজকে আর গোপন রাখতে পারলেন না। শ্রীভগবানের প্রেমময় এবং আনন্দময় বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বই এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ পেলে আমাদের আর কোন জিজ্ঞাসা থাকে না, সকল তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে যায়। তৃষ্ণা যেখানে কাম সেখানে থাকবেই এবং চিত্তবৃত্তির একান্ত নিবৃত্তি না ঘটলে, মনের চাঞ্চল্য তার এদিকে ওদিকে গতিও চলবে। মন যদি তার নিজে নিজে মাখামাখি না হয়, তবে ফাঁকি দিয়ে তাকে রোধ করা যায় না, বোধ মানানো সম্ভব হয় না। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে আমাদের মনের সনাতন পিপাসার নিরসন হয়। প্রকৃত প্রেমের তাতে উন্মেষ ঘটে। আমরা ভাগবতে দেখতে পাই কুন্তী দেবী শ্রীকৃষ্ণের জন্মে ও কর্মের প্রশ্নটি তুলেছেন। তিনি অবতারতত্ত্বসুলভ সব বিচার করে পরে বলেছেন, কাম্য কর্মে অভিভূত হয়ে আমরা এ জগতে কষ্ট পাচ্ছি, বেদ প্রতিপাদ্য পরম আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন এবং স্মরণের পক্ষে প্রকট করবার জন্যই তোমার এই জন্মলীলা। তোমার এ লীলার সঙ্গে সংবেদন না হলে কেউ বেদ প্রতিপাদ্য রসময় এবং আনন্দময় ব্রহ্মের সন্ধান পায় না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা অনেকেই ভগবানকে উদ্দিষ্ট করে রেখেছি। এ ছাড়া আমাদের মত জড়জীব তাঁর কোন ধারণাই করতে পারে না। আমাদের অনেকেরই ভগবানের সাধনা কেবল নামে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে আমরা কামনারই বশে ঘুরছি। ভগবানের সঙ্গে আমাদের দেহ, মন, প্রাণের সম্বন্ধ নাই। ভগবৎতত্ত্ব আমাদের কাছে পরোক্ষ মাত্র। আমরা ভগবানকে বড় করে দেখি, কিন্তু এই বড় করে দেখার ভিতর দিয়ে আমাদের যত ফাঁকি চলছে। আমরা তাঁকে কাছে রেখে পাচ্ছি না। আমরা বেদান্ত আর উপনিষদের সূত্র আওড়াই, তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, ইত্যাদি; কিন্তু এ সব খালি বাক্যের, আমাদের হৃদয়ের ঐক্য এতে নাই। বস্তুত ভগবানকে জড়িয়ে ধরতে চাইলেই তাঁকে জড়িয়ে ধরা যায় না। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের পরম রহস্য এই যে, এই তত্ত্বের সাধনার রসে ভগবান বশে এসে পড়েন, তাঁকে জড়িয়ে ধরা যায় এবং মনের সর্বময় সঙ্গতিতে ব্যবধানগত সব সন্দেহ ও সম্মোহ দূর হয়ে গিয়ে সর্বত্র তাঁরই স্ফূর্তি ঘটে। আমাদের দেহ ও মনের সব বৃত্তি তাঁর রসময় অনুভূতিতে ডুবে যায়। বড় ভগবান ছোট হ'য়ে তাঁর আপন তত্ত্বের গোপন বেদনার বশে আমাদের কামনায় উপহত চিত্তের দৈন্য ও দুর্বলতা দূর করে লাবণ্যময় মূর্তিতে জাগ্রত হন। উপরে, নীচে তিনি সকল দিকে রয়েছেন, আমাদের নজর কেবল উপরের দিকে; নীচের দিকটাকে আমরা তুচ্ছ করতে চাই; এজন্য তাঁকে আমরা পাই না। এ আমাদের দোষপূর্ণ দৃষ্টি, এ চোখে তাঁকে দেখা যায় না। ছোট হ'য়ে যখন তিনি আমাদের কাছে ধরা দেন, তখনই তাঁর পূর্ণ স্বরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। আমরা যদি অনিন্দক হয়ে সকৃৎ কৃষ্ণ বলতে পারি, তবে তাঁর মহিমা সর্বত্র উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু সে সব প্রেমের দৃষ্টি কামনার গন্ধ থাকতে লাভ করা যায় না। বস্তুত তিনি নিজে এসে ধরা না দিলে তাঁকে হৃদয় ভরে পাওয়া সম্ভব হয় না। কৃষ্ণলীলার অন্তর্নিহিত বীর্যে তাঁর নিজে এসে ছোট হয়ে ধরা দেওয়ায় পরম মাধুর্য রয়েছে বলে এই লীলা আমাদের সব অবীর্য দূর করতে পারে।

আমরা বিষ্ণু পুরাণে দেখতে পাই, গোবর্ধন ধারণ করবার পর গোপগণ এবং গোপীরা তাঁর পরম বিভূতি দেখে স্তম্ভিত হলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজেদের অপরাধের জন্য ত্রুটি স্বীকার করে বললেন, আমরা তোমাকে চিনতে পারি নাই। আমাদের মতই তুমি, এই জেনে আত্মীয়তার বুদ্ধিতে কত অপরাধ করেছি। তুমি আমাদের সে সব অপরাধ কিছু নিও না। ভগবান এর উত্তর যা দিয়েছেন, আপনাদের কাছে তা' বলছি। তিনি বললেন, গোপ এবং গোপীগণ, তোমরা আর আমাকে বঞ্চনা করো না। আমি বড় আশা অন্তরে নিয়ে এই ব্রজভূমিতে এসেছি। আমি যেখানে যাই সকলেই আমাকে বড় বড় ব'লে দূরে সরিয়ে দেয়। আমাকে কেউ নিজের করে নেয় না। তোমরা আমাকে তেমন বেদনা দিবে না, এই জেনেই আমার এখানে আগমন। আমি দেবতা নই, আমি গন্ধর্ব নই, আমি দশটা বিশটা মাথা-ওয়ালা দানবও নই, আমি তোমাদেরই আপন জন, তোমাদেরই বান্ধব; আমাকে এইভাবে দেখলেই প্রকৃতপক্ষে আমাকে বড় করা হয়। সজ্জনগণ, ভগবানকে আমরা আত্মা বলে থাকি। আত্মজ্ঞান, আত্মানুশীলন এই সব দার্শনিক বড় বড় কথা আমরা দিনরাত শুনেছি। কিন্তু আত্মা বলতে

নির্দিষ্ট একটা বস্তু নয়, বাতাসের মত একটা ফাঁকা জিনিস নয়। আত্মা বলতে প্রাণতত্ত্বে মাথা বস্তুই বুঝায়। ভগবানকে যদি আমাদের আত্ম-তত্ত্ব স্বরূপে সাধনা করতে হয়, তবে প্রাণবীর্যে পরিস্ফূর্ত পরম মাধুর্যের সম্পর্ক তাঁর সংগে পাতাতে হবে। আমাদের এই মানবীয় বেদনাকেই সনাতন সেই আপন তত্ত্বের সংগে জড়িয়ে ফেলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেই আপনাদের আপন বস্তুর দ্যোতনশীলতা পরিস্ফূর্ত রয়েছে। তাঁর দিব্য জন্ম ও কর্ম এ সাধনার পথেই অভিব্যক্ত হয়ে পড়ে। ভগবান কিভাবে এ জগতে রয়েছেন এবং প্রেমের পরম ছন্দে লীলা করছেন, পরম রহস্যে আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার কথা আপনারা শুনেছেন। কংস কারাগারে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন; কিন্তু ঐশ্বর্য এবং বিভূতি সেখানে ছিল, 'মহার্হ বৈদূর্য কিরীট কুন্তলত্বিষা পরিবক্ত সহস্র কুন্তলম্' তিনি দেবকী ও বসুদেবের কাছে একেবারে ছোট হ'য়ে আসেন নি, জ্ঞানতত্ত্বকে আশ্রয় করে তিনি পরিস্ফূর্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নন্দালয়ে তাঁর প্রকাশ একেবারে ছোট হয়ে সেখানে তাঁর মুখে আর জ্ঞানের ব্যাখ্যা নেই; একেবারে প্রেমের টানে আপনাকে তিনি সেখানেই ধরা দিয়েছেন। এজন্য তিনি নন্দনন্দন। বৃন্দাবনের এই পরম প্রেমেই তাঁকে আমরা একান্ত করে পেতে পারি। বৃন্দাবনের আত্মীয় অনুভূতিতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরা যায়। কারণ এখানে তিনি ধরা দিয়েছেন এবং এইখানে দিব্য লীলা প্রকট হয়েছে; অর্থাৎ শুধু আশ্রিত নয় প্রত্যক্ষতার প্রেমময় সংস্পর্শে তিনি রসময় হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সাধনার বীজ এই বৃন্দাবনেই রয়েছে। এইখানে তিনি আমাদের আপনার হয়েছেন এবং এই লীলা তাঁর নিত্যলীলা। এ লীলাকে নিত্যলীলা এইজন্য বলা হচ্ছে যে, এই পরম প্রীতিময় লীলা রসে মন যদি একান্ত নিষিক্ত হয়, তবে আমাদের মন, বুদ্ধি এবং দেহ পর্যন্ত ভগবানের পরম অনুভূতির যোগ্যতা লাভ করে। এ সব সাধনার বস্তু। সাধনা না করলে বোঝা যায় না; তবে আপনাদের কৃপায় সাধারণ-ভাবে এইটুকু বলা যায় যে, প্রেম বস্তু কি, ভগবানে ভালবাসা বলতে কি বুঝায় আমরা বৃন্দাবনলীলাতেই তার পরিচয় পাই। এই বৃন্দাবনে ভগবান তাঁর শক্তির মূলীভূত আনন্দাংশের পরম স্বরূপ সর্বাংশে প্রকট করেছেন। সে আনন্দের উজ্জ্বাসে জড় বিকার দূরীভূত হয়ে যায়। প্রকৃত-পক্ষে আনন্দই ভগবানের স্বরূপ। সৃষ্টি-স্থিতিসংহার এ সব কাজই তিনি আনন্দে মত্ত হয়েই করেছেন; কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর সে লীলা ধরা পড়ে না। কিন্তু আমাদের মনের মূলে ভগবানের সেই লীলাশক্তিই কাজ করছে। আমাদের মনও সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়—এই তিন স্তরের ভিতর দিয়েই নিজের মালা জপে চলেছে। কিন্তু স্বরূপগত সনাতন আনন্দসত্তার চেতনার সন্ধান সে পায়ে না। এজন্য সব ক্ষেত্রেই সে দেখতে পাচ্ছে বঞ্চনা, সান্ত্বনা তার কোথায় নাই। সুতরাং কর্মের উপশমও তার ঘটে না। তার ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাত পড়ে, কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে। এখন আমাদের মন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের পথে এইভাবে পরাজয়ের মধ্যেই শুধু ঘুরছে। সে গুণের বন্ধনে পড়ে আছে। কিভাবে এই গুণের বন্ধন অতিক্রম করে সে জয়ের রাজ্যে যেতে পারে এই হচ্ছে সাধনা। ঋষভ দেব বলেন, যে পর্যন্ত মন জড় কামনা বন্ধনে আছে, সে পর্যন্ত তার পরাজয় ঘটবেই। সে তার সার্থকতা কোথায়ও পাবে না। শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তিযোগে আত্মনিবেদন না হ'লে আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি হয় না। ভেবে দেখুন, আমরা সকলেই ভগবানকে দয়াময় কৃপাময় এ সব কথা বলছি; তিনিই সব কচ্ছেন, এ সব তত্ত্ব কথাও মুখে মুখে আওড়িয়ে যাচ্ছি; কিন্তু আমাদের অহংকৃত জীবনে কর্তৃত্ব তাঁকে ন্যস্ত কিছুতেই হচ্ছে না। আমাদের মন মুখ যেদিন এক হবে, আমাদের এই সব কথা যথার্থ হবে, সেদিনই আমাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সাধন হবে।

প্রকৃতপক্ষে বচনকে জড়িয়েই আমাদের সকল যতন রয়েছে, আমরা সকলে বচনের আলোকেই রতন খুঁজে চলেছি; কিন্তু দেহগত খণ্ড চেতনা নিয়ে অনিত্যের আশ্রয়ে অসত্য বচনের সংগে আমাদের মনের যোজনা হ'চ্ছে। শুনতে শুনতে একটা ভাব আমাদের মনে জাগে এবং আমরা সংস্কার বশে তাকেই সত্য বলে গ্রহণ করি। কিন্তু যে সব বচন শুনে আমরা চলি তার মধ্যে পূর্ণ আপনত্ব নেই। নেই এ হিসেবে যে, সে আপনত্ব গোপন রয়েছে। সুতরাং সে সব কথাই মিথ্যা; এক কৃষ্ণনামই সত্য। বচনে আপনত্ব চেতন হ'লে আর আমাদের বন্ধন ঘটে না। আপনময় বচন সনাতন বেদনা অন্তরে জাগিয়ে তোলে, তখন আমরা শ্রুতি স্মৃতির পথে আত্মতত্ত্ব লাভে সমর্থ হই। বস্তুতঃ এ জগৎ সবই ভগবানের বচন, তিনি আছেন এই তত্ত্বেরই সঞ্চার। জলে, স্থলে অনলে অনিলে ভগবানের সেই বোলই দোল দিচ্ছে; কিন্তু আমরা তাঁর বোল পাচ্ছি না। এত বোলের ভিতরেও তিনি আমাদের গোল মিটাতে পাচ্ছেন না। তাঁর ধ্বনিতে আমরা আশ্বস্ত এবং প্রীতির সূত্রে আত্মসংস্থিতি লাভ করছি না। শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুধ্যানে আমাদের এই গোল মেটে

যায়। শ্রুতির দ্বার সংস্কার মুক্তভাবে খুলে যায়, সে লীলার মধ্যে প্রেমের এমনই পরম নিগূঢ় সংবেদন রয়েছে যে, তাতে আমাদের নিত্য স্মৃতি উদ্দীপ্ত হয়। অনিত্য দেহগত সংস্কার হতে মুক্ত হয়ে আমরা ভাবময় জীবন লাভ করতে পারি; তখন বিস্ময় ভগবানের বাণীর সংগে আমাদের শুদ্ধ মনের ভাবময় সংগতি ঘটে। জীবনের মূল সত্তার সংগে আমাদের পরিচয় হয়ে যায়। শব্দ ব্রহ্মে নিষ্ণাত হ'য়ে আমরা পরব্রহ্মকে লাভ করতে পারি। কৃষ্ণলীলার অনুধ্যানের এ শক্তি কোথায় রয়েছে? রয়েছে এই সত্যে যে কৃষ্ণ আমাদের সকলের আপন। আমাদের মন সনাতন বেদনায় সেই পরম আপনের জন্যেই উন্মুখ হয়ে আছে। মন রূপ, রস ও গন্ধের যত ব্যথা বহন কচ্ছে, সব সেই আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। আমাদের মনে তাঁর লাবণ্য উদ্ভিন্ন হ'লে জীবনের সর্বাংগীন দৈন্য ঘুচে যায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শ্রুতি সময় সময় বোকা বনলেও সব সময় বোকা নয়; মাথা জিনিস ছাড়া তাতে ঝাকা লাগে না, দেখা এবং চাখা জিনিস ছাড়া শ্রুতি যা শুনে সব ফাঁকা করে ফেলে দেয়। কিন্তু কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণনাম এভাবে ফাঁকা হবার বস্তু নয়; এজন্যেই কানু ছাড়া আমাদের কোন গীত নাই। সকল সুরে কৃষ্ণের লীলারসই আমাদের কানে মধুর হ'য়ে স্ফুরে।

ভেবে দেখলেই বোঝা যায় আমরা শুনেই সব কাজ করছি। শ্রুতিই আমাদের সব বোধ ও অনুভূতির মূলে শক্তি। এই যে আমি আপনাদের কাছে কথা বলছি, এও শুনে। একটা বিন্দু থেকে বচনের ধারা ছন্দ ধ'রে এসে আমাকে নাড়া দিচ্ছে। আপনারা তাতেই আমার সাড়া পাচ্ছেন। কেহ কেহ আমাকে উত্তেজনা ছেড়ে কথা বলতে পরামর্শ দিচ্ছেন; কিন্তু উদ্দীপনা বা উত্তেজনা দু'টির একটি আমাকে ধরতেই হবে। বাহ্যতঃ এ দু'টি ভিন্ন মনে হ'লেও মূলতঃ একই—নির্বিকার। আমার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হয়ে আপনারা কেউ কেউ ধীরভাবে স্থির হ'য়ে আমাকে কথা বলতে অনুরোধ কচ্ছেন; কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব হয় না; কারণ বচনের ধারার ভিতর দিয়ে রসময় যে ছন্দের স্পন্দন আমাকে আপ্যায়ন করছে, তা ছাড়া হ'য়ে যাই, এই ভয়ে আমার মন ধাই ধাই করছে, এজন্য নিজের বিচারে কোন কাজে আসছে না। মনের ক্ষিপ্রতা বেড়ে যাচ্ছে। সে শ্রুতির পথে যে প্রাণপূর্ণ প্রত্যক্ষতার রস পাচ্ছে তা ছাড়তে চাচ্ছে না। তবে আমার এই যে শ্রুতির পথে মনের গতি, আর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার অভিব্যক্তি, এ সাময়িক মাত্র। আমার জড়দেহের সংস্কার সম্পূর্ণ রয়েছে; কিন্তু কৃষ্ণলীলা যাঁর কাছে মধুর হয়েছে, তাঁর পক্ষে দেহগত ও কামাত্মক সংযোগ থাকে না। তিনি নামের মধ্যে কামতত্ত্ব পরিস্ফূর্তরূপে পেয়ে তাতেই ডুবে যান। তাঁর ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়ে যায়। নাম করার সংগে ধাম পাওয়া, কামবীজ তাঁতে মজে যাওয়া এই হলো ভক্তের সাধ্যতত্ত্ব। তিনি শুদ্ধ মননেই নয়, দেহ দিয়েও প্রেমময় ভগবানেরই সংগ করে থাকেন।

সে কথা কি আমার পক্ষে বলা সম্ভব? শুধু এইটুকু বলা যায় যে, ব্রহ্ম আমাদের মন বুদ্ধি অগোচর হ'লেও কৃষ্ণতত্ত্বে তিনি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষময় পরিস্ফূর্ত হয়ে থাকেন। ব্রহ্ম স্বরূপে যিনি জগতে অবস্থান কচ্ছেন; তিনি আমাদিগকে বাড়াতে পাচ্ছেন না; কিন্তু কৃষ্ণরূপে তিনি আমাদের জড়িয়ে ধরে বাড়িয়ে তুলেন। তিনি অধর হ'য়েও আমাদের কাছে ধরা দেন। প্রকৃতপক্ষে এতেই তাঁর ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠা রয়েছে, এই কৃষ্ণ-লীলায়ই তিনি রসময় এবং আনন্দময়। দয়াময়, প্রেমময় তাঁর যত কিছু নাম, যত কিছু পরিচয় এই লীলাতেই তার সমগ্রভাবে সার্থকতা। কৃষ্ণ ভক্তির একমাত্র এই পথেই আমাদের পক্ষে পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ অধিগত হওয়া সম্ভব হতে পারে। ভগবান গীতাতেও এই কথাই বলেছেন।

কথাটা আরও একটু ভেঙে বলবার চেষ্টা করা যাক্। ভগবান আছেন, এ তো ঠিক নইলে এত বড় এ জগৎটা আসল কোথা থেকে। কিন্তু তিনি থেকেও যেন নিজকে ঢেকে ফেলছেন। কিন্তু এই কৃষ্ণলীলায় তিনি নিজকে আর ঢেকে রাখতে পাচ্ছেন না। তাঁর অন্তরংগা আনন্দময়ী হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে সর্বোপাধিকে রসায়িত করে তিনি একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। ভগবানের বচন আমরা শুনছি বটে; কিন্তু সে বচনে তিনি যেন কিছু গোপন রাখছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় এ চাতুরী আর তিনি করে উঠতে পাচ্ছেন না। এখানে বচনের ভিতর দিয়ে তাঁকে তার সর্বস্ব প্রেমধন একেবারে বিলিয়ে দিতে হচ্ছে। যে বচনে প্রাণ নাই, তা প্রাণ হয় না, আর টানও জাগায় না। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভগবানের বচনের প্রাণময় চাতুরী, বিকারশীল আমাদেরও অন্তরে সঞ্চারী হ'য়ে থাকে। তাঁর বচনের অন্তর্নিহিত পরম মাধুর্য আমাদের অবীর্য দূর করতে সমর্থ হয়। আমাদের প্রাণতরংগে সে বচনের বিভংগী তাঁর সংগের আকুতিময় তরংগ তোলে। প্রাণের কেন্দ্রে সে ছন্দোময় ঢেউ উঠলে তিনি ভিন্ন আর কেউ থাকে না। পরম যৌবনের রসের আবেশে হৃষীকেশেই চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ঘটে থাকে।

লীলার রাজ্যে না ঢুকলে আমাদের পক্ষে এসব উপলব্ধি সম্ভব হবে না। এ তো বিচার বা বিতর্কের বস্তু নয়। ভগবান এসেছিলেন, তিনি লীলা করেছিলেন। তাঁর করুণার দিক থেকে এ চেতনা না এলে শুধু তর্কসিদ্ধান্তের জোরে এ সাধনা করা যায় না। স্বামীজী তাঁর ভক্তিযোগে সব কথা ভেংগে বলেছেন, গোপবধূদের সেই প্রেমময় সংবেদন সাধনার সাহায্যে যাঁর অন্তরে জেগেছে, তিনিই এ লীলার রাজ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন। তাঁদের অনুগতির পথেই এই লীলা জীবন্ত হয়ে উঠে। প্রেমের প্রবল টানে ভগবানের সংগে আমাদের দেশ, কাল ও পাত্রগত সব ব্যবধান দূরীভূত হ'য়ে যায়। আমরা এইখানেই আত্মময় পরমপুরুষকে অব্যবধানে লাভ করতে সক্ষম হই। যিনি বড় ছোট সকল জুড়ে সুন্দর আমরা সকল দিয়ে তাঁর সেবা ক'রে জীবন সার্থক করতে পারি। ভগবানের বচন রয়েছে, কিন্তু ব্রজবধূদের প্রেমের বিদ্যুন্ময় স্পন্দন তার সংগে বেজে না উঠলে আমরা সে বচনে আত্মনিবেদন করতে পারি না। তাঁর অন্য কথা আমাদের সংস্কারাবদ্ধ শ্রুতিতে ছাড়া ছাড়া হয়ে যায়, তাঁর ডাক আমরা শুনতে পাই না, মাঝে ফাঁক ফাঁক থেকে যায়। শুধু বৃন্দাবনের বাঁশীর ডাকই আর কোন ফাঁক রাখে না; একেবারে ঝোঁকে এসে আমাদিগকে মেখে ধরে। আমরা বেদে দেখতে পাই, ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন, তোমার কথা মধুর ক'রে বল, কোমল ক'রে বল, আমাদের মন ও দেহকে ঘেষে এসে, আরও নিকট হ'ল। তোমার বলার ভিতরে তোমার দেহটিও ঢালা হ'য়ে যাক্। শব্দব্রহ্মময় বেণু মুখনাম বাজিয়ে যেদিন তিনি বৃন্দাবনে এলেন, সেদিন এই বেদবাক্য সার্থক হ'লো। ছোট হ'য়ে তিনি ধরা দিলেন, স্নেহে জড়িয়ে তাঁর চিন্ময় বিগ্রহ তিনি ফুটিয়ে তুললেন। অন্তরের সমগ্র আদর কন্দলিত করে বৃন্দাবন-বাসীরা তাদের সাধ্যবস্তুকে পেয়ে কৃতার্থ হ'লো।

বৃন্দাবনবাসীরা যা পেয়ে ছিলো, আমরা কি তা পেতে পারি? জানি ও প্রশ্ন উঠবে। আমি বলবো, হ্যাঁ ওক্ষেত্রে বড় ভরসা রয়েছে। মহাপ্রভুর কৃপায় বৃন্দাবনের দুর্লভতত্ত্ব আমাদের পক্ষে সুলভ হয়ে উঠেছে। বৃন্দাবনেও যা ঘটেছিল না, এবার তা ঘটেছে। বৃন্দাবনে সকলে কৃষ্ণের বাঁশী শুনতে পায় নাই। শুধু ব্রজবধূগণ, তাঁদের মধ্যেও যাঁরা 'কৃষ্ণগৃহীতমানসা' তাঁরাই সে বাঁশীর ঘোষাঘোষি ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু বৃন্দাবন মাধুরীর প্রবেশচাতুরী তাঁর প্রেমময় লীলায় সব উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কৃষ্ণনাম তিনি মধুর করেছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণই তাঁর নামের ভিতর সকল মাধুর্য শক্তি নিয়ে এসেছেন। কৃষ্ণকে তিনি আমাদের সকলের ক'রে দিয়েছেন। ব্রহ্ম আর আমাদের অনুমানের বস্তু নেই। মহাপ্রভুর প্রেমের লীলায় ডুবলে আমরা প্রেমময় পরম দেবতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

আজ সেই প্রত্যক্ষতার জন্যই প্রাণ আকুল হচ্ছে। হে দেবতা জানি, তোমার জন্ম নাই; তুমি অজ; তবু আমাদের জন্য তুমি তোমার চিন্ময় মূর্তি নিয়ে জাগো। তোমার প্রেমময় বচনমাধুরীর চাতুরীতে আমাদের ডাকো। ডাকার ভিতরে দেহ মাথা না থাকলে সব যে ফাঁকা হয়ে যায়। তুমি মন, বচন ও বুদ্ধির অগোচর বললে আমাদের সান্ত্বনা নাই। আমাদের মন, বচন, বুদ্ধি যা ধ'রে বিকারী হ'চ্ছে, তার মূলে তো তোমারই চাতুরী রয়েছে। সে চাতুরী যদি গোপনে গোপনে তুমি না চালাতে তবে তো আমরা যা পেয়েছি, তাতেই আমাদের সান্ত্বনা মিলতো। কিন্তু তুমি ছাড়ছো না, দূরে থেকেও তুমি আমাদের নিকটে রয়েছ। অন্তর্যামী স্বরূপে তুমি আত্মভাবে আমাদিগকে প্রভাবিত ক'চ্ছ ব'লেই আমাদের মন অনিত্য ও অসত্যকে ধ'রে একান্তভাবে শান্ত থাকতে পাচ্ছে না। এ তোমারই কুহক, এই কুহক কাটিয়ে পরম মাধুরীতে তুমি সব ভাবে সঞ্চারী হও। আমরা তোমাকে দেখতে চাই, আমরা তোমাকে পেতে চাই। বস্তুতঃ তোমাকেই শুধু দেখা যায়, প্রত্যক্ষতার তুমিই একমাত্র পরম বস্তু। সেই প্রত্যক্ষতার পরমরসে আমাদের অহংকারকে উদ্দীপ্ত করে তুমি আবির্ভূত হও—

"শৃংগার-রসসর্বস্বং শিখি-পিঞ্ছবিভূষণং
অংগীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্।"

টাকী রামকৃষ্ণ মিশনে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিপি।

কলিকাতার প্রেক্ষাগার ও দর্শক

কলিকাতার প্রেক্ষাগারগুলির বিরুদ্ধে—বিশেষ করে বাঙালী পাড়ার প্রেক্ষাগারগুলির বিরুদ্ধে—চলচ্চিত্র দর্শকদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত অভিযোগ আছে। এই পুঞ্জীভূত অভিযোগেরই একটা বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছিলাম ৭ই সেপ্টেম্বর, রবিবার চিত্রা প্রেক্ষাগারের সম্মুখে। সেদিন যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার ফলে পুলিশকে গুলিবর্ষণ পর্যন্ত করতে হয়েছিল। দর্শকদের সহিংস আক্রমণের ফলে চিত্রার অনেক ক্ষতিও হয়েছে। আমরা অবশ্য দর্শকদের এই সহিংস আচরণ সমর্থন করি না। কিন্তু যে কারণে এই সহিংস আচরণ তার মূলোদ্ঘাটন করে যথোচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা কর্তব্য বলে মনে করি।

চিত্রগৃহগুলির বিরুদ্ধে দর্শকদের যে অভিযোগ তা প্রধানত সিনেমা টিকেটকে কেন্দ্র করে। কেমন করে জানি না বাঙালী পাড়ার অধিকাংশ চিত্রগৃহের টিকিট অবলীলাক্রমে গুণ্ডা নামক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের হাতে গিয়ে পড়ে। এদিকে চিত্রগৃহের সম্মুখে যখন টাঙানো থাকে "হাউস ফুল" তখন হয়ত দেখা যায় যে, প্রচুর চড়া দামে প্রকাশ্য রাজপথে ঐ চিত্রগৃহেরই সম্মুখে সেই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা টিকেট বিক্রী করছে এবং অত্যুৎসাহী দর্শকরা সেই টিকেট কিনছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চৌরঙ্গী অঞ্চলস্থিত ইংরেজী ছবির প্রেক্ষাগারগুলিতে এই চোরাকারবারের উৎপাত নেই। এ অবস্থায় চিত্র-দর্শকদের মনে অভিযোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাঁরা যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও টিকেট পান না, তখন এই সব টিকেট অবলীলাক্রমে চোরাকারবারীদের হাতে যায় কি করে? এর মধ্যে প্রেক্ষাগারে টিকেট বিক্রয়কারী ও পুলিশের সঙ্গে গভীর ষড়যন্ত্রের সন্ধান যে পাওয়া যায় সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পুলিশের পক্ষ থেকে এই চোরাকারবার বন্ধ করার জন্যে এ পর্যন্ত কোন চেষ্টা তো হয়ই নি—প্রেক্ষাগারের মালিকগণও নিজেদের কর্মচারীদের সম্বন্ধে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভব করেন নি। এই সব ব্যাপার সম্মুখে রেখেই আমাদের চিত্রাগৃহের সম্মুখস্থ জনতার উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কথা বিচার করতে হবে।

এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কুফল অনেক আছে জানি। তবে এর একটা সুফলও ইতিমধ্যে ফলতে আরম্ভ করেছে। দর্শকদের পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টিকারী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি প্রেক্ষাগারগুলির মালিক ও পুলিশ বিভাগের দৃষ্টি সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাঁরা এই চোরাকারবার বন্ধ করার বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁদের এ

প্রচেষ্টার সফলতা নির্ভর করবে তাঁদের চেষ্টার অকৃত্রিমতা ও ঐকান্তিকতার উপর।

চিত্রার দুর্ঘটনার প্রতিবাদে বেঙ্গল মোশন পিকচার এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত মালিকবৃন্দ সাময়িকভাবে তাঁদের চিত্রগৃহগুলির দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁরা পুনরায় চিত্রগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন কলিকাতার

'নৌকাডুবি' চিত্রের নায়িকা মীরা সরকার

সংবাদপত্র সম্পাদকদের একটি সাংবাদিক সম্মেলনও আহ্বান করেছিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, তাঁরা সিনেমা টিকেটের চোরাকারবার বন্ধ করতে চান। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা কলিকাতা পুলিশের সর্ববিধ সাহায্য পাবেন বলে নাকি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেদের দিক থেকেও সতর্কতা অবলম্বনের ব্যবস্থা করেছেন। সে ব্যবস্থা এই:—প্রধানত নিম্নশ্রেণীর টিকেট নিয়ে বেশী চোরাকারবার চলে বলে তাঁরা চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট অগ্রিম বিক্রয় করা বন্ধ করে দিয়েছেন। এই দুই শ্রেণীতে সিনেমা দেখতে হলে অতঃপর ঠিক 'শো'র পূর্বে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে টিকেট কিনে সরাসরি প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতে হবে। অতঃপর প্রয়োজন হলেও আর ইণ্টারভ্যালের পূর্বে হলের বাইরে আসা চলবে না। একেবারে বন্দীদশা। দ্বিতীয়ত প্রেক্ষাগারের অসাধু কোন কর্মচারী যাতে চোরাকারবারীদের কাছে টিকেট বিক্রয় না করতে পারেন সেজন্যে তাঁরা কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তাঁরা এই সব ব্যাপারে জনসাধারণ ও সাংবাদিকদের সক্রিয় সহানুভূতি প্রার্থনা করেছেন। আমরাও তা দিতে প্রস্তুত আছি। জানি এই ব্যবস্থায় অনেক অসুবিধা আছে। যেমন ধরুন, স্বল্পবিত্ত ঘরের মেয়েরা যাঁরা এতকাল অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের তৃতীয় শ্রেণীর টিকেটে বাড়ীর পুরুষদের সঙ্গে সিনেমা দেখতেন। তাঁরা এখন সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। তাঁদের পক্ষে পুরুষদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকেট কিনে সিনেমা দেখা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এ সব অসুবিধা মেনে নিলেও এর দ্বারা সিনেমা টিকেটের চোরাকারবার বন্ধ হবে কিনা গভীর সন্দেহের বিষয়। প্রথমত উৎকোচলোভী পুলিশ চোরাকারবারী গুণ্ডাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে—এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে কি? দ্বিতীয়ত স্বল্পবেতনভোগী টিকেট বিক্রয়কারীরা কিছুটা উদ্বৃত্ত আয়ের লোভে চোরাকারবারীদের কাছে টিকেট বিক্রয় করবেন না—এ বিষয়েই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তৃতীয়ত চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট বাদ দিলেও অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যের টিকেট নিয়ে চোরাকারবার চলবে।

সিনেমা টিকেটের চোরাকারবার বন্ধ করার ব্যাপারে তিনটি দিক আছে। একটি হল চিত্রগৃহের মালিকদের দিক, একটি দর্শকদের দিক এবং অপরটি আইন ও শৃঙ্খলারক্ষক পুলিশের দিক। এই তিন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারলেই শুধু পুরোপুরি এই চোরাকারবার বন্ধ করা চলে বলে আমি মনে করি। প্রেক্ষাগারের মালিকরা যদি কর্মচারীদের অসাধু উপায়কে প্রশ্রয় না দেন, পুলিশ যদি চোরাকারবারী গুণ্ডাদের ধরে যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং দর্শক সাধারণ যদি অন্যায় মূল্যে চোরাকারবারীদের নিকট থেকে টিকেট না কেনার প্রতিজ্ঞা করেন, তবেই শুধু স্থায়ীভাবে এই চোরাকারবার বন্ধ হতে পারে। তা নইলে সাময়িকভাবে এই চোরাকারবারে ভাঁটা পড়লেও সুযোগ বুঝে এই জিনিসটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

ষ্টুডিও সংবাদ

পরিচালক রতন চ্যাটার্জি মুভি টেকনিক্ সোসাইটির একখানি নূতন ছবি পরিচালনা করবেন। ছবিখানির নাম 'বুড়ী বালামের তীরে'। কাহিনীকার মন্মথ রায়।

* * * *

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুসন্ধান' নামক কাহিনী অবলম্বনে চিত্ররূপার পরবর্তী চিত্র গৃহীত হবে। পরিচালনা করবেন বিজলীবরণ সেন।

* * * *

গীতিকার পরিচালক প্রণব রায়ের পরিচালনায় এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরবর্তী চিত্র 'রাঙা-মাটি'র কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে বলে প্রকাশ।

ফুটবল

আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। বাহিরের কোন দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতেছে না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাঠে প্রতিদিন আশানুরূপ দর্শক সমাগত হইতেছে। কলিকাতার অবস্থা বর্তমানে একরূপ স্বাভাবিক। সুতরাং খেলা দেখিবার জন্য দর্শকগণের ভীড় আরও বৃদ্ধি পাইবে, বলাই বাহুল্য।

শহরের শান্তি বজায় রাখিবার জন্য একদল অতি উৎসাহী পৌর সভার সভ্য শীল্ড খেলা বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই খুবই সুখের বিষয়। এই সকল আন্দোলনকারী কতখানি জ্ঞানহীন তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। আশা হয় ভবিষ্যতে ইহারা আর এইরূপ কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

শীল্ড প্রতিযোগিতায় বাহিরের দল যোগদান না করায় কেহ কেহ বলিতেছেন "ঠিক জমিতেছে না।" ইহাদের উক্তির প্রতিবাদে বলিতে হইলে অনেক কিছু বলিতে হয়। আই এফ এ-র কর্তৃপক্ষগণ বাহিরের দলসমূহকে যোগদান করিতে না দিয়া কোনরূপ অন্যায় করেন নাই। প্রতিযোগিতার ব্যয়ের ভার কমাইবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। এইরূপ সময় খেলার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আই এফ এ কর্তৃপক্ষগণ যে বিশেষ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। বাহিরের দলসমূহ প্রতি বৎসর শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া যে অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন তাহার কিছু কম করিতে নিশ্চয়ই রাজি হইতেন না। তাঁহাদের সেই দাবী মিটাইতে গিয়া গত এক বৎসর ধরিয়া আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলী সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্য যেরূপ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা পূরণ করিতে কোনরূপেই সক্ষম হইতেন না। পরিণামে হয়তো বা দেনাগ্রস্ত হইতে হইত। আগামী বৎসরে ভারত হইতে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবল দল প্রেরিত হইবে। ভারতীয় দলে বাঙলার কয়েকজন খেলোয়াড় স্থান পাইবেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। সুতরাং সেই সকল বাঙলার মনোনীত খেলোয়াড়দের জন্য আই এফ এ-কেই অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। শীল্ড প্রতিযোগিতার সময় বাহিরের দলসমূহের চাহিদা মিটাইতে যদি সকল অর্থ ব্যয় হইয়া যায় তাহা হইলে কিরূপে দেশের খেলোয়াড়দের সাহায্য করিবেন?

বাঙলার বাহিরের ফুটবল ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে বর্তমানে খুব উন্নত নহে তাহার প্রমাণ রোভার্স প্রতিযোগিতায় পাওয়া গিয়াছে। আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে খেলা হঠাৎ বন্ধ না হইয়া গেলে মোহনবাগান দলকে কাপ বিজয়ী হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখা যাইত। রোভার্সের পরিচালকগণ পুনরায় এই প্রতিযোগিতার অবশিষ্ট খেলাগুলি অনুষ্ঠিত যাহাতে হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এমন কি মোহনবাগান দলকেও বোম্বাইতে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় লোক প্রেরণ করিয়াছেন। মোহনবাগান দল যদি যায় পূর্বের ন্যায় খেলিতে পারিবে না। দলের অনেক খেলোয়াড়ই বোম্বাই যাইতে পারিবে না। অধিকাংশই চাকরী করে। একবার ছুটি লইয়া দীর্ঘদিন অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় কিছুদিনের জন্য ছুটী পাইবে, ইহা মনে হয় না। তাহা ছাড়া দেশের শীল্ড খেলা ফেলিয়া বিদেশে অনেকেই যাইতে স্বীকৃত হইবে না। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার পরিচালক পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের হঠাৎ সমস্ত খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়াটাই অবিবেচনার কার্য হইয়াছে।

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত বিজয় মার্চেণ্ট যাইবেন না ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে। অমরনাথ দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। অমরনাথ অধিনায়কতা করিবার যে সম্পূর্ণ যোগ্য তাহার প্রমাণ গত ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় বহু খেলায় তিনি দিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতীয় দলের ব্যাটিং শক্তি খুবই কমিয়া গেল। বিজয় মার্চেণ্ট একা দলের অর্ধেক শক্তি ধরেন। দলের জয় পরাজয় অনেক সময়েই তাঁহার খেলার উপর নির্ভর করিয়াছে। কন্ট্রোল বোর্ড তাঁহার পরিবর্তে একজন বিচক্ষণ উৎসাহী ব্যাটসম্যান পাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ করা না হইলেও আমরা ধারণা করিতে পারি সে কে। কিন্তু তাহা হইলেও জোর করিয়া বলিব "মার্চেণ্টের স্থান পূরণ করা অসম্ভব।"

ছয় মাস পূর্বে যখন দল নির্বাচিত হয় তখন কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই মার্চেণ্ট দলের সহিত যাইবেন না। এমন কি দেড় মাস পূর্বেও মার্চেণ্টের অসুস্থতার কথা কেহই জানিতেন না। পুণায় শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই সংবাদ প্রকাশিত হইল মার্চেণ্ট অসুস্থ। এইজন্য এখনও পর্যন্ত অনেকের দৃঢ় ধারণা মার্চেণ্টের এই অসুস্থতার পশ্চাতে গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। প্রকৃতই তিনি অসুস্থ নহেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহাকে অসুস্থ এই কথা প্রচার করিতে বাধ্য করিয়াছে। ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকগণ তাঁহার সহিত এমন সব আচরণ করিয়াছেন যাহার জন্য তিনি মর্মাহত হইয়াই এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। কেহ কেহ বা বলিতেছেন "দলের ম্যানেজারই ইহার জন্য বিশেষ দায়ী।" তিনি নাকি ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ আচরণ করিয়াছেন যাহা করিবার অধিকার তাঁহার নাই। বিজয় মার্চেণ্ট নাকি সেই সকল বিষয় বোর্ডকে জানাইয়া কোনই সদুত্তর পান নাই। আমরা জানি না এই সকল অভিযোগ অনুযোগ কতখানি সত্য। যদি সত্যই হইয়া থাকে বিজয় মার্চেণ্টের উচিত ছিল তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া। বোর্ড ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করিলেও জনমত বিহিত ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিতেন। এই ভ্রমণের উপর ভারতীয় ক্রিকেটের মান-সম্মান নির্ভর করিতেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থকে এইরূপ ক্ষেত্রে কেহই স্থান দিতেন না। এখনও সময় আছে সকল সমস্যার সমাধান করার। কেবল ইহার জন্য প্রয়োজন বিজয় মার্চেণ্টের সৎসাহস। কিন্তু তিনি সেইরূপ দৃঢ় মন লইয়া সকল কিছু সর্বসাধারণকে বলিবার জন্য আগাইয়া আসিবেন বলিয়া মনে হয় না। অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য দল শক্তিহীন হইলে ইহাই পরিতাপের বিষয়।

ব্যায়াম সম্মেলন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের পরিচালকগণ নিখিল বঙ্গ ব্যায়াম সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্মেলন আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। সারা বাঙলার ব্যায়াম পরিচালকদের ও বিভিন্ন ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে যোগদান করিতে আহ্বান করা হইয়াছে। এই সময় বিরাট এক প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই প্রদর্শনীতে স্বাস্থ্য বিভাগ, শিল্প বিভাগ, কৃষি বিভাগ, মৎস্য চাষ বিভাগ, কুটির শিল্প বিভাগ, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি বহু বিষয় থাকিবে। এই সম্মেলনের সময় জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক ও যুবতী ১২ দিনব্যাপী এক শিবিরে যোগদান করিবেন। এই শিবিরে নিয়মানুবর্তিতা, সংগঠন, সাধারণ ব্যায়াম, প্রাথমিক প্রতিবিধান, ব্রতচারী, সামরিক কুচকাওয়াজ আত্মরক্ষার কৌশল ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। এমন কি এই শিবিরবাসীদের দ্বারাই নাকি পরিচালকগণ নানা প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহের নিখুঁত ছবি দর্শকগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন। ইহা ছাড়া এই সম্মেলনের সময় কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, বাস্কেটবল, ভলিবল, জিমন্যাস্টিকস্, ভারোত্তোলন, ব্যাডমিণ্টন, হাডু-ডু, গাদী প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। এই সকল প্রতিযোগিতার সাফল্যমণ্ডিত দল বা ব্যক্তিকে বঙ্গীয় চ্যাম্পিয়ান খ্যাতি দেওয়া হইবে।

এই সম্মেলনের সময় ভারতের বহু বিশিষ্ট নেতা আসিবেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের ও দেশীয় রাজ্যের ব্যায়াম বিভাগের প্রতিনিধিগণও সমবেত হইবেন। এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় এইরূপ সম্মেলন বাঙ্গলা দেশে ইতিপূর্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

দেশী সংবাদ

৮ই সেপ্টেম্বর—ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী যথাক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও মিঃ লিয়াকৎ আলী খান কর্তৃক প্রচারিত এক যুক্ত বিবৃতিতে পাঞ্জাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন করিবার জন্য অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

দিল্লী সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে ইতঃস্তত আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু গতকল্য দিল্লীর উপদ্রুত অঞ্চল সফর করিবারকালে জনৈক গুণ্ডার সম্মুখীন হন। এই ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতেছিল। পণ্ডিত নেহরু আক্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য দৌড়াইয়া ঘটনাস্থলে যান এবং দুর্বৃত্তের নিকট হইতে তরবারিখানি ছিনাইয়া লন।

ভারত সরকারের রেলওয়ে বিভাগ কর্তৃক কলিকাতার উপকণ্ঠ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ট্রেণ চলাচলের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ও গবর্ণমেণ্টের সহিত এই বিষয়ে সহযোগিতা করার নিমিত্ত অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে কর্পোরেশনের নয়জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

বীরেশ্বর ঘোষ (১৬) নামক একজন স্কুলের ছাত্র গত সপ্তাহে কলিকাতায় শান্তি শোভাযাত্রায় শান্তির বাণী প্রচার করিবারকালে আহত হয়। গতকল্য শম্ভুনাথ হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৯ই সেপ্টেম্বর—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজ এক স্মরণীয় দিন। ৩২ বৎসর পূর্বে এই দিনে বাঙলার বিপ্লবী-চেতনার মূর্তবিগ্রহ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও তাঁহার সহকর্মিগণ বালেশ্বর বুড়িবালাম নদী তটে বৃটিশ শক্তির সহিত সর্বপ্রথম সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। অদ্য সেই ৯ই সেপ্টেম্বরের পুণ্যতিথিতে কলিকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি জাতির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট সভায় যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার চারিজন সহকর্মীর স্মৃতি যথাযোগ্যভাবে রক্ষা করার জন্য ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। যতীন্দ্রনাথের নামে ডালহৌসী স্কোয়ারের নাম এবং গ্রে স্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করার জন্য এবং উক্ত স্কোয়ারে যতীন্দ্রনাথের একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কলিকাতা কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার হয় না, হত্যা দ্বারা হত্যা প্রতিরোধ করা যায় না। তিনি বলেন, জনসাধারণ যেরূপ আচরণ করিতেছে তাহা উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব।

করাচীতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের ফলে গত রাত্রিতে ৮জন নিহত ও ৭জন আহত হয়।

১০ই সেপ্টেম্বর—মহাত্মা গান্ধী অদ্য দিল্লী ও সহরতলীর উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। দিল্লীতে সৈন্যদের গুলীতে ৮ জন হাঙ্গামাকারী নিহত হয়।

পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট গতকাল পূর্ববঙ্গ শিক্ষা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। অধুনা ঢাকায় যে ইণ্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আছে, এতদ্দ্বারা পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। এখন হইতে এই বোর্ডে প্রবেশিকা ও উচ্চতর মাদ্রাসা সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিবে। নব সৃষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে বিভিন্ন শিক্ষায়তনের প্রতিনিধি থাকিবে; অর্ডিন্যান্স জারীর সঙ্গে সমুদয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়াছে।

বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুত সুশীলকুমার দাশগুপ্ত গত ৩রা সেপ্টেম্বর শান্তি প্রচার করিতে গিয়া দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে আহত হইয়াছিলেন। অদ্য শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর—পাতিয়ালায় সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পাতিয়ালায় দাঙ্গা বাধিলে মিলিটারী গুলী চালনা করে, ফলে ১০৫ জন নিহত এবং ৮০ জন আহত হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ থামাইতে গিয়া দুইজন সৈনিক নিহত এবং অপর দুইজন আহত হইয়াছে।

১২ই সেপ্টেম্বর—পূর্ব পাঞ্জাবের জলন্ধর নগরীতে ব্যাপক লুঠতরাজ চলে। রায়পুর আক্রমণে উদ্যত এক জনতাকে প্রতিহত করা হয় এবং সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়। কপুরতলা ও জলন্ধরের মধ্যে আশ্রয়প্রার্থী-বাহী একখানি ট্রেণকে লাইনচ্যুত করা হয়।

পশ্চিম পাঞ্জাবে লাহোরের অবস্থা শান্ত থাকে। ফিরোজপুর জেলায় রায়বিন্দের দক্ষিণে অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থী একখানি ট্রেণ আক্রান্ত হয়। সৈন্যদের দ্বারা আক্রমণকারী দলের বহু লোক হতাহত হয়।

বাঙলার বিপ্লবী নেতা শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির স্মৃতি সপ্তাহ উপলক্ষে তাঁহার প্রতি জাতির শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অদ্য কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়। বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত মজুমদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশবাসীকে যতীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া অর্জিত স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী করার জন্য আহ্বান জানান।

বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। দীর্ঘ দশ বৎসরকালের বহির্বাসের পর শ্রীযুত চ্যাটার্জি এই প্রথম বাঙলায় আসিলেন।

১২ই সেপ্টেম্বর—আরও ৪ জন নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া পূর্ব বঙ্গীয় মন্ত্রিসভাকে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। এই চারিজন নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন—(১) মিঃ আবদুল হামিদ (শ্রীহট্ট); (২) মিঃ হাসান আলি (দিনাজপুর); (৩) মিঃ সৈয়দ মহম্মদ আফজল (পিরোজপুর, বরিশাল) এবং (৪) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ মহম্মদ হবিবুল্লা বাহার (ফেণী)।

মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লীতে তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে সীমান্ত হইতে উদ্বেগপূর্ণ নানা সংবাদ পাওয়া যাইতেছে বলিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। মহাত্মাজী বলেন, সীমান্তের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুত গিরিধারীলাল পুরী অবিলম্বে তাঁহাকে এবং তাঁহার পত্নীকে ঐ স্থান হইতে সরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার নিকট একখানা তার পাঠাইয়াছেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর—নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা একটা গুরুতর বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় সাড়ে বার লক্ষ লোক পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে পূর্ব পাঞ্জাবে আসিয়াছে এবং অনুরূপ সংখ্যক লোক পূর্ব পাঞ্জাব হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবে গমন করিয়াছে। বর্তমানে উভয় পাঞ্জাবে সম্ভবত পাঁচ লক্ষ লোক স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছে এবং সম্ভবত আরও পাঁচ লক্ষ লোক স্থানান্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ইহার অর্থ এই যে, উভয় দিকের অন্তত ৪০ লক্ষ লোককে সরাইয়া আনা হইয়াছে অথবা সরাইয়া আনার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর—ইণ্ডিয়া গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্নমেণ্ট বাঙলা ও পাঞ্জাব সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্তের সর্তাদি সুবিধামত উপায়ে পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক।

অদ্য লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে পূর্ব পাঞ্জাব হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবে এবং পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে পূর্ব পাঞ্জাবে আশ্রয়প্রার্থীরা যাহাতে স্বাধীন ও নিরাপদে যাইতে পারে তজ্জন্য উভয় গবর্নমেণ্ট অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মহীশূর কংগ্রেস সত্যাগ্রহের তৃতীয় ডিক্টেটর শ্রীযুত নিজলিনগাপ্পাকে মহীশূরে গ্রেপ্তার করা হয়। মহীশূরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতার উপর পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে তিন জন নিহত ও দশ জন আহত হইয়াছে।

কলিকাতায় গড়ের মাঠে শান্তি সেনাবাহিনীর এক বিশেষ সমাবেশকে সম্বোধন করিয়া পশ্চিম বঙ্গের গবর্নর চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী বলেন যে, শৃঙ্খলা ও শুভবুদ্ধিতে সমগ্র ভারতে বাঙলা দেশ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১০ই সেপ্টেম্বর—ফরাসী হাই কমিশনার মঁ এমিল বলার্ট অদ্য ঘোষণা করেন যে, ইন্দোচীনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন পরিচালনার দায়িত্ব ফ্রান্স ত্যাগ করিয়াছে। উপযুক্ত শাসকদের হস্তে সরকারী কার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত রহিয়াছে।

১২ই সেপ্টেম্বর—তেহরাণ হইতে রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, তেহরাণস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্যকে তাহার নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা কার্যে সর্বথা সাহায্য করিবে বলিয়া ঘোষণা করার ফলে পারস্যের উত্তর সীমান্তে তিন ব্যাটেলিয়ান যন্ত্র সজ্জিত সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া অদ্য জানা গিয়াছে। পারস্যের উত্তর সীমান্তবর্তী সোভিয়েট এলাকায় প্রবল সামরিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। দিবারাত্রি ট্যাংক, মেসিনগান ও সন্ধানী আলোর মহড়া চলিতেছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মার্শাল এক বক্তৃতায় বলেন যে, জাতিপুঞ্জ পরিষদের অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি দল গ্রীসে অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিবেন। যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়া কর্তৃক গ্রীস গেরিলাদিগকে সাহায্যদানের উল্লেখ করিয়া মিঃ মার্শাল বলেন যে, এতদ্দ্বারা গ্রীসের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে।

যমজ ভগ্নীর ভাগ্যের লিখন

সবিতার বাবা নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করলেন একটি যুবককে যাকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে, মেয়ের জন্য যোগ্য পাত্র বটে।

আহারের সময় আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার দাঁতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথা উঠলো। সবিতার মন যুবকটির প্রতি আকৃষ্ট হলেও আহার শেষ হতে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো, কারণ সে তো জানতো তার দাঁতের অবস্থা কী।

সবিতার মনে ছিল যে তার দিদির দাঁত নিজের মনোমত দাঁতের মাজন দিয়ে পরিষ্কার করার ফলে কতটা সুন্দর ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল। খাওয়া শেষ হতেই সে ছুটে গেল স্নানের ঘরে এবং কলিনোস দিয়ে দাঁত মেজে ফেললো। পরিবর্তন দেখে তখনি সে স্থির করলো যে কলিনোস ছাড়া আর সে দাঁত মাজবেই না।

সবিতার বিয়ের আর বিলম্ব নাই—সেই সঙ্গে কলিনোস্-এর কথাও আর চাপা রইলো না যে তা দাঁত পরিষ্কার করতে কতটা উপযোগী।

KOLYNOS

কলিনোস্-এ সাশ্রয় অনেক—টুথব্রাশের উপর আধ ইঞ্চি পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলে।

K 1-3-BEN
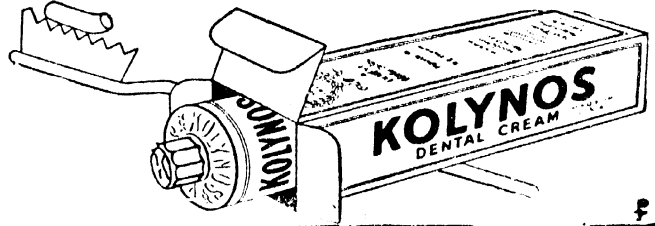
বাং দেশের মেয়েদের দীর্ঘ বলিষ্ঠ ও বিস্তৃত প্রদেশের স্বল্পকেশী কেশরাশি অন্যান্য দেশের প্রশংসার বস্তু। স্বভাবতই বাঙ্গালী মেয়েদের কেশবিন্যাসে বিভিন্ন মৌলিক পদ্ধতি দেখা যায়। আজ আর পুরাণো ধরণে কবরী বন্ধনের প্রচলন নেই।

কেশের এই সৌন্দর্য বজায় রাখতে কেশ-তৈল বাঙগালী মহিলাদের পক্ষে একটি অপরিহার্য প্রসাধন সামগ্রী। কেশের বৃদ্ধি ও সজীবতা যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, রূপচর্চায় কেশের স্থানই যদি সর্বোচ্চ হয়, তা হলে কেশমূল যাতে সতেজ থাকে, তার জন্য বিশিষ্ট কেশ তৈল দ্বারা তা নিয়মিত ঘর্ষণ করতে হবে। **বাথগেটের** পরিস্কৃত ও স্নিগ্ধ—গন্ধযুক্ত **ক্যাষ্টর অয়েল একশো পঁয়ত্রিশ বৎসর** ধরে কেশচর্চায় সুনাম অর্জন করে আসছে। আপনার নিকট এর দাবী সেই সুনামের উপরই প্রতিষ্ঠিত।
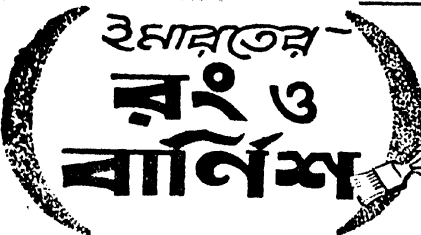
বাথগেটের
সু বা সি ত
ক্যাষ্টর অয়েল

পাকা চুল কাঁচা হয়

(Govt. Regd.)

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের সুগন্ধিত সেন্‌ট্রাল মোহিনী তৈল ব্যবহারে সাদা চুল পুনরায় কাল হইবে এবং উহা ৬ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। অল্প কয়েকগাছি চুল পাকিলে ২॥০ টাকা, উহা হইতে বেশী হইলে ৩॥০ টাকা। আর মাথার সমস্ত চুল পাকিয়া সাদা হইলে ৫৲ টাকা মূল্যের তৈল ক্রয় করুন। ব্যর্থ প্রমাণিত হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

দীনরক্ষক ঔষধালয়,

নং ৪৫, পোঃ বেগুসরাই (মুঙ্গের)

শেষ সুযোগ!

নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চাইতেও কম দামে এখনও পাওয়া যায়। যে-কোন মূল্যে ভবিষ্যতে কলম পাওয়া অসম্ভব হইবে; কেননা, ভারত সরকার বিদেশ হইতে আমদানী বাতিল করিয়াছেন।
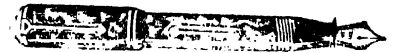
বিশ্ববিখ্যাত কলম	নিয়ন্ত্রিত মূল্য	বিক্রয় মূল্য
পার্কার '৫১' গোল্ড ক্যাপ ...	৬৩৲	৬১৲
ঐ '৫১' সিলভার ক্যাপ ...	৫৩৲	৪৮৲
ঐ ব্লু ডায়মণ্ড ...	৩৭৲	৩৬৲
শেফারস গোল্ড ক্যাপ ক্রেস্ট ...	৬৩৲	৬১৲
ঐ সিলভার ক্যাপ সেন্টিনেল ...	৫৩৲	৫১৲
ঐ লাইফটাইম ভ্যালিয়াণ্ট ...	৫৩৲	৫১৲
ঐ লাইফটাইম স্টেটসম্যান ...	৪২৲	৪১৲
ঐ মিডিয়াম	২৭৲	২৫৲
ঐ জুনিয়ার	২১৲	২০৲
এভারশার্প স্ট্রীম লাইনার ...	১৮৲	১৭৲
ঐ লাইফটাইম	২৪৲	২২৲
ঐ লাইফটাইম গোল্ড ক্যাপ ...	৪৫৲	৩৫৲
সোয়ান সেল্‌ফ ফিলার ...	১৩॥০	১৩৲
ঐ সুপিরিয়র রেগুলার ...	১৬৲	১৪॥০
ওয়াটারম্যান নং ৫১৫ ...	২৪৮০	২৪৲
ষ্ট্যাটফোর্ড রিজেন্সী	৭৲	৬॥০
এভারলাষ্ট	৬॥০	৫॥০

ইউ এস এ'র সস্তা মূল্যের বিভিন্ন কলম— অর্ডিনারী ৩৮০, গোল্ড প্লেটেড নিবসহ ৫৲ সুপিরিয়ার ৭॥০, সলিড গোল্ড নিবসহ ৯৲, অত্যুৎকৃষ্ট কোয়ালিটি ১২৲, রেগুলার (টিউব-বিহীন) পেন ৫॥০, সুপিরিয়ার ৭৲ টাকা। ডাক ব্যয় অতিরিক্ত। সস্তা মূল্যের বিভিন্ন কলমের মধ্য হইতে ৬ বা ততোধিক কলম লইলে শতকরা ১২॥০ টাকা হারে কমিশন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ওয়াচ কোং

পোষ্ট বক্স ৬৭৪৪ (ডি-১), কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সূচীপত্র

শারদীয়া সংখ্যা—১৩৫৪

পূজাসংখ্যা 'দেশ' অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের রচনা ও কুশলী শিল্পিবৃন্দের অঙ্কিত চিত্রাদিতে সমৃদ্ধ হইবে এবং মহালয়ার পূর্বেই বাহির হইবে।

স্বনামধন্য লেখকগণের লেখা ছাড়াও এবারের পূজাসংখ্যা দেশ কয়েকটি বিশেষ কারণে সবিশেষ আকর্ষণীয় হইবেঃ

১। সাহিত্যাচার্য প্রমথ চৌধুরী লিখিত "বিলাতের চিঠি"—

লেখকের বিলাতে পাঠকালীন (১৮৯৩—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ) লিখিত এই সুদীর্ঘ পত্রগুলিতে তৎকালীন বিলাতের নানা কৌতূহলোদ্দীপক আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

২। নিম্নলিখিত শিল্পীগণের অঙ্কিত রঙিন ছবিতে এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হইবে ঃ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নন্দলাল বসু
বিনায়ক মাসোজি

তাহা ছাড়া নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত বহুসংখ্যক স্কেচ্-চিত্রে শারদীয়া দেশ সুসজ্জিত হইবে।

৩। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "কলাবনের কলা" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ রসরচনা এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

এই সংখ্যায় যাঁহারা গল্প লিখিয়াছেন ঃ

প্রেমেন্দ্র মিত্র
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রবোধকুমার সান্যাল
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
মনোজ বসু
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্র—না—বি
সতীনাথ ভাদুড়ী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুমথনাথ ঘোষ
সুশীল রায়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
নবেন্দু ঘোষ
প্রভাত দেব সরকার
আশু চট্টোপাধ্যায়
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
লীলা মজুমদার
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি

এই সংখ্যার প্রবন্ধলেখকগণঃ

ক্ষিতিমোহন সেন
ডক্টর সুকুমার সেন
পশুপতি ভট্টাচার্য
কনকভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
উমা রায়
অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
অমরেন্দ্রকুমার সেন
বনানী চৌধুরী প্রভৃতি

কবিতা লিখিয়াছেন ঃ

কালিদাস রায়
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
নিশিকান্ত
জীবানন্দ দাস
অজয় ভট্টাচার্য
অজিত দত্ত
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
হরপ্রসাদ মিত্র
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
বিমলচন্দ্র ঘোষ
অরুণ সরকার
আশরাফ সিদ্দিকী
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
গোপাল ভৌমিক
মৃণালকান্তি দাশ
সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত
গোবিন্দ চক্রবর্তী
করুণাময় বসু
দেবেশচন্দ্র দাশ
প্রভৃতি

মহালয়ার পূর্বেই বাহির হইবে।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ২॥০ টাকা, রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে ২৸০ ভি, পি, যোগে পাঠানো সম্ভবপর হইবে না।
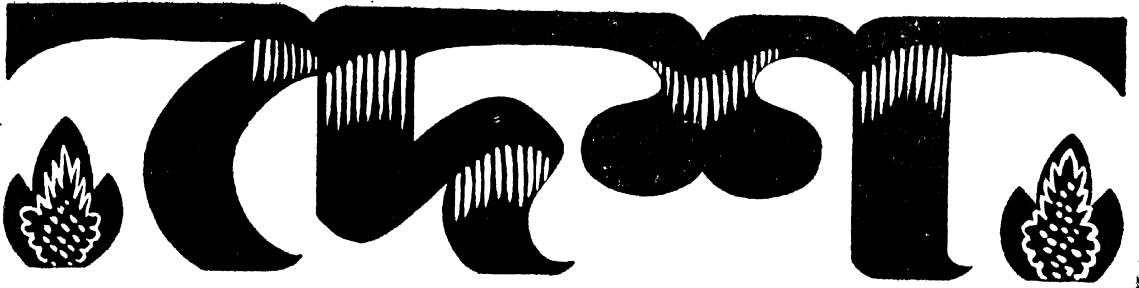
সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ ।   শনিবার, ১০ই আশ্বিন, ১৩৫৪ সাল।   Saturday, 27th September, 1947.   [৪৭শ সংখ্যা

শুভবুদ্ধির সঞ্চার

গত ১৯শে এবং ২০শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে দেশের বর্তমান বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্বন্ধে আলোচনা চলে। এই আলোচনার ফলে উভয় গভর্নমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে উভয় রাষ্ট্রে নিরাপদে বাস করিতে পারে, সেজন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হইবেন। তাঁহারা একটি যুক্ত বিবৃতিতে এই কথা বলিয়াছেন যে, "ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধের ধারণা সৃষ্ট হইলে তাহা শুধু যে নৈতিক দিক হইতে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করিবে, তাহা নহে, পরন্তু তাহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের ভয়ানক ক্ষতি ঘটিবে। এইরূপ অবস্থায় তাঁহাদের সুদৃঢ় অভিমত এই যে, বিশেষ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিদ্বেষ এবং পক্ষপাতিত্বমূলক বিবৃতির ফলে উত্তেজনা ও বিরোধের ভাব সৃষ্টি হইতে পারে, এজন্য ঐরূপ বিবৃতি যাহাতে প্রদত্ত না হয়, তৎপ্রতি তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন।" উভয় রাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে এই বিবৃতি যে সর্বতোভাবে সমীচীন এবং সময়োপযোগী হইয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সেদিন সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে যে কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। তিনি বলেন, ভারত গভর্নমেণ্ট এবং পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট—এই দুইয়ের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। দিল্লী হইতে এ পর্যন্ত যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে নিষ্ঠা-বুদ্ধির পরিচয়

পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই ধাপ্পাবাজী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে তিনি তাঁহার অভিভাষণেও সেই কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণের এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে অধিক দূর যাইতে হয় না। পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের কর্ণধারগণের মধ্যে কয়েকজনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ অনুধাবন করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে। পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া মিঃ জিন্না পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্য কামনা করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের এখনও বেশ স্মরণ আছে। বস্তুত সে বক্তৃতা পড়িয়া আমাদের স্বতঃই মনে হইয়াছিল যে, মিঃ জিন্না বুঝি নূতন মানুষ বনিয়া গিয়াছেন এবং অতঃপর তাঁহার রাজনীতিক কার্যকলাপে অভিনব এক অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শ অভিব্যক্ত হইবে; কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই আমাদের সে ধারণা দূর হইল। ইহার পর কায়েদে-আজম জিন্না সাহেব পূর্ব পাঞ্জাবের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া এক বিবৃতি দিলেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রে পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের উপর অত্যাচারের কথা একেবারে চাপিয়া গেলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। মিঃ জিন্না পরিচালনাধীন পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট দিল্লীর অশান্তি সম্বন্ধে ইহার পর যে বিবৃতি প্রদান করিলেন, তাহাও একদেশদর্শিতাপূর্ণ এবং ভারত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজনাসৃষ্টিকর। তারপর মিঃ জিন্নার অনুগত দল আসরে অবতীর্ণ হইলেন। মিঃ ফিরোজ খাঁ নূন পাঞ্জাব মুসলিম লীগের অধিবেশনে যে তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন, তাহাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের জন্য মুসলমান সমাজকে আহ্বান করাই বলা চলে। এই সভায় পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলীর বক্তৃতাও সমভাবে আপত্তিজনক। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বলিয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু হিসাব এইখানেই শেষ হয় নাই। মিঃ গজনফর আলী খাঁ পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী। পূর্ব পাঞ্জাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেণ্টের পরিচালনাধীন অবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নির্মমভাবে নিহত হইতেছে, অথচ পশ্চিম পাঞ্জাবে ততটা হয় নাই, স্বকপোলকল্পিত এক হিসাব উপস্থিত করিয়া তিনি একটি বক্তৃতায় ইহাই ব্যক্ত করেন। ইহার পর পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের দূতের দলের প্রচার-ব্রত আরম্ভ হইল। স্যার জাফরউল্লা খাঁ বিশ্ব-রাষ্ট্র সংসদের পাকিস্থানের প্রতিনিধিস্বরূপে তর্জন-গর্জন করিয়া বলিলেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর অত্যাচার করিতেছে, যদি তাহা বন্ধ না হয়, তবে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-রাষ্ট্র সংসদে অভিযোগ উপস্থিত করিব। পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের আমেরিকাস্থ প্রতিনিধি মিঃ হাসান ইস্পাহানীও সমভাবে ওয়াশিংটনের এক বিবৃতিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করিয়া ইহার পর একটি বিবৃতি প্রদান করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লীগ

নেতৃগণ, মুখে যাহাই বলুন, পাকিস্থান সম্পর্কে তাঁহারা কার্যত এ পর্যন্ত তাঁহাদের পূর্বতন 'টেকনিক' বা চাতুরীই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে ভিত্তি করিয়া তাঁহারা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এখনও সেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ-পূর্ণ নীতি প্রয়োগেই পাকিস্থান বজায় রাখিতে চাহিতেছেন। তাঁহারা যত যুক্তিই উত্থাপন করুন না কেন, সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা অসংস্কৃত ও অমার্জিত মনোবৃত্তিজনিত বর্বরতা বলিয়াই মনে করি। এই বর্বর হিংস্র মনোভাবজড়িত নীতির ফলে ভারতে বহু নির্দোষ নরনারীর রক্তপাত ঘটাইয়া তাঁহারা পাকিস্থান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব নীতি হইতে তাঁহারা এখনও নিরস্ত হইতেছেন না ইহাই দুঃখের বিষয় এবং আমাদের সমূহ আশঙ্কার কারণ। তাঁহাদিগকে আমরা এই কথাই বলিব যে, শুধু হিংসা বা বিদ্বেষের পথে কোন রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়িয়া তোলা যায় না; পক্ষান্তরে তাহার ফলে সমাজের নৈতিক ভিত্তি ভাঙিয়া পড়ে এবং মানুষ পশুতে পরিণত হয়। উদ্দাম পশুবৃত্তিতে সমাজের সংস্থিতি সম্ভব হয় না; বস্তুত অপরকে আঘাত করিবার জন্য উদ্যত অস্ত্র পরিশেষে সেক্ষেত্রে নিজদিগকেই আহত করে। দিল্লীতে পরামর্শ সভায় যোগদানকারী পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিগণ যদি এতদিনেও এই সত্য আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং অতঃপর তাঁহাদের কথায় ও কার্যের সত্যই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, তবে আমরাই সর্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইব।

স্বদেশপ্রেম ও সাম্প্রদায়িকতা

সম্প্রতি ঢাকা শহরে পূর্ব পাকিস্থান যুব সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল। এই সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মৌলবী হবিবুল্লা বাহার অনেক ভাল কথা বলিয়াছেন। বাহার সাহেবের অভিমত এই যে, যুবকদের স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আমরা শুধু এইটুকু বলিয়াই সন্তুষ্ট নহি। আমরা বলিব, তাহাই বর্তমানে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। কিন্তু এই সম্পর্কে এ সত্যটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা খাপ খায় না। ফলত স্বদেশপ্রেম এবং সাম্প্রদায়িকতা পরস্পরবিরোধী বস্তু। যুবকদের মনে স্বদেশপ্রেম সত্যই যদি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হয়, তবে রাষ্ট্রের সম্প্রদায়নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর প্রতি যাহাতে তাহাদের অন্তরে দরদ জাগে, রাষ্ট্র-নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, পূর্ব পাকিস্থান যুব সম্মেলনের সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া যে সকল মুসলমান স্বাধীনতার জন্য প্রাণদান করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন; কিন্তু এক্ষেত্রে হিন্দুদের কথা তিনি সম্ভবত সুবিধাজনকভাবেই সতর্কতার সঙ্গে চাপিয়া গিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য মুসলমানেরা প্রাণদান করিয়াছেন, আমরা একথা সহস্রবার স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহাদের সেই সংগ্রামে তখন পাকিস্থানের প্রশ্ন উঠে নাই। ভারত হইতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং সেজন্য শুধু তাঁহারাই সংগ্রাম করেন নাই, হিন্দুরাও সংগ্রাম করিয়াছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার যুবকদের দান ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে হিন্দু যুবকেরাই মুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, প্রধানত আত্মোৎসর্গ-কারী এই যুবক দলের সঙ্কল্পশীল বৈপ্লবিক সংগ্রামের ফলেই ইংরেজ এদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা মর্যাদায় যাহাতে তথাকার উভয় সম্প্রদায়ের যুবকই উদ্দীপ্ত হয়, সভাপতির অভিভাষণের তাৎপর্য এমন হইলেই আমরা অধিকতর সুখী হইতাম। বস্তুত স্বদেশপ্রেমকে পূর্ব পাকিস্থানের সমাজ-জীবনে সম্প্রসারিত করিবার পক্ষে রাষ্ট্র-স্বার্থগত উদার আদর্শকেই ভিত্তি করিতে হইবে। এক্ষেত্রে উপদলীয় স্বার্থের ঘোঁট কাটাইয়া নেতাদের বাহির হওয়া দরকার এবং পদ, মান ও প্রতিষ্ঠার লোভ সে বেলায় সঙ্কোচ করিলে চলিবে না। ঢাকার যুব সম্মেলন শুধু মুসলমান যুবকদের জন্য ছিল না। সে সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে সভাপতি অপেক্ষাকৃত দূর অতীতের ঐতিহ্যে নিরুদ্দেশ অভিযান করিয়া বৃহত্তর ভারতের পটভূমিকায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য মুসলমানের অবদানের কথাই শুধু উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত আধুনিক অপরিসীম ত্যাগের কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সভাপতি সম্ভবত এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবকদের ত্যাগের কথা যদি তিনি উল্লেখ করেন, তাহা হইলে লীগের মহিমা হয়ত ক্ষুণ্ণ হইবে এবং কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তাঁহার এইরূপ আশঙ্কার বস্তুত কোন কারণ ছিল না। পূর্ব পাকিস্থানের কংগ্রেস-নেতৃগণ নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দেশ অনুসারে পাকিস্থানের আনুগত্যই একান্তভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; সুতরাং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা মর্যাদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবদান-স্বীকৃতিতে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য প্রতি-পালনে তাঁহাদের দায়িত্ব এবং মমত্ববোধই বিশেষভাবে জাগ্রত হইত।

অন্নসংকটের প্রতিকার

পূর্ববঙ্গে দারুণ অন্নসংকট দেখা দিয়াছে। পূর্ববঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর সমৃদ্ধি ও বদান্যতার উপরই পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহার ও আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নির্ভর করিতেছে। কিন্তু সিন্ধু ও পাঞ্জাবে বর্তমানে যে ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়াছে, তাহা মানুষের ধারণাতীত। সুতরাং পূর্ববঙ্গের আসন্ন সংকট অত্যন্তই গুরুতর। এই সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। পশ্চিম বাঙলার সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর মতে পশ্চিম বঙ্গে দুর্ভিক্ষ ঘটিবার বিশেষ কোন আশঙ্কা নাই। তবে কলিকাতা ও অন্যান্য কয়েকটি রেশন অঞ্চলের সম্বন্ধে উদ্বেগের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার উক্তি অনুসারে খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজ যদি আশানুরূপ সাফল্যলাভ না করে, তবে উক্ত অঞ্চলসমূহে বর্তমানে যে পরিমাণে রেশন দেওয়া হইতেছে, তাহা অব্যাহত রাখা সম্ভব হইবে না। খাদ্যশস্য এখনও মজুত আছে; কিন্তু লোকে লাভের আশায় তাহা ছাড়িতেছে না, মন্ত্রী মহাশয় স্পষ্টভাবেই একথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহাদের হাতে খাদ্যশস্য মজুত আছে, তাঁহারা যদি অবিলম্বে বাজারে ছাড়ে, তবেই বর্তমানের এই সংকট কাটিয়া যায়। শ্রীযুত ভাণ্ডারী কৃষক ও মজুতদারদিগকে এই সঙ্কটকালে ধান-চাউল গভর্নমেণ্টের কাছে সঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের সরকারও খাদ্যশস্য সংগ্রহের উপর জোর দিতেছেন এবং মজুত-দারদিগকে খাদ্যশস্য ছাড়িতে অনুরোধ করি-তেছেন। ইঁহাদের এই সব অনুরোধ যদি রক্ষিত হয়, খুবই ভাল; কিন্তু আমাদের এই বিশ্বাস যে, লাভখোর ও মজুতদারেরা ১৯৪৩ সালের ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, তাহাতে এই সব অনুরোধে বিশেষ কোন কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহারা পূর্বের মতই সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সঙ্গে যোগ দিয়া নিজেদের রাক্ষসী বৃত্তি চরিতার্থ করিবে এইরূপ আশা করে। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু অনুরোধ নয়, কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন হইলে আইনের বলে মজুত শস্য লাভখোরদের গুদাম হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে। একদিকে মানুষ পোকা-মাকড়ের মত না খাইয়া মরিবে, আর অন্যদিকে লাভখোর, আর চোরা-

কারবারী দলের উৎসব আরম্ভ হইবে, আমাদিগকে যেন বাঙলা দেশে এ দৃশ্য আর না দেখিতে হয়। শাসন বিভাগের দুর্নীতির ফলেই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে এদেশের শাসকেরা অমানুষ, আমাদিগকে যেন এমন কথা না শুনিতে হয়। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ উভয় রাষ্ট্রের শাসকগণও মজুতদার ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, জনসাধারণ সর্বতোভাবে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন। আমরা এই আশা করি যে, মজুতদার ও চোরাকারবারীরা সমাজের সর্বত্র ধিকৃত ও নিন্দিত হইবে। একজন লোকের ঘরেও অন্ন থাকিতে বাঙলা দেশে কেহ যেন অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। দেশবাসিগণ এবং শাসকেরা উভয়েই এদিকে সমানভাবে দৃষ্টি রাখুন। মানবতা বলিতে কেবল দুর্বলকে রক্ষা করাই নয়, যাহারা দেশের লোকের দুর্গতির কারণ ঘটাইতেছে, বস্তুতঃ তাহাদিগকে দমন করাতেই মানবতার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষিত হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, এতদিন আমরা নিজেদের কর্তব্যের এই শেষোক্ত দিকটার উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করি নাই; পরাধীনতা আমাদের মানবোচিত দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধকে অভিভূত করিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সে কর্তব্যবোধে আমাদিগের কর্মসাধনাকে প্রণোদিত করিতে হইবে। আজ দুর্গতকে রক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দুষ্প্রবৃত্তিকেও সংযত করিতে হইবে।

যুবকদের সুযোগ

পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেণ্ট বাঙালী যুবকদিগকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। বাঙলার শান্তিরক্ষা কার্যে অংশ গ্রহণে যুবকেরা এই যে সুযোগ লাভ করিয়াছে, আমরা আশা করি, তাহারা উপযুক্তভাবে তাহাতে সাড়া দিবে। পুলিশ বিভাগে যোগদান করিতে হইলে দৈহিক পরিমাপের যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, বাঙলা দেশের যুবকদের মধ্যে তাহা অনেকেরই আছে বলিয়া আমরা মনে করি; সুতরাং সেদিক হইতে যথেষ্ট সংখ্যক যুবক পাইতে সরকারকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে না। তবে অস্ত্র শিক্ষার দিক হইতে কাহারও কাহারও ত্রুটি থাকিতে পারে। আমরা আশা করি, শুধু অস্ত্র চালনায় শিক্ষিত নহে বলিয়াই কাহাকেও অযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে না। সেক্ষেত্রে আমরা গভর্নমেণ্টকে দুই-তিন মাস সময় দিয়া যুবকদিগকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করিয়া লইতে অনুরোধ করিব। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বাহিনী বাঙালী যুবকদিগকে লইয়া পুরাপুরি রকমে গঠিত হয়, সরকারকে আমরা সর্বতোভাবে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলি। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করিবার মত লোক বাঙলা দেশে নাই, বাঙালীরা অস্ত্র ধরিতে পারে না এবং জানে না, বিদেশী শাসকদের মুখে এই ধরণের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। মূলত তাহাদের সেসব যুক্তির কারণ কোথায় ছিল, তাহা আমাদের জানা আছে। বাঙালী যুবকেরা দেশের শাসনবিভাগের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সংশিলষ্ট হয়, তাঁহারা ইহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। আজ দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সুতরাং বাঙালী যুবকদের মধ্যে আত্মরক্ষার শক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে এখন কোন বাধা নাই।

জন্মাষ্টমীর মিছিলে বাধা

অতীতে ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল সম্পর্কে অনেক অনর্থ ঘটিয়া গিয়াছে। বর্তমান বৎসরে কোনরূপে অনর্থ ঘটিবে না, অনেকেই এইরূপ আশা করিতেছিলেন। লীগ তাহার কাঙ্ক্ষিত পাকিস্থান লাভ করিয়াছে, অতঃপর রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঢাকার এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া ঐক্য ও সৌহার্দের ভাবই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে অনেকেই এইরূপ আশা করিতেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা যেরূপ হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের ক্ষেত্রে ভারতে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকাতে সেই আদর্শ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে ইহাই আমাদের আশা ছিল। পূর্ববঙ্গের গভর্নমেণ্ট এজন্য চেষ্টাও যথেষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইতে পারে নাই। গত ৫ই আশ্বিন ঢাকায় জন্মাষ্টমীর প্রথম মিছিল বাহির হয়। মিছিল আধ মাইল অগ্রসর হইয়া নবাবপুরের সেতুর কাছে গেলে কতকগুলি লোক মসজিদের সামনে বাদ্য বন্ধের মামুলি অজুহাত উপস্থিত করিয়া মিছিলে বাধা দেয়। বলা বাহুল্য, গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে পুরাপুরি লাইসেন্স লইয়া মিছিল বাহির হইয়াছিল; শুধু তাহাই নহে, মিছিলের অগ্রগমনে যাহাতে কোন বাধা না ঘটে, এজন্য গভর্নমেণ্টের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ঢাকা লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাহাতে ছিলেন। তাঁহারা আপত্তি উত্থাপনকারীদিগকে নিবৃত্ত করিতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সব অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের অনুরোধও তাহারা অগ্রাহ্য করে এবং মিঃ জিন্নার নামের দোহাইতেও বস্তুজ্ঞান জ্ঞান করে নাই। সুতরাং আপত্তিকারীরা পাকিস্থান সরকারের আইনের চেয়ে নিজেদের সাম্প্রদায়িকতার জিদকেই বড় বলিয়া মনে করে। শেষটা আইন ও শান্তিরক্ষাকারীদিগকে অনর্থ এড়াইবার ভয়ে সেই জিদের কাছেই হার মানিতে হয়। বস্তুত এইরূপ অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে যাহাই ঘটুক, সাম্প্রদায়িক জিদের কাছে আইনের মর্যাদা লাঘবের এই নীতি যেখানে সাধারণভাবে সরকারকে মানিয়া চলিতে হয়, সেখানে জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের কোন মূল্যই থাকে না। পূর্ব পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের কর্ণধারগণ এবং ঢাকার মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ এক্ষেত্রে সমীচীন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। মিছিলের গতিতে বাধাদানের মত প্রবৃত্তি যাহাতে না দেখা দেয়, পূর্ব হইতে এমন ব্যবস্থা পাকাপাকি রকমে তাঁহাদের করা উচিত ছিল। পাকিস্থান রাষ্ট্রের কল্যাণবোধে উদ্দীপ্ত যুবকদিগকে লইয়া গঠিত শান্তি বাহিনীসমূহের সাহায্যে যদি উপযুক্তভাবে শান্তির আবহাওয়া সর্বত্র অক্ষুণ্ণ ভাবে এবং শান্তির আবহাওয়া সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিতেন, তবে আকস্মিকভাবে এই আপত্তি উঠিতে পারিত না। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড দলের নেতা মিঃ মোহাজের সেদিন মহাপুরুষোদিত ভাষায় তাঁহার বাহিনীর উপর অনেক উপদেশ বৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু ঢাকার এই ব্যাপারে তাঁহার গার্ডেরা কোথায় ছিল? যাহা হউক, জন্মাষ্টমীর মিছিলের এই ব্যাপার বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই এবং ইহা লইয়া ঢাকায় সাম্প্রদায়িকতার বর্বর দৌরাত্ম্যের বিভীষিকা বিস্তৃত হয় নাই, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু এই ব্যাপারের ভিতর দিয়া অনর্থের যে ইঙ্গিত আসিয়াছে, আমরা আশা করি, পূর্ব পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ তৎপ্রতি অবহিত হইবেন। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল যদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত এবং এই সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সৌহার্দ্য সূচিত হইত, তবে সমগ্র পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে তদ্দ্বারা আশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব দৃঢ় হইয়া উঠিত এবং এই একটি ব্যাপারই পূর্ব পাকিস্থানের সমাজ-জীবনে একটা স্থায়ী প্রভাব সঞ্চার করিতে সমর্থ হইত। সে সুযোগ নষ্ট হইল দেখিয়া শান্তিকামী মাত্রেই দুঃখিত হইবেন; কিন্তু এই ব্যাপার যদি আমাদিগের ভদ্র নাগরিক জীবনের কর্তব্য নির্ধারণে সাহায্য করে, তবে ইহারও সার্থকতা কিছু আছে। রাষ্ট্রনীতি জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, গণতান্ত্রিকতার ইহাই স্বরূপ। আমরাও সেকথা স্বীকার করি; কিন্তু সে জনমত গুণ্ডাদের মত নিশ্চয়ই নয়। গুণ্ডামির কাছে মানসিক ও নৈতিক পরাজয়ের দুর্গতি হইতে ভগবান এদেশকে রক্ষা করুন।

কবির ধর্ম ও 'আয়ভার টাওয়ার'র স্বরূপ

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

"কবে আমি বাহির হলেম
তোমারি গান গেয়ে,
সে তো আজকে নয়,
আজকে নয়।"

কবি প্রথম যখন বাহির হোল নিজের মানব-সীমানার বাহিরে তখন পৃথিবীর স্তিমিত ঊষাকাল, অন্ধকার-আলোর মিতালি। ডাকলো তাকে চারিদিক, ডাকলো তাকে আকাশ চন্দ্রসূর্য-নীহারিকা তারা। আদি মানুষের প্রথম অনুসন্ধান তাই জ্যোতিষ। সেই আদিকালেই তার চেতনা হোল, তার সম্বন্ধ শুধু মানুষের সঙ্গে নয়, তার মিতালি করবার উপকরণ ছড়ানো রয়েছে বিশ্বচরাচরে। গান দিয়ে খুঁজলো সে, কল্পনা দিয়েও খুঁজলো ক্ষুদ্র এতটুকু মানুষের বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনের ডোর। কাব্য তার ফুটে উঠলো ঝকমকে, তার এই সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসে গড়ে উঠলো ধর্ম। বিশ্বকে খুঁজতে গিয়ে বাহির-দৃষ্টিপ্রবণ কবি গড়লো অতিকথা (myth), সে সূর্যকে দিলে সপ্তাশ্ববাহিত রথের বিভূতি, স্বর্গ গড়লো নানা উপকরণ অলংকার ঐশ্বর্যে, আর ধরায় গড়লো বিশ্বনাথের মন্দির। কবি উপনীত হোল ভূমানন্দে। মৃন্ময়ী ধরিত্রীকে সে চিন্ময়ী মাতার রূপদান করলে।

কবি যে পথই অনুসরণ করুক না কেনো, তার প্রাণধারা প্রবাহিত একই খাতে। কালে কালে কবির এ প্রয়াস, এ মহা অভিযান আর থামেনি। মর্ত থেকে স্বর্গে যাবার সোপান হোল তার যাগযজ্ঞ, নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া। অতিকথা দিয়ে মানুষ অধিকার করলো বিরাট বিশ্বকে, পেলো মহান সত্য, লাভ করলো গভীরতম বিশ্বাস যে যোগ আছে তার সকল সৃষ্টির সাথে, যোগ আছে তার বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গেও। এই অতিকথার অন্তরেই পুষ্টিলাভ করলো হিন্দু চৈনিক গ্রীক এবং অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা। তাদের নিজস্ব কাব্য দর্শন গড়ে উঠলো। ক্রমে ধর্মের প্রভাবের মালিন্যে অনুষ্ঠান বড়ো হয়ে উঠলো। অনুষ্ঠান হোল আর্টের জন্মদাত্রী। আর্টের অন্তর থেকে উত্থিত হোল বিজ্ঞান।

মানুষের সকল অধিকারের মধ্যে দিব্য-দৃষ্টি ও দূরদর্শন মহত্তম। কর্ম প্রার্থনা দুরাভিলাষ সকলের চেয়েও সে দুটি বড়ো। এই বিশাল মানবসম্বন্ধে বিশ্বাসী কবির গভীর চেতনা হোল, মানুষ তো ছোট নয়, তার ভাগ্য-লিপিতে লেখা নেই কেবলমাত্র জন্ম মৃত্যু আহার অন্বেষণ, তার অদৃষ্ট বিরাট। কবির মুখে তাই প্রথম বাণী জাগলো, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ,—ওরে অমৃতের পুত্র, শোন তোর ভাগ্যের কথা, ত্বমসি নিরঞ্জনঃ,—তুই মহান, মহান তোর বিশ্বের অধিকার, মহান তোর সম্ভাবনা। তোর ক্ষয় নেই, সম্যক মৃত্যু নেই তোর ললাটে লেখা।

মানুষ যেখানেই থাক, সে যে জাতিরই হোক না কেনো, তার পথ যতোই ভিন্ন হোক, তার প্রাণধারার প্রবাহটি এক। তাই কবিতে কবিতে এতো মিল, দিব্য দর্শনে বিভেদ নেই। কবি তাই সকল লোকের আপনার নিধি। কবির কাজ নিজের প্রাণশক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেওয়া। এ কর্মে জাতি ধর্ম ভাষা, কোন বিভেদেরই বাধা নেই। কবির প্রাণশক্তি মানব-হৃদয়ে কাজ করে ফেরে দেশ হতে দেশান্তরে, যুগ হতে যুগান্তরে, সাড়া জাগে কালে কালে, কেননা এ প্রাণশক্তির মৃত্যু নেই। বাধা তাকে রুদ্ধ করে না, অপচয় নেই তার কোথাও।

একদা শাক্যমুনির বাণী জগতে ছড়ালো, ধর্মের শরণাগত হও। মানুষ সমান, তার ছোটবড় নেই, বর্ণবিভেদ নেই। বুদ্ধের পথ অনুসরণ করলেন লাওৎসু, কনফ্যুসিয়াস্। তাঁরা প্রচার করলেন, মানবতাই শ্রেষ্ঠ নিধি। মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধ সবচেয়েও বড়ো কাম্য, সব চেয়েও বড়ো মানবধর্ম। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এলেন আর এক চীনা দার্শনিক মেহ্-তি। তিনি যীশুরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রচার করলেন, বিশ্বকে ভালো-বাসো, ভালোবাসাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম কর্ম। যিশুর অনেক আগে মেহ্-তি বলে গেলেন, নিজের মতো করে তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো। এ সকল বাণীর প্রভাব চৈনিক জীবন থেকে কোনদিন লুপ্ত হয়নি। চীনারা আজো জানে যে জীবন ও আর্ট এক, পৃথিবী ও স্বর্গ এক। তাদের লক্ষ্য এই ধরাতেই, এখানে, স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা। এই বাণীর প্রভাবে তারা জীবনে শান্তি সমতার দৃষ্টি লাভ করেছে, যার কারণে অনেক সংঘাত সত্ত্বেও চৈনিক সভ্যতা আজও ম্লান হয়ে যায়নি।

সেই আদিকালে গ্রীক কবি পিথাগোরাস বাণী বিতরণ করলেন, মানুষই মাপকাঠি এ বিশ্বের নানা প্রয়োজনে, নানা কর্মে। ইতিহাসের বন্ধনীতে পিথাগোরাসের মূর্তি ঝাপসা হয়ে গিয়েছে কিন্তু তাঁর বাণী এখনো শক্তি হারায়নি। এখনো সেটি নবীন উত্তেজনায় মানুষের চিত্তকে দোলায়। ও-বাণী, আমাদের কর্ম লাভ করি আর না করি, এখনো আমরা পরমতম সত্য বলে মানি, মানুষের আদর্শ ও লক্ষ্য বলেও জানি। মানুষের প্রয়াস আছে ওই লক্ষ্যে উপনীত হবার। পিথাগোরাসের বলার কথা, মানুষই জীবন ও জ্ঞানের স্রষ্টা, নিজের নিরিখে জগতকে গঠন করবার কারুশিল্পী। পিথাগোরাসের সমসাময়িক আর এক গ্রীক দার্শনিক কবি, হিপিয়স মানব জীবনের সমগ্রতার গান গেয়ে গেলেন গেটে রবীন্দ্রনাথের কয়েক সহস্র বছর আগে।

তারপর আবির্ভাব হোল যীশুর নাজারীনের। তাঁর বাণী ভালোবাসার, প্রীতির, শান্তির। সার্মন অন দি মাউণ্ট সেই পুরাণতম বাণী,—অমৃতস্য পুত্রাঃ। যীশু জগতের প্রথম কর্মকবি, কারণ, তিনি তাঁর বিরামহীন সকল কর্মে নিজেরই বাণীর আদর্শে তাঁর স্বল্প নশ্বর জীবন অতিবাহিত করে গেছেন।

কবি অতুলপ্রসাদের মুখে তাঁর স্বরচিত গান শুনেছিলুমঃ—

"প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল লো বধূ
ঘোমটাখানি খোল।
আছি আজ পরাণ মেলি দেখব বলি
তোর নয়ন সুনিটোল।"

অতুলপ্রসাদের বহু বহু শতাব্দী আগে প্রকৃতির মুখ দেখবার উদগ্র আশায় সারা জীবন অধীর উন্মাদনায় যাপন করে গেছেন লেনার্দো দা ভিঞ্চি। তাঁর জীবনীকার বলছেন যে, নারী গর্ভে এমন মানুষ আর জন্মগ্রহণ করেননি যাঁর সঙ্গে দা ভিঞ্চির তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের উত্তরাধিকার দা ভিঞ্চি তাঁর কি অপরি-মেয় দানের দ্বারা সমৃদ্ধ করে গেছেন তার আলোচনা এখানে অবান্তর। তাঁর জীবনীকার আরো বলছেন, আরব্যোপন্যাসে যা কল্পনা-বিলাস দা ভিঞ্চি অনুরূপ কল্পনাবিলাসকে সত্যে পরিণত করে গেছেন সুখবেদনা, আলো-ছায়া একাধারে স্থাপন করে কিয়ারসক্যুরোর (Chiaroscuro) পথ দিয়ে।

কবির মানসভ্রমণ হয়তো অধিকতরভাবে ঊর্ধ্বপানে কিন্তু দা ভিঞ্চির দৃষ্টি আবদ্ধ ছিলো মর্তে। জীবনকে প্রকৃতিকে তিনি কি ভাবে, কি নিবিড় আগ্রহে দেখতে চেয়েছেন তাঁর ছবি এঁকেছেন হ্যাভ্‌লক এলিস।—জীবন যেনো এক নিবিড় অন্ধকারময় গুহা, সেই গুহা-মুখে মাথা নত করে, চোখের ওপর করতল রেখে, একটা হাঁটু মুড়ে সেই গভীর অন্ধকার-পানে দৃষ্টি আবদ্ধ করে আছেন বর্ণ-কবি, স্থপতি-কবি, যন্ত্রবিশারদ-কবি লেনার্দো দা ভিঞ্চি। সেই অন্ধকার থেকে তাঁর চোখে জীবনের প্রকৃতির রহস্য ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

অনেক শতাব্দী পার হয়ে আসি রবীন্দ্রনাথে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বুকে প্রীতির মানবপ্রেমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন যাঁরা তাঁদের সংখ্যা কম নয়। মানবসম্পদ, ভাবের সকল ঐশ্বর্য জড়ো হয়েছে রবীন্দ্রনাথে। মানব ইতিহাসে দা ভিঞ্চিই তাঁর একমাত্র তুলনা। বোধকরি দা ভিঞ্চি ছাড়া তাঁর সঙ্গে তুলনা করবার মতো মানুষ নারীগর্ভে আর জন্মায়নি। নিরবধি কালের ভাবসম্পদ তাঁর জন্য আসন রচনা করে রেখেছিলো। সেই ভাবসম্পদ যে প্রাণশক্তি জড়ো করেছিলো তার উত্তরাধিকারী হলেন রবীন্দ্রনাথ। আর কোন মানুষ এ বিশাল উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ করে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। আর কোন মানুষ বোধকরি বিশ্বের অধিকারকে এতো নিবিড় করে পায়নি। দা ভিঞ্চি অন্ধকার গুহায় নিবদ্ধদৃষ্টি হয়েছিলেন, একদা কবি রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হলেন আলোকের রাজ্যে, তাঁর মাথা গিয়ে ঠেকলো "মেঘের মাঝখানে।"

গঙ্গাজল দিয়েই এই বিপুল প্রাণগঙ্গার গোমুখী উৎস নির্ণয় করিঃ

"এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এলো বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্য, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্য অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। সেই যে মহামানব, তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে,—কিন্তু সকলের মধ্য দিয়ে। এই যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো; এ আহ্বান কোথা থেকে? এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভেতর দিয়ে, সংস্কারের ভেতর দিয়ে,—ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়।"

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।

* * *

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে।

* * *

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ কী গান।
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখো আমার মুখপানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে।
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে
অরুণ-কর দিয়ে মুকুট দেন শিরে
নিজের গলা হতে কিরণ-মালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি পরে
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।"

"সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না ওরা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম,—যেখানে আছে চিরকালের মানুষ। তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম, সে এমন কিছু যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। যে-মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম, অমনি পরম সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম। মানব সম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন।"

নরদেবতার কল্পনা করেছে একমাত্র ভারতবর্ষ, তাই আদিকাল হতে ভারতের সকল কবির অর্ঘ্য এসে জড়ো হয়েছে নরদেবতার দুয়ারে। রবীন্দ্রনাথ সে অর্ঘ্য বিচিত্র করে সাজিয়ে এনেছেন, তাই বলছেন, "আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।" কবি আরো বলছেন, "(আমার লেখার) সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য সেই মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদ-বুদ্ধি স্খালন করার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

এই প্রীতির প্রয়োজন, প্রীতির চোখে সমগ্র করে দেখা ভারত ও চীনদেশের সার্মন অন দি মাউন্টের অনেক পূর্বেকার পুরানতম বাণী। কবির মহামানবের প্রতি অর্ঘ্যে আর নাজরেথের যীশুর মহিমাময়ী বাণীর আমি কোন পার্থক্য খুঁজে পাইনি। ঐক্যের ধারায় সবই এক, পরমতম সত্য। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ পাদপীঠে যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান। তাঁর জীবনের সমগ্রতায় বাণীর প্রমাণ বহন করছে আমাদের আত্মা। শোকেদুঃখে, সুখ আনন্দে, ভয় উল্লাসে তাঁর বিপুল প্রাণশক্তির বাণী নিত্যনিরন্তরই আমাদের অন্তরে সাড়া দিয়ে ফিরছে।

এই বিশ্বচেতনার উপলব্ধি করেছেন আধুনিককালের সংযতবাক আর্টিস্ট হ্যাভেলক এলিস, তিনি বলছেন,—

"Thus, while he (James Hinton) saw the world as an orderly mechanism, he was not content, like Strauss, to stop there and see in it nothing else. As he viewed it, the mechanism was not the mechanism of a factory, it was vital, with all the glow and warmth and beauty of life; it was, therefore, something which not only the intellect might accept, but the heart might cling to.

"The bearing of this conception on my state of mind is obvious. It ached with the swiftness of an electric contact; the dull aching tension was removed; the two opposing psychic tendencies were fused in delicious harmony, and my whole attitude towards the universe was changed. It was no longer an attitude of hostility and dread, but of confidence and love. My self was one with the not-self, my will one with the universal will. I seemed to walk in light; my feet scarcely touched the ground; I had entered a new world."

তারপর আবির্ভাব হোল যীশুর মানসপুত্র "করমচাদ" গান্ধীর। নামকরণের কালে বিধাতা তাঁর ললাটে কর্মেরই আদেশ লিখে দিয়েছিলেন। তিনি যীশুরই মতো জগতের দ্বিতীয় কর্ম-কবি। যীশু মানবপ্রীতির বীজ বপন করেছিলেন অল্পপরিসর গ্যালিলি জেরুসালেমে, গান্ধিজীর ক্ষেত্র শুধু ভারত নয় সারা ধরণী। তাঁর কর্মে সেই অবিনশ্বর সার্মন অন দি মাউন্টের বাণীর নিবিড়তম প্রকাশ, সেই মানবপ্রীতির ঘা দেওয়া সুপ্ত মৃত মানবাত্মার দুয়ারে দুয়ারে। যীশু দিয়েছেন স্বর্গ রাজ্যের আশ্বাস, গান্ধিজী তাঁর কর্মের দ্বারা কনফ্যুসীয় মানবতার আদর্শেরই প্রচার করছেন। সে আদর্শ আজো বলছে, স্বর্গ এইখানে, এই মাটির ধরণীতে। ভালোবাসাই শ্রেষ্ঠতম কর্ম। বুদ্ধ যীশু ছাড়া গান্ধীজীর তুলনা নেই। তিনি যীশুর চেয়ে মহত্তর কর্ম-কবি কিনা বলা কঠিন। তিনি মানুষকে প্রীতির পথে অগ্রসর করে দেওয়া ছাড়া এক মহাদেশকে সেই পথ দিয়েই স্বাধীনতার দুয়ারে এনে উপস্থিত করেছেন।

বর্তমানের দুঃখ এই যে, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী জীবননাট্যশালার পাদপ্রদীপে প্রখর আলোর সম্মুখচারী। আমরা তাঁদের জীবনের দৈনন্দিন অনেক তুচ্ছ বস্তুকে ধরে রেখেছি বলেই তাঁদের প্রকৃত রূপ আজো সম্পূর্ণ করে দেখতে পাইনি। এ পাদপ্রদীপের আলোতে যদি আমরা দেখতে পেতুম তাহলে বোধ করি বুদ্ধ ও যিশুর চরিত্রও অনেক ম্লান হয়ে যেতো। ভাবীকালেরই মানুষ শুধু তাঁদের সম্পূর্ণ করে দেখতে পাবে, এ কালের আমরা নয়।

কবির ধর্ম তাঁর প্রাণশক্তির ঊর্মি-মালা বিতরণ করে দেওয়া। সে ঊর্মি যুগপৎ সকল

মানুষের বুকে ঘা দেয় না, আজো দেয়নি। কারণ, সব মানুষই গ্রহণক্ষম নয়। তবুও সেই প্রাণশক্তি মানুষকে পাঁক থেকে টেনে এনে, পাঁকের দাবী থেকে মুক্ত করে নরদেবতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

মনে পড়ছে না "আয়ভরি টাওয়র" বাক্যটার স্রষ্টা কে—থিওফিল গতিয়ে অথবা গুস্তাভ ফ্লবেয়ার। সে যাই হোক, তাঁর উপলব্ধি ছিলো যে ও হর্ম্যশিখরে বন্দী হয়ে না থাকলে মানুষের প্রকৃত অদৃষ্টটুকুকে দেখা যায় না, তার জন্য কল্যাণকামনা, তার জন্য অমৃতমন্থনও করা যায় না। সাহিত্যিক যাকে "আয়ভরি টাওয়র" বলছেন মুক্তিকামীর সাধনার সে আশ্রয়ের নাম —আশ্রম তপোবন মঠ ল্যাবরেটরি আরো কত কি। বাল্মিকী থেকে মেঘনাদ সাহা পর্যন্ত তপস্বীরা এই "আয়ভরি টাওয়রের"ই মানুষ।

"'Art for art's sake!' the artists of old cried. We laugh at that cry now." লিখছেন হ্যাভ্‌লক এলিস—

"Jules de Gaultier, indeed, considers that the idea of pure art has in every age been a red rag in the eyes of the human bull.' Yet, if we had possessed the necessary intelligence, we might have seen that it held a great moral truth. 'The poet, retired in his tower of Ivory, isolated, according to his desire, from the world of man, resembles, whether he so wishes or not, another solitary figure, the watcher enclosed for months at a time in a lighthouse at the head of a cliff. Far from the towns peopled by human crowds, far from the earth, of which he scarcely distinguishes the outlines through the mist, this man in his wild solitude, forced to live only with himself, almost forgets the common language of men, but he knows admirably well how to formulate through the darkness another language infinitely useful to men and 'visible afar to seamen in darkness.' The artist for art's sake—and the same is constanty, found true of the scientist for sciences' sake—in turning aside from the common utilitarian aims of men is really engaged in a task none other can perform, of immense utility to men. The Cistercians of old hid their cloisters in forests and wilderness afar from society, mixing not with men nor performing for them so-called useful tasks; yet they spent their days and nights in chant and prayer, working for the salvation of the world, 'and they stand as the symbol of all higher types of artists, not the less so because they, too, illustrate that faith transcending sight, without which no art is possible.'"

যারা সাহিত্যের মতো কঠিন ঐকান্তিক সাধনার ক্ষেত্রে শুধু ভিড় করে আবর্জনারই স্তূপ বাড়িয়েছে সেই বোধশক্তিহীনেরা "আয়ভরি টাওয়র" বাক্যটার যে কদর্থ করে তার জন্য তাদের বেশি দোষ দেওয়া যায় না। বোধশক্তিহীনতাই একমাত্র নয় এ বিশিষ্ট মতের অন্য কারণও আছে। আমরা এসেছি ভিন্ন একটা যুগের দুয়ারে। এই যুগের সব চেয়েও বড়ো প্রলয়, পুরাতন ঐতিহ্যের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা। আগে ছিলো সুগভীর বিশ্বাস যার কল্যাণে মানুষ বিশ্বকে পেয়েছে। আজ আমরা আর কিছুতে বিশ্বাস রাখিনে, আমরা জানি। এই জানার কারণে সব বর্ণহীন বস্তুতে পরিণত হয়েছে, এবং বিশ্ব সঙ্কুচিত হয়ে ছোট এতোটুকু হয়ে গেছে। যা কাজের নয়, যার হাতে হাতে নগদ দাম নেই সে সব বস্তুকে আর কেউ আমল দিতে সম্মত নয়। এ ঘটনা যে শুধু আমাদের দেশে ঘটেছে তা নয়। লিনয়ুটাং বলছেন, আধুনিক চীনদেশের ভাগ্যও এই, এবং তার কারণ তিনি বলছেন, এখনকার মানুষের 'Mechanistic view of life', জগৎ ফ্যাক্টরীতে পরিণত হয়ে গেছে।

মানুষ আগে ছিলো homo Sapiens, এখন তার নব রূপান্তর হয়েছে—homo economicus. জানার মহলে এসে সে বিশ্বাস আনন্দ হারিয়েছে। আর সে স্বপ্ন দেখে না, জীবনকেও আর খুঁজে পায় না। বাস্তবের আলেয়া, কাজের ডিলিরিয়াম তাকে এনে দিয়েছে অমিত শ্রম, জৈব প্রয়োজন ছাপানো উৎপাদন। গল রিশার বলেছিলো, এই বিষম উৎপাদনই একদিন উৎপাদককে গ্রাস করবে। এনেছে বিক্ষোভ অশান্তি আর মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে হানাহানি। বিপুল বিশৃঙ্খলা আজ তার ললাটের লিখন। সে জানেও না যে মানুষ নরদেবতার সিংহাসনচ্যুত হয়ে শুধু গণের একজন হয়ে গিয়েছে। শ্রম তার জীবনমূল্যের একমাত্র মাপকাঠি।

"আয়ভরি টাওয়রের" কথায় রবীন্দ্রনাথের এ কথাগুলি মনে করে রাখা ভালো: "যুগ পরিবর্তন ইতিহাসের অঙ্গ, কিন্তু সাহিত্যের একটা মূলনীতি সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের মনকে আনন্দের জোগান দিয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে বলে রসতত্ত্ব। এই রস আধুনিকী বা সনাতনী কোনো বিশেষ মালমসলার ফরমাসে তৈরী হয় না। কখনো কখনো কোনো অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজনৈতিক গোঁড়ামি জেগে উঠে রসসৃষ্টিশালায় ডিক্টেটরি করতে আসে, বাইরের থেকে দণ্ড হাতে তাদের শাসন চালায়, মনে করে চিরকালের মতো অপ্রতিহত তাদের প্রভাব। তাদের তকমা চোখ ভোলায় যাদের, তারা রসরাজ্যের বাইরের লোক, তারা রবাহুত; এক-একটা বিশেষ রব শুনে অভিভূত হয়, ভিড় করে। রসের প্রকৃতি হচ্ছে যাকে বলা যায় গূঢ়াহিত, অভাবনীয়, সে কোনো বিশেষ উত্তেজিত সাময়িকতার আইন-কানুনের অধীন নয়। তার প্রকাশ এবং তার লুপ্তি মানবপ্রকৃতির যে নিগূঢ় বিশেষত্বের সঙ্গে জড়িত তা কেউ স্পষ্ট নির্ণয় করতে পারে না। স্বভাবের গহন সৃষ্টিশালার গভীর প্রেরণায় মানুষ আপন খেলনা গড়ে আবার খেলনা ভাঙে। আমরা কারিগররা তার সেই ভাঙাগড়ার লীলায় উপকরণ জুগিয়ে আসছি। কিন্তু সেগুলো নিতান্ত খেলনা নয়, সেগুলো কীর্তি, প্রত্যেকবার মানুষ এই আশা করে, নইলে তার হাত চলে না। অথচ সেই সঙ্গেই একটা নিরাসক্ত বৈরাগ্যকে রক্ষা করতে পারলেই ভালো।

আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এ সব কথা আধুনিককালের বুলির সঙ্গে মিলছে না—তা যদি হয় তা হলে সেই আধুনিক কালটার জন্যই পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে, সে চিরকালই আধুনিক থাকবে এত আয়ু তার নয়।"

হিন্দু সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের প্রতিক্রিয়া

১৯১২ সালে বিলাসপুর জমিদারী অঞ্চলের জরিপ রিপোর্টে মিঃ উইলস্ (Mr. C. U. Wills) এই মন্তব্য করেছেনঃ "বিলাসপুরের জমিদারেরা বংশের দিক দিয়ে কাওয়ার গোষ্ঠীর আদিবাসী। ব্রিটিশ যুগে বৈষয়িক অবস্থায় উন্নত হয়ে আজকাল তারা নিজেদের তানোয়ার ক্ষত্রি বলে পরিচয় দেয়, উপবীত ধারণ করে এবং মোটামুটি হিন্দুধর্মের রীতিনীতি মেনে চলে।...... পাইকরা কালোয়ার নামক গোষ্ঠী জমিদারী অঞ্চলের উত্তর ভাগে বহু সংখ্যায় রয়েছে এবং এদের অবস্থা বেশ ভাল। হিন্দুধর্ম আদিম অধিবাসীকে কতখানি সামাজিক সুরুচি, আত্মমর্যাদাবোধ, সংযম, মিতব্যয়িতা ও শ্রম-কুশলতার শিক্ষা দিতে পারে, তার দৃষ্টান্ত পাইকরা কালোয়ার।"

নৃতত্ত্ববিদ্ রায় বাহাদুর শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, যিনি আদিবাসী অঞ্চলে হিন্দু জমিদারী পত্তনের কুফল সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, তিনি মন্তব্য করেছেন যে—"রাঁচী জেলায় পূর্ব পরগণাগুলিতে হিন্দুদের সংস্পর্শে আসায় মুণ্ডারা সভ্যতার অবস্থায় উন্নীত হতে পেরেছে।" (১)

জমিদারী প্রথা আদিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে এবং জমিদারেরা প্রধানত হিন্দু। এই কারণে আদিবাসীদের দুঃখের কারণটাকে সোজাসুজি 'হিন্দু-আক্রমণ' বলে যাঁরা মন্তব্য করেন, তাঁদের বিচার ঠিক হয় না। হিন্দু সান্নিধ্যের ফলে আদিবাসী সমাজের অন্য যে সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়েছে, তার মর্যাদাও এই সব সমালোচক উপলব্ধি করতে পারেন না।

কোলহানের হো সমাজ সম্বন্ধে ১৯১০ সালে ও' ম্যালি (O' Malley) লিখেছেনঃ "হো সমাজ নিজেদের গোষ্ঠীগত ধর্মমত ও বিশ্বাস নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়িয়ে আছে এবং খুব কম সংখ্যক হো খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে।...... অপর দিকে হিন্দুধর্মের দিকে একটা আগ্রহের ভাব এদের মধ্যে দেখা যায়, বিশেষ করে 'জাত' প্রথার (Caste) প্রতি। একদল হো ব্রাহ্মণকে উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলে সম্মান দিয়ে থাকে।... বিগত সেন্সাসে অনেক হো নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। হিন্দু দেবদেবীর প্রতি এরা বিশ্বাস পোষণ করে এবং অনেকে উপবীত ধারণ করতে আরম্ভ করেছে।" (২)

আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে যারা হিন্দুত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু রীতিনীতি গ্রহণ করে, তার মধ্যে একটা ব্যাপার খুব সহজ-ভাবেই চোখে পড়ে। হিন্দুর ভাল প্রথা গ্রহণ করার সঙ্গে হিন্দুর মন্দ প্রথাগুলিও আদি-বাসীরা গ্রহণ করে থাকে। ডাঃ ডি এন মজুমদার হো সমাজের সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে জানা যায় যে—'হো সমাজ এক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে মেয়েদের পক্ষে বাজারে কাজ করতে যাওয়া নিষিদ্ধ করে।' এই প্রস্তাবকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, এটা বুঝি 'নারীর অধিকার সঙ্কোচে'র জন্য একটা কুসংস্কারাপন্ন গোঁড়া মনোভাব। এল্যুইন সাহেবের মত সমালোচকেরা এই সব ঘটনাকেই হিন্দু সংস্পর্শের কুফল বলে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু যখন খোঁজ করে জানা যায় যে, হো সমাজে পুরুষেরা আলস্যপরায়ণ এবং মেয়েদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, তখন মেয়েদের পক্ষে ঘরে থাকা এবং পুরুষদের পক্ষে বাইরে খাটতে যাওয়া হোদের সামাজিক পরিণামের দিক দিয়ে প্রগতিশীল পরিবর্তন বলে অবশ্যই স্বীকৃত হবে। এই উদাহরণটি বাদ দিয়েও একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে, আদিবাসী সমাজ হিন্দু সমাজের দেখা-দেখি অনেক কুপ্রথাও গ্রহণ করেছে। 'হো' সমাজে অনেক 'কাজোমেসিন' বা জাতিচ্যুত পতিত পরিবার ছিল। সম্প্রতি আদিবাসী সমিতির নির্দেশে পতিত পরিবারগুলিকে সমাজভুক্ত করা হচ্ছে। (৩)

মদ্যপানের অভ্যাস আদিবাসী সমাজের আর্থিক দুর্গতির একটা বড় কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আদিবাসীদের অনেক গোষ্ঠী সুরা বর্জনের আন্দোলন করে সমাজকে দোষ-মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। ১৮৭১ সাল থেকেই উড়িষ্যার খোন্দ সমাজ লেখাপড়া শেখ-বার জন্য এবং সুরাপান প্রথা দমনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ১৯০৮ সালে তারা সকলে সুরাপান বর্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে এবং মদের দোকানগুলি বন্ধ করে দেবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করে। গবর্ণমেণ্ট এই অনুরোধ অবশ্য উপেক্ষা করেন নি। (৪)

হিন্দুর সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের মোটামুটি অধঃপতন হয়েছে, না উন্নতি হয়েছে, অনেকে এই প্রশ্ন করেছেন এবং অনেকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এল্যুইন প্রমুখ কয়েকজন প্রচারক-নৃতাত্ত্বিক আছেন যাঁরা সোজাসুজি প্রচার করে থাকেন যে, হিন্দু সংস্পর্শের ফলেই আদিবাসীরা রসাতলে যেতে বসেছে। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বরং এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু সংস্পর্শের জন্য আদি-বাসীদের উন্নতিই হয়েছে, হিন্দুর সংস্পর্শে যেসব আদিবাসী গোষ্ঠী আসেনি, তারা কোন স্বর্গীয় অবস্থায় বাস করে না। এ বিষয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতামত যাচাই করে দেখতে পারি, তাঁরা কি বলেন?

ও' মালি (O' Malley) লিখেছেন—"হিন্দুত্ব গ্রহণ করে আদিবাসীরা মিত ও সংযত জীবনের প্রথম ধাপ খুঁজে পায়, কারণ হিন্দু-ধর্মীয় নীতির প্রভাবে মদ্যপানের আসক্তি খর্ব হয়, কারণ হিন্দুদের মধ্যে সভ্য নীতিসঙ্গত জীবনের একটা আদর্শ রয়েছে।" (৫)

এক মুখে হিন্দু সংস্পর্শের এই সুফল স্বীকার করেও ও' ম্যালি আর এক মুখে এক গাদা কুফলের বর্ণনা করেছেন। 'হিন্দুর সংস্পর্শে এসেই আদিবাসীদের ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ লোপ পায় এবং তারা বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কুপ্রথা গ্রহণ করে আনত শ্রেণী হয়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা ছোট জাত হিসাবে স্থান গ্রহণ করে।'

এই বিষয়ে অন্যান্য সমালোচকের কয়েক-জনের অভিমত দেখা যাক। মিঃ সিমিংটন (Mr. Symington) যে মন্তব্য করেছেন, সেটাও দু' মুখো ভাষ্য হয়ে উঠেছে। তিনি

(1) Munds and Their Country...... S. C. Roy

(2) District Gazetteer of Singhbhum.
(3) Hindusthan Quarterly. Jan.-Mar. 1944—D. N. Majumdar

(4) Aborigines & Their Future—G. S. Ghurye.
(5) Modern India and the West.

একবার বলেছেন,—'বাইরের পৃথিবীর সংস্পর্শ থেকে যে সব আদিবাসী গোষ্ঠী দূরে সরে আছে, তারাই সুখী ও স্বাধীন। যেখানে তারা উন্নততর শিক্ষিত, মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, সেখানেই তারা ভীরু ও অবনত হয়েছে এবং শোষিত হয়েছে।' কিন্তু এ হেন সিমিংটনও বলেন—"চোপড়া অঞ্চলে ভীলেরা রাজপুত কুর্লাবিদের (চাষীদের) সংস্পর্শে এসে তাদের কৃষিকাজের পদ্ধতি ও অন্যান্য অনেক সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রণালীতে উন্নতিলাভ করেছে।" (৬)

কিন্তু কর্নেল ডাল্টন (Col. Dalton) বলেন—'খেড়িয়া গোষ্ঠীর মধ্যে যারা ছোট-নাগপুরের জমিদারী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে তারা অন্যান্য দূরবিচ্ছিন্ন খেড়িয়াদের চেয়ে সভ্যতায় অনেক বেশী উন্নত।' (৭)

খেড়িয়াদের মধ্যে দুধখেড়িয়া নামে একটি শাখা আছে। এরা রায়ত হয়ে চাষবাস করে এবং হিন্দুর সংস্পর্শে ব্যবসায়িক লেনদেন করে হিন্দুদের সঙ্গে একই স্কুলে শিক্ষালাভ করে থাকে। এই সংস্পর্শের ফলে দুধ খেড়িয়াদের সাংস্কৃতিক সামাজিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। 'হিন্দু প্রতিবেশীর কাছ থেকে অনেক সাংস্কৃতিক বিষয় আহরণ করে খেড়িয়ারা নিজ সমাজকে আত্মস্থ করেছে।' (৮)

হিন্দুর সংস্পর্শ আদিবাসী সমাজের ওপর মোটামুটি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, এই সমস্ত বিবরণ থেকে সংক্ষেপে তার একটি পরিচয় বিবৃত করা যেতে পারেঃ

"হিন্দুর সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজ যতটুকু প্রভাবিত হয়েছে তার ফলে তারা মোটামুটিভাবে উন্নত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে সমাজ সংস্থার, শিক্ষার প্রসার ও ধর্মীয় মতবাদের সংস্কারের চেষ্টা করছে। পানোন্মত্ততার অভ্যাসকে খর্ব করেছে। উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করেছে। হিন্দু সমাজের মধ্যে এসে জাত-প্রথা গ্রহণ করেও তারা উপরে উঠবার চেষ্টা করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে।...... শুধু যদি হিন্দুর দ্বারা জমি গ্রাসের ব্যাপারটা না থাকতো (যেটা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থারই পরিণাম) তাহলে হিন্দুর সংস্পর্শ লাভ করে আদিবাসীরা সম্পূর্ণ মঙ্গলকর উন্নতি লাভ করতো।' (৯)

হিন্দু সমাজ

আদিবাসীরা নিজেদের সম্বন্ধে 'হিন্দু' আখ্যা দিতে কতখানি উৎসাহী তার কতগুলি প্রমাণ উধৃত করা হলো ঃ

(ক) খাড়িয়াদের মধ্যে শতকরা ৩৬ জন হিন্দু হিসাবে পরিচয় দেয়, শতকরা ৪৪ জন খৃস্টান হিসাবে। (১৯৩১ সালের সেন্সাস)

(খ) উড়িষ্যার খোন্দদের মধ্যে শতকরা ৪৫ জন হিন্দু বলে পরিচয় দেয় (১৯১১ সালের সেন্সাস)। "বিহার ও উড়িষ্যার খোন্দদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন হিন্দু হিসাবে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)

(গ) ওঁরাও আদিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৪১ জন হিন্দু ব'লে এবং শতকরা ২০ জন খৃস্টান ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(ঘ) সাঁওতালদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয়। শতকরা .০১-এর চেয়েও কমসংখ্যক খৃস্টান হিসাবে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(ঙ) যুক্তপ্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যার সমস্ত খোন্দ নিজেদের 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয়। মধ্য ভারতে শতকরা ৭৪ জন খোন্দ হিন্দু বলে পরিচয় দেয় এবং মধ্য প্রদেশের শতকরা ৪৬ জন। মোট কথা ভারতের সমগ্র খোন্দ সমাজের শতকরা ৫৩ জন হিন্দুত্বের দাবী করে। সমগ্র খোন্দ সমাজের মধ্যে মাত্র ৩৫ জন খৃস্টান বলে পরিচয় দেয়। (১৯৩১ সালের সেন্সাস) এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, খৃস্টান মিশনারীদের উদ্যোগের ব্যর্থতা। ১৮৪০ সাল থেকেই খৃস্টান মিশনারীরা খোন্দদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করে আসছে।

(চ) কাওয়ার গোষ্ঠীর আদিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৬ জন হিন্দু বলে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সেন্সাস)।

(ছ) ভীলদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন হিন্দু হিসাবে পরিচয় দেয়। সমস্ত ভীল সমাজের মধ্যে মাত্র ১৩ জন খৃস্টান পাওয়া যায় (১৯৩১ সেন্সাস)।

হিন্দু সংস্পর্শ

মানভূমের ভূমিজ কোলেরা হিন্দু হয়ে গেছে। তাদের ভাষা বাঙলা এবং তাদের সমাজপতিরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। তারা দ্রুত অধিকাংশ হিন্দু উৎসব-গুলিকে গ্রহণ করে ফেলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গোষ্ঠীগত নৃত্যগীতের অনুশীলনও বজায় রেখেছে। নৃত্যগীতের প্রতি তাদের কোলসুলভ অনুরাগের কোন হ্রাস হয়নি। (১০)

ভুইয়ারা নিজেদের হিন্দু ব'লে মনে করে। ভুইয়া সমাজের বিশিষ্ট জমিদার ও সর্দারেরা নিজেদের রাজপুত বলে পরিচয় দেয় এবং রাজপুত মর্যাদা দাবীও করে। (১১)

ও' ম্যালি বলেন ঃ খোন্দমলের খোন্দেরা সর্বদিক দিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম উপজাতি হয়েই রয়েছে। কিন্তু পুরীর খোন্দেরা এমন হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে গেছে যে, তাদের দেখে নিম্ন জাতের উড়িয়া বলেই মনে হবে।

তারাই যে শুধু নিজেকে সৎ হিন্দু বলে মনে করে তা নয়, গোঁড়া হিন্দু প্রতিবেশীরাও তাদের হিন্দু বলে মনে করে। গোঁড়া হিন্দুরা এই খোন্দদের গ্রামে বা গৃহে অবস্থান করতে আপত্তি করে না। (১২)

বিলাসপুর জেলায় হিন্দুর হোলি উৎসবে আগুন জ্বালবার ভার সাধারণত বৈগা, খোন্দ প্রভৃতি আদিবাসী লোকের ওপর দেওয়া হয়। খেরমাতা হনুমান প্রভৃতি পল্লী দেবতার পুজো করবার পুরোহিতকে ভুমকা, ভুমিয়া অথবা ঝানকার বলা হয়ে থাকে। এই পুরোহিত বা ঝানকার আদিবাসী গোষ্ঠীর লোক সম্বলপুর জেলায় সাধারণত বিঁঝোয়ার গোষ্ঠীর লোকেরা ঝানকার হয়ে থাকে। মাণ্ডলা ও বলাঘাট জেলায় বৈগারাই ঝানকার হয়ে থাকে। 'ঝানকার' পুরোহিতেরা গ্রামের হিন্দু সমাজে মোটামুটি ভাল রকমেই মর্যাদা লাভ করেছে। এই প্রথা অবশ্য এখন দিন দিন কমে আসছে। ঝানকার পুরোহিতেরা প্রত্যেক হিন্দু এবং আদিবাসী গেরস্থের কাছ থেকে বার্ষিক বৃত্তি (শস্য) লাভ করে।

দেখা যাচ্ছে, যে সব অঞ্চলে সাধারণ ভারতীয় ও আদিবাসী উভয় সমাজকে নিয়ে মিশ্র বসতি আছে, সেখানে পারস্পরিক একটা যোগাযোগের ফলে উভয়ের পুজ্য নতুন নতুন দেবতাও তৈরি করা হয়েছে এবং উভয়েই আদিবাসী ঝানকার পুরোহিতের যজমান হয়ে উঠেছে। মিঃ শুবার্ট (Shoobert) ১৯৩১ সালের মধ্যপ্রদেশ-বেরারের সেন্সাসের রিপোর্টে মন্তব্য করে গেছেন যে, অনেক প্রথা এবং বিশেষ করে জন্ম ও মৃত্যুর ব্যাপারে যে সব সংস্কার কৃত্য ও আচার আছে, সেগুলি মধ্য প্রদেশের এক একটা অঞ্চলে এক এক রকম। এই বিষয়ে জাতি হিসাবে বেশী পার্থক্য নেই, অঞ্চল হিসাবেই পার্থক্য। একই অঞ্চলের হিন্দু ও আদিবাসী এ বিষয়ে মোটামুটি একই রকমের প্রথা পালন করে।

কোরকুরা হোলি উৎসব পালন করে এবং আখাতিজ বা অক্ষয়তৃতীয়া থেকে তাদের কৃষি বৎসর আরম্ভ হয়। কোরকুরা হিন্দুর ছুৎমার্গও গ্রহণ করেছে, চামার, তেলি ও মুসলমানের ছোঁয়া জল তারা পান করে না। কোরকুদের মধ্যে এই সংস্কার প্রচলিত আছে

(6) Report on the Aboriginal & Hill Tribes of the Partially excluded Areas in the Province of Bombay 1939.

(7) Census of India—1930, Bihar & Orissa.

(8) Kharia—S. C. Roy & R. C. Roy.

(9) The Aboriginels & Their Future —G. S. Ghurye.

(10) Chotanagpur—Risley.

(11) The Story of an Indian Upland —Bradley-Biat.

(12) Modern India & The West—O'Malley.

যে, মহাদেব পাহাড়ে বসতি করবার জন্যে রাবণের অনুরোধে মহাদেব কোরকুদের সৃষ্টি করেছিল। ভীল সমাজের মধ্যে অনেকে এত বেশী হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে যে, তারা রাজপুত জাত ব'লে দাবী করে।

বর্তমান হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেছে—জাত-পাত-তোড়ক মনোভাব। হিন্দু সমাজে যাকে নিম্ন জাত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, তারা আর চুপ করে এই নিম্নত্ব মেনে নিতে রাজী নয়। তারা ওপরে উঠতে চাইছে। লক্ষ্য করার বিষয়, এই ওপরে ওঠবার পদ্ধতি হিন্দুর সামাজিক কাঠামোর প্রণালীসংগত। এক স্তর থেকে আর এক স্তরে যাওয়া—কিন্তু স্তরচ্যুত হওয়া কখনই নয়। নিম্ন জাতের হিন্দুরা শ্রেণী-মর্যাদা উন্নীত করার জন্য জনসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি গ্রহণ করে। আদিবাসীরাও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করার পর এক স্তর থেকে ওপরের এক স্তরে উন্নীত হবার চেষ্টা করে। উপবীত গ্রহণ করে, হিন্দু সমাজের বিশেষ দেবতা বা উৎসব গ্রহণ করে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহঘটিত সংস্কার ও প্রথা গ্রহণ করে, কোন মুনি ঋষি বা ভক্ত সাধকের সঙ্গে গোত্রত্ব দাবী করে—শিখাধারণ, নিরামিষ ভক্ষণ ইত্যাদি কোন না কোন বিশিষ্ট হিন্দু পদ্ধতির সাহায্য নিয়েই এই জাতগত উন্নয়ন সম্ভব হয়ে থাকে। মিঃ শুবার্ট মধ্য প্রদেশের সেন্সাস রিপোর্টে (১৯৩১) মন্তব্য করেছেন যে, নিম্নজাতের হিন্দুরা, যারা পূর্বে উপজাতীয় ধর্ম অনুসরণ করতো, তারা হিন্দু সমাজে আর নীচু হয়ে থাকতে চায় না। যে সব সামাজিক অধিকার তারা পূর্বে লাভ করতে পারে নি, বর্তমানে নিজের উদ্যোগে সে সব অধিকার আদায় করার জন্য এদের মধ্যে একটা উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। ছোট একটি ঘটনার বিবরণ এই প্রসঙ্গের উপসংহারে উধৃত করা গেল। এই ঘটনা বস্তুত অনুরূপ শত ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আদিবাসী জাতির মধ্যে হিন্দুসমাজ-ভুক্তির যে বিরাট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলেছে, এই ঘটনার মধ্যে সেই বৃহত্তর পরিণামেরই একটি ছোট প্রতিবিম্ব।—"গত ১৮ই বৈশাখ মানভূমের জানবাজার থানার কয়েকটি গ্রামে আদিম শবর হিন্দুগণ সমবেত হইয়া ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণান্তে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া সভাস্থ সকল সম্প্রদায়ের নিকট পরিচয় দেয় ও তাহা সভাস্থ সকলেই মানিয়া লয়।"—(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪।

তিনটি শিশু

সুভদ্রাকুমারী চৌহান

[সুভদ্রাকুমারী চৌহান আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের একজন খ্যাতনাম্নী লেখিকা। ইনি কংগ্রেস আন্দোলনে কারাবরণ করেন। ইঁহার লেখার ধারা অতি সরল এবং হৃদয়গ্রাহী। ইঁহার কাব্য-প্রতিভা বড় না কথাসাহিত্যিক প্রতিভা বড়—বলা মুস্কিল। "বিখরেমোতি" নামক গল্পপুস্তকের জন্য হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন ইঁহাকে ৫০০৲ টাকা মূল্যের সাকসেরিয়া পারিতোষিক দিয়াছে। "ঝাঁসি কী রাণী" নামক Ballad হিন্দী সাহিত্য-রসিক সমাজে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। ইঁহার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধাদি প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইয়া থাকে।]

আমার ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই এক একটি করে ফুলের বাগান বানিয়েছিল। বাগানও নয়, ছোট ছোট কয়েকটা ফুলের গাছ। একদিন ভোরে আমরা দেখতে পেলাম যে, সেই ফুলের গাছগুলিতে ফুল ফুটতে শুরু করেছে।

ছেলেমানুষ ত! প্রত্যেকেই নিজের বাগানের ফুল সুন্দর ব'লে জানে—আর এই নিয়েই ওদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হ'য়ে গেল। প্রত্যেকেরই বক্তব্য এই ছিল যে, তার বাগানের ফুলই সবচেয়ে সুন্দর। কথা চলতে চলতে সেটা ফুল থেকে অন্য ক্ষেত্রে পৌঁছল। একজন হল হিটলার, একজন মুসোলিনী, একজন স্ট্যালিন। আর আমার একই সঙ্গে এই তিন-জনের মা হওয়ার সৌভাগ্য হল। এদের যুদ্ধ ক্ষেত্রের কটুভাষণ আমাকে রান্নাঘর থেকে বাগানে যেতে বাধ্য করল। আমাকে দেখেই সকলে একসঙ্গে নিজের নিজের পক্ষ সমর্থন ক'রে ন্যায়ের দোহাই দিয়ে আমার কাছে আপীল করল। ন্যায় বিচার করা এত সোজা ছিল না যতটা ছিল আদালতের জজের পক্ষে। জজের পথপ্রদর্শনের জন্য থাকে আইন ও অনুরূপ ঘটনার বিবরণ। রাজাকে ফকীর প্রমাণে যতই অন্যায় হ'ক না কেন তবু জজের পথ থাকে পরিষ্কার। আমার সামনে না ছিল আইন, না ছিল অনুবিবৃত্তি—; তবু আমাকে এই যুদ্ধ মেটাতে হবে তাও আবার ন্যায়ের সঙ্গে।

আমি চিন্তা করছিলাম, একজন জুরী নিযুক্ত করা যায় কি না, ঠিক এই সময়ে ছেলে-মেয়েদের বাবাকে আসতে দেখা গেল। চীৎকার হৈ চৈ করা ত দূরের কথা বেশী জোরে কথা বলা পর্যন্ত উনি পছন্দ করেন না। ওদের ঝগড়া করতে দেখে বললেন—"আচ্ছা, ঝগড়া কি জন্যে? ফের যদি তোমরা এমন ঝগড়াঝাটি করবে ত তোমাদের মাকে সত্যাগ্রহ করতে দেব না।"

আমার হিটলার মুসোলিনী শান্ত হয়ে গেল। মা ছাড়া যাদের স্কুল যেতে কষ্ট হয়, মা ছাড়া যারা কোন কাজ করতে পারে না সেই তারাই আবার আন্তরিকভাবে চাইত যে আমি সত্যাগ্রহ করি এবং জেলে যাই। এখন আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম যে, ওদের কোন নালিশ আছে কিনা, ওরা সব একসাথে বলে উঠল—"না মা, কোন নালিশ নেই, আমাদের সকলের বাগানের ফুলই খুব সুন্দর। তুমি সত্যাগ্রহ করে জেলে যাও।" আমরা সবাই ভিতরে যাচ্ছিলাম এমন সময় কিশোর কণ্ঠের গানের কোরাস আওয়াজ শোনা গেল—

"ভগবান দয়া করনা ইতনী,
মোরী নৈয়া কো পার লগা দেনা।"

আমরা সবাই দরজার দিকে দৌড়ে গেলাম। এই সময় গানের আর এক পদ শোনা গেল—"ম্যয় তো ডুবত হুঁ মাঝধার পড়ী, মোরী বৈয়াঁ পকড়কে উঠা লেনা।" বাইরে এসে দেখি তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে—দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে। বড় মেয়েটি বোধ হয় বছর দশেকের হবে; ছোটটি আট, আর ছেলেটির বয়স বছর পাঁচেকের মধ্যে। ও বড় মেয়েটির কোলে ছিল। আমাদের দেখেই ওরা গান বন্ধ করে দিল। ছেলেটিকে কোল থেকে নামিয়ে বড় মেয়েটি মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রণাম করল। ওর দেখাদেখি ছোট মেয়েটি ও ছেলেটি মাটীতে মাথা ঠেকাল আর তিনজনেই জানাল, যে ওরা ক্ষুধিত এবং ছেঁড়া জামায় ঢাকা পেট হাত দিয়ে দেখিয়ে ক্ষুধার সাক্ষ্য দিল। বড় মেয়েটির হাতে একটি থলি ছিল আর ছোটটির হাতে একটা টিনের কৌটো। ও একবার ওর শূন্য থলিটার দিকে তাকিয়ে আমার দিকে চাইতে লাগল। আমি বললাম—"তুমি গাও ত বেশ! আর কোন গান জান?" বড় মেয়েটি কথা বলার আগেই ছোটটি বলে উঠল—"আমরা ভজনও গাইতে পারি মা।" এবং বিনা আদেশেই গাইতে লাগল—

"কমর কস লে রে বিলোচী, তেরে সংগ্ চলুংগী
তেরে সংগ্ চলুংগী রে তেরে সাথ চলুংগী,
কমর কস লে..........।
মেরী সাথ চলোগী তো তেরী অম্মা লড়েগী—"

আমরা আর হাসি চেপে রাখতে পারছিলাম না। অম্মার সঙ্গে লড়াইয়ের কথা শুনেই ও ফুঁপিয়ে উঠল। আমরা লজ্জায় চুপ করে রইলাম। ওর দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন কোন অজানা ব্যথায় ব্যথিত হয়েছে। আমি হাসি চেপে আশ্বাসের স্বরে বললাম "চমৎকার গেয়েছ।" আমার কথা শুনে ও আবার মাটীতে মাথা ঠেকাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম "তোমরা কি খাবে?" বড় মেয়েটি মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে বলল "যা হয় মা, কিছু দাও কাল থেকে কিছু খাইনি।" আমি ছেলেমেয়েদের দুটো দুটো করে পুরী দিয়ে দিতে বলে ভিতরে চলে গেলাম। ছেলেমেয়েরা ওদের কতটা পুরী দিয়েছিল সেটা আমি বুঝতে পারলাম রান্নাঘরে গিয়ে পুরী ও তরকারীর বাসন একদম খালি দেখে।

(২)

তার পরের দিন আমরা সকালে চা খেয়ে উঠছিলাম এমন সময় আবার ওরা এসে পেৌঁছল। শিশু কণ্ঠের কোমল স্বর শোনা গেল।

"সাঁওরিয়া হমে' ভুল গ্যয়ো, সখী সাঁওরিয়া,
বিন্দরাবন কী কুঞ্জ গলিন মে' বাজ রহী
হ্যা বাঁসুরিয়া
হমে' ভুল গ্যয়ো সখী সাঁওরিয়া।"

আমি আমার ছেলেমেয়েদের বললাম—"কাল তোমরা ওদের খুব পুরী খাইয়েছ না! এখন দেখ ওরা আবার এসে গেছে, রোজ যেন ওদের জন্য এখানে খাবার রাখা আছে!"

"রাখা ত আছেই মা!" একসঙ্গে ওদের মুখে দিয়ে বার হল এবং খাবারের বাটীর দিকে হাত বাড়াল।

আমি তিরস্কার করে বললাম—"থাক্ থাক্ রোজ রোজ ওদের এমন খাওয়াবে ত দরজা ছেড়ে আর নড়বে না। আজ ওদের চাল কি আটা দিয়ে বিদায় করে দাও।"

একজন বলে উঠল "বেচারারা ত সব ছোট! কে জানে ওদের মা আছে কি না। চাল বা আটা দিলে বাঁধবে কোথায়?

আর একজন বলে উঠল "তার চেয়ে ওদের কিছু না দেওয়াই ভাল।" সবচেয়ে ছোটজন বলে উঠল "তুমি মা হয়ে এমন কথা বলছ মা! ওদের ত ক্ষিদে পায়, আমাদের ভাগের খাবার দিয়ে দাও।"

মেয়েটি সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ছিল। ও চাইছিল মায়ের মত হলেই ওরা খাবার নিয়ে গিয়ে ওদের দিবে। আমি উদাসীনভাবে বললাম —"খাবার দিয়ে দাও, কিন্তু আবার বিকেলে তোমাদের জন্য খাবার তৈরী করতে হবে।"

"মা, আজ বিকেলে আমরা জলখাবার খাব না।" একসাথে সবাই বলে উঠল এবং খাবার নিয়ে বাইরে দৌড়ে গেল।

রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে আমি বাইরে এলাম। দেখি যে ওরা খুব খুশি হয়ে খাচ্ছে আর আমার ছেলেমেয়েরা খুব উৎসাহের সঙ্গে ওদের পরিবেশন করছে। ওদের খাওয়া হয়ে গেলে আমি বললাম—"তোমরা ত খুব খেয়েছ এখন গান না শুনিয়ে যেতে পারবে না।"

ওরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মাটীতে মাথা ঠেকাল এবং গান শুরু করল—

"অব ন রহুংগী কান্‌হা, তেরী নগরীয়া
হাট বাট মোরী গৈল ন ছোড়ে,
পন ঘট মোরী পর ফোরে
গগরিয়া। অব ন রহুংগী...... ।"

গান শেষ করেই ও আবার মাটীতে মাথা ঠেকাল যেন আমাদের দানের জন্য শুভকামনা করেই চলে যাবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম "তোমরা তিনজন ভাইবোন?"

"হ্যাঁ মা—বড় মেয়েটি বলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম "তোমার নাম কি?" ও ওর নিজের নাম ইঠী, ছোট বোনের নাম সীঠী আর ভাইয়ের নাম প্রেমা বলল। আমি ইঠী, সীঠী, প্রেমাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের কি মা বাপ কেউ নেই? কালও তোমরা তিনজনে এসেছিলে আজও তাই।' ছোট মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"মাও আছে বাবাও আছে, আমাদের সবাই আছে মা।"

"কেমন তোমারে মা বাপ যে একলা তোমাদের ভিক্ষে করতে পাঠায়?"

"বাবা অমরাবতীতে আছেন, আর মা...।"

"অমরাবতীতে তোমার বাবা কি করেন?" মাঝ থেকে আমার ছোট ছেলেটা প্রশ্ন করে বসল।

"জেলে আছে ছোটবাবু।" বড় মেয়েটি জবাব দিল।

"জেলে আছে?" আমি একটু অবিশ্বাসের সুরে বললাম।

"জেল হল কেন?"

মেয়েটি বলল—"ও ভীষণ মদ খেত আর মদ খেয়ে ভয়ানক মাতলামি করত, সবাইকে গালাগালি করত এমন কি মাকে ধরে মারত ও। ঝগড়াও করত—এ জন্যই (মেয়েটি চোখ উঠিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল) মা, পুলিশেরা ওকে ধরে নিয়ে গেল আর সবাই বলে পুলিশ নাকি ওকে ধরে ভালই করেছে।"

"আর তোমার মা কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মেয়েটি বলল—"মা? সেও ত জেলে।" আর তার কাছেই আমাদের ছোট ভাইটি আছে। সে তো (ছেলেটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে) প্রেমার চেয়েও ছোট, ও একটুও কান্নাকাটি করে না এর চেয়ে অনেক ভাল।"

"বেচারারা।" আমার মুখ দিয়ে বের হল—"মা-বাপ দুজনেই জেলে আর অনাথেরা রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাদের মা কি জন্যে জেলে গেল?" মেয়েটি বলল—"মেরেছিল, যখন পুলিশ বাবাকে ধরে নিয়ে যায়, তখন মা মেরেছিল পুলিশকে। ভীষণ খারাপ পুলিশগুলো, মাকে ছেড়ে থাকতে আমাদেরও খুব খারাপ লাগে, প্রেমা দিনরাত কাঁদে।"

আমি ছেলেটির দিকে ভাল করে চাইলাম—বেচারা! কতই বা বয়স হবে! বড় জোর বছর পাঁচেক, গায়ে একটা ছেঁড়া জামা জড়ান, মাথায় তেল পড়েনি কতদিন কে জানে, চুলগুলি রুক্ষ, জট বেঁধে গেছে, স্নান করে না বোধ হয় মাসখানেক হয়, শরীরে এক স্তর ময়লা জমে গেছে, গালে চোখের জলের ক্ষীণ শুষ্ক ধারা। ছেলেটার উপর আমার বড় করুণা হল। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা মার সঙ্গে দেখা করতে জেলে যাও না?" সীঠী বলে উঠল—"যাই মা।" বড় মেয়েটি বলল —"তিনমাস পরে একবার দেখা হয়। একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম। তারপরের বার তিনমাস বাদে যখন আমরা গেলাম তখন জানতে পারলাম যে, মাকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন আমরা কালীমায়ের সাথে এখানে চলে এলাম। কালীমা ভিক্ষে করে।"

"তোমরা রাতে কোথায় থাক? ঘুমাও কোথায়? ভয় করে না তোমাদের?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "জেলের কাছে একটা নালা আছে, আমরা সেই পুলের নীচে মার কথা বলতে বলতে ঘুমাই। কোন কোন দিন কালীমাও আমাদের কাছে শোয়।"

"কতদিনের শাস্তি তোমার মার?"

"দুই বছর" বড় মেয়েটি বলল—"আমরা রোজ জেলটাকে দেখি, আমাদের মাও ত ওখানেই আছে। যখন মা বার হবে আমরা তখন তাকে নিয়ে দেশে চলে যাব।" কল্পনার খুশিতে বালিকা পুলকিত হয়ে উঠল, মাকে নিয়ে যেন সত্যি দেশে যাওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কখনও স্নান কর?" লজ্জায় বড় মেয়েটি চুপ করে রইল। ছোট মেয়েটি বলল—"আমাদের কাছে আর কোন কাপড় থাকলে ত!" আমার ইঙ্গিতে আমার ছেলেমেয়েরা দৌড়ে গিয়ে কতকগুলি তাদের পুরোনো জামা-কাপড় নিয়ে এসে ওদের দিল। আমার মনটা উদাস হয়ে গেল, আমি ঘরে বসে ওদের কথাই ভাবছিলাম আর ওরা কাপড় পেয়ে খুব খুশি হয়ে চলে গেল। কিছুদূর থেকে গানের রেশ ভেসে এল—

"ম্যায় ও ডুবত হুঁ মঝধার পড়ী
মোরী বৈয়া পকড়কে উঠালেনা।"

অনেক সুন্দর সুন্দর পদ পড়েছিলাম, লিখেছিলাম, শুনেওছিলাম; কিন্তু স্বর ও আত্মার, শব্দ ও বস্তুর এমন সুন্দর মিল আর কোথাও দেখিনি। আমি ওদের আবার ডেকে পাঠাব ভাবছিলাম; কিন্তু তখন ওরা অনেক দূরে চলে গেছে।

(৩)

এই ঘটনার পরের দিন আমিও অহিংস সত্যাগ্রহ করে জেলের অতিথি হলাম। আমার অন্য ছেলেমেয়েরাও হাসিমুখে আমায় বিদায়

দিল, কিন্তু সবচেয়ে ছোট মিন্‌ু আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না অতএব ওকে সঙ্গে নিতে হল। ওই সময় জব্বলপুর জেলে অন্য আর কোন রাজবন্দিনী ছিল না, সেজন্য আমাকে এক হাসপাতালে রাখা হল। আমার সেবার জন্যে দুইজন সাধারণ স্ত্রী কয়েদী রাখা হল; তারা রাত্রেও আমার কাছে থাকত। সেখানে দিনে সবাই একসাথে থাকতে পারত। জেলের জগৎটা একটু বিচিত্র।

ও কে? চোর!

ও? ও চরস বেচত; আর ঐ কয়েদীটা নিজের সদ্যজাত শিশুকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু মা হয়ে নিজের সন্তানকে কেউ মারতে পারে, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। আর ঐ মেয়েটি? ওর খুব কম বয়েস! ও কি করেছিল? ও স্বামীকে আর শাশুড়ীকে বিষ দিয়েছিল!! আমি কেঁপে উঠলাম, হা ঈশ্বর, ওকি সত্যি নারী! ওকি তোমারি সৃষ্টি! কিন্তু এই সময় ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল—'এ তো ছবির এক পিঠ। অন্য দিকটাও দেখ, ওরা হয়তো নির্দোষ, হয়তো বা দেবী।'

আমার সেবার জন্য যে স্ত্রী কয়েদী নিযুক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে একজন ছিল বড় অলস কিন্তু আর একজন খুব কাজের; সে ছিল প্রৌঢ়া। ওর কোলে একটি ছোট ছেলে ছিল। বেশীর ভাগ সময়ই ও চুপ করে থাকত, যেন সব সময়ই কিছু চিন্তা করছে। আমার মেয়ে মিনুকে এমন ভালবেসে ফেলল যেন মিনু ওরই মেয়ে। ওর নিজের ছেলে হেঁটে বেড়াত আর মিনু থাকত ওর কোলে। ও জল ভরতে যায় ত মিনু সঙ্গে আছে, ডাল ভাঙ্গে মিনু আছে, বাসন মাজবার সময় মিনুকে ছোট ছোট বাটি, গ্লাস ধুতে দেখা যেত। তারপর এমন হল যে, ও মিনুকে পিঠে বেঁধে ঘর ঝাড় দিত। ওর নাম ছিল লখিয়া। লখিয়া ও মিনুর এই স্নেহের সম্পর্কে লখিয়ার ছেলের যে অভাব হত সেটা আমি মিনুর ফল ও মিষ্টি লখিয়ার ছেলেকে খেতে দিয়ে পূরণ করতে চেষ্টা করতাম। ও প্রায়ই আমার কাছে খেলা করত। ফল ও মিষ্টি খেয়ে লখিয়ার ছেলের এবং জল ভরে বাসন মেজে, বাগানে দৌড়োদৌড়ি করে মিনুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে দেখা গেল। আমি প্রায়ই ভাবতাম লখিয়া কে? ও জেলে কেন এসেছে? একদিন মেট্রনকে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে সে বলল—"ও এক সাংঘাতিক মেয়েমানুষ, ও পুলিশকে মেরেছিল—পুলিশকে! কিন্তু আমি ওর মাথা ঠিক করে দিয়েছি। আপনাকে ও কোন কষ্ট দেয় না?" হঠাৎ আমার সেই ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ল। ওদের মাও ত পুলিশকে মেরে জেলে গিয়েছে আর তার সঙ্গেও ত একটা ছোট ছেলে ছিল। আমি কতবার মনে করেছি জিজ্ঞেস করব, কিন্তু লখিয়ার উদাস গম্ভীর মূর্তি দেখে কিছু বলবার সাহস হয় নাই। একদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হল। খুব গর্জন করে মেঘ ডাকল, বিদ্যুৎ চমকালো। আমার নিজের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়তে লাগল। ছোট ছেলেটা ভয় পেয়েছে নিশ্চয়। আলাদা বিছানায় শুয়ে থাকলে ও এসে মেঘ ডাকলে আমার কাছে শোয়। এই সাথে আমার সেই তিনটি ছেলেমেয়ের কথাও মনে পড়ল যারা পুলের নীচে রাত্রে ঘুমায়। যদি কিছু......আর ভাবতে সাহস হল না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম "হে ঈশ্বর, সকল মায়ের সন্তানদের তুমি মঙ্গল কর আর আমার ছেলেমেয়েদের তুমি রক্ষা কর।

(৪)

জেলে আমার কাছে খবরের কাগজ আসত। জেলের সমস্ত কয়েদী স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধের খবর শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকত। ওদের বিশ্বাস ছিল একদিন এমন হবে যে জেলখানার দরজা ভেঙ্গে যাবে আর ওরা তার আগেই বেরিয়ে যেতে পারবে। আমিও ওদের য়ুরোপের যুদ্ধের খবর আর ভারতবর্ষের সত্যাগ্রহের খবর পড়ে শোনাতাম। ওইদিন বিকেলে খবরের কাগজ এলে আমি পড়তে পড়তে এক জায়গায় থেমে গেলাম। জব্বলপুরেরই খবর ছিল—

"কাল সমস্ত রাত্রি খুব বৃষ্টি হইয়াছে। জেলের নিকট নালার মধ্যে তিনটি গরীব ছেলেমেয়ে ভাসিয়া গিয়াছে। তিনজনেরই লাশ পাওয়া গিয়াছে। দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে। শোনা যায় তাহারা গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত।"

আমার চোখের সামনে হঠাৎ সেই সঙ্গীতরত তিনটি ছেলেমেয়ে ভেসে উঠল। মনে হল যেন দূর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে—

"ম্যারও ডুবত হৈ মঝধার পড়ী,
মোরী বৈয়া পকড়কে উঠালেনা।"

খবরের কাগজটা রেখে আমি চোখের জল চাপতে চেষ্টা করলাম। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বের হল "আহা, ছেলেমানুষ!" লখিয়া কাছেই বসে আমার জন্য চা তৈরী করছিল। জিজ্ঞেস করল "কি খবর দিদিমণি! আরে অমন হয়ে পড়লে কেন? ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ছে বুঝি?" আমি ওকে কিছু বলতে পারলাম না। ও আবার বলল—"আর কদিন! কেটেই যাবে। আর ছেলেমেয়েরাত তাদের বাবার কাছেই আছে। এত চিন্তা কর কেন?" ওর দিকে তাকাবার সাহস আমার ছিল না; কিন্তু বুঝতে পারলাম ও দীর্ঘনিশ্বাস নিল আর দু'ফোঁটা চোখের জল মুছে ফেলল। আমি সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলাম, "লখিয়া, তোর কি আরো ছেলেমেয়ে আছে না কেবল এই একটি?" চোখে জল ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি হেসে ও বলল, একটা কেন হবে! (আমার মেয়েকে দেখিয়ে) ওই মেয়েটিওত আমার!" আমি বললাম—"ও ত জেলের ভিতরে; জেলের বাইরে কয়টি আছে?" লখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল,—"জেলের বাইরে, দিদিমণি! তারা ত ভগবানের, নিজের কেমন করে বলি?" এরপর ও কাগজের খবর জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আমি ওকে কিছু বলতে পারলাম না।

অনুবাদিকা—**জয়ন্তী দেবী**

ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সঙ্কট

শ্রীঅনিলকুমার বসু

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, যখন ব্রিটেন বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণে ব্যস্ত, জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণে ব্রিটিশ-চমূ পলায়নপর, ফ্ল্যাণ্ডার্সের শোণিত-স্রাবী যুদ্ধকাহিনীতে সংবাদপত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠা রোমাঞ্চিত, জার্মানীর V-1, V-2 প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক বোমা-বিদারণে লণ্ডন শহর কম্পমান, সেই সময় নিপীড়িত জাত্যাভিমানী প্রত্যেক ভারতবাসী উৎপীড়ক ব্রিটিশ শাসকের শোচনীয় অবস্থার কাহিনী পাঠ করিয়া প্রতিহিংসা নিবৃত্তির পরোক্ষ উপায় হিস্যাবে প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্যকালীন চায়ের মজলিস-গুলি নানাবিধ আষাঢ়ে গল্পের রসে রসায়িত করিয়া তুলিত, সেই রস-চক্রে অন্তঃপুর-চারিণীরাও সমান তালে রস বিতরণে কার্পণ্য করিতেন না, বহিঃপ্রকোষ্ঠ ও অন্তঃপুর একই আলোচনায় মুখরিত থাকিত। সেই সময় ইংরাজ প্রভুর কোণ ঠাসা অবস্থা ও ধরাশায়ী মূর্তি আমাদের এতখানি উল্লসিত করিত যে ইংরাজের পরাজয়েই বুঝি আমাদের দাসত্ব শৃঙ্খল বিনা বাধায় আপনিই খসিয়া যাইবে এইরূপ আত্মপ্রসাদের অহিফেনে আমরা মোহাচ্ছন্ন ছিলাম। কিন্তু গত ১৫ই আগস্ট হইতে ভারতের মুক্তিদিবস পালিত হইবার পর আমাদের মনের সেই গোপন প্রতিহিংসার ভাবটি করুণার রসে দ্রব হইয়া সমস্ত বিশ্বকেই প্রেম-মন্দাকিনী-বারিতে স্নিগ্ধ করিতে সহস্র ধারায় প্রবাহিত, তাই আজ ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সংকটে আমরা গোপন-উল্লাস বোধ করি না, বরং ইহার পিছনে আমাদের নিজেদের সংকটের ছায়ামূর্তিই যেন দেখিতে পাই। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সংকট সমস্ত ইউরোপের সংকট, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের সংকট, বৃহত্তর পরিব্যাপ্তিতে সমস্ত বিশ্বের সংকট, ব্রিটিশের সংকটে তাই আমাদের মুখ বুজিয়া হাত পা ছাড়িয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, কারণ এই সংকটের দীর্ঘ কালো ছায়া অচিরে আমাদের রাষ্ট্রীয় আকাশকেও ছাইয়া ফেলিতে পারে। কাজেই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে সেই হুসিয়ারী পরোয়ানা, "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুসিয়ার!" এই জন্য ভারতের অর্থসচিবও সাম্প্রতিক বিবৃতিতে এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন,—ব্রিটেনের সংকট আমাদেরও সংকট, ব্রিটেনের সমস্যা আমাদেরই সমস্যা এবং মুখ্যতঃ তাহা এক, কাজেই ব্রিটেনের সংকটকালীন অবস্থাটা জানা থাকিলে আমাদের অবস্থার প্রতিচ্ছবিটাও ধরা যাইবে, এবং সেই অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার যথাবিহিত ব্যবস্থাও অবলম্বন করা যাইতে পারিবে।

ব্রিটেনের সমস্যাটা অধুনাতন ডলার-দুর্ঘটের জলছবিতেই চিত্রিত হইয়াছে এবং সেই রূপেই জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হইয়াছে। সহজ কথায়, আমেরিকা হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য দিবার উপযুক্ত ডলার সংস্থান ব্রিটেনের নাই। এই সূত্রটিকে একটু সম্প্রসারিত আকারে বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে ইদানীং গ্রেট ব্রিটেনে যুদ্ধজনিত প্রতিক্রিয়ার ফলে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন এতখানি হ্রাস পাইয়াছে যে বঞ্চিত জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহাকে আমেরিকা হইতে ঐসব দ্রব্যসম্ভার রাশিরাশি আমদানি করিতে হইতেছে। এইসব দ্রব্য সম্ভার যে শুধু আশু প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই চালান হইতেছে তাহা নহে। পরন্তু উহাদের প্রয়োগের ফলে যাহাতে ব্রিটেনের কল-কারখানাগুলি সম্প্রসারিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া অধিক পরিমাণে স্থায়ীপণ্য (durable and production goods) উৎপাদন করা যাইতে পারে, সেই অভিপ্রায়েও ঐসব পণ্যদ্রব্যের আমদানি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধকালে ঋণ-ইজারায় (Land-lease) আমেরিকার কাছ হইতে ধার পাওয়া যাইত বলিয়া এতদিন এই সংকটের উদয় হয় নাই, কিন্তু উক্ত চুক্তির মেয়াদ অবসানের পর হইতে ইদানীন্তন ডলার-দুর্ঘট-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তি অনুসারে গ্রেট ব্রিটেন আমেরিকার কাছ হইতে যে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ বাবদ পাইয়াছিল, তাহার সাহায্যে সমূহ বিপদকে অন্ততঃ ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঠেকাইয়া রাখার প্রয়াস করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত ঋণ যে বর্তমান বর্ষেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, প্রত্যেকের ধারণা ছিল এই ঋণ সাহায্যে গ্রেট ব্রিটেন তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনঃসংস্কার করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধিলাভে সক্ষম হইবে এবং এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আমেরিকা হইতে পণ্য আমদানির প্রয়োজনও সংকুচিত হইয়া আসিবে। কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে অনুরূপ ফললাভে সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হই ইংলণ্ডের উৎপাদন ক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে এইরূ ঊষর মরুতে পরিণত হইয়াছে যে আমেরিক নিঃসৃত ঋণ-প্রবাহিনী এক বৎসরের মধ্যে শোষিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এখ কিভাবে এই পরিণতি ঘটিল তাহা একা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। ২১শে আগস তারিখে Dr. Dalton পার্লামেণ্টে জানাইয় ছেন যে, দৈনিক আনুমানিক ৩০ মিলিয় ডলার ব্রিটেন কর্তৃক ব্যয়িত হইতেছে। ১৫ আগস্টের পূর্ববর্তী পাঁচদিনের মধ্যে ব্রিটেনকে আমদানি মূল্যে বাবদ আমেরিকার হস্তে ১৭ মিলিয়ন ডলার প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছে ইহারই অব্যবহিত পরে আরও ৬৩ মিলিয় ডলার আমেরিকাকে পরিশোধ করিতে হইয়াছে ইহা ছাড়া আমেরিকা-প্রদত্ত ঋণভাণ্ডার হইতে ব্রিটেনকে আরও ৭৫ মিলিয়ন ডলার দুই দফায় তুলিতে হইয়াছে। এইভাবে ডলার-ঋ ক্ষয়িত হইয়া মাত্র ৩০০ মিলিয়ন ডলা অবশিষ্ট আছে। এইরূপে দৈনিক ৩০ মিলিয় ডলার ক্ষয়িত হইলে কুবেরের ভাণ্ডারও অচিরে শূন্য হইয়া যায়, ব্রিটেনের সামান্য ভাণ্ডার কোন ছার। কাজেই—এই পলে পলে ক্ষয় রোগের চিকিৎসার জন্য ব্রিটেন পূর্ণ শা নিয়োগ করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধে ব্রিটেনকে যেমন বিপুল রণসম্ভারের আয়োজন করিতে অপরিসীম দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বর্তমানে আর্থিক সংকট জ করিবার জন্যও অনুরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের পরোয়ান ইতিমধ্যেই ঘরে ঘরে জারি হইয়া গিয়াছে। এই কৃচ্ছ্র সাধনার মূল ভূমিকা হইল বহিরাগত আমদানির পরিমাণ হ্রাস করিয়া দেশজাত দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি এরূপভাবে বৃদ্ধি কর যাহা দ্বারা বাণিজ্য-লক্ষ্মী ব্রিটেনের অঙ্ক শায়িনী থাকেন। অর্থাৎ ব্রিটেনের "Balance of payments" নিজের অনুকূলে রাখা বিদেশীয় পণ্য গ্রহণে সংযম প্রকাশ করিয় স্বদেশীয় পণ্যের ষোড়শোপচারে ধনাধিষ্ঠাত্রী আরাধনা করাই ব্রিটেনের মূলগত উদ্দেশ্য কিন্তু "প্রসীদ" বলা মাত্রই দেবী প্রসন্না হন না আশানুরূপ বরলাভের জন্য কিঞ্চিৎ ধৈর্যের ও স্থৈর্যের প্রয়োজন। তার কৃচ্ছ্রসাধনার একট ফল আছে বৈকি। পূর্বোক্ত সংযম-সাধনার ফলে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে ব্রিটেনের প্রতিকূলে বাণিজ্যের

পরিমাণ ৬০০ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে কমিয়া ৩৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড ও ৪০০ মিলিয়ন পাউণ্ডের মাঝামাঝি কোথাও দাঁড়াইবে।

খতিয়ান করিলে দেখা যায় যে, বর্তমান খাদ্যশস্য আমদানি বাবদই ব্রিটেনকে মোট দেয় ডলারের অর্ধাংশ ব্যয় করিতে হয়, কাজেই কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে এই দিকের চাপটা কিছুটা কমিয়া যাইবে। এতদুদ্দেশ্যে ব্রিটেনের প্রত্যেক কৃষিজীবীকে এই বলিয়া জোর তাগিদ (যাকে একরকম বলা যায় "battle orders") দেওয়া হইয়াছে যে আগামী চার বৎসরের মধ্যে কৃষি পণ্যোৎপাদন ন্যূনপক্ষে ১০০ মিলিয়ন পাউণ্ড পরিমিত বাড়াইতে হইবে। এই দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলে ডলারের উপর অর্ধেক চাপ লাঘব হইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "Agriculture is truly called a great dollar saver." সঙ্গে সঙ্গে সকলকে এই বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছে যে উপরোক্ত পরিমাণ পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি না ঘটিলে সমস্ত দেশই রসাতলে যাইবে (Produce or perish)। কৃষিজাত পণ্যের সাথে সাথে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশেষ করিয়া শিল্পপণ্যের মধ্যে ব্রিটেনে কয়লা উৎপাদনের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্বে কয়লা-উৎপাদন এতখানি হ্রাস পাইয়াছিল যে লণ্ডন শহরে কয়েক দিবস মোমের বাতি জ্বালাইয়া কার্য নির্বাহ করিতে হইয়াছিল। সেই কয়লা সঙ্কট ব্রিটেন এখনও সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই, যে পর্যন্ত কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া রপ্তানিযোগ্য না হইবে সেই পর্যন্ত ব্রিটেনের চেষ্টার বিরাম থাকিবে না। এককালে "To send coal to Newcastle" এই idiomটি "তেলে মাথায় তেল ঢালার" অর্থেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু যিনি এই idiomএর রচয়িতা, তিনি আজ ব্রিটেনের কয়লা সঙ্কটকালে জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই ইহার অর্থ পরিবর্তন করিয়া নিতান্ত স্বাভাবিক অর্থেই উহার ব্যবহার করিতেন। বর্তমানের ভাষাবিদ্‌গণ সাম্প্রতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বাহুল্য অর্থে উক্ত কথাটির প্রয়োগ করিতে বোধ হয় দ্বিধা বোধ করিবেন। সে যাক, সাময়িক কয়লা-সঙ্কট দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত উহার সমাধান করিবার প্রয়াসে ইংরাজ বদ্ধপরিকর। কবির কথায় "যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।" কাজেই ব্রিটেনের কয়লা-উৎপাদন স্রোত কার্যকারণে ব্যাহত হইলেও ভবিষ্যতে ঐ স্রোত আপন চলার পথ আপনিই বাহির করিয়া নিবে। এই প্রসঙ্গে Mr. Herbert Morrison, Lord President of the Council-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য;

"It begins to look as if we have stopped the rot in coal. We are determined not to rest before we can sustain not only a larger industrial effort here, but an increased industrial effort on the continent out of the yields of our mines. It would be a mistake to assure that we will be unable to resume export of coal to Europe as early as next year."

মোটকথা আকাশই ভাঙ্গিয়া পড়ুক, কিংবা ধরণী রসাতলে যাক্, ব্রিটেন যেন তেন প্রকারেণ পণ্যোৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে কৃতসঙ্কল্প।

উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে কৃচ্ছ্রসাধনেরও একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। এযাবৎ কৃচ্ছ্রসাধনার ভাবনা আমরা পুরাকালের বশিষ্ঠাশ্রম, কন্বাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম, নিদেনপক্ষে আধুনিক কালের বেলুড় মঠেই নির্বাসিত করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই ভাবনা-শিশু যে ইতিমধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই দুর্বাসারূপে আমাদের দ্বারেই এই বলিয়া করাঘাত করিবে —অয়মহম্ ভোঃ, "আমি এসেছি," তাহাত আমরা সঠিক ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। কাজেই চিরকাল সুখস্বাচ্ছন্দে প্রতিপালিত ইংরাজ বণিকের শেষ পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনার আহ্বানে সাড়া না দিয়া অলস মাথায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। ইংরেজ-প্রভুকেও "সঙ্কট দুঃখত্রাতার" তুষ্টি বিধানের জন্য বহিরিন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার বিলাস, বাসন ও সম্ভোগ রোধ করিয়া শেষপর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনার যোগাসনে উপবিষ্ট হইতে হইল। এই কৃচ্ছ্রসাধনার অনুশাসনগুলি কি তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা যাক। প্রথমেই আহার (food), দ্বিতীয় বিহার (foreign travel) প্রভৃতির উপর বাধা-নিষেধ আরোপের ফলে দেখা যায় যে বহিরাগত আমদানির পরিমাণ বৎসরে ২৩৩ মিলিয়ন পাউণ্ড কমিয়া যাইবে। আহারের দিক দিয়া কঠোর সংযম অভ্যাস করা হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ সাপ্তাহিক মাংসের বরাদ্দ দুই পেনি কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, চায়ের বরাদ্দও অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। বিলাসবাসন-উপকরণের (Luxury goods) আমদানীর পথে কঠোর সংযম ও বাধানিষেধের গগনস্পর্শী প্রাচীর খাড়া করা হইয়াছে। ফলে কতিপয় বর্ষ ধরিয়া ইংরেজ চতুরিকা ও মালবিকা দলের প্রসাধনোপকরণগুলি যে আমেরিকা হইতে আমদানি হইত তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। সখের হাওয়া-পরিবর্তনের জন্য (pleasure trip) এতদিন যে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মেদ-বহুল ধনীর দুলালরা (Lamb-এর ভাষায় "lump of nobility") ও মধুচন্দ্রিমা উদযাপনের জন্য প্রণয়ীযুগলরা অকাতরে বিদেশে ব্যয় করিতেন তাহা একপ্রকার নিষিদ্ধ হওয়ায় বাৎসরিক অনুমান ৩৩ মিলিয়ন পাউণ্ড ইংলণ্ডের বাঁচিয়া যাইবে। মোটামুটি কৃচ্ছ্রসাধনার অনুশাসনগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

		£
বিদেশাগত খাদ্য	...	১৪৪,০০০,০০০
বিদেশাগত সিনেমা	...	১১,০০০,০০০
কাঠ	...	১০,০০০,০০০
পেট্রল	...	১০,০০০,০০০
অপরাপর ভোগ্যদ্রব্য	...	৫,০০০,০০০
বহির্ভ্রমণ	...	৩৩,০০০,০০০
বিদেশে সামরিক ব্যয় সঙ্কোচ		২০,০০০,০০০
মোট		£ ২৩৩,০০০,০০০

উপরোক্ত কৃচ্ছ্রসাধনা আমাদিগকে বৃহস্পতি পুত্র কচের মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যালাভের জন্য কঠোর তপস্যার কাহিনীই স্মরণ করাইয়া দেয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য গুরুকন্যা দেবযানীর সেবাপরায়ণতা ও অতিথি-বাৎসল্যেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মার্কিন দেবযানীর সেবাপরায়ণতা ও বাৎসল্যের যেন উল্লেখযোগ্য অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তি যে সকল কঠোর সর্তাবলীর অনুশাসনে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে বাৎসল্যের স্থলে সনাতন কাবুলিওয়ালা-মনোবৃত্তিই সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। উক্ত চুক্তির ৮নং সর্ত হইল—বর্তমান বর্ষের ১৫ই জুলাইর মধ্যে ইংলণ্ডের দেয় যাবতীয় ষ্টার্লিং-ঋণের একটি সন্তোষজনক বিলিব্যবস্থা না হইলে উক্ত দিবাবসানের পর হইতেই ষ্টার্লিং দেনা বাধ্যতামূলকভাবে ডলারে রূপান্তরিত করা যাইবে। সত্যই "এবড় কঠিন ঠাঁই গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।" ৯নং সর্ত হইল এই যে গ্রেট বৃটেন আমেরিকার কাছ হইতে কোন জিনিস না কিনিবার কোন বিধিই অবলম্বন করিতে পারিবে না, এবং যে সকল পণ্য আমেরিকা হইতে কেনা যায় তাহা অন্য দেশ হইতে কদাচ কিনিতে পারিবে না। এ যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিবার মহাজনীসুলভ অপচেষ্টা। মার্কিন দেবযানী ছিল যতখানি উগ্র, ইংরেজ কচ ছিল ততখানি ব্যগ্র—মার্কিন ডলার ঋণ প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। কাজেই "পেটে খেলে পিঠে সয়" নীতি স্মরণ করিয়া যেকোন সর্তে মার্কিন দেবযানীর প্রেম না হইলেও কিঞ্চিৎ কৃপালাভের জন্য ইংরেজ কচকে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সে যাক্ ব্রিটিশের বর্তমান উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমেরিকা শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত দুইটি সর্তের প্রয়োগ আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছে। কাজেই ব্রিটেনের কিছুটা সুবিধা হইয়াছে বৈকি। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি বাণিজ্যিক স্বার্থব্যাপারে মার্কিন গুরু-কন্যার অনমনীয় মনোবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে কৃচ্ছ্রসাধনরত ইংরেজ কচের সিদ্ধিলাভে বিঘ্নোৎপাদন হইতেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকাতে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র প্রসারের কথাই তোলা যাক্। ব্রিটেনে আমেরিকান চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ফলে বৎসরে অন্যূন ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড লাভস্বরূপ মার্কিন অর্থকোষে সঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই দেয়ানেয়ার ভিত্তিতে মার্কিনরাজ্যে ব্রিটিশ-চলচ্চিত্র প্রসারের অনুরূপ সুবিধা দেওয়া হয় না, যাহার সাহায্যে ব্রিটেন কিছুটা মার্কিন ডলার অর্জন করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত রবার রপ্তানি করিয়া অন্যান্য দেশ আমেরিকার কাছ হইতে যেটুকু ডলার মুদ্রা এযাবৎ সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহা কেনাও আমেরিকা বাহির হইতে অনেকখানি কমাইয়া দিয়াছে। অধিকন্তু বহিরাগত উল না কিনিয়া নিজস্ব উল-শিল্প উন্নত ও সুগঠিত করিবার জন্য আমেরিকা শুল্ক-প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছে। আমেরিকার ভাবগতিকে ও কাজে কর্মে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে বাহিরের সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেই যেন তাহারা অধিকতর ব্যস্ত, কিন্তু সঞ্চিত অর্থের কিছুটা বিতরণ ও অপরকে দান করিতে যেন পরাঙ্মুখ। একদা ওলন্দাজগণ সম্বন্ধে যে উক্তি প্রযুক্ত হইত তাহা যেন আমেরিকার বর্তমান মনোবৃত্তিতে তাহাদের প্রতিই অধিকতর প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়—"They have one big fault—they give too little and want too much." এই মনোবৃত্তির দ্বারা নিজের লাভের অঙ্ক মোটা করা যায় বটে, কিন্তু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয়। এই দিক দিয়া আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন।

সমালোচকের দল এই সকল কঠোর সর্তাবলিতে ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তি সম্পাদনের জন্য শ্রমিক গভর্নমেণ্টের দূরদর্শিতার অভাবের নিন্দা করেন। তাহাদের এই দূরদৃষ্টির অভাবের জন্যই বর্তমান সংকটের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রমিক গভর্নমেণ্টের উৎপাদন-পরিকল্পনার নানা প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যও এই সংকট দেখা দিয়াছে। তাহারা বলেন শ্রমিক গভর্নমেণ্ট যদি নাতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার উৎপাদনে ততবেশী মনঃসংযোগ না করিয়া অত্যাবশ্যক শিল্পদ্রব্য, বা শিল্পপণ্য (goods of capital nature) উৎপাদনে বেশী যত্নবান হইতেন, তবে মার্কিন শিল্পপণ্য না কিনিয়া অপরাপর দেশগুলি ব্রিটিশ শিল্পপণ্য ক্রয়েই বেশী আগ্রহশীল হইত। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট—প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে কোন বৈষম্য না করিয়া বর্তমান সঙ্কট ডাকিয়া আনিয়াছেন।

Capital পত্রিকার মতে "Pre-occupation with nationalisation, lack of resistance to if not actual encouragement of workers' demands for higher wages, and shorter hours, retention and even intensification of controls which clog industry, continuance of bulk-buying, failure to recruit displaced persons (owing to submission to trade-union pressure) for the undermanned coalmining, textile, and agricultural industries have collectively put Britain in the tough spot she now is."

অর্থাৎ জাতীয়করণ পরিকল্পনায় সমধিক ব্যস্ত থাকায়, শ্রমিকদের কম কাজের ও বেশী বেতনের দাবি বিরোধিতা না করায়, যেসব নিয়ন্ত্রণনীতি দ্বারা শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয় তাহা বলবৎ রাখায়, পাইকারী পণ্যক্রয় নীতি অনুসরণ করায়, কয়লা, বস্ত্র ও কৃষিশিল্প কার্যে যথাযোগ্য লোক নিয়োজিত না করায় ব্রিটেনের বর্তমান সঙ্কট দেখা দিয়াছে। উপরোক্ত ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সংশোধন করিতে পারিলে ব্রিটেনের উৎপাদন ও রপ্তানি শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমান সমস্যার একটা ফলপ্রদ সমাধান সম্ভবপর হইবে। এই দিকে কয়লা-খননকারী শ্রমিকেরা সপ্তাহে একদিন বেশী কাজ করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় উৎপাদন পথের একটি প্রধান বাধা অন্তর্হিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলি এই চরম দুর্দিনে আর্থিক সাহায্য ও আমেরিকা হইতে যতদূর সম্ভব পণ্যদ্রব্য কম কিনিয়া ইংলণ্ডকে সর্বপ্রকার সহায়তা দানে অগ্রণী হইয়াছে। মোটের উপর যুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮ সালে রপ্তানি-পরিমাণ যাহা ছিল তাহার উপর শতকরা ১৬০ ভাগ রপ্তানি বৃদ্ধি না হইলে, ব্রিটেনের সংকট হইতে ত্রাণ পাইবার কোন পথ নাই। ইংলণ্ডের দুরবস্থা হইতে ভারতবর্ষ নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে প্রথম হইতেই সজাগ থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে। ব্রিটেনের যেসব অসতর্কতার জন্য বর্তমান দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে ভারতবর্ষকে গোড়া হইতে সেই সব নীতি বর্জন করিতে হইবে। ভারতকে বিদেশী মুদ্রা (foreign exchange resources) ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পরিকল্পনায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। এই সঙ্গে বহিরাগত আমদানির পরিমাণও সঙ্কুচিত করিতে হইবে। উপরোক্ত কর্মপন্থা সুগম করিবার জন্য আমদানি নীতির (Import policy) আমূল সংস্কার করা হইয়াছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফৎ বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণে নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসৃত হইতেছে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি সঙ্কোচন বিষয়ে ভারত গভর্নমেণ্টের কি মনোভাব তাহা বাণিজ্য সচিবের নিম্নপ্রদত্ত বিবৃতি হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে—

"I should like to make it clear that Government will give first priority only to imports of capital goods and to such essential goods as can contribute to increased production. For other goods, especially luxury goods, we must bid good-bye at least for sometime. This is essential because of our difficult foreign currency situation. Unless we restrict our needs of imprted goods to what we can meet from our exchange resources we shall be faced with a most critical position hereafter. It is, therefore, important to restrict and/or regulate imports of even essential goods. Government's import policy will consequently have to be frequently reviewed and revised, more and more in the direction of cutting down imports to a bare minimum. Simultaneously we shall have to think out and prepare a large scale export drive to balance our international payments."

অর্থাৎ পণ্য আমদানি ব্যাপারে সেই সব পণ্যের উপরই বেশী জোর দিতে হইবে যাহা উৎপাদন বৃদ্ধি কার্যে সহায়তা করিতে পারে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে বিশেষ করিয়া বিলাস উপকরণগুলির আমদানি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে। দেশের বিদেশীমুদ্রা কাঠিন্য হেতু এই নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যদি আমরা বিদেশী পণ্য আমদানি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ না করি যাহা আমাদের নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার হইতে ক্রয় করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বিরাট সঙ্কটের আবির্ভাব হইবে। কাজেই নিত্য-প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক বৈদেশিক পণ্য আমদানিও একপ্রকার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এই দিক দিয়া ভারতীয় গভর্নমেণ্ট বিশেষ মনঃসংযোগ করিবেন। ইহার উপর আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধিরও একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।" কাজেই দেখা যাইতেছে যে ব্রিটেনের সমস্যা ও ভারতের সমস্যা মুখ্যতঃ এক।
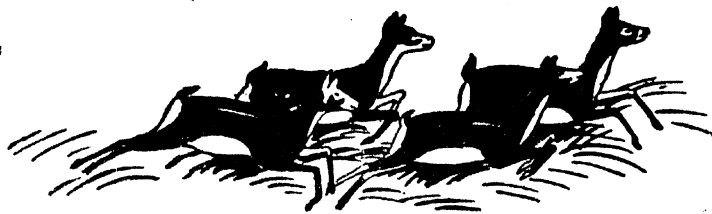
একপঞ্চাশৎ অধ্যায়

আট মাস পরে "গান্ধী-আরউইন" চুক্তির ফলে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিগণ জেল হইতে মুক্তি পাইলেন। প্রেসিডেন্সী জেল হইতে কল্যাণী দেবী, দমদম্ হইতে অমিয় এবং আলিপুর জেল হইতে অজয় মুক্তি পাইল। কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া অমিয় কল্যাণীকে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া গেলেন। অজয় কলিকাতায়ই রহিয়া গেল।

সেদিন বিকাল বেলা উত্তর কলিকাতার একটি অল্পপরিসর গৃহে বিমলদা আর অজয় বসিয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইবার পর আজ এই প্রথম উভয়ের সাক্ষাৎ হইল।

অজয় প্রশ্ন করিল—এই একটা বৎসর কি করলেন বিমলদা? বিমলদা হাসিয়া বলিলেন—তোরা সব কত কষ্ট করে জেল খেটে এলি আর আমি এই একটা বৎসর ধরে পালিয়ে পালিয়ে ফাঁকি দিয়ে বেড়ালাম।

অজয় হাসিয়া বলিল—পালিয়ে বেড়াতে পারেন কিন্তু তাই বলে ফাঁকি তো কেউ বলতে পারবে না। পালিয়ে বেড়ানোর যে কি দুঃখ তা তো আমরা জানি?

বিমলদা বলিলেন—আমি কি করেছি জানিস্ অজু—এই একটা বৎসর ধরে শুধু স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করেছি। জনসাধারণের ভিতরে আন্দোলনের প্রভাব কি হ'লো—কতটুকু তারা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হ'য়ে এলো এইটাই তো শুধু দেখলাম। এ আন্দোলনই তো শেষ আন্দোলন নয় রে—তা বোধ হয় মহাত্মাজীও জানতেন—আমরাও তাই অনুমান করেছি। ২১ সালের আন্দোলন—এবারকার আন্দোলন সবই হ'চ্ছে ভবিষ্যতে যে বিপ্লব একদিন প্রলয়ংকর রূপ ধরে নেমে আসবে তারই মহড়া—তারই ক্ষেত্র প্রস্তুতি।

অজয় প্রশ্ন করিল—কি দেখলেন?

সত্যি কথা বলতে কি অজয়, বাঙলাদেশে অনেক জায়গায়ই তেমন কোন আশার আলোক দেখতে পাইনি। কিন্তু সবচেয়ে আমাকে আকৃষ্ট করেছে—মেদিনীপুর জেলা। তাছাড়া আরামবাগ, মহিষবাথান এখানেও লোকের অপূর্ব দৃঢ়তা দেখেছি। মেদিনীপুরের প্রায় সর্বত্রই লোকে ট্যাক্স দেয় নাই—লাঠির আঘাত সহ্য করেছে—তাদের আসবাবপত্র নীলাম করে নিয়েছে—বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবু তারা ভেঙে পড়েনি। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ছেলেমেয়ে নিয়ে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে—তবু তারা দুই এক টাকা ট্যাক্স দিয়ে নির্বিবাদে সংসার পেতে বসেনি। অন্যান্য স্থানেও যে কিছু কিছু এমনি দৃঢ়তা দেখা না গিয়েছে এমন নয়—কিন্তু সে এদের তুলনায় অতি নগণ্য। এর একটা কারণ আমি নিজের মনে খুঁজে পেয়েছি অজয়—মেদিনীপুর আরামবাগ, মহিষবাথান প্রভৃতি স্থানে যারা এমনি করে ট্যাক্স বন্ধ করে নিজেদের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিল—তারা সাধারণত কৃষক শ্রেণীর লোক—এ'রাই এই জেলায় আন্দোলনে অগ্রণী—কিন্তু বাঙলাদেশের অন্যান্য বহু স্থানেই আন্দোলন ছিল—মধ্যবিত্তের মধ্যে জোতদার শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁদের বাড়িঘর সম্পত্তির উপরে মায়া তাঁরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। জেলে—দ্বীপান্তরে—এমন কি ফাঁসি যেতেও তাঁরা পিছপা হননি—কিন্তু এই যে স্বল্প আয়ের পৈত্রিক সম্পত্তি—বাড়িঘর—এই দিয়েই অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবার বর্গ কোনপ্রকারে বেঁচে থাকে—বাস্তুভিটার এই মোহ—সম্পত্তির এই মোহ—তাঁরা কাটাতে পারেন নি। তাই যখনই নীলাম আরম্ভ হ'য়েছে—সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আরম্ভ হ'য়েছে সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের গতিও গিয়েছে অনেকখানি থেমে।

—গান্ধী-আরউইন চুক্তি—রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স—এসব সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন, বিমলদা?

—ভেবেছি ভাই। ভেবে আমার মন বারে বারে আশঙ্কায় শিউরে উঠছে। হয়তো এই চুক্তি—এই রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স দেশের চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে। গভর্নমেণ্ট পূর্ব থেকেই এজন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এই যে কংগ্রেসী আর বিপ্লবীগণের মেশামিশি—সরকার সব সময়ই একে অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখেছে। দিন দিন যে কংগ্রেসী আর বিপ্লবীগণের মেশামিশিতে কংগ্রেসের ভাবধারা এক অদ্ভুত বৈপ্লবিক ধারার দিকে অগ্রসর হ'য়ে যাচ্ছে—যে বিপ্লব মুষ্টিমেয় লোকের নয়—যে বিপ্লব একদিন সারা ভারতবর্ষের অগণিত নরনারীর ভিতরে ছড়িয়ে পড়বে—তারই সূচনা আজ দেখা দিয়েছে—বৃটিশ সরকার এ বুঝতে পেরেছে বলেই আজ বিপ্লবী আর কংগ্রেসীগণকে সর্ব-প্রযত্নে তফাৎ রাখতে চাইছে। কংগ্রেসের জনগণের উপরে অপূর্ব প্রভাব—আত্মত্যাগ—সেবাবৃত্তি আর বৈপ্লবিকগণের সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতা যদি একত্র সম্পূর্ণ মিশে যেতে পারে তবে সে আন্দোলন গভর্নমেণ্টের পক্ষে দমন করা অসম্ভব হ'বে। তাই আজ এই প্রচেষ্টা! তারই জন্য আজ প্রায় এক বাঙলাদেশ থেকে তিন হাজারের উপর যুবককে বিনাবিচারে আটকে রাখা হ'য়েছে। কংগ্রেস আন্দোলনে যাতে তারা না মিশতে পারে—কংগ্রেসের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিশে যাতে তারা দেশের জনগণের সঙ্গে সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপন না করতে পারে। আর এই উদ্দেশ্যে আজ এই চুক্তি—এই উদ্দেশ্যেই হ'বে রাউণ্ড টেবিল। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের—পার্লামেণ্টের সভ্যগণের আজ কংগ্রেসের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার আগ্রহের অন্ত নাই। তারা চায় কোন প্রকারের ভূয়া খানিকটা ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে তুলে দিয়ে—কংগ্রেসকে মডারেট করে ফেলতে—কংগ্রেস আর বিপ্লবিগণের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ আনতে। একবার যদি খানিকটা ক্ষমতা কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়, তবে কংগ্রেসের ভিতরে যারা প্রগ্রেসিভ্ দল তারা কখনও তা মেনে নেবে না ফলে আসবে বিরোধ—তারা করবে কংগ্রেস ত্যাগ—এতদিনের এত শক্তিশালী জাতীয় দল এমনি করে পঙ্গু হ'য়ে পড়বে। তাই তো আমার আশংকা অজয়। আজই হ'বে সত্যকার নেতৃত্বের পরীক্ষা। যিনি আজ জাতির কর্ণধার হ'য়ে আছেন—কি করবেন তিনি এই সঙ্কটে? ভুলে যাবেন এই ভূয়া ক্ষমতা লাভের মোহে—না সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছ করে অটল হ'য়ে রইবেন দাঁড়িয়ে—আমি সশঙ্কচিত্তে আজ শুধু তাই ভাবছি।

অজয় বলিল—কিন্তু যদি সত্য সত্যই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের খানিকটা ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা থাকে—তবে তা গ্রহণ করা উচিত হ'বে না দাদা?

—সত্যকার ক্ষমতা পেলে সব সময় গ্রহণ করা উচিত অজয় কিন্তু এ আমি নিশ্চয় করে বুঝে ফেলেছি ভাই—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সে ইচ্ছা আদৌ নাই। এ যাঁরা বৃটিশ জাতিকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই বলবেন। কিন্তু তবু যে ভাই কেন গান্ধীজী বুঝলেন না—এ আমি ভেবে পাই নে। হয়তো তিনি মানুষের ভাল দিকটাই শুধু দেখেন—মন্দ দিকটা ইচ্ছে করেই দেখতে চান না—জোর করে দূরে সরিয়ে রাখেন—এ হয়তো তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। —তাছাড়া এই একটা বৎসর ধরে আর কি দেখলাম জান? দেখলাম অত্যাচারের নগ্ন-মূর্তি! চট্টগ্রামের ঘটনার পর—কি যে নির্মম

পেতে শুতে আপনার প্রবৃত্তি হবে না।

আর আমার ভাগ্যে তো দেখছি জুটলো যাকে সেই ইস্কুলের বইয়ের ভাষায় বলে—দুগ্ধ ফেন-নিভ শয্যা।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ওঃ এই—কিন্তু অতিথি নারায়ণ যে!

অজয় শুইয়া পড়িয়া বলিল—বেশ।

বিমলদা কিন্তু এক অদ্ভুত—কোথাকার জল যে কখন কোথায় নিয়ে গড়ান—তা কেউ ভেবেও পায় না।

অপর্ণা ঘরের দরজা দিয়া পরদার ওপাশে যাইতে যাইতে বলিল—মনে কোন সঙ্কোচ রাখবেন না—ভাবুন এটা কাপড়ের পরদা নয়—ইটের দেয়াল।

অজয় বলিল—তথাস্তু।

কিন্তু অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বার বার করিয়া ভাবিলেও কখনও কাপড়ের পরদা যে ইটের দেয়াল হইয়া যায় না, তাহা বুঝিতে অজয়ের এতটুকু অসুবিধা হইল না। কিন্তু এই মেয়েটি তো দিব্য সপ্রতিভ—সে তো সকল সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সহজ হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেছে—আর রাজ্যের সঙ্কোচ আসিয়া চাপিয়াছে কি তাহারই মনে? ওপাশ হইতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়—পাশ ফিরিবার শব্দটি পর্যন্ত ভাসিয়া আসে—কতটুকুই বা ব্যবধান! এমনি একটি অপরিচিত তরুণীর সহিত তাহাকে এক ঘরে নিশি যাপন করিতে হইবে—ইহা যদি দুই দিন পূর্বেও কেহ তাহাকে বলিত—সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। অথচ এখন হইতে দিনের পর দিন এই তরুণীটির সহিত একই ঘরে শুধু বাস করিতে হইবে নয়—তাহাকে নিজের পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে।

প্রথম দর্শনেই অজয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল সেই সুন্দর মুখশ্রীর দিকে সাহস করিয়া চাহিতে পারে নাই। এখন অন্ধকারে তাহার নিমীলিত দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল অপর্ণার অপরূপ সৌন্দর্যের ছবি—তাহাই সে আপন মনের নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া লুকাইয়া একান্ত মুগ্ধের মত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ত্রয়পঞ্চাশৎ অধ্যায়

দুই দিন পরের কথা। দুপুর বেলা আহারাদির পর অজয় নিজের বিছানায় শুইয়া গায়ের উপরে লেপ টানিয়া লইয়া একটি রীতি-মত দীর্ঘ ঘুম দিবার যোগাড় করিতেছিল। ঘরের মাঝখানের পর্দাটি দিনের বেলা এক পাশে টানিয়া রাখা হয়। ঘরের ও-পাশে অপর্ণার বিছানার উপরে একখানি সমাজতন্ত্রবাদের ইংরাজী বই পড়িয়া আছে। অপর্ণা জানালা খুলিয়া পাশের বাড়ীর একটি বউয়ের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে। অজয় লেপটি ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। এই দুই দিনে আবহাওয়া অনেকখানি সহজ হইয়া আসিয়াছে—তাহারা দুইজনে পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া লইয়া দিব্যি সহজভাবে মিশিতেছে। এ যেন দুইটি পুরুষ বন্ধু একসঙ্গে বিদেশের একটি ঘরে বাসা বাঁধিয়াছে। অজয়ের বাইরে যাইবার হুকুম নাই—বিমলদা সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—একটি বিশ্বাসী বৃদ্ধ প্রত্যহ দুইবার আসিয়া বাজার করিয়া দিয়া খবর লইয়া যায়।

বিমলদা আর আসেন নাই—বিশেষ দরকার না হইলে আর শীঘ্র হয়তো আসিবেনও না। জানালা বন্ধ করিয়া অপর্ণা বিছানায় আসিয়া বসিল।

অজয় মুখ তুলিয়া বলিল—কি এত গল্প হচ্ছিল আপনাদের?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—ওসব আপনাদের শুনতে মানা। আমাদের ঘর-কন্নার ইতিহাস।

অজয়ও হাসিয়া বলিল,—না শোনাই ভাল—কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠে পড়া অসম্ভব নয়।

অপর্ণা বলিল—কপালে থাকলেই ওঠে। বউটি আজ কয়দিন ধরে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছিল। আজ একেবারে জানালার শিক ধরে ডাকলে—শুনুন না ভাই! অগত্যা দাঁড়াতে হলো—তারপর কত কথা, আগে কোথায় ছিলে? নামটি কি? কতদিন বিয়ে হয়েছে? কর্তাটি কি করেন—কেমন মানুষ? কতদূর পড়াশুনো করেছে? টকি সিনেমা দেখেছো—কি আশ্চর্য—ছবিতে কথা কয়? এই সব।

অজয় হাসিয়া জবাব দিল,—এ তো গেল প্রশ্ন, কিন্তু জবাবগুলো কি প্রকারের হলো শুনতে পাই কি?

অপর্ণা বলিল—অদৃষ্টের লিখন—বলতেই হবে। বল্লাম—আগে ছিলাম বালিগঞ্জের দিকে। নাম—সুষমা। বছর দুই বিয়ে হলো। উনি চাকরী বাকরী কিছু করেন না—দিনরাত বাসায় শুয়ে শুয়ে যাত্রার দলের গান বাঁধেন—তাতেই যা পান—দুটি মানুষের এক রকম চলে যায়। লেখাপড়া আমি বিশেষ করতে পারিনি ভাই—পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—চিঠি-পত্তোর লিখতে পারি—কোন রকমে ডিটেকটিভ নভেল পড়তে পারি। টকি সিনেমা দেখবার পয়সা কোথায় ভাই—বল্লাম যে কর্তাটির চাক্‌রী বাক্‌রী নাই।

অজয় হাসিয়া বলিল,—ইস্‌ এ যে দেখছি একেবারে পঞ্চতন্ত্রের বিষ্ণুশর্মাকেও ছাড়িয়ে গেলেন। নিজে বি-এ পাশ করে যদি কোন রকমে ডিটেকটিভ, নভেল পড়তে পারেন, তাতে আমার অবশ্য আপত্তির কোন কারণ নাই, কিন্তু আমাকে শেষটায় একেবারে যাত্রার দলের গান লিখিয়ে করে ছাড়লেন।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—তা ছাড়া উপায় কি বলুন। এমন সুস্থ সবল দেহ নিয়ে দিনরাত যে লোক ঘরের কোণে চুপটি করে বসে থাকে, তার অন্য আর কি পরিচয় দেওয়া চলতে পারে?

অজয় বলিল—তাতো হলো, কিন্তু যদি বলতো—কর্তার লেখা একটা গান শুনিয়ে দাও তো ভাই—কি করতেন তা হ'লে? অমনি কি সুর করে ধরে বসতেন—

রুহিদাস বাপ্‌ নীলমণি—
একবার মা বলে ডাক কানে শুনি?

অপর্ণা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিয়া বলিল,—এই যে হয়ে এসেছে আর কি, আর একটু চেষ্টা করলেই একেবারে খাঁটি যাত্রাওয়ালা!

অজয় হাসিয়া বলিল—সংসর্গজা দোষ-গুণা ভবন্তি! তারপর উভয়ে হাসিমুখে খানিকক্ষণ মৌন হইয়া রহিল।

পরে অপর্ণা মুখ তুলিয়া বলিল,—সেদিন বিমলদা এসে যখন বল্লেন—আপনার কথা, এমনি করে একসঙ্গে থাকার কথা—তখন সত্যিই ভারী ভয় হলো—কেমন মানুষ—কেমন স্বভাব কে জানে!

অজয় বলিল,—কিন্তু ভয় বলে কিছু একটা অন্ততঃ আপনার ভিতরে ছিল বলে তো আপনার মুখ দেখে মনে করতে পারি নাই। বরং আমার নিজের দিকটাই—

অপর্ণা বলিল,—ভয়কে জয় করেছিলাম—দুইদিন ধরে কেবল মনে মনে বলেছি—কিসের সঙ্কোচ—কিসের ভয়—আপনার মাথা যদি উঁচু করে রাখা যায়—কেউ তাকে অসম্মান করতে পারে না।

অজয় পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—কি আর করবেন বলুন! বিপাকে পড়লে—সাপে মানুষে একই স্থানে আশ্রয় লয়। কিন্তু কেমন মানুষ—কেমন স্বভাব—পরীক্ষার ফলাফলটা জানবার এখনও সময় হয় নাই বোধ হয়?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—পরের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনবার লোভ তো আপনার কম নয়।

অজয় বলিল,—কম নয় কি বলছেন বরং বলুন অত্যন্ত বেশী।

—যদি না নিরাশ হন।

যদি নিয়ে আমার কারবার নয়—আমার কারবার সত্যি নিয়ে।

—সত্যও অপ্রিয় হলে বলতে নাই—সুতরাং কিছু বলছি না। আপাতত ঘুমোন।

রাত্রে আহারান্তে অপর্ণা প্রশ্ন করিল—এখন ঘুমুবেন বুঝি?

অজয় বিছানায় গা এলাইয়া দিয়া বলিল,—কি আর করি?

"ক্যাপিটাল"এর দুই একটা চ্যাপটার, বুঝিয়ে দিন না।

অজয় হাসিমুখে বলিল,—বেশ লোক

ধরেছেন। আমিই ভাল বুঝে উঠতে পারি না—তা আবার অপরকে বুঝাব।

ভাল না পারেন—মন্দ করেই বোঝাবেন। আমি যে দন্তস্ফুট করতেই পারছি না—একে অর্থনীতি—তার সঙ্গে আবার রাজনীতি মেশান।

—কিন্তু এখন ভাল লাগছে না। আপনি তো দেখছি রাতদিন একটা না একটা পলিটিকস-এর বই নিয়ে মেতে থাকতে পারেন। পলিটিকস-এর মত নীরস জিনিস সব সময় ভাল লাগে না আমার!

—কিন্তু কি ভাল লাগে শুনি?

অজয় হাসিয়া বলিল,—ভাল লাগে? ভাল লাগে কিছুই না করা—চুপ করে নীল আকাশের গায়ের সাদা মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকা। মাঠের শেষে গ্রামের সবুজ রঙ যেখানে ফিকে হয়ে গেছে—সেই দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে কিছুই না ভাবা।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—এ যে দেখছি রীতিমত কবিত্ব। কোন অসুখ বিসুখের পূর্বাবস্থা কি না তাই বা কে বলবে?

অজয় বলিল,—কিন্তু কবিত্বকেই বা আপনি এত ছোট করে দেখছেন কেন বলুন তো? এ সংসার মরুভূমির মাঝে একমাত্র ওয়েসিস্ হলো কাবতা।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল—কবিতা? একদিন কবিতাও ভালবাসতাম অজয়বাবু—কিন্তু দুঃখের আগুনে পুড়ে মন যে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। বাবা ভাবনা চিন্তায় মারা গেলেন—দাদার কথা তো আপনারা সবই শুনেছেন। তাই আমারও বাকি জীবনটা এ ছাড়া অন্য চিন্তাও যে অন্যায় বলে মনে করি অজয়বাবু!

অজয় উঠিয়া বসিয়া বলিল,—আপনার কথা, আপনার দাদা সমীর সেনের কথা বলুন না আজ সব খুলে। আপনাদের কথা শুনবার যে প্রবল আগ্রহ আমার।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল,—বাবা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট জজ। কিন্তু সরকারী চাকুরে হলে হবে কি মনটি ছিল তাঁর খাঁটি স্বদেশী। সে যুগে সুরেন ব্যানার্জিকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করতেন। বাড়িতে বসে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে—স্বদেশের স্বাধীনতার আলোচনায় যখন তখন তিনি একেবারে মেতে উঠতেন। তাঁর শোবার ঘরে একখানা ছবি টাঙান ছিল—ছবিখানার নাম শিকার যাত্রা—মা পতি-পুত্রকে নিজ হাতে সাজিয়ে শিকারে পাঠাচ্ছেন। কতবার তিনি সেই ছবির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলতেন, কবে আমাদের দেশের এমন দিন আসবে—কবে আমাদের মেয়েরা এমনি করে নিজের হাতে সাজিয়ে পতি-পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাবে। এমনি করে আমরা ছোট বেলা থেকেই স্বদেশী ভাবাপন্ন হয়ে উঠলাম। কিন্তু এরই মধ্যে দাদা কলেজে পড়তে পড়তে একেবারে ঘোর বিপ্লবী হয়ে উঠলেন—আমাকেও সমস্ত বুঝিয়ে পড়িয়ে নিয়ে এলেন দলে টেনে। বাবা এর কিছুই জানতেন না—যখন জানলেন—তাঁর ভাবনার আর সীমা রইলো না। ছেলেকে তিনি বড় চাকুরে করতে চান নাই—চাকুরির উপরে তাঁর নিতান্ত বিরাগ—দাদাকে তিনি তাই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দিলেন—ইচ্ছে ছিল মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করার পর বিলেত পাঠিয়ে এফ আর সি এস কি ঐ রকম একটা কিছু পাশ করিয়ে নিয়ে আসবেন। ফিফ্থ ইয়ারে যে বার তিনি পরীক্ষা দিলেন—সেবার তিনি ফার্স্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষা আর তাঁর দেওয়া হলো না—মাস ছয়েক পরে দার্জিলিং-এর এক বাড়িতে দাদা, আমি আর যতীন নাম করে অন্য একটি ছেলে এই তিন জনে মিলে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী বোমার ফরমুলো নিয়ে পরীক্ষা কর্ছিলাম। পুলিশ কেমন করে খবর পেয়ে বাড়ি ঘেরাও করে একেবারে দোতালা পর্যন্ত ধাওয়া করলে। উপায়ান্তর না দেখে দাদা—আমাকে জাপ্টে ধরে দোতালা থেকে দিলেন লাফ্। সঙ্গে সঙ্গে যতীনও লাফিয়ে নীচেয় পড়লো। আমি রইলাম অক্ষত কিন্তু দাদা দুজনের চোট একা সাম্লাতে পারলেন না—পাশে একটা পাথরের উপরে তাঁর পাখানা গিয়ে পড়লো—চেয়ে দেখি তাঁর পায়ের হাড় একেবারে ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছে—তীরবেগে রক্ত পড়ছে ঝরে। নিজের ভাঙ্গা পায়ের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই বুঝতে পারলেন—এবার আর তাঁর রক্ষা নাই। আদেশ করলেন আমাদের পালিয়ে যাবার। আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে নিজের কোমর থেকে পিস্তল বের করে বল্লেন—যদি না পালাও তবে গুলী করবো—পুলিশের হাতে ধরা দেওয়া হবে না। আমি কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার কি হবে দাদা?

তিনি বল্লেন—সে চিন্তা আমি করছি—আমার আদেশ পালন কর শিগ্গীর। কিন্তু তবু অমনি করে তাঁকে ফেলে যেতে কেউ আমরা পারলাম না দেখে—তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলটি নিজের বুকের উপরে ধরে ঘোড়া টিপে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেহ তাঁর মাটিতে এলিয়ে পড়লো। আমার তখন জ্ঞান ছিল না—যতীন আমার হাত ধরে ছুটে একটা টিলার আড়ালে চলে এলো। সে আজ এক বছরের কথা। তারপর নানা জায়গায় ঘুরে অবশেষে বিমলদার কাছে এসে তাঁরই হাতে নিজের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছি। এইতো গেল ইতিহাস। কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ্চাপ থাকিবার পর অজয় বলিল—রাত হয়েছে এইবার ঘুমোন।

কয়েক দিন পরে একদিন সকালবেলা অজয় খবরের কাগজ খুলিয়া একেবারে বিস্ময় ও আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"হাওড়ার গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টর শশাঙ্ক লাহিড়ী আততায়ীর গুলীতে নিহত।" ঘটনার বিবরণে প্রকাশ—শশাঙ্ক জন দুই সঙ্গী লইয়া হাওড়া হইতে ৮।১০ মাইল দূরে পর্যন্ত বিপ্লবী সন্দেহ করিয়া জনৈক ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া গিয়াছিলেন—গতকল্য মধ্যরাত্রে এক মাঠের মধ্যে উক্ত বিপ্লবীটির সহিত তাহাদের এক খণ্ডযুদ্ধ হয়—ফলে শশাঙ্ক ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বিপ্লবীটির কোন সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

অজয় মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল—আজ বেলা ১২টায় তাহাদের স্টেসনে কলিকাতার ট্রেনখানি পেঁাছিবে সেই ট্রেনেই আজও নিত্যকার মত কাগজ গিয়া পেঁাছিবে—তারপর সেখান হইতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গিয়া পেঁাছিবে তাহাদের গ্রামে। তাহার জ্যেঠামণি প্রত্যহ এমনি সময় কাগজের আশায় বাহিরের ঘরে বসিয়া থাকেন। আজিও যথারীতি কাগজ গিয়া তাঁহার হাতে পেঁাছিবে—কাগজখানি খুলিয়াই কি যে অবস্থা হইবে তাঁহার—অজয় ভাবিতেও পারে না। হয়তো মূর্ছিত হইয়া

পড়িবেন—দুর্বল শরীরে এ আঘাত তিনি সহ্য করিয়া উঠিতে পারিবেন তো? এ সময়ে যদি অজয় তাঁহার কাছে থাকিতে পারিত তাহা হইলেও হয়তো অনেকখানি সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিত কিন্তু তাহার যে কোন উপায়ই নাই।

অপর্ণা সমস্ত শুনিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। জ্যাঠামণি যে অজয়ের প্রাণের কতখানি জুড়িয়া আছেন তাহা সে ইতিমধ্যেই জানিতে পারিয়াছিল। সমস্তটা দিন রাত্রি এমনি ভাবিতে ভাবিতে অজয়ের কাটিয়া গেল।

দিন পাঁচেক পরে বিমলদা আসিয়া বলিলেন—বাড়ি যাবে অজয়?

অজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল—যাবো বিমলদা—কোন খবর পেয়েছেন সেখানকার?

—তোমার জ্যেঠামণির খুব অসুখ অজয়—এত বড় আঘাতটা হয়তো সামলাতে পারবেন না। তোমার একবার দেখা করা উচিত।

অজয় বলিল—আমার মন যে জ্যাঠামণির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে বিমলদা—কেবল আপনার দেখা পাইনি বলে যেতে পারিনি। আজই আমি যাবো—বিপদ যদি আসে আসবে তাই বলে কি এ সময়েও এমনি আত্মগোপন করে থাকবো? বলিতে বলিতে অজয়ের দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল।

বিমলদা বলিলেন— আজ রাত ১২টার গাড়ীতে যেয়ো—দমদম্ স্টেসন থেকে উঠবে। কিন্তু একটা দিনের বেশী থাকতে পারবে না অজয়—পুলিশে খোঁজ পেলে আর ফিরে আসতে দেবে না—নিশ্চয় জেনো।

বিদায়ের প্রাক্কালে ছোট একটি পুঁটুলীতে খানদুই কাপড় জামা গোছাইয়া লইয়া—অজয়ের হাতে দিয়া অপর্ণা বলিল—অজয় বাবু!

অজয় বলিল—কি বলছেন?

কিন্তু অপর্ণা মিনিটখানেক কোন কথা বলিতে পারিল না—মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে মুখ তুলিয়া বলিল—খুব সাবধানে থাকবেন। ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার মন কিন্তু কিছুতেই স্থির হবে না জানবেন। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। ইহা অজয়ের নিকট এক অদ্ভুত ব্যাপার! মাত্র কয়টা দিনের পরিচয় তাহারই মাঝে যে কেহ তাহার জন্য এমনি করিয়া চোখের জল ফেলিতে পারে ইহা তাহার ধারণার অতীত।

সে হাসিয়া বলিল—বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে পতিপুত্র নিয়ে পরম মঙ্গলময়ীরূপে যাঁরা বিরাজ কচ্ছেন, এ যে একেবারে তাদেরই মতো কথা হলো—বিপ্লবী অপর্ণা সেনের মত তো নয়।

—বিপ্লবী হতে পারি কিন্তু তাই বলে—নারীত্বকে তো বিসর্জন দিই নাই?

অজয় পরম হৃষ্টমনে বলিল—তোমার অনুরোধ মনে রাখবো অপর্ণা—খুব সাবধানেই থাকবো।

অজয় বাহির হইয়া গেলে—কতক্ষণ বাহিরের দরজা ধরিয়া চুপ করিয়া পথের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া অপর্ণা দরজা বন্ধ করিল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

গত ১লা আশ্বিনের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে কোন পত্রলেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—গত ১৫ই আগস্টের পরে অর্থাৎ ভূতপূর্ব "ছায়া" সচিবসংঘ কায়া গ্রহণ করিবার পরে কি নিম্নলিখিত সরকারী চাকুরীয়াদিগের মাসিক বেতন নিম্নলিখিতরূপে অসাধারণ বর্ধিত হইয়াছে?—

(১) সুকুমার সেন—২২৫০, টাকা হইতে ৩৭৫০. টাকা; (২) এস বন্দ্যোপাধ্যায়—৩০০০, টাকা হইতে ৩৭৫০, টাকা; (৩) বি কে গুহ—২২০০. টাকা হইতে ২৭৫০, টাকা; (৪) এস কে গুপ্ত—২১৫০, টাকা হইতে ২৭৫০, টাকা; (৫) কে সি বসাক—২১০০, টাকা হইতে ৩০০০, টাকা; (৬) আর গুপ্ত—২০০০, টাকা হইতে ২৭৫০, টাকা; (৭) কে কে হাজরা—২০০০, টাকা হইতে ২৭৫০, টাকা; (৮) এস কে চট্টোপাধ্যায়—২০০০, টাকা হইতে ২৭৫০, টাকা; (৯) এস গুপ্ত—১২০০, টাকা হইতে ২৫০০, টাকা; (১০) এস এন চট্টোপাধ্যায়—১১৫০, টাকা হইতে ২০০০, টাকা।

আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এই ভাগ্যবান দশজন ভারতীয় চাকুরীয়ার পদোন্নতি হইয়াছে এবং বিদেশী আমলাতন্ত্রের আমলে যে পদের যে বেতন ছিল, তাহাই অপরিবর্তিত রাখিয়া স্বদেশী সচিবসংঘ তাঁহাদিগকে বর্ধিত বেতন দিতেছেন। 'ইন্দিরার' পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"বড় হইলে দর বাড়ে। রাজার কৃপায় বা আমাদের কৃপায় যাঁহারা বড় হয়, তাঁহারা বড় হইলেও আপনার দর বাড়াইয়া বসেন। এমন কি, পুলিশের জমাদার যিনি এক টাকা ঘুষেই সন্তুষ্ট দারোগা হইলেই তিনি দুই টাকা চাহিয়া বসেন; কেননা বড় হইয়া তাঁহাদের দর বাড়িয়াছে।"

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যায়—ভারতসচিবের সহিত চুক্তিতে যাঁহারা চাকুরী করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা, এদেশের অধিবাসী হইলে ও চুক্তিকালে চুক্তি-নির্দিষ্ট বেতন অবশ্যই দাবী করিতে পারিলেও—পদের হিসাবে বেতন দাবী করিতে পারেন কি? যদি না পারেন, তবে কিজন্য তাঁহাদিগকে চুক্তি-নির্দিষ্ট বেতনের অধিক বেতন দেওয়া হয়? বিদেশী চাকুরীয়ারা উচ্চপদে থাকিবার পরে বিদায় লইয়া তাঁহাদিগের স্বদেশে যাইতেন। সুতরাং বিদেশী সরকার তাঁহাদিগের স্বদেশীদিগকে সে সময় "গাছেরও পাড়িবার—তলারও কুড়াইবার" যে সুযোগ দিতেন, তাহা এখনও এদেশের লোককে কিজন্য দেওয়া হইবে?

কোন মদ্যপ অল্পমূল্যে হইবে বলিয়া "দেশী"—পান করিয়া রাস্তায় পড়িলে পাহারাওয়ালা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়—

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বিচারে তাহার পাঁচ টাকা জরিমানা হইলে সে হাকিমকে বলিয়াছিল—"হুজুর, এত সেই বিলাতীর দরই পড়িল!" তেমনই এদেশের যে সকল লোক আজ চাউলের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল কিনিয়া পেট পূরিয়া ভাত খাইতে পারিতেছে না, তাহারা অবশ্যই মনে করিতে পারে—এত বিলাতীর দরই পড়িল! যে সকল বাঙালীকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে—বড় বড় সরকারী চাকুরীয়ারা কি তাঁহাদিগের গণ্ডির বাহিরে?

কাজেই বাঙলার লোক এই সকল বেতন-বৃদ্ধির কারণ নিশ্চয়ই জানিতে চাহিতে পারে।

পশ্চিম বাঙলার আয়ে যে তাহার ব্যয়-নির্বাহ হয় না, তাহা দেখা গিয়াছে। শুভংকরের কথা "আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী ফাজিল বলি তারে", বাঙলার সেই ফাজিল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে দুই উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন—নহিলে "যশোদার দড়ির দুই মুখ মিলিবার সম্ভাবনা নাই—

(১) ব্যয়-সংকোচ;

(২) আয়-বৃদ্ধি।

পূর্বে যে দশজন চাকুরীয়ার বেতন-বৃদ্ধির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে মোট মাসিক ৮৯৫০, টাকা অর্থাৎ বার্ষিক এক লক্ষ সাত হাজার চার টাকা ব্যয় বর্ধিত হইয়াছে। সুকুমার সেনের বেতন মাসিক দেড় হাজার টাকা ও এস এন চট্টোপাধ্যায়ের বেতন মাসিক সাড়ে আটশত টাকা বৃদ্ধি কি সমর্থিত হইতে পারে? ইহাতে ব্যয়-সংকোচ চেষ্টার পরিচয় নাই। যদি এইভাবেই বাজেট করা হয়, তবে অবস্থা কি হইবে?

আর আয়বৃদ্ধির কি উপায় অবলম্বিত হইবে? লোকের ভাত-কাপড়ের ব্যয় যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে করের পরিমাণ আর বর্ধিত করা সম্ভব বলিয়া মনে করা যায় না। খাদ্য-দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির—উৎপাদন বৃদ্ধির যে কোন ব্যবস্থা হইতেছে, ইহাও আমরা জানিতে পারি নাই।

যদিও পূর্ববঙ্গের সরকার শান্তির কথাই বলিতেছেন, তথাপি শান্তির লক্ষণ ব্যতীত অন্য লক্ষণও দেখা যাইতেছে। খুলনা ও যশোহর হইতে সাধারণ শাকসব্জী কলিকাতায় আসিতেও বাধা দেওয়া হইতেছে এবং ট্রেনে যাত্রীরা নানারূপ অত্যাচারের অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছেন। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের আতঙ্কের প্রভাব কতকগুলি ব্যাঙ্কের স্থায়ী বা অস্থায়ী কাজ বন্ধে পরিস্ফুট হইয়াছে। লোকে জমা টাকা ব্যস্ত হইয়া তুলিয়া লইতেছে। ভবিষ্যতে উভয় বঙ্গের ও উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্বন্ধ কি হইবে, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে না। লোক কথায় বলে—"সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।" সেইজন্য লোক সুখ না পাইলেও স্বস্তি পাইবে, এই আশায় পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিতেছে। কলিকাতায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। নোয়াখালির ব্যাপারের পরে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব—বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে কাঞ্চননগরে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিদিগকে বিনা "সেলামিতে" প্রতি পরিবারকে তিন কাঠা হিসাবে জমি দিবার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। গত কয় মাসের মধ্যেই সব জমি বিলি হইয়া গিয়াছে। এখন বর্ধমান শহরে জমির দাম কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল বিষয়ে অন্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। অধিবাসী বিনিময় অনিবার্য হইলে সরকারের সাহায্য ব্যতীত তাহা সুষ্ঠুভাবে ও স্বল্পব্যয়ে হইতে পারে না।

সেইজন্য আমরা বলি, পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে সেজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারে পূর্ববঙ্গবাসীর সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহারা একথা নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও আনন্দ করিবার মত নহে। শ্রীযুত রাধানাথ দাসের পদত্যাগের পরে যিনি বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার পাইয়াছেন, সেই ভাণ্ডারী মহাশয়ের ভাণ্ডারও পূর্ণ হওয়া ত দূরের কথা, শূন্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ হইবে না। কিন্তু তিনি যে কলিকাতার অধিবাসিগণকে যথাসম্ভব অল্প খাদ্যশস্য লইতে বলিয়াছেন, তাহাতেই মনে হয়—খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। দুর্ভিক্ষ না হইলেও যে অন্নকষ্ট থাকিতে পারে, তাহাও বিবেচনার বিষয়। আমরা আশা করি, শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর ভাণ্ডারে আবশ্যক শস্যাগম হইবে। যেভাবে মুসলিম লীগ সরকার গম ক্রয়-বিক্রয়েও লাভ করিয়াছিলেন—যেভাবে তাঁহাদিগের সময়ে গুদাম হইতে চাউল অদৃশ্য ও গুদামে আটা বিকৃত হইয়াছিল, তাহা আর হইবে না; কিন্তু আমরা চারুবাবুকে উডহেড কমিশনের রিপোর্ট পাঠ করিতে বলি—যখন খাদ্যশস্যের অভাব হয়, তখন প্রাচুর্য আছে বলিয়া প্রচারকার্য পরিচালিত করিলে তাহার ফল বিষময় হয়।

আমরা বার বার বলিয়াছি, বাঙলা সরকার খাদ্যোপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধির আবশ্যক

চেষ্টা যে করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার প্রমাণ আমরা এখনও পাই নাই। কেবল প্রচার-কার্যে লোকের ক্ষুধা মিটিতে পারে না। এ সম্বন্ধে এবুরী মাকের কথা বিশেষভাবেই বিবেচ্য—

"Reams of hiccoughing pletitudes lodged in the pigeon-holes of the Home Office by all the gentlemen clerks and gentlemen farmers of the world cannot mend this."

গত শনিবারে প্রচারিত হইয়াছিল—গোপন সংবাদ পাইয়া সচিব ভাণ্ডারী শালিমারে ও হাওড়ায় যাইয়া প্রায় দুই হাজার মণ চাউল পাইয়াছেন; উহা বাঙলা সরকারের গুদাম হইতে অখাদ্য বলিয়া সরাইবার বা নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছিল।

এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে, বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ এখনও দুর্নীতিতে পূর্ববৎ দুষ্ট। এই ঘটনার অনুসন্ধান ফল জানা যাইবে কি? আমাদিগের এইরূপ প্রশ্ন করিবার কারণ—বাঙলায় ও দিল্লীতে অনেক সংবাদের শেষ জানা যায় না। কলিকাতায় গান্ধীজীর নিকট যাহারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের আর কোন সংবাদ আমরা পাই নাই; দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং যাহাদিগের হস্ত হইতে দুইজন তরুণীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে পরবর্তী কোন সংবাদও পাওয়া যায় নাই।

বাঙলার একাউণ্টাণ্ট জেনারেল হিসাব-নিকাশের সময় যে প্রায় দেড় কোটি টাকার হিসাব পান নাই, তাহার শেষ কি হইয়াছে? যে সংবাদ মাসাধিককাল পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কেবল বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের নিম্নলিখিত বাবদের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছিল, প্রায় সকল বিভাগের অবস্থাই ঐরূপ—

খাদ্য (নগদ ক্রয়)—
১৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা

খাদ্য (খাতার হিসাব)—
২৭ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা
(ইহার মধ্যে মাত্র ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সরকার পাইয়াছেন)।

স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় (খাতার হিসাব)—
১৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা
(ইহার মধ্যে মাত্র ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা সরকার পাইয়াছেন)।

নৌকা নির্মাণ—
১১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা

দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান—
৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা

সাহায্যদান ও পুনর্বসতি—
১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা

কৃষি—৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা

খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি—
২১ লক্ষ ২ হাজার টাকা।

ইহার কি হইয়াছে, লোক এখনও তাহা জানিতে পারে নাই।

নৌকা নির্মাণে প্রায় দুই কোটি টাকা নষ্ট হইয়াছে। একাধিকবার এ বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রতিশ্রুতি সরকার পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্যকালে কিছুই হয় নাই।

বাঙলার সচিবসঙ্ঘ কি এ সকল বিষয়ে মনোযোগ দিবেন না?

আমরা দেখিতেছি, পশ্চিমবঙ্গের সরকার চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা সাধারণ হিসাবে সম্প্রদায় অনুসারে ছাত্র গ্রহণের বিরোধী; কারণ তাহাতে যোগ্যের অনাদর ও অযোগ্যের সুযোগ ঘটে। কিন্তু আর একটি কথা, পাকিস্থান সরকার পূর্ববঙ্গে ঐরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্র গ্রহণের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? পূর্ববঙ্গের পাকিস্থান সরকার যে সকল শিক্ষার্থীকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন, তাহারা সকলেই কি মুসলমান নহে? কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজেও কি অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে? বাঙলা সরকার স্থির করিয়াছেন, কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজ রাখা হইবে তবে তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ ব্যতীত আরও একটি সরকারী কলেজ রাখিয়া বে-সরকারী কলেজগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করার কোন কারণ আছে কি না, তাহা বিবেচ্য। কিন্তু যদি সরকার দ্বিতীয় কলেজ পরিচালিত করেন, তবে কি অচিরে "ইসলামিয়া" নাম পরিবর্তিত করা সঙ্গত হইবে না?

গান্ধীজী দিল্লীতে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অধিবাসী বিনিময়ের পক্ষপাতী। গান্ধীজী স্বয়ং তাহার বিরোধী হইলেও সর্দার বল্লভভাই বলিয়াছেন,—তাঁহার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের অর্থাৎ হিন্দুস্থানের অধিবাসী অধিকাংশ মুসলমান ভারত সরকারের আনুগত্যে আন্তরিক নহেন—তাঁহাদিগের পক্ষে পাকিস্থানে চলিয়া যাওয়াই ভাল।

এ বিষয়ে কি দ্বিমত থাকিতে পারে? মুসলমানের পক্ষে হিন্দুস্থানে থাকিয়া হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে মনোভাব পোষণ ও সুবিধা পাইলে ষড়যন্ত্র করা যেমন দোষের; হিন্দুর পক্ষে পাকিস্থানে থাকিয়া পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মনোভাব পোষণ ও সুবিধা পাইলে ষড়যন্ত্র করা তেমনই দোষের। পাকিস্থানের প্রতিনিধি আমেরিকায় যাইয়া যে প্রচারকার্য পরিচালনা করিতেছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে।

গান্ধীজী দিল্লীতে বলিয়াছেন—

"হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে বন্ধুভাবে বাস করিবে, ঈশ্বর হয় আমার এই স্বপ্ন সার্থক করিবেন, নহিলে দেশের একাংশে কেবল হিন্দু ও আর একাংশে কেবল মুসলমান বাস করিতেছে, এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শন হইতে আমাকে মুক্তি দিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

গান্ধীজীর স্বপ্ন সফল হউক, ইহা সকলেরই কামনা—সভ্য মানবমাত্রেরই কামনা কিন্তু যাহারা সেই শান্তি ভঙ্গ করে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড প্রদান করিবার মত ক্ষমতা পরিচালনের শক্তি ও ইচ্ছা সরকারের থাকা প্রয়োজন—নহিলে শান্তি রক্ষার অকারণ আশায় শান্তিনাশই হয়।
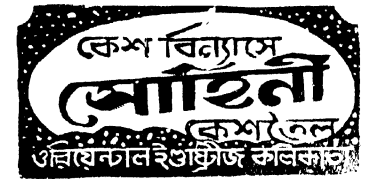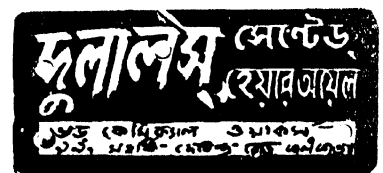
সিমলা শৈলে স্বাধীনতাদিবস উদযাপন

শ্রীদেবীকুমার মজুমদার, এম-এ

'এসেছে প্রভাত এসেছে,'—দুঃখের তিমির রাত্রির অবসান হইয়া পূর্বাশার ভালে শুকতারার উদয় হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ভারতের অগণিত মুক্তিকামী নরনারীর চির-অভীপ্সিত, ভারত ইতিহাসের পরম স্মরণীয় দিবস—১৫ই আগস্ট আসিয়া পড়িল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই শুভদিনটিকে উৎসবতিথি-রূপে গ্রহণ করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। সিমলার সকল প্রবাসী বাঙালী মিলিত হইলেন কি করিয়া এই উৎসব তিথিটা সকল-প্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাই স্থির করিবার জন্য। আজ স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে ভারতের নেতৃবৃন্দের ও জনগণের দুঃখের সীমা নাই। মুক্তিযজ্ঞের প্রথম হোতা বাঙালী জাতির দুঃখ বুঝি অপরিমেয়। ঐক্য ও মিলনের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত বিশাল ভারতের অমর স্বপ্ন আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া কোন সুদূর দিগন্তে বিলীন হইতে চলিয়াছে কে জানে। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার অরুণোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে খণ্ডিত ও দ্বিধাবিভক্ত হইতে চলিয়াছে;—এই চরম দুঃখের কথা ভারতবাসী কেমন করিয়া ভুলিবে; ইহা ভুলিবার নয়। তথাপি জাতির জীবনের এই পরম শুভদিনটিকে উৎসবতিথি-রূপে গ্রহণ করিতেই হইবে। শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ভারত যে বিদেশীর শাসন ও শোষণ-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে চলিয়াছে, ইহাই আজ সকলের প্রাণে এক অপূর্ব আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে। তাই পুত্র-শোকাতুরা মাতা যেমন উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া আপন পরিজনের মঙ্গল কামনায় প্রশান্ত চিত্তে সংসারের সকল উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন, তেমনই আমাদের সকলকেই ক্ষণিকের তরেও সর্ব দুঃখ, বেদনা ও বিচ্ছেদ ভুলিয়া গিয়া ভারতের জাতীয় জীবনের এই নূতন প্রভাতটিকে আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে।

১৫ই আগস্ট। অতি প্রত্যূষে প্রতি পল্লী হইতে প্রভাতফেরী বাহির হইয়া জাতীয় সংগীত গাহিতে গাহিতে রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক উপরেই কার্ট রোডে আসিয়া সমবেত হইবে স্থির হইয়াছে। আমার প্রভাতফেরীতে যোগদান করিবার সুবিধা ছিল না। তাই প্রত্যূষে উঠিয়াই কার্ট রোডের দিকে ছুটিলাম। ফাগলী, নাভা, কাইসু প্রভৃতি সকল পল্লী হইতে বিভিন্ন দলগুলি একে একে নির্ধারিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রথম দলেই এক অপূর্ব দৃশ্য। দেখিলাম, আমাদেরই এক পরিচিত ভদ্রলোকের তিন কি চারি বৎসরের পৌত্র জাতীয় পতাকা হস্তে সদর্পে একটি দলের পুরোভাগে দণ্ডায়মান। দলের মধ্যে শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া মা, বাবা, মায় ঠাকুর্দা পর্যন্ত রহিয়াছেন। কেহই বাদ যান নাই। ক্রমে সকল পল্লী হইতে আগত দল-

স্বাধীনতা উৎসবে সমবেত নরনারী

ক্যাপ্টেন ধীলন পতাকা উত্তোলন করিতেছেন

গুলি মিলিত হইয়া এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করিল। স্ত্রী-পুত্র ও পরিজনসহ একসঙ্গে এমনভাবে সকলকে কোনও শোভা-যাত্রায় যোগদান করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাড়ে সাতটার পরে মিলিত শোভাযাত্রাটি কার্ট রোড ধরিয়া মল রোডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বাঙালী অবাঙালী যে যেদিক হইতে আসিলেন, সকলেই জাতিবর্ণনির্বিশেষে শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে লাগিলেন। বিপুল জনস্রোত ক্রমশঃ মল রোড ও আপার মল ঘুরিয়া কালীবাড়ি প্রদক্ষিণ করিয়া কালীবাড়ির ঠিক সম্মুখেই স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বজনপ্রিয় কর্নেল ধীলন পূর্ব হইতেই এখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মন্দিরের সম্মুখেই পাহাড়ের গায়ে একটুখানি সমতল স্থানে একটি সুউচ্চ স্তম্ভে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইবে স্থির ছিল। ধীলন আসিয়া দাঁড়াইতেই বন্দে মাতরম সংগীত শুরু হইল। পরে অতি ধীরে প্রশান্ত বদনে কর্নেল ধীলন অশোকচক্র-লাঞ্ছিত স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন। উদ্বেলিত জনসমুদ্র হইতে উদাত্ত ধ্বনি উঠিল—জয় হিন্দ, মহাত্মাজীর জয়, নেতাজীর জয় জওহরলালের জয়.........

ধীলন জনতার উদ্দেশে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। বলিলেন—নেতাজীর স্বপ্ন আজ সফল হইতে চলিল। জনসমুদ্র গর্জিয়া উঠিল—নেতাজী জিন্দাবাদ। তারপর ধীলন বলিয়া উঠিলেন—ভারতের স্বাধীনতা আজ অপ্রত্যাশিতভাবে অতি শীঘ্র আনিয়া দিলেন অহিংসা-মন্ত্রের পূজারী এক 'বুড়া বাপু'।

স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে সিমলাস্থ বাঙালী মহিলাদের সমাবেশ
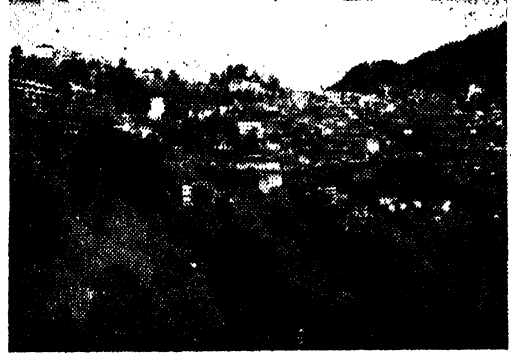
সিমলা শৈলের দৃশ্য

বিপুল জনতা মুহুর্মুহু ধ্বনি করিয়া উঠিল—মহাত্মাজীর জয়। ধীলন জাতীয় পতাকার বিভিন্ন রঙের ব্যাখ্যা করিলেন এবং পরিশেষে খণ্ডিত ভারতে যে প্রেম ও আত্মত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আবার এক অখণ্ড মহাভারতে পরিণত হইবে, এই আশার বাণী শুনাইয়া বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করিলেন।

তারপর ইউনিয়ন একাডেমীর বালকবৃন্দ কালীবাড়ির পার্শ্বস্থ তাহাদের বিদ্যালয়ের জাতীয় পতাকাটি উত্তোলন করিবার জন্য ধীলনকে আমন্ত্রণ করিল। সুবিনয়ী ধীলন সানন্দে স্বীকৃত হইয়া বেশ কষ্ট স্বীকার করিয়াই বিদ্যালয়ের ছাদে উঠিয়া পতাকা উত্তোলন করিলেন। বালকবৃন্দ সমস্বরে গাহিয়া উঠিল—'জন-গণ-মন-অধিনায়ক......'

তারপর হইল মন্দির প্রাঙ্গণে প্রসাদ বিতরণ—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে। প্রসাদ বিতরণের পরই মহিলাদের সভার অধিবেশন হইল। সভায় ধীলন ও শ্রীমতী ধীলন বক্তৃতা করিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার পর কালীবাড়ির নাট্যমন্দির গৃহে সাধারণ সভার অধিবেশনের পর কর্মসূচী অনুযায়ী সকল অনুষ্ঠানের সমাপন হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রতি গৃহে গৃহে দীপমালা জ্বলিয়া উঠিল। মিউনিসিপ্যালিটি সকল সরকারীভবনে আলোকসজ্জার বন্দোবস্ত করিবে স্থির ছিল। কিন্তু লাহোর হইতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অতিশয় দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় শেষ মুহূর্তে সব বাতিল হইয়া গেল। তাই সিমলার আলোকসজ্জা অনেকখানি ম্লান হইয়া পড়িল। তথাপি দিবাশেষে সকল গৃহ, সকল বিপণি আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল। দূরের আলোকোজ্জ্বল পাহাড়গুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ মনে হয়, নক্ষত্রখচিত নৈশ আকাশেরই এক একটি খণ্ড কেমন করিয়া যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া মর্ত্যে নামিয়া আসিয়া পর্বতগাত্রে আপনার আসন বিছাইয়া দিয়াছে।

উৎসবের সকল অনুষ্ঠানেরই অংশ লইয়া বেশ রাত্রি করিয়াই গৃহে ফিরিলাম। সমস্ত দিনের উত্তেজনা ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে যে সব ভাবনা মনে উদিত হইবার অবসর পায় নাই, নিজ গৃহে ফিরিলে তাহারাই আচম্বিতে সমগ্র চিত্তটি অধিকার করিয়া বসিল। সমস্তদিন ধরিয়া প্রায় সকলের মুখেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জয়গান শুনিলাম। আরও শুনিলাম, ভারতে স্বাধীনতার আবির্ভাব এই আন্দোলনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। শুধু কি ইহাই সত্য! যুগে যুগে যে সব মুক্তি-পাগল আত্মভোলা সন্ন্যাসীর দল বিপ্লবের অগ্নিশিখায় আত্মাহুতি দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অবদান কি অহিংস দেশসেবকদের অবদান হইতে কোনও অংশে কম? আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে শ্রান্ত আর তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নে আতঙ্কিত বৃদ্ধ বৃটিশসিংহ ভারতীয় জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অমোঘ পরিণামের কথা স্মরণ করিয়াই না ভারতভূমি হইতে সসম্মানে বিদায়ের পথ খুঁজিয়া লইতে চলিয়াছেন। আজ প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও জওহরলালের মত জগদ্বরেণ্য নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য দিল্লী নগরীর রাজপথে সীমাহীন জনসমুদ্র ঝটিকাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের মত উচ্ছল উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। আমি আজিকার এই পবিত্র দিনটিতে উৎসবান্তে নিজ গৃহকোণে সঙ্গোপনে ক্ষুদিরাম হইতে আরম্ভ করিয়া আগস্ট-বিপ্লব আর আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সব দুঃসাহসী মৃত্যুঞ্জয়ী বীর ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করিয়া বিপ্লবের শোণিত-রাঙা দুর্গম পথের পথিক হইয়া দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়া স্বাধীনতার সৌধভিত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই উদ্দেশে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া পরম প্রশান্তি লাভ করিলাম।

ক্যাপ্টেন ধীলন বক্তৃতা দিতেছেন
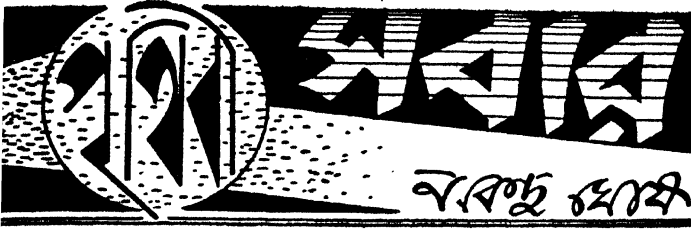
(৭)

পরদিন নিমডাঙ্গায় হাট ছিল। আশপাশের ছোট ছোট গ্রামের লোকেরা আসে খানে। তরিতরকারী, ধানচাল, নুন তেল র গামছা লুঙ্গিটাই বেশী বিক্রি হয় সে টে। বড় হাট তো সেই রোহণপুরে, দশ মাইল রে। খুব জরুরী সওদা না করতে হলে বা প্রাপ্য জিনিসের প্রয়োজন না হলে কেউ খানে যায় না। তাছাড়া যাওয়ার হাঙ্গামাও ন নয়। হয় মোষের গাড়ী নিয়ে যেতে হবে ংবা আর কারো গাড়ীতে একটু জায়গা বার জন্য খোসামোদ করতে হবে।

শিরসি গ্রামের অনেকেই গেল নিমডাঙ্গা। রসিক মাঝিও তার মোষের গাড়ী সাজাল। র্য একটু মাথার ওপর উঠতেই পান্তাভাতে টে ভরিয়ে সে গাড়ীতে ধান চাপাল, তারপর টের দিকে রওনা দিল।

হাট থেকে সে ফিরল সেই সন্ধ্যেবেলায়। নের দরটা আজ ভালই ছিল—ছ'টাকা বারো না প্রতি কাঁচি মণ। তাই মেজাজটা বেশ সন্নই ছিল রসিকের। গুন্ গুন্ করে একটা নের কলি ভাঁজছিল সে। হাল্কা গান, যে গান ধারণতঃ যুবক যুবতীরা গেয়ে থাকে। মোষ টো মন্থর চালে চলছিল তবু তার হাতের ুক বাতাস কেটে তাদের পিঠে পড়ছিল না।

দূরে থেকে শিরসি গ্রাম দেখা গেল। রসিক বার মোষ দুটোর ল্যাজ একটু মলে দিল। াড়ীর বেগ একটু বাড়ল।

কিন্তু বাহির-কালীর থামটার পাশে াসতেই হঠাৎ থেমে গেল গাড়ীটা। একটা াপার ঘটল। লাফ্ দিয়ে গাড়ী থেকে নীচে মল রসিক মাঝি।

পুষার মা খড় কাটছিল। হঠাৎ সে অবাক য়ে গেল। চালকহীন অবস্থায় মোষ দুটো াড়ীটা টেনে বাড়ির উঠোনে এসে থেমে গেল। কাথায় গেল রসিক? ওঃ, হয়ত সে পেছন পছন আসছে।

কয়েক মিনিট কাটল কিন্তু কেউ এলনা। ুষার মা ভারী শরীরকে টেনে তুলল, উঠোন পরিয়ে রাস্তায় নেমে এসে তাকাল চারদিকে। কন্তু কৈ? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।

"পুষা—আরে অ' পুষা"—

"কি-ই-ই?"

"জল্দি আয় বেটা—**হামার** খরাপ লাইগ্ছে"—

পুষা ছুটে এল কাছে, "কি **হইল** মা—আঁ?"

"গাড়ী দেইখছিস্?"

"হয়"—

"তুর বাপ কুন্ঠে গেল?"

"লাই?"

"না—জলদি খুঁজা দ্যাখ্ গাঁয়োৎ—না পালে রাস্তা ধরা আগায়া যা"—

পুষা বেরোল। সত্যি কোথায় গেল বুড়ো? কিন্তু গাঁয়ের কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। চিন্তা বাড়ল পুষার। কোথায় গেল লোকটা? এতো অস্বাভাবিক ব্যাপার, আজ পর্যন্ত এমন ঘটনা একবারও দেখা যায়নি যে, চালকহীন অবস্থায় গাড়ী ফিরে এসেছে। তবে?

রাস্তা ধরে এগোল পুষা। আরো এগিয়ে গেল। শেষে বাহির-কালীর থামটার পাশে, ছোট্ট একটা জঙ্গলের ধারে সে থমকে দাঁড়াল। অনেকগুলো লোক সেখানে জটলা পাকাচ্ছে। কি ব্যাপার? কৌতূহলী হয়ে সেখানে যেতেই লোকেরা চুপ হয়ে গেল। পুষা দেখল যে মাটির ওপর রসিক মাঝি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার জিভ্টা একটু বেরিয়ে আছে, চোখ দুটো ত্রাসে, যন্ত্রণায় বড় হয়ে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। পুষা কেঁপে উঠল, তারও চোখ বড় হয়ে উঠল, তারপরে একটা আর্তনাদ করে সে বাপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

যারা সেখানে ছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই সাঁওতাল—অনেকেই শিরসির লোক। তারা আলোচনা আরম্ভ করল।

"বোঙা মারাছে—গলা টিপা"—একজন **বলল।**

"হয়—তাই মালুম দিছে"—আর একজন সমর্থন জানাল।

দু'তিনজন মাথা নাড়ল, "না জী—না"—

"তভে?"

"ইটা খুন বলা মালুম দিছে"—

"খুন! আয় বাপ্!"—

"হয়"—

সবাই একথায় সায় দিল। হ্যাঁ, **খুনই বটে।** কিন্তু কে খুন করল? কেন? রসিক **মাঝির** ট্যাঁকে পাঁচমণ ধানের দাম ঠিকই আছে, **হাটে** কেনা তরীতরকারীও তার গাড়ীতে ঠিক **ছিল।** সুতরাং টাকার লোভে কেউ তাকে খুন **করেনি।** এটা নিশ্চয়ই কোনো শত্রুর কাজ। আর কে **সেই** শত্রু? সেই অদৃশ্য আততায়ী **রসিক মাঝিকে** কোন উদ্দেশ্যে খুন করল?

খবর পেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল **ঝুমরী।** কেঁদে আকাশ পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল।

"আয় রে হামার বাপ রে—**হামার বাপ**"—

মংরা চুপ করে বসে রইল। বাইরে **সোমা** আর টোমাও বসে ছিল।

শেষে কাঁদতে কাঁদতেই **ঝুম্রী মরা** বাপকে দেখতে গেল। পাগলিনী**র মত,** উর্ধ্বশ্বাসে।

মংরা গেল না। সোমা ও টোমাকে **নিয়ে** নিজের ঘরের বারান্দায় বসে সে পচানি **খেতে** আরম্ভ করল।

একে একে দলের এবং গাঁয়ের অন্যান্য লোকেরা এসে হাজির হল সেখানে। সবাই তাকাল তার দিকে। কিন্তু কেউ কিছু **বলল** না।

সোমা সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "**সর্দার** মরি গিছে"—

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সবাই।

"বোঙা দেব্তা মারাছে তাক্"—

"হয়, হয় জী"—সবাই সায় দিল।

"ইবার, ইবার তুদের সর্দার কে?"

পরস্পরের দিকে তাকাল সবাই মৃদুকণ্ঠে কি সব আলোচনা আরম্ভ করল।

শেষে তারা বলল, "ঠিক করাছি হাম্রা"—

"কি?" সাগ্রহে প্রশ্ন করল সোমা, "বুল্, বুল কেনে।"

সবাই বলল, "হামাদের পঞ্চ্ বুলছে কি মংরা হামাদের সর্দার মোড়হল্"—

চম্কে উঠল মংরা, ভ্রূকুঞ্চিত করে **বলল,** "কিন্তুক্ ভাইভা দ্যাখ্ তুরা।"

ওরা জোর গলায় বলল, "ভাইভাছি।"

"যাঁই বলমু তাঁই করবু—হুকুম **মানবু** তুরা?" কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করল মংরা।

"হয়"—

"চাল্লিশটা জানের শোধ লিবু? **মাছ মারার** হক্কে আদায় করবু?"

"হাঁ, হাঁ, শোধ লিমু"—সগর্জনে **উত্তর** দিল সবাই।

"আচ্ছা। ইবার তভে রসিক মাঝির ঘরোৎ চল্, উক্ পুড়াতে হবি"—মংরা গম্ভীরভাবে বলল।

আকাশে আজ জ্যোৎস্নার অপরূপ বাহার। পূর্ণিমার মস্ত বড় চাঁদটা পচানির নেশাকে আরো গাঢ় করে তুলতে চায়। কিন্তু তা হয়

না, চল্লিশটা মানুষের রক্তের শোধ না নেওয়া পর্যন্ত যেন শান্তি পাবে না মংরা।

উঠে দাঁড়াল সে, টলতে টলতে শ্বশুরবাড়ির দিকে গেল। পেছন পেছন আর সবাই গেল।

রসিকের শবদেহটা উঠোনের ওপর শোয়ানো ছিল। আকুল হয়ে কাঁদছিল পুষা, পুষার মা আর ঝুমুরী। আরো অনেক লোকজন চারদিকে বসেছিল। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে। সাঁওতাল, ধাঙর অনেকে। বাতাসে থমথম করছিল মৃত্যুর নিঃশ্বাস, মৃত্যুর দুর্গন্ধ। রসিকের পাকা চুল-ভর্তি মাথাটার দিকে, তার তালগাছের গুঁড়ির মত শক্ত ও মজবুত দেহটার দিকে সবাই তাকিয়ে ছিল। মংরাদের আসতে দেখেই সবাই নড়ে বসল।

মংরা রসিকের লাস্‌টার দিকে তাকাল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টিটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। কয়েকজন পুরুষ এগিয়ে এল এবার, বাইরে গেল। একটু বাদে তারা একটা বাঁশের মাঁচা তৈরী করে নিয়ে এল।

পুষার মা আর ঝুমরীর কান্না বেড়ে গেল।

"আয় বাপ্ গো—তু কুথা গিলি গো"—

"আয়রে হামার সর্দার—হামার সর্দার রে—এ—এ—এ—এঃ"—

কাঁদিতে কাঁদতে পুষার মার হিক্কা উঠে গেল। যারা তাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল সেই বুড়ীরা তার কান্না দেখে নিজেদের মরা ছেলে-মেয়ের নাম স্মরণ করে কাঁদতে আরম্ভ করল।

"আয়রে হামার পিংলু রে—এ—এ—এ"—

"তু কুন্‌ঠে গেলু রে—হায়রে মাত্‌লার বাপ্"—

"হামার জান ক্যানে যায় না রে—এ—এ—এ—এঃ"—

সে এক বিশ্রী, বীভৎস কোলাহল।

বাঁশের মাঁচার ওপর রসিক মাঝিকে শোয়ানো হল, ঢেকে দেওয়া হল।

সোমা উঠোনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সে ডাক দিল, "শুন্, তুরা সভাই শুন্"—

সবাই তাকাল। কি ব্যাপার?

"বুড়হা সর্দার মারা গিছে। কিন্তুক্ লয়া সর্দার চাহি তো ইবার? তাহু লাগি পঞ্ সভা কইরল, ঠিক কইরল যে হামাদের লয়া সর্দার হইল মংরা মাঝি।"

গুন্ গুন্ একটা গুঞ্জরণ ধ্বনিত হল।

"লয়া সর্দার"—

"মংরা মাঝি—হুঁ জী"—

ঢেউয়ের মত গুঞ্জরণধ্বনিটা একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত গড়িয়ে গেল, তারপরে এক সময়ে স্তব্ধতায় গিয়ে শেষ হল।

কয়েকটি মুহূর্ত।

নিঃশব্দে এবার উঠে দাঁড়াল সবাই। পঞ্চের রায় স্বীকার করে নিল তারা। কারণ এই রায়ের সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ নেই, তারাও মনেপ্রাণে এই রায়টিই ঠিক করে রেখেছিল।

তারপরে এক সময়ে সবাই রসিকের শবদেহ নিয়ে দূরবর্তী খাঁড়ির ধারে অবস্থিত শ্মশানের দিকে নিয়ে গেল। তাদের হরিধ্বনি ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। বাড়ির ভেতরকার ভীড় ধীরে ধীরে কমে গেল। সবাই যে যার বাড়ি ফিরল। তখন পুষা আর ঝুমুরীর কান্না ক্লান্তিতে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কেবল অক্লান্তভাবে, অদম্য উৎসাহে পুষার মা তখনো বিকট চীৎকার করে চলেছে। অফুরন্ত ক্ষমতা আছে তার বিরাট স্থূল দেহে। বাঘিনীর মত।

একপাশে চুপ করে বসে ছিল মংরা। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল।

পুষার মার কান্না এবার মুহূর্তে থেমে গেল। মনে হল যে, এতক্ষণ ধরে জামাইকে শোনাবার জনাই যেন সে কাঁদছিল।

জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে কান্নায় বিকৃত সুরে সে হঠাৎ বলল, "হামি জানি, হামি জানি"—

মংরা শাশুড়ীর দিকে তাকাল। মৃতের মত স্থির ও নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে।

"হামি জানি"—

"কি?" মংরার মুখ থেকে তার অজ্ঞাতসারেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

পুষার মা'র ভারী শরীরটা কাঁপতে লাগল, টেনে টেনে সে বলল, "তু—তু মাইরাছিস্ সর্দারকে"—

তার কথা শুনে চম্‌কে উঠল মংরা, তার দুচোখের তারায় একটা কুটিল ছায়া ঘনাল কিন্তু কিছুই বলল না সে। তার কথা শুনে পুষা উঠে দাঁড়াল, ঝুমুরী কান্না থামাল। তাদের চোখে আতঙ্ক, ত্রাস আর ঘৃণা ফুটে উঠল।

সাপের মত ফুঁসে উঠে আবার বলল পুষার মা, "তু—তু উয়াকে খুন করাছিস্—হামি জানে"—

বিশ্রীভাবে হেসে উঠল মংরা। শুকনো প্রাণহীন হাসি। বেশ বোঝা গেল যে, নেহাৎই জোর করে হাসছে সে, নিজেকে সুস্থ প্রতিপন্ন করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে।

ঝুমুরীর কান্না তখন থেমে গেছে, পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার বাপ রসিক মাঝি, পাঁচটা গ্রামের মোড়ল ছিল যে লোকটা, সে আজ মারা গেছে। না, মারা যায়নি, খুন করা হয়েছে তাকে। কিন্তু কে খুন করবে? তার তো কেউ শত্রু ছিল না। মা বলছে যে মংরা খুন করেছে। তা কি সম্ভব? পৃথিবীতে অসম্ভবই বা কি? বিলের ব্যাপার নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তার বাপের যে মনকষাকষি চলছিল তা তো সে জানে। কতবার তো মংরা তাকে বলেছে যে সে তার বাপের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করবে। আর সেদিন রাতে, যখন সর্দার মাঝি দেখা করতে এসেছিল তখন মংরা কি ভাল ব্যবহার করেছিল? মোটেই না। তবে? কেন অমন রুক্ষ রুক্ষ কথা বলেছিল মংরা? শ্বশুরকে শত্রু না ভাবলে কেউ কি অমন কথা শোনাতে পারে? না, ব্যাপারটা সন্দেহজনক। তাছাড়া আজ সন্ধ্যের সময় মংরা বাড়ি ছিল না, আর তারপর থেকেই যেন কেমন গম্ভীর হয়ে আছে, অনবরত ভাবছে। কেন? সন্ধ্যের সময়, যখন তার বাপ খুন হয় তখন মংরা কোথায় ছিল?

ঝুমুরীর দু'চোখে আগুন জ্বলতে লাগল।

বিশ্রী হেসে মংরা শাশুড়ীকে বলল, "তু পাগল আছিস বহুৎ মা—পাগল। কিসব কহুছিস্ তু—আঁ?"

দ্রুতপদে ঝুমুরীর দিকে এগিয়ে গেল সে, বলল, "চল্, ঘরোৎ চল্ ঝুমরী"—

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল ঝুমুরী, ভয় আর ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টি মেলে মাথা নেড়ে বলল, "না, হামি যামু নাই, তুর কাছোৎ যামু নাই। হাঁ, তু হামার বাপ্‌কে মাইরাছিস্"—

"যাবু নাই?"

"না"—

"যাবু নাই?" কর্কশকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করল মংরা।

"নাঃ"—

"তবে তু এঠি মর্"—

কালো কালো শক্ত শক্ত পা ফেলে, জ্যোৎস্না-বিধৌত সাদা সরু পথটা ধরে মংরা চলে গেল।

একা একাই বাড়ি ফিরে গেল মংরা। এক হাঁড়ি পচানি খেয়ে দাওয়ার ওপর ঝিম্ মেরে বসে রইল, কি যেন ভাবতে লাগল।

ক্রমে রাত গভীর হল। সে তখন ঘরে গিয়ে শুল।

কিন্তু ঘুম এল না তার। বিছানার মধ্যে গড়াগড়ি যেতে লাগল, ছটফট করতে লাগল। আজ ঝুমুরী পাশে নেই। আজ ঝুমুরী তাকে গভীর ঘৃণার সঙ্গে দূরে ঠেলে দিয়েছে, তার বাপের হত্যাকারী বলে বিশ্বাস করেছে। স্বামীর চেয়েও কি বাপকে বেশী ভালবাসে ঝুমুরী, বেশী শ্রদ্ধা করে?

এমনিভাবে ছটফট করতে করতে মংরা একসময়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বাইরে তখন পৃথিবী মায়াময় হয়ে উঠেছে, মোহগ্রস্তের মত নির্বাক হয়ে, দুধের মত চাঁদের আলোয় ধোয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আর এমনি সময়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখল মংরা। দেখল যে একটা আকাশচুম্বী পর্বত-চূড়ায় সে দাঁড়িয়ে আছে। রাক্ষসীদের মত বিকট শব্দে হঠাৎ ঝড় উঠল। প্রচণ্ড বায়ুবেগে সে যেন হঠাৎ ছিট্‌কে পড়ল শূন্যের মধ্যে, পাক খেয়ে খেয়ে পড়ে গেল নীচেকার ঘনান্ধকার গহ্বরের মাঝে। আর ঠিক সেখানে, মুখোমুখী দেখা হল একজনের সঙ্গে। তার দু'চোখে জমাট ত্রাস, মুখে যন্ত্রণার ছাপ, জিভ্‌টা বিলম্বিত। সে রসিক মাঝি। মংরা যেন ভয় পেল, পিছোতে চাইল কিন্তু রসিক মাঝি যেন হঠাৎ হেসে উঠল। হা হা হা

র, উন্মাদ পিশাচের মত। আর্তনাদ করে উঠল রা।

"আঁ—আঁ—আঁ—"

মংরার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। সে ধড়মড় করে ঠ বসল। তার শরীর ঘামে ভিজে গেছে। ভীষিকা দেখেছে সে। কিন্তু ঘরের ভেতরকার ধকারেও যেন রসিক মাঝি এসে দাঁড়িয়েছে, ঃশব্দে হাসছে সেই পৈশাচিক, উন্মত্ত হাসি।

মংরা ছুটে বাইরে বেরোল। বাইরে উঁচু-চু ক্ষেত জ্যোৎস্নায় অপরূপ দেখাচ্ছে। গাছ-লা, বাড়িঘর সব কিছুকে ছবির মত মনে চ্ছ। ছবির মত বটে কিন্তু তবু প্রাণহীন । জীবনের স্পর্শ আছে চারদিকে। আর ই স্পর্শ পেয়েই যেন সুস্থ হল মংরা।

সকালে উঠে বাড়িতে তালা লাগিয়ে সে মার কাছে গেল। তারপর টোমার কাছে। বন্ধুকে নিয়ে প্রতি গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়ায় , বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথা বলে, কি সব ঝায়। তখন তার চোখ দুটো বাঘের চোখের ই জ্বলতে থাকে, দেহ কেঁপে ওঠে আর ল উত্তেজনায় চাপা নাকটা ফুলে ওঠে। রা শোনে তারাও শেষে তারি মত উষ্ণ হয়ে ঠ, মাথা নেড়ে সায় দেয় তার কথায়।

"হাঁ—ঠিক বাৎ"—

"ঠিক, ঠিক বুলাছিস নয়া সর্দার"—

বাড়ি ফিরে মংরা দেখল যে ঝুমুরী সেনি। না। ভেতরে গিয়ে সে মোষ দুটোকে বার দিয়ে, বাইরে, ছায়ার মধ্যে বেঁধে দিল দের। ঘরের ভেতর বসে চিড়েগুড় খেয়ে য়ে এক ঘটি জল খেল। তারপর আবার রোল বাড়ি থেকে।

এবার বন্ধুদের নিয়ে গাঁ ছেড়ে বেরোল সে।

দুপুরের রোদ তখন ধারালো ক্ষুরের মত মড়া কাটতে চায়, উত্তপ্ত পশ্চিমা বাতাস খের ওপর ধুলোর ঝাপ্টা মারে। তরঙ্গায়িত ধূ মাঠের ওপর দিয়ে, মরুভূমির মত জ্বলন্ত কাশের তলা দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল।

নিমইল।

"টোমন মাঝি আছিস?"

"হয় জী—আছি। আয়, বৈস্ তুরা"—

"সব ভালা তো জী?"

"হয়"—

"তো ফির কি করবু ইবার?"

"কি করমু, তুর রায় কি?"

"হামার রায় তো এক—হামরা মনিষের ন বাঁচমু—হক ছাইড়মু না"—

"ঠিক, ঠিক বুলাছিস্ নয়া সর্দার।"

দিনটা এমনিভাবে কেটে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি ফিরে এল মংরা। রর ভেতর একটু দাঁড়াতেই গা ছম্ছম্ করে ল তার। কে যেন নিঃশব্দ পদে সরে গেল! র যেন নিঃশ্বাস শুনতে পেল সে! সেই ঃশ্বাসের মারাত্মক শীতলতাকে অনুভব করে তার দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল।

ছুটে সে বাইরে বেরোল, সোজা গিয়ে হাজির হল টোমার ওখানে।

"কি চাইস্ মংরা?" টোমা প্রশ্ন করল।

মংরা ফিস্ফিস্ করে বলল, "একটা মুরগী দে"—

টোমা অবাক হল, "ক্যানে, করবু কি?"

মংরা মুখ ঘুরিয়ে বলল, "কাম আছেক্"—

টোমা ব্যাপারটা যেন আঁচ করেই বলল, "বোঙার কাছোৎ যাবু?"

মংরা মাথা নাড়ল।

"ক্যানে? পিছা লিছে?"

"হয়—শালা"—

টোমা মুরগী এনে দিল একটা, বলল, "যা, বোঙার কাছোৎ গিয়া কাইন্দা পড়, যা"—

সোজা ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেল মংরা। কিছুদূরে গিয়ে একটু উঁচু ঢিবির মত জায়গায় থামল। তার ওপর কয়েকটা নিম গাছ ছিল আর তাদেরি একটার নীচে একটা মাটির বেদী মত ছিল। বোঙা দেব্তার থান।

সেখানে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল মংরা, চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধরে বিড় বিড় করে বকতে আরম্ভ করল। দোহাই বোঙা, তোর দয়াতেই ক্ষেতে ফসল ফলে, আকাশ ভেঙ্গে পানি পড়ে, আমরা নির্ভয়ে দিন কাটাই। কিন্তু বোঙা, আমার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে আজকাল। আমার আজকাল ভয় করে, যখন তখন মরা মানুষের মুখ দেখি আমি আর সেই প্রাণহীন মুখটা দাঁত বের করে অনবরত হাসে। দোহাই বোঙা দেব্তা, আমাকে বাঁচা।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে পাগলের মত প্রার্থনা জানিয়ে চোখ মেলল মংরা, দু'হাতে মুরগীটাকে ধরে মট্ করে তার গলাটা মুচ্ড়ে দিল। একটুও আওয়াজ করল না সেটা, শুধু বার-কয়েক সজোরে ডানা ঝাপ্টে নিস্পন্দ হয়ে গেল। বেদীটার নীচে সেটা রেখে দিয়ে, পরম ভক্তিভরে মংরা সেখানে প্রণাম করল। দোহাই বোঙা, আমাকে বাঁচা।

ওদিকে রাতের বেলা ঝুমুরীও বিছানায় ছটফট করছিল। কি করল সে? একি করল? শূন্য বিছানায় শুয়ে তার কান্না পায়। মায়ের বিশ্রী কান্নায় এমনিতেই ঘুম আসে না, তার ওপর আবার দুশ্চিন্তা।

এই বাড়িতেই সে জন্মেছে, ছোট থেকে বড় হয়েছে, এই বাড়িতেই একদিন তার বিয়ে হয়েছে, অথচ আজ তা যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হয়, অস্বস্তিকর বোধ হয়। আর এরি মাঝে রাতের মাদকতাময় মুহূর্তে যখন সে একজনের পরিচিত স্পর্শটি পায় না, ভবিষ্যতেও পাবে কিনা এমন সন্দেহ করে ,তখন তার বুক ফুলে ওঠে, চোখের সামনের অন্ধকার আরও অন্ধকার হয়ে ওঠে। তার বাপ খুন হয়েছে। রসিকের সঙ্গে মংরার সম্বন্ধটা ইদানীং খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, সে-ই রসিককে খুন করেছে। তার মা হয়ত দুঃখের আতিশয্যে অমন সাংঘাতিক অভিযোগটা করেছিল। কিন্তু তাও কি হয়? অথচ—অথচ—

অন্তর্দ্বন্দ্বে সারারাত বসে বসে কাটাল সে। রাঙা চোখ মেলে ভোরের সূর্যের দিকে তাকাতে গিয়ে সে চোখ বুজে ফেলল। জ্বালা করছে তা।

কিন্তু কি করবে সে? একদিন তো কেটে গেল। এখনও কি রাগ করবে? ঘৃণা করবে?

কেমন যেন আকুলি-বিকুলি করতে লাগল ঝুমুরী। কোন কিছুই ভালো লাগল না তার, সব নীরস ও অর্থহীন মনে হতে লাগল।

পা টিপে টিপে এক সময়ে- সে বেরিয়ে পড়ল। যন্ত্রচালিতের মত নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু তালাবন্ধ দরজা দেখে তার হৃদ্পিন্ডটা ধ্বক্ করে উঠল। নেই, মংরা সকালে উঠেই বেরিয়ে গেছে। আজকাল সে অনবরত চারপাশের গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা সে শুনেছে। কিন্তু তাই বলে এত সকালেই কি যেতে হয়? মোষ দুটোর কি করে গেছে লোকটা? বাইরের উঠোনের দিকে গেল সে। না, সেদিকে ঠিক আছে মংরা। জানোয়ার দুটোর পরিচর্যা সেরে গেছে।

না, কিছুই করার নেই। মংরা তাকে চায় না, তার সাহায্য চায় না, তাকে আর বোধ হয় সে ঘরে ডেকেও নেবে না। কিন্তু কেন? রাগ করে, শোকের মুহূর্তে সে কয়েকটা কঠোর কথা বলেছে বলেই কি মংরা তাকে একেবারে পরিত্যাগ করবে? বাঃ—

কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ি ফিরল ঝুমুরী। নিঃশব্দে।

বিলের বুকে সূর্যালোক পড়ে। বাষ্প হয়ে উড়ে যায় জল। কাদা আর পচা ঘাসের শাপ্লা আর কচুরীপানার দুর্গন্ধটা ক্রমে আরও তীব্র ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাছের লোভে বকেরা এসে সমাধিমগ্ন সাধুর মত, বর্শা-ফলকের মত তীক্ষ্ন ঠোঁট উঁচিয়ে জলের ধারে সার বেঁধে বসে। সন্ধ্যা হয়। রাত হয়। কুহকিনী রাত কাড়োল বিলের ওপর মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। জ্যোৎস্নালোকে, ক্ষয়-ক্ষীণাঙ্গী রূপসীর মত বিলটা নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে।

ওদিকে মংরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রাম গ্রামান্তরে। অক্লান্তভাবে। সঙ্গে সোমা ও টোমা।

নিমডাঙা।

"তৈয়ার থাক্বু তুরা—জরুর"—

"হাঁ হাঁ—জরুর"—

আনারপুরে।

"খালি সাঁওতাল জান দ্যায় লাই, মুসলমান ভি জান দিছে জী"—

"হাঁ হাঁ, মালুম আছে—বললা লিমু ইয়ার"—

এমনিভাবে সব গ্রামেই গেল মংরা। তিনদিন কাটল।

হঠাৎ একদিন একটা পরিবর্তন দেখা গেল। শিরসি, নিমইল, নিমডাঙা, হরিশপুরা বাঘারিয়া, নিশ্‌কালীপুর, আনারপুর—সব গ্রামেই—সাঁওতাল-ধাঙড়দের ঘরে ঘরে, জোয়ান সমর্থ মানুষেরা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঝুল-মাখা ধনুক আর মরচে-ধরা তীরগুলোকে তারা ঘর থেকে টেনে বের করল। বের করল রামদা আর খাঁড়া, দা আর বর্শা; পাথরের ওপর ঘষে ঘষে তারা সেগুলোকে ঝকমকে ও ধারালো করে তুলল।

সেদিন রাতের বেলাও জ্যোৎস্না ছিল। বসন্তকালের অপরূপ রাত অজানা ফুলের গন্ধে মদির ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যা আরম্ভ হওয়ার সংগেই মাটি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সবার অগোচরে অতি সূক্ষ্ম আবীরের মত হিম জমছিল ঘাসের বুকে। রূপকথার পৃথিবী এসে তরঙ্গায়িত ক্ষেতের বুকে মিশে গিয়েছিল, বাতাসে ভাসছিল অদৃশ্য পরীদের দেহসৌরভ।

গম্ভীর হয়ে দাওয়ার ওপর বসে পচানি খাচ্ছিল মংরা। ঘরে আলো জ্বলছিল টিম্‌-টিম্‌ করে। পাশে ছিল সোমা আর টোমা। তারাও পচানি খাচ্ছিল। ভিতর থেকে মোষ দুটোর ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের আওয়াজ ভেসে আসছিল।

মংরার তীরগুলোকে ধারালো করছিল টোমা। পচানি খেতে খেতে গুণ গুণ করে গান গাইছিল।

সোমা মৃদু হেসে বলল, "কেমুন চাঁদ—কেমুন জোছনা—কিন্তুক্‌ বিলের লাগা সব বন্ধ হইল"—

টোমা মাথা নাড়ল, "সচ্‌ কথা বুলছিস। শালার বিলের লাইগ্যা নাচ, গানা ব্যাক্‌ বন্ধ হইল।"

সত্যি অন্য সময়ে এমন রাতে, এমন বসন্ত-মদির রাতে হয়ত মাদলে ঘা পড়ত, পচানির ঝাঁজ রক্তের মাঝে, শিরায়, ধমনীতে জ্যোৎস্না-রাতের উৎসবের ঘোষণা করত। আর মেয়েরা চুল বাঁধত, গলায় পড়ত রূপো আর পলার মালা, হাতে বাঁধত বাজু, পায়ে প'রত মল আর খোঁপায় গুঁজত পদ্মফুলের কলি। তারপর গান হ'ত। নাচত মেয়েরা। ঝকঝকে দাঁত মেলে কালো মেয়েরা অপরূপ হয়ে হাসত, কটাক্ষ-বাণে জর্জর করত তাদের প্রিয়তমদের। কিন্তু আজ তা আর হবে না। আজ রক্তে উৎসবের ঘোষণা নয়, অভিযানের ঘোষণা। শোধ নিতে হবে। চল্লিশটা জোয়ান রক্ত ঢেলে বিলের জলে ঢলে পড়েছে চল্লিশটা কালো মরদ মারা গেছে। শোধ নিতে হবে। অস্ত্রে ধার দাও, শাণ দাও, শক্ত করো সমস্ত পেশীকে।

সোমা মাথা নাড়ল, "হয় বন্ধ হইল।—ফির কাইল তো গামু—হয়—"

টোমা মৃদু হাসল, "হয়। কিন্তুক্‌ হামি তো আইজই গামু"—

"কি গাবু?"

"শুনবি? কোন নাচের গানা লয়, কোন লড়কীর গানা লয়—হামার গানা—হামাদের গানা, শুনবি?"

"শুনা কেনে।"

টোমা তাকাল নিশ্চল মংরার দিকে, তারপরে গুণ গুণ করে গান ধরল। সে গান শুনে কেঁপে উঠল মংরা, তার চোখের ভিতর যেন চকমকির আগুন জ্বলে উঠল।

টোমা গাইল, "আয় রে আয় কাড়োল বিলে,

মাছ ধরিতে চল্‌,
আছে মুদের তীর ধনুকের বল—"
আছে মুদের তীর ধনীকের বল—"

রাত বাড়ল। সোমা আর টোমা চলে গেল। দাওয়ার ওপরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল মংরা। রাত গভীর হল। শেয়ালেরা প্রহর ঘোষণা করে ঢেউ-খেলানো ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। পরিষ্কার আকাশটা ক্রমে নির্জন নদীর আলোকিত চরের মত রহস্যময় হয়ে উঠল। রাত আরো গভীর হল।

রাত শেষ হবার অনেক আগে উঠে পড়ল মংরা। উঠে চারদিকে তাকাল। তাকাল আকাশের দিকে আর মরা জ্যোৎস্নার দিকে। তারপরে ঘরের ভিতর গিয়ে একটা ঢাক বের করে নিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়াল। সংগে দুটো কাঠি। স্থির হয়ে দাঁড়াল সে। যজ্ঞাগ্নির সামনে যেন দাঁড়াল কোন পুরোহিত। তারপর কাঠি দুটো দিয়ে ঘা মারল ঢাকের ওপর।

কড়ড়ড়ড়ড় ডুম কড়ড়ড়ড়ড় ড্যাংডা ড্যাডাং"—

মরা জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে গেল সে শব্দে। চমকে উঠল আকাশ আর মাটী। পাহাড়ের মত উ'চু-নীচু ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সেই শব্দটা তীরের মত ছুটে গেল দিক্‌দিগন্তরে।

কড়ড়ড়ড়ড়—ড্যাংডা ড্যাডাং—কড়ড়ড়ড়ড়

গ্রামের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। সবাই জেগেছে। তৈরী হচ্ছে।

এবার নিমইল গ্রাম থেকে ঢাকের জবাব এল। কড়ড়ড়ড়—ডুম—। তারাও জেগেছে, তৈরী হচ্ছে, জানিয়ে দিচ্ছে পাশের গ্রামকে।

এমনিভাবে সব গ্রাম জানবে, জাগবে, তৈরী হবে, অভিযানে বেরোবে। সেদিন পরাজিত হয়ে ফিরেছিল। আজ জয়লাভ করে ফিরবে। সেদিন গিয়েছিল এক হাজার, আজ যাবে তিন হাজার।

হঠাৎ মংরা চমকে উঠল। ছুটতে ছুটতে কে আসছে তার দিকে।

"কে?"

এবার চিনতে পারল মংরা। ঝুমুরী এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। তার চুল আলুলায়িত, চোখের কোণে গাঢ় ছায়া।

"যাছি হামি"—হেসে বলল মংরা।

জবাব দিল না ঝুমুরী। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

মংরা এগিয়ে গেল তার দিকে। ডান হাত দিয়ে তার এলোচুলকে মুঠি করে ধরে বাঁ হাত দিয়ে চিবুকটা ধরে ঝমুরীর মুখটাকে সে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলল—"সাচ্‌ কথা বুলে যাই তুকে আজ। বুলতাম আগে—কিন্তুক্‌ ছিলি না তু। শুন্‌ ঝুমুরী—তুর বাপ্‌কে, হামার শ্বশুরকে মাইরাছি হামি—হামি।"

কোন রূপান্তর ঘটল না ঝুমুরীর মধ্যে। কিছুই বলল না সে। স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে স্বামীর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়েই রইল শুধু।

মংরা বলল, "পাপ? পাপ কইরাছি? হোবেক। হামি মানি না। চল্লিশটা মরদের খুনকে হামি ভুলবু ক্যামনে বহু? হামি মাইর‍্যাছি তুর বাপকে—তুর বাপ বেইমান ছিল। উই গিয়া খভর দিল জিমিদারকে—উই টাকা লিলেক্‌ জিমিদারের—উ'ই বেইমান ছিল। হামি তাই চাল্লিশ জনার খাতিরে মারলম বেইমানকে"—

তবু জবাব দিল না ঝুমুরী। শুধু চোখের দৃষ্টিটা এবার যেন জীবন্ত হয়ে উঠল তার, পলক পড়ল।

দ্রুত পদক্ষেপ শোনা গেল। কারা আসছে।

ঘরের দিকে পা বাড়াল মংরা।

ঝুমুরী সামনে দাঁড়াল, বাধা দিল, এতক্ষণে কথা ফুটল তার মুখে।

সে বলল, "দাঁড়া—হামি দিছি তুকে—"

ছুটে সে ঘরের ভিতর গেল, আবার ছুটে বেরিয়ে এল। তার হাতে ধনুক আর তীর-ভর্তি তূণীর।

মংরা হাসল, "তু হামার কাছে ফিরা আইলি?"

ঝুমুরী স্বামীকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ, বলল, "আইলম। কিন্তুক্‌—তু ফিরা আসিস, হামার কিরিয়া"—

নিঃশব্দে হাসল মংরা, মাথা নাড়ল।

অন্ধকারে পদধ্বনি শোনা গেল। অনেকে এসে দাঁড়াল রাস্তায়। নিঃশব্দে ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল মংরা, একবার তাকাল সবার দিকে।

তারপর গম্ভীরকণ্ঠে সে বলল, "চল—আগায়া চল্‌"—

ঢেউখেলানো ক্ষেতের ওপর পড়েছে মরা জ্যোৎস্নার আলো। শেষরাতের স্তব্ধতা। শক্ত শক্ত, কালো কালো পা ফেলে ওরা এগিয়ে গেল। ওদের হাতে লাঠি, তীর ধনুক আর

বর্শা, দা' আর খাঁড়া, জাল আর পলুই। ধারালো অস্ত্রের ফলাগুলো জ্বলতে থাকে, জ্বলতে থাকে ওদের চোখের তারা। শিশির-সিক্ত নরম মাটির ঢেলা চূর্ণ করে, কালো ছায়া ফেলে ওরা এগিয়ে গেল। সামনের দিকে।

ঘণ্টা দুই বাদে শিবেন্দ্রকুমার যখন বিলের ধারে এসে পেঁছুলেন, তখন প্রায় চার হাজার লোক মাছ মারছে। জল-কাদার মাঝে আর ডাঙার ওপর গিজ গিজ করছে কালো কালো মানুষের দল। খালুই আর জালের ভেতর লাফাচ্ছে রুপোলী আঁশওয়ালা মাছ। বাতাসে উড়ছে বক আর সারস, ভাসছে পঙ্কিল জল আর পচা ঘাস-কাদার গন্ধ।

আজ শিবেন্দ্রকুমারের সঙ্গে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নেই। শিকার করাটা তো তার প্রাত্যহিক কাজ নয়। আর জমিদারের সঙ্গে পুলিসও আজ বেশী নেই। দারোগা সাহেবকে নিয়ে মাত্র পাঁচজন। বাকী ক'জন গেছে বিলাসপুরে, একটা খুনের আসামীকে গ্রেপ্তার করতে। আট-দশজন লাঠিয়াল নিয়ে পুলিসদের অভাবটাকে পূরণ করেছেন শিবেন্দ্র-কুমার। সব মিলিয়ে তাঁর দলে মাত্র আঠারো জন লোক।

এই আঠারোজন তাকাল বিলের দিকে। কাতারে কাতারে লোকেরা মাছ মারছে। হাজার হাজার লোক, ছেয়ে আছে বিলটাকে, কোলাহল করে মাছ মারছে।

"বন্ধ কর্—ভালো চাস তো থাম্"—চীৎকার করে বললেন শিবেন্দ্রকুমার।

"মাছ মারা বন্ধ কর্ রে শুয়োরের বাচ্চারা"—দারোগা গর্জে উঠল।

লোকেরা ফিরে তাকাল। কিন্তু আজ তারা ভয় পেল না।

মংরা চেঁচিয়ে বলল, "বুঝোপড়ুহা করমু আইজ—হাঁ"—

সবাই বলল, "হাঁ"

মংরা বলল, "ঘিরা লে উদের—ঘিরা লে"—

চারদিকে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ল নির্দেশটা, "ঘিরা লে উদের—ঘিরা লে"—

দারোগা বলল, "থাম্ না তো গুলী করব"—

মংরা শ্বাপদের মত হাসল; বলল, দাঁতে দাঁত সে, "দেখা লিমু কয়টা গুলী ছাড়বু তুরা, দেখা লিমু আইজ"—

হঠাৎ এগোতে লাগল ওরা। চারদিক থেকে এগিয়ে এল সবাই, জলকাদা ছেড়ে উঠে এল, মাছ ফেলে ছুটে এল। মাটি থেকে তারা তীর-ধনুক তুলে নিল, তুলে নিল বর্শা আর খাঁড়া আর এগোতে লাগল। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ওরা বৃত্তাকারে ঘেরাও করল জমিদার ও পুলিসদের।

"হটে যা—বাড়ী যা—নইলে মরবি"—চেঁচালেন শিবেন্দ্রকুমার।

মংরা এগিয়ে এল, "কিন্তুক্ কেত্তো মাইরভেন হুজুর—কেত্তো?"

"যতগুলো পারি"—

মংরা হাসল, "হাঁ? কিন্তুক হামরা আইজ জানোয়ারের মতন মরমু না হুজুর—জান ভি লিমু। কয়টা গুলী আছেক্ আপনোর? আর সভ্ গুলী তো ফুরায়া যাভেই একবার—তখ্‌নি?" গলা নামিয়ে মংরা এবার হিংস্রভাবে বলল—"আপনোর আছেক্ বন্দুক হুজুর—হামাদের ভি আছে তীরধনু আউর খাঁড়া—হাম্‌রা জান দিমু আউর লিমু"—

শিবেন্দ্রকুমার চারদিকে তাকালেন। বুনো হাতীর মত এগিয়ে আসছে বিদ্রোহী জানোয়ারগুলো, লোহার দেওয়ালের মত ঘেরাও করছে তাকে, ক্রমেই তাকে চেপে ফেলবার উপক্রম করছে। হাজার হাজার লোক। ওদের কুচকুচে কালো চামড়ার নীচে যেন আগুন জ্বলছে; ওদের কবাট বক্ষ, সুগঠিত উরু, চওড়া কব্জি আর অজস্র পেশীবহুল পৃষ্ঠদেশ যেন একটা অধীর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে; ওদের শান্ত, কালো চোখে যেন দাবানল দগ্ধ অরণ্যের রক্ত-দীপ্তি দেখা দিয়েছে; আর ওদের অস্ত্রমুখে আছে একটা হিংস্র, নিষ্ঠুর কামনা, একটা অনিবার্য অনর্থের সঙ্কেত।

"সরে যা শালার ব্যাটারা—সরে যা"—

কিন্তু কেউ সরল না, পেছু হটল না, একইভাবে এগিয়ে আসতে লাগল তারা। চারদিক থেকে। নিঃশব্দে। কঠিন রেখায় ভয়াল ওদের মুখ চোখ।

বিদ্যুতের মত একটা চেতনা জাগল। অসহায় ভঙ্গী করলেন শিবেন্দ্রকুমার, নিষ্ফল আক্রোশে, অক্ষমতার জ্বালায় তিনি বাতাসে ঘুষি মারলেন। উন্মত্ত, উত্তেজিত জনতার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে আরম্ভ করলেন।

"আগায়া চল্"—সোমা হুকুম দিল।

"ঘিরা লে"—মংরা বলল।

আজ ওরা পেছু হটবে না, গুলী খেয়ে পালাবে না, হার মানবে না।

"পেছু হটে যা—হটে যা রে কুত্তার বাচ্চারা"—দারোগা শেষবার বলল।

কিন্তু লোহার দেয়ালটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে, তাদের চেপে ফেলবার উপক্রম করছে। আর ঝক্‌ঝকে দাঁত মেলে হাসছে মংরা।

"আর্মস্ রেডি"—দারোগা আদেশ করল।

পাঁচটা রাইফেল উদ্যত হল।

দারোগা সামনের দিকে তাকাল। তবু এগিয়ে আসছে ওরা।

"ফা"—একটা শব্দ উচ্চারণ করতেই হঠাৎ থেমে গেল দারোগা সাহেব। জমিদার তার হাত চেপে ধরেছে।

"না, না—কাজ নেই"—শিবেন্দ্রকুমার বললেন।

"সে কি!"

"হ্যাঁ—কাজ নেই। কি হবে আর গুলী করে? যার জন্য এত কাণ্ড সেই মাছ কি আর বিলে আছে ভেবেছেন? না—ছেড়ে দিন"—

"ছেড়ে দেব?"

দাঁতে দাঁত চেপে শিবেন্দ্রকুমার বললেন, "না ছেড়ে উপায় কোথায়? আজ আর ওরা হার মানবে না"—

দারোগাসাহেব একবার তাকাল সবার দিকে, একটু ভাবল, তারপর সবাইকে বলল, "আচ্ছা যা তোরা, মাছ মারগে, জমিদারবাবু তোদের মাফ করে দিলেন।"

একটা প্রচণ্ড কোলাহল ধ্বনিত হল। আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল তাতে।

"হো—ই—ই—ভা—ই—ই—চল্"—

"মাছ মার"—

"হামাদের বিলটো হামাদের ভাই"—

ধীরে ধীরে, নির্বীষ ভুজঙ্গের মত ওরা সরে গেল। জমিদার আর দারোগার দল। ধীরে ধীরে, ক্লান্ত জন্তুর মত ওরা ফিরে গেল।

ওদের গমনপথের দিকে তাকাল মংরা, ঝক্‌ঝকে দাঁত মেলে হাসল। সামনে বিলের জল চকচক করছে রুপোর পাতের মত, তারপরে তরঙ্গায়িত ক্ষেত, তারও পরে নির্মেঘ নীলাকাশ। বিচিত্র এই রূপবতী পৃথিবী। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তা। মাথার ওপর উড়ছে বক আর সারস। দূরে, দিগন্তের কোলে বনরেখা। কারো চোখের কাজল-রেখার মত। ধমনীতে বয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহ, পাহাড়ী ঝরণার মত। উত্তেজনায় কাঁপছে দেহটা, তার ভেতরে যেন উৎসবের বাজনা বাজছে।

হঠাৎ সে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল, "হো—ই—ই—ই ভাই সব—মাছ মার তুরা—আ—আ—আ"—

"মাছ মারো জী—মাছ মারো"—

"ই বলটা তো হামাদের"—

সোমা হাসল, "বিল? কহুছিস্ কি রে শালা? বিল কেনে বাপ, ই গোটা দুনিয়া বি হামাদের হইল—হাঁ"—

"মাছ মারো জী—ই—ই—ই"—চীৎকার ধ্বনিত হল।

হাজার হাজার কালো মানুষেরা হঠাৎ উন্মত্ত উল্লাসে বিলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বাতাসে ছড়াল বিমথিত পঙ্কের গন্ধ।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল মংরা। তার বাবুড়ি চুলগুলো হাওয়ায় দুলছে, তার রুপোর তক্তিটা কর্দমাক্ত, হঠাৎ তাকে দেখলে এখন বিস্ময় জন্মাবে মনে, তাকে একটা অতিকায় দৈত্য বলে মনে হবে। মাটির ওপর পা দুটোকে শক্ত করে চেপে হঠাৎ সে হাসল। হঠাৎ তার মনে হল যে, মাথা নুয়ে থাকলে কিছু করা যায় না, চাইতে পারলেই ন্যায্য পাওনা পাওয়া যায়, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। হ্যাঁ, ভালো করে চাইতে পারলে শুধু বিল কেন, সমস্ত পৃথিবীটাকেও পাওয়া যাবে।

—শেষ—

রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **স্বরলিপি :** ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়॥
অসীম সৌন্দর্য তব কে ক'রেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়॥
তুমি জ্যোতির জ্যোতি, আমি অন্ধ আঁধারে।
তুমি মুক্ত মহীয়ান, আমি মগ্ন পাথারে॥
তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন,—
কী অপূর্ব মিলন তোমায় আমায়॥

সা II{সঋা -জ্ঞঋা | সণ্ -দ্ ণ্ | সজ্ঞা রা | জ্ঞমজ্ঞা -া -ঋসা I সা সা |
তো মা০ ০০ রে০ ০ জা নি নে হে০০ ০ ০০ ত বু

[-া]
| সঋা -জ্ঞমা মা | জ্ঞা ঋা | সা -া সা }I সা সদা | পা -া পপা |
ম০ ০ন্ তো মা তে ধা য় ("তো") তো মা০ রে ০ না জে

| পদণা -দা | -পমপা মজ্ঞা ঋসা I সা সা | সঋা -জ্ঞমা মা | জ্ঞা ঋা | সা -া সা II
নে০০ ০ বি০০ শ্ব০ তবু তো মা তে০ ০০ বি রা ম পা য় "তো"

II সা সা | সা -া ঋা | জ্ঞমা -জ্ঞদা | দা পা -মগা I মদা দা | পা -া পা |
অ সী ম ০ সৌ ন্দ০ র্য০ ত ব ০০ কে০ ক রে ০ ছে

পা দা | পদা -পণা দপা I মা -া | -া -া -মামা | জ্ঞরা -জ্ঞা | জ্ঞা -ঋসা সা I
অ নু ভ০ ০০ ব০ হে ০ ০ ০ ০০ সে০ ০ মা ০০ ধু

I{ সা -ঋা | জ্ঞা -া মা | জ্ঞঋা -া | সা (-া -া I সদা -পণা | -দণদা -া -পমা |
রী ০ চি ০ র ন ০ ব ০ ০ সে ০০ ০০০ ০ ০০

| মপা -জ্ঞরা | -জ্ঞা -া জ্ঞঋা)}I ণদা দা I{ ণ্ -জ্ঞা | রা মজ্ঞা -া | -া -া |
মা০ ০০ ০ ০ ধু০ আ মি না ০ জে নে ০ ০ ০

| ণদা -া দা I ণ্ সঋা | ণ্সা -ঋজ্ঞা ঋা | (সা -ঋসা | ণ্সা -দা দা)}I সা -া | -া -া সা II
প্রা ০ ণ সঁ পে ছি ০০ তো মায় ০০ "আ ০ মি" মায় ০ ০ ০ "তো"

II { সা সা | সা -া ঋা | জ্ঞা -া | মা -া মপমা I জ্ঞা রা | জ্ঞা -া জ্ঞমা |
তু মি জ্যো তি র ০ জ্যো ০ তি০০ আ মি অ ০ ন্ধ

| জ্ঞঋা -সঋজ্ঞা | ঋা -সা সা }I সা দা | দা -ণা র্সা | র্গঋা র্সা |
আঁ০ ০০০ ধা ০ রে তু মি মু ০ ক্ত ম হী

| ণা -দা দা I মপা মজ্ঞা | মা -ণা দপা | মপা -জ্ঞমা | জ্ঞা -ঋসা সা I{
য়া ০ ন আ মি ম ০ গ্ন০ পা০ ০০ থা ০০ রে

I সদা দা | দা -া ণা | র্সা -ণর্সঋা | র্সা -া -ণদা I পা পণা | দা -া দপা |
তু মি অ ০ ন্ত হী ০০০ ন ০ ০০ আ মি ক্ষু ০ দ্র০

| মা -পা | মজ্ঞা -া -ঋসা I সা সণ্ | সা -দা দপা | পণা -দা | পা -মজ্ঞা জ্ঞা I
দী ০ ন ০ ০০ কি অ০ পূ ০ র্ব মি ০ ল ০০ ন

I মা -পা | গমা -ণা জ্ঞরা | মজ্ঞা -া | -ঋা -সা সা IIII
তো ০ মা য় আ মায় ০ ০ ০ "তো"

নাম ও রূপ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বরযাত্রী গিয়েছিলেম, বন্ধুর বিয়েতে। বিয়ে হ'ল মফঃস্বলের এক শহরে। সেখান থেকে ফিরছি। ট্রেনের ২।৩টি কামরা জুড়ে আমাদের দল। জনা ষাটেক হবে। আমরা ছেলে-ছোকরার দল সব এক জায়গায় জুটে আড্ডা জমাচ্ছি, নানারকমের আলোচনা চলেছে। তার অধিকাংশই অবশ্য পূর্বরাগ, প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে। বিবাহিত বন্ধুটিও আমাদের মধ্যে রয়েছে। তার মুখখানা বেশ খুশি খুশি। হবারই কথা—নিজে দেখে বিয়ে করেছে; বৌ বেশ সুন্দরী এবং শিক্ষিতা—তার উপরে স্বাস্থ্যবতী! আর চাই কি?

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সকলেই একবার তার মুখের দিকে চাচ্ছে এবং মৃদু মৃদু হাসছে। বন্ধুও সে হাসিতে যোগ দিচ্ছে।

আলোচনা উঠলো মানুষের নামকরণ সম্বন্ধে। যতীশ বল্লে—'দেখ, নামের প্রতি আমাদের একটা মোহ আছে—এটা ঠিক। কিন্তু মানুষটা যদি সুন্দর হয়, তবে নাম তার যাই হোক—কিছু এসে যায় না।'

কথাটায় সকলে একমত হতে পারলাম না। কাজেই তর্ক বাধলো। তর্ক উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে—এমন সময় সকলকে নিবৃত্ত করলে আমাদের নবপরিণীত বন্ধু ক্ষেমংকর।

সে বলে উঠলো—'আমার কথা শোন। নামের একটা গুরুত্ব আছে, ওকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। এ আমি নিজের অভিজ্ঞতা হতে বলছি। আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় ঘটনা।'

এক মুহূর্তে তর্ক আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। সেই স্মরণীয় ঘটনাটি শোনবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম।

ক্ষেমংকর বল্লে—'তোমরা জাননা, বছর দুয়েক আগে, আমি যখন বরিশালে, তখন এক জায়গায় আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। ব্যাপারটা খুলে বলি।—

'বাবা হঠাৎ কলকাতা থেকে লিখলেন—'ক্ষেমু, বরিশালের '—কাঠি' হতে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। ভদ্রলোক বেশ অবস্থা-

'পাত্রীর প্রতীক্ষায় বসে আছি'—

পন্ন, তাঁর একমাত্র কন্যার জন্য তোমাকেই তিনি পাত্র নির্বাচন করেছেন। তোমাকে নাকি তিনি ইতিপূর্বে দু' একবার দেখেছেন এবং দেখে বেশ পছন্দ হয়েছে। এখন তাঁর কন্যাকে একবার দেখা দরকার। আমার পক্ষে সুদূর বরিশালের এক পল্লী-গ্রামে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। তাছাড়া, তুমি নিজেই যখন সেখানে রয়েছ, তখন তুমি পাত্রী দেখলেই সব দিক থেকে ভাল হয়।'

'পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে, পাত্রী দেখতে '—কাঠি' গেলাম, পাত্র যেখানে স্বয়ং পাত্রী দেখতে যায়, সেখানে অভ্যর্থনা কেমন হয়, তা বুঝতেই পারচো। বিশেষ পাত্রীর পিতা যদি আবার অবস্থাপন্ন হন।

'পাত্রী দেখতে গিয়ে তোমাদের অভাবটা খুব বেশি করে অনুভব করলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি বেশ 'নার্ভাস' হয়ে পড়লাম।

'সকালের দিকে সেখানে পৌঁছেছিলাম। দুপুরে বেলা তিনটার সময় কন্যা দেখাবার ব্যবস্থা হল।

'অন্দরের বাহিরের দিকের একটি কুটুরীতে আমি পাত্রীর প্রতীক্ষায় বসে আছি। শুধু বসে আছি বল্লেই যথেষ্ট হয় না। বসে বসে ঘামছি এবং মাঝে মাঝে কাঁপছি।

'তোমরা হাসছ? বাস্তবিক অবস্থা যা হয়েছিল তাতে মনে হয়, আমিই যেন পাত্রী; আমাকেই দেখতে আসছে পাত্রপক্ষ বা স্বয়ং পাত্র।

'যথাসময়ে তার আগমন হল। আমি চমকিত মুগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

'কতক্ষণ সেভাবে চেয়েছিলাম জানি না। আমার বোধ হয় বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আমার চমক ভাঙল—কন্যার কাকার কথায়—'যাও মা!

'আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় ঘটনা—'
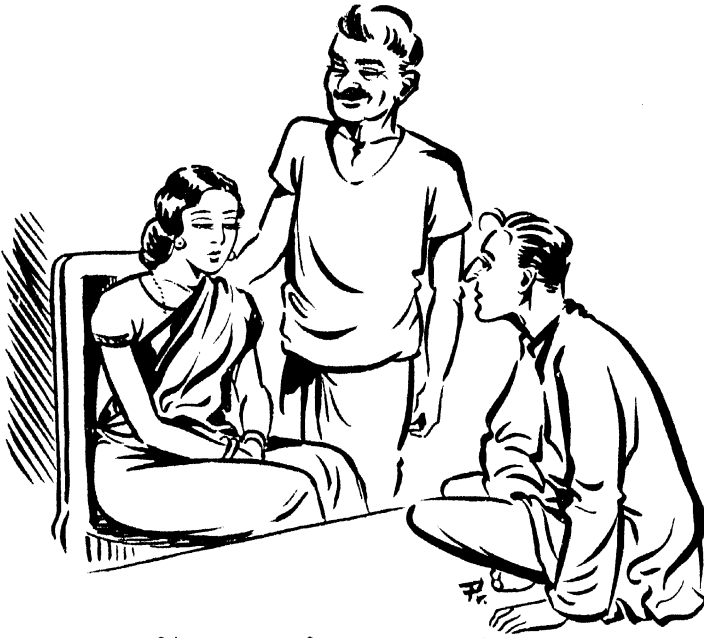
'তরুণের মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখা কাল্পনিক রূপ নয়,—বাস্তবিক সে রূপসী!'

ওঁকে প্রণাম কর।'

'তোমরা হাসছ, কিন্তু হাসির ব্যাপার নয়। তোমাদের যে-কেউ সেখানে গেলে, সেই মেয়েকে দেখে, আমারই মত চমকে উঠতে। আমারই মত মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে।

'এমন রূপ আমি দেখি নাই। রূপে ঘর আলো করার কথা আমরা শুনেচি। সেদিন তা সত্যি মনে হয়েছিল। সত্যই সেদিন তার রূপে ঘর আলো হয়েছিল।

'তরুণের মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখা কাল্পনিক রূপে নয়! বাস্তবিক সে রূপসী। তার আত্মীয়-স্বজনও দেখলাম সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। বেশভূষা সাজসজ্জার বাহুল্য মাত্র ছিল না। সামান্য একখান লাল পাড় শাড়ী পরিয়ে তাকে দেখান হয়েছিল।

'কন্যাকে কিছু প্রশ্ন করার প্রথা আছে। কিন্তু করবো কি—আমার বাকস্ফূর্তি হল না। যাহোক, পাত্রীপক্ষই আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করলেন। তাঁরা তাকে রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা আবৃত্তি করতে বল্লেন।

'সভাস্থ সকলকে চমকিত করে' মেয়েটি আবৃত্তি করে উঠলো—'তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে, রূপ না দিলে যদি বিধি হে!' আমি তো স্তম্ভিত! সে যে তেমন সময় এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করবে—এ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত।

'হঠাৎ সন্দেহ হল—আমাকেই ব্যঙ্গ করলে নাকি? কিন্তু ভেবে দেখলাম এরূপ ব্যঙ্গ করবার মত বয়স বা শিক্ষা তার নয়।

'যতদূর বুঝলাম—মেয়েটি তার বয়সের তুলনায় ঢের বেশি ছেলেমানুষ। মুখখানি শিশুসুলভ সরলতায় ভরা।

'কন্যাপক্ষ, কন্যার নানারূপ হাতের কাজ বা কারুকার্যের নিদর্শন দেখালেন। তার তৈরী সন্দেশ খাওয়ালেন। শেষে তার গানও শোনালেন।

'অর্থাৎ এককথায়, তাঁদের শিকারটিকে তাঁরা যতদিক থেকে পারলেন বন্দী করবার চেষ্টা করলেন। শিকারের বন্দিত্ব সম্বন্ধে শিকারীদের এমন কি শিকারেরও মনে যখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না—তখন হঠাৎ শিকার ফস্কে গেল।

'কেন—তা শোন।

'তখন পর্যন্ত একটা কথাও আমি বলি নাই। আমার তরফ থেকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করাটা বেখাপ ঠেকছিল। কিছু একটা বলা দরকার, তাই প্রশ্ন করলাম—'তোমার নাম কি?'

'সে উত্তর দিলে, বেশ স্পষ্টাক্ষরেই উত্তর দিলে—'রামানন্দ'

'কন্যা কর্তৃক সহসা আক্রান্ত হলেও আমি বোধ হয় এতদূর চমকে উঠতাম না। রামানন্দ! মেয়ের নাম রামানন্দ! এমন সুন্দর মেয়ে, আর তার নাম কিনা—! মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম করে উঠলো।

'এর পর আমি কি বলেছিলাম বা কি করেছিলাম—মনে নাই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, আমি এক প্লাস জল চেয়েছিলাম এবং জলের বদলে তাঁরা আমাকে সরবৎ দিয়েছিলেন। তাই খেয়েই উঠে পড়ি; এবং তৎক্ষণাৎ বরিশাল রওনা হই। তার পরের দিনই পত্র দিই—'বিবাহে আমার মত নাই।'

বন্ধুর এই অপূর্ব কাহিনী শুনে কিছুক্ষণ আমরা সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম। খানিক পরে আমি নিজের মনেই বলে উঠলাম—'মেয়ের নাম রামানন্দ হয় কেমন করে?'

ক্ষেমঙ্কর বল্লে—'এ প্রশ্ন বহুকাল আমার মাথায় ঘুরছিল। কিছুদিন আগে এক পণ্ডিতের কাছে এর উত্তর পেয়েছি।'

সকলেই সেই উত্তর শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম।

ক্ষেমঙ্কর বল্লে—'পণ্ডিত ব্যাখ্যা করলেন—'রামে যাঁর আনন্দ তিনিই রামানন্দ'—অর্থাৎ কিনা সীতা।'

পণ্ডিতের এই অপরূপ ব্যাখ্যার কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে এক ফাজিল ছোকরা বলে উঠলে—'সীতা না হয়ে হনুমানও তো হতে পারে!'

ক্ষেমঙ্কর উত্তর দিলে—'আমার মনেও সে প্রশ্ন জেগেছিল। পণ্ডিতকেও আমি তা

"পণ্ডিত ব্যাখ্যা করলেন, 'রামে যাঁর আনন্দ, তিনিই রামানন্দ'"

বলেছিলাম। তিনি বলেন—রামে যাঁর আনন্দ' কেবলমাত্র এ ব্যাখ্যায়, হনুমান কেন, জাম্বুবান, অঙ্গদ, বিভীষণ সবই হতে পারে। এমন কি গুহক চণ্ডালও হতে পারে।

কিন্তু তা নয়! 'রামে যাঁর আনন্দ' এবং 'রামের যাতে আনন্দ' এরূপ ব্যাখ্যা করলে—একমাত্র সীতা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কেননা, হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতির রামে আনন্দ হতে পারে; কিন্তু রামের আনন্দ, হনুমান জাম্বুবানে না হয়ে সীতাতেই হওয়া স্বাভাবিক।'

আমরা সকলেই মনে মনে স্বীকার করলাম—'হাঁ পণ্ডিতের মাথা বটে!'

ক্ষেমঙ্কর বলতে লাগলে—'আমার স্ত্রীকে তোরা সুন্দরী বলচিস্—কিন্তু তার কাছে আমার স্ত্রী দাঁড়াতে পারে না।'

আমি বলে উঠলাম—'সত্যি নাকি! এমন!'

রতীন বল্লে—'বলিস কি! তোর বৌএর চেয়েও সুন্দরী! অ্যাঁ!'

জ্ঞানেনদা আমাদের মধ্যে বয়স্ক এবং গম্ভীর প্রকৃতির। তিনি বল্লেন—'তাকে এখনও ভুলতে পারিস নি! এতো ভাল কথা নয়!'

হঠাৎ আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠলো—'থাক্ থাক্! এ-সব আলোচনা। বাসরঘরের কথা বল! কানমলা টানমলা খেলি? না, সে সব পাঠ এখন উঠে গেছে!'

শুনেই ক্ষেমঙ্করের কান লাল হয়ে উঠলো। সে বল্লে—'সত্যিই ভাই, কানমলা খেয়েছি! খুব বেশি করেই খেয়েছি!'

আমরা বলে উঠলাম—'তা হলে খেয়েছ কানমলা! বেশ বেশ!

ক্ষেমঙ্কর বল্লে—'কানমলা পর্যন্ত মিষ্টি লেগেচে!'

সকলে হো হো করে হেসে উঠলো!—'তা তো লাগবেই, বাসরঘরের কানমলা! বিশেষ যদি তা সুন্দর হাতের হয়—!'

ক্ষেমঙ্কর জবাব দিলে—'সুন্দর হাতের চাঁপার কলির মত কোমল আঙ্গুলের!'

আমি বল্লাম—"তাই নাকি! সে সুন্দরীটি কে ভাই?'

সকলকে চমকিত করে উত্তর হলো—'রামানন্দ'।

ক্ষেমঙ্কর ধীরে ধীরে বল্লে—'গত বছর ঠিক এমনি সময়ে রামানন্দের সঙ্গে আমার এক শালার বিয়ে হয়েছে!'

এপার ওপার

দিল্লী

দিল্লীকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে রূপান্তরিত করা হোক এরূপ এক দাবী দিল্লীর অধিবাসীরা করেছেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম কয়েকটি নগরীর মধ্যে দিল্লী আজও দাঁড়িয়ে আছে। দিল্লী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন পাণ্ডবগণ, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে, তখন তার নাম ছিল ইন্দ্র প্রস্থ। মরক্কো থেকে ইবন্ বতুতা ভারতবর্ষে বেড়াতে এসে দিল্লীর অনতিদূরে 'ইন্দরপত-শাসন' নামে একটি গ্রাম দেখে গিয়েছিলেন। তখন ওই ইন্দরপত আর দিল্লীর মধ্যে একটা শরাবের চোরাই কারবার চলত। গ্রামবাসীরা চামড়ার মশকে শরাব ভর্তি করে জ্বালানি কাঠ বোঝাই গরুর গাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে তা পৌঁছে দিত তুর্কি আমীরদের কাছে। মৌর্য বংশের দিলু থেকেই দিল্লী নামকরণ হয়। ১১ শতকে দিল্লী তোমারাদের রাজধানী হয় এবং পরবর্তী শতকে দাস বংশের। ১৫ শতকের মাঝামাঝি থেকে লোদীরা আগ্রাকে রাজধানী করে এবং মোগলরাও তা অনুসরণ করে। এখন যাকে বলা হয় 'ওল্ড দিল্লী' তা নির্মাণ করেন সম্রাট শাহজাহান, নাম দেন শাহজাহানাবাদ। উনবিংশ শতকের গোড়ায় মারাঠারা দিল্লী অধিকার করেন এবং মহারাজা সিন্ধিয়ার বৃত্তিভোগীরূপে মোগল সম্রাট শাহ আলম দিল্লীতে বাস করতে থাকেন। দিল্লীর ওপর তাঁর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। কিছুকাল পরে লর্ড লেক মারাঠাদের পরাজিত করেন। মোগল সম্রাট ব্রিটিশ হেফাজতে চলে যান। কিন্তু ইংরাজ সরকার তাঁর প্রতিপালনের জন্য দিল্লী ও হিসসার তাঁকে দেন, কিন্তু তার তদারক করত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট। রাজস্ব আদায় এবং বিচারের ভার ছিল রেসিডেন্টের ওপর। ১৮৩২ সালে রেসিডেন্সী তুলে দেওয়া হয় এবং পূর্ব যুক্তপ্রদেশের সঙ্গে দিল্লীকে যুক্ত করা হয়, শাসনভার দেওয়া হয় একজন ইংরাজ কমিশনারের ওপর। ১৮৫৭র বিদ্রোহের পর নবগঠিত পাঞ্জাব প্রদেশের সঙ্গে দিল্লীকে যোগ করে দেওয়া হয়। ১৯১২ সালে দিল্লীকে আলাদা করে একজন চীফ কমিশনারের হাতে শাসনভার দেওয়া হয়। তখন দিল্লীর আয়তন ছিল ৫৭৩ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৪,১২,৮২১। এখন জনসংখ্যা হয়েছে তার দ্বিগুণ।

জর্জি ডিমিট্রফ্, বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী। সঙ্গে রয়েছেন জর্জি প্যাভলফ্ (দক্ষিণে) দেশের বিখ্যাত 'ইম্প্রেসানিস্ট' শিল্পী।

অভিনব ঝরণা কলম

আমরা ফাউন্টেন পেনে লিখি, তা দিয়ে অবিরল ধারায় ঝর্ণার মতো কালি বেরিয়ে আসে; কিন্তু কালি ফুরিয়ে গেলে আবার কালি ভরতে হয়। ঝর্ণার সঙ্গে ঝর্ণা কলমের এই পার্থক্য। আজকাল বাজারে এক রকম কলম বিক্রয় হচ্ছে যাতে কালি না ভরে একাদিক্রমে দুই থেকে পনেরো বৎসর পর্যন্ত লেখা যায়। ল্যাডিসলাও বিরো নামে একজন হাঙ্গেরীয়াবাসী এই কলম আবিষ্কার করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিরো যখন বুডাপেস্টে বাড়ি ফিরে এল তখন তার বয়স ১৮। বিরোর নানারকম উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। সে প্রথমে ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করল, তারপর আরম্ভ করল হিপ্নটিজম, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প। তার আঁকা ছবি হাঙ্গেরীর জাতীয় শিল্প-ভবনে স্থান পেয়েছে। বিরোকে অবশেষে জীবিকা নির্বাহের জন্য রাজনীতির সমালোচক এবং প্রুফ রীডারের কাজ করতে হয়েছিল। প্রুফ যে কাগজে ছাপা হ'ত সে কাগজে ফাউন্টেন পেন ভাল চলে না। বিরো একটি উপযুক্ত কলম তৈরী করতে মনস্থ করল। তার বড় ভাই জর্জ ছিল একজন রাসায়নিক। জর্জের সহযোগীতায় ল্যাডিসলাও প্রথম যে কলম প্রস্তুত করল সেটি হ'ল লম্বায় দুই ফিট। ১৯৩৯ সালে দুই ভাই হাঙ্গেরী ত্যাগ করে প্যারিসে এল

এই জার্মান যুবকটির গত মহাযুদ্ধে একটি হাত সম্পূর্ণ কাটা গেছে। এখন সে কৃত্রিম হাতের সাহায্যে কি করছে, তা ছবিতেই প্রকাশ।

এবং কলম প্রস্তুত করবার চেষ্টা করতে লাগল। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে উঠল, বিরো যেয়ে হাজির হ'ল দক্ষিণ অ্যামেরিকায় বুয়েনস আয়ার্সে, তখন তার পকেটে আছে মাত্র দশ ডলার। সেখানে একজন আর্জেণ্টিনাবাসী ও একজন ইংরাজের সাহায্যে সে কলম তৈরী করবার চেষ্টা করতে লাগল। তার চেষ্টা ফলবতী হ'ল ১৯৪৩ সালে, সে এক অভিনব ঝর্ণা কলম প্রস্তুত করল। এই কলমে কালি ভরতে হয় না, কেবল মাঝে মাঝে এক প্রকার রসায়নের মশলা ভরতে হয়, ঠিক যেমন মাঝে মাঝে টর্চের ব্যাটারি বদলাতে হয়।

মিল্টন রেনল্ড নামে অ্যামেরিকার একজন ব্যবসায়ী বিরোর কলমের অনুকরণে এক রকম কলম তৈরী করেন, এতে বিরোর কলম অপেক্ষা কিছু কিছু উন্নতি সাধন তিনি করেছিলেন। আর একটি বিখ্যাত কলম ব্যবসায়ী কলমের সঙ্গে রঙীন মশলা (কারট্রিজ) বিক্রয় করছেন। কারট্রিজ বদলে নিলেই এক এক রঙের লেখা পড়বে। আজকাল অ্যামেরিকায় এই রকম কলম প্রতিদিন ষাট হাজারেরও বেশী তৈরী হচ্ছে।

দাম্পত্য কলহের বিশেষজ্ঞ !

"হাও টু বি হ্যাপি দো ম্যারেড" (বিয়ে করেও কি করে' সুখী হওয়া যায়) এই পুস্তকের লেখক ডক্টর এইচ এডওয়ার্ড মরিসন শীঘ্রই চতুর্থ পক্ষ গ্রহণ করছেন। দাম্পত্য কলহের মীমাংসা করবার জন্য তিনি একটি অফিস খুলেছিলেন' বিবদমান দম্পতিদের পরামর্শ দেওয়া নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মতে মিলত না। এই জন্য মরিসন দম্পতিরই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। প্রথম দুই পক্ষের সঙ্গে কি হয়েছিল তা জানা নেই।

সবাক টাইপরাইটার

ইংলণ্ডের ৫৯ বৎসর বয়স্ক আবিষ্কারক জর্জ কোফি সবাক টাইপরাইটার আবিষ্কার করেছেন। অন্ধ ব্যক্তিগণ এই টাইপরাইটার দ্বারা সহজে টাইপ করতে পারবেন। এই টাইপ-রাইটারের তিনি নাম দিয়েছেন টাইপোভক্স। কোনো ভুল অক্ষরে আঙুল পড়লে টাইপ রাইটার বলে দেবে যে ভুল হচ্ছে, এমন ব্যবস্থাও আছে।

বিদায় ব্যথা

তৃপ্তি দাশগুপ্তা

জানিতাম দোঁহে দোঁহারে ছাড়িয়া
যাবো চ'লে বহু দূরে,
তবু কেন দোঁহে দোঁহার হৃদয়
বসে'ছিনু মোরা জুড়ে।
জীবনে কখনও হেরিনি' স্বপনে
হবো গো তোমারে ছাড়া,
আজিকে এ-রাতে সবই যে ফুরালো
সকলই হইনু হারা।
কত সন্ধ্যায়, কত প্রাতে মোরা
খেলেছিনু কত খেলা,
আশার সাগরে ভাসায়েছি কত
মনের রঙীন-ভেলা।
আজি এই সেই বিদায়ের দিন
মিনতি জানায়ে যাই,
মনে যদি পড়ে ভুলিয়ো আমায়,
"আমি বোলে কেউ নাই।"
তব কাছে আজ কোন দাবী নাই,
(শুধু) এক ফোঁটা আঁখি-জল
স্মৃতির বেদনে সেই হবে মোর
সান্ত্বনা-পরিমল।

চাদর

আমি মানুষটা যে বিনয়ী নই সে কথা আমি পূর্বাহ্নেই বলে রেখেছি, তা ছাড়া আমার অহংকৃত মনোভাব খাতার পাতাতেও বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মুখের ভাষায় এবং লেখার পাতায় আমার দুর্বিনীত স্বভাব হামেশা প্রকাশ পেলেও হেঁটে চলে বেড়াবার সময় আমি সারাক্ষণ গলবস্ত্র হয়ে চলি অর্থাৎ আমার গলায় একটি চাদর জড়ানো থাকে। বহুকালের অভ্যাস এখন দ্বিতীয় প্রকৃতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। গলায় চাদর না থাকলে আমার মনে আস্থা থাকে না, দেহে স্বস্তি থাকে না। ওদিকে আমার চাদর দেখে দেখে বন্ধুরা এমন অভ্যস্ত হয়েছেন যে কদাচিৎ কখনো চাদরবিহীন অবস্থায় রাস্তায় বেরোলে আমার বন্ধুরা বিষম বিস্মিত হন। এমন কি কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু পত্নী রাস্তায় আমাকে বিনা চাদরে দেখে নাকি চিনতেই পারেননি। সেই থেকে দেখা হলেই তিনি আমাকে ইন্দ্রজিতের খাতায় আমার চাদর সম্বন্ধে লিখতে অনুরোধ করেন। আমি সম্ভব অসম্ভব সকল বিষয়েই লিখে থাকি তবু যে এতদিন আমার চাদর সম্বন্ধে কিছু লিখিনি সেটা বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানিনে নিতান্ত বিনয় বশতই করিনি। আমার দুর্বিনীত প্রকৃতিকে এ যাবৎ আপনারা নিজ গুণে ক্ষমা করে এসেছেন, কিন্তু তাই বলে গান্ধী টুপি, বিদ্যেসাগরী চটির সঙ্গে যদি ইন্দ্রজিতের চাদরটা যোগ করে দিই তাহলে আপনারা নিশ্চয় আমার আস্পর্ধাকে ক্ষমার অযোগ্য বিবেচনা করবেন। কাজেই গোড়াতেই বলে রাখছি আমার চাদরটাকে আপনারা উপরোক্ত দুটি জিনিসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখবেন না। সংসারে অতি অল্প জিনিসকেই আমি শ্রদ্ধা করতে শিখেছি। কিন্তু ঐ দুটি জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অকৃত্রিম। আগেই তো বলেছি আমি বিদ্যেসাগরী চটি শিরোধার্য করে নিয়েছি, কখনো পায়ে পরিনি। আমার মতে কারোই পরা উচিত নয়; কারণ চরণ মাত্রই শ্রীচরণ নয়।

এখানে কোনো কোনো পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিদ্যেসাগর মশায়ের প্রতি আমার যখন এতই ভক্তি তখন বিদ্যাসাগরী চাদরের কথা না বলে ইন্দ্রজিতের চাদরের কথা বলা কেন? প্রশ্নটা স্বাভাবিক হলেও অনাবশ্যক। কারণ, এটা আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে ইন্দ্রজিৎ লোকটা নিজের কথা বলতে পারলে অপরের কথা বড় একটা বলে না। তাছাড়া বিদ্যেসাগরের চাদর আর আমার চাদরে মস্ত বড় একটা পার্থক্য আছে। সেটা বুঝতে পারলে আর আপনাদের মনে কোনো গোল থাকবে না। লোকে বিদ্যেসাগর মশায়কে দিয়ে তাঁর চাদরকে চেনে আর আমার বেলায় তো দেখছেনই আমার চাদর দিয়ে তবে লোকে আমাকে চেনে। সেদিন আমাদের আসরে একটি আর্টিস্ট বন্ধু আমার একটি কার্টুন এঁকেছিলেন তাতে দেখলুম আমার চাদরটাই চৌদ্দ আনা, আমি নিজে দু আনা। অর্থাৎ গলায় চাদর না থাকলে আমার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কোনো দামই নেই। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক দেশী-বিদেশী অধিকাংশ কার্টুনিস্টই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট প্রকাশ না করে বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট প্রকাশ করেন—চুরুট দিয়ে চার্চিলকে চিনতে হয়, কপাল ঢাকা চুল দিয়ে হিটলারকে।
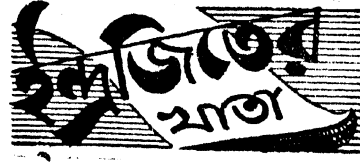
চাদর পরবার ঢংএও বিদ্যেসাগর মশায়ের সঙ্গে আমার তফাৎ আছে। তাঁর মতো আমি চাদরটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে পরি না, গলায় ঝুলিয়ে রাখি। আর আমার চাদরটা যদিচ খদ্দরের তৈরি তবু বিদ্যেসাগরী চাঁদরের মতো সেটা অমন পুরু বুনটের নয়, কারণ গায়ের চামড়া পুরু হলে চাদর সরু হলেও চলে।

আমার পোশাকটা খাঁটি বাঙালীর পোশাক। ধুতি পাঞ্জাবী চাদরে বাঙালীকে যেমন মানায় এমন আর কিছুতে নয়। এমনকি সার্ট জিনিসটাও বাঙালীকে তেমন মানায় না, পাঞ্জাবী যেমন পাঞ্জাবীকে মানায় না। বাঙালীর অন্ন বলতে ডাল, ভাত, বস্ত্র বলতে ধুতি চাদর। সেই চাদর পরলে লোকে কেন অবাক হবে আমি ভেবে পাইনে। বরং বাঙালীকে চাদরবিহীন অবস্থায় দেখলেই আমার অবাক লাগে। কোঁচা দুলিয়ে চাদর লুটিয়ে যদি না চললাম তবে বাঙালী বলে পরিচয় দেব কোন্ মুখে? বাঙালী ছেলেরা যখন মাল কোঁচা মেরে কিম্বা পাজামা পরে জহর জ্যাকেট এঁটে ঘুরে বেড়ায় তখন দেখতে কি যে বেখাপ্পা লাগে কি বলব। কবিগুরু দুঃখ করে বলেছেন, সাত কোটি বাঙালী সন্তান বাঙালী হতে গিয়ে মানুষ হয়নি। আর ইন্দ্রজিতের দুঃখ হচ্ছে বাঙালী সন্তানরা মানুষ হতে গিয়ে অবাঙালী হয়ে যাচ্ছে। আমার মতে অবাঙালী হওয়া অমানুষ হওয়ার চাইতে বড় অপরাধ। কারণ বাঙালীকে আমি মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি, তার সকল দোষ সত্ত্বেও।

আমাদের এই গরম দেশে চাদর ছাড়া আর সব গাত্রবস্ত্রই অনাবশ্যক বাহুল্য বলে মনে হয়। এমন কি আমাদের পৌষ মাসের শীতও একটা খদ্দর চাদর দিয়ে অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সাক্ষী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শিলং পাহাড় থেকে লিখছেন—একটা খদ্দর চাদর হলেই শীত ভাগ্গানো সম্ভবে।

আশ্চর্যের বিষয় এহেন অত্যাবশ্যক জিনিস বর্জন করবার জন্য এককালে আমাদের দেশে আন্দোলন হয়েছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছেলে বয়েসে চাদর নিবারণী সভা স্থাপন করেছিলেন। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের যত ছবি আমি দেখেছি তার প্রত্যেকটি চাদর গায়ে। বেশ বোঝা যায় তিনি বিলেত যাবার আগেই বিলেত ফেরৎদের আওতায় এসেছিলেন। কিন্তু উত্তর কালে তাঁর যে ভুল ভেঙেছিল কোনো সন্দেহ নেই। সেকালের ধুতি-চাদর বিদ্বেষী বিলেত ফেরৎদের তিনি নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। নিজেকেও ছেড়ে কথা কননি। 'নতুন কিছু কর একটা'—নামক ব্যঙ্গ সঙ্গীতিটিতে বলছেন—

ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা
কর শাঁগাগির ধুতি চাদর নিবারণী সভা।

বালক বয়সে নিজে যে চাপল্য প্রকাশ করেছিলেন পরিণত বয়সে তিনি তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর বসন ভূষণের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হবে আশা করা যায়। হ্যাট-কোট নেকটাই একদিন ছিল গলার ফাঁসি হয়ে। এখন সে পাপ বিদেয় হোক। আমাদের সনাতন চাদর বহু দিন পরে এসে বন্ধুর মতো আবার আমাদের গলা জড়িয়ে ধরুক। বাঙালী সন্তান আরেকবার স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বলুক—ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারই উত্তরীয়।

দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার

শ্রীসুলতা কর

১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মেঘলা দিনে মেডিরা দ্বীপের এক ছোট বন্দরে ফ্র্যাম নামে জাহাজ এসে ভিড়ল। জাহাজের মাস্তুলের উপর নরওয়ের জাতীয় পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। ছোট বন্দরটিতে প্রায়ই নানা দেশের জাহাজ যাওয়া আসা করে, কিন্তু এই জাহাজখানি দেশের লোকেদের মনে নিদারুণ কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। ছোট নৌকার মাঝিরা জিনিসপত্তর বেচবার জন্য জাহাজের ভিতর গেছল। তারা ফিরে এসে সবাইকে বলতে লাগল যে, জাহাজের ভিতর অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখে এসেছে। বিকটদর্শন এস্কিমো কুকুরেরা জাহাজ ভর্তি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাছাড়া রাশ রাশ তাঁবু, অসংখ্য শ্লেজ গাড়ি এমনি আরও নানারকম জিনিস।

মাঝিদের মুখের এইসব খবর চারদিকে রটবামাত্র দলে দলে লোক বন্দরে ভীড় করে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। এটা ছিল একটা মেরু আবিষ্কারের জাহাজ। নরওয়েবাসী যুবক আমুনডসেন তাঁর দলবল নিয়ে চলেছিলেন উত্তর মেরু আবিষ্কার করতে।

সেদিন বিকালে বন্দরে সাধারণ লোকেদের মধ্যে যেমন চাঞ্চল্য জেগেছিল তার চেয়েও বেশি চাঞ্চল্য জেগেছিল জাহাজের নাবিকদের মধ্যে। আমুনডসেন তাঁর সহযাত্রী নির্ভীক নরওয়েবাসী নাবিকদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, হাতে তাঁর একখানি চার্ট। তাদের সম্বোধন করে বললেন যে, তিনি তাঁর মতি পরিবর্তন করেছেন। উত্তর মেরু না গিয়ে তিনি এখন দক্ষিণ মেরুর অজানা পথে পা বাড়াতে চান। এপথে আগে কেউ কখনও যায়নি। তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, দলপতি বলে মেনে নিয়ে, সমস্ত দুর্দৈব সহ্য করে তাঁরা কি তাঁর অনুগামী হবেন।

তাঁদের প্রতিজ্ঞার উপরেই এই অভাবনীয় মেরু আবিষ্কারের সব কিছু নির্ভর করছে। দুরু দুরু বুকে তিনি উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

নাবিকদের মুখের উপর বিস্ময়ের ছায়া খেলে গেল, দক্ষিণ মেরুর অগম্য পথে যাত্রার কথা তারা আগে শোনেনি। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তে তারা সমস্বরে বলে উঠল—"সবাই রাজী। দলপতির জয় হোক।"

আশায় আনন্দে আমুনডসেনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সারাজীবন তিনি এই স্মরণীয় মুহূর্তটিকে মনে রেখেছিলেন।

জাহাজ ছোট বন্দর ছাড়ল। ক্রমাগত দক্ষিণ মেরুর অভিমুখে চলতে আরম্ভ করল। চার মাস বাদে পৌঁছল সবশেষ বন্দরে। এখানে লোকালয় শেষ হয়েছে।

আমুনডসেন তাঁর দলকে দুভাগ করলেন। ফ্র্যাম জাহাজ ক্যাপ্টেন নিলসনকে ও কিছু লোকজনকে নিয়ে চলে গেল। আমুনডসেন বাকী নাবিকদের নিয়ে চললেন কুকুরটানা শ্লেজে চেপে, জনমানবহীন বরফঢাকা প্রান্তর, গগনচুম্বী পাহাড়ের চূড়া আর অতলস্পর্শ গ্লেসিয়ার পার হয়ে।

জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এমনিভাবে চলতে চলতে পার হয়ে গেলেন হাজার মাইল তুষারাস্তীর্ণ প্রান্তর।

তারপর এল বাইশে এপ্রিলের রাত। সেই রাতে মেরুসূর্য দীর্ঘ চার মাসের জন্য বিদায় নিল তাঁদের কাছ থেকে।। আরম্ভ হল গভীর অন্ধকারময় দিবারাত্রিব্যাপী তুহিন শীতল মেরুরজনী। আমুনডসেন তাঁর যাত্রা থামালেন। মেরু শীত যাপনের উপযুক্ত তাঁবু তিনি আগেই তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন। সেইসব তাঁবু হিমশীতল অন্ধকারাচ্ছন্ন মেরু প্রান্তরে ফেলা হল। বিভীষিকাময়ী দীর্ঘ দিনরাতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে তাঁরা সবাই মিলে ঢুকে পড়লেন তাঁবুর ভিতরে।

কেমন করে তাঁরা এই দীর্ঘ ভয়াবহ চার মাস কাটালেন তার চমৎকার বর্ণনা আমুনডসেন তাঁর 'দক্ষিণ মেরু' নামের বইয়েতে দিয়েছেন।

সেই বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সবাইকে দেহে ও মনে সুস্থ রাখবার জন্য, মেরুরজনীর বিভীষিকা ভোলাবার জন্য আমুনডসেন সকলকে সব সময় কর্মব্যস্ত করে রাখতেন। তিনি নিয়ম করে দিলেন নিজেরা সবাই আর বাহান্নটি কুকুর প্রতিদিন টাটকা মাংস খাবে। কাজেই সকলকে বেশীর ভাগ সময় 'শীল' মাছ শীকারে ব্যস্ত থাকতে হত; আরও অনেকটা সময় কাটত অতগুলো মাছ রান্না করতে।

রান্না খাওয়া শেষ হলে আরম্ভ হত গান-বাজনা, লেখাপড়া। অভিজ্ঞ মেরুযাত্রী আমুনডসেন সঙ্গে এনেছিলেন তিন হাজার বই, গ্রামোফোন আর একটি রঙ্গীন ক্যানারি পাখী। গ্রমোফোন বাজান শেষ হলে তিনি সহযাত্রীদের এক অভিনব উপায়ে আনন্দ দিতেন। আরম্ভ হত বাহান্নটি কুকুরের কনসার্ট। প্রথমে একটি কুকুর গর্জন করে উঠত, তারপর তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আর একটি। এমনি করে পর পর বাহান্নটি কুকুরের গর্জনে মেরু-রজনীর নিঃস্তব্ধতা ভেঙ্গে যেত। কতক্ষণ ধরে চলত কুকুরদের কণ্ঠসঙ্গীত।

তারপর হঠাৎ যেন কি এক ইঙ্গিতে সবাই মিলে থেমে পড়ত।

এমনি করে কাটল দীর্ঘ চার মাসের ভয়াবহ মেরুরাত্রি। চব্বিশে আগস্ট আবার যখন সূর্যের আলো জীবনের আনন্দ বহন করে শ্বেত তুষার স্তূপের উপর জ্বলে উঠল তখন দেখা গেল কুকুরদল শুদ্ধ তাঁরা সবাই সুন্দর স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ প্রাণের আনন্দে ভরপুর হয়ে রয়েছেন।

মেরুরজনী তাঁদের অদম্য প্রাণশক্তিকে পরাজিত করতে পারেনি। তাঁবু গুটিয়ে ফেলে আবার তাঁদের যাত্রা শুরু হল। এবার সবচেয়ে দুরূহ পথে যাত্রা। মাত্র পাঁচটি নরওয়েবাসী বীর যুবক বাহান্নটি কুকুরটানা শ্লেজ নিয়ে চললেন মেরুর সবশেষ প্রান্তে পৌঁছতে।

প্রতিদিন তাঁরা পার হতে লাগলেন ত্রিরিশ মাইল দুর্ভেদ্য কঠিন পথ। নভেম্বরের মাঝামাঝি উঠে পড়লেন এগারো হাজার ফিট উঁচুতে।

তারপর আরম্ভ হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবন মরণ সংগ্রাম। কয়দিন ধরে বইতে লাগল অশ্রান্ত তীব্র বরফের ঝড়। সেই ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটার মুখে পড়ে তাঁদের হল জীবন-সঙ্কট। দুর্দান্ত শীতে হাত পা হয়ে আসতে লাগল পক্ষাঘাতগ্রস্ত, চোখে নেমে আসতে লাগল ঘন অন্ধকার, প্রত্যেকেই আক্রান্ত হলেন দৃষ্টিক্ষীণতা রোগে।

কিন্তু ভয় তাঁরা পেলেন না, মৃত্যুকে জয় করবার প্রতিজ্ঞা করেই তাঁরা এপথে পা বাড়িয়েছেন। এগিয়ে চললেন বরফের ঝড় উপেক্ষা করে, অসীম সাহসে বুক বেঁধে।

ক্রমে ঝড়ের প্রচণ্ডতা কমে আসতে লাগল, সূর্যের আলো হাসিমুখে বেরিয়ে পড়ল। মৃত্যুজয়ী বীরেদের সবশেষ যাত্রাপথটুকু আলোর মালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অবশেষে এল যাত্রীদলের বহুআকাঙ্ক্ষিত দক্ষিণ মেরুর শেষ প্রান্ত।

১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর প্রভাতসূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল দক্ষিণ মেরুর গগনপ্রান্ত উদ্ভাসিত করে। মেরুর তুহিন শীতল বরফ-রাশির বুকে পড়ল প্রথমমানবপাদস্পর্শ।

সেই যুগান্তকারী দিনে কি অপূর্ব

অনুভূতি তাঁদের হয়েছিল তার বর্ণনা আমুনডসেনের বইয়ে পাওয়া যায়।

অনুভূতির প্রাবল্যে সেদিন তাঁরা কেউ কিছু খেতে পারলেন না, দু'একটি ছাড়া কোন কথা বলতে পারলেন না। মাইলের পর মাইল নিঃশব্দে সবাই মিলে চলেছেন পায়ের তলায় বিরাট বরফস্তূপ মাড়িয়ে মাড়িয়ে। বুক কাঁপছে হর্ষে, উত্তেজনায়, তীব্র অনুভূতিতে।

বেলা তিনটে বাজল। দলপতি চেঁচিয়ে উঠলেন 'থাম'। যাত্রা শেষ হয়েছে, দক্ষিণ মেরু পেঁছে গিয়েছি।

বিস্মিত চোখ মেলে সবাই দেখতে লাগলেন এই সেই মানবসভ্যতার অনাবিষ্কৃত দক্ষিণ মেরু।

জনমানবহীন দিগন্তবিস্তীর্ণ তুষারভূমি, জীবনের ক্ষীণতম চিহ্নও এর বুকে জেগে নেই, তবু এই স্থানটুকু আবিষ্কারের জন্য কত শত শত সাহসী বীরেরা জীবন বিসর্জন দিয়ে গেছেন।

আমুনডসেন তাঁর বইয়েতে লিখেছেন—"সে কি অপূর্ব মুহূর্ত—যখন ঝড়ঝাপ্টা তুষারপাতে বিধ্বস্ত পাঁচজন বীর যুবক প্রথম মেরু স্পর্শ করল। তাদের লৌহ কঠিন হাতে নরওয়ের চিরগৌরবান্বিত পতাকা দক্ষিণ মেরুর বুকে সর্বপ্রথম উড়িয়ে দিল।

"পরস্পরকে আমরা নীরব সানন্দ অভিবাদন জানালাম। মেরুর তুহিন বুকে বসে পড়ে আরম্ভ করলাম আমাদের সেদিনকার বিশিষ্ট ভোজসভা। সম্বল ছিল কতকগুলো শুকনো 'শীল' মাছ, চকোলেট আর সিগার। তাই দিয়েই মহা আনন্দ উৎসব আরম্ভ হল। সেই ভোজ-সভায় বসে আমরা ভবিষ্যতের কত অপূর্ব সম্ভাবনার ছবি আঁকতে লাগলাম।"

তিন দিন আমুনডসেন তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে বিশ্রাম করলেন। চারদিকের নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিজের ডায়েরীতে লিখে নিলেন। আমুনডসেন জানতেন যে ইংরাজ অভিযাত্রী 'স্কট' দক্ষিণমেরু আবিষ্কারে বেরিয়ে-ছেন। তাই তিনি কিছু খাদ্যদ্রব্য, কাপড় জামা ও আরও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস তাঁর জন্য তাঁবুতে রেখে দিলেন।

তারপর তিনি তাঁর দল নিয়ে তুষারভূমি ত্যাগ করে ফিরে চললেন মানবজগতে। সভ্যতার বুকে তাঁদের এই মেরুজয়ের বার্তা প্রচার করতে।

ফেরার পথে তাঁদের বিশেষ দুঃখ কষ্টভোগ করতে হয়নি। প্রকৃতি এই মেরুজয়ী বীরদের উপর ছিল প্রসন্ন। প্রকৃতির রুদ্র বিভীষিকা আর তাঁদের দেখতে হয়নি।

দক্ষিণমেরুর এই দুর্গম অনতিক্রম্য সর্ব-শেষ ১৮৬০ মাইল পথ অতিক্রম করতে আমুনডসেন ও তাঁর দলের লেগেছিল মাত্র নিরানব্বইটি দিন।

১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে জগত প্রথম শুনল নরওয়ের বীরদের বীরত্ব কাহিনী—মেরুজয়ের সাফল্যের কাহিনী।

পৃথিবীর সকল জাতি, সকল দেশ বীর আমুনডসেনকে জানাল যোগ্য অভিনন্দন। নাম, যশ, অর্থ দিয়ে জগতবাসী এই বীরকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিল।

নিজের দেশে ফিরেই আমুনডসেন তাঁর সমগ্র ভ্রমণ কাহিনী বিস্তৃত করে লিখলেন "দক্ষিণ মেরু" নামের বইয়ে। এই বই পড়লে বোঝা যায়, মেরু-অভিযাত্রীর বুকের ভেতর কি অপূর্ব উদ্দীপনাময় প্রাণশক্তি লুকিয়ে থাকে, যার বলে মেরুর অনতিক্রম্য দুর্গম পথকে অনায়াসে জয় করে নিতে পারে নির্ভীক বীরের দল।

রাখী

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

আজকে ভোরের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম বিজয়াদি'।
অ-নে-ক দূর থেকে তুমি পাঠিয়েছ একটা রঙীন খামঃ
আর সেই রঙীন খামে ঝিল্‌মিল্‌ রঙীন একটা রাখী।
আর সেই রাখীর সনে মেয়েলী হাতে লেখা ছোট্ট একটি কবিতাঃ
'......ভায়ে ভায়ে হোক আজ রাখী বন্ধন......।'
তোমার রাখীটা বেশ করে ডান হাতে বাঁধলুম
আর সুদূর দিগন্তে একটা নমস্কার পাঠালুম।

সোনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের শান্তিনিকেতনের মাঠে ঘাটে
আর আমার হাতে ঝিল্‌মিল্‌ করছে তোমার রঙীন রাখী।
বিছানায় গা' এলিয়ে দিয়ে তোমার রাখীটার দিকে তাকিয়ে আছি
মন ছুটে বেড়াচ্ছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়......
হঠাৎ দেখিঃ
রাজপুতানার প্রাসাদে প্রাসাদে বেজে উঠেছে ব্যথার রাগিণী
টস্‌ টস্‌ করে গড়িয়ে পড়ছে রাণী কর্ণাবতীর চোখের জল
জহরের পেয়ালা হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে তারা
আর
অ-নে-ক অনেক দূরে
বাঙলার এক প্রান্ত থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে হুমায়ুন........
সোনার আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে হাতে তাঁর রঙীন রাখী
কর্ণাবতীর অঙ্গীকার.........।

পিয়নের ডাকে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো
পত্রিকা খুলে দেখিঃ
বড় বড় হরফে লেখাঃ
'কোলকাতায় ভয়ানক হাংগামা.........।'

আমার হাতে এখনো ঝল্‌মল্‌ করছে তোমার রঙীন রাখী
আর টস্‌ টস্‌ করে জল পড়ছে আমার দু'গাল বেয়ে॥

প্রগতি

গোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত

থেমে গেছে গান, টুটে গেছে সুর,
স্তব্ধ হয়েছে ছন্দ।
পিশাচের হাসি, পীড়িত-অশ্রু,—
প্রলয় এনেছে দ্বন্দ্ব।
হাহাকার, আর শোষকের নীতি,
দুর্বল প্রাণে সবলের ভীতি,
গড়েছে তোমার আমার মাঝারে,
দুর্বার ইমারত;
রুদ্ধ করেছে অরুণাংশুকে
তমিস্রাবৃত পথ।
মোহজালে তাই জড়ায়েছি মোরা,
স্তব্ধ প্রাণেতে সত্যের সাড়া,—
বিদায় নিয়েছে বারে বারে আজ
হৃদয় দুয়ার হতে—
ঠেলিছে নিয়ত নিয়তির কোন্‌
চক্র-কুটিল পথে।
প্রলয়ের বাঁশী ঐ শোনা যায়,
আহ্বানে তার কি কথা জানায়ঃ
রক্তধারায় মুছে দিতে হবে,
মোদের ঋণের অঙ্ক;
বিভেদের রীতি ঘুচাইতে তাই,
চলে যায় নিঃশঙ্ক।
তারপরঃ রক্তস্নাত পৃথ্বীতে কিগো
জাগিবে নবীন সবিতা;
মোদের বীণায় একক তারের
ছন্দিবে পুনঃ কবিতা?

জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

আমার পরলোকগত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় যখন গ্রীয়ারসন সাহেবের সহিত মিলিয়া মালিক মহম্মদ জায়সীর "পদ্মাবতী" সম্পাদন করিতেছিলেন তখন কাশীর পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ জায়সীর পদ্মাবতীতে যোগ সাধনার বিষয়ে লেখা অংশগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "এই সব বিষয়ে ইহা অপেক্ষা ভাল করিয়া লেখা আমাদেরও অসাধ্য। জায়সীর উদারতা বিস্ময়কর। তবে কি উদারতা বিষয়ে মুসলমানেরাই অগ্রণী? হিন্দুরাও কি উদারভাবে কখনো বাহিরের কিছু লইতে পারেন নাই?" তখন দ্বিবেদীজী বলিলেন, "আমাদেরই বা উদারতা কম কি? জ্যোতিষে গণিতাংশটা প্রায় আমাদেরই নিজস্ব। কিন্তু আমাদের জ্যোতিষের ফলিতাংশটা প্রধানতঃ গ্রীকদের কাছেই নেওয়া। তখনও একদল প্রাচীনপন্থী তাহাতে বাধা দিয়াছেন। কিন্তু তখনও অনেকেই সেই বাধা মানেন নাই। বৃহৎ সংহিতায় আছে—'ম্লেচ্ছেরা যবন হইলেও এই ফলিত জ্যোতিষ তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই সব জ্যোতিষাচার্যেরা ঋষিবৎপূজিত।'

ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে
কিংপুনর্দৈববিদ দ্বিজ॥'
(বৃহৎ সংহিতা, ২, ১৫)

আমাদের জ্যোতিষের "হোরা", "দ্রেক্কাণ" প্রভৃতি পারিভাষিক বহু শব্দ গ্রীক। বরাহ মিহিরকৃত বৃহৎ সংহিতার ভূমিকায় এইরূপ ছত্রিশটি গ্রীক শব্দ আছে যাহা সংস্কৃত নহে। ভারতীয় জ্যোতিষের হোরা বা জাতক স্কন্দটা প্রায় সবটাই গ্রীকদের। তাই ফলিত জ্যোতিষে চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রী লিঙ্গ, যদিও ভারতীয় শাস্ত্রে তাঁহারা পুরুষ। হোরা শাস্ত্রের শ্লোকগুলি সাধারণের দুর্বোধ্য গ্রীক শব্দে ভরা (১, ৮, প্রভৃতি শ্লোক দর্শনীয়)

তখনকার দিনে সনাতনীরাও ফলিত জ্যোতিষের এই গ্রীক বন্যাকে ঠেকাইতে পারেন নাই। পরে মহা সনাতনী ভৃগুর নামেও গ্রীক ফলিত জ্যোতিষ চলিয়াছে। ভারতীয় সমাজে গ্রহ-বিপ্রদের ও নক্ষত্র দর্শকদের স্থান যতই হীন হউক, তবু ফলিত জ্যোতিষ হিন্দু সমাজে এখন একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

এই জাতক বিদ্যাই আবার ভারতীয় রূপ লইয়া আরব দেশে গিয়াছে। সেখানে তাহা আবার আরবীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। পরে পুনরায় মুসলমান যুগে মুসলমানেরা ভারত হইতে নেওয়া আরবীকৃত সেই শাস্ত্রই ভারতে ফিরাইয়া আনেন। সেই মুসলমানী জ্যোতিষ ভারতীয় পণ্ডিতেরা তাজিক নামে গ্রহণ করিলেন। তাজিক অর্থই আরবী। "রমল"ও মুসলমানদের কাছে নেওয়া। তাহা খাঁটি মুসলমানী বস্তু। তাহা ভারতীয়েরা মুসলমানদের কাছেই পাইল। রমলের অন্তর্গত "জফর" বিদ্যা হইল গুটি ফেলিয়া ফলাফল গণনা।

মুসলমানদের ইতিবৃত্তে দেখা যায়, আটজন ভারতীয় পণ্ডিত আমন্ত্রিত হইয়া ভারত হইতে বাগদাদে যান। তাঁহাদের মধ্যে কঙ্খ (শঙ্খ?) বাগদাদে খলিফা অল মনসুরের দরবারে বিশেষভাবে মান্য হন। তিনি আরবদের মধ্যে ভারতীয় হোরাজাতক বিদ্যা প্রবর্তিত করেন। গ্রীকদের কাছে নেওয়া এই বিদ্যাই আবার আরবীয় "তাজিক" হইয়া ভারতে ফিরিল। ভারতীয় সমাজে তাহা সম্মানিত হইল। ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও এই সব মুসলমানী শাস্ত্রকে অনাদর করেন নাই। পাণ্ডুরঙ্গ বামন কানে বলেন, কাশীতে দাক্ষিণ দেশীয় মহাপণ্ডিত নারায়ণ ভট্টের পুত্র ছিলেন অনন্ত ভট্ট। অনন্তের পুত্র নীলকণ্ঠ ভট্ট ছিলেন সর্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। ১৬০০'র কাছাকাছি নীলকণ্ঠ তিথিরত্নমালা নামে গ্রন্থ লেখেন ও মুহূর্ত চিন্তামণি গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। মুহূর্ত চিন্তামণি জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিখ্যাত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা রাম দৈবজ্ঞ ছিলেন নীলকণ্ঠেরই ছোট ভাই। এই দাক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা বিদর্ভদেশ হইতে আসিয়া কাশীতে বাস করেন। আকবরের সভাতে নীলকণ্ঠের প্রভূত সম্মান ছিল। ইনিই আবার তাজিক নীলকণ্ঠী লেখেন। টীকা সহ এই গ্রন্থখানির পাথরে খোদাই ছাপা একখণ্ড আমার কাছে আছে। ভারতীয় জ্যোতিষে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা আলোচনা করিতে হইলে এই সব গ্রন্থ ভাল করিয়া আলোচনা করা দরকার। এই সব গ্রন্থের ভাল সংস্করণও হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বটতলার মত কাশীর কচুরী গলি এই সব গ্রন্থ লিথোতে ছাপাইয়া যে এতকাল রক্ষা করিয়াছে তাহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তাজিক নীলকণ্ঠীর মধ্যে "সংজ্ঞাতন্ত্র", "বর্ষতন্ত্র" প্রভৃতি ভিন্ন গ্রন্থ আছে। সংজ্ঞাতন্ত্রের সমাপ্তিতে দেখিতে পাই গর্গকুলোদ্ভব অনন্তের পুত্র নীলকণ্ঠ। এই নীলকণ্ঠের টীকা রচনা করেন দিবাকর দৈবজ্ঞের পুত্র বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ। বিশ্বনাথ আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন, গোদাবরী নদীতটে গোলগ্রাম অতি সুন্দর স্থান। সেখানে বেদান্ত শাস্ত্রবিদ্ দিবাকর দৈবজ্ঞের প্রথম পুত্র কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ। তাঁহার অন্য কৃতী পণ্ডিত পুত্রদের মধ্যে বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ। নীলকণ্ঠীর বর্ষতন্ত্র গ্রন্থে গ্রন্থকারের পরিচয়ে পাই "গর্গবংশোদ্ভব শ্রীদৈবজ্ঞানংতসুত নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ"। টীকাকার দিবাকর ছিলেন দৈবজ্ঞাত্মজ শ্রীবিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ।

রমল নবরত্ন নামে আর একখানা লিথো পুঁথি আমার কাছে আছে। গ্রন্থকার পরম সুখ উপাধ্যায় গ্রন্থারম্ভে আত্ম পরিচয় দিতেছেন।

শ্রীকাশিরাজ দ্বিজ গৌতম বংশ মুখ্যো
বদ বংড সিংহ নৃপতে রুসান সিংহঃ।
মন্ত্রী তদন্বয় ভূপেতি পরাক্রমাঢ্য
স্তস্মাচ্চ তস্যতনয়াৎ খলু লক্ষ বৃত্তিঃ॥

তাঁহার পিতা সীতারাম, জননী অনুপা। গ্রন্থ সমাপ্তিতে দেখি "ইতিশ্রী পরমসুখোপাধ্যায় কৃতে রমল নবরত্নে বর্ষফলং নাম নবমরত্নং সমাপ্তং। সংবৎ ১৯৩৭ (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ) মিতি আশ্বিন শুদ্ধ ৫ শুক্রবার। কাশী বিশ্বনাথের পাশে কচুরীগলিতে ছাপা এই সব গ্রন্থ আলোচনা করিলে ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের যুক্ত সাধনার একটি বড় পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই দিকে দেশের বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বাঞ্ছনীয়।

রাজপুতানায় যোগী রসুল শাহ প্রবর্তিত এক মুসলমান তান্ত্রিক যোগী সম্প্রদায় আছে। তাঁহাদের কাছে তাজিক ও রমলের বহু গ্রন্থ দেখিয়াছি। সেগুলি উদ্ধার করিয়া ভাল করিয়া সম্পাদন করা প্রয়োজন। এই রসুলশাহীরা তান্ত্রিক, তাঁহারা "কারণ" পান করেন এবং দেহের মধ্যে ষট্‌চক্র সাধনা ও ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না প্রভৃতির সাধনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অলৌকিক শক্তি সিদ্ধির খ্যাতি আছে। ইঁহারা আয়ুর্বেদ মতেও চিকিৎসা করেন। গুপ্ত রসায়ন বিদ্যা ইঁহাদের সাধনীয়।

---

* এই প্রসঙ্গে আমার 'ভারতীয় সংস্কৃতি' ২৯—৩৯ পৃষ্ঠা দর্শনীয়।

মুসলমানী য়ুনানী শাস্ত্রও আয়ুর্বেদের কাছেই অনেক পরিমাণে ঋণী। তবু মুসলমানদের কাছে হইতেও বহু ভেষজ ভারতীয়েরা লইয়াছেন, যথা আহিফেন, সোনামুখী, মুদ্রাশংখ ইত্যাদি। মুদ্রাশংখ তো পারসী শব্দ "মুরদা সঙ্গ" অর্থাৎ মৃত পাথর। তোকমা ইশবগুল আকর কোরা মুসব্বর, কাবাব চিনি, তোপ চিনি, রেউচিনি, সালেম মিশ্রী প্রভৃতি তাঁহাদের কাছে পাইয়াছে।

চিকিৎসাবিদ্যায় ভারতীয়দের দান অসামান্য। মুসলমানেরা ইহা কৃতজ্ঞভাবে স্বীকারও করিয়াছেন ও আয়ুর্বেদকে যথেষ্টভাবে ব্যবহারও করিয়াছেন। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে অনেক শিরীয় খৃষ্টান দক্ষিণ ভারতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা ধর্মে খৃষ্টান হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতিতে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই আয়ুর্বেদীয় ঔষধই ব্যবহার করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কবিরাজও আছেন। নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের কাছে তাঁহারা আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। নম্বুদ্রীদের মধ্যে অনেকে মহাবৈদ্য। অষ্ট কবিরাজ বংশীয় বলিয়া তাঁহাদের কোনো কোনো ধারা সম্মানিত।

জ্যোতিষে হিন্দু-মুসলমানদের যুক্ত সাধনার ইতিহাস রচনা করিতে হইলে এই যুগে যোগ্যতম লোক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী। সর্ব-সংকীর্ণ সংস্কার-মুক্ত মহাপন্ডিত না হইলে তিনি কখনো সংত সাহিত্যের এমন অনুরাগী হইতে পারিতেন না। তাঁহারই কাছে একবার আমি আবদর রহীম খান খানার "খেট-কৌতুক" জাতক গ্রন্থখানা দেখি। নারায়ণ প্রসাদ শর্মা তাঁহার একখানি ভাষা টীকা রচনা করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাহা টীকা সহ বোম্বাইতে মুদ্রিত হয়। ইহা সংস্কৃত ছন্দে হিন্দী সংস্কৃত পারসী ভাষা মিশাইয়া লেখা। একেবারে হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনার প্রকৃষ্ট নমুনা! গ্রন্থারম্ভের শ্লোকটিই এই—

করোম্যব্দুল রহী মোঽহং খুদাতালা প্রসাদতঃ।
পারসীয়পদৈর্যুক্তং খেট কৌতুক জাতকম্॥

অর্থাৎ আমি আবদুল রহিম খোদাতালার প্রসাদে পারসী শব্দ যুক্ত খেট কৌতুক রচনা করিতেছি।

এই গ্রন্থে অনুষ্ঠুপ মালিনী, ভুজঙ্গ প্রয়াত প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত ছন্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

"ভৌম ভাব ফলম" প্রকরণে আছে
যদি ভবতি মিরীখো লগ্নগঃ খিস্মনাক্ স্যাদ্
রুধিরপ্রভব রোগৈঃ পীড়িতে মফ্লিসশ্চ।
সকল জনবিরোধী হাসিলো লাগরোনা
জনুষি খলু বিয়োগী দারপুত্রৈর্ মেশঃ॥ (১)

যে জন মিরীখ (মঙ্গল লগ্নে) জাত সে কলহপ্রিয় আর রক্তবিকার রোগী এবং নির্ধন হয়। সবার সঙ্গেই তার বিরোধ ঘটে, তাহার শরীর দুর্বল হয় এবং সে স্ত্রীপুত্র বিয়োগী হয়।

রাজযোগাধ্যায়ে রহীম লিখিতেছেন,—
যদামুস্তরী কর্কটে বা কমানে
তথা চশ্মে খোরা জমী বাসমানে।
তদা জ্যোতিষী ক্যা লিখে ক্যা পঢ়েগা
হুবা বালকা বাদশাহী করেগা॥ (১৪)

যদি বৃহস্পতি কর্কট বা ধনুরাশিস্থিত হয়, তথা শুক্র যদি ভূমিলগ্নে অথবা দশম ঘরে থাকে তবে জ্যোতিষী আর কি লিখিবে বা কি পড়িবে? এমন জাতক নিশ্চয় বাদশাহী করিবে।

এই গ্রন্থে সূর্য ভাব ফলম্, চন্দ্রভাব ফলম, ভৌম (মঙ্গল) ভাব ফলম্ বুধভাব ফলম্, গুরুভাব ফলম্, শুক্রভাব ফলম্ শনি-ভাব ফলম্, রাহু ভাব ফলম্, কেতুভাব ফলম্, রাজযোগাধ্যায় এই দশটি অধ্যায় আছে। এক এক অধ্যায়ে বহু শ্লোক লিখিত।

পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থজাতকে হিন্দুদের বিদ্যা আরবী ভাবাপন্ন হইয়া তাজিক নামে আরবী পারসী হইতে আবার ইহাই ভারতে ফিরিয়াছে। রম্মলে আরবীদের গুটিকাপাত বিদ্যা ভারতীয় পন্ডিতেরা সংস্কৃত করিয়া লইতেছেন। কর কোষ্ঠিতে হিন্দুদেরই বিদ্যা মুসলমানেরা পাইয়াছেন। রসুলশাহীদের মধ্যে "দশত মিনামী" বা কর কোষ্ঠি বিদ্যায় পন্ডিত দেখিয়াছি। ইহার আরবী নাম "ফিলাস্তুনিয়াদ"। ইহাও রম্মলের অন্তর্গত। বসন্ত রাজ শাকুনিক প্রভৃতি গ্রন্থ মুসলমান দৈবজ্ঞদের মধ্যে সম্মানিত। তাহারও পারসী অনুবাদ হইয়াছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই অপরের বিদ্যা আপন ঘরে স্বাগত করিতে কার্পণ্য করেন নাই। আবার নিজেদের বিদ্যা যখন পরদেশে গিয়া রূপান্তরিত হইয়াছে তখনও তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া বহুদিনে ঘরে-ফেরা সন্তানের মতই সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে বাইবেলের Prodigal sonএর উপাখ্যান মনে পড়ে। ভারতের এই সব ক্ষেত্রে Prodigal sonদের পরিচয় ও হিন্দু-মুসলমানদের যুক্ত সাধনার বিষয়ে বিদ্যার্থীদের মন কবে আকৃষ্ট হইবে?

সাহিত্য সংবাদ

আবৃত্তি প্রতিযোগীতা

হাওড়া সেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। বিষয়—রবীন্দ্র-নাথের ১। দীক্ষা (ছাত্র); ২। ত্রান (ছাত্রী); সময়—মহাসপ্তমী দিবস বৈকাল ৫ ঘটিকায়। প্রত্যেক বিভাগে ২টি পুরস্কার দেওয়া হইবে। নাম পাঠাইবার শেষ দিন ২০শে আশ্বিন। শ্রীসুকুমার সাহা, সাহিত্য সম্পাদক, ৩৩।১নং নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া।

মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ সাহিত্য সম্মেলন

নিখিল বঙ্গ কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমিতির উদ্যোগে মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। সম্মেলনের অধিবেশন কলিকাতা চালতাবাগান, ১।১নং বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনস্থ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দিরে আগামী ৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হইবে। ইতিমধ্যে সাহিত্য দর্শন ও কাব্য শাখায় পাঠের নিমিত্ত 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ' প্রশস্তি, কবিতা ও প্রবন্ধাদির জন্য ভক্ত, রসজ্ঞ সাহিত্যিক, কবিবৃন্দের ও মহিলাবৃন্দের নিকট হইতে প্রার্থনা জানাইতেছি। বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করিবেন। প্রবন্ধাদি ৩রা অক্টোবরের মধ্যে শ্রীরাধারমণ দাস ভক্তিরত্ন, প্রচার সম্পাদক, নিখিল বঙ্গ কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমিতি ৬৬নং মণ্ডলপাড়া লেন, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

নূতন ছবির পরিচয়

নৌকাডুবি

বোম্বে টকিজের ছবি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চিত্ররূপ। চিত্রনাট্য—সজনীকান্ত দাস; পরিচালনা—নীতিন বসু; সুর পরিচালনা—অনিল বিশ্বাস; রবীন্দ্র সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়ক—অনাদি দস্তিদার; চরিত্র চিত্রণে—মীরা সরকার, অভি ভট্টাচার্য, মীরা মিশ্র, পাহাড়ী সান্যাল, বিমান ব্যানার্জি, শ্যাম লাহা, সুনলিনী দেবী, মণি চাটার্জি প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'নৌকাডুবি'কে চিত্রে রূপায়িত করার ভার বোম্বে টকিজ যখন গ্রহণ করেছিলেন, তখন স্বভাবতই মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়েছিল। সন্দেহের একাধিক কারণও ছিল। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের একাধিক উপন্যাসের চিত্ররূপ আমরা দেখেছি। কিন্তু তার কোনটিই রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা রক্ষা করতে তো পারেই নি—এমন কি দর্শক সাধারণেরও আশানুরূপ হয়নি। তাই স্বভাবতঃই নৌকাডুবি সম্বন্ধে মনে সন্দেহ ছিল। দ্বিতীয় ভয়ের কারণ ছিল বোম্বে টকিজের বাঙলা চিত্র নির্মাণের এই হল প্রথম প্রচেষ্টা। বোম্বাই-এর এই ভারত বিখ্যাত চিত্রপ্রতিষ্ঠানটি আমাদের অনেক উপভোগ্য হিন্দি চিত্র উপহার দিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙলা চিত্র নির্মাণে নেমেই প্রথমে তাঁদের রবীন্দ্রনাথের একটি জনপ্রিয় উপন্যাসকে চিত্ররূপ দেবার সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত হয়েছিল কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ ছিল। গত সপ্তাহে 'নৌকাডুবির' চিত্ররূপ কলকাতার তিনটি চিত্রগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করেছে। ছবিটি দেখে আমাদের সকল সন্দেহ তিরোহিত হয়েছে এবং আমরা নিঃসন্দেহে ছবিখানিকে অভিনন্দন জানাতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'কে সার্থকভাবে চিত্রে রূপান্তরিত করার জন্যে চিত্রনাট্যকার সজনীকান্ত দাস ও পরিচালক নীতীন বসু প্রশংসার দাবী করতে পারেন। সিনেমা টেকনিকের ধুয়া তুলে তাঁরা কোথাও রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর অমর্যাদা করেননি দেখে খুসী হলাম। চিত্র কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাবার জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। মূল কাহিনীকে অনুসরণ করে সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ছবিখানি চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। ছবিখানিতে আর একটি জিনিসও সহজে চোখে পড়ে। এই চিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের কারও মধ্যেই মঞ্চ-ঘেঁষা অভিনয়ের স্পর্শ পাওয়া যায় নি। আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিনেতা অভিনেত্রীই বাণীচিত্রোপযোগী অভিনয় করতে জানেন না বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় না। তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই মঞ্চঘেঁষা অভিনয় করে থাকেন। নীতীনবাবু এ বই-এর তিনটি প্রধান ভূমিকায় তিনজন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীকে গ্রহণ করেছেন বলেই বোধ হয়, এ চিত্রের অভিনয়ে মঞ্চ-ঘেঁষা ভাব দেখা গেল না। কোন কোন দিক থেকে হয়ত এঁদের অভিনয়ে ত্রুটি থেকে গেছে। কিন্তু বহু প্রচলিত এই প্রধান ত্রুটিটি নেই—এটা কম সুখের কথা নয়। অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রায় প্রত্যেকেই সহজভাবে নিজের নিজের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।

হেমনলিনীর ভূমিকায় নবাগতা মীরা সরকার প্রশংসার দাবী করতে পারেন। তাঁর চেহারায় কোন বিশেষ জৌলুস না থাকলেও, তিনি সহজ অথচ সংযত অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন। নায়ক রমেশের ভূমিকায় অভি ভট্টাচার্যও নবাগত, এঁর অভিনয়ের মধ্যেও একটা সহজাত নিষ্ঠাবোধ, স্বাভাবিকতা ও সংযমের পরিচয় পাওয়া গেল। কমলার ভূমিকায় মীরা মিশ্র নিজের করুণ সুন্দর দেহসৌষ্ঠব ও বচনভঙ্গীর গুণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে হেমনলিনীর পিতার ভূমিকায় মণি চ্যাটার্জি, নলিনাক্ষরূপী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়রূপে পাহাড়ী সান্যাল সুঅভিনয় করেছেন। নলিনাক্ষর মাতার ভূমিকাটি ছোট হলেও এই ভূমিকায় হিন্দি চিত্রের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ও দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ভাগিনী সুনলিনী দেবী সুন্দর সংযত অভিনয় করেছেন। 'নৌকাডুবির' অধিকাংশ রবীন্দ্র সঙ্গীতই সুগীত হয়েছে। বিশেষ করে মীরা সরকারের কণ্ঠে যে গানগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হয়েছে অপূর্ব। তিনি এ গানগুলি নিজে গেয়েছেন কিনা জানি না। তবে গানগুলি যে ভাল হয়েছে সে বিষয়ে সংশয় নেই। একাধিক ক্ষেত্রে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অন্য কণ্ঠের গান চরিত্র বিশেষের কণ্ঠে আরোপিত হয়েছে।

'নৌকাডুবির' দৃশ্যসজ্জা, আলোক চিত্র ও শব্দ গ্রহণ বিশেষ ভাল হয়েছে। বাঙলা চিত্রে সাধারণত এরূপ যান্ত্রিক উৎকর্ষ দেখা যায় না। 'নৌকাডুবি' দেখে স্বতই একটা কথা মনে হল। বোম্বে টকিজ যদি অতঃপর বাঙলা চিত্র নির্মাণ করে চলেন, তবে বাঙলার অনেক চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীকে বিপদে পড়তে হবে। এঁরা যে কোন প্রকারে একখানি চিত্র নির্মাণ করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পারলেই যেন বাঁচেন। সে চিত্রের অভিনয়োৎকর্ষ, যান্ত্রিক উৎকর্ষ বা অন্য প্রকারের আকর্ষণ কতটা আছে তা তাঁরা বিচার করার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁরা জানেন যে, বাঙলার চিত্র জগতে তো তাঁদের একচেটিয়া ব্যবসায়িক অধিকার। বোম্বে টকিজের "নৌকাডুবি" দেখে তাঁদের শিখবার যেমন অনেক কিছু আছে, তেমনই নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁদের সাবধান হবার ইঙ্গিতও আছে এই চিত্রের মধ্যে। চিত্রামোদী বাঙালী দর্শকদের 'নৌকাডুবি' আনন্দ দিতে পারবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

বর্মার পথে

ইউনিভার্সাল ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেডের ছবি। রচনা ও পরিচালনা—হিরন্ময় সেন; সঙ্গীত পরিচালনা—প্রফুল্ল চক্রবর্তী। রূপায়নে—অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়া দেবী, সমর রায়, জ্যোৎস্না গুপ্তা, আশু বোস, রেবা দেবী প্রভৃতি।

বৎসরাধিককাল বহু প্রচারকার্যের পর 'বর্মার পথে' কলিকাতায় মুক্তিলাভ করেছে। কিন্তু এই ছবিখানি দেখে আমরা হতাশ হয়েছি বললে অত্যুক্তি হয় না। বিগত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ব্রহ্মদেশে জাপানীদের বিমান আক্রমণের ফলে ভীত হয়ে বহু নরনারী পালিয়ে এসেছিল ভারতে। এমনই একটি পলায়নপর পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কাহিনীর আখ্যান ভাগ। কিন্তু গোটা গল্পটা এমনই অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে, কোথাও সেটি দানা বাঁধতে পারেনি। যে চিত্রকাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তাকে কাহিনী না বলে নক্সা বলা চলে। সমস্ত গল্পটি এমন খাপছাড়া যে কোথাও তার পূর্ণ রূপ ধরা যায় না—অনেক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে; কিন্তু পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত গল্পাকারে সেগুলোকে কাহিনীকার গাঁথতে পারেন নি। দুঃখিয়াকে কুমীরের ভয় দেখানো, লেবরেটরীতে বিড়াল মারার ছলে চিত্রার আগমন ইত্যাদি ব্যাপার কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। পাহাড়ী যুবক ঝুমরু অলোকা কেমিক্যাল ওয়ার্কসে সাপের বিষের প্রতিষেধক তৈরীর জন্যে গবেষণা করছে—একথা বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বহুবার শোনানো হয়েছে। কিন্তু ঔষধ আবিষ্কারের যে পরিবেশ ও প্রণালী লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা হয়েছে তা রীতিমত হাস্যকর। কার্যত শুধু দেখা গেল যে ঝুমরু লেবরেটরীতে বসে মনিব-কন্যার সঙ্গে চা খাচ্ছে এবং প্রেম করছে। এ ধরণের বহু ত্রুটিতে বইখানি পরিপূর্ণ। দর্শক-সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্যে পরিচালক হিরন্ময়

সেন বহু সস্তা ও পুরাতন প্যাঁচের আমদানী করেছেন ছবিটিতে। অভিনয়ের বিচারে দুঃখিয়ার ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী পারুল কর মোটামুটি ভাল অভিনয় করেছেন বলা চলে। ঝুমরুর চরিত্র-চিত্রণে নবাগত অভিনেতা সমর রায়ের মধ্যে আমরা কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিতে খুঁজে পেলাম না। তাঁর বচনভঙ্গীতে কসরৎ থাকলেও চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার মত কোন দক্ষতা তাঁর নেই। তবে মনে হয় যে, একাগ্র চেষ্টা ও সাধনা করলে ভবিষ্যতে তিনি উন্নতি করতে পারেন। মায়ের ভূমিকায় ছায়া দেবী তাঁর পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। জ্যোৎস্না গুপ্তার অভিনয় ভাল হয়নি। অন্যান্য ভূমিকাভিনয় চলনসই। সঙ্গীত ও দৃশ্যসজ্জা প্রশংসনীয়।

স্টুডিও সংবাদ

নবগঠিত স্ক্রীনল্যান্ড লিমিটেডের প্রথম চিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ডাউন'-এর শুভ মহরৎ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিওতে হয়ে গেছে। প্রযোজক অহি বসু ও পরিচালক সুধীরবন্ধু সমাগত অতিথিদের বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার, গোপাল ভৌমিক, প্রফুল্ল চৌধুরী, মোহিনী চৌধুরী, বিশ্ব রায় চৌধুরী, নরেশ চৌধুরী, শুভ মুখার্জি প্রভৃতি এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

* * * *

ফিল্ম আর্ট প্রোডিউসার্স লিমিটেডের প্রথম বাণীচিত্র 'উমার প্রেমে'র চিত্র গ্রহণ কার্য সমাপ্তপ্রায়। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন খগেন রায় ও সংগীত পরিচালনা করেছেন খ্যাতিমান, সুরশিল্পী অনিল বাগচী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন—ছবি বিশ্বাস, প্রমীলা ত্রিবেদী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর, সুশীল রায় প্রভৃতি।

* * * *

রূপছায়া লিমিটেড কলিকাতায় গত ১৫ই আগস্টের 'স্বাধীনতা উৎসবে'র চিত্র গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের দেশের চিত্রগৃহগুলি যাতে এই চিত্র প্রদর্শন করতে পারে তার জন্যে তাঁরা কয়েকটি কোম্পানীর মারফৎ এই চিত্র-পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের 'নেতাজী ও আই এন এ' নামক জাতীয় আদর্শে উদ্দীপ্ত চিত্রটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে বলে প্রকাশ।

খেলা-ধূলা

ফুটবল

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার সকল বিশিষ্ট দলই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন। তবে কোন দলেরই খেলা সেইরূপ উচ্চাঙ্গের হইতেছে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য খেলোয়াড়গণ নিয়মিতভাবে অনুশীলন করিবার সুযোগ না পাওয়ায় অবস্থা এইরূপ শোচনীয় দাঁড়াইয়াছে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা আগামী অক্টোবর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রতিযোগিতায় ১১টি প্রাদেশিক দল যোগদান করিয়াছে। এই সকল দলের মধ্যে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এখন কেহই বলিতে পারে না। আমাদের কেবল চিন্তা বাঙলার আই এফ এ দল এই প্রতিযোগিতায় কিরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিবে। বাঙলার মাঠে বাঙলার দল যদি বিজয়ীর সম্মান লাভ করিতে না পারে খুবই পরিতাপের বিষয় হইবে। বাঙলার দলকে শক্তিশালী করিয়াই গঠন করা হইবে বলিয়া আমাদের ভরসা আছে। অন্যান্য বার খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীকে পক্ষপাতদুষ্ট রোগ হইতে মুক্ত হইতে দেখা যায় নাই। সেই ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে নির্বাচকগণ উঠিবেন বলিয়া আশা করি। নিম্নে আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

প্রথম রাউন্ড

(১) আসাম ঃ হায়দরাবাদ; (২) বিহার ঃ উড়িষ্যা; (৩) মাদ্রাজ ঃ দিল্লী।

দ্বিতীয় রাউন্ড

১নং বিজয়ী ঃ মহীশূর; ২নং বিজয়ী ঃ পশ্চিম ভারত ফুটবল দল; ৩নং বিজয়ী ঃ আই এফ এ যুক্তপ্রদেশ ঃ ত্রিবান্দ্রম।

আন্তঃ প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় যে সকল খেলোয়াড় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন তাঁহারাই ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসাবে আগামী বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন। বাঙলার খেলোয়াড়গণ ইহা স্মরণ করিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে ভারতীয় দল গঠন করিবার সময় অধিকাংশ বাঙলার খেলোয়াড় লইয়া করিতে হইবে।

রোভার্স কাপ

বোম্বাইর রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার পরিচালকগণ অবশিষ্ট খেলাগুলি অনুষ্ঠিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা খুবই সুখের বিষয়। এই খেলাগুলি অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে। মোহনবাগান দল ঐ সময় বোম্বাইতে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তবে আশঙ্কা হইতেছে, যে সকল খেলোয়াড় লইয়া পূর্বে দল গঠন করা হইয়াছিল তাঁহারা যাইতে পারিবেন কি না? দলের সমস্ত খেলোয়াড়কে লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে যদি এখন হইতে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা না করেন' এই খেলার ফলাফলের উপর বাঙলার ফুটবল খেলার মান-সম্মান অনেকখানি নির্ভর করিতেছে—ইহা বুঝাইয়া বলিতে পারিলে কেহই দলকে শক্তিহীন করিবে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিবেন না।

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল আগামী ৭ই অক্টোবর একই বিমানে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সকল খেলোয়াড় আগামী ২রা অক্টোবর কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন। বেঙ্গল ক্রিকেট বোর্ডের কর্তৃপক্ষগণ খেলোয়াড়দের বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন খেলায় সাফল্যলাভ না করিলেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। বিজয় মার্চেন্টকে দলের সহিত লইয়া যাইবার এখনও চেষ্টা হইতেছে। তিনি খেলায় যোগদান করিতে পারিবেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি দলকে অনেকখানি উৎসাহিত করিবে। দলের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে এমন একটা অবস্থাও সৃষ্টি হইতে পারে যখন মার্চেন্ট খেলায় যোগদান না করিয়াও পারিবেন না। বৈজ্ঞানিক যুগে পেটের মাংসপেশীর যন্ত্রণার উপশম ব্যবস্থা হইতে পারিল না। ইহা মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না। কতপ্রকার রশ্মির চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। মার্চেন্ট ঐ সকল কোনটির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তো আমরা শুনি নাই। বোম্বাইতে যাহা সম্ভব হইল না কলিকাতায় যে তাহা হইবে না কে বলিতে পারে? বিজয় মার্চেন্ট যদি এখনই কলিকাতায় আসিতেন বোধ হয় বাঙলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই বিষয় তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিতেন। নিম্নে ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

১৭ই—২১শে অক্টোবর—পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া (পার্থ)।

২৪শে—২৮শে অক্টোবর—দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া (এডিলেড)।

৩০শে অক্টোবর—৩রা নভেম্বর—ভিক্টোরিয়া (মেলবোর্ন)।

৭ই নভেম্বর—১১ই নভেম্বর—নিউ সাউথ ওয়েলস (সিডনী)।

১৪ই নভেম্বর—১৮ই নভেম্বর—অস্ট্রেলিয়া একাদশ (সিডনী)।

২১শে নভেম্বর—২৫শে নভেম্বর—কুইন্সল্যান্ড (ব্রিসবেন)।

২৮শে নভেম্বর—৪ঠা ডিসেম্বর—প্রথম টেস্ট ম্যাচ (ব্রিসবেন)।

৬ই ডিসেম্বর—৮ই ডিসেম্বর—কুইন্সল্যান্ড পল্লীদল (ওয়ারউইক)।

১২ই ডিসেম্বর—১৮ই ডিসেম্বর—দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ (সিডনীতে)।

২০শে—২২শে ডিসেম্বর—পশ্চিম জেলা দল (ব্যাথহার্স্ট)।

২৭শে—২৯শে ডিসেম্বর—দক্ষিণ জেলা দল (ক্যানবেরা)।

১লা—৭ই (১৯৪৮) জানুয়ারী—তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ (মেলবোর্ন)।

১০ই—১২ই জানুয়ারী—ট্যাসমানিয়া (হার্বার্ট)।

১৫ই—১৭ই জানুয়ারী—ট্যাসমানিয়া (লনসেস্টন)।

২০শে—২১শে জানুয়ারী—দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া পল্লী দল (মাউন্ট গ্যাম্বিয়ার)।

২৩শে—২৯শে জানুয়ারী—চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ (এডিলেড)।

৩১শে জানুয়ারী—১লা ফেব্রুয়ারী—ভিক্টোরিয়া পল্লী (মিলডুরা)।

৬ই—১০ই ফেব্রুয়ারী—পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ (মেলবোর্ন)।

১৪ই—১৬ই ফেব্রুয়ারী—ভিক্টোরিয়া পল্লী (গিলং)।

২০শে—২৪শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া (পার্থ)।

ব্যায়াম

বাঙলার ব্যায়াম ও খেলাধুলো বিভাগটিকে ঠিক পথে চালিত করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি "বঙ্গীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিষদ" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যায়ামবীর ও ব্যায়াম পরিচালক যোগদান করিয়াছেন। বিভিন্ন বিভাগের ক্রমোন্নতির পথ নির্দেশ করিবার জন্য ইহারা বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার পরিকল্পনা গঠন করিবার জন্য উপসমিতি গঠন করিয়াছেন। ইঁহারা আরও স্থির করিয়াছেন, পরিষদ একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তবে ইঁহারা কতখানি কার্যকরী ব্যবস্থা করিতে পারিবেন সেই বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন তাঁহাদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা জানি না। শরীর সংস্থান বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে কাহাকেও কোন ব্যায়াম বিভাগ পরিচালনার ও নির্দেশ দিবার অধিকার দেওয়া উচিত নহে। ইহার ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারাত্মক হয়। বাঙলার বহু ব্যায়াম উৎসাহী অকালে মৃত্যুবরণ করিয়াছে ঠিকভাবে পরিচালিত না হওয়ায়। এই মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি এই পরিষদের কর্মব্যবস্থার মধ্যে না দেখিতে পাইলেই সন্তুষ্ট হইব। জাতির স্বাস্থ্যোন্নতির উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে এই বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজন আছে।

দেশী সংবাদ

১৫ই সেপ্টেম্বর—গতকল্য লাহোরে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের আলোচনাকালে অপহৃতা স্ত্রীলোকদের উদ্ধারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এই সমস্ত স্ত্রীলোক উদ্ধারের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট এবং তাঁহাদের পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয়।

সিউড়ীতে এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ বলেন যে, জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি বিধানই পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রধান কর্তব্য হইবে। ধনী ও দরিদ্রের স্বার্থের মধ্যে যখনই কোন বিরোধ দেখা দিবে, গভর্নমেণ্ট সেই ক্ষেত্রে সকল সময়েই দরিদ্রের স্বার্থ রক্ষা করিবেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—গত ১৪ই সেপ্টেম্বর লাহোরে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভায় পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খান যে বক্তৃতা করিয়াছেন, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহার উত্তরদানকালে বলেন, "আমাদের মধ্যে কেহই পাকিস্থানের সহিত শত্রুতা করিবার কথা চিন্তা করেন না কিংবা পাকিস্থানকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা পোষণ করেন না।"

১৭ই সেপ্টেম্বর—লক্ষ্ণৌর সংবাদে প্রকাশ, হরিদ্বার ও দেরাদুনের নিকটে ওয়ালাপুরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়াছে। প্রকাশ, ওয়ালাপুরে ২৯ জন নিহত হইয়াছে।

চট্টগ্রামের সংবাদে প্রকাশ, বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা হইতে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সাতকানিয়া হইতে ৭ জনের এবং বোয়ালখালি হইতে একজনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। টাকায় তিন পোয়া চাউল বিক্রয় হইতেছে।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত মাসের দ্বিতীয়ার্ধের বেতন পান নাই বলিয়া ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনের ট্রাফিক বিভাগের বহুসংখ্যক কর্মচারী অদ্য হইতে কার্যে যোগদান করেন নাই। ফলে আখাউড়া, বাহাদুরাবাদ এবং জগন্নাথ-ঘাট হইতে অধিকাংশ থ্রু ট্রেন নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় আসিতে পারে নাই।

পাঞ্জাবের জাম্দিয়ালা-কালাসি এবং ইহার নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে আশ্রয়প্রার্থী স্থানান্তরিত-করণে নিযুক্ত সামরিক কর্তৃপক্ষ ৭৫০ জন অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করিয়াছেন, উহাদিগকে পূর্ব পাঞ্জাবে পাঠান হইয়াছে।

১০০নং হ্যারিসন রোডের মামলা সম্পর্কে ধৃত প্রতিবাদী মহম্মদ আলি ও গোলাম হোসেন নামক দুইজন সশস্ত্র পাঞ্জাবী পুলিশকে হাই-কোর্টের দায়রার বিচারে বিচারপতি মিঃ রক্সবার্গ মুক্তি দেওয়ায় গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে যে আপীল করা হইয়াছিল, অদ্য প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ ক্লো তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর—ব্যাঙ্গালোরের সংবাদে প্রকাশ, মহীশূরের চারিজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা জেল হাজত হইতে পলায়ন করিয়াছেন। অদ্য বারুদ দিয়া ব্যাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল জেলের একটি প্রাচীর উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়।

১৯শে সেপ্টেম্বর—লাহোর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের নির্দেশে পশ্চিম পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট 'ট্রিবিউন' পত্রের অফিস ও প্রেস তালা বন্ধ করিয়াছেন।

কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহক পরিষদের এক সভায় উত্তর বঙ্গে কংগ্রেসের আঞ্চলিক কমিটি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এই প্রদেশে সংকটজনক ও অনিশ্চিত অবস্থাদৃষ্টে এই বিষয়ে বর্তমানে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। কার্যনির্বাহক পরিষদ আর এক প্রস্তাবে উভয় বঙ্গের বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া একটি করিয়া সংখ্যা-লঘুদের অধিকার রক্ষা কমিটি গঠন করার অনুরোধ জানান।

ব্যাঙ্গালোর শহরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। জনতা জেলা অফিসসমূহ ও জেলা আদালতে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছে। জেলা আদালত ভবনে ভারতীয় ইউনিয়নের পতাকা উড্ডীন করা হয়। অদ্য সকালে পুলিশ কনস্টেবলরা ধর্মঘট আরম্ভ করে।

২০শে সেপ্টেম্বর—নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থান ডোমিনিয়ন গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের দুই দিনব্যাপী বৈঠকে পুনরায় এই নীতি সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে নিরাপদে বাস করিতে পারে, স্ব স্ব ডোমিনিয়নে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তাহা অব্যাহত রাখা উচিত। শান্তি প্রতিষ্ঠায় উভয় গভর্নমেণ্ট পারস্পরিক সহযোগিতা করিতে একমত হইয়াছেন। এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে কোন প্রকারের বিরোধের ধারণা শুধু যে নৈতিক দিক দিয়া প্রতিকূলতার সৃষ্টি করিবে, তাহা নহে, ইহার ফলে উভয়েরই ভয়ানক ক্ষতি হইবে।

কলিকাতা হইতে ২৩ মাইল দূরে শ্যাম-নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। উহাতে সভাপতিরূপে শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, দীর্ঘ দিনের বহু কষ্টার্জিত স্বাধী-নতা লাভের পর ভারতবর্ষে এক্ষণে যে গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের সেই গভর্নমেণ্টকে নিজেদের গভর্নমেণ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়া উহার সহিত সহযোগিতা করা উচিত।

পাঞ্জাবে আত্মঘাতী হানাহানির তীব্রতা অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়াছে। লুধিয়ানা ও ফিরোজপুর জেলার কয়েকটি অপহৃতা বালিকাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। সেখপুরার ১৬টি গ্রাম হইতে এক হাজার অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ শ্রী সিনেমা হলে ভূপেন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উদ্বোধন প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙলার গভর্নর শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী বলেন যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করিতে ও মানুষের সত্তাকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করিতে সঙ্গীত বিশেষভাবে সাহায্য করে।

২১শে সেপ্টেম্বর—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী অদ্য করাচীতে কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হয়। আচার্য কৃপালনী স্থানীয় হিন্দুদের কতকগুলি অসুবিধার প্রতি মিঃ জিন্নার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কায়েদে আজম তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, তিনি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন।

নয়াদিল্লীতে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, "যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ততক্ষণই আমি বলিব যে, ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানগণকে বিতাড়ন করা চলিবে না। সাড়ে চার কোটি মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করা যাইতে পারে বা তাহাদিগকে পাকিস্থানে নির্বাসিত করা যাইতে পারে, এরূপ কথা মনে করা বদ্ধ পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নহে।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই সেপ্টেম্বর—জাতিপুঞ্জে সাধারণ পরিষদে পাকিস্থান প্রতিনিধি দলের নেতা স্যার জাফরুল্লা খাঁ অদ্য বিমানযোগে নিউইয়র্ক পৌঁছিয়া বলেন যে, মুসলিম নিধনের অবসান ঘটাইবার জন্য ভারত সরকার যদি ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে জাতিপুঞ্জ পরিষদে যথারীতি অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে।

১৭ই সেপ্টেম্বর—জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদ যে সকল অচল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহা দূর করিবার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ জর্জ মার্শাল অদ্য সম্মিলিত জাতির সনদের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা-কল্পে নূতন করিয়া জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন।

হংকং ও সিঙ্গাপুর রয়াল আর্টিলারীর ছয়জন ভারতীয় সৈন্য ১৯৪২ সালে ক্রিস্টমাস দ্বীপে বিদ্রোহ করার অভিযোগে দণ্ডিত হয়। অদ্য সুদূর প্রাচ্যের স্থল বাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার হইতে উক্ত ছয়জন ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে পাঁচজনের ফাঁসির আদেশ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর—লণ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রহ্মসচিব লর্ড লিস্টওয়েল ব্রহ্ম দেশ সম্বন্ধে ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রহ্ম দেশ বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে।

নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে সোভিয়েট রাশিয়ার সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মঁ আঁদ্রে ভিসিনস্কি বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, তাহারা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূলনীতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যক্ষভাবে লঙ্ঘন করিয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, নূতন সমরোদ্যম প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই প্রচারের স্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব মিঃ মার্শাল যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তিনি সরাসরি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর—জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সাধারণ পরিষদের জনাকীর্ণ অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টের আচরণ সম্পর্কে যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, সাধারণ পরিষদে যদি তাহার নিষ্পত্তি না হয়, তবে উহা ব্যাপকতর হইবে।

২০শে সেপ্টেম্বরঃ—রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান যদি শীঘ্রই প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে কোন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ না করেন তাহা হইলে বৃটেন প্যালেষ্টাইনের উপর কর্তৃত্ব ত্যাগ করিবে এবং প্যালেষ্টাইনস্থিত এক লক্ষ বৃটিশ সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা করিবে।

একটি ভারতীয় গোলাপ উদ্যানের সমস্ত প্রাতঃকালীন স্নিগ্ধতা ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ্ সাবান কর্ত্তৃক আপনার নিকট আনীত হয়। ইহার কোমল, প্রচুর ফেনা মোলায়েমভাবে সবচেয়ে নরম চর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিষ্কার করে—এবং ইহার সুগন্ধ আপনাকে একপ্রকার মিষ্ট সৌরভে মণ্ডিত করে। আপনার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভাল এবং উৎকৃষ্টতর সাবান আর নাই। ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ্‌কে আপনার প্রিয় সাবান করিয়া লউন্।

ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ সাবান

VWB 19/111 BG

VINOLIA CO., LIMITED, LONDON, ENGLAND

ধবল ও কুষ্ঠ

গাত্রে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গাদি স্ফীত, অঙ্গুলাদির বক্রতা, বাতরক্ত, একজিমা, সোরায়েসিস্ ও অন্যান্য চর্ম্মরোগাদি নির্দোষ আরোগ্যের জন্য ৫০ বর্ষোর্দ্ধকালের চিকিৎসালয়।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আপনি আপনার রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপুস্তক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া।

ফোন নং ৩৫৯ হাওড়া।

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

(পূরবী সিনেমার নিকটে)

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

বাঙ্গালী হিন্দুর এই চরম দুর্দ্দিনে প্রফুল্লকুমারের পথনির্দ্দেশ প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য।

তৃতীয় ও বর্দ্ধিত সংস্করণ : মূল্য—৩্।

২। জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় সংস্করণ : মূল্য দুই টাকা

—প্রকাশক—

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিঃ

ও

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

পাকা চুল কাঁচা হয়

(Govt. Regd.)

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের সুগন্ধিত সেন্‌ট্রাল মোহিনী তৈল ব্যবহারে সাদা চুল পুনরায় কাল হইবে এবং উহা ৬ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। অল্প কয়েকগাছি চুল পাকিলে ২৷৷৹ টাকা, উহা হইতে বেশী হইলে ৩৷৷৹ টাকা। আর মাথার সমস্ত চুল পাকিয়া সাদা হইলে ৫্ টাকা মূল্যের তৈল ক্রয় করুন। ব্যর্থ প্রমাণিত হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

দীনরক্ষক ঔষধালয়,

নং ৪৫, পোঃ বেগুসরাই (মুঙ্গের)

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সূচীপত্র

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৫৪ সাল।   Saturday, 4th October, 1947.   [৪৮শ সংখ্যা

খাল কাটিয়া কুমীর আনিবার চেষ্টা

লণ্ডন হইতে রয়টার কর্তৃক প্রেরিত একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট গ্রেটবৃটেনের মারফতে ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি বৃটিশ ঔপনিবেশকে তাঁহাদের বর্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানকল্পে সাহায্য করিতে আবেদন করিয়াছেন। ভাষাটা আবেদনের হইলেও ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়, ভারত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ইহাতে পুরোদস্তুর অভিযোগ উত্থাপন করা হইতেছে। পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট এইরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে যে উদ্যত হইয়াছেন, পূর্বেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বিশ্বরাষ্ট্র সংসদের পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ কিছুদিন পূর্বে প্রকাশ্যেই এই কথা ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রদায়িক ব্যাপার লইয়া তিনি বিশ্বরাষ্ট্র সংসদে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবেন। দেখা যাইতেছে, পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট বিশ্বরাষ্ট্র সংসদে না গিয়া তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ ব্রিটিশ প্রভুদের দরবারে ধর্ণা দেওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সত্যই প্রয়োজন ছিল কি? সাম্প্রদায়িক অবস্থা সম্বন্ধে উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন মতভেদ আজ পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় নাই। বিশেষত সাম্প্রদায়িক সমস্যা ভারতের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার, কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনার দ্বারাই তাহার সমাধান সম্ভবপর। হঠাৎ ভারতের অপর গভর্নমেণ্টের অগোচরে এই সমস্যা লইয়া বৈদেশিক রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে সহযোগী রাষ্ট্রের প্রতি অসৌজন্য এবং অভদ্রতাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রশ্ন শুধু ইহাই নয়, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উপর পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের অবিচল বিশ্বাস থাকিতে পারে; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার প্রতি যাহাদের বিন্দুমাত্র মর্যাদা বোধ আছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে তাঁহারা ভারতের শত্রু বলিয়াই জানেন। দুই শতাব্দীব্যাপী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে বিষময় ফলে ভারতবর্ষ বর্তমানে বিপর্যস্ত হইতে বসিয়াছে, ব্রিটিশ জাতির দ্বারাই সে বিষবৃক্ষ সৃষ্ট এবং পুষ্ট হইয়াছে। দেখা যায়, কিছুদিন যাবৎ বিলাতের সংরক্ষণশীল দলের সহযোগিতায় পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের প্রচার বিভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অপ-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে সংরক্ষণশীল দলের নেতা ভারতের স্বাধীনতার চিরন্তন শত্রু মিঃ চার্চিল ভারতের সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের প্রশ্ন অবতারণা করিয়া প্রত্যক্ষভাবে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বেরই মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বর্তমানে ভারতবর্ষ এবং সম্প্রদায় নরখাদকের জিঘাংসা বৃত্তি লইয়া অন্য সম্প্রদায়কে হত্যা করিতেছে; কিন্তু ইহা আরম্ভ মাত্র। ব্রিটিশের শাসনে যে দেশে পরিপূর্ণ শান্তি বজায় ছিল ইহার পর সেখানে ব্যাপকভাবে নরহত্যা ঘটিতে থাকিলে এক বিস্তীর্ণ দেশের সভ্যতা পশ্চাদগামী হইবে। এশিয়ার ইতিহাসে ইহাই হইবে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার।' লণ্ডনের 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' পত্রে সম্প্রতি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে যে, যতদিন হিন্দু ও মুসলমান নেতারা ভারতের কর্তৃত্ব পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য বৃটেনকে আমন্ত্রণ না করিবেন, ততদিন পর্যন্ত ভারতের হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটিবে না। পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট সেই আমন্ত্রণ পত্র ইহার মধ্যেই প্রেরণ করিয়াছেন কিনা আমাদের মনে স্বতঃই এই সন্দেহ জাগিতেছে। আমাদের ক্রমেই এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলেই ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের অদ্যাপি নিরসন হইতেছে না এবং রক্তস্রোতে ভারতভূমি প্লাবিত হইতেছে। এই ষড়যন্ত্রে যাহারা ইন্ধন যোগাইতেছে এবং ভারতের সদালব্ধ স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিতেছে, ভারতের কল্যাণকামী মাত্রেই আজ তাঁহাদের দুরভিসন্ধিজাল ব্যর্থ করিতে যত্নবান হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

জাগরণের ইঙ্গিত—

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াই ভারতের মুসলমানসমাজের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, মুসলিম লীগের এই দাবীর ফলে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মাখানো প্রচারকার্যের প্ররোচনায় ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়াছে এবং পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের বিপুল মুসলমান সমাজের সুখের স্বর্গের সন্ধান কিছুই মিলিতেছে না। ইহার মধ্যেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের লীগপন্থীগণ তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছেন। বোম্বাই, বিহার, যুক্তপ্রদেশ—সব প্রদেশের লীগপন্থী মুসলমানেরাই এখন বলিতেছেন যে, পাকিস্থানী নীতি সমর্থন করিয়া তাঁহাদের লাভ কিছুই হয় নাই; পক্ষান্তরে পাকিস্থান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের সাম্প্রদায়িক বিরোধমূলক প্রচারকার্যের ফলে এখন তাঁহাদের অবস্থা সংকটজনক আকার ধারণ করিয়াছে। বাঙলার মুসলমান সমাজের মধ্যেও

বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। লীগ যদি সাম্প্রদায়িকতার নীতির আমূল সংস্কার সাধন না করে, তবে কলিকাতার বিপুল মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হইবে, ইহা সুস্পষ্ট। সম্প্রতি উড়িষ্যা প্রদেশের লীগ দলের নেতা মিঃ লতিফর রহমান যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পাকিস্থানী সাম্প্রদায়িক নীতির অনিষ্টকারিতা তীব্র ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বক্তব্য এই যে, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্রভাবে ভারতের মুসলমান সমাজের ক্ষতিই সাধিত হইয়াছে। পাকিস্থানের মুসলমান সমাজ সাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাচারের উত্তেজনায় পড়িয়া যে বিষ বিস্তার করিয়াছে, তাহার ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান সমাজ মনে মনে নিজদিগকে অসহায় বোধ করিতেছেন। নিজ বাসভূমিতে তাঁহারা পর হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুত পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় জন কত ভাগ্যান্বেষীরই উচ্চপদ জুটিয়াছে, কিন্তু মুসলমান সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শান্তির পক্ষে সুবিধা কিছুই হয় নাই। মিঃ লতিফর রহমান মুসলমান সমাজকে এই সত্য সম্বন্ধে অবহিত করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, আসুন, আমরা দ্বৈজাত্যবাদ ভুলিয়া যাই এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করি; কারণ, পাকিস্থানী নেতৃগণ মুখে যতই বাগাড়ম্বর করুন না কেন, আমাদের জন্য তাঁহারা কিছুই করিতে পারিবেন না এবং তাঁহাদের কাছে কিছু আশা করা নিষ্ফল।" সমগ্র মুসলমান সমাজে এই ভদ্রোচিত শুভ মনোভাব সম্প্রসারিত হইলে কেবল মুসলমান সমাজই শক্তিশালী হইবেন না, পরন্তু স্বাধীন ভারতে এক অভিনব যুগের উদ্বোধন ঘটিবে।

লাভখোরদের নরঘাতকতা

লাভখোরদের অসাধ্য কোন কর্মই নাই। টাকার জন্য ইহারা নরহত্যা করিতেও সঙ্কুচিত হয় না; ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে পড়িয়া যাহারা নরহত্যা করে, বস্তুত তাহাদের অপরাধের চেয়ে ইহাদের অপরাধের গুরুত্ব আরও বেশী। ইহারা খোসমেজাজে বহাল তবিয়তে সকল দিক হইতে আটঘাট বাঁধিয়া খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে নির্বিবেকচিত্তে বিষ মিশাইয়া নরনারীকে ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে লইয়া যায়। খাদ্য-দ্রব্যে কত রকম ভেজাল চলে, শহরের রেশনের কল্যাণে আমরা তৎসম্বন্ধে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। চাউলে কাঁকর এবং পাথর, সে তো স্বাভাবিক ব্যাপারই হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহা অনেকটা নিরাপদ; কারণ, দাঁতে চিবাইয়া বিষ খাওয়া দুষ্কর ব্যাপার; কিন্তু লাভখোরের দলের মানুষমারা বিদ্যায় মনীষার অভাব নাই। তাহারা খাদ্যবস্তুর সঙ্গে ভেজাল এমনভাবে দিতেছে যে, মানুষের সাধারণ চোখে তাহা ধরা পড়ে না। চাউলে বালি এবং আটায় তেঁতুলের বীজ ভেজাল মিশানোর কথা আমাদের অনেক দিন হইতেই জানা আছে। চাউল ধুইলে বালি ধুলো বাহির হইয়া যায় ইহাই বাঁচোয়া। ঐ শ্রেণীর কোন ভেজালের সুলভ উপাদান আবিষ্কার করিবার দিকেই লাভখোরদের স্বাভাবিক দৃষ্টি থাকে। আটার সঙ্গে তেঁতুলের বীজ মিশানোর কারবার ধরা পড়িয়াছে। ইহার আগে আটার সঙ্গে সাজিমাটি মিশাইবার বিদ্যার কার্যকারিতার পরিচয় মিলিয়াছে। এগুলি সহজেই আটার সঙ্গে মিশিয়া একাকার হয়। কিন্তু পেটে গিয়া কিছুতেই হজম হয় না, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় সৃষ্টি করিয়া মানুষকে মৃত্যুর দিকে লইয়া চলে। পশ্চিম বাঙলার প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত ভাণ্ডারী আকস্মিকভাবে কলিকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি ময়দার কলে হানা দিয়া ১৫০ বস্তা সাজিমাটি পাইয়াছেন। বাঙলা সরকার হইতে এই মিলে গম দিয়া আটা করিয়া লওয়া হইত; বলা বাহুল্য, আটার ওজন সাজিমাটির গুঁড়া দিয়া ভারী করিয়া সরকারকে স্বচ্ছন্দে বঞ্চনা করা চলিত এবং সেই সঙ্গে বিষ খাদ্যে জনসংখ্যা কমাইয়া রেশন সমস্যায় বিব্রত সরকারকে সাহায্যও করা হইত। সরকারের এই শুভ-কামনাকারীদের কি সাজা হইবে, আমরা জানি না। বাঙলার প্রধানমন্ত্রী আমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন যে, যাহারা এই সম্পর্কে দোষী প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদের প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। আমরা তাঁহা-দিগকে বিশেষ করিয়া এই অনুরোধ করিব যে, ভেজালের অপরাধে সাধারণত যেরূপ অর্থদণ্ড করিয়াই অপরাধীদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, আর তাহারা লাভের মোটা টাকা হইতে কিছু দিয়া নূতন লাভের ব্যবসা পাড়িয়া বসে। এক্ষেত্রে যেন সেরূপ না ঘটে। যাহারা এই শ্রেণীর অপরাধ করিতে পারে, তাহাদিগকে আমরা মানুষ বলিয়া মনে করি না। নৈতিক অধঃপতন হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য এবং সাক্ষাৎ সম্পর্কে বিষদানকারীদের হাত হইতে নির্দোষ নরনারীকে রক্ষা করিবার দায়ে ইহাদিগকে এইরূপ আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত, যাহা মনে করিয়া অন্যান্য অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিরা শিহরিয়া উঠে। বস্তুত এই শ্রেণীর অপরাধীর পক্ষে বেত্রদণ্ড বিহিত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

সম্মুখে সঙ্কট

কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের রেশনে প্রদত্ত খাদ্যশস্য পুনরায় হ্রাস করা হইয়াছে। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সোমবার হইতে কলি-কাতা এবং তন্নিকটবর্তী শিল্পপ্রধান অঞ্চলে সপ্তাহে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য মোট এক সের বারো ছটাক খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তন্মধ্যে চাউল এক সের এবং আটা বা ময়দা বারো ছটাক বরাদ্দ রহিয়াছে। বাঙলার খাদ্য সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী এই ব্যবস্থা ঘোষণাকে শহরবাসীদের পক্ষে দুঃসংবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ইহাকে শুধু দুঃসংবাদই বলিব না, আমাদের পক্ষে ইহাই প্রাণান্তকর সংবাদ; কারণ, বর্তমান সপ্তাহে যে খাদ্যের বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা দ্বারা মানুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইতে পারে না। অনেক পরিবারকে এই ব্যবস্থায় কোনদিন অনশনে, কোনদিন অর্ধাশনে থাকিতে হইবে। মাছ, ডাউল, তরিতরকারীর দ্বারা খাদ্যশস্যের অভাব অবশ্য কিছুটা পূরণ করা চলিতে পারে; কিন্তু বর্তমানে এই সব বস্তু শহরে যেরূপ মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে শুধু ধনীদের পক্ষেই সে ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে; মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রের পক্ষে অনশন বা অর্ধাশনে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। সুখের বিষয় এই যে, পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর ঘোষ আমাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তিনি আশা করেন, গত ১০ই আশ্বিন সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে ডক্টর ঘোষ বলেন, ১৫ দিন পরেই শহরে রেশনের বরাদ্দ পুনরায় বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। প্রদেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে খাদ্য-শস্য সংগ্রহের যেরূপ উদ্যম দেখা যাইতেছে, তাহা হইলেও দৈনিক বারো আউন্সের রেশন পুনঃ প্রবর্তন করা তাঁহার মতে কষ্টসাধ্য হইবে না। প্রধান মন্ত্রীর চেষ্টা সফলতা লাভ করুক, আমরা ইহাই কামনা করি; কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা একথা বলিব যে, খাদ্য সংগ্রহ, বিশেষতঃ চোরাকারবারী দলন যে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে চলিতেছে, আমরা এরূপ মনে করি না। বিশেষভাবে গভর্নমেন্ট এই সঙ্কটে সরবরাহ বৃদ্ধির চেষ্টা যাহাদের মারফতে করিবেন, সেই সকল সরকারী কর্ম-চারীদের মধ্যে ঘরের শত্রু এখনও অনেক রহিয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিছুদিন পূর্বেও সালিমার গুদাম হইতে পাঁচ হাজার মণ এবং লেক রোড ডিপো হইতে পাঁচ শত মণ চাউল চোরা বাজারে চালান দেওয়ার ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। কাশীপুরের সরকারী গুদাম হইতেও অন্যভাবে এক হাজার মণ চাউলের চোরা কারবার চলিয়াছিল। এই সকল অপচেষ্টা যাহাতে সমূলে উৎখাত পায়, আমরা গভর্নমেন্টকে তজ্জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিতেছি। আমরা আশা করি, জনসাধারণ এই সব রাক্ষসদের উপদ্রব সংযত করিবার প্রচেষ্টায় সরকারকে সকল রকমে সাহায্য করিবেন।

শিক্ষার ভবিষ্যৎ মাধ্যম

সেদিন পশ্চিম বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর ঘোষ বিজ্ঞান কলেজের সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাঙলা ভাষার সাহয্যে যাবতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করাই তাঁহার ইচ্ছা। দুই বৎসরের মধ্যে যাহাতে তাঁহার সে ইচ্ছা সার্থকতা লাভ করে, তিনি সেজন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন। তিনি সমবেত বৈজ্ঞানিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, দুই বৎসরের মধ্যে যাহাতে এম এস-সি পর্যন্ত বাঙলা ভাষার মারফৎ শিক্ষা দান করা যাইতে পারে, সেজন্য তাঁহাদিগকে পুস্তকাদি লিখিতে হইবে। ডক্টর ঘোষের মতে বিদেশীয় ভাষার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে, এ-পথে কোন দেশ বা জাতির উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। ডক্টর ঘোষ আজ যে কথা বলিয়াছেন, বহুদিন হইতেই আমরা তাহা বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু পরাধীনতার প্রতিবেশ-প্রভাব জাতীয় মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে; সে অবস্থায় শিক্ষিতেরাও অনেকে শাসনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইরূপ জাতীয় মর্যাদার হানিকর একটা আভিজাত্যের মোহ সম্প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহার ফলে দেশের সাধারণ জন-শ্রেণীর অন্তরের সংযোগ হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, এখন পরকীয় প্রভাবে এই আড়ষ্ট-করা মোহ হইতে আমাদের সমাজ জীবনকে মুক্ত করিতে হইবে। বিদেশী ভাষা, বিশেষভাবে ইংরেজী ভাষার সাংস্কৃতিক মূল্য না আছে, আমরা এমন কথা বলি না; কিন্তু রাষ্ট্রজীবনে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সে মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তাকে আমরা স্বীকার করি না। তাহার ফলে জাতীয় মর্যাদা যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনই গণতান্ত্রিকতাও শাসন ব্যাপারে বাস্তব আকার পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও বাঙলা ভাষার মাধ্যম যথাসম্ভব প্রবর্তিত হয়, আমরা ইহাই চাই। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর ঘোষ ইহার মধ্যেই সরকারী কাজকর্মে বাঙলা ভাষা প্রচলনে কার্যত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ আত্মমর্যাদা ও আত্মীয়তা-বোধের সম্প্রসারণ ব্যতীত সমাজ-জীবন শক্তি-শালী হয় না এবং মাতৃভাষায়ই রাষ্ট্রকে সেই বোধে সংহত করিয়া থাকে।

স্বৈরাচারের অভিযোগ

কিছুকাল যাবৎ পূর্ববঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড দলের আচরণ সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। কিছুদিন হইতে রেলপথে ইহাদের উপদ্রব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহারা পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের স্বার্থরক্ষার নামে হিন্দু যাত্রীদের উপর নানারকম অসম্মানজনক ব্যবহার করে বলিয়া আমরা শুনিতে পাই। পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টের স্বার্থ সঙ্গতভাবে রক্ষিত হয়, তাহাতে আমাদের আপত্তির কোন কারণ নাই এবং লাভখোর ও চোরাকারবারীরা দমিত হয়, আমরা ইহাও চাই। কিন্তু ন্যাশনাল গার্ড দলের কতক-গুলি লোক পূর্ববঙ্গের রেলপথে যেভাবে স্বেচ্ছাচার চালাইতেছে, ইহাতে পূর্ববঙ্গ সরকারের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি না, পক্ষান্তরে ইহাদের কার্যের ফলে পূর্ববঙ্গের গভর্নমেণ্টের নিন্দাই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে এবং তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য যে সব চেষ্টা করিতেছেন, তাহার গুরুত্ব হ্রাস পাইতেছে। বস্তুত, ন্যাশন্যাল গার্ডের ফিতা বাঁধিয়া এই সব যুবকেরা মনে করে যে, অতঃপর তাহারাই সরকারের সব কাজে সর্বেসর্বা হইয়া পড়িয়াছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সর্দারীতেই তাহাদের পাকিস্থান-প্রীতির সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। বস্তুত এই ন্যাশনাল গার্ডের তরুণেরা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন এবং নির্দেশ মানিয়া চলে এরূপ মনে হয় না। যে কেহ এই দলের নাম লইয়া রেলপথে উঠিয়া নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়। সময় সময় পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টের সরকারী কর্ম-চারীদিগকেও ইহারা আমল দিতে চায় না, আমরা এরূপ প্রমাণ কয়েকটি ক্ষেত্রে পাইয়াছি। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড দলের এই শ্রেণীর উচ্ছৃংখল আচরণ যাহাতে অবিলম্বে নিবারিত হয়, আমরা তৎপ্রতি পূর্ববঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। অবশ্য ইহাদের কার্যে আজ পর্যন্ত কোন গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে নাই, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনের উপর ইহাদের অনর্থক সর্দারীর দাপট দেশের বাতাসে গুমোট সৃষ্টি করিতেছে এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাধা ঘটাইতেছে। এজন্য ইহা সংযত হওয়া উচিত। পূর্ব বাঙলার বিপদের কারণ অনেক দিক হইতে রহিয়াছে, দেশের শাসনতন্ত্র এখনও সুব্যবস্থিত হয় নাই। তাহার উপর দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, সুতরাং শান্তির আব-হাওয়া যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষকে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের উল্লাস—রক্তের গন্ধ পাইলে ব্যাঘ্রের জিহ্বা যেমন রসাক্ত হইয়া উঠে, ভারত-বর্ষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং তজ্জনিত নররক্তপাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিও তদ্রূপ লোলুপ হইয়া পড়িয়াছে। মিঃ চার্চিলের এসেক্স সহরের বক্তৃতাই ইহার প্রমাণ। বস্তুতঃ মিঃ চার্চিল এবং তাঁহার অনুগামী দল ভারতে এই অবস্থা সৃষ্টির জন্যই অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহারাই কুটিল নীতির পাকচক্র খেলিয়া ভারতে এই অবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং ভারতের বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির স্বরূপ দেখিয়া চার্চিল সাহেব, আদৌ বিস্মিত হন নাই বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। মিঃ চার্চিল একদিন সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এলাইয়া দিবার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেন নাই। কিন্তু মিঃ চার্চিলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রিটেনকে আজ সেই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। দীর্ঘ তিন শতাব্দীব্যাপী শ্রম ও সাধনায় ব্রিটিশ বিশ্ব জোড়া যে সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, আজ তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বাঘেরা এতদিন নির্বিবাদে যাহাদের রক্ত চুষিয়া খাইতেছিল, ব্রিটিশের আওতার বাহিরে গিয়া তাহারা সুস্থ এবং সুখী নাই, অন্ততঃ এইটুকুই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সান্ত্বনার কারণ সৃষ্টি করিতেছে। মিঃ চার্চিলকে কি বলিয়া আমরা সান্ত্বনা দিব জানি না এবং সেজন্য আমাদের চিন্তাও নাই; তবে সাম্রাজ্য-বাদী বাঘেরা যেভাবে চোখ পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, আমরা তৎসম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিতে চাই। আমাদের এই সত্য আজ একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উপদ্রবের ভাব যদি এখনও প্রশ্রয় পায়, তবে এ দেশের সর্বনাশ ঘটিবে। সুতরাং সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধকে সমুন্নত রাখিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে ব্রতী হইতে হইবে। সাম্প্র-দায়িকতাকে রাজনীতির মধ্যে ঢুকাইয়া যাহারা এই সংস্কৃতির উপর আঘাত করিতেছে বর্তমানে বহিঃশত্রুর চেয়ে সেইসব শত্রুই আমাদের পক্ষে বেশী মারাত্মক। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকাইয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে এই শ্রেণীর মতলববাজ রাজনীতিকদের সম্বন্ধে সচেতন থাকিবার সময় আসিয়াছে। চোর ডাকাতদের তবু ক্ষমা করা চলে কিন্তু সমগ্র দেশ ও জাতির বুকে ছুরি বসাইয়া যাহারা এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চায়, তাহারা ক্ষমার অতীত। বস্তুতঃ যাহারা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যযুগীয় দুর্নীতি এখনও সমর্থন করে, তাহারা পাকিস্থান এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এতদুভয়েরই শত্রু এবং সমগ্র ভারতের পরাধীনতার পথই তাহাদের সংকীর্ণচিত্ততার ফলে সাক্ষাৎ সম্পর্কে উন্মুক্ত হইতেছে।

মহাত্মা গান্ধী

২রা অক্টোবর ভারতের ইতিহাসের অন্যতম পুণ্যময় দিবস। এইদিন বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। গত ২রা অক্টোবর গান্ধীজী উনাশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে এই দিবসে ভারতের সর্বত্র গান্ধীজীর জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। আসমুদ্র-হিমাচল এই মহামানবের বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

গান্ধীজীর ন্যায় মহামানব শুধু ভারতের নহেন, তাঁহারা সমগ্র জগতের বন্দনীয়। ইহাদের জীবনের মহিমা সমগ্র বিশ্বকেই মানবত্বের গরিমায় উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে। তবু তাঁহার জন্য আমাদের বিশেষ গর্বের কারণ রহিয়াছে। কারণ গান্ধীজীর জীবন-সাধনার প্রজ্ঞানময় উন্মেষ ভারত হইতেই বিশ্বের দিগন্তে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতের বিপুল বেদনা মহাত্মাজীর মর্মদেশ মন্থন করিয়া অহিংসা এবং মানবপ্রেমের অবদানে আসুরিক পিপাসায় জর্জরিত জগতকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা যে আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, ইহার মূলে গান্ধীজীর ত্যাগময় জীবনের সংকল্পসম্পন্ন তপস্যাই প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়াছে। কূট রাজনীতির উচ্চাবচ গতির

ভিতর দিয়া গান্ধীজী তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনায় উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য ভারতবর্ষকে অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অব্যর্থ লক্ষ্যে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রখর মনীষা অশেষ অন্তরায়ের কুটিল আবর্তজাল কাটাইয়া দাসত্বের গ্লানিকর প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে ভারতের আত্মাকে মুক্ত করিয়াছে। বস্তুত গান্ধীজীর ন্যায় মহামানবের জীবন-সাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাব না পাইলে ভারতবর্ষ আজ যে এমনভাবে প্রবল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইত না, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু গান্ধীজীর সাধনা এখনও সর্বাঙ্গীন-ভাবে সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহার দুঃখের তপস্যা নিরন্তর চলিতেছে। এ তপস্যায় তাঁহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই। কখনও বাঙলায়, কখনও বিহারে, কখনও দিল্লী, কখনও পাঞ্জাবে মানব-কল্যাণ ব্রতে এই একোনাশীতিবর্ষ বৃদ্ধের তপস্যার আগুন নিরন্তর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। গান্ধীজী অতন্দ্রিত উদ্যমে নিজেকে আহুতি দিয়া পশুবৃত্তির উপর মানব-সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত আছেন।

ভারতের নিপীড়িত মানবাত্মার বেদনা-ব্যথিত অন্তরে গান্ধীজী অভীষ্টের অভিমুখে চলিতেছেন। দেহ তাঁহার জীর্ণ, স্বাস্থ্য তাঁহার ভগ্ন হইয়াছে; কিন্তু মনোবলে সুদৃঢ় হইয়া তিনি চলিয়াছেন। দিগন্ত আঁধারে আচ্ছন্ন; কিন্তু সে আঁধার তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তিনি অন্তর্জ্যোতিঃ। অন্তরের আলোকে তিনি চলিয়াছেন। তিনি অকুতোভয়। জীবনকে আহুতি দিবার মত পরম সঙ্গতি যিনি নিজের ভিতরেই পাইতেছেন, বাহিরে তাঁহার আর কোন ভীতি থাকিতে পারে না। তিনি অনপেক্ষ, তিনি শুচি এবং তিনিই দক্ষ। তাঁহার জীবনে ব্যর্থতা কিছুই নাই এবং পরাজয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীবন দিয়া তিনি জীবনকে জাগ্রত করেন। অমৃতের উপাসক, এমন মহামানবের প্রভাবেই মানব-সমাজ মহামৃত্যুর প্রলয়ংকর বিপর্যয় হইতে রক্ষা পায়।

গান্ধীজীই আমাদের বড় আশা এবং বড় ভরসাস্থল। আসুরিক তাণ্ডবে আজ আমাদের সমাজ-জীবন বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছে। ভেদ-বিদ্বেষের অনল আবর্ত তুলিয়া ভারত-ভূমিকে বিদীর্ণ করিতেছে। এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বর্বরতার উন্মত্ত বিক্ষোভে বিলুপ্ত-প্রায়। সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট রাজনীতি চূড়ান্ত হিংস্রতায় আজ মানুষের রক্তে অতি বীভৎস পৈশাচিক উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর্ত নরনারীর হাহাকারে ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতেছে, পুত্রহারা সহস্র সহস্র জননী এবং পতিহারা অগণিত নারীর নেত্র-নীরে ভারতভূমি সিক্ত হইতেছে। সতীত্বের মহিমা এবং নারীত্বের মর্যাদা আজ উপেক্ষিত ও অবহসিত। গান্ধীজীকে যদি আমরা না পাইতাম তবে ভারতের অবস্থা আরও যে কত ভীষণ হইয়া উঠিত, কল্পনাও করা যায় না। এই একজন মানুষ আজ ভারতে সত্যই অঘটন ঘটাইতেছেন।

গান্ধীজী চলিয়াছেন। অনপেক্ষ আত্মবলে দিক্ আলো করিয়া তিনি চলিয়াছেন। তিনি একাকী চলিয়াছেন; কিন্তু অমোঘ শৌর্যে তিনি কার্য করিতেছেন। ব্যথিত ভারতের আত্মা গান্ধীজীতে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। অগ্নিময় সেই পুরুষই আমাদিগকে পথ দেখাইবেন। দৃষ্টি তাঁহার স্বচ্ছ এবং অনাবিল; সত্য দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট এবং প্রোজ্জ্বল। তাঁহার গতি অনুমানে সন্দেহযুক্ত নয়, সনাতন সত্যের প্রচণ্ড চেতনায় তাহা স্পন্দিত। প্রকৃত ক্ষাত্রবীর্যের তিনিই উদ্বোধন করিতেছেন। রক্তলোলুপ পশুর হিংস্রদ্রংষ্টার আঘাতে ভারতের দেহে যে ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে গান্ধীজীই ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন। কাম-রাগবিবর্জিত যে বল তাহাই প্রকৃত বল এবং সেই বলেই ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠা। গান্ধীজী কামরাগবিহীন সেই বলে বলীয়ান। আসুরিকতা নিজের অন্ধতায় সর্বাংশে দুর্বল। তাহার দম্ভ-দর্প যতই থাকুক না কেন, সমষ্টি মানবের কল্যাণ বেদনার প্রাণময় সাধনার কাছে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতেই হয়। নিজের অন্তর্লীন ত্রুটিতে সে নিজেই এলাইয়া পড়ে।

গান্ধীজী চলিয়াছেন। খণ্ড দৃষ্টির সাময়িক সাফল্যের চাঞ্চল্য লইয়া তাঁহার নীতি ও গতির বিচার করিলে ভুল হইবে। যিনি নিরপেক্ষ এবং দক্ষ, তিনি মূলে লক্ষ্য করিয়াই চলেন। ভুল তাঁহার হয় না। গান্ধীজীও ভারতের রাজনীতি বহু বিপর্যয় এবং বিকৃতির ভিতর দিয়া অভ্রান্তভাবেই চালিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে, আমরা এ বিশ্বাস রাখি। গান্ধীজীর সাধনার পরম বীর্যে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য আসুরিক দৌরাত্ম্য-ভীতি নিঃশেষে নিরসন করিয়াই উদিত হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ মাত্র নাই। সত্যই আমাদের এ দুর্দিন থাকবে না। বর্ষার মেঘাড়ম্বরমুক্ত আকাশে শরতের নবোদিত সূর্যের স্বর্ণ-কিরণ অচিরেই জগতে মানবতার অপূর্ব মাধুর্য বিস্তার করিবে। গান্ধীজীর দিকে তাকাইয়া আমরা মানব-সভ্যতার সেই নবীন প্রভাতেরই প্রতীক্ষা করিতেছি। আমরা ভারতের নেতা, উপদেষ্টা এবং বিশ্বে প্রেম ও মানবতার পরম সত্যের উৎগাতা ও প্রতিষ্ঠাতা মহামানব গান্ধীজীকে বন্দনা করিতেছি।

ভারত-ভাগ্য-বিধাতা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

একটি হিরণচ্ছটা সূর্য-জ্যোতিষ্মানঃ
আলোকে কি অনালোকে ধূসর-ধেয়ান,
সদা সত্যবান
চ'লেছেন চিরপদাতিক।
মৃত্যুকীর্ণ অমানিশা রজনীরো মাঠে
আশ্চর্য জীবনশিখা উদার ললাটে,
তাঁর রাজ্যপাটে
মমতায় মাছিও মাণিক।

আকাশ, সাগর কিংবা ভুবনের তট
চ'লেছে, চ'লেছে ধীর প্রাণের শকট—
ধনী, গুণী, শঠ
সকলেরে ডেকে দুই হাতে।

হনাতার তীরে তীরে জ্বালিয়ে মশালঃ
বন্যাকে দেখান কান্ত মহৎ সকাল,
দেখে মহাকাল
চমকিত বুঝি শংকাতে!

একটি মধুর স্বপ্নে জাগে ইতিহাসঃ
দিকে দিকে পুড়ে যায় বন্ধনের পাশ;
কী সে নির্যাস?
গ'লে পড়ে দানবেরো মন!
একটি বিচিত্র বিশ্ব পূর্ণ প্রাণনীল
এখনো যন্ত্রস্থ তাঁর প্রাণের নিখিল,
শেষ হ'লে মিল—
জেবলে দেবে প্রাচীর গগন।

গাধা

আর বলেন কেন, এ সপ্তাহের লেখাটা আরেকটু হলেই বাদ পড়ে গিয়েছিল আর কি। আপনারা তো জানেন, আমার এক রোগ আছে—মাঝে মাঝে গম্ভীর কথা বলবার বিষম সখ চেপে যায়। কালকে রাত্তির বেলায় সবে ইন্দ্রজিতের খাতা খুলে বসেছি, অতিশয় গম্ভীর মুখ করে একটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করতে যাচ্ছি এমন সময় কানের কাছে এক বিকট চীৎকার। হঠাৎ এমন চমকে উঠেছিলুম যে খাতা একধারে আর কলম আরেক ধারে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল। আমি বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের নাম গ্রহণ করলে কি হবে আসলে আমি অতিশয় ভীরু প্রকৃতির মানুষ। অস্ত্রের টঙ্কার তো দূরের কথা রমণী কণ্ঠের ঝঙ্কারেও আমি মাঝে মাঝে আঁৎকে উঠি। তাছাড়া আমি আবার অন্যমনস্ক স্বভাবের লোক। কোনো কিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকি না, কাজেই অল্পেতেই অপ্রস্তুত হতে হয়।

ব্যাপারটা আসলে যৎসামান্য। কিছুদিন যাবৎ আমাদের পাড়ায় গাধার বড় উপদ্রব হয়েছে। তারই একটা কখন যে বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে আমার জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা জানতেই পারিনি। তার উপরে সবে যখন ইন্দ্রজিতের খাতার সূচনা করব ভাবছি ঠিক সেই মুহূর্তে এমন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে তা তো একেবারেই ভাবিনি। মনটা যৎপরোনাস্তি বিকল হয়ে গেল। আমার এত সাধের গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তুটি—গাধার ধমক খেয়ে ভেঙে চৌচির হয়ে ছিটকে পড়ল। ভাঙা চিন্তার টুকরোগুলোকে আর কিছুতেই জোড়া লাগাতে পারলুম না। খাতাপত্তর গুটিয়ে রেখে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

মনে আছে অনেকদিন আগে পড়েছিলাম Cowper's Letters। বন্ধুকে লেখা কবির চিঠি যখন বেশ জমে উঠেছে তখন হঠাৎ চিঠি বন্ধ করে দিয়ে কবি বলছেন, চিঠি এইখানেই শেষ করতে হল। কারণ কিনা my neighbour's ass seems to be much too musically disposed tonight. সেই গাধাটার উপরে সেদিন বিষম চটেছিলাম। রসভঙ্গ আর কাকে বলে!

নিজেকে কাউপারের সমপর্যায়ে স্থাপন করে রসভঙ্গের দায়টা রাসভনন্দনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আর নয়, ইন্দ্রজিতের খাতা এইখানেই ইস্তফা। কারণ গাধার এই অট্টহাসিটা নিশ্চয় আমাকেই উদ্দেশ
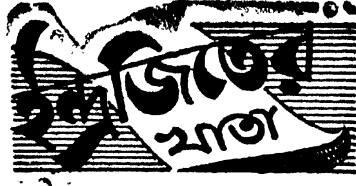
করে। আমার রস পরিবেশনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও একটি মাত্র হাসির ধমকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে যতই ভাবছিলাম ব্যাপারটা ততই কৌতুক বাষ্পে ঘন হয়ে মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। গাধার ডাকটা নিতান্ত অর্থহীন নয়। আমাকে উদ্দেশ করে ও যা বলতে চেয়েছে ক্রমেই তার অর্থটা স্পষ্ট হচ্ছে। আমি বারম্বার বলেছি আমি প্রশংসা লোভী, প্রশংসার খুদ্ কুড়াবার জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে আমার আত্মপ্রচারের আপ্রাণ চেষ্টা। গাধাটা বলছে, ওরে মূর্খ, চেয়ে দেখ্ আমার দিকে—বিশ্বের নিন্দা বয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কিছুমাত্র দৃকপাত করি না। জানি বিশ্বব্যাপী নিন্দা সত্ত্বেও সংসারে প্রয়োজন তো আমার ফুরায়নি। প্রয়োজনই সব চেয়ে বড় প্রশংসা। প্রয়োজন যেদিন ফুরোবে প্রশংসাও সেদিনই ফুরোবে।

তবে? তবে তো আমার প্রশংসার বুদ্বুদটি ফাটবার সময় হয়েছে। কারণ, আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ইন্দ্রজিতের পরমায়ু আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমাকে এখন অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে। ইতিমধ্যে যদি কিছু পুণ্য অর্জন করে থাকি তবে নিশ্চয় আমার দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হবে এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করলে আমি যে আগের মতোই যশোলিপ্সা নিয়ে জন্মগ্রহণ করব সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এ কথাও বলতে পারি যে, জন্মগ্রহণ করলে আবার এই 'দেশে'তেই অবতীর্ণ হব।

গোড়াতে যখন লিখতে শুরু করেছিলাম তখনই বলে নিয়েছিলাম—যা তা নিয়ে লিখব কিন্তু যা তা লিখব না। জানি না সে সংকল্প রক্ষা করতে পেরেছি কি না। অনেক আজে বাজে বিষয় সম্বন্ধে লিখেছি, কিন্তু গাধার বিষয়ে কিছু লিখিনি। ইন্দ্রজিতের খাতা আগাগোড়া উপেক্ষিত বিষয় নিয়ে লেখা। (গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে সামান্য যেটুকু লিখেছি সেটুকু প্রক্ষিপ্ত বস্তু)। ইন্দ্রজিতের কাব্যে গাধাটাকে আর কাব্যের উপেক্ষিত করে রাখব না। আমার কাব্যে গাধাটাই প্রধান নায়ক। কারণ সকল কথার সার কথা সে-ই আমাকে বলেছে। তার অট্টহাসিটা আমার কানে আজ দৈববাণীর মতো ঠেকছে।

সংসারে গাধার মতো উপেক্ষিত প্রাণী আর নেই। অথচ শুনেছি যীশু খৃষ্ট যখন জারুজেলাম-এ প্রবেশ করেছিলেন তখন গাধার পিঠে চেপে এসেছিলেন। এত বড় সম্মান আর কোনো প্রাণীর ভাগ্যে ঘটেনি। কিন্তু মানব সমাজে গাধার ভাগ্যে অসম্মান ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। যে মানুষ যীশুখৃষ্টকেই সম্মান করতে শেখেনি সে গাধাকে অসম্মান করবে সেটা আর বিচিত্র কি? বরং মানুষ যীশুর প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা দেখিয়েছে —তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছে, কিন্তু গাধাটাকে চিরকালের জন্য অপমানের শূলে চড়িয়ে রেখেছে। স্বয়ং যীশুখৃষ্টও ওর প্রতি অবিচার করেছেন। মানুষকে ভেড়ার মতো (meek as lamb) হবার উপদেশ দিয়েছেন; বলি, গাধার মতো হতে দোষ ছিল কি? এমন সহনশীল জীব সংসারে ক'টি আছে?

যে দুচার জন ব্যক্তি গাধাকে যথাযোগ্য সম্মানের আসন দিয়েছেন তাঁরা আমার প্রণম্য। আর এল স্টিভেনসন ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সঙ্গে একমাত্র সঙ্গী ছিল একটি গাধা (Travels with a Donkey দ্রষ্টব্য)। একবার ভাবুন তো আমার আপনার মতো বহু সজ্জন ব্যক্তি থাকতে স্টিভেনসন কেবল ঐ গাধাটাকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কেন? তিনি প্রকৃতই রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। জানতেন প্রকৃতির নিভৃত অঙ্গনে মানুষই মূর্তিমান রসভঙ্গ। ও শুধু তর্ক করে আর চারিদিকের ল্যান্ডস্কেপ্‌টাকে — নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে।

আরেকজন রসজ্ঞ ব্যক্তি জি কে চেস্টারটন। গাধার সম্বন্ধে তিনি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন। গাধার বিষয়ে এর চাইতে সুন্দর জিনিস কোনো সাহিত্যে আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। সমস্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করবার স্থান এখানে নেই, একটিমাত্র স্তবক উদ্ধৃত করছি—

Fools, for I also had my hour;
One far fierce hour and sweet:
There was a shout about my ears,
And palms before my feet.

চেস্টারটনের মতো আমি যদি কবিতা লিখতে পারতুম তবে আমিও গাধার আসন কাব্যে দিতাম পেতে। তা যখন হবার নয় তখন ইন্দ্রজিতের খাতার প্রধান নায়ক হিসাবে তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি ছেড়ে দিলুম।

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়

শেষরাত্রে অজয় আসিয়া নিজেদের গ্রামে প্রবেশ করিল। স্টেসনে কোন পরিচিত লোকের চোখেই সে পড়ে নাই—আর অত রাত্রে কে-ই বা কাহাকে লক্ষ্য করে। সারাটা নির্জন পথের উপর দিয়া হাঁটিয়া গ্রামে আসিয়া ঢুকিয়াছে—গ্রাম তো তখনও নিশুতির কোলে নিঝুমে হইয়াছিল। চন্দনার আর আজ কাল সেদিন নাই—পারাপার করিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না—বর্ষার শেষে জল নীচে নামিয়া গিয়া অগ্রহায়ণ-পৌষের দিকে স্রোতধারা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং বর্ষার শেষে বাঁশের পুল বাঁধিয়া দিলেই লোকে সচ্ছন্দে পারাপার করিতে পারে। বাড়ির সংলগ্ন আমবাগানের ভিতরে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল অজয়—বুকে তাহার কাঁপিয়া উঠিল। কেমন আছেন তাহার জ্যাঠামণি?—বাঁচিয়া আছেন তো? বাড়ির দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল—কই তাহার জ্যাঠামণির ঘর হইতে এতটুকু আলোর রশ্মি তো দেখা যাইতেছে না! কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া মনে খানিকটা বল সঞ্চয় করিয়া লইয়া তবে সে বাড়ির ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। না—এই তো জ্যাঠামণির ঘরে আলো রহিয়াছে—যাক্ বাঁচিয়া আছেন তাহা হইলে জ্যাঠামণি!! তাহার মন অনেকখানি হাল্কা হইয়া উঠিল। ঘরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই—তাহার মা ভিতর হইতে প্রশ্ন করিলেন—কে ওখানে?

অজয় বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া গলা খাট করিয়া জবাব দিল—আমি মা—দরজা খোল।

কল্যাণী তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলে, অজয় ভিতরে গিয়া ঢুকিল। কল্যাণী বলিলেন—তুই এতদিনে এলি বাবা!

অজয় চাহিয়া দেখে তাহার জ্যাঠামণির রোগশয্যার পাশে বসিয়া আছেন এ বাড়ির চিরসহচর তাহার সেই অক্ষয় কাকা। অক্ষয় উঠিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন—এসো অজয় তোমার জ্যাঠামণির কাছে বসো। তোমার কথাই আজ দুটো দিন ধরে শুধু বলেছেন। সারা রাত্রির ভিতরে মাত্র দুই তিন বার সজ্ঞানে কথা বলেছেন—তখন শুধু তোমাকেই ডেকেছেন। অজয় তাহার জ্যাঠামণির বিছানার উপরে বসিয়া মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—জ্যাঠামণি আমি এসেছি। কিন্তু তিনি তাহার দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন—ছেড়ে দে—আমায় ছেড়ে দে—গুলী করবে—গুলী করবে। তারপর আরও কয়েক-বার শুধু ঝোঁকের মাথায় আমায় গুলী করবে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন। অক্ষয় বলিলেন—খবরটা জেনে তখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন—তারপর থেকে এমনি চলছে—কখনও এমনি বলেন—কখনও দুই একটা কথা সজ্ঞানে বলেন।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। অজয় জ্যাঠামণির বিছানায় তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া শেষ সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কল্যাণী কাঁদিয়া বলিলেন—তোর জন্যেই বুঝি অজু জীবনটা এতক্ষণ বেরোয়নি রে। অজয়ের দুই চোখের কোন্ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। খানিকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল—জ্যাঠামণির শেষ সময়ে আমি কিছুই করতে পারলাম না—আমার এ দুঃখ যে কোন কালেও যাবে না মা! বেলা গোটা দশেকের মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। শ্মশান হইতে যখন অজয় বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন আর সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই। অজয়কে যে এমনি করিয়া আই বি-র লোক খোঁজ করিতেছে—সন্ধান পাইলে যে তোকে লইয়া বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিবে তাহা শুনিয়া কল্যাণী দেবী বলিলেন—তোকে আর আমি এখানে একটা দিনও আটকে ধরে রাখ্‌বো না অজু—কলকাতাই যদি তোর নিরাপদ স্থান হয় তবেই তুই ফিরে যা কলকাতায়। অজয় বলিল—একা বাড়িতে তুমি কি করে থাক্‌বে মা!

সে আমি পারবো অজু—তোর অক্ষয় কাকা বলেছেন—তিনিই সব ভার নেবেন—তাঁর ছেলে মেয়েরা ঘরে এসে আমার কাছে থাকবে। আমার জন্যে তুই কিছু ভাবিস নে বাবা। আর একটা কথা—তাঁর পিণ্ডদানের তুই তো একমাত্র অধিকারী! একদিন সাবধানে কালীঘাটে গিয়ে পিণ্ডটা দিয়ে আসিস্ বাবা। তুই ছাড়া তাঁর যে আর কেউ নাই রে। অজয় কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু কল্যাণী বাধা দিয়া বলিলেন—কোন যুক্তি এখানে খাটবে না অজু! তোরা পরলোক না মানতে পারিস—ভগবানে অবিশ্বাসী হতে পারিস্ কিন্তু তিনি তো মানতেন—আমি তো মানি বাবা।

অজয় হাসিয়া বলিল—তুমি আমায় অযথা অনুযোগ করছ মা—পরলোক আছে কি নাই—ভগবান মানি কি মানি না—তা যে আমিই আজ পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারিনি। কিন্তু তোমার কথা আমি রাখ্‌বো—জ্যাঠামণির শেষ কাজ আমি করবো মা!

গতকল্য শেষরাত্রে অজয় আসিয়া গ্রামে ঢুকিয়াছিল আর আজ শেষ রাত্রে চলিল গ্রাম ছাড়িয়া। অক্ষয় কাকা তাহার সঙ্গে চলিয়াছেন আগাইয়া দিতে। আজিও গ্রাম একেবারে নিশুতির কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। নদীর পরপারের মাঠের ভিতরে সাদা সাদা কুয়াশায় ও জ্যোৎস্নায় মিলিয়া যেন ধোঁয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। নদীর বাঁশের পুল পার হইয়া—অজয় শেষবারের মত গ্রামের দিকে ফিরিয়া চাহিল। আবার কতদিন পরে ফিরিয়া আসিবে কে জানে? সংসারের দুইটি বন্ধনের একটি আজ খসিয়া গেল—জ্যাঠামণিকে সে আর দেখিতে পাইবে না—আর তার অফুরন্ত স্নেহ সে ভোগ করিবে না। শৈশবের অতীত দিন-গুলি একে একে মনে পড়িতে লাগিল—জ্যাঠামণি তাহাকে প্রতি সন্ধ্যায় নিজের কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া গল্প বলিয়াছেন—কত আদর করিয়াছেন—পিতার অভাব একটা দিনের জন্যও তাহাকে বোধ করিতে দেন নাই। তারপর ইস্কুলে লেখাপড়া আরম্ভ হইল। তারপর আসিল ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন—তাহারই উৎসাহে জ্যাঠামণি আসিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—এত বড় চাকরী দিলেন ছাড়িয়া। সেই হইতে সারাটা জীবন সন্ন্যাসীর মত কাটাইয়া দিলেন। সেই জ্যাঠামণি আর আজ নাই। পথ চলিতে চলিতে তাহার সারা অন্তর বারে বারে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। বাকী রহিলেন মা। তাঁহাকে নিরাশ্রয় করিয়া—একা একা ফেলিয়া রাখিয়া সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিল? বিপদে আপদে কে দেখিবে? তাঁহার অসুখ হইলে পথ্যটুকু করিয়া দিবে এমন মানুষও তো নাই। চির-দুখিনী মা তাহার, স্বামী তাঁহাকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন—আজ পুত্রও তাঁহাকে কাঁদাইয়াই চলিল—একটা দিনের জন্যও সুখের মুখ তিনি দেখিলেন না! স্টেসনের এক অন্ধকার কোণে অজয় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল—অক্ষয় টিকিট করিয়া আনিয়া গাড়ী আসিলে তাহাকে তুলিয়া দিয়া তবে বিদায় লইলেন।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়

দিনের বেলা পথের মধ্যে ছোট একটি স্টেসনে অজয় নামিয়া পড়িয়াছিল। সারাটা দিন এদিক ওদিক কাটাইয়া সন্ধ্যার দিকের গাড়ীতে চাপিয়া বসিয়া রাত্রি গোটা নয়েকের সময় দম্ দম্ স্টেসনে নামিয়া কলিকাতার বাসে চাপিয়া বসিল। সদর দরজায় সাঙ্কেতিক শব্দ করিতেই অপর্ণা দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা বন্ধ করিয়া হ্যারিকেন তুলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া অপর্ণা শিহরিয়া উঠিল—একি চেহারা হইয়াছে তাহার!—দুই চোখ লাল—মাথার চুল রুক্ষ ও এলোমেলো মুখ চোখ শুকাইয়া গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিল—বাড়ির খবর কি—জ্যাঠা-মশাই কেমন আছেন? অজয় নির্বিকারভাবে জবাব করিল—মারা গেছেন।

—মারা গেছেন? অপর্ণার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। এক বাটী গরম দুধ আনিয়া অজয়ের সম্মুখে ধরিয়া অপর্ণা কহিল—দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়ুন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে শরীর আপনার ভাল নাই—কাজেই রাত করে ভাত আর খাবেন না।

সকাল বেলা অজয়ের যখন ঘুম ভাঙিল—তখন সারা গা তাহার জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। যে বৃদ্ধ প্রত্যহ বাজার করিয়া দিয়া যান—তাহাকে দিয়া অপর্ণা বিমলদার নিকট খবর পাঠাইল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল না। সন্ধ্যার পর অজয়ের কপালে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া সে মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। অজয়ের জ্বরের তখন মগ্ন অবস্থা, সমস্ত শরীরে রীতিমত দাহ উপস্থিত হইয়াছে। অজয় অপর্ণার হাত-খানা দুইহাত দিয়া নিজের কপালের উপরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—আঃ কি ঠাণ্ডা হাত—কি নরম হাত! অপর্ণা বলিল মাথায় হাত বুলিয়ে দেই?

—দাও!

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অপর্ণা বলিল—চিকিৎসার যে কোন বন্দোবস্ত হলো না অজয় বাবু—কি হবে বলুন তো?

অজয় বলিল—কোন ভয় নাই—জ্বর অমনি সেরে যাবে। আঃ বেশ করে আমার মাথাটা টিপে দাও—চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দাও। অপর্ণা চুপচাপটি করিয়া তাহার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। জ্বরের ঘোরে অজয়ের বক্তৃতার নেশা চাপিয়া গিয়াছিল—সে বলিতে লাগিল—এমনি করে সেবা তোমরা করতে পার বলেই তো তোমাদের গৃহলক্ষ্মী বলে অপর্ণা! সেবাযত্ন স্নেহ ভালবাসা এ তো নারীরই দান—এতেই তো সংসার আজও চলছে—নইলে দুনিয়ার সবই যে অচল হয়ে যেতো। তুমি কিছু মনে করো না অপর্ণা—আমরা বিপ্লবী হ'তে পারি—গায়ের জোরে স্নেহ ভালবাসার বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারি কিন্তু জেনো সত্যিকারের স্নেহ যেখানে, ভালবাসা যেখানে—সেখানে কোন জোরই খাটে না। এমনি ঘণ্টাখানেক নানা বক্তৃতার পর অজয় ক্রমে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। অপর্ণা তাহার বক্তৃতাস্রোতে কোনপ্রকার বাধা না দিয়া কখনও লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিতেছিল—কখনও মনে মনে হাসিতেছিল।

পরের দিন সকালে সেই বৃদ্ধটির সহিত একজন ডাক্তার আসিয়া যখন হাজির হইলেন—তাহার পূর্বেই অজয়ের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তারটি তাহাকে দেখিয়া বলিয়া গেলেন—ম্যালেরিয়া জ্বর—কয়েক দাগ কুইনাইন মিকশ্চার পাঠাইয়া দিবেন—ঠিকমত খাইলে সম্ভবতঃ আর জ্বর আসিবে না। সত্যই জ্বর আর আসিল না—অজয় বার কয়েক ভাত খাইতে চাহিয়া মিছা-মিছি অপর্ণার কাছে ধমক খাইল।

দিনতিনেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা অজয় আর অপর্ণা চায়ের পেয়ালা সম্মুখে করিয়া গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছিল এমন সময় সদর দরজার কড়া নাড়িয়া উঠিল। অপর্ণা তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই প্রবেশ করিলেন বিমলদা। ভিতরে আসিয়া চায়ের গন্ধে তিনি যেন অনেকখানি সজীব হইয়া উঠিলেন—বলিলেন—আমার ভাগ কই অপর্ণা! অপর্ণা হাসিয়া নিজের কাপ তাঁহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—এই আরম্ভ করুন!—না ওতে হবে না দিদি—আমার পুরো কাঁচের গ্লাসের এক গ্লাস চাই—বেশী করে মিষ্টি দেবে—বেশী করে দুধ দেবে—তবেই না চা!

অপর্ণা হাসিয়া বলিল ততক্ষণ আরম্ভ করুন—জল গরমই আছে দিচ্ছি করে! অজয় কথা কহে নাই—চুপ করিয়া বসিয়াছিল—এতক্ষণে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন—তুমি ভাগ্যবান অজয়—রোজ রোজ দুবেলা এমনি চা খাচ্ছ! পরে অপর্ণাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—কেমন তোমার অতিথি সেবা ভাল-ভাবে চলছে তো বোন! অপর্ণা কথা না কহিয়া মুখ নামাইয়া চা করিতে লাগিল। অজয় বলিল—ইস্ আজ তো খুব ঠাট্টা করছেন বিমলদা—আমার মনটা যে কেমন কচ্ছে—তা তো আর বুঝছেন না—তা ছাড়া এই যে দুটো দিন ধরে আমার একশ চার পাঁচ ডিগ্রী জ্বর হয়ে গেল—এসেছিলেন একবার? বিমলদা তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কণ্ঠে রাজ্যের স্নেহ টানিয়া আনিয়া বলিলেন—তুই যে জ্যোঠামণিকে কত ভালবাসতিস্ তা কি আর জানিনে ভাই! তবু তো দুঃখ আমাদের পেলে চলবে না—যেখানে নিজেদের কোন হাত নেই—তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি? এই যে তোরা আমাকে এত ভালবাসিস্—কাল যদি আমি মরি তোরা শত চেষ্টা করেও কি আমাকে রাখতে পারবি? আর তোর জ্বরের কথা? তোকে অস্থানে রাখিনি ভাই—স্বয়ং অপর্ণা দিদি যে রয়েছেন আজ তোর বডিগার্ড হয়ে। অপর্ণা ফিক্ করিয়া হাসিয়া পুনরায় মুখ নামাইল।—তা ছাড়া আজ যে মস্ত বড় একটা সুখবর নিয়ে এসেছি ভাই—শুনলে সব, মনখারাপ তোর ভাল হয়ে যাবে। অপর্ণা ও অজয় উভয়ে একই-সঙ্গে প্রশ্ন করিল—কি খবর বিমলদা!

বিমলদা বলিলেন—তোর বাবা আন্দামান থেকে ফিরে এসেছেন অজয়। অজয় বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল—তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অপর্ণা বলিল—কবে এলেন—কোথায় আছেন তিনি?

—কাল এসেছেন—আছেন কলকাতায়ই!

অজয় এতক্ষণে কথা কহিতে পারিল—বলিল—পঁচিশ বছর তো হয়নি দাদা!

—না হয়নি—কিন্তু এমনি প্রায় সব বন্দিদেরই দীর্ঘদিন পরে আন্দামান থেকে ছেড়ে দিচ্ছে! তুই দেখা করতে যাবি না অজয়!

অজয় দুইচোখ বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল—যাব, আমি যাব দাদা! কোথায় গেলে তাঁকে দেখতে পাব! আমাকে নিয়ে চলুন!

—আজ নয় ভাই। কাল ঠিক এমনি সময়ে আমি আবার আস্বো—তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

বিমলদা বিদায় লইলে সারাটা রাত্রির মধ্যে অজয় একটা মিনিটও ঘুমাইতে পারিল না। মনে হইতেছিল কখন রাত্রি প্রভাত হইবে—কতক্ষণে আগামী কালের দিনটি শেষ হইয়া আবার সন্ধ্যা নামিয়া আসিবে বিমলদা আসিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, সে তাহার বাবাকে দেখিতে পাইবে। কতকাল পরে—উঃ কত দীর্ঘদিন সে! অজয় মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল প্রায় পনর বৎসর। সেই কলিকাতার বাসার কথা অজয়ের মনে পড়ে—সে তখন কত ছোট। তাহার আবছা আবছা মনে পড়ে—তাহার বাবার কেমন সুন্দর শরীর ছিল—কেমন সুন্দর গায়ের রং ছিল। আজ এতদিন পরে চেহারা তাঁহার না জানি কেমন হইয়াছে। কিন্তু অজয়কে কি তিনি চিনিতে পারিবেন? না তাতো পারিবেন না! আর সে-ই কি তাহার বাবাকে এতদিন পরে চিনিতে পারিবে? না তাহাতো পারিবে না! সেই যে উল্লাসদার নিকট হইতে বাবার ছবিখানা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা সে কতবার দেখিয়াছে। কিন্তু তাহার পর যে পনরটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে—সে চেহারা—সে বয়স যে তাঁহার আর নাই। হায়রে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা—আজ পিতাকে বলিয়া দিতে হইবে—এই তোমার পুত্র—পুত্রকে বলিয়া দিতে হইবে—এই তোমার পিতা! সঙ্গে সঙ্গে অজয়ের মনে পড়িল—তাহার মাকে। আজ যদি মা কাছে থাকিতেন—কোন ভাবনা থাকিত না তাহার! মা তাহার ঠিক চিনিতে পারিতেন। সে তাহার মায়ের আঁচল ধরিয়া বাবার কোলে গিয়া বসিত। অজয়ের মনে হইতে লাগিল—কোন মন্ত্র বলে যদি বয়সটা তাহার বছর পনর কমিয়া যাইত—তাহার বাবার কোলে চড়িয়া—ছোট ছেলের আদর পুরাপুরি ভোগ করিয়া লইত।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া একটা দুইটা চারিটা পর্যন্ত বাজিয়া গেল—ঘুম তাহার

একটুও আসিল না। না—ঘুমাইবে না সে—সারারাত্রি ধরিয়া কত না কথা—কত না কল্পনার জাল বুনিয়া চলিতে লাগিল। কখন রাত্রির শেষে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিবে কখন দিনের শেষে আবার সন্ধ্যা হইবে—এই শুধু তাহার প্রতীক্ষা!

সন্ধ্যার পর বিমলদা ও অজয় আসিয়া একটা বাড়িতে ঢুকিলেন। নিচের তলায় অজয়কে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বিমলদা উপরে উঠিয়া গেলেন। একটু পরে নীচে নামিয়া আসিয়া ডাকিলেন এসো অজয়! দোতালার একটি ঘরে টেবিলের পাশে চেয়ারে বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া কে একজন একখানা বই পড়িতেছিলেন। বয়সে তিনি প্রৌঢ়, মাথার চুল প্রায় আধাআধি পাকিয়া গিয়াছে—সারা মুখে কঠোর দুঃখ কষ্টের ছাপ যেন আঁকা রহিয়াছে। শরীর কিন্তু তাঁহার তথাপি মজবুত দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা এখনও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। ঘরে উজ্জ্বল বিজলী বাতি জ্বলিতেছিল। বিমলদা অজয়কে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সেইদিকে আঙুল তুলিয়া বলিলেন—চিনতে পেরেছো অজয়? অজয় কোন কথা না কহিয়া শুধু চিত্রার্পিতের মত সেইদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শব্দ পাইয়া অসিত মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। বিমলদা তাঁহার দিকে আগাইয়া গিয়া বলিলেন—চিনতে পারছেন না অসিতবাবু ও যে অজয়—আপনার ছেলে। মুহূর্তে মধ্যে অসিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন—মুখ দিয়া বাহির হইল—অঞ্জু—আমার অঞ্জুমণি! ছুটিয়া গিয়া অজয়কে দুই বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিলেন। অজয় কোন কথাই কহিতে পারিল না—শুধু পিতার বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিমল দা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিয়া দরজাটি বাহির হইতে টানিয়া দিলেন। পুনরায় বিমল দা'র সহিত যখন অজয় পথে নামিয়া আসিল—তখন পা তাহার মাটিতে পড়িতেছে কি শূন্যে হাঁটিয়া চলিয়াছে সে খেয়াল তাহার ছিল না। তাহার মন বারে বারে আনন্দে ও গর্বে দুলিয়া উঠিতেছিল এই তো তাহার পিতা—এমন পিতার সন্তানই তো সে! আর, কিছু তার না থাক্—পিতৃগর্ব সে সর্বসমক্ষে বুক ফুলাইয়া করিতে পারিবে।

ষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায়

কয়েক মাস পরের কথা। আজ অনেক দিন পরে সন্ধ্যাবেলা বিমল দা আসিয়াছেন। অজয় ও অপর্ণাকে লইয়া তিনি নানা আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—গান্ধীজী গভর্নমেন্টের কূট চাল ধরে ফেলেছেন অজয়—রাউন্ড টেবিল ব্যর্থ হ'য়ে গেল। আমি তো তখন তোমায় বলেছি ভাই—গান্ধীজী রাজনীতিতে ছেলেমানুষ নন—ত'াকে অত সহজে ভুলান যাবে না। মেকি স্বরাজের ফাঁদে তিনি কখনও পা দেবেন না। জাহাজেই তিনি গ্রেপ্তার হ'য়েছেন—ভারতের মাটিতে পা দেবার পূর্বেই। দেশে আবার পূর্ণভাবে আন্দোলন জেগে উঠেছে।

অজয় বলিল—কিন্তু আজ আমাদের কর্তব্য কি বিমল দা? আমরা কি দিনের পর দিন এমনি আত্মগোপন করে—পালিয়ে পালিয়ে বেড়াব?

বিমলদা বলিলেন—সেই কথাই আজ আলোচনা করতে এসেছি ভাই।

এমনি করিয়া এই ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে বন্দী হইয়া থাকিতে অজয়ের মন আর কিছুতেই চাহিতেছিল না—সে রীতিমত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—গ্রেপ্তারের ভয় করে কোন লাভ নাই বিমলদা—যদি অনুমতি করেন আবার এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বিমলদা হাসিয়া বলিলেন—অসহিষ্ণু হ'লে তো চলবে না ভাই—তোমার খোঁজ পেলে তো গভর্নমেন্ট অমনি ছাড়বে না—বিনা বিচারে যে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাখবে আটকে—কি লাভ তাতে—দেশের কোন্ কাজটি করতে পারবে শুনি?

—কি তবে করতে চান?

—বলছি শোন।

তারপর অপর্ণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তোমার কথাটা ভেবেছি বোন—ভেবে একটা পথ খুঁজে পেয়েছি।

অপর্ণা বলিল—পথটা কি?

—তোমাকে বিয়ে করতে হ'বে দিদি।

—বিয়ে? অপর্ণা অবাক হইয়া বিমলদার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে হাসিয়া অজয়কে বলিলেন—তুমি ভেব না ভাই—তোমারও ঐ একই পথ। তোমরা দুজনে দুজনাকে ভালবাস—শ্রদ্ধা কর—এ আমি জানি। ভালবাসাকে গলা টিপে মারা বিপ্লবীদের শাস্ত্রে লেখে না—তারা চায় সংসার ভরে ভালবাসার সৃষ্টি করতে। তোমাদের বিয়ে করতে হ'বে। কিছু সংশয় মনে রেখো না বোন—কিছু অসম্মান এতে নাই অজয়। সে একদিন ছিল—যেদিন গুটিকয়েক মাত্র প্রাণী বেরিয়েছিল এই পথে—নিজেরা সন্ন্যাসী সেজে—সারাটা জীবন ধ'রে সাধনা ক'রে এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। সে আজ কয়েক যুগের কথা। মস্ত বড় অলিখিত ইতিহাস আছে তার—তাঁদের কথা স্মরণ ক'রে সব সময়েই আমরা মাথা নত করবো। কিন্তু ভাই এ পথ তো সন্ন্যাসীর পথ নয়—স্বাধীনতার কথা—ডালভাতের কথা। —দেশের যে সংসারী শত সহস্র নরনারী শোষণে ও পীড়নে প্রতিদিন পশুর অধম জীবন যাপন করছে তাদের কথা। তাই আজ এদের দুঃখ দূর করতে হ'লে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দিকে তাকালে চলবে না। যারা সংসারী তারাই করবে বিপ্লব—গাইবে মুক্ত মানবের সাম্যের জয়গান! তোমাদেরও সংসারী হ'তে হবে। আগামী সোমবার দিন রাত দশটার লগ্নে তোমাদের বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক করে ফেলেছি। অমত কিন্তু করতে পারবে না দিদি। অপর্ণা কোন কথার জবাব না দিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বিমলদা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—কথা কিন্তু আমার এখনও শেষ হয়নি বোন—আজ আমি তোমাদের নানা অদ্ভুত প্রস্তাব এনে বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করবো। বিয়ের পরেই তোমাদের দুজনকেই এদেশ ছেড়ে যেতে হ'বে—সঙ্গে যাব আমি নিজে।

অজয় প্রশ্ন করিল—কোথায় যেতে হ'বে?

—প্রথমে মণিপুর হ'য়ে চিন্দুইন নদীর তীর ধরে চীনে—তারপর সেখান থেকে রাশিয়ায়।

অজয় পুনরায় প্রশ্ন করিল—এমনি করে স্বদেশ ছেড়ে যাওয়াই কি উচিত হ'বে বিমলদা।

—হাঁ হ'বে। শুধু বৃটিশ গভর্নমেন্টের জেলে পচার চেয়ে এতে অনেক কাজ হ'বে অজয়। বিদেশে নিজেদের দেশ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে প্রচারের দরকার আছে—তা'ছাড়া আরও নানা প্রয়োজনের কথা সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে।

বিমলদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—তাহ'লে এবার চলি বোন। কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে হাঁ কি না একটা কথাও তো শুনতে পেলাম না।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আজ কি আবার নূতন করে বলতে হ'বে দাদা—আমার নিজের সব ভার তো অনেক দিনই আপনার উপরেই ছেড়ে দিয়েছি। আমার হাঁ কি নার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হ'বে কেন?

বিমলদা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু দিদি—এ বিয়ের সম্বন্ধ যদি ভেঙ্গে দিয়ে—আবার ঐ পাড়ার শ্রীধর চাটুজ্যের ছেলের সঙ্গে করি—কেমন রাজি আছ তো?

অপর্ণা হাসিয়া মুখ ফিরাইল। বিমলদা চলিয়া যাইবার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া অপর্ণা অজয়ের কোলের ভিতরে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল। অজয় তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছিল—মনে কোন দ্বিধা রেখো না অপর্ণা—দৃষ্টি যদি থাকে—আমাদের উদার সাহসে যদি থাকতে পারি দুর্জয়—আত্মসুখের কল্পনায় যদি না আমরা বিভোর হ'য়ে যাই—প্রেমের বন্ধন আমাদের নীচে নামিয়ে আনবে না বরং ঊর্ধ্বেই তুলে ধরবে। তোমার দাদা সমীর সেন যদি স্বর্গে থেকে দেখতে পান—দেখে সুখীই হবেন অপর্ণা! আজ যদি আমরা দুজনে বলতে পারি—

"উড়াব ঊর্দ্ধে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাবো
চাই না শান্তি সান্ত্বনা নাহি চাবো।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ আমি আছি।"

তবেই আমাদের প্রেম সার্থক হ'বে।

কাছাকাছি একটি বাড়িতে বিবাহের আয়োজন হইয়াছে। বাহিরে বাজিতেছিল—রশনচৌকী—আলোকমালায় বাড়িটি অত্যুজ্জ্বল করা হইয়াছিল। বিমলদার কিন্তু সাবধানতার অন্ত ছিল না—এক জোড়া নকল বর কনে পূর্ব হইতেই সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে অজয় ও অপর্ণাকে লইয়া বিমলদা নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মত উপরে উঠিয়া গেলেন। ঘরে বসিয়া কল্যাণী দেবী বরণডালা সাজাইতেছিলেন—অজয় অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—একি মা! তুমি এখানে। বলিয়া মায়ের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। কল্যাণী দেবী তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া অপর্ণার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—একা তোকে আদর করলেতো চলবে না অজু—এস মা আমার কাছে এসো—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! অপর্ণা প্রণাম করিয়া তাঁহার কোলের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী দেবী পিছনের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন—ওকে তোরা প্রণাম কর আর অজু। অজয় পিছন ফিরিয়া দেখে—তাহার বাবা। আজিও সেদিনের মত টেবিলের পাশে চেয়ারে বসিয়া আছেন—হাতে তাঁহার কি একটা বই—কিন্তু তিনি নির্নিমেষ নয়নে তাহাদের দিকেই তাকাইয়া আছেন। অজয় তাঁহার দিকে আগাইয়া গিয়া ডাকিল—বাবা! অসিত আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতেই অপর্ণা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি অপর্ণা ও অজয়কে দুই বাহুপাশে জড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুই চোখ দিয়া তাঁহার ঝর ঝর করিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে কিছুটা সামলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—এত বড় সুখের কল্পনা তো কোনদিন করিনি অজু—তোদের আমি এমনি ক'রে পাব! পঁচিশ বছর শেষ হ'তে যে আরও অনেক বাকী! পরে অপর্ণার মাথায় হাত রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—তোমাকে আমি কি ব'লে আশীর্বাদ করবো অপর্ণা। আমার ভাব নাই—ভাষা নাই—দীর্ঘদিন সমাজ সভ্যতার বাইরে কাটিয়ে যে সব হারিয়ে ফেলেছি মা! যথাসময়ে পুরোহিত আসিলেন—যথারীতি বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল।

রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। এখন বিদায়ের পালা। আজই স্বদেশ ছাড়িয়া যাত্রা করিতে হইবে। বিমলদা দ্বারের বাহিরে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঘরের ভিতরে অসিত, কল্যাণী দেবী, অজয় ও অপর্ণা। কল্যাণী দেবীর দুই চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। অসিত পুনরায় অজয় ও অপর্ণাকে দুই বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—বিচ্ছেদকে আমি দুঃখ ব'লে মানবো না অজয়। দুঃখ আমি অনেক সয়েছি—আরও হয়তো অনেক সইবো। তোমাদের আশীর্বাদ করি, তোমরা দুঃখ সহ্য করতে শেখো—পথ তোমাদের সুগম হোক্—উদ্দেশ্য তোমাদের সিদ্ধ হোক্। অজয় ও অপর্ণা পুনরায় তাঁহার পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পনর দিন পরে—ইম্ফল হইতে প্রায় মাইল পঞ্চাশ দূরে চিন্দুইন নদীর তীর ধরিয়া চলিয়াছে তিনটি প্রাণী। বিমলদা আগে আগে মধ্যে অপর্ণা পিছনে অজয়। বিমলদা ও অজয় কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়াছেন—চায়ের ফ্লাস্ক—জলের পাত্র আর কিছু খাদ্য—কোমরে আছে এক জোড়া করিয়া পিস্তল। অসমান পাহাড়ী রাস্তা—বামে অতলস্পর্শী গহ্বর—দক্ষিণে পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমশ উঁচু হইয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া অনন্তকাল দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার কোথাও চড়াই—কোথাও উৎরাই—উঠিতে ও নামিতে পা একেবারে ধরিয়া যায়। এমনি রাস্তা ধরিয়াই প্রতিদিন তাহাদিগকে অন্ততপক্ষে কুড়ি পঁচিশ মাইল করিয়া হাঁটিতে হইবে। গত রাত্রে মাইল পাঁচেক দূরে এক পাহাড়ীয়া পরিবারে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল—আজ আরও কুড়ি মাইল অতিক্রম করিলে তবে আর একটি আশ্রয় মিলিবার সম্ভাবনা আছে।—পথের ভিতরে অন্য কোথাও আর আশ্রয় মিলিবে না। বেলা বোধ করি গোটা নয়েক হইবে। সোনালী সূর্যের আলোয় সারা পাহাড় ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা, মাঝে মাঝে দুই একটা কি জাতীয় পাখী যেন বিচিত্রসুরে ডাকিয়া উঠিতেছে—দুই একটি অজানা ফুলের গন্ধ আসিতেছে ভাসিয়া। বিমলদা চলিতে চলিতে গাহিয়া উঠিলেন

—"বল্ ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ঐ এল ঐ—
এল ঐ মুক্ত যুগান্তর......।"

সেই সংগীত পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া—প্রতিকথা শতকথা হইয়া বাজিতে লাগিল।

—সমাপ্ত—

"খট্ খট্ দুম্ পটাশ্—"

শব্দটা রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে কানে যেতেই সুনীতি চমকে ওঠে! কিসের ঘোরে বিছানায় উঠে বসে। পাশেই বৃদ্ধ বাবা বাধা দিয়ে ওঠেন। বিনিদ্র রজনীর প্রহরী তিনি, প্রায় তিন চার মাস হতে সুনীতির অসুখের পর হতেই তাঁকে বসে থাকতে হয়। দুর্বল জীর্ণ দেহখানার বেড়া পার হয়ে কবে ফাঁকি দিয়ে চলে যায় সুনীতি,—সবাই গেছে। আপন বলতে ওইটুকুই বাকী! তাই এত প্রচেষ্টা তাঁর।

ধরে রাখা যায় না সুনীতিকে, শীর্ণ হাড়গুলো যেন লোহার মত শক্ত হয়ে ওঠে। স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। রাত্রির তমিস্রা ভেদ করে কানে আসে কাদের কোলাহল। ম্লান লণ্ঠনের লালাভ আলো। বাঁশের গেরো ফাটার মত শব্দ 'খট্-খটাস্' সবকিছু মিলিয়ে যেন সুনীতির চোখের সামনে ফুটে ওঠে কয়েক বৎসর আগেকার এমনি রাত্রির কথাগুলো—!

তারা—তারা সবাই ছিল তখন! এমনিই দিনের কথা। সেদিন মাঠে সবে দেখা দিয়েছিল ছোট্ট ছোট্ট ধানের সবুজ সমারোহ। গ্রামশীর্ষে ধূসর বর্ণক্রান্ত আকাশের পরিক্রমা। এমনি ভেজা সোনালী মিষ্টি রোদের লুকোচুরি খালিয়াড়ির বাজবরণ বনে!

কত রাত্রি—কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে এমনিভাবে! দূরে ভাঙ্গা সাঁকোর পাঠান আমলের বাংলা ইট-পাথরের স্তূপ—মেঘেঢাকা এক ফালি চাঁদের আলোয় যেন কোন বিভীষিকার স্বপন আনে! জনশূন্য রাস্তাটার পাশে টেলিগ্রাফের তারগুলো পড়ে আছে পাক দিয়ে কুণ্ডলীর সৃষ্টি করে, খেলাঘরের খেলনার মত শক্ত টেলিগ্রাফ পোস্টটা দুমড়ে বেঁকান!

প্রবীরকে চাঁদের আলোয় সত্যিই লাগে কোন বিজয়ী বীরের মত। দৃঢ় সবল পাদ-বিক্ষেপে চলেছে আলিপথ বেয়ে, মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দূর দিগন্ত পানে, কোথাও বা লাল আভার রক্তিম রাগ, কোথাও কানে আসে কাদের সম্মিলিত কণ্ঠের উদাত্ত কণ্ঠস্বর—'বন্দে মাতরম্'—আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে কানে আসে দূর দিগন্ত হতে!... চলতি পথের পথিকদের লাগে শিহরণ।

"পা চালিয়ে এস সুনীতি, ভোর হয়ে আসতে আর দেরী নাই!"

পিঠের বোঝাটিকে কোন রকমে আরও টান করে শাড়ীখানা গাছকোমর বেঁধে নিয়ে গতি-বেগ বাড়াল সুনীতি! বেশ লাগে! অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় কোন অজানা পথে যাত্রা! মাথার উপর তারার রোশনী,...মনের কলহংস যেন সাড়া দিয়ে ওঠে নিজের আত্মাতেই। বেশ রাত্রি, কেমন অস্পষ্ট চাঁদের আলো, সারা মন—

বাধা দিয়ে ওঠে প্রবীর—কাব্যি করবার জন্য বাড়ি ছেড়ে আসনি! ধরা পড়লে বাড়ি নয়, একেবারে মেদিনীপুরে খাস সদর শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে—"

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে কানে আসে কিসের খস্ খস্ শব্দ! সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে চারিদিক দেখতে থাকে প্রবীর। কিসের যেন সন্ধান পেয়েছে!...হঠাৎ একটু পাশেই একটা গাছের মাথায় টর্চের সন্ধানী আলোর একটা ঝলক পড়তেই চমকে ওঠে প্রবীর। কানে আসে কাদের বিদেশী কণ্ঠে গানের সুর—

"প্রবীর দা—?"

'স...স...' নীরবে প্রবীর সুনীতির হাতটা ধরে বাধা দেয়। ওরা এগিয়ে আসছে। ডান হাতে প্রবীরের দৃঢ়ভাবে ধরা রয়েছে কি একটা পদার্থ!...কালো ব্যারেলটা একবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে—

মিলিটারী ধরা পড়ে যাবে তারা, তারপর চলবে অসহ্য অত্যাচার। দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে চাবুক মারা হবে! না হয় বিশাল বরফের স্লাবের উপর শুইয়ে বাঁশ দিয়ে টিপে ধরে থাকা হবে!

হোক তাতে ক্ষতি নাই! কিন্তু এ সময় তাদের যাওয়া চলবে না! কত কায—! সারা দেশের যে প্রধূমিত বহ্নি তাতে পূর্ণাহুতি আজও বাকী আছে। তারাই হবে সেই মহা-যজ্ঞের ঋত্বিক!

সুনীতিকে টানতে টানতে নিয়ে এসে প্রবীর পাশের এঁদো পুকুরের মাঝেই নামল! বিন্দুমাত্র শব্দ না করে ঘন পটপটি দামের মধ্যে গলা ডুবিয়ে ফেলল। ফিস ফিস করে বলে—'নাক দিয়ে নয়, মুখ দিয়ে নিশ্বাস ফেল, নইলে শব্দ শুনতে পাবে ওরা!'

কঠিন বুটের শব্দ রাতের আঁধারে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে। এখানে ওখানে পুকুরের জলে সন্ধানী টর্চের আলো! সুনীতি চেয়ে থাকে প্রবীরের দিকে। কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রবীরের নাই! এই মুহূর্তেই কোন এক দমদম বুলেট ওর লাংস এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে, না হয় প্রাণেও যদি বাঁচে—দিনকয়েক পরই ফাঁসির দড়ি হতে বাঁচবে না! তবুও কোন চাঞ্চল্য ওর নেই।

কঠিন হাতে সুনীতির বাঁহাতটা ধরে তার দিকে চেয়ে থাকে, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ কষ্টকে জয় করবার অমলিন হাসির আভা ওর সারা মুখে!

কাদামাখা মূর্তি—জলে ভিজে কেঁদকাটির জঙ্গলে তারা যখন পেঁ'ছল সোনালী রোদে শালগাছগুলো ঝলমল করছে! সবুজ—আটারি কেলেকোঁড়ার লকলকে লতাগুলো ফিকে সবুজ রং-এ চিকমিক করছে! সনৎ অমিয় দেবু নমি আরও অনেকেই এগিয়ে আসে ছোট ঘরগুলো হতে!...নীচু সোলের মধ্যে বনগড়ানী খুলের ধারে ঘরগুলো!...বাতাসে পত পত করে নড়ছে তেরঙ্গা নিশানটা। ক্লান্তিতে সারা শরীর ছেয়ে আসে সুনীতির। কৈ—দামপচা গন্ধে সারা গা ঘিন্ ঘিন্ করছে।

প্রথম প্রথম আবহাওয়াটা একটু বিচিত্র লাগে সুনীতির। প্রায় সকলকেই এদের জানে! মেদিনীপুর কলেজের নলিনী—কাঁথির কবি প্রশান্ত, ফাজিল অমিয়—মায় সাম্যবাদী সনৎকে পর্যন্ত! আজ যেন তাদের আরও ভাল করে চেনে! প্রায়ই কাঁসাই নদীর ধারে পলাশবনে বসত তাদের আড্ডা! রাত্রির আঁধারে দূরে খড়গপুরের লোকো ওয়ার্কসে জ্বলে উঠত আলোগুলো,—নদীর দীর্ঘ ব্রিজটার উপর দিয়ে গম্ গম্ করতে করতে ফিরত কোলকাতা লোক্যাল!

একে একে বিভিন্ন পথে এসে জমায়েত হ'ত তারা! প্রতিদিনের সংবাদ আসত, দূর দূরান্তের সংবাদ! ভারতের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত অবধি কোন অসন্তোষের ধূমায়িত বহ্নি!...শতাব্দী ব্যাপী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের যে অভিনয় চলে আসছে—আজ এখনও সেই পুনরভিনয়!

সকালেই বিজয়দা আত্মগোপন করলেন! পুলিশের হাতে যেতে দেরী ছিল না তাই!... মনে পড়ে সুনীতির বিজয়দাকে! শীর্ণ চেহারা, উস্কোখুস্কো একমাথা চুল। চোখদুটো অস্বাভাবিক রকম বড়। সেদিন সন্ধ্যায় কাঁসাই-এর জলে কোন নাম না-জানা তারার ঝিকিমিকি। বিয়াঘাসের বনে কোন ভীরু শশক দম্পতির পলায়নের কাহিনী বলেছিলেন বিজয়দা—'আর হয়ত কিছুদিন দেখা হবে না, ...তোরা যেন এগোতে থামিস না!'

হাতের কাগজের তাড়াটি প্রবীরকে দিয়ে যান! কালই চলে যাবেন হাঁটাপথে তমলুক—

মহিষাদল—ঘাটালের দিকে। সকলের দেখাদেখি সুনীতিও নমস্কার করে তাকে। মাথা তুলতেই দেখে সুনীতি, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বিজয়দা তার দিকে। এগিয়ে আসে প্রবীর—"আমারই গ্রামের মেয়ে সুনীতি, থার্ড ইয়ারে পড়ে!"

নীরবে চলে যান বিজয়দা। নীচু পলাশগুলির জঙ্গল দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বিজয়দার সে তীক্ষ্ণ চাহনি ভুলতে পারে নি সুনীতি।...

বড্ড এখানে বাড়ির জন্য মন কেমন করে। বেশী করে ছোট ভাই সুশীলের জন্য। তাকে ফেলে রেখেই চলে এসেছে সে! কয়েকদিন প্রবীরকে তাদের বাড়ি যাতায়াত করতে দেখে সেও যেন কি অনুভব করেছিল একটু। আসবার জন্য তার কত ব্যগ্রতা! তাকে—এতটুকু ছেলেকে কি কাজে নিয়ে আসবে এই কঠোর জীবন যুদ্ধে!

বাড়িতে সুনীলের মন বসে না। দিদি নাই, সারা বাড়িটা যেন শূন্য ফাঁকা!

ফুটবল ম্যাচেও আজ মন দিতে পারে না! পায়ে বল এলে অন্যদিন সুনীলকে ধরে রাখা দায়!...ছোট্ট ছেলে, কিন্তু সারা মাঠে যেন তারই রাজত্ব! পা—মাথা দুটোই সমান চলে...

আজ পায়ে বল এলেও কেমন যেন আটকে যায়। ধমকে ওঠে দীপুদাঃ "ব্যাক হতে বল বার করে দিচ্ছি—একটাও সেণ্টার কর—তা নয়—"

সুনীলের মনটা কোন দিকে চলে গেছে জানে না সে!

টাউন কংগ্রেস অফিসের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখে সুনীল কিসের জনতা। পুলিশ বাড়িটার চারি পাশ ঘিরে সার্চ করছে। কয়েকজন ছেলেকে টেনে বার করে এনে তারের ঘেরা দেওয়া গাড়িখানায় তুলল! তারা চীৎকার করে ওঠে 'বন্দে মাতরম্'।

জনতাও সাড়া দেয় আবেগ ভরে দিক্-বিদিক্ প্রকম্পিত করে। দেখতে দেখতে চারিদিকে জমে যায় আশেপাশের লোক, তাদের চীৎকার ক্রমশ বেড়ে যায়, পুলিশবাহিনী জনতার মধ্যে আটকে পড়েছে। এগিয়ে চলল বিহ্বল জনতা! কাদের চীৎকারে সকলেই উন্মত্ত হয়ে যায়। পিছন হতে নোতুন পুলিশবাহিনী লাঠি চার্জ করছে। কারও কোনদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। আর্তনাদে ভরে ওঠে জায়গাটা।

চারিদিকে চলেছে কেমন যেন ছন্নছাড়া কোন ধ্বংসদেবতার কলরোল! দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ জনতাকে ঘিরে ফেলে পুলিশ, আরও কয়েকটা ভ্যানে যাকে সামনে পায় তাকেই ধরে ধরে তুলতে থাকে! কে যেন তেরঙ্গা নিশানটা ছাড়তে চায় না! উঁচু করে ধরে কঠিন হাতে।...

ভিড়ের মধ্য হতে পতাকাটা নিয়ে বার হয়ে আসতে চেষ্টা করে সুনীল! তারই হাতে ওই কংগ্রেস অফিসের পতাকাটা। তার জাতির—দেশের প্রতীক। কঠিনভাবে তার হাত হতে কে যেন কেড়ে নেবার চেষ্টা করেও পারে না। প্রাণপণে ধরে থাকে সুনীল।

কপালের পাশে কিসের একটা আঘাত পেতেই সারা দেহটা যেন ঝিমঝিম করে ওঠে! পা দুটো টলছে। তবুও বিরাম নাই। জনতার কোলাহলে সেও কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি তোলে—"ইনকিলাব জিন্দাবাদ!"

আর চলতে পারে না! একটা লাঠির আঘাত হাতে লাগতেই দূরে ছিটকে পড়ে পতাকাটা। হাতের হাড়খানা ঝন্ ঝন্ করে ওঠে! তার মুখে ফুটে ওঠে অস্ফুট আর্তনাদ। পারল না সে পতাকাটা উঁচু করে রাখতে!

সামনের মোটা চশমা পরা বিশালকায় দারোগাই পতাকাটা তুলে নিয়ে দু টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়—তাকে অবলীলাক্রমে বাঁহাতে করে তুলে ছুড়ে দিল খোলা ভ্যানের মধ্যে! আর্তনাদ করে ওঠে সুনীল—!

তার কপালের পাশে জমে উঠছে খানিকটা তাজা রক্ত! বাঁহাতটা ফুলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

তবু চীৎকারের বিরাম নাই।

বাড়ি যখন ফিরল সে রাত্রি বোধ হয় দুটো বেজে গেছে। নির্জন রাস্তাটা দিয়ে একলা হেঁটে যেতে গা ছম্ ছম্ করে। সারা শরীর যেন ক্লান্তিতে ছেয়ে আসছে। গায়ে অসম্ভব ব্যথা! বাঁহাতটা তোলা যায় না, কপালের রক্ত কালো হয়ে জমে গেছে!...

থানাতে জায়গা নেই। জেলেও বেশী লোক ধরে না। সুতরাং বেশ করে ঘা কতক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে কয়েকজন ছেলেকে। ধীরে ধীরে বাড়ীর দরজায় যখন পেঁৗছল সুনীলের বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে।

মা-বাবা কি বলবেন। দিদিও দুদিন হল চলে গেছে বাড়ি হতে। আজ মায়ের সামনে দাঁড়াতে সাহস হয় না তার।

বাবা সবেমাত্র খোঁজাখুঁজি করে হয়রাণ হয়ে ফিরেছেন। মা ফুলছেন রাগে, এমন সময় চুপে চুপে চোরের মত বাড়ী ঢুকতে দেখে মা এগিয়ে আসেন। বাবাও ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে চীৎকার করে তাকে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে পোরেন—"স্বদেশী করতে গিয়েছিলেন, হতভাগা কোথাকার। থাক এইখানে বন্ধ। কতদিন থাকতে পারিস দেখব।"

দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে যান বার হতে। রুদ্ধ দ্বার ঘরের মধ্যে ফুঁসতে থাকে সুনীল। খিদেতে নাড়িভুঁড়িগুলো পাক দিচ্ছে। কেমন করে তাকে বন্ধ করে রাখতে পারে সে দেখবে এবার। জানলার গরাদগুলো নিবিষ্ট মনে দেখতে থাকে।

কেঁদকাটির বনের সুঁড়ি পথ দিয়ে একজন ভলেণ্টিয়ারের সঙ্গে ছোটকাকে আসতে দেখে অবাক হয়ে যায় সুনীতি। এ কি! চোখকে সে অবিশ্বাস করতে পারে না, সত্যিই ত সুনীল। জানলা ভেঙ্গে পালিয়ে এসেছে।

প্রবীরও এসে উপস্থিত হয়। সুনীলের কপালের কাটাটা একটুও কমেনি। তার বাঁ-হাতটা প্রবীর একটা রুমাল দিয়ে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে পিঠ চাপড়ে দেয়। কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে চলেছে সুনীল—"মার্ধাতে মারতেও ছাড়িনি, হাতে মারতেই পড়ে গেল পতাকাটা, কালো মোটা মতন লোকটাই ত ছিঁড়ে ফেলল—নইলে—"

হাসে প্রবীর—"বাড়ী যাবে না?"

—"না।"

তার দিকে চেয়ে বলে সুনীতি—"ও-ফিরে যাবে না।"

সুনীল এগিয়ে আসে দিদির দিকে! চোখে মুখে কেমন একটা আশার আলো। সকালের রোদ ওর রক্তে রঞ্জিত ললাটে দু একগাছি চুলে যেন ঝিলিমিলি এঁকে যায়। ওর শিশু চোখে আজ কোন মহাবিশ্বের আলো-ছায়ার জাল বোনা। কত আশার সংকেত!

রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাসে যেন সুনীতির জ্ঞান ফিরে আসে। বাবা ধরে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেন। অদূরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দাঁড়িয়ে মা। ম্লান আলোয় ঘরের মধ্যে যেন আবার শান্তি ফিরে আসে। অনুভব করে সুনীতি অসুখের ঘোরে সে যেন স্বপ্ন দেখছিল।

থানার কাঁঠাল গাছের মাথায় কারা যেন উঠেছে। ও-পাশে কয়েকজন ছেলে বাখারির ওপর ন্যাকড়া লাগিয়ে রং করতে ব্যস্ত। কেউ কেউ নিমপাতাগুলো—দেবদারু পাতার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে চলেছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলের দল সুতলীর গায়ে ছোট ছোট পতাকা আঠা দিয়ে জুড়তে ব্যস্ত। আজ রাতে কারুর ঘুম নাই। সবাই যেন কি এক নেশার ঘোরে মত্ত। থানার কনস্টেবলগুলো সবুট পায়ে ছন্দবদ্ধভাবে রাতের আঁধারে শব্দ তোলে না।

কিন্তু এই ত সেদিন.........

না—না—না! ভুলতে পারে না সুনীতি। বার বার বিনিদ্র রজনীতেই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাদেরই কথা। হারাণ, প্রবীরদা, সুনীল, দেবু, সনৎ—তাদের কাউকেই সে ভুলতে পারেনি। মনের পরতে পরতে গাঁথা রয়েছে তাদের কাহিনী—সেই নানা রংএর দিনের মায়াঞ্জন চোখ তার ভরিয়ে রেখেছে।

বনের মাঝে সব খবরই পেঁৗছে। চারি পাশে দূরে দূরান্তরের গ্রামে লেগেছে সর্বহারার অভিশাপ! প্রবীর উঁচু পাথরের টিলাটার উপর বসে কিসের আলোচনা করতে ব্যস্ত। একটা কনভয় আজই পাশ করবে সমুদ্রের দিকে তাহলেই সৈন্যদল তাদের অনেক স্বেচ্ছাসেবব

ঘাঁটিকে জখম করতে পারবে। যেমন করে হোক তাদের বাধা দিতেই হবে!

তাদের ঘাঁটিতে বেশ একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়। কে কে যাবে এ্যাকশেনে—! যারাই প্রথম এই অভিযানে যোগ দেবার সৌভাগ্য পাবে—তারাই ভাগ্যবান নিঃসন্দেহ। সকলেই সুনীলের কথায় হাসি চাপবার চেষ্টা করে!

—আমি যাব!

প্রবীরকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে আর সকলেই হাসি চেপে যায়, বলে প্রবীর—

—"আগে হাত শক্ত কর, পতাকা যখন কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না—তখনই যাবে এ্যাক্‌শেনে!"

নীরবে মলিন মুখে সরে গেল সুনীল। যথারীতি আর আর নাম ঠিক হয়ে গেল! যাবার আয়োজন করতে থাকে তারা। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যাত্রা করল তারা! ক'জন ওদের ফিরবে জানে না। হয়ত বা বুলেটের ঘায়েই সবাই মাটি রাঙিয়ে দিয়ে যাবে, না হয় আহত হয়ে হাসপাতালে—সেখান হতে কারাগারের অন্তরালে দিন গুণবে! গুণুক—সে ভয় ওদের নাই।

সারা রাত্রি ধরে সুনীতি থামাতে পারে না সুনীলকে। খায়নি কিছুই! কপালের ঘা-টাতে পুঁজ হয়েছে, গরম জল দিয়ে ধুইয়ে দিতে গেলে হাতটা অভিমান ভরে সরিয়ে দেয়, "হোক পুঁজ! তোমার কি তাতে?"

ঘুমের ঘোরেও মাঝে মাঝে শোনা যায় তার ফোঁপানিঃ হাত ভেঙে গেল তাই, নইলে সে কক্‌খনো পতাকা ছাড়ত না! কক্‌খনো না!"

গ্রামের লোক সচকিত হয়ে ওঠে গুলীর শব্দে! রাত্রির অন্ধকারে রুদ্ধ দ্বারকক্ষে তারা বসে থাকে গুঁড়িসুড়ি মেরে, মাঝে মাঝে দু'একটা বুলেট এসে মাটির দেওয়ালে বিদ্ধ হয়ে যায়! চোখ বুজে গুলী চালাচ্ছে সৈন্যদল। গাড়ীগুলো তীরবেগে বার হয়ে গেল, গ্রামের বাইরের ডাঙ্গায় কয়েকটা বড় বড় লরী দাউ দাউ করে জ্বলছে। রাতের অন্ধকারে সমস্ত জায়গাটা পরিণত হয়েছে একটা যুদ্ধক্ষেত্রে। দু'একটা ছোট ছোট লরী ব্যাক করে নিয়ে পালাল! থামবার সাহস নাই। এতবড় বীর হয়েই ওরা সাগর পার হয়ে এসেছে দেশ অধিকার করতে!

ছেলেদের কোলাহল—জয়ধ্বনিতে গ্রামের লোক সকলেই বার হয়ে আসে।

অন্ধকারে আবার সব মিলিয়ে গেল। নেমে এল গ্রামের বুকে নিথর নীরবতা। লরীগুলো তখনও জ্বলছে! ভোর হয়ে আসতে দেরী নাই।

ক্রমশ কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে সরকারী মহলে—স্বেচ্ছাসেবকরাই কালকের রাত্রিতে আক্রমণ চালিয়েছে। ক্ষতিও করেছে প্রচুর। মেদিনীপুর হিজলী কোয়ার্টার্স হতে আমদানী হল নূতন সৈন্যদল! পুলিশের গাড়ীও এগিয়ে এল। ডাঙ্গার উপর হতে লোকজন তখনও কালকের রাতের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ফেলতে পারেনি!

গাড়ী চলবার পথ আর নাই। সৈন্যদল হানা দিল গ্রাম গ্রামান্তরে হাঁটা পথেই! কোথায় সেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী! এত ক্ষতি তারা নীরবে সহ্য করবে না কিছুতেই! যেমন করে হোক তার প্রতিবিধান করতেই হবে!

স্ত্রী-পুরুষ বৃদ্ধ সকলকেই জেরা করেও কিছু বার করতে পারে না। গ্রামে সৈন্যদের অত্যাচারের সংবাদ পেয়েই বৃদ্ধ নিবারণ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ওঠে! একমাত্র সন্তান তাকেও সে বাড়ী হতে বিদায় দিয়েছে, কোন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে গেছে সে, নিবারণ জানে না। তার আ-জীবনের সঞ্চয় সবই কি তুলে দেবে ওই নরপশুদের হাতে! না, কিছুতেই না! কি যেন ভাবতে থাকে!

বাইরে, রুদ্ধ দরজায় কাদের পদাঘাত শুনেই চমকে ওঠে! দরজাটা আর সইতে পারে না তাদের প্রবল অত্যাচার। জীবনের সমস্ত সঞ্চয়—তার দেহের রক্ত বিন্দুর মত এই সম্পদ—সে ত্যাগ করে যেতে পারবে না কিছুতেই! পিছনকার দরজা দিয়ে বার হয়ে যায়,—যদি পালাতে পারে!

বাইরের দরজাটা সশব্দে ভেঙে পড়ে। মদমত্ত গৌরবে প্রবেশ করে সৈন্যদল। ঘরের কেউ কোথাও নেই। মেজের মধ্যে বিশাল একটা গর্ত; অনেক কিছুই সন্দেহের দেখা যায়। সহসা দূরে পলাশ ঝোপের আড়ালে কাকে বেগে প্রবেশ করতে দেখেই ছুটে যায় দু'একজন।

রাইফেলের বুভুক্ষু নলটা গর্জন করে ওঠে! নীলাভ ধোঁয়ায় সামনেটা ভরে যায়! পর পর চলে কয়েকটা গুলী বনের দিকে!

নিবারণ ছুটে চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে! যেমন করেই হোক তাকে পালাতে হবে। জীবনের বহু কষ্টোপার্জিত সম্পদ সে এদের হাতে তুলে দিতে পারবে না, পিঠের দিকের জামাটা ভিজে গেছে। সারা দেহে অসহ্য জ্বালা, জিবটা শুকিয়ে আসছে তৃষ্ণায়! পা দুটো চলতে চাইছে না! চোখের সামনে কেমন যেন নীলাভ আকাশে অসংখ্য কালো কালো ঘূর্ণায়মান দাগ।

কেঁদকাটির জঙ্গলে যখন তাকে নিয়ে পোঁছল—কথা কইবার ক্ষমতা তার নাই। কোন রকমে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পিঠের দিকটা কালো জমাট রক্তে ভরে গেছে। সুনীতি-প্রবীর-সুনীল আরও সকলে দাঁড়িয়ে থাকে। জলও তার মুখে গেল না। বুক ভরা হাহাকার নিয়ে সে বিদায় নিল পৃথিবী হতে! তবুও দু' চোখে তার তৃপ্তির আভা—মরবার আগে নিবারণ তার সমস্ত সঞ্চয় তুলে দিয়ে গেল এদেরই হাতে—যারা জীবন পণ করে এগিয়ে এসেছে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল উন্মোচন করতে!

ওদের সাধনা সার্থক হোক!

এমন একটা নিবারণ নয়! কত শত লোক কত গ্রাম গ্রামান্তরের উপর সৈন্যবাহিনী অত্যাচার চালাচ্ছে যথেচ্ছভাবে! রাতের অন্ধকারে তারা রোজই দেখতে পায় দূরে কোন গ্রামশীর্ষে আগুনের লেলিহান শিখা, কাদের করুণ কাতর আর্তনাদ।

ঘরে ঘরে স্বেচ্ছাসেবকদের সন্ধান করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তারা নিঃশেষ করছে, টিন টিন পেট্রোল তারপরই দেশলাই সংযোগ। স্তম্ভিত হয়ে শোনে তারা!...প্রবীরের চোখ দুটো মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে!

দুদিন বাইরে হতে খাবার আসবার সুযোগ ঘটেনি। বনের সামনেই রাস্তাটায় সর্বদাই সৈন্য বাহিনী সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। কোন রকমে পাথর কাটা ঘোলা জল খেয়েই দিন কাটাচ্ছে! সেদিন কয়েকটা আম পাওয়া যেতেই বেশ যেন একটু আনন্দ দেখা দেয় সকলের মধ্যে! প্রবীর ভাগ করতে বসে!

একটা করে আম দুদিনের খিদের কাছে নস্যাৎ হয়ে গেল! তবু বাকী কয়েকটা আমের হিসাব মেলে না! এত বড় ধৃষ্টতা অমার্জনীয়, সুনীতি এটাকে ক্ষমার চোখে দেখে না।

'ডিসিপ্লিন' মানতেই হবে বিপ্লবীদের! সকলকে fall in করিয়ে প্রশ্ন করতেই, এগিয়ে আসে সুনীল—ছোট ছেলেটি নির্ভীক কণ্ঠে বলে—

"যে খিদে পেয়েছিল—তাই ওদুটোকেও খেয়ে ফেলেছিলাম আমি।"

অন্য সকলেই হেসে ফেলে তার স্বীকারোক্তিতে! প্রবীর এগিয়ে গিয়ে তার কানটা ধরে বার কতক নাড়া দিয়ে ছেড়ে দেয়—"যাও, আর কখনো এমন করো না।"

নীরবে অশ্রুপূর্ণ চোখে সরে গেল সুনীলঃ

সুনীতির চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট ভাই, কি কষ্টে দিনের পর দিন না খেয়ে কাটাচ্ছে। তার ডাগর চোখ দুটোতে কিযেন অজানা দীপ্তি। কেন, কেন ও এই কষ্টের মধ্যে এল! পিছন হতে কাঁধের উপর কাকে হাত রাখতে দেখেই চমকে পিছনে ফিরে চায়। প্রবীর বলে ওঠে

"রাগ করো না 'সু', ডিসিপ্লিন আমাদের চাই-ই। ভাল আমি ওদের কম বাসি না, তবুও কঠিন হতে হয়!"

বনের ওদিকে দেখা যায় খিন্ন পাংশু জনতা। অত্যাচার জর্জরিত হয়ে এগিয়ে চলেছে সহরের পানে, মৃত্যুর অভিসারে। সামনের রাস্তাটা ট্রাকের গতিবেগে শব্দমুখর হয়ে ওঠে! গম গম ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে

লোহার গার্ডারগুলো। সাঁকোটার নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে বনগড়ানী জলধারা ক্ষুদ্র নদীর আকার নিয়ে।

শাবলপুর — আকন্দা — তিনগাঁ — ওসব অঞ্চলে আর কোন বসবাসই নাই। মাঠ হয়ে গেছে। গ্রামগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেবল পোড়া বাড়ীগুলো আর ধ্বসে পড়া বিদগ্ধ খড়ের চাল! সুনীতি—প্রবীর আরও সকলেই অনুভব করে কাদের জন্য ওই নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর এই অত্যাচার—সর্বহারার অভিশাপ! আজ বাবা-মা কোথায় জানে না সুনীতি, তার সেই স্বপ্নঘেরা গ্রাম—শান্ত গৃহাঙ্গন—শিউলী ঝরা আঙিনায় তার শিশুমনের কত আঁকা বাঁকা ছাপ, আর হয়ত দেখতে পাবে না তাদের!

কে জানে এর শেষ কোথায়? কি এর পরিণতি! আজ বড্ড ভাল লাগে সেই হারানো কৈশোরের কথাগুলো স্মরণে আনতে'

একি!

প্রবীরের ডাকে মুখ তুলে চায়। সুনীতির দুচোখে কখন যে অজ্ঞাতেই জল নেমেছিল জানে না! আজ এই সবহারান দিনে প্রবীরের এতটুকু স্পর্শে যেন সারা মন তার ভরে ওঠে! বলে চলেছে প্রবীর—

"মাঝে মাঝে এত ভেঙে পড় কেন? বাবা-মা কেউই হয়ত আর নাই! তবুও ভেঙে পড়ো না! জানত—নীলনদের ধারে যারা বাস করে, ঘরবাড়ী তাদের সর্বকিছু ভেসে যাক, লোক মরুক তবুও তারা সেই প্লাবনের কামনাই করে—তাদের পরে যারা বাস করবে সেই মৃত্তিকায় ফসলের প্রাচুর্য তাদের সবহারানর দুঃখ ভুলিয়ে দেবে।

"আজ আমাদের সব হারিয়ে যদি আগামী সেই শুভদিনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, আমাদের পর যারা আসবে তারা নোতুন মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে!"

প্রবীরের দিকে চেয়ে থাকে সুনীতি! রাতের আলোয় কি যেন ভাল লাগে আজ। ভাল লাগে নিস্তব্ধ মর্মরিত বনভূমিকে। ভাল লাগে আজকের এই সংগ্রাম, কোনদিন এর কোন প্রতিদান আসবে কি না জানে না তবুও এই জীবনকে শ্রদ্ধা করে—ভালবাসে সে!

...রাস্তাটার দিকে এগিয়ে চলেছে ছেলের দল! কান্দরটার কাছে গিয়ে কমাণ্ড হ'ল হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে সাঁকোর দিকে। বাইরের সংবাদ সরবরাহ স্বেচ্ছাসেবকরা খবর এনেছে উপদ্রুত অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে সৈন্যবাহিনী, যেমন করে হোক এ রাস্তাটাও ভেঙে দিতে হবে! ওদের প্রবেশাধিকার দেওয়া চলবে না এই এলাকায়। সুতাহাটার দিক হতে স্বেচ্ছাসেবকরা এসেছে একাযে সাহায্য করতে!

ছোট ছোট পদার্থগুলো অসম্ভব ভারি: কোনরকমে বয়ে নিয়ে চলেছে, গান কটন—নাইট্রোগ্লিসারিনও এসে পড়েছে!...সাঁকোটাকে জখম করে দেবার প্রচেষ্টা...হাঁটুভোর জলে কোনরকমে পার হয়ে চলছে তারাঃ

রাস্তাটা বেঁকে এসেছে বনের পাশ দিয়ে, সাঁকোর উপর। সামনে কয়েকটি ছেলে গাছের ডাল আর পাথর গড়িয়ে এনে রাস্তায় জমা করছে। নীচে ওরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে সাঁকোটার পাশে—মধ্যে ডিনামাইট, গান কটন আর নাইট্রোগ্লিসারিন ছড়াতে ব্যস্ত!

মৌমাছির গুঞ্জনের মত এগিয়ে আসছে রাতের অন্ধকারে লরীর শব্দটা। একটার পর একটা হেড লাইটের আলোয় রাস্তাটা ঝকঝকে হয়ে ওঠে! বনের গাছগুলো সবুজের স্তূপ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলো দেখেই সন্তর্পণে সরে যায় ছেলেরা। স্থির গতিতে এগিয়ে আসছে তারা।

সহসা নৈশ অন্ধকার সচকিত হয়ে যায়! নিরব—নিথর বনভূমি মুহূর্তের মধ্যেই যেন কোন ধ্বংসলীলার প্রতীক হয়ে ওঠে। সারা আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে গর্জন করে ওঠে ডিনামাইটটা, লোহার দুটো গার্ডার যেন পাতের মত বেঁকে তুবড়ে যায়। দূরে ছিটিয়ে পড়ে ইট-পাথরের টুকরোগুলো। বনের মধ্যে কারা যেন মিলিয়ে যেতে চায়, অন্ধকারেই। সারা বনভূমি আলো হয়ে ওঠে সার্চলাইটের আভায়।

কট্ কট্ কট্—মেসিনগানটা হয়ে উঠল কর্মমুখর। কাদের আর্তনাদ ভরিয়ে তুলল রাতের বাতাস। ঝলকে ঝলকে মৃত্যু বিষ উগরে চলেছে জীবন্ত দানবটা। নীরব ক্রন্দসী মুখর হয়ে ওঠে কার চক্রনির্ঘোষে! লাল-নীল আলোর সংকেত নিয়ে এগিয়ে আসছে কয়েকটা প্লেন। উপর হতে সন্ধানী চোখমেলে তারা সারা বনভূমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেবার চেষ্টা করছে! রাতের বাতাস ওঠে শিউরে, আকাশের তারা যেন কোন অজানা পুলকে দ্যুতিমান হয়ে ওঠে, সেও যেন মুক্তির আশ্বাদ পেয়েছে আজকের এই আত্মত্যাগের রক্ত লিখায়!

প্রদীপটা দমকা বাতাসে নিবু নিবু হয়ে আসছে! ধূলিমলিন ঘরটায় একটা অখণ্ড নীরবতা, প্রাণপণে নিজেকে চাপবার চেষ্টা করে সুনীতি! পারে না!

আজ সারা মনে তার নিঃস্বতার হাহাকার! জীবনের শতদল হতে এক একটি করে ঝরে গেল তার কোরক, প্রাণশক্তির এই চিরন্তন ময়—তাকে যেন নিঃস্বতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। ওপাশে বসে রয়েছে প্রবীর, সুনীতির অঝোর আঁখিধারায় আজ সে বাধা দেয় না!...

রাস্তাটা ভেঙে গেছে! কনভয় যেতে পারেনি ওদিকে! কোন সৈন্যও যায়নি। কিন্তু কিসের বিনিময়ে ত্বরা অজকের এই স্বাধীনতাটুকু কিনেছে তার কথা হয়ত কেউ জানবে না। কারা আজ রাত্রের তারাকিনী বনভূমির প্রস্তর শিলায় রেখে গেল রক্ত লেখার আলপনা—কারা নীরবে সরে গিয়ে ওদের মহাজীবনের পথে নিয়ে গেল—তাও কেউ জানতে চাইবে না। তবুও প্রবীরের মনে থাকবে এদের, ভুলবে না সুনীতিও!

অনেকেই গেছে। সেই সঙ্গে গেছে তারও একজন—! সুনীল!

হাসিমাখা দ্যুতিময় মুখখানা! পতাকা কিন্তু এবার সে ছিনিয়ে নিতে দেয়নি। বুলেটটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে—মুখ গুঁজে পড়েছে একটা কাঁটা ঝোপের উপর তার প্রাণহীন দেহটা, পতাকাটা সে ছাড়েনি, বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরেছিল! তার মৃতদেহটা সেই পতাকা ঢাকা দিয়েই নামান হয়েছে।

সকালের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই কেঁদকাটির বনে আসবে সৈন্যদল। প্রতিটি প্রস্তরশিলা—যা তাদের এতদিনের পরিচিত, সব ছেড়ে চলে যেতে হবে তাদের। সকাল হতে আর দেরী নাই। এর আগেই এদের সৎকার করে—ছেড়ে চলে যেতে হবে এখান হতে।

থামবার সময় নাই, চোখের জল ফেলবার দিন আজ নয়! বুকের আগুন যে নিভে যাবে!

আজও—আজও ভুলতে পারে না সুনীতি সেই রাতের কথা। তেরঙ্গা পতাকার নীচে আজও দেখতে পায় তার কত প্রিয়জনের রক্তরঞ্জিত মৃতদেহ।

গুলীবিদ্ধ ললাট—জমাট রক্ত চুলগুলোকে মাখামাখি করে যেন এক অপূর্ব শ্রীর সৃষ্টি করেছে। ওই পতাকার গৈরিক কত শহীদের বক্ষরক্তে রাঙ্গা হয়ে আছে, তাদের গরিমায়! সুনীল—দেবু—সনৎ—নিবারণ আরও—আরও কত কারা যেন ভিড় করে আসে ওই সামান্য একটা পতাকার গৈরিকের অন্তরালে! ওরা বেঁচে থাক, ওদের কি সুনীতি কোনদিন ভুলবে!

"একটু জল!"

মায়ের হাতে একটু জল খেয়েই বিছানায় এলিয়ে পড়ে সুনীতি! 'একটু ঘুমো—'

বাবা যেন অনুনয় করেন!

ঘুম! ঘুমতে সে চায় না! অনুভব করে তার মহানিদ্রার আর দেরী নাই। এগিয়ে আসছে সেই সময়। আজ সারারাত বাইরে কিসের সমারোহ। কাদের পদধ্বনিতে রাতের আকাশ ভরে ওঠে—আর সে ঘুমবে! না—ঘুমতে সে পারবে না! ঘুমতে চায় না। এক মুহূর্তে এই অপূর্ব জীবনের স্বাদ হতে সে বঞ্চিত হতে চায় না!

ডাক্তারবাবু ইনজেকশসান দিতে থাকেন।

চোখের সামনে কেমন যেন নিথর নীরবতা। হাঁ চেনে, মনে পড়ে ওদিকে সুনীতির। সে রাত্রির কথা ভোলে নি। চোখে নেমে এসেছিল জল! কত প্রিয়জনকে রেখে এল ওই কেঁদ-

কাটির বনভূমিতে! তেরংগা ঝাণ্ডাটাকে **উ'চু করে রেখে এসেছিল!**

রাতের অন্ধকারেই পা বাড়াল তারা নদী পার হয়ে হাঁটা পথে—গ্রাম গ্রামান্তরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এই দৃশ্যটাই চোখে পড়ে তাদের—শূন্য প্রায় গ্রামগুলো, লোকজন বড় একটা নাই। রাতের থমথমে অন্ধকারে কোন ধ্বংসপুরীর স্বপন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। কত গৃহহারা—নিঃস্ব জনতার বুকভরা আশার বহ্নিশিখার ম্লান দীপ্তি! সব হারিয়েও যদি তাদের মাটিকে পরের গ্রাস হতে রক্ষা করতে পারে, তারা তবুও সেই চেষ্টা করবে। ক্ষুদিরামের দেশের মাটি—তার দেশ ভাইরা কি ছেড়ে দেবে এমনিই!

— আজকের এই যুদ্ধই জনযুদ্ধ! শুধু কর্মীরাই নয়—যারা চিরদিন জনতার পিছনেই সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে তাদেরই ত্যাগের এ ইতিহাস! এর সার্থকতা আসবে না?

কয়েকদিন পর আজ আবার মুড়ির মুখ দেখছে তারা। বনের মধ্যে এ সবের আস্বাদ ভুলতেই বসেছিল! গামছায় সব মুড়িকটা ভিজিয়ে এগিয়ে দেয় প্রবীরের দিকে। ভিজে গামছায় দড়ি দড়ি করে ভেজান লাল চালের মুড়ি—আর কয়েকটা কাঁচা লংকা—সকলেই তাই পরম তৃপ্তিভরে চিবুতে থাকে।

—"বারে, তোমার কই?"

প্রবীরের কথায় ফিরে চাইল সুনীতি—'আমার আছে!'

"মিছে কথা বলতে একটু ও বাধল না দেখছি। এস লেগে যাও, যে ক'মুঠ ভাগে পাও পেটে তলি পড়বে।"

এদের মাঝে এক সংগে খেতে কেমন যেন বাধে তার। হাসে প্রবীর—"নৈতিক চরিত্রের বালাই আছে দেখছি, তুমি কি ভাব এমনি পাকা স্বদেশী করে গিয়ে আবার কারুর সংসারে ঠাঁই পাবে ঘরনী হবার।"

মুখ তুলে হাসবার চেষ্টা করে সুনীতি। তবুও অকারণে রাংগা হয়ে যায় কপোলতল। আঁজলা করে মুঠকয়েক মুড়ি চাবলাতে থাকে। সত্যিই এত খিদে পেয়েছে ও সবগুলো পেলেও আপত্তি ছিল না। প্রাণভরে গিলতে থাকে করকরে বালির বুকের কাঁচধার জলটা আঁজলা করে।

আবার হল যাত্রা শুরু।

রাত্রির অন্ধকারে থমকে দাঁড়াল তারা সবাই। সন্ধানী টর্চের আলোতে দেখা যায় কয়েকজন এগিয়ে আসছে। তাহলে তারা কি ধরা পড়ে গেল! এইবার ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের বুক চিরে চলবে তাদের নিয়ে জয়যাত্রা মেদিনীপুর সদরের দিকে। বিপ্লবীর কি কঠিন হস্তে পড়বে লোহবলয়। দেশের স্বাধীনতার সাধনা করা আমাদের দেশদ্রোহ, তাই শাস্তি পেতে হবে বিদেশীর আইনে!

—"কমরেডস—"

সহাস্যে এগিয়ে আসে কয়েকটি ছেলে। একজনকে ভালভাবেই চেনে প্রবীর—সুনীতিও! ফোর্থ ইয়ারে পড়ত! আশেপাশের সমস্ত গ্রামেই বীভৎসতার চিহ্ন দেখে তারা অনুমান করেছিল এইখানেই হয়েছে সবচেয়ে কঠিনতর সংগ্রাম।

সুতাহাটা এলাকায় প্রবেশ করল তারা। স্বাধীন ভারতের মৃত্তিকায় পা দিল স্বাধীনতাকামী ভারত সন্তান। কত শত শহীদের রক্তরাংগা তীর্থক্ষেত্র। তাদের সংগে নিয়ে চলল স্বেচ্ছাসেবকরা। সংবাদ তারা পেয়েছে—কেঁদকাটির কেন্দ্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে,—তারাও এগিয়ে আসছে সুতাহাটার ঘাঁটিকে দৃঢ়তর করতে। ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেংগে আসছে সুনীতির। চলবার সামর্থ্য নাই। গলা যেন শুকিয়ে আসছে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে ঘুমের আবেশে।

কটা দিন কোনদিকে কেটেছে জানে না সুনীতি। যতই দেখেছে ততই যেন বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারে না। এত বড় এলাকায় চলেছে কোন এক স্বাধীন রাষ্ট্রের সূত্রপাত। সকলেই কোন এক অদৃশ্য নিয়মের দাস।

কোর্ট—কাছারী—ডাকঘর—সব কিছুই কোন বহু নির্দিষ্ট পথে আপনা হতেই চলেছে। থানাটার উপর দিকহারা বাতাসে নড়ে পত পত করে তেরংগা ঝাণ্ডা। সকাল সন্ধ্যা ওখানে কুচকাওয়াজ করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। কত আশা কত আনন্দে ঝলমল ওদের প্রাণ। প্রথম আলোর জাগরনী সুরে ধ্বনিত হয় দেশমাতৃকার জয়গান!

এ কোন দেশের মৃত্তিকায় পা দিয়েছে তারা। আজ কোথায় সেই সর্বহারা নিঃস্ব জনগণ, কোথায় সেই কেঁদকাটির বনের সনৎ—দেবু—সুনীল—সব যেন কি আনন্দে ভরপুর—হীরক রংএর আকাশে কোন পথিক ভ্রমরের আনাগোনা, কোন বিদেহী আত্মার ব্যাকুল মিনতি মাখা চাহনি! সারা পূব আকাশ রংএ লাল!

হঠাৎ কার ডাকে চোখ মেলে চাইল। একি একি জগৎ। সামনের জানলাটা দিয়ে দেখা যায় শালবনের পরিক্রমা, লাল কাঁকরভরা রাস্তাটা সামনে চড়াই বয়ে উতরে গেছে ওপারে না দেখা কোন সীমান্ত পারে।

হাতটা নাড়তেও তার সংগতি নাই! নিঃশ্বাস নিতে গেলে বুকের কাছে তীব্র একটা ব্যথা! চড় চড় করে ওঠে ফুসফুসের চারি পাশটা! বুকে কিসের প্রলেপ। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চায়। কি যেন অনুভব করে।

আজ প্রায় বার চৌদ্দদিন তার কেটেছে কোন অজানা জগতে। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছিল। ডাক্তার বলে প্লুরিসি। একেবারে বিশ্রাম দরকার।

প্লুরিসি! ম্লান চাহনিতে চেয়ে থাকে প্রবীরের দিকে। শরীরের উপর এত অত্যাচার সইবে কেন? তাই এ দুরন্ত ব্যাধি। ঘন কেশপাশে হাত বোলাতে বোলাতে সান্তনা দেয় প্রবীর—"ভয় নাই, সেরে যাবে কদিনেই।"

সেরে না যাক ক্ষতি নাই। তাকে যে মরতে হবে তার জন্য প্রস্তুত হয়েই বার হয়েছিল ওপথে। তবে রুগ্ন অসহায়ভাবে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া তার কাছে যে কত বড় ব্যথা—কি করে সে বোঝাবে। এর চেয়ে সামনা সামনি মৃত্যু ভাল। সেত মরণকে ভয় করেনি,—মরণ বিজয়ী বীরদের সে আত্মার আত্মীয়া।

—ছিঃ আবার চোখে জল! শাড়ীর আঁচল দিয়ে জলটা মুছিয়ে দেয় প্রবীর, আজ সুনীতি তাকে বোঝাবে কি করে এ চোখের জল তার মৃত্যুকে ভয় নয়—মৃত্যুর কাছে পরাজয়েরই প্রতীক।

আজ নিশ্চুপ হয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে বার বার পুরান কথাগুলোই মনে পড়ে। কোথায় বাবা, কোথায় মা জানে না। ছোট ভাই সুনীল তাকেও তুলে দিয়েছে দেশমাতৃকার অঞ্চলতলে. নিজে! সব হারিয়ে কি রোগের কবলে আত্মসমর্পণ করতে হবে তাকে। কি সে পেল জীবনে? না—পাবার কোন আশা নিয়ে ত সে আসেনি, নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জনাই এসেছিল। তবে আজ এ দুঃখ কেন? একজনকে সে ত পেয়েছে আপনার করে।

না,—আজ সে ওসব কথা ভাবতে রাজী নয়। নিজের করে পাবার কোন দাবীই নাই এ পথে। এখানে ত নীড় রচনার সংকেত নাই, আছে শুধু মুক্ত বিহংগের মহাশূন্যে আকাশ সীমায় মহাজীবনের পরিক্রমণ কোন মহাসত্যের সন্ধানে।

আগুন নিভে আসছে। বাইরে যত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টায় সব খবরই পেঁাছে সেখানে। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে ব্যর্থতারই সংবাদ। জোয়ার নেমে গেছে। সারা ভারতে—বোম্বাই—শোলাপুর—সাঁতারা—পাটনা—গয়া—মুংগের জিলা সব জায়গাতেই আবার ফিরে আসছে বৃটিশরাজের কঠিন শাসন বিধান। দলে দলে চলেছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। আবার নিবো নিবো প্রদীপের ম্লান আলো। তাদের এখানেও চলেছে আপ্রাণ চেষ্টা। দলে দলে দেশী বিদেশী সৈন্যদল বার হয়ে আসছে অরাজকতা দমনের নামে অধিকার বিস্তার করতে।

আজও তারা প্রজ্বলিত করে রেখেছে সেই অনির্বাণ বহ্নিশিখা। প্রাণ দেবার শপথ করেও তারা উ'চু করে রাখবে ওই পতাকা। আজ ধুমকোল—মহিষাদল—তমলুক সব জায়গাতেই আসছে বিদেশীর সেই লৌহ শৃংখল। আসুক—তবু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা

স্বাধীন ভারতের মুক্তিকার উপরই দাঁড়িয়ে মরবে।

প্রবীর কয়েকদিন খুবই কাজের চাপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায়। মহাপরাক্রমশালী বিদেশীর শাসন যন্ত্রের কাছে কতটুকু তারা। কে জানে কবে শেষ হয়ে যাবে তাদের সব কিছু। তবু আজও আসে দলে দলে চাষা—ধোপা—বাগদী—বাউরীর ছেলে, গলায় ফুলের মালা, হলদে রং-এর কাপড় পরা, বাবা এসে ছেলেকে সঁপে দিয়ে গেল দেশের কাজে এদের অফিসে নাম লিখিয়ে। আজ হতে সে আর তার ছেলে নয়, দেশ মাতৃকার সন্তান। তাঁরই নামে বলিপ্রদত্ত। এরা রক্তবীজের বংশধর।

শেষ এদের নাই, সংখ্যা এদের নাই। সামনে তাদের হয়ত অন্ধকার, ব্যর্থতা, তবুও চলার বিরাম নাই।

সুনীতির চোখে ফুটে ওঠে ব্যর্থতারই ছায়া। কি আছে এর শেষে। আজ বার বার মনে পড়ে শান্ত গৃহাঙ্গনের কল্পনা। সব হারিয়ে ওটুকু পেতেই সারা মন যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিসের আবেগে সমস্ত শরীর গরম হয় যায়। কানের কাছে আজ রক্তের লালাভা। কাসির বেগে বুকটা ফেটে যাবার উপক্রম।...গয়েরের সঙ্গে বার হয়ে আসে—নোনতা নোনতা স্বাদ।...রক্ত! হ্যাঁ রক্তই।

শিরায় শিরায় আসে তীব্র শিহরণ, তবে কি—তবে কি তার আর দেরী নাই। ডাক এসেছে সুদূর হতে। কিন্তু এই মৃত্যুই কি সে চেয়েছিল। এরই জন্য কি মা-বাবা শান্ত গৃহ-কোণ সবকিছু ছেড়ে পা বাড়িয়েছিল সামনের দিকে।

আজ সব শেষ! সব কামনার এল পরি-সমাপ্তি।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চলেছে রক্ষী বাহিনীর জরুরী বৈঠক। স্বাধীন মুক্তিকার এইটুকু বিস্তারের উপর পড়েছে চারিদিক হতে ক্ষুধিত দৃষ্টি। আকাশ হতে ঝলকে ঝলকে বিস্তার করে যায় বিমান বাহিনী অগ্নিশিখাসমারোহ। চারিদিক হতে ঘিরে আসছে তাদেরকে করাল গ্রাস করবার প্রচেষ্টা।

শেষ দীপ নির্বাপিত হতে তারা দেবে না সহজে। আজ রাত্রেই তার অগ্নি পরীক্ষা। সর্বাধিনায়ক বিজয়দার কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে আসে, কারা যাবে এ মৃত্যুর পথে!!

তবুও যায়। অনেকেই রাজী হয়ে গেল। কে আগে আত্মত্যাগ করবে তাই নিয়ে আজও কাড়াকাড়ি। এদের দেখে বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় বিজয়দার।

বম্ কেসের আসামী। যেমন করে হোক অন্তত একজনের ফাঁসি হবেই। পরামর্শ হয় পাঁচজনের মধ্যে অন্তত একজন স্বীকারোক্তি করুক—বাকী চারজন বেঁচে যাবে। লাগল ঝগড়া—এ বলে আমি করি, সংসারের কোন কাজে আমি নাই।

ও বলে—দাবী আমারই, সংসার বলতে কোন পদার্থই আমার নাই। তাদের পাঁচজনের কে আত্মত্যাগ করবে তাই নিয়ে মহা তর্ক।

আজ আবার সেই দৃশ্যের অবতারণা। ঝোলান লণ্ঠনের ম্লান আভায় ফুটে ওঠে ওদের চোখে কোন আলোর দ্যুতি! যাবার জন্য তৈরী হতে গেল।

ওদের যাত্রা শুভ হোক। নীরবে অশ্রুভারা-ক্লান্ত নয়নে তাদের গতিপথের দিকে চেয়ে থাকেন বিজয়দা।

কার স্পর্শ পেয়ে চমকে ওঠে সুনীতি। সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে প্রবীর। ইউনিফর্ম পরা। এত রাত্রে কোথায় যেন যেতে হবে তাকে। বিছানায় সুনীতির পাশেই বসে পড়ে প্রবীর। আজ নির্জন রাত্রে প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সুনীতি। তার যে দিন শেষ হয়ে আসছে—তাও যেন ভুলতে বসেছে। নিজেকে নিঃশেষ করে সঁপে দেয় প্রবীরের বাহুর মধ্যে। তার উষ্ণনিঃশ্বাস প্রবীরের গালে পরশ মাখায়।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে! রক্ত!

—তার আর অধিকার নাই আর একজনের মূল্যবান জীবন বিপন্ন করতেঃ সে যে প্রবীরকে ভালবাসেঃ না—না, এ সর্বনাশ সে করতে পারবে না। বিষাক্ত মারাত্মক ব্যাধির জীবাণু তার দেহে বাসা বেঁধেছে! প্রবীরকে আজ পাবার দাবী রাখে না।

আর্তনাদ করে ওঠে—না—না, তুমি যাও! তুমি যাও! ছুঁয়োনা আমাকে!

নিজের হাতটা প্রবীরের হাত হতে ছিনিয়ে নেয়!

আশ্চর্য হয়ে যায় প্রবীর সুনীতির এই পরিবর্তন দেখে। মনে মনে বহু কল্পনা সে করেছিল। নীড় রচনার মোহ—ভরিয়ে দিয়েছিল তার বিপ্লবী মনকে কাজের অবসরে। আজ এ কি কথা সুনীতির!!

ধীরে ধীরে উঠে পড়ে প্রবীর! বিপ্লবীর এ দুর্বলতায় যেন নিজেরই লজ্জা আসে। সামান্য নারীর প্রত্যাখ্যান তাকে মুষড়ে দিতে পারে না, সামনে তার অনেক বড় কাজ।

সুনীতির দুচোখে জলধারা। অপরাধীর মত বলে প্রবীর—"অন্যায় করে থাকলে ক্ষমা চেয়েই গেলাম সুঃ।

নীরবে বার হয়ে আসে! কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়ে সুনীতির দেহ। প্রবীর কি ভুলই বুঝে গেল তাকে। ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন যে তারই। সে ত জানে না জীবনের সঞ্চয়ের অঙ্কে সুনীতি দেউলিয়া হয়ে পথে নেমে এসেছে।

বাইরে রাত্রির থমথমে অন্ধকার। তারার আলো উঠে শিউরে। সারারাত সুনীতির চোখে ঘুম নাই। কানে আসে অন্ধকার ভেদ করে কিসের শব্দ! বুম্—ম্—ম্।

ফায়ারিং হচ্ছে কোথায়—রুদ্ধ নিঃশ্বাসেই রাত্রি কেটে গেল। কখন যে তারার রোশনী নিঃশেষ হয়ে গিয়ে ফুটে উঠেছিল দিনের আলো জানে না সে।

চমকে ওঠে! বিছানায় চোখ খুলেই দেখে—থানার উপরকার তেরঙ্গা পতাকাটা অর্ধেক করে নামান। সমবেত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে কেমন যেন থম থমে ভাব।

ধীরে ধীরে বার হয়ে আসে সুনীতি।

দাঁড়াবার সঙ্গতি নাই। সারা শরীর তার কাঁপছে উত্তেজনার আবেশে। সর্বনাশ হয়ে গেছে তার। প্রবীর আজ নাই। নাই সে! কাল রাত্রে সেঁওতলির প্রান্তরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। স্বাধীন ভারতের সন্তান—স্বাধীনতার জন্যই প্রাণ দিয়ে গেছে।

রক্ষীবাহিনী পশ্চাদপসরণ করেছে। মৃত-দেহগুলোও আনতে পারেনি তারা।

স্তম্ভিত হয়ে যায় সংবাদটা শুনে! সুনীতি যেন ভুলে যায় নিজের কথা। কালকের রাত্রির দৃশ্যটা বার বার ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

সেঁওতলির ডাঙ্গা! একটা চড়াই-এর পারেই। মাথার উপর তীব্র রোদ। কাঁকুরে পথ খালি পায়ে চলতে পারে না সুনীতি। তবুও সকলের অজ্ঞাতসারে সে বার হয়ে গেল। কাঠবনের লতাগুল্মে ভেদ করে চলতে থাকে। প্রবীরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তাকে। একবার যেন দেখতেও পায় তার মৃতদেহটা! চোখের জল যেন পাষাণ হয়ে গেছে। কি এক নেশার ঘোরে চলেছে সে।

নদীটা পার হয়েই পিছনে একটা শব্দে চমকে ওঠে। একি! পালাবার পথ নাই। চারিদিকে বুভুক্ষু রাইফেলের ব্যারেলগুলো এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে তার জ্ঞান ফিরে আসে—সে বন্দী! আর তার ওখানে ফিরে যাবার কোন পথই নাই। উত্তেজনার আবেশে কাঁপতে থাকে সারা দেহ।

জিপখানা পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে প্রান্তরের বুক চিরে, অন্যতমা কর্মী সুনীতি সেনকে নিয়ে।

তারপর আবার সেই নিরাশার অন্ধকার, কারাগারের প্রসার বেড়ে চলেছে দিন দিন। একদিন দেখেছিল সর্বাধিনায়ক বিজয়দাকে সেলের মধ্যে পায়চারী করতে বন্দী সিংহের মত। হেসে তিনি পরিচিতি স্বীকার করে-ছিলেন।

আবার সব লাল হয়ে গেল। মুছে গেল তাদের মেদিনীপুরের বুক হতে শেষ বহ্নি-শিখা! প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, বুলেট, মহামারী সবকিছু কি তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে দেবে?

জেল হতে বার হয়ে এল যখন বাবা কেঁদে

ওঠেন তাকে দেখে। এ কি করে এসেছে সে। জীবনের সমস্ত শক্তিই কি নিঃশেষে ফুরিয়ে এনে বাইরে পা দিল।

হাসে সুনীতি মলিনভাবে। তার বাঁচবার কি কোন সার্থকতা আছে।

আজ রাতে আবার সেই হয়রান উত্তেজনা কেন। সেই কোলাহল, থানার কাছে লোকের জনতা! বিনিদ্র রজনীতে বাঁশ কাটার শব্দ। কাদের কোলাহল—আনন্দধ্বনি।

ক্যালেণ্ডারের পাতায় ডাক্তারবাবু দাগ দিয়ে চলেছেন—১৫ই আগষ্ট '৪৭ সাল।

স্থিরদৃষ্টিতে চাইবার চেষ্টা করে সুনীতি পারে না। চোখের সামনে কেমন ধোঁয়াটে ভাব। আলোকোজ্জ্বল কোন দেশের পথরেখা। প্রবীর দেবু-সুনীল সকলেই সেখানকার যাত্রী। পথে পথে কোন নাম না জানা ফুলের সুবাস। দ্রোণ পুষ্প—অতসীর ঝরেপড়া ফুল সঞ্চয় ভরিয়ে তুলেছে তার রেণুবিতান। জাফরানী রঙ-এর ভেলায় কাদের হাতছানি।

সে যাবে—বিনিদ্র রজনীর স্বপ্নশিয়রসঙ্গী কোন প্রিয়জনের আহ্বান, প্রবীর আজও দাঁড়িয়ে আছে—সেই হাসি ঝলমল চোখ। যাবে—যাবে সে।

ডাক্তারবাবু একমনে নাড়ীটা দেখে চলেছেন। কাসির সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে খানিকটা চাপ চাপ রক্ত। স্থির হয়ে আসছে সুনীতির দেহ।

—১৫ই আগস্ট, '৪৭ সাল। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

গ্রামের পথে পথে আজ স্বাধীন ভারতে নবপ্রভাত। তারই বন্দনা গানে আকাশ বাতাস মুখরিত। আবালবৃদ্ধবনিতা আজ বার হয়ে আসে সেই জাগরণী সুরে।

সুনীতি আর নাই। চলে গেছে তা পথিক আত্মা কোন আলোকোজ্জ্বল দেশে আজকের বন্ধন মুক্তির সংবাদ নিয়ে। প্রবীর সুনীল-দেবু আরও কত শত শহীদের কানে পোঁছে দিতে হবে এই শুভদিনের বারতা তাদের সাধনা সার্থক হয়েছে।

আকাশে বাতাসে সেই জয়গানেরই সুর রেশ।

একটি চীন মহিলা

পার্ল বাক

আমার জীবন বহু লোকের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। তাদের অনেকেরই কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। সেই স্মৃতির পটে এমন একটি মুখ ও চেহারা অঙ্কিত হ'য়ে আছে যার একটি রেখা আজও আমার মন হ'তে কিছুমাত্র মুছে যায়নি। তিনি এক-জন চীনে মহিলা—তার নাম ম্যাডাম্ সিউঙ (Hsiung)

নানকিন্ সহরের একই রাস্তায় তারই গৃহসংলগ্ন একটি বাড়িতে প্রায় ১৭ বৎসর আমি বাস করেছি। আমি যে-বাড়িতে ছিলাম তাতে ঘর ছিলো একটি, একটি বাগান, লোক-সংখ্যা ছিলো চারজন মাত্র। তিনি থাকতেন একতলা একটি বাড়িতে। তার চারিদিক পাঁচিলে ঘেরা। তাতে সর্বশুদ্ধ ছিলো ৫০টি কুঠরী। তারি দু'টি তিনটি বা চারটি কুঠরী নিয়ে এক একটি মহল। প্রতি মহলের সামনে একটি ক'রে উঠোন। উঠোনগুলি ভিতরের দিকে দরজা দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। তার মধ্যে বাস করতো একটিমাত্র পরিবার তার লোকসংখ্যা ছিলো প্রায় ৭২ জন।

যখনই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি তখনই দেখেছি একই জায়গায় তিনি বসে আছেন। তার মহলটি বাড়ির ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিলো তাতে তিনটি মাত্র ঘর, সামনে একটি পাথরে বাঁধানো উঠোন। উঠোনের মাঝ-খানটিতে গভীর জলে পূর্ণ একটি বাঁধানো চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার জলে রঙীন মাছের ভিড়। একটি বিড়ালের জায়গা ছিলো ঠিক তারি পাশে। চৌবাচ্চার রঙীন মাছের দিকে সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে একই জায়গায় সেও বসে থাকতো। মাঝে মাঝে হঠাৎ থাবা উঠিয়ে জলের তলায় নিক্ষেপ করতো মাছের দিকে। ম্যাডাম সিউঙের দৃষ্টি তা এড়াতো না, যদিও তাকে দেখে মনে হতো কোন বিশেষ কিছুর দিকে তার যেন লক্ষ্য নেই। বিড়ালটি থাবা তুলতেই তিনি তার তীব্র কণ্ঠে হাঁক দিতেন, "বিড়ালী।" অমনি বিড়ালটি তার থাবা গুটিয়ে নিতো।

একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি বিড়ালটির কোন নাম রাখেন নি?"

তিনি একটু হেসে উত্তর করলেন, "আমার নাতি নাতনীদের নামকরণ করতে আমাকে কম ভাবতে হয় না।"

সাতটি তার ছেলে, তাদের সন্তান-সন্ততি ২২টি। তার মেয়েও আছে দু'টি। কিন্তু তাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে অন্য পরিবারে। তাই ওরা এখন আর তার পরিবারভুক্ত নয়। তবুও ওরা বছরে দু'বার ক'রে আসে ওর কাছে। ওর সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করে, তিনি যা বলেন মন দিয়ে ওরা তা শোনে।

তিনি তার মহল, ঘর বা তার কালো রঙের চেয়ারখানা ছেড়ে বড় একটা কোথাও যান না। চেয়ারের বসবার স্থানটি কাচের মতো মসৃণ হয়ে গেছে। দুধারের হাতলের যে-স্থানে তিনি হাত রাখেন তার বার্নিশ প্রায় উঠে গেছে। তার দেহ এত ক্ষীণ, এত হালকা ও দেখতে তিনি এতটুকু যে তার ওজন আছে বলেই মনে হয় না। অধিকাংশ সময়ই তিনি বসে বসে বই পড়েন—কখনো কবিতা, কখনো প্রাচীন গ্রন্থ-কারদের রচনাবলী, কখনো সমালোচনা, কখনো বা নানা জাতীয় প্রবন্ধ।

তিনি তার মেয়েদের লিখতে পড়তে শেখান নি। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন তাদের লেখাপড়া শেখান নি?"

তিনি আমার প্রশ্ন এড়াবার জন্য সামান্য দু' কথায় উত্তর দিলেন, "লেখাপড়া শিখে মেয়েরা খুব বেশি সুখী হ'তে পারে না।"

"কিন্তু আপনি—" একথা বলতে না বলতেই তিনি তার সুমিষ্ট কণ্ঠে বললেন, "হাঁ, আমি খুবই পড়ি। কিন্তু আমি ইহা অনসৃষ্ট বলেই মনে করি। আমি যখন খুব শিশু তখন আমার একমাত্র ভাই মারা যায়। আমার বাপ ছিলেন একজন খুব বড় পণ্ডিত। তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য এবং তার কথা আমি যেন যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারি সেও ছিলো তার উদ্দেশ্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, মেয়েরা কি যুক্তিবাদী নয়?"

তিনি উত্তরে বললেন, "প্রায়ই নয়।"

তিনি অধিক কথা বলতে মোটেই ভাল-বাসতেন না, সেই জন্য তার সঙ্গে কথা বলা খুব সহজ ছিলো না। আমি কত সময় আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ক'রে তার কাছে নিয়ে গেছি। কিন্তু তার মৌনতায় সকলেই তার কাছে কেমন সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়তো। কিন্তু আমার লাগতো ভালই কেননা সে সময় তার বাক্যহীন মূর্তিটি আমি আরো বেশি ক'রে

অনুভব করতে পারতাম, তার সঙ্গে তখন আমাকে আরো বেশি আনন্দ দান করতো।

আমি তাকে প্রথম দেখতে পাই তার ৫০ বৎসরের জন্মদিনের উৎসবে। তার প্রতিবেশী হিসেবে নতুন বাড়িতে এসে প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রথম দিনে এসেই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। কিন্তু পরদিন তার জন্মদিনের ভোজে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান। আমি গিয়ে দেখি অতিথিরা সকলে একটি টেবিল ঘিরে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর তিনি এলেন। তার সঙ্গে তার দু'ধারে দু'জন পরিচারিকা। আমরা সকলে উঠে দাঁড়ালাম—সকলেরই দৃষ্টি তার মুখের দিকে নিবদ্ধ। তাকে দেখে মনে হলো তিনি যেন প্রাচীন কবিদের বর্ণিত সৌন্দর্যের একটি জীবন্ত প্রতীক। ঈষৎ শুভ্র খাপে মোড়া একটি তীরের ন্যায় ঋজু তার দেহটি, গায়ের রঙ ঈষৎ ফ্যাকাশে, গড়নটি অতিশয় ছিপছিপে হালকা ধরণের। গালার ন্যায় মসৃণ কালো কুচকুচে চুল মাথার উপরে প্রাচীনদের ন্যায় ক'রে আবদ্ধ। তার কোমল কৃশ হাতটি এখনো যেন আমি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

তিনি এসেই মাথা একটু নুইয়ে হাতের ইশারায় আমাদের সকলকে বসবার ইঙ্গিত করলেন। যদিও তার মুখে হাসি ছিলো না তবু তার দুই আয়ত চোখের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার মুখের আভা যেন ফুটে বের হয়ে আসছিলো। তার অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল সাধারণ ধনী পরিবারে সুখে আলস্যে প্রতিপালিত রমণীকুলের তিনিও হবেন একজন। কিন্তু পরে জানতে পারলাম তিনি সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক নন।

একদিন আমি তাকে আমার বাগানের গোলাপ ফুলের একটি তোড়া উপহার দিলাম। সেই উপলক্ষ্য করে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ক্রমশ ঘনিয়ে এলো। আমি দেখতে পেলাম তার অনুরাগ গোলাপের প্রতি নয়, গোলাপের প্রতি বরং তার কতকটা যেন বিতৃষ্ণাই দেখলাম। তার অন্তরের সমুদয় অনুরাগ দেখলাম গার্ডেনিয়া (Gardenia) নামক ফুলের উপরে। আমার বাগানে গার্ডেনিয়ারও কয়েকটি ঝোপ ছিলো। তার কাছেই আমি প্রথম জানতে পারলাম তাদের গায়ে সকালের শিশির বিন্দু শুকোবার পূর্বেই তাদের তুলে আনতে হয়। তিনি আমাকে বললেন—"সূর্য-কিরণে এদের গন্ধের বিকৃতি ঘটে। তাদের তুলে আনতে হয় সূর্যোদয়ের পূর্বে, উপহারও দিতে হয় সদ্য সদ্য তখনি।"

আমি অমনি ব'লে উঠলাম—"কিন্তু আপনি তো তখন ঘুমিয়ে থাকবেন।"

তিনি বললেন—"একবার চেষ্টা ক'রে দেখো।"

তারি কথামতো একদিন আমি অতি সকালে অতি কষ্টে ঘুম থেকে উঠে গার্ডেনিয়ার ঝোপ থেকে দু' অঞ্জলী ফুল তুলে আনলাম। তাদের পাপড়িদল ছিলো তখনো শিশিরসিক্ত বৃন্ত-সংলগ্ন ঘন সবুজ কচি পাতায়, শিশিরবিন্দু তখনো চিকচিক করছিলো। সত্যি দেখলুম তাদের গন্ধের যেন তুলনা নেই। আমি সেই ফুল নিয়ে চললাম তার কাছে। গিয়ে দেখলুম তিনি তার মহলটিতে বসে আছেন, হাতে একখানা বই। একজন পরিচারিকা তার সামনে প্রাতরাশের সামান্য আয়োজন সাজিয়ে দিচ্ছে—কিছু ফেনসা ভাত, নুনে রক্ষিত কিছু শবজী ও অতি ছোট দু' টুকরা নোনা মাছ। আমি তার হাতে ফুল তুলে দিতেই একটি অব্যক্ত আনন্দে তার দু' চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমার দিকে দু' চোখ তুলে তিনি বললেন—"কেমন, আমি বলিনি?"

আমি উত্তরে বললাম—"হাঁ আপনি ঠিকই বলেছিলেন।"

ক্রমশ যে পরিবারটি তার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটতে লাগলো। দেখলাম পরিবারের পূর্ণ কর্তৃত্ব তারি উপর। মিঃ সিউঙ্গ শহরের তিনটি খুব বড় রেশমী দোকানের মালিক। দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কাটান চায়ের দোকানে অথবা তারি দোকানের পিছন দিকের ঘরে বসে। কিন্তু কোথাও কোন রকম বাধাবিঘ্ন ঘটলেই তিনি পরামর্শের জন্য ছুটে আসেন তার স্ত্রীর মহলে।

তিনি কখনো উপপত্নী গ্রহণ করেন নি। স্ত্রীর অধিকার একদিনের জন্য তার খর্ব হয়নি। স্ত্রীর প্রতি তার গভীর ভালবাসাও অপ্রকাশিত ছিলো না। স্ত্রীর কাছে আসবামাত্র তার সমুদয় প্রকৃতি যেন বদলে যেতো। তিনি ছিলেন একজন খুব রাশভারী, গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সকলেই তাকে ভয় ক'রে চলতো। কিন্তু স্ত্রীর কাছে আসবামাত্রই তিনি একেবারে একজন যেন নতুন মানুষ হয়ে যেতেন। স্ত্রীর কিছু বলবার থাকলে গভীর মন দিয়ে তিনি তা শোনতেন। ব্যবসা বুদ্ধি তার যথেষ্ট প্রখর থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর বুদ্ধির উপর সে বিষয়েও তাকে অনেক সময়েই নির্ভর করতে হতো।

বড় চীনে পরিবার প্রায় সর্বক্ষণই ঝগড়া কলহে পূর্ণ থাকে। পরিবারে যিনি কর্তা বা কর্ত্রী তার শুভ বা অশুভ বুদ্ধির উপরই সাধারণত পরিবারের শান্তি বা অশান্তি নির্ভর করে। (চীনে পরিবারে সাধারণত স্ত্রীলোকেই কর্তৃত্ব ক'রে থাকেন)।

ম্যাডাম্ সিউঙ্গের ক্ষমতা ছিলো একটি রাজ্য শাসন করবার মতো। পরিবারের ঠিক মাঝখানটিতে একই জায়গায় তিনি বসে থাকতেন। বসে বসে সর্বক্ষণই তিনি বই পড়তেন। প্রাচীন ঋষিদের জ্ঞানগর্ভ বাণীতে তার মন সর্বদা থাকতো সিক্ত হ'য়ে। তার সুযোগ্য শাসনের প্রভাবে পরিবারের সর্বস্থলে সর্বক্ষণ শান্তি বিরাজ করতো।

তিনি পুত্রবধূদের ডেকে সংসারের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন, পরিবারের পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে ক্রোর কোথাও ত্রুটি প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে তার দৃষ্টি ছিলো সজাগ। প্রতি বৎসরের প্রথম দিনটিতে তিনি তার পুত্রবধূদের কাছে ডেকে বৎসরের কাজ সকলের উপরে ভাগ ক'রে দিতেন। প্রতি বৎসরই তাদের কাজ বদলে যেতো সুতরাং কোন ব্যক্তিকেই বৎসরের পর বৎসর একই কাজের একঘেয়ে ক্লেশ ভোগ করতে হতো না। তাদের উপর যে কাজের ভার পড়তো তার ভালমন্দ বিচার করবার অধিকার তাদের ছিলো না। তার কোন প্রয়োজনও ছিলো না। কারণ তিনি তাদের সকলকে জানতেন খুব ভালো ক'রেই। তিনি তাদের প্রকৃতি ও রুচি অনুসারেই কাজ ভাগ করে দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে একজনের হয়তো রান্নাবাড়া দেখাশোনার কাজে তেমন রুচি নেই। এক বৎসর পরই তার কাজ বদলে যেতো। কিন্তু বদলে দেবার সময় দেখতেন পূর্ব বৎসর কাজে তার কখনো অবহেলা বা বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে কিনা, তাতে তার ইচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে কিনা। তাহলে তিনি তাকে পর বৎসরও সে কাজেই নিযুক্ত করতেন।

তিনি কখনো কাউকে তিরস্কার করতেন না। কিন্তু তার ভুলত্রুটি দোষ সংশোধন করতেন অবিচলিত চিত্তে। একবার তার বড় ছেলে চায়ের দোকানের একটি বালিকার প্রেমে পড়ে। কিছুদিন পরে দেখা গেলো এক দূরবর্তী স্থানে বালিকাটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে কেউ কোন কথা উচ্চারণও করতে পারেনি, ছেলেটি মনের দুঃখে কিছুদিন প্রায় খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিলে। সে সবই বুঝতে পেরেছিলো—কিন্তু সে জানতো এ সম্বন্ধে কিছু বলা বৃথা। এদিকে সে যে সব খাবার খেতে ভালোবাসে তাকে সে সব খাবার দেবার ব্যবস্থা হ'য়ে গেলো। তার জন্য একটি উপহার আসলো একটি বিলেতি ফনোগ্রাফ্। এইরূপ একটি ফনোগ্রাফের দিকে বহুদিন থেকে তার ঝোঁক ছিলো। সেই বৎসরই তার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। সেও বালিকার কথা ভুলে যায়।

তার ছেলেমেয়ে নাতিনাতনিরা কি তাকে ভালোবাসে? এ প্রশ্ন অনেকবার আমার মনে জেগেছে। আমি তখন আমার নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখেছি তার প্রতি আমার মনের ভাব কিরূপ? আমি দেখতুম তার প্রতি আমার মন গভীর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। কেন? কেননা, তার ন্যায় ও সুবিচারের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস ছিলো। কোন কারণেই কারোর

প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল না। অন্যের প্রতি ব্যবহারে কখনো তাকে খামখেয়ালীর বশবর্তী হয়ে কাজ করতে দেখিনি। বধূই হ'ক, শিশুই হ'ক অথবা ভৃত্যদের সম্বন্ধেই হক তার ন্যায় বিচার ছিলো সর্বত্র সমান।

কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সাধারণত কঠোর প্রকৃতির হ'য়ে থাকে। কিন্তু ম্যাডাম্ সিউগ্গী তেমন কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বাইরে প্রকাশ না পেলেও তার মন ছিলো স্নেহ মায়া মমতায় পরিপূর্ণ। আমার একদিনের কথা আজও মনে পড়ছে। আমরা যেখানে থাকতুম তারি কাছে একটি রাস্তায় একটি ভিখারী রমণী হঠাৎ সন্তান প্রসব করে। রাস্তায় সে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছিলো, হঠাৎ তার মনে হলো তার সময় হয়ে এসেছে। সেই অবস্থায় রাস্তার একদল ইতর শ্রেণীর লোক তাকে ঘিরে ফেলে এবং তাকে দেখতে থাকে যেমন ক'রে লোকে দেখে জন্তু জানোয়ারকে। সে সময় একজন ছুটে গিয়ে ম্যাডাম্ সিউগ্গীকে খবর দেয়। খবর পাওয়া মাত্র তিনি ছুটে এসে উপস্থিত হন সেখানে। পরে তার পরিচারিকার মুখে সে ঘটনার বর্ণনা শুনেছিলাম। সে বললে —"হঠাৎ মনে হলো ম্যাডামের পায়ে ও কাঁধে যেন পাখা হয়েছে। তিনি এসে সে স্থানের লোকদের উদ্দেশ করে যে সব কথা বললেন তা শুনে মনে হলো তা যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে একে একে সকলেই সে স্থান হ'তে পলায়ন করলো। তার আদেশে তখনই স্ত্রীলোকটিকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো।" পরে সেই স্ত্রীলোকটি ও তার শিশুটিকে অনেকবার সেখানে দেখেছি। স্ত্রীলোকটি সেখানেই পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলো।

আমার মনে হতো তার যদি কোন দোষ থাকে সে হচ্ছে তার পুত্রবধূদের সম্বন্ধে, শুধু পুত্রবধূই নয় নারীজাতি মাত্রেরই উপর তার মনের কঠোর ভাব। একদিন সাহস ক'রে তাকে বললাম—"ম্যাডাম্, আপনি কিন্তু পুত্রবধূদের চাইতে আপনার পুত্রদের বেশি ভালোবাসেন। অথবা একথাও বলা যেতে পারে নারী জাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতির প্রতিই আপনার অনুরাগ যেন বেশি।"

তিনি তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার কথা শোনলেন। তারপর উত্তর করলেন— "হাঁ একথা সত্য আমি নারী জাতি সম্বন্ধে অধিকতর অসহিষ্ণু কিন্তু তাদের প্রতি আমি কোনরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করি এ কথা সত্য নয়।"

আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম— "আমাদের সম্বন্ধে আপনার এরূপ মনোভাব কেন"

তিনি উত্তরে বললেন—"নারী জাতির ক্ষমতা অসীম।"

আমি তখনকার সে মুহূর্তটির কথা কখনো ভুলব না। তখন আগস্ট মাস, দিনটি ছিল বেশ গরম। কেটলিতে ফুটন্ত জলের শব্দের ন্যায় গাছের ডালে ডালে শোনা যাচ্ছিলো ঝিঁঝির ডাক। কিন্তু তার চারদিকে কেমন একটু শীতলতা, একটা সুমিষ্ট মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে ছিলো। তার পরণে ছিলো শুভ্র রেশমী বস্ত্রের গ্রীষ্মবাস। বাইরে উঠোনে নগ্ন শিশুর দল রঙীন মাছের চৌবাচ্চায় খেলা করছিলো। তার উঠোনটি সর্বদাই ভর্তি হয়ে থাকতো তার ছোট ছোট নাতিনাতনীদের দ্বারা। শীতের সময় তুলার শীতাবাসে তাদের দেখাতো বেশ ফোলা ফোলা, আর এ সময়ে তাদের নগ্নদেহ সূর্যের তেজে ছিলো ঝলসানো।

তিনি তাদের দিকে বড় একটা তাকান ব'লে মনে হতো না, কথা বলতেন তাদের সঙ্গে খুব কমই। কিন্তু সর্বক্ষণই তার দৃষ্টি থাকতো সেদিকে। ওরা মাঝে মাঝে তার কাছে ছুটে দৌড়ে আসতো, তিনি তাদের গায়ে মাথায় তার ঠাণ্ডা হাতটি বুলিয়ে দিতেন। ওরা তার গায়ের উপর একটু ক্ষণের জন্য ঝুঁকে পড়ে তখনি আবার ছুটে চলে যেতো খেলতে। তিনি সর্বক্ষণ ওদের কাছে থাকলেও ওদের স্বাধীন চলাফেরায় কখনো বাধা দিতেন না। যদি কখনো ওদের কেউ এমন কাজ করতো যা তার করা উচিত নয়, যেমন চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবিয়ে কেউ যদি সেই আঙ্গুল মুখে দিয়ে চুষতো তাহলে তিনি কখনো সেজন্য তাকে তিরস্কার করতেন না। তিনি তাকে কাছে ডেকে তার ভিজে হাতটি নিজের হাতের রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতেন, তারপর নিজের পাত্র থেকে চা-ভিজানো গরম জল তাকে দিতেন খেতে। "তেষ্টা পেলে আমার কাছে আসবে" এই বলে তাকে ছেড়ে দিতেন খেলতে যাবার জন্য।

সেদিনই আবার আমি তার নিকট পূর্ব প্রশ্নের পুনরুক্তি করলুম—"আপনি বললেন মেয়েদের ক্ষমতা অসীম?"

তিনি বললেন—"হাঁ। পৃথিবীতে এমন ক্ষমতা আর কারোর নেই।"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কোন ক্ষমতার কথা বলছেন ম্যাডাম্?"

তিনি উত্তরে বললেন—"সে হচ্ছে জীবনের উপর তাদের ক্ষমতা" (The power over life)।

আমি আরো শোনবার জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলাম। কিন্তু তিনি আর একটি কথাও বললেন না। আমি পরে বুঝতে পারলুম— তিনি যা বলেছেন তাই যথেষ্ট—এর অধিক অার কিছুই বলবার নেই।

১৯৩২ খৃস্টাব্দে জাপানীরা যখন প্রথম আসে চীন আক্রমণ করতে তখন প্রথম প্রস্ফুটিত প্লাম (plum) ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে আমি যাই তার সঙ্গে দেখা করতে। জিজ্ঞেস করলুম—"আপনি কি অন্যত্র যাবেন না?"

তিনি বললেন—"আমি স্ত্রীলোকদের পাঠিয়ে দিচ্ছি অন্যত্র। আমার নিজের ভয় করবার কিছুই নেই। দস্যুদলপতিরা যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তখনো আমি ভয় পাইনি। ওরা তো সকলেই পুরুষ মানুষ। জাপানী সৈন্যেরাও তাই। পুরুষ মানুষকে আমি কিছুমাত্র ভয় করিনে।"

তারপর অনেকদিন তার আর কোন খবর পাইনি। তিনি জীবিত নেই একথা আমি কল্পনাও করতে পারিনে। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন তিনি তার বৃহৎ পরিবার ও সমাজের কেন্দ্রস্থলটিতে। তার যা প্রধান বৈশিষ্ট্য তা রমণী জাতিরই বৈশিষ্ট্য।

অনুবাদক: তেজেশচন্দ্র সেন

ভারতের জাহাজ শিল্প

কিছুদিন পূর্বে 'এল হিন্দ' নামে একটি ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজ জলে ভাসানো হয়েছে। বলতে গেলে ভারতের জাহাজ শিল্প সুপ্রাচীন। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মলয়, বলি, শ্যাম, কাম্বোজ এ সকল নাম ভারতীয়। প্রাচীন ভারতীয়েরা নিশ্চয় এ সব দেশে গিয়েছিল। জলযান ব্যতীত ও-সব দেশে যাওয়া যায় না। সে সমস্ত জলযান নিশ্চয়ই ভারতেই নির্মিত হত। এ সব গেল কয়েক হাজার বৎসর আগেকার কথা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারত বিদেশের সঙ্গে যে ব্যবসা চালাতো তার পণ্য ভারতে নির্মিত জাহাজে করেই বিদেশে প্রেরিত হত। ইংরেজরা প্রভু হওয়ার পর থেকে ভারতীয় জাহাজের দুর্দশা আরম্ভ হল। ইংরেজরা তাদের সীমানার মধ্যে ভারতীয় জাহাজ যেতে দিতে নারাজ। তার ওপর আবার তারা ভারতীয় জাহাজে আমদানী করা পণ্যের ওপর ইচ্ছামতো শুল্ক বসাতে লাগলেন। ইস্পাতে নির্মিত বাষ্পীয়পোতের আমদানী এবং ইংরেজদের অনুকূলে প্রণীত বৃটিশ নেভিগেশান অ্যাক্ট ভারতীয় জাহাজ শিল্প একেবারে নষ্ট করে দিলে। ১৯১৯ সালে সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশান কোম্পানী স্থাপিত হয়, এর আগে বহু বৎসর ভারতের নিজস্ব জাহাজ চলাচলের ব্যবসা ছিল না। এর পর থেকে ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি ইংরেজ জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। ১৯৩৯ সালের মধ্যে ছোটবড় ৪৭টি ভারতীয় জলপথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই ব্যবসায়ে ৩৬৯ লক্ষ টাকা খাটতে থাকে। যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশই জাহাজী শিল্প ও ব্যবসায় বাড়িয়েছিল, কিন্তু ভারতের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে সরকার বাধাই দিয়ে এসেছেন, বাড়াবার কোনো চেষ্টাই করেননি। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত 'রিকনস্ট্রাকসান পলিসি সাব কমিটি অন শিপিং' ভারতের উপকূলবর্তী বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কর্তৃক যাতে পুরোপুরিই চালিত হয়, তার জন্য ওকালতী করেছেন। বর্মা, সিংহল ও নিকটবর্তী দেশগুলিতে অন্ততঃ পণ্যের বারো আনা ভারতীয় জাহাজ কর্তৃক বাহিত হয়, তার জন্যও উক্ত কমিটি সুপারিশ করেছেন। দূরবর্তী দেশের ব্যবসা এবং প্রাচ্য দেশগুলিতে যে সমস্ত ব্যবসা আগে অক্ষশক্তির জাহাজ দ্বারা চলত, তাদেরও একটা মোটা অংশ যেন ভারতীয় জাহাজগুলি পায় তার জন্যও কমিটিও সুপারিশ করেছেন।

ভারতীয় জাহাজগুলির যাতে মাল বহন করবার ক্ষমতা বাড়িয়ে তিন লক্ষ টন থেকে দশ লক্ষ টন করা হয় এবং দু'লক্ষ যাত্রী বহন করা হয় অর্থাৎ বৃটিশ জাহাজের ভার কিছু লাঘব করা যায়, এজন্য লণ্ডনে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে কিছুদিন আগে আলোচনা চলেছিল, কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

বড়োদার দেওয়ান শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র পদত্যাগ করেছেন। কিছুদিন আগে তাঁর বিদায় সভা হয়ে গেছে। তাঁরই চেষ্টার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করেন এবং বড়োদা প্রথম যোগদান করার সম্মান অর্জন করেন।

বড়োদার গাইকওয়াড়ের জন্মদিবসে রাজ্যের দেওয়ান ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র উপাধি বিতরণ করছেন

তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার। তাঁর জন্মের বৎসর ১৮৭৫। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও লিংকন্স ইনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯২৫ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত ছিলেন বাংলার অ্যাডভোকেট জেনারেল আর ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত ছিলেন ভারত সরকারের ল' মেম্বার। তারপর বাংলায় ফিরে এসে তিন বৎসর লাট-সাহেবের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। আবার দিল্লীতে ফিরে যান ভারতের অ্যাডভোকেট জেনারেলরূপে। ১৯৩১ সালে লীগ অব্ নেশানস-এর অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের নেতারূপে জেনেভায় গিয়েছিলেন। দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতীয় গণ-পরিষদে যোগদান করবে কি না যখন এই নিয়ে আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা চলছিল, তখন ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের পরামর্শানুযায়ী বড়োদা রাজন্যবর্গের নেগোশিয়েটিং কমিটিতে যোগদান করেনি। বরোদা সোজাসুজি গণপরিষদের নেগোশিয়েটিং কমিটির সঙ্গে কথাবার্তা চালায়। এই পরামর্শানুযায়ী কাজ করার ফলে বড়োদার গণ পরিষদে যোগদান সহজ ও সুগম হয়।

একটি সিগারেটের কাহিনী

জার্মানীতে একজন মার্কিন সৈন্য একজন জার্মান ফ্রাউলাইনকে (কুমারী মেয়ে) একটি ভাল সিগারেট উপহার দেয়। মেয়েটির বাড়িতে বহু জোড়া জুতো মেরামত হচ্ছিল না, মুচির হাতে অনেক কাজ জমে গেছে, নতুন কাজ সে নিতে পাচ্ছে না। কিন্তু ছেঁড়া জুতোগুলির সঙ্গে সেই সিগারেটটি দিতেই সে খুশি হয়ে মেরামতী কাজ নিয়ে নিলে। মুচি যদিও অনেকদিন সিগারেট খায়নি; তার চেয়েও বেশী দিন সে তার প্রিয়তর খাদ্য মাংস খায়নি। মাংসওয়ালাকে সিগারেটটি উপহার দিয়ে কিছু মাংস সে সংগ্রহ করল। মাংসওয়ালা সিগারেটটি যত্ন করে তুলে রাখলে। সন্ধ্যার সময় সে সিগারেটটি নিয়ে কয়লাওয়ালার দোকানে হাজির হল; অমন যে দুষ্প্রাপ্য কয়লা তাও সিগারেটের গুণে পাওয়া গেল। এদিকে কয়লাওয়ালার আবার জলের কল মেরামত হচ্ছিল না। কলের মিস্ত্রী নানা রকম ওজর আপত্তি করে আসছিল না, কিন্তু সেই সিগারেটটি, যদিও তা একটু বাসি হয়ে গেছে তাই পেয়ে কল-মিস্ত্রী সানন্দে কয়লাওয়ালার কল মেরামত করে দিলে। বেচারী কলের মিস্ত্রীর আবার অনেকদিন আলু জোটেনি। সেই বাসি সিগারেটটি সে সযত্নে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে যেয়ে উপস্থিত হল। গ্রামের এক চাষী সেই সিগারেট পেয়ে খড়ের গাদার নীচে মাটি খুঁড়ে আলু বার করে দিলে। তারপর সেই চাষী পার্সিয়ান কার্পেটের ওপর পাতা একটি নরম সোফায় বসে এবং আর একটি সোফার ওপর ছেঁড়া কাদা লাগানো বুট তুলে দিয়ে চোখ বুজে সিগারেটটি টানতে লাগল পরম আরামে। সিগারেটের মত আসবাবপত্রগুলির পরিবর্তে আর কেউ হয়ত আর কোনো সব্জি নিয়ে গেছে। মনে-প্রাণে একটি সিগারেটই সে চেয়েছিল।

অংক কি কখনও ভুল হয়!

শিক্ষক ক্লাসে বোঝাচ্ছেন, "অংক কখনও ভুল হয় না, ১ জন লোক যদি একটা বাড়ি ১২ দিনে তৈরি করতে পারে, তাহলে ১২ জন লোক একটা বাড়ি ১ দিনে তৈরি করতে পারবে; ২৮৮ জন লোক পারবে ১ ঘণ্টায় ১৭২৮০ জন লোক পারবে এক মিনিটে আর ১০৩৬৮০০ জন লোক পারবে ১ সেকেণ্ডে। একটি ছেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল "যদি ১টি জাহাজ ৬ দিনে অ্যাটলাণ্টিক সমুদ্র পার হতে পারে, তাহলে ৬টি জাহাজ ১ দিনে অ্যাটলাণ্টিক সমুদ্র পার হতে পারবে। অংক কি কখনও ভুল হয়!"

সাম্প্রদায়িক মন

শ্রীঅবনীনাথ রায়

আমরা সাধারণত মনে করে থাকি যে, আমাদের মন সাম্প্রদায়িক বিষ থেকে মুক্ত—হিন্দুর প্রতি, মুসলমানের প্রতি, এমন কি কোন লোকের প্রতিই আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। কিন্তু কোন ঘটনার সম্মুখীন হলে আমরা যে রকম ব্যবহার করি তার থেকেই এক মুহূর্তে বোঝা যায় যে, আমাদের ধারণা সত্য নয়।

সম্প্রতি এখানে (মীরাটে) অনুরূপ ঘটনা একটি ঘটেছে, ব্যাপারটি ছিল দুর্গাপূজোর আয়-ব্যয়ের বাজেট পাশ করা। তার একটি খরচের item ছিল সানাইয়ের ব্যয়-বরাদ্দ পাশ করা। সম্পাদক জানালেন যে, হিন্দু সানাইওয়ালা দুষ্প্রাপ্য—যদি খুঁজে পেতে মেলেও তবে খরচা বেশি লাগবে। যে লোকটা সানাই বাজায় সে যদিও মুসলমান কিন্তু তারা তিন পুরুষ ধ'রে এই দুর্গাবাড়িতে সানাই বাজাচ্ছে। অতএব আপনারা বিবেচনা ক'রে বলুন যে কোন্ সানাইওয়ালাকে আপনারা বায়না দেবেন।

এমনি হয়ত itemটি বিনা আলোচনায় পাশ হ'য়ে যেত কিন্তু যে মুহূর্তে শোনা গেল যে, সানাইওয়ালা মুসলমান এমনি কতকগুলি লোকের মন বক্র হয়ে উঠলো। সভামধ্যে গুঞ্জন ধ্বনিত হ'ল "মুসলমান আবার কেন?" "মুসলমানের কি দরকার?" ইত্যাদি।

সকলেই যে এই মতে সায় দিলেন, তা অবশ্য নয়। একদল বল্লেন যে, সে সানাইওয়ালা যখন তিন পুরুষ ধ'রে বাজাচ্ছে তখন তাকেই রাখা উচিত। কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-কোণ থেকে কোন প্রশ্নকেই বিচার করা উচিত নয়। আর তার খরচ যখন কম সেটাও ত আমাদের পক্ষে অনুকূল।

কিন্তু এসব যুক্তি কোন কাজেই লাগলো না। এই রকমই হয়—মানুষের মন যখন সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত হয়, তখন সে কোন যুক্তিরই অনুশাসন মানে না। ফলে সভাপতি মহাশয় প্রশ্নটিকে ভোটে ফেললেন এবং ভোটাধিক্যে সেই মুসলমান সানাইওয়ালা নাকচ হ'য়ে গেল।

এই ঘটনাটিকে ছোট বা অবান্তর ঘটনা বলে মনে করলে ভুল করা হবে। এর ফল সুদূরপ্রসারী। যাঁরা মুসলমান সানাইওয়ালাকে বরখাস্ত করলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন এই ভেবে যে তাঁরা হিন্দু জাতির বা হিন্দু সমাজের একটা উপকার করলেন। কিন্তু এই রকম একটা-আধটা ঘটনার ভিতর দিয়েই জাতির মনের ভিতরটা পড়তে পারা যায়। সেখানে নজর করলে দেখা যাবে যে, এই মন শান্ত এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরহিত নয়—সে মন নিজের সম্প্রদায়ের জন্য পক্ষপাত-দুষ্ট। নিজের সম্প্রদায়ের জন্য মমত্ববোধ ভাল জিনিস, কিন্তু তাই বলে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা ঐ সাম্প্রদায়িক মমত্ববোধ থেকে হওয়া চিন্তাশীল মানুষের পরিচায়ক নয়। এ যেন এক ধরণের পিতামাতা আছেন, যাঁরা নিজের ছেলেপুলের কোন দোষ, কোন অন্যায় দেখতে চান না বা দেখতে পান না, সেই রকম।

এ কথা বললে অতিরঞ্জন হবে না যে, এই রকম মনোবৃত্তির আধিক্যের ফলেই আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক রক্তপাত আজো বন্ধ হ'ল না। হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের মনোবৃত্তির মোটামুটি পার্থক্য এইখানে। আমার মনে যদি বিষ থাকে, তবে তার প্রতিক্রিয়া হবেই—অন্য পক্ষ থেকেও তার জবাব আসবে, তা দু'দিন পরেই হোক আর দু'দিন আগেই হোক, আর বাংলায়ই হোক, কি বিহারেই হোক, কি পশ্চিম পাঞ্জাবেই হোক। আমাদের মধ্যে যদি কেউ মুসলমানের দোকানে চাকরি করেন এবং কেবলমাত্র হিন্দু বলেই যদি তাঁর চাকরি যায়, তবে আমরা সেই মুসলমানের হিন্দু বিদ্বেষের কথা নিন্দা করতে ছাড়িনে। কিন্তু আমরা যখন এই রকম সামান্য ব্যাপারে মুসলমান বিদ্বেষের পরিচয় দিই, তখন সেটা আমাদের নিজেদেরই নজরে পড়ে না।

আসল কথা হ'ল আমাদের চিন্তাশক্তির যথেষ্ট অভাব ঘটেছে। অধিকাংশ বাঙালীই হুজুগের এবং হঠকারিতার বশে কাজ করেন। আমাদের মধ্যে শচীন্দ্র মিত্র, স্মৃতীশ ব্যানার্জি, সুশীল দাশগুপ্ত, বীরেশ্বর ঘোষ কয়জন? অধিকাংশ লোকই এ'দের ঠিক উল্টো। তা না হলে বেলিয়াঘাটার বাড়ীতে মহাত্মা গান্ধীর নিজের উপর আক্রমণ হ'তে পারত না। এ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোক বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে না। ভগবানের বিশেষ দয়া যে, তাঁর গায়ে কোন আঘাত লাগেনি—ভগবান বাংলার সুনাম নষ্ট হ'তে দেননি। Forward সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বাঙালীর বর্তমান চরিত্র ভারি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করেছেন। তাঁর কথা উদ্ধৃত করছিঃ—

"We still boast that Gopal Krishna Gokhale once said, what Bengal thinks today, the rest of India will think tomorrow. We do not see that we have since forgotten to think. What we now live on is mere thoughtless emotionalism, effortless vehemence and Spineless spite."

(আমরা এখনো এই কথা বলে অহঙ্কার করি যে, মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ যা আজ চিন্তা করছে, বাকি ভারতবর্ষ সেটা কাল চিন্তা করবে। আমরা এটা দেখতে পাইনে যে, আমরা ইতিমধ্যে চিন্তা করতেই ভুলে গেছি। যা নিয়ে আমরা এখন বেঁচে আছি সেটা হচ্ছে চিন্তা-শূন্য হৃদয়প্রবণতা, চেষ্টাশূন্য তেজ এবং মেরুদণ্ডশূন্য হিংসা)।

উপরের চরিত্র-চিত্রণ নিয়ে আমরা রাগ করতে পারি, কিন্তু এর যাথার্থ্য অস্বীকার করতে পারিনে। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ সেদিন বলেছেন যে, বাঙালীর মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে নেতার শুভাগমন হবে। আমরাও চাই যে তাই হোক, কিন্তু তাহ'লে আমাদের নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সজ্ঞান হতে হবে। মিথ্যা মূল্যে দিয়ে নিজেদের ভুলিয়ে রাখলে চলবে না। বাঙালীর মহত্ত্ব আছে, কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত, জাতিগত নয়। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে জাতিগত সম্বন্ধে পরিণত করতে হবে।

"গ্যেটে ও বাঙলা সাহিত্য"

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,

নানা দিক্ থেকে বিচার ক'রে দেখলে, এই বইখানিকে বাঙলা ভাষায় একখানি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয় বই ব'লতে হয়। এর বিষয়-বস্তু, এর লেখক, এর প্রকাশন-কাল, এর লিখন-রীতি, আধুনিক বাঙালীর মানসিক সংস্কৃতির পরিপোষণে এই বইয়ের উপযোগিতা—এই-সব কথা চিন্তা ক'রলে, ওদুদ সাহেবের 'কবিগুরু গ্যেটে'কে বাঙলা ভাষায় এমন একখানি বই ব'লে স্বীকার ক'রতে হয়, যা এক সঙ্গে এ-যুগের আর আগামী বহু যুগের হ'য়ে, বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে চিরবিরাজমান থাকবে। বিষয় গৌরবে তো এই বই বাঙলা সাহিত্যে অপূর্ব। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বড়াই ক'রে এই সাহিত্যের সম্বন্ধে আমরা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ ক'রে তৃপ্তিলাভ ক'রে থাকি, যে এই সাহিত্য হ'চ্ছে পুরাপুরি আধুনিক সাহিত্য, আধুনিক যুগের মানব-মনের অন্যতম প্রকাশ-ভূমি হ'য়ে এই সাহিত্য বিদ্যমান। কথাটা কতকটা সত্য হ'লেও, পুরো-পুরি সত্য নয়। বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বিস্ময়কর ব্যাপার; এঁদের লেখায় বাঙলা সাহিত্য আর প্রাদেশিক নেই, 'জাতীয়' অর্থাৎ কোনও বিশেষ জাতিগত সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিবদ্ধ নেই; বাঙলা সাহিত্য এঁদের রচনায় বিশ্ব-সাহিত্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁচেছে। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে পেয়েও, বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে আমরা বিশ্ব-মানবের মনের হাওয়াকে সম্পূর্ণভাবে বহাতে এখনও তো পারি নি;—যে ভাবে ইংরিজিতে তা সম্ভব হ'য়েছে, তা তো এখনও বাঙলায় সম্ভব হয় নি। বিদেশের প্রাচীন আর আধুনিক মহাগ্রন্থগুলি আর সব দেশের প্রাচীন আর আধুনিক শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতাদের রচনার সঙ্গে পরিচয় তো বাঙলা ভাষার মাধ্যমে এখনও সম্পূর্ণরূপে আমরা পেতে পারি না। খান দশেক মহাগ্রন্থ, গ্রন্থ-সংগ্রহ আর মহা-কবিদের রচনাবলী গত তিন হাজার বছর থেকে শুরু ক'রে আমাদের সময় পর্যন্ত পর পর প্রকাশিত হ'য়েছে, আর জগৎ জুড়ে মানব-মনের রসায়ন আর মানব-সংস্কৃতির পরি-পোষক হ'য়ে এগুলি আছে; আমার জ্ঞান-গোচর আর রুচি-মত এই দশখানি মহাগ্রন্থ বা গ্রন্থাবলী হ'চ্ছে এই—

(১) সংস্কৃত মহাভারত;

(২) সংস্কৃত রামায়ণ;

(৩) প্রাচীন গ্রীক মহাকবি Homer হোমর-এর দুই মহাকাব্য Iliad ইলিয়াদ ও Odusseia ওদুস্সেইয়া (বা Odyssey 'অডিসি');

(৪) প্রাচীন গ্রীক Tragoideia ত্রাগোই-দেইয়া (বা tragedy ট্রাজেডি) অর্থাৎ বিয়োগান্ত নাটকাবলী—Aiskhulos আয়স্-খুলস্ (বা Æschylus এস্কিলস্), Sophokles সোফোক্লেস্ আর Euripides এউরিপিদেস্-এর রচিত নাটক-সমূহ;

(৫) হিব্রু শাস্ত্র—ইহুদী জাতির প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস, ঋক্‌সংহিতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি যা ইংরেজিতে Old Testament অর্থাৎ 'প্রাচীন নিয়ম' নামে উল্লিখিত হয়;

(৬) ফারসী মহাকাব্য কবি Firdausi ফির্‌দৌসী রচিত Shahnama শাহ্‌নামা;

(৭) আরবী ভাষায় রচিত উপাখ্যান-মালা Alf Laylah wa Laylah 'অল্‌ফ্ লয়লহ্ ওয় লয়্‌লহ্' অর্থাৎ 'সহস্র রজনী ও এক রজনী'; The Arabian Nights অর্থাৎ আরব্য-রজনী নামে পরিচিত।

(৮) ইংরেজ মহাকবি William Shakespere উইলিয়াম শেক্‌স্পিয়র-রচিত নাটকাবলী।

(৯) জরমান মহাকবি, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক Johann Wolfgang von Goethe গোটের গ্রন্থাবলী; এবং

(১০) আধুনিক বাঙলার, ভারতের, তথা সমগ্র জগতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী।

এই দশ দফা মহাগ্রন্থ বা সাহিত্য-সর্জনকে মানব-জাতির সর্ব-শ্রেষ্ঠ বা প্রতিভূ-স্থানীয় সাহিত্য-সর্জনা ব'লে মনে করি; এগুলির মহত্ত্ব সম্বন্ধে খুব বিশেষ মতভেদ হবে না মনে হয়। এগুলির পরেই অথবা এগুলির সঙ্গে-সঙ্গেই আরও কতকগুলি বিশ্বসাহিত্যের প্রধান কীর্তির নাম মনে ক'রতে হয়; বিভিন্ন জাতির প্রাচীন বীর-গাথা, বা জাতির আদর্শ-স্থল লোকনায়কদের কৃতি অবলম্বন ক'রে লেখা 'জাতীয়' কাব্য-গ্রন্থ; চীনা প্রাকৃতিক কবিতা; প্রাচীন তামিল কাব্য; কালিদাসের রচনাবলী; প্রাচীন আইরিশ সাহিত্যের কতকগুলি বই; মধ্য-যুগের চীন আর জাপানী কবিতা আর উপন্যাস; ইতালির কবি দান্তের গ্রন্থাবলী; ফরাসী নাট্যকার মোলিয়ের-এর নাটকাবলী; আধুনিক ফরাসী আর রুষ জাতির ঔপন্যাসিকদের লেখা কতকগুলি বড় উপন্যাস আর ছোট গল্প, প্রভৃতি;—বিশ্বসাহিত্যের সভায় এগুলিকেও বাদ দিলে চলে না।

এই-সমস্ত মহাগ্রন্থের বা প্রামাণিক সাহিত্য-রচনার অনেকগুলিই বাঙলায় আমরা এখনও পাই নি। সমগ্র রামায়ণ মহাভারত অবশ্য বাঙলায় পেয়েছি, রবীন্দ্রনাথ তো বাঙলারই নিজস্ব নিধি; হিব্রু পুরাণ ও শাস্ত্র বাঙলায় মিলছে—কিন্তু ইংরেজির মারফৎ এই জিনিসের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী পরিচিত হ'লেও, বাঙলার মাধ্যমে হিব্রু শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় বাঙালী খ্রীষ্টান সমাজের মধ্যেই প্রধানতঃ নিবদ্ধ। হোমরের মহাকাব্য-দ্বয়ের আর শাহনামার আর আরব্য রজনীর, আর শেক্‌স্পিয়রের নাটকের কথাবস্তু বাঙলায় এসেছে, শেক্‌স্পিয়রের নাটকের অনেকগুলি বাঙলায় যথাযথ অনূদিতও হয়েছে, কিন্তু সমগ্রভাবে এগুলির, আর গ্রীক ট্রাজেডি নাট্যের, পুরা অনুবাদের চেষ্টা বাঙলায় এখনও হয়নি। অন্যান্য প্রধান বা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের টুকিটাকি খবর বা তা থেকে ছোটখাট জিনিসের অনুবাদ বাঙলায় (বিশেষ করে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়) এসেছে আর আসছে বটে। কিন্তু যেভাবে ইংরেজি ফরাসী জরমান সাহিত্য এই-সব বিদেশী সাহিত্যের সৌন্দর্য-সম্পুটকে আত্মসাৎ করেছে, বাঙলা তা এখনও ক'রতে পারে নি।

জরমান কবি আর চিন্তা-নেতা গোটে আধুনিক ইউরোপের সভ্যতা আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন বিশ্বন্ধর যুগাবতার পুরুষ। খ্রীষ্টীয় আঠারোর শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর উনিশের শতকের প্রথমার্ধে আধুনিক ইউরোপের মনের কাঠামো একরকম সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। প্রাচীন গ্রীক চিত্তের সোনার কাঠির স্পর্শ পেয়ে ইউরোপে পনেরোর আর ষোলোর শতকে যে Renaissance 'রেনেসাঁস' অর্থাৎ "পুনর্জাগরণ" দেখা দিলে, ষোলোর, সতেরোর আর আঠারোর শতকের ভৌগোলিক আর বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কারের ফলে সেই পুনর্জাগরণ আরও পরিপুষ্ট বা কার্যকর হল। প্রাচীন গ্রীসকে তার স্বরূপে বোঝবার চেষ্টা ইউরোপে নতুন ক'রে দেখা দিলে। আর নানা বিষয়ে ইউরোপ স্বাধীনভাবে দেখবার আর বিচার করবার রীতি নিজের জন্য আর সমগ্র মানব জাতির জন্য নোতুন ক'রে আবিষ্কার/

ক'রলে। আঠারোর শতকের দ্বিতীয় পাদে ফ্রান্সের বিশ্বপণ্ডিতদের আর ইংলণ্ডের কতকগুলি পণ্ডিত আর দার্শনিকের শ্রম আর বিচারের ফলে, মানুষের মানসিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুক্তি-অনুমোদিত বিচারমূলক বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রতিষ্ঠা হ'ল। মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই একটি অদ্ভুত সময়, একটি যুগসন্ধির কাল। যেমন একদিকে ইউরোপ গ্রীক জগৎ থেকে প্রাপ্ত তার মানবিকতার সঙ্গে পুনঃ পরিচয় ক'রলে, গ্রীসের সৌন্দর্যবোধ তার নিজের মানসিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে নিলে, দর্শন, রাষ্ট্র আর সমাজনীতিকে গ্রীক চিন্তাকে শিরোধার্য ক'রলে; তেমনি অন্যদিকে, বিশেষ ক'রে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, মধ্য যুগের ইউরোপের প্রতি তার দৃষ্টি প'ড়ল; মধ্য যুগের পশ্চিম ইউরোপীয় খ্রীষ্টান 'গথিক' রীতির শিল্প আর সাহিত্যকে আবিষ্কার ক'রলে; আর এছাড়া, অখ্যাত অজ্ঞাত আদিম জাতির সাহিত্যেও সৌন্দর্যের নূতন উৎস খুঁজে পেলে। জরমানিতেও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের এই নানা জাতীয় চিন্তা, সাহিত্য আর শিল্পের অনুশীলন, সংমিশ্রণ, পরিপোষণ আর আত্মসাৎকরণ চ'লছিল। প্রথমটায় ফরাসী সাহিত্য আর শিল্প-রীতির, ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায়ের অনুমোদিত শিষ্টতার আর রুচির অপ্রতিহত প্রভাব জরমানির রাজা থেকে আরম্ভ করে উচ্চ-মধ্য শ্রেণী ও শিক্ষিত সমাজের সকল স্তরে জরমান জাতির বিদগ্ধ বা শিক্ষিতাভিমানী মনকে পূর্ণভাবে আয়ত্তে এনেছিল। জরমানিতে বড় বড় পণ্ডিত দেখা দিলেন, কতকগুলি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল, সরল ধর্মবিশ্বাসের পাশে পাশে বিচারশীলতা আর তর্কনিষ্ঠা আত্মপ্রকাশ ক'রলে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এল। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবও কিছু এল, আর সেই প্রভাব ফরাসী প্রভাবের প্রতিষেধকরূপে কার্যকর হল, জরমান জাতিকে তার নিজের অভিজ্ঞতার দিকে আকৃষ্ট ক'রলে, নিছক ফরাসী নাট্য আর অন্যবিধ সাহিত্যের নকল থেকে জরমান মনীষাকে টেনে নিয়ে আসতে সাহায্য ক'রলে। এই যুগের দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন Wolfe ভোল্‌ফ (১৬৭৯—১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ), Kant কান্ট (১৭২৪—১৮০৪), Fichte ফিখ্‌টে (১৭৬২—১৮১৪), Schelling শেলিঙ্ (১৭৭৫—১৮৫৪) ও Hegel হেগেল (১৭৭০—১৮৩১)—এঁদের কৃতি, গোটের যুগে জরমান জাতিকে দার্শনিক আর চিন্তাশীল ব'লে জগৎ সমক্ষে তুলে ধ'রলে। গোটের যুগ এক হিসাবে ছিল যেন জরমানির মধ্য যুগের অবসানের পরে আধুনিক যুগের পত্তনের কাল। গোটের জীবৎকাল ছিল ১৭৪৯ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এঁর সমসাময়িক লেখক, কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতকার, সমালোচক, ঐতিহাসিকদের মধ্যে কতকগুলি এমন গুণী লোক ছিলেন যাঁরা বিশ্বসাহিত্যে অমর হ'য়ে আছেন—Klopstock ক্লপস্টক (১৭২৪—১৮০৩), Lessing লেসিঙ (১৭২৯-১৭৮১), Herder হের্ডের (১৭৪৪—১৮০৩), Schiller শিলর (১৭৫৯—১৮০৫), Handel হান্ডেল (১৬৮৫—১৭৫৯), Gluck গ্লুক (১৭১৪—১৭৮৭), Mozart মোৎসার্ট (১৭৫৬—১৭৯১) ও Bach বাখ্‌ (১৬৮৫—১৭৫০)।

গোটে তাঁর সমসাময়িক মানসিক—বৈজ্ঞানিক আর সাংস্কৃতিক—জীবনে পূর্ণ অংশ গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁর যৌবনকালে জরমান সাহিত্যে যে নবীন আন্দোলন দেখা দেয়, যেটা ছিল প্রচলিত সাহিত্যিক আর সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে তরুণ দলের বিদ্রোহের পরিচায়ক আর জরমানিতে যা Sturm und Drang বা Storm and Stress অর্থাৎ "বিক্ষোভ ও অশান্তি" আন্দোলন (ওদুদ সাহেবের অনুবাদে, "ঝড়-ঝাপটা" আন্দোলন) নামে পরিচিত, তাতে তিনি পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করেন। গোটে যেমন দীর্ঘজীবী ছিলেন—৮৩ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন—তেমনি জীবনের অভিজ্ঞতা, আর তার সঙ্গে নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন আর শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, তাঁর ছিল অতি গভীর, অতি ব্যাপক। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ছিল লক্ষণীয়, তাঁর কবি-কল্পনা ছিল লোকোত্তর, আর সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার আধারে মানব জীবনের সাহিত্যিক প্রতিফলনও তিনি তাঁর রচনায় যা দিয়ে গিয়েছেন, তা চিরস্থায়ী হ'য়ে থাকবে। ইউরোপের সংস্কৃতি, গ্রীক ও লাতীন সাহিত্য, ফরাসী ও ইংরেজি সাহিত্য, গেলিক সাহিত্যের অনুবাদ—এসবে তিনি মশগুল ছিলেন। আবার আরবী আর ফারসী সাহিত্য অনুবাদের সাহায্যে প'ড়ে তিনি তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে কবিতা লেখেন, শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ প'ড়ে তাঁর এই নাটক সম্বন্ধে লেখা সুন্দর কবিতাটি তো ভারতবর্ষেও সুপরিচিত —নিজ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Faust 'ফাউস্ট' নাটকের প্রস্তাবনাতে তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ করেন।

পৃথিবীর এহেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ বাঙলা পাঠকের পক্ষে এতদিন ছিল না। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব বাঙলা ভাষার সে অভাবের পূরণ অনেকটাই ক'রলেন। তাঁর বই একাধারে গোটের জীবন-চরিত, তাঁর কাব্যের আর অন্য রচনার সঙ্গে পরিচায়ক, তাঁর জীবনীর ও রচনার সমালোচনা। গোটে সম্বন্ধে আধুনিক সংস্কৃতিকামী মানুষের যা জানা দরকার, যেটুকু জেনে সে আনন্দ পাবে আর শিক্ষালাভ ক'রবে, সে সমস্তই যেন একই সম্পুটে সংক্ষেপে গ্রন্থকার ধ'রে দিয়েছেন। গ্যেটের জীবনচরিত আর রচনার আলোচনায় হাত দেবার আগে, ওদুদ সাহেব রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর বাঙলা সাহিত্যের অন্য লেখক সম্বন্ধে সার্থক সুন্দর আর সরস পরিচয়-গ্রন্থ লিখে, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে সূক্ষ্মদৃষ্টিযুক্ত দরদী সহৃদয় দ্রষ্টা-রূপে নিজের "ভাবয়ত্রী" শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—যে শক্তি কবির "শ্রম" ও তাঁহার "অভিপ্রায়", অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য-রচনা আর তাঁর আদর্শকে প্রকাশ ক'রে থাকে।

শেক্‌স্পিয়রের মত অতগুলি নাটক গোটে লেখেন নি; কিন্তু ডাক্তার স্যামুয়েল জনসন ইংরেজ কবি ও লেখক অলিভার গোল্ডস্মিথ সম্বন্ধে যা ব'লে গিয়েছেন, সে কথা নিঃসঙ্কোচে গোটের সম্বন্ধেও বলা যায়—সাহিত্যের এমন কোনও বিভাগ নেই, যাহা তিনি স্পর্শ করেন নি, এবং তাঁর দ্বারা স্পর্শ করা এমন কিছুই নেই, যা তিনি অলংকৃত করেন নি। গোটের জীবনও ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। জীবনের বিভিন্ন যুগে একাধিক নারীর প্রতি গোটের মন রাগরঞ্জিত হ'য়েছিল, এই অনুরাগের ছাপ তাঁর রচনায় নানাভাবে প'ড়েছে, গোটের জীবনীর চর্চায় তা বাদ দিলে চলে না। কাজী সাহেব তাঁর বইয়ে প্রশংসনীয় শালীনতার সঙ্গে সে সমস্ত কথার অবতারণা ক'রেছেন। গোটে-জীবনের আর গোটে-চরিত্রের পটভূমিকা-স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে জরমানির মানসিক আর সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকেরও দিগ্‌দর্শনও করিয়ে গিয়েছেন। এ বিষয়ে গ্রন্থকার ইংরেজিতে গোটের যতগুলি প্রামাণিক জীবনচরিত পাওয়া যায়, সবগুলির বিচার ক'রে তাঁর এই সম্পূর্ণ গোটে-জীবনী উপস্থাপিত ক'রেছেন।

যাঁরা গোটের কাব্যামৃতের রস আস্বাদ ক'রতে চান, তাঁদের পক্ষে এই বই সহজলভ্য-রূপে গোটের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। বিস্তর ছোট ছোট কবিতার অতি সরস সোজা বাঙলা অনুবাদ আছে। এছাড়া, গোটের কৃতি অনেক গদ্য-রচনার অনুবাদও এতে স্থান পেয়েছে। নাটক উপন্যাস প্রভৃতি বড় বড় বইয়ের সটীক সংক্ষিপ্তসারও গ্রন্থকার দিয়েছেন। কাজী সাহেব গোটের মূল জরমানের সঙ্গে তেমন পরিচিত নন, তাঁর অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদের আধারের উপরই হয়েছে। কিন্তু তাতে খুব ক্ষতি হয়েছে ব'লে মনে হয় না। যাঁরা বিশ্বমানবের উপযোগী কবি, তাঁদের কাব্যে ও কবিতায় মূল ভাষার সৌন্দর্যটি অন্য ভাষায় পুরাপুরি আসা অসম্ভব, কিন্তু তাঁদের অবিনশ্বর ভাব আর চিন্তা, কবি-দৃষ্টি আর কবি-কল্পনা, এগুলি ভাষান্তর হ'লেও, এমনকি, মাঝের আর একটি ভাষার পর্দার মধ্য দিয়ে এলেও, অনেকটাই পাওয়া যাবে; অনেকটা কেন, ভাবের দিকে সবটাই পাওয়া যাবে। আমার

নিজের জরমান ভাষার সংগে পরিচয় খুব বিশেষ নেই—কিন্তু মনে হয়, গোটের রচনা-শৈলী, বিশেষতঃ কবিতায়—বেশ সরল, সহজ-বোধ্য। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব আমাদের যে কবিতার তর্জমাগুলি দিয়েছেন, সেগুলিতে ইংরেজির মতন ছন্দের অনুবাদ বাঙলায় প্রতিচ্ছন্দে করা হ'য়েছে। ছোট ছোট বাক্য নিয়েই কারবার বেশী, সেই জন্য পড়তে কষ্ট হয় না, ভাব-গ্রহণে বাধা পড়ে না।

গোটের কাব্য-সরস্বতীর সবচেয়ে লক্ষণীয়, সবচেয়ে বিরাট সৃষ্টি হ'চ্ছে Faust ফাউস্ট নাটক। দুই খণ্ডে লেখা এই বিরাট নাটকের রচনা গোটের সাহিত্য-জীবনে অনেক বৎসর ধ'রেই চলেছিল। ফাউস্ট-এর প্রথম খণ্ড নাটকীয় গুণে পরিপূর্ণ; দ্বিতীয় খণ্ডে রূপক আর কাব্য নাটকখানিকে যেন ঢেকে দিয়েছে। প্রথম খণ্ডের বহু পাঠক মিলবে; কিন্তু টীকা ভাষ্য না থাকলে, দ্বিতীয় খণ্ড সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝে বুঝে পড়ে যাওয়া কঠিন হয়। গোটের এই নাটকে ইতিহাস আছে, দর্শন আছে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা আছে, মানবচরিত্র-বিশ্লেষণ আছে, রূপকের মাধ্যমে মানব-জীবন আর মানব-সংস্কৃতির অনেক দিক্ দেখানো হ'য়েছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা, H. B. Cotterill কোটারিলের মতন টীকাকার না পেলে, আর জরমান শিল্পী Franz Stassen শ্‌তাসেন্‌এর মত চিত্রকরের আঁকা ছবিগুলি না দেখলে, Faust-এর দ্বিতীয় খণ্ডের রসগ্রহণ আমার পক্ষে হ'য়ে উঠ্‌ত না। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব বাঙালী পাঠকের জন্য যা কেউ আগে করেন নি, সেই কাজ নিতান্ত সহজভাবেই এবং অবশ্যম্ভাবী আর অপরিহার্য-রূপেই নিজের বইয়ে ক'রেছেন—তিনি তাঁর বইয়ের প্রথম খণ্ডে ফাউস্টের প্রথম খণ্ডের একটি সার-সঙ্কলন ক'রে দিয়েছেন; এই সার-সঙ্কলনের মধ্যে এই নাটকের অনেকটারই বাঙলা অনুবাদ অতি সরস সুন্দর ভাষায় তিনি দিয়েছেন; আর দ্বিতীয় খণ্ডে তেমনি ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ডেরও অনুরূপ, তবে অপেক্ষাকৃত একটু ছোট, সংক্ষিপ্ত-সার দিয়েছেন। এটি আর একটু বিস্তারিত হ'লে ভালই হ'ত।

দুই খণ্ডে সমস্ত বইখানি বাঙলা ভাষার অপূর্ব সম্পদ হয়ে দেখা দিয়েছে। গদ্যে পদ্যে গোটের সূক্তিমুক্তাবলী এতে অজস্র ধারে সংগ্রথিত হ'য়েছে। গোটের ভূয়োদর্শন আর চিন্তা, কবিতা আর সৌন্দর্যবোধ, এসবের এমন সংগ্রহ আর কোনও বাঙলা বইয়ে পাওয়া যাবে না। গোটে সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষাতেও এমন সম্পূর্ণ আর সর্বাঙ্গসুন্দর বই দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের মত, শেক্‌স্পিয়রের মত, গ্রীক ট্রাজিক কবিদের মত, বাইবেলের মত, মহা-ভারতের মত, গোটেও বহু বহু মহাবাক্যরত্নের খনি। সেসবের পরিচয় দেবার অসম সাহস এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ক'রবো না। ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি যে ক্ষুদ্র কবিতাটিতে, কেবল সেইটি ও ওদুদ সাহেবের করা তার বাঙলা অনুবাদটি উদ্ধার করে দেবার লোভ কিন্তু সম্বরণ ক'রতে পারছি না—

Alles Vergaengliche — নশ্বর যা কিছু
its nur ein Gleichnis; — সবই প্রতীক;
das Unzulaengliche — যা অপূর্ণ
hier wird's Ereignis
এখানে বিকশিত হয় পূর্ণতায়;
das Unbeschreibliche — যা অবর্ণনীয়;
hier ist es getan;
রূপায়িত হয় তা এইখানে;
das Ewig-Weibliche — শাশ্বতী নারী
Zieht uns hinan.
চালিত করে ঊর্ধ্ব পানে।

গোটের শ্রেষ্ঠ রচনা ফাউস্টের সম্বন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব সত্যই ব'লেছেন—

"এই কঠিন আত্মজয়ের—কবির ভাষায়, বিকাশের আনন্দের"—বিচিত্র ছবি ও বিচিত্রের ইঙ্গিত ফাউস্টে আছে বলেই জীবন-আলেখ্য আর জীবন-দর্শন হিসাবে এর এত মর্যাদা। জগতের যেসব সত্যকার মহাকাব্য—যথা মহাভারত, ওল্ড টেস্টামেণ্ট, শাহনামা, ডিভাইন কমেডি—সেসবের পাশেই এর গৌরবময় আসন। ইলিয়াড, গ্রীক নাটক ও শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক গঠনের পরিচ্ছন্নতায় এর চাইতে হয়তো মহত্তর, কিন্তু ভাবের বৈচিত্র্যে ও ব্যাপকতায় নয়।"

এ হেন বিরাট গ্রন্থ আর তার দ্রষ্টাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বজাতীয় স্ব-ভাষাভাষী বাঙালী জনগণের সমক্ষে উপস্থাপিত ক'রলেন ব'লে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব আমাদের সকলের সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

সমগ্র বইখানির ভিতরে আমরা যে সংস্কৃতিযুক্ত চিত্তের পরিচয় পাচ্ছি তার দ্বারাই এটিকে গৌরবান্বিত ক'রে রেখেছে। এক বৎসরের অধিককাল হ'ল, এই বই প্রকাশিত হ'য়েছে। বইখানি বেরোবার প্রায় সংগে সংগেই কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে উঠ্‌ল, যে দাঙ্গার বিষাক্ত হাওয়া সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে প'ড়েছে। এই দাঙ্গার মূলে যে ভেদ-মূলক চিন্তাশৈলী কাজ ক'রছে, যে, ভারতের হিন্দু আর মুসলমান, রক্তে ভাষায় ইতিহাসে সংস্কৃতিতে জীবনযাত্রায় মনোভাবে এক হ'লেও কেবল ধর্মের জন্যই একেবারে পৃথক্ দুইটি জাতির মানুষ, কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের বাঙলা ভাষায় লেখা এই বই সেই চিন্তা-শৈলীর অন্যতম নীরব প্রতিবাদ। সচ্চিন্তা আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সব মানুষ এক; এইরূপ বই এখনকার "খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত" ভারতকে সত্য শিব সুন্দরকে অবলম্বন ক'রে এক হ'য়ে জীবনে পরমার্থ অর্জন ক'রবার জন্য আহবান ক'রছে—গোটের ভাষায়—

In Gaenzen, Guten, Schoenen
Resolut zu leben.

"পূর্ণ, শিব, সুন্দরের মধ্যে দৃঢ়চিত্ত হয়ে জীবন পালনের জন্য।"

---

* কবিগুরু গোটে—চরিতকথা ও সাহিত্য পরিচয়—কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত। দুই খণ্ড—প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠাসংখ্যা ৷৷৹+২৫৫, প্রকাশক জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৫৲; দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠাসংখ্যা ত+১৬৮+।৹ প্রকাশক ভারত সাহিত্য-ভবন, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৲। সচিত্র। প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৩ সাল।

মালিক অম্বরের সংগ্রাম ও মৃত্যু

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌.এ. পি-এইচ্‌.ডি

১। মালিক অম্বর ও রাজু

মুরতাজা শাহকে আহমদনগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পরে মালিক অম্বর অন্যান্য কাজের মধ্যে দুইটি বিষয়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তম্মধ্যে একটি হইল দেশের অপরাপর আমির ওমরাহগণকে তাঁহার পক্ষে আনয়ন করা অথবা যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহার বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং দ্বিতীয়টি হইল, মুঘলের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা ও তাহারা আহমদনগর রাজ্যের যে যে স্থান অধিকার করিয়াছে যতদূর সম্ভব তাহাদের পুনরুদ্ধার করা। কঠিন হইলেও এই দুইটি কার্যই বিচক্ষণতার সহিত সমাধান করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহার রাজ্য বালির বাঁধের মতই যে কোন সময়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে।

আমির ওমরাহগণের মধ্যে কেহ কেহ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিস্তার করিয়া যেন স্বাধীন রাজার মত বিরাজ করিতেছিল। সকলেই যদি ঐরূপ স্বাধীনভাবে থাকে এবং নিজ মতানুসারে তাহাদিগকে আরও চলিতে দেওয়া হয়, তবে ঝগড়া-বিবাদ সর্বদাই লাগিয়া থাকিবে, দেশে বেশীদিন শান্তি রাখা সম্ভব হইবে না এবং তাসের ঘরের মত ঐ এক একটি ক্ষুদ্ররাজ্য শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়িবে; কাহারও কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই সব আমির ওমরাহগণের মধ্যে তখন সর্বকালের শক্তিশালী ছিলেন রাজু। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল রাজা প্রহ্লাদ, কিন্তু তিনি রাজা নামেই সকলের নিকটে সাধারণতঃ পরিচিত ছিলেন। মুঘল সেনানী তাঁহাকে রাজার পরিবর্তে রাজু বলিয়া অভিহিত করিত এবং ইহা হইতেই ক্রমে তাঁহার নাম রাজা হইতে রাজুতে পরিণত হইল। তিনিও অম্বরের মত অতি সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় কর্মনৈপুণ্যে, অধ্যবসায়ে ও অসাধারণ ক্ষমতায় ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেন। অম্বর অপেক্ষা তাঁহার ক্ষমতা ও রাজ্য বিস্তৃতি কম হইলেও উভয়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী ছিল না এবং অম্বর তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় করিতেন, কারণ প্রকৃত দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইলে কে যে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হইবে তাহা বলা কঠিন, তবে যুদ্ধ তাঁহাদের মধ্যে অপরিহার্য ছিল, কারণ একের স্বার্থ অপরের পরিপন্থী ছিল। বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া উভয়ের মধ্যে বেশী দিন নীরবতায় কাটিতে পারে না এবং কাটিলও না। অল্পকাল মধ্যে একটা বিবাদের কারণও ঘটিল। অম্বরের উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজা মুরতাজা শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে রাজুর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন—যাহাতে তাঁহার ক্ষমতা খর্ব করা যায়। অম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য রাজুও কোন একটা সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিলেন। রাজার আহ্বান লইয়া তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না এবং ত্বরায় পরেন্দা দুর্গে গমন করিয়া মুরতাজা শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও অম্বরকে দমন করিবার আশ্বাস দিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া অম্বর শত্রুর বিরুদ্ধে দ্রুতবেগে পরেন্দার অভিমুখে গমন করিলেন। কয়েকদিন পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে খণ্ড-যুদ্ধ ব্যতীত কোন বড় রকমের যুদ্ধ হইল না; উভয় পক্ষই বিপক্ষের সৈনিকদের গতিবিধির উপরে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিল যাহাতে কেহ কাহাকেও অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে না পারে। অম্বর শত্রুর অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া একটু বিচলিত হইলেন এবং ভাবিলেন হয়তঃ তাঁহার পক্ষে একাকী রাজুকে পরাস্ত করা সম্ভবপর নাও হইতে পারে, তাই তিনি মুঘলের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। মুঘল সেনাপতি খান্‌-ই-খানান তাঁহাকে প্রয়োজনমত সাহায্য দান করিলেন এবং এইরূপে নববলে বলীয়ান হইয়া তিনি রাজুকে আক্রমণ করিলেন ও যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন; অনন্যোপায় হইয়া রাজু তাঁহার রাজধানী দৌলতাবাদে পলায়ন করিলেন।

কিছুদিন আবার নীরবে কাটিল, তারপরে সুযোগ বুঝিয়া অম্বর আবার রাজুকে আক্রমণ করিলেন। রাজু পরাস্ত হইয়া মুঘলের সাহায্য ভিক্ষা করিল; মুঘল সেনাপতি খান্‌-ই-খানান এবার তাঁহার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য দৌলতাবাদে গমন করিলেন। রাজুও আশান্বিত হইলেন, কিন্তু মুঘল সেনাপতি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃত পক্ষে কাহাকেও যুদ্ধে সহায়তা করিলেন না এবং উভয় পক্ষকেই যুদ্ধে বিরত হইতে বাধ্য করিলেন। অবশেষে মুঘল সেনাপতির অনুরোধে বাধ্য হইয়া অম্বর রাজুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া পরেন্দাতে ফিরিয়া গেলেন।

উপরোক্ত ঘটনার পরে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে অম্বর আহমদনগর রাজ্যের রাজধানী পরেন্দা হইতে পুনার উত্তরে জুনার নামক স্থানে পরিবর্তন করিলেন* এবং ইহার পরে তিনি রাজুকে পরাভূত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপরদিকে অত্যাচার ও কুশাসনের ফলে রাজু তাঁহার প্রজা ও সেনানী সকলের নিকটেই ভয়ানক অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার শাসনমুক্ত হইবার জন্য তাহারা ব্যগ্র ছিল। সেনানীর মধ্যে অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মালিক অম্বরের নিকটে গমন করিল এবং তাঁহার অত্যাচারের কাহিনী একে একে সমস্ত রাজার নিকটে বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে এই অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। ইহাতে অম্বরের খুব সুবিধা হইল, একদিকে তাঁহার দল পুষ্ট হইল এবং অপরদিকে রাজুকে আক্রমণ করিবার একটা সুযোগও মিলিল। তিনি রাজুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন;; উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, কিন্তু নিজের দলের মধ্যে একতা ও সংগঠনের অভাবে রাজু নিজেকে বেশীদিন রক্ষা করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি ধৃত ও বন্দী হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দৌলতাবাদ ও ইহার চারিদিকের স্থানসমূহ যাহা এতদিন রাজুর অধীনে ছিল তাহা আহমদনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

বন্দী অবস্থায় রাজু জুনার ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে তিন চারি বৎসর কাটাইলেন। অবশেষে তাঁহাকে বন্দীশালা হইতে মুক্ত করিবার এবং দেশে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবার একটা ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি হয়—এই সংবাদ যখন অম্বরের নিকটে পৌঁছিল তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হইলেন এবং যাহাতে ইহা কার্যকরী না হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ ষড়যন্ত্রের উদ্ভব না হয় তজ্জন্য তিনি রাজুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

---

*ইহার পরে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদে এবং তাহার কিছুকাল পরে খিরকিতে তিনি রাজধানী পরিবর্তন করেন। এই খিরকির নাম পরে আওরংগজেব আওরংগাবাদ রাখেন।

ইহার পরে মালিক অম্বরের পথ অনেকাংশে কণ্টকবিহীন ও প্রশস্ত হইল; অপরাপর যে সব দলপতি ছিল তাহাদিগকেও তিনি একে একে দমন করিলেন এবং পরে রাজ্যের ভিতরে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন শত্রু রহিল না যে তাহার কার্যে বাধা জন্মাইতে পারে। তৎপর তিনি বহিঃশত্রু মুঘলের বিরুদ্ধে আহমদনগরের শক্তি নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইলেন।

২। মালিক অম্বরের সহিত মুঘল ও বিজাপুরের সম্বন্ধ

স্বার্থের সংঘাতে অম্বরের সহিত মুঘলের বন্ধুত্ব স্থায়ী হওয়া অসম্ভব ছিল। যুদ্ধ উভয় পক্ষের মধ্যে লাগিয়াই থাকিত। যদি বা তাহাদের মধ্যে কখনও কিছুকালের জন্য যুদ্ধ-বিরতি হইত তাহা সাধারণতঃ কোন এক পক্ষের সাময়িক পরাভবের জন্য এবং যখনই আবার বিজিত পক্ষের শক্তি সঞ্চয় হইত, সেই পক্ষ সুযোগ মত আবার তাহার পরাভবের গ্লানি কাটাইবার জন্য এবং বিজিত স্থানগুলি পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তৎপর হইত। স্বকীয় স্বার্থ বলি দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। যতদিন অম্বরের সহিত রাজুর বিরোধ ছিল ততদিন মুঘলেরা এই অন্তর্বিবাদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া মাঝে মাঝেই আহমদনগর রাজ্যে অতর্কিতে আক্রমণ চালাইয়াছে এবং সম্ভবমত কোন কোন স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে তাহারা অম্বরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল; আহমদনগরের প্রায় দুইশত মাইল পূর্বদিকে নন্দের নামক স্থানে উভয় পক্ষে একটি প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, অম্বর নিজে আহত হন এবং অল্পের জন্য শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পান। তাঁহার সহচরগণ অসীম বীরত্ব সহকারে তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে আহত অবস্থায় লইয়া পলায়ন করে।

মুঘলদের উদ্দেশ্য ছিল অম্বর ও রাজুর মধ্যে ঝগড়া ও অন্তর্বিরোধ জিয়াইয়া রাখা, কারণ তাহা হইলে যখন এইরূপ যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে উভয় পক্ষ দুর্বল হইয়া পড়িবে তখন সমস্ত আহমদনগর-রাজ্য জয়ের পথ প্রশস্ত হইবে। যদি একজন অতিরিক্ত শক্তিশালী হয় তবে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা ও আয়ত্তে আনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইবে। অম্বরও মুঘলদের এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই রাজুর বিরুদ্ধে সময়োচিত আঘাত হানিয়া তিনি তাঁহার পথ পরিষ্কার করিয়া লন এবং মুঘলদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেন। সেই সময়ে তাঁহার ন্যায় নির্ভীক, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনৈতিক দাক্ষিণাত্যে অপর কেহ ছিল না। মুঘলেরা ভালভাবে বুঝিয়াছিল যে, তাঁহাকে বশীভূত করা বড় সহজ নয়। তিনি যে অমোঘ-অস্ত্র মুঘলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা তিনি এই প্রবল পরাক্রমশালী ও দুর্ধর্ষ শক্তিকে দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তারে শুধু দমন করিয়া রাখেন নাই, অনেক বিজিত স্থান তাহাদের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন এবং এমন কি কোন কোন সময়ে আহমদনগর রাজ্য হইতে তাঁহাদিগকে বহুদূরে পর্যন্ত বিতাড়িত করিয়া নিজের রাজ্যের যথেষ্ট বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। এই অভিনব অস্ত্র হইল গরিলা যুদ্ধ'। ইহাতে সামনা সামনি যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না, অথচ প্রবল শত্রু-সেনাকে কাবু করার পক্ষে ইহা যেমন কার্যকরী হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। এই যুদ্ধ-প্রণালী অনুযায়ী এক একদল সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পাহাড় ও পর্বতের অন্তরালে সুবিধা মত এক থানে অবস্থান করিতে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা অতর্কিতে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করে, তাহাদের ধনসম্পত্তি, সমরোপকরণ এবং খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি লুণ্ঠন করে। এইরূপ যুদ্ধ আহমদনগর রাজ্যে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল, কারণ উহার অনেকাংশ পাহাড়ে ও পর্বতে পূর্ণ, সুতরাং দেশের প্রাকৃতিক সাহায্য মালিক অম্বরের পক্ষে ছিল এবং যাহারা পদব্রজে বা অশ্বপৃষ্ঠে পাহাড়ে ও পর্বতে ত্বরিতবেগে আরোহণ ও অবতরণ করিতে খুব পটু সেই নির্ভীক বীর্যবান মারাঠাগণও তাঁহার পক্ষে ছিল। তিনি এই মারাঠাদিগকে অধিক সংখ্যায় তাঁহার সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করিয়া নূতন সমর পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান করিলেন এবং তাহাদিগকে মুঘলদের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি শুধু এখানেই ক্ষান্ত থাকিলেন না, নিকটবর্তী স্বাধীন রাজ্য বিজাপুরের সহিত সখ্য স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন—যাহাতে তাঁহার ও বিজাপুরের মিলিত শক্তি মুঘলের পক্ষে পরাজিত করা আরও কঠিন হয়। তখন বিজাপুরের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ। পাছে মুঘলেরা আবার কখনও তাঁহার রাজ্য দখলে প্রয়াসী হয় সেই ভয়ে তিনিও সন্ত্রস্ত ছিলেন, সেই জন্য তিনি অতি সহজেই মালিক অম্বরের ডাকে সাড়া দিলেন এবং উভয়ের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিলেন। মালিক অম্বর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতে খাঁর সহিত বিজাপুরের একজন সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী-আমিরের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন এবং এই বিবাহোপলক্ষে বিজাপুরে আনন্দোৎসবের খুব সমারোহ হইয়াছিল; চল্লিশদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল এবং বিজাপুরের রাজা স্বয়ং এই শুভকার্যে শুধু যোগদান করেন নাই, আশি হাজার টাকা কেবল আতস বাজির জন্য সরকারী তহবিল হইতে তিনি খরচ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া অম্বর আহমদনগরের অনেকগুলি স্থান মুঘলের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু মুঘলেরা ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল এবং অনেক সৈন্যসামন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। এদিকে বিজাপুর প্রথমবার দশহাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং পরে আরও তিন-চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার সাহায্যের জন্য পাঠাইল।

মুঘলেরা কোনমতেই তাঁহার সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তিনি সাধারণতঃ সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া গরিলা যুদ্ধে তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন এবং আরও অনেকগুলি স্থান-সহ আহমদনগর দুর্গ অধিকার করিলেন। এই বিরাট সাফল্যে আহমদনগর রাজ্যে অভূতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি হইল; চারিদিকে বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল এবং নিত্য নব উৎসব-আয়োজনে দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। অম্বরের খ্যাতি ও যশ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অপরদিকে পরাজয়ের অপমান মুঘলদিগকে তীরের মত বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা নব-সাজে সজ্জিত হইয়া আবার এই হাবসী বীরের বিরুদ্ধে ধাবমান হইল—তিনিও ইহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। বিজাপুর ব্যতিরেকে নিকটবর্তী আরও দুইটি স্বাধীন রাজ্য—গোলকোণ্ডা ও বিদারের সহিতও তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই সম্মিলিত শক্তিতে বলীয়ান হইয়া মুঘলের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। পূর্বের ন্যায় এইবারও তাঁহার গরিলা যুদ্ধে মুঘলদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল এবং অনেক সৈন্যসামন্ত হারাইয়া অবশেষে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল।

এখানে আমরা অম্বরের একটি সদ্‌গুণের পরিচয় পাই—এই যুদ্ধে আলিমর্দান খাঁ নামে একজন মুঘল বীর সেনাপতি আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয় এবং আহমদনগরের সেনানী তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দৌলতাবাদে লইয়া যায়। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অম্বর তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন এবং সেবাশুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলিমর্দান খাঁ কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শত্রুর প্রতি এইরূপ সুন্দর ও উদার ব্যবহার সেইযুগে আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই। এই উদাহরণ হইতেই বুঝা যায় যে অম্বর বীরের প্রতি কিরূপ উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

এই পরাজয়ের সংবাদে তদানীন্তন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তিনি নিজেই দাক্ষিণাত্যে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু তাঁহার পারিষদবর্গ তাঁহাকে

যাইতে নিষেধ করাতে তিনি তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী একজন দক্ষ সেনাপতিকে পুনরায় অম্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাহারা দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া খিরকির অভিমুখে রওনা হইল।

অপরদিকে মালিক অম্বর বিজাপুর, গোলকোণ্ডা ও বিদার হইতে প্রয়োজনমত সামরিক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া খিরকিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কয়েকজন বীর সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য মুঘলের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। এই সেনানী মুঘলদিগকে যতদূর সম্ভব লুণ্ঠনাদি দ্বারা উত্যক্ত করিতে লাগিল কিন্তু এবার তাহারা কিছুতেই মুঘলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না এবং পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এই সংবাদ পাইয়া মালিক অম্বর তৎক্ষণাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে রওনা হইলেন এবং খিরকির নিকটবর্তী রোসলগড় নামক স্থানে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল; এইবার অম্বর জয়ী হইতে পারিলেন না, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি রণক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎগমন করিলেন, মুঘলেরা চার-পাঁচ মাইল পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু পরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল এবং সেই সুযোগে অম্বরও পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। (ফেব্রুয়ারী, ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে)।

পরদিন মুঘলেরা খিরকিতে গমন করিল এবং কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া তাহারা ঐ সুন্দর শহরের অট্টালিকাগুলি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল এবং অগ্নিসংযোগে স্থানটি ভস্মীভূত করিল। জনকোলাহলপূর্ণ খিরকি-শহর নির্জন শ্মশানে পরিণত হইল।

এই পরাজয়ে মালিক অম্বরের অতিশয় ক্ষতি হইল। তাঁহার সেনানীর মধ্যে অনেকে বন্দী হইল অথবা প্রাণ হারাইল এবং যাহারা ভাগ্যবশতঃ প্রাণ লইয়া পলাইতে সমর্থ হইল তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনেক সমরোপকরণ এবং অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতিও তাঁহার হারাইতে হইল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি দমিবার পাত্র নন; আবার নূতন উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন এবং অবস্থার উন্নতি করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এখনই মালিক অম্বর মুঘলের অধীনতা স্বীকার করিবে না ইহা তাহারাও বেশ জানিত। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীর আরও অধিক সমরায়োজন করিয়া রাজকুমার খুরমকে (পরে শাজাহান) দাক্ষিণাত্য অভিযানের সমস্ত ভারার্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ করিলেন। রাজকুমার বিজাপুর, গোলকোণ্ডা ও আহমদনগরকে বশে আনিবার জন্য প্রত্যেকের নিকটে দূত পাঠাইলেন। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা উভয়েই মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিল। মালিক অম্বর দেখিলেন এ সময় অত্যন্ত খারাপ, তাঁহার পক্ষে একাকী মুঘল, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব; তাই তিনিও মুঘলদের সর্ত্ত মানিয়া লইলেন। তিনি যে সমস্ত স্থান মুঘলদের নিকট হইতে হস্তগত করিয়াছিলেন এই সর্ত্ত অনুযায়ী সেই স্থানগুলি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইল। তাঁহার এইরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল সময় কাটান এবং আবার সুযোগ পাইলেই ঐসব সর্তে জলাঞ্জলি দিয়া সমস্ত স্থান পুনরুদ্ধার করা। কাজেও তাহাই হইল; শাজাহানের অনুপস্থিতির সুযোগে তিনি বিজিত স্থানগুলি মুঘলদের হস্ত হইতে পুনরায় অধিকার করিলেন এবং নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতরে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া বহু স্থান দখল করিলেন। মুঘলদের ভিতরে চারিদিকে এত ভীতির সঞ্চার হইল যে কেহ দুর্গের বাহির হইতে সাহসী হইত না। এই সব সংবাদে আবার শাজাহান ত্বরায় দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া অম্বরের গতিরোধ করিলেন এবং তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বিজিত স্থানগুলি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিলেন।

আবার নীরবে কিছুকাল অতিবাহিত হইল; পরিশেষে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতির একটা প্রকাণ্ড পট-পরিবর্তন হইল। যে বিজাপুর রাজ্য এতদিন অম্বরকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল এবং তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা এক্ষণে ছিন্ন হইল; এইরূপ হইবার কতকগুলি কারণ ছিল। আহমদনগর ও বিজাপুরের সীমানায় অবস্থিত কতকগুলি স্থান বিশেষতঃ সোলাপুর (Sholapur) দুর্গ লইয়া এই দুই রাজ্যের মধ্যে পূর্বে প্রায়ই ঝগড়া লাগিয়া থাকিত; এক্ষণে আবার নূতন করিয়া এই ঝগড়ার উৎপত্তি হইল। অধিকন্তু বিজাপুরের রাজা অম্বরের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কখনও অন্তরের সহিত খুসী হন নাই, কারণ সম-ক্ষমতা-সম্পন্ন অথবা অধিক ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী-রাজ্য সকল সময়েই পার্শ্বের অপরাপর রাজ্যের ভীতির কারণ হয়। এতদ্ব্যতীত বিজাপুর রাজ্যের অনেক আমির ওমরাহ অম্বরের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ছিল এবং তাহারা তাঁহার পতনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। মালিক অম্বর এবং বিজাপুরের রাজা উভয়েই তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুঘলের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু মুঘলেরা বিজাপুরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং অম্বরকে নিরাশ করিলেন।

সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া অম্বর গোলকোণ্ডার সহিত মিলিত হইলেন এবং বিপক্ষকে সুযোগ না দিয়া বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। বিজাপুর রাজ তাঁহার অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হইয়া বিজাপুর দুর্গের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অম্বর দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মুঘলের সাহায্য বিজাপুরে পোঁছিল এবং তাহারা অম্বরকে বিজাপুর আক্রমণ বন্ধ করিতে এবং পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিল। অগত্যা তিনি আহমদনগরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। তিনি পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মুঘল ও বিজাপুরের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি ভীমা নদী পার হইয়া আহমদ নগরের প্রায় দশ মাইল দূরবর্তী ভাটোডি নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন। এখানে ভাটোডি নামক যে হ্রদ আছে ইহার নামানুসারে এই স্থানের নাম হইয়াছে ভাটোডি। ইহার পূর্বদিকে কেলি নদী প্রবাহিতা; সুতরাং আত্মরক্ষার পক্ষে এই স্থানটি অতি সুন্দর। শত্রু সৈন্যের আগমনের পথ বন্ধ করিবার জন্য তিনি হ্রদের বাঁধ কাটিয়া দিলেন, জলে চারিদিক এত কর্দমাক্ত হইয়া উঠিল যে মুঘল ও বিজাপুরের সৈনিকগণের পক্ষে চলাফেরা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল। ইহার উপর প্রবল বারিপাতের ফলে তাহাদের দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু তাহাদের চরম দুর্দশা হইল খাদ্যাভাবে। দিনের পর দিন অনেককে অনাহারে কাটাইতে হইল; বিজাপুর হইতে কিছু খাদ্য প্রেরিত হইল বটে; কিন্তু অম্বরের আক্রমণের জন্য ঐগুলি তাহাদের নিকটে পোঁছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া অনেকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অম্বরের শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। এইরূপে অম্বরের সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মুঘল ও বিজাপুরের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল।

উভয় পক্ষ পাঁচ ছয় মাইল ব্যবধানে ছিল, আর অধিককাল এইভাবে কাটিল না এবং দুই পক্ষই রণসাজে সজ্জিত হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইল। কিন্তু মুঘল ও বিজাপুরীগণ অম্বরের প্রচণ্ড আক্রমণ বেশীক্ষণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না এবং পরাস্ত হইয়া তাহারা রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। কিন্তু অম্বর তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন এবং অনেককে ধৃত করিয়া বন্দী করিলেন। (অক্টোবর ১৬২৪ খৃষ্টাব্দ)।

এই যুদ্ধে যে কয়জন সাধারণ সেনাপতি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাঁহাদের মধ্যে শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলা অন্যতম। অম্বরের পক্ষে এইভাবে দুইটি প্রবল পরাক্রমশালী সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করায় আহমদনগরের ইতিহাসে একটি নূতন যুগের সৃষ্টি হইল এবং ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন হইয়া দাঁড়াইল। হলদিঘাটের যুদ্ধ যেমন আজও প্রত্যেক রাজপুতের ধমনীতে ধমনীতে

নবশক্তি ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে এবং মারাথনের যুদ্ধের স্মৃতিতে যেমন প্রত্যেক গ্রীকবাসীর হৃদয়ে নূতন বল ও উদ্দীপনার উন্মেষ হয়, তেমনি ভাটোডির যুদ্ধ আজও আহমদনগরবাসীর প্রাণে অভিনব উদ্যম ও আশার সঞ্চার করে।

একের পর এক বিজাপুরের অনেক স্থান অম্বর অধিকার করিলেন এবং আহমদনগরের বহু স্থানও তিনি পুনরুদ্ধার করিলেন। তাঁহার অগ্রগতি বন্ধ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না এবং এমনকি নর্মদা নদীর ওপর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তিনি মুঘলদিগকে বিতাড়িত করিলেন। এক্ষণে তিনি দাক্ষিণাত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাশালী হইলেন এবং মুঘলদের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের আশা চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, কিন্তু তিনি ইহা আর কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না।

অম্বরের মৃত্যু ও সমাধি

১৬২৬ খৃস্টাব্দের মে মাসে অশীতি বর্ষ বয়সে তিনি অমরধামে গমন করিলেন।

আহমদনগর হইতে বত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্বে আমরাপুর নামক স্থানে তাঁহার সমাধি এখনও বর্তমান। মালিক অম্বরের নামানুসারে এই গ্রামের আসল নাম হইল অম্বরপুর, কিন্তু লোকে ইহাকে অম্বরপুরের পরিবর্তে আমরাপুর উচ্চারণ করে বলিয়াই ইহা এখন আমরাপুর নামে পরিচিত। সমাধিটী খুব সাধারণ-রকমের, ইহাতে কোন প্রকার জাঁকজমক নাই; উপরে ছাদ নাই এবং ইহার কোন পার্শ্বে বাঁধান বেড়াও নাই, শুধু সমাধিটী অতি সাদাসিদেভাবে বাঁধান—ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে বার ফুট, প্রস্থে চারি ফুট ও উচ্চে আঠার ইঞ্চি এবং ইহার পশ্চিমে একটি ছোট অতি সাধারণ রকমের মসজিদ আছে।

বাঙলা বলিতে আমরা এখন কেবল পশ্চিম বা হিন্দু বাঙলা বুঝিতে পারি না; তাহা বুঝিতে পূর্ববঙ্গে বা পাকিস্থানে যে প্রায় এক কোটি ২৫ লক্ষ বাঙালী হিন্দুকে যে পাকিস্থানীরা নোয়াখালী ত্রিপুরায় বর্বরতার অভিনয় করিয়াছে, তাহাদিগের প্রদেশে রাখিতে হইয়াছে তাঁহাদিগের কথা মনে করিয়া মন বেদনায় পূর্ণ হয়। তাঁহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গে আনিয়া অধিবাসী বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয় নাই। পাকিস্থান বাঙলায় সেই সংখ্যালঘিষ্ঠরা যে সর্বদা সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাস করিতেছেন এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের—"গৃহত্যাগ করিও না" নিরাপদ স্থান হইতে প্রদত্ত এই উপদেশে শান্তি বা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছেন না—সে সংবাদ আমরা প্রায় প্রতিদিনই ভুক্তভোগীদিগের নিকট শুনিতেছি। কলিকাতায় লোকসংখ্যা যে প্রতিদিন বর্ধিত হইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই পাকিস্থানে হিন্দুদিগের উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। কেহই বাধ্য না হইলে গৃহত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত অবস্থায় অন্যত্র আসে না।

সম্প্রতি ঢাকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে:—গত ৫ই আশ্বিন পাকিস্থান বাঙলার রাজধানীতে—গভর্নরের ও প্রধান সচিব খাজা নাজিমুদ্দীনের উপস্থিতিতে হিন্দুদিগের জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা মধ্যপথ হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দীর্ঘ ৫ শত বৎসর হইতে হিন্দুদিগের এই শোভাযাত্রা—"জন্মাষ্টমীর মিছিল' ঢাকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে; তবে তাহার মধ্যে মুসলমান শাসন থাকিলেও পাকিস্থান কায়েম হয় নাই এবং ইসলাম খাঁ ও সায়েস্তা খাঁ স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ও পুরুষ-পরম্পরায় মুসলমান হইলেও তখন খাজা নাজিমুদ্দীনের শাসন ছিল না এবং তাঁহাদিগের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে ছিল না। শোভাযাত্রা যথারীতি "চৌকী", হস্তী, অশ্ব, সং প্রভৃতি লইয়া নবাবপুর হইতে অগ্রসর হয়। পুলিসের ছাড় ছিল—শান্তি সমিতি বলিয়া অভিহিত দলের কয়জন মুসলমান এবং আরও জনকয়েক মুসলমান শোভাযাত্রার সহগামী ছিলেন। পথিপার্শ্বস্থ গৃহ হইতে মুসলমান নারীরা শোভাযাত্রা দেখিতে কৌতূহল প্রকাশ করিতেছিলেন। কালেক্টারের গৃহের ছাদ হইতে ইংরেজ গভর্নর সার এফ ট্রি বোর্ন তাহা দেখিবার আশায় উদগ্রীব হইয়া ছিলেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁহার পার্শ্বেই ছিলেন। শোভাযাত্রার কতকাংশ বাদ্যসহ নবাবপুর মসজেদের সম্মুখ দিয়া যাইবার পরে কতকগুলি মুসলমান অগ্রসর হইয়া মসজেদের সম্মুখে (তখন নামাজের সময় না হইলেও) বাদ্যে আপত্তি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমরারম্ভের সঙ্কেতরূপে শোভাযাত্রার উপর ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে নাকি পুলিস বন্দুকে একটি ফাঁকা আওয়াজ করে এবং ইষ্টক নিক্ষেপের নিবৃত্তি হয়। নবাব খাজা হবিবুল্লা মসজেদেই ছিলেন। তিনি বাহির হইয়া আপত্তিকারীদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলেন—কারণ, হিন্দুরা বহুকাল হইতে জন্মাষ্টমীর মিছিলে বাদ্য লইবার অধিকার সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে আপত্তিকারীরা বলে—পূর্বে কি হইত, তাহা তাহারা শুনিতে বা মানিতে চাহে না; পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তাহারা পাকিস্থানে মসজেদের সম্মুখে বাদ্য সহ্য করিবে না।

তখন খাজা নাজিমুদ্দীন যথাসম্ভব দ্রুত ঘটনাস্থলে যাইয়া আপত্তিকারীদিগকে বুঝাইবার কিছু চেষ্টা করিয়া—"সে বড় কঠিন ঠাঁই" বুঝিয়া (এবং হয়ত কলিকাতায় রাজাবাজারে সমধর্মীদিগের হস্তে তাঁহার লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া)—অপরাধীদিগকে বিতাড়িত না করিয়া শোভাযাত্রাকারী হিন্দুদিগকেই ফিরিয়া যাইতে বলেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া পরদিন ইসলামপুর হইতে যে মিছিল বাহির হইবার কথা ছিল, তাহার ছাড়ও বাতিল করিয়া পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সম্বন্ধে সমদর্শনের পরিচয় প্রদান করেন।

অতঃপর গভর্নর নিরাশ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীন কালেক্টরের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মুসলমানদিগকে বলেন, যে মিছিল শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল বিনা বাধায় পথাতিক্রম করিয়াছে, তাহারা আজ সেই শোভাযাত্রায় বাধা দিল। তিনি তাহাদিগকে বলেন, হিন্দুরা ঈদ ও পাকিস্থান দিবস শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছেন এবং আজও তিনি বলিবামাত্র হিন্দুরা ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, পরে তিনি তাহাদিগের বক্তব্য শুনিবেন; আপাতত তাহারা জিন্নার কথা স্মরণ করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে স্ব স্ব গৃহে গমন করুক।

বলা বাহুল্য হিন্দুদিগের শোভাযাত্রায় বাধাদানে সাফল্যলাভ করিবার পর মুসলমানদিগের আর তথায় থাকিবার কোন কারণ ছিল না; তাহারা বিজয় গর্বে চলিয়া যায়। নাজিমুদ্দীন তাহাদিগকে বলেন—জিন্না বলিয়াছেন, পাকিস্থানে কোন হাঙ্গামা ঘটিলে তাহাতে পাকিস্থানের অনিষ্ট ঘটিবে এবং পশ্চিমবঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়ায় বহু মুসলমান বিপন্ন হইতে পারে।

পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ স্বাধীনতা সম্বন্ধে জিন্নার জবানের যদি কোন আন্তরিকতা থাকিয়া থাকে, তবে সে জবানের ও নাজিমুদ্দীনের প্রতিশ্রুতির মূল্য কি, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইতে পারে না। নাজিমুদ্দীন যে পুলিসের ছাড় প্রদানের পরেও শোভাযাত্রা ছাড়ের সর্ত অনুসারে পরিচালিত করিবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই,

তাহাতে হয়ত মনে করা যায়, তিনি যাহাকে "ধর্মের ডাক" বলে, তাহাই ডাকিয়াছিলেন।

একজন মৌলবী কয়জন সচিবকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা দেন এবং ব্যাপারটি সচিব সংঘকে অপদস্থ করিবার ষড়যন্ত্র মাত্র—এই কথাও বলা হইতেছে।

এ সকলই কি অভিনয় মনে করা যায় না?

হিন্দুরা যদি সত্য সত্যই ঈদের ও পাকিস্থান দিবসের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া থাকেন, তবে যে তাঁহারা ভালবাসায় নহে,—কুম্ভীরের সহিত কলহ করিয়া জলে বাস করা যায় না, মনে করিয়া তাহা করিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে মনে করা যায়। কিন্তু তাহাতেই হয়ত মুসলমানদিগের আবদারের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা যদি ঈদের ও মহরমের শোভাযাত্রায় আপত্তি করেন, অথবা আজান নিষিদ্ধ করিতে চাহেন, তবে অবস্থা কিরূপ হইবে?

পাকিস্থান বাঙলার রাজধানীতে—গভর্নরের ও প্রধান সচিবের উপস্থিতিতে—দ্বিতীয়োক্তের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ও পুলিসের ছাড় পদদলিত করিয়া হিন্দুর শোভাযাত্রায় বাধা প্রদানের পরেও কি মনে করা যাইতে পারে পল্লীগ্রামে হিন্দুর প্রথা ও ধর্মাচরণ বাধা পাইবে না? আমরা অভিযোগ পাইতেছি, কোন কোন গ্রামে মুসলমানরা হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের শঙ্খ ও সিন্দুরে ও চরণে অলক্তকে আপত্তি জানাইতেছে এবং বলিতেছে, যদি গ্রামে দুর্গাপূজা হয়, তবে তাহারা সেই স্থানে গো-কোর্বানী করিবে।

এই অবস্থায় পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে স্থান ত্যাগ ব্যতীত আর কি পথ থাকিতে পারে? ঢাকায় যাহা হইয়াছে, তাহার পরেও কি মনে করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে যে, পাকিস্থান সরকার সত্যসত্যই পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে নাগরিক অধিকার সম্ভোগ করিতে দিতে ইচ্ছুক? যদি তাহাই হইবে, তবে কিজন্য ঢাকায় যাহারা ৫ শতাব্দীর প্রথা ও পুলিসের ছাড় পদদলিত করিয়াছে, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা হয় নাই? কলিকাতায় ইংরেজ সরকারই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় শিখদিগের শোভাযাত্রা পরিচালনে মুসলমানদিগের বাধা অন্যায় বলিয়া দলিত করিয়াছিলেন।

মিস্টার জিন্না পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা দাবীর সঙ্গে সঙ্গেই অধিবাসী-বিনিময় করিবার কথা বলিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। পশ্চিম পাঞ্জাবে শিখ ও হিন্দুরা নিহত বা বিতাড়িত হওয়ায় আর অধিবাসী-বিনিময়ের কথা উঠিবে না। কিন্তু দিল্লী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী মিস্টার লিয়াকৎ আলী খাঁন ২০শে সেপ্টেম্বর লাহোরে বলিয়াছেন—তিনি পূর্ব পাঞ্জাব হইতে মুসলমানমাত্রকেই স্থানান্তরিত করিয়া পাকিস্থানে বাস করাইতে দৃঢ়সংকল্প। ইহাই মিস্টার জিন্নার কামনা।

এই অবস্থায়ও যদি হিন্দুস্থানের মন্ত্রীরা পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখদিগকে থাকিতে উপদেশ দেন, তবে কি তাহারা মনে করিবে না—তাহারা নিহত বা ধর্মান্তরিত হয়, তাহাতেও তাঁহাদিগের আপত্তি নাই।

কয়দিন পূর্বে আমাদিগের পরিচিত কোন বাঙালী পরিবার লাহোর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তথায় মুসলমানাতিরিক্তদিগের সব সংবাদপত্র বন্ধ—'পাকিস্থান টাইমসে' লিখিত হইতেছে—"লাহোর শান্ত।" লাহোর শান্ত; কারণ তথায় আর মুসলমানাতিরিক্ত লোক নাই—হয় নিহত হইয়াছে, নহে ত পলাইয়াছে। যাঁহাদিগের কথা বলিতেছি, তাঁহারা সরকারী চাকরীয়া—ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে হিন্দুস্থানে চলিয়া আসিতে চাহিলে পাকিস্থান সরকার বাধা দিয়া বলেন—তাঁহাদিগের লোককে কাজ শিখাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়া তবে তাঁহারা লাহোর ত্যাগ করিতে পারিবেন। তাঁহারা পাহারার মধ্যেও নিরাপদ ছিলেন না। শেষে যখন "হয় চলিয়া যাও, নহে ত নিহত হও"—ঘোষিত হয়, তখন তাঁহারা পাকিস্থান সরকারকে তাঁহাদিগের যাইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন। পাকিস্থান সরকার ব্যবস্থা না করায় তাঁহারা ভারত সরকারের অর্থাৎ হিন্দুস্থান সরকারের লোকাপসারণকারী কর্মচারীকে জানাইলে তিনি সামরিক যানে তাঁহাদিগকে লাহোর সেনানিবাসে তাঁহার অধিকৃত স্থানে আনেন এবং পরে স্পেশ্যাল ট্রেনে অন্যান্য যাত্রীর সহিত আম্বালায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদিগকে অধিকাংশ দ্রব্যই ফেলিয়া আসিতে হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সরকার ও পশ্চিম বাঙলার সরকার সংবাদ নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থাই কেন করুন না, যে সংবাদ বন্ধ করা যাইতেছে না, তাহা হইতেই পাঞ্জাবে শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারা যাইতেছে। পাঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে মুসলমানাতিরিক্তদিগকে তাঁহাদিগের স্বর্ণাদিও লইয়া আসিতে দেওয়া হইতেছে না। অর্থাৎ পাকিস্থানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার অস্বীকৃত হইতেছে।

আজ পাকিস্থানের অন্যান্য অংশের অবস্থা ব্যবস্থা আমাদিগের আলোচ্য নহে। বাঙলার যে অংশ পাকিস্থানভুক্ত হইয়াছে, তাহার রাজধানীতে কি হইতেছে, তাহা আমরা ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল বন্ধে বুঝিতে পারিতেছি। খুলনা দৌলতপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তথা হইতে ব্রজলাল হিন্দু একাডেমীর পদার্থ-বিদ্যা বিভাগের কয়টি যন্ত্র সংস্কার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইতেছিল। থানায় ২ জন পুলিস কর্মচারী ও একজন মুসলমান যুবক যন্ত্রগুলির পুলিন্দা লইয়া থানায় চলিয়া যায় ও যে অধ্যাপক ঐগুলি কলিকাতায় আনিতেছিলেন, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে।

যশোহরের যে অংশ পাকিস্থানে গিয়াছে, তাহার এক স্থানে একজন হিন্দু ডাক্তার কোন মুসলমানের চিকিৎসা করিতেছিলেন। রোগী টায়ফয়েড জ্বরে ভুগিতেছিল। পক্ষকাল চিকিৎসায় জ্বর ত্যাগ না হওয়ায় রোগীর স্বজনগণ ডাক্তারী চিকিৎসা ছাড়িয়া এক কবিরাজকে ডাকে। ২৮ দিনে রোগীর জ্বর ত্যাগ হইলে তাহারা আসিয়া ডাক্তারকে গৃহীত ঔষধের মূল্য ও ক্ষতিপূরণ বাবদে অর্থ দিতে বলে এবং তিনি তাহাতে অসম্মত হইলে তাঁহাকে প্রহার করে। তাহারা কিছু টাকা আদায় করিয়া তবে ডাক্তারকে ছাড়িয়া দিলে তিনি যাইয়া সরকারী কর্মচারীকে সব কথা বলিলে তিনি ডাক্তারকে "চাপিয়া যাইতে" উপদেশ দেন—নহিলে তাঁহার আরও বিপদ ঘটিতে পারে।

রেলস্টেসনে, স্টীমার স্টেসনে ও অন্যান্য স্থানে মুসলমানাতিরিক্ত যাত্রীদিগের লাঞ্ছনার কথা কাহারও অবিদিত নাই।

এ সকল কি মুসলমানাতিরিক্তদিগকে পাকিস্থান ত্যাগ করিতে বলাই নহে?

মিস্টার লিয়াকৎ আলী খাঁনের উক্তি আমরা বুঝিতে পারি—মুসলমানদিগকে পাঞ্জাব হইতে আনিয়া পাকিস্থানে বসতি করান হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ও গান্ধীজীর উক্তি কিরূপ? তাঁহারা হিন্দু ও শিখদিগকে পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া আসিতে নিষেধ করিতেছেন। যদি তাহাতে তাঁহাদিগের নিধন সাধিত হয়, তবে কি সে দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন? গান্ধীজী স্বয়ং নোয়াখালী অঞ্চলে পাকিস্থানীদিগের যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়া আসিয়াছেন, তাহাতেই কি তিনি তথায় তাঁহার অহিংস নীতির চরম পরীক্ষা করিতে বিরত হইয়াছেন?

যাঁহারা মনে করেন, অধিবাসী বিনিময়ের দ্বারা লোককে শান্তি ও নির্বিঘ্নতা প্রদান শ্রেয়ঃ তাঁহাদিগকে কি কোনরূপে দোষ দেওয়া যায়?

এ বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের সরকারের কার্য যে সমীচীন বলিয়া মনে করা যায় না, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পশ্চিমবঙ্গের সরকার ইচ্ছাপূর্বক পাকিস্থানত্যাগী হিন্দুদিগকে প্রত্যক্ষভাবে কোন সাহায্য প্রদান করা তো পরের কথা, পরোক্ষভাবেও সাহায্য না দিয়া বিপরীত ব্যবহার করিতেছেন, বলা যায়। তাঁহারা অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের সেই কথা বলিতেছি না—"সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।" কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের সচিবদিগের অনেক সময় ও উৎসাহ ব্যয়

হইতেছে। যখন কংগ্রেস প্রথম মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা কোথায়ও একগাছি মাল্যও গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে যাঁহারা মন্ত্রী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বর্ধনা ও মাল্য গ্রহণ এখনও শেষ হইতেছে না। সেই কারণেই আজ তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। তাঁহারা বলিয়াছিলেনঃ—

(১) ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট—সুরাবর্দীর "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণার পরে—এপর্যন্ত হিন্দুরা যে সকল গৃহ মুসলমানদিগকে বিক্রয় করিয়াছেন, সে সকল পূর্বস্বামী হিন্দুদিগকে এবং মুসলমানরা যে সকল গৃহ অ-মুসলমানদিগকে বিক্রয় করিয়াছেন, সে সকল পূর্বস্বামী মুসলমানদিগকে প্রত্যর্পণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইবে।

(২) পূর্ববঙ্গে পাকিস্থানী অত্যাচারে বহু হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসায় পশ্চিমবঙ্গে জমির অধিকারীরা জমির মূল্য অন্যায়রূপে বাড়াইয়া দিয়াছেন—অর্থাৎ তাঁহারা জমি "ব্ল্যাক মার্কেট" করিতেছেন, তাহা অর্ডিন্যান্স করিয়া বন্ধ করা হইবে—কেহ পূর্বের মূল্য অপেক্ষা অসঙ্গতরূপ অধিক মূল্যে লইতে পারিবেন না।

তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, প্রথম দফায় যে সকল গৃহ হস্তান্তরিত করা হইয়াছে, সে সকলের হস্তান্তর সরল ভাবে করা হয় নাই, বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছে; আর দ্বিতীয় দফায় জমি লইয়া যে ফাটকা খেলা চলিতেছে, তাহা অন্যায় ও অসঙ্গত।

কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহারা দুইটি কাজেই উদাসীন আছেন। কলিকাতায় হিন্দুরা যে সকল গৃহ—বাস করিতে ভয়প্রযুক্ত বা মুসলমান পল্লীতে অবস্থিত থাকায় ভাড়া আদায়ের অসুবিধাহেতু বিক্রয় করিয়াছেন, সে সকল গৃহ হিন্দুরা পাইলে সে সকলে বহু হিন্দুর স্থান হইতে পারিত। তবে পশ্চিমবঙ্গে জমির মূল্য অন্যায় ও অসঙ্গতভাবে বর্ধিত না হইলে পূর্ববঙ্গত্যাগী বহু হিন্দু পরিবার এতদিনে পশ্চিমবঙ্গে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতে পারিতেন। পশ্চিমবঙ্গের সচিবরা সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার সচিব সঙ্ঘ বাংলায় কোন কল্যাণকর কাজ করেন নাই, এই অভিযোগের উত্তরে তৎকালীন প্রধান সচিব মিস্টার ফজলুল হক একবার বলিয়াছিলেন, আপনাদিগের সচিবত্ব রাখিতেই তাঁহাদিগের সময় ও উদ্যম ব্যয়িত হয়—অন্য কাজ করিবার সময় বা সুযোগ থাকে না। পশ্চিমবঙ্গের সচিবরাও কি তাহাই বলিবেন? অর্থাৎ তাঁহাদিগের কি "প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত হইতেছে?" ইতোমধ্যেই তিনজন সচিবকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের স্থানে নূতন তিনজনকে লওয়া হইয়াছে। যাঁহারা নূতন—তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদান করিতে হইতেছে—নূতন করিয়া মাল্য গ্রহণে ব্যাপৃত হইতে হইতেছে। অথচ বাঙলার অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখিতে পাইতেছি না। আবার প্ররোচনা ও পরামর্শ লাভ জন্য বিমানে দিল্লী গমন বর্ধিত হইতেছে।

মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের সচিবগণ এখনও মিস্টার সুরাবর্দীর ও খাজা নাজিমুদ্দিনের "ছেঁদো কথায়" বিশ্বাস করেন—সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঢাকায় হিন্দুদিগের জন্মাষ্টমীর মিছিল পরিচালিত করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া—মধ্যপথ হইতে মিছিল ফিরাইয়া দেওয়া যে হিন্দুদিগকে পাকিস্থানে তাঁহাদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিবার জন্য ইচ্ছাকৃত অপমান নহে, তাহা কেমন করিয়া বলা যায়? আজ হিন্দুদিগকে একদিকে বলা হইতেছে—পূর্বকথা ভুলিয়া যাও; আর এক দিকে বলা হইতেছে, পাকিস্থানে হিন্দুর ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকার করা হইবে না। এরূপ ব্যাপার সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের সচিবরা কি বলেন? আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি সব অত্যাচার অবাধে ভুলিয়া অত্যাচারীকে প্রেম দেওয়া যায়, তবে জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচার ভারতবাসীরা ভুলিতে পারেন নাই কেন? আমাদিগের বিশ্বাস—ইতিহাসের শিক্ষা, সমাজে ও দেশে শান্তি স্থায়ী করিবার জন্য দুষ্কৃতকারীর দণ্ডের প্রয়োজন। যদি তাহাই হয়, তবে জিজ্ঞাস্যঃ—

(১) ঢাকায় যাহারা জন্মাষ্টমীর মিছিল অন্যায়রূপে বন্ধ করিয়াছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? বিচার বিবেচনার পরে শোভাযাত্রার ছাড় দিবার পরে যাহারা তাহাতে বাধা দিয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া শোভাযাত্রা পরিচালনে সাহায্য করিবার জন্য কোনরূপে দৃঢ়তা অবলম্বিত হয় নাই। খাজা নাজিমুদ্দিন হিন্দুদিগকেই শোভাযাত্রা ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন—পরবর্তী শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এসব যে ইচ্ছাকৃত নহে, তাহা কে বলিতে পারে?

(২) কলিকাতায় আজ পর্যন্ত কয়জন হিন্দু ত্যক্ত গৃহে ফিরিতে পারিয়াছেন? আর তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণের কি ব্যবস্থা হইয়াছে? এই প্রসঙ্গে আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, নিহত হরেন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে কি তিনি—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—কোন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধীয় কাগজপত্র পাইয়াছিলেন? যদি পাইয়া থাকেন, তবে সে সম্বন্ধে কি হইয়াছে? ও হত্যার রহস্য ভেদে পুলিশ কমিশনার ও তাঁহার বিভাগসমূহ কি করিয়াছেন?

কলিকাতা পুলিশ ক্লাব ৭ই সেপ্টেম্বর যে "স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উৎসব" করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ২৮শে সেপ্টেম্বর হইয়াছে। স্বাধীনতাকামীদিগকে লাঞ্ছিত করা ইংরেজের আমলে যে সকল কর্মচারীর মোক্ষম্বার যুক্তির মন্ত্র ছিল, তাঁহারা যে স্বাধীনতা উৎসব করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদিগের দ্বারা কি কলিকাতার চোরাবাজার দূর হইয়াছে? অথচ আমরা দেখিতেছি, ইংরেজের আমলেও কোন বিষয়ে পুলিশ কমিশনারের নিকট অভিযোগ করিলে—অভিযোগ পত্রের যে স্বীকৃতি পাওয়া যাইত, তাহাও আর পাওয়া যায় না! ইহাই যদি জনগণের সহিত সহযোগলাভের সদুপায় হয়, তবে অসহযোগের উপায় কি?

পশ্চিমবঙ্গে আহার্য দ্রব্যের বিশেষ চাউলের ও আটার অভাব যে ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সচিবরাই বলিয়াছেন। ইহার ফল কিরূপ সুদূরপ্রসারী তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক ধর্মঘট উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। যিনি ভারতবর্ষ ডিপেন্ডেন্সী থাকার সময়ে ধনিকবাদের বিরোধী হইয়া শ্রমিকদিগকে প্রতিবাদে ধর্মঘট করিতে উপদেশ দিতেন—তিনিই ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রে শ্রম বিভাগের মন্ত্রী হইয়া শ্রমিকদিগকে ধর্মঘটে বিরত থাকিয়া পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতে সদুপদেশ দিতেছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে একটি বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি—

শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিকের হার খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। বিশেষ—এখন "রেশনে" চাউলের পরিমাণ যেরূপ হ্রাস করা হইতেছে, তাহাতে—

(১) শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য; অসুস্থ ও দুর্বল শ্রমিকগণ পূর্ণ শ্রম করিতে পারে না। "কাউন্সিল অব বৃটিশ সোসাইটীজ ফর রিলিফ এব্রড"—যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখিতে পাইবেন—য়ুরোপের যে সকল দেশে যুদ্ধের প্রয়োজনে লোকের খাদ্য পরিমাণ হ্রাস করাইতে হইয়াছিল, তাহাতে লোকের স্বাস্থ্য লুপ্ত হয় দেখিয়া সে সকল দেশেই খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। আংশিক উপবাসের ফলে—

(১) দেহের ওজন কমে,
(২) অলসতা ও শ্রমে বিতৃষ্ণা জন্মে
(৩) উৎসাহের অভাব ঘটে
(৪) রোগপ্রবণতা দেখা যায়।

কাজেই পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শ্রমিকগণ অধিক পরিশ্রম করিতে পারে না। কাজেই উৎপাদন হ্রাস হয়।

(২) শ্রমিকদিগকে যদি চোরাবাজারে অধিক

মূল্যে খাদ্যদ্রব্য কিনিতে হয়, তবে তাহাদিগের আবশ্যক অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিও অনিবার্য হয়।

বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে এই অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে না।

কাজেই এদিকে বিশেষ মনোযোগদান প্রয়োজন।

বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী এখানে ওখানে কিছু কিছু চাউল সরকারী গুদাম হইতে উদ্ধার করিতেছেন এবং সেই সংবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু তাহার মোট পরিমাণ, প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সেই জন্যই ধান্য ও চাউল সংগ্রহের জন্য "পুরস্কার প্রদানের" বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে—

"সংগ্রহ বোনাস"—

১৯৪৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ৭ই অক্টোবরের মধ্যে গভর্নমেণ্টকে বেচলে ধানের জন্য মণ প্রতি ১৲ (এক টাকা) ও চালের জন্য মণ প্রতি ১৵০ (এক টাকা দুই আনা) বেশি দর পাবেন।

১৯৪৭ সালের ৮ই অক্টোবর থেকে ২১শে অক্টোবরের মধ্যে ধানের জন্য মণ প্রতি ৸০ (বার আনা) ও চালের জন্য মণ প্রতি ১৵০ (এক টাকা দুই আনা) বেশি দাম পাবেন।"

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারের কারণঃ—

বাঙলা দেশের আরও চাল প্রয়োজন। ঘাটতি এলাকাগুলিতে ন্যায্য দামে ঠিক ঠিক-ভাবে বিলি করার জন্য দেশের যতদূর সম্ভব উদ্বৃত্ত মাল গভর্নমেণ্টের হাতে আসা চাই-ই। আজ এরও জরুরী প্রয়োজন। অবিলম্বে উদ্বৃত্ত ধান চাল সংগ্রহ করতেই হবে।"

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের এই চেষ্টা প্রশংসনীয় এবং আমরা এই চেষ্টার সাফল্য কামনা করি। কিন্তু আমরা বিভাগের পরিচালকদিগকে একটি বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। অজ্ঞ ও অতিলোভী মজুতকারী ও ব্যবসায়ীরা এইরূপ ঘোষণায় ধান্য ও চাউল লুকাইয়া রাখিতে অধিক সচেষ্ট হইবেন না ত? সাধারণ গৃহস্থরাও ইহাতে ভয় পাইয়া —কি জানি কি হয় মনে করিয়া কিছু অধিক ধান্য ও চাউল সঞ্চয় করিতে উদ্যত হইবেন না ত? অনেকে অল্প অল্প প্রয়োজনাতিরিক্ত সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইলে—সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক হইবে এবং তাহার ফলে বাজারে ধানের ও চাউলের দামও অযথা বৃদ্ধি পাইবে। আমরা বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের পরিচালকদিগকে এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বিভাগ লোককে আটার স্থানে ছোলা ব্যবহারের যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা আমরা সমীচীন বলিতে পারি না। মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ একপ্রকার প্রয়োজনাতিরিক্ত ছোলা আমদানী করিয়া তাহা বিক্রয় করিতে অক্ষম হইয়া লোককে ছোলা ব্যবহারে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে ছোলার গুণগান করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। তখন চিনির ও ঘৃতের অভাব অবজ্ঞা করিয়া তাঁহারা ছোলার হালুয়া করিবার কথাও বলিয়াছিলেন। অভাবে লোকে অনেক কুখাদ্যও খাইয়া থাকে বটে, কিন্তু যে যে আহার্যে অভ্যস্ত তাহাকে তাহার পরিবর্তে অন্য আহার্যে রুচিসম্পন্ন করা সহজসাধ্য নহে—সময়সাধ্য।

এই প্রসঙ্গে আমরা পশ্চিম বঙ্গের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগকে অনুমোদিত ও প্রদত্ত খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে সতর্ক হইতেও অনুরোধ করিব।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে মিস্টার বেনেডিক্স্ ট্রেঞ্চ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পরে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়াছিলেন। সেবার মধ্য প্রদেশে বহু পল্লীগ্রামে একপ্রকার পক্ষাঘাতের ব্যাপ্তি ঘটে। তাহাতে কোমর হইতে দেহের নিম্নাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত—অবশ হয়। ফলে যাহারা সেই রোগগ্রস্ত হয়, তাহারা জীবনের অবশিষ্টকাল অকর্মণ্য হইয়া থাকে। তাহাদিগকে দেখিলে দুঃখ হয়। ইহাতে কৃষি-কার্যে লোকের অভাব ঘটে। লেখক দুইশত লোকের অধ্যুষিত একখানি গ্রামে ৩৭ জনকে ঐ রোগগ্রস্ত দেখিয়াছিলেন। এই রোগের কারণ—দুর্ভিক্ষের সময় সরকার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে খাদ্যশস্য হিসাবে খেশারীর দাইল দিয়াছিলেন। খেশারীর দাইল পশুখাদ্য হিসাবে পুষ্টিকর ও উপযোগী হইলেও যে যে সকল মানুষ দুগ্ধ পান করিতে পায় না, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর—মৃদু বিষের ক্রিয়ায় পূর্বোক্ত রোগ উৎপন্ন করে।

কাজেই খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পশ্চিম বঙ্গের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলিয়াছেনঃ—

চাউল সংগ্রহের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এই অভিযানে আমরা অনেকটা কৃতকার্যও হইয়াছি। তবু আমাদিগকে এই কথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বয়লারের গোলযোগের জন্য বাঙলার অনেকগুলি চাউলের কল বন্ধ আছে। এই কারণে অনেক ধান মজুত থাকা সত্ত্বেও আমরা চাউল প্রস্তুত করিতে পারিতেছি না। ইহা ব্যতীত শ্যাম গভর্নমেণ্টের প্রতিশ্রুত ৮ হাজার টন চাউল এখনও আমাদিগের নিকট পৌঁছে নাই; আগামী ৭।৮ দিনের মধ্যেই চাউলের জাহাজ আসিয়া পৌঁছিবে—এমন আশা করা যায়। আবার ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ ও ভারতের বাহির হইতে যা চাউল পাওয়া যাইবে, আশা করা গিয়াছিল তাহাও পাওয়া যাইতেছে না।"

সুতরাং শীঘ্র যে অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইবে, সে আশা করা যায় না। বয়লারের গোলমালে অনেকগুলি চাউল কল বন্ধ আছে, ইহার কারণ কি?

সে যাহাই হউক যে ব্যবস্থা হইল, তাহাতে সাধারণ গৃহস্থদিগের—অর্থাৎ যাহারা দুর্মূল্যে মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও তরকারীও আবশ্যক পরিমাণ সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহারা যেমন শ্রমিকরাও তেমনি—যে আহার্য পাইবে, তাহাতে দেহে প্রাণরক্ষা হইবে বটে, কিন্তু লোক জীবিত থাকিলেও দিন দিন জীবন্মৃত হইবে।

যে সচিবরা এইরূপে লোককে আবশ্যক আহার্য প্রাপ্তির উপায় করিতে অক্ষম তাঁহারাই কিভাবে কতকগুলি সরকারী কর্মচারীর বেতন বাড়াইয়াছেন, তাহা মনে করিলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই দরিদ্র প্রদেশের লোকের মনে কি ভাব হয়, তাহার আলোচনা আর করিব না।

খৃস্টান মিশনারী ও আদিবাসী

খৃস্টান মিশনারী বা ধর্মপ্রচারকের দল ভারতে আগমন করেন তখনই, যখন ভারতের কোন কোন অংশে ইংরাজের রাজনৈতিক আধিপত্য ভিত্তি লাভ করেছিল। বিশুদ্ধ ধর্মপ্রচারের আবেগ ছাড়াও খৃস্টীয় ধর্ম প্রচারকের মনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল। খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ যে একটা অতি উচ্চ ধরণের আদর্শ, খৃস্টান পাদরী সমাজ সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। ভারতবর্ষের লোক খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলে এবং ইংরাজ শাসনে থাকলে উন্নত হবে, এ বিশ্বাস পাদরী সমাজ আন্তরিকভাবেই পোষণ করতেন। কিন্তু ধর্মপ্রচারের কাজ আরম্ভ করার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তাঁদের ধর্মপ্রচার কখনই প্রসার লাভ করতে পারবে না। এরপর মিশনারীদের উদ্যোগ আনত হিন্দু সমাজের দিকে ধাবিত হয় এবং এক্ষেত্রেও তাঁরা সামান্য রকম সাফল্য অর্জন করেন। তারপর আদিবাসী সমাজ খৃস্টীয় পাদরী সমাজের ধর্মাভিযানের লক্ষ্য হয় এবং আদিবাসী সমাজের এক বৃহৎ অংশকে ধর্মান্তরিত করতে তাঁরা সক্ষম হন।

খৃস্টান পাদরী সমাজ ধর্মান্তরিত আদিবাসীর কিছু কিছু উপকার যে করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে শিক্ষার বিস্তারে পাদরী সমাজ যথেষ্ট উদ্যোগ করেছেন। আদিবাসী সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনা নিয়ে পাদরী সমাজ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করেননি এবং সেটা বোধ হয় তাঁদের কর্মপদ্ধতির বিষয় নয়।

কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে দলে দলে খৃস্টধর্ম গ্রহণের' পালা বহুদিন হলো বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে যে হারে ধর্মান্তর ঘটছে, সেটা ছুটকো ঘটনা মাত্র, দলে দলে ধর্মান্তরের (Mass Conversion) ব্যাপার নয়। কিন্তু খৃস্টীয় ধর্মযাজকদের উদ্যোগ ও আড়ম্বরে বিশেষ কোন শৈথিল্য এখনো আসেনি। বহু চার্চ, বহু যাজক সম্প্রদায়, বহু প্রতিষ্ঠান ও উপ-প্রতিষ্ঠান নিয়ে এখনো কাজ করে চলেছে।

খৃস্টান পাদরী সমাজের মনোভাব ও আচরণের বিরুদ্ধে বিশেষ করে তিনটি কথা বলবার আছে এবং এই তিনটি ত্রুটীর জন্যই পাদরী সমাজের কৃতকার্যতার ভরসা বস্তুত একরকম স্তব্ধ হয়ে গেছে।

(১) পাদরী সমাজ বর্তমানে খৃস্টান ও অখৃস্টান আদিবাসীদের প্রতি আচরণে এমন বৈষম্য দেখিয়ে থাকেন, যার ফলে অখৃস্টান আদিবাসী সমাজ পাদরীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থার ভাব অটুট রাখতে পারে না। অখৃস্টান আদিবাসীদের পাদরীবিরোধী মনোভাব পাদরীদের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রকে অনুর্বর করে রেখেছে।

(২) পাদরী সমাজ আদিবাসীদের মনে হিন্দুবিরোধী তথা ভারত-বিরোধী ধারণা প্রচার করে থাকেন। আদিবাসীকে একদিকে বিশুদ্ধ ইংরাজ রাজভক্ত করা এবং অপরদিকে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী করা--পাদরী সমাজ এই অনধিকার চর্চা কম করেন নি। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও খৃস্টান আদিবাসীদের নিয়ে একটা রাজভক্ত ফৌজ গঠন করবার পরিকল্পনায় পাদরী সমাজও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

(৩) ধর্মপ্রচারক হয়েও পাদরী সমাজ তাঁদের সাহেবী আভিজাত্য ছাড়তে পারেন নি এবং আদিবাসীর মনও এই কারণে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। বর্ণহিন্দুদের উচ্চ জাতিত্বের অহংকার অনেক সময় আদিবাসীর মনকে হিন্দু সমাজের প্রতি সন্দিগ্ধপরায়ণ করেছে, একথা সত্য। কিন্তু পাদরী সমাজের আচরণের মধ্যেও আদিবাসীরা জাতিগর্বের (Race Pride) ঝাঁজটুকু সহজেই লক্ষ্য করতে পেরেছে। সেজন্য খৃস্টান হবার জন্য বর্তমানের আদিবাসী কোন সামাজিক প্রেরণা অনুভব করে না। আদিবাসীরা চোখের সামনে দেখতে পায়, মরে গেলেও তারা পাদরী সাহেবদের সঙ্গে সামাজিক সাম্য লাভ করতে পারে না। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত, হাজারিবাগের খৃস্টান সমাধিক্ষেত্র দুই ভাগে ভাগ করা আছে—এক ভাগ ইউরোপীয় খৃস্টানের সমাধির জন্য নির্দিষ্ট, অপর ভাগ কালা খৃস্টান আদমিকা ওয়াস্তে।

ইংরাজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যে সময় ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলে রাজনৈতিক বিধাতারূপে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সেই সময় সুদূর জার্মানীর বার্লিনে তৎকালীন বিখ্যাত ইভ্যানজেলিস্ট ধর্মযাজক জন গসনার (John Gossoer) হিদেন উদ্ধারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে উদ্যোগ প্রসারের সংকল্প করলেন। অর্থাৎ ইংরাজ ভারতের রাজ্য জয় করেছে, তিনি ভারতের আত্মা জয় করবেন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে তিনি কলকাতায় চারজন জার্মান মিশনারীকে পাঠালেন। জার্মান পাদরীরা কলকাতায় এসে দেশীয় লোকের মনোভাব দেখে নিরুৎসাহ হলেন, কারণ তাঁদের প্রচার বাণীর প্রতি কলকাতার "নেটিভ" সমাজ কোন আগ্রহই দেখালেন না। আকস্মিকভাবে তাঁরা কলকাতায় কয়েকজন ধাঙগড়কে নর্দমা পরিষ্কার করার কাজে দেখতে পান। কলকাতার নেটিভদের থেকে ধাঙগড়দের চেহারার পার্থক্যও তাঁরা লক্ষ্য করেন এবং প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে তারা রাঁচী থেকে এসেছে। ধাঙগড় কথাটি মূলতঃ মুণ্ডারি ভাষার কথা। (ছেলে ছোকরাকে এবং চুক্তিবদ্ধ ক্ষেতমজুরকে মুণ্ডারি ভাষায় সাধারণত ধাঙগড় বলা হয়)। কলকাতায় নেটিভদের নিদারুণ অধর্মের মধ্যেই ছেড়ে দিয়ে এই চারজন উৎসাহী জার্মান ধর্মযাজক দুর্গম পথ পার হয়ে রাঁচীতে এসে একটি মিশন স্থাপন করেন।

জার্মান পাদরীরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, মাত্র বাণী প্রচার করে তাঁরা আদিবাসীকে খৃস্টধর্মের আশ্রয়ে টেনে আনতে পারবেন না। ১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত চেষ্টা করে মাত্র একজন আদিবাসীকে তাঁরা ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিলেন। সোজা পথে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না, একটু বাঁকা পথে তারই চেষ্টা আরম্ভ হলো। পাদরীরা বুঝলেন একটা বৈষয়িক উন্নতির ভরসা দিতে পারলে কোন সমাজ (অর্থাৎ মুণ্ডা ও ও'রাও) খৃস্টধর্মে আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু পাদরী সাহেবরা নিজেদের অর্থে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁরা মাছের তেলে মাছ ভাজবার মতলব করলেন। আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে তাঁরা প্রবল জমিদারবিরোধী আন্দোলনের প্ররোচনা দিতে লাগলেন। জমিদারদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের ক্ষোভ আগে থেকেই পুঞ্জীভূত হয়েছিল। নতুন ইংরাজী ভূমি ব্যবস্থায় আদিবাসীরা জমির দখল ক্রমে ক্রমেই হারিয়ে আসছিল এবং

সেসব জমিদারদের কুক্ষিগত হয়ে চলেছিল। জমিদারবিরোধী আন্দোলনে আদিবাসীদের প্ররোচিত করে পাদরীবর্গ দু'রকম লাভের আশা করেছিলেন। প্রথম, আদিবাসীদের জমিদারবিরোধী মনোভাব বস্তুত হিন্দুবিরোধী মনোভাবে পরিণত হবে। দ্বিতীয়, এর দ্বারা ইংরাজ শাসক শ্রেণীকে প্রত্যক্ষভাবে বিড়ম্বিত করা হবে না। ইংরাজী শাসনের মূল ব্যবস্থাটির গায়ে আঁচড় না লাগিয়ে, মাত্র হিন্দু জমিদারদের বিড়ম্বিত করলে ইংরাজ অফিসার মহলের কাছে প্রশ্রয় পাওয়া যাবে, পাদরী সাহেবরা তাই মনে করেছিলেন। থানা পুলিশ ও আদালতের অনাচার এবং অন্যান্য সরকারী খাজনার আক্রমণে আদিবাসীদের সংসার যথেষ্ট উপদ্রুত হচ্ছিল, কিন্তু পাদরী সাহেবরা এদিকে হস্তক্ষেপ করেননি, বেশ সাবধানে এড়িয়ে গেছেন। তবে, জমিদারবিরোধী আন্দোলনের পথ গ্রহণ করার সময় তাঁরা একটা বিষয়ে পরিষ্কার করে বুঝে উঠতে পারেননি। সে সময় জমিদারদের স্বার্থ বস্তুত ইংরাজের রাজস্ব ভাণ্ডারের একটি প্রধান ভিত্তি রূপেই স্থাপিত হয়েছিল। জমিদারকে বিব্রত করলে রাজস্ব ব্যবস্থাকেই বিব্রত করা হয়, এটা ইংরাজ সরকার বুঝতেন। সেই কারণে মিশনারী প্ররোচিত জমিদারবিরোধী আন্দোলন কোন বড় রকম সরকারী আনুকূল্য লাভে সমর্থ হয়নি। তবে আন্দোলনের চাপে পড়ে অপোষমূলক ব্যবস্থা হিসাবে গভর্নমেণ্ট একটি নূতন ভূমি আইন জারি করলেন। ছোটনাগপুরের কমিশনার কর্নেল ডালটনের (Col. Dalton) সুপারিশ অনুসারে ১৮৬৯ সালে 'ভুইহারি আইন' (Bengal Act. II of 1869) পাশ করা হলো। জমিদারদের কাছ থেকে আদিবাসী কৃষক যাতে কিছু কিছু নিষ্কর জমি লাভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার পরেও মিশনারীদের প্ররোচনায় আদিবাসীরা যে পরিমাণে জমি ভুঁইহারি জমি হিসাবে দাবী জানাতে আরম্ভ করলে, অধিকাংশ ইংরাজ অফিসার তাকে 'আইনসঙ্গত' বলে মনে করতে পারেননি। ভুঁইহারি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেসব অ-খৃষ্টান ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন, মিশনারীরা এইবার তাদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এবিষয়ে তাঁরা বড়লাটের দরবার পর্যন্ত আবেদন নিয়ে পৌঁছলেন।

কোন সমাজের আর্থিক সুবিচার জন্য মিশনারীরা যেভাবে আন্দোলন করেছিলেন, তার বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই স্পষ্ট—আন্দোলন প্রধানত 'হিন্দু' জমিদারের বিরুদ্ধে এবং অ-খৃষ্টান অফিসারের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। মিশনারীদের আন্তরিক উদ্দেশ্য কি ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন ইংরাজ খৃষ্টান ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"মিশনারীরা এবিষয়ে খোলাখুলিভাবেই বলে থাকেন যে, কোলদের জন্য আন্দোলন করার পিছনে তাদের যে প্রধান উদ্দেশ্য আছে, সেটা হলো কোলদের ওপর ধর্মপ্রচারের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা।" (১)

"মিশনারীরা আদিবাসীদের এভাবে প্রলুব্ধ করেন না যে, খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁরা আদিবাসীর জন্য জমি আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য করবে। কিন্তু আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, পাদরী সাহেবরা মাত্র তাদের আত্মার উন্নতির জন্য আসেননি, বৈষয়িক উন্নতিও করিয়ে দিয়ে থাকেন। এই মনোভাব প্রসার লাভ করাতেই যে দলে দলে আদিবাসী খৃষ্টান হয়েছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।" (২)

"এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ধর্মান্তর করার চেষ্টায় খৃষ্টান মিশনারীদের এতখানি সাফল্যের একটা বড় কারণ হলো, মুণ্ডারা খৃষ্টান হয়ে কতকগুলি আর্থিক সুবিধা লাভ করে থাকে।" (৩)

১৮৭৫ সালে জার্মান মিশনারীরা বাঙলা গভর্নমেণ্টের কাছে একটা বিস্তৃত অভিযোগপত্র দাখিল করেন, তাতে বলা হয়েছিল যে, অ-খৃষ্টান ভুঁইহারী অফিসারগণ অত্যন্ত গর্হিত ভাবে কাজ করছে। তৎকালীন বাঙলার লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) উক্ত অভিযোগপত্র বিবেচনা করার পর মন্তব্য করেন:

"এই অভিযোগপত্রে এমন সব মন্তব্য ও কথা আছে যা পড়ে আমার এই ভয় হয় যে, যেসব কোল খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং যারা গ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছে তাদের উভয়েই বিশ্বাস করে—মিশনারীরা তাদের হয়ে দাবী (সত্য অথবা কাল্পনিক) আদায়ের জন্য লড়াই করবে। অভিযোগপত্রের মধ্যে লিখিত একটি অংশ থেকে এই ধারণা করা যেতে পারে যে আদিবাসীরা ধর্মান্তর গ্রহণ করে মনে মনে অখুসী হয়েছে, কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে যে, ধর্মান্তর গ্রহণ করেও তাদের সামাজিক উন্নতি হচ্ছে না।"

১৮৬৯ সালে রাঁচীর জার্মান লুথেরীয় মিশনের রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল: "কোলেরা একেশ্বরবাদী সমাজ, মূর্তিপূজক হিন্দুদের দূষিত সংস্পর্শে থেকেই তারা বহু দেবতার পূজো আর মদ্যপানের কু-অভ্যাস অর্জন করেছে।"

জার্মান মিশনারী তাঁদের ধর্মপ্রচারের পথ সুগম করার জন্য শুধু হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' কোলসমাজের এক ইতিহাসও রচনা করলেন। আদিবাসীকে হিন্দুধর্ম বিরোধী এবং হিন্দুসমাজ বিরোধী করবার জন্য যতখানি উদ্ভট কাহিনী রচনার প্রয়োজন সবই তাঁরা করেছিলেন।

১৯০২—১০ সালে রাঁচীর জরিপ (Survey & Settlement) কমিশনার মিঃ জন রীড (Mr. John Reid I. C. S.) কোল সমাজে জার্মান মিশনারী রচিত 'কিম্বদন্তীর' প্রভাব দেখতে পেয়ে মন্তব্য করেছেন: "জার্মান মিশনারীরা এদের মধ্যে একটি থিয়োরী প্রচার করে গেছে যে, অতীতে মুণ্ডা ও ওঁরাওয়েরা স্বেচ্ছায় তাদের নির্বাচিত রাজাকে জমির অর্ধেক ছেড়ে দিত; অপর অর্ধেক বিনা খাজনায় নিজেরা ভোগ করতো।" মিঃ রীড বলেন, কোলসমাজের ইতিহাসে এরকম ঘটনার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং 'অর্ধেক জমি বিনা খাজনায় ভোগ করার' একটা প্রলোভন ও প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্যেই যে মিশনারিরা কাহিনীটি রচনা করেছিলেন, এছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

জার্মান লুথেরিয় মিশনের প্রভাবে মন্দা পড়ে এবং ১৮৮৫ সালে বেলজিয়ান জেসুইট মিশন (Belgian Jesuit Mission) রাঁচীর আদিবাসী সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। জেসুইট ফাদারবর্গ বেশী সংখ্যক আদিবাসীকে ধর্মান্তর করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪) ইংরাজ-জার্মান বৈরিতার অধ্যায়ে রাঁচীতে জার্মান পাদরীদের ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর চার্চ অব ইংলণ্ডের এস-পি-জি (S. P. G.) যাজক সম্প্রদায় প্রধান হয়ে ওঠে এবং ছোট-নাগপুরের আদিবাসী সমাজে কাজ করবার সুযোগ পায়। কিন্তু এস-পি-জি জার্মান লুথেরীয় প্রচারকদের মতন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, এমনকি রোমক মিশনারীরাও (Church of Rome) আদিবাসী সমাজে ধর্মপ্রচারের কৃতিত্বে ইংলণ্ডীয় চার্চকে অতিক্রম করে যায়।

বেলজিয়ান জেসুইট প্রচারক সম্প্রদায়ের সাফল্যের একটি বড় কারণ আছে। ক্যাথলিক মতবাদ আদিবাসীদের মনে সহজেই আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। উৎসবপ্রবণ ক্যাথলিক মতবাদের মধ্যে আদিবাসীরা তাদের গোষ্ঠীগত নাচগানের প্রতি অংশটুকু বজায় রাখবার সুযোগ পেয়েছিল। আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত সমাজ ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহারের প্রতি জেসুইট প্রচারকেরা খুব বেশি গোঁড়ার মত বিরুদ্ধতা করেননি। তা ছাড়া জেসুইট পাদরীদের ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যেও আভিজাত্যের তিক্ততা কমই ছিল। ধর্মান্তরিত কৃষ্ণকায় আদিবাসীর সঙ্গে উদারভাবে মেলা-

---

(1) Official note dated Dec. 16, 1879 by Mr. C. W. Botton I.C.S., Secretary to Government.

(2) Census of India 1911.

(3) Sir Edward Gait

মেশার সহজ সৌহার্দ্য তাঁরা রাখতে পেরেছিলেন।

জেস্যুইট মিশনারীরাও প্রথম প্রথম আদিবাসীদের ভূমিস্বত্বের প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। ১৯০৮ সালের ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন (Chotanagpur Tenancy Act) পাশ করাবার ব্যাপারে জেস্যুইট মিশনারীদের প্রচেষ্টা অনেকখানি কাজ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু জেস্যুইট মিশনারীরা অল্পদিন পরেই এই ধরণের বাঁকা পথ ছেড়ে দেন এবং প্রধানতঃ বিশেষ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতির ভেতর দিয়ে 'ক্যাথলিক সত্য' প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

জার্মান মিশনারী ও তাঁদের উদ্যোগে ধর্মান্তরিত খৃষ্টান আদিবাসীদের সম্পর্ক বেশী দিন ধরে অন্তরঙ্গতায় বাঁধা থাকেনি। ঘটনা অন্যদিকে আবর্তিত হয়। কয়েকজন 'সর্দারের' নেতৃত্বে খৃষ্টান আদিবাসীরা মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই আদিবাসী সর্দারদের মধ্যে এক ব্যক্তি 'জন দি ব্যাপটিস্ট' (John the Baptist) নাম গ্রহণ করে এবং সদলবলে এক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়। প্রাচীন নাগবংশী রাজাদের রাজধানী যেখানে ছিল, সেই স্থানের নামে ডোয়েসা। আদিবাসীদের জন দি ব্যাপটিস্ট ডোয়েসাতে তাঁর 'স্বাধীন রাজ্য' স্থাপন করলেন। এই জন দি ব্যাপটিস্টের অনুগামীরা 'ময়েলের সন্তান' (Children of Mael) নাম গ্রহণ করে। এই নূতন আন্দোলন ক্রমে ক্রমে তীব্রতর হয়ে প্রায় বিদ্রোহের রূপে পরিণত হয়। ১৮৮৭ সালে এই বিদ্রোহ দমিত হয়।

ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া

ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রথম রাজমহলের পাহাড়িয়া গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আসে। তথাকথিত আদিম অধিবাসী অথবা উপজাতিদের প্রতি ব্রিটিশ শাসক যে নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তার প্রথম পরীক্ষা পাহাড়িয়া গোষ্ঠীর ওপরেই আরম্ভ হয়।

প্রথম ব্রিটিশ শাসকের দল (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) আদিবাসীদের প্রতি যে নীতি গ্রহণ করলেন তাকে বলা যেতে পারে 'শান্ত করার' নীতি (Pacification)। আদিবাসীরা যেন উপদ্রবপ্রবণ হয়ে না ওঠে এবং ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে এসে শান্তিভঙ্গ বা উৎপাত না করে, তারই জন্য এই নীতি। প্রত্যক্ষভাবে শাসন ব্যবস্থা না চাপিয়ে, আদিবাসীকে নিজের ঘরে নিজের আইন নিয়ে থাকবার সুযোগ ইংরাজ সরকার দিয়েছিলেন।

রাজমহলের পাহাড়িয়া সর্দারদের 'সনদ' দেওয়া হয়। পাহাড়িয়া অঞ্চলের কোন হাঙ্গামা হলে গভর্নমেণ্টের কাছে সে সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করা ও সংবাদ দেওয়া এইসব সনদধারী সর্দারের কর্তব্য ছিল। ইংরাজের সরকারী সড়ক দিয়ে ডাকের যাতায়াত যাতে নিরাপদ হয় এবং ডাকবাহকদের ওপর আক্রমণ না হয়, সে সম্বন্ধে পাহারা রাখা সর্দারদের অন্যতম কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্যের বিনিময়ে সর্দারেরা ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে বাৎসরিক বৃত্তি লাভ করতো। এই বৃত্তি বস্তুত উৎকোচ ছাড়া আর কিছু নয়। মুসলমান শাসনকালেও উপজাতিদের এই ভাবে ঘুষ দিয়ে শান্ত করে দূরে সরিয়ে রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

রাজমহলের পাহাড়িয়াদের প্রতি ইংরাজ সরকার যেমন একদিকে উৎকোচপুষ্ট তোষণ-নীতি গ্রহণ করলেন, অপরদিকে আর এক-রকমের কূটনৈতিক সতর্কতাও গ্রহণ করলেন। অবসরপ্রাপ্ত সিপাহীদের জমি দিয়ে রাজমহল পাহাড়ের চারদিকে বসতি করিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন। আক্রমণ-প্রবণ পাহাড়িয়াদের যাতে বাধা দিতে পারে, এমনই যুদ্ধ-শিক্ষিত এক শ্রেণীকে দিয়ে রাজমহল পাহাড়কে যেন একটা সামরিক বৃত্ত দিয়ে অবরোধ করে রাখার ব্যবস্থা হলো।

আদিবাসীদের প্রতি যেসব ব্রিটিশ রাজনৈতিক নানারকম নীতির আবিষ্কার পরীক্ষা ও প্রবর্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে আগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের (Augustus Cleveland) নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। রাজমহলের পাহাড়িয়া অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা তদারকের ভার পেয়েই ক্লীভল্যাণ্ড নানা নতুন পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। পাহাড়িয়া সর্দার, নেতা ও উপনেতাদের জন্য ক্লীভল্যাণ্ড পেন্সনের ব্যবস্থা করলেন (বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা) এবং সর্দারদের কর্তব্যের তালিকা আরও বাড়িয়ে দিলেন। পাহাড়িয়া এলাকার প্রত্যেকটি অপরাধের খবর সরকারী দপ্তরে পেঁৗছে দেওয়া, হাঙ্গামায় নিজেদের প্রভাবে শান্তি স্থাপন করা এবং শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করা—এইসব কর্তব্যে সর্দারেরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

এইভাবে পাহাড়িয়া অঞ্চলে ইংরাজ সরকারের অনুগত একটি সর্দারদল তৈরী হয়। এইবার ক্লীভল্যাণ্ড এদের দিয়ে একটা 'আদালত' কায়েম করেন। রাজমহল অঞ্চলকে সাধারণ আদালতের বিচারক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার জন্য ক্লীভল্যাণ্ড গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করলেন এবং ১৭৮২ সালে রাজমহল সাধারণ আদালতের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ক্লীভল্যাণ্ড পাহাড়িয়াদের গোষ্ঠীগত সর্দারদের নিয়ে একটি দায়রা আদালত স্থাপন করেন। নিয়ম ছিল, বছরে মাত্র দু'বার আদালত বসবে এবং সবরকম অপরাধের বিচার করবে। সর্দার পরিষদ রূপে গঠিত এই আদালতই সরকারী পরিভাষায় 'পাহাড়িয়া পরিষদ' (Hill Assembly) নাম গ্রহণ করে। বিচারে প্রাণদণ্ড ঘোষণার অথবা প্রাণদণ্ডের নির্দেশ বাতিল করবার অধিকার পাহাড়িয়া পরিষদের ছিল। পাহাড়িয়া মহলকে এইভাবে নিরুপদ্রব ও শান্ত করার ব্যবস্থা শেষ করে ক্লীভস্যাণ্ড এর পর পাহাড়িয়া মহলের ভূমি সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার চেষ্টা করলেন। ব্যবস্থা হলো—পাহাড়িয়ারা যেসব জমি ভোগদখল করেছিল, তা সবই গভর্নমেণ্টের জমি হিসাবে ঘোষণা করা হলো এবং পাহাড়িয়ারা খাস গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে এইসব জমি বিনা খাজনায় ভোগ করার ব্যবস্থা লাভ করলো। যেসব পাহাড়িয়া সর্দার এ পর্যন্ত পাহাড়িয়া পরিষদ প্রভৃতি ব্রিটিশ ব্যবস্থাকে স্বীকার না করে পৃথক হয়েছিল, তারাও ভূমিগত এই সুবিধার আকর্ষণে উৎসাহিত হয়ে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিল। এইভাবে সমস্ত পাহাড়িয়া মহালকে 'বিশেষ ব্যবস্থার' অধীনে আনা হলো এবং ব্রিটিশ কর্তৃক এই বিশেষভাবে ব্যবস্থিত ও শাসিত অঞ্চলই 'দামনি কো' নামে আখ্যাত হয় (সাঁওতালী ভাষায় 'কো' অর্থ পাহাড় এবং 'দামনি' অর্থ অঞ্চল)।

ক্লীভল্যাণ্ডের ধারণা ছিল যে, পাহাড়িয়া আদিবাসীকে যদি উন্নত অগ্রসরশীল সমাজের সংস্পর্শে না আনা হয়, তবে তাদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি স্তব্ধ হয়ে থাকে। ক্লীভল্যাণ্ড বহুদিন পূর্বেই এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী এবং আধুনিক অনেক ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক এবং রাজনীতিবিদ্ ক্লীভল্যাণ্ডের ধারণার ঠিক বিপরীত মনোভাব পোষণ ও প্রচার করে থাকেন। ১৭৮৪ সালে ক্লীভল্যাণ্ড মারা যান, সেইজন্য তিনি তাঁর পরিকল্পনার অনেকখানিই পরীক্ষা করে দেখে যেতে পারেননি।

পাহাড়িয়া পরিষদের (Hill Assembly) কাজ অবাধভাবে চলতে থাকে। পরিষদের বৈঠক সম্বন্ধে ক্লীভল্যাণ্ড যেসব নিয়ম তৈরী করেছিলেন, সেইসব নিয়মগুলিকে ১৭৯৬ সালে আইনে পরিণত করা হয় এবং আইন ১৭৯৬ সালের ১নং রেগুলেশন (Regulation I of 1796) নামে পরিচিত। ক্লীভল্যাণ্ডের পর থেকে আরম্ভ করে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত বলা যেতে পারে পাহাড়িয়া মহালের ইতিহাসে রেগুলেশন বহির্ভূত শাসনের (Non-Regulation) অধ্যায়। এই অধ্যায়ে পাহাড়িয়া অঞ্চলের শাসনের জন্য কলেক্টর সাধারণ বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ না করে নিজের ইচ্ছামত আইন তৈরী করবেন। ১৭৯৬ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত দামনি কো এইভাবে বিশেষ শাসনব্যবস্থার (Specially Administered) দ্বারা শাসিত হয়। ১৮২৭ সালে নূতনভাবে আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন চালু হয় এবং পুরাতন ১৭৯৬ সালের ১নং রেগুলেশন বাতিল হয়ে যায়।

১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন পাহাড়িয়া

পরিষদের স্বতন্ত্র ক্ষমতা রদ করে দেয়। দামনি কো'র পাহাড়িয়া অধিবাসীর বিবাদ বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যাপার সাধারণ আদালতের অধীনে আসে। পাহাড়িয়াদের ওপরেও সাধারণ আদালতের অধিকার প্রযুক্ত হয়েও কতকগুলি বিষয়ে পাহাড়িয়া সমাজের হাতে বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতার সুবিধা দেওয়া হয়। এর ফলে নিজেদের ব্যাপার নিয়ে বিচার ও মীমাংসার ক্ষমতা পাহাড়িয়া সমাজেরই হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে পঞ্চাশ বছর চলে। এর মধ্যে পাহাড়িয়াদের মত ভারতবর্ষের আরও অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী ভারত গভর্নমেণ্টের পরিচালনার মধ্যে এসে পড়ে।

'পাহাড়িয়া পরিষদ' প্রতিষ্ঠাকল্পে ক্লীভল্যাণ্ড যে ব্যবস্থা চালু করে গিয়েছিলেন, পরবর্তী কলেক্টরেরা এবং অন্যান্য অফিসারেরা সে ব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিযোগ করেন। একে তো পাহাড়িয়ারা খাজনা দেয় না, তারপর উল্টো তাদের বাৎসরিক বৃত্তি ও সর্দারদের পেন্সন দেওয়া হচ্ছিল। তা ছাড়া পাহাড়িয়া পরিষদের আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসন কিভাবে চলছে, তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা কলেক্টরদের পক্ষে একটা কণ্টকর পরিশ্রমসাধ্য ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল এবং কলেক্টরেরা এবিষয়ে মনোযোগ দিয়েও উঠতে পারতেন না। কাজেই পাহাড়ী পরিষদের মত একটা অপ্রবীণ সংঘ সরকারী কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য এবং সহানুভূতিপূর্ণ তদারকের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে। ১৮১৯ সালে গভর্নমেণ্ট জেমস সাদারল্যাণ্ডকে দামনি কো'র ব্যবস্থা ও অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করতে পাঠান। সাদারল্যাণ্ড পাহাড়ী পরিষদের নিয়ম কানুন ও কর্মপ্রণালীর তীব্র নিন্দা করে রিপোর্ট দেন। ১৮২৩ সালে জে পি ওয়ার্ড (J. P. Ward) দামনি কো'র সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করার জন্য প্রেরিত হন। তিনিও 'পাহাড়িয়াদের দাবী'কে অত্যন্ত গর্হিত বলে মত প্রকাশ করেন। গভর্নমেণ্ট ১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন অনুসারে পাহাড়িয়া সমাজকে সাধারণ আদালতের আওতায় এনেও পাহাড়িয়াদের গোষ্ঠীগত এবং সর্দার পরিচালিত ও আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসনের সুবিধাটুকু বাতিল করতে চাইলেন না।(১)

১৮৩১ সালে কোল বিদ্রোহ দমিত হবার পর গভর্নমেণ্ট সিংভূমের হো' সমাজের সম্বন্ধে এক নতুন পলিসি গ্রহণ করেন। এর আগে থেকে স্থানীয় 'হিন্দু রাজারা' (অর্থাৎ জমিদারগণ) হো'দের কাছ থেকে লাঙ্গল প্রতি আট আনা বাৎসরিক খাজনা নিত। হিন্দুরাজাদের ওপর হো'দের খুবই বিদ্বেষভাব ছিল, তাই, এর পর থেকে এই খাজনা সোজাসুজি গভর্নমেণ্টের ট্রেজারিতে জমা দিবার জন্য হো' সমাজের ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশ বছরের মধ্যে খাজনা দ্বিগুণ করা হয় এবং হো সমাজ কোনই আপত্তি করেনি। ১৮৬৬ সালে গভর্নমেণ্ট হো অঞ্চলের জমি জরিপের উদ্যোগ করেন। হো-সমাজের একটি প্রকাশ্য সম্মেলন আহ্বান করে এবিষয়ে হো সর্দারদের সম্মতি গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৬৭ সালে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকর প্রথা অর্থাৎ জমির পরিমাণ হিসাবে খাজনা দেবার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

হিন্দু জমিদারদের জমি গ্রাসের ফলে কোল বিদ্রোহের (১৮৩১ সালের) পর সমস্ত ছোটনাগপুর সম্বন্ধেই একটা নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ছোটনাগপুরের শাসন পরিচালনার জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত হয়, তাঁর পদবী ছিল 'গভর্নর জেনারেলের এজেণ্ট' (Agent to the Governor General)। গভর্নর জেনারেল এই অঞ্চলের জন্য একটা বিশেষ ফৌজদারী দণ্ডবিধি তৈরী করেন। ১৮৬১ সালে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি (Criminal Procedure Code) তৈরী হবার পর, ছোটনাগপুরের জন্য এই বিশেষ দণ্ডবিধি বাতিল হয়ে যায়। এজেণ্ট সাহেব আদিবাসীদের জমি সম্বন্ধে একটা রক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেন। এজেণ্টের বিনা অনুমতিতে আদিবাসীর জমি বিক্রয় হস্তান্তর বা বন্ধক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হলো। ১৮৫৪ সালে ছোটনাগপুরের এজেণ্ট শাসন প্রত্যাহৃত হয়, ছোটনাগপুরকে নন-রেগুলেশন অঞ্চল হিসাবে বাঙলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্নরের পরিচালনাধীন করা হয়। ছোটনাগপুরই প্রথম নন-রেগুলেশন অঞ্চল। (২) বিশেষভাবে শাসিত এবং সাধারণ শাসন আইনের অধিকার থেকে স্বতন্ত্র হলেও ছোটনাগপুরে ধীরে ধীরে সাধারণ আইনগুলি বলবৎ করা হতে থাকে।

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পর দামিন কোল অঞ্চলসহ সমস্ত সাঁওতাল পরগণাকে একটি জিলা হিসাবে নন-রেগুলেশন অঞ্চলে পরিণত করা হয়। একজন ডেপুটি কমিশনার জিলার উচ্চতম কর্তা হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তাঁর অধীনে চার জন সহকারী কমিশনার জিলার চারটি বিভাগের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সাঁওতাল পরগণা সাধারণ বিধিবন্ধ আইন ও ব্যবস্থার বাইরে থাকে। যা করেন ডেপুটি কমিশনার—তিনিই একাধারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী ব্যবস্থার কর্তা এবং তিনিই আদালত। বাদী বিবাদী বা ফরিয়াদী আসামী, সকলে ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনারদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মৌখিকভাবে অভিযোগ পেশ করে, উকীল মোক্তারের দরকার নেই। কোন পুলিশও নেই, সাঁওতাল সর্দারের দ্বারাই পুলিশী কর্তব্য সম্পন্ন হয়। নন-রেগুলেশন অঞ্চল সাঁওতাল পরগণায় এইভাবে শাসন চলতে থাকে। সাঁওতাল পরগণার তৃতীয় ডেপুটি কমিশনার স্যার উইলিয়ম ফ্লেমিং রবিনসনের (Sir William Fleming Robinson) নাম একটি কারণে বিখ্যাত হয়ে থাকবে। তিনি সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলের 'ক্রীতদাস প্রথা'র উচ্ছেদ করেন।

"কামিয়ৌতি প্রথা"

প্রথাটা এই: কোন গরীব লোক অর্থাভাবে পড়ে কোন পয়সাওয়ালা লোকের কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ হিসাবে নিয়ে এই মর্মে চুক্তিবন্ধ হতো যে, উত্তমর্ণ যখনই তাকে ডাকবে তখনই সে এসে কাজ ক'রে দিয়ে যাবে। খাটবার সময় সে উত্তমর্ণের কাছ থেকে ভিন্ন কোন মজুরী পাবে না, মাত্র খোরাক পাবে। বেশী হলে হয়তো আর এক টুকরো কাপড়। মজুরী হিসাবে যেটা প্রাপ্য হতো সেটা ঋণ-শোধের হিসাবে উত্তমর্ণের খাতায় জমা হতো। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে উত্তমর্ণের রহস্যময় হিসাবের কৌশলে ঋণের পরিমাণ বিশেষ কিছু কম্‌তির দিকে যেত না। সারাজীবন এভাবে খাটুনি দিয়েও হতভাগ্য কামিয়া ঋণ শোধ করতে পারতো না। মরবার সময় এই ঋণের দায়িত্ব কামিয়ার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অথবা নিকট সম্পর্কের আত্মীয়ের ওপর গিয়ে চাপতো, এবং তারাও সারাজীবন খেটে এই ঋণ শোধের চেষ্টা করতো। সরকারী আদালত এই কামিয়ৌতি প্রথাকে অবৈধ মনে করতেন না। এইভাবে সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে এবং ছোটনাগপুরের অন্য অঞ্চলেও একটা বিরাট ক্রীতদাস শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। স্যার উইলিয়াম রবিনসন তাঁর শাসনকালে সাঁওতাল পরগণায় কামিয়ৌতি প্রথার উচ্ছেদ করেন। ১৮৬৩ সালে অ্যাডভোকেট জেনারেলের কতগুলি রুলিং নন-রেগুলেশন অঞ্চলের অফিসারদের ক্ষমতার স্বাধীনতাকে কিছু কিছু খর্ব করে এবং লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার সিসিল বীডনও (Sir Cecil Beadon) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সাঁওতাল পরগণা জিলার শাসন ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব বাঙলার অন্যান্য জেলার শাসন ব্যবস্থার মত করা উচিত। এর ফলে জমিদার ও মহাজন সম্প্রদায় আবার সুযোগ পায় এবং ব্রিটিশ আইনের পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস পেছনে থাকায় সাঁওতাল চাষীদের ওপর প্রবল মহাজনী আরম্ভ করে। এর পরিণামে ১৮৭১ সালে সাঁওতালদের মধ্যে আবার ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্বেল "সাঁওতাল পরগণার শান্তি ও সুশাসনের" জন্য এক আইন পাশ করিয়ে নেন (Regulation III of 1872). মহাজনেরা শতকরা ২৪ টাকার বেশী সুদ নিতে পারবে না, রায়তেরা জমি হস্তান্তর করতে পারবে না ইত্যাদি কতগুলি বিধিনিষেধ এই রেগুলেশনের দ্বারা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৭৯ সালে সাঁওতাল

(1) District Gazetteer of Santal Parganas.

(2) Chotanagpur—Bradley Beat

পরগণার ভূমি নতুনভাবে জরিপ ও বন্দোবস্ত (Survey & Settlement) ক'রে সাঁওতাল সমাজের গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ শাসনের পদ্ধতিকেও অক্ষুণ্ণ রখা হয়। ব্রাডলে বার্ট এই সরকারী ব্যবস্থার প্রশংসা করেও বলেছেন: "দুরবস্থা-পীড়িত সাঁওতাল সমাজের আর্থিক উন্নতি ফিরে এল।......সাঁওতালদের ওপর বিশ্বাস করে আত্মশাসনের যে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হলো, তার ফলে সাঁওতালেরা খুবই খুসী হয়। অপরাধ-মূলক কাজ (crime) গোপন করার উদাহরণ ক্রমেই কমে আসতে থাকে। তবুও এই আর্থিক উন্নতি সাঁওতালের জীবনে খুব কমই পরিবর্তন আনতে পেরেছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা সভ্যতার ক্ষেত্রে তারা চিন্তার প্রবৃত্তিতে ও জীবনযাত্রায় কিছু ওপরে উঠতে পেরেছে, এমন প্রমাণ খুব কমই চোখে পড়ে। যেমন জীবন চল্‌ছে, তাইতেই তারা সুখী। কাজেই উন্নত হবার কোন চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই।"

ব্রাডলে বার্টের মন্তব্যের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শুধু জমির ব্যাপারের কতগুলি সুবিধা দিলেই এবং "গোষ্ঠীগত রীতিনীতির স্বাধীনতা অক্ষুন্ন" রাখলেই আদিবাসীর জীবন উন্নত হয় না। আদিবাসীদের জন্যে গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যের হাজার প্রশংসা ক'রে আধুনিক কালের যেসব স্বাতন্ত্র্যবাদী (Isolationist) সমালোচক আদিবাসী দরদ প্রচার ক'রে থাকেন, তাঁরা ব্র্যাডলে বার্টের পুরাতন মন্তব্য দিয়ে নিজেদের অভিমতের সত্যতা যাচাই ক'রে দেখতে পারেন।

ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ কোম্পানীর শাসনের সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম (কলিকাতা), ফোর্ট সেন্ট জর্জ (মাদ্রাজ) এবং বোম্বাইয়ের কর্ম পরিষদগুলি (Executive Councils) যেসব 'রেগুলেশন' জারি করতেন, তার দ্বারাই ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসন চলতে থাকে। নতুন নতুন অঞ্চল শাসনভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী বুঝতে পেরেছিল যেসব অঞ্চল বা প্রদেশকে এইসব রেগুলেশনের সাহায্যে শাসন করার অসুবিধা আছে, যেসব অঞ্চলকে অনগ্রসর ব'লে মনে হতো, সেগুলিকে রেগুলেশন-বহির্ভূত (Non-Regulated) প্রদেশ বলে পৃথক করে নিয়ে ভিন্ন ব্যবস্থায় শাসন করা হতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রেগুলেশন-বহির্ভূত অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান (Code) রচিত হয়। এই বিধানগুলি মূল রেগুলেশনগুলির তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করেই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরস্পর থেকে কছুটা ভিন্নতর ভাবে করা হয়। এইভাবে কোম্পানীর শাসন কাল থেকেই 'রেগুলেশন' প্রদেশ ও 'রেগুলেশন-বহির্ভূত' প্রদেশ নামে দুই শ্রেণীর প্রদেশ সৃষ্টি হয়। চার্টার (Charter Acts) আইনগুলির গণ্ডীর মধ্যে থেকে এইসব রেগুলেশন রচনা করা হতো। পরবর্তী কালে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে এই পারস্পরিক পার্থক্য দূরীভূত হয়।

১৮৬১ সালে পার্লামেণ্টে ভারতীয় কাউন্সিল আইন (Indian Council Act) পাশ হয়। রেগুলেশন-বহির্ভূত অঞ্চলের জন্য গবর্ণর-জেনারেল অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেসব বিধি নির্দেশ তৈরী করেছিল, এই আইনে সেগুলি সমর্থিত হয়। ১৮৭০ সালে পার্লামেণ্ট ভারত গভর্নমেণ্ট আইন (Government of India Act) পাশ করেন। স্থানীয় গভর্নমেণ্ট কতগুলি বিশেষ অঞ্চলের শাসনের জন্য যেসব বিধি-নির্দেশ তৈরী করবেন সেগুলিকে অনুমোদন করবার জন্য সপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই আইন অনুসারে ন্যস্ত ক্ষমতা অনুসারে গভর্নর জেনারেল বহু নতুন বিধান প্রবর্তন করেন। ১৮৭৪ সালে 'ভারতীয় আইন সভা' 'তপশীলভুক্ত জিলা আইন' (Scheduled Districts Act, XIV of 1874) পাশ করেন। এই আইনের বলে স্থানীয় গভর্নমেণ্টকে কতগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়, বিশেষ অঞ্চলগুলিকে নির্দিষ্ট ক'রে একটা তালিকাও এই আইনের সঙ্গে করা হয়। স্থানীয় গভর্নমেণ্ট নিজে বিবেচনা ক'রে বুঝবেন, কোন্ বিশেষ অঞ্চলে কোন্ ব্যবস্থা প্রয়োজন, কোথায় সাধারণ আইন প্রয়োগ করা উচিত এবং কোথায় নয়। (১)

নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলি তপশীলভুক্ত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হয়ঃ

আসাম, আজমীর মাড়ওয়াড়, কুর্গ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর বিভাগ, আঙ্গুল মহল, এডেন, সিন্ধু প্রদেশ, পাঁচ মহল, পশ্চিম খান্দেশের মেওয়াসি সর্দারদের তালুকসমূহ, চান্দা জমিদারী অঞ্চল, ছত্রিশগড় জমিদারী অঞ্চল, চিন্দোয়ারা জায়গীরদারী অঞ্চল, গঞ্জামের ১৪টি মালিয়া, ভিজাগাপট্টমের ৯টি মালিয়া, গোদাবরী জিলার কতগুলি অংশ, লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, হাজারা, পেশোয়ার, কোহাট, বন্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ, ডেরা গাজী খাঁ, লাহোল স্পিতি, ঝাঁসি বিভাগ, কুমায়ুণ ও গাড়োয়াল, তরাই পরগণা, মির্জাপুরে জিলার চারটি পরগণা, বারাণসী মহারাজার পারিবারিক বসতি অঞ্চলসমূহ, দেরাদুন জিলার জোনসার-বাওয়ার এবং মণিপুর পরগণা (মধ্য ভারত এজেন্সী)।

উল্লিখিত তালিকা থেকে পাঁচ মহল জিলা, ঝাঁসি ডিভিসন এবং গঞ্জামের একটি মালিয়া পরে বাদ দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালে মণিপুর পরগণাকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

(1) A Constitutional History of India —A. B. Keith

খোন্দ অঞ্চল

খোন্দ সমাজে নরবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই প্রথা রহিত করবার চেষ্টা করেন এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ খোন্দেরা ১৮৪৬ সালে 'বিদ্রোহ' করে। আঙ্গুলের রাজাও এই বিদ্রোহের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। বিদ্রোহ দমন ক'রে ১৮৪৮ সালে আঙ্গুলকে ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করা হয়। শুধু আঙ্গুলে নয়, খোন্দ অধ্যুষিত সমস্ত মালিয়াগুলিকে ১৮৩৯ সালের আইনের (India Act XXIV of 1839) ব্যবস্থা অনুসারে শাসন করা আরম্ভ হয়। ১৮৭৭ সালে আঙ্গুলকে তপশীলভুক্ত জিলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

তপশীলভুক্ত জিলা আইন পাশ হবার পর এইভাবে ক্রমে ক্রমে প্রয়োজন বুঝে তালিকার উল্লিখিত অঞ্চলগুলি তপশীল জিলা হিসাবে ঘোষিত হতে থাকে। গোদাবরী এজেন্সী ১৮৯১ সালে সম্পূর্ণভাবে তপশীলভুক্ত হয়।

১৮৬২ সালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি (London Missionery Society) দক্ষিণ মির্জাপুরে দুধি-পরগণায় জমিদারী স্বত্ব নিয়ে মিশন স্থাপনের পরিকল্পনা করেন, এতে ধর্মপ্রচারের সুবিধা হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। কিন্তু মিশনের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ধর্মপ্রচারের সঙ্গে জমিদারগিরি ঠিক খাপ খাবে না মনে ক'রে পথ ছেড়ে দেন। ১৮৬৪ সালে দক্ষিণ মির্জাপুরে রেগুলেশন-বহির্ভূত অঞ্চল ছিল, কিন্তু ১৮৭৪ সালে তপশীল জিলায় পরিণত হয়। ১৮৯১ সালে 'বোর্ড অব রেভিনিউ' দক্ষিণ মির্জাপুরের অঞ্চলের (রবার্টসনগঞ্জ তহশীল) শাসনের জন্য সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা ও বিধিনির্দেশ প্রণয়ন করেন। রাজস্ব এবং দেওয়ানী ব্যাপার প্রচলিত সাধারণ আইনের অধিকার থেকে এই অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। দেওয়ানী মামলার ব্যাপারেও সাধারণ আদালতের অধিকার খারিজ করে দিয়ে কালেক্টরকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়। আপীলের সর্বোচ্চ দরবার হ'লো কমিশনার। শুধু সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে আপীলের সর্বোচ্চ অধিকার এলাহাবাদ হাইকোর্টের হাতে রইল। ফৌজদারী মামলার বিচারের ভারও জিলার কোন পূর্ণ-ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে দেওয়া হয়। (১)

কয়েকটি আদিবাসী অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের রীতিনীতি এবং শাসনব্যবস্থার পলিসি ও প্রক্রিয়ার যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো তা থেকে কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব। প্রথম, এটা খুবই স্পষ্ট যে, সত্যি সত্যি আদিবাসী অঞ্চলে গোষ্ঠীগত স্বায়ত্তশাসনের কোন সুযোগ ইংরাজ গভর্নমেণ্ট দেননি। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট নিজেদের পলিসি সার্থক করার জন্য যখন যেমন ইচ্ছা বিধান ও ব্যবস্থা তৈরী করে নিয়ে আদিবাসী অঞ্চলে প্রয়োগ করেছেন। মাঝে মাঝে আদিবাসী সর্দারদের দিয়ে রেগুলেশন বা আধা-রেগুলেশনের ব্যবস্থাকে অথবা কালেক্টর কমিশনার এবং এজেণ্ট সাহেবের মরজি মাফিক রচিত ব্যবস্থাকে চালু করবার কাজে লাগান হয়েছে। এটা সর্দারতন্ত্র ছিল না, বরং বলা যায়—সর্দারদের সাহায্যে ইংরাজ কোম্পানীতন্ত্র। রেগুলেশন বহির্ভূত অঞ্চল অথবা পরবর্তীকালে তপশীলভুক্ত নামে ঘোষিত অঞ্চলগুলিই বিশেষভাবে আদিবাসী গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল। এই সব অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার রীতিনীতি ও ইতিহাস লক্ষ্য করলেই প্রথমে চোখে পড়ে এর জটিলতা। খানিকটা সাধারণ আইন, খানিকটা বিশেষ আইন তার সঙ্গে কিছুটা অফিসারী স্বেচ্ছাতন্ত্র মিশিয়ে, এবং তার মধ্যে আবার দুর্বল গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের ভেজাল দিয়ে এক উদ্ভট শাসন ব্যবস্থা আদিবাসীর অদৃষ্টের ওপর চাপান হয়। আংশিক আধুনিক প্রথা, আংশিক প্রাগৈতিহাসিক প্রথা এবং সবার ওপর কমিশনারী যথেচ্ছাতন্ত্র—এই হলো রেগুলেশন-বহির্ভূত অথবা তপশীলভুক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক গঠন। কোথাও হয়তো দেওয়ানী ব্যাপার সাধারণ আদালতের অধীন, এবং ফৌজদারী ব্যাপারে কমিশনার সাহেবই একমাত্র ন্যায়াধীশ।

সমস্ত ব্যাপার দেখে এই ধারণা হয় যে, আদিবাসী অঞ্চলে কোনমতে একটা শান্তি-রক্ষার জন্যই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রধানতঃ উৎসাহী হয়েছিলেন। জমির সমস্যা নিয়েই আদিবাসীরা বেশী বিচলিত হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ ভূমি-ব্যবস্থার রীতি অনুসারে বেশীর ভাগ জমি হিন্দু জমিদার ও মহাজনের হাতে চলে যাচ্ছিল। বিক্ষুব্ধ আদিবাসীকে এই জমির শোকে বহু বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছে। সুতরাং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট জমি সম্বন্ধে আদিবাসীদের প্রতি কিছু কিছু সহানুভূতি দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বিদ্রোহের পর প্রথম প্রথম কতগুলি আইন করে আদিবাসীদের জমি রক্ষার আনুকূল্য করেন। এইভাবে একটা শান্ত অবস্থা সৃষ্টি করেই, তারপর ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে ব্যাপক জরিপ ও নতুন বন্দোবস্ত ক'রে দস্তুরমত ভূমিকর প্রথা প্রবর্তন করেন। আদিবাসীকে আধুনিক যুগোপযোগী অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গে যোগ্যতার সঙ্গে উন্নতি করার পথে অগ্রসর করিয়ে দেবার কোন নীতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করেননি। রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে আদিবাসীর জীবনযাত্রাকে পুরাতন বৃত্তের মধ্যেই অচল করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। সত্যি সত্যিই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সাঁওতাল পরগণার দামিন অঞ্চলকে তালগাছের বৃত্ত দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ ভূমি-ব্যবস্থা আদিবাসীদের কাছে যতই নতুন ও অদ্ভুত লাগুক না কেন, এই একটি ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রবল অধ্যবসায়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত প্রাচীন আদিবাসীদের ঘাড়ে চাপিয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু সমস্ত আদিবাসী অঞ্চলে এই নীতি এখনও সম্পূর্ণ সফল হয়ে উঠতে পারেনি। তবে এটাই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতি। প্রথমে দমন নীতি, তারপর তোষণ-নীতি এবং তারপর আদিবাসীকে ধীরে ধীরে খাজনাদাতা বাধ্য প্রজারূপে পরিণত করার নীতি। সর্বত্র এই নীতির প্রক্রিয়া চলছে; কোন কোন ক্ষেত্রে এই নীতি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধ সার্থক হয়েছে।

দৃষ্টান্ত ঃ খোন্দমল ও গঞ্জামের খোন্দেরা ১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে কয়েকবার বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের পেছনে কতগুলি কারণ ছিল—(১) খোন্দ অঞ্চলে পুলিশ প্রথার প্রবর্তন, ধরাবাঁধা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সড়ক তৈরীর জন্য বেগার খাটতে বাধ্য হওয়া, এই তিন কারণে খোন্দেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। খোন্দমল এলাকায় পাহাড়ী উড়িয়ারা (এরা কোন আদিবাসী গোষ্ঠী নয়) জমির খাজনা দিয়ে থাকে, কিন্তু খোন্দের কাছ থেকে শুধু লাঙল কর (লাঙল প্রতি বার আনা) আদায় করা হয়। গঞ্জামের খোন্দদের লাঙলকরও দিতে হয় না। অধিকাংশ ভূমিই এখনো জরিপ বা বন্দোবস্ত করা হয়নি। কোরাপুট বা ভিজাগাপট্টম এজেন্সির জমিও এখনো ভালভাবে জরিপ ও বন্দোবস্ত করা হয়নি। এখানকার আদিবাসী গোষ্ঠী 'ঝুম' প্রথায় চাষ করে। জঙ্গলের ওপর তাদের বিশেষ কতগুলি অধিকার গভর্নমেণ্ট স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তারা নিজেদের প্রয়োজনের মত খাদ্য ঘরেই তৈরী করার অধিকার পেয়েছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস "মোহানা" 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বাহির হইবে।

---

(১) District Gazetteer of Mirzapur.

রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **স্বরলিপি :** ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

ললিত—চৌতাল

ডুবি অমৃতপাথারে— যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশী।
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমুরতি হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে ॥

| [ঋ]সা ঋা II {গা -মা | মা মা | -াঃ মঃ | [ম]ঋা -া | মা -ঋগা | (ঋসা -সঋা)} I -ঋা -সা I

ডু বি অ ০ মৃ ত ০ পা থা ০ রে ০০ ০০ ডুবি ০ ০

I [স]মা -া | -া মপা | মগা -া | মা দমা | -দা না | -র্সা র্সা I র্সা ঋর্ ‍া | -না [ম]দা | -পা পা |

যা ০ ই ভু০ লে০ ০ চ রা০ ০ চ ০ র মি লা য়্ র ০ বি

| মা -গপা | মা - [প]গঋা | সা ঋা II

শ ০০ শী ০০ "ডু বি"

I [ম]দা -মা | দা না | -র্সা র্সা | [র্স]ঋর্া -র্সা | র্সা র্সনা | -র্সা র্সা I [ন]র্সা -দা | দা না |

না ০ হি দে ০ শ না ০ হি কা০ ০ ল না ০ হি হে

| -র্সঋর্া ঋর্সা | [ন]র্সা -না | -দা দা | -পাঃ -মঃ I [গ]মা -া | মা মপা | গা গা | মা দমা |

০০ রি০ সী ০ ০ মা ০ ০ প্রে ০ ম মূ র তি হৃ দ০

| দা [দ]না | -র্সা র্সা I র্সা [র্ন]সা | -র্গা [র্গ]ঋর্া | [ঋর্]র্পা র্গা | [র্গ]ঋর্া -র্সা | -নদা [দ]পা | [ঋ]সা ঋা II II

য়ে জা ০ গে আ ন ০ ন্দ না হি ধ ০ ০০ রে "ডু বি"

তপশীলভুক্ত জিলা আইন পাশ হবার পর এইভাবে ক্রমে ক্রমে প্রয়োজন বুঝে তালিকায় উল্লিখিত অঞ্চলগুলি তপশীল জিলা হিসাবে ঘোষিত হতে থাকে। গোদাবরী এজেন্সী ১৮৯১ সালে সম্পূর্ণভাবে তপশীলভুক্ত হয়।

১৮৬২ সালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি (London Missionery Society) দক্ষিণ মির্জাপুরে দুধি-পরগণায় জমিদারী স্বত্ব নিয়ে মিশন স্থাপনের পরিকল্পনা করেন, এতে ধর্মপ্রচারের সুবিধা হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। কিন্তু মিশনের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ধর্মপ্রচারের সংগে জমিদারগিরি ঠিক খাপ খাবে না মনে ক'রে পথ ছেড়ে দেন। ১৮৬৪ সালে দক্ষিণ মির্জাপুরে রেগুলেশন-বহির্ভূত অঞ্চল ছিল, কিন্তু ১৮৭৪ সালে তপশীল জিলায় পরিণত হয়। ১৮৯১ সালে 'বোর্ড অব রেভিনিউ' দক্ষিণ মির্জাপুরের অঞ্চলের (রবার্টসনন্ড তহশীল) শাসনের জন্য সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা ও বিধিনির্দেশ প্রণয়ন করেন। রাজস্ব এবং দেওয়ানী ব্যাপার প্রচলিত সাধারণ আইনের অধিকার থেকে এই অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। দেওয়ানী মামলার ব্যাপারেও সাধারণ আদালতের অধিকার খারিজ করে দিয়ে কালেক্টরকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়। আপীলের সর্বোচ্চ দরবার হ'লো কমিশনার। শুধু সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে আপীলের সর্বোচ্চ অধিকার এলাহাবাদ হাইকোর্টের হাতে রইল। ফৌজদারী মামলার বিচারের ভারও জিলার কোন পূর্ণ-ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে দেওয়া হয়। (১)

কয়েকটি আদিবাসী অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের রীতিনীতি এবং শাসনব্যবস্থার পলিসি ও প্রক্রিয়ার যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো তা থেকে কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব। প্রথম, এটা খুবই স্পষ্ট যে, সত্যি সত্যি আদিবাসী অঞ্চলে গোষ্ঠীগত স্বায়ত্তশাসনের কোন সুযোগ ইংরাজ গভর্নমেণ্ট দেননি। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট নিজেদের পলিসি সার্থক করার জন্য যখন যেমন ইচ্ছা বিধান ও ব্যবস্থা তৈরী করে নিয়ে আদিবাসী অঞ্চলে প্রয়োগ করেছেন। মাঝে মাঝে আদিবাসী সর্দারদের দিয়ে রেগুলেশন বা আধা-রেগুলেশনের ব্যবস্থাকে অথবা কালেক্টর কমিশনার এবং এজেণ্ট সাহেবের মরজি মাফিক রচিত ব্যবস্থাকে চালু করবার কাজে লাগান হয়েছে। এটা সর্দারতন্ত্র ছিল না, বরং বলা যায়—সর্দারদের সাহায্যে ইংরাজ কোম্পানীতন্ত্র। রেগুলেশন বহির্ভূত অঞ্চল অথবা পরবর্তীকালে তপশীলভুক্ত নামে ঘোষিত অঞ্চলগুলিই বিশেষভাবে আদিবাসী গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল। এই সব অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার রীতিনীতি ও ইতিহাস লক্ষ্য করলেই প্রথমে চোখে পড়ে এর জটিলতা। খানিকটা সাধারণ আইন, খানিকটা বিশেষ আইন তার সংগে কিছুটা অফিসারী স্বেচ্ছাতন্ত্র মিশিয়ে, এবং তার মধ্যে আবার দুর্বল গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের ভেজাল দিয়ে এক উদ্ভট শাসন ব্যবস্থা আদিবাসীর অদৃষ্টের ওপর চাপান হয়। আংশিক আধুনিক প্রথা, আংশিক প্রাগৈতিহাসিক প্রথা এবং সবার ওপর কমিশনারী যথেচ্ছাতন্ত্র—এই হলো রেগুলেশন-বহির্ভূত অথবা তপশীলভুক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক গঠন। কোথাও হয়তো দেওয়ানী ব্যাপার সাধারণ আদালতের অধীন, এবং ফৌজদারী ব্যাপারে কমিশনার সাহেবই একমাত্র ন্যায়াধীশ।

সমস্ত ব্যাপার দেখে এই ধারণা হয় যে, আদিবাসী অঞ্চলে কোনমতে একটা শান্তি-রক্ষার জনাই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রধানতঃ উৎসাহী হয়েছিলেন। জমির সমস্যা নিয়েই আদিবাসীরা বেশী বিচলিত হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ ভূমি-ব্যবস্থার রীতি অনুসারে বেশীর ভাগ জমি হিন্দু জমিদার ও মহাজনের হাতে চলে যাচ্ছিল। বিক্ষুব্ধ আদিবাসীকে এই জমির শোকে বহু বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছে। সুতরাং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট জমি সম্বন্ধে আদিবাসীদের প্রতি কিছু কিছু সহানুভূতি দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বিদ্রোহের পর প্রথম প্রথম কতগুলি আইন করে আদিবাসীদের জমি রক্ষার আনুকূল্য করেন। এইভাবে একটা শান্ত অবস্থা সৃষ্টি করেই, তারপর ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে ব্যাপক জরিপ ও নতুন বন্দোবস্ত ক'রে দস্তুরমত ভূমিকর প্রথা প্রবর্তন করেন। আদিবাসীকে আধুনিক যুগোপযোগী অবস্থা ও প্রয়োজনের সংগে যোগ্যতার সংগে উন্নতি করার পথে অগ্রসর করিয়ে দেবার কোন নীতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করেননি। রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে আদিবাসীর জীবনযাত্রাকে পুরাতন বৃত্তের মধ্যেই অচল করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। সত্যি সত্যিই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সাঁওতাল পরগণার দামিন অঞ্চলকে তালগাছের বৃত্ত দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ ভূমি-ব্যবস্থা আদিবাসীদের কাছে যতই নতুন ও অদ্ভুত লাগুক না কেন, এই একটি ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রবল অধ্যবসায়ের সংগে শেষ পর্যন্ত প্রাচীন-আদিবাসীদের ঘাড়ে চাপিয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু সমস্ত আদিবাসী অঞ্চলে এই নীতি এখনও সম্পূর্ণ সফল হয়ে উঠতে পারেনি। তবে এটাই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতি। প্রথমে দমন নীতি, তারপর তোষণ-নীতি এবং তারপর আদিবাসীকে ধীরে ধীরে খাজনাদাতা বাধ্য প্রজারূপে পরিণত করার নীতি। সর্বত্র এই নীতির প্রক্রিয়া চলছে; কোন কোন ক্ষেত্রে এই নীতি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধ সার্থক হয়েছে।

দৃষ্টান্ত : খোন্দমল ও গঞ্জামের খোন্দেরা ১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে কয়েকবার বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের পেছনে কতগুলি কারণ ছিল—(১) খোন্দ অঞ্চলে পুলিশ প্রথার প্রবর্তন, ধরাবাঁধা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সড়ক তৈরীর জন্য বেগার খাটতে বাধ্য হওয়া, এই তিন কারণে খোন্দেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। খোন্দমল এলাকায় পাহাড়ী উড়িয়ারা (এরা কোন আদিবাসী গোষ্ঠী নয়) জমির খাজনা দিয়ে থাকে, কিন্তু খোন্দদের কাছ থেকে শুধু লাঙল কর (লাঙল প্রতি বার আনা) আদায় করা হয়। গঞ্জামের খোন্দদের লাঙলকরও দিতে হয় না। অধিকাংশ ভূমিই এখনো জরিপ বা বন্দোবস্ত করা হয়নি। কোরাপুট বা ভিজাগাপট্টম এজেন্সির জমিও এখনো ভালভাবে জরিপ ও বন্দোবস্ত করা হয়নি। এখানকার আদিবাসী গোষ্ঠী 'ঝুম' প্রথায় চাষ করে। জঙ্গলের ওপর তাদের বিশেষ কতগুলি অধিকার গভর্নমেণ্ট স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তারা নিজেদের প্রয়োজনের মত খাদ্য ঘরেই তৈরী করার অধিকার পেয়েছে।

(১) District Gazetteer of Mirzapur.

রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **স্বরলিপি :** ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

ললিত—চৌতাল

ডুবি অমৃতপাথারে— যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশী।
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমুরতি হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে ॥

| [ঋ]সা ঋা II {গা -মা | মা মা | -াঃ মঃ | [ম]ঋা -া | মা -ঋগা | (ঋসা -সঋা)} I -ঋা -সা I
ডু বি অ ০ মৃ ত ০ পা থা ০ রে ০০ ০০ ডুবি ০ ০

I [স]মা -া | -া মপা | মগা -া | মা দমা | -দা না | -র্সা র্সা I র্সা র্ঋা | -না [ন]দা | -পা পা |
যা ০ ই ভু০ লে০ ০ চ রা০ ০ চ ০ র মি লা য়্ র ০ বি

| মা -গপা | মা - [প]গঋা | সা ঋা II
শ ০০ শী ০০ "ডু বি"

I [ম]দা -মা | দা না | -র্সা র্সা | [র্স]র্ঋা -র্সা | র্সা র্সনা | -র্সা র্সা I [ন]র্সা -দা | দা না |
না ০ হি দে ০ শ না ০ হি কা০ ০ ল না ০ হি হে

| -র্সর্ঋা র্ঋর্সা | [ন]র্সা -না | -দা দা | -পাঃ -মঃ I [গ]মা -া | মা মপা | গা গা | মা দমা |
০০ রি০ সী ০ ০ মা ০ ০ প্রে ০ ম মু্ র তি হৃ দ০

| দা [দ]না | -র্সা র্সা I র্সা [র্ন]সা | -র্গা [র্গ]র্ঋা | [র্ঋ]র্পা র্গা | [র্গ]র্ঋা -র্সা | -নদা [দ]পা | [ঋ]সা ঋা II II
য়ে জা ০ গে আ ন ০ ন্দ না হি ধ ০ ০০ রে "ডু বি"

দেশী সংবাদ

২২শে সেপ্টেম্বর—নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে নবনগরের জাম সাহেব এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, জুনাগড় ও উহার চতুর্দিকস্থ রাজ্যে যেরূপ গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তদনুযায়ী ভারতীয় ডোমিনিয়ন কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে কাথিয়াবাড়কে রক্ষার জন্য জুনাগড় ও পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য হইয়া উঠিতে পারে। জুনাগড়ের পাকিস্থানে যোগদানের সিদ্ধান্তকে তিনি মিঃ জিন্নার কৌশল বলিয়া অভিহিত করেন।

পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর আহবানক্রমে কলিকাতায় পশ্চিম বঙ্গের পরিষদ সদস্যগণ এবং দল নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে খাদ্য সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও চোরাকারবার দমনে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য কেন্দ্রে এবং মফঃস্বলে সর্বদলীয় পরামর্শ বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জেল কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে হায়দরাবাদ রাজ্যের উসমাবাদ সেণ্ট্রাল জেলের ১৬০ জন রাজনীতিক বন্দী অনশন ধর্মঘট করিয়াছে।

২৩শে সেপ্টেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনে পাঞ্জাবের হাঙ্গামা বিশেষতঃ আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা ও উভয় পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার প্রশ্ন আলোচনা হয়।

প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি ও সেক্রেটারিগণকে লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল কমিটি এই মর্মে সুপারিশ করিয়াছেন যে, সর্বপ্রকার আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের নূতন আদর্শ হইবে। কংগ্রেসের পুনর্গঠন সম্পর্কে স্পেশ্যাল কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, কংগ্রেসকে এক দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত করিতে হইবে—কোন সুসংবদ্ধ দলকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

২৪শে সেপ্টেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। মহাত্মা গান্ধী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক বিবৃতিতে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সাধ্যমত সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকার রক্ষা করিতে থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। বিবৃতিতে ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিকট হইতেও রাষ্ট্রের প্রতি অনুরূপ আনুগত্য আশা করেন। ওয়ার্কিং কমিটি বলেন যে, বর্তমান বিপর্যয়ে কংগ্রেসের মৌলিক জাতীয় সত্তার কোন পরিবর্তন হয় নাই।

কয়েকটি সংরক্ষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় ব্যাপারে জনসাধারণের নির্বাচিত মন্ত্রীদের উপর শাসনভার অর্পণ করিয়া মহীশূরের মহারাজা এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছেন। ভারতীয় ডোমিনিয়নের সহিত শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং হাইকোর্টের শাসন পরিচালনা সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

জনৈক সামরিক মুখপাত্র নয়াদিল্লীতে বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের উপদ্রুত অঞ্চলে ৮খানি আশ্রয়প্রার্থীবাহী ট্রেণের উপর আক্রমণ চালান হয়। আক্রমণকারীদিগকে বাধা দেওয়ার সময় একজন অফিসার ও একজন সিপাহী নিহত হয় এবং একজন মেজর একজন নন-কমিসণ্ড অফিসার ও অপর ৮জন আহত হইয়াছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর—জুনাগড় রাজ্যের প্রজাদের গণভোট গ্রহণ ও তাহাদের স্বাধীন মতামত দ্বারা সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব করিয়া অদ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দেশীয় রাজ্য দপ্তর হইতে এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যার সমাধানে দৃঢ়সংকল্প।

জুনাগড় রাজ্যের যে সকল প্রজা বোম্বাইয়ে অবস্থান করেন তাহাদের এক বিরাট সভায় জুনাগড়ের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত শ্যামলদাস গান্ধী আজ ঘোষণা করেন যে, জুনাগড়কে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে আনিতে না পারা পর্যন্ত উহার বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধ' ঘোষণা করা হইল।

২৬শে সেপ্টেম্বর—ভারত সরকারের খাদ্য সচিব ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতের খাদ্য অবস্থা খুবই সঙ্গীন। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের হাতে মজুত খাদ্য শস্যের পরিমাণ খুবই সামান্য বলিয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কেবল যে মাঝে মাঝে রেশনিং ব্যবস্থায়ই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহাই নয়, বর্তমান রেশনের বরাদ্দও অতিমাত্রায় কমাইতে হইবে। আগামী অক্টোবর ও নবেম্বর মাসই আমাদের সম্মুখে সর্বাধিক সংকটজনক সময়।

নয়াদিল্লীতে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, তিনি সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের বিরোধী। কিন্তু পাকিস্থান হইতে ন্যায় বিচারলাভের অন্য কোন উপায় না থাকিলে এবং পাকিস্থানের যে ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে তাহা যদি পাকিস্থান ক্রমাগত উপেক্ষা করিয়া চলে ও তাহার গুরুত্ব হ্রাস করিতে চেষ্টা করে তবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টকে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।

শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। অদ্য গবর্ণমেণ্ট হাউসে তিনি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ১৭ই আগষ্ট হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৭ লক্ষাধিক অ-মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিম পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়াছে।

উড়িষ্যা পরিষদের মুসলিম লীগ দলপতি মিঃ লতিফুর রহমান এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানগণ এখন উপলব্ধি করিতেছে যে, তাহারা পাকিস্থান আন্দোলন সমর্থন করিয়া ভুল করিয়াছে। তিনি মুসলমানদিগকে দুই জাতিতত্ত্ব বিস্মৃত হইতে এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর—মিলে গম ভাঙ্গিবার সময় উহার সহিত একপ্রকার সাজি মাটি মিশ্রিত হইতেছে এই সন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী অদ্য কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডে এক ময়দার কলে অকস্মাৎ উপস্থিত হন এবং ১৫০টি থলিয়াপূর্ণ সাজিমাটি আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক থলিয়ার ওজন আড়াই মণ। প্রধান মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ এই থলিয়াগুলি হস্তগত করিবার এবং উক্ত কলের মালিককে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর—বাঙ্গালোরের সংবাদে প্রকাশ, মহীশূর রাজ্যের উত্তর সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত সীমান্তবর্তী বোম্বাই প্রদেশের ধারওয়ার জেলা হইতে কয়েকদল সশস্ত্র জনতা রাজ্যের অভ্যন্তর ভাগে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। অদ্য হাসানে সত্যাগ্রহী দল পুলিশের উপর ইটপাথর বর্ষণ করাতে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। পুলিশ লাঠিচার্জ করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করে।

সিমলার সংবাদে প্রকাশ, মিঞাওয়ালী জেলার ভক্কর তহশীলের উপকণ্ঠে জনতা কর্তৃক এক সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই আক্রমণে বহু লোক হতাহত হইয়াছে। নোটা এবং বেহাল নামক দুইটি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রকাশ, এই দুই গ্রাম হইতে প্রায় দুইশত নারী ও যুবতী অপহৃত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২২শে সেপ্টেম্বর—শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত অদ্য নিউইয়র্কে এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, ইউরোপের আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা প্রতিদিন বিশ্ববাসীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে; কিন্তু এশিয়ার লক্ষ লক্ষ লোক যে অনশন, রোগ ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পলে পলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের কথা কেহই স্মরণ করিতেছে না।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন অদ্য সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, সমগ্র মানবসমাজ আজ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে তিনি বলিয়াছেন যে, আগামী যুদ্ধে সমগ্র মনুষ্য সমাজ নিশ্চিহ্ন হইবে; এই সংগ্রাম পরিহার করিতে হইলে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদকে বিশ্ব পার্লামেণ্টে রূপান্তরিত করিতে হইবে।

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটেন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ লোহার টুকরা প্রেরণের নাম করিয়া করাচী ও হায়দরাবাদে বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক প্রেরণ করিতেছে।

ফরাসী গণতন্ত্রের সভাপতি মঁ আড়িয়া ও প্রধান মন্ত্রী মঁ রামাদিয়ার অদ্য প্যারিসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল ও সোভিয়েট ডেপুটি পররাষ্ট্র সচিব মঃ ভিসিনিস্কির মধ্যে যেরূপ সরাসরি কলহ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে তৃতীয় মহাসমরের আশংকা অত্যধিক বাড়িয়া উঠিতেছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর—সিরিয়া গবর্ণমেণ্ট বৃটেনের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বৃটেন বা সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান, যে কেহই প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাকেই যথাশক্তি বাধা দেওয়া হইবে।

২৮শে সেপ্টেম্বর—কায়রোতে প্রাপ্ত একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, প্যালেষ্টাইন রক্ষার জন্য দামাস্কাসের উপকণ্ঠে একটি আরব বাহিনী গঠন করা হইতেছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সূচীপত্র

শারদীয়া সংখ্যা—১৩৫৪

পূজাসংখ্যা 'দেশ' অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের রচনা ও কুশলী শিল্পিবৃন্দের অঙ্কিত চিত্রাদিতে সমৃদ্ধ হইবে এবং মহালয়ার পূর্বেই বাহির হইবে।

স্বনামধন্য লেখকগণের লেখা ছাড়াও এবারের পূজাসংখ্যা দেশ কয়েকটি বিশেষ কারণে সবিশেষ আকর্ষণীয় হইবেঃ

১. **রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা — "ছেলেবেলাকার শরৎকাল"**

২. **সাহিত্যাচার্য প্রমথ চৌধুরী লিখিত "বিলাতের চিঠি"—**

লেখকের বিলাতে পাঠকালীন (১৮৯৩—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ) লিখিত এই সুদীর্ঘ পত্রগুলিতে তৎকালীন বিলাতের নানা কৌতূহলোদ্দীপক আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৩. **নিম্নলিখিত শিল্পীগণের অঙ্কিত রঙিন ছবিতে এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হইবে :**

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নন্দলাল বসু
বিনায়ক মাসোজি

তাহা ছাড়া নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত বহুসংখ্যক স্কেচ্-চিত্রে শারদীয়া দেশ সুসজ্জিত হইবে।

৪. **শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "কলাবনের কলা" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ রসরচনা এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।**

এই সংখ্যায় যাঁহারা গল্প লিখিয়াছেন ঃ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রবোধকুমার সান্যাল
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
মনোজ বসু
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্র—না—বি
সতীনাথ ভাদুড়ী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুমথনাথ ঘোষ
সুশীল রায়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
নরেন্দ্র ঘোষ
অমলেন্দু দাশগুপ্ত
প্রভাত দেব সরকার
আশু চট্টোপাধ্যায়
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
লীলা মজুমদার
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি

এই সংখ্যার প্রবন্ধলেখকগণঃ

ক্ষিতিমোহন সেন
ডক্টর সুকুমার সেন
পশুপতি ভট্টাচার্য
কনকভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
উমা রায়
অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
ধীরাজ ভট্টাচার্য
দেবনারায়ণ গুপ্ত
বনানী চৌধুরী প্রভৃতি

কবিতা লিখিয়াছেন ঃ

প্রেমেন্দ্র মিত্র
কালিদাস রায়
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
অজিত দত্ত
জীবনানন্দ দাস
অজয় ভট্টাচার্য
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
বিরাম মুখোপাধ্যায়
দিনেশ দাস
হরপ্রসাদ মিত্র
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
বিমলচন্দ্র ঘোষ
অরুণ সরকার
আশরাফ্ সিদ্দিকী
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
গোপাল ভৌমিক
মৃণালকান্তি দাশ
গোবিন্দ চক্রবর্তী
যতীন্দ্র সেন প্রভৃতি

মহালয়ার পূর্বেই বাহির হইবে।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ২৷৷০ টাকা, রেজেস্ট্রী ডাকযোগে ২৸০ ভি, পি, যোগে পাঠানো সম্ভবপর হইবে না।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ২৪শে আশ্বিন, ১৩৫৪ সাল। Saturday, 11th October, 1947. [৪৯শ সংখ্যা

পূর্ববঙ্গে দুর্গাপূজা

দুর্গোৎসব আগতপ্রায়। এই সময়ে পূর্ববঙ্গে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে বাদ্যভাণ্ড-সহকারে হিন্দুদের গৃহে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। এবারও অনেকে আয়োজন করিয়াছেন; কিন্তু সকলেরই মনে একটা উদ্বেগ এবং আতঙ্ক রহিয়াছে। ইহাকে একেবারে অমূলক বলা চলে না। ঢাকা শহরের ঐতিহাসিক জন্মাষ্টমীর মিছিল বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে স্বতঃই একটা সংশয় দেখা দিয়াছে। তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টের অভিপ্রায় ও প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং নাজিমুদ্দীনের ব্যক্তিগত মধ্যস্থতাতেও বাধাদানকারিগণের সঙ্কল্প টলিল না। অবশেষে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটকে হিন্দুদিগকে এই কথাই শুনাইয়া দিতে হইল যে, মুসলমানেরাও কোন সময়েই বাদ্যসহকারে মসজিদের নিকট দিয়া জন্মাষ্টমীর মিছিল যাইতে দিতে সম্মত নহে। ফলে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দুগণ নিজেদের চিরাচরিত দাবী এবং পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কিত ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের কর্তব্য ক্ষুণ্ণ করিতে বাধ্য হইলেন। জন্মাষ্টমী মিছিলের সম্পর্কে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহাতে তাহার পুনরাভিনয় না ঘটে, সেজন্য পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টকে দৃঢ়চেতর মনোভাব অবলম্বন করিতে হইবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার আশ্বাস পূর্ব পাকিস্থানের গভর্নমেণ্ট অনেক-বার দিয়াছেন। মিঃ নাজিমুদ্দীন ৩০শে সেপ্টেম্বর একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "বর্তমান সময়ে দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। শান্তিপূর্ণ অবস্থার অন্তরায় হয়, এমন কিছু সংঘটিত হইতে দেওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।" তিনি যশোহর ও খুলনা পরিভ্রমণকালেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহারা নির্বিঘ্নে যথারীতি আসন্ন শারদীয় উৎসব সম্পন্ন করিতে পারিবেন; কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতি-পালন করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ গভর্ন-মেণ্টের নীতি কতটা বাস্তব কার্যকারিতা লাভ করে, আমরা উদ্বিগ্নভাবে তাহাই দেখিবার অপেক্ষায় থাকিলাম। গভর্ন-মেণ্টের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে কোন লোক বা দল মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির প্রশ্ন যদি ভবিষ্যতেও উঠে, তবে পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তার ভাব নিশ্চয়ই বিপর্যস্ত হইবে। সুতরাং ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের ন্যায় পূর্ববঙ্গে দুর্গোৎসব উদ্‌যাপনে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার পরিচালনায় কেহ কোথায়ও বাধাদান করিতে উদ্যত হইলে গভর্নমেণ্ট সোজাসুজি তেমন দৌরাত্ম্য দমন করিবেন, তাঁহাদের অবিলম্বে ইহাই ঘোষণা করা আবশ্যক। তাঁহারা পূর্ববঙ্গের সর্বত্র সর্বতোভাবে শান্তি কামনা করিতেছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের আন্তরিকতায় আমাদের একটুও অবিশ্বাস নাই। এক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে আমরা এই কথাই বলিব যে, তাঁহাদের এই শান্তি প্রচেষ্টার পথে বাধা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিক হইতে আসিবে না। বস্তুত ১৫ই আগস্টের পর পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্য রক্ষার জন্যই একান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন; প্রধান মন্ত্রী মিঃ নাজিমুদ্দীনও একথা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বাধা যদি আসে অপর পক্ষ হইতেই আসিবে। পূর্ববঙ্গ সরকার বলিষ্ঠ হস্তে মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক বর্বরতার তেমন দুষ্প্রবৃত্তি দলন করুন, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। আগামী দুর্গাপূজা তাঁহাদের পরীক্ষাস্থল। পূর্ববঙ্গের গভর্নমেণ্ট নিরপেক্ষ উদার আদর্শবলে এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হউন আমরা ইহাই কামনা করি। দলগত কোন স্বার্থে সঙ্কীর্ণ বিচার বা তজ্জনিত দুর্বলতা যেন এ সম্পর্কে বিড়ম্বনার সৃষ্টি না করে।

দুই জাতিতত্ত্বের বিষময় পরিণাম

ভারতীয় মুসলমান সমাজেরই সমর্থনে ও সংগ্রামে পাকিস্থান অর্জিত হইয়াছে। দেখিতেছি এখন সেই ভারতীয় মুসলমান সমাজেই দুই জাতি মত-বাদের অনিষ্টকারিতা ক্রমেই উন্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে। সেদিন কাশ্মীরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক সেখ আবদুল্লা দুই জাতিতত্ত্বের বিশেষভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দুই জাতি মতবাদের পরিণতিতে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের সাড়ে চারি কোটি মুসলমানের কি লাভ হইল? তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে সহানুভূতির উদ্রেক হয়। পাকিস্থানপন্থীরা নোয়াখালি হইতে তাহাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করে এবং তথাকার অ-মুসলমানদিগকে তজ্জন্য অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। ইহার প্রতিশোধ লইল বিহার। পরে সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখরা নিহত হইতে লাগিল।

ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পূর্বে পাঞ্জাব ও দিল্লীতে মুসলমানদিগকে হত্যা করা হইল। দুই জাতিতত্ত্বের ইহাই ফল দাঁড়াইয়াছে।" ইহার পূর্বে দিল্লীর ৫৯ জন বিশিষ্ট পৌরবাসী দুই জাতি মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করিয়া গান্ধীজীর নিকট একটি বিবৃতি পেশ করেন। ইঁহাদের মধ্যে স্থানীয় মুসলমান সমাজের অনেক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। বোম্বাইয়ের মুসলমান সমাজের নেতাগণও একটি বিবৃতিতে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার পর বোম্বাই প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ জারি রক্তক্ষয়কারী ভ্রাতৃহত্যায় নিমজ্জিত ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে হইলে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পন্থাই একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রগতিশীল তরুণদের মনোবৃত্তি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বিরোধী হওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাদের আদর্শ নিষ্ঠায়ই আমরা গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকি। কারণ, মিথ্যাকে শুধু নিন্দা করিয়া নয়, মনে প্রাণে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া মিথ্যাকে উৎখাত আদর্শকে জীবন্ত করিয়া তোলে। দুই জাতি-তত্ত্বের মোহার্ত এবং তাহার কুটিল আবর্ত হইতে ভারতবর্ষকে বাঁচাইতে হইলে এমনই সত্যনিষ্ঠ উদারচেতা কর্মিদলের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার উদ্বোধন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মৌখিক সদুপদেশদানকারিগণ তাঁহাদের বাক্‌-বৈভবে বর্তমান এই সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে ভিড় জমাইতে চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়।

স্থানত্যাগের হিড়িক

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বহু নরনারী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পূর্ব পাকিস্থানের কয়েকটি অঞ্চল বিশেষভাবে ঢাকা শহর ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিতেছি, পূর্ব পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট একটি বেতার বক্তৃতায় হিন্দুদিগকে আশ্বাস দান করিয়া বলিতেছেন যে, গভর্নমেণ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছেন। তাঁহারা ঢাকাতে কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে দিবেন না। সংবাদে প্রকাশ, ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার এই আশ্বাস্ত কার্যে পরিণত করিতেও উদ্যোগী হইয়াছেন। শহরের হিন্দুদের কয়েকটি বাড়ি বেদখল করা হইয়াছে, এই অভিযোগের তদন্তসূত্রে তিনি এই সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন যে, বেদখলকারীরা যদি অবিলম্বে ঐ সব বাড়ি ত্যাগ না করে, তবে তিনি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদিগকে বাড়ি ছাড়িতে নির্দেশ দিবেন। পাকিস্থান প্রাপ্তির অসমীচীন উল্লাস এবং অসংযত উত্তেজনায় যাহারা এইভাবে উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে, ঢাকার কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে কঠোরহস্তে দলন করিয়া তত্রত্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে আশ্বস্তির ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। এই সম্পর্কে তাঁহারা সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী মিঃ খুরোর ন্যায় ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করিবেন না এবং গৃহত্যাগী হিন্দুদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবার ফ্যাসিস্ট মনোভাব-মূলক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া অবস্থাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিবেন না, ইহাই আমরা আশা করি। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, কেবল ঢাকার সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেই চলিবে না। পূর্ব পাকিস্থানের আরও কয়েকটি স্থান হইতে আমরা একদল লোকের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উত্তেজক স্পর্ধারীর অভিযোগ পাইতেছি। পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টকে ইহাদিগকে নিরস্ত করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড নামধেয় কতকগুলি লোকের বিরুদ্ধেই বিশেষভাবে এই অভিযোগ। পাবনা এবং তন্নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে ইহাদের উপদ্রবের নানারূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ইহারা হিমায়েৎপুর গ্রামটি অবরুদ্ধ করে বলিয়াও খবর পাওয়া যায়। স্থানীয় শাসকদের কর্তৃত্ব ইহারা কোন ক্ষেত্রেই গ্রাহ্য করে না। প্রকৃতপক্ষে ইহারা নিজেরাই সর্বেসর্বা। জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই দলের কতকগুলি লোকের অমার্জিত মনোবৃত্তিমূলক এইসব ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের সম্বন্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট ইঁহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের মন্ত্রীরা • এবং সমর্থকগণ এই এই দলের প্রশংসা কীর্তনেই প্রবৃত্ত আছেন, আমরা ইহা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিতেছি। চোরাকারবার, দুর্নীতি প্রভৃতি দলনের ক্ষেত্রে ইহারা যদি সরকারকে সাহায্য করে এবং সতাই পূর্ব পাকিস্থানের স্বার্থরক্ষায় সাবহিত এক শিক্ষামার্জিত উদার মনোবৃত্তির দ্বারা প্ররোচিত হইয়া তাহারা কাজ করে, সেক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাবে বিভ্রান্ত হইয়া ইহারা যেখানে মানুষের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতেছে, সেইখানেই আমাদের আপত্তি। বিশেষত প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেণ্টের বিধি-বিহিত নিয়মানুবর্তিতা যদি ইহারা না মানিয়া চলে, তবে ইহাদের কাজে গভর্নমেণ্টের একান্তই আশঙ্কার কারণ থাকিয়া যায়। কয়েকটি স্থানে এই দলের লোকদের আচরণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ইহারা গভর্নমেণ্ট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশের নির্দেশ মানে না; বস্তুত ইহারা নিজদিগকে গভর্নমেণ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া প্রমাণ করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোন সভ্য গভর্নমেণ্টই এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। ইহাদের সম্বন্ধে নিজেদের নীতি সুস্পষ্টভাবে সর্বসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া পূর্ব পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের এ সত্য উপলব্ধি করা উচিত যে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে কেহ পিতৃপুরুষের বাসভূমি ছাড়িয়া আসিতে চায় না। একান্ত অসহায় অবস্থাই মানুষকে এমন সর্বস্বান্তকর ব্যবস্থা অবলম্বনে প্ররোচিত করে। পূর্ব পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে এই অসহায়ত্বের ভাব যাহাতে দেখা না দেয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং তাহার বাধাতক পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতীকার সাধন করুন, দেশ ত্যাগের আতঙ্ক তবেই দূর হইবে। নতুবা শুধু মুখের কথায় অতীতের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ বিভীষিকায় বিভ্রান্ত জনগণের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সংস্কার সাধন সম্ভব নয়।

আদর্শের বিরোধ ও বৈষম্য

কংগ্রেস রাষ্ট্রের সহিত সাম্প্রদায়িকতাকে কোনদিন জড়িত করে নাই। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতাকে সে সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াই রাষ্ট্র সম্পর্কিত সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এবং ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও কংগ্রেস তাহার অসাম্প্রদায়িক সেই উদার আদর্শে অবিচলিত আছে। ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেদিনও অভ্রান্ত ভাষায় এই সত্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেস হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন দাবী স্বীকার করিয়া লইবে না। ঐরূপ দাবী নির্বোধের দাবী এবং মধ্যযুগোচিত ধর্মসংস্কারান্ধ বর্বর মনোভাবই সে দাবীর সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও দৃঢ়ভাবে পশ্চিম বঙ্গের শাসন ব্যবস্থায় এই অসাম্প্রদায়িক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপর জোর দিয়াছেন। মুসলিম লীগের নিয়ন্তৃস্বরূপে মিঃ জিন্না মুখে একথা বলিয়াছিলেন বটে যে, পাকিস্থান ধর্মানুশাসনানুমোদিত রাষ্ট্র নয়; কিন্তু পাকিস্থানী রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত ব্যবস্থার তাঁহার সে উক্তির যাথার্থ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে এখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে না। বস্তুতঃ পাকিস্থান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকেরা পাকিস্থান যে মুসলমান রাষ্ট্র, এখনও এই কথাই বুঝাইতে চাহিতেছেন এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির মর্যাদার একটা মোহ তাঁহাদের মনের কোণে থাকিয়া সেখানকার রাষ্ট্রনীতিক জটিল চক্রে আবর্তিত করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ

সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ মূলে সাম্প্রদায়িকতাই এ পর্যন্ত মুখ্যভাবে কাজ করিয়াছে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়ক এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। ইহার ফলে এই গার্ড দলের কর্মতৎপরতার গতি পাকিস্থানের সমগ্র রাষ্ট্র-নীতির উপর প্রতিফলিত হইতেছে। পাকিস্থান যদি ধর্মানুশাসিত রাষ্ট্রই না হয়, তবে এইরূপ একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্থান সরকারের এতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল না। যদি গুরুত্ব দিতেই হয়, তবে সে প্রতিষ্ঠান যাহাতে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া পাকিস্থানের হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তরুণদিগকে লইয়া যদি ঐ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইত, তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে তদ্দ্বারা আশ্বস্তির ভাব বৃদ্ধি পাইত। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে দেশ আজ ছারখার হইতে বসিয়াছে। পারস্পরিক দোষারোপের কূটচক্রে এই আগুন বাড়াইলে ভারতবর্ষের কিছুই থাকিবে না। পূর্ব এবং পশ্চিম বাঙলার উভয় অংশকে এই অনর্থ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। বাহিরের অনর্থ বাঙলার কোন অংশে যাহাতে না ছড়ায়, তেমন দায়িত্ব এবং কর্তব্যবুদ্ধি লইয়া উভয় বঙ্গের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচালনা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্থানী নীতির মূলগত দুই-জাতিত্বের যুক্তির মধ্যে মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার অনুদারতা যে ছিল, সে সত্যকে চাপা দিবার সময় আর নাই এবং সে মনোভাব আমাদের সমাজ-জীবনে নৈতিক বিপর্যয় যে ঘটাইয়াছে, এ সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না। দেশ, জাতি এবং সমাজের শুভবুদ্ধি উন্মেষে আজ পাকিস্থানী মতবাদীদের দৃষ্টি যদি সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের মর্যাদা মোহ হইতে মুক্ত হয়, তবেই বাঙলা দেশ রক্ষা পাইবে। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের মোহ এখনও সম্যক্-রূপে কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাইয়া তাঁহারা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এখন সেই বিষ ছড়াইতে গেলে পাছে নেতৃত্বের রজ্জু নিজেদের হাত হইতে ফসকাইয়া যায়, তাঁহারা এই ভয়ে যেন আড়ষ্ট হইতেছেন। এ অবস্থায় পারস্পরিক স্বার্থের শুভবুদ্ধিতে বাঙলার ব্যাপক এবং বলিষ্ঠ জনমত বিকাশের উপরই কার্যত সমগ্র বঙ্গের শান্তি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যতদিন পর্যন্ত তেমন জাগরণ পূর্ণাঙ্গভাবে না ঘটিবে, পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মতবৈষম্যের নিরসন ঘটিবে না এবং জনগণের বাস্তব জীবনে বর্তমানের এই স্বাধীনতা দুঃস্বপ্নের মতই বিভীষিকা বিস্তার করিবে।

দুষ্কৃত দলন

পশ্চিমবঙ্গে গভর্নমেণ্ট কঠোরহস্তে দুষ্কৃত দলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রচলিত আইনের নির্দিষ্ট দণ্ড যথেষ্ট নহে, মনে করিয়া তাঁহারা চোরাকারবারী-দের জন্য বিশেষ দণ্ডবিধানের আয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল চোরাকারবারী নয়, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিয়া যাহারা মনুষ্যঘাতী অপরাধ করে, এই সঙ্গে তাহাদের প্রতিও আদর্শ দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হওয়া একান্তই আবশ্যক। কোন কোন রাষ্ট্রে এই শ্রেণীর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত বিহিত হইয়াছে। অর্থলিপ্সায় এদেশের এক শ্রেণীর লোক আজ সত্য রাক্ষসে পরিণত হইয়াছে। ইহাদিগকে সায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ন-মেণ্ট যেমন কঠোর দণ্ড প্রবর্তনে উদ্যোগী হউন না কেন, সেক্ষেত্রে তাহারা জনসাধারণের সর্বতোভাবে সমর্থন লাভ করিবেন। এই সম্পর্কে আমাদের আরও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র কঠোর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারাই দুর্নীতির প্রতীকার সাধিত হয় না, পরন্তু সেইসব ব্যবস্থা বলবৎ করিবার জন্য শাসন বিভাগের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রচেষ্টারও বিশেষভাবে প্রয়োজন। চোরাবাজার এবং ভেজালমূলক দুর্নীতি দলনের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল প্রত্যক্ষভাবে উদ্যোগী হওয়ার ফলেই শাসন বিভাগে এজন্য কিছু সাড়া পড়িয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে দুষ্কৃত-কারীদের পাপ ব্যবসা একরূপ অপ্রতিহত-ভাবেই চলিতেছিল। অথচ আইন ছিল এবং আইনের বিধান প্রয়োগের জন্য পুলিশও ছিল; কিন্তু গোপন-গুহার পাপীরা এমনভাবে ধরা পড়ে নাই। এতদ্দ্বারা পুলিশ বিভাগের অযোগ্যতাই প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে আমলা-তান্ত্রিক প্রভাবের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া এই বিভাগে দেশসেবা এবং তৎসম্পর্কিত মানবোচিত কর্তব্য পালনে মর্যাদাবোধ এখনও জাগ্রত হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা না আছে, এমন নহে। রাজদ্রোহী-দলনে সিন্ধুনীরে, ভূধর শিখরে ইহাদের অতন্দ্রিত উদ্যমের পরিচয় পরাধীন বাঙলা অশেষ রকমে পাইয়াছে। অথচ কলিকাতা শহরে চোরাবাজারী এবং ভেজাল ব্যবসায়ীদের পৈশাচিক খেলা ইহাদের চোখে ধরা পড়ে না। পরাধীন বাঙলার রাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে ইঁহাদের পক্ষে অনেক বাধা ছিল। সেক্ষেত্রে জনসাধারণের সমর্থন তাহারা লাভ করে নাই। গোয়েন্দা দলের কর্মতৎপরতা তখন জনসাধারণের দৃষ্টিতে ধিক্কৃত এবং নিন্দিত হইত, কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। বর্তমানে পুলিশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা বিভাগের কাজ স্বদেশসেবারই সমমর্যাদা লাভ করিয়াছে; দুর্নীতি দমনে জনসাধারণের সহযোগিতা তাহারা লাভ করিতেছে; তথাপি মন্ত্রীরা সাক্ষাৎ সম্পর্কে এই প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশের চৈতন্য ঘটে নাই, ইহাই আশ্চর্য। অবিলম্বে সমগ্র পুলিশ বিভাগের এই মনো-বৃত্তির প্রতীকার সাধিত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা দুষ্কৃতকারীরা সমগ্রভাবে দমিত হইবে না। আমাদের মতে পাপীদের মধ্যে নগণ্য অংশই এ পর্যন্ত ধরা পড়িয়াছে, এবং শহর জুড়িয়া পাপ-ব্যবসা ব্যাপকভাবে অদ্যাপি চলিতেছে। এ পাপকে সমূলে উৎখাত করিতে হইবে এবং সভ্য সমাজসম্মত নীতিকে আমাদের সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, কারণ তাহার উপরই আমাদের স্বাধীনতা লাভের সার্থকতা নির্ভর করে।

কেন লিখি

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ থেকে 'কেন লিখি' বলে একখানা বই প্রকাশিত হয়েছে। বইখানা বেরিয়েছে বেশ কিছুদিন আগে, আমি পড়লুম মাত্র সেদিন। ইদানীং আমি নিজের লেখা ছাড়া অপরের লেখা বড় একটা পড়িনে। যখন নিজে লিখতুম না তখন অবশ্যই অপরের লেখা পড়তুম। নিতান্ত বাধ্য হয়েই মধুর অভাবে তখন গুড় দিয়ে অবসর-বিনোদন করতে হ'তো। আপনারা হয়তো ভাবছেন আমার এ কথা শুনে সাহিত্যিক সম্প্রদায় ভয়ানক চটে যাবেন। কিন্তু আমি সে রকম কিছু আশঙ্কা করি না, কারণ আমি জানি সাহিত্যিকরা আমার এ লেখা কখনো পড়বে না; অপরের লেখা তাঁরা আমার চাইতেও কম পড়ে থাকেন।

যাঁরা উক্ত গ্রন্থে নিজ নিজ লেখা সম্বন্ধে জবানবন্দী প্রকাশ করেছেন তাঁরা সকলেই খ্যাতনামা লেখক। দুঃখের বিষয়, তাঁদের সে জবানবন্দী পড়ে আমি বড় নিরাশ হয়েছি। আমি ভাবতুম তাঁরাই সাহিত্যিক যাঁরা কঠিন কথা সহজ করে বলতে পারেন। এক্ষেত্রে দেখলুম এঁরা সবাই একটা অত্যন্ত সহজ কথাকে ভয়ানক কঠিন করে বলেছেন। তাঁরা সকলেই সুলেখক। তাঁরা কেন লেখেন সেটা তাঁদের বই পড়েই মোটামুটি বুঝে নেওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের জবানবন্দী পড়ে মনে হ'ল এঁরা কেন লেখেন তার মূলে একটা রীতিমতো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে এবং সে উদ্দেশ্যটা মোটেই সহজবোধ্য ব্যাপার নয়।

কেন লিখি—এ প্রশ্নের জবাবে এঁরা কেউ বলেন নি যে লিখতে পারি বলে লিখি। লিখতে না পারলে নিশ্চয় লিখতুম না। গাইতে জানলেই লোক গাইয়ে, বাজাতে জানলেই বাজিয়ে, লিখতে জানলেই লিখিয়ে। ফুটবল খেলতে পারি বলে ফুটবল খেলি, কবিতা লিখতে পারি বলে কবিতা লিখি। এই তো সোজা কথা। কেন খাও জিগগেস করলে যে লোকটা বলে খিদে পায় বলে খাই, সে-ই সব চেয়ে সত্য কথা বলে। আর যে বলে, না খেলে শরীরে কেমন করে বল হবে, শরীরে বল না হলে কেমন করে দেশের এবং দশের কাজ করব এবং সেই সূত্রে ভিটামিন-তত্ত্বের বক্তৃতা শুরু করে দেয়, তাকে সোজা কথায় বলা যায়—pedant. Pedanticism জিনিসটা সাহিত্যিককে একেবারে মানায় না। এঁরা সকলেই সুলেখক, কিন্তু এঁদের জবানবন্দী পড়ে বাস্তবিক আমার বড় কৌতুক বোধ
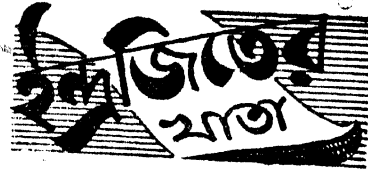
হয়েছে। দুঃখও হয়েছে এইজন্য যে, তাঁরা তাঁদের লেখার রস ভুলে গিয়ে তার কষ বের করেছেন।

রেখে ঢেকে কথা বলা আমার অভ্যাস নয়, সেজন্য গোড়াতেই বলে নিচ্ছি যে, আমি লিখতে পারি বলেই লিখি। আপনারা হয়তো বলতে পারেন এ-কথার মধ্যে লেখকোচিত বিনয় প্রকাশ পাচ্ছে না। তা নাই-বা পেল। সত্য কথা সব সময়েই দুর্বিনীত। আর লক্ষ্য করে দেখবেন, উক্ত সাহিত্যিকরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যে সব কথা বলেছেন তার মধ্যেও খুব যে একটা বিনয় প্রকাশ পেয়েছে এমন আমার মনে হয়নি। আমি কেন লিখি তার প্রথম কারণটা স্পষ্ট করেই বলেছি। দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে—আমি যা বলতে চাই তা অন্য কেউ বলছেন না। অপর কেউ যদি ঠিক এসব কথা লিখতেন, তবে আমাকে আর মিছিমিছি লিখতে হ'ত না। প্রত্যেক লেখকের বেলাতেই তাই। তাঁর মনের কথাগুলো অপর কেউ প্রকাশ করতে পারছেন না বলেই তাঁকে কলম ধরতে হয়েছে। অপর কেউ যদি-বা ও-সব কথা বলেনও তবু ঠিক তাঁর মনের মতো করে বলতে পারেন না। আমার মতে 'কেন লিখি'র মূলে তত্ত্ব এইখানে। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে আমরা অত যে আরাম পাই, তার প্রধান কারণ তিনি ওসব কথা না লিখে গেলে আমাদেরকেই বসে বসে লিখতে হোতো —না লিখে উপায় থাকত না। তিনি আমাদের কাজ বহুল পরিমাণে সহজ করে দিয়ে গেছেন, কারণ আমাদের মনের কথা বারো আনাই তিনি আগেভাগে বলে রেখেছেন। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ স্বীকার করি, তখন এই কারণেই করি।

'কেন লিখি' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থের মুখবন্ধে রোমাঁ রোলাঁর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি আছে। তাতে তিনি বলেছেন—To write is, for me to breathe, to live. রোমাঁ রোলাঁ এ যুগের সাহিত্য মহারথীদের অন্যতম। তিনি যা বলেছেন, সেটা তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বেলায় ওকথাটা মোটেই সত্য নয়। কারণ আমার কাছে লেখাটা breathe করবার মত সহজ ব্যাপার নয়, বরং লিখতে বসলে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কাছে লেখাটা breathing difficulty হয়। লেখার চাইতে না লেখা বেশি আরামের, একথা লেখকমাত্রেই স্বীকার করবেন। মনকে একটু যদি সাধাসাধি করতে না হয়, তবে তো লেখার মর্যাদাই থাকে না। ওস্তাদ গাইয়েকে দিয়ে কি সহজে গান করানো যায়? গান করতে বললেই তাঁদের একশো রকমের ওজর-আপত্তি দেখা দেয়—গলা খুস্‌খুস্, দাঁত কন্‌কন্, কান কট্‌কট্ অনেক কিছু শুরু হয়ে যায়। ওস্তাদ লিখিয়েদের যদি এতাদৃশ মুদ্রাদোষ অল্প-বিস্তর থাকে, তবে সেটাকে এমন কিছু অমার্জনীয় দোষ বলা চলে না।

'কেন লিখি'র লিখিয়েরা কেউ কেউ বলতে চান তাঁরা মানবহিতায় কিম্বা জগদ্ধিতায় লিখতে শুরু করেছেন। সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁদের এবম্বিধ মতামত তাঁদের অবশ্যই লিখবার জন্য সাধাসাধি বা খোসামুদির প্রয়োজন হবে না। তাঁরা আপন তাগিদেই নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে লিখে যাবেন। সাহিত্য প্রসঙ্গে সমাজ-সেবা কিম্বা মানবহিতের কথা তুলতে গেলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে কার জন্য লিখি। যাঁরা মানবহিতের জন্য লেখেন তাঁরা নিশ্চয় সমগ্র মানব সমাজের জন্যই লেখেন। আমার নিজের সম্বন্ধে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, আমি সম্পূর্ণরূপে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে লিখি, কাজেই আমার লেখার দ্বারা সংসারে কোনো ব্যক্তির কোনো হিত হবে, এ কথা ভাবাই হাস্যকর। 'দেশ'এর সমস্ত পাঠকের জন্য আমি কখনো লিখি না। মুষ্টিমেয় যে ক'জন পাঠক আমার সত্যিকারের সমজদার, আমি শুধু তাঁদের জন্যই লিখি। এযাবৎ চিঠিপত্রে যা বুঝেছি তাঁদের সংখ্যা বড় জোর পঁচিশ কিম্বা ত্রিশ। এ ছাড়া আমার নিত্যকার আসরের বন্ধু ধরুন আরো কুড়ি পঁচিশ জন। কাজেই দেখতেই পাচ্ছেন সাত কোটি বঙ্গ-সন্তানের মধ্যে বড় জোর জন পঞ্চাশেক লোকের জন্য আমি লিখে থাকি। আমার পাঠকসংখ্যা যে অতিশয় সীমাবদ্ধ তাই নিয়ে আমি দুঃখ করি না। বরং মনে মনে এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করি যে, কবি কিম্বা যাত্রা গানেই ভিড় জমা সম্ভব, কিন্তু যেখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপ, সেখানে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় রসজ্ঞের সমাবেশ। যাঁরা মানবহিতায় সাহিত্য পরিবেশন করেন, দেখা যাচ্ছে, তাঁরা এখনও মল্লিকবাড়ির কাঙালী-ভোজনে বিশ্বাস করেন। কারণ এই দুটো একই জাতীয় জিনিস এবং আমার বিশ্বাস এর কোনোটার দ্বারাই সমাজের কল্যাণ হবে না।

এপার ওপার

নিউ ইয়র্ক—

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শহরের নাম নিউইয়র্ক। নিউইয়র্ক বললেই মনে পড়ে উঁচু উঁচু বাড়িগুলি আর স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি। বাড়িগুলির মধ্যে এম্পায়ার স্টেট, ক্রাইসলার, উলওয়ার্থ ইত্যাদি এক একটি ছোটখাটো পাহাড়ের সমান উঁচু। নিউইয়র্ক শহর কত বড়? শহরটি লম্বায় ৩৬ মাইল আর চওড়ায় সাড়ে ষোলো মাইল, জনসংখ্যা প্রায় ৭৮ লক্ষ। নিউইয়র্কের সমস্ত রাস্তাগুলি পর পর যুক্ত করলে একটি রাস্তা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়া যাবে এবং অপর রাস্তাটি দিয়ে ফিরে আসা যাবে। নিউইয়র্কে প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন শিশুর জন্ম হয়, আর মৃত্যু হয় প্রতি সাত মিনিট অন্তর।

নিউইয়র্কে প্রতিদিন পঁয়ত্রিশ লক্ষ বোতল দুধ খরচ হয়, আর সেই দুধ জোগায় ১১,৭০০০টি গরু। দৈনিক রুটির খরচ ৩০ লক্ষ। ১৯৪৫ সালে নিউইয়র্কবাসীরা ৮৬,৪৭,৭৯৪ গ্যালন মদ খেয়েছিল অর্থাৎ দৈনিক খরচ ৯৪৭৭০টি কোয়ার্ট আকারের বোতল। নিউইয়র্কের সমস্ত রান্নাঘরের আবর্জনার ওজন দৈনিক হিসেবে ২৫০০ টন। নিউইয়র্কে মোটর বাস আছে ২৪৫৩টি আর ট্রলি বাস আছে ৫৮৫টি; দৈনিক টিকিট বিক্রয় হয় পঁচিশ কোটি, অবশ্য একজন লোক একাধিকবার বাসে ওঠানামা করে। নিউইয়র্কে ট্যাক্সির সংখ্যা দশ হাজারের ওপর। নিউ-ইয়র্কের খুচরো দোকান কর্মচারীর সংখ্যা ৪,৪০,০০০ পুলিসের সংখ্যা ২০ হাজার।

সিনেমা ও থিয়েটার মিলিয়ে উভয়ের সংখ্যা ৭০০; নৃত্যশালা ১৩১৫টি। প্রতিদিন টেলিফোন 'কল' হয় বারো কোটিরও ওপর, তার মধ্যে বারো লক্ষর ওপর হয় ভুল নম্বর। এখানে প্রতিদিন কাগজ বিক্রয় হয় ৫৭ লক্ষ ৬৩ হাজার।

সংস্কৃতের প্রভাব—

সংস্কৃত ভারতের প্রাচীন ভাষা। মাত্র দুশ বৎসর আগেও সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট প্রচলন ছিল; কিন্তু এখন নানা কারণে সে ভাষা আমরা ভুলতে চলেছি। সংস্কৃত ভাষার প্রভাব শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও কয়েকটি দেশে এর যথেষ্ট প্রভাব আছে। যথা—শ্যাম ও মালয়ে। মালয় দেশের অধিকাংশ লোকই ইসলামধর্মাবলম্বী, তথাপি সেখানকার ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল। মালয়ে প্রচলিত ভাষার শব্দগুলি শুনলেই সংস্কৃত শব্দের প্রভাব লক্ষিত হয়, যথা—সুয়ামী (স্বামী), সুয়ারা (স্বর), সুয়ার্গা (স্বর্গ)। শেষ কথাটি সোর্গা অথবা শুর্গারূপেও উচ্চারিত হয়। তারপর আছে সিংগ (সিংহ), সিংগাসন (সিংহাসন), সেতিয়া (সত্য), সেতিওয়ান (সত্যবান), সেরু সরোয়া (সর্ব), সেরু সুকালিয়ান (সর্ব সাকল্য), সেরোজা (সরোজ) অর্থাৎ পদ্ম এবং সেরিগাল অর্থাৎ শৃগাল। 'সেরি' হল শ্রী যা থেকে সেরিনগেরি (শ্রীনগর), কিংবা সেরিকায়া (শ্রীকায়), সেরাপা (শাপ) ইত্যাদি কথা সৃষ্টি হয়েছে। 'সেন্তোষা' হল সন্তোষ আর 'সেণ্ডাকাল' যে সন্ধ্যাকাল এ বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দেশে বহু নিরক্ষর ও 'সনজেবেলা' বলে থাকে।

ইটালীর একটি শহরে বুভুক্ষের মিছিল। ছবিতে যা লেখা আছে তার অর্থ "মেয়র-মশাই, আমরা ক্ষুধার্ত!"

রেসি (ঋষি), পুত্তেরা, পুত্তেরি (পুত্র, পুত্রী) পুস্যা (উপবাস), দেওয়ী পেরতেওয়ী (দেবী পৃথিবী), পারদেনা (প্রধান), পারকেসা (পরীক্ষা) ইত্যাদি কথা শুনলে এগুলি যে সংস্কৃত ভাষা থেকেই উদ্ভূত তা বোঝবার আর অবকাশ থাকে না। দেশের নামটিই ত সংস্কৃত, মলয়। যা ইংরেজিতে দাঁড়িয়েছে ম্যালে অথবা ম্যালোয়া আর বাঙলায় মালয়।

ভারতে মাছের চাষ—

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী মাছ ধরা হয়, ভারতে তেমন হয় না; যদিও ভারতের মৎস্য সম্পদ অফুরন্ত। গত কয়েক বৎসর থেকে মৎস্য চাষ বাড়াবার জন্য ভারত সরকার এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমত একটি কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মৎস্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সরকার নিয়োজিত বিভাগ কর্তৃক মৎস্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বাঙলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বরোদা, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর এবং কোচিনে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে মাছের চাষ করা হচ্ছে। ভারতে সর্বপ্রথম আধুনিক মৎস্য বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে ১৯১৭ সালে। এখানে গভীর-সামুদ্রিক, সামুদ্রিক এবং নদীর জলের মাছের সৌকর্য সাধনের জন্য গবেষণা করা হয়। যুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতে মৎস্য-জনিত কয়েকটি শিল্পের উন্নতি হয়েছে, যথা—শার্ক-লিভার অয়েল, মল্ট-এক্সট্রাক্ট ও ইমালসান এবং মাছের কাঁটার গুঁড়োর।

কলকাতায় থিয়েটার রোডে প্রাদেশিক সরকারের একটি বিজ্ঞানাগার ও শিক্ষাকেন্দ্র আছে এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে মৎস্য-চাষ বিষয়ে কয়েকটি বিজ্ঞানাগার ও কেন্দ্র আছে। বাঙলা দেশে মাছের চাষ এবং উৎপন্ন বাড়াবার খুব চেষ্টা চলছে এবং আশা করা যায় যে, পূর্ববঙ্গের মাছ বিনা পশ্চিমবঙ্গ স্বাবলম্বী হতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলে এবং নদীর মোহানাগুলিতে প্রচুর মাছ আছে, তবে তা ধরবার ও শহরে প্রেরণ করবার সুব্যবস্থা নেই। নদী ও পুকুরের মাছের চাষ বাড়াবার জন্যও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপাতত সরকার মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূল থেকে কলকাতায় মাছ আনবার ব্যবস্থা করেছেন। আশা করা যায়, পুজোর পর থেকেই মাছ আসবে, ভেটকি, ভাঙন ইত্যাদি। কলকাতায় কমপক্ষে দৈনিক আড়াই হাজার মণ মাছের প্রয়োজন।

একদা টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলতেই শোনা গেল দুজন মহিলা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছেনঃ

—"কি গো সুলতা তুমি এখন কি করছ," অপরজন উত্তর দিলেন, "আমি ভাই একটু আগে ভাত চড়িয়ে ওপরে এসেছি এমন সময়ে..............." এই রকম তাদের কথাবার্তা চলতে লাগল। অপারেটারকে ডাকবার বৃথা চেষ্টা করলুম এবং বিরক্ত হয়ে রিসিভার রেখে দিলুম।

কিছুক্ষণ পরে রিসিভার তুলতে আবার সেই দুটি মহিলারই কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তখন আমি জোরে বললুম—"সুলতা দেবী, আপনার ভাত যে পুড়ে গেল, আমি গন্ধ পাচ্ছি।"

লাইন কেটে গেল।

মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্য-সাধনা

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব জগতে কৃষ্ণদাসের অমর গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা অবিমিশ্র কবিত্বশক্তির উৎকর্ষের জন্য নহে। সরল ও মর্মস্পর্শী বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস বা লোচন দাস নিতান্ত উপেক্ষণীয় প্রতিযোগী নহেন; এমন কি বহু স্থানে তাঁহাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হয়। কৃষ্ণদাস কেবল কবিত্বশক্তির অনুশীলনের ক্ষেত্র স্বরূপ চৈতন্য-দেবের জীবনের উপাদানকে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে যে কাব্য সৌন্দর্য আছে, তাহা গৌণ ও মনে হয় যে, লেখকের অনভিপ্রেত। ভক্তিরস বিবেক ও বিনয়ের অবতার কবি নিজ বিষয়-গৌরবের মাহাত্ম্যে এত অভিভূত যে সচেতন সৌন্দর্যসৃষ্টির শিল্পী মনোভাব তাঁহার মধ্যে প্রায় অলক্ষ্য বলিলেই হয়। কাব্য রচনা বিষয়ে তিনি যেন এক রহস্যময় দৈবশক্তির অর্ধঅচেতন বাহন মাত্র। চৈতন্যদেবের লোকোত্তর মহিমা যেন তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সচেতন সৃষ্টিকর্তার অভিমানের সম্পূর্ণ বিসর্জনে, আত্মদীনতার একান্ত অনুভবে ও সময় সময় কাব্যোচিত সুষমার প্রতি উদাসীনতায় তিনি সাধারণ কবিগোষ্ঠী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর লেখক।

তাহা হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৈশিষ্ট্যের মূল সূত্র কোথায়? আমার মনে হয় যে, তাঁহার বৈশিষ্ট্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্রটি সর্ব-প্রথম এক রসঘন ভাবসংহতির রূপ ধারণ করিয়াছে —তাঁহার নানা অলৌকিক ঘটনার মধ্যে কৃষ্ণদাস একটি কলাগত সুষমা ও ভাব-সমগ্রতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, ইহাতে চৈতন্যজীবনী এক স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্ব-বিরোধশূন্য দার্শনিক পরি-মণ্ডলের মধ্যে বিধৃত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের প্রায় ৮০ বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামীর জীবনী রচিত হয়। এই আশী বৎসর ধরিয়া চৈতন্য জীবনের ঘটনাবলী অনাবিল ও অজস্র ভক্তিরস বিধৌত হইয়া নানা ভক্তের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাক্ষ্যে, সুসংবদ্ধ ধর্মমতের কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণে, দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর বাস্তবাতিসারী তাৎপর্য বিশ্লেষণে ধীরে ধীরে এক নূতন অধ্যাত্ম সত্তার ভাব-উপাদানে রূপান্তরিত হইতেছিল। যাহা লৌকিক, যাহা স্থূল, যাহা বহির্মুখী, যাহা স্থান-কালে সীমাবদ্ধ তাহা ভক্তের চোখে, কবির সৌন্দর্যানুভূতিতে ও দার্শনিকের শাশ্বত সত্যানুসন্ধিৎসার মধ্যে এক নূতন ভাব-ব্যঞ্জনার কিরণসম্পাতে ভাস্বর হইয়া চিরন্তন রস ও রহস্যলোকের সূক্ষ্ম, সুকুমার পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে। তথ্যের এই সুকুমার রূপান্তরটাই কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়।

তাঁহার পূর্ববর্তী জীবনীগ্রন্থে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা সেরূপ সবিস্তারে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু পঞ্চমাঙ্কহীন নাটকের মত লীলারসের দিব্যোন্মাদ বর্জিত চৈতন্য জীবনী অঙ্গহীন ও কেন্দ্রিকতাভ্রষ্ট। এই শেষ কয়েকটি বৎসরের লীলার মধ্যেই তাঁহার জীবনের পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিহিত আছে। তাঁহার পূর্ব জীবনের সমস্ত ভাবৈশ্বর্য এই চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুতি-মাত্র। তাঁহার অজস্র প্রবাহিত ভাবধারার শাখা নদী-সমূহ নীলাচলপ্রান্তবর্তী মহাসমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের অঙ্কিত চিত্রেই শ্রীচৈতন্যের দেবকান্তি পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনিই সহস্র সহস্র বৈষ্ণব ভক্তের মনে তাঁহাদের উপাস্যদেবতার কারুণ্যসিক্ত অলৌকিক মহিমাটি অবিস্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল দার্শনিকতার সহিত কাব্যের বিচিত্র সমন্বয়। তাঁহার রচনায় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের অতি নিগূঢ় দার্শনিক আলোচনা কাব্যরসমণ্ডিত হইয়া একাধারে জ্ঞান ভক্তি ও সৌন্দর্য পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটাইয়াছে। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের দার্শনিক পটভূমিতে সন্নিবেশ ভারতীয় ধর্মসাধনার সনাতন বৈশিষ্ট্য। এই রূপান্তর সাধন প্রধানতঃ রূপ, সনাতন, জীব ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসী গোস্বামী গোষ্ঠীর প্রভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। একদিকে যখন বাঙলা দেশ চৈতন্যপ্রেমে মাতোয়ারা, তাহার আকাশ-বাতাস কীর্তনের রোলে মুখরিত ও পদাবলী সাহিত্যের মাধুর্যরসে অভিসিঞ্চিত, অন্যদিকে বৃন্দাবনের নির্জন সাধনাতীর্থে গোস্বামীবৃন্দ এই ভাবমত্ততার প্রভাবমুক্ত হইয়া নবজাত ধর্মের ও সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্র ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি রচনায় প্রশান্ত নিষ্ঠার সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কোন ধর্মকে ধর্মোচিত মর্যাদা দিতে হইলে শুধু তাহার কর্মনিষ্ঠা ও হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; তাহাকে দার্শনিক যুক্তিবাদের অপরিবর্তনীয় আশ্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উপনিষদ ও গীতার সমপর্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। ভাবোচ্ছ্বাস অচিরস্থায়ী; কর্ম প্রচেষ্টা যতই উপাদানবহুল হউক না কেন, উহা বুদ্বুদের মত বিলয়শীল। কিন্তু এই ভাবযমুনাকে দার্শনিকতার দৃঢ় তটভূমির মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারিলে উহার প্রবাহকে চিরন্তন করা যায় এবং সেই সুরক্ষিত তটের উপর কর্মের কীর্তিমন্দির নির্মাণ করিলে তাহা কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে না। রসজ্ঞ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে রমণীর করাভরণ বলয়-কঙ্কনের উপযোগিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সর্বাঙ্গে প্রবহমান রূপধারা যাহাতে উপচাইয়া পড়িয়া নষ্ট না হয় সেইজন্যই এই সমস্ত অলঙ্কার বন্ধনের প্রয়োজন। কাব্য সৌন্দর্যের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও অপচয় নিবারণের জন্য দর্শনিকতার দৃঢ় বেষ্টনীও অনুরূপভাবে কার্য করে। সুর ও তালের মধ্যে যে সম্বন্ধ দার্শনিকতা ও কাব্যরসের মধ্যেও অনেকটা সেই সম্বন্ধ। কবিরাজ গোস্বামী তাই বৈষ্ণব-ধর্মকে ভক্তিবিলাস ও রসোপভোগের উপকরণ হইতে শাশ্বত জ্ঞানের বিষয়ে উন্নীত করিয়া ইহার স্থায়িত্বের কাল ও প্রভাবের পরিধি বাড়াইয়া দিয়াছেন; কর্ম ও ভক্তির মত্ত, ফেনিল উচ্ছ্বাসের উপর জ্ঞানের শান্ত চিরন্তনতার আরোপ করিয়াছেন। ভক্তির আবেশের নিবিড়তা টুটে; কর্মের তীব্র আকর্ষণ কালে মন্দীভূত হয়। সুতরাং যে ধর্ম ইহাদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাহার স্থায়িত্ব সম্ভাবনা খুব বেশী নহে। কিন্তু অপ্রমত্ত জ্ঞান ও যুক্তিবাদের পরীক্ষায় যে ধর্ম উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা মহাকালের নিকট চির-স্থায়িত্বের অধিকার লইয়া আসিয়াছে। ইহাই বৈষ্ণব সাহিত্যে ও ধর্মে কবিরাজ গোস্বামীর অনন্যসাধারণ অবদান।

এ হেন মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি আমরা কেমন করিয়া উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিব? তিনি শুধু কবি নন যে, কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার মহিমার পরিমাপ করিব। তিনি শুধু দার্শনিক নন যে, তাঁহার মতবাদের মৌলিকতা ও যুক্তিনৈপুণ্যের মানদণ্ডে তাঁহার উৎকর্ষ নির্ণীত হইবে। তিনি একজন সাধক ও ভক্ত; নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতি, নিগূঢ় সাধনা ও ভক্তিই তাঁহার কাব্যরচনার মূল প্রেরণা। আমরা নিজ নিজ রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁহার সর্বাঙ্গীন মানস ঐশ্বর্যের অংশমাত্র আস্বাদনের অধিকারী। আধুনিক যুগের বহুধা বিভক্ত, অগভীর চিত্তবৃত্তি লইয়া বৈষ্ণব রস সাহিত্যের অতলস্পর্শ গভীরতায় ডুব দিবার শক্তি আমাদের নাই। রাধাকৃষ্ণের নামোচ্চারণ, চৈতন্যদেবের স্মৃতি-মাত্র বৈষ্ণব কবির মনে যে ভাবের স্বর্গরাজ্য উন্মুক্ত করিত, যে বাহ্যজ্ঞানহীন আনন্দ তন্ময়তার আবেশ সৃষ্টি করিত, তাহা আমাদের অনুভূতি বহির্ভূত। যাহা প্রাণের গভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত, যাহা সত্যশিবসুন্দরের একাত্মতার সহজ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আমরা সাহিত্য সমালোচনার সঙ্কীর্ণ মানদণ্ডে, ভাষা ও ছন্দের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া তাহার বিচার করিতে বসি। কাজেই আমাদের শতচ্ছিদ্র চালুনির ভিতর দিয়া এই কাব্যের খাঁটি রস নির্যাসটুকু আমরা ছাঁকিয়া লইতে পারি না—ছাঁকিতে চেষ্টা করিয়া ইহার আসল সৌরভ ও আস্বাদটুকু হারাইয়া ফেলি। বৈষ্ণবযুগের প্রতিবেশ ও মনোভাব কিয়ৎ পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে আমাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কবির কাব্যে তাহার যেটুকু পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সম্পূর্ণ করিতে গেলে তাঁহার কাল ও স্থান প্রতিবেশের প্রভাবটি মনে মনে কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। কবি এই প্রতিবেশ হইতে রস আহরণ করেন; যুগের চিন্তা-ধারা, আদর্শ স্বপ্ন, কর্মানুষ্ঠান তাঁহার দেহমনকে সহস্র বন্ধনে সমসাময়িক জীবনযাত্রার সহিত জড়াইয়া ধরে। আজ বিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত প্রতিবেশে ও প্রতিকূল মনোভাবের মধ্যে আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজের আবেদনের কতটুকু গ্রহণ করিতে পারি? মধ্যযুগের যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী গিরিগুহার মধ্যে ইষ্টমন্ত্রধ্যানে নিজ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, বর্তমান যুগে আমরা কতটুকু তাঁহার সহিত রক্তের আত্মীয়তা অনুভব করি? চৈতন্যচরিতামৃত আমাদের সমস্যা-বিক্ষুব্ধ জীবনে হয়ত খানিকটা আত্মবিস্মৃতি আনিয়া দিতে পারে; কিন্তু এই জটিল জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণরশ্মি কি তাহার হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে আমরা প্রস্তুত আছি? কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্মৃতিরক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার জন্য কিছু করা নয়, ইহা তাঁহার প্রভাব স্বীকারের জন্য আমাদেরই চিত্ত বিশুদ্ধির আয়োজন। তুলসীবৃক্ষ রোপণ করা সহজ; তুলসীতলা পরিষ্কৃত রাখাই কঠিন। জানিনা ঝামটপুরের শূন্য প্রান্তরে তাঁহার স্মৃতি-বিজড়িত যে ধূলিরেণু বাতাসে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার মধ্যে অতীতের সেই বিস্মৃত সুরটি, তাঁহার সাধক জীবনের সেই নিগূঢ় মন্ত্র-রহস্যটি খুঁজিয়া পাইব কিনা।

মোহানা

শ্রীহরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

হন্ হন্ করে জেটি পার হয়ে আসে সীমাচলম। ঠিক গেটের মুখে টিকেটটা দিয়ে সদর রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ালো। এতটা পর্যন্ত সমস্ত যেন মুখস্ত ছিলো তার। ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে ভীড়ের পিছন পিছন জাহাজে এসে ওঠা, তারপর চারদিন অকূল সমুদ্রের ওপর ভেসে যাওয়া জীবন, কোন তট-রেখা নেই কোনদিকে, চারদিক ঘিরে শুধু অথৈ জল—কখনো সবুজ, কখনো কালো, কখনো গাঢ় নীল। খুব ভালো লেগেছিলো সীমাচলমের। পৃথিবীর সামান্যতম স্পর্শটুকুও যেন নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছিলো এই নীল জলের রাশি। তার নিজের ফেলে আসা জীবনও সমস্ত তিক্ততা নিয়ে মুছে গিয়েছিলো। শুধু মাঝে মাঝে ওপরের ডেকে পায়চারী করতে করতে মনে পড়েছিলো শুভলক্ষ্মীর কথা আর সংগে সংগে তীব্র একটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিলো তার বুক। চক্রবালের দিকে চেয়ে ভেবেছিলো সীমাচলম—কতোদূরে সরে যাচ্ছে শুভলক্ষ্মী, মাদ্রাজের তাল-নারিকেল ছাওয়া ছোট এক গ্রাম সমস্ত স্মৃতি নিয়ে ক্রমেই সরে যাচ্ছে। স ছিলো পুঞ্জীভূত ফেণা আর সমুদ্রের প্রচণ্ড গর্জন—তার মধ্যে ওর সমস্ত অতীত ভেঙে যেন চুরমার হয়ে যাচ্ছে। রেলিংয়ের ধার থেকে সে আস্তে আস্তে সরে গিয়েছিল। একেবারে পিছনের ডেকে যেখানে ছোট্ট চীনে ছেলেটি কাঠের বল নিয়ে খেলা করছিলো একমনে, সেখানে গিয়ে তার সংগে ভাব জমাতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি বিশেষ। খুদে খুদে হলদে চোখ দুটো তুলে চেয়ে দেখেছিলো ছেলেটি তারপর হঠাৎ বলটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের কেবিনের দিকে ছুটে চলে গিয়েছিলো।

রেলিংয়ের পাশে জাহাজ বাঁধবার যে উঁচু লোহার টোপগুলো থাকে, তারই একটার ওপরে চুপচাপ বসেছিলো সীমাচলম। কেমন যেন মনে হয়েছিলো তার। সকাল থেকে জাহাজটা একটু একটু দুলছিলো। পেটের মধ্যেটা মোচড় দিয়ে উঠেছিলো। চোখ দুটো কুঁচকে একটু কুঁজো হয়ে মাঝে মাঝে বমির বেগটা সামলে নিয়েছিল সীমাচলম। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠেছিল তার—অসহ্য উত্তাপ দুটি কানের পাশে।

ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল আর একদিন। সেদিনের কথাটা জীবনেও ভুলবে না সীমাচলম।

মিস্টার আয়েঙ্গার যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন কোর্ট থেকে, তা সে ভাবতেই পারে নি, এমন কি শুভলক্ষ্মীও পারেনি ভাবতে। রোজকার মতই তারা হাত ধরাধরি করে বেড়াতে বেরিয়েছিল কাছের পাহাড়তলীতে। বসন্তের ছোঁয়ায় অপূর্ব হয়ে উঠেছিল প্রত্যেকটি গাছ আর লতা। দু'হাতে প্রচুর ফুল কুড়িয়েছিল সীমাচলম। শুভলক্ষ্মীর কালো চুলের রাশ আর সারা দেহ ফুলের স্তবকে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তারপর তাল আর শিরীষ ঢাকা নির্জন পথ ধরে ফিরে এসেছিল তারা—শুভলক্ষ্মী অনেকদিন আগে ইস্কুলে শেখা আধুনিক ঢংয়ের একটা গান গাইছিল আর সুর মিলিয়ে অক্লান্তভাবে শিষ দিয়ে চলেছিল সীমাচলম। প্রায় বাড়ির ফটকের কাছে এসে জ্ঞান হলো তাদের, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। ঠিক ফটকের সামনে উত্তেজিতভাবে পায়চারী করছিলেন মিঃ আয়েঙ্গার। ওদের দেখে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে এলেন একেবারে সামনে—তারপর যেন ফেটে পড়লেন সগর্জনে।

সীমাচলম, তোমার স্পর্ধা ক্রমেই বেড়ে উঠছে। কুকুরকে কোলে ওঠালেই সে মাথায় উঠতে চায়। তোমাকে না আমি বারবার বারণ করেছি লক্ষ্মীর সংগে মেলামেশা করতে। কি সাহসে তুমি মেলামেশা কর তার সংগে। তুমি কি আশা করো তোমার হাতে আমার মেয়েকে কোনদিন আমি সঁপে দেবো। তোমার মত ভ্যাগাবণ্ডের হাতে মেয়েকে দেওয়ার চেয়ে ওকে নটরাজনের মন্দিরে সারাজীবন দেবদাসী করে রাখবো আমি। কেউটের বাচ্ছা কেউটে তো হবেই……

আরও অনেক কথা বলেছিলেন মিঃ আয়েঙ্গার—ওর মার চরিত্রহীনতার কথা, ওর নিজের অর্থোপার্জনের অক্ষমতার কথা। কিন্তু একটি কথারও উত্তর দিতে পারেনি সীমাচলম। একবার কি একটা বলতে গিয়ে চোখ তুলতেই ও দেখতে পেয়েছিল শুভলক্ষ্মীর গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। অনেক অনুনয় আর মিনতি দুটি চোখে। সীমাচলমের চোখের আগুন নিভে গিয়েছিল সে জলে। ও মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে ফিরে গিয়েছিল। তারপর বহুদিন যায়নি ওদিকে। শুধু শুভলক্ষ্মীর বিয়ের রাতে চুপি চুপি একবার ফটকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—তাও সদর রাস্তার ওপরে নয়, রাস্তা থেকে দূরে একটা ঝোপের আড়ালে। সেখান থেকেও কিন্তু উৎসবের প্রতিটি অংগ বেশ ভালভাবেই দেখতে পেয়েছিল সে। সারাটা রাত চুপ করে বসেছিল—শুধু খুব ভোরের দিকে শুভলক্ষ্মী যখন খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল একবার তখন নাম ধরে চীৎকার করে ডেকে উঠেছিল সীমাচলম। ফল কিন্তু ভাল হয় নি—ভয় পেয়ে আরও জোরে চীৎকার করে উঠেছিল শুভলক্ষ্মী। চীৎকারের সংগে সংগে দলে দলে লোক বাগানের দিকে আসতে থাকায় সীমাচলম তালবনের মধ্যে দিয়ে আগাছার জংগল ভেঙে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও সে খবর পেয়েছিল শুভলক্ষ্মীর। কুনুরে বিয়ে হয়েছিল তার। স্বামী বুঝি মস্ত বড় ডাক্তার—জমাট পশার আর ধনদৌলতের পরিসীমা নেই।

বিয়ের প্রায় বছরখানেক পরে বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছিল শুভলক্ষ্মী প্রসব হতে। সাহস করে একবার মিঃ আয়েঙ্গারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার সংগে দেখাও করেছিল সীমাচলম। কিন্তু শুভলক্ষ্মী তাকে অত্যন্ত কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল: অন্যের পরিণীতা স্ত্রীর সংগে কথা বলতে যাওয়ার মত নির্লজ্জতা কি করে অর্জন করলো সীমাচলম। কৈশোরের চপলতার সুযোগ নিয়ে তাকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল, সে অন্য ধাতুতে গড়া মেয়ে তাই খুব সময়ে নিজেকে সংযত করতে পেরেছিল। আর কোনদিন যদি এ তল্লাটে আসে সীমাচলম তবে চাকরদের হাতে তাকে অপদস্থ হতে হবে।

এ সমস্ত কথার কোন উত্তর দেয়নি সীমাচলম। শুধু পাহাড়তলীর পথ ধরে ফিরতে ফিরতে বলেছিল নিজের মনে: আমার শুভলক্ষ্মী মরে গেছে। যে আছে, সে কুনুরের বিখ্যাত ডাক্তারের স্ত্রী। সমাজ আর আভিজাত্য যার একমাত্র সম্পদ। তবু নিজের মনকে সে বোঝাতে পারে নি। বার বার মনে হয়েছিল হয়ত একদিন শুভলক্ষ্মী ঠিক তেমনি করে আগের মত ফুলের গহনায় সেজে দাঁড়াবে ওর সামনে এসে, বলবে: তুমি এতো ভীরু কেন? তুমি আমাকে নাও। চোখের সামনে তোমার জিনিস অন্য লোকে ছিনিয়ে নিয়ে উপভোগ করবে, আর কাপুরুষ তুমি শুধু নিষ্পলক চোখে দেখবে চেয়ে?

সাহস হয় নি সীমাচলমের। অনেক

চিন্তার পরে ও চলে গিয়েছিল মাদ্রাজ শহরে দূর-সম্পর্কের এক নিঃসন্তান খুড়োর কাছে। প্রকাণ্ড কারবার খুড়োর—বিরাট এক লোন কোম্পানীর খুড়ো সর্বেসর্বা। ইদানীং বয়স একটু বেশী হওয়ায় খুড়োর খুবই অসুবিধা হচ্ছিল, সীমাচলমকে পেয়ে হাতের কাছে তিনি চাঁদের সামিল কোন জিনিসই যেন পেলেন। সীমাচলমকে কাছে ডেকে অনেকক্ষণ বোঝালেন, তাঁর অবর্তমানে সমস্ত কারবারের মালিক যে সীমাচলমই হবে—সে কথাও আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন ভাল করে। আজকাল শহরে কতকগুলি ব্যাঙ্ক হওয়ায় লোন কোম্পানীর কাজ একটু ঢিলে হয়েছে বটে, কিন্তু যা আছে, তাই যথেষ্ট। এটাই সীমাচলম সমঝে চালাতে পারলে দুপুরুষ বসে খেতে পারবে পায়ের ওপর পা দিয়ে। মুখে কোন কথা বলে নি সীমাচলম, কিন্তু ভারি মনোযোগ দিয়ে সে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিল। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্নান-আহারেরই সময় পায় না সীমাচলম। খেটে-খুটে পুরানো খাতাপত্তর সব কিছু পড়ে ফেল্লে সে, এমন কি লোন কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমত তর্কও শুরু করে দিলো দু'একদিন খুড়োর সঙ্গে।

কিন্তু সমস্ত কিছু উদ্যমের শেষ হয়ে এলো একদিন। বিকেলের দিকে হাতের কাজ সেরে সমুদ্রের ধার-ঘেঁষা রাস্তার উপর দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছিল সীমাচলম। কিছুটা গিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক যেখানে সমুদ্র অশ্রান্ত গর্জনে আছড়ে পড়ছিল কালো কালো পাথরগুলোর ওপরে তারই কোল ঘেঁষে শুভলক্ষ্মী দাঁড়িয়েছিল ডুবন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে। একলা নয় শুভলক্ষ্মী, তার পাশে ইংরেজি পোষাক পরা দৈত্যাকার এক ভদ্রলোক—আন্দাজ করলো সীমাচলম—এ সেই কুনুরের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ছাড়া আর কেউ নয়। রাস্তা থেকে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল সীমাচলম, কারণ শুভলক্ষ্মী আর তার স্বামী ওর দিকেই আসতে শুরু করেছিল। কাছে আসতেই কানে গেল ভর্ৎসনার সুর। শুভলক্ষ্মীকে তীব্রভাবে কি যেন বলে চলেছেন ভদ্রলোকটি। আরো কাছে আসতে স্পষ্টতর হলো ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরঃ তোমার মত স্বল্প-বুদ্ধি মেয়েছেলের দুনিয়ায় থাকার কোন মানে হয় না। মেয়ে অনেকেরই মারা যায়, কিন্তু তাই বলে সংসার-ধর্ম ছাড়ে না কেউ। তুমি শুধু নিজের জীবন নয়, আমার জীবনটাও নষ্ট করে দিয়েছ। তোমার মত সোহাগী পরিবারকে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘন ঘন হাওয়া বদলিয়ে বেড়াবার মত উৎসাহ আমার নেই। যত সব আপদ জোটে কি না আমারই ঘাড়ে।—অনেকক্ষণ ধরে গজ গজ করে বলেছিলেন ভদ্রলোকটি। উত্তরে কিন্তু একটি কথাও বলেনি শুভলক্ষ্মী। তবু দেখতে পেয়েছিল সীমাচলম ম্লান গ্যাসের আলোয় চক চক করে উঠেছিল চোখ দুটি তার আর কেমন যেন উদাস দৃষ্টি সে দুটি চোখে। অনেক কৃশ হয়ে গিয়েছে সে। লাবণ্যহীন পাণ্ডুর দুটি গাল আর সারা মুখে কেমন যেন অবসাদের একটা ম্লানিমা।

চেয়ে চেয়ে ভারী কষ্ট হয়েছিল সীমাচলমের। ওরা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত চুপ করে সেইখানে সে বসেছিল, আর হারানো টুকরো ঘটনাগুলোকে জোড়া দিয়ে দিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন রচনা করেছিল। অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়েছিল সীমাচলম; কিন্তু বাড়ির দিকে আর পা বাড়ায় নি। টলতে টলতে লোন কোম্পানীর অফিসের দিকেই ফিরে গিয়েছিল সে।

পরের দিন ভোরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল খুড়ো। সীমাচলম নিখোঁজ—আর তার সঙ্গে নিখোঁজ বেশ মোটা কয়েক গোছা নোটের তাড়া আর দামী জড়োয়া গহনার বাক্সটা, যা বাঁধা রেখে লোকেরা লোন কোম্পানী থেকে কর্জ নিতো।

অন্য কোন কথা আর মনে আসে নি সীমাচলমের। শুধু তার মনে হয়েছিল সরে যেতে হবে মাদ্রাজ থেকে—আশেপাশের কোন শহরতলীতে নয়,—মাদ্রাজ থেকে বহু দূরে,—যেখানের মাটিতে শুভলক্ষ্মীর ছায়া পড়বে না—যেখানের বাতাসে শুভলক্ষ্মীর চুলের সৌরভ বহন করে আনবে না—পাহাড় পর্বত পার হয়ে এদেশ থেকে অনেকদূরে। তাই প্রথম পাওয়া স্টীমারে উঠে পড়েছিল সীমাচলম রেঙ্গুনের টিকেট কিনে।

সদর রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবে সীমাচলম। অজানা দেশ, কাছাকাছি স্বদেশবাসী কারও চিহ্ন নেই—পথঘাট সমস্তই নতুন। বিপদে পড়ে যায়। পকেট অবশ্য এখনও যথেষ্ট ভারী, কিন্তু তবু খুব সংযতভাবে চলাফেরা করতে হবে—কতদিন কাটবে এইভাবে তার কোনই স্থিরতা নেই। এই প্রথম মনে হয় সীমাচলমের—হঠাৎ দেশ ছেড়ে যেন মস্ত বড়ো ভুলই করেছে সে। সুটকেশটা হাতে নিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে চলন্ত একটা ট্যাক্সীকে ইশারায় দাঁড় করায়, তারপর ড্রাইভারের কাছে এসে বলেঃ এখানে হোটেল আছে কোন, খুব বড় নয়, এই মাঝামাঝি রকমের কোন একটা হোটেল।

চওড়া, মাঝারি, সরু নানা রাস্তা দিয়ে ছোটখাট একটা বাড়ির সামনে এসে থামে মোটর।

চীনা হোটেল। এদেশে সচরাচর এ ধরণের হোটেল যে রকম হয়ে থাকে। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই। লোক ঢোকে আর শান্তমুখে বেরিয়ে যায় দল বেঁধে। কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রূপ খোলে হোটেলের। বড় বড় মোটর এসে দাঁড়ায় আর শহরের ধনীদের সমাগমে হৈ হুল্লোড়ে গম গম করতে থাকে হোটেলের হল ঘরটা। চৈনিক জুয়ার আসরে পাশার দানের সঙ্গে ভাগ্য বিপর্যয় হতে থাকে লোকের। এ ছাড়াও চণ্ডু কোকেন আর চরসের সুপ্রচুর বন্দোবস্ত আছে। যার যা সখ।

হোটেলের মালিক বৃদ্ধ চীনা ভদ্র লোকটি একটু যেন সন্দেহের চোখে দেখে সীমাচলমকে। তাকে মুখের ওপর বলে যায়গা নেই হোটেলে। স্থানান্তরে চেষ্টা করুক সে। কিন্তু বিপদ থেকে সীমাচলমকে বাঁচায় মালিকের সঙ্গিনী বর্মী স্ত্রীলোকটি। অনেকখানি বয়েসের তফাৎ মালিকের সঙ্গে নয়ত সীমাচলম বোধ হয় স্বামী স্ত্রীই ভেবে বসতো দুজনকে, কিন্তু তাদের সম্পর্কটা যে নৈকট্যের এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না সীমাচলমের।

বৃদ্ধের হাতের উপরে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বলেছিলো মেয়েটিঃ আঃ আলিম এতটা বয়স হলো এখনো কাক আর পায়রা চিনলে না তুমি। দেখছো না চিজটি একেবারে আনকোরা—কেমন চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে—যা দেখছে সবই যেন নতুন লাগছে চোখে। ডিমের খোলা ঠুকরে কবুতরের বাচ্চা বেরিয়েছে যেন। দেখাই যাক না পরখ করে—দু চারদিন থাকুক না—এই সব লোক দিয়ে অনেক সময় কাজ হয়—বুঝলে হাঁদুরাম।

থেকে যায় সীমাচলম। ছোট্ট কাঠের এক কামরা, জরাজীর্ণ খাট একটা আর কাঠের একটা আলনা। খাওয়ার সময় কান্না পায় সীমাচলমের—নতুন আস্বাদ প্রত্যেকটি তরকারীতে আর নুন আর তেলের অদ্ভুত পরিমাপে উপাদেয় হ'য়ে ওঠে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন। দিন চারেকের মধ্যেই হাঁপিয়ে ওঠে সীমাচলম। আহারের ব্যাপারটা যাও বা কিছুটা সইয়ে আনে, কিন্তু মা পানের উপদ্রবে ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। সময় পেলেই ঘরে টোকা মেরে ঢুকে পড়ে মেয়েটি এবং আধা হিন্দি আধা ইংরাজীতে আলাপ শুরু করে তার সঙ্গে। তার অবশ্য ধারণা ইংরাজীতে অসাধারণ তার দখল এবং পাছে বিস্মিত হয়ে ওঠে সীমাচলম তাই তার ইংরাজী জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধেও সচেতন করে দেয় তাকে। অনেকদিন নাকি এক খাঁটি ইংরেজ পুলিশ ইন্সপেক্টরের বাড়িতে ছিলো সে—সেই সময় ইংরেজী ছাড়া সে বলতোই না কিছু। মাতৃভাষা প্রায় ভুলে যাবারই যোগাড় হয়েছিলো। শুভক্ষণে মারা গেলেন ইংরাজ সন্তান কাজেই মাতৃভাষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবার আগেই উদ্ধার পেলো মেয়েটি। খুব ভালো ছিলো ইনস্পেক্টার সাহেবটি। দো আসলা ট্যাশ নয়, আসল ইংরেজের বাচ্ছা, আহা বেঘোরে প্রাণটা দিলো বেচারা।

কি রকম ঃ উৎসুক হয়ে ওঠে সীমাচলম ঃ চোরের হাতে প্রাণ দিলেন বুঝি?

চোর ঃ অবজ্ঞায় কুঞ্চিত হয়ে আসে মা পানের

ঃ ছিচকে চোরের সাধ্য কি যে ছোঁয় তাকে। ‌াওয়াডির গোলমালের কথা শুনেছো সে। ‌াট গোলমাল যা সারা বর্মার গ্রামে গ্রামে ন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো?

মাথা নাড়ে সীমাচলম।

হেসে ওঠে মেয়েটি ঃ ও হ্যাঁ, তোমার তো বার কথাই নয়। তুমি তো সেদিন মাত্র সছো দেশ থেকে। কিবা জানো তুমি বর্মার। য়া শান ছিলেন এই গোলমালের সর্দার—টি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে হাটু মুড়ে টিতে তিনবার মাথা ছোঁয়ায় মা পান আর সঃ মানুষ নয় মেয়া শান,—দেবতা দেবতা। র রক্ত সমস্ত বর্মায় ছড়ানো রয়েছে। সেই জমাট হবে একদিন আর লক্ষ লক্ষ মেয়া ন দা হাতে জেগে উঠবে, সেদিন আর নিস্তার ই ইংরেজের। এই মেয়া শানকে ধরতে ঠানো হয়েছিলো "বোজীকে" মানে সেই রেজ ইনস্পেক্টরটিকে—

তারপরঃ আগ্রহে যেন ফেটে পড়ে মাচলম।

তারপর—প্রকাণ্ড একটা 'কোপিন' ছে ঝুলতে দেখা গিয়েছিলো তাকে—সব ছে শুধু মুণ্ডটা নেই আর সারা গায়ের লটা ছাড়ানো ঃ গলায় কেমন যেন একটা ম্ভীর্যের আমেজ আনে মা পান।

চমকে ওঠে সীমাচলম ঃ সর্বনাশ, এ সমস্ত া নাকি এদেশে? আর তুমি এত সব নলেই বা কি করে?

খিল্ খিল করে হেসে ওঠে মা পান ঃ রে আমি জানবো না এ সব? আমার ন্নিপতি বা শিনও যে ছিলো এই দলে। ক্ষ্মীছাড়া বা শিন বুড়ো বয়সে ভীমরতি য়েছিলো আর কি। কোকেনের কারবারে শ দু পয়সা কামাচ্ছিল, হঠাৎ কি এক য়াল হলো দেশ স্বাধীন করবার—ব্যস তাতেই লো শেষকালে। পুলীশের গুলী এ ফোঁড় ফোঁড় করে ফেলেছিলো বুকের পাঁজরটা।

তাই নাকি ঃ বেশ একটু বিচলিত হয়ে ড়ে সীমাচলম ঃ তোমার বোনের তো খুব ষ্ট তা হলে।

আমার বোনের? আবার হেসে ওঠে া পান। হাসির ধমকে ওর প্রকাণ্ড চুলের গোছা ারা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। যৌবন হিল্লোলিত নতেজ দেহ আর প্রাণের আবেগে পূর্ণ। কেমন একটু আনমনা হয়ে পড়ে সীমাচলম। আরো একজনের এমনি ভরাট যৌবন, এমনি প্রাণের উচ্ছলতা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। সংসারের সহস্র প্রয়োজনে চূর্ণিত হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত আবেগ। শুভলক্ষ্মীর কঙ্কাল—যৌবনের শীর্ণ কাঠামোটাই আজ অবশিষ্ট শুধু।

চমক ভাঙে সীমাচলমের মা পানের কথায় ঃ কি, তুমি আবার ভাবতে শুরু করলে কি? ও সব তোমার দ্বারা হবে না। কালারা ভয়ানক ভীতু তারা ওসব পারবে না। তারা জানে শুধু আমাদের খেত-খামার কিনে নিয়ে ফসল তুলতে ঘরে আর আমাদের নিকে-সাদী করে একপাল জেরবাদী বংশধরদের সৃষ্টি করতে। অবশ্য প্রয়োজন বুঝলে, ঠিক সময় মত টুপ করে খসেও পড়তে পারে তারা। কিন্তু বর্মীদের হাতে হাত মিলিয়ে তাদের দেশের জন্য কিছু করা ও সব তাদের ধাতে সয় না। কথাটির মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করে সীমাচলম ঃ মা পানের বোনের কি হলো। বা শীনের মৃত্যুতে সে বেশ একটু মুষড়েই পড়েছে বোধ হয় ঃ গলায় একটু আন্তরিকতার সুর আনে সীমাচলম।

আমার বোনের তো আর ঘুম হচ্ছে না বা শীনের জন্য! বুড়ো বর তার মনেই ধরেনি। সে তো বহুদিন আগে ইসমাইল সাহেবের সঙ্গে ঘর ছেড়েছে। ভারী চালাক মেয়ে আমার বোন। ইসমাইল সাহেবের মস্ত বড়ো মসলা পাতির ব্যবসা—আমার বোন মা পোয়া আজকাল মোটর ছাড়া তো বেরোয়ই না কোথাও। আমার এখানে আসে মাঝে মাঝে। জুয়াতে ভারী সখ মেয়েটির—আর বরাতও তেমনি ভালো। সেদিনই আসে বেশ কিছু কামিয়ে নিয়ে যায়।

বিস্মিত হয় সীমাচলম। কোন সংকোচ নেই, কোন দ্বিধা নেই—একটু জড়তা নেই কোথাও। স্বামীকে ছেড়ে বোন অন্য এক পুরুষকে আশ্রয় করেছে—স্বামীর চেয়ে ধনী—হয়ত, বা সুপুরুষও। কিন্তু সমাজ চোখ রাঙায়নি তাকে,—এক ঘরেও করেনি—আত্মীয় স্বজনের দরজা আজো খোলা রয়েছে তার জন্যে। আর একটা কথা মনে পড়তেই বুকটা খচ করে ওঠে সীমাচলমের। তার মাও এমনি ঘর ছেড়ে ছিলো আর একজনের সঙ্গে, অবশ্য তার বাপের মৃত্যুর পর। লোকটিকে আবছা মনে পড়ে সীমাচলমের। কলম্বোর মস্ত বড়ো ব্যবসায়ী—নারকোলের ছোবরা চালান দিয়ে বেশ দুপয়সা রোজগার করেছিলো সে। তার দু হাতের আঙুলে দামী আটটা আংটির কথা আজো বেশ মনে আছে সীমাচলমের। ওই আটটা আংটি বিক্রী করলে নাকি ওদের আধখানা গাঁ কেনা চলতো সেই টাকায়—কথাটা অবশ্য সেই লোকটাই রহস্যচ্ছলে বলেছিলো একদিন। সেই থেকে তার ওপর ভক্তি হয়েছিলো সীমাচলমের। তাকে দেখলেই মনে হ'তো সীমাচলমের—এই একটা লোক যে আধখানা গাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বেড়াচ্ছে। লোকটি প্রথম প্রথম আসতো তার বাপের কাছে—ঠিকুজী কোষ্ঠি গণনা করাতে। এই বিষয়ে খুব নাম ছিলো ওর বাপের। ওর বাপের চেহারাটা ভালো মনে পড়ে না সীমাচলমের—তবু তার কথা মনে হলেই—ধূপধুনার ঘেরা ফোঁটা চন্দনকাটা শান্ত সমাহিত গম্ভীর একটা চেহারার কথা মনে আসে। সামনে প্রচুর পুঁথিপত্তর—আর যখনই বাপকে দেখেছে সীমাচলম, সব সময়েই প্রকাণ্ড একটা পালকের কলমে খস খস করে কি যেন লিখে চলেছেন তিনি। গাঁয়ের লোকেরা বলতো সুব্রামনিয়ামের মত পণ্ডিত আশেপাশে দশখানা গাঁয়ের মধ্যে নাকি ছিলো না।

সীমাচলম তখন খুব ছোটো তবু ওর বাপ মারা যাবার দিনের কথাটা বেশ মনে আছে ওর। সকাল থেকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিলো—আর সঙ্গে কি ঝড়ের দাপট। ওদের পুরোনো বাড়ির কপাটগুলো মনে হচ্ছিল খুলেই পড়ে যাবে বুঝি বা। পিছনের দালানের ওপরে প্রকাণ্ড অশথ গাছটা পড়ে গিয়ে দেয়ালের অনেকখানি ভেঙে গিয়েছিলো। বাড়ির সবই জানতো আজ মারা যাবে সীমাচলমের বাপ। এ রোগে কেউ নাকি বাঁচে না। গাঁয়ের কবিরাজ মশাই আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। যতদিন তাঁর হাতে ছিলো রোগী তিনি এসেছিলেন, এখন রোগী না কি ভগবানের হাতে—শুধু তিনি যদি কৃপা করেন, তবেই রক্ষা পেতে পারে রোগী। বাড়ি ভর্তি লোকজন—তার খুড়ো, দূর সম্পর্কের জ্যাঠা, তিন মামা সবাই এসেছে খবর পেয়ে। পাশের ঘরে সীমাচলমকে নিয়ে শুয়েছিলেন তার এক খুড়িমা—হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো সীমাচলমের। ঝড়ের ঝাপটার ফাঁকে ফাঁকে কিসের যেন একটি গোঙানী। গাটা ছম্ ছম্ করে উঠলো সীমাচলমের—অনেকবার খুড়ীর গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করলো তাকে—কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন তিনি। তখন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো সীমাচলম। ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। পাশের ঘরে পিদ্দিমটার মৃদু আলোয় ঘরের অন্ধকার যেন আরো জমাট হ'য়ে উঠেছে। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন ঠেসাঠেসি করে—তাদের কালো কালো ছায়াগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছে ঘরের চূণবালি খসা বিবর্ণ দেয়ালে। এক কোণে ওর বাপের দীর্ঘ দেহটা শক্ত হ'য়ে পড়ে আছে—বিস্ফারিত দুটি চোখ—চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুর শীর্ণ রেখা আর কস বেয়ে টাটকা রক্তের ধারা। সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠলো সীমাচলমের। ঠিক বাপের পায়ের কাছেই বসে তার মা। এক দৃষ্টে বাপের মৃত্যু পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

দুটি চোখে যেন অনেকদিনের সঞ্চিত জ্বালা আর উত্তাপ। হাত লেগে দেয়ালের চূণবালি একটু খসে পড়তেই সেই আওয়াজে চমকে মুখ ফেরালেন তার মা। মুখোসের মত সাদা মুখ—এলোমেলো চুলের রাশ ঋজু হয়ে বসে থাকার ভঙ্গীটি আজও চোখের সামনে ভাসছে সীমাচলমের। ছেলের দিকে চেয়ে শুকনো গলায় বল্লেন ঃ তোমার বাবা এইমাত্র মারা গেলেন, তাকে শেষ প্রণাম ক'রে নাও। যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গিয়ে বাপের পায়ে

মাথা ঠেকাল সীমাচলম। ওর বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠছিলো—মাকে যেন কেমন মনে হচ্ছিল ওর। ঘুমন্ত পুরীতে প্রাণহীন দেহ আঁকড়ে বসে থাকার মতন সাহস আর শক্তি কোথা থেকে আসলো তার। একটু উচ্ছ্বাস নেই—জীবনের সবচেয়ে প্রিয়বস্তুকে হারানোর আক্ষেপ নেই—নিষ্ঠুর একটা কর্তব্য করে চলেছেন ওর মার মুখ দেখে এই কথাটাই শুধু মনে হয়েছিলো সীমাচলমের।

বাপ মারা যাওয়ার পরে অনেকবার এসেছিলো কলম্বোর সেই ব্যবসায়ীটি। যখনই সে আসতো, প্রচুর ফুল আনতো সঙ্গে। ওর বাবা যে জায়গাটায় বসে অধ্যয়ন করতেন সেখানটায় ফুলের স্তূপ রেখে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকতো সে। মাঝে মাঝে তার মাও ব'সে থাকতেন তার পাশে। এ নিয়ে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কথাও উঠেছিলো অনেকবার—কিন্তু ব্যাপারটা জমাট বাঁধবার আগেই এক রাতে সীমাচলমের মা নিখোঁজ হ'লেন। কোন চিঠিপত্র নয়, কোন ফেলে যাওয়া চিহ্ন নয়, কোন নির্দেশ নয় ভবিষ্যৎ পথের—কেবল সীমাচলমের আবছা মনে পড়ে—গভীর রাত্রে তার কপালে কে যেন তপ্ত চুম্বন এঁকে দিয়েছিলো—ঘুমের মধ্যেও সে চুম্বনের স্পর্শ অনুভব করতে পেরেছিলো সে। ও ঠিক জানে ওর মাই আস্তে নীচু হয়ে চুমো খেয়েছিলেন ওর কপালে আর তার নীচু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত দু' ফোঁটা জল সীমাচলমের গালের ওপর পড়েছিলো। তাইতেই বোধ হয় একটু জেগে উঠেছিলো সে। কিন্তু এ কথাটি সে কাউকে বলেনি কোনদিন—এমন কি শুভলক্ষ্মীকেও নয়। ওর বয়স যদিও তখন খুব কম—তবু কেন জানি ওর মনে হয়েছিলো ওর মায়ের এই চুপিচুপি পালিয়ে যাওয়া ঠিক যেন সহজ সরল সরে চাওয়া নয়—কোথায় যেন প্রকাণ্ড একটা বাধা আর নিষেধের প্রাচীর। আজ সেই প্রাচীর তার মাকে ডিঙিয়ে যেতে হয়েছিলো আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ফিরে আসার পথও চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

ওর খুড়ী অবশ্য ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে বলেছিলেন প্রতিবেশীদের কাছে। শ্রীনিবাসদের পুকুরে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরেছেন সীমাচলমের মা। আহা, এ শোক সামলাতে পারবে কেন, দুটিতে বড় ভাব ছিলো যে ঃ কথার সঙ্গে সঙ্গে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন খুড়িমা, তারপর গলাটা আরও কাঁপিয়ে বলেছিলেন ঃ আহা, সতীসাধ্বী, বেশ গেছে শুধু কচি ছেলেটার জন্যই আমার ভাবনা। খুড়ীর কথাটার মধ্যে বিরাট ফাঁক ছিলো একটা—ডুবেই যদি মরেছে সীমাচলমের মা তবে লাশ কই তার। পুকুরে তো লাশ ভেসে উঠতো নিশ্চয়। মাছে অত বড় শরীরটা খেয়ে ফেলবে নাকি। গোলমালটা আরও স্থূলরূপে পেলো পিল্লেদের চাকর রাম্মুর কথায়। প্রায় সন্ধ্যে থেকে বাবুদের হারানো গরুটা খোঁজাখুঁজি করেছে সে, মাঝ রাত্তির নাগাদ তালবনের ভিতরে সন্ধান পেয়েছিলো গরুটার—সেই দামাল গরুটাকে গলায় দড়ি পরিয়ে কায়দা করে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো তার—ওই থানার সামনে কাঠের পুলটার কাছে আনতেই পায়ের আওয়াজ শুনে গরুটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো—তারপর সে স্পষ্ট দেখেছিলো—সীমাচলমের মা আর সেই লম্বা মতন মস্ত বড়ো লোক বাবুটি হন হন করে শহরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবে নাকি? যে কোন বড়ো রকমের দিব্যি করতেও সে রাজী আছে।

রাম্মুর কথায় সে সন্দেহটা মানুষের মনের আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি মারছিলো এতদিন—সেটাই স্পষ্ট রূপ নিলো এইবার। পিল্লেদের মেজ বৌ তো স্পষ্টই বলে গেলো খুড়িমার মুখের ওপর ঃ শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার আর মিছে চেষ্টা বাছা। সীমাচলমের মার কীর্তি গাঁয়ের আর কারুর জানতে বাকী নেই। চোখের সামনে কি ঢলাঢলিটাই দেখেছি। খোঁজ করো গিয়ে দেখবে এখন কলম্বো শহরে কুলবধূদের সংখ্যা বাড়িয়েছে এতোদিনে—ছি, ছি, ছি—গলায় দড়ি। গলায় দড়ি। মেয়েছেলেরা রসনার সাহায্য নিলো, কিন্তু পুরুষরা নিলো পঞ্চায়েতের শরণ। ফলে মাসখানেকের মধ্যেই ভিটে মাটি বিক্রি করে শহরের কাছেই অন্য গাঁয়ে গিয়ে উঠতে হয়েছিলো সীমাচলমদের। সে আজ অনেক দিনের কথা।

মা পোয়ার সমাজ তাকে ত্যাগ করেনি, আত্মীয়স্বজন একঘরে করেনি তাকে—আজও সে সমাজের বুকের ওপরেই বাস করে—স্বজাতিদের সঙ্গে নির্ভয়ে মেলামেশা করে। সব দেশের সমাজ এক নয়—যা এখানে সম্ভব সাগর পারের দেশ ভারতবর্ষে হয়ত তা সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হতো তবে সীমাচলমের মা, নিশ্চয় আসতেন ফিরে—অন্ততঃ সীমাচলমকে একবার দেখতেও আসতেন নিশ্চয়।

আজো মনে হয়, সীমাচলমের তার মা একটুও অন্যায় করেন নি। সত্যই যদি তিনি গিয়ে থাকেন কলম্বোয় তবে সেই যাওয়ার হয়ত তার প্রয়োজন ছিলো অন্ততঃ মনের দিক দিয়ে। মাপোয়াকে ভাল করে জানে না সীমাচলম—কেন সে ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও ঘর বেঁধেছিলো তাও সে জানে না—তবে তার কেবলই মনে হয় বাড়ীর বউ যখন এক আশ্রয় ছেড়ে অন্য আশ্রয়ে গিয়ে ওঠে—নিশ্চয় তার কোন কারণ থাকে—এমন কোন কারণ যে কারণ হয়ত সমাজ মানবে না—দেশাচার মানবে না—আত্মীয় পরিজন মানবে না, তবুও এদেরও ঊর্ধ্বে যারা—তাদের কাছে এ কারণের সমাদর হবেই। মিথ্যা মোহ আর ভালবাসার ভান করে পলে পলে নিজেকে আত্মবঞ্চনা করার চেয়ে এ ঢের ভালো—অন্য কোথায় ঘর বাঁধা যেখানে আর যাই হোক ভালবাসার অপমান হবে না, স্বাধীন সত্তার মর্যাদা রক্ষা হবে। শুভলক্ষ্মীর কথা আবার মনে পড়ে যায় সীমাচলমের। অনায়াসেই সে ফিরে আসতে পারে তার কাছে—কুনুরের বিখ্যাত ডাক্তারের অবমাননাকর আশ্রয় ছেড়ে। এ প্রেমের প্রহসনের পরিসমাপ্তি হওয়াই প্রয়োজন এবং অবিলম্বে।

যখন চমক ভাঙে সীমাচলমের, তখন মা পান উঠে গিয়েছে। অন্ধকার নেমেছে সারা ঘরটায়। উঠে বাতি জ্বালাতে ইচ্ছা করে না তার। কেমন যেন একটা মানসিক অবসাদ আর ক্লান্তি নামে শরীরের প্রতি গ্রন্থিতে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বসে সীমাচলম।

হোটেলের সামনে দু একখানা গাড়ি এসে জুটেছে। নীচের জুয়ার আড্ডা বসবে পুরোদমে। হাজারো রকমের লোক আসবে শহরের বিভিন্ন দিক থেকে। হৈ হুল্লোড়ে সরগরম হয়ে উঠবে সারা হোটেল। এই স্রোতে অনায়াসে গা ঢেলে দিতে পারে সীমাচলম। অতীত ওর কাছে মৃত—ভবিষ্যৎ অর্থহীন,—কিন্তু কোথায় যেন বাধছে ওর ঠিক এমনি করে ছেড়ে দিতে নিজেকে।

সামনে অপরিসর রাস্তার ওপাশে শ্রমণ-নিবাস। শহরের কোলাহল ভেদ করে তার ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। আরো দূরে 'সোয়ে ডাগন' প্যাগোডার প্রকাণ্ড সোনালী চূড়োটা অন্ধকারেও ঝলমল করে ওঠে। এ কদিনে শহরের দু একটা জিনিস দেখে এসেছে সীমাচলম। সোয়েডোগন প্যাগোডার বিরাট বুদ্ধ মূর্তির সামনে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। নটরাজনের রুদ্র মূর্তি নয়—ধ্বংসের করাল-প্রতীক নয়,—শান্ত সমাহিত তপঃক্লিষ্ট প্রশান্ত মূর্তি—অপার করুণা এই নিমীলিত দুটি চোখে, অধরে বরাভয়ের আভাস। সঙ্গের ফুঙ্গিটি (পুরোহিত) বলেছিলো সীমাচলমকে ঃ জাগ্রত দেবতা ইনি। যা আপনার মনের কামনা নির্বিচারে একে জানান। 'সিকো' (প্রণাম) করুন এঁকে প্রাণের কাকুতি জানিয়ে। নতজানু হয়ে সিকো করেছিলো সীমাচলম—যে জিনিস ও কোনদিন পাবে না, যা চাওয়া হয়ত উচিত নয়—বুদ্ধের পদপ্রান্তে মাথা ছুঁইয়ে তাই চেয়েছিলো সে। বারবার বলেছিলো ঃ দাও ঠাকুর, আমার জিনিস আমাকে দাও। অবজ্ঞায়, অনাদরে সংসারের আবর্জনার মধ্যে বর্ণহীন হবে সেই কুসুম স্তবক—সুষমা আর সুগন্ধ হারাবে সে আমি কি করে সহ্য করবো ঠাকুর। তুমি দাও তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে। (ক্রমশ)

প্রতীক্ষমানা

জন স্টেনবেক্

[জন্ স্টেনবেক্ বর্তমান আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পলেখক। চরিত্রচিত্রণ, ঘটনা সংস্থান, সংবেদনশীল মনন ও তীক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গী তাঁর রচনার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমেরিকায় যে নিগ্রো লিঞ্চিংএর প্রচলন এই সেদিন পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলেছিল, বর্তমান গল্পটির ভিত্তি তারই উপর। গল্পটি যে স্টেনবেকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।——অনুবাদক]

শহরের পার্কে আবেগের বিরাট উচ্ছ্বাস, জনতার চীৎকার ও উত্তেজিত পদপাত ক্রমশ নীরব হয়ে এল। দুটো ব্লক দূরে পথের নীল আলোকে অস্পষ্টভাবে আলোকিত এলম্ গাছগুলোর তলায় তখনও একটি ছোট জনতা দাঁড়িয়েছিল। একটা ক্লান্ত নীরবতা নেমে এসেছিল লোকগুলোর উপর; জনতার মধ্য থেকে কেউ কেউ আবার অন্ধকারে সরে পড়েছিল। জনতার পদাঘাতে পার্কের লনটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

মাইক্ বুঝেছিল যে, সব শেষ হয়ে গেছে। সে নিজের মধ্যেও অনুভব করছিল অবসাদের অবসন্নতা। নিজেকে তার এত ক্লান্ত মনে হচ্ছিল যেন সে কয়েক রাত ঘুমোতে পারেনি—তবু সে অবসন্নতাকে মনে হচ্ছিল স্বপ্নের মত, একটা ধূসর আরামপ্রদ অবসন্নতা। টুপিটা চোখের উপর পর্যন্ত টেনে দিয়ে সে এগিয়ে চলল, কিন্তু পার্ক ছেড়ে চলে যাবার পূর্বে সে শেষবারের মত ফিরে তাকাল।

জনতার কেন্দ্রে কে একজন একটা মোচড়ানো খবরের কাগজে আগুন লাগিয়ে সেটা তুলে ধরেছিল ঊর্ধ্বে। এলম্ গাছে দোদুল্যমান দেহের নগ্ন দেহটির পা দুটি ঘিরে কিভাবে সে অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বে উঠছিল মাইক তা দেখতে পেল। নিগ্রোরা মারা যাবার পর তাদের দেহে একটা নীলাভ ধূসর রঙ দেখা দেয়—দেখে মাইকের কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। জ্বলন্ত খবরের কাগজের আলোকে ঊর্ধ্ব-দৃষ্টি, নীরব ও স্থির মানুষগুলোর মাথাগুলোও আলোকিত হয়ে উঠেছিল; তারা ফাঁসিতে লটকানো লোকটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

যে লোকটা শবটিকে পোড়ানোর চেষ্টা করছিল তার উপর মাইক্ যেন কিছুটা বিরক্তই হল। প্রায়ান্ধকারে তার পাশে দাঁড়ানো একটা লোকের দিকে ফিরে সে বলল: "এ কাজটা ত ভাল হচ্ছে না।"

লোকটা কোন জবাব না দিয়ে সরে দাঁড়ালো। খবরের কাগজের টর্চটা নিভে গেল—ফলে পার্কটা যেন একেবারে অন্ধকারে গেল ডুবে। কিন্তু প্রায় সংগে সংগে আর একটা মোচড়ানো খবরের কাগজ জ্বালিয়ে পা দুটোর নীচে তুলে ধরা হল। কাছেই আর একটি লোক দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। মাইক্ তার কাছে সরে গিয়ে বলল: "এতে ত কিছু লাভ হবে না। ও ত মরেই গেছে। এখন ত ওকে আর আঘাত দেওয়া যাবে না।"

দ্বিতীয় লোকটা একটা অসন্তোষ প্রকাশের শব্দ করল বটে—কিন্তু জ্বলন্ত কাগজের উপর থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল না। সে বলল: "কাজটা ত ভালই। এতে দেশের বহু টাকা বেঁচে যাবে এবং কৌশলী আইনজীবীরাও মাথা গলাতে পারবে না।"

মাইক্ একমত হয়ে বলল: "আমিও ত তাই বলি। আইনজীবীরা মাথা গলাতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে ওকে পোড়ানোর চেষ্টা করে ত লাভ নেই।"

লোকটি এক দৃষ্টিতে সেই অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল: "তবে এতে ক্ষতিরও কিছু নেই।"

মাইক চোখ ভরে দৃশ্যটি দেখল। তার মনে হল যে, তার যেন বোধশক্তি নেই। সে যেন দৃশ্যটি যথেষ্ট পরিমাণে দেখছিল না। তার চোখের সামনে এমন একটা জিনিস ছিল যার কথা সে ভবিষ্যতে বলতে পারবে বলে স্মরণ রাখতে ইচ্ছুক—কিন্তু জড়ত্ববিবর্ণ অবসাদ যেন সেই চিত্রের তীক্ষ্ম্যতা ফেলছিল কেটে। তার মস্তিষ্ক তাকে বলছিল যে, এ দৃশ্যটি ভয়ংকর এবং গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার চোখ ও অনুভূতি তাতে সায় দিচ্ছিল না। একটা যেন সাধারণ ঘটনা। আধ ঘণ্টা পূর্বে যখন সে উন্মত্ত জনতার সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে চীৎকার করছিল এবং ফাঁসির দড়ি লাগানোর সুযোগ পাবার জন্যে রীতিমত লড়াই করছিল, তখন তার বুক এতটা পূর্ণ ছিল যে, তার চোখে এসে পড়েছিল জল। আর এখন সব শেষ—সব অবাস্তব; অন্ধকারাচ্ছন্ন জনতা যেন কঠিন রেখাচিত্র দিয়ে তৈরী। অগ্নিশিখার আলোকে যে মুখগুলো দেখা যাচ্ছিল সে মুখগুলোতে কাঠের মতই কোন অভিব্যক্তি ছিল না। মাইক্ নিজের মধ্যেও অনুভব করল কঠোরতা এবং অবাস্তবতা। অবশেষে সে মুখ ফিরিয়ে পার্ক থেকে বেরিয়ে গেল।

সে জনতার নৈকট্য ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই তার নিজের উপর চেপে বসল একটা শীতল নির্জনতার অনুভূতি। সে পথ দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলল—তার মনে কামনা হল আর কেউ যদি তার পাশ দিয়ে হেঁটে যেত। বিস্তৃত পথটি পরিত্যক্ত শূন্য—পার্কের মতই অবাস্তব। বৈদ্যুতিক আলোর নীচে রাজপথে গাড়ির জন্যে ইস্পাতে গড়া সরু লাইন দুটি বহু দূরে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল আর অন্ধকারে স্টোরের জানলায় প্রতিফলিত হচ্ছিল মধ্য রাত্রির পৃথিবী।

মাইক্ তার বুকে একটা মৃদু বেদনা অনুভব করতে লাগল। সে আঙুল দিয়ে বুক টিপতে লাগল; মাংসপেশীতে বেদনা। তখন তার মনে পড়ল। জনতা যখন কারাগারের দরজা আক্রমণ করেছিল, তখন সে ছিল পুরোভাগে। ৪০জন লোকের একটা লাইন মাইককে ভেড়ার শিঙের মত ঠেলে দিয়েছিল দরজার উপরে। তখন সে কিছু বুঝতেই পারেনি। এখনও অবশ্য এ বেদনার মধ্যে ছিল একটা নির্জনতার জড়ত্ব বিবর্ণ গুণ।

দুটো ব্লক দূরে পথের পাশে আলোকোজ্জ্বল 'বিয়ার' কথাটা ঝুলছে। মাইক্ দ্রুত সেই দিকে এগিয়ে চলল। সে আশা করল যে, দোকানে নিশ্চয়ই অন্যান্য লোক আছে এবং তাদের সংগে কথা বললে সে নির্জনতার হাত থেকে মুক্তি পাবে। সে আরও আশা করল যে, সে লোকগুলো নিশ্চয়ই লিঞ্চিং-এ যায়নি।

ছোট বারটিতে একমাত্র দোকানীই ছিল—বিষাদ-করুণ এক গুচ্ছ গুম্ফসমন্বিত মধ্যবয়সী একটি লোক, তার মুখের ভাব বৃদ্ধ ইঁদুরের মত—বিজ্ঞ, অশোভিত এবং শংকাতুর।

মাইক্‌কে ভিতরে আসতে দেখেই সে সসম্ভ্রমে দ্রুত মাথা নোয়ালো: "আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে, আপনি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছেন।

মাইক্ সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল: "আমার নিজেরও ঠিক তেমনই বোধ হচ্ছে—আমি যেন ঘুমের মধ্যেই হাঁটছি।"

তা বেশ, আপনার যদি মেয়ে দরকার হয়, আমি দিতে পারি।

মাইক্ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল: না—আমি তৃষ্ণার্ত—আমার বিয়ার চাই......তুমিও কি ওখানে গিয়েছিলে?

ছোট লোকটি পুনরায় তার ইঁদুরের মত মাথা নেড়ে বলল: "একেবারে শেষে গেছিলাম—যখন তাকে ফাঁসিতে লটকানোর পর সব শেষ হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম যে, লোকগুলোর অনেকেই হয়ত তৃষ্ণার্ত হবে—তাই আমি ফিরে

দোকান খুলে বসেছি। কিন্তু আপনি ছাড়া এ পর্যন্ত আর কেউ আসে নি। হয়ত আমারই অনুমানে ভুল হয়েছিল।"

মাইক্ বলল ঃ "হয়ত তারা পরে আসবে। পার্কে এখনও অনেকে আছে। যদিও সব উত্তেজনা এখন থেমে গেছে। তাদের কেউ কেউ আবার ওকে খবরের কাগজের আগুনে পোড়ানোর চেষ্টা করছে। তাতে লাভ হবে না কিছু।"

মদের দোকানী বললে ঃ "একটুও লাভ হবে না।" সে তার সরু গোঁফটায় চাড়া দিল।

মাইক্ তার বিয়ারে লম্বা চুমুক দিল। "বেশ ভাল লাগছে। আমি কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছি।"

দোকানী বারের উপর দিয়ে ঝুঁকে মাথাটা তার কাছে নিয়ে এল। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল। "আপনি কি প্রথম থেকেই ছিলেন—জেলের দরজায় এবং তার পরে?"

মাইক্ আবার চুমুক দিল। তারপর বিয়ারের গ্লাসের মধ্যে তাকালো—গ্লাসের নীচ থেকে বুদবুদ উঠছে দেখতে পেল। সে বলল ঃ "আমি প্রথম থেকেই ছিলাম—জেলের দরজায় আমি ছিলাম অগ্রণীদের অন্যতম এবং আমি ফাঁসি লাগানোতেও সাহায্য করেছিলাম। সময় সময় নাগরিকদের পক্ষে নিজেদের হাতে আইন না নিয়ে উপায় থাকে না। কৌশলী আইনজীবীরা এসে অনেক দৈত্যকেও আইনের বিচার থেকে বাঁচায়।"

ইঁদুরের মত মাথাটি এই কথায় ওঠা-নামা করতে লাগল। সে বলল ঃ "আপনি ঠিক বলেছেন। আইনজীবীরা ওদের সব কিছুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। আমার মনে হয় যে, ওই কালা আদমীটা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিল।"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কে যেন বলল যে, সে নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছে।"

আবার বারের উপর দিয়ে মাথাটা নেমে এল মাইকের টেবিলের কাছে। "কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল, মশায়? আমি সব শেষ হয়ে যাবার পর ওখানে গেছিলাম—আর ছিলাম মাত্র মিনিট খানেক। তারপর চলে এসে দোকান খুললাম এই ভেবে যে, লোকগুলোর মধ্যে কারও কারও হয়ত এক গ্লাস বিয়ার পানের ইচ্ছা হতে পারে।"

মাইক তার গ্লাসটা শেষ করে সেটা ঠেলে দিল ফের ভরার জন্যে। "অবশ্য সবাই জানত যে এই ব্যাপারটা ঘটবে। আমি জেল থেকে কিছু দূরে একটা বারে বসেছিলাম। সারা বিকেলটাই আমি সেখানে ছিলাম। একটি লোক আমার কাছে এসে বলল ঃ "আমরা এখানে বসে আছি কেন? কাজেই আমরা পথ ধরে চললাম। ওখানে আরও অনেক লোক জুটেছিল—আরও অনেক লোক এল আমরা সবাই সেখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগলাম। তারপর শেরিফ বেরিয়ে এসে একটি বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু আমরা তাঁকে চীৎকার করেই থামিয়ে দিলাম। একজন লোক একটা ২২ নম্বরের রাইফেল নিয়ে এগিয়ে চলল এবং পথের আলো-গুলো গুলী ছুড়ে নষ্ট করে দিতে লাগল। তারপর আমরা জেলের দরজা আক্রমণ করে ভেঙে ফেললাম। শেরিফ কিছুই করলেন না। একজন দানব বিশেষ কালা আদমীকে বাঁচাতে গিয়ে এতগুলো সৎলোককে গুলী করে মেরে তাঁর লাভ হ'ত না কিছুই।"

"তার উপর যখন নির্বাচন এগিয়ে আসছে", মদের দোকানী টিপ্পনী জুড়ে দিল।

"তখন শেরিফ চীৎকার শব্দ করে দিয়েছেন ঃ 'ওহে, ছোকরারা, ঠিক লোককে বেছে নিও, খৃষ্টের দোহাই ঠিক লোককে বেছে নিও। সে নীচে চতুর্থ ঘরটিতে আছে।'

"ব্যাপারটা বড় করুণ", মাইক্ ধীরে ধীরে বলল, "অন্যান্য বন্দীরা যা ভয় পেয়ে গেছিল। জানলার শিকের মধ্য দিয়ে আমরা তাদের দেখছিলাম। আমি এ রকম মুখ আর কখনও দেখি নি।"

উত্তেজনার মুখে মদের দোকানী নিজে একটি ছোট গ্লাসে এক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে খেয়ে ফেলল। "এজন্যে তাদের দোষ দেওয়া চলে না। মনে করুন আপনি যদি চল্লিশ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জেলে থাকতেন আর তখন একটা লিঞ্চিং-এর [illegible] এসে পড়ত। আপনি ভয় পেয়ে ভাবতেন যে, ওরা ভুল লোককেই ধরে নিয়ে যাবে।"

"আমিও ত তাই বলছি। বড় করুণ সে দৃশ্য। যাক্, আমরা সেই নিগ্রোটার ঘরেই গেলাম। সে চোখ বন্ধ করে পাঁড় মাতালের মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একজন লোক তাকে টেনে ফেলে দিল, আবার সে উঠে দাঁড়াল—তারপর আর একজন তাকে একটা গাঁট্টা মারল—উলটে পড়ে গিয়ে তার মাথা ঠুকে গেলো সিমেন্টের মেঝেতে।" মাইক্ বারের উপর ঝুঁকে পড়ে পালিশ-করা কাঠে তর্জনী দিয়ে টোকা দিল। "অবশ্য এটা আমার নিজের ধারণা—আমার মনে হয় যে, ওতেই তার মৃত্যু হয়েছিল। কেননা আমি তার পোষাক খুলেছিলাম এবং সে তাতে একটা টুঁ শব্দও করেনি বা নড়েও নি এবং আমরা যখন তাকে গাছের উপর ঝুলিয়েছিলাম, তখনও সে নড়া চড়া করেনি। আমার মনে হয় যে, দ্বিতীয় লোকটা তাকে আঘাত করার পরই সে মরে গেছিল।"

"যাক্, আগে মরুক আর পরে মরুক—সে একই কথা।"

"না, মোটেই না। আমরা যা করতে চাই তা ঠিকভাবেই করতে চাই। তার জন্যে যা যা ছিল, তার সবই তার ভোগ করা উচিত ছিল।" মাইক্ তার পাজামার পকেটে হাত দিয়ে একখণ্ড ছেঁড়া নীল ডেনিস কাপড় বের করে আনল। ওর পরণে যে প্যাণ্ট ছিল এটা তারই একটা টুকরো।"

মদের দোকানী মাথা নীচু করে কাপড়টা পরীক্ষা করে দেখল। সে মাইকের দিকে মাথাটা তুলে ধরে বলল ঃ "আমি এটার জন্যে একটি রুপোর ডলার দিচ্ছি।"

"না, না, তা আমি দিতে পারব না।"

"বেশ, তাহলে আমি এর অর্ধেকটার জন্যে দুটো রুপোর ডলার দিচ্ছি।"

মাইক্ সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল। "তুমি এ দিয়ে কি করবে?"

"শুনুন! আপনার গ্লাসটা এগিয়ে দিন। আমি আপনাকে এক গ্লাস বিয়ার খাওয়াচ্ছি। আমি একটা ছোট কার্ডসহ এই কাপড়ের টুকরোটি দেয়ালে আটকে রাখবো। আমার দোকানে যে সব খদ্দের আসবে, তারা সবাই এটা দেখবে।"

মাইক্ তার পকেটের ছুরিটা দিয়ে কাপড়ের টুকরোটি দু ভাগ করল এবং তার এক ভাগ মদের দোকানীকে দিয়ে দুটো রৌপ্য ডলার নিল।

"আমি একজন কার্ড লেখককে জানি," ক্ষুদ্রকায় দোকানী বলল। "সে লোকটা রোজই আমার দোকানে আসে। এর নীচে টানিয়ে রাখার জন্যে সে নিশ্চয় একটা কার্ড আমায় লিখে দেবে।"

তারপর সে সাবধানী হয়ে উঠল। "শেরিফ কি কাউকে গ্রেপ্তার করবেন বলে মনে হয়?"

"অবশ্যই না। তিনি মিছামিছি কেন অনর্থ বাধাতে যাবেন। আজকের রাতের জনতার মধ্যে অনেকেরই ভোট আছে। ওরা সব চলে যাওয়া মাত্রই শেরিফ আসবেন, নিগ্রোটাকে গাছ থেকে নাবিয়ে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবেন।"

মদের দোকানী দরজার দিকে তাকাল। "আমার মনে হয় যে, ওরা মদ খেতে চাইবে আমার এ ধারণা করা ভুল হয়েছিল। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।"

"আমিও এইবার বাড়ি চলে যাই। বড় ক্লান্ত লাগছে।"

"আপনি যদি দক্ষিণ দিকে যান, তবে আমিও দোকান বন্ধ করে কিছু দূরে আপনার সাথে যেতে পারি। আমি দক্ষিণের ৮নং পথে থাকি।"

"তাই নাকি, সে ত আমার বাসা থেকে মাত্র দুটি ব্লক দূরে। আমি দক্ষিণের ৬নং রাস্তায় থাকি। তোমাকে ত আমার বাড়ি ছাড়িয়ে যেতে হবে। বেশ মজার কথা ত, আমি

তোমাকে আশে পাশে কোনদিনই ত দেখি নি।"

মদের দোকানী মাইকের গ্লাসটা ধুয়ে ফেলল এবং লম্বা অ্যাপ্রনটা খুলে ফেলল। সে টুপি ও কোট পরল, দরজার কাছে গিয়ে বাইরের লাল রঙের বাতি এবং ভিতরের বাতি-গুলো নিভিয়ে দিল। এক মুহূর্তের জন্যে দুটো লোক পথের পাশে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো পার্কের দিকে। সমস্ত শহর নিস্তব্ধ। পার্কের দিক থেকে কোন শব্দই পাওয়া যাচ্ছিল না। একটি ব্লক দূরে একজন পুলিশ ফেলছিল তার টর্চের আলো।

"দেখছতো?" মাইক্ বলল। "কিছুই যেন ঘটে নি।" "যাক্, ও লোকগুলোর যদি বিয়ার পানের ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে ওরা নিশ্চয়ই অন্য কোথাও গেছে।" "আমিও ত তোমাকে তাই বলেছিলাম,", মাইক বলল।

তারা নির্জন পথে চলতে চলতে ব্যবসায়ের অঞ্চল ছাড়িয়ে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে ঘুরল। মদের দোকানী বলল ঃ "আমার নাম ওয়েলচ্—আমি মাত্র বছর দুয়েক হল এ শহরে এসেছি।"

আবার মাইকের মনে নেমে এসেছিল নির্জনতা। "বেশ মজার ব্যাপার ত—"সে বলল এবং তারপর "আমি এই শহরেই এবং যে বাড়িতে এখন বাস করছি সেই বাড়িতেই জন্মেছিলাম। আমার স্ত্রী আছে কিন্তু ছেলে-মেয়ে নেই। আমাদের দুজনেরই জন্ম এই শহরে। প্রত্যেকেই আমাদের চেনে।"

তারা আরও কয়েকটি ব্লক হেঁটে পার হ'ল। স্টোরগুলো পিছনে পড়ে গেল এবং তার বদলে পথের দুধারে দেখা দিল সুন্দর বাগান ও পরিষ্কার লন সমন্বিত বাড়ী। পথের আলোকে বড় বড় গাছের ছায়া এসে পড়েছিল পথিপার্শ্বে। দুটো নৈশ কুকুর পরস্পরের গা শুঁকতে শুঁকতে ধীরে ধীরে চলে গেল।

ওয়েলচ্ মৃদুস্বরে বলল ঃ "সে লোকটা অর্থাৎ ওই নিগ্রোটা কি ধরণের লোক ছিল কে জানে!"

মাইক্ নির্জনতার মধ্য থেকেই জবাব দিল ঃ "সব কাগজই বলেছে যে সে একটা দৈত্য বিশেষ। আমি সব কাগজ পড়ি। তারা সবাই এই কথা বলেছিল।"

"হ্যাঁ, আমিও সেসব পড়েছি। তবু ভাবতে কেমন লাগে। বহু ভাল নিগ্রোর সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে।"

মাইক্ মাথাটা ঘুরিয়ে প্রতিবাদের সুরে বলল ঃ "তা যদি বল, তবে আমিও খুব ভাল কয়েকটি নিগ্রোকে জানি। আমি অনেক নিগ্রোর সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করেছি—তারা যে-কোন শ্বেতাঙ্গের মতই ভাল।...কিন্তু তার মানে এই নয় যে, খারাপ নিগ্রো নেই।"

তার এই বক্তৃতার বেগ মুহূর্তের জন্যে ওয়েলচকে থামিয়ে দিল। তারপর সে বলল ঃ "ও কি ধরণের লোক ছিল তা বোধহয় আপনি বলতে পারেন না—না?"

"না, সে কঠিন ভাবে মুখ বন্ধ করে, চোখ বন্ধ করে এবং পাশে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। তখন একজন লোক তাকে আঘাত করেছিল। আমার ধারণা, আমরা যখন তাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন সে মারা গেছে?"

ওয়েলচ্ পথের পাশে একটা বাগানের কাছে এগিয়ে গেল ঃ "এখানে বড় সুন্দর বাগান। এ গুলোকে সাজিয়ে রাখতে নিশ্চয়ই অনেক টাকা লাগে।" সে আরও নিকটে সরে গেল এবং ফলে মাইকের বাহুর সঙ্গে তার স্কন্ধের সংযোগ ঘটল। "আমি কখনও লিঞ্চিং-এ যাইনি। এতে পরে কেমন লাগে?"

মাইক্ যেন লজ্জায় তার সংযোগ এড়িয়ে কিছুটা দূরে সরে গেল। "এতে কোন অনু-ভূতিই জাগে না।" সে মাথা নীচু করে গতি বাড়িয়ে দিল। তার সাথে চলতে গিয়ে ক্ষুদ্রকায় মদের দোকানীকে প্রায় ছুটতে হ'ল। পথের বাতিগুলো অনেক কম। পথে অন্ধকারও যেমন বেশী, নিরাপত্তাও তেমনই বেশী। মাইক্ হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল ঃ "নিজেকে যেন কেমন বিচ্ছিন্ন আর ক্লান্ত মনে হয়—তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্তুষ্টিবোধও থাকে,—যেন, "তুমি একটা ভাল কাজ করে ক্লান্তি অনুভব করছো—তোমার ঘুম আসছে।" তার পায়ের গতি মন্দীভূত হয়ে এল। "দেখ রান্নাঘরে বাতি জ্বলছে। ওইখানেই আমি থাকি। আমার বউ আমার জন্যে জেগে বসে আছে।" সে তার ছোট বাড়ীটার সামনে থেমে দাঁড়াল।

ওয়েলচ্ দুর্বলভাবে তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। "যখনই আপনার এক গ্লাস বিয়ার কিংবা মেয়ের দরকার হবে, আমার দোকানে যাবেন। মধ্য রাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকে। আমি বন্ধু-বান্ধবদের পরিচর্যার ত্রুটি করি না।" সে বুড়ো ইঁদুরের মত নড়বড়িয়ে চলে গেল।

মাইক্ বলল ঃ "গুড নাইট্!"

তারপর সে বাড়িটা ঘুরে খিড়কি দরজার পাশে গেল। তার রোগা খুঁতখুঁতে স্বভাবের স্ত্রী উন্মুক্ত গ্যাসের চুল্লীর পাশে বসে গা গরম করছিল। সে দরজায় দাঁড়ানো মাইকের দিকে অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টি ফেরালো।

তারপর তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো এবং তার স্বামীর মুখের উপর লেগে রইল। "তুমি এতক্ষণ কোন্ মেয়ের সঙ্গে ছিলে," সে ভাঙ্গা গলায় প্রশ্ন করলে। "কার সঙ্গে ছিলে বল!"

মাইক্ হাসল। "তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে কর—নয়? তুমি খুব চালাক—তাই না? আমি কোন মেয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে এলাম —এটা তুমি কেন ভাবলে?"

সে ভয়ঙ্কর ভাবে বলল ঃ "তুমি কি ভাবো যে তোমার ব্যাভিচারের কথা আমি তোমার মুখ দেখে বলে দিতে পারি না?"

মাইক্ বলল ঃ "বেশ তুমি যদি এতই চালাক আর সবজান্তা হও, আমি তোমায় কিছুই বলতে চাই না। তুমি শুধু সকালের কাগজের জন্যে অপেক্ষা করে থাকো।"

সে দেখতে পেল যে অসন্তুষ্ট চোখ দুটোর মধ্যেও সন্দেহের ছায়া ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। বউ প্রশ্ন করল ঃ "তবে কি সেই নিগ্রোটার কথা বলছ? তারা কি নিগ্রোটাকে জেল থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে? সবাই বলছিল যে তাকে মেরে ফেলা হবে।"

"তুমি যদি এতই চালাক হও, তবে নিজে খুঁজে বার করো। আমি তোমাকে কিছুই বলে দেব না।"

সে রান্নাঘরের মধ্য দিয়ে বাথরুমে চলে গেল। দেয়ালে একটা ছোট আয়না টানালো।

মাইক্ টুপিটা খুলে নিজের মুখের দিকে তাকালো। "হায় ভগবান, বউ ঠিক কথাই বলেছে," সে মনে মনে ভাবল। "আমারও ঠিক তেমনই মনে হচ্ছে।"

অনুবাদক—গোপাল ভৌমিক

মেশিন

নূতন আবিষ্কৃত

কাপড়ের উপর সূতা দিয়া অতি সহজেই নানা প্রকার মনোরম ডিজাইনের ফুল ও দৃশ্যাদি তোলা যায়। মহিলা ও বালিকাদের খুব উপযোগী।

চারটি সূচ সহ পূর্ণাঙ্গ মেশিন—মূল্য ৩৲

ডাক খরচা—॥৶০

DEEN BROTHERS, Aligarh 22.

বিশ্ব-সাহিত্য গ্রন্থমালা

সম্পাদনাঃ জগদিন্দু বাগচী

১৪ই ডিসেম্বর

মেরেজ্‌কোব্‌স্কীর সুবিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় ও শ্রীঅশোক ঘোষ। জারের অপসারণের জন্যে প্রথম যারা দান করেছিল বক্ষশোণিত, ব্যর্থ হয়েছিল তারা, তবুও তাদেরই রক্তের আভায় রাশিয়ায় আজ রক্তরবির অভ্যুদয়। তারই মর্মন্তুদ কাহিনী। দাম—৩॥০

পঙ্কিল

আলেকজাণ্ডার কুপরিণের উপন্যাস 'ইয়ামা'র অনুবাদ। গণিকাবৃত্তির বাস্তব কথাচিত্র। নর্দমার এ নোংরা ঘাঁটা কেন? নিজেদেরই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে। দাম—৩৸০

নূতন চীনাগল্প

শ্রীগৌরাঙ্গ বসুর ভাষায় ও চীনা শিল্পীর রেখায়।

শ্রীকুমারেশ ঘোষের

ভাঙাগড়া

আধুনিক সমস্যামূলক উপন্যাস। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হয়েও কলমের বদলে সগর্বে যে ধরতে পারে ছেনিহাতুড়ী শুধু সেই বলতে পারে দোষী কে? আমি? না, অনুভা? না, আমাদের ভীরু সমাজ। দাম—২॥০

ম্যানিয়া

স্ত্রীভূমিকা-ও-দৃশ্যপট-বর্জিত ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী রসনাটিকা। দাম—১৲

শিশু কবিতা

শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত। দাম—॥৶০

রীডার্স কর্ণার

৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

জননীগণ নিজেরা এবং তাঁদের শিশু সন্তানদের জন্য কিউটিকিউরা ট্যালকাম পাউডার (Cuticura Talcum Powder) ব্যবহার করে থাকেন। স্নিগ্ধ, শীতল ও রেশমসদৃশ কোমল, দীর্ঘস্থায়ী, প্রাণমাতানো গন্ধাদিবাসিত আনন্দবর্ধক মনোরম সামগ্রী।

কিউটিকিউরা ট্যালকাম পাউডার
CUTICURA TALCUM POWDER

কেবলমাত্র কিউটিকিউরা ট্যালকাম পাউডারই (Cuticura Talcum Powder) ব্যবহার করবেন শিশুদের কোমল ত্বকের জন্য। এতে তাদের খুব আরাম হবে—বিশেষতঃ এই গ্রীষ্মের দিনে! লুনছাল ও জাঙিয়া পরার দরুণ ক্ষত অন্তর্হিত হবে।

559

স্বাধীনতার ব্যথা

শ্রী অপূর্বকুমার মৈত্র

ঐ বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব ক'টাই ছ্যাবলা, গীতা'টা সবচেয়ে বেশী। জয়ন্তী কলেজে পড়ে, গায়ত্রী স্কুলে, বোকনদা ব্ল্যাক-মার্কেটে ব্যবসা ফাঁদবে বলে; কিন্তু ঐ পর্যন্তই —দিনে চার প্যাকেট করে সিগারেট খায়, ঠাট্টা তামাসার সময় অসময় নেই। বৈঠকখানায় কিছুক্ষণের জন্য বসে থাকি দুটি ভাতের জন্য, বাড়ির ভিতর ডাক পড়ে, খেয়ে আসি। জেলার সদরে সরকারী কাজ করি, ওদের ঘরে আমি সুখের অতিথি। আমি অতিথি হইনি, ওরাই সবাই মিলে আমাকে অতিথি করিয়েছে। ইতিহাসটা জানা দরকার।

পনেরো অগাস্ট, উনিশশ' সাত চল্লিশ সাল কেবল ভারতের নয়, নিম্নতম ক্ষুদ্র সরকারি কেরাণীদের জীবনেও সেদিন একটা নতুন পাতা উল্টে গেল। আমার জীবনেও বটে। সরকারি চাকরি করি—যৌবনটা পার করে দিলাম পদ্মা নদীর পারে, আড়িয়ালখাঁর ধারে, কোটালিপাড়ার মাঠে, নারায়ণগঞ্জের ঘাটে। উপরওয়ালা ছাড়বেন না, গোলাপি কাগজ কতকগুলো অফিসে সবার হাতে হাতে বিলি করে বল্লেন—এক্ষুণি সই করে দাও বাকি জীবন কোথায় চাকরি করতে চাও—হিন্দুস্থানে না পাকিস্থানে?

বল্লাম, "দু'দিন সময় দাও সাহেব, কলকাতায় গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।"

লাল চামড়া—নীল চোখো সাহেব চটে আগুন, বল্লেন, "তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশু নও, খবরের কাগজ পড় না? বাবাকে আবার কি জিজ্ঞেস করতে যাবে? এক্ষুণি ঠিক করে ফেলো, আজই কলকাতার হেড অফিসে সব ফরম্ পাঠাতে হবে।"

গোলাপি কাগজখানা টেবিলের উপর রেখে, চোখ বন্ধ করে, মুখখানা সিগারেটের ধোঁয়ায় আড়াল করে নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই ভাবতে লাগলাম। সত্যিই তো খবরের কাগজ পড়ি, সবই তো জানি, তবে আর বুড়ো বাবার কি দরকার? আমার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট ঐ সব খবরের কাগজের পাতায় পাতায় লেখা আছে। চোখ বন্ধ করেই যুগপৎ দেখতে লাগলাম বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—হাত বোমা! লক লক করছে বুকের সামনে ছোরা, জিপ্ গাড়ি ছুটে চলেছে—বাহুমূলে চাপা স্টেন গান, নলটা আমার কপালকে লক্ষ্য করছে, গা পুড়ে যাচ্ছে এসিডের জ্বালায়—চারিদিকে হৈ হৈ শব্দ দমকলের ঘণ্টা। পিছনে আবার অনেক দূরে ক্ষীণ সঙ্গীত—"দেশ দেশ নন্দিত করি' সহস্র কণ্ঠের সুদূর ধ্বনি; ফ্যানের বাতাসের শব্দে জাতীয় পতাকার বিজয়গর্ব শুনতে পেলাম, চোখের পাতায় জেগে উঠলো ত্রিবর্ণের রামধনু —শিবাজীর শিরস্ত্রাণ, আমার মায়ের অঞ্চল আর বাঙলার বুকের শ্যামল ছবি, শত শহীদের রক্ত তার উপর গোলাকার রক্তের ছাপে গতির চক্র এ'কে চলেছে। ইত্যবসরে আমাদের সেই বিশ্ব-বখাটে অফিসের টাইপিস্টটা তার নিজের কাগজখানা টাইপ করে বিকট এক আওয়াজে চেঁচিয়ে উঠলো—বন্দে মাতরম্!

জানি না কি বেদনায় আমিও লিখলাম ধীরে ধীরে—"পশ্চিমবঙ্গ"। টেলিগ্রাফে আমাদের সবার বদলির হুকুম এসেছে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নানাস্থানে একান্ন পীঠস্থানের মতন। আমার নিজের দেহটা গিয়ে পড়বে, হুকুম হয়েছে একেবারে হিমালয়ের পাদদেশে তিস্তা নদীর পারে। বদলি হয়েছে যেতে হবে; নিশ্চয়ই আবার হুকুম হয়েছে থাকতে হবে কষ্ট করে যতদিন না উপযুক্ত লোক আমার পরিবর্তে আসে। এ এক নূতন ঝঞ্ঝাট। সরকারি বাড়িতে থাকি—সেটি আমার সম্পূর্ণ নিজের দখলে। আমি কেন পরের বাড়ি অতিথি হতে যাবো আমার কি দুঃখ। তবু একান্তই দুঃখ আসে জীবনে, যাকে নূতনতর দুঃখের আস্বাদ নিতে হবে।

ঝাঁকে ঝাঁকে শহরে নতুন লোক এসে পেঁৗছায়, ঝাঁকে ঝাঁকে চলে যায়—তারা সবাই কর্মচারি কিন্তু আমার পরিবর্তে উপযুক্ত লোকটি আসে না। জানাশোনা যারা ছিল সবাই এক এক করে চলে গেল—আমার কাছে শহরটা হয়ে যায় মরুভূমির মতন। রবীন্দ্রনাথের কোন নায়িকার মতন যিনি পূজার ছুটীতে দার্জিলিংএ জনতা দেখেছিলেন কিন্তু মানুষ খুঁজে পেলেন না। আমার তাতে দুঃখ নেই; আমি যে চিরদিনই একলা। দলে দলে লোক আসে আমার অফিসের, কিন্তু শহরে এমন স্থানাভাব যে গাছতলাতে স্থান হয় না। আইনত এরা আমার কাছে বিদেশী তবু মায়া হয়—ভাবি, আহা ছেলেপিলে নিয়ে দাঁড়াবে কোথায়! ছেড়ে দিই একটা ঘর, দুটো ঘর নিজের বৈঠকখানা, বারান্দাটাও দিলাম, নিজের বাড়ির ভিতর যাওয়া বন্ধ করলাম, পুকুরে স্নান করে আসি বাথরুম ব্যবহার করলে ওদের মেয়েদের হয়তো অসুবিধা হবে অনেক। দাড়ি কামানোর জলটাও রাস্তার কল থেকেই আনি—শেষে রান্নাঘরটাও গেল। উপায় কি; ওদের কষ্ট দেখা যায় না।

ঠাকুরকে টাকা দিয়ে বল্লাম, "যা তিস্তা নদীর পাড়ে বসে থাকগে, আমি এলাম বলে, আমার লোক এলেই চলে যাবো।" অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাডের মতন শোবার ঘরটা শুধু তখনও আঁকড়ে ধরে আছি বিদেশীদের হাত থেকে।

পারলাম না। তাও গেল। পার্টি পেতে ঐ ঘরটাতে নিরিবিলি বোধে দিনে রাতে ঈশ্বরের নাম নিতে সবাই হাতপা ধুয়ে যাতায়াত শুরু করলে। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে, সপ্তমীর চাঁদ জানালায়, ঠাকুর তিস্তা নদীর দেশে, সুটকেশটা খাটের তলা থেকে টেনে একটা টাকা বের করে রাস্তায় নেমে পড়লাম। পাইস্ হোটেল, গ্র্যান্ড হোটেল, কতদিন শহরে চোখে পড়েছে কিন্তু কাজের সময় মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেছি। কিন্তু এখনি যে আমার দরকার।

ঐ বাড়ির সব ক'টা ছেলেমেয়েই ছ্যাবলা। গীতাটা সবচেয়ে বেশী। স্টেশন রোডের উপরেই ওদের বাড়ি। আমি লাজুক, সন্ধ্যা-বেলার ভিড় ঠেলে রেডিওমুখরিত মনিহারী দোকানে দোকানীর বন্ধুবান্ধবদের অবজ্ঞা করেও জিনিসের দর করতে পারি তবু পাইস হোটেল কোথায় এই সামান্য কথা জিজ্ঞেস করতে ওই সব ছ্যাবলা ছেলেমেয়েদের কাছে গিয়ে অপদস্থ হবো আমি? প্রাণ থাকতে নয়।

ডাকলাম, "এই সাইকেল রিক্সা?"

"আসুন কোথায় যাবেন?"

"স্টেশনের এই রাস্তায় কোন পাইস্ হোটেল আছে বলতে পারো?"

মেহেদির বেড়া আর কাঁঠালি চাঁপাগাছের আড়ালে বারান্দা থেকে তখনই উত্তর এল—"আছে আছে এই বাড়িই!"

লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জবাব তৈরী করতে লাগলাম। এমন একটা কথা যে আঙ্গুলের সিগারেটের আগুনের মতন তপ্ত—অসভ্য।

দ্রুত পদক্ষেপে বারান্দার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমরাই জবাব দিচ্ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাবাকে ডেকে দাওতো এক্ষুনি।"

"তিনি তো কবে মরা গেছেন।"

জয়ন্তী, গায়ত্রী, টুকু, দুলু, দালি এক সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো আমার পরাজয়ে।

"বাড়ির কর্তা কে?"

"পিসেমশায়।"

"কোথায় তিনি ডাকো।"

"বেড়াতে বেরিয়েছেন।"

"তুমি কে?"

"আমি? গীতা।"

"আচ্ছা, কোন বেটাছেলে নেই বাড়িতে? ডাকো।"

গীতা অতি অবজ্ঞার হাসিতে ঘরের ভিতর মুখটা ঘুরিয়ে চলে গেল, চৌকাট পার হবার সময় গানের একটা টুকরো নিয়ে—"পাওয়া তো নয় পাওয়া।"

তারপরই শুনতে পেলাম ঘরের ভিতর গীতা চেঁচাচ্ছে,—"ও বোকনদা তোমাকে পুলিশে ধরতে এসেছে, যাও, দেখবে মজা। ব্ল্যাকমার্কেট করবে আর?"

দীর্ঘ একটা টান দিয়ে ঘরের ভিতর জিজ্ঞাসাবোধক শব্দ হো'ল, "কে—?"

বল্লাম, "একবার বেরিয়ে আসুন তো।"

বোকনদার প্রথম চেহারা দেখেই বুঝে নিলাম যে, এ লোকের কাছে আপিল করার চেয়ে ফাঁসিতে ঝুলে পড়াই শ্রেয়। তবু বেশ একটু কর্কশ সুরেই বল্লাম—"একি শিক্ষা বলুন তো আপনাদের বাড়িতে—রাস্তার লোকের কথার জবাব দেয় মেয়েরা।"

বোকনদা বল্লে, "খুব অন্যায়। কে দিয়েছে বলুন তো?"

"এদেরই মধ্যে কেউ হবে।"

"খুবই অন্যায়। তবে অপরাধীর নাম না জানলে কি করে বিচার হবে বলুন? বসুন আপনি, এই জয়ন্তী! আমার সিগারেটের প্যাকটা আনতো, পাঞ্জাবীর পকেটে আছে।"

"থাক সিগারেট চাই না। ভবিষ্যতে ওদের সাবধান করে দেবেন।"

"পনেরোই আগস্টের পর ওরা এমনিই খুব সাবধানে আছে মনে তো হয় না—গায়ে পড়ে যে রকম রাস্তার লোকের কথার জবাব দেয় একটা বিপদ হতে কতক্ষণ। আচ্ছা, বাবা বাড়িতে এলে বলবো।"

সকলের শান্ত ভাব দেখে রাগটাও আমার একটু কমে এল। বোকনদা জিজ্ঞেস করলো—"আপনি বুঝি এখানে নতুন এসেছেন?"

বোকনদার কাঁধের আড়াল থেকে আলপিনের খোঁচার মতন কথা ভেসে এল—"না বোকনদা পুরোন লোক তবু আমাদের পাড়াতে পাইস্ হোটেল খুঁজছিলেন।"

সবাই হেসে উঠলো। ধৈর্য আর ধরে রাখতে পারলাম না।

পিছনে মুখ ঘুরিয়ে বোকনদা জিজ্ঞেস করলে—"তুই এঁকে চিনিস গীতা।"

আসামী মুখ নীচু করে স্বীকার করলে, "হ্যাঁ।"

বোকনদা আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি বুঝি গানের মাস্টার?"

ওদের কথাবার্তায় অবাক ও হতভম্ব দুই-ই হলাম। আর দাঁড়িয়ে থেকে অপদস্থ হবার ইচ্ছা ছিল না, হন্ হন্ করে নেমে রাস্তার দিকে চলতে শুরু করলাম। পিছনের হাসিকে উপেক্ষা করতে পকেটের সিগারেট পুরুষের একমাত্র সম্বল, মেয়েদের যেমন আঁচল। আঁচল বা সিগারেট নখে নাড়াচাড়া করলে সকল প্রকার স্নায়বিক দুর্বলতা জয় করা যায়।

রাতকানা গরু ঠেকাতে ওদের একটা বাঁশের গেট ছিল, নারিকেলের দড়ির ফাঁসগিঁট খুলে বেরিয়ে পড়বো এমন সময় নিঃশব্দে দ্রুতপদে আসামী এসে বাধা দিলে, "বারে, চলে যাচ্ছেন যে।"

"কি করতে হবে শুনি।"

"চা খেয়ে যান—জল চড়িয়ে দিয়েছি।"

"এটা রেস্তঁরাও নয় হোটেলও নয়, সরুন! অবাক হয়ে যাই কি করে পারলেন দাদার কাছে অমন অম্লান বদনে মিথ্যা কথাটা বলতে যে আমাকে চেনেন।"

"বারেঃ মনে নেই? জয়ন্তীদির কলেজে এবার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আপনি গান করেছিলেন না?"

"তাতেই পরিচয় হয়ে গেল?"

"আমি তা জানি না, ছোড়দি বল্লে—বল্ এটা পাইস হোটেল, তাই বল্লাম।"

"ছিঃ লোককে অপমান করতে একটু ভাবেন না? আপনার ছোড়দি যদি খুন করতে বলেন তাও করতে পারেন?"

"হ্যাঁ তাও পারি।"

"সরুন যেতে দিন।"

"না, চা খেয়ে যান।"

"না খাবো না, যান্—চা খাই না আমি, এখন আমার খাবার সময়।"

"না খেলেও যেতে হবে, বোকনদাকে বুঝিয়ে বলবেন চলুন।"

"কি বলবো?"

"যা হয় বলুন নইলে পিসেমশায়কে বলে দিলে আমার রক্ষা থাকবে না।"

ফিরে গেলাম। একটা বড় চৌকী বারান্দার উপর শীতলপাটিতে ঢাকা, উঠে আসতেই বোকনদা দিয়াশলাই আমার মুখের কাছে জেবলে বল্লে—"এবার মুখে আগুন দিয়ে বসুন, আপনি হেরেছেন ওদের কাছে।"

"তাইতো দেখছি।"

"যা গীতা চা এনে দে!"

দূর থেকে দেখলাম গীতা হাঁপাতে হাঁপাতে ভারী কি একটা জিনিস নিয়ে আসছে; ভাবলাম হয়তো এক ট্রে খাবার। বিরক্ত হলেও উপভোগ্য ক্ষিদের পেটে। কিন্তু তাতো নয়, চোখের ভুল। পাটির উপর এনে হাজির করলে বড় একটা হারমোনিয়াম। তারপর এল শুধু এক পেয়ালা চা, হারমোনিয়ামের ডালার উপর রেখেই বল্লে, "আগে খান তারপর একটা গান করুন।"

দুই-এক চুমুক খেয়েছিলাম হয়তো ঠিক মনে নেই। গান গাইতে হয় নি, ওরাই তাগিদ দিতে ভুলে গিয়েছিল।

অদূরে ট্রেজারীতে ও জেলখানায় যখন একসঙ্গে রাত এগারটার ঘণ্টা বাজতে লাগলো সচেতন হয়ে দেখি আমার চারিদিকে দানি দুলু জয়ন্তী গীতা গায়ত্রী। বোকনদা একটা ইজিচেয়ারে বসে তালে তালে সিগারেট টানছে আর চৌকির তলায় হাত ঢুকিয়ে লুকোচ্ছে পিসেমশায়ের ঘন ঘন ঘর আর বারান্দা পায়চারির সঙ্গে সঙ্গে। আমি ভূতের গল্প বলে চলেছি দশটা আঙ্গুলে গীতাদের মুখের সামনে নেড়ে চেড়ে আর গীতা এক নাগাড়ে "তারপর" আর "হুঁ" দিয়ে যাচ্ছে। ক্ষিদেতে আমার পেটে ইঁদুরের বাচ্চার ডাক শোনা যায়।

গুরুগম্ভীর গলায় পিসেমশায় এসে সামনে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "এবার চেয়ারটা ছাড়ো দেখি বোকন, যাও তোমরা সব বাড়ির ভিতর। খেতে দিয়েছে। আর নয়; রাত কোরো না।"

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেলাম, ছিঃ ছিঃ রাত করে দিলাম এত! এদের খাওয়া হয়নি আর আমি গল্প করছি বসে বসে অচেনা অজানা এদের নিয়ে। তৎক্ষণাৎ উঠে স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে নাবতে যাচ্ছি গীতা বলে উঠলো, "বা রেঃ চলে যাচ্ছেন যে বড়? আসুন পিসিমা কতবার তাগাদা দিয়ে গিয়েছেন।"

"কোথায় যাবো?"

"আহা, জানেন না যেন! খেতে। কানে কম শোনেন?"

এমন বিপদেও মানুষে পড়ে। সবাই বাড়ির ভিতরে এক এক করে চলে গেল। কত অনুনয় বিনয় করলাম এড়িয়ে চলে যাবার জন্য, অসহায় ভাবে পিসেমশায়ের দিকে তাকাতেই তিনি বল্লেন—"কি, হাত পা ধুতে চাও? বাড়ির ভিতরেই জল আছে যাও আর রাত কোরো না, খেয়ে এসে না হয় গল্প করো।"

তিন পা পিছিয়ে পিসেমশায়কে আড়াল করে গীতা এমন একটা মুখভঙ্গী করলে যার অর্থ, "কেমন হোল তো! এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মতন আসুন।" নিতান্ত অনিচ্ছায় যাই যাই করি, দু'পা ভিতরের দিকে বাড়াই সম্পূর্ণ মনের বিরুদ্ধে, আবার দাঁড়াই। আবার ডাকাডাকি, হাসাহাসি চলেছে রান্নাঘরের সামনের বারান্দায়, সারি-বাঁধা আসন, পিঁড়ি, খবরের কাগজ—সবাই বসে গিয়েছে। একখানা পিঁড়ি খালি। গীতা যেন তার উপর কি একটা করলে অথবা রাখলে নয়তো আঁচল দিয়ে মুছলে দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বোকনদা ডাকলে, "আসুন আপনি

হেরেছেন, খেতে আপনাকে হবেই, পালাবেন কোথায়?"

আর রাগ নাই, লজ্জায় রাঙা হবার মতন বয়সও নাই। বল্লাম, "সত্যি এ তোমাদের কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি।"

গীতা রান্নাঘর থেকে একথালা ভাত নিয়ে বেরিয়ে এসে বল্লে, "হয়েছে ঠাকুরমা, আর লজ্জা দেখাতে হবে না বসুন এবার।"

অবাক হয়ে গেলাম। ঠাকুরমা! কাকে বলছে তবে? প্রকাশ্যেই জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকে বলছেন ঠাকুরমা?"

সমবেত কণ্ঠে সবাই জবাব দিল, "আপনাকে, আপনাকে! গীতা আপনার নতুন নাম দিয়েছে—'ঠাকুরমা'। আপনি সুন্দর গল্প বলতে পারেন কিনা তাই।"

তিন ঘণ্টার ঘনিষ্ঠতায় ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষের নারী সম্বন্ধ অপ্রতিভ হয়েও মেনে নিলাম। আমার নাম হোল ওদের কাছে "ঠাকুরমা"। এটুকু খেলাছলে হয়তো সহ্য করা যায় কিন্তু পিঁড়ির উপর পা বাড়াতে গিয়ে দেখি খড়িমাটিতে মেয়েলি হাতে লেখা—"পাইস হোটেল"! ফিরে চলে যাওয়ার মতন অপরিচয়ের গণ্ডি কোন মুহূর্তে হারিয়ে গিয়েছে জানি না, রুদ্ধ ক্রোধের আবেগে পা দিয়ে অপমান করে মুছে দিতে পারতাম পিঁড়ির উপর দাঁড়িয় দাঁড়িয়ে অপমানসূচক ঐ কথাটা, তবে হয়তো গীতার পরাজয় হোত, কিন্তু পরিবর্তে নিজের পরাজয়টাই স্বীকার করে নিলাম। নত মুখে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে খেতে বসলাম। মনে পড়ে, ইলিসমাছের ঝোল পরিবেশনের সময় খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেছিল—"রাগ করেছেন? উঠুন একটু, মুছে দিচ্ছি পিঁড়ি আঁচল দিয়ে।"

সংসারে স্নেহ, মায়া, মমতার জালে মানুষ পড়ে সেবায়, আদরে, যত্নে, প্রীতিতে, আপ্যায়নে; কিন্তু অপমানেও যদি ধরা দেয় তবে বুঝতে হবে সবার উপর যে জন বসে মন নিয়ে খেলা করে তিনি অনন্ত লীলাময়।

আর যাইনি ও বাড়িতে। সে রাতে বোকনদা অনেকটা পথ আমার বাড়ির দিকে পেঁাছে দিয়ে গেল আমিও তাকে পেঁাছে দিতে তাদের বাড়ীর দিকে গেলাম—এমনি করে চার প্যাকেট সিগারেটের আগুন আস্তে আস্তে নিভে গেল। স্নিগ্ধ শুকতারাটি তখন কাঁঠালি চাঁপা গাছের ওপর নূতন দিনের উষার আলোককে পূব গগনে ডাকতে লাগলো। চোখ টিপে টিপে, হাসিতে, ইসারায়। জানতে পারলাম বোকনদার মামাতো বোন গীতা ওদের ওখানে থেকেই মানুষ। সহোদরার চেয়েও সে বেশী আপন। মামা ছিলেন রেল কর্মচারী কোলাঘাট স্টেশনে রূপনারায়ণের পাড়ে। পাঁচ বছর বয়সে গীতা পিতৃহীনা। হঠাৎ এক রাতে কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে বাড়িতে এসে বল্লেন বুকটা কেমন করছে তারপর ডাক্তার আসবার পূর্বেই সব শেষ হয়ে গেল। বিধবা মা তের বছর গীতাকে নিয়ে এই বাড়িতে আছেন কিন্তু কেউ তাঁর নিরলঙ্কার হাতখানাও একদিনের জন্য দেখতে পায়নি। জীবনটাই রান্নাঘরে কেটে গেল সবার সেবা যত্নে। দূর থেকে আমিও তাঁকে প্রণাম করে ভোরের দিকে বাড়ি ফিরে এলাম। আর যাইনি। ওরা সবাই ছ্যাবলা, বিশেষ করে শোকের ছায়ায় চিরদিন মানুষ হয়ে কেমন করে হাসি ঠাট্টার ঝরণা হয়েছে ভাবতে অবাক হয়ে যাই—ঐ গীতাটা।

আর খবর নেবার আমার সময় নেই, অফিসে আমার পরিবর্তে উপযুক্ত লোকটা তখনও এসে পেঁাছালো না, কিন্তু কাজ দ্বিগুণ বেড়েছে। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে, একটু আগে বৃষ্টি থেমেও ইলসা গুঁড়ি ঝির্ ঝির্ করে মাঝে মাঝে পড়ছে। ভাদ্র পূর্ণিমার ঝুলনে ছুটি নেই—নূতন গভর্নমেন্টের কাজ—করতে হবে যতক্ষণ না ছাড়ে। চারিদিকে টেবিলের উপর কাগজ বোঝাই আরদালি চাপরাশি সব পালিয়েছে টেবিলে পড়ে আছে টাইপ করার মেশিন, নথিপত্র দলিল ফাইল ছড়াছড়ি, সারাদিনের উকিল মোক্তার মক্কেলের পায়ের ধূলোতে মেঝেটা ধূলিময় হয়ে আছে। কমনীয়তার স্পর্শ কোথায়ও নেই। ফৌজদারীর বড় অফিসে জঘন্য এর আবহাওয়া। বড় বড় দরজা লোক ঢুকলে রাতে প্রথমটা চেনাই যায় না। কেবল মাত্র আমার টেবিলের উপরে আলো জ্বলছে।

"বাবা রেঃ হাকিমের চেয়ে কেরানী বড়—এত কাজ।"

"অ্যাঁ!"

মুখ তুলে দেখি দুলু, জয়ন্ত, দানি। গীতার হাতে পেয়ালা একটা পিরিচ দিয়ে ঢাকা আছে।

"শিগ্গির নিন্ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হয়তো।"

"একি তোমরা এখানে যে?" বলেই আরো বিস্মিত হয়ে গেলাম। গীতার পিঠের উপর ঘোমটা ফেলা, সিঁথিতে টকটকে সিন্দুর।

জয়ন্তী আমার মনের প্রশ্নের জবাব দিল, "গীতার মঙ্গলবারে বিয়ে হয়ে গেল হঠাৎ। আগেই কথাবার্তা চলছিল ওরা মেয়ে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিল।"

"ওঃ তা বেশ! এ কদিনেই অনেক পরিবর্তন।"

গীতা আর চুপ করে থাকতে পারলে না, বল্লে, "নাগো মশায় আমাদের অত পরিবর্তন হয় না আপনাদের মতন। এ কদিন যান নি কেন পাইস হোটেলে? নিন্ খান শিগ্গির ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমাদের অনেক কাজ আছে।"

পিরিচটা তুলেই মুখের পানে চাইলাম, চা নয় ঘন দুধ তার উপরে সরের ফেনায় পুট্ পুট্ শব্দ হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "এর মানে?"

"সেদিন যে বলেছিলেন চা খান না।"

অভিভূত হয়ে মাথা নীচু করে ভাবলাম একি স্নেহ, একি মমতা! বাঙলা দেশের সব ঘরেই কি এমন করে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা পরিচয় অপরিচয়ের গণ্ডী লঙ্ঘন করে যায়, বয়েসের তারতম্য মানে না, স্থানকালপাত্র ভুলে যায়। বাপের বাড়ি, বিয়ে হয়ে গিয়েছে হয়তো ঘোমটা না দিয়েও পথ চলা যায়; কিন্তু ফৌজদারী অফিসে বৃষ্টির মধ্যে ছুটে এসে একি পরের জন্য অনাবিল স্নেহস্রোত! আমরা পর, গোলাপি কাগজে সই দিয়েছি পশ্চিম বঙ্গে চলে যাবো—কিন্তু এরা তো রয়ে যাবে এদেশে!

"ফেলতে পারবেন না, খেতে হবে, শিগ্গিরি নিন্।"

বল্লাম, 'না গীতা ফেলবো না।' ধর্মে যার মতি গতি নাই সেও চরণামৃত হাতে নিয়ে ঘ্রাণ পায় সুরভির, ঘোলাটে গঙ্গাজলে, শত রোগের বীজাণু আছে জেনেও হাতটা মোছে মাথার চুলে। জীবনে আমার কোন বন্ধনই নাই, তবু ঐ দুধটুকুকে ফিরিয়ে দেওয়া আমার সাধ্যাতীত, হাসতে হাসতে ঠোঁটে তুলে প্রতি বিন্দুতে আস্বাদ পেলাম অনাস্বাদিত মায়া-মমতা-স্নেহের।

"জানেন ঠাকুরমা, বোকনদা' আমার বিয়েতে যায়নি রাগ করে।"

"কেন?"

জয়ন্তী বলে, "আশীর্বাদের টাকা থেকে গীতাকে দিতে বলেছিল টাকা।"

"কেন?"

"রূপোর সিগারেট কেস কিনবে, সিগারেট কিনবে, বাবুগিরি করবে, কত কি, তবে যাবে, আমি দিই নি—দেখুন তো 'ঠাকুরমা'; একি আবদার বোকনদা'র!"

"তা কোথায় গিয়েছে সে?"

"কে জানে, উধাও হয়েছে কোনখানে, হয়তো বড়দির শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়, সেখানে গিয়ে তার ঘাড় ভাঙ্গছে। 'ঠাকুরমা' চলুন না?"

"কোথায় গীতা?"

"একটা টেলিগ্রাম করুন কলকাতায়, ওখানে নিশ্চয় আছে, এই দেখুন আমি টাকা এনেছি। চলুন পোস্ট অফিস তো কাছেই।"

টেলিগ্রাম করে ওদের স্টেশন রোডের বাড়িতে পেঁাছে দিতে গিয়ে আবার আটকে পড়লাম। তারপর দিনে-রাতে, সকালে-বিকেলে পাইস হোটেল আমার চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

একদিন রাতে ঠাকুরমা'র ঝুলির গল্প

তখনও শেষ হয়নি, রাত এগারোটার গাড়ি স্টেশনে এলে তবে আমাদের খেতে বসতে হয়। বোকনদা'র যে খবর নাই, সে দুঃখের কথা আমাদের গল্পে, গানে, ধাঁধার উত্তরে, মনে হয়, সবাই ভুলে গিয়েছি। সামনের উঠানে কিসের একটা ছায়া পড়তেই চৌকী ছেড়ে সবাই হৈ-হৈ করে নেমে পড়লো—ওরে বোকনদা' রে! বোকনদা'। গীতা তাকে সার্টের কলার ধরে এনে আমার কাছে হাজির করলে।

"নিন্ ঠাকুরমা এর বিচার করুন—ইয়ারকী সব সময়, সবাইকে দেখুন তো কি ভাবিয়ে তুলেছিল।"

বোকনদা' একটুও বিচলিত নয়—ঘর্মাক্ত কলেবরে ধপাস্ করে চৌকীতে বসেই একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—"উঃ, ট্রেনে কি ভিড়!"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?"

"আর বলবেন না, যত ব্যাটা বিনে টিকিটের প্যাসেঞ্জার। চেকার নেই, রথের মেলা বসিয়েছিল গাড়িতে। সেকেণ্ড ক্লাসে এলাম, তবু বড্ড কষ্ট হয়েছে।"

"নাও এখন হাত-পা ধুয়ে এস। তা কোথায় গিয়েছিলে?"

"পুরী।"

"পুরীতে কেন?"

"গীতার জন্যে উপহার আনতে।"

"কি আনলে—কটাক দুল?"

"না, এই নে গীতা।"

গীতার আঁচলে পকেট থেকে মুঠো মুঠো সমুদ্রের ঝিনুক ফেলে দিতে লাগলে। তাকিয়ে দেখলাম গীতার হাসি, যেন সোনার মোহর কুড়োচ্ছে দিল্লীর বাদশাহের হাত থেকে। তার বোকনদা'কে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা বোকনদা', পুরীতে যেতে রাস্তায় কোলাঘাট পড়ে, তাই না?"

"হ্যাঁ, জানিস গীতা আসবার দিন খুব চাঁদের আলো ছিল, পূর্ণিমা-টুর্ণিমা হবে, কোলাঘাট স্টেশন ছাড়িয়ে রূপনারায়ণের পুলের উপর যখন গাড়ি উঠলো, দেখতে পাওয়া যায় রে সেই শ্মশান ঘাটটা। আমি জানালা দিয়ে চেঁচিয়ে বললাম—ছোট মামা! জানো তোমার গীতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

কি আত্মগোপন আনন্দে সবাই খিল খিল করে হেসে উঠলো জানি না, কিন্তু আমার গলার নীচে কোথায় ব্যথা করে উঠলো। কি ছ্যাবলা সবাই। আমার সংসারে কোথায়ও বন্ধন নাই, গোলাপি কাগজ আমার কাছে নিরর্থক, পূর্ব বা পশ্চিম বাঙলা আমার কাছে সবই সমান, তবু যাবার বেলায় হারানর কষ্টটা যা হয়, তারই দুঃখটা বুঝতেই হয়তো এই পাইস হোটেলটা ঈশ্বর সেদিন দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

এবার উপযুক্ত লোক আমার স্থানে এতদিনে এল। সুদীর্ঘ দিন আতিথ্য স্বীকার করেছি, প্রতিদানে তো কিছুই দিতে পারিনি। সামাজিকতার সুযোগ পেলাম। গীতার বিয়ের উপহার আমিও দেবো। একদিন গল্পের মধ্যে অজ্ঞাতে বলেছিল, কালো ঢাকাই শাড়ি খুব সুন্দর। বাজারের সব থেকে ভালখানাই এনে হাতে তুলে দিলাম—চিরদিন যেন পোষাকী কাপড় হয়ে বাক্সে থাকে 'ঠাকুরমা'র স্মৃতি'। কচিৎ কখনও জয়ন্তী বা দুলুর বিয়েতে পরবে পাট ভাঙবে না যখন-তখন।

সন্ধ্যায় গাড়ি পাকিস্থান ছেড়ে চলে যাবে, শেষ বেলার খাওয়াটা খেতে সুটকেস আর বিছানা বারান্দায় রেখে অবেলায় খেতে বসলাম। নতুন আনকোরা কালো ঢাকাই শাড়ি পরে গীতা পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজা দিল, পেট ভরে ইলিশ মাছ খেতে বললে কতবার। বোকনদা' ছুটে এসে বললে—"ঠাকুরমা আর নয় উঠে পড়ুন, সিগন্যাল ডাউন দিয়েছে।"

গীতা রেগে গেল। "বোকনদা' যেন কি! লোককে স্থির হয়ে খেতেও দেয় না।"

কাছেই স্টেশন, সবাই চললে সঙ্গে। গাড়ি দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফরমে। আর কি বলবার আছে, জিজ্ঞেস করলাম, "আজকেই শাড়িখানার পাট ভাঙলে?"

"চলে যাচ্ছেন এদেশ ছেড়ে, আর তো কোনদিন আসবেন না, দেখতেও পাবেন না যখন এ-শাড়ি পরবো—তাই, বুঝলেন তো?"

প্ল্যাটফরমের লোহার রেলিংয়ের ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দেখতে লাগলাম সারি সারি সজল চোখ তবু ঠোঁটভরা দুষ্টু হাসি। ধীরে ধীরে গোধূলির শেষে ট্রেনখানা ওদের সামনে থেকে সরে যেতে লাগলো।

গীতা জিব্ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে বললে, "গিয়ে কিন্তু চিঠি দেবেন।"

জয়ন্তী হাত তুলে বললে, "ঠাকুরমা, জয় হিন্দ্।"

জানালা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, রজনীতি যমের থেকেও পাষাণ, মানুষের গড়া দুর্ভিক্ষ দেখলাম, মানুষের গড়া এ বিচ্ছেদ হিন্দু-মুসলমানের ঘরে ঘরে চিরদিন হয়তো রয়ে গেল। এ-দুঃখ তো চেয়ে নেওয়া—ভাদ্রশেষের ধানের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, যুগ যুগ ধরে জননী তোমার যে শ্যামল অঞ্চল দেখেছি—তা আজ সন্তান হয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে চললাম। তবু সান্ত্বনা তাতে আছে, যদি তোমারই কোলে ভ্রাতৃরক্তে তোমার বসন আর সিক্ত না হয়ে ওঠে। ক্ষমা কোরো যেন।

কুমার নদীর পুল পার হতে জেলেদের ডিঙিগুলো আর শহরের শেষ প্রান্তটুকু নিমেষে আর একবার দেখে নিলাম—এ-দেশ আর আমার নয়। তবু সুখী। স্বাধীনতা আজ পেয়েছি। নিজের অজ্ঞাতে জানি না কখন জানালাতে থুতনীটা রেখে গীতার সেই গানের টুকরোটুকু আমিও গুণ গুণ করছি—"পাওয়া তো নয় পাওয়া।"

ঢাকায় হিন্দুদিগের জন্মাষ্টমীর মিছিল মুসলমানদিগের উপদ্রবে পথিমধ্যে ব্যাহত হওয়ায় ত্যক্ত হইয়াছে। ঢাকার যে ম্যাজিষ্ট্রেট নিশ্চয়ই প্রধান সচিব খাজা নাজিমুদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিয়া শোভাযাত্রার ছাড় দিয়াছিলেন, তিনি ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। করিবারই কথা। কারণ, উপদ্রবকারীরা বলিয়াছে, সত্য বটে দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীকাল হিন্দুরা এই শোভাযাত্রা পরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তখন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; পাকিস্থানে তাহাদিগের পূর্বসম্ভুক্ত অধিকার স্বীকৃত হইবে না।

পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানীতে যখন তাহার বিদেশী গভর্নর ও স্বদেশী প্রধান সচিবের উপস্থিতিতে উপদ্রব হইয়াছে, তখন পল্লীগ্রামে বা মফঃস্বলে কোন সহরে হিন্দুর ধর্মাচরণের স্বাধীনতা যে পাকিস্থান সরকার স্বীকার করিবেন না বা স্বীকার করিতে পারিবেন না, তাহা সহজেই মনে করা যায়।

সিন্ধু প্রদেশে একস্থানে ৪২টি শিখ পরিবারের মুসলমান হওয়ায় বিস্ময়ের কারণ কোথায়? পূর্ববঙ্গের কথায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছিলেন, দুর্ভিক্ষে বাঙলায় ৩০।৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু অপেক্ষা পূর্ববঙ্গে বলপূর্বক হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করায় তিনি অধিক বেদনানুভব করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, প্রাণভয়ে যেমন সর্বস্বান্ত হইবার ভয়েও তেমনই লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে পারে। সিন্ধুতে প্রধান সচিব খুরো জানাইয়াছেন, তথায় হিন্দু বা শিখদিগের ধন অন্যত্র প্রেরণের স্বাধীনতাও নাই। তাঁহার সরকার তথা হইতে ভারতবর্ষে অর্থাৎ হিন্দুস্থানে প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, সিন্ধু প্রদেশের ব্যবসা শতকরা ৯০ ভাগ হিন্দুদিগের হস্তে। হিন্দুরা যে ব্যবসা বন্ধ করিয়া সিন্ধু ত্যাগ করিবেন, তাহা হইবে না। জমী বা ব্যবসা হিন্দুদিগের দ্বারা ত্যক্ত বা বন্ধ হইলেই তাহা মুসলমানকে দিয়া—চাষ বা ব্যবসা চালাইবার জন্য সিন্ধু সরকার মুসলমানদিগকে আবশ্যক অর্থ প্রদান করিবেন। সেই অর্থ হিন্দুদিগের স্বর্ণ রৌপ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে কি না তাহা তিনি এখনও "প্রকাশ করিয়া" বলেন নাই, হয়ত তাহা "ক্রমশঃ প্রকাশ্য"। সিন্ধী (হিন্দু) ব্যবসায়ী কর্তৃক বোম্বাইএ প্রেরণের জন্য প্রেরিত ৪৫ হাজার তোলা রৌপ্য রপ্তানী বন্ধ করা হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পাঁচ দিনে করাচী হইতে আরও ১২ হাজার অমুসলমান জলপথে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। আর ট্রেণে স্থানাভাব হেতু সিন্ধুর হায়দরাবাদ হইতে যে পাঁচ হাজার "ভাইয়া" পদব্রজে যুক্ত প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে আটক করিয়াছেন।

পাঞ্জাবের সংবাদ—পূর্ব পাঞ্জাবের সরকার পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের মধ্যে ৬ লক্ষকে ৭ লক্ষ একর জমীতে বসতি করাইয়াছেন; এখনও ১৮ লক্ষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহারা আর আশ্রয় প্রার্থনা করিবে না; দেখা যাইতেছে পাকিস্থান পাঞ্জাব হইতে অন্ততঃ ২৫ লক্ষ অমুসলমান প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিতে পারিয়াছেন। বহু শিখ পরিবার যে সর্বস্বান্ত হইয়া একবস্ত্রে কলিকাতায় আসিয়াছেন, সে সংবাদ অনেকেই অবগত আছেন।

পাকিস্থান বাঙলা হইতে, প্রাণ, ধন, ধর্ম ও সকলের নিরাপত্তায় যে সকল হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় লইতে আসিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি পশ্চিম বঙ্গের সরকার কোনরূপ দায়িত্ব স্বীকার করিবেন না?

পশ্চিম বঙ্গেও যে পাকিস্থানের প্রশ্রয়প্রাপ্তির আশায় কিরূপ অনাচার সম্ভব হইতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জিলার সরকারের পক্ষে ৩ জন ধান্য সংগ্রহকারী—বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের জন্য ধান্যের সন্ধানে যাইয়া জলঙ্গী থানার এলাকায় রায়পাড়াগ্রামে কতকগুলি মুসলমানের সঞ্চিত বহু পরিমাণ ধান্য আটক করেন। নিরাপদে সেগুলি আনিবার জন্য তথায় ২ জন সশস্ত্র পুলিশ প্রেরিত হয়। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তাহারা রায়পাড়ায় উপনীত হইলে গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে সাদরে ডাকিয়া একটি মুক্ত স্থানে লইয়া যায় এবং ধান্য স্থানান্তর করিবার কার্যে সাহায্য করিবার প্রস্তাবও করে। দেখিতে দেখিতে মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত ৬।৭ শত মুসলমান সরকারের লোকদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে সঙ্গীনবিদ্ধ করে। কর্মচারীদ্বয়ের ৩টি দোনলা টোটা ব্যবহারের বন্দুক এবং কনষ্টেবল ২ জনের ২টি রাইফেল ও ৪০ রাউন্ড টোটা আক্রমণকারীরা কাড়িয়া লয়। তাহার পরে গ্রামের সব মুসলমান জরু-গরু-ধান সব লইয়া খালের পরপারে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত দৌলৎপুর থানার এলাকায় চলিয়া যায়। গ্রামের স্বল্পসংখ্যক হিন্দু অধিবাসী ঘটনার সময় সরকারী চাকরীয়াদিগকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলে আক্রমণকারী মুসলমানরা তাহাদিগকে ভয় দেখায়। মুসলমানরা চলিয়া যাইবার পরে হিন্দুরা আহত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দান করে।

দেখা গিয়াছে, আইনরক্ষক হইয়া আইন ভঙ্গকারী পুলিশ কর্মচারী হার্ডউইক, গফুর প্রভৃতিকে যে দণ্ডদান না করিয়া বিলাতে বা পাকিস্থানে যাইতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই এই সকল মুসলমানের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে মনে করিলে কি অসঙ্গত হইবে? দুষ্টের দণ্ডদান যদি সরকারের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে কি সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়? সেই জন্যই যখন জগাই ও মাধাই "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" করিয়া পরে মতি পরিবর্তন করে, তখন প্রেমাবতার চৈতন্য বলিয়াছিলেন বটে,—

"মেরেছ কলসীর কাণা
তাই বলে কি প্রেম দিব না?"

কিন্তু তাহাদিগের দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন—একজনকে নবদ্বীপের রাজপথে লুটাইতে হইয়াছিল, আর একজনকে স্নাতকদিগের বস্ত্র ধৌত করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব পাঞ্জাবের সরকার যে ২৫ লক্ষ অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থীকে বসতি করাইয়াছেন ও করাইতেছেন, তাহাতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আপত্তি করেন নাই—বোধ হয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর সম্মতিতেই তাহা হইয়াছে ও হইতেছে। অবশ্য গান্ধীজী এখনও পাঞ্জাবে গমন করেন নাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী বালকবালিকা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন—তাঁহাদিগকে কি আমরা কেবল ফিরিয়া যাইতেই সদুপদেশ দিয়া আমাদিগের কর্তব্য শেষ করিব? তাঁহারা কেন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারিব না? কলিকাতার বাহিরে জমী লইয়া যে ফাট্‌কা খেলা চলিতেছে; তাহাতে কত আগন্তুক পরিবার যে নিশ্চিত বিপদ জানিয়াও পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা নবদ্বীপাদি স্থানে অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যায়। স্থানীয় জমীদাররা লোকের দুঃখ দুর্দশায় বাণিজ্য করিয়া ধনী হইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সংবাদ আমরা সকলেই পাইতেছি। বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ প্রভৃতি দুঃস্থ পরিজনদিগকে যেমন বিনা সেলামীতে জমী দিতেছেন—তেমনই অধিকাংশ জমীদার জমীর মূল্য পূর্বের তুলনায় দশ

বিশ পঞ্চাশ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করিয়াছেন। সেলামীর উৎপাতও ভয়ানক। তাঁহারা দলিলে সেলামীর উল্লেখ করেন না—জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার করেন। পশ্চিম বাঙলার সরকার যে এই সকল অনাচার নিবারণের জন্য অর্ডিন্যান্স জারীর হুমকী দিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহারা যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়েন, তবে বহু ধনী "কলোনী" করিতে প্রস্তুত আছেন এবং বহু লোক সমবায় পদ্ধতিতে অনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন। যাহাতে "কলোনীর" মালিকরা অতিরিক্ত লাভ করিতে না পারেন, সেদিকেও সরকারকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি কথা বলিব—নূতন গ্রাম যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে —পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া রচিত হয়, সেদিকে মনোযোগ দিতে হইবে। মহীশূর দরবার যেভাবে "ললিতপুর" রচনা করিয়াছেন, তাহা বিবেচ্য। ফ্রান্স তাহার গ্রাম উন্নয়নের যে পরিকল্পনা করিয়াছিল, তাহা অধ্যয়ন করিলে আমরা উপকৃত হইতে পারিব, সন্দেহ নাই। গ্রামে যাহাতে পথ ভাল হয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে, জল নিকাশের সুবিধা করা হয়, স্যানিটারী প্রিভি ব্যবহৃত হয় এবং গ্রামে পরে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধা থাকে সে সকল বিবেচনা করিয়া—ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। গ্রামের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দান প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায় অবহিত হইতে হইবে।

পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল পরিবার কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্থান দানের কোন ব্যবস্থাও হয় নাই। ইহা দুঃখের বিষয়। পুনর্বসতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই শুনিতেছি। কিন্তু কার্যকালে কি দেখা যাইতেছে। শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় সাহায্যদান ও পুনর্বসতি বিভাগের ভার পাইয়াছেন। কমলবাবু সম্প্রতি পদত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে পদত্যাগ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন বিডন ষ্ট্রীটে ডালমিয়া কোম্পানীর গৃহের ঘর ত্যাগ করিয়া হাঙ্গামা বিধ্বস্ত বাগমারীতে যাইয়া বাস করিয়া আপনার কার্যে উৎসাহের পরিচয় দিয়াছিলেন—কয়দিন হইতে অনুরূপ অবস্থাপন্ন জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে রাত্রি যাপন করিতেছেন। বাগমারী অঞ্চলের কথায় তিনি বলিয়াছেন, সুরাবর্দীর "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" পূর্বে বাগমারী অঞ্চলে প্রায় ১৬ হাজার হিন্দুর বস ছিল। মাণিকতলা, মুরারিপুকুর, বাগমারী, খোট্টাবাগান অঞ্চলটি মুসলমানবেষ্টিত। "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" ফলে সকল হিন্দুই ঐ অঞ্চল ত্যাগ করেন (অবশ্য অনেকে নিহতও হইয়াছিলেন) এবং হিন্দুদিগের প্রায় ৪ শত কারখানা বন্ধ হয়। অধিকাংশ কারখানাই যে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি। কমলবাবু বলিয়াছেন, গত ১৮ই আগষ্ট তিনি যখন বাগমারীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন সব হিন্দুগৃহই শূন্য। কিন্তু এই এক মাসে তাঁহাদিগের শতকরা ২৫ জন ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, হিন্দুরা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেই চাহেন—ভয়ে ও অন্য কারণে আসিতে পারেন না। কমলবাবু ভয়ের কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই এবং মুসলমানরা যে অনেক গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া সেগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছিল মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের কৃপায় বিনা মূল্যে আহার্য পাইতেছিল, তাহারও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু তিনি অপর যে কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার জন্য কি সরকারকেই দায়ী বলিতে হইবে না? তিনি বলেন—

"ঐ অঞ্চলে অধিকাংশ গৃহেরই সংস্কার প্রয়োজন এবং সংস্কারের জন্য উপকরণের অভাবে সংস্কার সম্ভব হইতেছে না। যে সকল গৃহের সংস্কারের প্রয়োজন সে সকলের অধিকারীদিগের শতকরা ৭০ জন নিজ ব্যয়ে সংস্কার করিয়া লইতে সম্মত হইলেও উপকরণের অভাবে তাহা করিতে পারিতেছেন না।"

পশ্চিম বঙ্গের সরকার এজন্য কেন্দ্রী সরকারের দ্বারস্থ হইয়াছেন। কেন্দ্রী সরকার ভিখারীকে কি বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু অবস্থা যখন এইরূপ, তখন তাঁহারা কিরূপে লোককে ফিরিতে বলিয়াছেন? কাগজে উপদেশ প্রকাশ করিলে কার্যসিদ্ধি হয় না। শতকরা ৭০ জন গৃহস্বামী আপনাদিগের ব্যয়ে মুসলমান দুষ্কৃতকারীদিগের দ্বারা কৃতকার্যের পরেও আপনাদিগের গৃহ সংস্কার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু সে বিষয়ে সরকার অসহায়, ইহা কিরূপ অবস্থার পরিচায়ক? কারখানার অধিকারীরা কি সরকারের নিকট কোন সাহায্য পাইবেন?

যে সকল গৃহস্থ পূর্ব গৃহে আসিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা বাড়ী ভাড়া দিতেও অসম্মত। কমলবাবু ভয় দেখাইয়াছেন—তাঁহাদিগের মত পরিবর্তন না হইলে সরকারকে হয়ত আইন করিয়া তাঁহাদিগকে আসিতে বা বাড়ী ভাড়া দিতে বাধ্য করিতে হইবে। যে সকল গৃহের দ্বার জানালা খুলিয়া লওয়া হইয়াছে, সে সকল গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বাস করা যে ভয়ের কারণ, তাহাও যেমন সত্য—যাঁহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছেন বা যাঁহাদিগের আত্মীয়স্বজন নিহত ও আহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে নির্ভর হইতে বিলম্বও তেমনই অনিবার্য। মধ্যে যে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহাতেও প্রত্যাবর্তিত কেহ কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আজ তাঁহারা যদি দ্বিধায় বিচলিত হইয়া থাকেন, তবে তাহা যদি অপরাধ বলিয়া আইন করা হয়, তবে আমরা বলিব—

> "O! it is excellent
> To have a giant's strength; but it is tyrannous
> To use it like a giant."

এই সকল অঞ্চলে উপযুক্ত প্রহরীর ব্যবস্থা করা হইবে কি?

জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট সম্বন্ধে কমলবাবু বলিয়াছেন,—সে অঞ্চলে যে সকল হিন্দু বাস করিতেন, তাঁহারা অধিকাংশই ধনী। ধনী বলিয়াই যে তাঁহারা আক্রমণকারীদিগের বিশেষ লক্ষ্য হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, কলুটোলা, ফৌজদারী বালাখানা প্রভৃতি অঞ্চলে কত হিন্দু নিহত হইয়াছেন, তাহার হিসাব কে দিবে? কমলবাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, সে অঞ্চলে আর একজন হিন্দুও নাই—দেড় শতেরও অধিক বড় বড় বাড়ী শূন্য পড়িয়া আছে। হয়ত সে সকলে নিহত অধিবাসীদিগের রক্তের চিহ্ন এখনও বর্তমান। নোয়াখালীতে গান্ধীজী সেইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। কমলবাবু হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ সকল গৃহে ৪০ হাজার লোকের স্থান হইতে পারে অর্থাৎ এক একটি বাড়িতে প্রায় ২ শত ৫০ জন থাকিতে পারে। এই স্থানে পুনর্বসতি হইলে সহরের অন্যান্য স্থানে জনাকীর্ণতা হ্রাস পাইবে এবং ব্যবসা কেন্দ্র কলুটোলা অঞ্চল আবার "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম"পূর্ব অবস্থাপন্ন হইবে। বাড়িগুলি বাসযোগ্য আছে কিনা, সেগুলির সংস্কার জন্য উপকরণ কিরূপে পাওয়া যাইবে এবং হিন্দুদিগের নির্বিঘ্নতার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে, সে সকল সরকারকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। নহিলে সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে উপার্জনক্ষম স্বাবলম্বী করিতে না পারিলে যে পুনর্বসতির প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহা কমলবাবু বলিয়াছেন। সে বিষয়ে অনেকেই তাঁহার সহিত একমত হইবেন, সন্দেহ নাই। লোককে কাজ দিবার বা বৃত্তি দিয়া কাজের জন্য আবশ্যক শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা বাঙলা সরকার করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বাঙলা সরকার আসাম সরকারের সহিত একযোগে বাঙালীদিগকে নাবিকের কাজ শিক্ষা দিতেছেন। নদীমাতৃক পশ্চিমবঙ্গে কখনই তাহাদিগের কাজের অভাব হইবে না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যাঁহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছেন,

তাঁহাদিগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করিয়াছেন বা কি করিতেছেন?

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া বে-সামরিক সরবরাহ মন্ত্রী পর্যন্ত আর একদিকে তাঁহাদিগের উৎসাহের প্রশংসনীয় পরিচয় দিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী একটি ময়দার কলে যাইয়া মামুলী শ্বেত পাথরের গুঁড়া বস্তা বস্তা পাইয়াছেন—সরবরাহ মন্ত্রী (সমর ত এখন অভাবের সহিত—সুতরাং বেসামরিক যে অর্থে ব্যবহৃত তাহার আর সার্থকতা থাকিতে পারে না) সরকারী চাউলের গুদামে যাইয়া কর্মচারীদিগের ভাল চাউল মন্দ বলিয়া সস্তা দরে বিক্রয়ের চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছেন। এ সব সংবাদ এমনই নিত্যনৈমিত্তিক হইয়াছে যে, এ সকল আর বিস্তৃতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশের কারণ থাকিতেছে না। এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে কৌতূহল হয়—এ সকল কাজ পুলিশ করিতে পারিতেছে না কেন? আর সরকারী কর্মচারীরা যে সকল স্থানে অপরাধী সে সকল স্থানে মনে হয়—যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়ান" হইবে, সেই সরিষাই যদি "ভূতে পায়"—তবে উপায় কি? পুলিশ যদি অযোগ্য হয় ও অন্য কর্মচারীরা যদি অসাধু হয়, তবে ত If the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted?" এ বিষয়ে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়া যিনি বর্ধিত বেতন পাইতেছেন, তাঁহার যোগ্যতা কিরূপ?

বিস্ময়ের কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, প্রধান মন্ত্রীর অভিযানের পর প্রায় প্রতিদিন পুলিশ ময়দায় মিশাইবার জন্য সঞ্চিত তেঁতুল বীজের শ্বেতাংশ, পাথরের গুঁড়া প্রভৃতি আবিষ্কার করিতেছে। তাহারা কি তবে, এতদিন, প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল? যখন দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের সদস্যগণ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন কমিশনের সভাপতি সার জন উডহেড আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ কথা কি সত্য যে, চাউলে মিশাইয়া চাউলের ওজন বাড়াইবার জন্য কাঁকর আমদানী করা হইয়াছে এবং তাহা ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে? তিনি শুনিয়াছিলেন, হাওড়ার কাঁকর ব্যবসায়ীরা গুদামে কাঁকর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

যে সকল সরকারী কর্মচারী এইরূপ কার্যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে পদচ্যুত করা হইবে ও যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুর্নীতিদ্যোতক কাজের জন্য দায়ী, তাহাদিগকে দণ্ডিত করা হইবে—এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

আজ পুলিশ যে তৎপরতার পরিচয় দিতে চাহিতেছে, তাহা এতদিন মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য সর্পের মত নীরবে ছিল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন।

সরবরাহ বিভাগ যে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইতেছেন, তাহাতে যদি ত্রুটি দেখা যায়, তবে সে ত্রুটি সংশোধন করা কর্তব্য। কলিকাতার উপকণ্ঠ হইতে যে সকল দরিদ্র—অধিকাংশই স্ত্রীলোক—মাথায় বহিয়া দুই-এক সের চাউল বিক্রয় করিতে আনে, তাহারা কৃপার পাত্র—দণ্ডার্হ বলা যায় না। কারণ তাহারা অভাবের তাড়নায় আপনারা অনাহারে থাকিয়া আপনাদিগের চাউল বিক্রয় করিতে আসিয়া থাকে। তাহাদিগকে ধরিয়া পুলিশে দিলে বা চাউল কাড়িয়া লইলে, তাহাদিগের দুঃখ বাড়ানই হয়। তাহাতে বড় বড় কারবারীর চোরাকারবার বন্ধ হয় না। তাহাদিগকে ধরিতে হইবে। পুষ্করিণীতে কলমীর দামের একটি শাখা টানিলে যেমন দাম সরিয়া আসে, তেমনই একটা সূত্র পাইলেই তাহাদিগকে ধরা যায়। যেসব সংবাদ পাইয়া প্রধান মন্ত্রী ও সরবরাহ মন্ত্রী অপরাধী ধরিতেছেন, সে সকল সংবাদ কি পুলিশকে পূর্বে কেহ দেয় নাই?

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি কথা বলিতে চাই। পশ্চিম বাঙলার সরকার কি শুনিয়াছেন, বিহার হইতে চোরাকারবারীরা লরীতে কোলাঘাট পর্যন্ত গম প্রভৃতি আনিয়া তথা হইতে নৌকায় পূর্ব পাকিস্থানে চালান করিতেছে? সে সংবাদ যদি তাঁহারা শুনিয়া থাকেন, তবে সে বিষয়ে তাঁহারা কি আবশ্যক অনুসন্ধান করিবেন? পাকিস্থানীরা কিভাবে পশ্চিমবঙ্গ হইতে মাল সরাইতে সচেষ্ট, তাহার প্রমাণ রাণাঘাটে রেলওয়াগন ধরায় যেমন—সম্প্রতি জলপাইগুড়ীতেও তেমনই পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত অভাব দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। মন্ত্রীরাও সেই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য কি চেষ্টা হইতেছে? পশ্চিমবঙ্গের সরকার কাহাদিগকে পরিকল্পনা রচনার ভার দিয়াছেন এবং পরিকল্পনা রচনার কার্য কিরূপে অগ্রসর হইবে? পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর লোককে সঙ্গীত রসে মগ্ন হইতে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু—

"রাঙা অধর নয়ন ভালো
ভরা পেটেই লাগে ভালো;—
এখন পেটের মধ্যে নাড়ীগুলো
দিচ্ছে যে তাড়া!"

পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন বৃদ্ধির মূল্যবান সময় নষ্ট করা হইতেছে। সে দিকে দৃষ্টি প্রদান বিশেষ প্রয়োজন।

কেবল কথায়, বিবৃতিতে ও বক্তৃতায় কাজ অগ্রসর হইতে পারে না।

যে বিহারে নোয়াখালীর প্রতিক্রিয়া অতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল, তথায় মুসলিম লীগের নেতা সৈয়দ জাফর ইমাম ও সৈয়দ বদরুদ্দীন আমেদ এক যৌথ বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন,—মুসলমানরা তথায় বকর ঈদে গো-কোর্বানী করিতে বিরত থাকিবেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—যদিও বকর ঈদে গো-কোর্বানী মুসলমানদিগের বহুদিনের প্রথা, তথাপি, বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানদিগকে—বিশেষ বিহারের মুসলমানদিগকে গো-কোর্বানী বর্জন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। কাবুলের আমীর যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন বকর ঈদের সময় তাঁহার দিল্লীতে যাইবার কথা ছিল—দিল্লীর মুসলমানরা সেই উপলক্ষে বহু গো-কোর্বানী করিতে উদ্যত জানিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুর মনে বেদনা অনিবার্য; সুতরাং বকর ঈদে যদি একটিও গো-কোর্বানী হয়, তবে তিনি দিল্লীতে যাইবেন না। দিল্লীর মুসলমানরা তাঁহার কথাই শুনিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, ইরাকে গো-কোর্বানী হয় না—তথায় গরু পাওয়া দুষ্কর। কাজেই মনে হয়, গো-কোর্বানীই মুসলমানের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। গো-কোর্বানী লইয়া এদেশে কত অশান্তি ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

পাকিস্থানে এই অনুরোধ রক্ষিত হইবে কিনা জানি না। কারণ, হিন্দুর মনোভাব সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্নভাবে সচেতন থাকিলে ঢাকায় মুসলমানরা কখনই জন্মাষ্টমীর মিছিল বন্ধ করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিতেন না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে শহীদ সুরাবর্দী আজ গান্ধীজীর অনুরক্ত ভক্ত, তিনি, মিস্টার আক্রাম খান, মিস্টার আবুল হাসিম প্রভৃতি কি বিহারী লীগপন্থী নেতাদিগের মত আবেদন প্রচার করিয়া তাহার সাফল্য সাধনের জন্য আবশ্যক চেষ্টা করিবেন?

পশ্চিম বাঙলার সরকার বাঙলাকে সরকারী কাজে ব্যবহারের ভাষা করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বাঙলা ভাষা আজ সর্বভাব-প্রকাশক্ষম এবং ভারতীয় আর কোন ভাষাই সাহিত্যের ঐশ্বর্যে বাঙলার সহিত তুলিত হইতে পারে না। কাজেই বাঙলা ভাষা যাহাতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হয়, সে চেষ্টায় বাঙলার লোক নিশ্চয়ই বাঙলা সরকারের সাহায্যলাভের আশা করিতে পারে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান

সদস্যগণ কলিকাতার কোন হোটেলে আগা খাঁ মহাশয়কে সম্বর্ধিত করেন। সেই উপলক্ষে তিনি বাঙলার মুসলমানদিগকে বাঙলা ভাষার অনুশীলন করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যে সকল ভাষায় মানুষের উচ্চতম চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা যায়, বাঙলা সে-সকলের অন্যতম। তিনি বাঙলায় ইসলামের সংস্কৃতি মুসলমানদিগকে শিক্ষাদানের প্রয়োজনেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বাঙলাই বাঙলার মুসলমানদিগের মাতৃভাষা। অবশ্য নাজিমুদ্দীন দল ইহা স্বীকার করিবেন কি না, বলিতে পারি না।

এদেশে বাঙলাই যে সর্ববিধ শিক্ষার বাহন হওয়া সংগত ও প্রয়োজন, তাহা বহুদিন পূর্বে ডক্টর গুডীব চক্রবর্তী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, বাঙলায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থী-দিগকে বলিয়াছিলেন। তিনি বলেনঃ—

দেশীয় ভাষাই তোমাদিগের মাতৃভাষা। তাহা শিখিতে অধিক পরিশ্রম বা ব্যয় হয় না। কাজেই ব্যয়াল্পতা ও বুঝিবার সুবিধা মাতৃ-ভাষায় শিক্ষালাভের পক্ষে সমর্থক যুক্তি।

তখন তিনি দেশীয় ভাষায় ডাক্তারী পুস্তকের অভাবের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে অভাব অতি দ্রুত দূর হইতেছিল। দুর্গাদাস করের 'মেটিরিয়া মেডিকা', জহিরুদ্দীন আমেদের 'অস্ত্র চিকিৎসা', লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের 'চক্ষু চিকিৎসা'—এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ক্যাম্পবেল স্কুলেও ইংরেজী শিক্ষার বাহন হওয়ায় বাঙলায় রচিত ডাক্তারী গ্রন্থের অনাদর হইতে থাকে। পরিভাষার অভাব যদি অনুভূত হয়, তবে উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের চেষ্টায় সে অভাব দূর করিবার উপায় করিতে হইবে। হায়দ্রাবাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় তাহা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সে কাজে অনবহিত নহেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ একযোগে কাজ করিলে সে অভাব দূর করিতে বিলম্ব হইবে না। ইংরেজীতে বহু বিদেশী শব্দও গৃহীত হইয়াছে। বুয়র যুদ্ধের পূর্বে 'ক্লাম' শব্দ ও প্রথম জার্মাণ যুদ্ধের পূর্বে "কেমুফ্লাজ" শব্দ ইংরেজী অভিধানে স্থান পায় নাই। আমরাও "এঞ্জিন", "প্যান্ডাল" প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকি। পরিভাষার সমস্যা সহজে সমাধান করা যায়।

শুনিয়াছি, গান্ধীজীর মত এই যে, সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিবেন না—সে সকল প্রতিষ্ঠান বেসরকারী সাহায্যেই পরিচালিত হওয়া সংগত। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী যদি অবিচারিত চিত্তে সেই মত, বর্তমান অবস্থায় অনুকরণ করেন, তবে তিনি ভুল করিবেন। যতদিন সরকার সকল প্রকার শিক্ষা প্রদানের ভার গ্রহণ করিতে না পারিবেন, ততদিন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের কাজই করিতেছেন মনে করিয়া সে সকলকে আবশ্যক সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। তাহা না হইলে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীমতী অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত "নারী শিক্ষা সমিতি"র উল্লেখ করিতে পারি। সেরূপ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সরকারের কর্তব্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়।
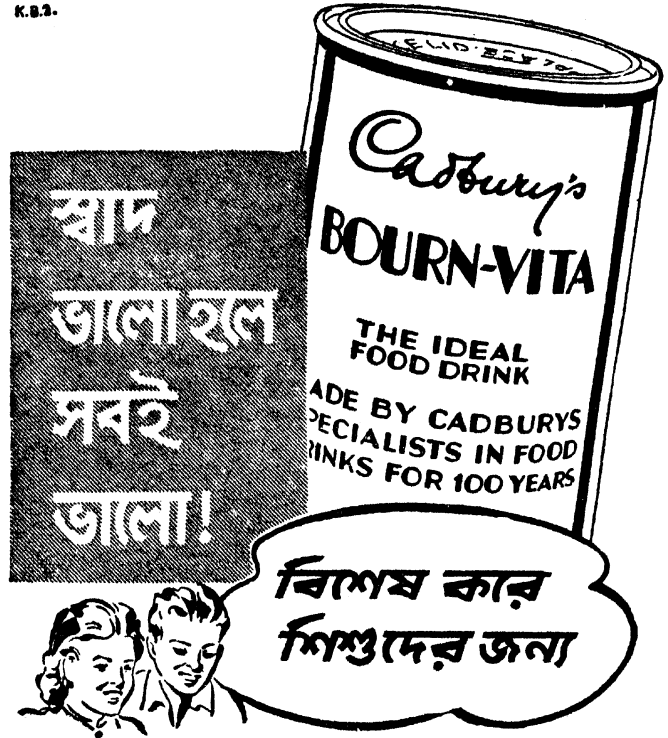
রক্ষামূলক ব্যবস্থার নীতিরীতি ও রহস্য

'বিশেষ রক্ষামূলক' (Special Protection) ব্যবস্থা করেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বাস্তব ক্ষেত্রে আদিবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে রক্ষা করতে পারেন নি। কালাহাণ্ডি রাজ্যের খোন্দ-সমাজ ১৮৮২ সালে কোল্‌টাদের (মহাজন) হত্যা করতে আরম্ভ করে, কারণ খোন্দদের জমি একে একে কোল্‌টাদের হাতে চলে গিয়েছিল। গঞ্জামের খোন্দদের জমি একে একে উড়িয়াদের হাতে চলে যেতে থাকে। বিশেষ রক্ষামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও আদিবাসীর জমি সুরক্ষিত থাকতে পারেনি। কেন এ রকম হলো? এ বিষয়ে শুধু মহাজন ও সাহুকারের লোভ এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই প্রশ্নের উত্তর হয় না। আদিবাসীর এই অর্থনৈতিক অধঃপতনের ব্যাপারে স্বয়ং আদিবাসীরও দোষ রয়েছে এবং 'বিশেষ রক্ষামূলক' ব্যবস্থাগুলির মধ্যেও ত্রুটি আছে।

১৯১৭ সালে ১নং মাদ্রাজ আইন (Madras Act I) পাশ হয়। এই আইনের অপর নাম—'এজেন্সি অঞ্চলের সুদ ও ভূমি হস্তান্তর আইন।

(Agency Tracts Interest & hand Transfer Act).

আইনের নির্দেশ ছিল—গভর্নরের এজেণ্টের অনুমতি ছাড়া আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন লোক জমি হস্তান্তর করতে পারবে না। আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন লোকের বিরুদ্ধে যদি কারও কোন মামলা করতে হয়, তবে এজেন্সি অঞ্চলের আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে; ডিক্রি পেলেও কেউ আদিবাসীর অস্থাবর সম্পত্তিকে ক্রোক করতে পারবে না। শতকরা ২৪ টাকার বেশী হারে সুদ আদায় করা নিষিদ্ধ হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই ধরণের রক্ষামূলক আইন কার্যক্ষেত্রে সার্থক হয়নি, কারণ কর্তৃপক্ষই এই আইনের নির্দেশগুলির মর্যাদা রক্ষা করেন নি। খোন্দ সমাজ মহাজনের কাছে চড়া সুদে দেনা করেছে, জমি বন্ধক দিয়েছে আর দরিদ্র হয়েছে। আদিবাসী অঞ্চলে বিশেষ রক্ষামূলক আইনের সাহায্যে আদিবাসীকে রক্ষা করার কাজে গভর্নমেণ্ট তাঁর অফিসারদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অফিসারদের আচরণ ছিল রক্ষামূলক নীতির বিপরীত। সরকারী অট্টালিকা নির্মাণে বা মেরামতের কাজে, সড়ক তৈয়ারীর কাজে এবং অফিসারদের মালপত্র বহনের কাজে মজুরকে কোন পারিশ্রমিক দেওয়ার নীতি সরকারী অফিসারেরা পালন করতেন না। 'বেগার' প্রথাকে (বিনা মজুরীতে লোক খাটাবার) একটা চলতি ও সংগত প্রথা হিসাবে সরকারী অফিসারেরা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সরকারী অফিসারের কাছে আন্তরিকভাবে রক্ষামূলক ব্যবস্থার ভরসা করা আদিবাসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আদিবাসীরা লক্ষ্য করেছিল, প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার ব্যবসায়ে সরকারী অফিসারেরাও কম যান না। সুতরাং অফিসার পরিচালিত রক্ষামূলক ব্যবস্থার ওপর আদিবাসীর পক্ষে কতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করা সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়। রক্ষামূলক ব্যবস্থা অথবা তপশীলভুক্ত অঞ্চলে অনুসৃত সরকারী নীতির ব্যর্থতার মূল কারণ এইখানে। ব্যবস্থার নীতি হয়তো ভাল ছিল, কিন্তু ব্যবস্থা প্রয়োগের ব্যাপারে দুর্নীতি ছিল। ১৯২৪ সালে গভর্নমেণ্ট এই কুপ্রথার উচ্ছেদের জন্য একটা সার্কুলার জারি করেন—সরকারী অফিসারেরা কাউকে বেগার খাটাতে পারবে না, খাটালে ন্যায্য মজুরী মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই সার্কুলারের দ্বারা অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি এবং এই কুপ্রথা আজও রয়ে গেছে।(১)

ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেসব সরকারী ব্যবস্থা ও আইন করা হয়েছিল তার কিছু পরিচয় এর আগে বিবৃত করা হয়েছে। কিন্তু এত ক'রেও আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার আদর্শটা বাস্তবক্ষেত্রে কেমন যেন কাগজে কলমেই রয়ে গেল। আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থার সত্যিকারের উন্নতি ব'লে কোন ব্যাপার সম্ভব হলো না। ১৯০৩ সালে আবার একটা আইন পাশ করা হয়—ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন (Chotonagpur Tenancy Act)। মানভূম ছাড়া ছোটনাগপুর বিভাগের সর্বত্র এই আইনকে কার্যকরী করা হয়। পাঁচ বছরের বেশী মেয়াদে ভূমি বন্ধক দেওয়া বা নেওয়া বে-আইনী করা হয়। প্রজার স্বার্থ ও স্বত্বকে জমিদারের অধিকার থেকে আরও বেশী সংরক্ষিত করে ১৯০৮ সালের ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়।

ভীল

ভীল সমাজের প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একই শাসন নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমে ভীলদের শান্ত করার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট 'ভীল এজেন্সি' স্থাপন করেন, এবং রাজমহলের পাহাড়িয়াদের সম্পর্কে যে ধরণের শাসন ব্যবস্থা ভীল সমাজের সম্পর্কেও সেই ধরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ী চাষী হিসাবে ভীলদের বসতি পত্তন করাবার চেষ্টা হয়, এবং ভীলদেরও বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হতে থাকে।(২) ভীলেরা অল্পদিনের মধ্যে ভূমি-প্রিয় চাষী হিসাবে স্থায়ীভাবে বসতি করে ফেলে। এর পরেই ভীল এজেন্সি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং অন্যান্য প্রদেশের প্রচলিত সাধারণ আইন ব্যবস্থা ও নীতির দ্বারাই ভীল সমাজও শাসিত হতে থাকে। আদিবাসী গোষ্ঠী হলেও, ভীলদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়নি, এবং এদের বসতি অঞ্চলকে তপশীলভুক্ত অঞ্চল বলেও ঘোষণা করা হয়নি। মাত্র মেওয়াসী উপগোষ্ঠীর অধ্যুষিত পশ্চিম খায়েসাকে ১৮৮৭ সালে তপশীলভুক্ত অঞ্চল করা হয়। তপশীলভুক্ত হলেও মেওয়াসী অঞ্চলের জন্য খুব বড় রকমের কোন 'বিশেষ ব্যবস্থা' করা হয়নি। ১৮৪৬ সাল থেকেই এই অঞ্চলে কতগুলি বিশেষ বিশেষ ফৌজদারী আইন ছিল, ১৯২০ সালে এই বিশেষত্ব বাতিল করে দিয়ে সমস্ত অঞ্চলকে সাধারণ ফৌজদারী আইন ও পুলিশী কর্তৃত্বের অধীন করা হয়। কতগুলি বিশেষ দেওয়ানী আইন মাত্র প্রচলিত থাকে। ১৯১৮ সালে গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, মেওয়াসি অঞ্চলে আবগারী আয় বাবদ যে টাকা উঠবে, তা সবই মেওয়াসিদের উপকারের জন্য ব্যয় করা হবে, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।

গোন্দ কোরকু এবং বৈগা গোষ্ঠীকে 'বিশেষভাবে রক্ষা' করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা

1. Report of the partially excluded Areas Committee (Orissa).

2. Brief Historical sketches of the Bhil Tribes—Cept D. C. Graham.

হয়নি, মাত্র মধ্যপ্রদেশের তিনটি জমিদারী অঞ্চলে করা হয়েছে। মিঃ উইলস্ (Mr. C. N. Wills) বলেন—ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর বিলাসপুরে জমিদারী অঞ্চল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েই ছিল। আদিবাসীরা ঝুম প্রথায় চাষ আবাদ করতো, কারণ জমির প্রাচুর্য ছিল এবং কোন প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু ১৮৯০ সাল থেকেই অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়, ব্যবসায়ী, মহাজন ও জমিদারের শুভাগমন হতে থাকে। গোষ্ঠীর সর্দার অথবা গ্রামের মোড়লকে কিছু পরিমাণ বিশেষ সুবিধা ও ক্ষমতা দিয়ে পর পর কতগুলি আইন জারি করা হয়। কিন্তু মাত্র এইটুকু বিশেষত্ব দিয়ে জমিদারী অঞ্চলের আদিবাসীর কোন উন্নতি হয়নি।

এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে আদিবাসীর গোষ্ঠীরা বহুসংখ্যায় বাস করে, কিন্তু এই সব অঞ্চলকে তপশীলভুক্ত অঞ্চল করা হয়নি। তবুও এইসব সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসী সমাজেরও কতগুলি বিশেষ সমস্যা যে আছে, সরকারী কর্তৃপক্ষ সে তথ্য জানতেন। ১৮৬৩ সালেই স্যার রিচার্ড টেম্পল্ আদিবাসীদের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে গেছেন।

পাহাড় ও অরণ্য অঞ্চলে যে স্বাভাবিক বা সহজ সম্পদ আছে, (Natural economy bills & forests")) সেটা সার্থকভাবে আহরণ করার কাজে আদিবাসীরাই প্রধান সহায়। আদিবাসীদের 'ঝুম' চাষের অভ্যাসকে উচ্ছেদ করার নীতি গৃহীত হয়, কিন্তু এবিষয়ে জবরদস্তি করা উচিত হবে না বলেই কর্তৃপক্ষ মনে করেন। কারণ, হঠাৎ একটা প্রাচীন উপজাতীয় অভ্যাসকে বন্ধ ক'রে দিলে আদিবাসীরা তাড়াতাড়ি লাঙ্গল প্রথা গ্রহণ করবে, এরকম আশা করা যায় না। বরং জবরদস্তী করলে ঝুম-চাষী আদিবাসীরা হয়তো জীবিকাহীন হ'য়ে লুঠতরাজ ও গরু চুরির বৃত্তি গ্রহণ করে বসবে।(১)

পূর্বে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আদিবাসীর জন্য 'বিশেষ রক্ষামূলক' ব্যবস্থা হিসেবে কতগুলি আইন করেছিলেন, যার সাহায্যে আদিবাসীদের জমি হাতছাড়া হবার পথ বন্ধ করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সব আইন ব্যর্থ হয়েছে। ফরসাইথ (Forsyth) স্বীকার করেছেন—"আইন ক'রে কখনো কোন অবনত জাতিকে উন্নত জাতির প্রতিপত্তি থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। বরং এইসব আইন প্রতিষ্ঠাভিলাষী (agressor) উন্নত সমাজের হাতেই একটা নতুন অস্ত্র হয়ে উঠেছে। আইন না করলে বরং আক্রান্ত সমাজ মুখোমুখি লড়াই করে তাদের অধিকার টিঁকিয়ে রাখতে পারতো। জমির দখলীস্বত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রবর্তিত আইনগুলির মধ্যেই ত্রুটি আছে। আদিবাসীদের প্রতি 'দায়িত্ব' পালনের জন্য যেভাবে আইনের প্রয়োগ হয়ে থাকে, তার মধ্যেও ত্রুটি আছে। আইনগতভাবে যা কিছুই করা হয়, দেখা গেছে যে শেষপর্যন্ত হিন্দুরাই আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সুবিধা পেয়েছে। বর্তমান অবস্থায় পুঁজিওয়ালা ধনী ব্যক্তি ছাড়া কারও সামর্থ্য নেই যে, পতিত জমিগুলি অধিকার করতে পারে, আদিবাসীদের এমন আর্থিক শক্তি নেই যে, তাহার দ্বারা পতিত জমি অধিকার সম্ভব হবে।......আর একটা কথা, দেওয়ানী মামলা বিচার করার আদর্শ (Civil Justice) যে পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হচ্ছে, সাধারণ প্রদেশগুলিতে হয়তো তার সার্থকতা আছে, কিন্তু অরণ্যের আদিবাসীর কাছে সেটা ন্যায়বিচারের পদ্ধতি তো নয়ই, বরং তার বিপরীত।"

এপর্যন্ত যেসব ভূমি আইনের উল্লেখ করা গেল, সেগুলি সবই প্রজার (আদিবাসী অথবা সাধারণ সমতলবাসী) স্বার্থ ও স্বত্বের জন্য করা হয়েছিল, অর্থাৎ জমিদার বা মহাজন যেন আদিবাসীর জমি সহজে গ্রাস না করতে পারে। এইসব আইনই ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কারণ, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এমন একটা ভূমি ব্যবস্থা করেছিলেন, যার দ্বারা জমিদার ও প্রজার স্বার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। জমিদারের স্বার্থ দেখলে প্রজার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এবং প্রজার স্বার্থ দেখলে জমিদারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট শুধু প্রজা-দরদী বা আদিবাসী-দরদী আইনই প্রবর্তন করেননি, জমিদার-দরদী আইনও সঙ্গে সঙ্গে চালু করে এসেছেন। হয়তো একেই বলে 'ব্রিটিশ-নীতি'। পরস্পর-বিরোধী দুই বিপরীত স্বার্থকেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আইনের সাহায্য দিয়ে এসেছেন। মধ্যপ্রদেশে ভূমিস্বত্ব আইনে (১৮৯৮) প্রজার স্বার্থ ও জমিদারের স্বার্থ উভয়ই বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোটনাগপুরে অক্ষম জমিদারী আইন (Chotanagpur emcumbured states act, 1876) স্থানীয় জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই প্রণীত হয়। ১৯১৬ সালে মধ্যপ্রদেশের ভূমি হস্তান্তর আইন (Land Alienation Act) পাশ ক'রে ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা হয়। তপশীলভুক্ত অঞ্চলেও এই আইন বলবৎ হয়, জমিদারের স্বার্থের জন্যই। মাত্র ১৯৩৭ সালে আদিবাসী প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই আইনের নির্দেশগুলি প্রয়োগ করা হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতির মধ্যে এই বিচিত্র ভেজাল থাকায় আদিবাসীদের সম্বন্ধে রক্ষামূলক আইনগুলির উদ্দেশ্য বাস্তবক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

১৯১৯ সালের শাসনসংস্কার ও আদিবাসী সমাজ

মাইণ্ড-চেম্সফোর্ড রিপোর্টের ওপর ভিত্তি ক'রে ১৯১৯ সালে ভারতের শাসন পদ্ধতিকে এক দফা সংস্কার করা হয়। উক্ত রিপোর্টে আদিবাসী সমাজ সম্বন্ধে 'বিশেষ ব্যবস্থার নীতি পূর্ববৎ বহাল থাকে। রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল যে—'আদিবাসী সমাজে এমন কোন মালমসলা নেই যার ওপর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করান যেতে পারে। ১৯১৯ সালের নূতন ভারত গবর্ণমেণ্ট আইনে বড়লাটের হাতেই আদিবাসী-অঞ্চলকে ইচ্ছামত অর্থাৎ বিশেষভাবে নির্বিশেষভাবে শাসন করার খাস ক্ষমতা দেওয়া হয়। পুরাতন তপশীলভুক্ত জিলা আইনে উল্লিখিত অঞ্চলের তালিকাটি পুনর্বিবেচনা করে, একটা নতুন 'অনগ্রসর' (Backward tracts) অঞ্চলের তালিকা তৈরী হয়। অনগ্রসর অঞ্চলকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) সম্পূর্ণভাবে শাসন-সংস্কার বহির্ভূত এবং (২) আংশিকভাবে শাসন সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চল।

নতুন অনগ্রসর অঞ্চলের তালিকা এই দাঁড়ায়ঃ—(১) লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম, (৩) স্পিতি, (৪) অঙ্গুল মিলা, (৫) দার্জিলিং জিলা, (৬) লাহোল, (৭) গঞ্জাম এজেন্সী, (৮) ভিজাগাপটম এজেন্সি, (৯) গোদাবরী এজেন্সী, (১০) ছোটনাগপুর বিভাগ, (১১) সম্বলপুর জিলা, (১২) সাঁওতাল পরগণা জিলা, (১৩) গারো পাহাড় জিলা, (১৪) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ব্রিটিশ অংশ (শিলং মিউনিসিপ্যালিটি ও ক্যাণ্টনমেণ্ট বাদে), (১৫) মিকির পাহাড়, (১৬) উত্তর কাছাড় পাহাড়, (১৭) নাগা পাহাড়, (১৮) লুসাই পাহাড়, (১৯) সদিয়া বলিপাড়া ও লখিমপুর সীমান্ত অঞ্চল।

অনগ্রসর অঞ্চলের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যায় তপশীলভুক্ত অঞ্চলের তালিকা থেকে সমস্ত অঞ্চলকেই এর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়নি। কিছু বাদ পড়ে গিয়ে প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের মধ্যে চলে গেছে। কিন্তু সাধারণ অঞ্চলের গণ্ডীর মধ্যে থেকেও কার্যতঃ সেসব অঞ্চলে ১৯১৯ সালের সংস্কার চালু করা হয়নি।

প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে অনগ্রসর অঞ্চলগুলি কতটুকু অধিকার লাভ করলো?

এবিষয়ে অনগ্রসর অঞ্চলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ—(১) কতকগুলি অঞ্চল একেবারেই কোন প্রতিনিধিত্ব লাভ করেনি, যথাঃ লক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, স্পিতি ও অঙ্গুল। (২) কতকগুলি অঞ্চলে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়, যথাঃ দার্জিলিং, লাহোল এবং আসামের সমগ্র

1. Aboriginal Tribes of the Central Provinces—Hislop.

অনগ্রসর অঞ্চল। (৩) কতকগুলি অঞ্চলে নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়, উপরন্তু কয়েকটি সরকার মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থাও থাকেঃ ছোটনাগপুর বিভাগ, সম্বলপুর জিলা, সাঁওতাল পরগণা, গঞ্জাম এজেন্সী, ভিজাগাপটম এজেন্সী ও গোদাবরী এজেন্সী।

অনগ্রসর অঞ্চলের ওপর প্রাদেশিক আইন-সভার অধিকার কতটুকু, তা এই শ্রেণী বিভাগ থেকেই বোঝা যায়। প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত ৪টি অঞ্চলে আইনসভার কোন অধিকার নেই, কারণ ঐ অঞ্চলের কোন প্রতিনিধিত্ব আইনসভার নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি আইন-সভায় আছে, সুতরাং এই দুই শ্রেণীর অঞ্চলের ওপর প্রযোজ্য আইন রচনার ক্ষমতা আইনসভার থাকা উচিত এবং আছেও। কিন্তু এ বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা সপরিষদ বড়লাট অথবা সপরিষদ গভর্নরের ওপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে। আইনসভায় গৃহীত আইনকে বড়লাট অথবা গভর্নর ইচ্ছে করলে প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন অনগ্রসর অঞ্চলেও প্রয়োগ না-ও করতে পারেন, অথবা কিছু রদবদল করে নিয়ে প্রয়োগ করতে পারেন।

তৃতীয় শ্রেণীর অনগ্রসর অঞ্চলকে যে ভাবে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, তাতে এই অঞ্চলে প্রাদেশিক গঠনসভা অথবা মন্ত্রি-মণ্ডলের অধিকার থাকার কথা। বিহার ও উড়িষ্যার অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে বস্তুতঃ মন্ত্রিমণ্ডলের অধিকার কার্যকরী হয়ে থাকে, সমস্ত প্রদেশের ক্ষেত্রে মন্ত্রিমণ্ডলী যেসব ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন, অনগ্রসর অঞ্চলেও তাই করে থাকেন—কাজের বেলায় বিশেষ কোন বাধা নেই। কিন্তু আসামের ক্ষেত্রে আবার একটা ব্যতিক্রম করা হয়েছে। বিহার-উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল অনগ্রসর অঞ্চল শাসনে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিচালনা করে থাকেন, আসামের মন্ত্রিমণ্ডলীকে ততটা সুযোগ কার্যক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি। গভর্নর নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এমন সব নির্দেশ বলবৎ করেছেন, যার ফলে অনগ্রসর অঞ্চলে মন্ত্রি-মণ্ডলের ক্ষমতা খুবই সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলতে পারা যায়, অনগ্রসর অঞ্চলের ওপর আইনসভার ক্ষমতাকে খর্ব করেই রাখা হয়েছে। দেখা যায় যে, অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য একটা সোজা সরল শাসন পদ্ধতি ১৯১৯ সালে এসেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পরিকল্পনা করতে পারেননি। কোথাও ডায়ার্কি (যেমন বিহার ও উড়িষ্যার অনগ্রসর অঞ্চলে), কোথাও আংশিক ডায়ার্কি (যেমন আসামের অনগ্রসর অঞ্চলে) এবং কোথাও একেবারে খাস গভর্নরী শাসন (আসাম উল্লিখিত ১নং থেকে ৯নং অঞ্চল)।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও আদিবাসী

১৯১৯ সালে ভারতবর্ষের জন্য একদফা শাসন সংস্কার করা হয়। এর পর ১৯৩৫ সালে আর এক দফা শাসন সংস্কার হয়। এই দুই শাসন সংস্কারের মধ্যবর্তী সময়ে আদি-বাসীদের উন্নতির জন্য বলতে গেলে আর কোন নতুন ব্যবস্থা বা আইন করা হয়নি। ১৯১৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত আদিবাসীদের জন্য প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে কতগুলি বিশেষ রক্ষামূলক ব্যবস্থা রেগুলেশন বা আইন করা হচ্ছিল, এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। রক্ষামূলক ব্যবস্থার মধ্যে প্রধানতঃ এবং একমাত্র আদি-বাসীদের জমি রক্ষার চেষ্টাই হয়েছিল। কিন্তু জমির ব্যাপার ছাড়া আদিবাসীদের যে আর কোন সমস্যা বা প্রয়োজন আছে এবং জমি রক্ষার পদ্ধতি ছাড়া আদিবাসীকে উন্নত করার আর কোন পদ্ধতি আছে, তা গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনার মধ্যে আসেনি। সম্ভবতঃ এদিক দিয়ে কোন চিন্তাই করা হয়নি।

প্রায় প্রত্যেক আদিবাসী অঞ্চলে রেগুলেশন বা বিশেষ আইনের সাহায্যে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দফায় দফায় জমি রক্ষার জন্য বা আদি-বাসীদের আর্থিক উন্নতির জন্য যে চেষ্টা হলো, তার ভাল-মন্দ পরিণামের পরিচয় সরকারী রিপোর্টের মধ্যেই পাওয়া যায়। ১৯১৭ সালে খোন্দদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে আইন হলো, ১৯৩৮ সালের উক্ত আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তদন্ত করে এক সরকারী রিপোর্টে বলা হলো যে, "সরকারী অফিসারেরা ঐ আইনকে ভালভাবে কার্যকরী করেনি। প্রত্যেকটি জরিপ ও বন্দোবস্তের সময় তদন্তের ফলে পূর্বে প্রচলিত রক্ষামূলক ব্যবস্থার ব্যর্থতা অথবা আংশিক সাফল্যের কথা স্বীকৃত হয়েছে। একটা আইন করে কিছুদিন পরেই সে আইনকে হয় সংশোধন করতে হয়েছে অথবা নতুন আইন করে আবার ভিন্ন ভাবে রক্ষামূলক ব্যবস্থা করতে হয়েছে। একই অঞ্চলে বার বার রক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন, এই ইঙ্গিত করে যে ব্যবস্থা-গুলি ঠিক প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি করতে পারেনি।

কোন ক্ষেত্রেই রক্ষামূলক ব্যবস্থা বা বিধান বা আইন আদিবাসীর উপকার করেনি, এ কথা অবশ্য সত্য নয়। দু'এক ক্ষেত্রে এর ফল ভাল হয়েছে। কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করলেই জানা যায় যে, নিছক সরকারী রক্ষা-মূলক বিশেষ আইনগুলির জন্যেই এ উন্নতি হয়নি, বে-সরকারীভাবেই এমন কতগুলি সামাজিক, আর্থিক বা শিক্ষার সুযোগ আদিবাসীরা এক্ষেত্রে পেয়েছিল, যার ফলে কিছু উন্নতি সম্ভব হয়।

সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীর অবস্থা

এইবার দেখা যাক, প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলে যেসব আদিবাসী বসবাস করে, তাদের অবস্থার কতটুকু উন্নতি বা অবনতি হয়েছে? আরও দেখতে হবে, সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীরা কি তপশীলভুক্ত বা অনগ্রসর অঞ্চলের আদি-বাসীদের তুলনায় বেশী দুর্দশা লাভ করেছে। আইনের দিকে তাকালে, সরকারী নীতির দিকে তাকালে এবং ইংরাজ নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ মহাশয়দের মতবাদের দিকে তাকালে, এই তত্ত্বই আমাদের মেনে নিতে হবে যে, সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীকে রক্ষিত (Protected) অনগ্রসর অঞ্চলের আদিবাসীর চেয়ে অবনত হতেই হবে। কারণ, সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসী সকলেরই মত সাধারণ আইনের দ্বারা পরিচালিত, বিশেষ রক্ষামূলক আইনের স্নেহ এখানে নেই। দ্বিতীয় কথা, সাধারণ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা হিন্দু সংস্পর্শও খুবই বেশী রয়েছে।

বাঙলা প্রদেশে সাধারণ অঞ্চলের অধিবাসী সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনকে সংশোধিত করা হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সাঁওতালদের প্রজাস্বত্ব রক্ষার জন্য এই আইনের সংশোধিত নির্দেশগুলি প্রথম প্রয়োগ করা হয়; পরে সুন্দরবন অঞ্চলেও চালু করা হয়। মধ্য ভূমি হস্তান্তর আইন (১৯১৬) বিশেষ আইন নয়। এই সাধারণ প্রাদেশিক আইন মাণ্ডলা জিলার আদি-বাসী এবং মেলাঘাট ও অমরাবতী জিলার আদিবাসীকে উপকৃত করেছে। মাণ্ডলা, মেলা-ঘাট ও অমরাবতী কোনটাই 'রক্ষিত' অঞ্চল নয়। মধ্যপ্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের লোকেরা রক্ষিত অঞ্চলের লোকদের চেয়ে আর্থিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বেশী উন্নত। বলাঘাটের লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাদনদাতা মহাজনদের 'বয়কট' করে সায়েস্তা করতে সমর্থ হয়। ১৯২০-২১ সালে নাগপুরের পতাকা সত্যাগ্রহে এবং ১৯২৩ সালের জঙ্গল সত্যাগ্রহে খোন্দ-সমাজ বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করে। দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ প্রাদেশিক আইনের সাহায্যে আদিবাসীদের উন্নতি করা সম্ভব হয়েছিল, এর জন্য তাদের তপশীলভুক্ত জেলা বা অনগ্রসর অঞ্চলে সাধারণ প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যাবার কোন অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল না। প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীরা সকল সাধারণ নাগরিকের মত সমান সুখে-দুঃখে ও সুযোগে জীবিকা নির্বাহ করেছে এবং তারা 'রক্ষিত' অঞ্চলের জাতভাইদের চেয়ে অবনত হয়নি।

তপশীলভুক্ত রক্ষিত অঞ্চল হয়ে সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার আদিবাসীর জমি রক্ষার সমস্যাকে অল্পবিস্তর সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করা যায়। কিন্তু ছোটনাগপুর বিভাগের

মানভূম, হাজারীবাগ ও পালামৌয়ের আদিবাসীরা বস্তুত ভূমিহীন দাসশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। এটা গভর্নমেণ্টেরই স্বীকৃতি (Report of the Indian Statutory Commissions.)

ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা তাদের জমি যখন হাতছাড়া করে ফেলেছে, তখন তাদের জমি বাঁচাবার জন্য বিশেষ আইন চালু করা হয় (১) এ থেকেই ধারণা হয়, রক্ষিত অঞ্চলে গভর্নমেণ্ট আদিবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য কি পরিমাণ তৎপরতা ও সম্বরতা দেখিয়েছেন।

সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসী ও রক্ষিত অঞ্চল

গভর্নমেণ্টের রক্ষিত অঞ্চলেই ঘন ঘন প্রজা-বিদ্রোহ হয়েছে। এর অর্থ রক্ষিত অঞ্চলের প্রজাদের অর্থাৎ আদিবাসীদের মধ্যে বার বার অসন্তোষের কারণ ঘটেছিল। এটা রক্ষিত অঞ্চলের বিশেষ শাসনের ব্যর্থতার প্রমাণ। রক্ষিত অঞ্চলে গভর্নমেণ্ট যে শাসন-নীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেটাকে মূলতঃ নেতিমূলক বা নেগেটিভ নীতিই বলা চলে। গঠনমূলক কোন নীতি তার মধ্যে ছিল না। শুধু নিষেধ করা, বন্ধ করা, বাতিল করা, রহিত করা ইত্যাদি। কিন্তু কোন সমাজের শুধু খারাপ প্রসঙ্গগুলিকে নিষেধ, বন্ধ বা বাতিল করলেই সুফল হয় না। সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা প্রচলন করা, গঠন করা এবং সৃষ্টি করাও চাই। কোন কোন বিষয়ে গভর্নমেণ্ট আবার নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছেন, ফলে যে অবস্থা সেই অবস্থা রয়ে গেছে। খোন্দ সমাজের ঝুম-চাষ প্রথাকে গভর্নমেণ্ট বন্ধ করলেন না। এটা উদার নীতি নয়। ঝুম চাষ বন্ধ করলে সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল পদ্ধতিতে খোন্দ সমাজকে শিক্ষিত করার যে পরিশ্রম, দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাট ছিল, গভর্নমেণ্ট সেইটাকে এড়িয়ে গেলেন। ছোটনাগপুরের কোয়োরা ও বিরহোরা আজও ভ্রাম্যমাণ বর্বর-দশায় রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভূমি বা এলাকা সংরক্ষিত করে চাষী হিসাবে বসতি করিয়ে দেবার চেষ্টা গভর্নমেণ্ট আজও করে উঠতে পারেননি। অপর দিকে তুলনা করে দেখা যায় যে, মধ্যপ্রদেশের বৈগাদের পক্ষে 'রক্ষিত অঞ্চলে' পড়বার অদৃষ্ট হয়নি। মধ্যপ্রদেশের গভর্নমেণ্ট তাদের নানাভাবে উন্নত হবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পেরেছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভীল-সমাজের পক্ষেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য, তারা 'রক্ষিত অঞ্চলে' পড়েনি বলে সাধারণ ভাবেই শাসিত হয়েছে এবং 'রক্ষিত অঞ্চলের' আদিবাসীদের চেয়ে তাদের অবস্থা উন্নত।

রাজমহলের পাহাড়িরা প্রায় দেড়শত বছর হলো 'রক্ষিত অঞ্চলে' থেকে অফিসারী শাসনের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যে দশায় আগে ছিল, আজও প্রায় সেই দশা। 'রক্ষিত অঞ্চলের' আদিবাসী খোন্দ সমাজও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মর্জির দ্বারা দীর্ঘকাল শাসিত হয়ে আসছে এবং কৃষি বা শিল্পে কোন কুশলতা আজও তারা লাভ করতে পারেনি। ১৯৩০ সালে বিহার-উড়িষ্যা গভর্নমেণ্টের রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে—"গত ৭০ বৎসরের মধ্যে সমগ্রভাবে আদিবাসী সমাজের চরিত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। আদিবাসীকে শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য কোন গঠনমূলক কাজ ভাল করে আরম্ভও হয়নি। (১)

Oraons of Chotenagpur.—S. C. Roy
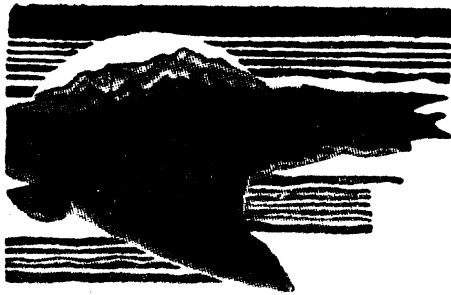
1. Report of the Indian Statutory Commission.

মালিক অম্বরের— —অভ্যুদয় ও পতন

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, পি-এইচ-ডি

(১)

আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁহারা গৌরবান্বিত করিয়াছেন, যাঁহাদের বীরত্বের কাহিনী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুখরিত এবং যাঁহাদের দেশসেবা ও প্রজাবাৎসল্য শত শত বর্ষ পরেও এ দেশে অমর হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে মালিক অম্বর অগ্রগণ্য। তাঁহার নশ্বর দেহ আমাদের মধ্যে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার সুশৃংখল কর্মপদ্ধতির ও অকৃত্রিম দেশসেবার কাহিনী এবং তাহাদের স্মৃতি এখনও দেশবাসীর মনে জাগরূক। তাঁহার মৃত্যুর ৬০ বৎসর পরে ভীমসেন নামে একজন মুঘল ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "যদিও মালিক অম্বর এখন জীবিত নাই তথাপি তাঁহার সৎকার্যের ও অশেষ গুণাবলীর সৌরভ সুগন্ধযুক্ত পুষ্পের ন্যায় চারিদিকে ভরপুর।" ভীমসেন ছিলেন দাক্ষিণাত্যের একজন মুঘল কর্মচারী এবং মালিক অম্বরের বিপক্ষীয় দলের। সুতরাং এইরূপ একজন লেখকের লেখনি হইতে বেশ বুঝা যায়, শত্রু ও মিত্র সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিল।

তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ভারতের বাহিরে কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মস্থল ছিল দাক্ষিণাত্যে, কাজেই আমাদের বাঙলা দেশ হইতে বহুদূরে এবং কিছুটা সেই কারণে কিন্তু বেশীর ভাগ অন্য একটি কারণে— ইতিহাসের অভাবে তিনি আমাদের নিকটে ছায়ার মতন ছিলেন। অনেক দুষ্প্রাপ্য পারশী, সংস্কৃত ও মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় লিখিত সমসাময়িক গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার কর্মবহুল জীবনের ও মূল্যবান কর্মধারার—কি উপায়ে অন্ধকার হইতে আলোর রেখাপাত করা হইয়াছে তাহার বিবরণ আমি ইংরাজি ভাষায় লিখিত মালিক অম্বর গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে তিনি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। জাতি-বর্ণনির্বিশেষে সকলেই তাঁহার আদর্শে ও মহানুভবতায় এতই অনুরক্ত ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর কয়েকশত শতাব্দী পরেও সেই পবিত্র স্মৃতি বংশপরম্পরায় দাক্ষিণাত্যের জনগণ অতি সমাদরে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিছুকাল পূর্বে পেশোয়া দপ্তর হইতে মালিক অম্বর সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান মিলিয়াছে— সেইগুলি হইতে বেশ বুঝা যায় তিনি হিন্দু প্রজাদের কি রকম ভালবাসিতেন ও সম্মান করিতেন। অপরদিকে তাঁহার মৃত্যুর পরে মারাঠাদের এমনকি রাজা শাহুর (Shahu) কার্যকলাপ হইতেও বুঝা যায় তাঁহারা মালিক অম্বর প্রদত্ত সনদগুলির প্রতি কি রকম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন এবং সেইগুলির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

যে কয়জন খ্যাতনামা ব্যক্তি দাক্ষিণাত্যে ইস্‌লামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মালিক অম্বর সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন ঐতিহাসিক তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। এইরূপ কোন ইতিহাসের হদিস মিলিলে হয়ত তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন খবর পাওয়া যেত। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সন্ধান পাই উহার বেশীর ভাগ মুঘল ও বিজাপুরী ঐতিহাসিকগণের লেখনী হইতে; মুঘল তাঁহার চিরবৈরী ছিল এবং বিজাপুরও জীবন সায়াহ্নে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। কিন্তু অন্য দলভুক্ত হইলেও এইসব ঐতিহাসিক তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু লিখেন নাই এবং তাঁহাদের লেখনী হইতেই আমরা তাঁহার সদগুণাবলীর পরিচয় পাই। ইহাতে মালিক অম্বরের কৃতিত্বই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়; কারণ, আচার-ব্যবহার ও কার্য দ্বারা তিনি সকলকেই এমনভাবে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। সর্বত্র সকলের নিকট হইতে সমভাবে এমন ভালবাসা ও সম্মান অর্জন করা খুব কম লোকের ভাগ্যে ঘটে—অন্ততঃ এইরূপ সাক্ষ্য ইতিহাস খুব কমই দেয়।

(২)

১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে একটি নগণ্য হাবসি পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার বাল্য-কালের বেশী সংবাদ জানার আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য হয় নাই, তবে এইটুকু আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সময়ে তাঁহার জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। যখন তাঁহার জীবন-প্রভাতে আমরা তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হই, তখন দেখিতে পাই তিনি খাজা বাঘদাদী ওরফে মিরকাশেম নামে এক ব্যক্তির ক্রীতদাস। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি সেই সময়ে দাস প্রথার খুব প্রচলন ছিল, কাজেই ভবিষ্যতের একজন অত বড় নেতা ও দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাকে প্রথম পরিচয়ে ক্রীতদাসরূপে পাওয়াতে কিছুই আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কারণ নাই। ইতিহাসে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাঁদের আমরা জীবনের প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাই ক্রীতদাসরূপে, কিন্তু তাঁহাদের দক্ষতায়, কর্মকুশলতায় ও অসাধারণ ক্ষমতার বলে পরবর্তী অধ্যায়ে দেখিতে পাই তাঁহারা কোন বিরাট দেশের নায়ক বা ভাগ্যনিয়ন্তা।

মালিক অম্বর কিছুকাল মিরকাশেমের কাছেই ছিলেন, পরে মিরকাশেম তাঁহাকে আহমদনগরের মন্ত্রী চেঙ্গিজ খাঁর নিকটে বিক্রয় করেন। চেঙ্গিজ খাঁর এক সহস্র ক্রীতদাস ছিল এবং অম্বর তাহাদেরই দলভুক্ত হইলেন। কিন্তু যদিও এক সহস্র ক্রীতদাসের মধ্যে তিনি একজন নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন তথাপি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির বলে তিনি তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে রাজকার্য পরিচালনা বিষয়ে অনেক কার্যের শিক্ষালাভ করেন। সাধারণ ক্রীতদাসের এইসব বিষয় জানিবার বা শিক্ষা করিবার অভিলাষ হইত না, কিন্তু তাঁহার মনে মনে তিনি বরাবরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন, তাই এইসব বিষয় জানিবার ঔৎসুক্য তাঁহার সব সময়েই ছিল।

চেঙ্গিজ খাঁ ছিলেন আহমদনগরের চতুর্থ রাজা মুরতাজা নিজাম সাহের (১৫৬৫—১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ) মন্ত্রী, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইনি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে অম্বর বড়ই বিপদে পড়িলেন, কিন্তু দুঃখেই যাঁর জীবনের প্রারম্ভ এবং সংগ্রামই যাঁর জীবনের একমাত্র সোপান তিনি কি প্রবল বাত্যাতাড়িত সমুদ্র দেখিলেই তরী উত্তাল তরঙ্গে ডুবাইয়া দিতে পারেন? তাঁহার ছিল অদম্য সাহস ও নিজ বাহুবলে বিশ্বাস, তাই তিনি কোন মতে প্রতিঘাতে ম্রিয়মান হইতেন না। বীরের মতন অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বকীয় চেষ্টায় কিছু-দিনের মধ্যেই একটি ক্ষুদ্র চাকুরীর সংস্থান করিলেন, সেইটি হইল আহমদনগর রাজ্যের সৈন্য বিভাগে একটি সাধারণ সৈনিকের কার্য। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁহার ভাগ্য এইরূপ

অপ্রসন্ন রহিল এবং তাঁহার উন্নতির কোন আশা-ভরসা দেখা গেল না। এদিকে আহমদ-নগর রাজ্যের অবস্থাও ক্রমে ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজার দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান আমির ওমরাহগণ কেবল নিজেদের স্বার্থের বশবর্তী হইয়া কার্য করিতে লাগিলেন এবং একে অন্যের ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। ফলে রাজ্যের ভিতরে অরাজকতার সৃষ্টি হইল এবং আমির ওমরাহগণের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে লাগিল। এইসব গোলযোগের মধ্যে যদি নিজের কিছু সুবিধা করিয়া লওয়া যায় সেইজন্য মালিক অম্বর এক একবার এক একজনের কাছে যাইয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সব যায়গাতেই তাঁহার সাধারণ সৈনিকের কার্যই করিতে হইল। ইহা অপেক্ষা ভাল চাকুরী কোথাও পাওয়া গেল না, কাজেই তিনি অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাহা হইলেও কর্ম হইতে বিরত হইবার পাত্র তিনি নন। আহমদনগর রাজ্যে সুবিধা হইল না দেখিয়া তিনি নিকটবর্তী বিজাপুর রাজ্যে যাইয়া চাকুরী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেখানেও ভাগ্য পরীক্ষায় জয়ী হইলেন না; সামান্য বেতনে ও নিতান্ত নগণ্যভাবে সেখানেও কাটাইতে হইল। অবশেষে ভগ্নমনোরথ হইয়া তিনি বিজাপুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আহমদনগরে আগমন করিলেন। তখনও সেখানে ভীষণ গোলযোগ চলিতেছিল। যে কয়জন আমির ওমরাহ তখন এই রাজ্যের ক্ষমতা দখল করার জন্য কলহে ও যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাবসী নেতা আহংগ খাঁ। মালিক অম্বর আহমদনগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া আহংগ খাঁর নিকটে চাকুরীর প্রার্থী হইলেন। তিনি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে সাধারণ সৈনিকের পদে নিযুক্ত করিলেন। এবার অম্বরের ভাগ্যও প্রসন্ন হইল এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি উন্নতি-লাভ করিলেন। তাঁহার কর্মদক্ষতায় সুখী হইয়া আহংগ খাঁ তাঁহাকে দেড়শত অশ্বারোহীর নেতার পদে উন্নীত করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি ঐ হাবসী নেতার অধীনে কার্য করিলেন না। নিজেই একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়া আহমদনগরে স্বকীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেশের ভিতরে যে অশান্তি বিরাজ করিতেছিল এবং রাজ্যের ক্ষমতা দখল করিবার জন্য আমির ওমরাহগণের মধ্যে যেরূপ ঝগড়া বিবাদ চলিতেছিল তাহাতে তাঁহারও বেশ সুবিধা হইল। তাঁহার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিবার মতন মন তখন কাহারও ছিল না, প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত ছিল। অপরদিকে মালিক অম্বরও তখন তাঁহার কাজ গুছাইয়া লইতে লাগিলেন।

(৩)

নিজেদের ভিতরে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হইয়া আমির ওমরাহগণের মধ্যে একজন অত্যন্ত সহায়হীন ও গুরুতর অবস্থায় পতিত হইয়া আহমদনগর দুর্গে অবরুদ্ধ হন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি মুঘলের সাহায্য ভিক্ষা করেন। মুঘলরাও ঐ রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, সুতরাং এই সুযোগ পাইয়া তাহারা উহা আক্রমণ করিল এবং ক্রমান্বয়ে দুইবার আহমদ-নগর দুর্গ অবরোধ করিল। প্রথমবার চাঁদবিবির অসাধারণ বীরত্বে ও কর্মতৎপরতায় দুর্গ রক্ষা পাইল, কিন্তু আহমদনগর রাজ্যের অধীন বেরার মুঘলদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল। দ্বিতীয়বার যখন মুঘলরা ঐ দুর্গ আক্রমণ করিল তখন চাঁদবিবি আর উহা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলেন না, কারণ রাজ্যের একটি বিরুদ্ধ দলের হস্তে তিনিই নৃশংসভাবে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যে মুঘলগণ আহমদনগর দুর্গ জয় করিয়া তরুণ নৃপতি বাহাদুর নিজাম শাহকে গোয়ালিয়রের কারাগারে বন্দী করিল (১৯শে আগষ্ট—১৬০০ খৃষ্টাব্দ)। আহমদনগর রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল এবং বিজিত অংশ বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশরূপে পরিণত হইল।

যখন মুঘল সেনাপতি খান্-ই-খানান আহমদনগর অবরোধ করিয়াছিলেন তখন মালিক অম্বর ঐ রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশের দস্যুতস্করদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই দুর্দান্ত লোকগুলিকে তাঁহার অধীনে আনয়ন করা, তাহা হইলে তাঁহার দল বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের নিকট হইতে কিছু যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া যাইবে। অবশেষে হয়রাণ হইয়া তাহারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল এবং তাঁহাকে তাহাদের নেতারূপে বরণ করিয়া লইল। ফলে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া আড়াই হাজারে দাঁড়াইল এবং এইরূপে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে তাঁহার উৎসাহও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যখন যেখানে সুবিধা হইত, তখন সেইস্থান হইতে লুণ্ঠন করিয়া খাদ্য-সম্ভার, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি বলপূর্বক হস্তগত করিতেন। ক্রমে তাঁহার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইল এবং সংগে সংগে তাঁহার সাহস আরও বাড়িতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া তিনি অতর্কিতে নিকটবর্তী বিদার রাজ্য আক্রমণ করিলেন; বিদারের সৈন্য-গণ এমনভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া যুঝিয়া উঠিতে পারিল না; প্রাণ ভয়ে কেহ কেহ মালিক অম্বরের সহিত যোগদান করিল, যাহারা বাকি রহিল তাহাদিগকে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন এবং কতকগুলি অশ্ব, হস্তী ও অন্যান্য জিনিসপত্র হস্তগত করিয়া সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আহমদনগর দুর্গ ও উহার চতুষ্পার্শ্বের স্থানগুলি দখল করিয়া মুঘলগণ যখন ঐ রাজ্যের অন্যান্য স্থানগুলি দখল করার জন্য ব্যস্ত ছিল, তখন মালিক অম্বর সুযোগ মতন তাহাদের বাধা দিতে লাগিলেন ও তাহাদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি লুণ্ঠন করিতেন। তাঁহার প্রতি ভাগ্যদেবীও এই সময়ে সুপ্রসন্না ছিলেন এবং প্রত্যেক কার্যেই তিনি সফলকাম হইতে লাগিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ছয় হাজার হইতে সাত হাজারে গিয়া দাঁড়াইল এবং ঐ রাজ্যের অনেক আমীর ওমরাহ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তখন তিনি আহমদনগরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন এবং ঐ লুপ্ত রাজ্যের অনেকাংশ তাঁহার করতলগত হইল।

(৪)

এতদিন তিনি যে আশার স্বপ্নজাল বুনিতেছিলেন, তাহা এখন সত্য সত্যই কাজে পরিণত হইতে চলিল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল আহমদনগরকে মুঘলের পরাধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া ইহার লুপ্ত শ্রী ও গৌরব পুনরুদ্ধার করা, কিন্তু এই কাজটি বড় সহজ নয়। প্রতি পদে বাধা ও বিপত্তি, দেশের ভিতরে ও বাহিরে চারিদিকে শত্রুর সমাবেশ। দেশের ভিতরে তাঁহার শত্রু ছিল অনেক। আমির ওমরাহদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সহিত যোগদান করেন নাই, তাঁহারা তাঁহার ক্রমবর্ধমান শক্তি ও ক্ষমতায় অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং কি করিয়া তাঁহার পতন সম্ভব হয়, তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন অপরদিকে বাহিরের শত্রু ছিল আরও প্রবল পরাক্রমশালী—মুঘল। তাহারা আহমদনগর রাজ্যের সমস্ত স্থানগুলি একে একে দখল করার চেষ্টা করিতেছিল এবং কখন তাহারা তাঁহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে ধ্বংস করে সেই ভয়ে তিনি সর্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। আকবর তখন দিল্লীর মুঘল বাদশাহ, সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র নৃপতি তিনি, এমনকি দাক্ষিণাত্যেও কোন কোন স্থানে তখন মুঘল ধ্বজা উড্ডীয়মান। এই মহাশক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া যে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা মালিক অম্বর ভালভাবেই বুঝিতেন কাজেই তাঁহার পথ পর্বতের আঁকা বাঁকা পিচ্ছিল পথের মতই বিপদসঙ্কুল ছিল; এক বার পদস্খলন হইলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তাঁহার মনের অসাধারণ বল, অদম্য সাহস, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি ধীরে ধীরে প্রতি পদক্ষেপে সফলতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সমস্ত

...ধ্য অতিক্রম করিতে লাগিলেন। দেশে তখন ...জা নাই; আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি রাজা ...লের বন্দী। কিন্তু রাজা বিহীন রাজ্যই বা ...ক করিয়া চলিবে এবং প্রজারাই বা কাহাকে ...নিবে? বহু আমীর ওমরাহ তখন রাজার ...য় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বসিয়াছিলেন, ...ন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ত রাজা নন, এবং ...জারাই বা তাঁহাদের রাজা বলিয়া কেন ...নিবে? মালিক অম্বর তাই চেষ্টা করিতে ...গিলেন কি করিয়া আহমদনগর রাজবংশের ...হাকেও এই শূন্য সিংহাসনে বসান যায়—...হাকে সকলে ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিতে ...রে। বহু চেষ্টার পরে এরূপ এক ব্যক্তির ...ন্ধান মিলিল। তিনি হইলেন আহমদনগরের ...জামশাহি বংশের দ্বিতীয় রাজা বুরহান ...জাম শাহের নাতি। বুরহান নিজাম শাহের ...ত্যুর পরে তাঁহার পঞ্চ পুত্রের মধ্যে সিংহাসন ...ইয়া বিবাদের ফলে এক পুত্র—হোসেন নিজাম ...হ রাজা হইতে সমর্থ হন এবং অবশিষ্ট ...ত্রদের মধ্যে শাহ আলি নামে একজন প্রাণ-...য়ে ভীত হইয়া বিজাপুর রাজ্যে চলিয়া যান। ...খন হইতেই শাহ আলি সেখানেই বসবাস ...রিতেছিলেন।

মালিক অম্বর যখন তাঁহাদের অন্বেষণে ...বৃত্ত তখন শাহ আলি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং ...াঁহার বয়ঃক্রম ৮০ বৎসর। সুতরাং তিনি ...াঁহার পুত্র আলিকে আহমদনগরের শূন্য ...সংহাসন পূর্ণ করিবার জন্য আহ্বান ...রিলেন, কিন্তু প্রথমতঃ তিনি মালিক অম্বরের ...থায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। ...বশেষে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস পাইয়া যখন ...তনি বুঝিতে পারিলেন যে, মালিক অম্বরের ...কান দুরভিসন্ধি নাই, তখন তিনি আহমদ-...গরের রাজা হইতে স্বীকৃত হইলেন। ...াহমদনগরের ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পরেন্দা ...ামক স্থানে খুব জাঁকজমকের সহিত ...ভিষেকের কার্য সুসম্পন্ন হইল এবং ...তনি মুরতাজা-শাহ-নিজাম-উল-মুল্ক উপাধিতে ...ষিত হইলেন। পরেন্দাকে রাজ্যের নূতন ...াজধানী করা হইল। মালিক অম্বর ...ধান মন্ত্রীর পদ অধিকার করিলেন ...বং নৃপতির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ ...দলেন।

তারিখ-ই-শিবাজি নামক গ্রন্থে মালিক ...ম্বরের অভ্যুদয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প ...লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সকলেরই জানিবার ...কৌতূহল হয়। অবশ্য ইতিহাস হিসাবে ইহার ...কোন মূল্য নাই, তবে মহৎ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ...প্রায়ই এইরূপ অলৌকিক গল্প বা কিংবদন্তি ...পাওয়া যায়, তাই বিশেষ করিয়া এখানে ইহার ...উল্লেখ করিব। এইরূপ কথিত আছে, যখন তিনি বিজাপুর হইতে দৌলতাবাদে* আসেন তখন তিনি ছিলেন একজন দরবেশ। ঐ বেশে পথের ধারে তিনি কোনও একটি দোকানে পা উঁচু করিয়া ঘুমাইতেছিলেন এমন সময়ে সবাজি অনন্ত নামে আহম্মদনগর রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পাল্কিতে চড়িয়া ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ মালিক অম্বরের দিকে নজর পড়াতে তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার পায়ে সৌভাগ্যের চিহ্ন রহিয়াছে। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, হয়ত ইনি নিজে একজন দলপতি অথবা কোন দলপতির পুত্র। তখন তিনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন এবং অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত তাঁহাকে আহমদনগর রাজ্যের নায়েব বা প্রতি-নিধির পদে অভিষিক্ত করিলেন।

ইহা যে একটি উপাখ্যান মাত্র তাহা পাঠ করিয়াই বুঝা যায়। একজন অজ্ঞাতকুলশীল ও রাজকার্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যে এত সহজে অত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে কেহ অভিষিক্ত করিতে পারে তাহা কেহ কখনও বিশ্বাস করিবে না।

মালিক অম্বরের যত্নে ও প্রচেষ্টায় রাজ্যে অচিরে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হইল, কৃষকগণ পুনরায় অবাধে চাষের উৎকর্ষ সাধনে মনঃসংযোগ করিতে পারিল এবং অশেষ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিয়া প্রজাগণ সরকারের প্রতি যে বিশ্বাস হারাইয়াছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

মালিক অম্বর ও রাজু

মুরতাজা শাহকে আহমদনগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পরে মালিক অম্বর অন্যান্য কাজের মধ্যে দুইটি বিষয়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তন্মধ্যে একটি হইল দেশের অপরাপর আমির ওমরাহগণকে তাঁহার পক্ষে আনয়ন করা অথবা যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহার বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং দ্বিতীয়টি হইল, মুঘলের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা ও তাহারা আহমদনগর রাজ্যের যে যে স্থান অধিকার করিয়াছে যতদূর সম্ভব তাহাদের পুনরুদ্ধার করা। কঠিন হইলেও এই দুইটি কার্যই বিচক্ষণতার রাজ্য বালির বাঁধের মতই যে কোন সময়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে।

আমির ওমরাহগণের মধ্যে কেহ কেহ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিস্তার করিয়া যেন স্বাধীন রাজার মত বিরাজ করিতেছিল। সকলেই যদি ঐরূপ স্বাধীনভাবে থাকে এবং নিজ মতানুসারে তাহাদিগকে আরও চলিতে দেওয়া হয়, তবে ঝগড়া-বিবাদ সর্বদাই লাগিয়া থাকিবে, দেশে বেশীদিন শান্তি রাখা সম্ভব হইবে না এবং তাসের ঘরের মত ঐ এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য... ভাঙিয়া পড়িবে; কাহারও কোন অস্তিত্ব... খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই সব আমির ওমরাহগণের মধ্যে তখন... সর্বকালের শক্তিশালী ছিলেন রাজু। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল রাজা প্রহ্লাদ, কিন্তু তিনি রাজা নামেই সকলের নিকটে সাধারণত পরিচিত ছিলেন। মুঘল সেনানী তাঁহাকে রাজার পরিবর্তে রাজু বলিয়া অভিহিত করিত এবং ইহা হইতেই ক্রমে তাঁহার নাম রাজা হইতে রাজুতে পরিণত হইল। তিনিও অম্বরের মত অতি সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় কর্মনৈপুণ্যে, অধ্যবসায়ে ও অসাধারণ ক্ষমতায় ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেন। অম্বর অপেক্ষা তাঁহার ক্ষমতা ও রাজ্য-বিস্তৃতি কম হইলেও উভয়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী ছিল না এবং অম্বর তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় করিতেন, কারণ প্রকৃত দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইলে কে যে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হইবে তাহা বলা কঠিন, তবে যুদ্ধ তাঁহাদের মধ্যে অপরিহার্য ছিল, কারণ একের স্বার্থ অপরের পরিপন্থী ছিল। বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া উভয়ের মধ্যে বেশীদিন নীরবতায় কাটিতে পারে না এবং কাটিলও না। অল্পকাল মধ্যে একটা বিবাদের কারণও ঘটিল। অম্বরের উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজা মুরতাজা শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে রাজুর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন—যাহাতে তাঁহার ক্ষমতা খর্ব করা যায়। অম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য রাজুও কোন একটা সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিলেন। রাজার আহ্বান লইয়া তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না এবং ত্বরায় পরেন্দা দুর্গে গমন করিয়া মুরতাজা শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও অম্বরকে দমন করিবার আশ্বাস দিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া অম্বর শত্রুর বিরুদ্ধে দ্রুতবেগে পরেন্দার অভিমুখে গমন করিলেন। কয়েকদিন পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে খণ্ড-যুদ্ধ ব্যতীত কোন বড় রকমের যুদ্ধ হইল না; উভয় পক্ষই বিপক্ষের সৈনিকদের গতিবিধির উপরে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিল যাহাতে কেহ কাহাকেও অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে না পারে। অম্বর শত্রুর অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া একটু বিচলিত হইলেন এবং ভাবিলেন হয়ত তাঁহার পক্ষে একাকী রাজুকে পরাস্ত করা সম্ভবপর নাও হইতে পারে, তাই তিনি মুঘলের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। মুঘল সেনাপতি খান-ই-খানান তাঁহাকে প্রয়োজনমত সাহায্য দান করিলেন এবং এইরূপে নববলে বলীয়ান হইয়া তিনি রাজুকে আক্রমণ করিলেন ও যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন; অনন্যোপায় হইয়া রাজু তাঁহার রাজধানী দৌলতাবাদে পলায়ন করিলেন।

কিছুদিন আবার নীরবে কাটিল, তারপরে

* আহমদ নগর রাজ্যের একটি শহরের নাম।

অপ্রস্তুত বুঝিয়া অম্বর আবার রাজুকে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। রাজু পরাস্ত হইয়া মুঘলের সাহায্য প্রার্থনা করিল; মুঘল সেনাপতি খান-ই-খানান ঈশ্বর তাঁহার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য দৌলতাবাদে গমন করিলেন। রাজুও আশান্বিত হইলেন, কিন্তু মুঘল সেনাপতি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও যুদ্ধে সহায়তা করিলেন না এবং উভয়পক্ষকেই যুদ্ধে বিরত হইতে বাধ্য করিলেন। অবশেষে মুঘল সেনাপতির অনুরোধে বাধ্য হইয়া অম্বর রাজুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া পরেন্দাতে ফিরিয়া গেলেন।

উপরোক্ত ঘটনার পরে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে অম্বর আহমদনগর রাজ্যের রাজধানী পরেন্দা হইতে পুনার উত্তরে জুনার নামক স্থানে পরিবর্তন করিলেন* এবং ইহার পরে তিনি রাজুকে পরাভূত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপরদিকে অত্যাচার ও কুশাসনের ফলে রাজু তাঁহার প্রজা ও সেনানী সকলের নিকটেই ভয়ানক অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার শাসনমুক্ত হইবার জন্য তাহারা ব্যগ্র ছিল। সেনানীর মধ্যে অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মালিক অম্বরের নিকটে গমন করিল এবং তাঁহার অত্যাচারের কাহিনী একে একে সমস্ত রাজার নিকটে বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে এই অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। ইহাতে অম্বরের খুব সুবিধা হইল, একদিকে তাঁহার দল পুষ্ট হইল এবং অপরদিকে রাজুকে আক্রমণ করিবার একটা সুযোগও মিলিল। তিনি রাজুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন; উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, কিন্তু নিজের দলের মধ্যে একতা ও সংগঠনের অভাবে রাজু নিজেকে বেশীদিন রক্ষা করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি ধৃত ও বন্দী হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দৌলতাবাদ ও ইহার চারিদিকের স্থানসমূহ যাহা এতদিন রাজুর অধীনে ছিল তাহা আহমদনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

বন্দী অবস্থায় রাজু জুনার ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে তিন চারি বৎসর কাটাইলেন। অবশেষে তাঁহাকে বন্দীশালা হইতে মুক্ত করিবার এবং দেশে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবার একটা ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি হয়—এই সংবাদ যখন অম্বরের নিকটে পৌঁছিল তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হইলেন এবং যাহাতে ইহা কার্যকরী না হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ ষড়যন্ত্রের উদ্ভব না হয় তজ্জন্য তিনি রাজুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

ইহার পরে মালিক অম্বরের পথ অনেকাংশে কণ্টকহীন ও প্রশস্ত হইল; অপরাপর যে সব দলপতি ছিল তাহাদিগকেও তিনি একে একে দমন করিলেন এবং পরে রাজ্যের ভিতরে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন শত্রু রহিল না যে তাহার কার্যে বাধা জন্মাইতে পারে। তৎপর তিনি বহিঃশত্রু মুঘলের বিরুদ্ধে আহমদনগরের শক্তি নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইলেন।

মালিক অম্বরের সহিত মুঘল ও বিজাপুরের সম্বন্ধ

স্বার্থের সংঘাতে অম্বরের সহিত মুঘলের বন্ধুত্ব স্থায়ী হওয়া অসম্ভব ছিল। যুদ্ধ উভয় পক্ষের মধ্যে লাগিয়াই থাকিত। যদি বা তাহাদের মধ্যে কখনও কিছুকালের জন্য যুদ্ধ-বিরতি হইত তাহা সাধারণত কোন এক পক্ষের সাময়িক পরাভবের জন্য এবং যখনই আবার বিজিত পক্ষের শক্তি সঞ্চয় হইত, সেই পক্ষ সুযোগমত আবার তাহার পরাভবের গ্লানি কাটাইবার জন্য এবং বিজিত স্থানগুলি পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তৎপর হইত। স্বকীয় স্বার্থ বলি দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। যতদিন অম্বরের সহিত রাজুর বিরোধ ছিল ততদিন মুঘলেরা এই অন্তর্বিবাদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া মাঝে মাঝেই অহমদনগর রাজ্যে অতর্কিতে আক্রমণ চালাইয়াছে এবং সম্ভবমত কোন কোন স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে তাহারা অম্বরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল; আহমদনগরের প্রায় দুইশত মাইল পূর্বদিকে নান্দের নামক স্থানে উভয় পক্ষে একটি প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, অম্বর নিজে আহত হন এবং অল্পের জন্য শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পান। তাঁহার সহচরগণ অসীম বীরত্বসহকারে তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে আহত অবস্থায় লইয়া পলায়ন করে।

মুঘলদের উদ্দেশ্য ছিল অম্বর ও রাজুর মধ্যে ঝগড়া ও অন্তর্বিরোধ জিয়াইয়া রাখা, কারণ তাহা হইলে যখন এইরূপ যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে উভয়পক্ষ দুর্বল হইয়া পড়িবে তখন সমস্ত আহমদনগর রাজ্য জয়ের পথ প্রশস্ত হইবে। যদি একজন অতিরিক্ত শক্তিশালী হয় তবে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা ও আয়ত্তে আনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইবে। অম্বরও মুঘলদের এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই রাজুর বিরুদ্ধে সময়োচিত আঘাত হানিয়া তিনি তাঁহার পথ পরিষ্কার করিয়া লন এবং মুঘলদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেন। সেই সময়ে তাঁহার ন্যায় নির্ভীক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনৈতিক দাক্ষিণাত্যে অপর কেহ ছিল না। মুঘলেরা ভালভাবে বুঝিয়াছিল যে, তাঁহাকে বশীভূত করা বড় সহজ নয়। তিনি যে অমোঘ-অস্ত্র মুঘলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা তিনি এই প্রবল পরাক্রমশালী ও দুর্ধর্ষ শক্তিকে দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তারে শুধু দমন করিয়া রাখেন নাই, অনেক বিজিত স্থান তাহাদের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন এবং এমন কি কোন কোন সময়ে আহমদনগর রাজ্য হইতে তাঁহাদিগকে বহুদূর পর্যন্ত বিতাড়িত করিয়া নিজের রাজ্যের যথেষ্ট বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। এই অভিনব অস্ত্র হইল গরিলা যুদ্ধ। ইহাতে সামনাসামনি যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না, অথচ প্রবল শত্রুসেনাকে কাবু করার পক্ষে ইহা যেমন কার্যকরী হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। এই যুদ্ধপ্রণালী অনুযায়ী এক একদল সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পাহাড় ও পর্বতের অন্তরালে সুবিধামত এক স্থানে অবস্থান করিতে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা অতর্কিতে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করে, তাহাদের ধনসম্পত্তি, সমরোপকরণ এবং খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি লুণ্ঠন করে। এইরূপ যুদ্ধ আহমদনগর রাজ্যে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল, কারণ উহার অনেকাংশ পাহাড়ে ও পর্বতে পূর্ণ, সুতরাং দেশের প্রাকৃতিক সাহায্য মালিক অম্বরের পক্ষে ছিল এবং যাহারা পদব্রজে বা অশ্বপৃষ্ঠে পাহাড়ে ও পর্বতে ত্বরিতবেগে আরোহণ ও অবতরণ করিতে খুব পটু, সেই নির্ভীক বীর্যবান মারাঠাগণও তাঁহার পক্ষে ছিল। তিনি এই মারাঠাদিগকে অধিক সংখ্যায় তাঁহার সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করিয়া নূতন সমর পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান করিলেন এবং তাহাদিগকে মুঘলদের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি শুধু এখানেই ক্ষান্ত থাকিলেন না নিকটবর্তী স্বাধীন রাজ্য বিজাপুরের সহিত সখ্য স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন—যাহাতে তাঁহার ও বিজাপুরের মিলিত শক্তি মুঘলের পক্ষে পরাজিত করা আরও কঠিন হয়। তখন বিজাপুরের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ। পাছে মুঘলেরা আবার কখনও তাঁহার রাজ্য দখলে প্রয়াসী হয়, সেই ভয়ে তিনিও সন্ত্রস্ত ছিলেন, সেই জন্য তিনি অতি সহজেই মালিক অম্বরের ডাকে সাড়া দিলেন এবং উভয়ের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিলেন। মালিক অম্বর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতে খাঁর সহিত বিজাপুরের একজন সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী আমিরের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন এবং এই বিবাহোপলক্ষে বিজাপুরে আনন্দোৎসবের খুব সমারোহ হইয়াছিল; চল্লিশদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল এবং বিজাপুরের রাজা স্বয়ং এই শুভকার্যে শুধু যোগদান করেন নাই, আশি হাজার টাকা কেবল

---

* ইহার পরে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদে এবং তাহার কিছুকাল পরে খিরকিতে তিনি রাজধানী পরিবর্তন করেন। এই খিরকির নাম পরে আওরংজেব আওরংগাবাদ রাখেন।

আতস বাজির জন্য সরকারী তহবিল হইতে তিনি খরচ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া অম্বর আহমদনগরের অনেকগুলি স্থান মুঘলের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু মুঘলেরা ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল এবং অনেক সৈন্যসামন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। এদিকে বিজাপুর প্রথমবার দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং পরে আরও তিন-চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার সাহায্যের জন্য পাঠাইল।

মুঘলেরা কোনমতেই তাঁহার সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তিনি সাধারণত সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া গরিলা যুদ্ধে তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন এবং আরও অনেকগুলি স্থানসহ আহমদনগর দুর্গ অধিকার করিলেন। এই বিরাট সাফল্যে আহমদনগর রাজ্যে অভূতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি হইল; চারিদিকে বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল এবং নিত্য নব উৎসবায়োজনে দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। অম্বরের খ্যাতি ও যশ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অপরদিকে পরাজয়ের অপমান মুঘলদিগকে তীরের মত বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা নব-সাজে সজ্জিত হইয়া আবার এই হাবসী বীরের বিরুদ্ধে ধাবমান হইল—তিনিও ইহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। বিজাপুর ব্যতিরেকে নিকটবর্তী আরও দুইটি স্বাধীন রাজ্য—গোলকোণ্ডা ও বিদারের সহিতও তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই সম্মিলিত শক্তিতে বলীয়ান হইয়া মুঘলের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। পূর্বের ন্যায় এইবারও তাঁহার গরিলা যুদ্ধে মুঘলদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল এবং অনেক সৈন্যসামন্ত হারাইয়া অবশেষে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল।

এখানে আমরা অম্বরের একটি সদ্গুণের পরিচয় পাই—এই যুদ্ধে আলিমর্দন খাঁ নামে একজন মুঘল বীর সেনাপতি আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয় এবং আহমদনগরের সেনানী তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দৌলতাবাদে লইয়া যায়। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অম্বর তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন এবং সেবাশুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলিমর্দন খাঁ কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শত্রুর প্রতি এইরূপ সুন্দর ও উদার ব্যবহার সেই যুগে আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই। এই উদাহরণ হইতেই বুঝা যায় যে, অম্বর বীরের প্রতি কিরূপ উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

এই পরাজয়ের সংবাদে তদানীন্তন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি নিজেই দাক্ষিণাত্যে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু তাঁহার পারিষদবর্গ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করাতে তিনি তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী একজন দক্ষ সেনাপতিকে পুনরায় অম্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাহারা দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া খিরকির অভিমুখে রওনা হইল।

অপরদিকে মালিক অম্বর বিজাপুর, গোলকোণ্ডা ও বিদার হইতে প্রয়োজনমত সামরিক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া খিরকিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কয়েকজন বীর সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য মুঘলের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। এই সেনানী মুঘলদিগের যতদূর সম্ভব লুণ্ঠনাদি দ্বারা উত্যক্ত করিতে লাগিল, কিন্তু এবার তাহারা কিছুতেই মুঘলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না এবং পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এই সংবাদ পাইয়া মালিক অম্বর তৎক্ষণাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে রওনা হইলেন এবং খিরকির নিকটবর্তী রোসলগড় নামক স্থানে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল; এইবার অম্বর জয়ী হইতে পারিলেন না, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি রণক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎগমন করিলেন, মুঘলেরা চার-পাঁচ মাইল পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু পরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল এবং সেই সুযোগে অম্বরও পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। (ফেব্রুয়ারী, ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে)

পরদিন মুঘলেরা খিরকিতে গমন করিল এবং কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া তাহারা ঐ সুন্দর শহরের অট্টালিকাগুলি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল এবং অগ্নিসংযোগে স্থানটি ভস্মীভূত করিল। জনকোলাহলপূর্ণ খিরকিপুর নির্জন শ্মশানে পরিণত হইল।

এই পরাজয়ে মালিক অম্বরের অতিশয় ক্ষতি হইল। তাঁহার সেনানীর মধ্যে অনেকে বন্দী হইল অথবা প্রাণ হারাইল এবং যাঁহারা ভাগ্যবশতঃ প্রাণ লইয়া পলাইতে সমর্থ হইল তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনেক সমরোপকরণ এবং অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতিও তাঁহার হারাইতে হইল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি দমিবার পাত্র নন; আবার নূতন উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন এবং অবস্থার উন্নতি করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এখনই মালিক অম্বর মুঘলের অধীনতা স্বীকার করিবে না ইহা তাহারাও বেশ জানিত। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীর আরও অধিক সমরায়োজন করিয়া রাজকুমার খুররমকে (পরে সাজাহান) দাক্ষিণাত্য অভিযানের সমস্ত ভারার্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ করিলেন। রাজকুমার বিজাপুর, গোলকোণ্ডা ও আহমদনগরকে বশে আনিবার জন্য প্রত্যেকের নিকটে দূত পাঠাইলেন। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা উভয়েই মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিল। মালিক অম্বর দেখিলেন এ সময় অত্যন্ত খারাপ, তাঁহার পক্ষে একাকী মুঘল, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব; তাই তিনিও মুঘলদের সর্ত মানিয়া লইলেন। তিনি যে সমস্ত স্থান মুঘলদের নিকট হইতে হস্তগত করিয়াছিলেন এই সর্ত অনুযায়ী সেই স্থানগুলি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইল। তাঁহার এইরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল সময় কাটান এবং আবার সুযোগ পাইলেই ঐসব সর্তে জলাঞ্জলি দিয়া সমস্ত স্থান পুনরুদ্ধার করা। কাজেও তাহাই হইল; শাজাহানের অনুপস্থিতির সুযোগে তিনি বিজিত স্থানগুলি মুঘলদের হস্ত হইতে পুনরায় অধিকার করিলেন এবং নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতরে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া বহু স্থান দখল করিলেন। মুঘলদের ভিতরে চারিদিকে এত ভীতির সঞ্চার হইল যে কেহ দুর্গের বাহির হইতে সাহসী হইত না। এই সব সংবাদে আবার শাজাহান ত্বরায় দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া অম্বরের গতিরোধ করিলেন এবং তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বিজিত স্থানগুলি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিলেন।

আবার নীরবে কিছুকাল অতিবাহিত হইল; পরিশেষে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতির একটা প্রকাণ্ড পট-পরিবর্তন হইল। যে বিজাপুর রাজ্য এতদিন অম্বরকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল এবং তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা এক্ষণে ছিন্ন হইল; এইরূপ হইবার কতকগুলি কারণ ছিল। আহমদনগর ও বিজাপুরের সীমানায় অবস্থিত কতকগুলি স্থান বিশেষতঃ সোলাপুর (Sholapur) দুর্গ লইয়া এই দুই রাজ্যের মধ্যে পূর্বে প্রায়ই ঝগড়া লাগিয়া থাকিত; এক্ষণে আবার নূতন করিয়া এই ঝগড়ার উৎপত্তি হইল। অধিকন্তু বিজাপুরের রাজা অম্বরের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কখনও অন্তরের সহিত খুসী হন নাই, কারণ সম-ক্ষমতা-সম্পন্ন অথবা অধিক ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী-রাজ্য সকল সময়েই পার্শ্বের অপরাপর রাজ্যের ভীতির কারণ হয়। এতদ্ব্যতীত বিজাপুর রাজ্যের অনেক আমির ওমরাহ অম্বরের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ছিল এবং তাহারা তাঁহার পতনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। মালিক অম্বর এবং বিজাপুরের রাজা উভয়েই তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুঘলের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু মুঘলেরা বিজাপুরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং অম্বরকে নিরাশ করিলেন।

সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া অম্বর গোলকোণ্ডার সহিত মিলিত হইলেন এবং বিপক্ষকে সুযোগ না দিয়া বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। বিজাপুর রাজ তাঁহার অগ্রগতি প্রতিরোধ

করিতে সমর্থ না হইয়া বিজাপুর দুর্গের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অম্বর দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মুঘলের সাহায্য বিজাপুরে পেঁাছিল এবং তাহারা অম্বরকে বিজাপুর আক্রমণ বন্ধ করিতে এবং পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিল। অগত্যা তিনি আহমদনগরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। তিনি পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মুঘল ও বিজাপুরের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি ভীমা নদী পার হইয়া আহমদনগরের প্রায় দশ মাইল দূরবর্তী ভাটোডি নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন। এখানে ভাটোডি নামক যে হ্রদ আছে ইহার নামানুসারে এই স্থানের নাম হইয়াছে ভাটোডি। ইহার পূর্বদিকে কেলি নদী প্রবাহিতা; সুতরাং আত্মরক্ষার পক্ষে এই স্থানটি অতি সুন্দর। শত্রু সৈন্যের আগমনের পথ বন্ধ করিবার জন্য তিনি হ্রদের বাঁধ কাটিয়া দিলেন, জলে চারিদিক এত কর্দমাক্ত হইয়া উঠিল যে মুঘল ও বিজাপুরের সৈনিকগণের পক্ষে চলাফেরা অত্যন্ত কণ্টকর হইয়া পড়িল। ইহার উপর প্রবল বারিপাতের ফলে তাহাদের দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু তাহাদের চরম দুর্দশা হইল খাদ্যাভাবে। দিনের পর দিন অনেককে অনাহারে কাটাইতে হইল; বিজাপুর হইতে কিছু খাদ্য প্রেরিত হইল বটে; কিন্তু অম্বরের আক্রমণের জন্য ঐগুলি তাহাদের নিকটে পেঁাছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া অনেকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অম্বরের শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। এইরূপে অম্বরের সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মুঘল ও বিজাপুরের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল।

উভয় পক্ষ পাঁচ ছয় মাইল ব্যবধানে ছিল, আর অধিককাল এইভাবে কাটিল না এবং দুই পক্ষই রণসাজে সজ্জিত হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইল। কিন্তু মুঘল ও বিজাপুরীগণ অম্বরের প্রচণ্ড আক্রমণ বেশীক্ষণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না এবং পরাস্ত হইয়া তাহারা রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। কিন্তু অম্বর তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন এবং অনেককে ধৃত করিয়া বন্দী করিলেন। (অক্টোবর, ১৬২৪ খৃষ্টাব্দ)।

এই যুদ্ধে যে কয়জন সাধারণ সেনাপতি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাঁহাদের মধ্যে শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলা অন্যতম। অম্বরের পক্ষে এইভাবে দুইটি প্রবল পরাক্রমশালী সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করায় আহমদনগরের ইতিহাসে একটি নূতন যুগের সৃষ্টি হইল এবং ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন হইয়া দাঁড়াইল। হলদিঘাটের যুদ্ধ যেমন আজও প্রত্যেক রাজপুতের ধমনীতে ধমনীতে নবশক্তি ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে এবং মারাথনের যুদ্ধের স্মৃতিতে যেমন প্রত্যেক গ্রীকবাসীর হৃদয়ে নূতন বল ও উদ্দীপনার উন্মেষ হয়, তেমনি ভাটোডির যুদ্ধ আজও আহমদনগরবাসীর প্রাণে অভিনব উদ্যম ও আশার সঞ্চার করে।

একের পর এক বিজাপুরের অনেক স্থান অম্বর অধিকার করিলেন এবং আহমদনগরের বহু স্থানও তিনি পুনরুদ্ধার করিলেন। তাঁহার অগ্রগতি বন্ধ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না এবং এমনকি নর্মদা নদীর অপর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তিনি মুঘলদিগকে বিতাড়িত করিলেন। এক্ষণে তিনি দাক্ষিণাত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাশালী হইলেন এবং মুঘলদের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের আশা চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, কিন্তু তিনি ইহা আর কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না।

অম্বরের মৃত্যু ও সমাধি

১৬২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অশীতি বর্ষ বয়সে তিনি অমরধামে গমন করিলেন।

আহমদনগর হইতে বত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্বে আমরাপুর নামক স্থানে তাঁহার সমাধি এখনও বর্তমান। মালিক অম্বরের নামানুসারে এই গ্রামের আসল নাম হইল অম্বরপুর, কিন্তু লোকে ইহাকে অম্বরপুরের পরিবর্তে আমরাপুর উচ্চারণ করে বলিয়াই ইহা এখন আমরাপুর নামে পরিচিত। সমাধিটী খুব সাধারণ-রকমের, ইহাতে কোন প্রকার জাঁকজমক নাই; উপরে ছাদ নাই এবং ইহার কোন পার্শ্বে বাঁধান বেড়াও নাই, শুধু সমাধিটী অতি সাদাসিদেভাবে বাঁধান—ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে বার ফুট, প্রস্থে চারি ফুট ও উচ্চে আঠার ইঞ্চি এবং ইহার পশ্চিমে একটি ছোট অতি সাধারণ রকমের মসজিদ আছে।

সমাধান

শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়

[রবীন্দ্রনাথের "পলাতকা"র "নিষ্কৃতি" আখ্যানকে অবলম্বন ক'রে এই নাটক। "নিষ্কৃতি" কেন 'সমাধান হ'লো এবং তার পাত্র পাত্রীর নামগুলির 'সমাধানে' কেন পরিবর্তন ঘটলো, তার একটি কৈফিয়ৎ দরকার।

কবির লেখনীতে চরিত্রগুলি যেরূপ ব্যঞ্জনায় আচ্ছন্ন, নাটকে তাদের বাক্যবিন্যাসে ও পরিবেশ-চাতুর্যে স্পষ্ট ও প্রকট করতে হ'য়েছে। তা ছাড়া দু'একটি গৌণ চরিত্রেরও আমদানি রোধ করতে পারিনি।

কবির আখ্যায়িকায় যে-ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন নাটকের সারা অবয়বে তা প্রদীপ্ত। 'মঞ্জুলিকা'র ব্যথাবেদনাময় রূপটি নাটকে বিদ্রোহিনীর বিষ নিয়ে দেখা দিয়েছে "অঞ্জলি"তে। 'মঞ্জুলিকা'র পিতার অনিচ্ছাকৃত কপট প্রকৃতি "মনোমোহনে"র শঠতায় কিছু বেশি উগ্র হ'য়ে উঠেছে।—এই ধরণের রং দেওয়ার লঘুতা ও গুরুত্বের কারণে বিশ্বকবির আখ্যায়িকার নাম ও নাটকের চরিত্রগুলির নাম বদল করতে বাধ্য হ'য়েছি ব'লে মনে করি।

—নাট্যকার]

প্রথম অংক—প্রথম দৃশ্য

(মনোমোহনের বাড়ীর পিছন দিকের বাগান। সন্ধ্যা সমাগত। অঞ্জলি, সুলতা ও অরুণা। অঞ্জলিকে সাজানো শেষ হ'য়েছে।)

অরুণা—ওকি ভাই অঞ্জলি, তোমার মুখ এমন ভার কেন ভাই? আজ না তোমার আশীর্বাদ! এমন শুভদিনে মুখ ভার কেন ভাই? সাজানো বুঝি পছন্দ হয় নি? কেন ভাই শাড়ি তো ঠিকই পরিয়েছি। আজ কালকার এই তো ফ্যাশান: পেঁচিয়ে পরা।

অঞ্জলি—লতার সাজানো যার পছন্দ হবে না, তার উচিত পাছাপেড়ে শাড়ি পরে, পায়ে চারগাছা মল দিয়ে, সারকান মাকড়ি দুলিয়ে, নাকে একটা নোলক ঝুলিয়ে......

অরুণা—তবে মুখ ভার কেন ভাই? বরের বয়স বেশি ব'লে?

সুলতা—থাম-না অরু। কিই বা এমন বেশি বয়স!

অঞ্জলি—পুরুষ মানুষের আবার বয়স! পুরুষ, পুরুষ। তার আবার বয়স কি?

অরুণা—তবে মন খুসী নয় কেন ভাই?

সুলতা—তবে কি হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে এতোদিনের মা বাপের আদর ছেড়ে, এতোদিনের আমাদের ভালোবাসা ছেড়ে......

অরুণা—সে ভাই বিয়ের আগে অমন সকলকেই বলতে শুনেছি।

সুলতা—দেখ অরু, তুই চলে যা এখান থেকে। যতো সব বাজে মন খারাপ করা কথা বলবি।

অঞ্জলি—না লতা, মন খারাপ হয় না আমার। আমাদের আবার মন খারাপ কি বল?

সুলতা—থাক ওসব কথা। ওরা কখন আসবে অলি, জানিস?

অঞ্জলি—ঠিক জানি না।

অরুণা—অলির মা বলছিলো ঠিক সন্ধ্যের পরই। আচ্ছা লতা, বরের নাকি জমিদারী আছে?

অঞ্জলি—তা আছে। মাসিক তিনটি হাজার আয়। তাছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের হ'লেও প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়ে কেউ নেই।

অরুণা—তবে তো খুব জিতে গেলি দেখছি। আমাদের পোড়া বরাতে কি আছে কে জানে?

সুলতা—তোমার বরাতে বেশ পঁচিশ বছর বয়স, ধবধবে রং, বাপের এক রাশ টাকা, আর বউ বলতে বলতে অজ্ঞান........

অরুণা—হ'য়েছে হয়েছে। ...... অলির বরের ঠিক বয়স কতো ভাই?

অঞ্জলি—পঁচিশ নয়। (সুলতা অঞ্জলির মুখ চেপে ধরলো। অঞ্জলি মুখ সরিয়ে নিলো।) পঞ্চাশ।

অরুণা—আহা, ঠাট্টা: আমি যেনো বুঝি না?

অঞ্জলি—ঠাট্টা নয়, সত্যি। তা হোক্ পঞ্চাশ। আমরা মেয়ে। আমরা সেবা করবো, ভক্তি করবো, স্বামীর সংসার বজায় রাখবো, ছেলেমেয়ে সামলাবো—এই তো আমাদের কাজ?

অরুণা—শুনেছি নাকি একখানি গাড়ি আছে?

সুলতা—আরে গেলো; তোর যে নাল পড়তে লেগেছে। তবে ওর বরকে তুই-ই বিয়ে কর।

অরুণা—ইস্ অমন চিজ অলি বেহাত করবে কিনা।

অঞ্জলি—নিশ্চয় নয়। সে আমি প্রাণ থাকতে পারবো না, তুমি গিয়ে ওঁর পাকা চুল তুলে দেবে—সে আমি হ'তে দেবো না।

সুলতা—(ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট) অলি?

নেপথ্যে সারদা—লতা?

সুলতা—যাই মাসি মা।

নেপথ্যে সারদা—না, না, থাক। আসতে হবে না। গল্প কর। ওরা এলে ডাকবো (মনোমোহন এলেন।)

মনোমোহন—বাঃ, মাকে আমার চমৎকার মানিয়েছে। যেন ইন্দ্রানী। ইলারও যখন বিয়ে হয়, তখন তারও প্রায় এমনই বয়স। কিন্তু তাকে তো এমনটি মানায় নি। চমৎকার; চমৎকার!

অরুণা—ওটা সাজাবার গুণ মেসোমশাই।

মনোমোহন—নিশ্চয় মা নিশ্চয়। চমৎকার, সাজিয়েছো। কিন্তু তিন বন্ধুর একটি চলে যাবে। তোমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে ভালো হোতো। যাক আশীর্বাদ করি শিবতুল্য পতি লাভ করো। ...... আমি যাই অলি। তোরা গল্প গুজবে ওকে একটুখানি ভুলিয়ে রাখ মা। ...... মা আমার ঘর আঁধার করে চলে যাবে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে গেলেন। বাবলু এলো।)

বাবলু (অরুণাকে) মা তোমাকে ডাকছে দিদি। (ইতিমধ্যে অঞ্জলি তাকে কোলে টেনে নিয়েছে)।

অরুণা—কেন রে?

বাবলু—মা বললে তোমাকে আরো ভালো কাপড় পরতে হবে অলি দিদির আশীর্বাদে কতো সব লোক আসবে।

সুলতা—তাই বুঝি তুই প্যাণ্ট পরিস নি?

বাবলু—উঁহু। কালো পাড় ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী।

অরুণা—আসছি ভাই এখনি। মার হুকুম; শুনতেই হবে।

সুলতা—হ্যাঁ হ্যাঁ। খুব চটকদার সাজবি কিন্তু। (অরুণা ফিরে দাঁড়ালো)।

অরুণা—কেন?

সুলতা—আরে অলির তো বুড়ো বর। আসবে যারা তারা তো আর সবাই বুড়ো নয়। ছোকরাও তো আসবে কেউ কেউ।

অরুণা—আহা, আহ্লাদ আর কি! (চলে গেলো)।

অঞ্জলি—বাবলু?

বাবলু—অলি দিদি, তোমাকে আজ খুব ভালো

দেখাচ্ছে। কেমন ফরসা। আমার দিদি বড়ো বকে, মারে। আদর করে না, ভালোবাসে না। তুমি যদি আমার দিদি হও......

অঞ্জলি—আছি তো; অলিদিদি।

বাবলু—হ্যাঁ। ...... অলিদিদি?

অঞ্জলি—ভাই।

বাবলু—বিয়ের দিনে খুব কি লোক হবে? আমি তোমার কাছে থাকবো। থাকতে দেবে না?

অঞ্জলি—খুব দেবো, গোপাল, খুব দেবো। (অঞ্জলি বাবলুকে বুকে চেপে ধরলো।)

বাবলু—অলিদিদি, তোমার বরকে কেমন দেখতে?

অঞ্জলি—খুব ভালো।

বাবলু—অনিল ডাক্তারের মতো?

অঞ্জলি—অনিল ডাক্তার আবার কেরে? তোর বন্ধু বুঝি কেউ?

বাবলু—দূর, সে যে বড়ো। তোমার চেয়ে বড়ো। ডাক্তার সেই যে ঐ মোড়ে বাড়ি। খুব ভালো দেখতে। রাজার মতন।

অঞ্জলি—আমার বরকে ওর চেয়েও ভালো দেখতে। মহারাজার মতো।

বাবলু—ওর চেয়েও ভালো? মহারাজার মতন? (সুলতা কাছে এলো।)

সুলতা—বাবলু—তোর দিদিকে তাড়া দিগে যা। বলবি শিগগির আসতে। (বাবলু চলে গেলো)। অলি কি বলছিলি? অনিল ডাক্তারের চেয়েও তোর বর ভালো? জানিস, অনিলের বয়স ছাব্বিশও নয় আর......

অঞ্জলি—জানি; আর এর বয়স পঞ্চাশের বেশি। তা হলেই বা লতা। জমিদারী আছে, ছোটো খাটো। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হ'তে চলেছি। কতো আদর পাবো। এর চেয়ে বেশি সুখ ক'জনের হয়? আমার ভালো লেগেছে।

সুলতা—বলিস কিরে? এই কথা তুই বললি? ভালো লেগেছে? অলি ধন্যি মেয়ে তুই ধন্যি। অলি, তুই সব পারিস।

অঞ্জলি—'সব পারি' মানে? আমি কি ওকে বিয়ে না করতে পারি?

সুলতা—তার মানে?

অঞ্জলি—তাই। বুঝলি না? জানিস লতা, সব পারি না। লতা—(সখীর কাঁধে মুখ রাখলো। অরুণা এলো। তার শাড়ির বদল হয়েছে।)

অরুণা—লতা? (কাছে এসে) একি? কাঁদছে যে। মুখখানা ভার দেখে ভুলিয়ে হাসিয়ে গেলুম, এসে দেখি বর্ষণ।

সুলতা—হ্যাঁ বর্ষণ। আমরা মেঘ, আমরা মেয়েরা। মুখ ভার করেই থাকি। তারপর ভার যখন আর রাখতে পারি না তখন কাজল আঁখি সজল হয়। আর ঠাণ্ডা একটু বাতাস দিলেই বর্ষা। কিন্তু জানিস অরু। মেঘের ভিতর বিদ্যুৎ আছে? (অরুণা নিরুত্তর। অঞ্জলি চোখ মুছে স্থির হলো।)

নেপথ্যে সারদা—অরু, আয়-না মা একবার। বসবার জায়গাটা একবার দেখে যাবি কেমন হোলো।

অরুণা—যাচ্ছি মাসিমা। অলি, লতা রইলো। আমি যাই। (অরুণা চলে গেলো।)

সুলতা—সত্যি; জনে জনে কতো তফাৎ। ঐ অরু বিয়ের জন্য পা বাড়িয়েই আছে। (সারদা এলেন।)

সুলতা—আমিও যাই, অরুকে সাহায্য করিগে।

সারদা—যাবে মা যাবে। একটু বোসো। তোমার এতোদিনের বন্ধু অলি-মা আমার চলে যাবে, দুদণ্ড মনের কথা বলে যা।

অঞ্জলি—মনের কথা মা অনেক ছিলো। মেঘ ছিলো জলে ভরা। একটা ঝোড়ো হাওয়া এসে সমস্ত মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেলো এখন রোদ্দুর খাঁ খাঁ করছে।

সারদা—কী বললি? রোদ্দুর খাঁ খাঁ করছে? দুপাতা তোদের মতো শিখিনি ব'লে কি তোদের কথা বুঝতে পারবো না? কিন্তু আমরা যে মেয়ে। আমরা যে দুঃখ সইতেই এসেছি মা। একথা তোকে কতোবার বলবো?

সুলতা—মাসিমা, অলিও আমায় ঐ কথাই বলছিলো। ধন্যি মেয়ে, শক্ত মেয়ে।

সারদা—লতা, অলি মুখে বলে শক্ত কথা চোখে থাকে জল।

অঞ্জলি—তা কী করবো? যেমন ছেলেবেলায় আদর দিয়েছো। তাই একটুতেই চোখের পাতা ভিজে আসে।

নেপথ্যে অরুণা—লতা, আমি ভাই একলা আর পারবো না।

সুলতা—যাচ্ছিরে যাচ্ছি।......জানো মাসিমা, এক একজন এক এক রকম। অরুণা বিয়ের জন্যে পাগল।

সারদা—ও একটু ডেঁপো আছে বাপু। (মৃদু হেসে সুলতা চ'লে গেলো। কিছুক্ষণ মা ও মেয়ের কোনো কথাই নেই।)

সারদা—বেশ শাড়িখানি পরিয়েছে কিন্তু। সুলতাই তো?

অঞ্জলি—তা ছাড়া আর কে?

সারদা—মেয়ের বোধ শোধ আছে। দেখো দেখি কেমন পাউডার লাগিয়েছে। যেনো মিশিয়ে আছে গায়ে। আবার তা-ও বলি, মেয়ের আমার সাজের দরকার ছিলো না।

অঞ্জলি—মেয়ে তোমার এমনিতেই সুন্দরী; এই তো?

সারদা—হাজার বার। শুধু আমার কথা নয়; সবাই তাই বলবে। ওরাও তাই বলেছে। বিধুভূষণ বলেছে, "খাসা দেখতে।"

অঞ্জলি—মা, ওসব শুনিয়ো না। ভালো লাগে না।

সারদা—ভালো লাগে না?

অঞ্জলি—না। "খাসা দেখতে"—এ আমার সইবে না। খুব ভালো হোতো যদি আমাকে দেখতে ভালো না হোতো। চোখ ক্ষুদে, নাক খাঁদা, কপাল উঁচু, চুল খুব কম আর খাটো, দাঁত উঁচু, রং খুব কালো—এমনি হ'লে খুসী হতুম।

সারদা—তা হ'লে পছন্দ করতো কে রে হতভাগী?

অঞ্জলি—না-ই বা করলো পছন্দ। তাহ'লে তো আর শুনতে হোতো না "খাসা দেখতে।" কথাটা শুনেই আমার কাণ ঝাঁ ঝাঁ করছে। (মায়ের কণ্ঠলগ্ন হ'লো।) মা, আমি চলে' গেলে তোমার মন কেমন করবে না?

সারদা—করবে না? অলি, ওকথা আর বলিস নি। মনকে অনেক কষ্টে শক্ত করেছি।

অঞ্জলি—আমার কিন্তু মন কেমন করবে না।

সারদা—হুঁঃ, মিছে কথা আমি বুঝি ধরতে পারি না?

অঞ্জলি—মিছে কথা? কেমন ক'রে ধরবে? কেমন ক'রে ধরলে মা?

সারদা—পাগল মেয়ে। (চুম্বন) হ্যাঁরে, মাথা ধরাটা ক'মেছে? না হয়তো অনিলের কাছ থেকে—

অঞ্জলি—না, মা, না। আমি বেশ আছি। আর মাথা ধরা নেই। আর ঐ ডাক্তার ছাড়া কি তোমার ডাক্তার নেই? সামান্য মাথা ধরেছে, অমনি অনিল ডাক্তার!

সারদা—না রে, তোর বাবা জানতে পারবে না। ...হুঁঃ, সেই যে সেদিন ওকে বলেছিলুম বিধুভূষণের চেয়ে অনিলই ভালো, হোক্ বংশে-মানে ছোটো,—সেই থেকে মনে যাই থাক্, মুখে অনিলের নাম আর ওর কাছে করেছি কি?

অঞ্জলি—(দাঁড়িয়ে উঠে) চললুম। এমন পাগলও কি মানুষ হয়। অনিল আর অনিল। দুনিয়ায় বুঝি ঐ একটিমাত্র সৎপাত্র? (অরুণা দ্রুত এলো)

অরুণা—মাসিমা, ওরা এসেছে।

সারদা—যাচ্ছি মা; তুমি বাও। তোর মা এসেছে? ব'লেছিলুম যে।

অরুণা—হ্যাঁ এসেছে।

সারদা—তাকে সব ব্যবস্থা সুরু করতে বল্-না মা। আমি এখনই যাচ্ছি।

অরুণা—দেরি করবেন না যেনো। আমি বরং সুলতাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(চলে গেলো)

সারদা—অলি, মনটাকে শক্ত কর।

অঞ্জলি—তুমি করো আগে। আমার মন পাথর হ'য়ে গেছে।

সারদা—দেখ মা, সুখটাই সব নয়, সাধটাই সর্বস্ব নয়। দুঃখ পেয়ে কষ্ট সয়ে তবে সতী হওয়া যায়।

অঞ্জলি—আমিও তাই ভাবি। সতীদাহ এখনো আছে।

সারদা—কী বল্লি? এই তোর মন শক্ত?

অঞ্জলি—ভুলে গিয়েছিলুম মা। এই মুখ বন্ধ করলুম।

সারদা—জলে ফেলে দিলুম এমন সোনার প্রতিমা।

অঞ্জলি—মা, আমাকে দেখতে সত্যিই কি ভালো?

সারদা—(বুকে ধরে) পাগল মেয়ে আমার। এমন সোনার চাঁদ ধুলোর দামে বিকিয়ে গেলো। কর্তা তো বুঝবে না। অনিল এর চেয়ে—(অঞ্জলি মায়ের মুখে হাত চাপা দিতেই সারদা তার হাত সরিয়ে দিলেন।) হাজার গুণে ভালো, হাজার গুণে... (মনোমোহন এলেন)

মনোমোহন—বলি, মেয়ে-ঝিয়ে কাঁদা-কাটা হ'চ্ছে নাকি? ভদ্রলোকেরা অনেকক্ষণ এসেছেন। এইবার অলি চলুক। আশীর্বাদটা হ'য়ে যাক্।

সারদা—এরি মধ্যে সময় হয়েছে?

মনোমোহন—না, তাকি আর হয়েছে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে ঠাওর হবে কেন? বলি, ওরা কি সতেরো ঘণ্টা দেরি করবে? তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি সব গেছে? কুটুম মানুষকে গোড়া থেকেই খুসী রাখতে হয় তা জানো? তাও আবার যে সে কুটুম নয়। বড়ো মানুষ! চাইবার আগেই জিনিস হাজির করতে হয় বোঝো না?...জামাই মন্দ হবে না, মন্দ হবে না। মাসে হাজার তিনেক আয়, কুলীন। আর তুমি কিনা ধরেছিলে অনিল! আরে পৈতে গলায় দিলেই বামুন হয় না। বিধুভূষণের কুটুম্বিতায় আমরা কতো উঁচুতে উঠে যাবো বলো দেখি সমাজে? চলো, চলো, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

সারদা—তুমিই নিয়ে যাও।

মনোমোহন—তা না হয় গেলুম। কিন্তু তুমি দরজার আড়ালটায় থাকলে হোতো না? কখন কী দরকার হয়, আর কখন কী বলে, ঠিক মতো উত্তর দিতে আটকালে ইসারা করবে আড়াল থেকে।

সারদা—আমার ইসারা তো তোমার দরকার নেই। আমার কথা তুমি শোনো?

মনোমোহন—দেখ্ দেখি অলি, বুড়ো মাগি এলো এমন সময় ঝগড়া করতে। চলো চলো, ঝগড়ার সময় ঢের আছে।

সারদা—তুমি যাও না ওকে নিয়ে; আমি যাচ্ছি।

মনোমোহন—আয় অলি। (অঞ্জলি অগ্রসর হ'লো)

সারদা—(এগিয়ে এসে) হ্যাঁ গা, আশীর্বাদের পরও বিয়ে ভেঙে দেওয়া যায় তো?

মনোমোহন—(ফিরে দাঁড়িয়ে) বলি, মতলব কী বলো তো? একেবারেই বেহেড হ'য়েছো? এমন বেয়াড়া তুমি তো কখনো ছিলে না?

অঞ্জলি—(রাগ, নিষেধ ও অনুনয়ের সুরে) মা?

সারদা—চুপ্ কর তুই। নিজের জন্যে ঝগড়া করতে পারি না; লজ্জা করে। তোর জন্যে করছি; মেয়ের জন্যে করছি; লজ্জা করছে না।

মনোমোহন—লজ্জা, ভয়, বুদ্ধি—সবের মাথা খেয়েছো তুমি।

অঞ্জলি—বাবা, আসল কথা মা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারছে না। এতোক্ষণ কাঁদছিলো। তাই রাগে যা তা বলছে।...তুমি চলো। ওঁরা দেরি করবেন না। দেরি হ'লে রাগ করেন যদি?

মনোমোহন—দেখো দেখো, মেয়ের কথা শোনো। কতোখানি বুঝদার কথা।

অঞ্জলি—বাবা, আমার খুব পছন্দ হ'য়েছে। কেমন সুখে থাকবো।

মনোমোহন—বলিস কিরে? তোর পছন্দ হয়েছে? যাক্, এইবার বুকখানা আমার গর্বে ভরে উঠেছে। তুই-ই তোর বাপের যোগ্য মেয়ে।...মেয়েকে ছাড়তে আমারও কি কষ্ট কম হচ্ছে? কিন্তু কি করবো? হৃদয় নিয়ে কাঁদাকাটা করলে তো আর সংসার চলবে না। সারদা, মেয়েদের কান্নায় সংসারটা চলছে না। চলছে পুরুষের নিষ্ঠুরতায়। বুঝলে?...আয় অলি, আমরা যাই। তোর মা পরে আসবে। দেখো সরো। দু মিনিটের বেশি দেরি ক'রো না; আমার হুকুম।

সারদা—না, চলো, এখনই যাচ্ছি।

মনোমোহন—আচ্ছা আচ্ছা তোমরা মায়ে-ঝিয়েই এসো। আমি এগিয়ে যাই। (যেতে যেতে) কষ্ট তো হবেই। মা আমার চলে গেলে ঘরখানা যে ফাঁকা হ'য়ে যাবে। বুঝি সব। কিন্তু কী করবো? শক্ত না হ'লে চলে কই, সারদা। (চলে গেলেন)

অঞ্জলি—মা, কষ্ট পেয়ো না।

সারদা—কেন?

অঞ্জলি—তোমার মেয়ে সুখেই থাকবে।

সারদা—(মেয়ের মুখ চেপে ধরে) যাক্, শুনতে চাই না।

অঞ্জলি—আমি খুব হাসি মুখে সহ্য করতে পারবো।

সারদা—পারবি?

অঞ্জলি—হ্যাঁ গো। আমার খুসী হ'য়েছে মনটায়।

সারদা—সত্যি বলছিস?

অঞ্জলি—সত্যি? সত্যি বেরোয় না মা। মেয়ে মানুষ যে! (মাতা নিরুত্তর)

প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য :

(মনোমোহনের ঘর। রাত্রি প্রহর প্রায় শেষ। ভৃত্য ভোলা ঝাড়া মোছা শেষ করে এনেছে।)

ভোলা—বাব্বাঃ, গাড়িতে একটু শুতে পাইনি। বসা যাক্। (একখানি চেয়ারে বসলো) নাঃ। (চমকে উঠে পড়লো, পরিষ্কৃত চেয়ারগুলোর উপর আবার একবার ঝাড়ন বুলিয়ে নিলো। এমন সময় ইলা এলো।)

ইলা—ভোলা?

ভোলা—মা।

ইলা—তুই বাবার তামাকটা নিয়ে আয়। বড়ো ঘরে অলি আছে। সাজা হয়ে গেছে। তুই নিয়ে আয়। দেখিস্, ফেলিস নি যেনো। না হয় বরং কল্কেটা পরে আনিস।

ভোলা—উঁহু ফেলবো না। (চলে গেলো।)

(টেবিলের বই দুইখানা ইলা একবার নাড়াচাড়া করলো, মনোমোহন এলেন।)

মনোমোহন—এই যে ইলা রয়েছিস। বস্। (উভয়ে বসলেন) তা হ্যাঁরে, পরশু বিয়ে। তোদের লিখেছিলুম, দু-পাঁচ দিন আগে আসতে। আর এলি কিনা আজ? তাও আশীর্বাদ করে ওরা চলে যাবার পর?

ইলা—কি করবো বাবা? তোমার জামাইকে তো জানো?

মনোমোহন—যাক্, যা হবার হয়েছে। এখন একটু দেখ্, শোন, তোর মা একলা কিনা। আর ওর শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না; মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে গেছে। (এমন সময় ভোলা এক হাতে গড়গড়া, অন্য হাতে কল্কে নিয়ে এলো। গড়গড়ার মাথায় ফুঁ দিচ্ছে, সেথায় কল্কে নেই।)

মনোমোহন—ও কিরে, কিসে ফুঁ দিচ্ছিস? কল্কে কোথায়? (ভোলা বোকার

মতো হাসতে লাগলো।)

ভোলা—ভুলে গেছি।

ইলা—ওর নাম ছিলো ভূষণ। অতো ভোলে বলে আমি ভোলা নাম দিয়েছি। (ভোলা বোকার মতো ভংগী করতে করতে চলে গেলো।)

মনোমোহন—কিন্তু খুব খাটতে পারে। এইতো ঘণ্টাখানেক এসেছে, এরই মধ্যে অনেক কাজ করলো। আমার অমনি একটি লোক হলে ভারী সুবিধে হয়। তোর মায়েরও শরীরটা বাঁচে। আর আজ-কাল খিটখিটেও হয়েছে এমনি।

ইলা—বেশ তো। ভোলাকে রেখে দাও না।

মনোমোহন—জামাই যদি রাগ করে?

ইলা—হুঁ, রাগ করবে? আমার কথার উপর আবার বলবে কী? (মনোমোহন প্রচ্ছন্নভাবে মৃদু হাসলেন। ইলা চলে গেলো। ভোলা এসে একপাশে দাঁড়ালো।)

মনোমোহন—বলে, "আমার কথার উপর আবার বলবে কী?" হুঁ, 'সরো' বড়ো সরল। অলিটাও দুদিনে ঠিক হয়ে যাবে।

ভোলা—তামাক ঠিক আছে তো?

মনোমোহন— ঠিক আছে।

ভোলা—জল ঠিক আছে?

মনোমোহন—আছে, আছে।

ভোলা—নলটা ঠিক হয়েছে বসানো? (ঠিক করতে এগিয়ে এলো।)

মনোমোহন—নারে, ঠিক আছে, তুই যা।

ভোলা—তাহলে সব ঠিক আছে? আমার ভুল হয়নি তো?

মনোমোহন—বেরো। হতভাগা। এককথা একশো বার। (বিব্রত ভোলা সকুণ্ঠে চলে গেলো। সারদা এলেন।) বোসো 'সরো'। ইলাকে বলছিলুম ঐ পাগলাটে চাকরটাকে এইখানে রেখে যেতে। ও রাজি। আর যাই হোক, ছোঁড়াটা খাটতে পারে খুব। একটা বেশি লোক না হ'লে আর চলে না। তোমার শরীরও ইদানীং খারাপ হ'য়েছে। আর খেটে খেটে মেজাজটাও ভালো নেই।

সারদা—মেজাজ আবার কি খারাপ দেখলে?

মনোমোহন—না, না। এমনি বলছিলুম। তবে ছেলেটা ভালো; খাটতে পারে।

সারদা—বেশ তো। রাখতে ইচ্ছে হয়, রাখো। সত্যি, বুঝতে পারি, তোমার সেবায় আমার ত্রুটি হচ্ছে। কি করবো; সব সময় মনটা আমার ভালো থাকে না।

মনোমোহন—কি আশ্চর্য? ত্রুটির কথা কে বলছে? এইতো এতো কাজের মধ্যে মনে ক'রে তামাকটা কে পাঠালো?

সারদা—অলি।

মনোমোহন—অলি?

সারদা—না। আমিও পাঠাচ্ছিলুম। অলিও বললো।

মনোমোহন—'সরো', আমার উপর রাগ ক'রো না। পাত্র আমি ঠিকই নির্বাচন করেছি।

সারদা—হ্যাঁ।

মনোমোহন—হ্যাঁ মানে?

সারদা—মাসে তিন হাজার টাকা আয়, আর অতো উঁচু বংশ। কথাটা ঠিকই।

মনোমোহন—তবেই দেখো। একটু স্থিরভাবে বুঝলে আমার বিবেচনাকে তারিফ করতেই হবে। বলি, অতো বড়ো আপিসের অতোগুলো অকর্মা কেরানীর বড়োবাবু হ'য়ে চালাচ্ছি আর সামান্য একটা মেয়ের বিয়ে একটা পাত্র আর ঠিক করতে পারবো না? তবে হ্যাঁ, বিধুভূষণের বয়সটা কিছু বেশি।

সারদা—না, সে আর এমন কি? পুরুষের আবার বয়েস?

মনোমোহন—(সংশয়ের দৃষ্টিতে) উঁ? (ইলা এলো।)

ইলা—মা, অলি কিছুই প্রায় খেলে না। বললে, খিদে নেই।

মনোমোহন—কেন? খিদে নেই কেন? তুই অতো বড়ো মেয়ে, জোর ক'রে খাওয়াতে পারলি না?

ইলা—আমি কী করবো? আমি কি বলতে কসুর করেছি? কিছুতেই খেলো না।

সারদা—থাক্, জোর করতে হবে না। আমি গিয়ে খাওয়াবো।

মনোমোহন—তুমি গিয়ে খাওয়াবে? কেন, ইলা বললে ও খাবে না? আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ওর মাথাটি খেয়েছো জানো?

সারদা—বেশ তো। আদর কাল পরশু অবধি দেবো। তারপর যতো খুসী অনাদর ওর ভাগ্যে ঘটুক, বিধাতা ছাড়া আর কেউ দেখবার রইলো না। (বেগে চলে' গেলেন।)

মনোমোহন—দেখলি তো ইলা। তোর মা'র আস্কারাতেই না অলি আবদেরে হয়েছে। তোরা তো অমন ছিলি না? মুখটি বুজে চলতিস্। বিয়ের কথায় তোদের তো অতো ভাবনা হয়নি। তোর মা'র কথাতেই না ওকে সেকেন্ড ক্লাশ অবধি পড়িয়েছি। ওটুকুও না পড়ালেই হোতো। ঐ দু'পাতা পড়েই ওর ইচ্ছের জোর বেড়ে গেছে।

ইলা—কেন বাবা, অলির কি ওখানে বিয়েতে ইচ্ছে নেই?

মনোমোহন—অলির ইচ্ছে নেই মানে? অলির খুব ইচ্ছে। অমন ঘর, অমন ঐশ্বর্য। কার না ইচ্ছে হয়? ইচ্ছে নেই তোর মা'র।

ইলা—মা'র ইচ্ছে নেই? কেন? বরের বয়েস বেশি বলে?

মনোমোহন—হ্যাঁ হ্যাঁ, অনিলের মতো ওর বয়েস পঁচিশ নয়, অনিলের মতো সে ডাক্তারি পাশ করা নয়। আরে বাপু, বংশটা দেখতে হবে তো? অনিলরা হোলো চক্রবর্তী বামুন। চক্রবর্তী আবার বামুন? তা হ'লে আরশোলাও পাখী! রামোঃ।

ইলা—মা'র বুঝি অনিলের সংগে বিয়ে দিতে ইচ্ছে? অনিলকে আমার মনে আছে। ছেলেটি কিন্তু চমৎকার দেখতে। ও' বুঝি ডাক্তারি করছে আজকাল? এখানে এখনো আসে? ছেলেবেলায় আমরা কতো খেলা করেছি।

মনোমোহন—এখানে কেন আসবে? না না ইলা, সে সব নয়। অলির কোনো দোষ নেই। সে এসব স্বপ্নেও ভাবেনি। তোর মারই ইচ্ছে। বলে হ'লোই বা বংশে নিচু? শুনেছিস কথাটা একবার? তবে তোর বিয়েতে পাঁচটা হাজার খরচ করলুম কেন? দিদিমার পুঁজিটাতে হাত দেবো না ভেবেছিলুম; সেটিও গেলো। তা যাক্। না হ'লে ললিতের মতো অমন বংশের ছেলে পেতুম কি করে?

ইলা—এরাও তো কুলীন?

মনোমোহন—কুলীন ব'লে কুলীন। খাঁটি কুলীন। নির্জলা যাকে বলে। তা ছাড়া কী নেবে জানিস্? মাত্র দুটি হাজার। ব্যস্। তবেই দেখো লোক কতো ভালো। (সারদা এলেন)।

সারদা—ইলা, তুই যা। অলির সংগে ব'সে তুই একটু গল্প কর। ওর খাওয়া হ'য়ে এলো বলে'। আমার কথা আবার শুনবে না! (ইলা চলে' গেলো।)

মনোমোহন—তা বৈ কি! তবে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে গিয়ে তুমিই খাইয়ে এসো ওকে।

সারদা—তাই যাবো ভাবছি।

মনোমোহন—তা যাবে বৈ কি!

সারদা—না হ'লে কেঁদে কেঁদেই ওর পেট ভরবে। খেয়ে নয়।

মনোমোহন—দেখো সারদা, তুমি ভালো করছো না কিন্তু।

সারদা—ভালো আমি কবেই বা করেছি? যেদিন থেকে অলির জন্যে ঘটক আনাগোনা করছে সেইদিন থেকেই আমি ভালো

করছি না। হ্যাঁ গা, তোমরা পুরুষরা কি মেয়েদের দিকটা একটুও দেখবে না? দেখতে পাওনা, না চাও না?

মনোমোহন—ব'লে যাও। (তামাকে মন দিলেন)

সারদা—ওর চেয়ে বয়সে পাঁচগুণো বড়ো—

মনোমোহন—পাঁচগুণো মানে? রাতকে দিন করবে নাকি?

সারদা—তিনগুণো আর পাঁচ গুণো একই। তিনের আর কতো পরে পাঁচ? আহা, ওকে দেখে বাছা আমার ভয়েই সারা হবে। তোমাদের পুরুষদের প্রাণে কি এতোটুকু মায়া-মমতা নেই?

মনোমোহন—তা বৈকি! আমরা যদি কঠিন না হতুম, তবে সংসারটা মেয়েদের ঐ ঢলঢলে মুখের বলায় আর ঝমঝমে পায়ের চলায় রসিয়ে তল্ তলে হয়ে তাল পাকিয়ে যেতো!

সারদা—বুড়ো বয়েসেও রং ঢং ক'রে কথা তুমি বলতে পারো আমি জানি। কিন্তু কথাই তোমরা জানো, আর কিছু জানো না। সত্যি বলোতো তুমি খুসী মনে অলিকে ঐ বিধুভূষণের হাতে দিচ্ছো?

মনোমোহন—দেখো সারদা, আশীর্বাদ হ'য়ে গেছে। এর পরও আর ও-রকম কথা মেয়ের কানে গেলে কি অধর্ম হবে না? বিয়ে কি একটা ছেলেমানুষী খেলা? না, একটা মেয়েমানুষী কান্না? বিবাহটি ধর্ম গো ধর্ম। দাম্পত্য একটা রীতিমতো সাধনা। সংসার করা, ঠিক মতো সংসার করা একটা নিদারুণ তপস্যা। অনেক ভেবেই ঋষিরা এসব ব্যবস্থা করে-ছিলেন। তাঁরা ভেবে ব্যবস্থা ক'রে-ছিলেন। কেঁদে নয়।

সারদা—কাঁদবার মতো প্রাণ কি তাদের ছিলো? ঋষি না ছাই। চোখের সামনে দেখছি মেয়েটা বিয়ের কথা শুনেও শুনছে না। এতো বড়ো মেয়ে; বিয়েতে এতোটুকু আনন্দ নেই। উঠতে বসতে খেতে শুতে মন-মরা। এই সব দেখেও বুঝতে পারো না তোমরা, তোমরা পাষাণ। আর কী বলবো বলো?

মনোমোহন—বিধুভূষণ অপাত্র? আর ঐ অনিল বুঝি সুপাত্র? পাশ ক'রে জলপানি পেয়েছে ব'লে? মেয়েমানুষ, মেয়ে-মানুষ। মেয়েমানুষ আর কাকে বলে? (ক্ষণকাল নির্বাক)

সারদা—একটা কথা বলো। সত্যিই আশীর্বাদের পর বিয়ে ভেঙে দেওয়া যায় না? ওদের সুশীলার তো—

মনোমোহন—আমার মেয়েকে তুমি স্বৈচারিণী করতে চাও? (সারদা ও'র মুখ চেপে ধরলেন) তবে?

সারদা—থাক্ তোমার খাবার সময় হয়েছে, খাবে চলো।

মনোমোহন—না, এখন নয়।

সারদা—দেখো, রাগ করো না। মনের ঝোঁকে কি যে বলি হুঁস্ থাকে না। সত্যিই। শরীরটা খারাপ হ'য়েছে, মনটারও স্থিরতা নেই। আমারই বুঝবার ভুল। অলির মন দুদিনে ঠিক হ'য়ে যাবে!

মনোমোহন—ঠিক হবে কি আবার? বেঠিকই বা হলো কবে? তুমিই তো আপন মনে ঠিক বেঠিকের কাঁটা ঘোরাচ্ছো? মেয়ে তো আমার বেশ শক্ত। সে নিজে তো এ পাত্রে অসুখী নয়?

সারদা—নয়?

মনোমোহন—না। বলছিলো না, "বাবা, আমার খুব পছন্দ হ'য়েছে। কেমন সুখে থাকবো।"

সারদা—হ্যাঁ, বলেছিলো বটে। (ইলা এলো।)

ইলা—মা, অলি সব খাবার বমি ক'রে ফেললো। হুড়-হুড় ক'রে সব বার ক'রে দিলো।

মনোমোহন তার মানে?

সারদা—য়্যাঁ!

মনোমোহন—এসবের মানে কী 'সরো'?

সারদা—মানে আমার পোড়া কপাল। মেয়ের রোগে না ধরে।

মনোমোহন—রোগই তুমি চাও। তোমার জন্যেই যতো গণ্ডগোল, যতো অনর্থ।

সারদা—কি? আমি চাই রোগ? মুখে তোমার একটু আট্‌কালোও না বলতে? ও' যখন হয় তখন মরণাপন্ন রোগ আমার। মরতে মরতে ওর......

নেপথ্যে

অলি—মা?

সারদা—যাই মা যাই। (চলে' গেলেন)

ইলা—বয়েস হ'লে দেখছি সকলেরই ঝগড়া হয়।

মনোমোহন—তুই থাম্।

ইলা—আগে তো তোমাতে-মা'তে এতো ঝগড়া হ'তো না?

মনোমোহন—কেন, হবে কেন? ও যে মাটীর মানুষ। আমার এতোটুকু কষ্টও যাতে না হয়, সেই ভাবনাই না ওর ষোলো আনা? ওতো সেই সরো'ই আছে। অলির বিয়ে নিয়েই না যতো গণ্ডগোল।

ইলা—মা অলিটাকে বেশী ভালবাসে কিনা।

মনোমোহন—আর আমি বাসি না ভালো?

ইলা—তা নয়। তা বলিনি। বলছি, আমাদের মধ্যে মা ওকেই বেশী ভালবাসে। তাই ওকে ছাড়তে মা'র মনটা বড্ড খারাপ লাগছে।

মনোমোহন—আর তোকে ছাড়তে মন খারাপ হয়নি?

ইলা—তা আর হয় নি? কিন্তু আমি গেলেও তবু অলিটা ছিলো। অলি চলে' গেলে কে থাকবে বলো? বাবা, তুমি জানো না বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতে মেয়েদের খুব কষ্ট হয়। মনে হয় বিয়ের মতো নিষ্ঠুর আর কিছু নেই।

মনোমোহন—এখনো তাই বলবি?

ইলা—এখন আর তা মনে হয় না। তখন হ'তো।

মনোমোহন—আরে, তোর ছিলো চোদ্দ বছর। এ কি তাই? এতো বড় মেয়ের মা'র জন্যে মন কেমন?

ইলা—কেন হবে না বাবা? তেইশ বছরের আমারও মা'র জন্যে মন কেমন করে।

মনোমোহন—যা যা। ডেঁপোমি করতে হবে না।

অলিকে একবার ডেকে দে।

ইলা—বকবে নাকি? না বাবা, এমন দিনে—(কাছে এলো একটু)

মনোমোহন—বকবো মানে? বকতে যাবো কেন? এমন দিনে বকতে কি পারি? তা ছাড়া অলির তো ভালোই লেগেছে। কেমন সুখে থাকবে।—ওর নিজের মুখের কথা। আমাকে বলেছে।

ইলা—ও নিজে বলেছে? তোমাকে?

মনোমোহন—তবে আর বলছি কি? যতো ভাবনা তোর মা'র। তোর মা-ই যেনো কচি বয়েসে বুড়ো বর বিয়ে করতে চলেছে।

ইলা—ছি! কি যে বলো রাগের মাথায়। অলিকে সত্যিই ডেকে দেবো? এই বমি করলো—যদি শুয়ে থাকে?

মনোমোহন—শুয়ে থাকলে ডাকতে যাবি কেন? আমি কি তাই বললুম? (সারদা এলেন)

ইলা—মা, বাবা অলিকে ডাকছে। ডেকে আনবো?

মনোমোহন—তার জন্যে ওর মত নিতে হবে। আমার হুকুম। যা।

সারদা—আমার বারণ। যাস্ নি। অলি শুয়েছে। ডাকতে হবে না। তুই যা। (ইলা চলে' গেলো।) কেন, অলিকে কেন? আমার ওপর রাগটা মেয়ের ওপর ঝাড়বে?

মনোমোহন—কোনো দিন ওকে রেগে অন্যায় বলেছি?

সারদা—কোনো দিন বললে এসে যেত না। আজ বলতে পারো। কিন্তু বলতে পাবে না। আজ থেকে ঐদিন সকাল বেলা ওদের যাবার আগে পর্যন্ত ওকে কিছু বলতে পাবে না। সারা বাড়িতে আমার বুক পাতা রইলো। তার ওপর দিয়ে অলি হাঁটবে। সামান্য কুশটী ওর পায়ে বিঁধতে দেবো না। আমি ওর মা। (দীর্ঘশ্বাস)

মনোমোহন—কান্না শুরু করবে নাকি? ওগো ঠাকরুণ, শুধু কান্নার বাষ্পে বাষ্পে ফানুসটি হ'য়ে থাকলে চলে না। এই

আমাদের মতো পুরুষদের কঠিন খোঁটায় বাঁধা না থাকলে উবে যাবে তোমরা।—দেখো 'সরো', মেয়েকে বয়স্ক বরে দিতে আমারও মন কাঁদে। কিন্তু চোখে জল আসে না। এই যা তফাৎ। অনিল যদি কুলীন হ'তো কোনো কথাই ছিলো না।

সারদা—না-ই বা হ'লো কুলীন?

মনোমোহন—তা ছাড়া কি-ই বা ওর আয়। সবে ডাক্তারি শুরু করেছে বৈতো নয়?

সারদা—হ'লোই বা। ভালো ছেলে। পুরুষ মানুষ। রোজগার করতে কতোক্ষণ? মেয়ে আমার লক্ষ্মীমন্ত।

মনোমোহন—তবে তোমার বিয়েও আমি ভেঙে দিলুম। মা আর মেয়ে একই সঙ্গে বিয়ে ক'রো। আশীর্বাদের পরও কি না এই সব কথা! (অঞ্জলি এলো।)

অঞ্জলি—মা, তুমি কি পাগল হ'লে? বাবা, সংসারে সাধটাই বড়ো নয়, ভোগটাই সব নয়। সমাজ আর ধর্মই সব।

মনোমোহন—ধন্য মা আমার। যোগ্য বাপের যোগ্য মেয়ে তুই। (অঞ্জলি প্রণাম করলো।) সাবিত্রী সমান হও মা। (আশীর্বাদ)

(বিমূঢ় মায়ের দিকে অঞ্জলি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। তারপর অকস্মাৎ তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।) (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনার রাজ্যে অজিত-কুমার চক্রবর্তীর নাম অবিস্মরণীয়। ঐতিহাসিক তথা রসের বিচারে তিনিই রবীন্দ্র-কাব্যের আদি ব্যাখ্যাতা। বাঙলা সাহিত্যের নবীন পাঠকগোষ্ঠীর অনেকের নিকট অজিত-কুমারের নাম আজ হয়তো আর তেমন সুপরিচিত নয়, অথচ রবীন্দ্র-সাহিত্যের যেসব অধুনা-প্রচলিত সমালোচন-গ্রন্থ সচরাচর তাঁরা পাঠ করে থাকেন সে সকলেরই ভিত্তিমূলে অধুনা-বিস্মৃত এই লেখকটির প্রতিভা স্বীকৃত-ভাবে অথবা অলক্ষ্যে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে তার বিরাট সমগ্রতায় এবং কবির জীবনসাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে অনুশীলন করার যে আধুনিক রীতি আজ প্রচলিত অজিতকুমারেই তার সর্বপ্রথম ব্যাপক সূত্রপাত।

সুদূরে ১৩১৮ সালে রচিত এই নাতিদীর্ঘ লেখাটিকে সেদিন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকা ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু কি তাই?—কবি তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থটিকেও অজিতকুমারের এই সমালোচনা গ্রন্থখানির পটভূমিকাতে প্রথম প্রকাশ করা সমীচীন বিবেচনা করেছিলেন, অজিতকুমারের সাহিত্য বিচারের প্রতি এতই প্রগাঢ় ছিল তাঁর বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের চোখে তাঁর নিজের "কাব্যরচনা ও জীবন-রচনা ও-দুটো একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ" কারণ, "জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়।" ফলত অজিতবাবুর "রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থ কবি রবীন্দ্র-নাথের "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থের অবিচ্ছেদ্য পরিপূরকস্বরূপ। প্রবাসী সম্পাদকের হাতে জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি সমর্পণ করার সময় রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারের এই গ্রন্থখানির মূল্যের প্রতি কি সুস্পষ্ট সপ্রশংস ইঙ্গিত করেছিলেন শুনুনঃ

"অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন—তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয়, তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তিরূপে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে।" কবির এ উক্তি শুধুই বিনয়ের উক্তি নিশ্চয়ই নয়, অজিতকুমার যে তাঁর কাব্যকে সত্যরূপে দেখতে এবং বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন এবং সেই দৃষ্টি এবং বিচার সর্বসাধারণে প্রচারিত হলে তবেই কবিকে যথার্থভাবে বোঝা একদিন সহজ হবে—এই আশ্বাস অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ওই উপরের উক্তিটুকুতে।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র এক জায়গায় নিজের কাব্যজীবন প্রসঙ্গে বলেছেন, "বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে—পর্বে পর্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে—প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায়, কেন্দ্রটা একই।" রবীন্দ্র-কাব্য-জীবনের কেন্দ্রগত এই বিশেষ পালাটি যে কি তাও তিনি উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র খুব স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন: "আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।" অজিতকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিতে গভীর বিচার ও যুক্তির সাহায্যে রবীন্দ্রকাব্যের কেন্দ্রগত এই পালাটিকে তার ক্রমবিকাশমান ধারায় বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, এ যেন কবির "বিশ্ব-অভিসার যাত্রার ভ্রমণের ইতিহাস।" সেই ইতিহাসেরই অভিব্যক্তির পরিচয় তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য ও রসবোধের সহায়তায় অতিসুন্দরভাবে দিয়েছেন, তাঁর এই সযত্নরচিত অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে।

প্রাক্-বলাকা পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যের যে ধারা, অজিতকুমারের অকাল-সমাপ্ত জীবনে তার অধিক অনুসরণের সুযোগ তার হয়নি, আজ সেকথা স্মরণ করতেও হৃদয় ব্যথিত হয়। অথচ রবীন্দ্রকাব্য-স্রোতস্বিনীর সেই প্রথমার্ধের যে পরম পরিণাম তিনি বর্ণনা করে গিয়েছেন, তার অব্যর্থতা সত্যই বিস্ময়কর। মনে রাখা প্রয়োজন, রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে আজ যে সব মন্তব্য নিতান্তই অবধারিত সেদিন তার আভাসমাত্র কোন সমালোচনা সাহিত্যে প্রচার লাভ করে নি। এ বিষয়ে অজিতকুমারই প্রথম পথিকৃৎ। রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ আমরা অজ্ঞাতে অজিতকুমারের ভাষায় কথা বলে থাকি। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষার সগোত্র হয়েও সে ভাষা তার নিজস্ব যৌবন-বেগে পরম বেগবান ভাষা। লেখকের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং দর্শনের সুগভীর চর্চায় জ্ঞানগর্ভ হয়েও কোথাও সে ভাষা তাই জড়ত্বপ্রাপ্ত হয় নি: স্বতঃস্ফূর্ত সরসতায় অজিতকুমারের ভাষা গ্রন্থটির সর্বত্রই অনায়াস-বেগে প্রবাহিত হয়েছে। কোন্ সেই ১৩১৮ (১৯১১) সালের অতীতে বসে অজিতকুমার রবীন্দ্রকাব্যের কী মহৎ পরিণাম তাঁর মানস-নেত্রে অবলোকন করেছিলেন একবার মন দিয়ে অনুধাবন করুন, স্মরণ রাখবেন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবির সম্মান-শিখরচূড়ায় তখনো অধিষ্ঠিত হন নি!—

"আমরা তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] সমস্ত কাব্য-গ্রন্থাবলীতে ইহাই দেখিয়াছি—বিশ্ব-উপলব্ধির জন্য উৎকণ্ঠা এবং বারম্বার তাহার বাধা হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রয়াস।

"এমনি করিয়া ঠেকিতে ঠেকিতে চলিতে চলিতে অবশেষে কবি এক সময়ে ভারতবর্ষের পথ এবং তাহার মধ্য দিয়া আপনার পথটি পাইয়াছেন ইহাই তাঁহার কাব্যের শেষ পরিচয়। এই বিপুল ধর্মসাধনার পথ বাহিয়া তাঁহার জীবনের ধারা সাগর-সংগমে আপনার সংগীত পরিসমাপ্ত করিতে চাহিতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই পথটি দেশাচারের সংকীর্ণ কৃত্রিম পথ নহে, তাহা সত্য পথ। এই জন্য সকল দেশের সকল সত্যের সঙ্গেই তাহার সামঞ্জস্য আছে। তাহা যদি না হইত, তবে কবির কাব্য বিশ্বজনীন সার্থকতার মধ্যে স্থান পাইত না, তাহা সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার মরু-ভূমির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।"

রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের এই বিশ্বরূপ-দর্শন আজো পাঠকসাধারণের মধ্যে নিতান্ত সুসাধ্য হয়েছে বলে মনে করি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতায় বলেছিলেনঃ

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।"

দিগন্তবিস্তারী রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভ্রান্ত হয়ে কবিকে উদ্দেশ ক'রে আমরাও সেকথা বললে খুব অপরাধ হয় না বোধ হয়। তবু সান্ত্বনার কথাও যে একেবারে নেই তা নয়। কবির ভাষা প্রয়োগ করেই বলতে হয় যে, সত্যকারের অন্তর্দৃষ্টি বা রস-দৃষ্টি থাকলে সে জটিল কাব্যারণ্যের সহজ সরল পথটি আবিষ্কার করাও একেবারে কঠিন নয়।

"বাহিরে কুটিল হোক্,
অন্তরে সে ঋজু।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যারণ্যে অজিত-কুমার সেই ভাবচ্ছায়ানিগূঢ় ঋজু পথটির সার্থক পথপ্রদর্শক। সে পথের কৃতার্থ সন্ধানী নইলে কি সেই সুদূরকালেও এতখানি উদাত্ত উচ্ছ্বাস

গ্রন্থকারের হৃদয়কে এমন দুকূলপ্লাবী বন্যার বেগে আপ্লুত করতে পারে।

"বাঙলাদেশ ধন্য যে, এমন একটি পরিপূর্ণ জীবন তাহার সম্মুখে স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে এমন করিয়া উদ্ঘাটিত হইল।

"আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা, আমাদের দেশের সাধনা, আমাদের সৌন্দর্যের সাধনা, আমাদের ধর্মের সাধনা কালে কালে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই এই জীবনটির আদর্শ জাজ্বল্যমান হইয়া আমাদিগকে সকল সাধনার অন্তরতর ঐক্য কোথায়, সকল খণ্ডতার চরম পরিণাম পরম পূর্ণতা কোথায়, তাহাই নির্দেশ করিয়া দিবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, বিশ্বমানবের বিচিত্র সভ্যতার সকল আয়োজন সুদূর ভবিষ্যতে একদিন যখন এই ভারতবর্ষের নানা অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবার জন্য সমাগত হইবে, তখন ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে এই অখ্যাত বাঙলাদেশের মহাকবির মহান আদর্শের তলব পড়িবেই এবং বাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রপথে নাবিকের চক্ষের সমক্ষে অন্ধকার রজনীতে ধ্রুবতারার দীপ্তির ন্যায় এই পরিপূর্ণ আদর্শের দিক্-দিগন্তব্যাপী রশ্মিচ্ছটা সকল সংশয়ের অন্ধকারকে দূর করিবে।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ঘন-বিস্তীর্ণ অরণ্যপথে নিত্য নবীন পথিকের দল যুগে যুগে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও আসবেন। অজিতকুমার তাঁদের সকলের জন্যে এই অক্ষয়-প্রেরণাসঞ্চারী উদাত্ত আশ্বাসবাণী রেখে গিয়েছেন তাঁর "রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থটিতে। সকল বিচার বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে রবীন্দ্র-কাব্য সম্ভোগের যে অবিনশ্বর আনন্দ, অজিতকুমারের আশ্চর্য প্রতিভা অলৌকিক সেই আনন্দের স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল হীরকপ্রভায় সর্বত্রই আলোকিত—সে আলোকের অনির্বচনীয়তা আলোচ্য গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করবেন অবিলম্বেই, যখনই তাঁরা গ্রন্থ পাঠান্তে তাঁদের সংশয়বিদূরিত দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-কাব্যের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছবার ঋজু পথটি সহসা আবিষ্কার করবেন।

অজিতকুমারের এই গ্রন্থখানি বহু বৎসর দুষ্প্রাপ্যতার সমাধিতলে লুপ্ত ছিল। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থখানিকে পুনর্জীবন দান করে তাঁদের রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থমালার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন এবং পাঠক সাধারণের পরম উপকার করায় তাঁদের অজস্র কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। *

* রবীন্দ্রনাথ। কাব্যগ্রন্থ পাঠের ভূমিকা।—অজিতকুমার চক্রবর্তী। বিশ্বভারতী সংস্করণ। পৃষ্ঠা ১২৮। মূল্য দেড় টাকা।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে 'দেশে' পুস্তক পরিচয়ে 'শ্রীসুদর্শন' নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সমালোচনায় এই পত্রের কার্যালয়ের ঠিকানা ভ্রমক্রমে ৩৯নং অন্নদা নিয়োগী লেন, বাগবাজার ছাপা হইয়াছে, তৎপরিবর্তে ঐ ঠিকানা ৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইবে।

চিত্র-জগতে প্ল্যানিং চাই

সম্প্রতি ভারতের চিত্র-জগতে একটা বিষয় নিয়ে গভীর আলোড়ন ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা হ'ল এই ঃ মুখে মুখে গুজব রটেছিল যে, ভারত গভর্নমেণ্ট যুদ্ধ-কালীন ফিল্ম্ নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্তিত করবেন। গুজবের পিছনে যুক্তি ছিল এই যে, স্টার্লিং ডলার সংকটের ফলে ভারত গভর্নমেণ্ট বিদেশ থেকে আমদানি করা মাল সম্বন্ধে যে বাধানিষেধ আরোপ করেছেন, তার হাত থেকে ফিল্মও রেহাই পাবে না এবং সেই জন্যেই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়োজন হবে। যুদ্ধকালীন তিক্ত অভিজ্ঞতার অধিকারী ভারতীয় চিত্র-শিল্পপতিদের মধ্যে এ সংবাদে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবারই কথা। এই দুর্দশার সম্মুখীন যাতে না হতে হয় তার ব্যবস্থা করার জন্যে তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল গেছিলেন কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের বাণিজ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণকারী সঙ্ঘের তরফ থেকে এই প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়েছিল। প্রকাশ যে, তাঁরা বাণিজ্যসচিবের কাছ থেকে এই মর্মে ভরসা পেয়েছেন যে, এরূপ কোন কঠোর ফিল্ম-নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা বর্তমানে গভর্নমেণ্টের নেই। এটা সুসংবাদ সন্দেহ নেই।

তবে এর মধ্যেও একটা 'কিন্তু' আছে। বর্তমানে তারই কথা বলছি। বোম্বাইর স্টুডিও-গুলোর কথা আমি জানি না—তবে কলকাতার স্টুডিওগুলো ঘুরে এলে একটা নতুন অভিজ্ঞতা জন্মায়। প্রায় স্টুডিওতেই দেখা যায় অসংখ্য নতুন চিত্র-নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের অফিস। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ নিলে এটাও জানা যায় যে, এই সব প্রতিষ্ঠানের অনেকেরই চিত্র অর্ধ-নির্মিত বা অংশত নির্মিত হয়ে পড়ে আছে। আর্থিক সঙ্গতির অভাবে ছবির অগ্রগতি বন্ধ। এই ব্যাপারটা কেন হয়? এ নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে। বিগত যুদ্ধের চোরা-কারবারের দৌলতে আজ আমাদের সমাজের অনেকেরই হাতে দুটো পয়সা জমেছে। কারো জমানো পয়সার পরিমাণ বেশি—কারও বা কম। বর্তমানে ব্যবসায়ের অন্যান্য দ্বার রুদ্ধ বলে এ'রা প্রত্যেকেই এগিয়ে যাচ্ছেন চিত্র-নির্মাণের দিকে। সহজে চিত্র-নির্মাণ করে ধনী হওয়াই তাঁদের ইচ্ছা। অর্থ-সামর্থ্যে চিত্র-নির্মাণ চলে কিনা সেটা দেখার সময় তাঁদের নেই। এমনই তাঁদের উৎসাহাধিক্য। ফিল্ম নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তাঁদের পথ আরও প্রশস্ত হয়ে গেছে। তারই প্রত্যক্ষ ফল এই সব অর্ধসমাপ্ত বা অংশত সমাপ্ত চিত্র।

অবাধ চিত্র-নির্মাণের নামে জাতির অর্থ ও সামর্থ্যের এই অনাবশ্যক অপব্যয় প্রকৃতই চিন্তার বিষয়। বাঙলা এবং ভারতীয় চিত্র-

শিল্পের যাঁরা কল্যাণ কামনা করেন, তাঁরাই এতে ভাবিত হয়ে উঠেছেন। জাতীয় অর্থের ও জাতীয় শক্তির এই অপচয় যদি বন্ধ করা না যায়, তবে আমাদের চিত্রশিল্পের প্রভূত ক্ষতি হবে বলেই আমি মনে করি। চিত্র নির্মাণের অবাধ অধিকার আছে বলেই তার অপ-ব্যবহার করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। সেই জন্যে আমাদের চিত্র-জগতেও আজ প্ল্যানিং-এর অত্যধিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। জীবনের সর্ব বিভাগেই আজ চলেছে প্ল্যানিং-এর যুগ। চিত্র-জগতকেও আনতে হবে সেই প্ল্যানিংএর আওতায়। তা নইলে দায়িত্বজ্ঞানবিবর্জিত সুযোগ-সন্ধানী মুনাফালোভীদের হাতে পড়ে আমাদের চিত্রশিল্পের দুর্দশা বাড়বে বই কমবে না। ফিল্মের উপর কোন সরকারী বাধানিষেধ না থাকা চিত্রশিল্পের পক্ষে কল্যাণকর না হয়ে, হয়ে দাঁড়াবে বিপজ্জনক। কাঁচা ফিল্ম অনিয়ন্ত্রিত থাকুক আমাদের আপত্তি নেই—কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে এই চিত্র-নির্মাণ ব্যবসায়ের উপর আজ সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। চলচ্চিত্র নিয়ে অবাধ ব্যবসায়ের সুযোগ আমাদের চিত্রপতিরা বহুদিন ভোগ করেছেন, কিন্তু তাঁরা এই শিল্পটির উৎকর্ষ সাধনে আশানুরূপ অগ্রগতি দেখাতে পারেননি। সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর না হলে তাঁরা তা দেখাতে পারবেনও না। ভারতের চিত্রশিল্পপতিদের আমরা অবিলম্বে এই বিষয়ে মনোনিবেশ করতে অনুরোধ করি।

স্টুডিও সংবাদ

প্রণব রায়ের পরিচালনায় এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের বাঙলা বাণীচিত্র "রাঙ্গামাটি"র চিত্রগ্রহণ কার্য সমাপ্তপ্রায়। এই চিত্রে প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় নেমেছেন চন্দ্রাবতী, শিপ্রা, সত্য চৌধুরী ও জহর গাঙ্গুলী।

কলিকাতার একটি স্টুডিওতে শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"র হিন্দী সংস্করণের চিত্রগ্রহণ-কার্য আরম্ভ হয়েছে বলে প্রকাশ। এই চিত্রের প্রযোজক এসোসিয়েটেড পিকচার্স ও পরিচালক অগ্রদূত।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকাহিনী অবলম্বনে পরিচালক-প্রযোজক অমর মল্লিক যে চিত্রগ্রহণ আরম্ভ করেছেন তার কাজ প্রায় অর্ধেক সমাপ্ত হয়েছে বলে প্রকাশ। চিত্র-নাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রাইচাঁদ বড়াল। এলাহাবাদের নবাগত অভিনেতা অজিত চট্টোপাধ্যায়কে নাম-ভূমিকায় দেখা যাবে।

* * *

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নাটক "সৈনিকের স্বপ্ন"কে পরিচালক সুশীল মজুমদার চিত্রে রূপায়িত করার ভার নিয়েছেন এবং কালী ফিল্মস্ স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ আরম্ভ করেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের মূল অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই চিত্ররূপে অংশ গ্রহণ করবেন বলে জানা গেল। ভারতের সর্বত্র মুক্তির জন্যে এই মাসের ২২শে তারিখের মধ্যেই এই পাঁচ রীলের চিত্রটি সমাপ্ত হবে বলে প্রকাশ।

নানা কথা

শ্রীমতী কানন দেবীর বিদেশ ভ্রমণের যে খবর পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিনি ভারতের হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননের আমন্ত্রণক্রমে ইণ্ডিয়া হাউসে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর বিশেষ অনুরোধে তিনি তিনখানি গান গেয়েছিলেন। বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে তিনি আলেকজাণ্ডার কোর্ডা স্টুডিও পরিদর্শন করতে গেছিলেন এবং সেখানে অভিনেত্রী ভিভিয়েন লী-র সঙ্গে তাঁর চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। আগস্ট মাসের শেষে তিনি প্যারী শহরে গেছিলেন। সেখান থেকে কয়েকদিন পরে লণ্ডনে ফিরে তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি আমেরিকা থেকে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। মাঝে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের দরুণ তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন। আশা করা যায়, শীঘ্রই তিনি কলকাতায় ফিরবেন।

* * *

প্রকাশ যে, সরকারী শ্রমিক নীতি বোঝানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট চলচ্চিত্রের সাহায্য নেবেন বলে স্থির করেছেন। শ্রমমন্ত্রী ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই সরকারী প্রচার-দপ্তরকে দুখানি ডকুমেণ্টারী চিত্র নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রকাশ। একখানি চিত্রের বিষয়বস্তু হবে প্রদেশের পাটচাষীদের জীবন ও কার্যক্রম। তাদের জীবনধারণের মান উন্নত করার জন্যে গভর্নমেণ্ট কি কি ব্যবস্থা করছেন, এই চিত্রের মারফৎ শ্রমিকদের সামনে তা তুলে ধরা হবে। এই চিত্রে সরকারী জুট ট্রাইব্যুনালের কাজকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হবে। অপর চিত্রটিতে দেখান হবে গভর্নমেণ্ট যে ওয়ার্কস্ কমিটি নিযুক্ত করেছেন তার কাছ থেকে শ্রমিকরা কি কি সুবিধা পেতে পারে। ভারতে এই ধরণের প্রচেষ্টা এই বোধ হয় প্রথম। নাট্যকার মন্মথ রায়কে এই চিত্রটি নির্মাণ করার ভার দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেল।

পাইয়োনিয়র পিকচার্সের চন্দ্রশেখর

আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাইয়োনিয়ার পিকচার্স-এর নতুন ছবি "চন্দ্রশেখর" কলকাতায় প্রদর্শিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনীপ্রসূত "চন্দ্রশেখর" বাঙলার নরনারীর একটি অতিপ্রিয় উপন্যাস। প্রতাপ ও শৈবালিনী চরিত্র বাঙালী আজো ভোলেনি। এই দুইটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভারতের দুই জনপ্রিয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন ও অশোককুমার। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন ভারতী দেবী, ছবি বিশ্বাস, অমর মল্লিক প্রভৃতি। দেবকী বসুর পরিচালনায় ও কমল দাশগুপ্তের সুর-সংযোজনায় "চন্দ্রশেখর" শারদীয়া পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে দেখা দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

খেলাধূলা

ফুটবল

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা গত ৪ঠা অক্টোবর যে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে—চিন্তা করিলে লজ্জায়, অপমানে মাথা নত হইয়া পড়ে। ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় যে, আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ। অতি উৎসাহী দর্শকগণের একাংশ সেইদিন অসংযম, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাঙলার ফুটবল ইতিহাসে কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। খেলা দেখিতে গিয়া দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর টিকিট না পাওয়ায় তাঁহাদের ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছিল বলিয়া যে যুক্তি দেখান হইতেছে, অভিযোগ সত্য হইলেও বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। এই অশিষ্ট আচরণ বাঙালী জাতির সুনামে কালিমা লেপন করিয়াছে। স্বাধীন জাতি বলিয়া গণ্য হইবার যে সম্পূর্ণ অযোগ্য ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

শোনা যাইতেছে, আই এফ এর পরিচালকগণ পুনরায় এই শীল্ড ফাইনাল খেলার অনুষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষও নাকি অনুষ্ঠানের পক্ষে মত পোষণ করিতেছেন। ফাইনাল খেলা যদি শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতও হয় ৪ঠা অক্টোবরের ঘটনা কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না, এই কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা অনুভব করিতে হইতেছে।

ঘটনার বিবরণ

শীল্ড ফাইনালে কলিকাতার দুইটি জনপ্রিয় ফুটবল দল, মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে সুতরাং সেই খেলা দেখিতেই হইবে এই উৎসাহে সাধারণ দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া পড়েন। সকাল হইতেই দেখা যায়, দলে দলে দর্শক মাঠের দিকে ছুটিতেছেন। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, মাঠের প্রবেশপথের সকলগুলিতেই সারিবন্ধভাবে বিরাট জনতা অপেক্ষা করিতেছে। ভীড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। বেলা দুইটার সময় টিকিট বিক্রয় করা হইবে এই বিজ্ঞপ্তি আই এফ এর পরিচালকগণ প্রচার করিয়াছিলেন। বেলা দুইটা বাজিল টিকিট বিক্রয়ের কোনই নিদর্শন নাই। দর্শকগণ কিছুটা চঞ্চল হইলেন। বেলা আড়াইটার সময় টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইল। অর্ধ ঘণ্টা পরে হঠাৎ দেখা গেল, নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, টিকিট আর নাই। দর্শকগণ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। ক্রমশঃ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল। বেলা ৩টার সময় দেখা গেল, গ্যালারীর কয়েক অংশ ও গেট ভাঙ্গিয়া উচ্ছৃঙ্খল জনতা মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পুলিশ মোতায়েন ছিল বটে কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করিবার অধিকার তাহাদের ছিল না। তাহারা জনতার গতিবেগ রোধ করিতে পারিল না। উচ্ছৃঙ্খল দর্শকগণ মাঠের সমস্ত বসিবার এমন কি সংরক্ষিত স্থানগুলি পর্যন্ত দখল করিল। হাজার হাজার দর্শক যাঁহারা পূর্বে হইতে সীট রিজার্ভ করিয়াছিলেন তাঁহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আই এফ এর পরিচালকগণ কি করিবেন। অনুপায় হইয়া ঘোষণা করিলেন, "খেলা হইবে না, সকলে মাঠ ত্যাগ করুন। পরে এই টিকিটেই খেলা দেখিতে দেওয়া হইবে।" অনেক দর্শক মাঠ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কতক লোক খেলার জন্য ভীষণ জিদ ধরিলেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও আই এফ এর পরিচালকগণের শত অনুরোধ তাঁহাদের শান্ত করিতে পারিল না। উত্তেজিত জনতা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। মাঠের আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তচনচ করিতে লাগিলেন। ক্যানকাটা তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিচালকদের প্রহার করিয়া আসবাবপত্র ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত পুলিশ অনেকেই নিগৃহীত ও আহত হইলেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ দর্শকদের মাঠ হইতে দূর করিবার জন্য প্রথমে কাঁদুনে গ্যাস, পরে গুলী ছুড়িতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর মাঠের আশে পাশে বহু নিরীহ পথচারী এই উত্তেজিত জনতার হস্তে লাঞ্ছিত, অপমানিত হইলেন। পুলিশ লাঠিচার্জ ও গুলী ছুড়িয়া মাঠের সকল অংশ হইতে তাঁহাদের বিতাড়িত করিলেন। সন্ধ্যা হইলে সকল কিছু শান্ত হইল। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, হাঙ্গামায় ২৮ জন পুলিশ আহত হইয়াছে। জনতার মধ্যে ২১ জন আহত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে মাত্র দুইজন গুলীতে আহত হইয়াছেন।

ক্রিকেট

৮ই অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণ কলিকাতা হইতে বিমানযোগে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। অমরনাথ এই দলের অধিনায়ক ও বিজয় হাজারী সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। ৮ই অক্টোবর মাত্র ১৩ জন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়া যাইতেছেন। বিজয় মার্চেণ্ট, আর এস মোদী, মুস্তাক আলী ও ফজল মামুদ এই নির্বাচিত চারিজন খেলোয়াড় শেষ পর্যন্ত দলের সহিত যাইতে পারিলেন না। ইঁহাদের পরিবর্তে শেষ মুহূর্তে সি টি সারভাতে, রঙ্গচারী, ক্যাপ্টেন রায় সিং ও রণবীর সিংহজীকে মনোনীত করা হইয়াছে। এই সকল মনোনীত খেলোয়াড়দের ৯ই অক্টোবর দিল্লীতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ ও এস ডিমেলোর সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহার পর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া এই চারিজন খেলোয়াড় কয়েকদিন পরে বিমানযোগে ভারত ত্যাগ করিবেন ও এডিলেডে ভারতীয় দলের সহিত মিলিত হইবেন। সকল ব্যবস্থা খুব তৎপরতার সহিত হইয়াছে সন্দেহ নাই তবে দল যে শক্তিহীন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া যাত্রা করিল ইহাই চিন্তার বিষয়। মার্চেণ্ট দলের সহিত যাইবেন না ইহা আমরা পূর্বেই ধারণা করিয়াছিলাম; কিন্তু আর এস মোদী, মুস্তাক আলী, ফজল মামুদ যাইবেন না ইহা আমাদের কল্পনাতীত ছিল। এতগুলি খেলোয়াড়ের না যাইবার পশ্চাতে একটা গভীর রহস্য লুক্কায়িত আছে ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। ইহার কিছুটা আভাষ আমরা পাই বোম্বাই অঞ্চলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের বাদ দিয়া কয়েকজন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করায়। ইহাদের কেহ কোনদিন ভারতীয় দলে স্থান পাইবে বলিয়া কল্পনাই করিতে পারা যায় নাই। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এই সকল অবিচার, অনাচার দেশবাসী আর কতকাল সহ্য করিবে? রাজা মহারাজার আওতায় পরিপুষ্ট স্বার্থপর লোকেরা সমানে স্বেচ্ছাচারিতা করিবে আর তার কোন প্রতিকার হইবে না?

মুষ্টিযুদ্ধ

পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই গত ৯ বৎসর অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখায় পৃথিবীর মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালকগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না কিরূপে জো লুইকে সম্মানচ্যুত করিতে পারেন। ১৯৩৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যন্ত ২৩ বার জো লুইর প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করিয়াছেন কিন্তু ২৩ বারই লুই বিজয়ী হইয়াছেন। মুষ্টিযুদ্ধ ইতিহাসে ইহা একটি নূতন রেকর্ড। ইতিপূর্বে কোন চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা এতগুলি ও এত দীর্ঘদিন ধরিয়া সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেক চেষ্টার পর জো ওয়ালকট নামক এক নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জোগাড় করিয়াছেন। জো লুই ইহার সহিত লড়িতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু অনেকেই বলিতেছেন, "বেচারী ওয়ালকট এক রাউণ্ডও লড়িতে পারিবে না।" ওয়ালকটের পরে কাহাকে খাড়া করা হইবে এই চিন্তায় আশার প্রদীপ জ্বালিয়া তুলিয়াছেন ভূতপূর্ব চ্যাম্পিয়ান জার্মান মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাক্স স্মেলিং। ইঁহার বয়স বর্তমানে ৪২ বৎসর। কিন্তু তাহা হইলেও সম্প্রতি জার্মানীর খ্যাতনামা ভোলমার নামক মুষ্টিযোদ্ধাকে সপ্তম রাউণ্ডে ভূতলশায়ী করিয়াছেন। ম্যাক্স স্মেলিংয়ের এই লড়াই যাঁহারাই দেখিয়াছেন তাঁহারাই বলিতেছেন, "স্মেলিং এখনও চ্যাম্পিয়ানসিপ লড়িতে পারেন।" স্মেলিং শীঘ্রই আর একজন খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধার সহিত লড়িবেন, তাহার পর স্থির হইবে জো লুইর সহিত লড়িতে পারিবেন কি না। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, স্মেলিংই একমাত্র মুষ্টিযোদ্ধা যিনি এক সাধারণ লড়াইতে জো লুইকে "নক আউট" করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনা ঘটে ১১ বৎসর পূর্বে। প্রৌঢ়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাক্স স্মেলিং বর্তমানে সেই অসাধ্য সাধন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায় না। তবে জো লুই ও ম্যাক্স স্মেলিংয়ের লড়াই যদি হয় খুব সহজে জয়পরাজয় নিষ্পত্তি হইবে না ইহা জোর করিয়াই বলা চলে। দীর্ঘ নয় বৎসর পরে যে লোক সাধারণ লড়াইতে অবতীর্ণ হইতে ভীত বা সন্ত্রস্ত হয় না সে যে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ইহা অস্বীকার কেমনে করা চলে?

দেশী সংবাদ

২৯শে সেপ্টেম্বর—জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি ও জাতীয় সম্মেলনের অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

মহীশূরের উত্তর সীমান্তে সশস্ত্র জনতার কার্যকলাপের ফলে গতকল্য ঐ অংশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়। এই সকল জনতা সরকারী অফিস আক্রমণ করিয়া সরকারী কাগজপত্র নষ্ট করিতে এবং পুলিশ ও সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইতে চাহে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করিয়া দেশকে চরম বিপর্যয় হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-সচিব শ্রীযুত ষন্মুখম চেট্টি ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ়। তিনি বলেন, "খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইলে পর আমরা আর্থিক, সামাজিক ও শিল্প সংক্রান্ত অপর যাবতীয় জটিল সমস্যার সুরাহা করিতে পারিব।"

৩০শে সেপ্টেম্বর—রাজকোটের সংবাদে প্রকাশ, জুনাগড়ের অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দল অদ্য রাজকোটের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জুনাগড় স্টেট হাউস দখল করেন। বর্তমানে সশস্ত্র তরুণ দল জুনাগড় স্টেট হাউসের দ্বারদেশে প্রহরায় নিযুক্ত আছেন। গৃহের উপর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে।

দিল্লীতে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, "আমার কর্তৃত্বকালে ভারত হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হইবে না।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী দুই বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলাভাষাকে সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এখন হইতে সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য সরকারী অফিসের নথিপত্রে মন্তব্য যথাসম্ভব বাঙ্গলাভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইবে।

১লা অক্টোবর—অমৃতসরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন যে, অধিবাসী বিনিময়ের সর্বসম্মত ব্যবস্থা অনুসারে মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীরা চলিয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগকে শান্তিতে চলিয়া যাইতে দেওয়াই উচিত। বহু বৎসর যাবৎ বিদ্বেষ প্রচারের ফলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মুসলমানদের পক্ষে পূর্ব পাঞ্জাবে এবং হিন্দু বা শিখদের পক্ষে পশ্চিম পাঞ্জাবে বসবাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সকলের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়াই এই লোক বিনিময় নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

কলিকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পার্ক সার্কাস অঞ্চলে একটি খালি বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র অস্ত্রশালা আবিষ্কার করে।

২রা অক্টোবর—মহাত্মা গান্ধী অদ্য ঊনাশীতি বর্ষে পদার্পণ করেন। স্বাধীন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে তিনি জন্মদিবসটি প্রার্থনা ও উপবাস করিয়া উদযাপন করেন। এই উপলক্ষে নয়াদিল্লীতে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল এবং আচার্য কৃপালনী সত্য ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব মানিয়া লওয়ার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষে কলিকাতা

নগরীর বিভিন্ন অংশে সারা দিবসব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রভাত ফেরী, বিরাট সূত্র-যজ্ঞ, শান্তি শোভাযাত্রা, প্রচার পত্র প্রদর্শনী এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জনসভাসমূহের মধ্য দিয়া কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

পাবনার হিমাইতপুরের হিন্দু জনসাধারণ ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন নেতার নিকট এই মর্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেনঃ—"মুসলিম জনসাধারণ দ্বারা গ্রাম অবরুদ্ধ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উদাসীন, উদ্ধার করুন, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করুন।"

জব্বলপুরের সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে উৎখাত করিবার এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সম্প্রতি পুলিশ সেখানে উহার কিছু সন্ধান পাইয়াছে এবং কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ও মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কলিকাতার কয়েক স্থানে তল্লাসী করিয়া পুলিশ আরও ভেজালোপকরণ হস্তগত করে এবং কয়লা ও চাউলের চোরাকারবার করিবার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। চিৎপুর এলাকায় এক ময়দা কলের মালিক এবং অপর ৮জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, ঢাকা শহর ও পল্লী অঞ্চলের হিন্দুদের বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া যাওয়ার হিড়িক ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

৩রা অক্টোবর—হায়দরাবাদ পুলিশ নান্দেদ জিলার উমারী ও পাতারদে গ্রামের ২০০ অধিবাসীর উপর গুলী চালনা করে। ফলে ১২জন নিহত এবং ৩০জন আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, চোরাকারবার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট শীঘ্রই একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা মাণিকতলা থানার পুলিশ বাগমারী অঞ্চলে একটি কাঠ ফাঁড়াই গুদাম তল্লাসী করিয়া দুই হাজার বস্তা তেঁতুলের বীচি উদ্ধার করে; ঐগুলির পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার মণ হইবে। আটা, ময়দার সহিত ভেজাল দিবার উদ্দেশ্যেই নাকি ঐ তেঁতুলের বীচি রাখা হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগে প্রকাশ। এই ঘটনা সম্পর্কে একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ের সিয়া সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আলী জহীর ইরাণে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪ঠা অক্টোবর—ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কাথিয়াবাড়ের কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের অনুরোধক্রমে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পোরবন্দরে পাঠান হইতেছে। এই সৈন্য বাহিনী ৫ই অক্টোবর ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ হইতে অবতরণ করিবে।

পশ্চিম পাকিস্থানের সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্থান হইতে অ-মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের অপসারণ ও তাহাদের পুনর্বসতি স্থাপন সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত হিন্দু ও শিখ নর-নারী "আশ্রয়প্রার্থী" নহে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রহিয়াছে।

সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী কাজি মুজতাবা, এম এল এ এক বিবৃতিতে বলেন যে, দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের অর্থ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই পুনরায় কোন বিদেশী শক্তির দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া।

৫ই অক্টোবর—জুনাগড়ের পাকিস্থানে যোগদান ভারত গভর্নমেণ্ট মানিয়া লইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারত গভর্নমেণ্ট মনে করেন যে, যেহেতু বাবরীবাদ ও মংগ্রল ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগ দিয়াছে, সেখানে জুনাগড়ের সৈন্যবাহিনী রক্ষা করা অন্যায়। ভারত গভর্নমেণ্ট এই সমস্ত সৈন্য অপসারণ দাবী করিতেছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত ডেরা-ইসমাইল খাঁর বিদায়ী ডেপুটি কমিশনার দেওয়ান শিবশরণলাল এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শিখ ও হিন্দুগণ কসাই-খানার পশুদের ন্যায় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছেন। নৌশেরার শতকরা ৯০জন অমুসলমা অধিবাসী নিহত হইয়াছে। সশস্ত্র পাঠান দল এক্ষণে সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া পশ্চি পাঞ্জাবে হানা দিতেছে। কাশ্মীর রাজ্যের সীমান্তে বহুসংখ্যক সশস্ত্র পাঠানের এক বিরাট সমাবেশ হওয়ায় উক্ত রাজ্যেরও নিরাপত্তা বিপন্ন হইবা সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পাকিস্থানের নেতৃবর্গ পূর্ব বাঙ্গলা হিন্দুদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দেও সত্ত্বেও তাহা কার্যে পরিণত করা হইতেছে ন দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারতীয় ইউনিয়নবে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাহারা যেন অতি সত্ব এমন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, যাহাতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ পশ্চিমবঙ্গে, আসাম ও ভারতী ইউনিয়নের অন্যান্য স্থানে সরিয়া আসিতে পারে।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে সেপ্টেম্বর—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি এটলী অদ্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার বিশেষ গুরুত্বপূ পরিবর্তন ঘোষণা করেন। মন্ত্রিসভার আর্থি ব্যাপার সম্পর্কিত মন্ত্রীর একটি নূতন পদ সৃ করিয়া স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে উক্ত পদে নিয়ো করা হইয়াছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট সীমান্তে নিকটস্থ পারস্যের উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থিত খোরসা প্রদেশের অন্তর্গত দুস্তাবাদে এক ভূমিকম্পের ফ ১২০ জন নিহত হইয়াছে এবং ৩০০ জনের কো সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থান অদ ৫৩—১ ভোটে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সদস রূপে গৃহীত হইয়াছে।

১লা অক্টোবর—নিউইয়র্কে সম্মিলিত রাষ্ট্রপু সাধারণ পরিষদে ভারতবর্ষ ও ইউক্রেনের মধ্যে কো রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের শূন্য আসনে সদস নির্বাচিত হইবে তৎসম্পর্কে গতকল্য ভোট গৃহী হইবার সময় সোভিয়েট রাশিয়া ইউক্রেনের জ ভোটের আহ্বান করিলে সাধারণ পরিষদের ভারতী প্রতিনিধি শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সোভিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

৫ই অক্টোবর—ইউরোপের ৯টি দেশের কম্যুনিস পার্টি মিলিয়া ১৯৪৩ সালের জুন মাসে কম্যুনিস ইণ্টার ন্যাশনাল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর প্রথ আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে অদ্য বেলগ্রেড হইতে এই সংবাদটি প্রকাশি হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত
'সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য' প্রণীত

পুরোহিত-দর্পণ

বিশাল হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
বিরাট ও নিখুঁত প্রামাণ্য বাংগলা পুস্তক
মূল্য—কাপড়ে বাঁধাই—১০৲ টাকা
সাধারণ ,, ৯৲ টাকা
প্রকাশকঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
২০৪, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থানঃ—**সত্যনারায়ণ লাইব্রেরী**,
৩২নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন।

আপনার স্বাস্থ্য-সংবাদ

রক্ত দূষিত হইলে, দু'দিন আগেই হউক বা পাছেই হউক আপনার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবেই, ফলে আপনার চেহারা বিশ্রী হ'য়ে উঠবে, মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে, জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন না।

যখনই রক্ত দূষিত হওয়ার এই সমস্ত রোগ যথা—বাত, আড়ষ্ট ও বেদনাযুক্ত গ্রন্থি বিখাউজ্জ ফোঁড়া, ঘা ইত্যাদি জাতীয় রোগ দেখা দিবে, তখনই এই বিখ্যাত মহৌষধটির একটি পুরা কোর্স সেবন করতে ভুলবেন না।

সমস্ত ঔষধালয়েই ট্যাবলেট বা তরল আকারে পাওয়া যায়।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পৃথিবীবিখ্যাত ওলার হ্রদের
খাঁটি

পদ্মমধু

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান এবং যাবতীয় চক্ষুরোগের স্বভাবজ মহৌষধ। ড্রাম শিশি ২৲। ৩ শিশি ৫৷৷০। ৬ শিশি ১১৲। ডাক মাশুল পৃথক।
ডজন—২২৲ টাকা। মাশুল ফ্রি।

ডি, পি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং
৪৬-এ-৩৪, শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া (বেঙ্গল)

আমাদের মত লোকের জন্য

আদর্শ সিগারেট

নাম্বার টেন ভার্জিনিয়া

NUMBER TEN
VIRGINIA
MAGNUMS
TEN CIGARETTES

সর্বোৎকৃষ্ট কাশ্মিরী ছাপা

৫ গজ ৪৩৲ টাকা, ৬ গজ ৪৭৲ টাকা।
২৲ টাকা অগ্রিম দেয়,
বক্রী ভি পি পি যোগে।
পাইকারী দরের জন্য লিখুনঃ—

এল বি বর্মা এণ্ড কোং,
কাণপুর।

ধবল ও কুষ্ঠ

গাত্রে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গাদি স্ফীত, অঙ্গুলাদির বক্রতা, বাতরক্ত, একজিমা, সোরায়েসিস্ ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নির্দোষ আরোগ্যের জন্য ৫০ বর্ষোর্দ্ধকালের চিকিৎসালয়।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আপনি আপনার রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপুস্তক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া।
ফোন নং ৩৫৯ হাওড়া।

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
(পূরবী সিনেমার নিকটে)

আই, এন, দাস

(আর্টিষ্ট)

ফটো এনলার্জমেণ্ট, ওয়াটার কলার ও অয়েল পেণ্টিং কার্যে সুদক্ষ, চার্জ সুলভ, অদ্যই সাক্ষাৎ করুন বা পত্র লিখুন। ৩৫নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জহর আমলা

ভড় কেমিক্যাল ওয়ার্কস
৯২, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

সর্দ্দি ও কাসির
জন্য
সিরোলিন
"রচি"
SIROLIN

আজই কিনুন!
ডিডিটি নিওসিড
ঘর থেকে পোকা মাকড় দূর করে
গাইগি ইনসেক্টিসাইডস্ লিঃ, বোম্বাই

পুরস্কার
উচ্চ শ্রেণীর হাতঘড়ী
চামড়ার সুটকেস
প্রভৃতি পুরস্কার
দেওয়া হইবে।
নিয়মাবলীর জন্য
পত্র লিখুন
এন, পি, হাউস
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৮
কলিকাতা

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ৩১শে আশ্বিন, ১৩৫৪ সাল। Saturday, 18th October, 1947 [৫০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

এবারের পূজা

আগামী ৩রা কার্তিক বাঙলায় দুর্গোৎসব আরম্ভ হইবে। দুর্গোৎসব বাঙালী হিন্দুর বড় পূজা। বাঙলার বহু যুগের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বাঙলার সম্পদ ও সংগতির পরিচয় পূজার এই কয়েকদিনের উৎসব ও আনন্দের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পর পর দুর্ভিক্ষ এবং নানারূপ আর্থিক সংকট বাঙলার সমাজকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, ইহার উপর সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উপদ্রবে বাঙলার সমাজ-জীবন আজ বিধ্বস্ত। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্বেগ এবং আতঙ্কে বাঙলায় সকল উৎসবের আনন্দ বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। কার্যতঃ অনেকের পক্ষে জীবন-ধারণ দুর্বহ হইয়া ভারস্বরূপে পরিণত হইয়াছে এবং কোনরকমে জীবনের গতির ধারাটি ধরিয়া টিকিয়া থাকিতেই তাহারা ব্যস্ত। হৃদয়ে যাহাদের একবিন্দু শান্তি নাই, উৎসব ও আনন্দের স্ফূর্তি তাহারা কোথায় পাইবে? এ অবস্থায় মুখের যে হাসি তাহাও কৃত্রিম, বস্তুত হৃদয়ের ভয়কে সে হাসি চাপা দিতে পারে না এবং সে অবস্থায় উৎসব বিড়ম্বনার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। গত ১৫ই আগস্ট হইতে বাঙলাদেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং দুই অংশের শাসনতন্ত্র বিভিন্ন শাসকদের দ্বারা স্বতন্ত্র নীতিতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করিয়া এই ভাগ হইয়াছে এবং এই সাম্প্রদায়িক বিভাগের দাবীদার যাহারা তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয়তাবোধ এখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। রাষ্ট্রীয়তাবোধের মূলীভূত স্বদেশ-প্রেমের প্রভাবে যদি এই শ্রেণীর মন সাম্প্রদায়িকতার মোহ হইতে মুক্ত হইত, তবে বাঙলার পূজায় এমন উদ্বেগ বা আতঙ্ক দেখা দিত না। কিন্তু লীগ সাম্প্রদায়িকতা উস্কাইয়া তুলিয়া সমাজ-জীবনে যে বিপর্যয় আনয়ন করিয়াছে, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও তাহার নিরসন ঘটিতেছে না। সাম্প্রদায়িক উল্লাস ও উত্তেজনা লীগের অনুগতদের অন্তরে স্বদেশপ্রেমকে জাগিতে দিতেছে না। আমাদের রাষ্ট্রের যে অন্তর্ভুক্ত সে যে আমাদেরই একজন এবং সে হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক্ তাহার স্বার্থরক্ষা করাই যে আমাদের কর্তব্য এবং জীবন দিয়া সে স্বার্থকে রক্ষা করিতে হইবে, এমন উদার প্রেরণা তাহারা পাইতেছে না। পাকিস্থানের মর্যাদা রক্ষায় আজ যাহাদিগকে ছুটাছুটি করিতে দেখিতেছি, সেইসব মুসলমান যুবকদের মধ্যে শচীন মিত্র, স্মৃতীশ বাড়ুয্যে, বীরেশ্বর ঘোষের উদার অসাম্প্রদায়িক আদর্শের আন্তরিক পরিচয় আমরা পাইতেছি না। পূজার উদ্বেগ ও আতঙ্ক এজন্যই এবার বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঞ্জাবের নরঘাতী সাম্প্রদায়িক পৈশাচিক তাণ্ডব সেই আতঙ্কের মনস্তাত্ত্বিক উপচার যোগাইতেছে। বিশেষভাবে হিন্দুর বিজয়াদশমী এবং মুসলমানদের ঈদপর্ব এবার ঠিক ঘেষাঘেষি দিনে পড়িয়াছে। আগামী ২৪শে অক্টোবর বিজয়া এবং তাহার পরদিন অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর ঈদ। বাঙলার প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের এই দুইটি প্রধান পর্বের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যহেতু পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট উভয় সম্প্রদায়ের শান্তির আবেদন প্রচার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, হিন্দু ও মুসলমান কিভাবে আপন আপন পর্ব উদ্‌যাপন করিবেন, তৎসম্বন্ধেও সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মনের আতঙ্ক এবং উদ্বেগ প্রশমিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেণ্ট যেভাবে এ সম্বন্ধে নীতি নির্দেশ করিয়াছেন, পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে এমন কোন নির্দেশাত্মক বিবৃতি আজও প্রচারিত হয় নাই। পূর্ববঙ্গের সর্বত্র হিন্দুরা নির্বিঘ্নে পূজা নির্বাহ করিতে পারিবেন, খাজা নাজিমুদ্দীন একথা বারংবার বলিয়াছেন এবং হিন্দু নেতা-দিগকে তিনি এ সম্বন্ধে আশ্বাসও প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনও প্রশ্ন নাই। কিন্তু তাঁহার এতৎসম্বন্ধীয় প্রতিশ্রুতি বা বিবৃতির মধ্যে এক্ষেত্রে হিন্দুদের অধিকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ দলন করিবার বিধানকে বলবৎ করিবার শক্তির পরিচয় আমরা কিছুই পাইতেছি না। ঢাকা জন্মাষ্টমীর মিছিলের অবাঞ্ছনীয় পরিণতি যদি না ঘটিত, তাহা হইলে পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর এই আশ্বাসই পর্যাপ্ত হইত; কিন্তু সেদিন যাহারা শোভাযাত্রা পরিচালনের চিরন্তন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর এই মৌখিক উপদেশ তাহাদের অন্তরের উদ্বেগ কতটা দূর করিতে সমর্থ হইবে এ সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহের উদয় হয়। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে জন্মাষ্টমীর মিছিল যেভাবেই পরিচালিত হোক্ না কেন, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাহা চলিবে না, যাহারা এই সাম্প্রদায়িক অনুদার যুক্তি লইয়া নিজেদের রাষ্ট্রের নাগরিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, পূজার ব্যাপারে তাহাদের তেমন দুর্বুদ্ধি যে জাগিয়া উঠিবে না, ইহাতে নিশ্চয়তা কি? এইখানেই সমস্যা। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড দলের সর্বাধিনায়ক সম্প্রতি

এ সম্বন্ধে তাঁহার দলের প্রতি একটি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। পূজা সম্পর্কে হিন্দুদের অধিকার রক্ষা করিতে সজাগ থাকিবার জন্য তিনি ন্যাশনাল গার্ডদলের সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই আহ্বান কতটা কার্যকর হইবে ইহাও প্রশ্ন থাকিয়া যায়। পারস্পরিক সম্প্রীতি সৌহার্দ্য ও সহনশীলতার দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান দুইটি পর্ব যদি সম্পন্ন হয়, তবে বাঙলা বর্তমান অগ্নি-পরীক্ষা হইতে অনেকখানি উত্তীর্ণ হইবে। বস্তুত আজ সমগ্র ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বাঙলার উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা উভয় গভর্নমেণ্টকে এজন্য সচেতন ও সক্রিয় হইতে বলি এবং উভয় সম্প্রদায়কে সহানুভূতিশীল অন্তর লইয়া দেশের স্বার্থ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। মানুষে মানুষে পারস্পরিক ভীতির দুর্নীতিময় নৈতিক অধঃপতন হইতে ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন বিজয়ার আলিঙ্গনকে ঈদের কোলাকুলিতে সম্প্রসারিত করিয়া সার্থক করিতে পারি।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস

পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কায়েদে আজম জিন্না বলিয়াছেন, "যিনি যে রাষ্ট্রের মধ্যে আছেন, তিনি সেই রাষ্ট্রের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য প্রদর্শন করিবেন, ইহাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি আমার পরামর্শ।" জিন্না সাহেবের এই পরামর্শ খুবই ভাল, একথা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান ধ্বনি উঠাইয়া তিনিই ভারতের নয় কোটি মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অনুদার দৃষ্টি প্ররোচিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজ তিনি নিজের কাজ হাসিল করিয়া লইয়াছেন—পাকিস্থান রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে সমাসীন হইয়াছেন। এখন ভারতের মুসলমানদিগকে সোজা কথায় বিদায় করিয়া দিবার পালা আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানগণ তাঁহার উপদেশকে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস স্বরূপেই গ্রহণ করিবেন। এই সঙ্গে জিন্না সাহেবের স্বশাসিত পাকিস্থানের মন্ত্রী মিঃ যোগেন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের একটি অভিনব উপদেশের কথাও আমাদের মনে হইতেছে। হরিজন সম্প্রদায় অর্ধচন্দ্র ও তারকাখচিত একটা চিহ্ন অঙ্গের ভূষণ স্বরূপে ধারণ করেন, মণ্ডল সাহেবের ইহাই ইচ্ছা। অন্যান্য হিন্দু হইতে হরিজন-দিগকে পৃথক করিয়া দেখানই যে ইহার উদ্দেশ্য তাহাও নাকি মণ্ডল সাহেব জানাইয়া দিয়াছেন। বালী-সুগ্রীবের লড়াইয়ের সময় রামচন্দ্রের বাণ হইতে সুগ্রীবকে বাঁচাইবার জন্য তাহার গলায় একটা মালা চিহ্ন স্বরূপে দেওয়া হইয়াছিল। হরিজন সম্প্রদায় যাহাতে লীগ-নীতির ষোল আনা মহিমা উপলব্ধি করে, বোধ হয় এজন্যই মণ্ডল সাহেব, তাহাদিগকে বর্ণ হিন্দু হইতে এই-ভাবে বিশিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু নোয়াখালির ব্যাপার অনুন্নত সম্প্রদায় এখনও বিস্মৃত হয় নাই। কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণায় হরিজনদের নিগ্রহ ও নিধন লীলা এখনও তাঁহাদের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছে। এরূপ অবস্থায় মণ্ডল সাহেবের এই উদ্যম তাহাদের কাছে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস স্বরূপেই গণ্য হইবে। এপথে না গিয়া মণ্ডল সাহেব যদি হরিজন সম্প্রদায়কে সরাসরি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উপদেশ দিতেন, তবেই বোধ হয় তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি পাইত।

শ্রীযুত কিরণশংকর রায়ের অভিযোগ

পূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পাকিস্থান গণপরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত কিরণশংকর রায় সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি পূর্ববঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের মারধর, শ্রীহট্টের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে জাতীয়তা-বাদী মুসলমানের নির্যাতন, হিন্দু বালিকাদের পিতাদের নিকট অশ্লীল পত্রপ্রেরণ এবং মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের হাতে হিন্দু জনসাধারণের অযথা হয়রানির বহু বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত একজন দুষ্কৃতকারীকেও গ্রেপ্তার করার সংবাদ আমরা পাই নাই। আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার ভার পূর্ববঙ্গে যাহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা এ সম্পর্কে হয় নেহাৎ উদাসীন অথবা অরাজকতা দমন করিবার মত শক্তি তাঁহাদের নাই। তদুপরি এক শ্রেণীর মুসল-মানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ববোধের দৌরাত্ম্যও অত্যধিক মাত্রায় প্রকট হইতেছে।' শ্রীযুত রায়ের মতে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুদের সহিত শান্তি ও সম্প্রীতিতেই বসবাস করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু সংখ্যায় অল্প দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকেরা সমাজের বৃহদংশের মনে ত্রাস সৃষ্টি করিতেছে। ইহারা গভর্নমেণ্টকে একান্তভাবে অসহায় করিয়া ফেলিতেছে। ইহার উপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের অযোগ্যতা এবং ঔদাসীন্যের অভিযোগও তিনি উত্থাপন করিয়া-ছেন। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের অবলম্বিত ব্যবস্থা প্রবর্তনে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের স্বার্থ কার্যত উপেক্ষিত হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস, যত অনর্থের এই দিক হইতেই সৃষ্টি হইতেছে। পূর্ববঙ্গের গভর্নমেণ্ট যদি সত্যই তাঁহাদের রাষ্ট্রে সম্প্রীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তবে এই অনুদার মনো-বৃত্তিকে উৎখাত করিতে হইবে। বস্তুত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পূর্ব পাকিস্থানে দয়ার পাত্রস্বরূপে পরিণত করিলে চলিবে না। তাঁহাদের অধিকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহিত সমভাবে মর্যাদা দান করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমুন্নত শিক্ষা-দীক্ষা এবং সংস্কৃতির অধিকারী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তাঁহাদের রক্ত-দানের অক্ষরে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আজ রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতার আহ্বানে তাঁহাদের সেই স্বদেশপ্রেমকে মর্যাদাদান করিতে হইবে। আজ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, পূর্ব পাকিস্থানের মুসলমানেরাই শুধু স্বাধীনতা পায় নাই হিন্দুরাও সে স্বাধীনতার পরিপূর্ণ মর্যাদারই অধিকারী হইয়াছে। যদি এই উদার দৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গের শাসননীতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে সর্বত্র আশ্বস্তি ফিরিয়া আসিবে। বস্তুত আইন ও শৃঙ্খলা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক শ্রেণীর লোকের সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্ববোধের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতা যদি পূর্ববঙ্গের সরকার কঠোর হস্তে দমন করিতে পারেন, তবে বাঙলার দুর্দৈব অতিক্রান্ত হইতে অধিক দিন বিলম্ব ঘটিবে না বলিয়াই আমরা মনে করি।

চিরন্তন চাতুরী

পাকিস্থান রাষ্ট্রের কর্ণধার মিঃ জিন্না কিছুদিন পূর্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিমূলক একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে ভাল কথা অনেক আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে সেইসব কথার আড়ালে মিঃ জিন্না তাঁহার লীগ-নীতির মূলীভূত সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিবার চিরন্তন চাতুরী ছাড়েন নাই। তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও উপদ্রবের কথা কল্পনাও করিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু পাকিস্থানে বিশেষভাবে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তত্রত্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যেসব অবর্ণনীয় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সবই চাপিয়া গিয়াছেন। লীগ-নেতাদের এই কৌশল আমাদের জানা আছে। তাঁহাদের এইসব অনিষ্টকর মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাই না। কিন্তু মিঃ জিন্না এবং তাঁহার বশংবদ দল নিজেদের নির্দোষিতা প্রচার করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে ৫০ মাইল দীর্ঘ লাইন ধরিয়া সেখানকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় মিছামিছি যে পলাইয়া আসিতেছে না ইহা সকলেই বুঝিবে। হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সম্রাজ্যে তিষ্ঠিতে কেন পারেন নাই, ইহা বুঝিতেও কাহারও বেগ পাইতে হয় না। পাকিস্থানের

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সেখানকার গভর্নমেণ্টের সংগে মনে-প্রাণে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক নহে, মিঃ জিন্না এই অজুহাত উপস্থিত করিয়াছেন। মিঃ জিন্না সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কিভাবে চাহেন, আমরা বলিতে পারি না। তিনি এবং তাঁহার অনুগত দল সাম্প্রদায়িকতাকেই রাষ্ট্রনীতির সংগে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত করিয়া চালিতেছেন এবং সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থহানির অসত্য ও অনর্থক অভিযোগসমূহ প্রচারের দ্বারা উত্তেজনা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করিতেছেন, আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি। সহযোগিতা চাহিলেই পাওয়া যায় না, সেজন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাও প্রয়োজন। নিয়ত সাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দিয়া যাহারা অপর সম্প্রদায়ের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাদের সহযোগিতার প্রার্থনা কতটা আন্তরিক, ইহা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের এই চাতুরী ক্রমেই ধরা পড়িয়া যাইতেছে। ভারতের দশ কোটি মুসলমানের জন্য তাঁহারা পাকিস্থানের স্বর্গরাজ্য উন্মুক্ত করিবেন বলিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম জাগাইয়া তুলিয়াছেন। আজ বাস্তব সত্যে তাঁহাদের সেই বঞ্চনা ভারতের মুসলমান সমাজের উপলব্ধিতে আসিয়াছে। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী পূর্ব পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানের পক্ষে পাকিস্থানে বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের কাছে আজ পাকিস্থানের দরজা বন্ধ। এ অবস্থায় ভারতের ৪॥০ কোটি মুসলমানের পক্ষে পাকিস্থানের কোন মোহই থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে পাকিস্থানী নীতির অনিষ্টকারিতাই বর্তমানে তাঁহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন। লীগের নীতির ফলে ভারতের সমাজ-জীবনে যে বিপর্যয় সাধন হইয়াছে, মুসলমানদের পক্ষে তাহার সংগে খাপ খাওয়াইয়া চলাই আজ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্থানী নীতি তাঁহাদের মনে অনর্থক একটা অসহায়ত্বের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমান সমাজের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে গর্ব ছিল, বর্তমান সমাজ-জীবনে তাঁহারা তাহার সংগে সংগতি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। সমগ্র ভারতকে মুসলমান সমাজ আপনার করিয়া দেখিবার সেই গর্ব এবং মনোবল কতদিনে ফিরিয়া পাইবেন, আমরা বলিতে পারি না। কংগ্রেসের আদর্শই তাঁহাদিগকে এ পথে সাহায্য করিবে, আমরা এই কথাই বলিব। ভারতের মুসলমান সমাজেও চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে, ইহাই আশার কথা।

বাঙলায় সাংস্কৃতিক ঐক্য

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডক্টর ঘোষ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যের অবতারণা করিয়া বলেন, এদেশের সাধকগণ রাজনীতিক ঐক্যের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, গত ১৫ই আগস্ট তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুই ভাগে বাঙলা দেশ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই প্রতীয়মান অনৈক্য এবং বৈষম্যের মধ্যেও বাঙালী মৈত্রীর দ্বারা নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন যে, রাজনীতিক কারণে বাঙলাদেশ বিভক্ত হইলেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁহারা উভয় বাঙলার সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষা করিবেন। ডক্টর ঘোষ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। প্রকৃতপক্ষে পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধগত মিলন এবং সংগতিই সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে। বাঙলা দেশ এই সাংস্কৃতিক মর্যাদা বলেই ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এবং শুধু ভারতে নহে, বাঙলার সাংস্কৃতিক মর্যাদা বহু মনীষীর সাধনায় উদ্দীপ্ত হইয়া ভারতের বাহিরেও বাঙালীকে সমুন্নত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বর্তমানের বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও বাঙলার এই সাংস্কৃতিক মর্যাদাই আমাদিগের মনে একান্ত আশার সঞ্চার করে। সাম্প্রদায়িক অন্ধতায় বাঙলার অনেক অনর্থ ঘটিয়াছে; কিন্তু তথাপি আমরা বলিব যে, এই উপদ্রব বাঙলায় নিত্য হইতে পারে না। ভারতের অন্য প্রদেশে যাহাই ঘটুক, বাঙলার সাংস্কৃতিক মর্যাদা বাঙালীকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবে; বাঙালী মরিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকার কার্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে, কাজেই ২৫শে অক্টোবর (৭ই কার্তিক) তারিখের 'দেশ' বাহির হইবে না। 'দেশে'র পরবর্তী সংখ্যা বাহির হইবে ১লা নবেম্বর (১৪ই কার্তিক) তারিখে। —সম্পাদক, 'দেশ'

পরলোকে মৃণালকান্তি ঘোষ

গত ২৪শে আশ্বিন, শনিবার 'অমৃতবাজার পত্রিকার' অন্যতম প্রধান পরিচালক ভক্তিভূষণ মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘ ৮৭ বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত দেশ ও জাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশে বিগত অর্ধশতাব্দীর সাংস্কৃতিক সমগ্র সমৃদ্ধির সংগে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠার সময় প্রথম দিকেও তাঁহার কৃতিত্ব ও সহায়তা যথেষ্ট ছিল। ১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা নবপর্যায়ে দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয়, তখনও তিনি পরিচালকরূপে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন; অবশ্য পরে তাঁহার সহিত আনন্দবাজারের এই সংযোগের অবসান ঘটে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি আনন্দবাজারের বিশেষ শুভার্থী ছিলেন। মৃণালকান্তি বৈষ্ণব ধর্মের সাধন-রসে নিজের সমগ্র জীবনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বস্তুত বৈষ্ণবোচিত বিনয় এবং সৌজন্য তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে তিনি গৌরপদ-তরঙ্গিণীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব মহাজনগণের জীবনী সংগ্রহে সমৃদ্ধ হইয়া এই সংস্করণ সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে এবং বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূরণ হয়। ইহা ছাড়া তিনি আরও কয়েকখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙলার সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন পুরুষরূপে পরিগণিত হইতেন। আপনার ধর্মে, আচারে ও আদর্শে অবিচল থাকিয়া তিনি লোক-কল্যাণ সাধনায় অপেক্ষাকৃত নীরবে এবং নিভৃতে তাঁহার নিরহংকৃত জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন নৈষ্ঠিক জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য মহাত্মা শিশিরকুমারের স্বদেশপ্রেম, সাংবাদিকতা এবং অধ্যাত্ম জীবনের আদর্শ তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সমাজ ও দেশ-সেবার ক্ষেত্রে কর্মসাধনায় শেষ জীবনে তাঁহার অক্লান্ত উৎসাহ এবং উদ্যম পরিলক্ষিত হইত। আমরা পরম সম্ভ্রম সহকারে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

সাম্রাজ্যবাদীদের অপচেষ্টা

বিহারের পুলিশ সম্প্রতি পাটনা শহরের কয়েকটি স্থানে খানাতল্লাসী করিয়া প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী ও বোমা উদ্ধার করিয়াছে। ভারতের নানা স্থানে এই সব বে-আইনী অস্ত্রের কারবারের সংগে বিলাতের গভর্নমেণ্টের যোগ আছে কিনা, জানা যায় নাই। এ সম্বন্ধে সময় থাকিতে বিশেষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং যাহাতে অবিলম্বে এই ধরণের মারাত্মক প্রচেষ্টার প্রতিবিধান হয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তেমন ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া দরকার।

আবগারী নীতি

আদিবাসীসমাজের একটা মস্তবড় আচার-গত দোষ—মদ্যপানের অভ্যাস। শুধু উৎসব-রাত্রির মুহূর্তগুলিকে প্রাণলাভ করার জন্য নয়, প্রাত্যহিক জীবনেও মদের নেশা আদিবাসীকে গ্রাস করে বসে আছে। শুধু আদিবাসী পুরুষ নয়, মেয়েদের মধ্যেও এ নেশা সমানভাবে প্রবল। কতগুলি গোষ্ঠী মদের প্রতি এত আসক্ত যে, তারা আর সময়-অসময় বিচার করে না। কাজের সময়ে হোক বা কাজ ফাঁকি দিয়ে হোক এবং অবসরের সময় তো কথাই নেই—মদ পেলেই হলো। সুতরাং আদিবাসীর অভ্যাসকে বরং বলা যায় পানোন্মত্ততা।

পানোন্মত্ততা কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর নৈতিক চরিত্রকে যথেষ্ট শিথিল ও অবনত করেছে। এ সত্যে সন্দেহ নেই। পানোন্মত্ততার জন্যই বহু উৎসবের বিহ্বলতা শেষ পর্যন্ত যৌন ব্যভিচারের উৎসবে পরিণতি লাভ করে। এদের পানোন্মত্ততার দাবী মেটাতে গিয়েই পয়সার ঘাটতি পড়ে এবং একে একে জমি, শস্য, গরু ও বাছুর মহাজনের হাতে বন্ধকদশাপ্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন উঠে যে, আদিবাসীদের মধ্যে এত পানোন্মত্ততা কেন? এ বিষয়ে আদিবাসীর সামাজিক চরিত্র অবশ্যই দায়ী; কিন্তু এর ওপরেও একটা কারণ আছে। গবর্ণমেণ্টের আবগারী নীতি আদিবাসীর সাধারণ রকমের পানদোষের অভ্যাসকে পানোন্মত্ততার অভ্যাসে পরিণত হতে বাধ্য করেছে—অতি দুঃখের বিষয় হলেও কথাটা অত্যন্ত সত্য। ইংরেজ সরকারের নতুন ভূমি ব্যবস্থার ধারক ও বাহক হিসাবে যেমন জমিদার ও মহাজন আদিবাসী অঞ্চলে এক নতুন পদ্ধতির অর্থনৈতিক শোষণ সুরু করেছিল, ইংরাজ সরকারের আবগারী নীতি (Excise Policy) অনুসারেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদ্য বিক্রেতার দল (কালার বা কালাল) আদিবাসীর অদৃষ্টাকাশে আর এক কুগ্রহের মত আবির্ভূত হলো। মদের দোকানের গদিতে বসে কালারের দল এক বোতল তরল মূঢ়তার লোভ দেখিয়ে আদিবাসীর সুখ-স্বাস্থ্য, অর্থ ও মস্তিষ্ক কিনে ফেলবার সুযোগ লাভ করলো।

মিঃ ফুলার (Mr. Fuller) মন্তব্য করেছেন: "গোন্দদের অবস্থা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রত্যেক রিপোর্টেই স্বীকৃত হয়েছে যে, গোন্দদের সর্বনাশের কারণ সুরাপানের আসক্তি। এই সঙ্গে এ ধারণাও করা যেতে পারে যে, গবর্ণমেণ্টের আবগারী নীতি গোন্দদের এই অভ্যাসকে প্রতিরোধ করেনি। একথা শোনা গেছে যে, গোন্দরা কয়েক পুরুষ আগে এ রকম একটা মাতাল সমাজ ছিল না। বৃটিশ শাসনের সময় থেকেই এই মাতাল হওয়ার অভ্যাস বেড়ে গেছে।" (১)

মিঃ ফুলার সরকারী আবগারী নীতির বিরুদ্ধে স্পষ্টাস্পষ্টি অভিযোগ আনেননি, শুধু 'শোনা গেছে' বলে অভিযোগটাকে কিছুটা হালকা করে রেখেছেন।

আদিবাসী অঞ্চলে মদ্য সরবরাহ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগ দুইটা প্রথার মধ্যে একটা প্রথা অবলম্বন করে থাকেন—(১) আরক বা স্পিরিট সরবরাহের প্রথা (Central Distillery) অথবা (২) চোলাই প্রথা (Out still system) সেণ্ট্রাল ডিস্টিলারি, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের এক একটি কেন্দ্রীয় আরক তৈরীর ভাটিখানা থাকে, সেখান থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের ভেণ্ডারদের কাছে আরক প্রেরিত হয়। ভেণ্ডার জলের সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণে আরক মিশিয়ে বিভিন্ন নম্বরের (Strength) মদ তৈয়ারী করে এবং বোতলে পুরে বিক্রী করে। আউট-স্টিল বা চোলাই প্রথা হলো, মদ্য বিক্রেতাকেই নিজ নিজ ভাটিতে মদ চোলাই করবার লাইসেন্স দেওয়া। গবর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে তাঁর আবগারী নীতির পরিবর্তন করে থাকেন। এই কথাটার অর্থ হলো—হয় আরক সরবরাহ প্রথা উঠিয়ে দিয়ে চোলাই প্রথা অথবা চোলাই প্রথা উঠিয়ে দিয়ে আরক সরবরাহ প্রথার প্রবর্তন। এই পলিসি পরিবর্তনের মধ্যে বস্তুত কোন নৈতিক পরিবর্তন নেই। কারণ উদ্দেশ্যটা একই থাকে, অর্থাৎ সরকারী আয়। যে প্রথার সাহায্যে যখন আয় হবার আশা থাকে, তখন সেই প্রথা চালু করা হয়। আদিবাসীদের পানাভ্যাস সংযত হোক, আবগারী পলিসির মধ্যে সে রকম কোন সামাজিক আদর্শের বালাই নেই।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জানতেন আদিবাসী সমাজে মদ্যাসক্তি একটা ব্যাপক সামাজিক কুপ্রথা। শাসন ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্ট নাকি আদিবাসীদের সম্পর্কে রক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। অথচ তাঁদের আবগারী নীতির প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার কোন আদর্শ এর মধ্যে ছিল না। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত আদিবাসী অঞ্চলে মদ 'চোলাই প্রথা' (Out still system) প্রচলিত ছিল, পরে কেন্দ্রীয় ভাটিখানা (Central Distillery) থেকে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০৭-৮ সালে কেন্দ্রীয় ভাটিখানা থেকে মদ সরবরাহের ব্যাপারটা খাস সরকারী পরিচালনায় না রেখে ব্যবসায়ীদিগের কাছে ঠিকা দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্টের আবগারী নীতি যে ভাবে পরিবর্তিত ও পরিচালিত হয়েছে, তার মধ্যে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, আদিবাসীদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাসকে সংযত বা সীমাবদ্ধ করার কোন চেষ্টা হয়েছে; অথচ মদ্যাসক্তিই আদিবাসীদের আর্থিক দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ।

গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা অনুযায়ী তিন রকম মদ্য প্রস্তুত এবং বিক্রয় হতো। (১) মহুয়া ফুল থেকে তৈরী আরক বা স্পিরিট, (২) হাঁড়িয়া বা পচাই অর্থাৎ ভাত থেকে তৈরী মদ, (৩) নম্বরী মদ (liquor) চোলাই প্রথার (outstill) দ্বারা কোল হানের হো সমাজের ভয়ানক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। ১৯৩৪ সালে বিহার ও উড়িষ্যার আইনসভার (Legislative Council) বেসরকারী সদস্যরা 'কয়লা খনি অঞ্চল ও অন্যান্য জেলায় চোলাই প্রথা সম্বন্ধে একটা তদন্তের প্রস্তাব করেন; কিন্তু আইনসভা সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। (২) রাঁচি জেলায় ১৯০৪ সালে পর্যন্ত চোলাই প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তারপর 'কেন্দ্রীয় ভাটিখানা' প্রথা কায়েম করা হয়। রাঁচীর কোন কোন অংশে প্রাক্তন চোলাই প্রথাও বজায় রাখা হয়। বিক্রী করার জন্যে নয়, নিজেদের প্রয়োজনের জন্য হাঁড়িয়া (Rice-Beer) তৈরীর অধিকার আদিবাসীদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তবুও লক্ষ্য করার বিষয় হলো

(1) Review of the Progress of Central Province.

(2) A tribe in Transition—D. Mojumdar.

যে, আবগারী বিভাগের উদ্যোগে 'সরকারী মদ' বিক্রয়ের পরিমাণ খুবই বেশী। (১) ১৯০৭ সালে মানভূমে চোলাই প্রথা রহিত ক'রে দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় ভাটিখানা প্রথা প্রবর্তিত হয়। আসানসোলের কেরু কোম্পানী (Carew & Co.) তাদের ভাটিখানা থেকে জিলার সর্বত্র মদ সরবরাহের ঠিকা (Contract) লাভ করে। মির্জাপুরে জেলার আদিবাসী অঞ্চলে প্রথম দিকে এক একটা এলাকা ভাগ করে নিয়ে ঠিকেদারের হাতে মদ তৈরী ও বিক্রীর ভার ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে ১৮৬৩ সালে কেন্দ্রীয় ভাটিখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাটিখানা করেও আবগারী আয় খুব আশাজনক হয় নি, কারণ পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্য থেকে গোপনে আমদানী করা মদ ও বে-আইনীভাবে তৈরী করা মদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরকারী মদ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আবগারী বিভাগ আবার ঠিকেদারের হাতে মদ তৈরীর ভার অর্পণ করে। আবার ১৮৯৬ সালে চোলাই প্রথা কায়েম করা হয়। এই ঘন ঘন প্রথা পরিবর্তনের মধ্যে যে নীতি ছিল, তা আর চিন্তা করে বুঝতে হয় না। যখনি যে প্রথায় আবগারী আয়ের ভরসা কমেছে, তখনি সে প্রথা তুলে দিয়ে ভিন্ন প্রথার পরীক্ষা হয়েছে।

আদিবাসী অঞ্চলে গভর্নমেণ্টের আবগারী নীতিতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখা যায়। যে অঞ্চলে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মত হাঁড়িয়া বা পচাই তৈরীর অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং হয়ে থাকে, সেখানেও গভর্নমেণ্ট তাঁর বোতল-ভরা মার্কা-মারা নম্বরী মদ বিক্রীর জন্য উপস্থিত হয়েছেন। গঞ্জাম এবং ভিজাগাপট্টম এজেন্সী গভর্নমেণ্টই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য লোকে নিজের ঘরেই হাঁড়িয়া বা পচাই তৈরী করতে পারবে (Notification of Board of Revenue, July 1873) কিন্তু এ সত্ত্বেও আবগারী বিভাগ এই অঞ্চলে কখনো 'চোলাই' এবং কখনো 'কেন্দ্রীয় ভাটিখানা' পদ্ধতিতে আদিবাসীদের কাছে সরকারী নেশা বিক্রয় করতে থাকেন। কোন কোন অঞ্চলের আদিবাসীকে পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য হাঁড়িয়া তৈরী করতে হ'লে সরকারী লাইসেন্স নিতে হয়।

সরকারী পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে সময় সময় দু'একটা মন্তব্য করেছেন যে, মদ আদিবাসীদের নানাভাবে ভয়ানক ক্ষতি করছে। কিন্তু এসব মন্তব্য সরকারের আবগারী নীতির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। নীতি পরিবর্তনও করাতে পারে নি। বড় বেশী উচ্চবাচ্য হলে আবগারী বিভাগ হয়তো বড় জোর তাঁদের প্রিয় দুটো প্রথার মধ্যে একটার বদলে আর একটা প্রথা চালু করে দিয়েছেন। সেখানে চোলাই প্রথা ছিল, সেখানে কেন্দ্রীয় ভাটিখানা প্রথা এবং যেখানে কেন্দ্রীয় ভাটিখানার প্রথা ছিল, সেখানে চোলাই প্রথা। এর বেশী নয়।

আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে মাঝে মাঝে সংস্কার আয়োজন হয়েছে এবং তারা নিজেরাই সচেষ্ট হয়ে মদ্য বর্জনের জন্য দাবী ও আন্দোলন করেছে। ১৮৭১ সালে খোন্দমলের খোন্দ সমাজ নিজেরাই গভর্নমেণ্টকে মদ বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। ১৯০৮ সালে উড়িষ্যার খোন্দেরা মদ্য বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করে। গোন্দ সমাজে বেশ সংস্কার আন্দোলন হয়েছে, তাতেও দেখা যায় যে, তারা মদ্য বর্জনের জন্য চেষ্টা করেছে। ১৯০৭—১২ সালে মান্দলা জেলার আদিবাসীদের মদ্য বর্জন আন্দোলন খুবই প্রসার লাভ করে এবং সফলও হয়। কিন্তু তারপরেই আবার যথাপূর্ব মদ্যাসক্ত অবস্থা ফিরে আসে; কেন এ রকম হলো, তার রহস্য গভর্নমেণ্ট জানেন।

ধর্মগত আচার ও পূজা এবং উৎসবে আদিবাসীদের পক্ষে মদের প্রয়োজন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট আদিবাসীদের এই সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে জঙ্গলে জঙ্গলে মদ বিক্রীর ব্যবস্থা করেছিলেন, গভর্নমেণ্টকে এতটা নিঃস্বার্থ সংস্কৃতিসচেতন মনে করা যায় না। মদ্যপানের অভ্যাস প্রসার লাভ করুক—বস্তুত আবগারী বিভাগের উদ্যোগ এই লক্ষ্যে চালিত হয়েছে। আদিবাসীকে হাঁড়িয়া তৈরীর অবাধ অধিকার দেওয়া কোন উদারনীতির প্রমাণ নয়। আদিবাসীকে বিনা খাজনায় জমি বন্দোবস্ত করে দেবার মতই এটা একরকম কূটনৈতিক উদারতা। জমিতে চাষের কাজে একবার অভ্যস্ত করিয়ে নিয়ে তারপর উঁচুদরে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ভালমতই হতো। এক্ষেত্রেও হাঁড়িয়া খাইয়ে আদিবাসীদের নেশা একবার ভালমত পাকিয়ে দিতে পারলে, তারপর কড়া সরকারী মদের জোগান দিয়ে চাহিদা মেটানো সহজ হবে, এই বেনিয়াবুদ্ধির দ্বারাই গভর্নমেণ্টের আবগারী নীতি গঠিত। ভীল অঞ্চলে মাঝে মাঝে গভর্নমেণ্ট সাধারণ রাজস্বের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আবগারী আয় বাড়াবার উদ্যোগ করেছেন এবং আবগারী আয় বৃদ্ধির অর্থ মদ বিক্রীর বৃদ্ধি।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় গোন্দ সমাজ সুরা-বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করে। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রবলভাবে চলতে থাকে। কিন্তু ইংরেজ সমালোচক এই আন্দোলনকে কি চক্ষে দেখেছেন, তার পরিচয় দেওয়া হলো।

"আদিবাসীদের পক্ষে এই সব সংস্কারের (মদ্য বর্জনের) যে প্রচেষ্টা চলছে, তার মূলে কি আছে? মদ জিনিসটা খারাপ, অথবা মদ খেলে স্বাস্থ্যহানি হয়, মদ ছেড়ে দিলে লোকের স্বাস্থ্য ভাল হবে—এসব ধারণা এই প্রচেষ্টার পেছনে নেই। মদ বর্জন করলে উঁচু জাত হয়ে সম্মান পাওয়া যাবে, এই রকম একটা ধারণাই এর পেছনে রয়েছে।" (১) সমালোচক মিঃ উইলসের মনস্তত্ত্ব সত্যই অদ্ভুত। উঁচু জাত হবার জন্যে অথবা লোক-সম্মানিত সমাজে উন্নীত হবার জন্য যদি কেউ মদ্য বর্জন করে, তবে তাকে নিন্দা করার কি থাকতে পারে?

বিখ্যাত আদিবাসী ও হরিজন সেবক শ্রীঅমৃতলাল ঠক্কর লিখেছেন—"সাধারণত সরকারী অফিসারের দল, বিশেষ করে আই-সি-এস অফিসার এবং নৃতাত্ত্বিকেরা (Anthropologists) আদিবাসী সমাজে মদ্য-বর্জন ব্যবস্থা (Prohibition) পছন্দ করেন না। গভর্নমেণ্টের আবগারী নীতির ক্রিয়াকলাপ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, গভর্নমেণ্ট আদিবাসী সমাজে সুরাপানের ব্যাপকতাই কামনা করেছেন। এর ফলে আদিবাসী সমাজকে প্রচণ্ড আর্থিক ও নৈতিক দণ্ড দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু সব ইংরেজ সমালোচক উইলস এল্যুয়িন বা গ্রিগসনের মত নয়। মিঃ ডি সিমিংটন সুস্পষ্টভাবেই মন্তব্য করেছেন—"আমি একথা না বলে পারছি না, যদি মদ্য-বর্জনের ব্যবস্থা কোথাও চালু করার প্রয়োজন ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে বিশেষ করে ভীল ও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীদের সম্পর্কেই সে ব্যবস্থা চালু করলে ন্যায়সংগত কাজ হবে।" (২)

জঙ্গল আইন

আদিবাসীদের জন্য সরকারী উদ্যোগে ভূমিঘটিত যেসব ব্যবস্থা ও সংস্কার হয়েছিল, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের জীবিকা মাত্র ভূমির ওপর নির্ভর করেছিল না। ভূমির মতই জঙ্গলও তাদের জীবন ও জীবিকার একটা বড় আশ্রয়। সুতরাং জঙ্গল সম্বন্ধে যে কোন বিধিনিষেধ আইন বা ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া আদিবাসীদের জীবনে দেখা দেবে, এটা স্বাভাবিক সত্য। জঙ্গল সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট কি এবং কতখানি উদ্যোগ করেছিলেন, তার ইতিহাস খোঁজ করা যাক।

সাঁওতাল পরগণার খাস-শাসিত Directly administrated) দামনি কো অঞ্চলের বৃহৎ অংশ অরণ্যাবৃত। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পরও দীর্ঘকাল ধরে জঙ্গলের কোন জরিপ ও বন্দোবস্ত হয় নি। চাষ করার পক্ষে উপযোগী পতিত অথবা জংলি জমি সাঁওতাল ও পাহাড়িয়ারা নিজের জমি হিসাবেই উপভোগ করতো। ১৮৭১ সালে গভর্নমেণ্ট প্রথম দামনি কো অঞ্চলের 'সরকারী জঙ্গলের' সীমা নির্ধারণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কিন্তু সেখায় সাঁওতালদের মধ্যে বিক্ষোভ চলছিল এবং

(1) District Gazetteer of Ranchi (1917).

(1) Aboriginal Problem in the Balaghat District—C. U. Wills.

(2) Report of the Aboriginal and Hill-Tribes (Bombay)—D. Symington.

গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনা কয়েক স্থগিত থাকে। ১৮৭১ সালে লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পলের আমলে ৩৬ বর্গমাইল জঙ্গল 'সংরক্ষিত জঙ্গল' (Reserved Forest) ব'লে প্রথম ঘোষিত হলো। পর বৎসর ডেপুটি কমিশনারের হাতে জঙ্গল পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয় এবং সরকারী দপ্তরে একটা 'জঙ্গল বিভাগ' (Forest Department) কায়েম করা হয়। ১৮৭৯ সালের জরিপ হয়ে যাবার পর জঙ্গলের গাছ সংরক্ষণের নীতি কার্যকরী হতে আরম্ভ করে। জরিপ করা বন্দোবস্ত এলাকাতেও শালগাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়। গভর্নমেণ্ট নিজের বিবেচনামত এক একটা এলাকাকে 'জঙ্গল এলাকা' বলে ঘোষণা করতে থাকেন। ১৮৯৪ সালে গভর্নমেণ্ট দামিন কো'র সমস্ত বে-বন্দোবস্ত এলাকাকে 'সংরক্ষিত জঙ্গল' বলে ঘোষণা করেন। ঘোষণার মধ্যে একটা প্রতিশ্রুতি ছিল—'সেইরিয়া পাহাড়িয়ারা জঙ্গল সম্পর্কে যে সব ব্যক্তিগত বা সামাজিক অধিকার ভোগ করে আসছিল, সেসব অধিকার বজায় রইল।' কিন্তু সরকারী জঙ্গল বিভাগ কার্যক্ষেত্রে এই নীতি মেনে চলেন নি, সেইরিয়া পাহাড়িয়াদের অধিকারে বাধা দিয়ে তাদের বহু দুর্ভোগে পতিত করা হয়। ১৯০৬ সালে ১৫৩ বর্গ-মাইল জঙ্গলের মধ্যে ১৪৩ বর্গমাইল ডেপুটি কমিশনারের পরিচালনাধীন হয়ে যায়। ১৯১০ সালে সীমানা আরও বাড়িয়ে দিয়ে ২৯২ বর্গমাইল জঙ্গলকে 'সরকারী জঙ্গলে, অর্থাৎ সংরক্ষিত জঙ্গলে পরিণত করা হয়।

সিংভূমের কোলহান অঞ্চলেও এই নীতি অনুসৃত হতে থাকে এবং ৭০০ বর্গ মাইলেরও অধিক জঙ্গলকে হো' সমাজের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে খাস সরকারী জঙ্গলে পরিণত করা হয়।

খোন্দমল অঞ্চলে কোন 'সংরক্ষিত জঙ্গল' ছিল না, সম্প্রতি এ বিষয়ে একটা চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। গঞ্জাম এজেন্সীতে জঙ্গলের কিছু অংশকে 'সংরক্ষিত জঙ্গল' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। খোন্দ অঞ্চলে প্রচুর জঙ্গল আছে, কিন্তু শবর অঞ্চলে খুবই কম। কিন্তু তবুও শবর অঞ্চলের জঙ্গলকেই সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। কোরাপাট অঞ্চলে ১৬০০ বর্গ মাইলেরও বেশী জঙ্গল 'সংরক্ষিত' ক'রে রাখা হয়েছে।"

মধ্যপ্রদেশে গভর্নমেণ্টের জঙ্গল নীতি কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হতে থাকে। এই প্রদেশের জঙ্গল শুধু বৃক্ষসম্পদে ধনী নয়, জঙ্গলের মাটীর নীচে বহু খনিজের আধার রয়েছে। তাছাড়া জঙ্গল অঞ্চলেই প্রধান গোচারণভূমিগুলি অবস্থিত; সুতরাং জঙ্গল এলাকাই মধ্যপ্রদেশের ঐশ্বর্যের একটা বড় আশ্রয়। জঙ্গলের বা জঙ্গল এলাকার থেকে সম্পদ আহরণ করতে হ'লে আদিবাসী সমাজের সহযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজন—এই ধারণা থেকেই গভর্নমেণ্ট তাঁর জঙ্গল-নীতি নির্ধারিত করেন। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে যে 'ঝুম' চাষের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেটা জঙ্গলের পক্ষে ক্ষতিকর। তবুও গভর্নমেণ্ট কড়াকড়ি করে ঝুম চাষের প্রথা বন্ধ করতে উৎসাহী ছিলেন না। গভর্নমেণ্টের আশংকা ছিল, 'ঝুম' প্রথা বন্ধ ক'রে দিলে, আদিবাসীরা হয়তো এলাকা ছেড়ে স্থানান্তরে চলে যাবে, যাযাবর জীবন গ্রহণ করবে এবং আদিবাসীরা যাযাবর হ'য়ে গেলে 'জঙ্গলের সম্পদ আহরণ করার' মত উপযুক্ত শ্রমিক পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে স্যার রিচার্ড টেম্পলের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"আশা করা যায় যে, পাহাড়ী লোকেরা ক্রমে ক্রমে উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করবে। যদিও তারা অজ্ঞ ও রূঢ় প্রকৃতির মানুষ, তাদের মধ্যে উৎসাহ ও সহিষ্ণুতার শক্তি আছে। তাদের গোষ্ঠী আছে, গোষ্ঠীপতি সর্দার আছে। তাদের মধ্যে সর্বদা একটা লুঠেরা প্রবৃত্তি দেখা যায়। এটাও বহু ঘটনায় দেখা গেছে যে, তারা সশস্ত্রভাবে বাধা দেবার যোগ্যতা রাখে। তাদের কোন অভ্যস্ত লোকাচার বা প্রথাকে বন্ধ করে দেবার ফলে যদি তারা আর্থিক অভাবে পতিত হয়, তবে তারা লুঠ করেই জীবিকা অর্জন করবে, বিশেষ ক'রে গৃহপালিত পশু চুরি করার দিকে ঝুঁকে পড়বে। এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রদেশের সমতল অঞ্চল থেকে গবাদি পশু যেসব বড় বড় গোচারণভূমিতে এসে খাদ্য লাভ করে, সেই সব গোচারণভূমিগুলি এই পাহাড়ী আদিবাসী অঞ্চলেই অবস্থিত। যদি আদিবাসীরা এখানে না থাকে, তবে জঙ্গল এলাকার অবস্থা চরম দুর্দশার স্তরে নেমে যাবে। কারণ, জঙ্গল এলাকা থেকে মানুষের বসতি উঠে যাবে, জমি বন্দোবস্ত ও জঙ্গল কেটে পথ করার ভরসাও লুপ্ত হবে। বন্যজন্তু সমাকীর্ণ, ম্যালোরিয়ায় আচ্ছন্ন, পথশূন্য জঙ্গল অঞ্চলে কোন বন-কর্মচারী বা কাঠুরিয়ার পক্ষে প্রবেশ করার সাধ্য হবে না, বাস করাও সম্ভব হবে না। আর একটা সত্যিকারের আপদ জঙ্গলের বন্যজন্তু। এদের উপদ্রবে ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে। বন্যজন্তুগুলিই যাতে জঙ্গল এলাকার প্রভু হয়ে উঠতে না পারে, তার সম্ভাবনা রোধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পাহাড়ী সমাজকে জঙ্গল এলাকায় স্থায়ী বসতি করিয়ে দেওয়া।" (১)

স্যার রিচার্ড টেম্পলের উক্তির মধ্যে গভর্নমেণ্টের আদিবাসী-নীতি এবং সেই সঙ্গে জঙ্গল-নীতির মূলে সূত্রটুকু পাওয়া যায়। পাহাড় ও জঙ্গল এলাকার সম্পদ সাফল্যের সঙ্গে আহরণের জন্য আদিবাসীকে দরকার হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে, 'জঙ্গল সংরক্ষণের' (Preservation of forests) এবং আদিবাসী সংরক্ষণের (Preservation of Tribes) নীতির একই উদ্দেশ্য—জঙ্গলের সম্পদ আহরণ।

এই নীতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে এই ধারণাই হবে যে, আদিবাসীর উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে গভর্নমেণ্টের জঙ্গল-নীতি তৈরী হয়নি। বরং বলা যায়, জঙ্গলের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে আদিবাসী-নীতি তৈরী করা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হলো, জঙ্গল এলাকার সম্পদ আহরণ, এই উদ্দেশ্যের জন্য আদিবাসীকে কতখানি কাজে লাগান যায়, গভর্নমেণ্ট সর্বদা সেদিক থেকেই চিন্তা করেছেন। গভর্নমেণ্টের জমি-নীতিরও যে পরিচয় ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে, তার মধ্যেও এই একই উদ্দেশ্যের গূঢ় লীলা দেখতে পাওয়া যায়। আদিবাসী অঞ্চলে জমির উন্নতির জন্যেই গভর্নমেণ্ট অনেক উদারতা রেগুলেশনে জরিপ-বন্দোবস্ত ও বিশেষ আইন করেছেন। আদিবাসীর জমিকে শস্যপ্রসূ করার নীতি এর মধ্যে ছিল না, সেটা পরোক্ষভাবে হয়তো হয়েছে। মুখ্য নীতি ছিল জমিকে খাজনাপ্রসূ করা। এই উদ্দেশ্যেই গভর্নমেণ্ট জমির আবাদ বৃদ্ধি করাবার জন্য প্রথম প্রথম বিনা খাজনায় আদিবাসীর হাতে জমি তুলে দিয়েছেন। কৃষিবিমুখ আদিবাসী একবার আবাদে অভ্যস্ত ও দীক্ষিত হওয়ামাত্র অল্প দিনের মধ্যেই গভর্নমেণ্ট নতুন জরিপ ও বন্দোবস্ত করে খাজনা-প্রথা চালু করে দিয়েছেন।

(1) Aboriginal tribes of the Central Provinces—Hislop.

(২)

কথাটা শুনে প্রথমটা বেশ একটু চমকে ছিলো সীমাচলম। মা পানের দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়েই থাকে সে।

মা পান তীব্র ভ্রূকুটি করে ওর মুখের দিকে চেয়েঃ ওঃ, এই নাকি মুরোদ বাবুর! আগেই জানতুম আমি কালাদের দিয়ে কোন কাজ হবার যো নেই। এদেশের ছোট্ট একটা ছেলেও এ কাজ করতে পারে নির্ভয়ে। কাজটা আর এমন কি শক্ত! কোকেনের প্যাকেটটা ঘিয়ের টিনের মধ্যে প্যাক করা থাকবে। এখান থেকে ইনশিন মাইল আটেকের পথ, তাও তো আর হেঁটে যেতে হবে না। রেলে চাপলে আধ ঘণ্টার ব্যাপার। তারপর স্টেশনের সামনেই দোতলা বাংলো মজিদ সাহেবের—তার হাতে প্যাকেটটা কেবল দিয়ে আসা।

ব্যাপারটা অবশ্য শক্ত কিছুই নয়, একটা জিনিস আট মাইল দূরে—এক ভদ্রলোকের হাতে পেঁছে দেওয়া। কিন্তু তবু বেশ কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে সীমাচলম। অচেনা জায়গা, নতুন মানুষ—কি হতে শেষ-কালে কি হ'য়ে পড়বে। মা পানের পীড়া-পীড়িতে অবশেষে রাজী হ'ল সীমাচলম। ইনশিন যাওয়ার পথে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু স্টেশনে নেমে মহামুস্কিলে প'ড়ে যায় সীমাচলম। সামনেই অবশ্য দোতলা বাংলো রয়েছে তবে একটা নয় গোটা সাতেক। সব-গুলোরই হুবহু এক প্যাটার্ণ—এক ধরণের জানলা আর সিঁড়ির সারি—এমন কি সামনের বাগানগুলো পর্যন্ত এক মাপের। ঘেমে ওঠে সীমাচলম। কাকে জিজ্ঞাসা করা যায় মজিদ সাহেবের কথা, সহজ সরল জিজ্ঞাসা হ'লে ভয়ের অবশ্য কিছুই ছিলো না, কিন্তু হাতের কোকেনের প্যাকেটটাই যতো নষ্টের মূল। চোরাই কোকেন কেনেন মজিদ সাহেব, সুতরাং লোক যে সুবিধের নয় তা বেশ বুঝতে পারে সীমাচলম। ব্যাপার খারাপ দেখলে হয়ত বেমালুম গাঢাকা দিয়েই বসবেন তিনি, নয়ত নিজেই পুলিশে খবর দিয়ে সীমাচলমকে চালান করে দেবেন থানায়। অনেকবার ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় সীমাচলমের,—কিন্তু মা পানের ঠোঁট উল্টানো হাসি আর আলিমের কঠিন মুখের কথা মনে হ'তেই দমে যায় সে। জলে বাস করে বিবাদ করা কুমীরের সঙ্গে কতদিনই বা চলাতে পারে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সীমাচলম—আর নয়, হোটেল সে এবার বদলাবেই।

রাস্তার সামনে একটা বেয়ারাকে দেখে সাহস করে এগিয়ে যায় সীমাচলম।

ঃ মজিদ সাহেবের কুঠি কোথায় বলতে পারো?

ঃ ওই তো তিন নম্বর বাড়ি—বাঁ দিকে।

নির্দেশমত এগিয়ে যায় সীমাচলম। গেটের পাশেই ছোট্ট একটু বাগান। কাঠের একটা বেঞ্চিতে বৃদ্ধা একজন ব'সে বসে কার্পেটের আসন বুনছিলো। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে একেবারে তাঁর সামনে গিয়েই দাঁড়ায় সীমাচলমঃ

মজিদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!

বৃদ্ধা মুখ তোলে না কার্পেট থেকেঃ মজিদ সাহেব বাইরে গিয়েছেন হপ্তাখানেকের জন্য।

মুস্কিলে পড়ে যায় সীমাচলম। মজিদ সাহেব বাড়িতে না থাকলে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়নি মা পান। অগত্যা পায়ে পায়ে ফিরেই আসছিলো সে, হঠাৎ বৃদ্ধার গলার আওয়াজে আবার ফিরে দাঁড়ায়ঃ ওহে ছোকরা, শোন একটু।

মুখটা তুলে চশমার ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে বৃদ্ধা সীমা-চলমের আপাদ মস্তক, তারপর ভুরু দুটো গম্ভীর গলায় বলেঃ

তুমি কি মজিদ সাহেবের জন্য ঘি এনেছো দেশ থেকে?

সীমাচলমের মাথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যায়। সে একটু নীচু হ'য়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলেঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, বহুকষ্টে পুরানো ঘি যোগাড় করে এনেছি মজিদ সাহেবের জন্য। ওঁর বাতের এবার নিশ্চয় উপকার হবে। আমার ঠাকুমার আমলের জমানো ঘি—প্রায় একশ বছরের পুরানো!

বৃদ্ধার ঠোঁট দুটো একটু কুঁচকে ওঠে হাসির আবেগে, তারপর বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকেঃ হামিদা, বাগানে একটু এসো তো!

চমক ভাঙে সীমাচলমের। ঝোপের পাশ থেকেই তন্বী তরুণী একটি বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় বৃদ্ধার গা ঘেঁষে। অপরূপ লাবণ্যময়ী তরুণী। সীমাচলম সমস্ত কিছু ভুলে বেশ কিছুক্ষণ চেয়েই থাকে শুধু। কাঁচা সোনার মত গায়ের রং। স্তবকে স্তবকে কালো চুলের গোছা নেমে এসেছে সুডৌল পিঠের ওপরে। টানা দুটি চোখের অশেষ জিজ্ঞাসা। হাসির ভঙ্গিতে গড়া রক্তিম অধর।

এই ছেলেটি তোমার বাবার জন্য পুরানো ঘি এনেছে কোথা থেকে। এবার নিশ্চয় তোমার বাপের বাতের কষ্ট অনেকটা কমবে! কি হে ছোকরা বাতের কথাই তো বললে তুমি?

ঘাড় নাড়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না সীমাচলমের।

মেয়েটি ফিক করে একটু হেসে বলেঃ আসুন আমার সঙ্গে। ঘিয়ের টিনটা দিন না আমার হাতে।

একতলায় বসবার ঘরে ঢুকেই হাসিতে ভেঙে পড়ে মেয়েটি। সোফার ওপর আছড়ে পড়ে খিল খিল করে হাসতে থাকেঃ ও, আচ্ছা লোক তো আপনি। এতগুলো টাটকা মিথ্যে কথা বলতে আপনার বাধলো না একটু। সাতপুরুষে আমার বাপের বাত নেইঃ হাসিতে আবার লুটিয়ে পড়ে মেয়েটি।

সীমাচলম ওঠবার চেষ্টা করে এইবারঃ আমায় বিদায় দিন তাহলে আর মা পানকে গিয়ে কি বলতে হ'বে বলে দিন। অনেকটা সামলে নিয়েছে হামিদাঃ হ্যাঁ, বলবেন মাসীকে যে আরো পুরানো ঘি যদি মজুদ থাকে, তবে এই শনিবারের মধ্যেই যেন পাঠিয়ে দেন।

ঘাড় নেড়ে উঠে পড়ে সীমাচলম। সিঁড়ির কাছ অবধি এসে অনুভব করে মেয়েটিও আসছে পিছনে পিছনে। গেট পার হবার সময় মেয়েটি জোরপায়ে একেবারে তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

মুচকি হেসে বলেঃ সামনের শনিবার আপনিই আসবেন তো ঘি নিয়ে।

সমস্ত সংকল্প ভেসে যায় সীমাচলমের। মেয়েটির চোখে কিসের যেন যাদু মাখানো, সব কিছু ভুলিয়ে দেয়—পুরানো ব্যথা আর বেদনা। ঘাড় নেড়ে গেট পার হ'য়ে আসে সীমাচলম।

একেবারে হোটেলের দরজায় দেখা হ'য়ে যায় মা পানের সঙ্গে। একটু যেন উৎকণ্ঠিতা মনে হয় মা পানকেঃ কি ব্যাপার, এতো দেরী যে? জিনিসটা দিয়ে এসেছো তো ঠিক জায়গায়?

ভারিক্কি চালে ঘাড়টা কাত করে সীমাচলম। কালাদের অতটা অকেজো ভেবো না। সাত সমুদ্দুর পার হ'য়ে এদেশে আসতে পারে যারা, তারা সব কিছুই ক'রতে পারে।

তাই নাকি? আজ যে খুব বোল ফুটছে দেখছি। হামিদা বিবির সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে বুঝি। বেশ, বেশ, আলাপটা এগুলো কদ্দুর?

একটু মুস্কিলে পড়ে যায় সীমাচলম। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মুখটা কেমন যেন লাল হয়ে ওঠে ওর আর কানের পাশে উত্তপ্ত একটা পরশ। কোন রকমে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে আসে সীমাচলম।

ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে মা পান। তারপর চোখ দুটো ঘুরিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে—আর বলে :

ফায়া, ফায়া—কতই দেখলুম এ বয়সে। রুই কাতলা ঠাঁই পায় না, চাঁদা মাছের নাচন।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে সীমাচলম। একি হলো তার! শুভলক্ষ্মী ক্রমেই যেন সরে যাচ্ছে দূরে, অস্পষ্ট হয়ে আসছে তার যৌবন উজ্জ্বল মূর্তি। প্রকাণ্ড একটা সমুদ্রের ব্যবধান—প্রকাণ্ড একটা সমাজের নিষেধ।

শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার ভাব আসার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে সীমাচলম। নটরাজের মন্দিরে দেবদাসীর সাজে অপূর্ব লাস্যে আর ভঙ্গিতে নেচে চলেছে শুভলক্ষ্মী। এক হাতে তার পঞ্চপ্রদীপ আর এক হাতে চন্দ্রমল্লিকার মালা। ব্রোঞ্জের নটরাজনের মূর্তির প্রশস্ত কপালে প্রবালের টিপ। মন্দিরের পাথরের দেয়ালে দেবদাসীর নৃত্য-ছন্দায়িত দেহের চঞ্চল ছায়ামূর্তি। হঠাৎ অনেক দূর থেকে যেন ফিরে এলো সীমাচলম। মন্দিরের সোপানে গিয়ে দাঁড়াতেই নাচ থামিয়ে তাকে প্রণাম করলো শুভলক্ষ্মী। হাতের মালাটি সাদরে তার গলায় পরিয়ে দিলো। তারপরে আস্তে আস্তে মুখ তুলতেই পঞ্চপ্রদীপের আলোয় তার মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠলো সীমাচলম। একি শুভলক্ষ্মী তো নয়— এ যে হামিদা। টানা দুটি চোখ অপরূপ মমতায় উজ্জ্বল, তন্বী দেহলতায় আগাগোর ছন্দ। ....
আচমকা ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। কাঁচের জানলা দিয়ে ভোরের রোদ তেরচাভাবে বিছানার ওপর এসে পড়েছে। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।

সকালে খাবার টেবিলে ভীড় বিশেষ হয় না। আলিম, মা পান আর সীমাচলম এই তিনজনেই পাশাপাশি খেতে বসে। পরিবেষণ করে হোটেলের ছোকরা চাকর বা ছিট্।

খেতে খেতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যায় সীমাচলম। ব্যাপারটা মাপানের চোখ এড়ায় না কিন্তু। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বলে : মান্দ্রাজী-কালা কিন্তু খুব কাজের লোক। ঘিয়ের টিনটা নির্বিবাদে মজিদ সাহেবের কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে কাল।

মুখ না তুলেই উত্তর দেয় আলিম্ : তাই নাকি! ছোকরা চটপটে বলেই মনে হচ্ছে। দেখো সাবধান, কালারা আবার অতি চালাক হয় প্রায়ই।

সুপের বাটিতে চামচ ডোবাতে ডোবাতে বলে সীমাচলম : সামনের শনিবার কিন্তু অন্য লোক দেবে। আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।

তাই নাকি : ভুরু দুটো তুলে হেসে ফেলে মা পান : ব্যবসাদারী চাল এর মধ্যেই শিখে ফেলেছো দেখছি। তবু যদি আসল মাল নিয়ে যেতে। ফুকো মাল বয়েই এত গুমোর।

: তার মানে

: মানে আর কি। ঘিয়ের টিনই বয়ে নিয়ে গেছো তুমি। তবে টাটকা বা পুরোনো ঘি নয়। তাজা শুয়োরের চর্বির ঘি—মজিদ সাহেবের অবশ্য কোনই কাজে লাগবে না জিনিসটা।

তাই নাকি : খাওয়া ছেড়ে প্রায় উঠে পড়ে সীমাচলম : কোকেন তাহলে ছিলো না মোটেই?

না গো না, ভালো করে জানাশোনাই হলো না তোমার সঙ্গে, এরই মধ্যে কোকেন চালান দিতে পারি নাকি তোমার হাতে। তারপর পুলিশের আস্তানায় গিয়ে ওঠো সোজা আর আমাদের হাতে পড়ুক দাড়ি! বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে সীমাচলম। মা পানের কাছে নিজেকে যেন অপরিণতবুদ্ধি শিশু বলে মনে হয়। এরা সব পারে—ভাব-ভঙ্গীতে ধরা-ছোঁয়ার যো নেই, কিন্তু পেটে পেটে কি ওস্তাদী বুদ্ধি!

কিন্তু এই শনিবারেও তাহলে আমায় ফাঁকা মাল বয়ে নিয়ে যেতে হবে নাকি : হতাশ হয়ে পড়ে সীমাচলম।

না, পরীক্ষায় পাশ করেছো তুমি। এবার তোমার হাতে আসল মালই পাঠানো হবে।

ইতিমধ্যে খাওয়া সেরে তোয়ালেতে মুখ মুছতে শুরু করেছে আলিম্। অবান্তর কথা ওর মোটেই ভালো লাগে না। কম কথা আর বেশী কাজ—ব্যস। এই সব ব্যবসায় কথা যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। সারা বর্মা জুড়ে বলাও হয়ে উঠেছে তার চড়ু. কোকেন আর চরসের কারবার। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে চর আছে, যারা আইন আর পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি কারবার করে চলেছে দিনের পর দিন তাদের অনেককে কখনও চোখেও দেখেনি আলিম্,—চিঠিপত্রের পাট তো নেই। শুধু কাজ ব্যস্। কাজেই অন্য কাউকে বেশী কথা বলতে দেখলেই যেন মাথা গরম হয়ে ওঠে আলিমের। আর মা পান বড্ড বেশী কথা কয়—নিছক বাজে কথা। কিন্তু মা পানের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলবার সাহস আজো হয়নি আলিমের। মা পানকে সে চেনে। একশোটা আলিমকে সে এজির (জামার) ফাঁকে পুরে রাখতে পারে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যায় আলিম। চরসের নল মুখে দিয়ে একটু দিবানিদ্রা। এ না হলে শরীরটা যে ভেঙে পড়বে দুদিনে, অনেক রাত অবধি জাগতে হয় কি না!

মা পানেরও খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলো, তবুও তরকারীর বাটিতে চামচ নাড়াতে নাড়াতে অপাঙ্গে সীমাচলমের দিকে চেয়ে মুচকি হাসে মা পান : খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি।

কেন : একটু চমকে ওঠে সীমাচলম।

: এই হামিদাবানুর জন্য

: হামিদাবানু : শক্ত হয়ে ওঠে সীমাচলম। ব্যাপারটা আর গড়াতে দেওয়া উচিত নয়। এইখানেই শেষ হওয়া এর প্রয়োজন। কঠিন গলায় বলে : মেয়ে দেখলেই তার ধ্যান করা কালাদের স্বভাব নয়। তাদের সমাজ তাদের আরও জোরালো করেই গড়েছে।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হো হো করে হেসে ওঠে মা পান। বেশ জোর হাসি। বাছিট পর্যন্ত চমকে ওঠে সেই হাসির আওয়াজে। বহু কষ্টে কাঁচের বাসনগুলো সামলে সিঁড়ি বেয়ে ও নীচে নেমে যায়।

: সত্যি কালারা কিন্তু ভারী শক্ত এসব বিষয়ে। থায়াওয়াডির গোলমালে বোজী মারা যাবার পরে, আমি মনের দুঃখে আমার জন্মস্থান বেসিনে ফিরে যাই। বেসিনে আমার মা ছিলো, বছর দুয়েক হলো মারা গেছে বুড়ী। একে বয়সও হয়েছিল তার ওপর আবার চোখেও দেখতে পেতো না সে। নিত্য নানান রোগ—ডাক্তার আনতে আনতে আমার প্রাণান্ত। তখন আমার বয়সও বেশ কম ছিলো আর চেহারাও বেশ খাপসুরৎই ছিলো। অবশ্য এখনও যে একেবারে বেসুরৎ হয়ে গেছি তাও নয়—এখনও অনেক জোয়ান মদ্দর মাথা ঘুরে যায়, কি বলো : এইখানে আচমকা থেমে যায় মা পান। বাঁ চোখ মটকে কেমনভাবে যেন চায় সীমাচলমের দিকে তারপর আবার হেসে ওঠে খিল খিল করে : হুঁ, যা বলছিলুম, ডাঃ মাজামদার আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতো। অল্পবয়সী ছোকরা, সবে পাশ করে প্র্যাকটিশ শুরু করেছে, রোগের চেয়ে রোগিনীর উপরই নজর বেশী। কাজেই মার রোগের চিকিৎসা করতে এসে আমার সেবায় মনোযোগ দিলো ভদ্রলোক বেশী করে। মা'র অসুখের অবস্থা বোঝাবার ছল করে নিভৃতে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের কথা আর শেষ হয় না। ব্যাপারটা নিয়ে পাড়াতেও বেশ একটু কানাঘুষা শুরু হলো। একদিন হাটের রাস্তায় ডাক্তার সায়েবের সংগে দেখা হয়ে গেলো, সাইকেলে আসছিলো সে আমাকে দেখেই লাফিয়ে নেমে পড়লো বাহন থেকে. তারপর অনেক রকম কথা। আমার বুড়ীমার বাঁচবার সম্ভাবনা খুবই কম, আর বড়োজোর

হপ্তাখানেক, তারপরে আমার সব ভার ডাক্তার মাজামদার নিতে মোটেই দ্বিধা করবে না। প্রথম আমাকে দেখে অবধি নাকি ডাক্তার সায়েবের কলিজায় ব্যথা উঠেছে। এসব কথা শুনতে আমার আজো ভারী ভালো লাগে। কচি কচি ছোকরাদের ধড়ফড়ানি— পারলে বুঝি প্রাণটাই দিয়ে ফেলে তখুনি। ডাক্তার সায়েবের এ ব্যয়রামের ওষুধ আমার জানা ছিলো। তাড়াতাড়ি পা থেকে পুঁতি-বসান ফানাটা (চটি) খুলে বলি ডাক্তার সায়েবের দিকে চেয়ে : এই ফানাজোড়ার দাম বারো টাকা আর মাণ্ডেলের সিল্কের লুংগিটা যেটা আমার পরনে রয়েছে তার দামও শ আড়াইয়ের কম নয়। এই লুংগি আর ফানা আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বদলাই। তোমার ডাক্তারীর মাসে আয় কত ডাক্তার সায়েব। এর কম হলে তো আমায় পুষতে অসুবিধে হবে তোমার। পশার একটু জমিয়ে নিয়ে তারপর না হয় একবার দেখা ক'রো আমার সঙ্গে কেমন?

মাজামদার সাহেব সাইকেলে উঠে হাটের দিকেই ফিরে গেলো আবার। তারপর আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। কোন হাসপাতালে চাকরী নিয়ে বুঝি অন্য কোথাও চলে গেছে। আহা, বেচারী, যৌবনের টালটা ঠিক সামলে উঠতে পারেনি। কালাদের কথা আর বলো না। তোমাদের সমাজে দরজা বন্ধ করে দেয় বলেই জানলার ফুটো খোঁজো তোমরা। আমাদের সমাজের বালাই নেই, কাজেই মনও ঠুনকো নয় তোমাদের মত।

চুপ করে শোনে সীমাচলম। তর্ক করার আর প্রবৃত্তি হয় না তার। জীবনকে কতটুকুই বা জেনেছে সে। এরা কিন্তু ঘাটে আঘাটায় কত জায়গাতেই না ডিঙি বেঁধেছে। চুপ চাপ সে নিজের ঘরে ফিরে আসে।

গভীর রাত্রে আচমকা কড়া নাড়ার শব্দে বিছানায় উঠে বসলো সীমাচলম। বিকেল থেকে আলোর সুইচটায় গোলমাল চলছে, তাই হাতড়াতে হাতড়াতে বিছানার তলা থেকে মোমবাতি আর দেশলাই বের করে। কড়ার শব্দ ক্রমেই স্পষ্টতর হয়। খুব সন্তর্পণে কে যেন শিকলটা তোলে আর নামায়। মোমবাতিটি জেবলে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে যায় সীমাচলম। অন্ধকারে কেমন যেন একটু ভয় ভয় করে তার। বিদেশ বিভুঁই কিছু একটা না হওয়াই বিচিত্র। এদেশে দা চালাতে একটু ইতস্ততঃ করে না লোকেরা, সামান্য ঝগড়াঝাঁটিতে বাঁকানো ছোরা তলপেটে ঢুকিয়ে দিয়ে তারই কাপড়ে ছোরার রক্তটা মুছে নিয়ে নির্বিকারভাবে জুয়া খেলতে ব'সে এরা। আর এ হোটেলটাও যেন কেমন কেমন। যে ধরণের লোকরা দিনের পর দিন যাওয়া আসা করে এখানে তাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা না থাকলেও এইটুকু বোঝে সীমাচলম—তাদের অসাধ্য কিছু নেই। টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এরা, প্রয়োজন হলে মানুষের প্রাণ নিয়েও ছিনিমিনি খেলতে এরা দ্বিধা ক'রবে না মোটেই।

এছাড়াও আর একটা ভাবনা মনে আসে সীমাচলমের। একথাটা অবশ্য কদিন ধরেই তার মনের আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিলো। কেমন যেন মনে হয় মা পানকে। নিরালায় সিঁড়ির পাশে কিংবা বারান্দায় সীমাচলমকে একলা পেলেই নিচের ঠোঁটটা কুঁচকে সে হাসে—আর জ্বলে জ্বলে ওঠে খুদে খুদে চোখদুটি ওর। এ হাসি ভালো লাগে না সীমাচলমের আর ওই চোখের উজ্জ্বল দীপ্তির সামনে ও কুঁচকে যেন ছোট হয়ে যায়। কী চায় মা পান? কী ওর দেবার আছে!

দরজাটা খোলার সংগে সংগেই ছিটকে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে মা পান। মা পানের চেহারার সংগে কোনদিন পরিচয় ছিল না সীমাচলমের। খুব সন্ত্রস্ত আর উদ্বিগ্ন মনে হয় তাকে। "সাণ্ডো" (খোঁপা) খুলে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পিঠের ওপরে, সামনের চুলের স্তরে বড়ো কাঠের একটা চিরুণী গোঁজা, উত্তেজনায় বুকটা ওঠানামা করছে আর কেঁপে কেঁপে উঠছে হাতের আঙগুলগুলো।

পিছিয়ে আসে সীমাচলম: কী ব্যাপার এত রাত্রে? সর্বনাশ হয়েছে: সর্বনাশের আভাস পাওয়া যায় মা পানের গলার আওয়াজে: শীগগির তৈরী হয়ে নাও—এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।

রীতিমত চমকে ওঠে সীমাচলম। কম্পিত হাত থেকে মোমবাতিটা ছিটকে পড়ে, চৌকাঠে লেগে নিভে যায়। ঘন অন্ধকার—কিন্তু সেই অন্ধকারেও ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে ওঠে মা পানের কানের পাথর দুটো আর তার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দটা অন্ধকারকে একটা ভয়াবহ রূপ দেয় যেন। সীমাচলমের একটা হাত জড়িয়ে ধরে মাপান—পাথরের মত নিস্পন্দ আর নিস্তেজ সেই হাত। সীমাচলমের মনে হলো একটা সাপই বুঝিবা পাক দিয়ে ধরেছে তার হাত—কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর শিহরণ—সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়ে দেয় সীমাচলমের।

কিন্তু কি ব্যাপারটা না জানলে একটি পাও নড়বো না আমি: সীমাচলম যেন অনেক দূরে থেকে কথা বলছে।

লক্ষ্মীটি এভাবে আর দেরী করো না। পুলিশের লোক হয়ত এখনি ঘিরে ফেলবে সারা হোটেল। তার আগেই আমাদের সটকাতে হবে এখান থেকে।

পুলিশের লোক, সে কি, কি আমার হাঙ্গামা বাধালে তোমরা? না, না, এসব ব্যাপারে আমি নেই কিন্তু: সীমাচলম দৃঢ়তা আনার চেষ্টা করে কণ্ঠস্বরে।

আরো এগিয়ে আসে মা পান। কানের পাথরের সংগে সংগে চোখ দুটোও জ্বলে ওঠে তার। হাতটা আরও শক্ত হ'য়ে বসে সীমাচলমের কব্জিতে। দাঁতে দাঁতে ঘষার একটা শব্দও পাওয়া যায়: কালা! নিজের মরণ নিজে ডেকে আনছো তুমি। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার অবসর নেই। এসো আমার সংগে, সব কিছুই তুমি সময়ে জানতে পারবে।

যন্ত্রচালিতের মত মা পানের পিছু পিছু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে আসে সীমাচলম। অজানা শঙ্কায় কাঁপছে ওর পাদুটো আর দ্রুত রক্তের স্রোত বইছে শিরায়। পিছনের দরজা দিয়ে কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে আসে দুজনে।

জমাট অন্ধকার। এদিকটায় রাস্তার আলো নেই মোটেই—ছোট্ট অপরিসর এক গলি। গলি পার হয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছেই দাঁড়িয়ে পড়ে মা পান। সংগে সংগে সীমাচলমও দাঁড়ায়। মৃদু একটা গর্জন; তারপরেই তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় জীর্ণ একটা মোটর। মাল পত্তরে বোঝাই—ড্রাইভারকেও দেখবার উপায় নেই। দরজাটা খুলে কোনরকমে উঠে বসে মা পান তারপর ইঙ্গিতে সীমাচলমকেও উঠতে বলে। মালের বোঝাগুলো দুহাতে কোনরকমে ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে পড়ে সীমাচলম। ভালো করে বসবার উপায় নেই—কোনরকমে সীটের ওপরে পা মুড়ে বসা। সে উঠে বসবামাত্র বিরাট একটা গর্জন করে প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিয়ে চলতে শুরু করলো মোটরটা। টাল সামলাতে না পেরে একেবারে মা পানের গায়ের ওপর গিয়ে পড়লো সীমাচলম। হাত দুটো দিয়ে মাপানের দেহটা কোনরকমে আঁকড়ে ধরলো। মাথাটা মা পানের বুকের ওপর গুজরে যায়। অবিচলিত মা পান একটা হাত দিয়ে আস্তে তাকে সরিয়ে দেয় একপাশে তারপর মৃদু গলায় বললো: এত তাড়াতাড়ি নয়,—এসবের এখনও ঢের সময় আছে।

স্তম্ভিত হ'য়ে যায় সীমাচলম। ব্যাপারটা যে ইচ্ছাকৃত নয়, সেকথা কি বুঝতে পারে নি মা পান! আচমকা ধাক্কায় তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিলো, এছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে তার। কিন্তু এনিয়ে আর কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছা হলো না সীমাচলমের। এখনি ঘোলাটে হয়ে উঠবে জল। পাঁক আর শেওলায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে তার সর্বাঙ্গ। তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভালো।

কিন্তু চুপচাপই কি থাকা যায়। অপরিসর জায়গার মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি গায়ে গায়ে জোয়ান্তীয় হয়ে যায় দুজনের। অসমতল পথ দিয়েই

বুঝি গাড়ী চলেছে। আশে পাশে বিরাট সমস্ত পোঁটলা পুঁটলি থাকায় বাইরের দিকে চোখ মেলে দেখবার কোন সুযোগই নেই। আন্দাজে শুধু বুঝতে পারছে সীমাচলম শহরের এলাকা পার হ'য়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে গাড়ী। মিটমিটে গ্যাসের আলো মাঝে মাঝে। লোকজনের বসতি ক্রমেই বিরল হ'য়ে আসছে।

আচমকা একটা স্পর্শে শিউরে ওঠে সীমাচলম। তার কাঁধের ওপরে আলতো একটা হাত রেখেছে মা পান। চোখ ফিরিয়ে দেখলো—অস্পষ্ট মা পানের মুখ—কিন্তু একটু যেন মুচকি হাসির রেখা দেখা যাচ্ছেঃ খুব ভয় করছে না-কি?

এবারে চেতনা যেন ফিরে আসে সীমাচলমের। কোথায় চলেছে সে এই বিদেশী মহিলার সংগে। সাজানো হোটেল আর মালিক আলিমকে পিছনে রেখে নির্জন রাতে এমনি ক'রে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলেছে সে,—আর কোথায়ই বা চলেছে।

কোথায় চলেছি আমরাঃ অস্পষ্ট গলায় বলে সীমাচলমঃ আর হোটেল থেকে পালাবার মানে?

না পালালে হাজত বাস ক'রতে হতো যে। এতক্ষণে লাল পাগড়ীতে ঘেরাও ক'রে ফেলেছে হোটেল। আলিম বুড়ো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুলিশ সাহেবদের দেখাচ্ছে সমস্ত কামরা। কোকেন চরস আর চণ্ডুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। খুব বোকা বনবে ইন্সপেক্টর সাহেব!

ব্যাপারটা যেন দিনের আলোর মত পরিষ্কার হ'য়ে আসে সীমাচলমের কাছে। হোটেল ঘেরাও করেছে পুলিশে তাই পালাচ্ছে মা পান চরস, চণ্ডু আর কোকেনের বোঝা নিয়ে আর সংগে চলেছে সীমাচলম। কিন্তু আলিম, আলিমকে কেন সংগে নিলো না মাপান? বাঘের মুখে তাকে রেখে এমনি ক'রে পালাচ্ছে মাপান।

কথাটা বলেই ফেলে সীমাচলমঃ কিন্তু আলিমকে ফেলে এলে যে এমন ক'রে।

অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে মা পানঃ খুব বুদ্ধি তোমার যা হোক, পুলিশে চাকরী নাও, উন্নতি হবে।

তার মানে?

মানে আর কি! সবশুদ্ধ হোটেল ছেড়ে এলে পুলিশের সন্দেহ যে বেড়েই যেতো আরো। তার চেয়ে বুড়ো আলিম রইলো হোটেলে, মালপত্তর নিয়ে আমরা সরে পড়লুম—এই তো বেশ। আবার ব্যাপারটা মিটে গেলে ফিরে এসে জোর কারবার শুরু করবে।

পুলের ওপর দিয়ে চলেছে গাড়ী,—লোহালক্কড়ের আওয়াজের তালে তালে মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ মিলে একটা ঐকতানের শুরু হয়। পুলের নীচে শীর্ণকায়া নদী দুপাশে বালুরচর আর শহরের সীমানা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। কেমন যেন মনে হয় সীমাচলমের—ঘুমন্ত শহরের মাঝখান দিয়ে অনির্দেশ যাত্রা—বাতাসে ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ অনেক দূরে কোথায় যেন বৃষ্টি হয়েছে। বর্মার মৌসুমী বৃষ্টি—বছরের আট মাস আকাশ কালো হয়ে থাকে মেঘের ভারে। মোটর আর একটু এগিয়ে যেতেই ঝমঝম্ ক'রে নামে বৃষ্টি। পিচের রাস্তা ছাড়িয়ে লাল কাঁকরের পথ শুরু হয়েছে। খুব সাবধানে চলতে শুরু করে মোটর, পথের বাঁক ঘুরে পাহাড়ী রাস্তায় সাবধানে না চালালে যেকোন মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্য জড়সড় হ'য়ে বসে সীমাচলম। কেমন যেন শীত শীত করছে তার—পাতলা একটা সার্ট আর সিল্কের লুঙগী পরণে—শীত তো লাগবারই কথা। মা পানও সরে বসে একটু—মানুষের গায়ের গরমে মন্দ লাগে না সীমাচলমের। অন্ধকার পাতলা হ'য়ে আসছে,—এইবার ভোর হবে বোধ হয়—গাছপালার আড়াল থেকে একটু যেন আলোর আভাস দেখা যায়। একটা হাত মা পানের পিছনে লম্বালম্বিভাবে রাখে সীমাচলম। আরো এগিয়ে আসে মাপান। মাথাটা এলিয়ে দেয় সীমাচলমের বুকে তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের ছন্দে আর কালবৈশাখীর অকাল বর্ষণের সংগে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে আরো নিবিড় করে মা পানকে জড়িয়ে ধরে সীমাচলম।

ক্রমশঃ

কবি কৃষ্ণদাস

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃন্দাবন-কুঞ্জে যিনি রস-ভোক্তা রাই,
গৌরাংগ-সুন্দর রূপে ব্যক্ত নদীয়ায়।
মানবের ঘরে এক রসের পাগল
রূপে গুণে ভোলাইয়ে ব'লে হরিবোল।
শ্রীকৃষ্ণ সে রাধাবশ, রাধাই গোবিন্দ,
ভজ মন, শ্রীহরির চরণারবিন্দ।
কভু রাই মৃগমদ মাখিয়া অংগেতে
চলে অভিসার-পথে বাঁশরী সংকেতে।
মাখিয়া কুংকুম-পংক কৃষ্ণ রংগভরে
সখী-বিরহিত হ'য়ে রাধারূপ ধরে।
চন্দ্রবদনী সে রাই—কনক—লতিকা
বেষ্টিত শ্যাম-তমালে যে ব্রজ-বীথিকা,
যেখানে শ্যামের লাগি ফোটে বনফুল,
কানুর ভোগের ননী যোগায় গোকুল,
শীতের ওড়না গোপী শ্যাম-অংগে দিয়া
সে উজ্জ্বল নীলমণি রাখে লুকাইয়া।
অখিল রসের মূর্তি সমুখে প্রকাশ,
সেথা তুমি উপনীত কবি কৃষ্ণদাস।

পথভ্রান্ত

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

দুর্গম পথ তোমায় ডাকে
খররৌদ্রের দ্বিপ্রহরে—
ক্ষীণ স্বার্থের স্বেদ ঝরে,
বিক্ষত তুমি রণক্লান্ত
অশেষ পথের পান্থ!

অক্ষমতা তোমায় গ্রাসে
দিন শেষের অন্ধকারে—
আত্মগ্লানির বন্ধ দ্বারে
যখন রৌদ্র উদ্ভাসিত—
স্বরূপ করে উচ্চারিত।

সেথায় আত্মা খেই হারা
প্রেমের কমল কোথা ফোটে?
ক্ষুদ্র হৃদয় নামে ওঠে—
স্তিমিত পথেই তুমি ভ্রান্ত
অশেষ পথের পান্থ!

মালিক অম্বরের— —অভ্যুদয় ও পতন

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, পি-এইচ-ডি

(২)

মালিক অম্বরের চরিত্র

মালিক অম্বরের মত কর্মবীর শুধু দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে কেন ভারতের ইতিহাসেও খুব বিরল। তিনি যেরূপ ক্ষুদ্রাবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চ শিখরে উপনীত হইতে সমর্থ হন, ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় তিনি কি রকম অসাধারণ গুণী ও মহাশক্তিমান পুরুষ ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই যেখানে অতি সাধারণ অবস্থা হইতে এক একজন ব্যক্তি স্বীয় অধ্যবসায়ে ও কর্মনিপুণ্যে অনেক উচ্চপদ অধিকার করিয়াছেন—এমন কি রাজ সিংহাসনও লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁহারা স্বকীয় কর্মকুশলতায় রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অথবা আমির ওমরাহদিগের আশ্রয়ে ও সৌজন্যে বর্ধিত হইয়া উন্নতির এক স্তর হইতে অন্য স্তরে আরোহণের সুযোগ পাইয়াছেন এবং যশের অধিকারী হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই দিল্লীর দাস-রাজা কুতবউদ্দীন, আলতামস ও বলবন প্রভৃতির ইতিহাসে। তাঁহারা সকলেই অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং সকলেই অমানুষিক শক্তির দ্বারাই অতি ক্ষুদ্র ক্রীতদাস হইতে পরে রাজমুকুট পরিধানে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু মালিক অম্বরের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য এই যে তিনি কাহারও আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া বড় হইবার সুযোগ পান নাই, তিনি একাকী নানা ঘাত প্রতিঘাত, ভাগ্য-বিপর্যয় এবং ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের জন্যই তিনি আহম্মদনগরের মন্ত্রী চেঙ্গিজ খাঁর মতন সহৃদয় ব্যক্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেই তিনি নিজের অসাধারণ পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে, অদম্য বীরত্বে এবং অলৌকিক চরিত্রবলে অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিপদকে তিনি কখনও ভয় করেন নাই, নির্ভীক চিত্তে সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন এবং সময়োপযোগী বীরোচিত কার্য দ্বারা সমস্ত বিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন, পরন্তু এইরূপ প্রতি ঘটনাতে তিনি অধিকতর বল লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বীর-গাথা এখনও দাক্ষিণাত্যের জনপদে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রাজপুতানায় যেমন স্বদেশপ্রেমিক বীরশ্রেষ্ঠ মেবারের রাণা প্রতাপের নামে সমস্ত রাজপুত জাতির প্রাণে এক অভিনব অনুপ্রেরণার উদয় হয় তেমনি অম্বরের স্মৃতিতে দাক্ষিণাত্যে এখনও নবীন শক্তি ও স্বদেশ-প্রেমের উন্মেষ হয়। তাঁহার দেশবাসী দেশবাসী যেরূপ অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে তেমন ইঁহার পূর্বে আর কখনও হয় নাই। আহম্মদনগর তাঁহার জন্মভূমি ছিল না, কিন্তু এই দেশেই তিনি বাস করিয়াছেন, এই দেশকেই ভালবাসিয়াছেন এবং ইহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন। তাঁহার মত দেশপ্রেমিক দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে খুবই কম।

তাঁহার শক্তির আধার ছিল জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে আহম্মদনগরের অধিবাসীবৃন্দ, সেখানে জাতি বা ধর্মের ভেদাভেদ ছিল না। এই মহান নেতার অধীনে এক মহাশক্তি গঠন এবং সেই শক্তিকে অজেয় করিয়া তোলাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য—সমবেত চেষ্টায় সেই উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছিল। যে রাজ্যের ভিত্তি প্রজার প্রীতি ও ভালবাসার উপরে গঠিত, সেখানে কোন কাজ অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না এবং সমস্ত কাজ শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও সাফল্যে পরিণত হয়—তাহাই হইয়াছিল আহম্মদনগর রাজ্যে। মালিক অম্বরের সকল কাজের মূলেই ছিল প্রজার হিতসাধন, তাই প্রাণ বিসর্জন দিয়াও তাহারা তাঁহার কার্যে সহায়তা করিয়াছে এবং সমস্ত কার্য সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে। সেই সময়ে মুঘলকে পরাজিত করিয়া আহম্মদনগর রাজ্যের পুনরুত্থান করা, তাহাদের আক্রমণ প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত করা এবং এমন কি তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যের সকল স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া সেখানকার মুঘল রাজধানী বুরহানপুর দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখা—এই সমস্ত ঘটনা ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। এইসব সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার অসীম বীরত্বে ও নেতৃত্বের অসাধারণ ক্ষমতায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আহম্মদনগরবাসীর স্বার্থ-ত্যাগে ও পূর্ণ সহযোগিতায়।

তাঁহার চরিত্রগত একটি প্রধান গুণ ছিল কাহারও নিকট হইতে কোন উপকার পাইলে তিনি তাহা কখনও ভুলিতে পারেন নাই এবং বিনয়াবনত ও সশ্রদ্ধ হৃদয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। আহম্মদ-নগরের মন্ত্রী চেঙ্গিজ খাঁর নিকটে তিনি যে উপকৃত হইয়াছিলেন তাহা তিনি কখনও ভুলিয়া যান নাই এবং উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াও তিনি সে কৃতজ্ঞতার সুন্দর পরিচয় দিয়াছিলেন যখন তিনি তাঁহার শীল-মোহরে "মালিক অম্বর, চেঙ্গিজ খাঁর ভৃত্য"—এই কথাগুলি ব্যবহার করিতেন। ইহা হইতে আর একটি কথাও বেশ প্রকাশ পায়—তিনি যে অতি সামান্য অবস্থা হইতে বড় হইয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই, বরং গৌরব অনুভব করিতেন। এই বিনয়ই হইল মহত্বের সত্যকার পরিচয়।

কিন্তু তাঁহার বিনয়ের পরিচয়ে যদি আমরা মনে করি তাঁহার হৃদয় সব সময়ে কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল তাহা হইলে অত্যন্ত ভুল হইবে। আমরা যেমন তাঁহার কোমল স্বভাবের পরিচয় পাই তেমনি তাঁহার কঠিন হৃদয়ের পরিচয়ও স্থানে স্থানে পাই। তিনি যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়াছিলেন সেখানে শুধু কোমল স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা সম্ভব হইত না, যদি কখনও কখনও তিনি সময়োচিত কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিতেন। সাধারণতঃ তিনি সদ্ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যদি তিনি ইহাতে কৃতকার্য না হইতেন তাহা হইলে সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও দ্বিরুক্তি করিতেন না। কাজেই কোমল ও কঠিন উভয়ের সংমিশ্রণই তাঁহার চরিত্রের মধ্যে ছিল।

সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে মুঘল ও বিজাপুরী ঐতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার কাছে উচ্চ ও নীচ, ধনী ও নির্ধন, হিন্দু ও মুসলমান কোন প্রভেদ ছিল না; কেহ অন্যায় করিলে তাঁহার ন্যায়-বিচারে দণ্ডভোগ করিতেই হইত। তাঁহার সুবিচারের

কাহিনী চারিদিকে এত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে মুঘল ও বিজাপুরী সৈন্যদের মধ্যেও ইহা একটা প্রচলিত কথার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। যখন ভাটোড়ির যুদ্ধের পরে মুঘল ও বিজাপুরী আমিরগণ বন্দী অবস্থায় তাঁহার নিকটে নীত হইল তখন তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কাপুরুষের মত পলায়ন করিবার জন্য ভৎর্সনা করিয়া দণ্ড-স্বরূপ প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাতের আদেশ দেন। তাহাদের মধ্যে একজন কবি ও পাঁচশত সৈন্যের মনসবদার ছিল। যখন সেই ব্যক্তির বেত্রাঘাতের পালা পড়িল তখন সে অম্বরকে বলিল, "আমি শুনিয়াছিলাম মালিক অম্বর সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু এতদিন আমার এ ধারণা ভুল ছিল—৩,০০০, ২,০০০ এবং ৫০০—সকল মনসবদারকে একই-রূপে শাস্তি দেওয়া কি ন্যায়বিচার?" তাহার এই কথা শুনিয়া অম্বর এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি তাহাকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। উপরোক্ত গল্পটি অম্বরের খাফি খাঁর ইতিহাসে পাই; মালিক অম্বরের মৃত্যুর পরে এই ইতিহাস লেখা হয় এবং উহাতে ঐরূপ গল্পের উল্লেখ দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, অম্বরের সুবিচারের কাহিনী তখনও দেশময় পরিব্যাপ্ত ছিল।

মালিক অম্বরের সহিত আহমদনগরের রাজার সম্বন্ধ

দ্বিতীয় মুরতাজা নিজাম-শাহ নামে মাত্র রাজা ছিলেন; অম্বর নিজেই রাজ্যের সমস্ত কার্য পরিচালনা করিতেন, কিন্তু রাজার প্রতি তাঁহার আনুগত্য প্রায় সর্বদাই আন্তরিকতা-পূর্ণ ছিল। তাঁহাদের ভিতরে মাঝে মাঝে মতভেদ ও বিরোধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী প্রধানত অম্বরের বিরুদ্ধ দলীয় আমির-ওমরাহগণ এবং রাজা স্বয়ং। সমসাময়িক ইতিহাস তারিখ-ই-ফেরিস্তা এবং আরও কোন ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এক সময়ে অম্বর ঐ রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া অপর একজনকে আহমদনগরের রাজা করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহার কারণ তারিখ-ই-ফেরিস্তা লিখিয়াছেন, অম্বরের শত্রুগণের সহিত রাজার ষড়যন্ত্র। যদি এইভাবে রাজা তাঁহার শত্রুদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে, তবে দেশে পুনরায় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হইবে, তাই এই সব বন্ধ করিয়া দেশের শান্তি অব্যাহত রাখার জন্যই তিনি মুরতাজা শাহকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া অপর একজনকে ঐ সিংহাসনে বসাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজে রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কখনও হয় নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসে সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন এবং এইরূপ নজীরের অভাবও ভারতের ইতিহাসে নাই, কিন্তু সেই-রূপ হীন লোভ তাঁহার কখনও জন্মায় নাই। তাঁহার বিরুদ্ধ দলীয় আমির-ওমরাহগণ শায়েস্তা হইবার পরে আর মুরতাজা শাহের সহিত তাঁহার ঝগড়া-বিবাদ হয় নাই এবং পরবর্তীকালে তাঁহাদের সম্বন্ধ মধুর হইয়াছিল।

মারাঠা জাতির প্রতি অম্বরের অবদান

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, অম্বরের মুঘলদিগকে পরাস্ত করার প্রধান অস্ত্র ছিল গরিলা যুদ্ধ এবং এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিল মারাঠা সেনানী। তাহাদিগকে নূতন সমরপ্রণালীতে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়ার এবং পারদর্শী করিয়া তোলার কৃতিত্ব ছিল অম্বরের। তিনি জানিতেন, তাহাদের সাহায্য ভিন্ন গরিলা যুদ্ধ সম্ভবপর নয় তাই তাহাদিগকে নূতনভাবে সংগঠিত করিয়া আহমদনগরের সমরশক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেন। এই শিক্ষা এবং সংগঠনপ্রণালী তাহাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গঠনে অনেক সহায়তা করিয়াছিল। অম্বরের অনুকরণে ঐ একই যুদ্ধপ্রণালীর সাহায্যে পরে ছত্রপতি শিবাজী বিজাপুর ও মুঘলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবল প্রতাপশালী মারাঠা রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং মারাঠা জাতি গঠনে অম্বরের দান অতুলনীয়; কারণ তাঁহারই শিক্ষা-দীক্ষায় তাহাদিগকে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিয়াছিল এবং শিবাজী তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গরিলা যুদ্ধ আরও সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং একটি মহাশক্তিসম্পন্ন স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি দ্বারা সমস্ত মারাঠা জাতিকে একই ভ্রাতৃ-বন্ধনে গ্রথিত করেন।

মালিক অম্বরের হিন্দু জাতির প্রতি ব্যবহার

মালিক অম্বরের শাসনকালে সমস্ত ধর্মাবলম্বীর লোক তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম আহমদনগর রাজ্যে বিনা বাধা-বিপত্তিতে সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে সমর্থ হইত। সকল ধর্মাবলম্বীর লোকই তাঁহার নিকট হইতে সমব্যবহার পাইত এবং তাঁহার শাসনাধীনে কোন হিন্দুমন্দির নষ্ট বা ধ্বংস করা হয় নাই। হিন্দু প্রজাদের প্রতি যাহাতে কোনপ্রকার অন্যায় ও অবিচার না হয় তাহার জন্য তিনি সর্বদাই সচেতন থাকিতেন। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগেও ধর্ম বা জাতির প্রশ্ন উঠিত না, গুণানুসারে পদ পূরণ করা হইত এবং তাহার ফলে আমরা দেখিতে পাই আহমদ নগর রাজ্যের বহু উচ্চপদ হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির লোকই অধিকার করিয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার অধীনে উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শিবাজির পিতা শাহজি শরিফজি ভিঠলরাজ ও যাদব রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তাহারা সকলেই আহমদ-নগরের সামরিক ও অসামরিক উভয় বিভাগেই যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাহারা মুসলমান কর্মচারীদের সহিত এক-যোগে সকল কাজে অম্বরকে সহায়তা করিয়াছিলেন। ভাটোড়ির যুদ্ধে মারাঠাদের ত্যাগ ও দান অতুলনীয়, কারণ তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ মহাসমরে জয়লাভ অম্বরের পক্ষে খুব কঠিন হইত।

আহমদনগর রাজ্যের শাসনপ্রণালী—

(ক) রাজা ও মন্ত্রীর ক্ষমতা

আহমদনগর রাজ্যের শাসনপ্রণালী অনুযায়ী সর্বোচ্চপদ অধিকার করিতেন রাজা স্বয়ং। তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম এবং স্বকৃত কার্যের জন্য তাঁহার কাহারও নিকটে কৈফিয়ৎ দিতে হইত না। রাজার পরেই রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা-শালী ছিলেন প্রধান মন্ত্রী বা পেশোয়া। প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেন রাজা স্বয়ং এবং তিনি তাঁহার সকল কাজের জন্য দায়ী হইতেন রাজার নিকটে। আজকালের মত তখন কোন ব্যবস্থাপক সভা ছিল না—যাহার নিকট প্রধান মন্ত্রী তাঁহার কার্যের জন্য দায়ী হইতেন। যতদিন তিনি রাজার আস্থাভাজন থাকিতেন ততদিন তাঁহার অন্য কাহাকেও ভয় করিবার কিছু থাকিত না, কারণ তাঁহাকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা অপর কাহারও ছিল না। যদি রাজা দুর্বল বা অকর্মণ্য হইতেন তবে উপরোক্ত নিয়মের ব্যতি-ক্রম ঘটিতে বাধ্য হইত এবং তখন প্রধান মন্ত্রীই রাজ্যের ভিতরে সর্বেসর্বা হইতেন।

অম্বরের সময়ে সাধারণ নিয়মের বেশ ব্যতিক্রম দেখা যায়। তিনি রাজ-আদেশ ছাড়াই প্রধান মন্ত্রীর পদ অধিকার করিয়াছেন এবং রাজাকেও তিনিই নিজে অভিষিক্ত করিয়াছেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন রাজ্যের সকল কাজে তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল এবং তাঁহাকে অপসারিত করা রাজার পক্ষেও অসম্ভব ছিল।

(খ) আহমদনগরের প্রদেশ বিভাগ

শাসনের সুবন্দোবস্তের জন্য এই রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং এইরূপ এক একটি প্রদেশকে বলা হইত তরফ। প্রত্যেক তরফের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁহারা নিজ নিজ সীমানার ভিতরে শান্তিরক্ষা, প্রজাদের সুখ-সুবিধা এবং সর্ব-প্রকার শাসন কার্যের জন্য দায়ী হইতেন। এক একটি তরফকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং এক একটি জেলা আবার পরগণার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—ইহাদিগকে বলা হইত মহল, তালুক বা দেশ।

অম্বর প্রদেশ ও জেলা প্রভৃতির শাসন-কর্তাদের উপরে যতদূর সম্ভব নজর রাখিতেন—যাহাতে তাঁহারা কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিতে

না পারেন অথবা কাহারও উপরে অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিতে না পারেন। যদি তিনি কখনও কোন কর্মচারীর অত্যাচারের বা কর্তব্যকর্মের অবহেলার প্রমাণ পাইতেন তবে তিনি তাহার বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন।

সেকালে দস্যু-তস্করের ভয়ে দেশের লোক সর্বত্র ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিত, কিন্তু অম্বর তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া রাস্তা-ঘাট সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে আহমদনগর রাজ্যে যেরূপ সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বর্তমান ছিল তাহা ঐ রাজ্যের ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই।

(গ) মালিক অম্বরের রাজস্ব-প্রণালী

মালিক অম্বর রাজস্ব আদায়ের যে সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহার জন্যই তিনি আহমদনগরের জনগণের নিকটে বেশী সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। প্রজাদিগকে তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের হিতসাধন তাঁহার জীবনের এক মহাব্রত ছিল। অনেক সময়ে দেখা যায় রাজস্ব আদায়ের কালে রাজ-কর্মচারীরা নিরীহ প্রজাদের উপরে অত্যাচার করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ও সরকারের আয়ের জন্য ব্যস্ত হইত। কিন্তু প্রজার উপরে অত্যাচারে যে আয় বৃদ্ধি হয় অম্বর তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এবং এইরূপ প্রথার আমূল পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের মঙ্গল সাধন, কৃষির জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, চাষের উৎকর্ষ সাধন এবং সরকারের আয়-বৃদ্ধি। তাঁহার মতে যদি কৃষকদের চাষের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া যায় এবং তাহাদের দুঃখ ও কষ্টের লাঘব করা যায় তাহা হইলে কৃষির উন্নতি হইতে বাধ্য, সুতরাং সম্পূর্ণ নির্ভর করে সরকারের মনোবৃত্তি ও কৃষকের সুযোগিতার উপরে।

এতদিন জমির সমস্ত বন্দোবস্ত হইত দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদের সহিত। এইসকল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি নানাপ্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়নের দ্বারা রাজস্ব আদায় করিত এবং ফলে দেশের চাষের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে অনেক আবাদী জমিতে চাষ বন্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে ঐগুলি জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। অম্বর পুরাতন ব্যবস্থা রহিত করিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন প্রত্যেক গ্রামের প্রধান ব্যক্তি বা মণ্ডলের উপরে। এইরূপে প্রত্যেক গ্রামের সহিত সরকারের সোজাসুজি একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইবার এবং প্রয়োজনানু-সারে তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করার উপায়ও উদ্ভাবন করিলেন। তারপরে প্রত্যেক ব্যক্তির জমির পরিমাণ এবং এইসব জমির গড়পড়তা ফলনের হিসাব নিরূপণ করিবার জন্য সম্ভব-মত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন—যাহাতে প্রত্যেক জমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতানুযায়ী রাজস্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। ইহার জন্য কৃষির উপযোগী জমিগুলি ভাল ও মন্দ, দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং রাজস্ব নিরূপিত হইত জমির ফসল-উৎপাদনের ক্ষমতানুযায়ী, জমির পরিমাণ অনুযায়ী নয়; যেমন এক ব্যক্তির দুই বিঘা জমিতে যদি অপর একজনের এক বিঘা জমির পরিমাণ শস্য জন্মাইত, তবে ঐ দুই বিঘা জমির রাজস্ব শেষোক্ত এক বিঘা জমির মতই হইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক চাষের জমির ফলন দেখিয়া তাহার পরে ঐ জমির প্রতি বৎসরের গড়পড়তা রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করা হইয়াছিল। ধান-জমি ব্যতীত সমস্ত চাষের জমিই উপরোক্ত দুই-ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু ধানজমি-গুলি আরও সূক্ষ্মভাবে ভাগ করিয়া উর্বরতা অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ—এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। পাহাড়ে জমিগুলির ব্যবস্থা এত সূক্ষ্মভাবে হয় নাই, ঐসব জমির রাজস্ব অনেক কম নির্ধারিত হইয়াছিল, কারণ উহাদের ফসল উৎপাদনের পরিমাণের কোন নিশ্চয়তা ছিল না, অথবা রাজস্বের হার বেশী হইলে কেহ সেখানে চাষ করিবে না। সুতরাং চাষীরা যাহাতে ঐ জমি-গুলিতে চাষ করে এবং সরকারও রাজস্ব হইতে বঞ্চিত না হয় সেইসব দিক চিন্তা করিয়া উহাদের রাজস্বের হার নির্ণয় করা হইয়াছিল।

সর্বপ্রথমে মালিক অম্বর উৎপন্ন শস্যের পাঁচভাগের দুইভাগ রাজস্বস্বরূপ গ্রহণ করিতেন, কিন্তু পরে তিনি শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকা আদায় করিতেন এবং উহাতে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছিল উৎপন্ন শস্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক জমির বাৎসরিক খাজনার হার নির্ধারিত ছিল, কিন্তু আদায়ের সময়ে ঐ নির্ধারিত হারে খাজনা প্রতি বৎসর আদায় করা হইত না। প্রকৃতপক্ষে দেয় খাজনার পরিমাণ নির্ভর করিত প্রতি বৎসরের ফসলের উৎপন্নের উপরে। যে বৎসর ফসল ভাল হইত, সেই বৎসর খাজনার পরিমাণ বেশী হইত, আবার যখন ফসল কম হইত তখন খাজনার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইত। যে জমিতে কোন বৎসর ফসল জন্মাইত না সেই বৎসর ঐ জমির খাজনা বাবদ কিছুই দিতে হইত না। সরকার প্রজার প্রতি এইরূপ সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়াতে গ্রামের প্রধান ব্যক্তি বা মণ্ডলগণ অনেক পতিত জমি বিলি করিয়া চাষের উপযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রাজস্ব আদায়ের সময়ে কাহারও উপরে অত্যাচার বা উৎপীড়ন করা হইত না। যদি কখনও কোন অত্যাচারের কাহিনী অম্বরের কানে পৌঁছাইত তাহা হইলে তিনি তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, কাজেই সেই ভয়ে সকলেই অত্যন্ত সংযতভাবে কাজ করিত। কৃষকের আর একটা খুব সুবিধা হইয়াছিল এই যে, শস্যের মূল্য প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নির্ধারিত হইত না। যে বৎসর উহা নির্ধারণ করা হইয়াছিল তখন শস্যের মূল্য এত কম ছিল যে ইহাতে তাহারা ভবিষ্যতে খুব উপকৃত হইয়াছিল, কারণ শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয় বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু ইহার জন্য তাহাদের রাজস্ব বেশী দিতে হইত না।

এইরূপে অম্বরের যত্নে ও পরিশ্রমে অনেক পতিত জমিতে চাষ আরম্ভ হয়, কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়, দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়, সরকারেরও আয় বহুগুণে বর্ধিত হয় এবং মালিক অম্বরের [illegible] সবদিকই পরিপূর্ণ হইল।

বাঙলা সরকার বাঙলা ভাষাই সরকারী কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্য সকলেই তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি, সরকারী কাগজপত্রে বাঙলা ব্যবহৃত হইবে এই ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইবেন না। বিশেষ এখনও বাঙলা সরকারের দপ্তরখানায় অবাঙালী কর্মচারী আছেন—কৃষি বিভাগের মন্ত্রীর সেক্রেটরী মিস্টার কৃপালনী তাঁহাদিগের অন্যতম। ইনিই স্যার জন হার্বার্টের কার্যকালে অপসারণ নীতির প্রধান প্রবর্তক ছিলেন। ইনি কি মন্ত্রীর বাঙলায় লিখিত মন্তব্যের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন? আমরা মনে করি, পশ্চিমবঙ্গের সরকার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সাধনে সচেষ্ট হইবেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁহাদিগকে শিক্ষকদিগের অভাব ও অভিযোগে অবহিত হইতে অনুরোধ করিব। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে মাসিক ৫ টাকা হিসাবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে মাসিক ৩ টাকা হিসাবে দুর্মূল্যতার জন্য ভাতা দেওয়া হয়। এই যৎসামান্য ভাতাও আবার মাসে মাসে না দিয়া ৬ মাস অন্তর দেওয়া হয়। আমরা অবগত হইয়াছি—সেপ্টেম্বর মাসে যে ৬ মাসের ভাতা প্রাপ্য ছিল, তাহা অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহেও শিক্ষকদিগের হস্তগত হয় নাই। ইহার জন্য কে বা কাহারা দায়ী?

শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য যে গুরু-ট্রেনিং বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ছাত্রগণ মাসিক মাত্র ১০ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। সর্বদলীয় সচিবসংঘ বলিয়াছিলেন, উহা ১৫ টাকা করা হইবে। কিন্তু আজও তাহা করা হয় নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, কোন কোন গুরু-ছাত্র—এক একদিন "নো মিল" অর্থাৎ উপবাস লিখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এ অবস্থা যে যে-কোন সরকারের পক্ষে লজ্জার বিষয় তাহা বলা বাহুল্য।

শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবহারের সহিত সিভিল সার্ভিসে ও ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে চাকুরিয়াদিগের সম্বন্ধে ব্যবহারের তুলনা করিলে একান্ত বিস্ময়ানুভব করিতে হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে এক দলের বেতন কিরূপ বর্ধিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি এবং সেই বেতন বৃদ্ধির সমর্থনও করিতে পারি নাই। যে শিক্ষকগণ জাতির ভবিষ্যৎ গঠিত করিবেন, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া বাঙলার এই দুর্দিনে সিভিল সার্ভিসে ও ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে চাকুরিয়াদিগকে তাঁহাদিগের "গ্রেডের"ও অধিক বেতন প্রদানে লোক একান্তই বিস্ময়ানুভব করিতেছে।

বাংলায় কিরূপ শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, ইংরেজীতে যাহাকে "বেসিক এডুকেশন" বলে এবং যাহা হিন্দুস্থানীতে "তালিমী" শিক্ষা বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে, বাঙলায় তাহা প্রচলিত করিবার আয়োজন হইতেছে। সে শিক্ষা বাঙলার উপযোগী কি না এবং বাঙলায় প্রদত্ত প্রাথমিক শিক্ষা তাহার তুলনায় সহজবোধ্য কি না, তাহা বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা বিবেচিত হয় নাই। সে অবস্থায় যদি হয়, "নূতন কিছু কর" হিসাবে অথবা তাহা অন্যত্র উপযোগী বলিয়া গান্ধীজীর দ্বারা বিবেচিত হইয়াছে, এই কারণে বাঙলায় প্রবর্তিত হয় তবে তাহা কখনই সঙ্গত হইবে না। বাঙলার শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই বুঝেন, লর্ড মর্লি যেমন বলিয়াছিলেন, কানাডায় যে গরম জামা শীতকালে আরামপ্রদ ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে নিদাঘে তাহা আরামপ্রদ হইতে পারে না, তেমনই যমুনার কূলে যাহা শোভা পায়, বাঙলার জলবায়ুতে তাহা শোভা না-ও পাইতে পারে।

জাপান শিক্ষা বিস্তারের ফলেই দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তথায় সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, কোন গ্রামে একটিও অশিক্ষিত পরিবার এবং কোন পরিবারে একজনও অশিক্ষিত লোক থাকিবে না।

পাকিস্থান বাঙলায় সরকারের প্রধানমন্ত্রী সেদিন কোন কলেজে সরকারী সাহায্য প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছেন,—"যদি ৬ মাস কাটাইতে পারি, তবে বাঁচিয়া যাইব। টাকার কথা চার বৎসরের মধ্যে বলিবেন না।"

বাঙলার একাংশে শিক্ষার অবস্থা কি হইবে তাহা ঐ উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের শিক্ষার্থীদিগকেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে। আমাদিগের বিশ্বাস বাঙালীকে "তালিমী" শিক্ষায় তালিম করিবার কোন প্রয়োজন নাই—বাঙলা তাহার প্রচলিত প্রথার আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া লইতে পারিবে।

আর এক দিক হইতেও বাঙলা ভাষার বিপদের আশংকা করা যাইতেছে। গান্ধীজী এখনও ফারসী মিশ্রিত হিন্দীর—সংকর হিন্দীর পক্ষপাতী। তিনি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাঙলার দাবী বিবেচনারও অযোগ্য মনে করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ভারতীয় রাষ্ট্র-সঙ্ঘের যেমন একটি সাধারণ ব্যবহার্য ভাষা থাকা প্রয়োজন, তেমনই হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান যদি বন্ধুভাবে থাকে, তবে উভয়কেই হিন্দুস্থানীর অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু হিন্দুস্থানের লোককে আর হিন্দুস্থানী শিক্ষার বিড়ম্বনা ভোগ না করাইলেও ভাল হয়। বাঙলার কথাই বিবেচনা করা যাউক। বাঙালীকে অবাঙালীতে পরিণত করা যদি অভিপ্রেত না হয় তবে তাহাকে বাঙলা শিখিতেই হইবে; আবার রাষ্ট্রভাষা হিন্দী—যত দরিদ্র ও দুর্বলই কেন হউক না, হিন্দী শিখিতে হইবে তাহার পর এখনও ইংরেজীর অনুশীলনের প্রয়োজন শেষ হয় নাই; এই সকলের উপর যদি আবার তাহাকে পাকিস্থানের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য—হিন্দুস্থানী অভ্যাস করিতে হয়, তবে তাহা যে বোঝার উপর শাকের আঁটি না হইয়া শেষে যে খড় চাপাইলে উটেরও পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া যায়—তাহা হইবার সম্ভাবনাই প্রবল। ফলে বাঙলা সাহিত্যের অনিষ্ট অনিবার্য হইবে এবং ভবিষ্যতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যিকের আবির্ভাব পথ রুদ্ধ হইবে। কাজেই বাঙলায় বাঙলার উপযোগী প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় "তালিমী" শিক্ষার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন না করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সরকার "তালিমী" শিক্ষার প্রবর্তনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে—ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, অনুকরণ তোষামোদের সর্বপ্রধান রূপে হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রশংসা প্রকাশ হিসাবে অতি ভয়াবহ ব্যাপার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপূর্ব পথে বাঙলাই শিক্ষার বাহনরূপে অধিক ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভূতপূর্ব স্কুল ইন্সপেক্টর মিস্টার স্টার্ক যেমন বলিয়াছিলেন, শুভংকরী বর্জনের পরেই বাঙলায় ছাত্রদিগের অঙ্কে ব্যুৎপত্তি হ্রাস পাইয়াছে, তেমনই এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, "ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষার (ইহাতে ইংরেজী যোগ করিয়া 'মধ্য ইংরেজী' পরীক্ষা হইত) অনাদরের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী ছাত্রদিগের বাঙলা ভাষা ব্যবহার নৈপুণ্য ব্যাহত হইয়াছে। পূর্বে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ—ডাক্তারী ও মোক্তারী পরীক্ষা দিতে পারিত। ফলে যেমন লোক অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারিত তেমনই আদালতেও ব্যবহারজীবের সাহায্য পাইত। ইংরেজীর প্রতি অকারণ অনুরাগাতিশয্যে যেমন ডাক্তারী শিক্ষায় ইংরেজী বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়, তেমনই মোক্তারের উচ্ছেদসাধন হয়। অথচ বাঙালী ছাত্র কেন যে বিদেশী ভাষা ব্যতীত চিকিৎসা বিদ্যা ও আইনজ্ঞান অর্জন করিতে পাইবে না, তাহা সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায় না।

বাঙলায় যখন চিকিৎসকের প্রয়োজন অত্যান্ত অধিক এবং তাহার অভাবও অল্প নহে, তখন কেন যে পূর্ববৎ ক্যাম্বেল স্কুলে বাঙলায় ডাক্তারী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হইবে না, তাহা কে বলিবে? আমরা প্রস্তাব করি, সে ব্যবস্থা আর বিলম্ব না করিয়া প্রবর্তিত হউক।

বাঙলায়—বিশেষ পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের সমস্যার যে-কোন সমাধানের সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কয়দিন মাত্র পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের সরকার একখানি পুস্তক নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার নাম—"লড়কে মিলা পাকিস্থান"। উহা কলিকাতায় কড়েয়া অঞ্চলে (পার্ক সার্কাসে) ইসলামিয়া আর্ট প্রেসে মুদ্রিত।

আর ঢাকায় কয়দিন হইতে ইংরেজীতে ও বাঙলায় মুদ্রিত "জেহাদের ডাক" শীর্ষক এক ইস্তাহার বিলি করা হইয়াছে। উহাতে হিন্দুস্থানে "মুসলিম নরনারী ও শিশুদের পাশবিকভাবে হত্যা বা অগ্নিদগ্ধ" করার জন্য হিন্দুস্থানের সরকারকে দায়ী করিয়া বলা হইয়াছে—

"আমরা দাবী করি আমাদের পাকিস্তান সরকার হিন্দস্থানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে জেহাদ ঘোষণা করুক।"

ইস্তাহারের শেষাংশে লিখিত আছে:—

"আমরা শেষ পর্যন্ত ইহাও জানাইয়া রাখিতে বাদ্য (বাধ্য?) হইতেছি যে যদি সরকার আপন কর্তব্য না করেন, তবে আমরা জনসাধারণ তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না। ইসলামের ও আল্লাহতালার আদেশ পালন করা আমাদের প্রথম কর্তব্য। যদি তাই হয় তবে যাই ঘটুক জনসাধারণই হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিবে।"

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণাকালে কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে কিরূপ ইস্তাহার পাওয়া গিয়াছিল তাহা এই প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে পড়িবে। আর বিহারে মুসলমানদিগের লাঞ্ছনার পরে কিভাবে তাহা লইয়া হাজারা জিলাতে প্রচার কার্য পরিচালন করা হইয়াছিল, তাহাও স্মরণীয়। ঢাকা অঞ্চলে এক শ্রেণীর মুসলমান যে সমধর্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, উক্ত ইস্তাহারে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

যে দিনের "আনন্দবাজার পত্রিকায়" ঐ ইস্তাহারের সংবাদ প্রকাশিত হয় (৮ই অক্টোবর) সেইদিনই তাহাতে পূর্ববঙ্গের আর কতকগুলি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সে সকলই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ববিধ স্বাধীনতার বিরোধী। সে সকলের উল্লেখ করিবার পূর্বে আমরা, কেবল পূর্ববঙ্গেই নহে পূর্ব পাকিস্তানের নবলব্ধ শ্রীহট্টেও কিরূপে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকৃত হইতেছে তাহার কথা বলিব। তথায় জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ পাকিস্তান বিরোধী মুসলমানগণ কিরূপ ব্যবহার পাইতেছেন, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'জনশক্তি' পত্রে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদান করা হইয়াছে। মৌলানা জামীল-উল-হক তথায় জাতীয় দলের অন্যতম নেতা। গত ১৫ই আগস্ট তিনি ও তাঁহার কয়জন সহকর্মী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। মুসলমানরা কচ্ছপকে শূকরেরই মত অপবিত্র (হারাম) মনে করেন। সেই কচ্ছপের মাংসের মালা করিয়া সরকারী কর্মচারীদিগের উপস্থিতিতে তাহা তাঁহার গলদেশে বিলম্বিত করিয়া তাঁহাকে স্থানীয় পুলিশ আদালতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। গত ৩০শে আগস্ট জাতীয়তাবাদী মৌলবী গোলাম রব্বানী প্রভৃতিকে সুনামগঞ্জের ফৌজদারী আদালতের প্রাঙ্গণে অপমানিত করা হয়।

ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, যাহারা ঐরূপ কাজ করিতেছে, তাহারা মনে করে, পাকিস্তানে যেমন অ-মুসলমানের কোন অধিকার নাই, তেমনই জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরও স্থান নাই।

অতঃপর আমরা পূর্ববঙ্গের—বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত যে সকল সংবাদ ঐ দিনের পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকলের উল্লেখ করিতেছি।—

(১) পূর্ববঙ্গ হইতে (৭ই অক্টোবর) শ্রীসতীন সেন পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীকে তার করিয়া জানাইয়াছেন—বাখরগঞ্জ (বরিশাল) থানার দুধলে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং শহরে দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ বলিয়া বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মফঃস্বলে হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন।

(২) সৈয়দপুর হইতে কোন পত্রলেখক জানাইয়াছেন, তথা হইতে রেলের কারখানার হিন্দু কর্মচারীরা চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদিগের স্থানে বহু মুসলমান আসিয়াছেন। এখনও যে দুই চারি ঘর হিন্দু পরিবার আছেন, তাঁহাদিগের উপর অত্যাচার চলিতেছে। তালা ভাঙিয়া বলপূর্বক গৃহ অধিকার করা হইতেছে। পুলিশ কোন প্রতীকার করে না। প্রত্যহ ১০।১৫ খানি গৃহ বলপূর্বক অধিকৃত হইতেছে। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের দ্বারা হিন্দু নরনারী অপমানিত হইতেছেন।

(৩) কুষ্টিয়ার সংবাদ—"গত ৮ই সেপ্টেম্বর বেলা অনুমান ৩ ঘটিকার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রায় ১৪।১৫ জন লোক সমবেত হইয়া স্থানীয় উকিল শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ির বেড়া ভাঙিয়া তন্মধ্যস্থিত একটি বাসা জোরপূর্বক দখল করিতে চেষ্টা করে। ঐ বাসা হাজারীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাড়াটিয়ারূপে সপরিবারে দখল করিয়াছিলেন।......শ্রীকালীপদ পালের একটি বাসা নদীর ধারে আছে। ঐ বাসা তাহার ভাড়াটিয়া শ্রীসম্মোহন মজুমদার সপরিবারে দখল করিতেছিলেন। কিছুদিন হইল তিনি ঐ বাসা ছাড়িয়া দিয়া অন্য বাসায় গিয়াছেন।.....জনৈক মুসলমান উহা বে-আইনীভাবে দখল করিলে মালিক উহা ছাড়িয়া দিতে তাহাকে বলেন। কিন্তু সে বলে যে, সে লীগের 'ফোর্সিং অফিসার' (?) সুতরাং সে উহা ছাড়িবে না।"

এই সঙ্গে গত ৬ই অক্টোবর ময়মনসিংহ হইতে প্রেরিত সংবাদ উল্লেখযোগ্য। তথায় পাকিস্তান সরকার অনেক পাঞ্জাবী পুলিশ আমদানী করিয়াছেন। যাহারা কলিকাতায় উপদ্রব করিয়া গিয়াছিল, তাহারাই সেই উপদ্রবের পুরস্কারে পাকিস্তানে স্থান পাইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। তাহারা যে তথায়, লোকের নিকট হইতে দ্রব্য লইয়া তাহার মূল্য দেয় না—সে অভিযোগ নূতন নহে। কলিকাতাতেও তাহারা সেইরূপ কাজ করিত। প্রকাশ, গত ৫ই অক্টোবর ৫০।৬০ জন পাঞ্জাবী কনস্টেবল হকি খেলার ডাণ্ডা প্রভৃতি লইয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে ৮টার সময় বীণাপাড়ায় বসতি আক্রমণ করে। তথায় বহু অবাঙালী শ্রমিক বাস করে। লোক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া পলায়নপর হয়। কনস্টেবলরা নাকি গৃহদাহের জন্য পেট্রোলও লইয়া গিয়াছিল। তাহারা পুলিশ লাইনের সন্নিকটে হিন্দুদিগের দুইখানি দোকানও লুণ্ঠন করে ও মণীন্দ্র দেকে প্রহার করে। যখন এই ব্যাপার চলিতেছিল, সেই সময় ঠিকাদার শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র গুহরায় সেই পথে যাইতেছিলেন। পাঞ্জাবীরা তাঁহাকে আক্রমণ ও প্রহার করে এবং তাঁহার ঘড়ি ও টাকা কাড়িয়া লয়। ইহার পূর্বেও তাহারা কয়জন লোককে প্রহার করিয়াছিল।

এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকার যে কোনরূপ প্রতীকার করিতে অক্ষম তাহা ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল ভঙ্গেই বুঝিতে পারা গিয়াছে।

জানা গিয়াছে, গান্ধীজী সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে নির্বিঘ্ন করিবার ছাড় রচনা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর দিয়া তাহা মিস্টার জিন্নার নিকট স্বাক্ষর জন্য পাঠাইতেছেন। গান্ধীজী কি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অর্থাৎ ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ঐ ছাড় রচনা করিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে কি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের স্বাক্ষরই নিয়মানুগ হইত না? সে যাহাই হউক মিস্টার জিন্না যদি স্বাক্ষর দান করেন, তাহা হইলেই যে তাহার সর্ত পাকিস্তানে পালিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? পাকিস্তানের পরিচালকগণ পুনঃ পুনঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নির্বিঘ্নতার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন বটে কিন্তু কার্যকালে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই।

এই অবস্থায় বিশেষ পাঞ্জাবের অতি

ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পরে—পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের পক্ষে আতঙ্কানুভব অনিবার্য। যাঁহারা এখনও বলিতেছেন, লোক যেন বাস্তুত্যাগ না করে, তাঁহারা লোককে নির্বিঘ্নতা দিবার কি ব্যবস্থা করিতেছেন? পশ্চিমবঙ্গে এখনও পতিত জমীর অভাব নাই; সে সকল যাহাতে চাষ ও বাসের জন্য ব্যবহৃত হয়, সে চেষ্টা করা প্রয়োজন। বিস্ময়ের বিষয়, পূর্ববঙ্গেও ভূস্বামী ও ধনীরা হিন্দুদিগকে এক এক স্থানে আনিয়া বাস করাইবার জন্য কোন পরিকল্পনা করেন নাই। আমরা এই বিষয়ে তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি।

পশ্চিমবঙ্গেও যে ঐরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহা আমরা বার বার বলিয়াছি।

কিন্তু আমরা দেখিতেছি, পশ্চিমবঙ্গের সরকার এখনও কলিকাতায় পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় বলিয়াছেন, উপকরণের অভাবে বাঘমারী অঞ্চলে পুনর্বসতির কার্য অগ্রসর হইতেছে না। তবে কি সরকার কেবল "চিত্রার্পিতপ্রায়" থাকিয়া ঐ বিষয় কেবল লক্ষ্য করিবেন?

আবার কমলকৃষ্ণবাবু বলিয়াছেন—তিনি বাঘমারী ত্যাগ করিয়া ফৌজদারী বালাখানা অঞ্চলে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তথায়ও অবস্থা ভাল নহে। তিনি বলেন, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের গৃহস্বামীদিগের ব্যবহার ফলে ৭০ হাজার লোককে বসতি করান যাইতেছে না। প্রতিদিন শত শত লোক পুনর্বসতির জন্য আসিতেছে; কিন্তু অত্যধিক ভাড়া ও সেলামী দাবী করায় তাহারা হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। গৃহস্বামীদিগের এই ব্যবহারে সরকারের পুনর্বসতি পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

আমরা জানি, কলিকাতায় সেলামী নিষিদ্ধ। যদি তাহাই হয়, তবে যে সকল ভূস্বামী সেলামী দাবী করেন এবং যাঁহারা আইনের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ভাড়া বাড়াইতে সচেষ্ট তাঁহাদিগকে কেন মামলা সোপর্দ করা হয় না? আমাদিগের মনে হয়, কোন কোন পত্রে ঐরূপ সেলামী দাবীকারী গৃহস্বামীদিগের নামও প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার কি সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিয়াছেন, বা করিতেছেন? মুষ্টিমেয় গৃহস্বামী যদি ৭০ হাজার লোককে পুনর্বসতির সুযোগে বঞ্চিত করিয়া সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারেন, তবে তাহা সেই সকল অর্থগৃধ্নু গৃহস্বামীর পক্ষে যেমন নিন্দার কথা—তাহা সরকারেরও তেমনই প্রশংসাজনক নহে।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, গত বৎসর ১৬ই আগস্ট হইতে এ পর্যন্ত যে সকল গৃহ হিন্দুরা মুসলমানদিগকে বা মুসলমানরা হিন্দুদিগকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সে সকল পূর্বাধিকারীদিগকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। তাহার কি হইয়াছে? আমরা আজ একটিমাত্র গৃহের উল্লেখ করিব। আণ্টনীবাগান লেনে প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহ লুণ্ঠিত, তাহার দ্বার ও জানালা প্রভৃতি অপসারিত করিয়া তথায় বিহার হইতে আমদানী মুসলমানদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সে কাজ সরকার বা গৃহস্বামী কেহই করেন নাই। থানায় যাইলে বলা হইয়াছে, গৃহস্বামীকে অনধিকার প্রবেশের জন্য আদালতে যাইতে হইবে। দ্বার জানালা প্রভৃতি সনাক্ত করা হইলেও লুণ্ঠনকারীরা নিশ্চিন্ত আছে। তাহার উপর আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাঙ্গামা-ঘটিত মামলাগুলি প্রত্যাহার করিবেন, স্থির করায় তাহারা আরও সাহস পাইবে।

কলিকাতায় জনসংখ্যা হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাঁচরাপাড়ায় নূতন নগর পত্তন করিবার আয়োজন করিতেছেন। এই জন্য সরকার জামিন হইয়া এক গঠন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সেই প্রতিষ্ঠান কোম্পানীর মত মূলধন সংগ্রহ করিয়া কাজ করিবেন এবং প্রতিষ্ঠানে যেমন সরকারের তেমনই অংশীদারদিগের প্রতিনিধিরা কার্য পরিচালিত করিবেন—নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারের হইবে।

এই সংবাদ যে অনেকের পক্ষেই প্রীতিপ্রদ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলেই অবগত আছেন, বর্ধমানের নিকট পানাগড়ে সামরিক প্রয়োজনে নগর রচিত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিবিধ জনরব প্রচারিত হইয়াছিল—(১) বাঙলার মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ তথায় বিহার হইতে আনীত মুসলমানদিগকে বাস করাইবেন;

(২) তথায় শিল্প কেন্দ্র নগর রচনা করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গকেও মুসলমানপ্রধান করিবার অভিপ্রায়ে মুসলিম লীগ সরকার নিয়াজ মহম্মদ খাঁনকে আড়কাঠী করিয়া যে সকল বিহারী মুসলমানকে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগের সমস্যা আর পশ্চিমবঙ্গের নহে—তাহারাও আর হিন্দুস্থান বাঙলায় থাকিতে চাহিতেছে না। সে অবস্থায় যদি পানাগড়ে শিল্প কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ভালই; নইলে তথায় বহুলোকের বাসযোগ্য নগর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তথায় জমি সরকারের আছে। সুতরাং কাজ আরও সহজসাধ্য হইবে। আপাতত দ্রুত কাজ করাই যে নানা কারণে প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। পাকিস্থান বাঙলায় যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার বিষয় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

খুলনা—সাতক্ষীরার মহকুমা হাকিম ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে এই মর্মে এক আদেশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে দুইমাসকাল সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির (উসকা থানা কালীগঞ্জ) যুগ্ম সম্পাদক ব্রহ্মচারী ভোলানাথ সাতক্ষীরা মহকুমার এলাকায় প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত থাকিবেন। অল্প দিন পূর্বে তিনি সংবাদপত্রে এই মর্মে এক বিবৃতি প্রচার করেন যে, তিনি কালীগঞ্জে যাইলে কয়জন মাঝি তাঁহার নিকট পুলিশের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করে—প্রায় ২৫ জন মাঝিকে পুলিশ কালীগঞ্জ থানার জনৈক পুলিশ কর্মচারীর নিকটে লইয়া যায়। মাঝিরা প্রায় সকলেই মুসলমান। তাহারা বলে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় কালীগঞ্জের নিকটে তাহাদিগকে আটক করা হয় এবং তাহারা উৎকোচ দিয়া তবে অব্যাহতি লাভ করে।

অভিযোগের গুরুত্ব যে অসাধারণ তাহা বলা বাহুল্য। অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাই সরকারের কর্তব্য এবং দুর্নীতি দমনে সরকারকে সাহায্য করার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে ব্রহ্মচারী ভোলানাথকে ধন্যবাদ প্রদান করাই সংগত। কিন্তু তাহা না করিয়া মহকুমা হাকিম দুইমাসের জন্য তাঁহার সাতক্ষীরা মহকুমায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি যখন ক্ষমতা পাইয়াছেন, তখন তিনি আদেশ জারী করিতে পারেন। কারণ "রাজ-নন্দিনী হয়ে পেয়ারী, যা করিস তাই শোভা পায়।" কিন্তু ব্যবস্থাটা কিরূপ হইল?

অনেক স্থলে দেখা যাইতেছে, সমস্যা দিন দিন অধিক জটিল হইয়া উঠিতেছে। মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ড—কাহাদিগের অধীন? কাহার আদেশে বা নির্দেশে তাহারা ট্রেনে লোকের জিনিসপত্র খুলিয়া দেখে আটক রাখে কোন কোন জিনিস আনিতে বাধা প্রদান করে? পূর্ব পাকিস্থান সরকার কি তাহাদিগকে সেরূপ কাজ করিবার ছাড় দিয়াছেন?

পশ্চিমবঙ্গের যে সকল অংশ র‍্যাডক্লিফ-ব্যবস্থায় পাকিস্থানভুক্ত হইয়াছে, সে সকল হইতে কোন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইহা মধ্যেই স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কেন তাহা হইতেছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সে সকল প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার বুঝিয়া সে কাজ করিতেছেন। ফলে সে অঞ্চলে শিক্ষার্থীদিগের উচ্চ শিক্ষালাভের পথ আরও বিঘ্ন-কঙ্কর কণ্টকিত হইবে। কোন স্থানে কলেজে সাহায্যপ্রার্থনার উত্তরে খাজা নাজিমুদ্দীন যাহা বলিয়াছেন, আমরা পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

পূর্ববঙ্গের সমস্যার সহিত পশ্চিমবঙ্গের

সমস্যাও এই হিসাবে জড়িত যে, মুসলিম লীগ যাহাই কেন বলুন না, আমরা "দুই জাতি" মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না। তদ্ভিন্ন পূর্ববঙ্গে—পাকিস্থানে যে প্রায় এক কোটি ২৫ লক্ষ হিন্দু রহিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদিগের সামাজিক, সংস্কৃতিমূলক, শিক্ষা-সম্পর্কিত সব ব্যাপার পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদিগের ব্যাপারের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবেই বিজড়িত। যাঁহারা অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা হিসাবে বঙ্গবিভাগ চাহিয়াছিলেন, তাঁহারাও মনে করিয়াছেন—পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সর্ববিধ সাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিতে পারিবেন, সে কথাও পশ্চিমবঙ্গকে মনে রাখিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাও অল্প নহে। দেশের লোকমতের সহযোগ লইয়া সেই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইবে।

বিশ্রাম ও আরোগ্য

শ্রীকুসুমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পরিশ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর শ্রম এই নীতির উপরই আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত শ্রমের সহিত বিশ্রামের স্থান বিনিময় করিয়া লইয়াই আমরা বাঁচিয়া থাকি।

আমাদের দেহের প্রত্যেকটি যন্ত্রের যেমন পরিশ্রমের সময় আছে, তেমনি বিশ্রামেরও সময় আছে। হার্টকে দেহের অতন্দ্রিত সেবক বলা হয়। কিন্তু হার্টটিও প্রত্যেকটি স্পন্দনের ভিতর একবার বিশ্রাম করিয়া লয়। এইভাবে বিশ্রাম করিয়া পরবর্তী স্পন্দনের জন্য সে শক্তি সঞ্চয় করে। আমাদের মস্তিষ্ক ও পাকস্থলী প্রভৃতিও বিশ্রাম পাইয়াই পুনরায় পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়া থাকে।

পরিশ্রমের শেষে দেহ আপনি ভাঙিয়া আসে। প্রকৃতি তখন আপনি বিশ্রাম চায়। তখন পরিমিত বিশ্রামে দেহ ও মনের ক্ষমতা ফিরিয়া আসে। পরিশ্রমে দেহের ভাণ্ডার হইতে যে শক্তির অপচয় হয়, বিশ্রাম সেই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দেয়। এই জন্যই পরিমিত বিশ্রামের শেষে দেহ তাহার কর্মক্ষমতা ফিরিয়া পায়।

পরিশ্রম এক শ্রেণীর ধ্বংস কার্য। প্রত্যেকটি পরিশ্রমের কার্যেই দেহ কতকটা ক্ষয় পাইয়া থাকে। পরিমিত বিশ্রামের দ্বারা এই ক্ষয় পূরণ করা আবশ্যক। অন্যথা দেহের ধ্বংস হয়। এইজন্য একবার শ্রান্ত হওয়ার পর যখন বিশ্রাম না করিয়া পুনরায় শ্রমে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন দেহের যে ক্ষয় হয়, তাহা আর সহজে পূরণ হয় না।

শ্রান্ত হইবার পর যেমন বিশ্রাম করা কর্তব্য, তেমনি কয়েক দিন শ্রম করিবার পরেও একদিন বিশ্রাম করা আবশ্যক। এইজন্য ছয় দিন কাজ করিবার পর, একদিন বিশ্রাম নিবার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত আছে। সম্ভব হইলে কিছু দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত। বিশ্রামের এই সময়টা কখনো নষ্ট হয় না। যে সময়টা বিশ্রামের জন্য দেওয়া হয়, ভবিষ্যতের জন্য শক্তির ভাণ্ডারে তাহা গচ্ছিত থাকে। এইজন্য যাহারা মস্তিষ্কের কাজ করে তাহারা কায়িক পরিশ্রমশীল লোকদের অপেক্ষা অপেক্ষা গড়ে ১৪ হইতে ২০ বৎসর বেশি বাঁচিয়া থাকে।

কিন্তু জীবনে বিশ্রামের সুযোগ লাভ করা সহজ কথা নয়। এই পৃথিবীতে মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া তবে ক্ষুধার অন্ন অর্জন করিতে হয়। পূর্বের পৃথিবী এখন আর নাই। জীবন-লীলার পৃথিবী এখন জীবন সংগ্রামের পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে। অবস্থার চাপে এখন আর লোক ঘরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। এখন পৃথিবীর বড় বড় সহরগুলিতে লোক যে পথ দিয়া চলে, তাহাকে হাঁটা না বলিয়া দৌড়ানো বলিলেই ভাল হয়। একদিকে অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়না এবং অপর দিকে লোভ ও প্রভুত্বের মোহ মানুষকে পাগল করিয়া ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এই কর্মব্যস্ততার যুগে বিশ্রাম লাভ করাটাই এখন একটা প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে এই কর্মব্যস্ততার ভিতরও যে, অল্পাধিকরূপে বিশ্রাম লাভ করা না যায় তাহা নয়। আমরা পরিশ্রমকে হয়তো এড়াইতে পারি না, কিন্তু চেষ্টা করিলে শ্রমকে লঘু করিয়া লইতে পারি। হয়তো বিশ্রামের প্রচুর অবসর না থাকিতে পারে; কিন্তু এমন ব্যবস্থা করা যায়, যাহাতে স্বল্প বিশ্রামেই দীর্ঘ বিশ্রামের ফল-লাভ করা যাইতে পারে।

একজন লোক বলিয়াছেন কাজে মানুষ মরে না মরে উদ্বেগে। ব্যস্ততা ও উদ্বেগই কাজের পরিশ্রমকে বাড়াইয়া তোলে। পরিশ্রমে দেহের যতটা ক্ষয় হয়, তাহা অপেক্ষা বেশি হয় ব্যস্ততা ও উত্তেজনায়। এইজন্য কাজের ভিতর যখন উত্তেজনা না থাকে, তখন শ্রমটা যেন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়। শ্রমকে আমরা বর্জন করিতে পারি না, কিন্তু এভাবে কাজ করিতে পারি যাহাতে ব্যস্ততা ও উদ্বেগ না থাকে। শ্রমকে লঘু করিয়া লইবার ইহাই কৌশল।

পরিশ্রমকে যেমন আমরা লঘু করিয়া লইতে পারি না, তেমনি বিশ্রাম করিতেও আমরা জানি না। আমরা যখন ভ্রমণে বাহির হই তখনো মন নিশ্চিন্ত থাকে না। গৃহে ফিরিবার জন্য মন আকুলি বিকুলি করিতে থাকে। বিদেশে হাওয়া পরিবর্তন করিতে গেলেও অনেক সময় এইরূপ হয়। এই অস্থির মন লইয়া কখনো বিরাম লাভ হয় না।

আমাদের দেহ যখন বিশ্রাম করে, তখনো মন চলিতে থাকে। হয়তো গভীর বিদ্বেষ, ক্রোধ হিংসা বা অদম্য কর্ম পিপাসা মনকে আলোড়িত করিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তস্রোত ধমনির ভিতর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলে। সুতরাং দেহ আর কি করিয়া বিশ্রাম পায়। আরাম কেদারায় দেহ ঢালিয়া দিয়া অথবা শয্যার সঙ্গে দেহ মিশাইয়া দিয়াও পূর্ণ বিশ্রাম হয় না। অথবা তখনো দেহ ক্ষয় পায়।

এইজন্য পরিশ্রমের ভিতর যেমন বিশ্রাম হয়, তেমনি বিশ্রামেও দেহের ভিতর শ্রম চলিতে থাকে। সুতরাং বিশ্রাম অর্থ কেবল দৈহিক বিশ্রাম নয়। দৈহিক বিশ্রাম যখন মানসিক বিশ্রামের সহিত যুক্ত হয়, তখনই দেহ পূর্ণ-ভাবে বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে।

। ২ ।

কিন্তু বিশ্রামের মানসিক দিকটা সর্বদাই আমরা অস্বীকার করি। প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন শয্যায় শুইয়া থাকি, তখনো আমাদের মন শক্ত থাকে। মনের উত্তেজিত অবস্থার জন্যই ঐরূপ হয়। একটি নিদ্রিত শিশুর দিকে তাকাইলেই আমরা বুঝিতে পারি আমাদের বিশ্রামের ত্রুটি কোথায়। শিশুটি নিশ্চিন্ত মনে গা এলাইয়া দিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকে। আমরা ঐরূপ পড়িয়া থাকিতে পারি না কেন? যদি ঐভাবে বিছানার সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে পড়িয়া থাকা যায়, তবেই বিশ্রাম গ্রহণ সফল ও সার্থক হইয়া থাকে।

। কিছুদিন চেষ্টা করিলে সত্য সত্যই শিশুদের মত সমস্ত দেহ শিথিল করিয়া বিশ্রাম করা যায়। এইরূপ বিশ্রাম লাভের জন্য দেহকে শিথিল করাই সর্বপ্রধান কথা। কয়েকদিন অভ্যাস করিলেই সর্বদেহে এই শিথিলতা আনয়ন করা যাইতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে "আরোগ্যমূলক শিথিলতা' বলা হইয়া থাকে। এই অভ্যাস এক শ্রেণীর সাধনা। ইহাকে বিশ্রামের সাধনা বলা চলিতে পারে।

এইরূপ বিশ্রাম করিবার বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে। ইহা গ্রহণ করিবার পূর্বে ইহার জন্য দেহ ও মনকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। প্রথমেই মনটিকে চিন্তাশূন্য করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহার পর বিছানার উপর পিঠ রাখিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করিয়া আলস্য ভাঙার মত একটু নাম মাত্র ব্যায়াম করিয়া লইতে হয়। বিড়ালে যেরূপ আলস্য ভাঙে ইহাও ঠিক সেইরূপে করা হইয়া থাকে। প্রথমে একখানা হাত আস্তে আস্তে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া পুনরায় গুটাইয়া আনা হয়। তাহার পর হাতখানা শয্যার উপর এমনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, যেন উহা আপনি পড়িয়া যায়। পড়িয়া গেলে যেখানে পড়িয়া থাকে সেইখানেই হাতখানা রাখিয়া দিতে হয়। তাহার পর অপর হাতখানাও এইভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অতঃপর এক এক করিয়া পা দুইখানা যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া পুনরায় বুকের সঙ্গে আনিয়া লাগাইতে হয়। যখন দুইটি জানু বক্ষের সহিত আসিয়া মিশিয়া যায়, তখন মাথাটি তুলিয়া আনিয়া জানুর সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। এই সময় মেরুদণ্ড যাহাতে বিস্তার লাভ করে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এইভাবে মেরুদণ্ডটি যখন যথেষ্টরূপে প্রসারিত হয়, তখন মাথা ও পা দুইটি এমনভাবে যথাস্থানে ছাড়িয়া দিতে হয়, যেন উহারা অসাড় হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া যায়।

এইবার চোখ দুটি বন্ধ করিতে হয়। তাহার পর এক-এক করিয়া দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয় যে, ঐ অঙ্গটি শিথিল হইয়া গিয়াছে। কোন অঙ্গের উপর মনঃস্থির করিতেই দেখা যাইবে, ভিতরে ভিতরে যেন একটা উত্তেজনার স্রোত বহিয়া যাইতেছে। তখনই ঠিক ঠিক ধরা পড়ে, বিশ্রাম গ্রহণ করিলেও দেহ বিশ্রাম পায় না। কিন্তু এইরূপ ক্ষণকাল চিন্তা করিতেই অঙ্গটি শিথিল হইয়া যায়। অর্থাৎ উহার সমস্ত উত্তেজনা নষ্ট হয়। অন্তত কয়েক দিন অভ্যাস করিবার পর এইরূপ হয়-ই। কারণ ইহা এক শ্রেণীর "সংকল্প-ভাবনা"। (auto-suggestion)

প্রথমে একখানা পা সম্বন্ধে ভাবা উচিত। এইভাবে ভাবা উচিত যে, আমার সমস্ত পা-খানা শিথিল ও শান্ত হইয়া যাইতেছে। প্রথম পায়ের অঙ্গুলিগুলি সম্বন্ধে এইরূপ ভাবনা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ ঐ ভাবনা উর্ধ্বদিকে টানিয়া লইতে হয়। তাহার পর অপর পাখানা সম্বন্ধে ঐরূপ চিন্তা করা হইয়া থাকে। অতঃপর একখানা হাত, পরে আর একখানি হাত সম্বন্ধে ঐরূপ চিন্তা করা হয়। ইহার পর পৃষ্ঠদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করা হইয়া থাকে। পৃষ্ঠদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় এইরূপ ভাবা উচিত যে, মেরুদণ্ডটা নীচ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ উর্ধ্বদিকে শিথিল হইয়া যাইতেছে। তাহার পর পেট, বুক, ঘাড় ও মুখ সম্বন্ধে অনুরূপ চিন্তা করিতে হয়। এইভাবে কয়েকদিন অভ্যাস করার পর চিন্তা করা মাত্র হাত-পাগুলি তখন-তখন শিথিল হইয়া যায়। তখন হাত দুইটি পেটের উপর তুলিয়া পেটের নীচের দিকে সংযুক্ত অবস্থায় রাখা হইয়া থাকে। হাত দুইটি খুব মৃদুভাবে সংযুক্ত রাখা আবশ্যক। ইহাতে প্রথম প্রথম পেটের উপর একটু অস্বস্তি বোধ হইতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই এই অস্বস্তির ভাব কাটিয়া যায়। ইহার পর দেহের এই শিথিল অবস্থা ভঙ্গ না করিয়া এক পায়ের গ্রন্থি অন্য পদ-গ্রন্থির উপর তুলিয়া দিতে হয়।

এই সমস্ত ব্যাপারে সাধারণত তিন-চার মিনিটের সময় লাগে। কিন্তু ইহাতেই সমস্ত দেহ-মনে একটা আশ্চর্য শান্তি নামিয়া আসে এবং মনে হয়, যেন সমস্ত দেহখানি আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এইভাবে দেহ শিথিল হইয়া গেলে সাধারণত আপনিই ঘুম আসে। কিন্তু তখন ঘুমাইয়া পড়িতে নাই। তখন জাগিয়া থাকিয়া দেহের আশ্চর্য শান্তিময় অবস্থা লক্ষ্য করা কর্তব্য। কিন্তু এই সময় নিদ্রা গেলে দেহ এরূপ বিশ্রাম লাভ করে যে, সাধারণ বিশ্রাম অপেক্ষা তাহা অনেক বেশী গভীর হয়।

এই অবস্থাটাকে আয়ত্তের ভিতর আনিতে সাধারণত এক হইতে দুই ঘণ্টা সময়ের আবশ্যক হয়। কিন্তু একবার অভ্যাস হইয়া গেলে শয্যায় শয়ন করিয়া ইচ্ছা করা মাত্র সমস্ত দেহ শিথিল ও ঢিলা হইয়া যায়।

দেহ এইভাবে শিথিল হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম গ্রহণ করা যায়, তবে অত্যন্ত উপকার হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম আরোগ্যমূলক শিথিলতার একটা অপরিহার্য অংশ। দেহ শিথিল হইয়া যাইবার পর তিন-চারবার পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ইহা খুব ঘন ঘন নিবার প্রয়োজন হয় না। বেশ বিশ্রাম নিয়া কিছু পর পর এক-বার করিয়া নিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই সময় দেহের শিথিলতা যাহাতে ভঙ্গ না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এই জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামগুলি খুব ধীরে ধীরে গ্রহণ করা কর্তব্য। তথাপি শিথিলতা অভ্যাস হইয়া গেলে, দেহ যত শিথিল হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস তত গভীর হইয়া উঠে। তখন যতক্ষণ আরাম বোধ হয়, ততক্ষণই ইহা নেওয়া যাইতে পারে।

এই পদ্ধতি অনুযায়ী অর্ধ ঘণ্টার জন্য দেহকে শিথিল করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু প্রতিদিন ইহা গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয় না। সাধারণ অবস্থায় সপ্তাহে দুই দিন গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ তরুণ রোগে প্রতিদিন ইহা গ্রহণ করা হয়। তাহার পর রোগ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে বেশী দিন অন্তর অন্তর গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

শ্রান্ত বা দেহ-মনের উত্তেজিত অবস্থায় ইহা যে কোন সময় গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায়, খালি পেটে বা আহারের পূর্বে গ্রহণ করিলেই সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার হইয়া থাকে।

[৩]

শ্রান্ত দেহে সজীবতা ফিরাইয়া আনিতে, দেহকে শিথিল করার মত পৃথিবীতে আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। দেহের শ্রান্ত অবস্থায় মাত্র দশটি মিনিটের জন্য দেহকে শিথিল করিয়া লইলে সমস্ত শ্রমের অপনোদন হয় এবং ক্লান্তির ভাব কাটিয়া যায়। অনেক সময় এইভাবে কিছু সময়ের জন্য দেহকে শিথিল করিয়া লইয়া শ্রমের পর পুনরায় আবার কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে

দেহ ও মনের উত্তেজিত অবস্থায়ও ইহা যে কোন সময় গ্রহণ করিয়া আশ্চর্য উপকার লাভ করা যায়। মন হঠাৎ ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে শয্যায় শুইয়া পড়িয়া দেহকে শিথিল করা মাত্র মন শান্ত হইয়া যায়। এমন-কি, যাহারা অস্বাভাবিক উপায়ে দেহকে নষ্ট করে, দেহ উত্তেজিত হইবার পরেও দেহকে শিথিল করিয়া লইতে পারিলে অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হয়।

লোকে দেহকে আয়ত্তে আনিতে পারে, কিন্তু মনকে আয়ত্তে আনিতে পারে না। ইহা সর্বদাই গড়াইয়া চলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মাংসপেশীর শিথিলতা মনের উপর আপনি প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্য কিছুদিন দেহের শিথিলতা অভ্যাস করিলে, মাংসপেশী ও স্নায়ুর উত্তেজনা যখন কমিয়া যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে মনও শান্ত ও সংযত হইয়া উঠে এবং মানসিক শক্তি যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি পায়। এই জন্য দেহকে শিথিল করার পদ্ধতিকে আমাদের যোগশাস্ত্রে একটি আসন বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। বিদেশী ভাষায় যাহাকে 'দেহের শিথিলতা' বলে আমাদের হঠযোগ শাস্ত্রে তাহাকে 'শবাসন' বলা হইয়া থাকে। কোন কোন ইউরোপীয় এই দাবী করিয়া থাকেন যে, এই পদ্ধতিটি তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু দেহ ও মনকে শান্ত করিবার এই

আশ্চর্য কৌশল, ইউরোপীয়েরা অবগত হইবার বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতীয় ঋষিরা অবগত হইয়াছিলেন। যোগশাস্ত্রে ইহার বহু প্রশংসা আছে।

প্রকৃতপক্ষে কিছুদিন দেহের শিথিলতা অভ্যাস করিলে মনের দিক দিয়া আশ্চর্য পরিবর্তন হয়। ইহা গ্রহণের ফলে কোপন-স্বভাব শান্ত হয়, কলহস্পৃহা কাটিয়া যায়, মানুষ বিনা উত্তেজনায় যুক্তি দিয়া কথা বলিতে সক্ষম হয় এবং সহজে ঘাবড়ায় না বা ভয় পায় না বা কোন কাজের কথা ভুলিয়া যায় না। কিছুদিন দেহের শিথিলতা অভ্যাস করিলে ইহা এরূপ আয়ত্তে আসে যে, প্রবল উত্তেজনার সময়, কাহারো সহিত দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে বা পথ চলিতে চলিতে ইচ্ছা মত দেহকে শিথিল করিয়া দেহ ও মনকে শান্ত করিয়া লওয়া যায়।

শিথিলতা অভ্যাসের দ্বারা স্নায়ুগুলি স্নিগ্ধ হয় বলিয়া বিভিন্ন স্নায়বিক রোগে ইহা দ্বারা আশ্চর্য উপকার হয়। অনিদ্রা রোগ দূর করিবার ইহা একটি প্রধান উপায়। যদি সুনিদ্রা লাভ না হয়, তবে সকল বিশ্রামই মিথ্যা হইয়া থাকে। সত্যকার যে স্বাভাবিক বিশ্রাম, তাহাও কেবল নিদ্রার সময় লাভ হয়। এই সময় সকল উত্তেজনার অবসান হয় এবং দেহ তাহার শ্রান্ত তন্তুগুলিকে মেরামত করিবার অবসর পায়। যদি প্রতিদিন যথাসময়ে নিদ্রা না আসে, নিদ্রা অগভীর হয়, অথবা অল্প সময় পরেই ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে কিছুকাল পর্যন্ত প্রতি রাত্রেই শয়নের পূর্বে দেহকে শিথিল করিয়া লওয়া উচিত। কয়েকদিন এইরূপ করার পর দেহকে শিথিল করা মাত্র আপনি নিদ্রা আসে এবং কখন যে আসে, তাহা বোঝাই যায় না।

হৃৎকম্পকে বর্তমানে আর হৃদযন্ত্রের রোগ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা একটি মানসিক বিশৃঙ্খলাঘটিত রোগ। প্রতিদিন বা একদিন অন্তর একদিন নিয়মিতভাবে অর্ধ ঘণ্টার জন্য দেহকে শিথিল করিলে ক্রমশই হৃৎকম্পনের ভাব কাটিয়া যায় এবং অবশেষে রোগী স্বর-যন্ত্রের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে।

অন্যান্য সাধারণ রোগে দেহকে শিথিল করার তেমন প্রয়োজন হয় না। তথাপি এমন কোন রোগ নাই, যাহাতে বিশ্রামের প্রয়োজন না আছে। অতিরিক্ত শ্রমের পর দেহ যেমন বিশ্রাম চায়, তেমনি রোগের সময়ও দেহ কাজ করিতে অস্বীকার করে। কারণ দেহ যখন বিশ্রামরত থাকে তখনই কেবল প্রকৃতি দেহকে মেরামত করিয়া লইবার অবসর পায়। এই জন্য সমস্ত রোগে বিশ্রামই একটা চিকিৎসা।

প্রায় সমস্ত রকম বেদনায় সামান্য নড়াচড়াতেই কষ্ট বোধ হয়। তখন কেবল বিশ্রাম দিলেই অনেক সময় বেদনা পড়িয়া যায়। এই জন্য একটা হাত বা পা যদি ভাঙিয়া বা মুচকাইয়া যায়, তবে প্রথমেই এমন ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে হাত বা পা নড়িতে না পারে। আঘাতপ্রাপ্ত অংগটিকে এইরূপ বিশ্রাম দিবার ব্যবস্থা করিলে প্রকৃতি ঐ অংগটিকে আপনিই সংস্কার করিয়া লয়। ঠিক এই জন্য পেটে বেদনা হইলেও না খাইয়া আমরা পেটকে বিশ্রাম দিই।

এইভাবে মস্তিষ্কের অসুখে মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়া হইয়া থাকে। চক্ষুরোগ ও অন্য কোন যন্ত্রের রোগেও ঐ সকল যন্ত্রকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। অনেক সময় দেহটিকে বিশ্রাম দিলেই দেহের বিভিন্ন যন্ত্র বিশ্রাম পাইয়া থাকে। এই জন্য পাকস্থলীর ক্ষত সারাইতে পরিপূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়।

সর্বপ্রকার জ্বর রোগেই বিশ্রাম একেবারে অপরিহার্য। জ্বরের সময় কেবল বিশ্রামেই বহু অবস্থায় জ্বর আপনি আরোগ্য লাভ করে। এমন কি, যক্ষ্মা রোগীকেও কেবলমাত্র বিশ্রাম দিলে তাহার জ্বর ও অধিকাংশ উপসর্গ আপনা হইতে কমিয়া আসে। যদি যক্ষ্মা রোগীকে প্রয়োজনানুসারে কয়েকদিন হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্রাম দেওয়া যায়, তবে অনেক সময় কেবল তাহা দ্বারাই রোগীর দুর্বলতা, মন্দাগ্নি, অজীর্ণ দ্রুত হৃৎস্পন্দন জ্বর কাশি ও শ্লেষ্মা কমিয়া আসে এবং কোন কোন অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়।

পরিপূর্ণ বিশ্রাম ওজন বৃদ্ধির একটি প্রধান সহায়। এই জন্য যে সকল রোগীর ওজন বৃদ্ধির প্রয়োজন তাহাদিগকে সর্বদাই দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশ্রাম দেওয়া হইয়া থাকে।

এই সকল কারণে সকল রোগেই বিশ্রামে উপকার হয়। কঠিন কঠিন রোগে কেবল বিশ্রাম দেওয়াই যথেষ্ট হয় না। ঐ সকল অবস্থায় সর্বদার জন্য শয্যায় থাকিয়া পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের আবশ্যক হইয়া থাকে। যখন রোগী শয্যা হইতে কিছুতেই নাবে না এবং অপর কেহ তাহার জন্য সব কিছু করিয়া দেয় তখনই কেবল তাহার পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

কিন্তু রোগে ও স্বাস্থ্যে বিশ্রামের যথেষ্ট উপকারিতা থাকিলেও ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, বিশ্রাম ও আলস্য এক কথা নয়। রোগ ব্যতীত বিশ্রাম অর্থই শ্রমের পর বিশ্রাম। যে বিশ্রাম শ্রমের অনুগমন করে না, দেহ ও মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থাকেই দীর্ঘ করিয়া লয়, তাহা বিশ্রাম নয়, তাহা আলস্য। অতিরিক্ত শ্রমে যেমন দেহের ক্ষয় হয়, আলস্যেও তেমনি মনের ভিতর মরিচা ধরিয়া যায়। আলস্য ও শ্রান্তির ভিতর যদি একটা বাছিয়া লইতে হয়, তবে শ্রান্তিকেই বাছিয়া লওয়া উচিত। খাটিয়া খাটিয়া বরং মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি মরিচা ধরিয়া মরা ভাল নয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

(মনোমোহনের বাড়ির বাগান। অপরাহ্নের শেষ। অঞ্জলি বসে ছিলো। সুলতা এলো।)

অঞ্জলি—লতা, আবার এসেছিল পড়া কামাই করে? তোর না সামনের মাসে পরীক্ষা?

লতা—আমি তো ভাই পড়াশুনোয় ভালো, লোকে বলে। তবে খুব বেশি না পড়লে কি আমার চলবে না?

অলি—বোস্। (লতা বসলো।)

লতা—তোর মা কোথায়? দালানে দেখতে পেলুম না তো?

অলি—মা বোধ হয় শুয়ে আছে।

লতা—এমন ভর্ সন্ধ্যে বেলায়?

অলি—মায়ের শরীর খারাপ। আমার বিয়ের আগে থেকেই খারাপ যাচ্ছিলো। বিয়ের পর আরো ভাঙলো। তার পর সব খুইয়ে যখন এলুম—

লতা—(ওর একখানি হাত ধরে) থাক তার পরের কথা সবাই জানে। তোর কথা ভাবলে আমার হাত-পা হিম হয়ে আসে অলি। এক মাস মাত্র বিয়ে হলো আর আজ তুই বিধবা?

অলি—বিধবা তো নই; কুমারী। যে ক'টা দিন স্বামীর ঘর করেছি কেবল পদসেবাই করেছি; ভালোবাসার কথাও তিনি বলবার অবসর পান নি।

লতা—থাক্, ওসব কথায় কাজ নেই। —মাসিমার কি বিশেষ কিছু রোগ হয়েছে? ডাক্তার দেখানো হচ্ছে তো?

অলি—বিশেষ রোগ আর কি। ঘুসঘুসে জ্বর, খেতে চায় না। খায় না, ঘুমোয়-ও কম।

লতা—কে দেখছে?

অলি—মোড়ের ডাক্তার; অনিলবাবু।

লতা—ওঃ, সে? তোর বাবা যে মত দিলে?

অলি—বাবা জানে না। মা লুকিয়ে একদিন ওষুধ আনিয়ে ছিলো। মায়ের আর সে-ওষুধ খাওয়াও হচ্ছে না।

লতা—কেন?

অলি—পাছে বাবা জানতে পারে বলেই বোধ হয়, মা ওষুধ ফেলে দিয়েছে। মা ভারি একগুঁয়ে হয়ে গেছে। আমি বললুম, "মা, ও-ডাক্তারকে কেন? বাবা জানলে অন্য ভাববেন।" ওর সংগে আমার বিয়ে দিতে মায়ের কিরকম ঝোঁক ছিলো তা তো জানিস? —মা বললেন, "ওর চেয়ে ভালো ডাক্তার এখানে কেউ নেই। ও পাশ করে জলপানি পেয়েছে। ওকে দেখলেই অর্ধেক রোগ সেরে যায়।" —এর ওপর আর কী বলবো বল? আপত্তি করেছিলুম বলে সে কি রাগ আমার ওপর। এতো রাগ মা কখনো আমার ওপর দেখায় নি।

লতা—অলি, মায়ের ব্যথাটা বুঝতে পারিস? তোর জন্যে তোর মা তোর বাবার সংগে কতো লড়াই করছে। মান-অভিমান, রাগ-ঝাল সবই করছে। তবু উপায় নেই। অন্ধ গলি, যেদিকেই যাও পথ বন্ধ। রবি ঠাকুর লিখেছেন না, "বোবা আকাশ কথা কয় না।" অলি, কার কাছে নালিশ করবো আমরা, মেয়েরা?

অলি—নালিশ? নালিশ আবার কি? মেনে নিতে হবে। বিধাতার লিখন খণ্ডানো? সে তো আহাম্মুখি। তাঁর লিখন কি বোঝা যায় কিছু? এই দেখ না, নিজের অবস্থাটা নিজেই বুঝতে পারছি না। এই দেড় মাসে কবে যে বিয়ে হলো, আর কবে যে বিধবা হলুম, বুঝতেই পারছি না। বিয়ের রাত্তিরটার কথা মনেই পড়ে না যেন।

লতা—বলিস কিরে? বিয়ের রাতের কথা মনে পড়ে না?

অলি—সময় সময় মনে আসে না। আবার এক-এক সময় দপ্ করে সমস্ত ছবিটা চোখের সামনে জ্বলে ওঠে। (ভোলা এলো।)

ভোলা—মাসিমা, দিদিমা খুব ঘুমুচ্ছে।

অলি—এখনো উঠলো না? বাবা এসেছেন?

ভোলা—না তো। আজ বোধ হয় আসতে রাত হবে।

(নেপথ্যে) মনোমোহন—ভোলা?

ভোলা—এই রে। দাদামশাই।

নেপথ্যে—ভোলা?

অলি—ভোলা যাচ্ছে বাবা, আমি যাচ্ছি।

নেপথ্যে—না-না। তোর আসতে হবে না। ভোলাকে পাঠিয়ে দে। (তৎক্ষণে ভোলা চলে গেছে। অরুণা এলো।)

লতা—কিরে অরু, আয় বোস্।

অরুণা—মা গেছে এটর্নি গিন্নীর কাছে পাশের বাড়িতে। আসতে যার নাম ন'টা। ভাবলুম, যাই দেখে আসি অলিটা কী করছে। জানতুম না লতা আছে।

অলি—অরু, তোর নাকি বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে? পরশু তারা পাকা কথা দিয়েছে?

অরুণা—কে জানে ভাই, আমি ওসব কথায় থাকি না।

লতা—তবে কে থাকে ওসব কথায়? তোরই তো বিয়ে?

অরুণা—বারে, ওসব কথায় আমি থাকতে যাবো কেন? মা থাকবে, বাবা থাকবে—

লতা—আর তুমি থাকবে দরজার আড়ালে। আড়াল থেকে কথা শুনবে। অপছন্দর কিছু হলে মায়ের কাছে ঝাঁজ দেখাবি, অভিমান করবি। আর পছন্দর কিছু হলে মায়ের কথা বেশি করে শুনবি। বাপের দরকার না হলেও জল আর পান নিয়ে অসময়ে হাজির হবি।

অরুণা—দেখছো ভাই অলি, লতা কেবলই ঠোক্কর দেবে।

অলি—না না। ও' ঠাট্টা করছে।

অরুণা—কিন্তু ওর ঠাট্টাও যেনো ঠোক্কর।

লতা—তবে চললুম। তুমি অলির মতো শান্ত শ্রোতার কাছে মন খুলে কথা বলো। আমি দেখে আসি, অলি, মাসিমা উঠলো কিনা। (সুলতা চলে' গেলো।)

অরুণা—অলি, কী বলবো? মাঝে লতা থাকলে আমি কথা বলতে পারি। একা তোকে দেখলে কথা বন্ধ হ'য়ে যায়।

অলি—কেনরে? আমার জন্য দুঃখে?

অরুণা—ভগবান বোধ হয় কানা, তাই তোর অমন রূপও দেখতে পান না। যদি পেতেন তবে এই বয়েসে বিধবা করতেন না।

অলি—থাক্, দরদ দেখাস নি।

অরুণা—অলি, তোর বর তোকে ভালোবেসেছিলো?

অলি—সময় পেলো কই? বিয়ের পরেই [illegible] রোগে পড়লো, তারপর ভুগে ভুগে একমাস পরে সব শেষ।

অরুণা—একটু আদরও পাস্ নি?

অলি—কেন পাবো না? যখন সেবা করতুম, বলতো, "তাই তো তোমার ভারি কষ্ট হচ্ছে।" আর বলতো, "তোমার জন্যে এক ছড়া নতুন ফ্যাসানের হার গড়াতে দিয়েছি।"......আমার কথা থাক্। তোর বর কী করেরে?

অরুণা—কাগজে লেখে উপন্যাস, কবিতা। ওরা দু'ভাই। ছোটটি নেহাৎ ছোটো। বাপের অনেক টাকা। একখানা প্রেস আছে ওর নিজের নামে। বয়সও কম; পঁচিশ। খুব ফর্সা। পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা।

অলি—তুই দেখেছিস্ নাকি?

অরুণা—কেন দেখবো না? বন্ধুকে নিয়ে নিজে যে আমাকে দেখে গেছে। ওর বন্ধু বললো, "তুমি অনুপমবাবুর লেখা কোনো উপন্যাস বা কবিতা পড়েছো?" আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

অলি—তুই পড়েছিস্?

অরুণা—হ্যাঁ, শুনেছিলুম ও' লেখক। দু'খানা আনিয়ে পড়ে নিয়েছিলুম।

অলি—বেশ তো চালাক তুই!

অরুণা—বললুম, "ফুলের নিচে আর তারা-খসা।" লেখকের তখন মাথাটা আরো নিচু হ'য়ে গেলো। খুব খুশী হ'লো আর কি! আমার যা হাসি পেলো!

অলি—তাই নাকি?

অরুণা—বিয়ের পর লেখার কথা যদি বলে, বলবো তোমার লেখা একদম বাজে।

অলি—কেন, লেখা খারাপ?

অরুণা—না না। ভালো লেখা। বলবো মিছি-মিছি। রাগাবো না? না হ'লে মজা কি? (সুলতা এলো)

লতা—ফিস ফিস করে কী মনের কথা বলছিস রে অরু? হ্যাঁরে, তোর বরের রং নাকি কালো?

অরুণা—হ্যাঁ, রজনীগন্ধার মতো।

লতা—খুব নাকি মোটা?

অরুণা—রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো।

লতা—হাঁ-টা নাকি খুব বড়ো?

অরুণা—ছোটো একটি রসগোল্লা না ভাঙলে ঢোকে না মুখে।

লতা—না না, আমি শুনেছি যে।

অরুণা—তাই নাকি? কে বললে? আনন্দবাজারে লিখেছে নাকি?

লতা—আর তোর বরের নাকি এক ঝোড়া গোঁফ?

অরুণা—হ্যাঁ, ফড়িং-এর ডানা যেমন এক যোড়া তেমনি।

লতা—বা[illegible]ঃ। অলি, তবু এখনো বিয়ে হয়নি। অরু, তুই বিয়ের পর কী করবি আমি জানি। (অরুণা প্রস্থানোদ্যতা।)

অলি—চললি নাকি?

অরুণা—এতোক্ষণে বোধ হয় রান্না হ'য়ে গেছে। এবার খিদে পেয়েছে বেজায়। (অরুণা চলে' গেলো।)

লতা—আচ্ছা মেয়ে যা হোক্।

অলি—দেখ্ লতা, ভালোবাসা কি ইয়ার্কি? ফাজ্‌লামি?

লতা—অরুর মতো মেয়েরা তাই ভাবে। ওরা তার বেশি জানে না। ওরা জানে না যে ভালোবাসাটা একটি দুঃখ। যাকে ভালোবাসবো তার জন্য সব করা যায়। কী বলিস্? (সারদা এলেন।)

অলি—মা, তুমি এই খান্‌টায় বোসো।

সারদা—অলি, ওঁর ঘর, আমার ঘর, দালান—এসব ঝাড়া মোছা কে করলো? ভাঁড়ার গোছালো কে?

অলি—আমি মা। বিকেলবেলা কোনো কাজ খুঁজে পাইনি। কি যে করি ভেবে পাচ্ছিলুম না। তাই ভাবলুম......

সারদা—তোকে না একশো বার বারণ করেছি? অগোছালো মনে হয়, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাকে দিয়ে করাবি।

অলি—(অভিমানে) কেন? কেন করবো না? কেন করবো না নিজে?

সারদা—না। আমি বলছি 'না'। আমি কি বুঝতে পারি না কিছু?

অলি—ছাই বোঝো।

সারদা—সব বুঝি। আগে আমি মরি, তারপর যা খুসী করিস্।

অলি—মা, ওকথা বলতে আটকালো না তোমার?

সারদা—কেন আটকাবে? তোর ভয়ে? কাকেও আর ভয় করি না। যমকেও নয়।

অলি—একটু কষ্ট হ'লো না তোমার ওকথা বলতে? তুমি গেলে আমার আর কে রইলো? তখন কী নিয়ে থাকবো?

সারদা—তবে বল্, আমার কথা শুনবি? অতো খাটতে পাবি না।

অলি—কেন মা ছেলেমানুষী ভাবনা ভাবছো? কেন খাটি জানো? যা ভাবছো তা নয়। তোমার শরীর খারাপ, বাবা আবার এমনি ছেলেমানুষ, কাজের একটু এদিক ওদিক হ'লে রেগে অনর্থ করবেন। বোঝেন না যে তোমার শরীর খারাপ।

সারদা—না-ই বুঝুক। করুক-না রাগ। উনি চলেছেন ওঁর কর্তব্যের রাস্তায়। এদিকে আমরা মায়ে-ঝিয়ে বুকের বোঝা ব'য়ে ব'য়ে মাটীতে মিশিয়ে যাচ্ছি যে, তার খবর কে রাখে?

লতা—মেসোমশাই কি অলিকে কম ভালো-বাসেন মাসিমা?

সারদা—বলিস্ নি ওদের ভালোবাসার কথা। ওরা ভালোবাসতেও যতো, ভালো' না বাসতেও ততো। পুরুষ কিনা! যদি সত্যিই ভালোবাসতো তবে আমার এমন সোনার চাঁদ মেয়েকে বুড়োর গ্রাসে না দিয়ে অনিলের হাতেই দিতো।

অলি—মা, বিয়ের আগে ওসব শুনেছি। আর নয়।

লতা—মাসিমা, ভাগ্যের ওপর আর কার হাত আছে বলুন?

সারদা—ভাগ্য আর ভাগ্য! চিরকাল ঐ এক কথা মানুষের। কেন, ইচ্ছে করলে কি অনিলের হাতে দিতে পারতুম না?

লতা—মনে করুন না কেন অলির বিয়েই হয়নি। সে কুমারী।

সারদা—সে-চেষ্টা কি করি না? কিন্তু পারি না, ভাবতে পারি না।

লতা—না মাসিমা, তাই ভাবতে হবে। উপায় কী বলুন?......আচ্ছা আজ আসি মাসিমা। মায়ের শরীরটা খারাপ......(সুলতা চলে' গেলো।)

অলি—মা, আমার ইচ্ছে নয় যে, আর [illegible] পারি। চুড়ি চারগাছা আজ খুলে ফেলবো কোথায় সময়।

সারদা—তোর যা ইচ্ছে কর। আমি তোর কেউ নই। (উঠতে গিয়ে টলে' পড়লেন। অলি মাকে ধ'রে বসালো।)

অলি—না মা না। আমাকে তুমি যা বলবে তাই করবো। তোমার শরীর খারাপ মনে ছিলো না। চলো ঘরে।

সারদা—না, ঘরে কেন? ঘরের চারখানা দেয়ালই তো সারা জীবন ধ'রে দেখে আসছি। তোকেও তাই দেখতে হবে। (অলিকে বুকে নিয়ে) আয় অলি বুকে আয়। বুকটা ধড়াস ধড়াস্ করছে। ঐ তো তোর চোখ ঝাপসা হ'লো। আয় বুকে আয়। আবার তুই আমার দেহে মিলিয়ে যা। জন্মাবার আগে তাই তো ছিলি। বাইরের যতো ঝড় ঝাপ্টা আমারই বুকে লাগুক।

অলি—না, আমি এমনি ক'রে তোমাকে আড়াল ক'রে রাখি। ঝড়-ঝাপ্টা মায়ে-ঝিয়ে এক সঙ্গে ভোগ করবো। (মনোমোহন এলেন।)

মনোমোহন—ওঃ, তুমি এখানে? অলি তোর সেই বইখানা পড়া হ'য়েছে?

অলি—কোনখানা? সেই 'ব্রহ্মচর্য'খানা? না বাবা, আর একটু বাকি আছে।

আমি বিবেকানন্দ'র পত্রাবলী পড়ছি। খুব ভালো লাগছে।

মনোমোহন—উঁ? ওঃ। হ্যাঁ, উনি মস্ত সাধক। তবে ও'র সব কথা আমার আবার মনে লাগে না। যাক্ হ্যাঁরে, আমার টেবিলে একখানা ইংরেজী বই ছিলো গেলো কোথায়?

সারদা—সেখানা আমি তোমার আলমারিতে তুলে রেখেছি।

মনোমোহন—আচ্ছা।

সারদা—তুমি বোসো। একটা কথা বলবো। (মনোমোহন বসলেন।)

মনোমোহন—আজ আর তোমার জ্বর হয়নি? দেখ্‌তো অলি গায়ে হাত দিয়ে। (অলি কপাল দেখ্‌লো।)

অলি—একটু গরম।

সারদা—হ্যাঁরে, একেবারে আগুন গরম। পুড়ে যাচ্ছে আর কি? যা যা, আমার জ্বর দেখতে হবে না।

মনোমোহন—দেখো, তোমার মেজাজ্‌টা বড়োই খিট্‌খিটে হ'য়ে গেলো।

সারদা—কী আর করবো বলো?

মনোমোহন—কী বলবে বলেছিলে?

সারদা—না বলবো না। ব'লে কোনো লাভ নেই।

মনোমোহন—শুনিই না।

সারদা—বলছিলুম, অলিটাকে পড়তে দাও আবার। ও' লেখাপড়া করে বি এ, এম এ পাশ করুক। পাশ করার বুদ্ধি ওর খুবই আছে।

মনোমোহন—তার চেয়ে মায়ে ঝিয়ে দুজনেই ইস্কুলে ভর্তি হ'লে হয় না? (সারদা রেগে উঠে পড়লেন।)

সারদা—বলতে আটকালোও না?

মনোমোহন—কেন আটকাবে? আমি জানি অলিকে কী করতে হবে।

সারদা—ফর্দটা একবার শুনি?

মনোমোহন—ও' ব্রহ্মচর্য পালন করবে প্রাণপণে। ঘরের কাজে ডুবে থাকবে সারাদিন। আর ভাবছি ওকে মন্ত্র নেওয়াবো। দীক্ষা।

সারদা—এর চেয়ে সতীদাহ ভালো ছিলো।

মনোমোহন—কী! এতো বড়ো কথা? কালের হাওয়া তোমাকেও লাগলো?

অলি—বাবা, মায়ের শরীর খারাপ। মাকে একলা থাকতে দাও। (ভোলা এলো।)

ভোলা—দা'দামশাই, হরিদাদু এসেছে। ঘরে বসেছে......

মনোমোহন—যাচ্ছি। (ব'লেই চলে গেলেন। ভোলা মাতাপুত্রীর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে চলে' গেলো।)

অলি—মা, আমরা না সহ্য করতেই এসেছি? একথা যে তোমারই কথা মা। ভুলে যাচ্ছো কেন?

সারদা—আমার কথা নয়। দুঃখের কথা। আমার দুঃখের কথা। (মনোমোহন এলেন।)

মনোমোহন—তুমি শোও গে। শরীর খারাপ, ঘুসঘুসে জ্বর। বাইরের হাওয়ায় কেন?

সারদা—তাই যাবো। ঘরের চারখানা দেয়াল যদি সরে' সরে' এসে 'সারি'কে গোর দেয়, তবেই 'সারি'র মুক্তি। (চলে গেলেন।)

অলি—কেন বাবা মাকে বকছো? মাকে কিছু ব'লো না।

মনোমোহন—আমি কি সাধে বলি? বলতে কি চাই?

অলি—না বোলো না।......আমি একটা কথা ভাবছিলুম।

মনোমোহন—বল্ মা।

অলি—সাড়ি চুড়ি আর ভালো লাগে না। মাকে বলেছিলুম। মা সাড়ি-চুড়ি ছাড়াতে চায় না।

মনোমোহন—খুব ভালো কথা মা তোমার। খুব ভালো কথা। তবে থানটা না পরে' সরু পাড় ধুতি পরলেই পারিস। একগাছা ক'রে চুড়ি থাক্। যাক্, ওসব কথা পরে হবে। এখন ঘরে আয়।

অলি—সরু পাড় ধুতি? এক গাছা ক'রে চুড়ি থাকবে হাতে?

মনোমোহন—হ্যাঁ, ছেলেমানুষের ওতে দোষ হয় না।

অলি—না বাবা, আমাকে থান পরতে হয়, হাত খালি রাখতে হয়। (মুখ ফিরিয়ে নিল। চোখ জলে ঝাপসা। ঠোঁট ফুলছে।)

মনোমোহন—তোর মাকে ডাক্। নিজের কানে মেয়ের কথা শুনে যাক্। (সারদা এলেন।)

সারদা—শুনেছি কথা। যেটুকু শুনেছি ঐ অনেক। সরু পাড় ধুতি আর এক গাছা চুড়ি। কেন, তাই বা কেন?

অলি—মা, তুমি থামো। আমাকে নিয়ে আর তোমরা টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি করো না। (মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মনোমোহন বিমূঢ়।)

দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য :

(সারদার ঘর। ঘরখানির সজ্জা মনোমোহনের ঘরের সংগে অনেক মেলে। প্রথম রাত্রি। ভোলা মৃদুস্বরে গান করতে করতে এসে আলো জ্বাললো। বিছানা ঝেড়ে মেঝের শতরঞ্চখানা ঠিক ক'রে পেতে রাখলো।... সারদা এলেন।)

সারদা—ভোলা, হরিদাদু চলে' যায়নি এখনো?

ভোলা—না দিদিমা, দাদামশাই খালি ঐ বুড়োর সংগে বকবে! বুড়োটা কেমন যেনো, পাজি-পাজি।

সারদা—থাম্। দাদুকে বলে আয় যেনো সারা হ'লে এঘরে আসে। (ভোলা চলে' গেলো। অঞ্জলি এলো।)

অলি—মা, তুমি এবার শুয়ে থাকো। রোগা শরীরে আর অতো ঘোরাঘুরি করো না।

সারদা—হ্যাঁ। বুকটাও কেমন যেনো ধড়ফড় করছে। (খাটে শুলেন। অঞ্জলি পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলো।) দেখ্ অলি, ঐ হরিবুড়োটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

অলি—কেন মা? তুমি দুচক্ষে দেখতে পারো না এমন লোকও যে আছে তা আমি জানতুম না।

সারদা—ঐ মিনসেই তো তোর পাত্তরের খবর এনেছিলো। তুই জানিস না অলি, লোকটা সুবিধের নয়। তোর বাবাকে খুশি করে আর মাঝে মাঝে টাকাকড়ি আদায় করে।

অলি—হোক না মা। কেউ যদি কিছু পায় তাতে রাগ করা ঠিক কি?

সারদা—তুই জানিস না অলি, শুনেছি ওর বউকে নাকি ও' বড্ড মারে। একবার মুখখানাকে এমনি ঠুকে দিয়েছিলো...

অলি—থাক মা, পরের কথায় কাজ নেই।

সারদা—তুই বললি কিনা, তাই বললাম। না হ'লে ... দেখ তো আমার কপালটা। আর বোধ হয় জ্বর নেই।

অলি—পরশু, রাতে আমার যা ভয় হয়েছিলো!

সারদা—জ্বরটা খুব বেড়েছিলো কিনা! খুব বুঝি ভয় পেয়েছিলি?

অলি—না, তা কি আর পেয়েছিলাম? মা, আমাকে ফেলে তোমার যাওয়া হবে না।

সারদা—না রে না। যাবো কোথায়? গেলেই বা কে? যদি যাবোই, তবে তোর দুঃখে বুক ফাটবে কার মা?

অলি—মা, একবারও আর ওসব বোলো না। আমি বেশ আছি।

সারদা—বেশ আছিস? আমি বুঝি বুঝি না?

অলি—হ্যাঁ বেশ আছি। কেমন বই পড়ছি ভালো ভালো। ঘরের কাজ করছি। কাজ করতে আমার এতো ভালো লাগে। যেনো নেশায় ধরে।

সারদা—জানি। ও নেশার মানে আমি জানি। হ্যাঁ রে, ভোলা ঘর মুছে গেলো, আবার তুই মুছলি কেন?

অলি—ওর মোছা মা পছন্দ হয় না।

সারদা—এ তোর অন্যায় কথা অলি। ভোলার কাজ খুব পরিষ্কার। মনটাই যা একটু ভুলো। তাছাড়া আমি দেখছি,

আজকাল তুই যে কাজ একবার করেছিস্, সে কাজ আবার ফিরে করিস্।

অলি—ভালো লাগে যে মা।

সারদা—থাম্ থাম্। আমার কাছে মিথ্যে বলতে হবে না, জানিস্, দশ মাস পেটের মধ্যে রেখেছিলুম তোকে? তারপর এই এতোগুলো বছর তোর শোওয়া বসা, ওঠা-চলা সব আমি চোখ বুজেও টের পাই। আমার কাছে ধরা দিবি না, না? ওরে অন্ধকারেও তোর চোখ খোলা আছে না বোজা আছে তাও আমি বুঝতে পারি। এক কাজ দুবার ক'রে কেন করে তা আমি জানি না, নয়?

অলি—মা, যা জানো, তা আর জানতে চেয়ো না।

সারদা—দেখ অলি,—

অলি—বলো।

সারদা—ওদের বাড়ির সুশীলার নাকি বিয়ে দিয়েছে ওর বাপ।

অলি—হ্যাঁ।

সারদা—তা বেশ করেছে। ঐ বাচ্চি বয়েস। অমন রূপ। অমন মেয়েকে বিধবা দেখতে মায়ের বুক ফেটে যায় না?

অলি—ওদের আত্মীয় কুটুম্বরা খুব নিন্দে করছে।

সারদা—করুক। তারা নিন্দেই করবে ওর দুঃখ তো আর বুঝবে না।

অলি—থাক, পরের কথায় আমাদের কী দরকার? আজ কাল তুমি বড্ড পর লোকের কথা বলো।

সারদা—তা তো বলবেই রে। অন্য লোকই যে এখন আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেয়ে হ'য়ে জন্মিছি রে। 'আপনার' কেউ নেই কোথাও। শুধু অন্য লোকেরাই আছে। তাদের মন জুগিয়েই আমাদের জীবন কাটবে।

অলি—না মা, এ তোমাকে মানায় না। যতোদিন আমাকে নিয়ে তোমার ভাবনা ছিলো না, ততোদিন কেমন নিশ্চিন্ত ছিলে তুমি। এখন বাবারও কথার উপর কথা বলো।

সারদা—তা বলবো না? ওর ওপর ছাড়া আর কার ওপর জোর খাটাবো বল্?
(মনোমোহন এলেন।)

মনোমোহন—কার উপর জোর খাটানো হচ্ছে?
(সারদা উঠে বসলেন। মনোমোহন কোচটায় বসলেন। অঞ্জলি বিছানার একধারে বসে' রইলো।)

মনোমোহন—উঠলে কেন আবার? বেশ তো শুয়েছিলে। আজ জ্বর নেই তো? দেখি। (কপালে হাত দিলেন।) সামান্য একটু আছে। যাক, তড়িৎ ডাক্তারের ওষুধ খেয়েই সারবে। ওর ওষুধটা যে আনিয়ে দিয়েছিলুম, খেয়েছিলে? যদি এতে না কমে তবে অনিলকে ডাকলেই হবে। অনিল নাকি এই অল্পদিনে বেশ পশার করেছে। নাম হ'য়েছে। চিকিৎসা ভালোই করে। হরিচরণও ঐ কথা বলছিলো।

সারদা—থাক, এইতেই সেরে যাবে।

অলি—মা, আমি দেখে আসি বাবার খাবার হ'লো কিনা। (চলে' গেলো।)

মনোমোহন—আচ্ছা, অনিল ডাক্তারের কথায় চলে গেলো?

সারদা—কেন, ওর কথায় যাবে কেন?

মনোমোহন—না, সে সব নয়। ওর সঙ্গেই বিয়ের কথা তুমি বলেছিলে কিনা। ওতো তা জানে!

সারদা—জানলেই বা' ও আমার সে মেয়ে নয়। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে অনিলকে ও' দেখে আসছে। একবার আমি বিয়ের কথা বলেছি বলেই কি ও' অনিলের জন্যে মরে যাচ্ছে? মেয়েরা তা নয়। মেয়েদের তোমরা যতোটা ছোটো ভাবো মেয়েরা তা নয়।

মনোমোহন—নাঃ, তোমার দেখছি মেজাজ ঠিক নেই। ভুগে ভুগে.....আমি তা বলিনি, তবে কিনা মেয়েদের উপর সময় সময় আমাদের নিষ্ঠুর হ'তে হয়। তা ব'লে ছোটো ওদের ভাবি না। ছোটো হ'লে কি আর ওরা তোমার মতো সতী-সাধ্বী হয়? আমার অলি-মা'র মতো ব্রহ্মচারিণী হয়? দিনরাত সেবা আর কাজ নিয়ে থাকে। মায়ের আমার কঠিন তপস্যা। খুব মেয়ে, খুব মেয়ে। ওর সাধনায় আমার বুক গর্বে ভ'রে ওঠে 'সারো'। আর কী জানো, এখন ওর বয়স হ'লো.... যাক আর চারটে পাঁচটা বছর। ব্যস, তারপর আমি ওর চুল কেটে দেওয়াবো। তখন থান পরবে, খালি হাত করবে, হবিষ্যিও করতে পারে। তারপর আর কোনো ভয় নেই। শাস্ত্রকাররা হিসেবী ছিলো সারদা, হিসেবী ছিলো।

সারদা—ছাই ছিলো।

মনোমোহন—ছিঃ, রোগের ঝোঁকেও অমন বলতে নেই।

সারদা—তাদের হিসেবের বাহাদুরীটা কী দেখলে?

মনোমোহন—কি জানো, বিধবার আহার, বিহার, শয়ন, গমন—সবই যদি একটি বিশেষ ধরণে চলে তবে তাদের মনটা আর ছটফট করতে পারে না। হাজার হোক তারাও মানুষ তো। মনতো তাদেরও আছে।

সারদা—থাক ওসব কথা। তোমার বাতটা কেমন আছে? কমেছে?

মনোমোহন—কমেছে।

সারদা—অলি মালিস ক'রে দেয় তো রোজ?

মনোমোহন—হ্যাঁ হ্যাঁ ওসব তোমায় ভাবতে হবে না।

সারদা—শুধু ভাবতেই তো পারি। করবার ক্ষমতা আর কই রইলো? ভুগে ভুগেই মলুম। দেখো কদিন থেকে সময় সময় বুকটা ধড়ফড় করে।

মনোমোহন—কই আমাকে বলোনি তো সে কথা?

সারদা—কী আর বলবো? নিজের কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।

মনোমোহন—জানি। চিরকালই তোমার এক-ভাবে কাটলো। স্থির, ধীর, শান্ত।

সারদা—তবে যে বলো আজকাল খিটখিটে হয়েছি?

মনোমোহন—সে তো ভুগে ভুগে। তাছাড়া ঐ অলিটার জন্যেই না তোমার এমন মন হয়েছে। কি করবে বলো, সমাজ-ব্যবস্থা তুমিও করোনি, আমিও করিনি। ওটা মানতেই হবে।

সারদা—না মানছি আর কোনটা? আমি কি অলির বিয়ে দিচ্ছি আবার?

মনোমোহন—ওদের সুশীলার যে আবার বিয়ে দিলো। বিয়ে তো দিলি কিন্তু ওদের ছেলেমেয়ের কী হবে ভবিষ্যতে? তা ছাড়া তুমি দেখো ঐ সুশীলাই বুড়ো বয়সে অনুতাপ করবে আর বাপ মাকে দুষবে।

সারদা—কই, বিধুভূষণের বুড়ো মা তো অলির একবার খোঁজও করে না।

মনোমোহন—থাক, ওদের খোঁজে আর কাজ নেই। অলি বেশ আছে।

সারদা—(প্রচ্ছন্ন বেদনায়) হ্যাঁ, বেশ আছে। অলি বলছিলো একাদশীর দিন ও' আর খাবে না কিছু।

মনোমোহন—কিছু না খায়? খায় তো একটু দুধ আর জল। ওতে দোষ হয় না। আমি ভালো পণ্ডিতের মত নিয়েছি। তা ছাড়া এতো তাড়াতাড়ি কেন? পাঁচ ছটা বছর কেটে যাক, তারপর একাদশীতে নিরম্বু উপবাসেও আমি বাধা দেবো না। যাই বলো 'সারো' অলির কঠোর সাধনার ইচ্ছে দেখে আমার বুক দশ হাত হয়। ওযে আমারই মেয়ে সে কথায় গর্ব বোধ হয়।

সারদা—(প্রচ্ছন্ন মনোভাবে) হ্যাঁ

মনোমোহন—লোকের উচিত ওকে দেখে শেখা। সুশীলা রামোঃ ওটা কি

আবার বিয়ে! মেয়ে মানুষের দুবার বিয়ে? ছিঃ।

সারদা—আর পুরুষে যে দুবার ছেড়ে পাঁচবার বিয়ে করে!

মনোমোহন—কি মুস্কিল! তারা হ'লো পুরুষ।

সারদা—(প্রচ্ছন্ন মনোভাবে) হ্যাঁ।

মনোমোহন—তবেই দেখো।

সারদা—ঐ দেখো, বুকটায় কি রকম বোধ হচ্ছে! পাখাটা দিয়ে একটু বাতাস করো দেখি। বড্ড গা হাত ঝিম্ ঝিম্ করছে।

মনোমোহন—অলি? (ডাকলেন)

সারদা—না, ওকে নয়। তুমি তো করছো। (মনোমোহন বাতাস করিতে লাগিলেন) দেখো দমটা যেনো আটকে আসছে। একবার ডাক্তারকে খবর......

মনোমোহন—'সরো'. অনিলকে ডেকে পাঠিয়েছি আজই। তোমাকে বলিনি আগে। ওকে সাড়ে আটটায় আসতে বলেছি। কটা বাজলো? ঐ তো সাড়ে আটটা। এলো ব'লে। ও ঠিক সময়ে আসবে বলেছে।......কেমন কমেছে? একটু বুকটায় হাত বুলিয়ে দেবো?

সারদা—দাও-না। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। হাওয়া করো। (অনিল এলো।)

মনোমোহন—এই যে। এসো বাবা। দেখো তো, হঠাৎ বুকটায় কী কষ্ট হচ্ছে? বলছে হাত-পা হিম্ হ'য়ে এলো। (অনিল নাড়ি দেখলো।)

সারদা—কে, অনিল?

অনিল—আপনি চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন। কিছুই বিশেষ হয়নি। দুর্বলতা মাত্র। (সারদা চোখ মুদে রইলেন।)

মনোমোহন—জ্বরটা বোধ হয় নেই?

অনিল—প্রায় নেই। পিঠে-পাঁজরার ব্যথা আছে কি?

মনোমোহন—না, সে সব নেই। সর্দিকাশিও নেই। ঐ যা জ্বর। আর এখন বলছিলো বুকটায়......

অনিল—বুঝেছি। (অঞ্জলি প্রবেশ করলো। অনিলকে দেখে সে একটু থমকে' দাঁড়ালো।)

মনোমোহন—আয় অলি, তোর মার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে।

সারদা—কে, অলি? দে-না হাত বুলিয়ে। কোথায় যে যাস থেকে থেকে? অনিল কি কি করতে হবে অলিকে বলে যাও। ও ঠিক মতো করবে। অলি, অনিলের সামনে লজ্জা করিসনি। ছেলেবেলা থেকে ওকে দেখে আসছিস্। (অঞ্জলি মায়ের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।)

অনিল—না, না। আমাকে আবার সঙ্কোচ কি! আমি কি অচেনা?......আচ্ছা, এই দেখে গেলুম। বিশেষ কিছু নয়। তবে বেশি খাটা খাটুনি চলবে না। বিশ্রাম নিতে হবে। এই ভারটা অঞ্জলির উপর রইলো। (অঞ্জলি ঘাড় নাড়লো সম্মতির)

অনিল—আমি আসি তা হ'লে। কাকেও পাঠিয়ে দেবেন ডাক্তারখানায়, ওষুধ আনবে। (প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখলো।)

মনোমোহন—তুমি কি আর কোথাও যাবে? না, সোজা ডাক্তারখানায়?

অনিল—সোজা ডাক্তারখানাতেই যাবো।

মনোমোহন—তবে আমার চাকর ভোলা তোমার সঙ্গে যাক। ভোলা? (ডাকলেন। ভোলা এলো।)

ভোলা—কী বলছেন?

মনোমোহন—ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গিয়ে ডাক্তারখানা থেকে ওষুধটা নিয়ে আয়।

ভোলা—আমি তো ডাক্তারখানা চিনি না।

মনোমোহন—ওঁর সঙ্গেই যাবি তো? আচ্ছা হাঁদা তো! (ভোলা কুণ্ঠিত।)

অনিল—আসি তা হ'লে। অঞ্জলি, তোমার উপর ঐ কাজটার বিশেষ ভার রইলো। ওঁকে আদৌ কাজকর্ম করতে, বিশেষ চলাফেরা করতেও দেবে না। (অঞ্জলি ঘাড় নাড়লো সম্মতির। অনিল কয়েক পা এগিয়ে গেলো। অঞ্জলি তাড়াতাড়ি অনিলের ফেলে-যাওয়া স্টেথিস্‌কোপটা এনে দিলো।)

অলি—এটা ভুলে যাচ্ছেন।

অনিল—ও। (অনিল চলে' গেলো। সঙ্গে ভোলা গেলো।)

অলি—বাবা, তোমার খাবার দেবো?

মনোমোহন—একটু পরে। তোর মা একটু সামলে নিক্।

সারদা—সামলাবার আবার কী হ'লো? আমি ভালো হ'য়ে গেছি। যা অলি, ওর খাবার দে। এই ঘরেই এনে দে।

মনোমোহন—হ্যাঁ, সেই ভালো। (অঞ্জলি চলে গেলো।)

সারদা—আজকাল ডাক্তারে নাড়ি তো দেখেই না। ও কেমন নাড়ি দেখলো।

মনোমোহন—নাঃ, সত্যিই অনিলের চিকিৎসা ভালো। ডাক্তারিটা শিখেছে। শুধুই বই মুখস্থ করেনি। কিছুদিন পরে নাকি বিলেতও যাবে শুনেছি। যাক, উন্নতি করতে পারবে।

সারদা—তা ছাড়া কথাবার্তাও পরিষ্কার। ডাক্তার মানুষ, দেখতে শুনতে ভালো। কথাবার্তায় ভালো না হ'লে রোগীর মন খুসী হয় না।

মনোমোহন—সেরেছে! ডাক্তার হ'তে গেলে আবার দেখতে ভালো হ'তে হবে? তবে তো আমি ডাক্তার হ'লে রোগী জুটতো না?

সারদা—আমি যেনো তাই বলছি?

মনোমোহন—তোমার মনের মতন ডাক্তার এনে দিয়েছি। এবার তোমার রোগ সেরে যাবে, কি বলো?

সারদা—যাবেই তো।

মনোমোহন—অনিলের ভালো তো সবই। রোজগারও করছে ভালো। বাপেরও বেশ কিছু আছে। দেখতে তো ভলোই। চক্রবর্তী হ'য়েই তো গোল বাঁধলো কি না। (এদিক ওদিক দেখলেন।) কিন্তু 'সরো' অলির সামনে ওর বার বার আসাটা কি ঠিক হবে? মানুষের মনতো? অলি না হয় শক্ত। অনিলকেও ধরতে হবে তো?

সারদা—থামো থামো। যতো সব বাজে কথা।

মনোমোহন—বাজে কথা। যাক, বাজে কথা হ'লেই বাঁচি। আর আমার ভাবনা নেই। বাজে কথা তো?

সারদা—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

মনোমোহন—আমি বলি, অলি যখন চাইছে, তখন সাড়ি চুড়ি ছেড়েই দিক। সরু পাড় ধুতি......

সারদা—কী ভাবছো বলো দেখি? এতো কিসের ভয়?

মনোমোহন—আহা ভয় নয়, ভয় নয়। কিন্তু তাই কি উচিত নয়? বিধবা হ'য়েছে, বিধবার সাজে থাকবে না? সন্ন্যাসী কি আদ্দির পাঞ্জাবী আর ফরাস ডাঙ্গার ধুতি পরে' বেড়ায়? তুমিই বলো? তাই বলছিলুম থানই ওর পরা উচিত।

সারদা—তাই পরবে গো পরবে। থান পরবে। চুড়ি খুলবে। হবিষ্যি করবে। মাথাও মুড়বে। আগে আমি মরি, তারপর। তার আগে নয়। আমার চোখে সে সইবে না। ওর বয়ন্দ্ সুলেখাও কুমারী, অলিও তেমনি কুমারী।

মনোমোহন—বটে? তবে একাদশীর দিনে দুধ ফল খাচ্ছে কেন? ভাতের ব্যবস্থা করলেই হয়।

সারদা—তাই করবো।

মনোমোহন—তাই ক'রো। মাছও খাইয়ো।

সারদা—হ্যাঁ, খাওয়াবো......লোকে যে যাই বলুক, আমি ওর আবার বিয়ে দেবো।

মনোমোহন—কী? বিয়ে? দ্বিচারিণী? শাস্ত্র উল্টে দেবে? বেশ তাই ক'রো। আগে আমি মরি। তখন মায়ে ঝিয়ে এক সঙ্গে বিয়ে ক'রো। (বেগে চলে গেলেন। দ্বারপথে অঞ্জলি খাবার নিয়ে আসছিলো। খাবারের থালা তার হাত থেকে প'ড়ে গেলো।)

ক্রমশ

মরা মনের উপর মাছির মত ডুবিয়া ঘরের কোণে একান্তে বসিয়া জিব দিয়া ঘা চুলকাইতেছিলাম। অনেক করিয়া দেখিলাম, এই-ই শান্তি। কণ্ডুয়নং খলু।

চুলকাইতেছি, এমন সময় আমার ন্যাংটা বয়সের বন্ধু সুবিমল আসিলেন। আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। দুর্দিনে কোন বন্ধু আসিবে বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। হঠাৎ সুবিমলকে দেখিয়া কাঁদিতে গিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বুকের অন্তস্থলে একটা দুর্নিরীক্ষ্য বেদনা কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। মুখে কথা জোয়াইল না। শুধু বাছুরের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বন্ধুবরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

সংগ্রামী জীবনের অনেক সাফল্যের সংবাদ মুখে করিয়া আসিয়াছিলেন সুবিমল। স্পষ্টতঃই বুঝিলাম, অনেক কথা বলিবার আছে বন্ধুর। সুতরাং আমি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। লক্ষ্য করিলাম, ঐকান্তিক একাগ্রতায় ইতিপূর্বে যেসব কথা কেঁচোর মত বন্ধুবরের প্রসন্ন মুখাননে বলি বলি করিয়া মুখ বাহির করিয়াছিল, এতক্ষণে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া গুটাইয়া যাইতেছে। নিকটের বন্ধু আবার সুদূরে চলিয়া যাইতেছেন আমার চোখের উপর।

মনের দুঃখে আমি মাথা হেঁট করিয়া বসিলাম।

একটু পরেই আশাভঙ্গজনিত ব্যর্থতা এবং ব্যর্থতা হইতে বিরক্তির ভাব সুবিমলের মুখের উপর কালো পোঁচড়া টানিয়া দিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বন্ধুবর বলিলেন, করিতেছ কি হে, যাঃ। তামাম শহরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে আজ শারদীয়া আনন্দের, আর তুমি এইরকম একলাটি মনমরা হইয়া বসিয়া আছ? আইস, হাত ধরাধরি করিয়া মেঘমুক্ত আকাশের তলে খানিকক্ষণ বেড়াইয়া আসি। অন্তর্বেদনা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

মুখ তুলিলাম না। মনের গহনে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া যেমন চুলকাইতেছিলাম তেমনই চুলকাইয়া চলিলাম।

বন্ধুবর ছাড়িবার পাত্র নহেন। একদৃষ্টে আমার দৈন্যদশার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া জিবে দাঁতে চুক্ চুক্ শব্দ করিয়া মাথার উপর করুণার শান্তি জল ছিটাইলেন।

বুঝিলাম, দুঃখ পাইয়াছেন। আড়চোখে তাকাইয়া দেখিলাম, এতক্ষণে সুবিমলের চোখ দুইটি ছোট হইয়া ছলছল করিতেছে। আর ঠোঁট দুইখানি দুইটি কথার সান্ত্বনার আবেগে আছাড়-খাওয়া কইমাছের ন্যাজের মত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

অন্য সময় হইলে সমব্যথীর ব্যথায় হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতাম। এমনকি কয়টা দিন আগে হইলেও দুর্বল হাতখানি কথা না বলিয়া বন্ধুবরের হাতে তুলিয়া দিতাম। কিন্তু আজ আর সে উৎসাহও পাইলাম না। সুতরাং ঠিকানাবিহীন মনে ঘা চুলকাইয়া চলিলাম।

মুখের কাছে একটা উড়ন্ত ডাঁশমাছি অনেকক্ষণ যাবৎ আমার নাকের ভিতর ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল। থাবা মারিয়া সেটিকে ধরিয়া দাঁতে চিবাইয়া ঢোক গিলিলাম।

বন্ধুবর ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া একেবারে ছ্যা ছ্যা করিয়া উঠিলেন। আমার এই ঘৃণ্য জৈব প্রবৃত্তির মূলে কথার কুঠার মারিয়া বলিলেন, জানোয়ারের মত চুলকাইতেছ চুলকাও। কিন্তু তাই বলিয়া মাছি ধরিয়া খাইলে!! ঘৃণা পিত্ত বলিয়া তোমার কি কিছুই নাই। ছি ছি ছি—বাক্যালাপ করাও তো দেখি দুষ্কর হইয়া উঠিল তোমার সঙ্গে।

ভাবিলাম, হালআমলের খবরের কাগজ-গুলোর মত 'জানেন কি!' ঢং'এর কতকগুলি প্রশ্ন করি। কিন্তু ইচ্ছাশক্তিরও তো সেরকম আর ঐকান্তিকতা নাই;—মনের কথা একলহমা থাকিয়াই বুদ্বুদের মত ফাটিয়া মিলাইয়া যায়। সুতরাং প্রশ্নও আর করিলাম না। প্রাণমনের বালাই-এর উপর আবার হুমড়ি খাইয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িলাম।

আমার দীনহীন জীবনযাত্রার আসরে ন্যাকড়াকাণির সঙ্গোপন হইতে একটা পূতিগন্ধ বাহির হইয়া আবহাওয়াটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অপর কেহ হইলে বহুক্ষণ পূর্বেই বিদায় হইয়া যাইত। কিন্তু সুবিমল আমাকে তথাপি ত্যাগ করিয়া গেলেন না। বরং নাকে-মুখে রুমাল চাপিয়া আরও খানিকটা আগাইয়া আসিলেন।

আমি কোনরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলাম না। চুলকাইতে চুলকাইতে চুলের ভিতর হঠাৎ কয়টা উৎকুনের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি আঁচ করিয়া সতর্ক হইয়া উঠিলাম।

আন্তরিকতার সামান্যতম আভাস না পাইয়া বন্ধুবর অতঃপর আমার শিক্ষাদীক্ষার গোড়া ধরিয়া টান মারিলেন। বলিলেন, তোমার যে এতটা অধঃপতন হইয়াছে তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। সমাজ সংসারের উপর সাধারণ মানুষ হিসাবে আজ কি তোমার কোন কর্তব্যই নাই। স্বাধীনতার সোপানে জাতির এই প্রথম পদক্ষেপের সহিত তাল রাখিয়া চলাও কি তুমি যুক্তিযুক্ত মনে করো না। লজ্জাহীনের মত শুধু একান্তে বসিয়া চুলকাইয়া সময় নষ্ট করিতেছ! কি চাও আর কি নাই যে আজিকার এই পুণ্যদিনে তুমি অমন 'হা হুতোস্মি' হইয়া বসিয়া আছ! আইস, ভীরুতা দীনতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া কাপড় পরিয়া আইস। শুদ্ধচিত্তে মা আনন্দময়ীর নিকট হইতে বরাভয় যাচিয়া লই। কোন দুঃখ থাকিবে না।

কানে শুনিয়া গেলাম আর হাতে কার্য করিলাম। তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধানের পর এতক্ষণে মাত্র একটি উকুন দুই নখের মাঝখানে ফেলিয়া টিপিয়া মারিলাম। তৎপর নাকের কাছে তুলিয়া গন্ধ শুঁকিয়া ফেলিয়া দিলাম।

ক্ষোভে দুঃখে বন্ধুবরের নাসারন্ধ্র ঘন ঘন স্ফুরিত হইতে লাগিল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, এতক্ষণ যাবৎ গলা ফাটাইয়া যে চীৎকার করিলাম তাহার কি কিছুই শুনিলে না। না লজ্জায় থাকিয়ে এক কানে শুনিয়া অন্য কান দিয়া বাহির করিয়া দিলে। উত্তর দাও।

হাঁ, না—কোন জবাব দিলাম না। অভ্যাসমত একটু হাসিয়া বন্ধুবরের মুখের উপর প্রসন্ন লোচন মুখখানি তুলিয়া ধরিলাম।

পুরাতন স্মৃতি হয়তো মোচড় দিয়া উঠিল বন্ধুর বুকে। চোখে চোখ পড়িতেই হাসিয়া বলিলেন, কি চল। আর কতক্ষণ আমাকে এভাবে ভোগাইবে।

আমার চরিত্রের হেবফের অসম্ভব। হয়রাণ হইয়া বন্ধুবর অগত্যা দেখি পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিলেন। বলিলেন, খাইবে নাকি একটি!

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সুবিমল আমার কোলের উপর একটি সিগারেট ছুঁড়িয়া দিলেন। দিয়াশলাই'এর কাঠি জ্বালাইয়া বলিলেন, কই ধরাও।

দুইজনেই সিগারেট ধরাইয়া বসিলাম। বন্ধু খাইতে লাগিলেন সিগারেট; আর আমি ছাই।

ধূম্রপানে হৃষ্ট হইয়া বন্ধুবর আমার বহু-পরিচিত মুখখানার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া নূতন কিছু একটা আবিষ্কারের তালে ছিলেন। হঠাৎ টনক নড়িয়া উঠিল। ধমক মারিয়া বলিলেন, করিতেছ কি! সিগারেট না খাইয়া ছাই খাইতেছ! ছি, অমন কাজ করিও না। আজিকার শুভদিনে ছাই খাইলে সারা বছর ধরিয়াই ভস্ম খাইতে হইবে। ফেলিয়া দাও।

বন্ধুবরের কথা অমৃতসমান মনে করিয়া সিগারেট ফেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বসিলাম। পড়ন্ত রোদের এক টুকরা আলো জানালার ফাঁক দিয়া গলিয়া অনেকক্ষণ হইতে আমার গায়ে পায়ে নাচানাচি করিতেছিল। অগত্যা আমি উহাই ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এতক্ষণে বোধ করি অসহ্য হইয়া উঠিলাম। উত্যক্ত হইয়া বলিলেন, ওঠ ওঠ, বাজে কাজে সময় নষ্ট না করিয়া চল বড় রাস্তা ধরিয়া খানিকক্ষণ ঘুরিয়া আসি। জোর সাদা চামড়া মিলিটারী পাহারা আছে; ভয়ের কারণ নাই।

আন্তরিকতার অবলেপে মনের অন্ধকার অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আবার ঘন-ঘোর করিয়া আসিল। শিহরিয়া ভাবিলাম, ভক্ষক রক্ষক হইয়া অভয় দিতেছে, এ আবার কী বরাভয়।

দুই পাশের দুই রগ হঠাৎ আগুন হইয়া লাফাইতেছিল। ডান হাতে খানিকটা থুথু লইয়া আচ্ছা করিয়া কপালে ডলিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিলাম।

এতক্ষণে ধৈর্যের সীমা চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন হইল। দ্রুত পাদবিক্ষেপে বন্ধুবর কয়েক পা পিছু হটিয়া আমাকে ধিক্কার দিয়া চলিয়া গেলেন, গোল্লায় যাও তুমি, আমি চলিলাম।

আর আমি,—দৃকপাতহীন অঙ্গুলিচালনার ফলে আমার যে ঘা-টা এতক্ষণ বিষাইয়া টন্ টন্ করিতেছিল, অগত্যা আমি উহার চারিপাশে সুড়সুড়ি দিতে লাগিলাম।

ধ্যাননেত্রে দেখিলাম, গৌরীশৃঙ্গের উপর হইতে ভাঙা বাংলার দিকে একটিবার কটাক্ষ হানিয়া মা আমার কার্তিক গণেশের হাত ধরিয়া মানস সরোবরের উপর দিয়া রাতুল চরণ ফেলিতে ফেলিতে কৈলাস পর্বতের দিকে ফিরিয়া যাইতেছেন।

বামন

আলডুস হাক্সলি

উত্তরকালে যিনি ক্রাপিথের চতুর্থ ব্যারন হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কোন একদিনে তাঁর জন্ম হয়। জন্মকালে তাঁর দেহাকৃতি ছিল খর্ব, ওজন ছিল হাল্কা। নামকরণের সময় এলে, মাতামহ স্যর হারকিউলিস ওকামের স্মৃতির প্রতি সম্মানে শিশুর নাম রাখা হলো হারকিউলিস। শিশুর মাতা ছেলের দেহবৃদ্ধির তালিকা মাসের পর মাস ধরে ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করে চলেছেন। শিশু দশ মাসে হাঁটিতে শিখলো, দু'বছর উত্তীর্ণ হবার আগেই মুখে কথা ফুটলো। তিন বছর বয়সে তার ওজন হলো মাত্র চব্বিশ পাউণ্ড। শিশুর বয়স যখন ছ'বছর তখন সে বেশ লিখতে পড়তে শিখেছে, সংগীতেও মেধার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তখনও তার দেহাকৃতি দু'বছরের শিশুর চেয়েও খাটো। ইতিমধ্যে তার মা আরো দুটী সন্তান প্রসব করেছেন, কিন্তু তার একটি শৈশবেই ঘুংড়ি কাশিতে মারা গেল, পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হবার পূর্বে অপরটিও বসন্ত রোগে বিদায় নিল। হারকিউলিসই একমাত্র সন্তান যে বেঁচে রইল।

দ্বাদশতম জন্মদিনে হারকিউলিস মাত্র তিন ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা হয়েছে। দেহের তুলনায় তার মাথা ছিল অনেক বড়, কিন্তু মাথা ছাড়া অন্যান্য অঙ্গগুলির সঙ্গে তার দেহের বেশ সঙ্গতি ছিল। দেহের তুলনায় শক্তি ছিল অনেক বেশী। ছেলের দেহবৃদ্ধির জন্য পিতা বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক দিয়ে তার চিকিৎসা করিয়েছেন, কিন্তু সবই নিষ্ফল। এক ডাক্তার প্রচুর মাংস পথ্যের ব্যবস্থা করলেন আর একজন ব্যায়াম করবার উপদেশ দিলেন, তৃতীয়জন ব্যবস্থা করলেন একটা ছোট র‍্যাক তৈরী করে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় হারকিউলিসকে তার ওপর শুইয়ে টানা দেবার জন্য। এইভাবে আরো তিন বছর অতিবাহিত হবার পর হারকিউলিস আর মাত্র দুই ইঞ্চি লম্বায় বাড়লো। এইখানেই তার দেহ বৃদ্ধিতে ছেদ পড়লো। আজীবন সে তিন ফুট চার ইঞ্চি লম্বা বামনই রয়ে গেলো।

পিতার আশা ছিল ছেলেকে তিনি ভবিষ্যতে একটা মস্তবড় কিছু করে তুলবেন। তিনি ভাবতেন, ছেলে তার হবে মার্লবোরোর মত ভুবনবিখ্যাত একজন যোদ্ধা; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত আশাই বিফল হয়ে গেলো। আশাভঙ্গের ফলে তিনি ছেলের উপর অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়লেন। এর পর থেকে ছেলেও তাঁর সামনে আসতে ভয় পেতো। তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু আশা-ভঙ্গের দরুণ একদিকে যেমন তিনি মন-মরা হয়ে পড়লেন, তেমনি মেজাজ তার উঠলো খিট্খিটে হয়ে। লোকের সঙ্গে তিনি আর মিশতেন না। নিজের একান্তে তিনি সুরার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে তার আয়ু দ্রুত নিঃশেষ হয়ে এলো। হারকিউলিস সাবালক হবার এক বছর পূর্বেই তাঁর সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু ঘটলো। পিতার ঔদাসীন্যে সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ আরো বেড়ে গিয়েছিলো; কিন্তু মা-ও আর বেশীদিন টিকলেন না। পিতার মৃত্যুর এক বছর পর তিনিও টাইফয়েডে বিদায় নিলেন।

একুশ বছর বয়সে হারকিউলিস পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা এবং প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে পড়লেন। তাঁর বাল্যকালের দেহশ্রী ও বুদ্ধিমত্তা যৌবনেও অটুট কিন্তু খর্বাকৃতিই তাঁকে সমাজে করে রাখলো একঘরের মত। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তিনি বেশ বুৎপত্তি লাভ করেছেন। আধুনিক ইংরেজি, ফরাসী ও ইতালিয় সাহিত্যেও তাঁর দখল নেহাৎ কম ছিল না। গানে ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। বেহালা বাজাতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। চেয়ারে বসে দুই পায়ের মধ্যে বেহালা রেখে তিনি বেহালা বাজাতেন। বাদ্য বাজিয়ে গান গাইবার ইচ্ছেও তাঁর কম ছিল না। কিন্তু তাঁর ছোট হাত দুখানা সেখানে বাধা জন্মাতো। তাঁর নিজের উপযোগী ছোট একটা হাতীর দাঁতের বাঁশী ছিল। মনের আকাশে যখন আসতো বিষাদের কালো মেঘ, তখন নিরালায় বসে তিনি তাঁর বাঁশীতে ফুটিয়ে তুলতেন এক মেঠো সুর। ছেলেবেলা থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। একদিকে পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও কখনও তিনি তাঁর কবিতা প্রকাশ করেন নি। তিনি বলতেন যে, আমার কবিতার ছন্দে আমার প্রতিবিম্বই ফুটে উঠবে। কবি নয় বামন বলেই আমার কবিতা পাঠক সমাজে কৌতূহল সৃষ্টি করবে।

সম্পত্তির মালিক হয়ে স্যার হারকিউলিস বাড়ির আসবাবপত্র সম্পূর্ণ নতুন করে গড়েছেন। পূর্ণাবয়ব নারী বা পুরুষের সান্নিধ্য তাঁকে বিরক্ত করে তোলে। হারকিউলিস বুঝলেন, এ জগতে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন মূল্য নেই। এই কোলাহলমুখর জগৎ থেকে সরে গিয়ে তিনি নিজের একান্তে সৃষ্টি করবেন

এক নতুন জগৎ যেখানে তাঁর সঙ্গে থাকবে সব কিছুরেই সঙ্গতি। এই সংকল্প নিয়ে তিনি সমস্ত পুরোন ভৃত্যদের বিদায় করে দিলেন, আর তাদের স্থলে সম্ভবমত রাখতে লাগলেন বামন ভৃত্য। এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যে হারকিউলিস এমন এক পরিবার গড়ে তুললেন, যেখানে চার ফুটের বেশী কেউ লম্বা নেই, বরং দু'ফুট চার ইঞ্চির লম্বা মানুষও আছে। তাঁর বাবার আমলের গ্রে-হাউণ্ড, সেটার্স প্রভৃতি শিকারী কুকুরগুলো তিনি বিদায় করে দিলেন। কারণ এই অতিকায় কুকুরগুলো তাঁর বাড়ির সঙ্গে বেমানান। তার বদলে তিনি কিনলেন পাগ এবং ছোট আকৃতির অন্যান্য কুকুর। তাঁর বাবার আমলের ঘোড়াগুলোও তিনি বিক্রি করলেন। নিজের জন্য তিনি কিনলেন কালো এবং বিচিত্র রঙের দুটো টাট্টু ঘোড়া।

নিজের খুসিমত সংসার সাজিয়ে নেবার পর তাঁর বাকী রইল একটি কাজ। সেটা হচ্ছে এক সঙ্গিনী মনোনয়ন করা, যাকে নিয়ে তিনি এই স্বর্গরাজ্যের সুখভোগ করতে পারেন।

যৌবনের প্রারম্ভে স্যার হারকিউলিস এক তন্বীর প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর খর্বাকৃতি সেখানেও হয়ে দাঁড়াল প্রতিবন্ধক। গল্পটা শিগ্‌গিরই ছড়িয়ে পড়লো। এই সময়ে হারকিউলিসের লেখা কবিতা থেকে দেখা যায় যে, এই প্রত্যাখ্যান তাঁর মনকে একেবারে ভেঙে দিয়েছিলো। যা হোক কালে হারকিউলিসের গ্লানি মুছে গেল বটে, কিন্তু এর পর থেকে তিনি আর কাউকে প্রেম নিবেদন করেন নি। সম্পত্তির মালিক হবার পর তিনি খুসিমত একটা জগৎ গড়ে তুললেন। হারকিউলিস বুঝলেন যে, প্রণয়াসক্ত স্ত্রী পেতে হলে ভৃত্যদের মত তাঁকেও খুঁজে নিতে হবে বামন সমাজ থেকে। বামন হোক, কিন্তু সুন্দরী ও সদ্বংশজাত না হলে তিনি বিয়ে করবেন না। কিন্তু এ রকম স্ত্রী পাওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। লর্ড মেম্বোরোর বামন মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ এলো, কিন্তু মেয়ের পিঠ কুঁজো বলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাম্পসায়ার থেকে সদ্বংশজাত এক গরীব মেয়ের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু তার মুখশ্রী বিশ্রী ও শুকনো বলে তা'ও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারপর হঠাৎ একদিন স্যার হারকিউলিস কাউণ্ট টিটিমেলো নামক জনৈক ভেনিসিয়ান ভদ্রলোকের তিন ফুট লম্বা এক সুন্দরী কন্যার খবর পেলেন। স্যার হারকিউলিস ভেনিস অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে পেঁছোবার অব্যবহিত পরেই শহরের দরিদ্র অঞ্চলের একখানা কুঁড়েঘরে কাউণ্টের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। কাউণ্টের অবস্থা তখন এত খারাপ হয়ে পড়েছে যে, সে এক ভ্রাম্যমাণ সার্কাস পার্টীর কাছে তার বামন কন্যা ফিলোমিনাকে বিক্রয় করবার জন্য কথাবার্তা চালাচ্ছেন। ঠিক এমনি সময়ে স্যার হারকিউলিস দেখা দিলেন ফিলোমিনার সামনে তার উদ্ধারকর্তারূপে। হারকিউলিস তার রূপে মুগ্ধ হলেন। সাক্ষাতের তিনদিন পর তিনি বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ফিলোমিনা স্যার হারকিউলিসের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলো। কাউণ্টও একজন ধনী ইংরেজ জামাই পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, কারণ এ থেকে তার কিছু রোজগারের সম্ভাবনা আছে। একজন ইংরেজ দূতের উপস্থিতিতে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হলো। স্যার হারকিউলিস ও তাঁর স্ত্রী ইংলণ্ডে ফিরে সুখে ঘরকন্না আরম্ভ করলেন।

ক্রোম সহর আর ছোট্ট এই সংসার ফিলোমিনার মন জয় করলো। জীবনে এই প্রথম সে তার সমতুল্য সমাজে স্বাধীন নারী হিসাবে পদার্পণ করলো। স্বামীর মত তাঁরও ছিল গানে অনুরাগ, তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে সে সকলকে মোহিত করে দিত। বাদ্যযন্ত্রের কাছে বসে তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে বাজাতে ভালবাসতেন।

তারা দুজনে মিলে ইংরেজী ও ইতালীয় ভাষায় গান রচনা করে সেই গান গাইতেন। সবসময়েই তারা এই নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অবসর সময়ে তারা মন দিতেন স্বাস্থ্যচর্চায়। কখনো হ্রদে দাঁড় বেয়ে, কখনও বা ঘোড়ায় চড়ে তারা ব্যায়াম করতেন। ঘোড়ায় চড়তে তারা দুজনেই ভালবাসতেন। ফিলোমিনা এতে আনন্দ পেত সবচাইতে বেশী। ফিলোমিনা যখন পাকা সওয়ার হয়ে উঠলো, তখন সে আর তার স্বামী দু'জনে মিলে কালো এবং বাদামী রঙের পাগ নামক একদল কুকুর নিয়ে জঙ্গলে মৃগয়ায় যেতো। এই কুকুরগুলো খরগোস এবং অন্যান্য প্রাণীদের তাড়া করে বেড়াত। চারজন বামন সহিস টকটকে লাল রঙের পরিচ্ছদ পরে মুর-দেশীয় সাদা রঙের টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে কুকুরের দলকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। আর তাদের মনিব আর মনিব-পত্নী সেটল্যাণ্ডের কাল্সা রঙের অথবা নিউ ফরেস্টের বিচিত্র বর্ণের টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়ায় যেতেন। কুকুর ঘোড়া আর সহিস নিয়ে হারকিউলিসের মৃগয়ার এই দৃশ্য উইলিয়াম স্টাবস বিচিত্র ভাষায় বর্ণনা করেছেন। স্যার হারকিউলিস স্টাবসের রচনা পড়তে ভালবাসতেন। স্টাবস যদিও পূর্ণাবয়ব মানুষ তবু স্যার হারকিউলিস তাঁকে নিমন্ত্রণ করে বাড়ি নিয়ে যেতেন আর তার মৃগয়ার দৃশ্য বর্ণনা করতেন। স্টাবস স্যার হারকিউলিস ও তার স্ত্রীর একখানা ছবিও এঁকেছেন। হারকিউলিস লাল ও সবুজ রংএ মেশান একটা মখমলের জামা ও সাদা ব্রিচেস পরেছেন, আর ফিলোমিনা একটা ফিনফিনে মসলিনের পোষাক পরে বড় টুপি মাথায় দিয়ে গাছের ছায়ায় তাদের ধূসর রঙের গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।

এমনিভাবে কেটে গেলো চার বছর পরিপূর্ণ শান্তিতে। ফিলোমিনা সন্তান সম্ভবা। স্যার হারকিউলিস আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যেদিন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, সেদিন হারকিউলিস আনন্দাতিশয্যে একটা কবিতা লিখে ফেললেন। ছেলের নাম রাখা হলো ফার্ডিনাণ্ডো।

কিন্তু কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর স্যার হারকিউলিস ও তার স্ত্রীর মনে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দিলো। ছেলে অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। এক বছরের সময় তার ওজন হলো হারকিউলিসের তিন বছর বয়সের ওজনের সমান। ফার্ডিনাণ্ডোর গড়ন বেশ বর্ধিষ্ণু। আঠারো মাস বয়সে ছেলে তাদের বত্রিশ বছর বয়স্ক খর্বাকৃতি সহিসের সমান লম্বা হলো।

তৃতীয় জন্মতিথিতে ফার্ডিনাণ্ডো পিতার চেয়ে দুই ইঞ্চি খাটো কিন্তু মাকে ছাড়িয়ে লম্বা হয়ে গেছে। হারকিউলিস তাঁর ডাইরিতে লিখলেন, "সত্য আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। ফার্ডিনাণ্ডো আমাদের মত বেঁটে হবে না তাই আজ তার তৃতীয় জন্মতিথিতে তার স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্যে আনন্দ অনুভবের পরিবর্তে আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে চোখের জল ফেললুম এই ভেবে যে, আমাদের সুখের নীড় ভাঙতে বসেছে। ভগবান যেন এ দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের দেন।"

আট বছর বয়সে ফার্ডিনাণ্ডো এত দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠলো যে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতামাতা তাকে স্কুলে পাঠাতে মনস্থ করলেন। বছরের শেষার্ধে তাকে ইটনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। গ্রীষ্মের ছুটিতে ফার্ডিনাণ্ডো যখন বাড়ি ফিরলো তখন সে আরো দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। একদিন ঘুসি মেরে সে তাদের খানসামার হাত ভেঙে দিলো। তার পিতা চুপি চুপি ডাইরিতে লিখলেন, 'ফার্ডিনাণ্ডো রূক্ষ, অবিবেচক ও অনমনীয়, শাস্তি ছাড়া তার স্বভাব শোধরাবে না।'

তিন বছর পর ফার্ডিনাণ্ডো গ্রীষ্মের ছুটিতে বড় একটা ম্যাস্তিফ কুকুর নিয়ে ক্রোমে ফিরলো। জানোয়ারটা একেবারে বুনো কোনোমতেই তাকে বিশ্বাস করা যায় না। একদিন হারকিউলিসের একটি পোষা পাগের ঘাড়ে কামড়ে সে তাকে প্রায় মৃতপ্রায় করে ফেললো। তারপর থেকে কুকুরটার বাড়ীতে প্রবেশ একরকম বন্ধ হয়ে গেলো। এই ঘটনার পর থেকে হারকিউলিস কুকুরটাকে আস্তাবলে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবার হুকুম দিয়েছেন। ফার্ডিনাণ্ডো রেগে গিয়ে বললো যে কুকুর তার, সে যেখানে খুসী তাকে রাখবে। কুকুরটাকে অবিলম্বে বের করে দেবার জন্য হারকিউলিস হুকুম দিলেন। এদিকে ফার্ডিনাণ্ডোও সোজা জানিয়ে দিলো যে তাতে সে রাজী নয়। এরি মধ্যে অকস্মাৎ একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল। ফার্ডিনাণ্ডোর মা ঘরে প্রবেশ করছে এমনি সময়ে কুকুরটা ছুটে গিয়ে তার গায়ে লাফিয়ে

পড়ে হাতে ও ঘাড়ে কামড়ে দিলো। হারকিউলিস রাগে আগুন হয়ে তেড়ে গিয়ে তার তরবারি মূলে কুকুরটার দেহে বসিয়ে দিলেন। ছেলেকে তিনি অবিলম্বে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। কারণ মাকে সে প্রায় খুন করেছিলো। স্যার হারকিউলিস দাঁড়িয়ে আছেন, তার এক পা মৃত কুকুরটার ওপরে, হাতে রক্তাক্ত অসি, কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গম্ভীর। ফার্ডিনাণ্ডো ভয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেবারকার ছুটির বাকী কটা দিন সে বেশ নম্রভাবে কাটিয়ে গেলো।

ফিলোমিনা মাস্তিফের দংশন থেকে তাড়াতাড়িই সেরে উঠলো, কিন্তু এই ঘটনা তার মনের ওপর একটা স্থায়ী আতংকের ছাপ রেখে গেলো।

এরপর ফার্ডিনাণ্ডো দু'বছর ইউরোপে ঘুরে বেড়াল। সংসারে আবার ফিরে এসেছে শান্তি। কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তা মাঝে মাঝে তাদের বিচলিত করে তোলে। অথচ যৌবনের সেদিনও আর নেই যে মনকে আনন্দের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে দূরে সরে রাখে। ফিলোমিনা তার কণ্ঠস্বর হারিয়েছে। স্যার হারকিউলিসেরও বেহালা বাজাতে যেন অবসাদ এসেছে। স্যার হারকিউলিস এখনও তার কুকুরগুলো নিয়ে খেলে বেড়ায় কিন্তু মাস্তিফের সেই ভয়াবহ আক্রমণের পর থেকেই তার স্ত্রী একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে। এ খেলা দেখতে তার এখন ভয় হয়। নেহাৎ স্বামীকে খুশী করবার জন্য সে ছোট্ট একটা গাড়ীতে শেটল্যাণ্ড ঘোড়া জুড়ে শিকারে বেরুত।

ফার্ডিনাণ্ডোর ফেরবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। ফিলোমিনা একটা অলিক ভয়ে ও শংকায় শয্যাশায়িনী হলো। স্যার হারকিউলিস একাই ছেলেকে অভ্যর্থনা জানান। বাদামী রঙের টুরিস্টের পোষাক পরিহিত একটা দৈত্য যেন ঘরে এসে ঢুকলো। স্যার হারকিউলিস কম্পিত স্বরে ছেলেকে আপ্যায়ন করে ঘরে নিয়ে এলেন।

এবার ফার্ডিনাণ্ডো একা আসেনি। তার সাথী দু'জন বন্ধুও তার সঙ্গে এসেছে। প্রায় চার বছর কোন পূর্ণাবয়ব মানুষের সান্নিধ্য থেকে পৃথক ছিল। স্যার হারকিউলিস আতংকিত ও বিরক্ত হইলেন। কিন্তু অতিথি সৎকারের দায়িত্ব মেনে না চলার উপায় নেই। তিনি যুবকদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আগতদের যত্ন করবার জন্য চাকরদের হুকুম দিয়ে তিনি তাদের রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিলেন। পৈতৃক আমলের পুরাণো খাবার টেবিলটা ভাল করে ঝেড়ে পুছে ঝকঝকে করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে বৃদ্ধ সাইমন একাই টেবিলটার নাগাল পায়। ফার্ডিনাণ্ডো ও তার বন্ধুদের সঙ্গে আগত খানসামা তিনজন ভোজের সময় সাইমনকে সাহায্য করছে। স্যার হারকিউলিস ভোজ উৎসবে গৃহকর্তার আসনে বসে তার বিদেশ ভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু যুবকের দল তার গল্পে মনোনিবেশ না করে খাবার আর মদের দিকেই বেশী মন দিয়েছে। ওদের ভেতর থেকে হাসি চাপার চেষ্টায় কাসির আওয়াজও থেকে থেকে উঠছে। স্যার হারকিউলিসের কিন্তু এদিকে মন নেই। এবার তিনি আলোচনার ধারা পরিবর্তন করে খেলাধুলোর প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন।

ভোজন শেষ হবার পর হারকিউলিস চেয়ার থেকে নেমে এলেন। অতিথিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি স্ত্রীর ঘরে গেলেন। ভোজঘরের কলরোল তার কানে এসে বাজছে। ফিলোমিনা তখনও ঘুমোয়নি, বিছানায় শুয়ে সে হাসির রোল শুনছে। বারান্দায় ও সিঁড়িতে সে ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। স্যার হারকিউলিস একটা চেয়ার এনে স্ত্রীর কাছে কিচুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। রাত প্রায় দশটার সময় একটা ভীষণ গোলযোগ সুরু হয়ে গেলো। গ্লাস ভাঙ্গার শব্দ, হাসি চিৎকার আর লাথির শব্দ কয়েক মুহূর্ত ধরে সমানে শোনা যাচ্ছে। স্যার হারকিউলিস উঠে দাঁড়ালেন, স্ত্রীর বারণ সত্ত্বেও তিনি এগিয়ে গেলেন।

সিঁড়িটা অন্ধকার, কোথাও আলো নেই। স্যার হারকিউলিস পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন। গোলমালটা এইখানেই সবচেয়ে বেশী, ভোজকক্ষের কথাবার্তা এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। স্যার হারকিউলিস আস্তে আস্তে হলঘর পেরিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। দরজার সামনে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গার একটা ভীষণ শব্দ হলো। দরজার চাবির ছিদ্র দিয়ে তিনি প্রায় সবই দেখতে পাচ্ছিলেন। মদ খেয়ে বৃদ্ধ খানসামা সাইমন টেবিলটার ওপর নৃত্য সুরু করেছে। তার পায়ের ধাক্কায় ভাঙ্গা গ্লাসগুলি থেকে টুং টাং আওয়াজ হচ্ছে। মদ পড়ে তার জুতো একেবারে ভিজে গেছে। যুবক তিনটি টেবিলটি ঘিরে বসে হাত আর মদের খালি বোতল দিয়ে টেবিলটাকে বাজাচ্ছে, আর হাসির হররা ছুটিয়ে সাইমনকে বাহবা দিচ্ছে। চাকর তিনজন দেওয়ালের ওপর ঝুঁকে পড়ে সব দেখছে আর হাসছে। ফার্ডিনাণ্ডো হঠাৎ এক মুঠো আখরোট সাইমনের মাথায় ছুঁড়ে মারল, তাল সামলাতে না পেরে সাইমন মদের পাত্র ও গ্লাসের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেলো।

ফার্ডিনাণ্ডো বললো, কাল বাড়ীর সব লোক মিলে নাচ-গানের আসর বসানো হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার একজন বন্ধু বলে উঠলো, "তোমার বাপ হারকিউলিসকে সিংহের চামড়া পরিয়ে, হাতে লাঠি দিয়ে নামানো হবে।" আর একটা হাসির রোল উঠলো।

আর কিছু দেখবার বা শোনবার মত শক্তি স্যার হারকিউলিসের ছিল না। হলঘর পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তিনি আবার আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগলেন। প্রতিটি ধাপ উঠতে তার হাঁটু যেন যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ছিল। তিনি ভাবছিলেন, এইখানেই শেষ। এ জগতে তার আর স্থান হবে না, এরপর ফার্ডিনাণ্ডো ও তার এক সঙ্গে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

ফিলোমিনা তখনও জেগে আছে। স্ত্রীর চোখে জিজ্ঞাসার ভাব দেখে স্যার হারকিউলিস বললেন, "বুড়ো সাইমনকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা তামাসা করছে। কাল আসবে আমাদের পালা।" দু'জনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। শেষ পর্যন্ত ফিলোমিনা নীরবতা ভাঙলো, বললো, "আমি কাল সকালের মুখ আর দেখতে চাই না।"

হারকিউলিস শান্তস্বরে বললেন, "তাই ভালো।" তারপর নিজের ঘরে গিয়ে তিনি সন্ধ্যায় সমস্ত ঘটনা ডাইরিতে লিখে রাখলেন। লিখতে লিখতেই স্যার হারকিউলিস চাকরকে হুকুম দিলেন গরম জল চরাতে। রাত এগারটার সময় তিনি স্নান করবেন। লেখা শেষ করে তিনি তার স্ত্রীর ঘরে গিয়ে গরম জলে আফিং গুলে তাকে দিলেন। ঘুম না হলে ফিলোমিনা সচরাচর যে পরিমাণ আফিং খেত তার প্রায় বিশ গুণ বেশী দিয়ে তৈরী করা হলো মাত্রা। "এই নাও তোমার ঘুমের ওষুধ।" বলে হারকিউলিস গ্লাসটা তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন।

ফিলোমিনা গ্লাসটা পাশে রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার দুচোখ বেয়ে এল অশ্রুধারা। "আগেকার দিনে আমরা দুজনে নরফোলায় বসে যে গানটা গাইতাম সেটা তোমার মনে আছে?" ভাঙা গলায় গুণ গুণ করে সে গানটার দু'একটা কলি গাইতে লাগল, "আমি গাইতাম আর তুমি বাজাতে বেহালা। এইত যেন সেদিনের কথা, কিন্তু মনে হয় কত যুগ আগে।" তারপর আফিংটা গলায় ঢেলে দিয়ে সে বালিসের ওপর শুয়ে চোখ বুজলো। হারকিউলিস স্ত্রীর হাতে চুমু খেয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তাকে জাগাতে যেন তার ভয় হচ্ছে। নিজের ঘরে গিয়ে তিনি ডাইরিতে স্ত্রীর শেষ কথাগুলো টুকে রাখলেন। তাঁর হুকুম মত যে গরম জল এনে রাখা হয়েছিল, তা তিনি স্নানের টবটার মধ্যে ঢাললেন। জল এত গরম যে তখনও টবের মধ্যে নামা যায় না। বইয়ের শেলফ থেকে তিনি নামিয়ে নিয়ে এলেন "সুইটোনিয়াস"— ইচ্ছে হলো সেনেকার মৃত্যু কাহিনী পড়বার। উদ্দেশ্যবিহীন তিনি বইয়ের পাতা উলটে চললেন। হঠাৎ একটা লাইনের ওপর তাঁর চোখ পড়লো,—'কিন্তু বামনদের তিনি প্রকৃতির ব্যতিক্রম ও কুলক্ষণ মনে করে ঘৃণা করতেন।'

হারকিউলিসের পিঠে কে যেন চাবুক মারলো। তার মনে পড়লো, এই অগস্টাইনই একদিন মল্লভূমিতে এনে হাজির করেছিল ম্যাসিয়াস নামে এক সদ্বংশজাত তরুণকে যার দেহের দৈর্ঘ ছিল দু'ফুটেরও কম, অথচ গলা ছিল দরাজ। পাতা উলটে চললেন হারকিউলিস: টাইবেরিয়াস, ক্যালিগুলো, ক্লডিয়াস, নীরো সে এক বীভৎস ইতিবৃত্ত। "তাঁর উপদেষ্টা সেনেকা আত্মহত্যা করলো।" তার মনে পড়লো সেই পেট্রোনিয়াসের কথা, ছিন্নশিরা বয়ে তার আয়ু যখন নিঃশেষ হয়ে চলেছে, তখনও সে তার বান্ধবদের ডেকে বলছে তার সঙ্গে কথা বলতে, দর্শনশাস্ত্রের সান্ত্বনা বাণী নয়, প্রেম ও শৌর্যের কাহিনী। আর একবার দোয়াতে কলম ডুবিয়ে নিয়ে স্যার হারকিউলিস ডাইরির পাতায় লিখলেন, "সে রোমানের মত মৃত্যু বরণ করলো।" তারপর জলের উষ্ণতা একবার পরীক্ষা করে নিয়ে তিনি নিজের ড্রেসিং গাউনটা খুলে ফেলে একখানা তীক্ষ্ণধার ক্ষুর নিয়ে বসলেন সেই টবের মধ্যে। ক্ষুরটা অনেকখানি বসিয়ে দিয়ে তিনি নিজের বাঁ-হাতের রক্তবাহী ধমনী চিরে ফেললেন। তারপর বেশ নিশ্চিন্ত মনে হেলান দিয়ে বসে যেন ধ্যানমগ্ন হলেন। ধমনীর ছিন্নমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল, চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে সেই রক্ত মিশতে লাগল জলের সঙ্গে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত টবের জল রক্তাভ হয়ে উঠলো। তারপর ক্রমে রংয়ে এলো আরো গাঢ়তা। স্যার হারকিউলিসের চোখ যেন তন্দ্রায় ভেঙে এলো, আচ্ছা স্বপ্নলোকে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারপর তিনি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর সেই ক্ষুদ্র দেহে বেশী রক্ত ছিল না।

অনুবাদক : সমরেন্দ্রনাথ সেনশর্মা।

উ স'র বিচার শুরু

বর্মার প্রধান মন্ত্রী আউংগ সান এবং তাঁর ছয়জন সহকর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করার অপরাধে ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী উ স'র বিচার শুরু হয়েছে। বিচারের স্থান নির্বাচিত হয়েছে ইনসিন কারাগার, যা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম কারাগাররূপে খ্যাতিলাভ করেছে।

উ স মিয়োচিট দলভুক্ত। তাঁকে সহজে গ্রেপ্তার করা যায় নি। পুলিশকে তাঁর দেহরক্ষীদের সঙ্গে বন্দুক নিয়ে লড়াই করতে হয়েছিল। উ স'র সঙ্গে আরও নয়জন আসামী আছে: থেট তিন, মউংগ সোয়ে, ইয়ান গি আউংগ, মউংগ ইন, থু খা, কিন মউংগ ইন মাউংগ নি, মাউংগ গি এবং বা নাই উন। একজন রাজসাক্ষী হয়েছে, তাকে ক্ষমা করতে হবে এই সর্তে।

আরম্ভের দিন উ স বর্মী ভাষায় বিচারক-মণ্ডলীকে সম্বোধন করে কিছুদিনের সময় ভিক্ষা করেন, কারণ বিলাত থেকে তখনও তাঁর উকিল এসে পৌঁছয় নি। উ স আরও বলেন, ফলাফল যাই হোক না কেন, বিচার যেন দীর্ঘ না হয়।

বিচার-গৃহে মাত্র কয়েকজন দর্শককে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল, তাও যাওয়া ও আসার সময় প্রত্যেকের দেহ খানাতল্লাসী করা হয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে উ স'র ষোড়শী কন্যা মেরী ও তাঁর দিদিমা ও দাদামহাশয়ও ছিলেন।

চারজন আসামী অভিযোগ করে যে, জেলে তাদের প্রহার করা হয়েছিল।

বর্মার শাসনকর্তা স্যার হিউবার্ট র‍্যান্স ও প্রধান মন্ত্রী আউংগ সান।

মিয়োচিট দলের নেতা উ স। আউংগ সানের হত্যাপরাধে বিচারাধীন। এঁরও একবার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল।

এ এফ পি এফ এল

বর্মার প্রধান রাজনৈতিক দলটির নাম অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট পিপলস ফ্রিডম লীগ অর্থাৎ ফ্যাসিস্টবিরোধী জনগণের মুক্তিকামী দল। এই দল গঠিত হয়েছিল জাপানীরা যখন বর্মা দখল করেছিল সেই সময় তখন এর নাম ছিল অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট অর্গানাইজেশন এবং বার্মা পেট্রিয়টিক ফ্রন্ট। পরে এই দল জেলখানায় আরও একটি দল মিলে বর্তমান এ এফ পি এফ এল-এর জন্ম হয়। সেই দশটি দলের নাম: কমিউনিস্ট পার্টি, পিপলস রিভল্যুশনারি পার্টি, ন্যাশনালিস্ট (মিওচিট) পার্টি বর্মা ফ্যাবিয়ান পার্টি, থাকিন পার্টি, বর্মা ন্যাশনাল আর্মি, ইউথ লীগ অফ বর্মা, মহা বামা পার্টি এসোসিয়েশন অফ দি বার্মীজ বুদ্ধিস্ট মংক এবং উইমেনস ফ্রিডম লীগ। এ এফ পি এফ এলের নামে বর্মা ন্যাশনাল আর্মি ছিল দলের সশস্ত্র বিভাগ। প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টি পিপলস রিভল্যুশনারি পার্টি এবং থাকিন পার্টিকে ইংরেজ সরকার বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং সেগুলিকে দমন করেন। কমিউনিস্ট নেতা থান টনকে জেলে আবদ্ধ করা হয়। আউংগ সান

থাকিন নু, বর্মার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী।

জাতীয় বেশে আউংগ সান্, এ-এফ-পি-এফ-এল দলের ভূতপূর্ব নেতা।

থাকিন থান টুন, কমিউনিস্ট দলের নেতা।

১৯৪০ সালে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে জাপানে পলায়ন করেন। এই দলটি আশা করেছিল যে, জাপানীদের সাহায্যে তারা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে, কিন্তু পরে এই মতের পরিবর্তন করতে হয়। জাপানী আমলে ব ম'র মন্ত্রিসভায় আউংগ সান ও থান টুন মন্ত্রী ছিলেন। জাপানীদের পরাজয়ের ও বর্মা ত্যাগের পর এ এফ পি এফ এলই একমাত্র শক্তিশালী দলরূপে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে আবার কমিউনিস্ট পার্টি এই দল থেকে বেরিয়ে আসে। আরও পরে মিয়োচিট্ পার্টির নেতা উ স মহা বামা পার্টির নেতা বা ম' এবং দো-বামা দলের নেতা থাকিন বা সিন এই দল থেকে বেরিয়ে আসেন। দলে এই রকম ছোট-খাটো ভাঙ্গন ধরা এবং রাজনৈতিক হত্যার ফলেও দলে কিন্তু এখনও আর কোন ভাঙ্গন ধরেনি এবং দলটি দিন দিন যেন আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

থাকিন নু হলেন বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী এবং দলের নেতা। তিনি আউংগ সানের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। পূর্বে তাঁর নাম সুপরিচিত ছিল না। বর্মা গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হবার পর তিনি বিখ্যাত হন। ইংরেজ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় আলোচনা চালাবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন।

অদ্ভুৎ স্মৃতিশক্তি

সলোমন সিরেসেসকি নামে রাশিয়াতে একটি লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে তার নাকি মনে রাখার ক্ষমতা অদ্ভুত। কি গুণাবলীর জন্য তার এই অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি জন্মেছে, সে বিষয়ে মনোবিদ্‌গণ পরীক্ষা করতে যেয়ে পরাজয় স্বীকার করেছেন। সিরেসেসকিকে প্রায়ই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে পরীক্ষা দিতে ও পরীক্ষিত হবার জন্য আসতে হয়। সিরে-সেসকির বিশেষত্ব হল এই যে, দশ-ব ' বৎসর আগে সে যা শুনেছে, তা সে নির্ভুলভাবে বলতে পারে। যে ভাষা সে জানে না তা শুনলেও সে মুখস্ত করে ফেলতে পারে। যত বড় রাশি হোক না, একবার শুনলেই প্রত্যেকটি সংখ্যা সে পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

জীবন বেদ

দেবদাস পাঠক

'কোথায় হয়তো সূর্য ওঠে
কোন এক জীবনের কাঞ্চনজঙ্ঘায়,—
বরফের চাপ গলে, নামে ঢল গিরিগাত্র বেয়ে;
তারপর সমতলে নানাবিধ ফসল ফলায়।

কোনও জীবনে হয়তো আছে এই দীপ্ত সূর্যোদয়,
সে জীবন সে প্রভাত আমাদের নয়।

এখানে বিষণ্ণ, ম্লান, রিক্ত আয়ু এক একটি 'দিন'
জীবনের বৃন্ত হতে আশাহত বিবর্ণ ব্যথায়
অনেক আলোর স্বপ্ন চোখে নিয়ে—বুকে নিয়ে তবু
সূর্যহীন গাঢ়তম অন্ধকারে ঝরে পড়ে যায়।

জীবনের সব কথা, তবু আশা, জেনে নিয়ে গ্লানির স্বরূপ
খুঁজে পাবে কোন এক গানের মহিমা অপরূপ।

অকুন্তলা*

চন্দ্রচূড়

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর বসন্তসেনা, বিদ্যাসুন্দর, প্রাচীন আসামী হইতে প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে সুকবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। কিন্তু কবিতার পাঠক সংখ্যা মুষ্টিমেয় হওয়ায় (সেই মুষ্টিমেয় পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যেও অনেকেই আবার বাঙলা কবিতায় সমুদ্রপারের আমদানী নিত্য-নূতন মতবাদের ভৌতিক উপদ্রবে বিভ্রান্ত) প্রমথবাবুর কবি-খ্যাতির তুলনায় বিচিত্রবুদ্ধি গদ্যলেখক বলিয়া খ্যাতি অনেক বেশী। অথচ প্রমথনাথ বিশীর অভিন্নদেহী বন্ধু প্র-না-বি'র রচনার কথা না হয় বাদ দিলাম, মর্মজ্ঞ রসিক পাঠকের অগোচর নাই যে, ইঁহার 'পদ্মা' ও 'কোপবতী' উপন্যাস অথবা 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' শীর্ষক স্মৃতিকথা গদ্যে লেখা কবিতা বলিলেই হয়; কাহিনী হিসাবে যথোচিত চিত্তাকর্ষী বটে, চরিত্রসৃজন অনবদ্য, সাবলীল ভাষার অপ্রমত্ত স্বচ্ছন্দ গতি কিন্তু এ সমস্তই গৌণ কথা, এ সমস্তই উপলক্ষ মাত্র আনন্দোৎসুক ও আত্মনিষ্ঠ কবিপ্রাণের রসোপলব্ধিকে রসাত্মক বাক্যে নানা অন্যের গোচর করাই যেন প্রমথনাথের আসল উদ্দেশ্য ও সহজ প্রবৃত্তি।

অকুন্তলা কাব্যে কয়েকটি প্রণয় কাহিনী, কয়েকটি নরনারীর ব্যাখ্যান পুরাকথা এবং সর্বশেষে বিরাট পুরুষ নেপোলিয়ান সম্বন্ধে দীর্ঘ একটি কবিতা আছে। গ্রন্থের প্রথমাংশে সন্নিবিষ্ট 'অকুন্তলা' 'লাল শাড়ি' 'কালকাটা রোডে' এবং 'বিদ্যাপতির রাধা' বিশেষভাবেই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ ও মনকে মুগ্ধ করে। প্রথম তিনটি কবিতার স্থান-কাল পাত্র পাত্রী ঘটনা আধুনিক, ব্যঞ্জনা ও রস চিরকালীন। স্থান-কাল-পাত্র একালের বলিয়াই যেন স্থায়ী মধুর রসের আনুষঙ্গিক সঞ্চারী ভাব হিসাবে হাস্য বা কৌতুকের সঞ্চার মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই; এমন কি কাহিনী তিনটির 'সমাপ্তি'ও কৌতুকরসে, মিলনে নয়। এই যে কৌতুক শেষ পর্যন্ত ইহা মানবজীবন লইয়া ভাগ্য-দেবতারই কৌতুক। কিন্তু কৌতুক যাহারই হউক এই কৌতুকের দ্বারা মানসোৎসুক মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমকে লুপ্তদেশকাল মেঘলোকের অন্তরে, ক্ষণে ক্ষণে সেই বাষ্পজাল ছিন্ন করিয়া, রূঢ় ও প্রত্যক্ষ জগতের বাস্তবতার কথা স্মরণ করানো হইয়াছে—

উঠিলাম ঘেমে,
মনে হ'ল হয়তো বা পড়িয়াছি প্রেমে।

প্রণয়াভিমানে বিবাগী হইয়া যাইবার কালেও—

বিছানা নিলাম সাথে, নিলাম মশারী
(বিরহে মশার জ্বালা, অত বাড়াবাড়ি
সবে না আমার)।

এইভাবে মাধুর্যের সহিত কৌতুকের সমাবেশে শুধু যে বৈচিত্র্য আসিয়াছে তাহা নয়, ছায়া-সম্পাতে আলোর মতন উজ্জ্বল-রসেরও ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। স্থানে স্থানে নির্ভেজ বাস্তবের বিবরণও ক্ষিপ্রগতি পয়ারে জমিয়াছে ভালো। যেমন ট্রেনযাত্রার কথা—

কর্কশ হুইসাল শব্দভেদী বাণে
বর্ণমুক আকাশের মর্মে গিয়ে হানে
মুহূর্তে ... ...
হঠাৎ ধরণী যেন হয়েছে তরল।
মত্তানুগামী স্রোত তার ছোটে অবিরল
প্রলয় নিশ্বাস লভি ... ...
সর্পিল দিগন্তরেখা চলে পাটি পাটি,
হুস্ ক'রে ছুটে যায় টেলিগ্রাফ-খুঁটি,
এঞ্জিন উদগত বাষ্প রচে ধূমকেতু,
ঝম্ ঝম্ ঝঙ্কারেতে সাড়া দেয় সেতু।
... ... মন্দীভূত গতি
লৌহ মুদগরের তাল দীর্ঘতর অতি;
বাহিরে ঝুঁকিয়া দেখি এল কতদূর?
স্টেসনে পশিল গাড়ি—সীতারামপুর।

অন্যদিকে নায়ক যেখানে বলিতেছেন—

ফাল্গুনের তপ্তবায়ে বিমূঢ় মত্ততা
ছায়াদেহী কস্তুরিকা মৃগপালসম
ঊর্ধ্বে ছুটিতেছিল; সেই সঙ্গে মম
মুগ্ধচিত্ত ছুটে গিয়ে করিল প্রবেশ
লীলার কুন্তলারণ্যে। হারাইনু দেশ,
হারাইনু কাল সেই অদি তমিস্রায়।
যুগপৎ মধু মদ শিশিরের নেশা
দুঃখের দ্রাক্ষার দ্রব সুরাসার মেশা
অজস্র সর্পের বেগে স্নায়ুতন্ত্রীপথ
পশিল শরীরে মোর। নিঃশব্দ জগতে
ভ্রমিলাম পথভ্রান্ত পুরূরবাপ্রায়—

সত্যই বিশেষ দেশকালের বিশেষ চিহ্নগুলি কত সহজেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এরূপ পথভ্রান্তি এরূপ মোহ ইন্দু বা পুরূরবা বা শাজাহান বা যদুধন মল্লিক (স্বীকার করিতে হয়, নামটা শ্রুতিমধুর নয়) অর্থাৎ একালের বা সেকালের বা কোনকালের নয়, এমন কোন প্রেমিকের জীবনেই অবাস্তব বা অনুচিত হয় না। অর্থাৎ এখানে মানব-হৃদয়ের শাশ্বত সুখ-দুঃখ-বেদনার কথাই আছে, কবিতার অন্তর্গূঢ় রসাত্মাই ছন্দিত ও স্পন্দিত ভাষায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। উদ্ধৃত অংশের পরেই কিন্তু আছে—

মাথা করি হেঁট
খুলিয়া ফেলিয়া লীলা টিফিন-বাস্কেট
সন্দেশ সাজালো প্লেটে দুই চারিখান

এবং—

ব্যস্ততায় মাথা হতে নামিল গুণ্ঠন।
কিন্তু এ কি! চুল এ যে ছোট ক'রে ছাঁটা!
আগ্রীবকুঞ্চিত কেশ ঢেকেছে গ্রীবাটা।
'এ কি লীলা, চুল কোথা? কী রকম বেশ
কহিল সে, 'ইস্কুলের হেডমিসট্রেস
আমি, ছোট করে ছাঁটা সেখানে রেওয়াজ।
স্টেসনে থামিল গাড়ি। 'আসি তবে আজ'
কহিল সে নতমুখে। নামাইনু তার
বাক্স-শয্যা আদি গাড়ি ছাড়িল আবার।

এইখানেই এ কাহিনীতে ছেদ পড়িয়াছে শেষ হইয়াছে বলিতে পারি না, বাস্তব জীবনে খুব অল্প কাহিনীরই শেষটা জানা যায়। ছেদ পড়িয়াছে। বাস্তবের বিদ্রূপ-ঝলসানো হাসির কৃপাণে কি? তা হইলেও ক্ষতি তো দেখি না। বাস্তব তাহার রূঢ় বাস্তবতা লইয়া যত সত্য, আন্তরিক সুখ-দুঃখ মোহ হোক না ক্ষণস্থায়ী, বাটখারায় বা গজকাঠিতে নাই বা তাহাদের পরিমাপ করা গেল। তাহার চেয়ে কম সত্য তো নয়, বরং অন্তর বলে তাহাই আসল সত্য বা 'আরো সত্য'।

আমরা 'অকুন্তলা' কবিতাটি হইতে অনেকটা উদ্ধৃত করিলাম। ভাষা ছন্দ উপমা অনুপ্রাসাদির উৎকর্ষ, ভাবপ্রকাশের অভিনবত্ব ও চারুতা, রসের ব্যঞ্জনা এগুলির দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আরও বহু ছত্রই তো সংকলন করা যায়—

সোনার তবকে মোড়া এই দিনখানি
পৃঃ ২২

...........কুজ্ঝটিকা কপোত-ধূসর
পৃঃ ২৩

পূর্ণিমা রজনীতে—

... ... কেলয়ডোর
শ্লথ নীবিবন্ধসম রভসবিভোর
সুপ্ত নাগরীর
পৃঃ ৩৩

অকুন্তলা (কাব্যগ্রন্থ) : লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রকাশক জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড : ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

নিদ্রার খিলানে দেখি আছে সে দাঁড়ায়ে
দীপঙ্করী

পৃঃ ৩৪

........................রাগারুণ গালে
চুম্বনের চন্দ্রকলা মিলায় অকালে
ঝড়ের ইঙ্গিতে

পৃঃ ৪১

প্রেম যৌন—

বুকে বেঁধে কাঁদা আর উথলিত স্নেহ
বাহুপাশ মন্ত্র করি। কামলোক মাঝে
নিগূঢ় মৃণাল তার; রূপলোকে রাজে
অনবদ্য অরবিন্দ মেলি দিয়া দল;
অরূপ লোকের বায়ু তার পরিমল
রেখেছে নন্দিয়া নিত্য

পৃঃ ৪১—৪২

......................প্রতি রাত্রে আসে বাহিরিয়া
নক্ষত্রের পিপীলিকা সারি চন্দ্রমার
লোভে লোভে; প্রতিদিন কাতারে কাতারে
রামের কটকচলে মেঘ-মেখলায়
অফুরন্ত; নভোনীলে পুঞ্জিত জলদ
রচে নব সেতুবন্ধ; গবী গরুড়ের
পক্ষদাহী ইরম্মদ অসংখ্য শাখায়
আকাশে বিতান মেলে

পৃঃ ৪৫

হৃৎপিণ্ড ডমরু হবে শঙ্করের হাতে,
শোনো না কি পদধ্বনি আশা-আশঙ্কাতে।
শুভ্র ছায়াপথ যার জটায় ধুতুরা
আসে অনাগত সেই

পৃঃ ৫৩

তাণ্ডব-নিরত মত্ত ধূর্জটির ছিন্ন মালা হতে
স্খলিত রুদ্রাক্ষসম যুগগুলি পড়িছে খসিয়া;
পাপালী-অঞ্চল-সম অন্তহীন আকাশের পথে
অখণ্ড কালের স্রোত নিত্যকাল চলিছে বহিয়া;
জ্যোতিষ্কের নীহারিকা স্বর্ণসূত্র গুটি বিদারিয়া
তারকা-চন্দ্রকময় মেলি দিয়া পক্ষ দুই খান
দিব্য-প্রজাপতি-সম সারা বিশ্ব চলেছে উড়িয়া।

পৃঃ ৯২

মর্মজ্ঞ ও রসিক পাঠকের ঔৎসুক্য উদ্রেকের জন্যে যথেষ্ট উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের ভ্রূকুঞ্চনের বিষয় চিন্তা করিয়াও এইখানেই ক্ষান্ত হওয়া ভালো।

পূর্বে বলা হইয়াছে এই কাব্যগ্রন্থে নবভাবে ব্যাখ্যাত কয়েকটি পৌরাণিক কথা আছে। বিদ্যাপতির রাধা কবিতাটি সীমান্তবর্তী। কারণ বিদ্যাপতি ঐতিহাসিক চরিত্র। অথচ রাধা কল্পনা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ও কাব্যের অন্তর্গত। কবি তাঁহার অভিনব রসদৃষ্টিতে দেখাইয়াছেন বিদ্যাপতির রাধা পৌরাণিক রাধা নহেন—কবি বিদ্যাপতির জীবনের অভিজ্ঞতায় তিল তিল করিয়া গঠিতা মানসী তিলোত্তমা।

কামনার নটী সে যে প্রেমের রমণী,
ভাবনার অপ্সরী সে, কবিতার ধনী,
বৃকভানুপুত্রী রাধা।
সে নহে কৃষ্ণের।

"বৃকভানুপুত্রী" ছাপা হইলে দোষ ছিল না। কল্পনার অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব আছে; বর্ণাঢ্য বর্ণনায় চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া কবি তাঁহার উপলব্ধিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। অন্য কবিতাগুলির মধ্যে 'ত্রিশঙ্কু'তে কবি জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি ঝোঝুল্যমান হতভাগ্য 'হ্যামলেট'এর কথা বলিয়াছেন। 'ঘটোৎকচ' কবিতায় ঘরের ঢেঁকি হঠাৎ কী ভাবে অতিকায় কুম্ভীর হয় এবং যুগে যুগে 'কুরুক্ষেত্র চাপি পড়ে বিরাট আকার' তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। 'যুধিষ্ঠির ও কুক্কুর' কবিতায়, মহাপ্রস্থানের পথে ভীমার্জুন নকুল সহদেব দ্রৌপদী সকলে যখন ত্যাগ করলেন 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ' কুক্কুরের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কী আলাপ হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিলাম। 'কুরুক্ষেত্রের পরে' কবিতায় জানিলাম কুরুক্ষেত্র শেষ হয় নাই; একটার পর আর একটা নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া মানুষের হাতে গড়া সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি মানুষের হাত দিয়াই নষ্ট করিবার হেতু হইতেছে। 'ত্রিশঙ্কু' 'ঘটোৎকচ', 'যুধিষ্ঠির ও কুক্কুর', 'কুরুক্ষেত্রের পরে'—এই কবিতা কয়টি মননের দ্বারা ঢালাই-পেটাই করিয়া গঠিত এবং সময়ে সময়ে বিদ্রূপের দ্বারা শানিত; এগুলির রচনায় প্র না বি'র যথেষ্ট হাত আছে।

সমালোচনা করিতে বসিয়া কিছু দোষ না দেখাইলে কর্তব্যের অঙ্গহানি হইল মনে হইতে পারে। ৩৮ পৃষ্ঠায় আছে—

স্বপ্নে-মনে-পড়া
প্রিয়মুখচ্ছবিসম তরুতলে ঝরা
বকুলের আধো গন্ধ।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়কে এইভাবে দর্শনীয় বস্তু (হোক্ তা স্বপ্নদর্শন) করিয়া তুলিলে উপলব্ধির বিশেষ কোনো আনুকূল্য হয় না। হয়তো কবির বলিবার কথা এই যে, গন্ধটি স্বপ্নে-মনে-পড়া'র মতো 'কিমিব কিমিব' বোধের শিহরণ তুলিয়াছে; কিন্তু ভাষণের কৌশলে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে কি? ৫৩ পৃষ্ঠায় আছে—

নাচে নিঃস্থাণু শঙ্কর।
সাথে সাথে নাচে শঙ্করী।
ভয়ংকরী
দুজনেই প্রলয়ংকরী।

এক্ষেত্রে ব্যাকরণবিধি লঙ্ঘন করা হয় নাই কি! ছন্দ মিল এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া 'প্রলয়ংকর প্রলয়ংকরী' বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত ছিল অথবা উক্ত বিশেষণ ত্যাগ করিলেও ক্ষতি ছিল না। 'ঘটোৎকচ' কবিতার এই উপসংহার ছন্দে ও শব্দঝংকারে চমৎকার; কেবল কয়েক স্থানে যতির অনুরোধে অস্থানে পদচ্ছেদ করিতে হয় বলিয়া রসাস্বাদে ব্যাঘাত ঘটে। 'নিজ অঙ্গ অ।লংকরি' বা ' রবে না আর দি।গম্বরী' 'দৈলীপী' বিচারে সমর্থনযোগ্য হইলেও শ্রুতির প্রসন্ন সম্মতি লাভ করে না—এবং হিন্দুদের নিকট (অহিন্দুদের নিকট নয় যে তাহা নয়) শ্রুতিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

প্রমথনাথের এই নূতন কাব্যখানি প্রকাশের জন্য প্রকাশককে কৃতজ্ঞতা জানাই। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্যে কবিতা অনেক লেখা হইতেছে; কবি ও কবির স্বজনবন্ধু ও কবির নিকট উপকার প্রত্যাশী জন ছাড়া অন্য লোকেও সে কবিতা পড়ে কি না, যাহারা পড়ে তাহাদের সংখ্যা কত, বলিতে পারি না। তবুও কবিতা লেখা হইতেছে, ছাপা হইতেছে। বাঙলার কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রমথনাথের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই; উহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, উহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন—যতটা তাঁর প্রয়োজন, যতটা স্বাভাবিক। আমার তো মনে হয়, বাঙলার পুরাতন কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার অনেকটা মিল আছে; তেমনি উপমার প্রাচুর্য ও চমৎকারিত্ব, তেমনি শব্দের ঝংকার, তেমনি বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, তেমনি রসোদ্বেল মনস্বিতা। এই মননের প্রবৃত্তি যেখানে প্রাধান্য পাইয়াছে, শ্লেষ ও বিদ্রূপ আসিয়া মিলিয়াছে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিতও তাঁহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখি। এই কবিরা সকলেই দেহবাদী। দেহবাদী হইলেই অন্য সব বাদ দিতে হয় যে তাহা নয়, দেহকে মন্থন করিয়া দেহাতীতের উপলব্ধি লাভ করা যায়। এ হইল বাঙালীর সহজ প্রবৃত্তি, তান্ত্রিকের ধর্ম—ভোগঃ যোগায়তে। এ দিক দিয়া মোহিতলাল মজুমদারের সহিতও প্রমথ-নাথের তুলনা করা যাইতে পারে। তফাৎ এই যে, মোহিতলালের কবিতায় মননপ্রবৃত্তি রস-প্রেরণার উপর কর্তৃত্ব খাটাইতে যত্ন করে (কৃতকার্য হয় যে তাহা বলিতেছি না)। এবং প্রায়শঃই তাঁহার 'সহজ' সাধনা, 'ভোগঃ যোগায়তে'র উপলব্ধি বহু সংশয়ে তর্কে জিজ্ঞাসায় বিরাগে বিষাদে জটিল ও দ্বিধাগ্রস্ত।*

আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। অতএব, এইখানেই থাক। গ্রন্থখানির ছাপা বাঁধাই সাজ-সজ্জা সমস্তই অতিশয় সুন্দর। অকুন্তলায় প্রচ্ছদপটে সকুন্তলার ত্রিবর্ণ চিত্রখানি আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের অঙ্কিত। বাঙলা গ্রন্থের এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

---

* আমরা উভয় কবির রচনার আনুপূর্বিক তুলনায় সমালোচনা করিতেছি না। তদুপযুক্ত স্থান পাই উপস্থিত প্রয়োজনেরও অভাব। দেহ-বাদটাই ভিন্ন ক্ষেত্রে কিরূপ ভিন্ন হয় তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কবিতা হিসাবে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ অথবা কোনটা কত ভালো সে সম্বন্ধে পূর্বনির্দিষ্ট কোনো বিধি নাই।

পদার্থ বিজ্ঞানে ক্রমবিবর্তনের ধারা

শ্রীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

> 'যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি
> জগতের পিছু পিছু
> কোনোদিন কোনো গোপন খবর
> নূতন মেলে না কিছু।
> শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে
> সন্দেহ হয় মনে
> লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন
> বন হ'তে উপবনে।
> মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে
> রয়েছে কী ভাব ভরা
> হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর
> কিছুই পড়ে না ধরা।'

ইহাকে শুধু কবিমনের গোপন ব্যথার অভিব্যক্তি মনে করিলে ভুল করা হইবে। প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীর অভিমতও ইহা অপেক্ষা বিশেষ ভিন্ন নয়। ভিন্ন শুধু এই জায়গায় যে, বিজ্ঞানী তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পটভূমিতে সর্বরহস্যের সমাধানের পন্থা বাহির করে—। আপাততঃ মনে হয়, প্রকৃতির দুর্বোধ রহস্যের ইহাই বুঝি শেষ মীমাংসা—চূড়ান্ত কথা। কিন্তু মহাকালের সঙ্গী নব নব জ্ঞানের আবির্ভাবের ফলে পুরাতন রহস্য সমাধানের পন্থাটিকে অর্বাচীনের ভ্রান্ত বিলাস বলিয়া মনে হয়, তখন হয় তাহা পরিত্যক্ত। আবার নবলব্ধ জ্ঞানের সৌধকে ভিত্তি করিয়া নূতন-ভাবে রহস্য-জাল ছিন্ন করিবার প্রয়াস ঘটে—আবার কালের সঙ্গে সঙ্গে আসে নব নব তত্ত্ব; তখন ইহা আবার অযথার্থ বলিয়া ধরা পড়ে। এই জানা এবং না-জানার একটানা ইতিহাসই পদার্থ বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। এই ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, প্রকৃতির এই রহস্যের চূড়ান্ত Solution বুঝি অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্বতঃই মনে হয়, মানুষের এই যে জানার চেষ্টা—যে চেষ্টা পূর্ণ সাফল্যলাভ করে নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস—তাহা কি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে? এই চেষ্টা বা প্রয়াসের বিনিময়ে আমরা কি কিছুই পাই নাই? পাইয়াছি—রহস্য সম্যকভাবে না বুঝিলেও ইহা বলিতে বাধ্য যে, এই জ্ঞান-সাধনায় আমরা অনেক পাইয়াছি, জানিয়াছি বিস্তর। ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে, চূড়ান্ত জানা হয় নাই—কোনও দিন হইবে কিনা, তাহাও জানি না। সর্বাপেক্ষা সংশয়, চূড়ান্ত জানা বলিয়া কিছু আছে কিনা?

প্রকৃতির রহস্য-জাল ছিন্ন করবার প্রয়াস কিছু নূতন নয়। মানুষ যেদিন প্রথম চিন্তা করিতে শিখিল, সেদিন হইতে তাহার এই জানার জন্য ব্যাকুলতা। তখন তাহার ব্যাকুলতা ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ও শৃংখলা ছিল না, ভাব ছিল কিছু, ভাষা ছিল না। মাত্র তিনশত বৎসর পূর্বে গ্যালিলিও ও নিউটনের আবির্ভাবের সঙ্গে প্রথম শৃংখলাবদ্ধভাবে ইহাকে জানিবার চেষ্টার সূত্রপাত হয়। সৃষ্টি হইল নব নব ভাষা, নব নব পন্থা, উদ্ভাবিত হইল ইহার উপযুক্ত যন্ত্র। কিছু কিছু সমস্যার সমাধান হইল বটে, মনে হইল রহস্য-রুদ্ধ দ্বার বুঝিবা অর্গলমুক্ত হইল, কিন্তু শীঘ্রই নূতন সমস্যা আসিয়া পরিষ্কার আকাশকে কুয়াস চ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সমস্যা গতির (motion) সমস্যা। রাস্তায় এই যে গাড়ি চলিতেছে, সমুদ্রবক্ষে ঐ যে ভাসমান জাহাজ চলিয়াছে, ইহাদের গতি বা motion-এর রহস্য বড় সহজ নয়। জটিলতার বিবিধ পাকে ইহারা আবেষ্টিত। ইহাদের গতি-রহস্য বুঝিবার পূর্বে আরও সহজ, সরল গতি-রহস্য জানিবার চেষ্টা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যে দ্রব্যের কোনও গতি নাই, স্থির, এমন একটি দ্রব্য লইয়া আরম্ভ করা যাক। এই স্থির বস্তুটিকে গতিমান করিতে হইলে আমাদের কি করিতে হইবে? বাহির হইতে কোনও প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। ইহাকে হয় ধাক্কা দিতে হইবে, নয়ত উত্তোলন করিতে হইবে, নয়ত ঘোড়া বা স্টিম ইঞ্জিনের সহিত যুক্ত করিয়া চালাইতে হইবে। ইহা হইতে ইহাই মনে হয় যে, গতি বা motion বাহিরের প্রভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রভাব নাই গতিও নাই, প্রভাব আছে—গতিও আছে। আর একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, বাহিরের প্রভাব যত শক্তিশালী হইবে, গতিবেগ তত দ্রুত হইবে। দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ি অপেক্ষা চারি ঘোড়ায় টানা গাড়ি অবশ্যই দ্রুততর চলিবে।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, একবার যুক্তির মধ্যে কোনও গলদ প্রবেশ করিলে সমস্যার সমাধান ত' হয়-ই না, বরং সমাধান হইতে আমরা আরও দূরে চলিয়া যাই। সে যুগে এরিস্টটলের প্রভাব ছিল অসীম—তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, 'আরোপিত প্রভাবের অভাব ঘটিলেই বস্তু গতিহীন এবং নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।'

"The moving body comes to a standstill when the force which pushes it along can no longer so act as to push it.'

এই বিশ্বাসের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করেন গ্যালিলিও। তিনি বলেন, মোটামুটি-ভাবে দেখিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তাহা সকল সময় ঠিক অভ্রান্ত হয় না। প্রশ্ন এই যে, গতি সম্পর্কে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাতে ভুল কোথায়? প্রভাবের সহিত গতি নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট; কিন্তু, প্রভাবমুক্ত হইলেই দ্রব্য (যাহার পূর্বে গতি ছিল) গতিমুক্ত বা নিশ্চল হয় না। রাস্তা সমতল, মসৃণ, গাড়ি চলিতেছে, হঠাৎ প্রভাব অপসারিত করিলেই গাড়ি কিন্তু থামিয়া যায় না—হঠাৎ থামাইতে হইলে ব্রেক কসিতে হয়। নচেৎ ইহা চলে। ইহাকেই বলি জাড্য (Inertia) যদি রাস্তা সমতল এবং মসৃণ হয় এবং প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবার মত কিছু না থাকে, গাড়ি চলিবে এবং অনন্তকাল চলিবে। ইহা অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করা অসম্ভব! কেননা, এই গতি যে সকল সত্তাধীন সে আদর্শ অবস্থা সৃষ্টি করা অসম্ভব। গ্যালিলিওর পূর্বে জানিতাম যে, গতি (motion) প্রভাবের শক্তির উপর নির্ভর করে (Greater the actions Greater to the velocity)। সুতরাং গতির বেগ হইতে প্রভাব সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় বুঝিতে পারি। গ্যালিলিওর পর জানিলাম যে, প্রভাবমুক্ত হইলে দ্রব্য সমান গতিতে চলিবে।

(If a body is neither pushed, pulled, nor acted on in any other way, or more briefly, if no external forces act on a body, it moves uniformly that is always with the same velocity along a straight line.)

সুতরাং ইহার পর কোনও বস্তুর গতির বেগ দেখিয়া বলিতে পারি না ইহার উপর বাহ্যিক কোনও প্রভাব ক্রিয়া করিতেছে কিনা? গ্যালিলির এই কথাই নিউটন তাঁহার Law of Inertia-য় এইভাবে ব্যক্ত করেন :—

'Everybody perseveres in its state of rest or of uniform motion in a straight line, unless it is compelled to change that state by forces impressed thereon.'

এখন কথা হইল এই যে, গতি যদি বাহ্যিক প্রভাবের অভিব্যক্তি না হয়, তবে ইহা কি? উত্তর দিলেন প্রথম গ্যালিলিও এবং পরে

নিউটন। আবার সেই গাড়ির গতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। গাড়িটি কম গতিতে চলিতেছে — যেদিকে চলিতেছে — সেদিকে গাড়িটিকে একটু ধাক্কা দেওয়া হইল। দ্রুতি (Speed) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সুতরাং এইবার প্রভাবের সহিত সম্পর্ক দাঁড়াইল এই যে, বাহ্যিক প্রভাবের ক্রিয়া গতির বেগের পরিবর্তন সাধন করা। বাহ্যিক প্রভাব গতির বেগ হয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিবে, নয়ত হ্রাস করিবে। হ্রাস কি বৃদ্ধি করিবে, তাহা অবশ্য ইহা কোন্ মুখী কার্যকরী, তাহার উপর নির্ভর করিবে। তাহা হইলেই নিউটন প্রবর্তিত বলবিদ্যার (Classical mechanics) ভিত্তিভূমি এই force এবং Change of Velocity বা গতির বেগের পরিবর্তনের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত; force এবং Velocity-র সম্পর্কের উপর নয়।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উদিত হয়, এই force কি? নিউটন force-এর সংজ্ঞা এইভাবে দিলেন—

An impressed force is an action exerted upon a body in order to change its state, either of rest, or of moving uniformly forward in a straight line.

মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া হইতে একটি লোষ্ট্র পতিত হইলে ইহার যে গতি হয়, তাহা কোনও প্রকারেই সম গতীয় বেগ নয়। বেগ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে, force গতির সমমুখী প্রয়োগ করা হইয়াছে। অথবা আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, পৃথিবী লোষ্ট্রটিকে আকর্ষণ করিতেছে। সেই প্রকার ঊর্ধ্বমুখী একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে ইহার বেগ ধীরে ধীরে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই ক্ষেত্রে force গতির বিপরীতমুখী।

যে কথা বলিতেছিলাম force কি? সংজ্ঞা না দিতে পারিলেও মনে মনে জানি force বলিতে কি বুঝি। ধাক্কা বা টান হইতেই force সম্পর্কে ধারণার উৎপত্তি। টান বা ধাক্কা ব্যতীতও force-এর ফল প্রকাশমান। সূর্য এবং পৃথিবী, পৃথিবী এবং চন্দ্রের মধ্যে আকর্ষণ- (force of attraction) বিদ্যমান। পৃথিবীর উপরে দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখী লম্ফ প্রদান করিলে আবার মাটিতেই ফিরিয়া আসিতে হয়। যে-শক্তি আমাদিগকে মাটিতে ফিরাইয়া আনে, তাহা force ব্যতীত আর কি?

তাহা হইলে ইহাও সুস্পষ্ট যে, force-এর কেবল পরিমাণ নয়, ইহার প্রয়োগ-দিক (Direction of Action) ও সম প্রয়োজন। এ পর্যন্ত আমরা Rectilinear (ঋজুরেখ) গতির মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে, এই গতিপথ সরল নয়। চন্দ্রের গতিপথও সরল নয়। Mechanics-এর নীতির সহায়তায় ইহাদের গতিপথ এবং অবস্থান সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহার অপূর্ব সাফল্য বিস্ময় সৃষ্টি না করিয়া পারে না। কিন্তু rectilinear motion এবং motion along a curved path ঋজুরেখ গতি এবং বক্ররেখ গতিও এক নয়। তবে একটা কথা— ঋজুরেখ গতি বক্ররেখ গতির সহজ রূপান্তর মাত্র।

নিউটন এই আকর্ষণের পরিমাণ নির্ধারণের এক সহজ উপায় আবিষ্কার করেন- তিনি বলেন, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ (force) পরস্পরের দূরত্বের উপর নির্ভর করে। দূরত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে force হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, দূরত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে force বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দূরত্ব দ্বিগুণ হইলে force-এর পরিমাণ চারগুণ কমিবে, তিনগুণ হইলে কমিবে নয়গুণ। তাহা হইলে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, নিউটনের Law of motion এবং তাহার Law of Gravitation—এই দুইটির সাহায্যে আমরা গ্রহাদির গতি বুঝিতে পারি। Law of motion অনুযায়ী গতির পরিবর্তনের সহিত force-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। Law of Gravitation-র অনুযায়ী আকর্ষণ (বা force) পরস্পরের দূরত্বের সহিত সম্পর্কিত। সূর্যের চতুর্দিকে যে সমস্ত গ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের গতিবিধি সম্পর্কে Mechanics-এর প্রয়োগ-ফল অতি সাফল্যপূর্ণ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহা একপ্রকার অভ্রান্ত। যে কল্পনা বা অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া এই সমস্ত Law বা বিধি গঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত বাস্তব ঘটনার মিল বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

এ পর্যন্ত আমরা একটি বিষয় অবহেলা করিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতেছে দ্রব্যের mass বা ভর। দুইটি বিভিন্ন গাড়িতে— যাহাদের একটি ভারী দ্রব্য বোঝাই এবং আর একটি হালকা—এই force প্রয়োগ করিলে গাড়ি দুইটি কিন্তু সমান গতিতে চলিবে না। হালকাটি জোরে এবং ভারীটি লঘু গতিতে চলিবে। সুতরাং আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, গতি ভরের (mass) সহিত সম্পর্কিত। ভর বেশী থাকিলে গতি কম এবং ভর কম থাকিলে গতি বেশী হইবে। সুতরাং দুইটি দ্রব্যের আপেক্ষিক গতি হইতে (যদি একই force প্রয়োগ করা হইয়া থাকে) তাহাদের আপেক্ষিক ভর নির্ণয় সম্ভব। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু এই ভাবে ভর নির্ণয় করি না। আমরা ভর নির্ণয় করি অভিকর্ষের সাহায্যে। কিন্তু অভিকর্ষের সাহায্যে বা গতির সাহায্যে, যে ভাবেই ভর নির্ণয় করি না কেন, ফল পাই একই। Inertial mass এবং gravitation-এর mass-এর জগতে এই যে সমতা ইহা কি একটা আকস্মিক ঘটনা, না ইহা বিশেষ কোনও প্রকার অর্থব্যঞ্জক? Classical Physics অনুযায়ী ইহা আকস্মিক। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের নব্য মতবাদ অনুযায়ী ইহা মোটেই আকস্মিক নয়। ইহাদের সমতা বিশেষ তাৎপর্যব্যঞ্জক। ইহার উপরেই ভিত্তি করিয়া Theory of relativity বা আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ অনুযায়ী এই যে ভর-সমতা ইহার কারণ এবং অর্থ সুস্পষ্ট। নিউটনের মতবাদের সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর পর আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সমস্ত কারণে আপেক্ষিক মতবাদের অবশ্যক হইয়াছে, তাহার অন্যতম এই ভরের সমতা। ভর যে সমান তার প্রমাণ কি? আবার সেই গ্যালিলিওর চূড়া হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপের কাহিনীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। বিভিন্ন দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া দেখেন যে, একই সময়ে তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, পতিত দ্রব্যের (falling bodies) গতি দ্রব্যের ভরের উপর নির্ভর করে না। বেশ কথা! কিন্তু একই দ্রব্যের উপরি উল্লিখিত দুই প্রকার ভরই সমান— তাহা কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। এ কথা সত্য যে, একটি দ্রব্যকে ধাক্কা দিলে তাহা নড়িবে কি না এবং নড়িলেও কতটা জোরে নড়িবে, তাহা তাহার Inertial mass-এর উপর নির্ভর করে। এখন ইহা যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করি যে, পৃথিবী সকল বস্তুকেই সমান জোরে টানিতেছে- তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যে দ্রব্যের Inertial mass বেশী তাহা ধীরে পতিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। কথা এই যে পৃথিবী অভিকর্ষ বল দ্বারা (force of gravity) দ্রব্য আকর্ষণ করিতেছে এবং ইহার Inertial mass সম্পর্কে কিছুই জানে না। gravitatonal mass-এর উপরই পৃথিবীর calling force নির্ভর করে, আবার দ্রব্যটির answering motion inertial mass-এর উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, যে সকল দ্রব্যের answering motion সমান—

all bodies dropped from the same height fall in the same way—

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক নয় যে gravitational mass এবং inertial mass সমান।

আরও এক ভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়,

The acceleration of a falling body increases in proportion to its gravitational mass and decreases in proportional to its inertial mass. Since all falling bodies have the same combat acceleration the two masses not be equal.

ঊর্ধ্ব হইতে পতিত দ্রব্যের acceleration তাহার gravitational mass-এর সহিত সংশ্লিষ্ট এবং ইহার উপর নির্ভরশীল; ইহার কম বা বেশীর সহিত acceleration-এর কম

বা বেশী নির্ভর করে। কিন্তু এই acceleration-এর পরিমাণ ঠিক বিপরীত ভাবে inertial mass-এর সহিত নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোনও দ্রব্যের inertial mass কম বা বেশী হইলে acceleration বেশী বা কম হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পতিত দ্রব্য সমূহের accelaration-এর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে—বিশিষ্ট স্থানে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট মূল্যে অবধারিত। এক কথায় ইহা দ্রব্যনিরপেক্ষ। সুতরাং ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তাহা হইলে gravitational mass এবং Inertial mass সমান। গ্যালিলিওর বিখ্যাত experiment যে এ বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিভিন্ন ভরযুক্ত দ্রব্যকে একই tower-এর চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিয়া ইনি দেখিয়াছেন যে, ভূমিতে পতিত হইতে ইহারা সকলেই সমান সময় নেয়। সুতরাং এই আকর্ষণ শক্তি ভরের উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না।

বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্থান

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও বাঙলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহাপ্রভুর তিনি একজন সাধারণ চরিতকার নন, তাঁর অগ্রগামী বৃন্দাবন দাসের মত ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় তিনি মহাপ্রভুর জীবন-চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেন নি, সাধারণ জীবনী-লেখকের মত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা কেবলমাত্র জীবন-সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক সত্যকে রূপায়িত করেন নি, তাঁর কাজ এ সবের চেয়েও অধিক মূল্যবান, অধিক গভীর। তিনি মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি, মূলতত্ত্ব এবং বিশিষ্ট রস ও রহস্যের পরিচয় সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সাধারণ বাঙালী পাঠকের সম্মুখে ধরেছেন ও সেই সঙ্গে মহাপ্রভুর জীবনের ভাবময় ও ব্যঞ্জনামুখর রূপকে মূর্ত করেছেন। কবিরাজ গোস্বামীর শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, তবুও তাঁর সমস্ত পাণ্ডিত্য নিবিড় রসানুভূতির জারক রসে দ্রবীভূত হয়ে সহজ ও সরল ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। চৈতন্য চরিতামৃতে গভীর পাণ্ডিত্য ও নিবিড় উপলব্ধির অপূর্ব সম্মেলন হয়েছে। ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে মর্তে আনয়ন করেছিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজও তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের রস-গঙ্গাকে বাঙলার সমতল, সবুজ ক্ষেত্রে প্রবাহিত করেছেন। বাঙলা ভাষার পত্রপুটে সেই 'অনর্পিতচরী' ব্রজরস, 'রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা-রহস্য পিপাসু জনসাধারণের ওষ্ঠে তুলে ধরেছেন। যে বৃন্দাবন-লীলার মর্ম যে শান্ত দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য মধুর রসের রহস্য যে রাধা-ভাবের বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব মতে অবজ্ঞাত ছিল, যা কেবল মহাপ্রভুরই আবিষ্কার, সেই অনির্বচনীয় ভাব-রসের কবিরাজ গোস্বামীই প্রধান পরিবেষক, বিশদীকারক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারক। তাই তাঁর চৈতন্য-চরিতামৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দ্বিতীয় বেদ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে বৃন্দাবনলীলা ও রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য রস। রামানুজ মাধব, নিম্বার্ক, এমন কি বল্লভাচার্য পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মকে এত ভাবময়, আবেগময় ও মনস্তত্ত্বসম্মত রূপ দিতে পারেন নি। গোপীভাব বা রাধা-ভাবেই এই ধর্মের চরম পরিণতি। এই মধুর রস এই 'উজ্জ্বল' রসের মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্য নিহিত। এই মধুর রস উপভোগের জন্য ভগবানের অবতার নিজের আনন্দ অংশকে নিজের প্রেম অংশ দিয়া উপভোগের বাসনা;—নিজের এই আনন্দ-দায়িনী ও হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীরাধা—নিজের অংশ-স্বরূপা শ্রীরাধার প্রেম উপভোগের জন্যই ভগবানের রূপ গ্রহণ। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়,—

> যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ—
> প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন,
> রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।
> রসিক শেখর কৃষ্ণ, পরম করুণ;
> এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম।
>
> (আদি, ৪র্থ)

শ্রীকৃষ্ণকে এই 'প্রেমরস নির্যাস' আস্বাদন করান—'মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী'। তিনি সর্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।

পূর্বের কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই শ্রীরাধাকে এত উচ্চ সম্মান দেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়,—

> রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি শিষ্য নট;
> সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।
>
> (আদি, ৪র্থ)

মহাপ্রভু তাঁর আচরিত ধর্মের তত্ত্ব কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নি, কোন বিশিষ্ট দার্শনিক মতাবলম্বিত কোন সম্প্রদায় গঠন করে যান নি, কেবল ভাবাবেশ আলোচনা ও নিজের সমগ্র জীবন দিয়ে সেই তত্ত্বের জীবন্ত প্রতিরূপ দেখিয়ে গিয়েছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-গীতি-কবিতা ও শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণু-পুরাণ, হরি-বংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতির মধ্য থেকে এই গোপীভাব বা রাধাভাবের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে নিজের জীবনকে সেইভাবে অপূর্বরূপে রূপায়িত করে গেছেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর অনুষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে জীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভে' আর বলদেবের 'গোবিন্দ ভাষ্যে'। কিন্তু এ সবই সংস্কৃতে লেখা; কৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রথম সংস্কৃতের গণ্ডী ভেঙে বাঙলা ভাষার পাত্রে করে মহাপ্রভুর মতবাদের অমৃত সহস্র সহস্র রসপিপাসুদের কণ্ঠে ঢেলে দিয়েছেন।

এই যে রাধাভাব এর চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন মহাপ্রভু তাঁর জীবনে। এই মহাভাবে বিভোর হয়ে প্রতিটি ক্ষণ কেটেছে তাঁর জীবনের, কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধাকে প্রত্যক্ষ করা গেছে তার জীবনের প্রতি কার্যে, প্রতি কথায়। তাই তার পার্শ্বচরগণ স্বরূপ দামোদর, রূপগোস্বামী প্রভৃতি এই অলৌকিক ভাব দেখে উপলব্ধি করেছেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে কলিতে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই অবতারের উদ্দেশ্য রাধিকা যে প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই প্রেমের মহত্ত্ব কত দূর, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যই বা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিয়া রাধিকার যে সুখ হয়, তাহাই বা কি প্রকার—তারই আস্বাদন করা। তাই তাঁরা এই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর গৌরাঙ্গদেবকে অবতারস্বরূপে মেনে নিয়েছেন।

এই মহাপ্রভুর আবির্ভাবের রহস্যও রূপ গোস্বামী প্রভৃতি সংস্কৃতেই নিবন্ধ করেছেন। এই সব বৈষ্ণব গোস্বামীগণের শিক্ষায় ও আত্মোপলব্ধির দ্বারা কৃষ্ণদাস কবিরাজ অবতাররূপে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের রহস্য, তাঁহার অন্তর্জীবনের আলেখ্য, তাঁর ভাবোন্মাদনা প্রভৃতি বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করে আমাদের দিয়েছেন। যা ছিল বিশিষ্ট পণ্ডিত সমাজের তা তিনি করেছেন সর্বজনীন। বাঙলার সাধারণ বৈষ্ণব আজ মহাপ্রভুকে পাচ্ছে কবিরাজের মধ্য দিয়ে। নানা সংস্কৃত গ্রন্থ মন্থন করে সত্যই চরিতামৃত তিনি উদ্ধার করেছেন এবং তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ এই সব রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি প্রচার করেছেন,—

> রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি
> অন্যোন্যে বিলাস সরস আস্বাদন করি।
> সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞী:
> ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।
>
> (আদি, ৪র্থ)

সার্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর বিচারে (মধ্য, ৬ষ্ঠ) ও সনাতন-শিক্ষা (মধ্য, ২০) প্রভৃতিতে

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। নানা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাবকে নিজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষায় অপূর্বভাবে রূপায়িত করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্ত্বপ্রচারক ও মহাপ্রভুর সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত লেখকরূপে কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রসিদ্ধি ছাড়াও তাঁহার চৈতন্য চরিতামৃতের বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান আছে। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের রূপ ও রসের এটি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অবশ্য কবিরাজ গোস্বামী বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে ভাষা ও ছন্দের প্রতি মনোযোগ দেন নাই, কাব্য হিসাবে অনেক দোষ-ত্রুটিও লক্ষ্য হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, আধুনিক কাব্য-বিচার এই গ্রন্থের প্রতি প্রযোজ্য নয়। দেখতে হবে, যে মহাভাবের মূর্তিমান বিগ্রহকে তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন, যে তত্ত্ব ও দর্শনকে তিনি সর্বজনবোধগম্য করতে চেয়েছিলেন তাতে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন কিনা। এ সাধনায় তিনি অবশ্য সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং মহাপ্রভুর ভাব ও সাধনাকে তিনি বাঙালীর হৃদয়ে চিরতরে মুদ্রিত করে দিয়েছেন।

তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতের স্থান বিশেষ বাঙলা ভাষায় ক্লাসিকরূপে পরিগণিত হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে এই সব স্থান সুপরিচিত,—

কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ,
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।
'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা' তারে বলি কাম;
'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা' ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য—নিজ সম্ভোগ কেবল;
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য প্রেম হয় মহাবল।
লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম কর্ম;
লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম।
দুস্ত্যজ্য আর্যপথ নিজ পরিজন;
স্বজন করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন।
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন;
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেমের সেবন।
ইহাকে কহিয়ে—কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ;
স্বচ্ছ-ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ।
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর;
কাম অন্ধকারতম ; প্রেম নির্মল ভাস্কর।
(আদি, ৪)

সর্বোপরি চরিতামৃতের লেখকের বিনয় নম্র, সরল, প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত হৃদয়ের অনেকখানি স্পর্শ আমরা পাই তাঁর গ্রন্থে। অতি বৃদ্ধ কবি বলছেন,—

আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলা সার সূত্র মধ্য বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ ধন॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল যেই ইহা না লিখিল
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি তত দিন জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥
ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার চরণ
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ-গোসাঞির মত রূপ রঘুনাথ জানে যত
তাহি লিখি নাহি মোর দোষ॥

সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ও বাঙলা সাহিত্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের দান অপরিসীম ও তাঁর নাম ও কীর্তি চিরস্মরণীয়। *

* অখিল কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

মানস সরোবর

শিল্পী—শ্রীবিনায়ক মাসোজি

ফুটবল—

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা এখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই: প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক দলও কলিকাতায় আসিয়াছেন। দিল্লী ও হায়দরাবাদ দল শেষ পর্যন্ত যোগদান করিতে পারেন নাই। যে কয়েকটি খেলা এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা হইতে এইটুকু বলা চলে ভারতের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবল দল প্রেরণের যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহা পরিত্যক্ত হইলেই ভাল হইবে। ভারতীয় দল উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া একটি রাউণ্ডের অধিক খেলিতে পারিবে না, ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। দেশের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ: এইরূপ সময় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের একটিমাত্র খেলায় যোগদান করিবার জন্য দল প্রেরণ করা মোটেই যুক্তিসংগত হইবে না।

ক্রিকেট

অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৩ জন খেলোয়াড় ইতিমধ্যেই অষ্ট্রেলিয়াতে পেঁৗছিয়াছেন। পার্থের মেয়র ইঁহাদের নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারতীয় দলের অপর চারিজন খেলোয়াড় শীঘ্রই যাত্রা করিবেন। ইঁহাদের পেঁৗছিবার পূর্বেই ভারতীয় দলকে কয়েকটি খেলায় যোগদান করিতে হইবে। এই সকল খেলার ফলাফল লইয়া পরে আলোচনা করা যাইবে।

অধ্যাপক দেওধরের পদত্যাগ

অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় দলে নির্বাচক-মণ্ডলীর সহিত আলোচনা না করিয়া চারিজন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করায় অধ্যাপক দেওধর প্রতিবাদে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সহ-সভাপতির পদ ও খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পদত্যাগ পত্রে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতিকে জানাইয়াছেন যে, ঐভাবে হঠাৎ খেলোয়াড় মনোনীত করায় খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া যাঁহাদের লইয়া খেলোয়াড় নির্বাচন করা হইয়াছে তাঁহাদের কেবল খেলার মাঠে প্রতিখেলার খেলোয়াড় নির্বাচনের অধিকার আছে তাঁহারা কোন খেলোয়াড়কে দলে লওয়া উচিত বা উচিত নহে সেই সম্পর্কে কোন মতামত দিবার অধিকারী নহেন। এইভাবের কণ্ট্রোল বোর্ডের আচরণ তাঁহাকে মর্মাহত করিয়াছে। তিনি সম্পর্ক ত্যাগ ছাড়া অন্য উপায় দেখিতে পাইতেছেন না।

অধ্যাপক দেওধরের পদত্যাগের উত্তরে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ এ এস ডিমেলো একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমি অধ্যাপক দেওধরের বিবৃতি পাঠ করিয়া খুবই দুঃখিত হইয়াছি, তিনি পুনরায় সাধারণের চক্ষের সমক্ষে ভ্রান্তিপূর্ণ ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন। যাহা হউক আমি তাঁহার পদত্যাগ পত্র আনন্দে গ্রহণ করিলাম। তিনি কোনদিনই বোর্ডকে সাহায্য করেন নাই। খেলোয়াড় নির্বাচন সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলি যে, আমি কলিকাতায় পেঁৗছিয়া দেখিলাম দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে চারিজন অনুপস্থিত। তখন আমি সংগে সংগে বিচক্ষণ সার্জেনের রক্তপাতশূন্য অস্ত্রোপচারের ন্যায় প্রাদেশিকতার দুষ্ট ক্ষত ও আমাদের গোপনধ্বংসকারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করি। আমরা যে দল প্রেরণ করিয়াছি সেই সম্পর্কে আর কিছুই বলিবার নাই। অষ্ট্রেলিয়াতে আমাদের দল সাফল্যমণ্ডিত হইবে এই আশ্বাস আমি ভারত-বাসীকে দিতে পারি।"

একজন দায়িত্বসম্পন্ন লোক কিরূপে এইরূপ জঘন্য ইংগিতকারী বিবৃতি প্রদান করিতে পারে ভাবিয়া পাই না। অধ্যাপক দেওধর পদত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া। ডিমেলোর উচিত ছিল বিবৃতির মধ্য দিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, কেন তিনি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তিনি বিবৃতির মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ না করিয়া লিখিলেন "প্রাদেশিকতার দুষ্ট ক্ষত ও গোপন-ধ্বংসকারী ব্যবস্থা" ইহার দ্বারা ইনি প্রমাণিত করিতে চান যে, অধ্যাপক দেওধর একজন অতি হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক, ইহাই নয় কি? কিন্তু আমরা জানি এবং আমাদের বিশ্বাস আছে দেশের লোকে দেওধরের সম্পর্কে এই ধারণা কোনদিন করিবে না ও করিতে পারে না। মিঃ ডিমেলো যতই বাক্‌চাতুরী করুন না কেন অধ্যাপক দেওধর কি এবং কি প্রকৃতির তাহা দেশবাসীর অবিদিত নাই। হইয়াছে বলিয়া। ডিমেলোর উচিত ছিল বিবৃতির পক্ষান্তরে, ভারতীয় ক্রিকেট ডিমেলোর দান বলিতে কিছুই নাই। তিনি বল করিতে পারিতেন সত্য, কিন্তু কোনদিন তিনি ভারতের বিশিষ্ট বোলারদের মধ্যে স্থান পান নাই। ভারতের মধ্যে যতগুলি খেলোয়াড় এই পর্যন্ত সুনাম অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনকেও তিনি তৈয়ারী করেন নাই। এইরূপ একজন লোক সাহসী হইয়াছেন কিনা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধরকে হীন প্রতিপন্ন করিতে? অধ্যাপক দেওধর ভারতের কত খেলোয়াড়কে তৈয়ারী করিয়াছেন তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। বোর্ডের সভাপতি হইয়া যাহা বলিবেন তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া দেশবাসীর বিশ্বাস ইহা যদি মিঃ ডিমেলো ধারণা করিয়া থাকেন ভুল করিয়াছেন। তিনি যে বিষোদ্গার করিয়াছেন, একদিন সেই বিষই তাঁহাকে জর্জরিত করিবে এই কথা যেন স্মরণ রাখেন। দেশবাসী এই সকল অনাচার অবিচার, জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় আর সহ্য করিবে না, ইহাও স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। স্বাধীন দেশে স্বেচ্ছাচারিতার স্থান নাই।

সন্তরণ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বংগীয় প্রাদেশিক সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন সেই অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেন। উৎসাহী সাঁতারুগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া সাফল্যলাভের আশায় নিয়মিতভাবে অনুশীলন আরম্ভ করেন। হঠাৎ অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখা গেল বেংগল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালক-গণ আর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে বলিয়াছেন, সন্তরণ অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করা হইল ও প্রতিযোগিতার তারিখও পিছাইয়া দেওয়া হইল। ঠিক কবে হইবে তাহা না বলিয়া কেবল উল্লেখ করেন নবেম্বর মাসের প্রথমে। এই বিজ্ঞাপন বাংগালী সাঁতারুকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। তাঁহারা সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে না।

এই অনুষ্ঠান হউক বা না হউক বেংগল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকদের উচিত একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। অনর্থক সাঁতারুদের হয়রানি করার কোনই মানে হয় না। এসোসিয়েশন যে কতকগুলি অকর্মণ্য লোকেদের হাতে পড়িয়াছে ইহা গত দুই বৎসরের মধ্যেই লোকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। সুতরাং নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করিতে এসোসিয়েশনের পরিচালকদের কুণ্ঠিত হইয়া লাভ কি?

ব্যাডমিণ্টন

ব্যাডমিণ্টন খেলিবার মরসুম আগতপ্রায়। বেংগল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এইজন্যই অনুশীলনের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দীর্ঘকালের পরিকল্পিত আচ্ছাদিত কোর্ট নির্মাণের জন্য পুনরায় চেষ্টা করিতেছেন। বৎসরের পর বৎসর ইহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া মনে হয় দেশবাসী প্রকৃতই ব্যায়াম অনুরাগী নহে। এখনও পর্যন্ত যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার দৃশ্য আমাদের মাঠে দেখি তাহা কেবল বাহ্যিক, আন্তরিক নহে। ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

ব্যাডমিণ্টন খেলা আমাদের জাতীয় খেলা। আমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্যই ইহাকে আমরা হারাইয়াছি। দেশ স্বাধীন হইয়াছে, পুনরায় সময় হইয়াছে, যখন আমরা ইহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি। কিন্তু ইহার জন্য সকলে যদি উৎসাহিত না হই অথবা কিছু ত্যাগ স্বীকার না করি, তবে কোনদিনই অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না। দেশের খেলার পুনরুদ্ধার সে অনেক দূরের কথা। বর্তমানে আমরা যাহাতে এই খেলায় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারি সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। আচ্ছাদিত কোর্ট ব্যতীত নিয়মিত অনুশীলন করা যায় না এবং নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া খেলায় উন্নতি অসম্ভব। এইরূপ অবস্থায় আচ্ছাদিত কোর্ট যাহাতে শীঘ্র হয় তাহার জন্য দেশের প্রত্যেক ব্যায়ামানুরাগীর কিছু কিছু সাহায্য করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বর্তমানে যেখানে ব্যাডমিণ্টন খেলা হইয়া থাকে এইরূপ ক্লাব ৭।৮ শত হইবে। ইহারা যদি সকলে একসংগে হইয়া একটি আচ্ছাদিত কোর্টের অর্থসংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে প্রয়োজনীয় ১৫।২০ হাজার টাকা অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সংগৃহীত হইবে।

চলচ্চিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রী

বাঙলা ছবির অভিনয় দেখলে আমার প্রথমেই দুটো জিনিস চোখে পড়ে। তার একটা হল বাঙলা চিত্রে খাঁটি সিনেমা-সুলভ অভিনয় কলার অভাব এবং অপরটি হল বাঙলা দেশের অভিনেতা অভিনেত্রীদের একই-যোগে বহু চিত্রে এক সংগে অবতরণ। বাঙলা ছবি যাঁরা দেখেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই বোধ হয় এ দুটি জিনিস চোখে পড়ে। বাঙলা চলচ্চিত্রের অভিনয় বড় বেশী মঞ্চঘেঁষা। এর বোধ হয় একাধিক কারণ আছে। তার একটি কারণ হল—আমাদের দেশে বর্তমানে যাঁরা প্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রী তাঁদের অধিকাংশই পেশাদার রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করে থাকেন। তাই তাঁরা ভুলে যান যে মঞ্চাভিনয় ও চিত্রাভিনয় ঠিক এক জিনিস নয়। এক হিসেবে দেখতে গেলে চিত্রাভিনয় মঞ্চাভিনয় থেকে একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা আর্ট। চিত্র দর্শকদের কাছে দুটোই অভিনয় বটে—কিন্তু এই দুই প্রকারের অভিনয়ের আবেদন এক জাতীয় নয়। মঞ্চে আমরা রক্তমাংসের জীবন্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের চোখের উপর দেখতে পাই। তাই তাঁদের কণ্ঠ চাতুর্য আমাদের মনে মোহজাল সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। চিত্রাভিনয়েও বাচনভংগী ও কণ্ঠ-চাতুর্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু নাটকীয় অভিনয়ের অবকাশ এখানে অত্যন্ত কম। তাই চিত্রের রস পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে হলে অভিনেতা অভিনেত্রীদের অবলম্বন করতে হবে ভাবাভিব্যক্তির। আমার মতে বাচনভংগী অপেক্ষা ভাবাভিব্যক্তিই চিত্রাভিনয়ে বেশী প্রয়োজন। আর আমাদের চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রীদের অভিনয়ে এই বস্তুটির অভাবই বেশী করে পরিলক্ষিত হয়। এর জন্যে অনেকটা দায়ী উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। চলচ্চিত্রে দেশ ও জাতির কোটি কোটি টাকা খাটছে। অথচ অভিনেতা অভিনেত্রীদের চিত্রাভিনয় শেখাবার জন্যে আজ পর্যন্ত কোন অভিনয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি।

এর পরেই আসে চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রীদের একযোগে বহু চিত্রে অভিনয়ের প্রসংগ। একই অভিনেতা বা অভিনেত্রী যদি একযোগে বহু-চিত্রে অভিনয় করেন তবে তাঁর অভিনয় যে ভাল হতে পারে না, এটা ধরে নেওয়া চলে। বিলাতী বা মার্কিনী ছবির বেলায় দেখা যায় যে, কোন নাম করা অভিনেতা অভিনেত্রী এক বছরে সাধারণত একটির বেশী চিত্রে অভিনয় করেন না। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা একই অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে একই বছরে ৮।১০

খানা ছবিতে পর্যন্ত অভিনয় করতে দেখি। আমি এর বিরুদ্ধে একদিন একজন নামকরা চলচ্চিত্রাভিনেতার কাছে নালিশ জানিয়েছিলাম। তার উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "একযোগে বহু চিত্রে অভিনয় না করে করব কি মশাই? ব্যাঙের ছাতার মত চিত্র-নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আজ আমার বাজার দর আছে, কাল থাকবে না। আমার কাজের স্থায়িত্ব কোথায়? সময় থাকতে যদি দু' পয়সা সঞ্চয় করতে না পারি, তবে দাঁড়াবো কোথায়?" কথাটা সত্য, অস্বীকার করার উপায় নেই। চিত্রশিল্পীদের একযোগে একাধিক চিত্রে অবতরণ বন্ধ করতে হলে তাঁদের কাজের স্থায়িত্ব সৃষ্টি করে দিতে হবে—অর্থের লোভে তাঁরা যেন আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য না হন তার ব্যবস্থা করতে হবে। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, যাঁদের মাইনে করা নিজস্ব অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকে, তাঁদের কোম্পানীর চিত্রে অভিনয় গড়ে ভালো হয়। চিত্র-জগতের অভিনেতা অভিনেত্রীদের যদি আর্থিক দুর্ভাবনা না থাকে, তবে তাঁরা নিছক পেশাদারী মনোবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠে অভিনয়ে অধিকতর প্রাণ সঞ্চার করার অবকাশ পাবেন। এইভাবে বাঙলা চিত্রের অভিনয়ের দিক আরও উন্নত করা যায় বলে আমি মনে করি।

নূতন ছবির পরিচয়

অভিযোগ—বাসন্তিকা পিকচার্সের বাঙলা ছবি। কাহিনী, সংগীত ও সংলাপ : প্রেমেন্দ্র মিত্র; পরিচালনা : সুশীল মজুমদার; সুর-শিল্পী : শৈলেশ দত্ত গুপ্ত। ভূমিকায় : অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, দেবী মুখার্জি, সুমিত্রা, বনানী চৌধুরী প্রভৃতি।

এই নূতন বাঙলা ছবিখানি দেখে আমরা তৃপ্তি পেয়েছি। কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্র কাহিনী রচনায় বেশ অভিনবত্ব ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের দেশের তথাকথিত দেশ নেতারা কিভাবে বড় বড় কথার মায়াজাল রচনা করে জনসাধারণকে প্রতারিত করেন, তাদেরই প্রদত্ত চাঁদার টাকায় কি করে ধান চাউলের চোরা কারবার চালান, নিজেদের চেলা চামুণ্ডাদের মারফৎ এবং অবলা আশ্রম গড়ে অসহায়া মেয়েদের আশ্রয় দেওয়ার নাম করে কিভাবে তাদের দিয়ে গোপন ব্যবসায় করেন—আলোচ্য বইখানিতে তারই ছবি তুলে ধরা হয়েছে দর্শক সাধারণের সামনে। এই চিত্রে দেশনেতা কৃপাশংকরের যে চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে সেরূপ চরিত্রের জাল দেশ-নায়ক বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক আছেন। গত মহাযুদ্ধের সুযোগে এই সব বর্ণচোরা কৃপাশংকরের দল আমাদের সমাজ দেহ ছেয়ে ফেলেছে এবং তারই ফলে জনগণের,

চন্দ্রশেখর চিত্রে দলনীর ভূমিকায় ভারতী

যৌবনের বাদ্য

শিল্পী—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

দুঃখদারিদ্র্য বেড়ে চলেছে। জনগণের উচিৎ এই সব কৃপাশঙ্করের দলকে চিনে রাখা। যত তাড়াতাড়ি এদের প্রকৃত স্বরূপকে আমরা ধরতে পারি এবং তাদের মুখোস টেনে খুলে দিতে পারি ততই আমাদের মঙ্গল। সময়োপযোগী এই ধরণের চিত্রকাহিনী জনগণের পক্ষে কল্যাণকর হবে বলে আমরা মনে করি।

'অভিযোগ' প্রথম শ্রেণীর ছবি হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। তবে প্রচলিত অনেক বাঙলা ছবির তুলনায় অভিযোগ যে উচ্চস্তরের চিত্র হয়েছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি বাদ দিলে অভিনয় পরিচালনা, আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ এবং সংগীত পরিচালনা মোটামুটি ভালই হয়েছে। বইখানি জনসমাজে সমাদৃত হবে বলে মনে হয়।

স্টুডিও সংবাদ

রমা আর্ট প্রোডিউসার্সের বাঙলা ছবি "সংসারে"র চিত্রগ্রহণ কার্য ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে নতুন করে আরম্ভ হয়েছে। এই চিত্রের পরিচালক আশু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানাংশে অভিনয় করছেন রবীন মজুমদার ও সন্ধ্যারাণী। সংগীত পরিচালনা করছেন সুবল দাশগুপ্ত।

* * * *

অজন্তা আর্ট ফিল্মসের "কার্টুনে"র চিত্রগ্রহণ কার্যও ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই চিত্রের পরিচালক ডি জি ও কাহিনীকার পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

* * * *

শ্রীবাণী পিকচার্সের প্রথম চিত্রের নামকরণ করা হয়েছে "যে নদী মরুপথে"। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন সীতা দেবী, পাহাড়ী ঘটক ও অঞ্জলি রায়।

* * * *

হিন্দুস্থান আর্ট পিকচার্স লিমিটেডের প্রথম বাঙলা ছবি 'সুধারা'র কাজ কালী ফিল্মস স্টুডিওতে সমাপ্ত প্রায়। কয়েকটি বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে এই চিত্রের কর্মীবৃন্দ এই মাসের শেষ দিকে ওয়ালটেয়ার ও দার্জিলিং-এ যাবেন বলে প্রকাশ।

* * * *

সুধীরবন্ধুর পরিচালনায় চলন্তিকার 'মাটি ও মানুষে'র চিত্রগ্রহণের কাজ বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিওতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন নরেশ মিত্র, বিমান বন্দোপাধ্যায়, হরিধন, তুলসী চক্রবর্তী, অমর চৌধুরী, গীতশ্রী, মণিকা ঘোষ, শ্রীমতী মুখার্জি প্রভৃতি।

* * * *

সরোজ মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স নামক একটি নবগঠিত চিত্রপ্রতিষ্ঠান ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে "মনে ছিল আশা" নামে একটি বাঙলা চিত্র নির্মাণ করবেন বলে প্রকাশ। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

শেষ রাতের অতিথি (কিশোর উপন্যাস)—অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত; সরস্বতী সাহিত্য মন্দির (সোনারপুর) ২৪ পরগণা) হইতে প্রকাশিত; মূল্য দেড় টাকা।

অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত বাঙলা সাহিত্যে সুপরিচিত, বিশেষ করিয়া শিশু সাহিত্যে প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার কিশোর উপন্যাসগুলিতে একটা নিজস্ব সুর আছে, একটা নূতন সাড়া আছে; কিশোরদের কোমল মনের উপর দেশকে ও দশকে ভালোবাসিবার একটা দাগ আঁকিবার ক্ষমতা তাঁহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য উপন্যাসেও তাহা পরিষ্কারভাবে দৃষ্ট হয়। উপন্যাসটির প্রচ্ছদপট, বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর। আমরা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে উপন্যাসটির বহুল প্রচার কামনা করি।

এর শেষ কোথায় (বারোয়ারী কিশোর উপন্যাস)—শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত; দীপালী গ্রন্থশালা, ১২০।১, আপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত; মূল্য দুই টাকা। আমরা বইখানি পাঠে মুগ্ধ হইয়াছি। উপন্যাসটির সব থেকে বিশেষত্ব এই যে, পনেরজন অল্প বয়স্ক কিশোর-কিশোরীর দ্বারা এর বিভিন্ন পরিচ্ছেদ লিখিত হইলেও গতি কোথাও ব্যাহত হয় নাই এবং ছোট-বড় প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'এর শেষ কোথায়'এর সকল নূতন লেখক-লেখিকাই আমাদের খুশী করিয়াছে।

শ্রীশ্রীমহানাম রস মাধুরী — কবিকিংশুক ব্রহ্মচারী, পরিমল বন্ধু দাস প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র। প্রধান প্রাপ্তিস্থান লীলামৃত কার্যালয় —৪১সি, শাখারীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার সাহিত্য জগতে সুপরিচিত। তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ বাঙলার জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে প্রভু জগদ্বন্ধু রচিত চন্দ্রপাত নামক গ্রন্থের তাৎপর্য কবিতায় ব্যাখ্যাত এবং বিশ্লেষিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধনায় আগ্রহশীল পাঠকেরা এই গ্রন্থপাঠে আনন্দ লাভ করিবেন।

বন্ধু করুণা-কণিকা—শ্রীপাদ শিশিরাজ মহেন্দ্রজী প্রণীত। প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরিমল-বন্ধু দাস, শ্রীশ্রীধাম শ্রীমঙ্গল, ফরিদপুর। মূল্য ছয় আনা।

ভক্ত সাধকের প্রাণময় আবেগে পুস্তিকাখানা উচ্ছ্বসিত। উন্নত জীবন গঠনের পক্ষে ইহা সহায়ক হইবে।

চার শ' বছরের পাশ্চাত্য দর্শন—অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত। সংস্কৃতি বৈঠক কর্তৃক ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা—২৯ হইতে প্রকাশিত। ১৬৮ পৃঃ। মূল্য আড়াই টাকা।

ইহা একখানি সুন্দর দর্শনের বই। ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর গত চার শতাব্দীর ইউরোপ ও আমেরিকার বিপুল চিন্তাধারার একটি সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ দার্শনিক প্রশ্ন, যথা দ্রব্য ও গুণ, জ্ঞান ও জ্ঞাতা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক জটিল ও প্রবীণ তর্ক যথা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন না জগৎ ঈশ্বরের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছে, মানুষ ও তাহার সভ্যতার লোপ কত দিনে হইবে ইত্যাদিও এই আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। তবে

সংক্ষিপ্ত আলোচনার যাহা ত্রুটি (যদি ইহাকে ত্রুটি বলা চলে) তাহা এখানেও হয়ত রহিয়া গিয়াছে। যেমন আরও কোন কোন চিত্তাকর্ষক সমস্যার বিচার থাকিলে এবং আলোচনা কোন কোন স্থলে আরও বিস্তৃত হইলে অনেকেই হয়ত বেশী তৃপ্ত হইতেন। দুর্মূল্যের বাজারে প্রকাশকরা ইহা অপেক্ষা বড় বই ছাপাইতে সাহস পান নাই, ইহা মনে করা চলে। তবে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া বিশ্বাস হয়, এরূপ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রয়োজন হইবে। আশা করি তখন এই গ্রন্থের পরিসর বর্ধিত করিতে লেখক ও প্রকাশক চেষ্টাবান হইবেন। আমরা বইখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি এবং আশা করি পাঠকগণও তৃপ্তিলাভ করিবেন। ১০০।৪৭

শিক্ষক—নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুখপত্র। সম্পাদক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী, কার্যালয়—৬১, বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। মূল্য বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা।

আমরা সচিত্র মাসিক পত্র 'শিক্ষকে'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। শিক্ষা বিষয়ে নানা সারগর্ভ প্রবন্ধ ও চিত্রাদিতে উহার প্রত্যেকখানি সংখ্যাই সমৃদ্ধ। বর্তমানে শিক্ষা ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের ঘোর দুর্দিন। শিক্ষা ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে আশা করি পত্রখানা উভয়ের সঙ্গে জড়িত বিবিধ জটিল সমস্যার সমাধানে ও পথ নির্দেশে সফলকাম হইবে। পত্রখানা একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। আমরা 'শিক্ষকের' শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

জীবন—সচিত্র মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীঅজিত-কৃষ্ণ বসু। মূল্য প্রতি সংখ্যা ছয় আনা।

'জীবন'—প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। পত্রখানা জীবন, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ ও চিত্রে সমৃদ্ধ। উহার শোভন সাজসজ্জাও সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমরা পত্রখানার শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

স্বাধীন বাংলা—পাক্ষিক পত্র। সম্পাদক ডাঃ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। কার্যালয়—৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই আনা।

'স্বাধীন বাংলা' নূতন আত্মপ্রকাশ করিল। আমরা পত্রিকাখানার উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বর্ষ পঞ্জী—১৩৫৪—সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম-এ। প্রকাশক: শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত, এস আর সেনগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং, ২৫।এ, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু (ত্রিতল), কলিকাতা—৪। মূল্য আড়াই টাকা।

আমরা এই সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত বর্ষপঞ্জীখানা পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থখানা সুদীর্ঘ, ৩৭৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এবং আগাগোড়া জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। গ্রন্থারম্ভে ১৩৫৩-৫৪ সালের আন্তর্জাতিক অবস্থার পর্যালোচনামূলক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। অতঃপর ভারতের প্রাকৃতিক রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক বিবরণ, প্রধান নগরীসমূহ, জনসংখ্যা ও আয়তন, আদম সুমারী, দেশীয় রাজ্যসমূহ, ভারতে বৃটিশ শাসন, ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের পরিচয়, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকার, ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, ভারতীয় বিচার বিভাগ, ভারতীয় সমর বাহিনী প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ভারতের বিজ্ঞান, সাহিত্য, অর্থনীতি, যানবাহন, জনস্বাস্থ্য, শিল্পকলা এবং ক্রীড়াকৌতুক সম্বন্ধেও বহু তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। গ্রন্থখানা সাহিত্যিক সাংবাদিক হইতে সাধারণ গৃহস্থ পর্যন্ত সকলেরই বিশেষ কাজে আসিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে একটি ত্রুটি বিশেষরূপে চোখে পড়িল। প্রথিতযশা বাঙ্গালীদের পরিচয় প্রদানে কি নীতি অনুসৃত হইয়াছে বোঝা গেল না, কেন না, ইহাতে বহু স্বল্পখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় স্থান পাইয়াছে অথচ কতিপয় খ্যাতনামা বাঙালী কর্মবীরের উল্লেখমাত্র নাই। ইহা পাঠকদের অসুবিধা সৃষ্টি করিবে। গ্রন্থখানা উত্তম কাগজে পরিপাটিরূপে মুদ্রিত।

২০৭।৪

জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীশৈলে... বসু প্রণীত। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যাম... চরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য বারো আনা।

এখানা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ। বিশেষ করিয়া জাতীয় জীবনের পটভূমি হইতে তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। দেশের জাতীয় জাগরণের মধ্যে কবিগুরু আপনাকে কিভাবে মিলাইয়া দিয়াছিলেন এবং কিভাবে তাঁহার গান ও প্রবন্ধাদি আমাদের জীবনে নূতন প্রাণধারার সৃষ্টি করিয়াছিল, এ... ক্ষুদ্র গ্রন্থখানায় তাহারই খানিকটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। কবিগুরুর একখানি সু... প্রতিকৃতি এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও অন্য... জনপরিবৃত তাঁহার একখানা ব্লক ফটো বইটির সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। ২০১।৪

বিদেশীর চোখে গান্ধীজী—শ্রীপ্রভাত ... সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান : কংগ্রেস পুস্তক প্রচার কেন্দ্র, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূ... দশ আনা।

গান্ধীজীর সম্বন্ধে পৃথিবীর নানাস্থানের মনীষীদের অভিমত এই পুস্তিকায় সংকলিত হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা নূতন এবং প্রশংসার্হ। এই মহামানবের সম্বন্ধে সভ্য জগতের চিন্তা-নায়কগণের কাহার কিরূপ ধারণা এ সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল সকলেরই হয়। সংকলয়িতা এই কৌতূহল চরিতার্থ করার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু মাত্র ২৪ পৃষ্ঠার পঠনীয় বিষয়ের পুস্তিকার দশ আনা মূল্য নির্ধারণ প্রচারের পক্ষে উপযো... হয় নাই। ১৯৯।৪

১। **ভূইবোনেদের আসর**; ২। **তোমাদের মত ছেলে**—শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য যথাক্রমে এক টাকা ও দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান সরস্বতী সাহিত্য মন্দির, সোণারপুর, ২৪ পরগণা।

প্রথমোক্ত বইটি শিশুদের উপযোগী গল্প সমষ্টি। গল্পগুলি কেবলমাত্র শিশুদের আনন্দ দিবে না উহা পাঠে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষাও লাভ করিবে।

দ্বিতীয় বইটি দেশবিদেশের বাইশজন ছে...

ব্যক্তির ছেলেবেলাকার দুষ্টামির কাহিনী। বইটি শিশুদের মনে যথেষ্ট কৌতূহল উদ্রেক করিবে।

অভয় বাণী—শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস এম-এ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅরুণকুমার বসু, বিশ্বাস নিকেতন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মূল্য আট আনা।

"অভয় বাণী" চাব্বিশটি কবিতার সমষ্টি। সবগুলি কবিতাই জাতীয় ভাবের উদ্দীপক।

২০০।৪৭

ছড়াছড়ি—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান, আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

আমরা বাঙলার প্রাচীন সাহিত্যের দুই বিশিষ্ট শাখার একটিতে পাইয়াছি পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও অন্যটিতে পাইয়াছি ছেলেভোলানো ছড়া। এগুলি বাংলা দেশের প্রাণের সাহিত্য, খাঁটি লোক-সাহিত্য। লোক-সাহিত্য লোকের প্রাণের উৎস হইতে আপনি অতি সহজভাবে উৎসারিত হইয়া উঠে। এগুলিও তাহাই হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গ গীতিকা তথা গাথা-সাহিত্যে মানুষের প্রেম-বৈচিত্র্য রূপায়িত হইয়াছে আর ছড়া সাহিত্যে দানা বাঁধিয়াছে শিশু-মনের ভাব-বৈচিত্র্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই প্রেম-মধুর গাথা-সাহিত্যকে বাঁচাইয়া রাখার কোন চেষ্টা যেমন দেখা যায় না, তেমনি ছড়া-সাহিত্যও আজ অনাদরে লুপ্তপ্রায়। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য এইরূপ কতকগুলি ছড়া সংগ্রহ করিয়া ছেলে-মেয়েদের জন্য গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তিনি অল্পের মধ্যে কয়েকটি ভাল জনপ্রিয় ছড়া সংগ্রহ করিয়াছেন। দেশের বিরাট ছড়া সাহিত্যের যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যক রত্ন সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থশেষে যে দুই একটি আধুনিক ছড়া সংযোজিত হইয়াছে, সেগুলি না থাকিলেই বোধ হয় ভাল হইত। কারণ, এখনকার কাল লোক-সাহিত্য বা ছড়া সৃষ্টির কাল নহে। তার প্রমাণ এই দুই একটি আন্তরিকতা-স্পর্শবিহীন আজগুবি আধুনিক ছড়া। অজস্র ছবি বিচিত্র প্রচ্ছদপট বইটিকে বিশেষভাবে লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

১৯১।৪৭

কেবল মজা—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সুকবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত যে শিশু-সাহিত্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার রচিত এই বইখানা। অনেকগুলি হাসির পদ্য এই বইটিতে স্থান পাইয়াছে। পদ্যগুলি ঠিক ছড়া-সাহিত্যের মতই উপভোগ্য। প্রত্যেকটি রচনাই সচিত্র। শিশুমহলে বইখানার আদর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

১৯২।৪৭

মণিকাঞ্চন (২য় খণ্ড)—সুধাংশুকুমার গুপ্ত সম্পাদিত। প্রকাশক—প্যাল প্রকাশনা নিকেতন, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩॥০ টাকা।

ইহা একখানি মনোজ্ঞ বার্ষিক সংকলনী। কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দিলীপকুমার রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অনাথনাথ বসু, গণপতি ভট্টাচার্য, কালিদাস রায়, কাজী আব্দুল ওদুদ প্রভৃতি বঙ্গের সাহিত্য মনীষীগণের গল্প, কবিতা ও রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ এই সঙ্কলনীখানি পূজার বাজারে পাঠকবর্গের মনোহরণ করিবে সন্দেহ নাই। কবিতা, গল্প, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যবান প্রবন্ধরাজি ইহার গৌরববর্ধন করিয়াছে। গঠন পারিপাট্যেও ইহা অত্যুত্তম হইয়াছে।

২০৬।৪৭

সাহিত্য-সংবাদ

"প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা"

ইটাবেড়িয়া মিলন সংসদের উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। বিষয়—"ভারতীয় স্বরাজের রূপ"। তিনটি পুরস্কার আছে। প্রবন্ধটি ফুলস্কেপ কাগজের ½ সাইজের ১২ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিয়া আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণের (১৩৫৪ সাল) মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। শ্রীচিন্তামণি কামিলা, সম্পাদক, ইটাবেড়িয়া মিলন সংসদ, পোঃ মুগবেড়িয়া, জেলা মেদিনীপুর।

রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন
সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আগামী নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে এক সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় ১৪ বছরের অনূর্ধ্ব বালক-বালিকাদের যোগদান করিতে আহ্বান করা যাইতেছে।

নিয়মাবলী—১। প্রত্যেক বিষয়ে ১ম ও ২য় পুরস্কার দেওয়া হইবে। ২। একই বালকবালিকা ইচ্ছা করিলে উভয় প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে। ৩। এই প্রতিযোগিতায় কোনরূপ প্রবেশ মূল্য নাই। ৪। প্রতিযোগিতায় যোগদান ইচ্ছুক বালকবালিকাকে আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে প্রতিযোগীর নাম ও অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা দিয়া সম্মেলনের কার্যালয় ৬নং মোহনলাল স্ট্রীট, শ্যামবাজার, বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে জানাইতে হইবে। বিষয়—১। আবৃত্তি (রবীন্দ্রনাথের যে কোন কবিতা হইতে); ২। সংগীত (রবীন্দ্র-সংগীত)।

মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ সাহিত্য সম্মেলন

নিখিল বঙ্গ কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমিতির উদ্যোগে বিগত ৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর গৌরাঙ্গ মিলন মন্দিরে মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী, কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়, প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী ও শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, ডাঃ নলিনীমোহন সান্যাল, আচার্য শ্রীমতিলাল রায় ও শ্রীহরিহর শেঠ বাণী প্রেরণ করেন। প্রারম্ভে মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য মঙ্গলাচরণ করেন। শ্রীহরিদাস নন্দী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়ের কীর্তনের পর দ্বিতীয় দিবসের কার্য আরম্ভ হয়। সাহিত্য বিভাগের কাব্য বিভাগে, দর্শন বিভাগে যথাক্রমে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, কবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিভাগে যাহারা বক্তৃতা করেন ও যাহাদের প্রবন্ধ বা কবিতা পঠিত হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীননীগোপাল মজুমদার, পণ্ডিত শ্রীশিবশঙ্কর শাস্ত্রী কুমার শরদিন্দু-নারায়ণ রায়, প্রাজ্ঞ কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, কবি শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, কবি শ্রীঅপূর্ব ভট্টাচার্য ও শ্রীমণিমোহন মল্লিক। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন বিভাগীয় সভাপতিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দেশী সংবাদ

৬ই অক্টোবর—কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে এবং নির্বাচন ব্যাপারে সুদূরপ্রসারী কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। কর্পোরেশনের বর্তমানে যে পৃথক নির্বাচন প্রথা আছে তাহা তুলিয়া দিয়া যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন, কর্পোরেশন হইতে মনোনয়ন প্রথার উচ্ছেদ, ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্য স্বার্থের প্রতিনিধিমূলক কাউন্সিলারগণের সংখ্যা হ্রাস উপরোক্ত পরিবর্তনগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাইয়ের মুসলমান সমাজের নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক স্বাক্ষরিত আবেদনে ভারতের মুসলমানগণকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সেবা করাই তাহাদের জীবনের গৌরবজনক জাতীয় কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আবেদনকারিগণ ভারতের শান্তিরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টায় মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর গভর্নমেণ্টকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করিবার জন্যও মুসলমান সমাজের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন।

পশ্চিম পাঞ্জাবের সর্বাপেক্ষা উর্বর অঞ্চল লায়ালপুর হইতে বাস্তুত্যাগী ৪ লক্ষ অ-মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীর এক বিরাট দল পদব্রজে পাকিস্থান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিতেছে। পশ্চিম পাঞ্জাব ত্যাগকারীদের ইহাই বৃহত্তম দল।

৭ই অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট সরকারী কর্মচারীদের মধ্য হইতে দুর্নীতির উচ্ছেদকল্পে দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। একটি বিজ্ঞপ্তিতে গভর্নমেণ্ট প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকে গত ১লা জানুয়ারী (১৯৪৭) তারিখে তাহার যে ধনসম্পত্তি ছিল, আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে তাহার এক হিসাব দাখিল করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি বৎসর ৩০শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে তাহার ধনসম্পত্তির অনুরূপ বিবৃতি দিবারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে গভর্নমেণ্ট সরকারী কর্মচারিগণ কর্তৃক কোনভাবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়াখেলা ও শেয়ার বাজারে ফটকাবাজী করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ, গত কয়েকদিন যাবৎ ঢাকা শহরের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে "জেহাদের ডাক" নামক বাঙলা ও ইংরাজীতে মুদ্রিত এক ইস্তাহার বিলি করা হইতেছে। ঐ ইস্তাহারে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করা হইয়াছে।

সিন্ধুর গভর্নর মিঃ গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা করাচীতে এক বক্তৃতায় সিন্ধুর সংখ্যালঘুদিগকে সিন্ধু ত্যাগ করিয়া না যাইতে অনুরোধ জানান।

৮ই অক্টোবর—পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে যে কোন সংঘর্ষই উভয়ের পক্ষে আত্মহত্যাতুল্য। যাহারা শান্তিপূর্ণ প্রগতির বিঘ্নকর তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলেন যে, অপরাধী যত বড়ই রাজনৈতিক, সরকারী বা সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হউক না, তাহাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে।

মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ স্বীকার করেন যে, পাকিস্থানের কয়েকটি অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের রক্ষায় অসমর্থ হইয়াছে।

কলিকাতা শহরের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় পুলিশ কমিশনার ১৪৪ ধারা অনুসারে যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহা ৯ই অক্টোবর হইতে প্রত্যাহার করিয়াছেন।

কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ উত্তর কলিকাতায় এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে। উত্তর কলিকাতার লাটুবাবু লেনের এক বাড়ীতে এই হত্যাকাণ্ড হয়। জনৈকা বয়স্কা মহিলা ও তাঁহার দুই কন্যা নিহত হন। এসম্পর্কে বাড়ীর ঝি এবং পাচককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৯ই অক্টোবর—পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্প্রতি রেশন হইতে যে সাত ছটাক রেশন হ্রাস করা হইয়াছে, তাহা আগামী ২০শে অক্টোবর হইতে পুনর্বহাল করা হইবে।

১০ই অক্টোবর—শ্রীযুত ঈশ্বরদাস জালান পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের স্পীকার নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাটনা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করিয়াছে।

১১ই অক্টোবর—নয়াদিল্লীতে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, হরিজনরা যে অস্পৃশ্য তাহার নিদর্শনস্বরূপ শ্রীযুত মণ্ডল ও পাকিস্থান মন্ত্রিসভার আরও কয়েকজন সদস্য হরিজনদিগকে প্রতীক ধারণের অনুরোধ জানাইবার সিদ্ধান্ত করিয়া গতকল্য যে বিবৃতি দিয়াছেন, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত প্রতীকটি নাকি অর্ধচন্দ্র ও তারকাখচিত হইবে। হরিজনদিগকে অন্যান্য হিন্দু হইতে পৃথক করিয়া দেখানোই ইহার উদ্দেশ্য। মহাত্মাজী বলেন, তাঁহার মতে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যে সমস্ত হরিজন তথায় থাকিবেন, তাঁহারা অবশেষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

মহীশূর স্টেট কংগ্রেস ও মহীশূর গভর্নমেণ্টের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্নে একটা বুঝাপড়া হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রধান পরিচালক ভক্তিভূষণ শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ কলিকাতায় তাঁহার বাগবাজার ভবনে পরলোকগমন।

স্বর্গীয় মহাদেব দেশাইর পুত্র শ্রীনারায়ণ দেশাইর সহিত উড়িষ্যার রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী উত্তরা চৌধুরীর শুভ পরিণয়।

করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল।

১২ই অক্টোবর—পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দুদের আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া পাকিস্থানে পার্লামেন্টের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলেন যে, তথায় এক শ্রেণীর মুসলমানের কার্যকলাপের ফলে হিন্দুদের শুধু ধনসম্পত্তি নহে, হিন্দুনারীর মর্যাদা পর্যন্ত আজ একান্তভাবে বিপন্ন। পূর্ববঙ্গ সরকার মোটেই সুগঠিত নহে—দুর্বৃত্তদলের কার্যকলাপ বন্ধ করার ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্ট নিতান্ত অসহায়। এই অবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীদের আপন শক্তিবলে তথায় বসবাস করিতে হইবে।

গুতকলা মহীশূরের দেওয়ান এবং স্টেট কংগ্রেসের সভাপতির মধ্যে যে মীমাংসা হয়, অদ্য মহীশূরের মহারাজা তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। স্টেট কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি অদ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৭ই অক্টোবর—বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী শ্রমিক মন্ত্রিসভার বহু প্রত্যাশিত রদবদল ঘোষণা করিয়াছেন। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য এবং মন্ত্রিসভা দৃঢ় করার উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের উহাতে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

৮ই অক্টোবর—সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ওলন্দাজ সরকার সুমাত্রার সমুদ্র-তীরবর্তী সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলকে সাময়িক স্বায়ত্ত-শাসন দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৯ই অক্টোবর—লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, বর্তমান বৎসরের ৮ই আগস্ট হইতে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও হায়দরাবাদের নিজামের মধ্যে কতকগুলি পত্র বিনিময় হয়। পত্রগুলি সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই পত্রগুলি হইতে জানা যায় যে, নিজাম ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিবেন, না স্বাধীন থাকিবেন, তাহা তাঁহাকে ১৪ই অক্টোবরের মধ্যে স্থির করিতে বলা হয়। তিনি যদি স্বাধীন থাকিতেই স্থির করেন, তবে বৃটিশ কমনওয়েলথ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে স্বীকার করিবেন না, ইহাও তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হয়।

১০ই অক্টোবর—আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল আজম পাশা ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটিশরা প্যালেস্টাইন ত্যাগ করিয়া আসিলে আরব অধ্যুষিত প্যালেস্টাইনকে "সামরিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যদানের" উদ্দেশ্যে আরব লীগের পক্ষ হইতে মিশর ও সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইনের সীমান্ত অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছে। আরব লীগ কাউন্সিলের পূর্ণ অধিবেশনে ইহুদী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনকে সর্বপ্রকার সামরিক সাহায্যদানের জন্য আরব রাষ্ট্রসমূহকে আহ্বান জানাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে পর আজম পাশা এই সংবাদটি প্রকাশ করেন।

১১ই অক্টোবর—জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্যালেস্টাইন সম্পর্কিত স্পেশ্যাল কমিটির সুপারিশ অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদ্য প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইহুদী রাষ্ট্রে বিভক্ত করার পরিকল্পনা সমর্থন করার কথা ঘোষণা করিয়াছে। প্যালেস্টাইন কমিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিঃ এইচ জনসন ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে গমনের নীতি অনুমোদন করেন এবং জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত বলবৎ করার নিমিত্ত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান মারফৎ একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেন।

নিউইয়র্কে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্যালেস্টাইন কমিটিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেন যে, প্যালেস্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১২ই অক্টোবর—আরব লীগের সেক্রেটারী আজম পাশা ঘোষণা করেন যে, কোন জাতি যদি বলপূর্বক প্যালেস্টাইনকে দ্বিধা বিভক্ত করার চেষ্টা করে, তাহাতে আরব রাষ্ট্রসমূহ বাধা দিবে।

ইরাকী সেনেটের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট বলেন, আমরা প্যালেস্টাইনের প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য শেষ রক্ত বিন্দু দিয়া লড়িব। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র হইতে প্যালেস্টাইনে অর্থ, রণসম্ভার ও দুই লক্ষ আরব সৈন্য প্রেরণের যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহা কার্যে পরিণত করা হইতেছে।

জেরুজালেমের সংবাদে প্রকাশ, আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া লেবানন সীমান্তের পাঁচ স্থানে ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে।

অমর্ত্য সকাল

শ্রীসৌম্যেন গাঙ্গুলী

ফুটিল রাতের অবসান
মৃত্যুর ইতিহাস শেষ,
বেদনায় ওঠে জয়গান
নূতন আলোকে জাগে দেশ।
ছিঁড়ে গেছে পিছনের টান
সম্মুখে সীমাহীন পথ,
নব-চেতনায়-জাগা প্রাণ
নব উদ্যমে চলে রথ।

জ্যোতিষ্ক শিশু জাগে ওই
খুলে গেছে সুবর্ণ-দ্বার,
ওঠে ধ্বনি, মাভৈঃ মাভৈঃ—
জীবনের তারে ঝংকার।
এলো চির-বাঞ্ছিত দিন
সার্থক হোলো প্রাণ দান;
গাও সবে কুয়াসা-বিহীন
অমর্ত্য সকালের গান।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার স্বাস্থ্য সংবাদ

রক্তদুষ্টি হ'লে দু'দিন আগেই হোক, আর পরেই হোক, স্বাস্থ্য ভংগ হয়। ফলে আপনি দেখতেও রুগ্ন হয়ে পড়েন, আপনার কোন কিছুই ভাল লাগে না, উপভোগ্য কোন জিনিষেও আপনার রুচি থাকে না।

রক্তদুষ্টি ও চর্মরোগ যথাঃ—সাধারণ বাত বেদনা, আড়ষ্ট ও বেদনাদায়ক সন্ধিস্থল, ফোড়া এবং অনুরূপ অসুখ-বিসুখে ভুগতে থাকলে কিছুদিন এই বিখ্যাত ঔষধ সেবন করে দেখুন।

সমস্ত ডীলারের নিকট তরল বা বটিকাকারে পাওয়া যায়। (১)

রবার ষ্ট্যাম্প

যাবতীয় রবার ষ্ট্যাম্প, চাপরাস ও ব্লক ইত্যাদির কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

V. D. Agency, 4 B, Peary Das Lane, Calcutta 6.

অন্যায়ের বিরুদ্ধে তরুণ ডিটেক্টিভের বিদ্রোহের রহস্যঘন রোমাঞ্চ গল্প
'অজন্তা গ্রন্থমালা'র প্রথম বই জ্যোতি সেনের
"বিপ্লবী ...ব." বারো আনা
পূর্ব-ভারতী
১২৬-বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪

নিত্যকার ঝঞ্ঝাটে

চাই

চা

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
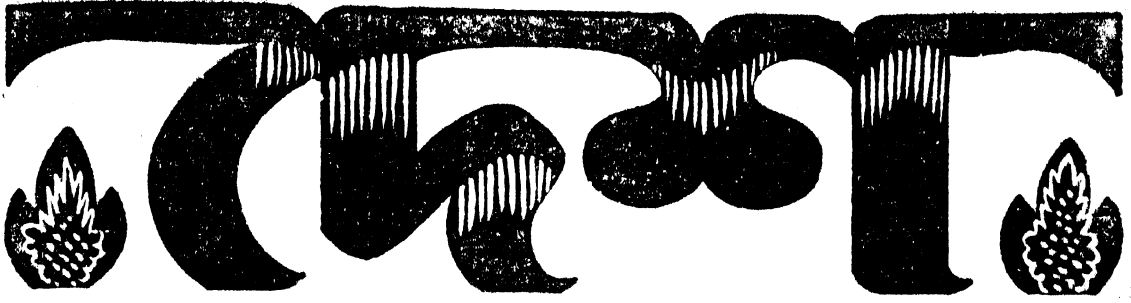
সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ১৪ই কার্তিক, ১৩৫৪ সাল।   Saturday 1st November, 1947.   [৫১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজয়ার অভিবাদন

বাঙালীর সর্বপ্রধান উৎসব দুর্গাপূজার অবসানে আমরা আমাদের পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকবর্গকে আমাদের শ্রদ্ধা-পূর্ণ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। একথা সত্য যে, বিদেশীয় শাসন হইতে আমরা মুক্ত হইলেও বিজয় আমরা এখনও লাভ করিতে পারি নাই। সুতরাং আমাদের বিজয়ার অনুষ্ঠান সর্বাংশে সার্থকতা লাভ করে নাই। পূর্ব পূর্ব বৎসরের বিজয়ার অনুষ্ঠান আমরা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সম্পন্ন করিয়াছি, এবারকার অবস্থা তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র ছিল। একদিকে রাষ্ট্র শাসন-ক্ষমতা যেমন আমাদের আয়ত্ত হইয়াছে এবং জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধারগণের উপর তাহা পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তেমনই অপর দিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ভারতের পুণ্যভূমি খণ্ডিত হইয়াছে। এই পরস্পরবিরোধী অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগকে নূতন পথের সন্ধান করিতে হইবে। সে সাধনা সহজ নয়। এখনও পথের বিপুল বাধা আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের এই সাধনায় যাঁহারা আমাদের মিত্র শুধু তাঁহারাই আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, ইহা নয়। যাঁহাদের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি নাই, বস্তুতঃ যাঁহারা আমাদের শত্রুতা করিয়াছেন, তাঁহারাও পরোক্ষভাবে আদর্শের অভিমুখে নিষ্ঠাবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে সাহায্যই করিয়াছেন। আমরা শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলকে পুনরায় বিজয়ার অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

শুভেচ্ছার তাৎপর্য

পশ্চিম বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্ল-চন্দ্র ঘোষ বিজয়া উপলক্ষে দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া আবেগময়ী ভাষায় বলিয়াছেন, আসুন, আজিকার এই পুণ্য দিনে বাঙলাকে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন করিবার সুমহান্ সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করি। বাঙলার ত্যাগ ও দুঃখ বরণের দুর্জয় শক্তির উপর অবিকল শ্রদ্ধা ন্যস্ত করিয়া প্রধান মন্ত্রী এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাঙলা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অতীতে অমিত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, দুঃসহ দুঃখ বরণ করিয়াছে, ভবিষ্যতেও আপনার অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্কল্প ও সৎসাহসের অভাব তাহার হইবে না। পশ্চিম বাঙলার গবর্নর শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন, "আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের একটা আধ্যাত্মিক খ্যাতি আছে, কিন্তু বর্তমানে তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। তথাপি বাঙলা গৌরবের সঙ্গে এই দিক দিয়া তাহার কর্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছে। ভারতের পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য বাঙলার জাতীয় প্রচেষ্টা চলিতে থাকুক। এই প্রচেষ্টা ও কর্তব্য পালনের গৌরব বাঙলার প্রত্যেক নরনারী অনুভব করুন।" সুখের বিষয় এই যে, পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার উভয় অঞ্চলেরই পূজা ও ঈদ হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের দুইটি প্রধান পর্ব মোটামুটি নির্বিঘ্নেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের দুই একটি স্থানে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার কিছু বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হইলেও গুরুতর কোন অশান্তি ঘটে নাই। কিন্তু স্বদেশ প্রেম এবং সংস্কৃতির উপর উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা এই কথাই বলিব যে, লীগের দুই জাতিতত্ত্ব এবং সাম্প্রদায়িক মতবাদকে চাপা দিতে চেষ্টা করার ফলেই বাঙলার শান্তিরক্ষায় নেতৃবৃন্দের এই উদ্যম সার্থকতা সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু দেখিতেছি, লীগের সর্বাধিনায়ক মিঃ জিন্না তাঁহার চিরন্তন ধারা ধরিয়াই চলিয়াছেন। তিনি তাঁহার অধীন পাকিস্থান রাষ্ট্রে শান্তি ও আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার কথা মুখে বলিলেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্ররোচনা দানের কূটনীতি সমানভাবেই প্রয়োগ করিতেছেন। ঈদ উপলক্ষে তিনি যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহাতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—"আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র শত্রুর আঘাতে জর্জরিত। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় সাহায্য ও সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রস্থ আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ কেবল মুসলমান বলিয়াই অত্যাচারিত হইতেছেন। বর্তমানে আমাদের চতুর্দিকে কৃষ্ণ মেঘ পুঞ্জী-ভূত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আমরা ভয়শূন্য"—ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, মিঃ জিন্না এই ধরণের বিবৃতির দ্বারা একসঙ্গে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়া-ছেন, তিনি জগতের কাছে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হইতেছে। পক্ষান্তরে তাঁহার পাকিস্থানে স্বর্গের শান্তি বিরাজমান। অন্য পক্ষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্ররোচনাও স্পষ্টত ইহাতে রহিয়াছে। মিঃ জিন্নার মারাত্মক নীতি ভারতবর্ষের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে এবং মুসলমান সমাজেরও এই নীতির ফলে কার্যত কোন কল্যাণই সাধিত হয় নাই। হীন স্বার্থগত মোহান্ধতা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ নিতান্ত নিষ্ঠুরতা এবং ক্রূরতার খেলা আরও কতদিন চলিবে, আজ ইহা ভাবিয়াই আমরা শঙ্কিত হইতেছি। মানবতার বৈপ্লবিক বেদনা কত দিনে সমষ্টি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া এই দুষ্ট প্রবৃত্তিকে উৎখাত করিবে আমরা তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

ভবিষ্যৎ কর্তব্য

ভারতের বুকের উপর দিয়া সাম্প্রদায়িক নরঘাতী জিঘাংসার যে পৈশাচিক লীলা জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে মিঃ জিন্না এবং তাঁহার মুসলিম লীগের দুই জাতি-তত্ত্বই তাহার মূলে রহিয়াছে। যে কোন রাষ্ট্র এবং সমাজ বিজ্ঞান-বিদ একথা স্বীকার করিবেন। কিন্তু গায়ের জোরকেই তাহারা বড় বলিয়া বুঝিয়াছে, যুক্তি তাহারা চাহিবে না ইহা স্বাভাবিক, তথাপি সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে না। মানুষের সর্বজনীন মনের সঙ্গে বস্তুতের সঙ্গতি রক্ষা করে বলিয়াই যুক্তির শক্তি পরিশেষে বলবত্তর হইয়া উঠে। মিঃ জিন্নার দুই জাতিতত্ত্বের অসারতা এবং তাহার অনিষ্ট-কারিতা এইভাবেই আজ স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। মানবতার নীতিকে লঙ্ঘন করিয়া মুসলিম লীগ আজ সমগ্র সমাজ জীবনে এমন অসঙ্গতি সৃষ্টি করিয়াছে যে মুসলমান সমাজ তৎপ্রতি অবহিত না হইয়া পারিতেছেন না। ইরানে ভারতের ভাবী রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আলী জাহীর সত্যই বলিয়াছেন, মিঃ জিন্নার অনুসৃত নীতি যে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত মুসলমান সম্প্রদায়কে নূতন নেতা ও নূতন কর্মপন্থা বাছিয়া লইতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। গত ২৩শে অক্টোবর করাচীতে সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে মিঃ জিন্না বলেন, "ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান ও তাহাদের নেতৃবৃন্দকে আমি পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছি যে, তাহাদের নিজেদের নির্বাচিত নেতার অধীনে তাহাদিগকে নূতনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য ও জীবন, সর্বোপরি তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাহাদিগকে অনেক কিছু করিতে হইবে।" ইহার সোজা অর্থ এই যে, মুসলিম লীগের সর্বাধিনায়ক এখন ভারতের মুসলমানদিগকে নিজের পথ দেখিয়া লইতে বলিয়াছেন। মিঃ জিন্না নিজের নীতি ছাড়িবেন না। মুসলিম লীগের নীতির সংস্কার সাধন করিয়া তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের মুসল-মানদের স্বার্থরক্ষার পথে চলিবার সঙ্গতি বা সুবিধা দান করিবার ইচ্ছা মিঃ জিন্নার নাই। এরূপ ক্ষেত্রে মানব-সংস্কৃতির মর্যাদা বোধ যাহাদের আছে এবং মধ্যযুগীয় বর্বর আরণ্য জীবনের নৈতিক অধঃপতন হইতে যাঁহারা দেশকে এবং সমাজকে উদ্ধার করিতে চাহেন, মুসলিম লীগের সম্পর্ক বর্জন ব্যতীত তাঁহাদের পক্ষে অন্য উপায় থাকে না বলিয়াই আমরা মনে করি। বাঙলার মুসলমান সমাজ, বিশেষভাবে প্রগতিপন্থী তরুণ দল এ সত্য আন্তরিক উপলব্ধি করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। এই দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ আত্মঘাতী উন্মাদনা আর বঞ্চনা করিতে পারিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

একটি প্রহেলিকা

২৫শে অক্টোবরের তারিখের 'হরিজন' পত্রে একটি প্রহেলিকা এই শিরোনামে মহাত্মা গান্ধীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে গান্ধীজী লিখিয়াছেন, "আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই ভাগ ধর্মের ভিত্তিতে হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু সেগুলির ফলে বিভাগ হয়ত সম্ভব হইত না। আজ সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষই বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম-বিরোধী শক্তি আজ ধর্মের ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা না থাকিলে ভাল হইত, একথা শুনিতে খুব ভাল শোনায়; কিন্তু যাহা সত্য তাহার খণ্ডন কি সম্ভব হইতে পারে ইহাই বিবেচ্য।" ভারতের বর্তমান অশান্তির মূলে অর্থনৈতিক কারণ অনেকখানি জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে, একথা আমরাও অস্বীকার করি না; কিন্তু অর্থনৈতিক কারণ সমাজ চেতনা বিলুপ্ত করিয়া বর্বরতার পঙ্কে দেশ ও জাতিকে এমনভাবে নিমগ্ন করিতে পারিত না; এবং তাহার ফলে এমন নৈতিক অধঃপতন আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের সর্বত্র দেখা দিত না। বস্তুত মুসলিম লীগের নীতিই প্রত্যক্ষভাবে এই দুর্গতির মূলে রহিয়াছে। সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মমূলক কতকগুলি কুসংস্কার প্ররোচিত করিয়া তুলিয়া সে নীতি পাশবিক তাণ্ডবে মনুষ্যত্বকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। মিঃ জিন্না এই সোজা সত্য চোখ বুজিয়া অস্বীকার করিতে চাহেন। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও দেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং উপদ্রব কেন দূর হয় নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কিছুদিন পূর্বে এই কথা বলিয়াছেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে যে সব অশান্তি ঘটিতেছে সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বলা চলে না। তাঁহার মতে অন্য কোন কারণে নয়, শুধু হিন্দু বলিয়াই মুসলমান যে হিন্দুর বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হইতেছে কিংবা হিন্দু মুসলমানকে শত্রুর মত দেখিতেছে, কতকগুলি লোকের চক্রান্তেরই তাহা ফল। কঠোর বস্তুবিচারী মিঃ জিন্নার মতে কতকগুলি লোক নবজাত পাকিস্থানকে পঙ্গু করিবার জন্য সুপরিকল্পিত এবং সুসংহত কর্মপন্থা লইয়া এই সব উপদ্রব সৃষ্টি করিতেছে। আমরা মিঃ জিন্নার এমন যুক্তি স্বীকার করি না। কতক-গুলি লোকের চক্রান্তে সমাজের নৈতিক বোধ এইরূপভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এ বিশ্বাস আমাদের হয় না। পক্ষান্তরে আমরা এই কথাই বলিব যে, মুসলিম লীগ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া যে সাম্প্রদায়িক অন্ধ উন্মাদনাকে প্ররোচনা দিয়াছে, এই সব উপদ্রব তাহারই ফল। যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই অন্ধ বিদ্বেষ-বুদ্ধি সঞ্চারিত হইয়াছে রাষ্ট্রগত দায়িত্ববোধ তাহাদের নাই। রাষ্ট্রগত দায়িত্বের পথে স্বদেশপ্রেম তাহাদের অন্তরে জাগে নাই। তাহারা নিজের রাষ্ট্রের অপর সম্প্রদায়ের নরনারীকে বিদ্বেষ এবং ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখিতেছে। ধর্মগত কুসংস্কার মানুষকে এমনই অমানুষ করিয়া তোলে; মানুষ তাহার ফলে ন্যায়, অন্যায়, সত্য ও মিথ্যার বিচার ভুলিয়া যায় এবং সমাজ-জীবনের চূড়ান্ত অধঃপতন ঘটে। ইতিহাসে এ সত্য বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। গান্ধীজীর অভিমত এই যে, এই সব বিপর্যয়ের মধ্যেও সত্যের জয়ে একদল লোকের বিশ্বাস অটল থাকিবে। গান্ধীজীর ন্যায় আমরাও আশা-শীল। আমাদের গর্ব এই যে, অতীতে বাঙলাদেশ ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার পথে সমগ্র ভারতের অগ্রণী হইয়াছে; এবং এই পুণ্য-ভূমির সন্তানগণ অকাতরে মৃত্যুকে বরণ করিয়া বৃহদাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাঙলার জলবায়ুর মধ্যে এই সব অনর্থকর উপদ্রব সত্ত্বেও তেমন বীর্য ও বলের সম্ভাব্যতা রহিয়াছে এবং অচিরেই প্রাণপূর্ণ কর্মসাধনার পথে সকল দিক হইতে তাহা সত্য হইয়া উঠিবে। দুষ্প্রবৃত্তির সাময়িক বিপর্যয়, এবং তাহার মূঢ়তাময় প্ররোচনা বাঙলার আত্মাকে দীর্ঘ দিন অভিভূত রাখিতে পারিবে না। পাশবিক দৌরাত্ম্যে উপদ্রুত ভারতবর্ষে বাঙলার সন্তান-দের অবদান ইহার মধ্যেই অনেকখানি আশার আলোক সঞ্চার করিয়াছে।

কাশ্মীর

কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে এবং কাশ্মীরের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সেখানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে সেনাদল প্রেরিত হইয়াছে। কাশ্মীর মুসলমান-প্রধান রাজ্য; সুতরাং কাশ্মীরের ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান কতিপয় রাজার পক্ষে বিস্ময়কর মনে হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। পক্ষান্তরে কাশ্মীরের প্রজাসাধারণ যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেই যোগদানে ইচ্ছুক, এ পরিচয় স্পষ্টই পাওয়া গিয়াছিল। কাশ্মীরের মুসলমান সম্প্রদায় মিঃ জিন্নার দুই জাতীয়ত্বের নীতির অনুরাগী নহেন। তাঁহারা সেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন এবং নিজেদের শক্তি সুগঠিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, কাশ্মীরের শাসননীতির উপর তাঁহাদের সেই জন-আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গত কয়েক মাসের ইতিহাসই সে পক্ষে প্রচুর প্রমাণ জোগাইবে। পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট কাশ্মীরের এই জাগ্রত জনশক্তিকে

দুর্বল করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তাঁহারা চেষ্টাতে কোন ত্রুটি রাখেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কাশ্মীরের আশেপাশে ঘোর সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং নরঘাতী দৌরাত্ম্যের মধ্যেও কাশ্মীরে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। মুসলিম লীগের কূটনীতিকগণ কাশ্মীরে তাহাদের চেষ্টাকে অতঃপর সফল করিবার জন্য নীতি অবলম্বন করেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের পাকিস্থান অঞ্চল হইতে দলে দলে লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কাশ্মীরে হানা দিতে থাকে। ইহার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে উপজাতীয় দল কাশ্মীরের উপর চড়াও করে। রাজধানী শ্রীনগর পর্যন্ত ইহাদের আক্রমণের ফলে বিপন্ন হয়। কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের নিকট এই সব কার্যের প্রতীকার প্রার্থনা করিলে তাঁহারা কাশ্মীরের উপরই যত দোষ চাপাইতে থাকেন। পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল হিসাবে মিঃ জিন্না এই অভিযোগ করেন যে, কাশ্মীরের শাসকগণ সেখ আবদুল্লা পরিচালিত জাতীয় সম্মেলনকে অনেক সুবিধা দিতেছেন; কিন্তু মুসলিম লীগের পরিচালিত মুসলিম কনফারেন্সকে কোনই সুবিধা দিতেছেন না। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এই সব ব্যাপারের বিবেচনার ভার সেখানকার জনসাধারণের উপর রহিয়াছে, মিঃ জিন্নার সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার সংগত অধিকার নাই। কিন্তু কাশ্মীরের শান্তি বা নিরাপত্তা বা তথাকার জনসাধারণের অধিকার মিঃ জিন্নার কাম্য নয়। পাকিস্থানের সর্বাধিনায়কত্বের মহিমা উপভোগ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। দেশীয় রাজ্যের জনমতের মূল্য যদি তাঁহার নিকট কোনরূপে থাকিত, তবে জুনাগড় লইয়া তিনি এবং তাঁহার অনুগতগণ এমন খেলা খেলিতেন না। হায়দরাবাদের সমস্যাও অনেকদিন আগেই মিটিয়া যাইত। কারণ ঐ দুইটি রাষ্ট্রই হিন্দুপ্রধান এবং অধিবাসীরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পক্ষপাতী। এরূপ ক্ষেত্রে কাশ্মীরের পক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করে না। তথাকার রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে হিন্দু বা মুসলমানের কোন প্রশ্ন বিজড়িত নয়। কংগ্রেস বহুদিন হইতে দেশীয় রাজ্যে জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। এখনও কংগ্রেস পরিচালিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সেই নীতির মর্যাদা রক্ষা করিয়াই চলিতেছেন। বস্তুত কাশ্মীরের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে তথাকার জনমতের মর্যাদাই রক্ষিত হইয়াছে। সেখানকার গভর্নমেণ্ট প্রজানায়ক সেখ আবদুল্লার সহযোগিতা আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহযোগিতায় কাশ্মীরের এই উপদ্রব ও অশান্তি সত্বরই প্রশমিত হইবে। অত্যাচার ও উৎপীড়নের দ্বারা বিভীষিকা বিস্তারে যে দুষ্প্রবৃত্তি ভারতবর্ষে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া বিভিন্ন অঞ্চলে বন্য বর্বরতা জাগাইয়া সমগ্র দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে, কাশ্মীরের এই ব্যাপার হইতে আমাদিগকে তৎপ্রতিকারে সতর্ক হইতে হইবে। আমাদিগকে আজ এই সত্য সুনিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, দুই জাতিবাদের মহিমা কীর্তনে আমরা যথেষ্ট বিড়ম্বিত হইয়াছি। আমরা হিন্দু ও মুসলমান এখন এক হইয়া থাকিতে চাই। মুষ্টিমেয় লোককে রাষ্ট্রনীতিক প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব ভোগে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমাদের ঘর-সংসারে আগুন দেওয়ার কোন সার্থকতাই আমাদের বাস্তব জীবনে নাই। সুতরাং আমরা সে ফাঁদে আর পা দিতেছি না।

চট্টগ্রামের দুর্দৈব

বন্যার ফলে চট্টগ্রামের বিপুল অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের পল্লীবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার এখনও প্রতিকার সাধিত হয় নাই। তাহাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই, এমন কি মাথা গুঁজিবার স্থান পর্যন্ত নাই। সরকারপক্ষ হইতে সাহায্য-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হইতেছে না। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও উপযুক্ত সরকারী সহযোগিতার সুবিধা না পাইয়া সুষ্ঠুভাবে কার্য-পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতেছে না। এইরূপ বিপন্ন অবস্থার মধ্যে সেদিন চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলের উপর দিয়া প্রলয়ংকর ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। বন্যার ফলে চট্টগ্রামের তিন-চতুর্থাংশ ঘরবাড়ি বিনষ্ট হইয়াছিল, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, গরীবের তাহাও থাকিল না। এই ঝড়ে চট্টগ্রামের ৩ শত বর্গমাইল স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা চট্টগ্রামের বিপন্ন নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্য দেশবাসীকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। বন্যাপীড়িত চট্টগ্রামের সেবাকার্যে যে সব সেবা প্রতিষ্ঠান প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উপযুক্ত অর্থ সাহায্য লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহারা আশানুরূপ কাজ করিতে পারিতেছেন না। অবিলম্বে এই অভিযোগের কারণ দূর করিতে হইবে। পূর্ব এবং পশ্চিম—উভয় বঙ্গের অধিবাসীরা আজ একত্র হইয়া চট্টগ্রামের আর্ত নরনারীর রক্ষা কার্যে প্রবৃত্ত হউন। রাজনীতিক ব্যবচ্ছেদ সত্ত্বেও সংস্কৃতি এবং মানবতার দিক হইতে বাঙালী আজও একই আছে এবং বিপদে আপদে তাঁহারা এক হইয়াই পরস্পরকে সাহায্য করিবে।

এসিয়ার গণ-জাগরণ

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে গণপরিষদ ভব[ন] এসিয়া আঞ্চলিক শ্রমিক সম্মেলনের অধিবে[শন] সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষ পাকিস্থান, ব্র[হ্ম]দেশ, সিংহল, মালয়, শ্যাম, চীন ও নে[পাল] হইতে বহু প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ[দান] করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠা[নের] ভারত মহাসাগর অঞ্চলের সদস্যরূপে অস্ট্রে[লিয়া] ও নিউজিল্যাণ্ড এবং এসিয়ার শাসক শক্তির[ূপে] বৃটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডও এই সম্মেলনে যো[গ]দান করে। বলা বাহুল্য, পরাধীন ভার[তে] সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ-নীতিরই প্রাধান্য অ[ক্ষুণ্ণ] ছিল। শাসন ও শোষণ-নীতির সে প্রতিবে[শের] মধ্যে শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের কোন প্রচেষ্[টায়] গভর্নমেণ্টের আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয় না[।] বর্তমানে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে[;] এখন শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন হই[তে] বাধ্য। এই পরিবর্তন শুধু ভারতেই পরিলক্ষি[ত] হইবে না। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীন[তা] লাভে সমগ্র এসিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের ব[নিয়াদ] নড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সাধারণভা[বে] ভারতের এই রাষ্ট্রনীতিক অবস্থার পরিবৃত্ত[ি] অখণ্ড এসিয়ার অর্থনীতিতে একটা বিপ[্লবাত্মক] পরিবর্তনের ধারা অল্পদিনের মধ্যেই প্রব[র্তিত হইতে] পাইবে। ভারতের স্বাধীনতা বৃটিশ সাম্রা[জ্য]বাদীদিগকে এইজন্যই সর্বাপেক্ষা বিচলি[ত] করিয়া তুলিয়াছে এবং এইজন্যই ভারতবর্ষে[র] বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এ[বং] উপদ্রবের জন্য মিঃ চার্চিলকে আমরা কুম্ভীরা[শ্রু] বর্ষণ করিতে দেখিতেছি। নতুবা তিনি ভা[ল]ভাবেই জানেন যে, ভারতের বর্তমান এই উপ[দ্রব] এবং অশান্তির জন্য তাঁহারাই দায়ী। তাঁহারা ভারতবর্ষে শোষণ কার্য নির্বিঘ্নে নিষ্প[ন্ন] করিবার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে ভারত শাস[ন] নীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাম্প্রদায়িকতার মারাত্ম[ক] বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভারতে[র] নানাস্থানে বর্বরতা বর্তমান পৈশাচিক এ[ই] বীভৎস বিক্ষোভ তাঁহাদেরই সৃষ্ট। এ ব্যাপারে গুরু তাঁহারাই। তাঁহাদের সে পাপ-ব্যবসা ব[ন্ধ] হইতে বসিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা উদ্বেগ[গ্রস্ত] হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু এসিয়[ায়] তাঁহাদের শোষণ নীতির কারসাজী আর চলি[বে] না। সকল দিক হইতে এসিয়া আজ সচে[তন] হইয়া উঠিতেছে। কয়েকমাস পূর্বে নয়া[]দিল্লীতে এসিয়া সম্মেলনে সংস্কৃতিক দি[ক] হইতে সে সংহতিবোধের পরিচয় পাও[য়া] গিয়াছিল। এসিয়া আঞ্চলিক শ্রমিক সম্মেলনে[র] অধিবেশনের ফলে সে সংহতি দৃঢ়তর হই[ল] এবং সমগ্র এসিয়ার গণশক্তি জগতে আসুরি[ক] শোষণ-পিপাসা-বিনির্মুক্ত এবং পশুত্বের পো[ষক] প্রবৃত্তি-রহিত এক অভিনব উদার সংস্কৃতি[ও] সভ্যতার উদ্বোধন করিবে।

দুর্গা পূজা শেষ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় এবার পূজায় লোকের বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ দেখা গিয়াছিল। যুদ্ধের সময় আলোক-নিয়ন্ত্রণ ও তজ্জনিত অনিশ্চয়তার আশঙ্কা এবং গত বৎসরের আতঙ্ক তাহার পরে এ বৎসর সেই উৎসাহ ও আনন্দ যে স্বাভাবিক তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু উৎসাহ ও আনন্দ যে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের বিষয় বিবেচনায় ম্লান হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গে এই আনন্দের মধ্যে বিজয়গর্বও হয়ত ছিল; কেননা গত বৎসরও হিন্দু জগজ্জননীর নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "সংগ্রামে বিজয়ং দেহি" —তাহা পশ্চিমবঙ্গে নিরর্থক হয় নাই। দেখা গিয়াছে, যে সম্প্রদায়ের ভয়ে গত বৎসর হিন্দুকে সসঙ্কোচে পূজা করিতে হইয়াছিল, সেই সম্প্রদায় এবার বোধ হয় আত্মরক্ষার ও স্বার্থরক্ষার সহজাত সংস্কারবশে, হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে বাধা না দিয়া—কোন কোন স্থানে পূজার শান্তি রক্ষার কার্যে যোগ দিয়াছিলেন এবং দেখা গিয়াছে, তাহাতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয় নাই—ইসলামের মর্যাদাহানি হইয়াছে বলিয়া তারস্বরে চীৎকার উঠে নাই।

পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ পাকিস্থান বঙ্গে নানাস্থান হইতে প্রতিমা ভঙ্গের সংবাদ যে পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে। যে প্রদেশে বিদেশী গভর্নর ও মুসলমান প্রধান মন্ত্রী—রাজধানী ঢাকায় হিন্দুর জন্মাষ্টমীর মিছিলের ছাড় দিয়াও মিছিল পরিচালিত করিতে নিবার যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই, তথায় যে হিন্দুকে শঙ্কিত ও কম্পিতভাবেই বাস করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল বলপূর্বক বন্ধ করিবার সময় কতকগুলি মুসলমান স্পষ্টই বলিয়াছিল, পূর্বে যাহাই কেন হইয়া থাকুক না, পাকিস্থানে হিন্দুর ঐ শোভাযাত্রা হইতে পারিবে না। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে ঢাকা জিলা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সভা পূর্ব পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলোচনার ফলে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন—

হিন্দুরা যেন "দেশে শান্তিরক্ষার জন্য" পূজার সময়—যে সকল স্থানে মুসলমানের মসজেদের নিকটে পূজা হইবে সে সকল স্থানে নামাজের সময়ে বাদ্যে বিরত থাকেন।

হিন্দুরা যে বাধ্য হইয়া এই ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ, আমাদিগের মনে আছে ২০ বৎসর পূর্বে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হিন্দুরা এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তখন মিস্টার কিলবার্ট নামক একজন ইংরেজ ঢাকার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি দুর্গা পূজার প্রাক্কালে কতকগুলি হিন্দু গৃহে গিয়াছিলেন—সেগুলি মসজেদ হইতে ৫০ গজের মধ্যে অবস্থিত এবং সেই সকল গৃহে পূজা হইবে স্থির ছিল। মিস্টার কিলবার্ট গৃহস্বামীদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে পূজায় বাদ্যে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু লিখিত নির্দেশ দিতে বলিলে তিনি তাহা করেন না। সেই সংবাদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রেরণ করিলে কলিকাতার কোন সংবাদপত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—যে সকল হিন্দু আপনাদিগের গৃহে পূজা করিতেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে তাহাদিগকে এইরূপ "অনুরোধ" করা কি সমর্থন করা যায়?

"An Englishman's home may be his castle, but cannot a Hindu have even the right to perform his Puja at home in his own way without being hampered by magisterial request?"

সেদিন হিন্দুরা যে নির্দেশে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, আজ যে ঢাকায় হিন্দুরা সেই ব্যবস্থা আপনারা গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে কি প্রতিপন্ন হয়?

হিন্দুর সর্বপ্রধান ধর্মোৎসবে—দুর্গা পূজায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সম্বন্ধে হিন্দুর অভিযোগে দুর্গন্ধ হইয়াছি। সে অভিযোগ—তাঁহারা হিন্দুদিগকে পূজার জন্য আবশ্যক চাউল, শর্করা ও বস্ত্র দিতে বিমুখ হইয়াছেন। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল অতি দুঃসময়ে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন—হয়ত তাহাই এইরূপ অ-ব্যবস্থার কারণ। আমরা আশা করি আগামী বৎসরেও যদি "নিয়ন্ত্রণ" রক্ষিত হয়, তবে আর এরূপ অব্যবস্থা হইবে না।

এই সঙ্গে বস্ত্রের ব্যবস্থার উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন মনে করি। দুর্গা পূজার কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থায় বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী যে বাঙালী ও অবাঙালী ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের মতের বিরোধী কি না, তাহা বিবেচ্য। পূর্বের দুই বৎসর যাঁহারা বস্ত্র বণ্টন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারা সে কাজে কোনরূপ লাভবান হইতে চাহেন নাই। এবার যাঁহাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে কি শতকরা ২০ টাকা লাভ করিতে দেওয়া হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে কি তাহা দরিদ্র ক্রেতাদিগকেই দিতে হয় নাই? আমরা বাঙালীর উন্নতি চাহি। কিন্তু বর্তমান সময়ে যদি বাঙালী অ-বাঙালীতে প্রভেদ কংগ্রেসী সরকার প্রবল করেন, তবে বিহারে, উড়িষ্যায় ও আসামে বাঙালীদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ আমরা কিরূপে করিব এবং প্রতীকারের দাবীও কি প্রকারে করিতে পারিব?

বস্ত্র বিষয়ে হিন্দুদিগের আর এক অভিযোগ আছে। হিন্দু বিধবারা পাড়ওয়ালা কাপড় ব্যবহার করেন না। মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ সে বিষয় বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যদি মুসলিম লীগের পদাঙ্কানুসরণ করেন, তবে তাহা কি একান্তই দুঃখের বিষয় হইবে না?

এবার পূজার জন্যও অনেকে শাড়ী ক্রয় করিতে পারেন নাই। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, সুব্যবস্থা করিয়া কাপড় সরবরাহ করা হয় নাই। ইহার জন্য কে বা কাহারা দয়ী? অথচ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, পাঞ্জাব বরাদ্দ কাপড় লইতে না পারায় বাঙলায় কাপড়ের অভাব হইবার কথা নহে।

ইহার পরে চিনির কথা। চিনির অভাবে পূজার সময় সমগ্র হাওড়ায় মিষ্টান্নের দোকান বন্ধ ছিল। হাওড়া মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদিগের পক্ষ হইতে শ্রীদুলালচন্দ্র ঘোষ যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে গৌরব-জনক নহে। তাহার এক স্থানে আছে:—

"খাদ্য সচিব মাননীয় ভাণ্ডারী মহাশয়ের নিকট যাইয়া আমাদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাত করিলাম। তিনি চারিদিন পরে যাইতে বলিলেন। অনেক পরে যাইয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিলে তিনি ডাইরেক্টরের নিকট যাইতে বলিলেন। ডাইরেক্টর ডেপুটি ডাইরেক্টর মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন এবং তিনি রেশন কণ্ট্রোলারের নিকট পাঠাইলেন। রেশন কণ্ট্রোলার মহাশয় মহাপূজার জন্য আটা ও কিছু চিনি দিবার জন্য আমাদের সংগত দাবী তাঁহার উপরওয়ালা আই সি এস ডাইরেক্টার বাহাদুরকে জানাইলেন। ডাইরেক্টর মহাশয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিলেন।"

যদি এই অভিযোগ সত্য হয়, তবে যে অযোগ্যতায় এই ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে, তাহার জন্য দায়ী কে?

ঐ বিবৃতির শেষভাগে দেখা যায়:—

"সুগার সিণ্ডিকেট জানাইতেছেন, প্রায় ষাট হাজার বস্তা চিনি গুদামে মজুদ; উপরন্তু ত্রিশ হাজার বস্তার রেলওয়ে রসিদ আসিয়া পড়িয়াছে এবং বহু বস্তা বসিয়া নষ্ট হইতেছে। মাননীয় সরবরাহ সচিব ও তাঁহার আই সি এস ডাইরেক্টর বাহাদুর এই ক্ষতির জন্য কোন কৈফিয়ৎ দাখিল করিবেন কি?

হাওড়ার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা লিখিয়াছেন—

চিনি, আটা ও কয়লা কালো বাজারে কিনিতে কিনিতে মিষ্টান্নের দরও অগ্নিমূল্য হইয়াছে।" যে সময় চিনি ও আটার অভাবে হাওড়ায় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই সময়ে যে গঙ্গার পূর্ব পারে কলিকাতায় ১২ টাকা হইতে ১৭ টাকা সের দিলে মিষ্টান্নের কোন অভাবই দেখা যায় নাই, তাহাতে মনে হয় চোরাবাজারে চিনির অভাব হয় নাই। কে কোথা হইতে, কিরূপে চোরাবাজারে চিনি দিতেছে?

চোরাবাজারে কয়লার অভাব হয় না। যদি এই অনুমান সত্য হয় যে, ধাতব দ্রব্যের কারখানা হইতে সেই কয়লা সরবরাহ হয়, তবে কেন তাহা ধরা পড়িতেছে না? কোন কারখানা মাসে কত লোহা (পিগ আয়রণ) ক্রয় করে এবং সেই লোহা গলাইতে কত কয়লার প্রয়োজন হয়, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলেই কোন কারখানা প্রয়োজনাতিরিক্ত কয়লা পাইতেছে, তাহা অতি সহজে ধরা যায়। ... যে হইতেছে না, সে রহস্য কে ভেদ করিবে?

ব্যবস্থার অভাব আমরা চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছি বলিয়াই মন্ত্রিমণ্ডলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি।

কয়দিন পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল:—

(১) প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং যাইয়া কলিকাতার কোন ময়দার কল হইতে বহু পরিমাণ পাথরের গুঁড়া উদ্ধার করিয়াছেন এবং কলের পরিচালককে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

(২) বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী একটি গুদামে যাইয়া ধরিয়াছেন—ভাল চাউল খাদ্যের জন্য অব্যবহার্য বলিয়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয়ের আয়োজন চলিতেছিল। অপরাধী-দিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কিন্তু তাহার পরে সেই সকল ঘটনার শেষ জানা যায় নাই। আমরা আশা করি, কলে যে পাথরের গুঁড়া ধরা পড়িয়াছিল, তাহা কল হইতে যখন পরীক্ষা স্থানে নীত হইয়াছে তখন অন্য কোন দ্রব্যে পরিণত হয় নাই। যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে কি যে সকল লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহারা ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবে? এই সকল বিষয়ে প্রথম সংবাদ যেরূপ বিশদভাবে প্রকাশিত হয়, পরে—সেরূপ হয় না কেন?

তেঁতুল বীজের সারাংশ কি শেষে কাপড়ের সঙ্গে মাড় হিসাবে ব্যবহারের জন্য নীত বলিয়া বিবেচিত হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে সমস্ত ব্যাপার বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার মত হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিবে না?

যদি সর্বাঙ্গে ক্ষত হয় তবে ঔষধ লেপ কোথায় হইবে এবং যদি সরকারের কর্মচারীরাও সাধু না হয়েন, তবে ত জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে—"শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধিব তাগা!"

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অতি দুঃসময়ে বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে কার্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দেশের লোক তাঁহাদিগকে সহযোগ দান করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সে সহযোগ কি গৃহীত হইতেছে? মন্ত্রীরা কার্যে অনভিজ্ঞ এবং তাঁহাদিগের বিষম বিপদ এই যে—রৌলণ্ড কমিটির কথা অতি সত্য, কয় বৎসর যে ব্যবস্থা চলিয়াছে, তাহাতে লোকের যেমন সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যেও তেমনি দুর্নীতি প্রবল হইয়াছে। সে অবস্থায় জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ না করিলে তাঁহাদিগের পক্ষে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। প্রত্যেক মন্ত্রী যদি বে-সরকারী উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ পরিষদ গঠিত করেন, তবে তাঁহারা উপকৃত হইতে পারেন। তাঁহারা কেহ কেহ এক-একটি জিলায় বা মহকুমায় কংগ্রেসের কাজে যশ অর্জন করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু যে সকল সমস্যা সমগ্র প্রদেশের এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার অংশ, সে সকল সম্বন্ধে তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব অবশ্যই তাঁহারা অস্বীকার করিবেন না। সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য বাহিরের সাহায্য প্রয়োজন। তাঁহারা যদি কোনরূপ সমালোচনা সহ্য করিতে অক্ষম হন, তবে তাঁহারা কখনই প্রকৃত কাজ করিতে পারিবেন না।

স্বাস্থ্য বিভাগের কথা ধরা যাউক। পশ্চিম-বঙ্গের নানাস্থানে স্বাস্থ্যের সমস্যা নানারূপ। সে সকল অবগত হইবার জন্য ও অবগত হইয়া আবশ্যক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য স্থানীয় লোকের পরামর্শ প্রয়োজন। দপ্তর-খানায় বসিয়া মামুলি রিপোর্টে নির্ভর করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনাই প্রবল থাকিবে। কিন্তু যিনি পশ্চিম বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী, তাঁহাকে কি সেই-জন্য পরামর্শ সমিতি গঠন করিতে দেওয়া হইয়াছে?

সেচের ব্যবস্থাও সেইরূপ। কলিকাতার নিকটে যে সকল স্থান সামান্য অতিবৃষ্টিতে ডুবিয়া যাওয়ায় শস্যহানি ঘটে, সে সকল স্থানের জল নিকাশের ব্যবস্থা অল্প ব্যয়ে হইতে পারে। সেজন্য ব্যাপক ও বহু ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনার প্রয়োজন নাই। বর্তমান বৎসরের অভিজ্ঞতায় সে সমস্যার গুরুত্ব মন্ত্রীর বুঝিতে পারিবার কথা।

শিক্ষার কোন ব্যাপক পরিকল্পনা হয় নাই। যাহাকে "বেসিক শিক্ষা" বলে, তাহা যে গান্ধীজীর সমর্থন লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, গান্ধীজীও শিক্ষাবিষয়ে আপনাকে বিশেষজ্ঞ বলিয়া মনে করেন না। কাজেই সেই শিক্ষাই এদেশের উপযোগী অবিচারিতচিত্তে তাহা মনে করা ভুল হইবে। বাঙলায় বহুকাল হইতে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহার ভিত্তির উপরেই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি গঠিত করা সঙ্গত ও প্রয়োজন। সম্প্রতি পরিভাষা রচনার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে, এ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন—গত ৯০ বৎসরকাল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অপূর্বকুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দুর্গাদাস কর, জহিরুদ্দীন আমেদ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রয়োজনে যে সকল পরিভাষা রচনা করিয়াছেন, সে সকলের সন্ধান রাখেন? 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রে পরিভাষার আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং সেই সকল আলোচনায় অনেক পরিভাষার সন্ধান পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১২৯৩ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'তে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বঙ্গভাষা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা" প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। তাহাতে তিনি ইংরেজী 'কনসেন্স' ও 'এভলিউশন' শব্দদ্বয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"কতিপয় বঙ্গীয় লেখক 'কনসেন্স' শব্দের অনুবাদ স্থলে বিবেক শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিবেক শব্দটি নিতান্তই দার্শনিক শব্দ। তাহার অর্থ—আত্মাকে অনাত্মা হইতে—জ্ঞানকে অবিদ্যা হইতে—পুরুষকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখা।" অর্থাৎ বিবেক—ইংরেজী 'কনসেন্সের' পরিভাষা হইতে পারে না। আবার—"অনেকে 'এভলিউশন' শব্দের অনুবাদ করিয়া থাকেন—'বিবর্তবাদ'। বিবর্ত বেদান্ত দর্শনের একটি তান্ত্রিক শব্দ। রজ্জুতে সর্পভ্রমের যে কারণ, তাহাই 'বিবর্ত-কারণ'। অজ্ঞান, যাহা দর্শকের মনের ধর্ম, তাহার প্রভাবে দৃশ্য বস্তু সকল দর্শকের চক্ষে যেরূপ—এক প্রকার হইয়া অন্য প্রকার দেখায়, তাহারই নাম বিবর্তন।" তাঁহার সিদ্ধান্ত—

(১) 'কনসেন্স' শব্দ যেস্থলে মনোবৃত্তি-রূপে ব্যবহৃত হয়, সেস্থলে ধর্ম-বুদ্ধিই তাহার প্রকৃত অনুবাদ; আর যেস্থলে তাহা সেই বৃত্তির উদ্ভাসরূপে ব্যবহৃত হয়, সেস্থলে ধর্মবোধ বা ধর্মজ্ঞান তাহার প্রকৃত অনুবাদ।"

(২) "'থিওরি অব এভলিউশন' এই মতটিকে অভিব্যক্তিবাদ বলাই সর্বাংশে যুক্তিসংগত।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই আলোচনা ৬০ বৎসর পূর্বে "ভারতী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ যাঁহারা পরিভাষা রচনার ভার পাইয়া-ছেন, তাঁহারা যেন পরিভাষা সঙ্কলনে পূর্ববর্তীদিগের চেষ্টার সন্ধান করেন।

শিল্প দ্বিবিধ—বৃহৎ ও উটজ। উটজ শিল্পের পরিচয় কলিন, কানিংহাম, জ্ঞানেন্দ্র-

নাথ গুপ্ত, সোয়ান প্রভৃতির রিপোর্টে এবং বার্ডউড ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির পুস্তকে পাওয়া যায়। কিরূপে সে সকলের উন্নতি সাধিত হয়, তাহা স্থির করিতে হইবে। এক এক স্থানে কেন এক এক শিল্পের কেন্দ্র হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া লোকের শিল্প-নৈপুণ্যের সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

এই সকল কারণে আমরা পূর্বাবধি বলিয়া আসিয়াছি, রুশিয়া নবজীবনে সঞ্জীবিত হইবার পরেই যেমন লেনিন রুশিয়ার প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞদিগকে দেশের সর্বাংগীন উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পশ্চিম বঙ্গের সরকারকে তেমনই করিতে হইবে।

গত পূজার সময়ে পশ্চিম বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—

"আজ অধিকাংশ বাঙালীই উপযুক্ত আহার পায় না, তাহাদিগের অধিকাংশই শিক্ষায় বঞ্চিত, তাহাদিগের অধিকাংশের জন্যই চিকিৎসা-ব্যবস্থা নাই। আমরা যদি এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন করিতে না পারি, তবে আমাদিগের ঐক্যের (?) স্বপ্ন সফল হইতে অনেক বিলম্ব হইবে। কাজেই আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া বাঙলাকে সুখী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিব।"

কিন্তু তিনি যে ঐক্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ঐক্যই হউক আর সাম্প্রদায়িক ঐক্যই হউক, তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সরকারী দপ্তর-খানায় শত বৎসরের ভ্রান্ত মতে নিষ্ঠাবান আই সি এস কর্মচারীদিগের দ্বারা হইতে পারে না।

আমরা দেখিতেছি, এখনও কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচিত হয় নাই; তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য দেশের লোককে আহ্বান করাও হয় নাই। দেশের লোকের সহযোগ, সমালোচনা ও সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত সে কাজ হইতে পারে না।

বাঙলায় কৃষিজ ও শিল্পজ উৎপাদন বর্ধিত না করিলে কখনই আয়ে ব্যয় সংকুলান হইবে না—যশোদার দড়ীর দুই মুখ মিলিত হইতে পারে না।

সে জন্য আর এক বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন। প্রদেশে শান্তি ও লোকের নির্বিঘ্নতা। যে প্রায় এক কোটি ২৫ লক্ষ বাঙালী হিন্দু পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ অপাংক্তেয়রূপে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে বাঙালী জাতির সর্বাংগীন উন্নতির পথ বিঘ্ন কঙ্করকণ্টকিতই থাকিবে। তাহাদিগের সহযোগে বঞ্চিত হইলে আমাদিগের চলিবে না।

অথচ তাহাদিগকে ইচ্ছানুসারে পশ্চিম বঙ্গে আসিবার সুবিধা প্রদানকল্পে আজও কলিকাতায় ও মফঃস্বলে ভূমির অধিকারী-দিগের অর্থগৃধ্নুতার বিরোধী অর্ডিনান্স জারি করা হয় নাই! আমরা জানি কলিকাতার কোন কোন বস্তির মালিক "স্বাধীনতার" সুযোগে সেলামী দ্বিগুণ করিয়াছেন—কোন কোন গৃহস্বামী বাড়ীর বা ঘরের ভাড়া শতকরা ২৫ টাকারও অধিক বাড়াইয়াছেন—সেলামীর ত কথাই নাই। মন্ত্রীরা যদি জানিতে চাহেন, আমরা নাম দিতে প্রস্তুত আছি।

আর মফঃস্বলে যে জমী কেহ বিনামূল্যেও লইতে চাহিত না, ভূস্বামী তাহার যে মূল্য হাঁকিতেছেন, তাহা এক বৎসর পূর্বে কল্পনাতীত ছিল।

কেবল বিবৃতি ও বাণী প্রচারে এই অবস্থার পরিবর্তন ও প্রতিকার হইবে না।

"পতিত" জমীতে চাষ করাইবার নির্দেশ এখনও প্রদত্ত হয় নাই। জমী লইয়া এখন জুয়া খেলা আরম্ভ হইয়াছে। অথচ ইহা বাঙলার লোকের জীবন-মরণের সমস্যা। লোক এখনও পরিবর্তন অনুভব করিতে পারিতেছে না। যতদিন তাহারা সেই অনুভূতি লাভ না করিবে, ততদিন অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন জনগণকে—"অপেক্ষা কর—শান্ত হও—অধীর হইও না"—কথা তাহারা উপহাস মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিবে। সেই কথাই আইরিশ বিপ্লবী কনোলী বলিয়া গিয়াছেন। সেই কথাই বাঙলার মন্ত্রীদিগকে মনে রাখিতে হইবে। উপদেশে জনগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে না—বস্ত্রাভাব দূর হইবে না।

সেইজন্যই আমরা মন্ত্রিমণ্ডলকে অবিলম্বে কর্তব্যে অবহিত হইতে বলিতেছি। বাঙলা আজ আবার অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—নূতন আকারে বিপ্লব দেখা দিবার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হইতেছে।

পুস্তক পরিচয়

অধ্যাত্ম তত্ত্ব কৌমুদী—ডাঃ কক্তেশ্বর মিশ্র প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ত্রিবেণীবাবা বেদবেদান্ত আশ্রম লাইব্রেরী, ত্রিবেণীবাবা লেন, পোঃ সাঁতরাগাছি, হাওড়া। মূল্য দেড় টাকা।

শব্দ ব্রহ্ম, রামায়ণের লংকা, ভাগীরথী গংগার উৎপত্তি, শক্তিতত্ত্ব, দুর্গাপূজা তত্ত্ব, রাসলীলার বৈদিকসূত্র, দোললীলা ও শিব চতুর্দশী প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের আলোচনা সবিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও অনেকাংশে অভিনব। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ও দুই একটি প্রবন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। গ্রন্থখানি অধ্যাত্মতত্ত্ব-পিপাসু পাঠকের নিকট বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আশা করি।

চলন্তিকা—শারদীয়া সংখ্যা। প্রসাদ সিংহ ও শক্তি দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং দি প্রিন্টিং হাউস, ৭০, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শক্তি দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের রচনায় এই পূজাসংখ্যাখানা সমৃদ্ধ। ২৫৭।৪৭

অগ্রদূত—শারদীয়া সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তী। কার্যালয়, ৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। এই পূজাসংখ্যাখানা বহু উৎকৃষ্ট রচনা ও সুদৃশ্য চিত্রে সুসমৃদ্ধ। প্রচ্ছদপট সুন্দর। ২০৮।৪৭

মণি-সঞ্চয়—ময়মনসিংহ জেলা মণিমেলা কেন্দ্রের প্রচারিত পুস্তিকা। মূল্য আট আনা। মণিমেলার ইতিহাস, ময়মনসিংহ জেলা মণি-মেলা সম্মেলনের বিবরণ ও অন্যান্য নানা কার্য-বিবরণী ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছে। ২১০।৪৭

বাঙ্গালীর কথা—যুবেদা খানম প্রণীত। হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স, কলিকাতা হইতে বাঙ্গালী সঙ্ঘ (৮৪নং রসা রোড, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত।

'বাঙ্গালীর কথা' একখানি সময়োপযোগী পুস্তিকা। বাঙ্গালীর নিজেকে বুঝিবার ও আত্মকল্যাণার্থে ঐক্যবদ্ধ হইবার সাধু ইঙ্গিত এই পুস্তিকায় পাওয়া যাইবে। ২১৫।৪৭

বাঘা যতীন—শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। অশোক লাইব্রেরী, ১৫।৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই পুস্তিকায় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। ২১৭।৪৭

মধুগীতি—শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণ-ওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

নানাভাবের কতকগুলি কবিতা ও গানের সমষ্টি। ২১৬।৪৭

বহ্নিশিখা—শ্রীমন্মথনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—১৭নং নন্দলাল সেন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কলিকাতায় ও নোয়াখালিতে লীগপন্থীদের নির্মম অত্যাচার কাহিনী পদ্যাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথের খাল

শ্রীযতীন্দ্র সেন

উ-ডুবির খাল কাটা হবে—ঢেঁড়া পড়ল হাটে-হাটে বাজারে-বাজারে।

গান্ধী-টুপি-পরা ভলান্টিয়ারের দল ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বাজারে ঢেঁড়া দিয়ে যাচ্ছে : বউ-ডুবির খাল কাটা হবে, সে জন্যে আগামী সোমবার সভা হবে জোড় ফুলে বাড়ির মাঠে. আপনারা দলে দলে সভায় যোগ দেবেন।

কে কাটবে?

ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথ! কে এই ইন্দ্রনাথ? ও সেই মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, হাঁটু-সমান মোটা খদ্দরের কাপড় পরা লোকটি? যে জেল খেটেছে অনেক বার?

কেউ মুখ ফিরিয়ে হাসল। কেউ বাজে কথায় কান না দিয়ে বাজারের সওদা সারতে ছুটল। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। আকাশে মেঘ করেছে।

কারও দোকান পড়ে আছে। খদ্দের হয়ত ফিরে যাচ্ছে। বেচাকেনা সারতে হবে। সেইটেই আগে। খাল কাটবে ইন্দ্রনাথ! তবেই হয়েছে! ফুঃ......

কেউ মুচকি হেসে বিদ্রূপের সুরে পাশের লোককে বলল : বলে'হাতী-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল?' অমন যে রতনদীঘির জমিদার সেই-ই কিছু করতে পারল না, তা আবার ইন্দ্রনাথ! জমিদারবাবু সেবার সফরে বেরিয়ে প্রজাদের সম্বর্ধনা সভায় বলেছিল, খাল কেটে লোহার 'লক্-গেট' বসিয়ে দেবে। লাগিয়ে দেবে কপাট। খুশীমত জল বিলে নেওয়া যাবে, আবার দরকার বুঝলে বন্ধ করে দেওয়া যাবে। তা-ই কিছু হল না, তা আবার ইন্দ্রনাথ কি করবে শুনি?

শুধু কি তাই?—আর একজন দরকারী কথাটা মনে করিয়ে দিল বিজ্ঞের মত ভংগীতে : গবর্ণমেণ্ট থেকে আমিন-কানুনগুরা কতবার জরিপ করে যায়নি বউ ডুবির খাল? খালের মুখে, মাথায় আর মাঝে মাঝে এখনও পাথরের পিলপেগুলো দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো বাবলা গাছটার খানিকটা বাকল তুলে ইংরেজিতে এখনও খোদাই করে লেখা আছে কত কি! লেখা আছে, মধুমতী নদী থেকে বক-উড়ানির বিলের জল কত উঁচু, কত নিচু,—আর খাল কতটা ভরাট হয়েছে, কতটা মাটি কাটতে হবে তারি নিশানা।

বাজারের লোকেদের কানাকানি কথাগুলো, নিরুৎসাহব্যঞ্জক আলাপ-আলোচনা কানে গেল ভলান্টিয়ারদের। একজন বাজারের এক কোণে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে লেগে গেল : খাল কাটা হয়নি? তাতে ক্ষতি হয়েছে কার,—জমিদারের, না গবর্ণমেণ্টের? তারা তাদের পাওনা-গণ্ডা সমানই আদায় করছে। ক্ষতি কারও হয়ে থাকে ত, সে হয়েছে আপনাদের,—অন্নহীন, বস্ত্রহীন চাষী ভাইদের। কাজেই এ খাল কাটার দায়িত্ব আর গরজ আর কারও নয়,—জমিদারেরও নয়, গবর্ণমেণ্টেরও নয়,—এ দায়িত্ব আপনাদের। যদি অনাহার থেকে বাঁচতে চান, পেট পুরে খেতে চান, খাল আপনাদের কাটতেই হবে। যাঁরা চাষী, যাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলান, তাঁদের এ সভায় যেতে হবে দলে দলে, হাজারে-হাজারে লাখে-লাখে...

অবিশ্বাসের হালকা হাসি যেন কতকটা লিয়ে গেল।

চলাই না সকলে সভায়। শোনা যাবে, কি লে ইন্দ্রনাথ।

সভা বসল জোত ফুলবাড়ির মাঠে।

বিশখানা গাঁ থেকে লোক এসেছে,—গাঁ পিছু পনের বিশজন করে। এতগুলি গাঁয়ের র নির্ভর করে বউ-ডুবির খাল, আর বক-ড়ানির বিলের ওপর।

শুকনোর সময় প্রায় দু' মাইল জায়গা জুড়ে লের জল থাকে। বর্ষার সময় বিল ভরাট য়ে জল ছড়িয়ে যায় আট-দশ মাইল। এই ট-দশ মাইল জায়গা জুড়ে ফাঁকা মাঠ, তার ঝে মাঝে সবুজ দ্বীপের মতো গ্রাম। গাঁয়ে য়ে ঘন বসতি। প্রচুর ধান আর মাছের াভেই বিলের মধ্যে মাটি কেটে জমি টিলার তো উঁচু করে করে গড়ে উঠেছিল লোকালয়।

বক-উড়ানি বিলে জল আসার একমাত্র পথ উ ডুবির খাল। কবে, কিসের জ্বালায় ীবনের কোন্ অসহন ঘৃণায়, কার বউ এই-লে ডুবে মরেছিল, তা কেউ জানে না। কেবল লের নামটা অতীতের সেই দুঃসহ ঘটনার ৃতি জাগিয়ে রেখেছে।

খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদীর জল খালের তের দিয়ে সমানভাবে এসে বিলে পড়তে পায় । ধীরে ধীরে জল এলে ধান গাছও আস্তে স্তে বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু খালের খের পলির আর বালির বিরাট চড়া ডুবিয়ে লের ভিতর দিয়ে বিলে যখন জল আসে, খন তা আসে হঠাৎ—একেবারে আচমকা। নের গাছগুলি ডুবিয়ে দিয়ে চোখের নিমেষে রা বিল জলে জলাকার হয়ে যায়। আট-দশ ইল জুড়ে ছোটখাটো সমুদ্রের মতো ওঠে ল থই থই করে।

জলে ডোবা ধান গাছের ডগায় আর তার পাতায় বর্ষার ঘোলা জলের পলি পড়ে তিয়ে। মাথা তুলতে পারে না ধানের পাতা র শীষ। জলের মধ্যে পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে । নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বিশখানা গাঁয়ের লাখো খো লোকের মুখের গ্রাস,—সারা বছরের শা-ভরসা।

কোন কোন বার খালের মুখ জলে ভরাট য়ে উঠতেই ছুটে আসে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের বাসীরা। ঘরের চাল আর বেড়া কেটে খুলে য়ে এসে, ঘন ঘন মজবুত বাঁশের ঠেকনো ধারে বসিয়ে দিয়ে মাঝখানটা মাটি কেটে রাট করে গড়ে তোলে চওড়া বাঁধ। বাঁধ ল্প অল্প কেটে দিয়ে দরকার মতো জল ছাড়ে াস্তে আস্তে। কিন্তু প্রায় বারেই নদীর লের প্রচন্ড বেগে আর চাপে বাঁধের তলার াটি আস্তে আস্তে ক্ষয়ে ক্ষয়ে, বেড়া আর টি আলগা হয়ে কোথায় ভেসে যায় বাঁধ।

তখন কার সাধ্য জলের স্রোতকে রোখে? কাণায় কাণায় ভর্তি হয়ে যায় বিল। ছোট ছোট ধানের পাতার সবুজ ঢেউয়ের উপর দিয়ে বয়ে যায় ঘোলা জলের ঘূর্ণি আর বাঁধ ভাঙ্গা জলের প্রচন্ড উচ্ছ্বাস,—হাওয়ার তালে তালে দুলতে থাকে উদ্দাম জলরাশির অগাধ বিস্তার।

আবার বর্ষার পর খালের মুখ যায় বুজে। সব জল বেরিয়ে যেতে পারে না। বহু জমি থাকে জল-কুন্ড আর অনাবাদী হয়ে। রবিশস্য ফলে না সে সব জমিতে। ফলে না তিল, চিনে, ভুরো, কাওন আর আউশ ধান। অথচ আগে বারো মাসই ফসল ফলত এসব জমিতে। ফাঁক যেতো না কখনও। এমন সোনা-ফলানো মাটি একদিন ছিল বক-উড়ানি বিলের। আর আজ?

কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? সভায় প্রশ্ন করলেন ইন্দ্রনাথ।

দায়ী জমিদার, দায়ী গবর্ণমেণ্ট। সমস্বরে বলে উঠল বিশখানা গাঁয়ের কৃষক-প্রতিনিধিরাঃ তারা খাজনা নিচ্ছে, উপস্বত্ব ভোগ করছে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে। কিন্তু কিসে জমির লোকসান না হয়, কিসে জমির ফসল রক্ষা পায়, সে ব্যবস্থা করবার বেলায় তারা কেউ নয়!

তা যেন হোলো,—চাষীদের কথার উত্তরে বললেন ইন্দ্রনাথ ঃ কিন্তু জমিদার কিংবা গবর্ণমেণ্টের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে খাল কাটা হবে না কখনও। হ্যাঁ, এর প্রতিবিধান অবিশ্যি চাই। এর প্রতিবাদে আপনারা খাজনা বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু এদিকে খাল কাটা হবে না এক ছটাক জমিরও। কিন্তু দিনরাত পুলিশ-আদালত করতে হবে আপনাদের। জমিতে পড়বে না লাঙলের আঁচড় কিংবা নামবে না একখানিও কাস্তে। কাজেই ওসব না করে আপনাদেরই উচিত খাল কাটা।

কিন্তু খরচ যোগাবে কে? প্রশ্ন উঠল চাষীদের তরফ থেকে ঃ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এই খাল কাটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি,—ঘামায়নি জমিদার আর গবর্ণমেণ্ট।

খাল কাটার খরচ কেউ দেবে না, আর খরচ লাগবে না এক পয়সাও।—অর্থের প্রশ্নের উত্তরে বললেন ইন্দ্রনাথ ঃ আপনারা নিজ হাতে কোদাল ধরে খাল কাটবেন। এতদিন আপনারা অন্যের উপর নির্ভর করেছেন বলেই খাল কাটা হয়নি। বিশখানা গাঁয়ে আপনারা যত লোক আছেন, প্রত্যেকে এক কোদাল করে মাটি কাটলেই খালের অনেকখানি কাটা হয়ে যেতে পারতো। বউ ডুবির খাল কাটতে পারলে কেবল আপনাদেরই লাভ নয়, সারা বাঙলা দেশের লাভ। আপনারা একটা নতুন আদর্শ ধরে তুললেন সবার চোখের সামনে। জমিদারের সাহায্যে নয়, গবর্ণমেণ্টের মুখ চেয়ে নয়, নিজের বাহু বলেই অনেক অসাধ্য-সাধন করা যায়। আপনারা যে পথ দেখাবেন, সে পথ ধরে নিরন্ন বাঙলার কত ভরাট খাল একদিন কাটা হবে। উঠিত হবে, লায়েক হবে কত হেজে যাওয়া বালি-মদো জমি! জ্বলন্ত প্রেরণার আগুন ছড়িয়ে বললেন ইন্দ্রনাথ।

সভায় জমিদারের বিনা অনুমতিতে খাল কাটার অধিকার সম্বন্ধে আইনগত প্রশ্ন তুললেন রতনদীঘির জমিদারের নায়েব।

তিনজন জমিদারের জমির ওপর দিয়ে খালটি কাটা হয়েছিল কোন মান্ধাতার আমলে। খাল কাটতে গেলে জমি কাটা পড়বে তিন জমিদারেরই। রতনদীঘির বারো আনা, কাঞ্চন-পুরের দু আনা, আর হরিণহাটির দু আনা। অনুমতি নিতে হবে এঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই।

সভায় ঠিক হোলো, তিন জমিদারের কাছেই চাষীদের প্রতিনিধি হয়ে খাল কাটার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করবেন ইন্দ্রনাথ। দরখাস্ত দেওয়ার তারিখ থেকে এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। এর মধ্যে অনুমতি পাওয়া যায় ভালো কথা। আর যদি অনুমতি নাই পাওয়া যায়, তা হলেও কাটা সুরু হবে বউ ডুবির খাল।

এক মাস কেটে গেল।

তার মধ্যেও এলো না জমিদারবাবুদের অনুমতি পত্র। বিনা অনুমতিতেও খাল কাটবে ইন্দ্রনাথ? এত বড় বুকের পাটা! খদ্দরের নেংটির মধ্যে কতখানি কুজ্ঞান আছে, তা দেখে নিতে হবে।

বারো আনার মালিক রতনদীঘির জমিদার নেপথ্যে হুঙ্কার ছাড়লেন। দু দু আনার মালিক কাঞ্চনপুর আর হরিণহাটি রতনদীঘির ওপর নির্ভর করে রইলেন চুপ করে। ফলাফল নীরবে লক্ষ্য করতে লাগলেন তাঁরা।

খাল কাটতেই হবে। গাঁয়ে গাঁয়ে আবার সভা বসল, বসল পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক। ঠিক হোলো, আপাততঃ প্রতি গ্রাম থেকে দশজন হিসাবে দু'শ' লোক নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে। এক সপ্তাহ কাজ চলার পর এই দু'শ' জনের বদলে আসবে আরো দু'শ' জন। ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হবে লোকের সংখ্যা।

বউ ডুবির খালের মোহনার ধারের মাঠের মধ্যে ধানের লম্বা লম্বা খড় দিয়ে সারি সারি কতকগুলি চালা তৈরী হোলো। খড়ের ছাউনি, খড়েরই বেড়া, মেঝেয় পুরু করে বিছিয়ে দেওয়া হোলো খড়। আপাততঃ একশ' খানা কোদাল, আর একশ'টা ঝুড়িও সংগৃহীত হোলো।

খাল কাটা আরম্ভ করবার নির্দিষ্ট দিন এসে গেল, কিন্তু এলো না একটি প্রাণীও।

বউ-ডুবির খালের মোহনায় নির্জন চালার নীচে বসে ইন্দ্রনাথ নীরবে প্রতীক্ষা করছে

লাগলেন বিশখানা গাঁয়ের দুশ' চাষীর পদধ্বনিতে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হোলো। দুপুর গড়িয়ে এলো বিকাল। বিকালের পরও আর সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নাই। কিন্তু বক-উড়ানির বিলের পশ্চিম মাঠে একটি জনপ্রাণীর ছায়াও পড়ল না।

ইন্দ্রনাথের ক্লান্ত দৃষ্টি দূর শূন্যে মাঠের ওপার থেকে বৃথাই ঘুরে ফিরে এলো। বিশখানা গাঁয়ের লোক কি আজকের দিনের কথা এক সঙ্গেই ভুলে গেল! না কি, নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে সকলে? ইন্দ্রনাথের মনে পড়লো রতনদীঘির জমিদারের ম্যানেজারের কথা। গাঁয়ে গাঁয়ে বরকন্দাজ পাঠিয়ে শাসিয়ে দিয়েছে সকলকে: খবরদার! বউ-ডুবির খালে একটি কোদালের কোপ পড়লেও আর রক্ষে নেই। ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। তা ছাড়া জমিদার-কাছারীর বরকন্দাজ দুর্জয় সিংয়ের বুকে-পিঠে বাঁশ দিয়ে ডলার কাহিনী জলিমৎ সেখের মর্মঘাতী চোরা মার, আর অসহ্য অশ্লীল গালাগালির ইতিহাস ভুলবার কথা নয় কারও। সে গালাগালি শুনলে মরা মানুষও যেন জেগে ওঠে, এমনি কথার বাঁধুনি, আর তার জ্বালা।

তাহ'লে ভয়েই থেমে গেছে বিশখানা গাঁয়ের লোক। এই ভয়েই ওরা অনাহারে আর অর্ধাহারে ধুকবে সারা জীবন। এই ভয়েই ওরা তিলে তিলে এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে। এর বিরুদ্ধে উঠবে না একটিও প্রতিবাদ-ধ্বনি। একটি আঙ্গুলও তোলবার দুঃসাহস হবে না কারও।

দূর থেকে বিষণ্ণ দৃষ্টি সরিয়ে মাটির দিকে নত চোখে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন ইন্দ্রনাথ।

বিশখানা গাঁয়ের লোক স্তব্ধ হয়ে রইলো, উৎকর্ণ হয়ে রইলো, যদি বউডুবির খালের কোন খবর পাওয়া যায়। ওদিকে যাওয়ার সাধ্য হোলো না কারও। কেমন যেন একটা অপরাধ-বোধ সকলকে রাখল নির্জীব আর নিশ্চল করে। অথচ খাল কাটতে যাওয়ার মতো উৎসাহ নেই, সাহসও নেই কারও।

চাষীদের মধ্যে কেউ কেউ দূরে থেকে দেখে গেল একটু সাহস করেই। দেখে গেল, বউ-ডুবির খালের মোহনায় জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। না, কেউ আসে নি খাল কাটতে। মোহনার মুখে ফাঁকা মাঠের মধ্যে ধানের লম্বা খড় দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরগুলি নির্জন, অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আচ্ছন্নের মতো। কর্ম-কোলাহলের প্রাণস্পন্দন জাগে নি ওখানে। চারদিকে খাঁ খাঁ করছে নিরবচ্ছিন্ন দিগন্তপ্রসারী শূন্যতা। এক একবার বাইরে এসে চারদিকে তাকাচ্ছেন ইন্দ্রনাথ, আবার যেয়ে বসছেন কুঁড়েঘরের মধ্যে। নির্জন শ্মশানের ধূকে নিঃসঙ্গ শবসাধকের মতো দেখাচ্ছে ইন্দ্রনাথকে।

অপরিসীম অবসাদের দুঃসহ পাষাণ-ভার যেন চেপে বসেছে বিশখানা গাঁয়ের ওপর। ক্ষেত-খামারেও আজ কাজে যায় নি কেউ। খাল কাটার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা রাখে নি কথার মর্যাদা। মিথ্যা হয়ে গেছে তাদের শপথ। নৈরাশ্য-কাতর মন, জমিদারের শাসানি আর ইন্দ্রনাথের অমোঘ আহ্বান ও আগুনের দহন-জাগানো প্রেরণা—এই বিরুদ্ধ সংঘাতের মধ্যে পড়ে স্থাণু হয়ে গেছে, স্থবির হয়ে গেছে বক-উড়ানি বিলের চাষীরা।

পায়ে। হো, হো, হো—হেসে উঠলেন জমিদার বাবুরা।

বিদ্রূপের হাসি কুঞ্চিত আর উচ্ছল হয়ে উঠল মুখে মুখে।

কিন্তু আস্পর্ধা কম নয়! কোন্ সাহসে ও এসেছে লড়তে?

আরে আসুক, আসুক। কোথায় রাজা রাজচন্দ্র, আর কোথায় পণ্ডা তেলী।

নেংটি-পরা পথের ভিখিরী। ও আসে খনেদী জমিদারদের সঙ্গে ঠোক্কর দিতে! সাহস কম নয়।

আগে পাথরে কপাল ঠুকলে কপালই

ইন্দ্রনাথ পুরাণো নক্সা, কাঁটা-কম্পাস আর ফিতে নিয়ে খালের সাবেক সীমানা-সহরদ্দ ঠিক করেন।

বউডুবির খালে একটিও কোদালের কোপ পড়ে নি, একটি প্রাণীও যায় নি খাল কাটতে—খবর পৌঁছল রতনদীঘি, কাঞ্চনপুরে আর হরিণহাটিতে। জমিদার থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা পর্যন্ত সকলেই হাসল সগর্ব কৃতার্থতার হাসি। তাই তো হবে। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে, জমিদারের হুকুম অমান্য করে কাটবে বউডুবির খাল?

সন্ধ্যার পর আগুনের মতো একটা কথা গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। বউড়ুবির খালে কোদালের কোপ পড়েছে। অনশন-ব্রত অবলম্বন করে খাল কাটতে সুরু করেছেন একা ইন্দ্রনাথ স্বয়ং।

রতনদীঘি, কাঞ্চনপুর আর হরিণহাটিতেও খবর পৌঁছল। জমিদার-সরকারের বিনা অনুমতিতে খাল কাটতে সুরু করেছে ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথ? ইন্দ্রনাথ একা কাটবে খাল? হাজার বছর পরমায়ু হলে তা সম্ভব হতে

ভাঙেগ। দেখাই যাক না, কত বাড় বাড়ে।

ইন্দ্রনাথের প্রতি একটা রুদ্ধ আক্রোশ স্ফীত, আর উগ্রতর—হিংস্রতর হয়ে উঠলো কাঞ্চনপুরে, হরিণহাটিতে, আর বিশেষ করে রতনদীঘিতে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে। রোদের তাপটা বেশ প্রখর।

বউডুবির খালের মোহনায় মাটি কাটছেন একা ইন্দ্রনাথ। নিজের দেহের ছায়াটা পায়ের নীচে মাটির ওপর গুটিয়ে পড়েছে। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে কেটে ঝুড়ি ভরতি করছেন। দু'হাত তুলে হেঁকে কোপ দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছেন ইন্দ্রনাথ। কোদালের ছায়াটা অদ্ভুত-ভাবে মাটি কাটা খাদের ওপর উঠছে—নামছে।

ঝুড়ি ভরতি হয়ে গেলে ঝুড়ি মাথায় তুলে নিয়ে পাশে ঢেলে আসছেন মাটি।

বকউড়ানি বিলের চাষীরা ছোট ছোট দলে দূরে দাঁড়িয়ে দেখল ইন্দ্রনাথের মাটি-কাটা। টলতে টলতে ঝুড়ি মাথায় করে হাটেন ইন্দ্রনাথ। জড়ো করে রাখা মাটির ওপর ঝুড়ির

মাটি ঢেলে দেন। দুর্বল হাত-দুটো মাটি-সুদ্ধ ঝুড়ির দুর্বহ ভারে কাঁপতে থাকে।

আজ দু'দিন হল জলটুকু স্পর্শ করেন নি ইন্দ্রনাথ। জীবনের বেশির ভাগ সময় জেল খাটতে খাটতে, তারপর উপযুক্ত আহারের অভাবে আর অনিয়মে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে।

ভগ্নস্বাস্থ্যের উপর দু'দিনের নিরম্বু উপবাস বড় বেশি দুর্বল ও ক্লান্ত করে ফেলেছে ইন্দ্রনাথকে। একবার ঝুড়ি-ভর্তি মাটি মাথায় করে উপরে উঠতেই খাদের মধ্যে টলে পড়ে গেলেন হঠাৎ।

এক মিনিট দু-মিনিট তিন মিনিট—খাদের ভিতর থেকে আর উঠলেন না ইন্দ্রনাথ।

দূরে দাঁড়ানো চাষীদের দল হা হা করে চীৎকার করে উঠলো।

ছুটে এল মতি হাজরা, দুর্লভ দাস, হারাধন, হলধর, কাজেম বেপারী, তেরাপ খাঁ রহমৎ মোল্লা এবং তাদের পেছনে আরো অনেকে।

তারা কেউ ছুটল জল আনতে, পাখা আনতে,—কেউ ছুটল ডাব আনতে।

মাটির ঝুড়িটা মাথা থেকে ছিটকে এসে পড়েছে বুকের ওপর। খাদের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন ইন্দ্রনাথ।

চোখে মুখে জলের ছিটে, মাথায় জল আর জোরে জোরে হাতপাখার হাওয়া চলল অনেক-ক্ষণ ধরে।

অবশেষে চোখ মেললেন ইন্দ্রনাথ। তাকিয়ে দেখলেন বউড়ুবির খালের মোহনা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। বক-উড়ানি বিলের পশ্চিমু দিকের মাঠের এখানটার মাটি ফুঁড়ে যেন হাজার হাজার লোক উঠে এসেছে।

এগিয়ে এল মতি হাজরা আর কাজেম বেপারী। বলল,—আপনি জল খান। উপোস ভাঙুন, আমাদের সকলের অনুরোধ। আমাদের অন্যায় হয়েছে। খাল আমরা কাটবোই, যা থাকে কপালে...

ততক্ষণে কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে চাষীর দল।

ইন্দ্রনাথকে ধরে নিয়ে আসা হোলো খালের পাড়ে—মাঠের ভিতরকার খড়ের কুঁড়েঘরে।

ডাব কেটে ইন্দ্রনাথের মুখের কাছে ধরল মতি হাজরা।

পাঁচশ' কোদালে মাটি কাটা হচ্ছে পর পর, ছোট ছোট দলে। পাঁচশ ঝুড়িতে মাটি বোঝাই হচ্ছে, আর উপরে এনে ফেলা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

বিশখানা গ্রাম থেকে এক হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছে বউ-ড়ুবির খালের মুখে। একদল কাজ করে, একদল বিশ্রাম করে। কেউ তামাক খায়, কেউ বিল থেকে মাছ ধরে আনে, কেউ রান্না করে।

প্রত্যেক সপ্তাহে পঞ্চাশজন করে লোক আসে এক এক গ্রাম থেকে। নতুন দল কাজ করবে। পুরানো দল যাবে ঘরে ফিরে। প্রত্যেকে এক সপ্তাহের চাল, ডাল, চিড়ে, ঝাল-মশলা আনে সঙ্গে করে। যারা অক্ষম, যারা গরীব,—তারা কিছু আনে না। সবার ওপর থেকে তাদের খোরাকী চলে।

দিন-রাত্রি কাজ চলে। জ্যোৎস্না রাত্রে বসে থাকে না কেউ।

ইন্দ্রনাথ খাল-কাটা তদারক করেন। পুরাণো নক্সা, কাঁটা-কম্পাস আর ফিতে নিয়ে খালের সাবেক সীমানা-সহরদ্দ ঠিক করেন। খালের দু'পাশে খুঁটি পুঁতে পুঁতে দাগ কেটে দেন। সেই নিশানা অনুসারে খাল কেটে চলে চাষীরা।

যে জমি একদিন ছিল খালের গর্ভে তা-ই ভরাট হয়ে, হয়েছিল 'নাল'—আবাদী জমি। সে আবাদী জমির ওপর কোদাল চালাতে লাগলো চাষীরা। আবাদী জমি কেটে খাল বেরিয়ে যাবে পুরাণো আকারে।

টনক নড়ল জমিদারদের। রতনদীঘির ম্যানেজার ডেকে পাঠালেন ইন্দ্রনাথকে। একটু দেখা করলে জমিদারবাবু খুশী হন।

ফিতে কাঁটা রেখে ইন্দ্রনাথ চললেন বর-কন্দাজের সঙ্গে।

রতনদীঘির জমিদারবাড়ীর বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে আলবোলায় অম্বুরী তামাক খাচ্ছেন বৃদ্ধ জমিদার রূপেশ্বর-নারায়ণ।

চোখ অর্ধেক খুলে, অর্ধেক বুজে কি যেন ভাবছিলেন আর শূন্যে সঞ্চরমান ধূম-কুণ্ডলীর বিচিত্র গতি লক্ষ্য করছিলেন আনমনে।

কিছুদূরে একপাশে চেয়ারে বসে নক্সা, পরচা আর তৌজি দেখছিলেন ম্যানেজারবাবু।

ইন্দ্রনাথ যেতেই ম্যানেজারবাবু বললেন—বসুন।

জমিদার রূপেশ্বরনারায়ণ আলবোলার নল হাতে সোজা হয়ে বসলেন।

ম্যানেজারবাবু ভুরু কুঁচকে, চিবুকে ও ঠোঁটে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গি ফুটিয়ে বললেন,—এই যে খাল কাটাচ্ছেন, এর আইনের দিকটা কি ভেবে দেখেছেন?

আইনের দিকটা ত আপনারাই দেখে আসছেন বরাবর। কিন্তু তাতে ত প্রজাদের কোন দুঃখই ঘোচে নি, বরং আরও বেড়েছে। —বললেন ইন্দ্রনাথ।

ধমকের সুরে বললেন ম্যানেজারবাবু,—দেখুন, ওসব কথা রাখুন। দুঃখ কেউ কারও ঘোচাতে পারে না...

তা-ই যদি হয়, তবে ত আর কোন সমস্যাই থাকে না।

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো সোজা হয়ে বসলেন ম্যানেজারবাবু। গগনস্পর্শী অহমিকায় দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠলেন। বললেন,—দেখুন যাদের চাল নেই, চুলোও নেই, তাদের কোন সমস্যাও নেই। এই খাল কাটা সুরু করে কত যে অনর্থের সৃষ্টি করেছেন, জানেন? যে জমি ছিল পয়োস্তি, তা-ই হয়েছিল সিকস্তি,—সেই অনুসারে খাজনার বৃদ্ধি হয়েছিল। এখন আবার সেই সিকস্তি জমি পয়োস্তি হতে চলেছে। খাজনারও 'কমি' হতে বাধ্য। কিন্তু তৌজি, পরচা আর নক্সায় আবার সেটেলমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্বত্বও এক রকমের নয়—মৌরশি, কোর্ফা, কোল-কোর্ফা, পত্তনি, দরপত্তনি,—কত জটিলতা! কাজেই বলছি এখনও খাল কাটা বন্ধ রাখুন।

জমিদার রূপেশ্বরনারায়ণ কথা বললেন এতক্ষণে: পলিটিকস্ করছিলে বাপু, সেই-ই তো ভালো ছিলো। গবর্ণমেন্টকে ছেড়ে জমিদারের পিছনে লাগতে এলে কেন বল ত? এতে কত ক্ষতি হবে জান? আমাদের সালিয়ানা লোকসান হবে দশ হাজার কাঞ্চনপুরের পাঁচ হাজার, আর হরিণহাটির পাঁচ হাজার।

দেখুন এ আপনাদের লোকসান নয়। যে খাজনাটা আপনারা বেশীরভাগ পাচ্ছিলেন, সেইটে পাবেন না। কিন্তু বছর বছর প্রজাদের ফসল নষ্ট হচ্ছে, দুবছর আগে পঞ্চাশের মন্বন্তরে আপনাদের কত প্রজা যে একমুঠো ভাতের অভাবে হেজে-মরে কৌত-ফেরার হয়ে গেল, তার কি করেছেন আপনারা? বছর বছর খাজনা আদায় করেই কি আপনাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়?—উত্তেজিত হয়েই বললেন ইন্দ্রনাথ।

আহত পশুর মতো ঘেঁৎ করে উঠে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে বললেন ম্যানেজার-বাবু: দেখুন, এ লেকচার দেওয়ার জায়গা নয়। লেকচার দিতে হয় ত দিনগে ওদের কাছে। সাফ জানিয়ে দিচ্ছি,—খাল কাটা চলবে না। খাল কাটা বন্ধ না করলে তার ফল ভুগতে হবে। যা ভাল বোঝেন, করবেন। যান...

উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন ম্যানেজারবাবু।

* * * *

রতনদীঘি থেকে ফিরে এলেন ইন্দ্রনাথ।

বহু দূর থেকে চোখে পড়ল বউ-ড়ুবির-খালের মোহনা। কিন্তু কিসের যেন বিক্ষোভ চঞ্চল হয়ে উঠেছে ওখানে। আর একটু এগিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন ইন্দ্রনাথ,—এধারে লাঠি সড়কি নিয়ে দাঁড়িয়েছে জন পঞ্চাশেক, আর ওধারে প্রায় দু'শ' লাঠি, শড়কি আর ঢালের আস্ফালন চলেছে আগে আগে, পিছনে চলেছে পাঁচ শ কোদাল। দুপুরের প্রখর রোদে শড়কির ফলাগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। দূর থেকেই ইন্দ্রনাথ

[illegible]

শুনলেন নয়ন সর্দারের উত্তেজিত স্বরঃ আর শালারা, কোদালের তলে তোদের মাথাগুলো রেখে দি।

বড় রগ-চটা আর এক-রোখা মানুষ নয়ন সর্দার। নামকরা লেঠেল অর্জুন সর্দারের ছেলে। লাঠি-হাতে অর্জুন সর্দার একা নিতে পারতো দু'শ' লোকের মহড়া। চিরকেলে কাঠ-গোঁয়ার আর দাঙ্গাবাজ ওরা।

ছুটে এলেন ইন্দ্রনাথ ঃ আরে, থাম থাম। ফেলে দে হাতিয়ার—ফেলে দে—ফেলে দে—

লাঠি-শড়কি ফেলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো চাষীরা। চলে গেল জমিদারের লেঠেলরাও। আটি বেঁধে লাঠি শড়কি-গুলো সরিয়ে দেওয়া হোলো দূরের গাঁয়ে।

কিছুক্ষণ বাদে ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলো দারোগাবাবু, এল উর্দিপরা কনেস্টবলরা।

দারোগাবাবু বললেন—আপনি ইন্দ্রনাথ-বাবু? আপনার লোকেরা দাঙ্গা করেছে।

দাঙ্গা! কে বলল? একটু রোখারুখি হয়েছিল মাত্র—

রোখারুখি নয় দস্তুরমতো দাঙ্গা হয়েছে। Casualty হয়েছে। চলুন—

চাষীদের বললেন ইন্দ্রনাথ ঃ আমাকে গ্রেপ্তার করা হোলো, মনে হচ্ছে। কিন্তু খাল কাটার কাজ যেন বন্ধ না থাকে। হয়ত তোমরাও গ্রেপ্তার হবে তোমাদেরও হতে পারে জেল। কিন্তু নতুন লোক এসে যেন যারা গ্রেপ্তার হবে তাদের জায়গা দখল করে। শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতেও যেন খাল কাটা বন্ধ না হয়—

থানায় এসে দেখলেন ইন্দ্রনাথ পাঁচ-ছয়জন লোক দেহে আঘাতের চিহ্ন নিয়ে বসে আছে। কারও শরীরের কোন অংশ ফুলে উঠেছে, কারও কেটে গেছে চামড়া। বুড়ো করিম সেখ উরুতে সড়কি বেঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে বাঁশের মাচায়।

দারোগাবাবু বললেন—এই দেখুন দাঙ্গার চাক্ষুষ প্রমাণ।

কিন্তু আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে দারোগাবাবু। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন ইন্দ্রনাথ।

সে ত আপনি বুঝবেন না। লোক-গুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারেন শুধু।

দারোগাবাবু ডায়েরী লেখা শেষ করে সহরের হাজতে পাঠিয়ে দিলেন ইন্দ্রনাথকে, আর আহতদের পাঠিয়ে দিলেন হাসপাতালে। সেখানে ডাক্তারী পরীক্ষা হবে।

ইন্দ্রনাথের পর পাঁচদিনের মধ্যে বক-উড়ানি বিলের পাঁচ শ' চাষী গ্রেপ্তার হয়ে এল হাজতে। তাদের মুখে ইন্দ্রনাথ শুনে কতকটা আশ্বস্ত হলেন, খালকাটা বন্ধ হয় নি একদল গ্রেপ্তার হচ্ছে, আর একদল তাদের জায়গায় এসে তুলে নিচ্ছে কোদাল আর ঝুড়ি। যেন সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়েছে বৌ-ডুবির খালে।

কেরদিন হাজতবাসের পর চাষীদের সকলকে ছেড়ে দেওয়া হোলো, কিন্তু ইন্দ্রনাথকে জামিন পর্যন্ত দেওয়া হোলো না। আদালতে মামলা সুরু হোলো একা ইন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না ইন্দ্রনাথ, বললেন না একটি কথাও। ছ মাস ধরে চলল মামলা, মামলা সরকার-পক্ষ থেকে চললেও সাক্ষী জোগাতে লাগলেন রতনদীঘির ম্যানেজার। মামলার তারিখে ম্যানেজারবাবু পেশকারের বাঁ হাতের মধ্যে তাঁর মুঠিটা গুঁজে দেন। তারিখ পিছিয়ে যায়। ছ মাসে সাক্ষীদের বাবদ বারবরদারি আর কৌশলী খরচের খাতে তারও আয় হোলো মন্দ নয়।

ছমাস পর শেষ হোলো শুনানি। ইন্দ্রনাথ কোনো উকিল নিযুক্ত করেননি। কাজেই আর জেরার বালাই নেই। এক-তরফা মামলা। রায়ে ইন্দ্রনাথের দীর্ঘ মেয়াদের জেলের হুকুম হবে নির্ঘাত, মামলার গতি থেকে নাকি একথা দিনের মত সুস্পষ্ট। ম্যানেজারবাবু আদালতের আমলাদের আগাম বখশিশ দিয়ে ফেললেন খুশি হয়ে।

সাত দিন পর আবার মামলা উঠলো। আদালতে কেমন যেন উত্তেজনা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বক-উড়ানি বিলের কয়েকজন মাতব্বর-চাষী এসেছে। উকিল দাঁড় করিয়েছে তারা। অনর্থক জেলে যেতে দেবে না ইন্দ্রনাথকে।

ফুলের মালায় রহিম সাজিয়ে নিয়ে সদরে এসেছেন জমিদার রূপেশ্বরনারায়ণ, আর তাঁর ম্যানেজার। ইন্দ্রনাথের জেলের হুকুম হলে বিজয়োল্লাস করবেন তাঁরা। কিন্তু আদালতে এসে সরকারী উকীলের মুখে সব শুনে তাঁদের উল্লাসের অত্যুগ্র স্পৃহাটা বাষ্পের মতো গেল উবে।

তাঁদের দেওয়া সরকার পক্ষের সাক্ষী উল্টো কথা বলছে আজ। ইন্দ্রনাথের পক্ষের কোন লোক তাদের মারেনি, ম্যানেজারবাবুর লোকেরাই রাং-চিতার কষ আর কাটা-কুমুরের

লাঠা দিয়ে তাদের গায়ে ফুটিয়ে তুলেছে আঘাতের চিহ্ন। জমিদারবাবুর টাকা খেয়ে করিম সেখের উরুতে শড়কি মেরেছিল তারই ঘর-জামাই জয়নাল।

সাক্ষী বিগড়েছে বলে সরকার পক্ষ থেকে দরখাস্ত করা হোলো। হাকিম শ্লেষের সুরে জমিদার রূপেশ্বরনারায়ণ আর তাঁর ম্যানেজারকে বললেন,—এবার গ্রেপ্তার হবার আর হাজতবাসের পালা আপনাদের। যা হোক আমি সদরের ইনস্পেক্টরের উপর তদন্তের ভার দিচ্ছি। ব্যাপারটা আগাগোড়াই গোলমেলে মনে হচ্ছে আমার।

হাসি মিলিয়ে গেল জমিদারবাবু আর তাঁর ম্যানেজারের। তাঁরা তাঁদের সজ্জিত বজরায় চড়ে কখন কোর্ট থেকে সরে পড়লেন, তা কেউ টেরও পেলো না।

বউ-ডুবির খাল-কাটা শেষ হয়ে গেছে বর্ষার আগেই। এবার বক-উড়ানি বিলে ধান ফলেছে প্রচুর। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন ধান নাকি দেখেনি কেউ। কালো মেঘের মতো ধানের পাতা জলের ওপর বাতাসে শির শির করে দোল খায়।

আজ কিসের যেন একটা পরম আশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে বক-উড়ানি বিলের বিশখানা গাঁয়ের আকাশে বাতাসে। বিশখানা গাঁয়ের হৃৎপিণ্ড কানায়-কানায়-ভরা উচ্ছল খুশীতে অধীর হয়ে উঠেছে। বিলের দাঁড়া আর খাল নৌকোয় নৌকোয় ছয়লাপ হয়ে গেছে।

সব চেয়ে বড় ফুলের মালাটা ইন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিলেন রূপেশ্বরনারায়ণ।

ঐ আসছে—আসছে—

হঠাৎ একটা আনন্দমিশ্রিত কোলাহল উঠলো। দূরে পতাকা আর ফুলের মালায় সজ্জিত একখানা নৌকো দেখা গেল।

জয় ইন্দ্রনাথের জয়—

জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল বক-উড়ানির বিল। সারা বিলের জল টলমল করে উঠলো আনন্দ-চঞ্চল নৌকোর দোলায় দোলায়, আর লগি ও বৈঠার তাড়নায়।

জেল-হাজত থেকে বেকসুর খালাস হয়ে এসেছেন ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো নতি হাজরা, সেলাম করলো কাজেম বেপারী। আনন্দের কোলাহলে তোলপাড় করে উঠলো বক-উড়ানির বিল।

স্তূপীকৃত ফুলের মালা গলা ছাপিয়ে মাথা পর্যন্ত উঠলো ইন্দ্রনাথের। করজোড়ে, স্মিতহাস্যে অভিনন্দন গ্রহণ করলেন নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে।

জমিদার রূপেশ্বরনারায়ণের বজরাখানা কখন যে এসে ভিড়েছে ইন্দ্রনাথের নৌকোর পাশে তা কেউ লক্ষ্যও করেনি। ইন্দ্রনাথের পাশে তাঁর নিষ্প্রভ মূর্তিটা দৃষ্টি আকর্ষণও করলো না কারো।

সব চেয়ে বড় ফুলের মালাটা ইন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিলেন রূপেশ্বরনারায়ণ। পেছন থেকে ম্যানেজারবাবুর করতালি-ধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠলো না কোথাও।

যারা জানে তারা বুঝলো ইন্দ্রনাথের কাছে ফুলের মালার ঘুষ নিয়ে এসেছেন রূপেশ্বর-নারায়ণ। মামলার উল্টো গতিতে বিপন্ন হয়েই তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে দম্ভ ও ঐশ্বর্যের সুউচ্চ আসন থেকে।

উদ্ধতশীর্ষ হিংস্র কুটিল কেউটের বিচূর্ণ ফণার মতো মাথাটা হেঁট করে ক্ষীণকণ্ঠে একটা অক্ষম বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করলেন রূপেশ্বরনারায়ণ।

খাল কাটার বিপুল সফলতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ইন্দ্রনাথের, দুঃখ প্রকাশ করলেন প্রজাদের কাছে। অবশেষে ঘোষণা করলেন তিনি :... আসছে শীতে আমি এই-খালের "লক্-গেট" করে দেব, আর তাতে নাম লিখে দেব ইন্দ্রনাথের। বউ-ডুবির খালের নাম আমাদের ভুলে যেতে হবে,—ভুলে যেতে হবে তার অতীতের তিক্ত আর বেদনাময় স্মৃতি। আজ থেকে এই খালের নাম হলো "ইন্দ্রনাথের খাল"......

আইন করে এই প্রথার উচ্ছেদ করেছেন। যে গোষ্ঠীকে বলি দেবার জন্য নির্দিষ্ট করা হতো, তাকে 'মেরিয়া' বা উৎসর্গ বলা হতো। ১৯০১ সালের আদম সুমারিতে ২৫ জন খোন্দ নিজেদের 'মেরিয়া' শ্রেণী বলে পরিচয় দেয়, অর্থাৎ তারা মেরিয়াদের বংশধর। বলি দেবার জন্য নির্বাচিত ২৫ জন মেরিয়াকে গভর্নমেন্টের লোক উদ্ধার করেছিল, এরা তাদেরই বংশধর। খোন্দেরা এর পর থেকে নরবলির বদলে মহিষ-বলির প্রথা গ্রহণ করেছে। মেরিয়া অনুষ্ঠান বা নরবলির প্রথা আইন ক'রে উচ্ছেদ করা হলেও মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে এমন এক একটা গোপন হত্যাকাণ্ড হয়, যাকে বস্তুত মেরিয়া অনুষ্ঠান ব'লে সন্দেহ করবার কারণ থাকে। ১৯০২ সালে খোন্দ সমাজের পক্ষ থেকে গঞ্জামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মর্মে এক আবেদনপত্র পেশ করা হয়েছিল যে, আবার তাদের নরবলি বা মেরিয়া অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হোক।

সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি খোন্দ সমাজের জন্য কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেছেন এবং অন্যান্য সেবা ও শিক্ষামূলক কাজের জন্য একটা আশ্রমও করেছেন।

গঞ্জাম পাহাড়ী অঞ্চলের খোন্দেরা গভর্নমেণ্টকে কোন ভূমিকর (Land Tax) দেয় না। মেরিয়া অনুষ্ঠান বর্জন করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গভর্নমেণ্ট নাকি প্রায় একশ' বছর আগে খোন্দদের প্রতি শুভেচ্ছা ও পুরস্কার-স্বরূপে এই অনুগ্রহ দেখিয়েছেন।

(১২) কোণ্ডা-ডোরাঃ পূর্ব গোদাবরী জেলায় এদের বসতি বর্তমানে বহুল পরিমাণে তেলেগু সংস্কৃতি এরা গ্রহণ করেছে। এরা পাহাড়ের ওপরেই চাষবাস করে। এরা সম্ভবত খোন্দ গোষ্ঠীর একটি শাখা।

(১৩) কোইয়াঃ এরাও তেলেগু-সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। এরা সম্ভবত খোন্দ গোষ্ঠীরই একটি শাখা।

(১৪) কুকিঃ আসামের একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। পার্বত্য ত্রিপুরাতেও এরা আছে। নাগা গোষ্ঠীর মত এদের এক শ্রেণীর মধ্যে মুণ্ড-শিকার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাবেক কুকি সমাজে বিবাহেচ্ছু কুকি যুবককে আগে কোন শত্রুকে হত্যা করে, তার মুণ্ড নিয়ে আসতে হতো, তবে তার বিবাহ সম্ভব হতো। গ্রামের মধ্যে উঁচু বাঁশের চূড়ায় শত্রুর মুণ্ড ঝুলিয়ে রাখার প্রথা ছিল।

(১৫) লুসাইঃ দক্ষিণ-পূর্ব আসামে প্রায় বর্মার গা ঘেঁষে লুসাই পাহাড় অঞ্চলে এদের বাস। অঞ্চলটি পথহীন দুর্গমতার জন্য প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলে যাতায়াতের একটি বৈশিষ্ট্য দোলনা-পথ। এদের মধ্যেও মুণ্ড-শিকার প্রথা প্রচলিত ছিল।

(১৬) মিকিরঃ একটি অহিফেনবিলাসী সমাজ। মিকির (এবং খাসিয়ারা) মৃৎ-শিল্পে পারদর্শী, অলাতচক্র বা কুমোরের চাকা ব্যবহারের কৌশল এরা জানে। তুলো এবং ধানের চাষও এরা জানে, কিন্তু চাষের পদ্ধতি সেই অতি-পুরাতন 'ঝুম' প্রথা।

(১৭) নাগাঃ আসামে এদের বাস এবং সংখ্যায় ২½ লক্ষ। মুণ্ড-শিকারের পদ্ধতি এদের মধ্যে প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে।

গাইডালো নামে এক নাগা রমণী সম্বন্ধে আধুনিক রাজনীতি-উৎসাহী ভারতীয় সমাজ কিছু কিছু খবর রাখেন। পণ্ডিত নেহরু এ'র সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে উল্লেখ করায় গাইডালোর কাহিনী বহু প্রচারিত হয়। তরুণী গাইডালো এবং আর একজন নাগা তরুণ, উভয়ে এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে। বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ-ভারতীয় পুলিস ও সৈনিকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পলিটিক্যাল অফিসারের আবাস আক্রমণ করে। উভয়েই—তরুণী গাইডালো এবং তার সহকর্মী তরুণ নাগা পরাজিত হয়ে বন্দী হয়। তরুণটির ফাঁসি হয় এবং গাইডালোর হয় নির্বাসন। সম্প্রতি এ বিদ্রোহিনী নাগা রমণী মুক্তিলাভ করেছেন।

(১৮) ও'রাওঃ ছোটনাগপুরের একটি প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠী। ও'রাওদের মধ্যে অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। রাঁচী শহরে ও জেলায় ও'রাও এবং মুণ্ডাদের কয়েকটি স্কুল আছে। বহু ও'রাও ছোটনাগপুরের খৃষ্টান মিশনারীদের সুদীর্ঘ প্রচার-সাধনার ফলে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। অ-খৃষ্টান ও'রাওদের মধ্যে রায় সাহেব বন্দীরাম জনৈক বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং তিনি বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য।

ছোটনাগপুরের ও'রাও এবং মুণ্ডা সমাজে ইংরেজি শিক্ষার কিছু প্রসার হওয়ায় অন্যান্য প্রত্যেক প্রদেশের আধুনিক ভারতীয়ের মত একটা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক (Middle Class) শ্রেণী গড়ে উঠেছে। খৃষ্টান এবং অ-খৃষ্টান ও'রাও ও মুণ্ডাদের দুই সমাজেই 'ভদ্রলোক' শ্রেণী দেখা দিয়েছে। কিন্তু খৃষ্টান খাসিয়া সমাজের মত এরা বেশভূষায় ফিরিঙ্গিয়ানা গ্রহণ করে নি।

(১৯) পরাজঃ কিছু কিছু কৃষিকাজ এবং গরু ও শূকর পালন পরাজদের জীবিকা। পরাজ মেয়েদের পরিচ্ছদ ও অলংকারে বৈশিষ্ট্য আছে। পরিচ্ছদ মাত্র একটি দশ আঙুল চওড়া কাপড়, কোমরে জড়ান। অলংকারের মধ্যে বুকভরা অজস্র পুঁতির মালা। মেয়েরা মাথা নেড়া ক'রে তার ওপর একটি টায়রা এঁটে দেয়।

(২০) সাঁওতালঃ সংখ্যায় প্রায় ৩০ লক্ষ; সাঁওতাল পরগণাতেই এদের সংখ্যাধিক্য। এরা কৃষিতে অভ্যস্ত, গৃহ সমাজ ও গ্রামের প্রতি অনুরাগী। কিন্তু ভারতবর্ষের সকল আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র সাঁওতালেরাই সবচেয়ে দ্রুত মজুর-জীবন গ্রহণ করেছে। এরা দলে দলে চা-বাগানের শ্রমিক হয়ে দেশান্তরে গেছে, কোলিয়ারী বা কয়লা খনিতে মালকাটার কাজ নিয়েছে এবং টাটা কোম্পানীর কারখানাতে দৈনিক বাঁধা পরিশ্রমের প্রথায় মজুর বৃত্তি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন নতুন অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে এরা নিজেকে খাপ খাইয়ে চলবার মত গুণ ও শক্তি রাখে। বাঙলা দেশেও এরা 'ভূমিহীন কৃষক' হয়ে জীবিকা অর্জন করে থাকে। পতিত ও জংলী জমিতে আবাদের পত্তন করতে এদের সমকক্ষ কেউ নেই।

(২১) শবরঃ দক্ষিণ উড়িষ্যায় বসতি। রামায়ণের শবরীর উপাখ্যান আধুনিক ভারতীয়ের চিত্তে করুণ-মধুর নাটকীয় সংবেদনা সৃষ্টি করে। রামায়ণের শবরী এই শবর জাতির মানুষ—ইতি জনশ্রুতি। রামচন্দ্রের জন্য পথের দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে শবরীর, তবু প্রতীক্ষায় ক্লান্তি নেই। সে শুধু দৃষ্টি মেলে পথের দিকে চেয়ে আছে। ঈপ্সিতের জন্য প্রতীক্ষায় এই বুক-ভরা জীবনপণ আকুলতা, শবরী যেন স্বয়ং একটি আগ্রহের মহাকাব্য।

শবরেরা পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে আলবাঁধা ক্ষেত তৈরী করে এবং তার সঙ্গে অতি সুন্দর কৌশলে সেচ ব্যবস্থাও করে থাকে। এই ধাপ-বাঁধা কৃষি ('Terraced cultivation') যাদের আয়ত্ত তারা কৃষিকলায় যথেষ্ট উন্নত সন্দেহ নেই।

(২২) টিপুরাঃ পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এদের বসতি। এদের অনেকখানি বাঙালীত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে, অর্থাৎ এরা অনেকখানি বাঙলা সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে।

(৩)

গ্রামে আর শহরে মেশানো এই শানচাউঙ্ বন্দর। খালের মুখে বড়ো বড়ো বজরা সর্বদাই ভিড় করে থাকে। ভিন জায়গা থেকে তারা নিয়ে আসে ধান আর জ্বালানি কাঠ আর এখান থেকে নিয়ে যায় সিল্কের পুঁতি-বসানো লুংগি আর হরেক রকমের কাঁচ বসানো গালার চুড়ি। খালের ধার ঘেঁষে কাঠের কতক-গুলো বড়ো বড়ো বাড়ি। তলায় গুদাম আর ওপরে ব্যবসায়ীদের গদি। সকল সময়ই কারণে-অকারণে সরগরম হয়ে থাকে জায়গাটা। লাল সুরকির রাস্তাটা এই অবধি এসে হঠাৎ যেন থেমে গেছে। তারপরেই কাঁচা রাস্তা মোষের গাড়ির অত্যাচারে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে—অন্য কোন যানবাহনের যাবার উপায়ই নেই।

মোটরটা থামতেই মেয়ে কুলীদের ভীড় শুরু হয়ে যায়। যে যেখান থেকে পারে মালের বোঝা তুলে নেয় মাথায়। সীমাচলম বেশ একটু বিরক্ত হয়ে পড়ে। মা পান শুধু গলা বাড়িয়ে দেখে কিছুক্ষণ, তারপর চীৎকার করে কাকে যেন ডাকে : আকো, আকো!

মাঝারী গোছের একটা বজরার ওপরে প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন একটি। সাজ-সজ্জায় চূড়ান্ত বিলাসিতা, হাতের শিঙের লাঠিটা ধরার কায়দাতেই তা মালুম হয়। মা পানের ডাকে চমকে ফিরে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ মোটরের দিকে, তারপর খুব সাবধানে কাদা আর জল থেকে দামী জুতো বাঁচিয়ে এগিয়ে আসে মা পানের দিকে।

নাতিদীর্ঘ চেহারা, তীক্ষ্ণ দুটি চোখ আর কড়া একজোড়া গোঁফ মুখের অন্যান্য অংগ চট করে যেন নজরে পড়ে না। গোঁফ-জোড়াটি অতি সযত্নে তিনি লালিত করেন তা বোঝা যায় সে দুটির মোম লাগানো প্রান্তভাগ দেখে।

কাছে এসে দাঁড়ান কিছুক্ষণ, তারপর কৌতূহলে যেন ফেটে পড়েন তিনি : মা পান না? হ্যাঁ, তাইতো! তারপর খাস শহরের মেয়ে এ জংগলে যে হঠাৎ?

মুচকি হাসে মা পান : শহুরে লোকের তাড়া খেয়ে। বলবো'খন সব, আগে তোমার কুলীদের হাত থেকে রক্ষা করো আমার জিনিসপত্তর।

হাতের ছড়িটা তুলে হুংকার দেন ভদ্রলোক। এক হুংকারেই বেশ কাজ হলো। মেয়ে কুলীরা মোট-ঘাট রেখে দাঁড়ালো তাঁকে ঘিরে। তিনি তিনটি কুলীকে নির্দেশ করে বললেন : ব্যস্, তিনজনই যথেষ্ট। তোরা নিয়ে যা সব মালপত্তর একটা একটা করে।

সীমাচলম এতক্ষণ শুধু আপাদমস্তক দেখছিলো ভদ্রলোকটির। বেশ বেশ একটা পারিপাট্য, চাল-চলনে গ্রাম্য আভিজাত্য—এখানকার পড়ন্ত জমিদার বংশের শেষপ্রদীপ নাকি?

ইনি কে : প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির গলার আওয়াজে চমক ভাঙে সীমাচলমের : এঁর কি ব্যবস্থা হবে?

কুলী তাড়ানোর যেভাবে মাল পাঠাচ্ছিলেন তিনি, সেইভাবেই তার দিকে দৃষ্টির সংকেত করেন। ও যেন একটা বাড়তি মালবিশেষ অথবা চড়ুয়ে নাকি কোন মেয়ে কুলীর পিঠে।

আবার হাসে মা পান : এটি! এটি আমার নতুন ম্যানেজার : হাসে আর আড়চোখে চেয়ে থাকে সীমাচলমের দিকে : অল্প কালের মধ্যেই কিন্তু কাজটা বেশ বুঝে নিয়েছে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আরো এগিয়ে আসেন। সীমাচলমের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর বলেন : কালা খুবই অল্প বয়স বলেই মনে হচ্ছে।

: হ্যাঁ, ভারতবর্ষের লোক এখনও পাওয়া যাবে না শহরেতে। কিন্তু অল্প বয়সেই বেশ ধুরন্ধর।

একটু ভয় পায় সীমাচলম। প্রথম আলাপেই সব ফাঁস করে দেবে নাকি মা পান। কিন্তু কি-ই বা জানে মা পান! রামিনারানের সম্বন্ধে অস্পষ্ট আভাস একটা আর তার নিজের সম্বন্ধে ওই একটু। চলন্ত গাড়ির ভিতরে কয়েকটি দুর্বল মুহূর্ত।

কিন্তু বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন না লোকটি। লাঠিটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলেন : বেশ বেশ। চলো এগোও তোমরা। আমি এই জল-কাদায় এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে আর যাবো না, খালের পাশ দিয়ে দিয়েই যাই।

কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে মা পান। সীমাচলম ইচ্ছা করেই একটু পিছিয়ে পড়ে।

রাস্তার দুধারে বিস্তীর্ণ মাঠ। হোগলার মত লম্বা লম্বা গাছের ঝোপ। দূরে দূরে বড়ো গাছের সার। তারও পিছনে আবছা দেখা যাচ্ছে কতকগুলো পাহাড়ের শ্রেণী। বিশেষ উঁচু নয়, —কিন্তু সারি সারি চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, একটার পর একটা। পাহাড়ের গায়ে ঝাকড়া ঝাকড়া ঘন গাছের ঝোপ। কুয়াশায় ভালো করে দেখা যায় না সবটা। কালো মৌসুমী মেঘে এখনও আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আকাশ।

: কিগো, পুরুষ মানুষ হয়ে পিছিয়ে থাকবে নাকি : অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে মা পান।

জল আর কাদা সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয় সীমাচলমের। জুতোটা খুলে হাতে নিয়ে খুব সাবধানে পা ফেলছে সে। মা পানের কথাটায় মনোযোগ দেবার সময় নয় এখন।

কিছুটা এগিয়েই ও দাঁড়িয়ে পড়ে : কি ব্যাপার, বসলে যে? মস্ত বড় একটা গাছ উপড়ে পড়ে আছে রাস্তার এক পাশে। হয়ত কাল রাতের ঝড়েই এই অবস্থা গাছটার। তার ওপরেই বসে আছে মা পান।

: শোনো, কাকার বাড়ি ঢোকবার আগে কতকগুলো কথা তোমার জানা দরকার।

মা পানের পাশেই বসে পড়ে সীমাচলম। একবার বসলে সত্যই উঠতে যেন আর ইচ্ছাই করে না। কাল রাত থেকে একটানা চলেছে শরীরের ওপর অত্যাচার। শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তীব্র একটা বেদনা।

: আমার কাকা এখানকার ডাক্তার বুঝলে : মা পান সরে বসে একটু।

: তাই নাকি : সত্যিই আশ্চর্য হয় সীমাচলম : তোমার কাকাকে দেখে আমি কিন্তু এখানকার জমিদার বলেই মনে করেছিলাম। বুড়ো বয়সে শরীরটিও বেশ তোয়াজে রেখেছেন।

কথাগুলোর বিশেষ আমল দেয় না মা পান। কাকার কাছে নানা রকমের রোগী আসবে কিন্তু, তাদের সম্বন্ধে কোনদিন কোন রকম কথা জানতে চেয়ো না। চুপচাপ শুধু দেখে যাবে। আমরা এখানে চিরকালের জন্য থাকতে আসিনি, এইটে মনে রেখো। ওদিকের ব্যাপার একটু নরম হলেই, এই এঁদো জংগল ছেড়ে পালাবো আমরা।

: আমার দায় পড়েছে তোমার কাকার রোগীদের বংশপরিচয় জানবার জন্য : মুখে

কথাটা বললেও, মনে কিন্তু অজস্র কৌতূহল উঁকি মারে সীমাচলমের। কোথা থেকে কোথায় চলেছে সে ভেসে। শুধু এক দেশ থেকে দেশান্তরে নয়, এক জাতি থেকে অন্য জাতির মধ্যে, এক সংস্কার থেকে অন্য সংস্কারে, বোধ হয় এক বিস্ময় থেকে নতুনতরো কোন বিস্ময়ে।

কাঠের দোতলা বাড়ি। আশে-পাশে মাইল খানেকের মধ্যে জনমানবের বসতি আছে বলে মনে হয় না। বড়ো বড়ো পুকুর আর জঙ্গলের সারি—সমস্ত দিন ঝিঁ ঝিঁ আর তক্ষকের ডাকে কান পাতা যায় না। এমন নিরালা যায়গায় বাড়ি করে না কি মানুষে! গেট খুলে এগতেই বৃদ্ধা একটি মহিলা নেমে আসে। একরাশ পাকা চুল চুড়ো করে মাথার ওপরে বাঁধা—মুখের দু'পাশের চামড়া কুঁচকে ঝুলে পড়েছে আর একটা চোখের সাদা অংশটা বীভৎস ভাবে বেরিয়ে থাকে। সে চোখে যে দেখতে পায় না এটা তার চলার ভংগী দেখেই বোঝা যায়।

ঃ কে রে মা পান না কি! আয়, আয়, অনেকটা হাঁটতে হয়েছে, না?

ঃ আমাদের আসার খবর তুমি কোত্থেকে পেলে খুড়ী?

ঃ বারে তোর কাকা যে বললো। মা পান আসছে, শীগ্‌গীর চায়ের জল চড়িয়ে দাও আর বসবার ঘরটা রাখো পরিষ্কার করে।

ঃ কাকা বুঝি অনেকক্ষণ এসেছে।

ঃ হ্যাঁ, তা বেশ কিছুক্ষণ হলো বৈ কি। খালের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা ধরেই এসেছে। তোদের তো জলা ভেঙে আসতে হ'লো। তা তো হবেই, যা সব জিনিস তোর সংগে থাকে, সে সব নিয়ে তো আর সদর রাস্তা দিয়ে আসা যায় না, কি বল: খিক্ খিক্ করে হেসে ওঠে বৃদ্ধাটি।

বৃদ্ধাটি সরু সরু হাত দুটো জোর করে তালি দেয় আর অনেকক্ষণ ধরে হাসতে থাকে, তারপর হঠাৎ সীমাচলমের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসিটা বন্ধ করে বলেঃ বা, বা, এবার বেশ জোয়ান ম্যানেজার এনেছিস তো সংগে। খুব কাজের লোক বোধ হয়। আগের বারের সেই মড়াখেকো ম্যানেজারটার কাণ্ড মনে হলে এখনও যেন কেমন হয়ে যাই। ধন্যি বুকের পাটা তার। বাঘের ঘরে ঢুকে তার ছা চুরির সাহস। শাস্তিও পেয়েছে তেমনি—যেমন কুকুর,—তেমনি—

আঃ, থামো দিকিনি খুড়ী, তোমার কথা একবার আরম্ভ হলে আর থামতে চায় নাঃ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে মা পান। সংগে সংগেই গলার সুর একেবারে পাল্টে ফেলে বুড়ীঃ আমার যেমন মরণ, কি বলতে কি বলে ফেলি, —আয়, আয়, ভেতরে আয়।

বেশ একটু দমে যায় সীমাচলম। ছোট্ট ছোট্ট কথার টুকরো কিন্তু সব জোড়া দিয়ে অর্থটা পরিষ্কার হয়ে আসে তার কাছে। কিছু বিশ্বাস নেই এদের। সব পারে এরা। দা দিয়ে কুচি কুচি করে কাটলেও বাইরের পৃথিবী কোন সন্ধান পাবে না। চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও সাড়া দেবার লোক নেই মাইল খানেকের মধ্যে। মা পানের পিছনে পিছনে ঘরে ঢোকে সীমাচলম।

নতুন জায়গায় খুব ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের! বেশ একটু শীত শীত করছে। সোয়েটারটা গায়ে চাপিয়ে পশ্চিম দিকের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। গাছের ঝোপে ঝোপে তখনও জমাট অন্ধকার—পাতলা কুয়াসার একটা আস্তরণ সে অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে তুলেছে। অনেক দূরে মোষের গাড়ির সার চলেছে, তারই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

সারা রাত ভালো ঘুম হয়নি সীমাচলমের। একতলার একটা ঘরে তাকে শুতে দেওয়া হয়েছিলো। ঠিক পাশেই পার্টিশন দেওয়া ডাক্তারের চেম্বার। অনেক রাত পর্যন্ত হটগোল আর চীৎকারের সুর ভেসে এসেছিলো সেখান থেকে। মাঝে মাঝে খুবই বিরক্তি বোধ হয়েছিলো সীমাচলমের, ইচ্ছা হয়েছিলো চীৎকার ক'রে বলে ডাক্তার সায়েবকে সারা রাত এভাবে গোলমাল চললে শুতে পারে নাকি কোন মানুষে। কিন্তু ক্লান্তিতে নির্জীব হয়ে পড়েছিলো সে। বিছানা থেকে ওঠবার সামর্থ্যও বুঝি ছিল না তাই এক-সময়ে ওই হটুগোলেও সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ কি একটা দেখে যেন দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। সামনে ঝুঁকে প'ড়ে সে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ তারপর নিজের অজানিতেই হেসে ওঠে খিল খিল ক'রে। হাসবারই অবশ্য ব্যাপার। বাঁশ-ঝাড়ের পাশে বৃষ্টির জল জমে কিছুটা জায়গা প্রায় পুকুরের মত হয়েছে—আশে পাশে বুনো ফুলগাছের ঝোপ। তারই পাশে একটা জায়গায় নিচু টেবিল পাতা—তার ওপরে চায়ের সরঞ্জাম। টেবিল ঘিরে মাপানের খুড়ো আর খুড়ী। খুড়ীর পরনে খুব দামী সিল্কের লুংগী আর গায়ে নীল রেজারের এঞ্জি। চুলের গোছা চুড়ো করে বাঁধা, কাঠের চিরুনী ঘিরে সাদা ফুলের গোছা। অন্ধকার একটু পাতলা হতে অবাক হয়ে যায় সীমাচলম। খুড়ীর দুটি গালে তানাখা আর পাউডার। যৌবন ফিরে এলো নাকি খুড়ীর! খুড়োর অবশ্য সব সময়েই সাজ-পোষাকের একটু বাহুল্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারি হাসি আসে সীমাচলমের। দু' একবার 'খুক' 'খুক' করে হেসেও ওঠে—তারপরেই সাবধান হয়ে যায়। কিন্তু কতক্ষণের জন্যেই বা একটু পরে খুড়ী নাকিসুরে গান শুরু করতেই, খিল খিল করে হেসে উঠলো সীমাচলম।

ভোর না হতেই এতো হাসির ঘটা যে: দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মা পান। রাত্রে যে তারও ঘুম বিশেষ হ'য়েছে তা মনে হয় না। সারা মুখে অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি আর বিরক্তি।

ঃ ওই দেখো না তোমার খুড়ো খুড়ীর কাণ্ড ঃ আঙুলে দিয়ে দেখায় সীমাচলম।

খুড়ীর গান ততক্ষণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার চায়ের পালা। খুড়ী নিজের হাতে চা পরিবেশন করে।

অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখে মা পান। তারপর সীমাচলমের গা ঘেঁসে দাঁড়ায় আর বলেঃ আজ বোধ হয় খুড়ীমার জন্মদিন।

ঃ বছর কুড়ি বয়স হলো বোধ হয় তোমার খুড়ীর ঃ হালকা গলায় বলে সীমাচলম।

ঃ হ্যাঁ, তা তিনকুড়ি হলো বোধ হয়।

ঃ কিন্তু উৎসব থেকে আমরাই বাদ। ভোর রাত্তিরে চুপি চুপি উঠে ঝোপে জঙ্গলে গিয়ে জন্মদিন পালন করতে হবে এ কেমন কথা?

ঃ কলরব থেকে দূরে গিয়ে উৎসব করাই তো ভালো। জনতার রুচি অরুচির প্রশ্ন উঠবে না, ভালো মন্দের কথা উঠবে না—শান্ত আর আড়ম্বরহীন জন্মোৎসব পালন এই তো ভাল ঃ খুব উদাস মনে হয় মা পানের গলা ঃ চলো আমরা সরে যাই, ওরা ফিরে আসছে।

ঃ আসুক না, তোমার খুড়ীকে অভিনন্দন করে যাই ঃ সহজ হবার চেষ্টা করে সীমাচলম।

ঃ না, না, চলো এখান থেকে দেখতে পেলে কি মনে ভাববে ওরা ঃ ব্যাকুল হয়ে ওঠে মা পান।

আগাগোড়া ব্যাপারটা যেন কেমন মনে হয় সীমাচলমের। কিসের এত লুকোচুরি আর চাপাচাপি। কি একটা যেন লুকোচ্ছে মা পান। অবশ্য সব কথাই যে তাকে বলতে হবে এমন কোন চুক্তি কোনদিনই হয়নি মা পানের সংগে। সমস্ত কিছু জানবার অধিকারও তাকে দেয়নি মা পান।

চা খেতে খেতে নিজের থেকেই কথাটা শুরু করে মা পান ঃ জানো খুড়ী কিন্তু মানুষ নয়।

শীমের বীচি ভাজা চিবোতে চিবোতে বেশ একটু চমকে ওঠে সীমাচলম ঃ তার মানে?

ঃ হ্যাঁ, খুড়ী আরাকানের মেয়ে যে। নানা-রকম ওষুধপত্তর খুড়ীর জানা আছে। কোশে-পীন পাতা বেটে জিদি ফলের সংগে মিশিয়ে খাওয়াতে পারলে নির্ঘাৎ পক্ষাঘাত হবে। তা ছাড়া নানারকম শিকড় আর পাতার কথা জানা আছে খুড়ীর—মেয়েছেলে বশ করা, মামলা জেতা, যে কোন সর্বনাশ করা এ সমস্তর ওষুধ একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে। খুড়ো তো খুড়ীকে যমের মতন ভয় করে। খুড়ী তো দ্বিতীয়পক্ষের বৌ খুড়োর এর আগের পক্ষের ছেলে ছিল একটা খুড়োর কিন্তু খুড়ী বাড়ি ঢোকবার পর থেকে ক্রমে রোগা হয়ে যেতে

লাগলো সে—কংকালসার আর মাথার চুল মুঠো মুঠো প'ড়ে যেতে লাগলো। তারপর একদিন দুপুরবেলা কোথাও কিছু নেই—আচমকা চীৎকার করে উঠলো ছেলেটি, ফুলে উঠলো গলার শিরাগুলো, হাত পা শক্ত কাঠির মত হয়ে গেলো আর চোখ দুটো ঠেলে উঠলো কপালে। ব্যস, খতম!

: তোমার খুড়ো না ডাক্তার : নিস্তেজ সীমাচলমের গলার স্বর।

: হুঁ, ডাক্তার না আরো কিছু। খুড়ীর ওষুধ নিয়েই তো খুড়োর ডাক্তারী। রোগী কিন্তু কম নয়। আশে পাশের দু'চারখানা গাঁ ঝেঁটিয়ে রাত দুপুর অবধি রোগীর আর অন্ত নেই।

: তোমার খুড়োর ছেলে মারা গেছে কদ্দিন হবে : সীমাচলমের চা খাওয়া যেন বন্ধ হয়ে যায়।

তা প্রায় বছর পনেরো হবে। আমরা তখন খুব ছোট। খুড়ীর বিয়ের ঠিক পরের বছরে। তারপর সেই মড়া নিয়ে কি কেলেংকারী। খুড়ী তো কিছুতেই পোড়াতে দেবে না সেই মড়া। তার নাড়ি ভুঁড়ি নিয়ে নাকি ওষুধ তৈরী করবে। তারপর অনেক বলাকওয়ার পর বাড়ির সামনের জমিটায় কবর দেওয়া হলো তাকে। ঠিক যে বাঁশঝাড়ের নীচে ভোরবেলা বসেছিলো খুড়ো আর খুড়ী সেই জায়গাটায়। ভোরবেলা খুড়ী ঠিক ওই জায়গাটায় ঘুরে বেড়ায় প্রত্যেক দিন আর বিড় বিড় করে কিসব বকে।

আধিভৌতিক ব্যাপারে চিরকালই আস্থা কম সীমাচলমের। তবু এই পরিবেশে সব যেন কেমন খাপ খেয়ে যায়। নদীর থেকে বহুদূরে নির্জন বনপ্রান্তে অনাত্মীয় পরিবারে জীবনে সব কিছুরই যেন ভিন্ন একটা রূপ আছে।

পনেরোটা দিন একটানা কেটে যায়। বৈচিত্র্যহীন নতুনত্বহীন গতানুগতিক। ক্রমেই যেন হাঁপিয়ে ওঠে সীমাচলম। মা পান উদ্বিগ্ন হ'য়ে দিনের পর দিন নতুন কোন সংবাদের প্রত্যাশা করে, কিন্তু কোন সংবাদ নেই সহর থেকে। কি করে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছে আলিম, কোন খবর না দিয়ে।

একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সীমাচলম। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আঁকা বাঁকা রাস্তা। ফার্ন আর ইউকেলিপটাসের সারি আর ছোট ছোট আগাছার ঝোপ। শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে পথ চলতে মন্দ লাগে না সীমাচলমের। অস্পষ্ট কুয়াশার স্তর সরে যায় চোখের সামনে থেকে। মাদ্রাজের পাহাড়তলী আর হারানো জীবনের কথা ভেসে আসে। এমনি পাহাড় আর এমনি দুর্ভেদ্য অরণ্য সে ফেলে এসেছে অন্য এক প্রদেশে, আর ফেলে এসেছে নতুন জীবনের স্বীকৃতি। শুভলক্ষ্মী নিঃশেষ হয়ে গেছে তার জীবনে, মনের আদিম স্তরেও যেন তার কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই। তারপর এসেছে অনেক সংঘাত—এসেছে হামিদাবানু আর মা পান। একদিনের পরিচয় হামিদাবানুর সঙ্গে আর মা পান এখনও জড়িয়ে আছে তার জীবনে। সমস্ত যেন দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। এ মেঘ কোনদিন কি কাটবে না তার আকাশ থেকে, নতুন সূর্য জাগবে না নতুন দীপ্তিতে—ঝলোমলো ভাস্বর কোন দিন।

পাহাড়ের ঢালু পাড় বেয়ে সংহত গতিতে নেমে আসে সীমাচলম। বাঁশের ঘন ঝোপ—বাতাসে কান্নার সুর তোলে। বাঁশঝোপ পার হ'য়ে একেবারে নদীর কিনারে সে এসে পড়ে।

এদিকটায় বড়রা নামে না কেউ। বাকি আর সবটুকু ঘাসে ঢাকা চর। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে কালো হ'য়ে আসে চারদিক। তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করে সীমাচলম। কিছুটা এগিয়েই ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনে অন্ধকারে কি একটা যেন পড়ে রয়েছে। আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। অনেক কষ্টে চোখদুটো দূরকে ঠাওর করে করে পা বাড়ায় সীমাচলম। কাছে যেতেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার হ'য়ে আসে। প্রকাণ্ড ডিঙি একটা উপুড় করা রয়েছে চরের ওপর। বোধ হয় মেরামত হচ্ছে কিংবা বং লাগানো হচ্ছে ডিঙির ওপর। তেমন একটা [illegible] গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। ডিঙির পাশে যেতেই ফিসফিস শব্দ কানে গেলো সীমাচলমের। বিশেষ কিছুটার দেখে যেন পা ছমছম করে উঠলো [illegible] পড়ে। ঠিক সংগে [illegible] সংকেত। [illegible] কালো পাকা কাঠির এগিয়ে গেলো সীমাচলম।

: কে যায় : গলার আওয়াজে চমকে ওঠে সীমাচলম। কিন্তু সে ডাক উপেক্ষা করা যায় না তা গলার আওয়াজেই বুঝতে পারে সে। আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসে। ডিঙির কাছ বরাবর গিয়েই ও বেশ একটু ভড়কে যায়। প্রায় জন-পাঁচেক লোক হাতে মোটা লাঠি আর লম্বা কোট পরনে। আলো-অন্ধকারে শর্টকায় এই সব চেহারাগুলো অদ্ভুত দেখায়।

কে একজন এগিয়ে এসে দপ করে দেশলাইয়ের কাঠি জেলে ধরে ওর সামনে। দু'একবারের চেষ্টায় কাঠিটা জ্বলে উঠতেই চমকে লোকটি সরে যায়। সীমাচলমও পিছিয়ে আসে দু'পা। সেই স্বল্প আলোতেও চিনতে পারে সীমাচলম। এ চেহারা ভোলবার নয়—সীমাচলম চেঁচিয়ে ওঠে : আরে এ কি আপনি এখানে।

একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়েন মা পানের কাকা। আর একবার জ্বালান দেশলাইয়ের একটা কাঠি। মুখের চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে সীমা-চলমের খুব কাছে এসে দাঁড়ান। টানের সংগে সংগে লাল আলোর আভা। সেই আলোয় কেমন যেন বিবর্ণ দেখায় সীমাচলমের মুখ।

: তুমি হঠাৎ এসময়ে এখানে যেন অস্বাভাবিক রূক্ষ মনে হয় তাঁর কণ্ঠস্বর। এর আগে তাঁর কণ্ঠস্বরে একটি গ্রাম্যটান লক্ষ্য করেছিলো সীমাচলম, যার জন্য তাঁর কথা বুঝতে মাঝে মাঝে বেশ অসুবিধা হতো। ঠিক শহরের ভাষা নয়, যে-ভাষা মা পানের কাছে শিখেছিলো সীমাচলম। আজ কিন্তু কোন জড়তা নেই ভাষায়, বুঝতে সীমাচলমের একটুও কষ্ট হয় না।

: এই এদিকটায় বেড়াতে এসেছিলাম একটু, নদীর ধার দিয়ে দিয়ে সোজা খানিকটা রাস্তা : আমতা আমতা করে সীমাচলম।

সংগের লোকগুলোর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে কি যেন বলেন মা পানের কাকা। গাছের গুঁড়িতে দাঁড়-করানো সাইকেলগুলো নিয়ে তারা মিশে যায় অন্ধকারে।

এগিয়ে আসেন তিনি। একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ান সীমাচলমের।

: চলো, বাড়ির দিকেই যাবে তো!

খুব সাবধানে পা ফেলে সীমাচলম। সরু রাস্তা। হয়ত কারুর জমির সীমানা, কিংবা চষা খালের জল আটকাবার জন্য মাটির স্তূপ জড়ো করা হয়েছে। মাঝে মাঝে শুকনো জারুল গাছের গুঁড়ি বাঁশবনের ঝোপ। অনেকটা পথ পার হলো দুজনে। মা পানের কাকা হাতের লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে চলেন। পিছনে পিছনে তাঁকে লক্ষ্য করে পা চালায় সীমাচলম। অনেকক্ষণ চুপচাপ। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়ার ঝলক। কোথাও ঝাঁঝি বৃষ্টি নেমেছে ধারে কাছে।

: কতদিন মা পানের সংগে আছো তুমি।

: ভারতবর্ষ ছেড়ে পর্যন্ত।

: এ দলে আসলে কি করে?

কোন দলে : খুব ভিজে গলায় জিজ্ঞাসা করে সীমাচলম।

: এই গাঁজা-আফিং-কোকেনের দলে?

: আজ্ঞে আমি তো নই এ দলে। পাকে চক্রে এসে পড়েছি দলে।

: ছাড়তে হবে।

কথাটা ভালো করে শুনতে পায় নি সীমা-চলম। কিংবা হয়ত যা শুনেছিলো তা বিশ্বাসই করতে পারেনি। আরো দু'পা এগিয়ে আসে। একটু উঁচু গলায় বললো : কি বললেন?

: ছাড়তে হবে এদের সংগ। এ ঘূর্ণীতে একবার পড়লে চিহ্ন থাকবে না তোমার। খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে যাবে।

চমকে ওঠে সীমাচলম। ওর গুরুজন থাকলে হয়ত ঠিক এইভাবে সাবধান করে দিতো ওকে এমনি গম্ভীর গলায় আর অধঃপতনের ঠিক পূর্বাহ্নেই। হদিস পায় না সীমাচলম। মা পানের কাকাকে ঠিক এইভাবে যেন কল্পনাও করতে পারেনি ও। গ্রাম্য ডাক্তার টোটকাটোটকি আর ঝাড়ফুঁকই শুধু ভরসা। পুলিশের তাড়া খেয়ে মা পানের চোরাই মাল লুকোবার এক

আস্তানা এ'র বাড়ি। এই ধরণের কথা- কেমন যেন বেমানান এ'র মুখে।

আরো কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। ঝাঁকড়া ডাল- র মধ্যে দিয়ে দু' একটা তারা নজরে । ঝিঁঝির একটানা সুর। কেমন যেন ম স্তব্ধতা।

আল ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নামে দুজনে। এদেশে আসার উদ্দেশ্য?

থেমে পড়ে সীমাচলম। কি ওর উদ্দেশ্য পার হ'য়ে অচেনা মুল্লুকে আসবার অহেতুক খামখেয়াল ছাড়া এ পাড়ি র আর কি কৈফিয়ৎ থাকতে পারে। ন জ্বলে উঠেছিলো বুকে, সেই তপ্ত- জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের মত ছুটে বেড়াতে হয়েছিলো। দেশ থেকে দেশান্তরে। কিন্তু ন্ত কথা বলা যায় নাকি কাউকে!

এ মুল্লুকে আসলে কেন? : আরও র গলার স্বর।

এ স্বর উপেক্ষা করতে সাহস পায় না চলম। আলগোছে উত্তর দেয় ছোট্ট করে: ভাগ্য-অন্বেষণে।

ওঃ, শুনেছিলে বুঝি চুণী-পান্নার দেশ চাল, পেট্রোল আর কাঠে ঠাস বোঝাই। য়ে নামলে রাতারাতি লক্ষপতি হবে আর মাইনের চাকরীর ছড়াছড়ি—মোটর বে আর স্ফূর্তি করবে এই দেশের মেয়ে- কে নিয়ে,—কেমন এই তো! কিন্তু এই র ভেতরটা দেখেছো কোনদিন—যেখানে উ করে আগুন জ্বলছে আর সেই আগুনে লক্ষ-দা আর ভোজালী তেতে লাল হয়ে । ভেবেছো কোনদিন এমন একটা জাগরণ ত পারে এদেশে যার তুলনায় থারওয়াডির হে একটা স্ফুলিঙ্গ মনে হবে। এই সব হাসিখুসি আর আত্মভোলা বর্মীজাতের র বিরাট শৃঙ্খলাবদ্ধ একএকটা দৈত্য কবছে। যেদিন শেকল ভেঙে তারা ছুটে সেদিন শাসকরা সাবধান আর সাবধান । যাদের সাহায্য নিয়ে বর্মাবিজয় সম্ভব ছলো।

থর থর করে কেঁপে ওঠে সীমাচলমের ঠোঁ। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা প। মাথাটা ঝিম ঝিম করে । ঠিক এভাবে কোনদিন ভাবেনি লম, কেউ তাকে ভাবতেও শেখায়নি। একটা দেশ কেউ জয় করে, সেই দেশ আবার কেড়ে নিতে হবে তাদের থেকে এ চিন্তা এমন ব্যাপকভাবে কোন- করেনি সীমাচলম। এ কোন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষের চিন্তা নয়—এ একটা জাতির । কি গভীর বেদনা থেকে এ চিন্তার ভেবে দিশা পায় না সীমাচলম।

পারবে?

কি?

: এই সংগ্রামে এদের পাশাপাশি দাঁড়াতে। 'কালা' বলে তোমাদের এরা কেন এতো ঘৃণা করে জানো? এদের মাঠের ফসল কেটে নিজের গোলায় তোলো তোমরা, এদের বৌ-ঝিদের টাকার জোরে নিজেদের কুক্ষিজাত করো এদের দেশ শোষণ করো পুরোমাত্রায়,—কিন্তু কোন- দিন এদের দুঃখদরদে পাশে এসে দাঁড়াও না। কাজেই বিদেশী শাসকদের থেকে আলাদা করেও এরা তোমাদের কোনদিন দেখতে পারে না। এদের চোখে তারাও যা তোমরাও তাই।

: এদেশ সম্বন্ধে বেশী কিছুই জানি না আমি। আপনি যা বল্লেন তাই যদি সত্যি হয়, তবে ভারতীয়দের খুবই অন্যায় বলতে হবে।

: হ্যাঁ, আমার প্রত্যেকটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। চোখ খুলে এদেশে বাস করলে সবই বুঝতে পারবে।

একটা বাঁক। এটা পার হ'লেই একেবারে মা পানের কাকার বাড়ির ফটকে গিয়ে পৌঁছাবে তারা। একটু থেমে পিছিয়ে আসেন মা পানের কাকা। সীমাচলমের পাশ ঘেঁসে দাঁড়ান তারপর খুব চুপি চুপি বলেন ফিস ফিস করে: এখানে থাকো। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে। কথাগুলো বলেই সোজা রাস্তা ধরে হন্ হন্ করে অন্যদিকে এগিয়ে যান তিনি।

বাড়ি ফিরতেই হৈ চৈ করে ওঠে মা পান: কোথায় গিছলে বলো তো। বিদেশ বিভূঁই— এতো রাত পর্যন্ত, ভেবেই সারা হচ্ছিলাম।

ম্লান হাসে সীমাচলম। ওর জন্যে ভাবে মা পান। ওর দেরী হলে ভাবতো শুভলক্ষ্মী। এরা শুধু ভাবেই—প্রয়োজন হলে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে না এরা সব ছেড়ে! না মা পানও নয়। সীমাচলমকে শুধু প্রয়োজন হ'য়েছিলো তার—প্রহরী হিসাবে। পুলিশের হাতে পড়লে নির্বিচারে তার দিকে আঙুল দেখাতে একটুও দ্বিধাবোধ করতো না মা পান। মা পান কি জানে,—সে তো মেলেছেলে এই পোঁটলা পুটলী ওই পুরুষটিই তো নিয়ে চলেছে, সে শুধু চলেছে সংগে। বাস কোন দিক দিয়ে কোনরকমে অসুবিধা হোতো না। পুলিশের নেকনজরে সীমাচলমের বরাত জুটতো হাজতবাস আর মা পানের কিছু মাল বরবাদ হোতো। এই পর্যন্ত। কিন্তু কোন কথা বলে না সীমাচলম। মা পানের পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। ঘরে ঢুকেই কিন্তু টের পেলো মা পানও এসেছে পিছনে পিছনে।

: কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হবে। তৈরী থাকবে।

চমকে ওঠে সীমাচলম: কাল ভোরেই?

: হ্যাঁ, চিঠি এসেছে আলিমের। আহা, অসুখে পড়েছিলো বেচারী তাই উত্তর দিতে দেরী হ'য়ে গেলো।

: পুলিশের ব্যাপারের কি হলো: কথাটার ওপর খুব জোর দেয় না সীমাচলম।

: হবে, হবে আবার কি। থানাতল্লাসী ক'রে তারা ফিরে গেছে। এবারে মালপত্তর নিয়ে হাজির হবো আমরা।

কোন উত্তর দেয় না সীমাচলম। অনেকক্ষণ জানলার গরাদ ধরে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। বাইরে নিরন্ধ্র অন্ধকার। এমনি অন্ধকার বুঝি নামবে ওর জীবনে। কোথাও একটু আলোর কণামাত্রও নেই। এ অন্ধকারের যেন শেষ নেই- ওকে হয়ত গ্রাসই করবে এ তমিস্রা।

বাইরে থেকে মুখ ফেরায় সীমাচলম। মা পান দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে। কেরো- সিনের ম্লান আলোয় পাণ্ডুর দেখাচ্ছে তার মুখ—কেমন যেন বিষণ্ণ আর নিষ্প্রভ। মায়া হয় সীমাচলমের। ওকে সম্বল করেই এই দূর- পথে পাড়ি দিয়েছিলো মেয়েটি—ফিরে যাবে নাকি একলা?

আস্তে উত্তর দেয় সীমাচলম: কাল ভোরে তৈরী থাকবো। আমার জন্য চিন্তা করো না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যায় মা পান।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করে সীমাচলম। রাশি রাশি চিন্তা ভাবনার যেন শেষ নেই তার। সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। কোকেনের চোরা ব্যবসা আর জুয়া এই নাকি তার জীবনের পরিধি! পুলিশের তাড়া খেয়ে খেয়ে এইভাবে পালানোর কোথায় শেষ? আলিমকে মনে পড়ে আর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ওর। সাপের মত শান্ত দুটি চোখ কিন্তু চাউনীতে যেন বিষ সঞ্চারিত হয় সারা দেহে। মা পানের সংগে মেশামিশি মোটেই ভালো চোখে দেখে না সে। মা পানকে মাঝখানে রেখে দ্বন্দ্বযুদ্ধই বুঝি শুরু হবে একদিন! এ সমস্ত কিন্তু চায়নি সীমাচলম। যে শুভলক্ষ্মীকে নিজের রক্তবিন্দুর চেয়েও আরও গভীরভাবে ভালোবাসতো, এদের আওতায় পড়ে তাকে যেন ভুলে যেতে আরম্ভ করেছে। শুভলক্ষ্মীকে ভোলা ছাড়া তার কি পথই বা আছে, তবে এভাবে তাকে ভুলাতে চায়নি সে। তার জায়গায় অন্য কাউকে বসিয়ে তাকে নামিয়ে দেবে বিস্মৃতির অতলগর্ভে— তা অসম্ভব। তার চেয়ে এই ভালো—মনকে একেবারে ঘুরিয়ে দেওয়া এই পরিবেশ থেকে মা পানের কাকার কথাগুলো রক্তে যেন দোল দেয় তার। জীবনের এদিকটার সংগে কোনদিন পরিচয় ছিল না তার। মন্দ কি নতুনতরো এক খেলা—শুভলক্ষ্মী ভেঙে চুরমার হয়ে যাক।

আচমকা কড়া নাড়ার শব্দে বিছানায় উঠে বসে সীমাচলম। মা পান আসলো নাকি আবার। বিরক্ত হয়ে ওঠে সে।

না, মা পান নয়। দরজা খুলেই পিছিয়ে আসে সীমাচলম। সামনেই মা পানের কাকা। ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে খুড়ী! দুজনের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। দরজা খুলতেই ঢুকে পড়েন মা পানের কাকা। তারপর খুড়ি ঘরে ঢুকতেই তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেন দরজাটা।

স্বল্প পরিসর খাটের ওপরে ঘেঁষাঘেঁষি বসে তিনজনে।

: তুমি কি ঠিক করলে : মা পানের কাকার গলা।

: আপনার সংগেই থাকবো : সব যেন ঠিক করে ফেলেছে সীমাচলম। সংশয়ের দোলায় দুলে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। ঢেউয়ের মাঝখান থেকে কোন একটা আশ্রয় চায়—যে কোন একটা চর। পায়ের তলায় ধ্বসে যাওয়া বালুচরই যদি হয়—ক্ষতি কি?

: তা হলে মা পানের সংগে যাওয়া চলবে না তোমার।

: কিন্তু কি বলা যায় তাকে : এদিকটা যেন ভেবেই দেখেনি সীমাচলম।

: তাকে যা বলবার আমিই বলবো : এই প্রথম কথা বলে খুড়ি।

ম্লান আলোয় বিবর্ণ দেয়ালে দীর্ঘতর হয়ে পড়েছে কালো কালো ছায়া। কাঁপছে ছায়াগুলো। সীমাচলমের বুকটা ঢিপ ঢিপ করে ওঠে। আর এক অজানা পথ—কোথায় শেষ কে জানে,—তা হোক, নতুনত্বের আস্বাদ পাওয়া যাবে মন্দ কি।

: তা হলে এখনি তোমাকে তো রওনা হতে হয়।

রওনা? আবার কোথায় যেতে হবে তাকে গভীর এই রাত্রে। শেওলার মত ভেসেই বুঝি বেড়াতে হবে তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

কোথায় যেতে হবে : শান্ত আর নিস্তেজ গলার স্বর।

পরে জানতে পারবে। তোমার জিনিস পত্তর নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ো।

পিছনের রাস্তায় মোষের গাড়ী তৈরী আছে, ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে।

কি আর জিনিস-পত্তর। পোষাকের পুঁটলীটা কাঁধে ফেলে নেয় সীমাচলম। নতুনত্বের নেশা যেন ওকে পেয়ে বসেছে।

: আমি তৈরী।

: বেশ এসো তাহলে।

মোমবাতি জেলে পথ দেখায় খুড়ি। মোমবাতির কম্পমান শিখায় সব কিছু যেন কাঁপতে থাকে। পাশের ঘরে শুয়ে আছে মা পান। দরজা পার হবার সময় তার নিশ্বাসের গভীর শব্দ শুনতে পায় সীমাচলম। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাচ্ছে মা পান। আলিমের খবর এসেছে তার জীবনের চিরসাথী আলিম। গাম্য পরিবেশ ছেড়ে এবার শহরে চলে যেতে পারবে সে।

খিড়কী দরজা দিয়ে মাঠে নেমে পড়ে তিনজনে। কালো আকাশে অজস্র তারার সমাবেশ। তার মধ্যে জ্বল জ্বল করে উঠছে শুকতারাটি। অন্ধকার যেন একটু পাতলা হয়ে আসছে। হাওয়া উঠেছে। বাঁশপাতার মধ্য দিয়ে আর উল্টানো ডিঙির গলুইয়ের ভিতর দিয়ে কেমন ভাবে কেঁদে কেঁদে ওঠে বাতাসের শব্দ।

কাঁচা রাস্তার ওপরেই মোষের গাড়ী একটা। অন্ধকারে খুব ভালো করে কিছু ঠাওর হয় না। মোমবাতির অস্পষ্ট আলোয় শুধু গাড়ীর ছইটা নজরে পড়ে। গাড়ীতে উঠে বসে সীমাচলম।

: আপনার সংগে আবার কবে দেখা হবে : সীমাচলমের গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে।

: মা পান আজ ভোরেই চলে যাবে—দিন কতক বাদেই নিয়ে আসবো তোমাকে।

: মা পান শহরে গিয়ে পেঁছালে তারপর : এই সংগে যোগ করে দেয় খুড়ি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মরিয়া হ'য়ে বলে ফেলে সীমাচলম : একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি।

: বলো।

: আপনি কি সত্যিই ডাক্তার—মা পানের কাছে যা শুনেছিলাম।

: হতে বাধা কি।

: বাধা নেই কিছুই কিন্তু আমার যেন মনে হয় এ সমস্ত আপনার ছদ্মবেশ। এই টোটকা-টুটকি আর গাছগাছড়ার ওষুধ-পত্তর।

মোমবাতির স্বল্প আলোতেও জ্বলে জ্বলে ওঠে মা পানের কাকার চোখদুটো। কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে আর দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা সজোরে কামড়ে ধরেন তিনি।

ভয় পেয়ে যায় সীমাচলম। কিন্তু অদম্য কৌতূহল সমস্ত কিছু বাধা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। আজ আর কোন লুকোচুরি নয়। নতুন পথে পা দেওয়ার এই সন্ধিক্ষণে সব কিছু ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাক।

: অন্যায় করেছি কি?

: কিসের অন্যায়?

: এই সমস্ত কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে।

: না, অন্যায় আর কি। ডাক্তার আমি সত্যিই—তবে ডাক্তারী আমি করি না।

: তবে গভীর রাতে যারা আসে আপনার কাছে, তারা আপনার রোগী নয়?

ঝুঁকে পড়েন মা পানের কাকা। সমস্ত দেহটা উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠছে তাঁর। একটা হাত দিয়ে চেপে ধরেন সীমাচলমের মণিবন্ধ। সীমাচলমের মনে হয় যেন হাতের হাড়গুলো পিশে যাবে ওর সশব্দে গুঁড়িয়ে যাবে।

: তুমি এসব জানলে কি করে।

: প্রথম দিন রাত্রে ঘুম হয় নি আমার। আপনার ঘরে অনেকগুলো লোকের কথাবার্তা শুনেছিলাম আমি। তার আগেই মা পান বলে ছিলো আমায় এই অদ্ভুত সময়ে নাকি রোগী দেখেন আপনি।

: না রোগী নয় তারা—তারা আমার দলেরই লোক। সময়ে সবই শুনতে পাবে : হাতটা ছেড়ে দিলেন সীমাচলমের আর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন গাড়ীতে ভর দিয়ে।

: আরো একটা কথা : সব কিছু জানতে চায় সীমাচলম।

: কি?

: খুড়ি যে এভাবে থাকেন এটাও কি ছদ্মরূপ তার?

আবার যেন কেমন হয়ে যান মা পানের কাকা : সব কিছু জানবার প্রয়োজন নেই এখন। তবে এইটুকু শুনে যাও ইনি আমার স্ত্রী নন।

: স্ত্রী নন আপনার : ভয়ার্ত গলার স্বর সীমাচলমের। কি অদ্ভুতভাবে ভেসে চলেছে সে এক রহস্য থেকে অন্য রহস্যে।

: থারাওয়াডী বিদ্রোহের নাম শুনেছো? সেয়া সান যিনি এই বিদ্রোহের প্রাণ ছিলেন ইনি তাঁরই একমাত্র ভগ্নী। এর স্বামীকে পুলিশের লোকেরা কিরীচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। সেই ছিন্নভিন্ন দেহ ইনি কুড়িয়ে নিয়ে এসে আমার বাগানেই কবর দিয়েছিলেন। ইনি স্বামীর তর্পণ করার জন্যই বেঁচে আছেন আজো।

অসংখ্য প্রশ্ন ভেসে আসে সীমাচলমের মনে। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে তার। সমস্ত কিছু যেন একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে আসছে তবু যেন অনেক কিছু অস্পষ্টই রয়েছে এখনও। সব কিছু জানার অবকাশ হবে কি তার।

কিন্তু আর নয়। গাড়ী ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছেন মা পানের কাকা। মোমবাতি হাতে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুড়ি।

মোষের গলার ঘণ্টাটা অদ্ভুতভাবে বেজে চলেছে। তালে তালে পা ফেলছে ওরা। কাঁচা রাস্তার থপ থপ করে একটা আওয়াজ আর চাকাগুলোর আবর্তনের সংগে সংগে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ।

তখনও দাঁড়িয়ে আছেন মা পানের কাকা। খুড়ির হাতের মোমবাতির কম্পমান আলোয় বীভৎস দেখায় তাঁর কপালের বলিরেখা আর মুখোসের মত ভাবলেশহীন মুখ।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে খুড়ির দিকে চায় সীমাচলম। এলোমেলো চুলের রাশ। বার্ধক্যের কালো ছায়া নেমেছে মুখের প্রতি লোমকূপে। ম্লান দুটি চোখের নীচে টলমল করছে অশ্রু।

বড় বাঁশের ঝাড় বাঁ দিকে রেখে বাঁক ফেরে গাড়ীটা।

(ক্রমশঃ)

একটী গৃহপালিত পশু

শীম.জাকি টৌসোন

[নূতন যুগের কবি হিসেবেই তিনি লিখতে শুরু করেন, কিন্তু রুশ-জাপান যুদ্ধের পর থেকে উপন্যাস লেখার দিকে মন দেন। অল্পবিস্তর ইউরোপীয় ছাঁচেই তিনি উপন্যাস লেখেন। তবে তাঁর ছোট গল্পে তিনি খাঁটী জাপানীই রয়ে গেছেন। তাঁর অনুবাদক বলেছেন, 'প্রকৃতির সংগে অন্তরংগতা, আর জীবনের সংগে গভীর পরিচয়' তাঁর সমস্ত ছোট গল্পের মধ্যে অনুভূত হয়।]

গোড়ায় জন্মতেই তার কপাল পুড়েছে; পৃথিবীতে সে এসেছে খাটো খাটো ধূসর লোম, ঝুলন্ত কান আর খেঁকশিয়ালী ধরণের চোখ নিয়ে। যেসব পশুকে আদরে গৃহপালিত হিসেবে নেওয়া হয়, তার প্রত্যেকটির এমন একটি বিশেষ গুণ থাকে, যা আপনাতেই মানুষের সখ্যভাব আকর্ষণ করে নেয়। কিন্তু তা সে পারনি। মুখখানিতে তার এমন কিছু নেই যাতে মানুষের ভালবাসা সে পেতে পারে। গৃহপালিত পশুর সাধারণ গুণগুলোর ষোলো আনা অভাব তার মধ্যে। সে পরিত্যক্ত থেকে যায় স্বভাবতঃই।

যা হোক, তবু সে একটা কুকুর তো, এমনি একটা প্রাণী যে নিজের উপর নির্ভর করে বাঁচতে পারে না। মানুষে দেওয়া খাদ্যের মুখাপেক্ষী, সাত পুরুষের বাসভূমি ছেড়ে দিয়ে তার আদি পুরুষদের বন্য আবাসে ফিরে যেতে পারে না সে। উপযোগী মনুষ্যাবাস একটির অনুসন্ধান করতে সে লেগে যায়।

কিনসান, একজন জমিদার। তার জমিদারিতে এই ঝঞ্ঝাটে জীবটি ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে থাকে, যখন নূতন কাঠের ছাদওয়ালা ভাড়াটে বাড়ি তৈরির কাজ সবে মাত্র শেষ হয়েছে। ওকুবোর গ্রাম্য পথের পাশাপাশি বাড়িখানা তৈয়ার করা হয়েছে, অবস্থানটা এমন ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে যে কেউ পেছনের উঠোনটি হ'য়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারে। মেজেটা এর উঁচু আর তলায় মাটি শক্ত শুকনো। তদুপরি এ বাড়ি আর পাশের বাড়ির মধ্যেকার পাঁচিলের গোড়াতে একটা সংকীর্ণ, অন্ধকার শূন্যস্থান রয়েছে, যাতে জরুরী অবস্থায় চটপট সে আত্মগোপন করতে পারে। সে অবিলম্বে ভূগর্ভস্থ আশ্রয়টাকে কায়েম করে নেয়।

আশু প্রয়োজন হচ্ছে তার খাবার যোগাড় করা। ওই জমিদারী এলাকাতে আরো দু'খানা ভাড়াটে বাড়ি রয়েছে এতে কিনসান পরিবারের খামার বাড়ি ধরণের সদর বসতবাটী মিলে গিয়ে চারখানাতে দাঁড়িয়েছে। বাড়িগুলো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আর অনেকগুলি গাছ বিরাজমান মনোরম শাখায় ওদের মাঝখানে। তার ছুঁচলো নাক প্রথমেই হেঁশেলের পথের সন্ধান তাকে শিখিয়েছে। সে ক্ষুধার্ত তাই বাছাবাছির সময় তার নেই। ফলের খোসা, ঠাণ্ডা দুর্গন্ধ ঝোল, পাতের পচা এঁটো—যা পায় তাই সে খায়। যদি তাও তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে ঘুরে ঘুরে জঞ্জালের স্তূপ সে শুঁকে শুঁকে বেড়ায়, আর পাতি পাতি ক'রে খোঁজাখুঁজি করে যতটুকু তার সাধ্যে কুলোয়। কুয়োর পাশে কাপড় ধোয়ার টবে ছোট ছোট কতকগুলো ময়লা মোজা চুবানো ছিল। পরিতৃপ্তির সংগে ওই টব থেকে সে জল খায়।

পুরোনো একটা মোকুসেই রয়েছে বাগানের মধ্যে। এর ছায়াকে সে জিরোবার যায়গা ক'রে নেবে বলে ঠিক ক'রে ফেলে; পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ পড়ে মাটিকে তাতিয়ে তোলে তাতে চার পা ছড়িয়ে সে হাঁপায় নয় ভেজা যায়গাগুলোকে আঁচড়ে আঁচড়ে চুলকোয়। সন্ধ্যের সংগে সঙ্গে সে ভূগর্ভস্থ আবাসে প্রবেশ করে উপরস্থ পাটাতনের নীচে কাঠকয়লার বস্তাগুলোর গায়ে শুয়ে পড়ে। প্রকাণ্ড একটা টবেও সে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। সময় সময় সে নুয়ে নুয়ে রান্নাঘরের নীচ দিয়ে যদ্দুর পথ আছে চলে যায়, গিয়ে গরম কাঠকয়লার বাক্সে কাঠকয়লার মধ্যে ঘুম দেয়। এমনিভাবে সে জীবন সুরু করে।

এই সময় কিনসান পরিবার বাদামী আর সাদায় বিচিত্র একটা কুকুর রাখল। নাম ওর পোচি। প্রাণবন্ত এই পোচিই একমাত্র প্রাণী যে তাকে সমাদর করল। পোচির একটা শিশুর মন আছে বলে মনে হয়, ও ভদ্রভাবে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে এগিয়ে আসে তার কাছে। সে তার নোংরা লেজটি দোলাতে দোলাতে প্রত্যুত্তরে ওকে অভিনন্দিত করে।

অথচ কিনসান ও তার জমিদারিতে যারা বাস করে তারা কেউই তাকে পোচির মত গ্রহণ করল না। এমন কি জীবজন্তুদের মধ্যেও কুৎসিত হওয়া একটা মস্ত অভিশাপ নয় কি' একজন মন্তব্য করল। 'আর একটুখানি ভালো হ'লে আমিই হয়তো ওকে নিতাম', আরেকজন বলল। এ সব কিছুই তার কাছে নিরর্থক। এদের মধ্যে যারা জানে না তারা তাকে ডাকে 'পাপ' বলে। বাড়ি চারখানার প্রত্যেকটিতেই খুড়িমা আছেন একজন একজন ক'রে, পরিবারের কর্ত্রীকেই এমনি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেবল ওই খুড়িমারাই নন তাদের ছেলেপিলেরা পর্যন্ত তাকে নিয়ে চিৎকার ক'রে হাসে, ঘেন্নায়, ঠাট্টা আমোদে আটখানা হ'য়ে ডাকে, ডাকে 'পাপ, পাপ।' খুড়োদের বেলায় এসব আরো সাংঘাতিক। তার সতর্কতায় একটু ঢিলে পড়লে তারা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। কত কী তার উপর নিক্ষেপ করা হয়—পাথর, কাদার ডেলা লোহার টুকরো। একদিন মস্ত দরজার ঠেকনা একটা তার উপর ছুঁড়ে মারা হ'ল, তাতে পেছনের পা তার খোঁড়া হয়ে গেল।

ক্রমান্বয়ে, মানুষের মন সে বুঝে নেয়। মুখের অর্থপূর্ণ কুঞ্চন, কোনো কিছু কুড়িয়ে নেওয়ার ভংগী, ঘাড়ের ঝাঁকুনি আর ওষ্ঠ দংশন—তার বিরুদ্ধে অভিব্যক্ত সর্বপ্রকারের মনোভাব—দেখায় তার প্রতি গভীর হিংস্রতার ব্যাধসুলভ নিদর্শন। কিনসানের রান্নাঘরে একদিন সে প্রায় ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল আর কি। কেউ জানে না সে সেযাত্রা কিভাবে পালিয়ে বাঁচল। একজন চেঁচাচ্ছিল: 'দড়ি আন—দড়ি দড়ি!' সে বেপরোয়া, খাটো খাটো গাছ ভর্তি বাগানের ভেতর দিয়ে সে চালাঘরের দিকে চলে গেল; পালপার্বণের দিনে বিক্রীর জন্যে ফুলে ভরা মাঠে খামারটা মোড় দিয়ে পালিয়ে গেল!

'যাঃ! ফসকে গেল!' খুড়োদের অন্যতম একজন বললেন। 'একটা ঝঞ্ঝাটে চিজ নয় ওটা?' উত্তরে কিনসান বললেন, হাসলেন ভালোমানুষের মত।

কেবল একবার বা দু'বার সে এমনি বিপাকে পড়েনি। সে সে-কুকুরই নয় যে, এ ধরণের নিগ্রহে সে কাবু হয়ে যাবে। খাদ্যান্বেষণে প্রশান্ত গম্ভীর মুখে সে ঘুরে বেড়ায়, ভাবে ভংগীতে এমনি যেঃ 'আমার নিজের এটা জমিদারি।' তোয়াক্কা না ক'রে সে ভাড়াটে বাড়ির রান্নাঘরে বীরদর্পে ঢুকে পড়ে, নয়তো তার নোংরা পা নিয়ে উপরে বারান্দা পর্যন্ত উঠে যায়। লপেটার জুড়ি আঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে, ধুলোকাদায় মাড়িয়ে খুড়ীমাদের ধোয়া জিনিসপত্র নিয়ে সে খেলা করে। মানুষের সন্তানসন্ততির প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই। এই পরিবারে একটা মেয়ে আছে—নাম ওর কোচ্যান: মস্ত মস্ত কাঠের খড়ম পায়ে দিয়ে পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে ও উঠোনে আসে—খেলবার ওর অমনি সখ। আমোদ করবার জন্যে সে ওকে

একটা গৃহপালিত পশু

দীম.জাকি টোসোন

[নূতন যুগের কবি হিসেবেই তিনি লিখতে শুরু করেন, কিন্তু রুশ-জাপান যুদ্ধের পর থেকে উপন্যাস লেখার দিকে মন দেন। অল্পবিস্তর ইউরোপীয় ছাঁচেই তিনি উপন্যাস লেখেন। তবে তাঁর ছোট গল্পে তিনি খাঁটী জাপানীই রয়ে গেলেন। তাঁর অনুবাদক বলেছেন, 'প্রকৃতির সংগে অন্তরংগতা, আর জীবনের সংগে গভীর পরিচয়' তাঁর সমস্ত ছোট গল্পের মধ্যে অনুভূত হয়।]

গোড়ায় জন্মতেই তার কপাল পুড়েছে; পৃথিবীতে সে এসেছে খাটো খাটো ধূসর লোম, ঝুলন্ত কান আর খেঁকশিয়ালী ধরণের চোখ নিয়ে। যেসব পশুকে আদরে গৃহপালিত হিসেবে নেওয়া হয়, তার প্রত্যেকটির এমন একটি বিশেষ গুণ থাকে, যা আপনাতেই মানুষের সখ্যভাব আকর্ষণ করে নেয়। কিন্তু তা সে পায়নি। মুখথ নিতে তার এমন কিছু নেই যাতে মানুষের ভালবাসা সে পেতে পারে। গৃহপালিত পশুর সাধারণ গুণগুলোর ষোলো আনা অভাব তার মধ্যে। সে পরিত্যক্ত থেকে যায় স্বভাবতঃই।

যা হোক, তবু সে একটা কুকুর তো, এমনি একটা প্রাণী যে নিজের উপর নির্ভর করে বাঁচতে পারে না। মানুষে দেওয়া খাদ্যের মুখাপেক্ষী, সাত পুরুষের বাসভূমি ছেড়ে দিয়ে তার আদি পুরুষদের বন্য আবাসে ফিরে যেতে পারে না সে। উপযোগী মনুষ্যাবাস একটির অনুসন্ধান করতে সে লেগে যায়।

কিনসান, একজন জমিদার। তার জমিদারিতে এই ঝঞ্ঝাটে জীবটি ইতস্তত ঘুরাফেরা করতে থাকে, যখন নূতন কাঠের ছাদওয়ালা ভাড়াটে বাড়ি তৈরির কাজ সবে মাত্র শেষ হয়েছে। ওকুবোর গ্রাম্য পথের পাশাপাশি বাড়িখানা তৈয়ার করা হয়েছে, অবস্থানটা এমন ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে যে কেউ পেছনের উঠোনটি হ'য়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারে। মেজেটা এর উঁচু আর তলায় মাটি শক্ত শুকনো। তদুপরি এ বাড়ি আর পাশের বাড়ির মধ্যেকার পাঁচিলের গোড়াতে একটা সংকীর্ণ, অন্ধকার শূন্যস্থান রয়েছে, যাতে জরুরী অবস্থায় চটপট সে আত্মগোপন করতে পারে। সে অবিলম্বে ভুগর্ভস্থ আশ্রয়টাকে কায়েম করে নেয়।

আশু প্রয়োজন হচ্ছে তার খাবার যোগাড় করা। ওই জমিদারী এলাকাতে আরো দু'খানা ভাড়াটে বাড়ি রয়েছে এতে কিনসান পরিবারের খামার বাড়ি ধরণের সদর বসতবাটী মিলে গিয়ে চারখানাতে দাঁড়িয়েছে। বাড়িগুলো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আর অনেকগুলি গাছ বিরাজমান মনোরম শাখায় ওদের মাঝখানে। তার ছুঁচলো নাক প্রথমেই হেঁশেলের পথের সন্ধান তাকে শিখিয়েছে। সে ক্ষুধার্ত তাই বাছাবাছির সময় তার নেই। ফলের খোসা, ঠাণ্ডা দুর্গন্ধ ঝোল, পাতের পচা এঁটো—যা পায় তাই সে খায়। যদি তাও তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে ঘুরে ঘুরে জঞ্জালের স্তূপ সে শুঁকে শুঁকে বেড়ায়, আর পাতি পাতি ক'রে খোঁজাখুঁজি করে যতটুকু তার সাধ্যে কুলোয়। কুয়োর পাশে কাপড় ধোয়ার টবে ছোট ছোট কতকগুলো ময়লা মোজা চুবানো ছিল। পরিতৃপ্তির সংগে ওই টব থেকে সে জল খায়।

পুরানো একটা মোকুসেই রয়েছে বাগানের মধ্যে। এর ছায়াকে সে জিরোবার যায়গা ক'রে নেবে বলে ঠিক ক'রে ফেললে; পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ পড়ে মাটিকে তাতিয়ে তোলে তাতে চার পা ছড়িয়ে সে হাঁপায় নয় খোলো যায়গাগুলোকে আঁচড়ে আঁচড়ে চুনকোয়। সন্ধ্যার সংগে সংগে সে ভুগর্ভস্থ আবাসে প্রবেশ করে উপরস্থ পাটাতনের নীচে কাঠকয়লার বস্তাগুলোর গায়ে শুয়ে পড়ে। প্রকাণ্ড একটা টবেও সে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। সময় সময় সে নুয়ে নুয়ে রান্নাঘরের নীচ দিয়ে ইঁদুরের পথ আছে চলে যায়, গিয়ে গরম কাঠকয়লার বাক্সে কাঠকয়লার মধ্যে ঘুম দেয়। এমনিভাবে সে জীবন সুরু করে।

এই সময় কিনসান পরিবার বাদামী আর সাদায় বিচিত্র একটা কুকুর রাখল। নাম ওর পোচি। প্রাণবন্ত এই পোচিই একমাত্র প্রাণী যে তাকে সমাদর করল। পোচির একটা মিশুকে মন আছে বলে মনে হয়। ও ভদ্রভাবে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে এগিয়ে আসে তার কাছে। সে তার নোংরা লেজটি দোলাতে দোলাতে প্রত্যুত্তরে ওকে অভিনন্দিত করে।

অথচ কিনসান ও তার জমিদারিতে যারা বাস করে তারা কেউই তাকে পোচির মত গ্রহণ করল না। এমন কি জীবজন্তুদের মধ্যেও কুৎসিত হওয়া একটা মস্ত অভিশাপ নয় কি' একজন মন্তব্য করল। 'আর একটুখানি ভালো হ'লে আমিই হয়তো ওকে নিতাম', আরেকজন বলল। এ সব কিছুই তার কাছে নিরর্থক। এদের মধ্যে যারা জানে না তারা তাকে ডাকে 'পাপ' বলে। বাড়ি চারখানার প্রত্যেকটিতেই খুড়িমা আছেন একজন একজন ক'রে, পরিবারের কর্ত্রীকেই এমনি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেবল ওই খুড়িমারাই নন তাদের ছেলেপিলেরা পর্যন্ত তাকে নিয়ে চিৎকার ক'রে হাসে, ঘেন্নায়, ঠাট্টা আমোদে আটখানা হ'য়ে ডাকে, ডাকে 'পাপ, পাপ।' খুড়োদের বেলায় এসব আরো সাংঘাতিক। তার সতর্কতায় একটু ঢিলে পড়লে তারা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। কত কী তার উপর নিক্ষেপ করা হয়—পাথর, কাদার ডেলা লোহার টুকরো। একদিন মস্ত দরজার ঠেকনা একটা তার উপর ছুঁড়ে মারা হ'ল, তাতে পেছনের পা তার খোঁড়া হয়ে গেল।

ক্রমান্বয়ে, মানুষের মন সে বুঝে নেয়। মুখের অর্থপূর্ণ কুঞ্চন, কোনো কিছু কুড়িয়ে নেওয়ার ভংগী, ঘাড়ের ঝাঁকুনি আর ওষ্ঠ দংশন—তার বিরুদ্ধে অভিব্যক্ত সর্বপ্রকারের মনোভাব—দেখায় তার প্রতি গভীর হিংস্রতার ব্যাধসুলভ নিদর্শন। কিনসানের রান্নাঘরে একদিন সে প্রায় ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল আর কি। কেউ জানে না সে সেযাত্রা কিভাবে পালিয়ে বাঁচল। লোকজন চেঁচাচ্ছিলঃ 'দড়ি আন দড়ি দড়ি!' সে বেপরোয়া, খাটো খাটো গাছ ভরতি বাগানের ভেতর দিয়ে সে চালাঘরের দিকে চলে গেল; পালপার্বণের দিনে বিক্রীর জন্যে ফসলে ভরা মাঠে খামারটা মোড় দিয়ে পালিয়ে গেল।

'যাঃ! ফসকে গেল!' খুড়োদের অন্যতম একজন বললেন। 'একটা ঝঞ্ঝাটে চিজ নয় ওটা?' উত্তরে কিনসান বললেন, হাসলেন ভালোমানুষের মত।

কেবল একবার বা দু'বার সে এমনি বিপাকে পড়েনি। সে সে-কুকুরই নয় যে, এ ধরণের নিগ্রহে সে কাবু হ'য়ে যাবে। খাদ্যান্বেষণে প্রশান্ত গম্ভীর মুখে সে ঘুরে বেড়ায়, ভাবে ভংগীতে এমনি যেঃ 'আমার নিজের এটা জমিদারি।' তোয়াক্কা না ক'রে সে ভাড়াটে বাড়ির রান্নাঘরে বীরদর্পে ঢুকে পড়ে, নয়তো তার নোংরা পা নিয়ে উপরে বারান্দা পর্যন্ত উঠে যায়। লপেটার জড়ি আঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে, ধুলোকাদায় মাড়িয়ে খুড়ীমাদের ধোয়া জিনিসপত্র নিয়ে সে খেলা করে। মানুষের সন্তানসন্ততির প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই। এই পরিবারে একটা মেয়ে আছে—নাম ওর কোচান; মস্ত মস্ত কাঠের খড়ম পায়ে দিয়ে পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে ও উঠোনে আসে—খেলবার ওর অমনি সখ। আমোদ করবার জন্যে সে ওকে

ধাওয়া করে। কোচ্যান মধ্যে মধ্যে চমৎকার এক এক টুকরো পিঠে নিয়ে আসে—লালা ঝরে দেখলে—আর তুলে দেখায় তাকে।

'এই দ্যাখ্! এই দ্যাখ্, পাপ্!'

সংগে সংগে সে কোচ্যানের দিকে লাফ দেয়।

'ওমা, পাপ্ পাজী গো!'

এইটে সব সময়েই কোচ্যানের সাহায্য প্রার্থনাসূচক আর্তনাদ। তক্ষুনি খুড়িমা ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ছুটে আসেন, কোচ্যানকে চিৎকার ক'রে ডাকেন।

'পালা, কোচ্যান!—শীগ্গির! এতো বড় খড়ম পায়ে দিস্ কেন?' কোচ্যান বেচারীর কিছুই থাকে না এর মধ্যে। ক্রন্দনরত কোচ্যানের কাছ থেকে সে পিঠেখানা নিয়ে যায়, মনুষ্য খাদ্য, মিঠাই মণ্ডা এমনি উপায়ে সে আদায় ক'রে নেয়। স্বাভাবিকভাবে সে তার নাকের ডগা তার লাল জিব দিয়ে লেহন করে ওই সময়।

এ সত্ত্বেও তার আচরণে ভালো বা মন্দের কোনো অভিপ্রায় ছিল না। সে শুনেছে এই কথাগুলি পল্লীর খুড়ো খুড়িমাদের মুখ থেকে, তবে ওদের সম্বন্ধে কিছুই তার জানা নেই। মানুষের অনুসৃত শালীনতা ও ভদ্রতার কোনো ধারণা তার নেই। সে একটা কুকুর, এইমাত্র। তার আচরণ শিষ্ট কি অশিষ্ট কোনো প্রশ্ন নেই সে-সম্বন্ধে। অভাগা একটা পশু মাত্র সে, তার প্রকৃতিগত আচরণই সে ক'রে যাচ্ছে।

ঠাণ্ডা, অপ্রচুর, শোচনীয় শীত কেটে গেল অমনি পেল সে এই দুর্বাবহার 'ভালোর আলোর পথ দেখো।' একটা বিস্ময় যে ক্ষুধায় সে মারা পড়ল না। রোজ সকালে গুরুবোতে যে ভিখারী ধর্মযাজক আসত সে বলছিল যে সে পর্যন্ত বিশেষ কিছু পাচ্ছে না। একটা শিশুকে নিয়ে যে দুঃখিনী মেয়েটি এল, প্রায় সর্বত্রই সে প্রত্যাখ্যাত হ'ল এই বলে 'কোনো কাজ কারবার নেই' অথবা 'কিছুই করছিনে।' এমন কি মানুষজন পর্যন্ত পড়ে গেছে দুরবস্থায়। কেমন ক'রেই বা তারা এর পরে এই আনাড়ী, অকেজো পশুকে, এই আপদ কুকরটাকে তাদের এক আস্ত গামলা পান্তাভাত বরাদ্দ করতে পারে? সে বরফের উপর দিয়ে বহু দূরে এক যায়গা থেকে আরেক যায়গায় ঘোরাঘুরি করেছে, খেয়েছে যা-তা, এমনকি কমলালেবুর খোসা পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে, বসন্ত এসে গেছে। এমনি সময়ে বরফ যখন গলতে সুরু হয়েছে তখন মনে হ'ল তাকে, সে রীতিমত বড়সড় হ'য়ে গেছে। সব ক'টি কুকুর, কিনসানের পোচি থেকে স্নানঘরের কুরো, কাঠ কারবারীর আকা আর প্রতিবেশী বাগান মালিকের ভয়ংকর কুকুরটা পর্যন্ত তাকে ঘিরে রাখে। সে যেখানেই যায় সেখানেই কুকুর দু'টো তিনটে থাকে তার পেছনে পেছনে। তাই মোকুসেই'র ছায়ার মত নিশ্চিন্ত, নিরিবিলি স্থানটা কুকুরের একটানা আর্তনাদে সরগরম থাকে, শব্দ থেকে মনে হয়, কুকুরগুলো কানাকানি করতে চায়, নয় চায় তোয়াজ তোষামোদ করতে।

খুড়ীমা একজন এক হাতে একটা কড়াই নিয়ে কুয়োর পারে এসেছেন, তিনি দেখলেন দৃশ্যটা।

'ওমা!' বলে উঠলেন তিনি। 'পাপ্ একটা কুত্তি যে! এতো আমি কখনো লক্ষ্য করিনি।'

আর নয়া ভড়াটেবাড়ির খুড়িমা, ঘটনাচক্রে তিনিও ছিলেন সেখানে, তিনি বললেন: 'আমিও তো!'

খুড়িমা দুজন স্ফূর্তির চোটে হাসতে হাসতে গা ঢলাঢলি করেন।

তাকে বিতাড়িত করা উচিত। এমনি ধরণের কথাবার্তা কিনসানের পল্লীতে উঠেছিল। আর যা-ই হোক, চারটি পরিবারস্থ বান্ধবর্গের মধ্যে, দুইটি দলে, খুড়ো এবং খুড়িমাদের মধ্যে যুক্তিতর্ক ক'রে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছিল। মতের দিক থেকে পোষণ করে খুড়িমারা যার উপর জোর চাপ দিচ্ছিলেন দেখাশোনায় তা এখন ভিন্ন আকার নিল। তার আগের অবস্থায় সে আর নেই এখন আর এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যদি তাকে বিয়োতে হয়। এসবের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, তাদের নিজেদের অবস্থার সংগে তাকে বিচার করে খুড়িমারা সহানুভূতিসম্পন্ন তার উপর। তা হ'তে পারে, কিন্তু বাচ্চাই যদি সে বিয়োয় তাহ'লে কী বিশ্রী একটা ব্যাপার হবে। এমনিতর সতর্কতা ... প্রকৃতপক্ষে, এমন কেউ ছিল না, যে না পাপ-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিল।

সে এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

একদিন একখানা গাড়ি এসে কিনসানের দরজার থামল। গাড়ির উপরে ময়লা একখানা কাপড়ের মাদুরে ঢেকে দেওয়া ঢাকনাহীন বাক্সের মত যেন কি একটা রয়েছে। গাড়িতে কি রয়েছে নাক তার শুঁকে টের পেল।

খোলা কলার, একটা পুলিশের পেছনে পেছনে একজন সন্দেহজনক লোক বাড়িটাতে ঢুকল। সে আর কিন্তু এমনি বিপজ্জনক যায়গাতে ঘুরাফেরা করল না। পোচি কুরো ও অন্যান্য কুকুরগুলো আকস্মিকভাবে চিৎকার সুরু ক'রে দিল। খুড়ো খুড়ি সবাই ঘর থেকে আছেন বেরিয়ে এলেন এ সময়।

'মা, কুকুর শিকারী গো!'

কোচ্যান তার মা'র আড়ালে লুকোল।

সকলে বাগানের চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। কিনসানের মেয়ের ফুলগাছে জল দেওয়া ছিল রোজকার কাজ, একখানা খুরপি হাতে নিয়ে রাস্তায় সে ছুটে এল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটা ছাত্র জল রংয়ের একখানা ছবি আঁকছিল, সে তার তেপায়া উল্টিয়ে ফেলে ওদের পেছন পেছন ছুটল।

'ওই ওদিকে পালাল, এই এদিকে দৌড়ে গেল!'

সৃষ্টি হ'ল একটা অদ্ভুত বিশৃঙ্খলার।

'নিশ্চয়ই, পাপ মারা পড়েছে', কাঁপতে কাঁপতে কোচ্যান বলে উঠল।

সে পালায় শেষ পর্যন্ত। মস্ত একটা ওকেল লাঠি হাতে একটা লোক তার সংগীর সামনে মাথা নাড়ে। 'বাজে, বাজে', গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে পুলিশটি বলে আর হাসে। লোক দু'টি হতাশ মুখে খালি গাড়ি টেনে নিয়ে চলে।

কোনো উপায়ে সে তার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচে। এদিকে, পেট তার ক্রমে ক্রমে বড় হ'য়ে ওঠে। যন্ত্রণার একটা রঙীন আভাস তার চোখে ফুটে উঠতে থাকে। নিজেকেই এখন কেবল তার বাঁচিয়ে চলতে হবে না গর্ভস্থ শাবকগুলোকেও বাঁচাতে হবে' কাজেই আরামপ্রদ মোকুসেই'র ছায়া তার এখন নিরাপদ যায়গা থাকে নি। এমনকি, যখন স্বচ্ছন্দ আরামে স্যাঁত-স্যাঁতে মাটিতে শুয়ে মুহূর্তের জন্যে তার দুঃখের নিঃশ্বাস ছাড়ছে তখনও মানুষের ছায়া দেখা মাত্র সে উঠে দাঁড়িয়ে যায়। অসাবধান সে এক নিমেষের জন্যেও হ'তে পারে না। তার চোখে, মানুষের চেয়ে নির্দয় ও নৃশংস আর কিছু নেই।

কিন্তু, ভয় তার থাকা সত্ত্বেও, মনুষ্যাবাস সে ছেড়ে যেতে পারে না। কেমন সহজ নিশ্চিন্ত সে হ'ত যদি অন্যান্য পশুদের মত দূরের জংগলে গিয়ে সবুজ গাছ ও ঘাসের মাঝখানে সে প্রসব করতে পারত। একজন দর্শকের কাছে এ মনে হ'তে পারে, কিন্তু তার বেলায় এ-ষে হয় না, তার জন্মগত প্রকৃতিকে সে বদলাতে অসমর্থ।

ঠিক জন্মের সুরুতে সে তার মাতৃত্বের কর্তব্য সমাধা করল। কিনসানের চালাঘরে চারটা বাচ্চা চোখে পড়ল। এর দু'টো পোচির মত বাদামী আর সাদায় সুন্দর রং বেরংয়ের, একটা পুরো কালো আর আরেকটা ঠিক ঠিক ধূসর নয়, অনেকটা পাপের নিজের মত।

হায়, তার মাতৃত্বের প্রভাবে মানুষের মুখে হাসি সে প্রথমে দেখল। এই মাতৃত্বের প্রভাবেতেই জীবনের প্রথম সে পুষ্টিকর খাদ্য পেল।

'পাপ—আয়, আয়!'

কিনসানের বাড়ির খুড়িমা রান্নাঘরের কাগজের পর্দা সরিয়ে তাকে ডাকতে আরম্ভ করেন। কেননা, ওই দিনটি থেকেই তিনি তাকে ডেকে আসছেন।

অনুবাদক: নরেন্দ্রনাথ রায়

আতঙ্কময়ীর আগমনে

যেতে যেতে হঠাৎ আমার কন্যা রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বললে আঃ, কি সুন্দর শিউলি ফুলের গন্ধ। আমিও থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। পিতা পুত্রী দুজনে একই সৌগন্ধে মুগ্ধ। আমার কন্যার বয়সে আমার মনেও এমনি চমক লাগত। ক্ষণকালের জন্য শিশুকন্যার মধ্যে আমার আপন শৈশবটি জেগে উঠেছিল। সে শৈশব থেকে বহুদূরে চলে এসেছি। অনেক বৎসর কেটে গেছে, অনেক ঘটনা ঘটেছে, ইতিহাসের পূতিগন্ধে জীবনে মালিন্য স্পর্শ করেছে, কিন্তু শিউলি ফুলের গন্ধটি এতটুকু মলিন হয় নি। শেষ বর্ষণের জল-ধারায় ধুয়ে শরতের আকাশ গাঢ় নীল হয়ে উঠেছে। আনন্দময়ী এসেছেন এবং চলে গেছেন। একমাত্র ঐ শিউলি ফুলের গন্ধটা ছাড়া আর কোথাও তাঁর আগমন ও গমনের বার্তার ঘোষণা নেই। আমি অধার্মিক ব্যক্তি, দেবদেবী কোনোকালে বুঝি নাই, কিন্তু আনন্দময়ীকে বুঝেছি, শিউলি ফুলকে চিনেছি, শরতের আকাশ দেখে মন নেচে উঠেছে। সেই আনন্দময়ীর আগমনে আতঙ্কে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। আনন্দময়ী অকস্মাৎ আতঙ্কময়ী হয়ে উঠেছিলেন! শুনেছি নাকি ভিটেমাটি ছেড়ে বাচ্চাকাচ্চা তল্পিতল্পা নিয়ে মানুষ পালিয়েছিল।

এই সেদিন নিন্দে করে বলেছিলাম বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টির শিকলে বাঁধা। মানুষের মন যে মুক্তির সন্ধান জানে বিশ্বপ্রকৃতি তা জানে না। গর্ব করে বলেছিলাম এইখানেই প্রকৃতির উপরে মানুষের জয়। কিন্তু মানুষের মুক্তির স্বরূপ যদি এই হয় তবে সে মুক্তি কার কি কাজে লাগবে? স্বাধীন মানুষ মানে কি হিংস্র মানুষ? বনের পশুর স্বাধীনতা আর মানুষের স্বাধীনতা কি এক কথা? আগে বাঘ-ভালুকের ভয়ে মানুষ পালাত, এখন মানুষের ভয়ে মানুষ পালাচ্ছে। এমন যে সুন্দর বন তারও আশে পাশে মানুষে ঘর করেছে, নিরাপদে বাস করছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ পালাচ্ছে মানুষের ভয়ে। মানুষ হয়েছে এখন হিংস্রতম জীব। পাঞ্জাবে মুসলমানের ভয়ে হিন্দু পালিয়েছে, হিন্দুর ভয়ে মুসলমান। Have I no 'reason' to lament then, what man has made of man? মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান কবে কোথায় হয়েছে? ইয়ুরোপের প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের সময়ও অর্ধকোটি নরনারী বাড়ী ঘর ছেড়ে দেশান্তরে পালায় নি। গ্যাসের যুদ্ধ ইয়ুরোপেও হয় নি, কিন্তু ভারতবর্ষে আজ যত বিষবাষ্প ছড়িয়েছে জার্মানির গুপ্ত অস্ত্রাগারেও এত বিষবাষ্প লুক্কায়িত ছিল না। এই বিষ অগণিত মানুষকে মারবে। যে সব নেতারা দেশময় এই হিংসার বাষ্প ছড়িয়েছেন তাঁরাও বাদ পড়বেন না। একটি মাত্র আশার কথা এই যে, যত দ্রুত এই বিষোদ্গীরণ হয়েছে তত দ্রুত এর নিরসন হবে। হিটলার-তন্ত্রের যেমন দ্রুত উত্থান তেমনি দ্রুত পতন।
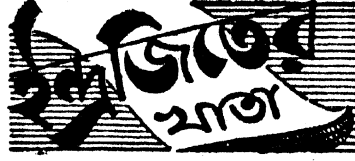
ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে এখনও শিউলি ফুল ফোটে এবং সে ফুলে গন্ধ থাকে। মানুষ তার ধর্মকে ভুলেছে, কিন্তু ছোট্ট শিউলি ফুলটি শরতের ধর্মকে ভোলে নি। বাঙলা দেশের হৃদয়-ছেঁচা গন্ধটি শরতের আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফুলের গন্ধ আসে যেন মায়ের গন্ধ হয়ে। সাত কোটি সন্তানের জননী বঙ্গমাতার কেশ-সুরভি ভেসে আসছে। এখন ডেকে আনুন র‍্যাডক্লিফ কমিশন—সেই সৌরভটিকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যাক্। হায়রে কি সুসন্তানই আমরা হয়েছি—মায়ের দেহটিকে কেটে দুখানা করে নিয়েছি। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী আমি, পশ্চিম বঙ্গের এক প্রান্তে বসে বসে ভাবছি এখানটায় আমি alien অর্থাৎ বিদেশী কারণ আমি ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী। মাদ্রাজী, মারাঠী, বিহারীর কাছে এটা স্বদেশ, কিন্তু আমার বেলায় বিদেশ। নিজ বাসভূমে পরবাসী—কবিবাক্য এত বড় নিদারুণ পরিহাস হয়ে উঠবে একথা কে ভেবেছিল!

যে বাঙলাদেশ গুণে গরিমায় জগৎসভায় স্থান পেয়েছে সে বাঙলা দেশকে গড়ে তুলেছিলেন কে? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রের নিজ হাতে গড়া বাঙলাদেশ। সেই বাঙলাদেশ একত্র থাকবে কি আলাদা হবে, বাঙলা দেশকে ল্যাজে কাটবে কি মুড়োয় কাটবে তার নির্দেশ দেবেন জিন্না সাহেব আর র‍্যাডক্লিফ সাহেব? গড়বার দিনে কেউ ছিল না। আর ভাঙবার বেলায় সবাই ওস্তাদ। বঙ্গ বিভাগ সমগ্র বাঙালী জাতির আত্মসম্মানের প্রতি চ্যালেঞ্জ। কার্জনী বঙ্গ বিভাগ হিন্দু মুসলমান দুই-এ মিলে বাতিল করে দিয়েছিল, **জিন্নাকৃত বঙ্গ-বিচ্ছেদও হিন্দু মুসলমান দুই-এ মিলেই বাতিল করবে।** সেই সুবুদ্ধি আজকের উত্তেজনা নিবে এলে অদূরে ভবিষ্যতে দেখা দেবে। হয়ত এজন্য বাঙলা দেশকে কংগ্রেস এবং লীগ উভয়ের পলিটিক্সকেই ত্যাগ করতে হবে। ট্র্যাজেডির মূল তো এইখানেই। জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে—বঙ্গবীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে। কংগ্রেস এবং লীগের পলিটিক্স বাঙলা দেশের গলায় ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা বাঙলাদেশ ছিল আর সব প্রদেশের পুরোভাগে। যেদিন থেকে সর্বভারতীয় রাজনীতির জন্ম হয়েছে সেদিন বাঙলা দেশকে দু-পা পিছিয়ে এসে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে পা মিলাতে হয়েছিল। পশ্চাদগমন মাত্রই পাপ। বাঙলাদেশ আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। কংগ্রেসী পলিটিক্স যে বাঙলা দেশের পলিটিক্স নয় তা বারম্বার প্রমাণিত হয়েছে। বাঙলা দেশের যাঁরা অবিসম্বাদিত নেতা তাঁরা কেউ বেশি দিন কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথ পারেন নি, চিত্তরঞ্জন পারেন নি, সুভাষচন্দ্র পারেন নি। যাঁরা পেরেছেন তাঁরা কংগ্রেসের নেতা হয়েছেন কিন্তু বাঙলা দেশের নেতা হন নি। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে কংগ্রেস যেদিন বাঙলা দেশের নেতৃত্বকে বিভক্ত করেছে সেদিনই ভারতবর্ষের কপাল পুড়েছে। এই কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে ভারত বিভক্ত হতে বাধ্য সেদিনই আমাদের বোঝা উচিত ছিল। মুসলিম লীগ কংগ্রেস পলিটিক্সেরই বাই-প্রডাক্ট। আবার এ কথাও সত্য যে, কংগ্রেসী পলিটিক্স যেমন বাঙলা দেশের ধাতে সয় নি, লীগ পলিটিক্সও বেশি দিন বাঙালী মুসলমানের ধাতে সইবে না। পূর্ববঙ্গে লীগ-বিরোধী আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী।

বিভক্ত ভারতবর্ষকে একত্র করবার দায়িত্ব বাঙলা দেশকেই গ্রহণ করতে হবে। এখন আমাদের একমাত্র রাজনীতি হওয়া উচিত—উভয় বঙ্গের মিলন চেষ্টা। কংগ্রেস লীগের পলিটিক্স ভুলে গিয়ে একমাত্র সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শত শত যুবক কেবলমাত্র এই মিলনের মন্ত্র প্রচার করুন। এই দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও শুভদিন আসন্ন। হিন্দু মুসলমান উভয়ের সব চেয়ে বড় পর্ব এবার একসঙ্গে এসেছে। বর্তমান উত্তেজনার মুহূর্তে এইটিই অধিকতর আতঙ্কের কারণ হয়েছে। এই দুই পর্বের শুভসম্মিলন আতঙ্কের না হয়ে আনন্দের হউক। হিন্দু মুসলমানকে বিজয়ার সম্ভাষণ জানাক, **মুসলমান হিন্দুকে ইদ্ মোবারক্ জানাক।**

তৃতীয় অংক : প্রথম দৃশ্য

(মনোমোহনের ঘর। অপরাহ্ন। মনোমোহন উপবিষ্ট। অঞ্জলি এলো।)

অলি—বাবা, মালিশটা আর একবার এখন হ'তো না?

মনোমোহন—কটা বেজেছে শুনি?

অলি—পাঁচটা বাজেনি এখনও।

মনোমোহন—তার মানে চারটে বেজে গেছে। তবে আর এখন মালিশে কী হবে?

অলি—ডাক্তার বলেছিলেন সকালে আটটায়, দুপুরে দুটোয়, রাত্রে শোবার সময়, আর বিকেলে সাড়ে চারটেয়।

মনোমোহন—বাতে ভুগছি ব'লে মাথায় তো আর বাত হয়নি। স্মরণশক্তি আমার ঠিকই আছে। ঠিক চারটেয় মালিশ করবার কথা। আর তুই এলি এতোক্ষণে? আজ তোর মা থাকলে কি এমন হ'তো? (নিরুত্তর অঞ্জলি অশ্রুমুখী।) ঘরের কাজের জন্য লোক তো রয়েছে। তোর সব না করলেই নয়? আজ সারদা নেই তো কেউই যেনো নেই। (অঞ্জলি কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছিলো।) শোন তোকে আমি বকছি না। তোর মা'র কথা মনে ক'রে কষ্ট পাচ্ছি। তুই কিছু মনে করিসনি। তোরই শাস্তি। এই ঘরের কাজ, আবার বুড়ো বাপের সেবা।

অলি—আমি বুঝি সেবা করতে পারছি না?

মনোমোহন—তা কেন? তবে......ওঃ ঠিকই তো। ডাক্তার যেনো পাঁচটার সময় মালিশের কথা বলেছিলো। দেতো ঐ কাগজখানা। (অঞ্জলি ছোটো টেবিলটি থেকে কাগজ দিলো নির্দেশ মতো।) এই তো। লেখা আছে পাঁচটার সময়। তবে যে তুই বললি সাড়ে চারটের সময়? (অঞ্জলি নিরুত্তর) বুঝেছি। অবাধ্য ছেলেকে সহ্য করা হচ্ছে। অলি তুই যা। মালিশ সেই ছটায় করিস। কেন না, হরিচরণ আসবে একবার। ও চলে গেলে.........

অলি—না, না। ঠিক সময় মালিশটা করা দরকার। ওতে অনেক যন্ত্রণা কমে।

মনোমোহন—এতো আর খাবার ওষুধ নয়। তুই যা এখন। একটু দেরী হ'লে কিছু ক্ষতি নাই।

নেপথ্যে হরিচরণ—মনোমোহন, যাবো নাকি হে?

মনোমোহন—এসো, এসো হরিচরণ, চলে এসো। (হরিচরণ এলো, অঞ্জলি চলে গেলো।)

হরিচরণ—(প্রস্থানোদ্যতা অঞ্জলিকে) কেমন আছো মা? ভালো? (অঞ্জলি ঘাড় নেড়ে জানালো হাঁ। তারপর চলে গেলো। হরিচরণ বসলো।)

হরিচরণ—তোমার মেয়েটি ভায়া ভারি লক্ষ্মী।

মনোমোহন—হাঁ।

হরিচরণ—কি করা যাবে! সবই শ্রীমধুসূদনের হাত। না হ'লে অমন দেখে বিয়ে দেওয়া গেলো! ভাগ্য, ভাগ্য, সবই ভাগ্য। যাই হোক, স্ত্রীর অভাবে তোমার সেবার ত্রুটি হচ্ছে না। অঞ্জলি চমৎকার মেয়ে।

মনোমোহন—সে কথা হাজার বার হরিচরণ। আজকালকার হ'লে হয় নাটক নভেল নিয়ে সাধ মেটাতো নয় তো চেনা-শোনা দূর সম্পর্কের পুরুষদের সঙ্গে হাসি তামাসা করে কাটাতো। অঞ্জলি আমার সেদিকেই নেই। কতো করে বলেছিলুম একাদশীর দিনে তুই এক-বেলা ক'রে লুচি খা। ওতে দোষ নেই।—

হরিচরণ—তুমি বলেছিলে?

মনোমোহন—আমি কি বলেছিলুম? আমার মুখে অসংযমের কথা আসে না যে। ওর মা-ই বলেছিলো........

হরিচরণ—তা থাক ওতে দোষ নেই। আজ তো একাদশী?

মনোমোহন—তা থাক মনে? বলেছিলো ওর মা। ও কি রাজি হয়েছিলো ভেবেছো? তেমন বাপের মেয়ে ও নয় হরিচরণ। তবে আর বুড়ো হয়ে অম্লানবদনে বিয়ে করলে কেন? বংশ মর্যাদা, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মশাস্ত্র—এসব আমার কাছেও যতো বড়ো ওর কাছেও ততো। ও আমার সে মেয়ে নয়।

হরিচরণ—ঠিকই, ঠিকই তো। চমৎকার মেয়ে। তার তা না হ'লে বুঝলে, বিধুকে আমি জোর ক'রে রাজি করিয়েছিলুমই বা কি ক'রে? কতো সব পয়সাওয়ালা লোক মেয়ে নিয়ে ওর জন্য হ্যাং হ্যাং করছিলো। তাদ্দিদীকে জানো তো?

মনোমোহন—জানি।

হরিচরণ—শালা বলে কী জানো? (এদিক ওদিক চাহিয়া) 'ঘটকালির কমিশনেই হরিচরণের সংসার চলে'। হারামজাদার বচন দেখেছো?

মনোমোহন—তা বলুক গে। তবে বিধুর উচিত ছিলো তোমাকে কিছু সাহায্য করা। তোমার টানাটানির সংসার ...

হরিচরণ—(এদিক ওদিক চেয়ে) তোমাকে তবে বলি। দিয়েছিলো পাঁচশটি টাকা।

মনোমোহন—তাই না কি?

হরিচরণ—আমি কি নেবার পাত্র? কিছুতেই নেবো না, তা বললে 'আহা ধার হিসেবেও তো নিতে পারো'। তখন অগত্যা নেহাৎ বেচারা মনে কষ্ট পাবে বলে......(ভোলা এলো।)

ভোলা—দাদামশাই, মালিশ করা এখন হবে কি? মাসিমা জিজ্ঞাসা করছে।

মনোমোহন—না। সন্ধ্যের সময়। অলিকে বল্ সে শুয়ে পড়ুক। আজ একাদশী। ও কী করছে?

ভোলা—পুজোর বাসনগুলো সব তেঁতুল দিয়ে পরিষ্কার করছেন।

মনোমোহন—তবে তুই রয়েছিস কী করতে? আজকের দিনেও ওর কাজের কামাই নেই? সারদা যে স্বর্গ থেকে অভিসম্পাত দেবে আমাকে? তুই করতে পারিস না?

ভোলা—আজ্ঞে আমি তিনবার বলেছিলুম......

মনোমোহন—চুপ কর পাজি। (অঞ্জলি এলো।)

অলি—বাবা, ও পাজি নয়। আমিই অবাধ্য। ও অনেকবার বলেছে। তবে পুজোর বাসনটা নিজে পরিষ্কার করতেই আমি চাই। সেই আমার ভালো লাগে। মায়েরও ঐ অভ্যাস ছিলো (অশ্রুমুখী)।

মনোমোহন—আচ্ছা আচ্ছা, তুই কর পরিষ্কার। আর দেখ অলি তোর মায়ের ফটোখানা 'এনলার্জ' হয়ে এলে তোরই ঘরে রাখিস। ভেবেছিলুম আমার ঘরে রাখবো। তা থাক্।

অলি—সে যা হয় হবে। আগে আসুক। তোমার জ্বর বাড়ে নি?

মনোমোহন—না। ডাক্তার কখন আসবে রে?

অলি—ছ'টার মধ্যেই আসবেন বলেছিলেন। তোমার এখন আর কিছু দরকার নে? আমি যাই।

মনোমোহন—হ্যাঁ। (অঞ্জলি চলে গেলো।)

হরিচরণ—সাড়ি-চুড়িটা না ছাড়িয়ে ভালোই করেছো। ওটা থাক্। আহা ছেলে মানুষ।

মনোমোহন—হরিচরণ, মেয়ে আমার সোনার মেয়ে। সাড়ি-চুড়ি ওর কণ্টক হে কণ্টক। ফেলতে পারলে বাঁচে। আমি বলেছিলুম চুলপাড় ধুতি আর এক-গাছি করে সরু চুড়ি। মেয়ে চায় থান পরতে, শুধু হাত করতে। এখন থাক্। ওর মায়ের শোকটা কমে আসুক।

হরিচরণ—আহা, তোমার স্ত্রীটি যা ছিলো। অমন মেয়েমানুষ হাজারে একটা মেলে। তোমার হ'য়ে নিশ্বাসটি পর্যন্ত ফেলে দিতো যেনো। কী বলো? না, না। বাড়াবাড়ি বলছি না। আহা আমরাও দেখেছি তো? ঘরে এলেই দেখতুম লক্ষ্মীর হাতের ছোঁয়া রয়েছে সর্বত্র। অঞ্জলি আর কতোটাই বা করবে? তবুও করে খুবই। যতোটা সম্ভব করে।

মনোমোহন—করে না? খুব করে। তবে হ্যাঁ, ওর মায়ের মতো পারে কি? সে করতো স্বামীর জন্য, ও করে বাপের জন্য। তফাৎ হবে না?

হরিচরণ—তা আর হবে না? সে হ'লো অনা-রকম। দুটো দুরকম কিনা। আচ্ছা অনিল ডাক্তারের চিকিৎসা তো ভালোই। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারলো না। তা ভবিতব্য কে খণ্ডাবে বলো? যাই হোক, তোমার স্ত্রী যে স্বামীকে রেখে গেছে...

মনোমোহন—নিশ্চয়ই। সারদা গেছে, বেশ গেছে। আমাকে রেখে যেতে পারা কি কম সৌভাগ্যের কথা? তবে কি জানো, সে তো দেহের রোগে মরেনি। অলি-টার দুঃখেই সে মরলো। অনিলের চিকিৎসার আর কী দোষ?

হরিচরণ—তোমার বাতটা আগেও দুবার হয়েছিলো না? এবারে কিন্তু বেশ বেশি। যাক্ সেরে যাবে। অনিল ডাক্তারের হাতে রয়েছো যখন—

মনোমোহন—হ্যাঁ, ডাক্তার তো বলেছে আর হবে না। তবে খাওয়া দাওয়া মানে মাংস-টাংস খাওয়া কিছুদিন বাদ রাখতে বলেছে। (ভোলা এলো।)

ভোলা—দাদু ডাক্তার বাবু—(অনিল এলো। পরনে ধুতি ইত্যাদি।)

মনোমোহন—এসো, বোসো। কিন্তু ডাক্তারের পোষাকটা দেখছি দেশি যে।

অনিল—আপনার এখান হ'য়েই একটা নিমন্ত্রণে যাবো কিনা।

মনোমোহন—বেশ বেশ। কোথায় নিমন্ত্রণ? পাড়াতেই না'কি?

অনিল—না। সুকিয়া স্ট্রীটে।

হরিচরণ—ও, সেই রমেন্দ্র উকিলের বিয়েতে। সে তো অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করছে। তা ঐখানেই বাবাজীর গমন হবে?

অনিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। ডাক্তারের গতিবিধি সর্বত্র। দেবরাজ ইন্দ্রের বিয়েতেও স্বর্গে যেতে হবে আর নাগেদের বিয়েতে পাতালে যেতেও বাধা নেই। রোগ তো সবারই কি না! কী বলেন?

হরিচরণ—(টেনে হেসে) এমন না হ'লে ডাক্তার। কেমন কথা বলো দেখি।

অনিল—(মনোমোহনকে) হাত দেখি? বাঃ জ্বর নেই। গাঁটে ব্যথা? পায়ে?

মনোমোহন—আছে কিছু কিছু।

অনিল—হাতে?

মনোমোহন—বিশেষ না। একটু।

অনিল—না। ওটা অতীতের স্মৃতি।

হরিচরণ—বাবাজির কথা ভালো। বলে কিনা অতীতের স্মৃতি।

অনিল—মালিশ করছেন কখন কখন?

মনোমোহন—এই সকালে... দাঁড়াও... মনে নেই। অলিকে ডাকছি। অলি? (ডাকলেন) অঞ্জলি দ্বারের পাশেই ছিলো, এগিয়ে এলো।)

অলি—আপনি যেমন যেমন বলেছিলেন তেমনি চলেছে, কেবল আজ এখন বিকেলের মালিশটা হয়নি।

অনিল—তাতে এসে যায় না। এক আধ ঘণ্টার দেরিতে ক্ষতি নেই। এতো আর Myalgia বা Rheumatoid Athritis নয়। এ আপনার Simple Rheumatism তা ছাড়া এতে Gouty dia thesis নেই। আপনার বংশে তো উপরের দিকে চার পুরুষ পর্যন্ত এসবের কোনো ইতিহাস নেই।

মনোমোহন—না। সেসব তো বলেছি।

অনিল—খুব বিশ্রাম নেবেন। সেটা নির্ভর করছে অঞ্জলির শাসনের উপর।

অলি—সে বিষয়ে আমার খুবই লক্ষ আছে। উনি শুয়েই থাকেন বা ব'সে থাকেন। বেশি সময় বই প'ড়েই কাটে।

অনিল—তা ছাড়া Solid খাবার আরো দুচার দিন নয়। তারপর Semi-Solid যাক্, আর আমার আসার দরকার হবে না। দরকার বুঝলেই ভোলাকে পাঠালেই হবে।

মনোমোহন—না অনিল। সম্পূর্ণ সারিয়ে দাও। তবে তোমার ছুটি।

অলি—হ্যাঁ, যতোদিন দরকার বুঝবেন আসবেন। মা থাকলে কথা ছিলো না। আমি যে এসব বুঝি না ঠিক।

অনিল—তোমার কি শরীর খারাপ? বড্ড শুকনো দেখছি। আজকাল ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে খুব। সাবধানে থাকা উচিত।

মনোমোহন—ব'লে যাও তো বাবা, তোমরা ডাক্তার মানুষ, তোমাদের কথা শুনবে। ভারি অবাধ্য হয়েছে ওর মা গিয়ে অবধি। (অঞ্জলি চলে' গেলো।)

অনিল—চললুম। দরকার হ'লেই খবর দেবেন। (ভোলা এলো।)

ভোলা—ডাক্তারবাবু, ছড়িটা নিচে রেখে এসে-ছিলেন। তুলে রেখেছি। দিচ্ছি। (অনিলের আগেই ভোলা গেলো। দ্বারপথে ছড়ি দিলো। অনিল চলে' গেলো। নাড়ি দেখবার জন্য হাত দেখবার সময় কব্জি ঘড়িটা পকেট থেকে বার ক'রেছিলো। সেটা নিয়ে যেতে ভুলে গেলো।)

মনোমোহন—ছেলেটি বেশ। ধুতি পিরানে আরো মানায় বেশি।

হরিচরণ—বিয়ে হয়েছে তো?

মনোমোহন—বোধ হয় নয়।

হরিচরণ—ওর সঙ্গে কি তোমার মেয়ের অলির ...

মনোমোহন—না, না। কোনো কথাই হয় নি।

হরিচরণ—না, শুনেছিলুম কিনা; তাই বলছি।

মনোমোহন—মাত্র একবার আমাকে ব'লেছিলো। তা ওরা চক্রবর্তী শুনেই দশ হাত পিছিয়ে গেলো কিনা। মেয়ে বড়ো, না, কুল বড়ো? হ্যাঁ? তাই না তোমাকে পাত্র সন্ধান করতে বললুম। আর মেয়েও তখন খুব বড়ো হ'য়েছে।

হরিচরণ—ভায়া, সেসব তুমি বলবে, আমি বলবো, ঐ দেখো না, ডাক্তার গেলো রমেন্দ্র উকিলের বিয়েতে। ব্যাটা আমার কায়েতের ছেলে হ'য়ে বিয়ে করবেন বামুনের মেয়েকে। তাও যদি বামুনের ছেলে কায়েতের মেয়ে ঘরে আনতো। তা হ'লে কথা ছিলো না। এ যে পাঁচশো হাত নেমে গেলো সে বামুন। তাকে নামালি আবার আমাদেরও নামিয়ে দিলি।—বাপ নেই, টাকাও আনছে, পশার বেশ—তবে আর কি! সাপের পাঁচ পা দেখেছো। কেন, তোদের জাতে কি মেয়ের অভাব? বলু-না, এখনই

সাস্তটা ধ'রে দিচ্ছি। আমার কিছু চাই না। গাড়িভাড়া ইত্যাদি যাতায়াতের সব খরচা নিজের গাঁটের খসিয়ে করবো।

মনোমোহন—যাক, পরের কথায় কাজ নেই। (অনিলের হাতঘড়ি পাশে দেখে) একি? এটা এখানে কেন? বোধ হয় ডাক্তার ফেলে গেলো। ভোলা? (ডাকলেন। ভোলা এলো।)

ভোলা—আজ্ঞে।

মনোমোহন—ডাক্তার কতো দূর গেলো রাস্তায় একটু গিয়ে দেখ। ছুটে যাবি। এই ঘড়িটা তাঁকে দিয়ে আয়। ফেলে গেছে। (ভোলা ঘড়ি নিয়ে চলে' গেলো।)

হরিচরণ—হাতঘড়িটা হাত থেকে নামলো কি ক'রে?

মনোমোহন—ঐ যে আমার নাড়ি দেখছিলো। পকেট থেকে বার ক'রেই রেখেছিলো। পকেটেই রাখে। হাতে রাখে না আর কি।.....হরিচরণ, ধরো দেখি হাতটা। (অঞ্জলি এলো।)

অলি—কোথা যাবে?

মনোমোহন—তোর মায়ের ঘরটায় একবার বসবো। হরিচরণ, এটা ধরো। একঘেয়ে একই জায়গায় ব'সে ব'সে অস্বস্তি হচ্ছে। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে হরিচরণ। ঐ ঘরে চলো। বলছি। (ধরাধরি ক'রে নিয়ে চললো' দ্বারপথে ভোলা এলো।)

ভোলা—দাদু, দেখতে পেলুম না; চলে গেছেন।

মনোমোহন—তবে অলি, ওটা রেখে দে। এক সময় দিয়ে আসিস্ ভোলা ওর বাড়িতে। অলি ওটা ঠিক ক'রে রেখে দে। দামি ঘড়ি। ভোলা, আমায় ধর। (ভোলা ও হরিচরণ মনোমোহনকে ধরে নিয়ে গেলো। অঞ্জলি ঘড়িটা নিয়ে কানে দিয়ে 'টিক্ টিক' করছে কিনা দেখলো। সযত্নে রেখে দিলো। বাবার বিছানাটি ঝেড়ে দিলো। একবার। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। ভোলা এলো।)

ভোলা—বাব্বাঃ, ডাক্তারবাবুর পায়ে চাকা দেওয়া আছে নাকি? এই গেলো, আর নেই। কতো ছুটে গেলুম, তবু দেখতে পেলুম না। ঘড়িটা রেখেছো?

অলি—হ্যাঁ, তুই যা। বাবার মালিশটা ঐ ঘরে নিয়ে যা। আমি পরে যাচ্ছি। (ভোলা মালিশের শিশি নিয়ে চলে গেলো। পরক্ষণেই অনিল প্রবেশ করলো।)

অলি—একি? আবার এলেন যে? ঘড়িটা নিতে বোধ হয়? ওটা দেবার জন্যে ভোলা ছুটে গেলো। দেখতে পায় নি। এই নিন্। (ঘড়ি দিলো।)

অনিল—(ঘড়ি নিয়ে) কি রকম বিয়েতে নিমন্ত্রণ যাচ্ছি জানো? অসবর্ণ বিয়ে। কায়েতের ছেলে, বামুনের মেয়ে। যদি গ্রামের বাড়িতে হ'তো, ডাক্তারি করা বন্ধ হ'য়ে যেতো। অবশ্য ডাক্তার ব'লেই হয়তো বন্ধ হ'তো না কাজ।

অলি—তাতে আর কী হ'য়েছে? সে করছে বিয়ে, আপনার দোষ কী? নিমন্ত্রণ গেলেই জাত্ গেলো?

অনিল—তুমি তো তাই বললে। সবাই কি তোমার মতো? কিন্তু সত্যই তোমার শরীরটা অত্যন্ত শুকনো দেখাচ্ছে, খুব বেশি পরিশ্রম করছো বোধ হয়? তা ছাড়া ব্রতপালন, নিশিপালনের নিশ্চয়ই কামাই নেই? তোমার মা থাকলে তোমাকে যে কাজ করতে নিষেধ করতেন সে কাজ করা তোমার উচিত হবে না। আমার কোনো অধিকার নেই। তবু বলছি, শরীরটাকে কষ্ট দিয়ে কী এমন পুণ্য হয়? অবশ্য, আমার নিষেধ শুনবে কিনা জানি না। আমি তো তোমাদের কেউ নই।

অলি—না, কেউ নন। কিন্তু আপনার কথা শুনবো।

অনিল—শুনবে? কিন্তু অতো সহজে মেনে নিলে মনে হয় আদেশ অমান্য হবে।

অলি—না না! অমান্য হবে না। (দুজনেই শুধু তাকালো স্থিরদৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে।)

অনিল—আচ্ছা আজ কি একাদশী? ইস আমার খেয়াল ছিলো না। তাই তোমাকে শুকনো দেখাচ্ছে।

অলি—হাঁ একাদশী। আপনার দেরি হ'য়ে যাবে না? শেষকালে নিমন্ত্রণে ফাঁক পড়বেন না তো? আচ্ছা ঘড়ি বুঝি পকেটে রাখেন? হাতে বাঁধেন না?

অনিল—হাতে বাঁধলে ভারি ছেলেমানুষ দেখায়।

অলি—আপনার কি ধারণা আপনি খুব বুড়ো মানুষ?

অনিল—কমই বা কি? অন্ততঃ তোমার চেয়ে বুড়ো তো? (চলে যাবার জন্য অগ্রসর হ'লো।) আজকের তিথিটার কথা আমার স্মরণ ছিলো না। ইস্..

অলি—কেন, তাতে আপনার এতো কুণ্ঠা কেন? দয়া হচ্ছে আমার জন্যে?

অনিল—অমন ক'রে বলছো কেন অঞ্জলি?

অলি—আমার জন্যে দুঃখ হয়?

অনিল—না। চললুম। (চলে গেলো। ধীরে ধীরে ভোলার কাঁধে হাত রেখে মনোমোহন এলেন। বসলেন। অঞ্জলির মুখের ভাব পীড়িত।)

মনোমোহন—অলি, তোর শরীরটা খারাপ লাগছে?

অলি—মাথাটা ঘুরছে।

মনোমোহন—ঘুরবে না? না খেয়ে না দেয়ে মেয়ে আমার ঘুর ঘুর করে সারা বাড়ি চরকি ঘুরছে যেনো। যা' শুয়ে থাকগে যা।

অলি—তোমার মালিশ?

মনোমোহন—একদিন মালিশ না করলে আমি মরে যাবো না। তা ছাড়া ভোলা তো রয়েছে। ও করবে।

অলি—না। আমি করবো। মা থাকলে কে করতো?

ভোলা—মালিশের শিশি এইখানেই আনবো?

অলি—হ্যাঁ। (ভোলা চলে গেলো।)

মনোমোহন—অনিল ঘড়ি নিয়ে গেলো?

অলি—হ্যাঁ।

মনোমোহন—কী বলছিলো?

অলি—কিসের?

মনোমোহন—এই—(ঢোঁক গিলে) আমার অসুখের কথা?

অলি—কিছু তো বলেননি তখন। উনি বলছিলেন আমার শরীর বড়ো শুকনো দেখাচ্ছে। চারদিকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা। তাই সাবধান হতে বলছিলেন। উনি তো জানেন না আজ একাদশী?

মনোমোহন—ও কি আবার কাল আসবে? (ভোলা এলো। শিশি রাখলো।) যা ভোলা। (ভোলা চলে গেলো।)

অলি—তুমি যে আসতে বললে? উনি তো বলছিলেন আর দরকার নেই।

মনোমোহন—সেই ভালো। দরকার নেই।

অলি—কী দরকার নেই? ওঁর আসবার তো?

মনোমোহন—হ্যাঁ। আর আসবার দরকার নেই। ভোলাকে দিয়ে খবর দিলেই হবে। তাছাড়া এইবার আমি সেরে যাবো তাড়াতাড়ি।

অলি—সামান্য দিন পাশ করলেও ও'র চিকিৎসা ভালো।

মনোমোহন—সামান্য বাতের চিকিৎসা সকলেই করতে পারে। ছ'টা বছর তবে পড়ে না ঘাস কাটে?

অলি—তা ঠিক।

মনোমোহন—তবে?

অলি—আমি মালিশ ক'রে দি।

মনোমোহন—বইখানা দে। পড়ি। (অঞ্জলি বই দিলো। তিনি পড়তে থাকলেন। অঞ্জলি মালিশ করতে থাকলো।) আরো একটু জোরে দে।

অলি—এই তো?

মনোমোহন—হাঁ। (পড়তে ব্যস্ত)

অলি—বাবা, ব্রহ্মচর্য বইখানা আমার পড়া হয়ে গেছে।

মনোমোহন—ও আচ্ছা। মন দিয়ে পালন করবি।

অলি—ওখানা কী বই বাবা?

মনোমোহন—ইংরেজী।

অলি—তা জানি। কি রকমের বই।

মনোমোহন—নভেল।

অলি—নভেল?

মনোমোহন—হ্যাঁ। মানুষ কতো মন্দ হতে পারে এই বইখানায় তাই দেখিয়েছে। না হলে আমি কি আর মজা পাবার জন্য ছোকরাদের মতো নভেল পড়ছি? জীবনটা একটা সাধনা। সব জানতে হয়। তোর মতো ইলার মতো মেয়ের বাপ যারা তাদের বয়সে সংসারের সবখানি বুঝে তবে সংসার চালাতে হয়। গার্হস্থ্য বড়ো সোজা জিনিস নয়। আর থাক্। আজ আর নয়। আজ একাদশী।

অলি—বাবা, কুমারী পোষাকের বোঝা আর কতোদিন বইতে হবে?

মনোমোহন—আহা থাক-না আর কিছুদিন। সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তোর মন ষোলো আনা সংযম চাইছে। ব্যাস্, ঐ যথেষ্ট।

অলি—না। বাইরের বোঝাটাও ফেলে দিতে চাই। এখনই। পরে নয়। আজই।

মনোমোহন—আজই? না না। আজ নয়। তোর মা তা হ'লে স্বর্গ থেকে আমাকে অভিসম্পাত দেবে, অভিসম্পাত দেবে।

অলি—না বাবা, মা খুসী হবে। মাও মেয়ে যে। (গমনোদ্যতা।)

মনোমোহন—অলি, অনিলকে আসতে নিষেধ করিস্‌নি।

অলি—কেন?

মনোমোহন—দরকার না হ'লে ও-ই আসা বন্ধ করবে।

অলি—উনি তো বলছিলেন তাই। তোমারই কথায় আসতে বাধ্য হচ্ছেন।

মনোমোহন—তা আসুক। আবার যদি জ্বরটা ওঠে? যন্ত্রণাটা বাড়ে?

অলি—না।

মনোমোহন—'না' মানে?

অলি—প্রায় তো সেরে গেছো। আর বাড়বে না। আসতে আর হবে না ওঁকে মিছিমিছি। (অঞ্জলি চলে গেলো)

মনোমোহন—ওরে অলি তুই শুয়ে পড়। আর ঘোরাঘুরি করিস্‌নি।

নেপথ্যে অলি—আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার শরীর খুব ভালো আছে।

মনোমোহন—তবে যা খুসী কর। (বই তুলে পড়তে চেষ্টা করলেন। বিমনা।)

তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য :

(মনোমোহনের বাড়ির বাগান। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। অঞ্জলি ও সুলতা।)

লতা—মায়ের জন্য মন কেমন করে?

অলি—করবে না? মা ছিলো, সব ছিলো। মা নেই, কেউ নেই। সারা বাড়িতে মায়ের ছায়া পড়ছে সর্বক্ষণ; কিন্তু মা নেই।

লতা—অন্যায় করলুম। তোর কষ্ট হলো।

অলি—না না। অন্যায় নয়। কষ্ট আবার কী? ভাগ্যকে মেনে নিতে আমার কষ্ট হয় না। মেয়েদের কষ্ট হয় না।

লতা—তোর বাবার বাতটা সেরেছে? অনিল ডাক্তারই দেখছে তো? এখনো কি আসে তোর বাবাকে দেখতে?

অলি—এসেছিলেন। আর দরকার নেই। উনি আসতে চান না। বাবা বলেন, 'আসুক।' বাবার ভয় হয়েছে। বাত কি না। যদি আবার বাড়ে। অনিলবাবু কিন্তু বলেছেন সাবধানে থাকলে আর হবে না। পৈতৃক তো আর নয়?

লতা—ওর সঙ্গে কথা বলেছিস্?

অলি—কেন বলবো না?

লতা—তোর মায়ের ইচ্ছে ছিলো ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে অনিল ডাক্তার তা তো জানে?

অলি—জানে? না না। কি করে জানবে?

লতা—না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমি জানি না অনিলবাবু জানে কি না।........ ওর বিয়ে হয়েছে?

অলি—আমি কি জিজ্ঞাসা করেছি?

লতা—শুনেছিস কিছু?

অলি—আমাদের নিমন্ত্রণ করেনি।

লতা—তুই রাগ করছিস কেন?

অলি—তুই ওসব কথা তুলছিস কেন?

লতা—কেন, এতে দোষ আছে?

অলি—কেন, এতে দরকার আছে?

লতা—এমনি ইচ্ছে হলো, বললুম।

অলি—আমার এ ইচ্ছে হয় না, তাই শুনতে চাই না।

লতা—তবে কি ইচ্ছেটা চেপে যাবো?

অলি—আমিও কি অনিচ্ছেটা চেপে যাবো? (কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব।)

অলি—লতা, কিছু মনে করিস নি।

লতা—পাগল নাকি?

অলি—কিছু মনে করিস্ নি। আজকাল মনটা ভালো নেই। তাই রেগে রেগে উঠি থেকে থেকে।

লতা—এমনি? শুধু শুধু?

অলি—হ্যাঁ, রেগে উঠি নিজের মনে মনে। কার ওপর যে রাগ করি লোক খুঁজে পাই না।

লতা—সেই হরিচরণ এখনো তোদের বাড়িতে আসে?

অলি—কে হরিচরণ?

লতা—যে তোর পাত্র যোগাড় করে দিয়েছিলো।

অলি—আসেন। বাবার সঙ্গে বহুদিনের আলাপ।

লতা—লোকটাকে আমার ভালো লাগে না।

অলি—কেন?

লতা—কি জানি কেন মনে হয় ও যেনো কারো মন্দ হ'লে খুশী হয়। যেনো দুর্ভাগ্যের অগ্রদূত। (ভোলা এলো।)

ভোলা—ডাক্তারবাবু এসেছে। দাদামশাই বললে তোমাকে যেতে নয়।

লতা—তোমাকে যেতে নয়? বাবা ভোলার ভাষাটা নিয়ে নূতন ধরণের চলন্তিকা অভিধান লিখতে হবে।

ভোলা—বললেন, "ডাক্তার এসেছে, মাসিমাকে ব'লে আয়। বলিস তাকে আসতে হবে না। দরকার নেই।"

অলি—আচ্ছা।

লতা—ডাক্তার কী করছে? নাড়ি টিপছে?

ভোলা—না গো। গল্প করছে। দাদামশাই বিয়ের কথা বলছেন।

লতা—কার রে?

ভোলা—ডাক্তারবাবুর, বিয়ে করেনি যে এখনো?

লতা—ডাক্তার কী বললে?

ভোলা—বললে, করবে এবার। বড়ো লোকের মেয়েকে বিয়ে করবে। খুব সুন্দর চাই বলেছে। অনেক লেখাপড়া জানা মেয়ে চাই আবার।

লতা—আরে মোলো। তবে যে তুই হাঁদা গোবিন্দ? একথাগুলি তো ঠিক মনে ক'রে রেখেছিস? ভুলিস নি তো?

ভোলা—কিছু ভুলিনি। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। (ভোলা চলে গেলো।)

অলি—বলতে পারিস লতা, পুরুষেরা দু'পয়সা থাকলেই অর্ধেক রাজত্ব আর এক রাজকন্যা চায় কেন?

লতা—আর মেয়েরা দুটো পাশ করলেই জজ্ ম্যাজিস্ট্রেট চায় কেন?

অলি—তা যা বলেছিস।

লতা—কটা বাজলো কে জানে? আমি যাই। কেমন? (অঞ্জলির একখানি হাত ধ'রে) সাড়ি চুড়ি ছাড়বার সেইসব পাগলামি মাথায় আর নেই তো? ওসব করিস নি। আজ আসি। (ক্ষণকাল হাত ধ'রে দুই সখী নিরুত্তর। সুলতা চলে গেলো। অঞ্জলি শূন্য দৃষ্টিতে একাকিনী। দেখা গেলো অনিল আস্তে আস্তে আসছে। কাছে আসতেই অঞ্জলি উঠে দাঁড়ালো।)

অনিল—কেমন আছো?

অলি—এতো তাড়াতাড়ি কি আর এমন শরীর খারাপ হবে? আপনি এখানে এলেন?

অনিল—নিমন্ত্রণ সেরে ফিরছি। তোমার বাবাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। তোমাকে ওখানে দেখলুম না। তাই ভাবলুম আমার ব্যবস্থাপত্রের কথা তোমাকে একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই।

ল—কী ব্যবস্থাপত্র ?

নল—সেই যে শরীরটায় যত্ন নেওয়ার কথা। তোমাকে বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে। আমাদের মেয়েরা নিজেদের উপর রাগ ক'রে দেহটাকে কষ্ট দেয়। লোকে তাই বলে চমৎকার। কিন্তু আমি তা বুঝি না। মৃত্যুর তপস্যায় এতো কী বাহাদুরী? অঞ্জলি, মরণের সাধনা আর যে-ই করুক, তুমি ক'রো না। তোমাকে মানায় না। তোমার মায়ের আদেশও কি অমান্য করবে ?

—মায়ের আদেশ আমি কি কখনো অমান্য করতে পারি ?

ল—তোমার মা তোমাকে অত্যন্ত ভালো বাসতেন। রোগের সময় যখন তাকে দেখে যেতুম, তুমি হয়তো অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে, কাছে থাকতে না, তখন অনেক কথাই বলতেন। তোমার মা তোমাকে বেশি পড়াশুনা করাতে চেয়েছিলেন, আরো কতো কি ....

—বাবার মত ছিল না।

ল—সত্যি অঞ্জলি, আজ তোমার মা নেই। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসছি। সেই দাবীতে আমার অনুরোধ রাখবে না ?

—কী অনুরোধ ?

ল—না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, উপোস ক'রে ক'রে নিজেকে মেরে ফেলো না।

— কতো বার শুনবো ?

ল—আরো একটা কথা ছিলো তোমাকে বলবার।

—আপনি নাকি বিয়ে করবেন ? ভোলা শুনেছে, বাবার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন।

ল—ওঃ সেই কথা ? উঁকে না বলেছি ?

—বড়ো লোকের মেয়ে নাকি ?

ল—উঁকে তাই বলেছি।

—উঁকে বলেছেন তাই। আসলে সে বড়ো লোকের মেয়ে নয় ?

ল—খুব নয়। তোমাদের মতো মধ্যবিত্ত সংসার।

—সুন্দরী বুঝি খুব ?

ল—উঁকে তাই বললুম। আসলে তোমাদেরই মতো আর কি।

—বেশ ভালো। (কিছুকাল উভয়ে নীরব।)

ল—একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। কতোবার বলবো ভেবেছি। অবসরও হয় না। তা ছাড়া......

—কী এমন কথা ? খুব জরুরী নয় নিশ্চয়। জরুরী হ'লে ব'লেই ফেলতেন। থাক-না, পরে শুনবো।

ল—কাল থেকে তো আর আসবো না। কবে আবার দেখা হবে......

—না-ই বা হ'লো দেখা ?

অনিল—অনেক কথা আছে যে। তা ছাড়া তোমার দেখা পেতে ইচ্ছে করে।

অলি—না না। ইচ্ছে করতে হবে না।

অনিল—কেন অমন ক'রে এড়িয়ে যাচ্ছো অঞ্জলি ? তুমি জানো তোমার মায়ের ইচ্ছে ছিলো তোমার সঙ্গে আমার.....

অলি—ছি! ওকথা এখন আর বলতে নেই।

অনিল—হ্যাঁ, বলতে আছে। আমাকে বলতে আছে। আমি আর জনের মতো নই।

অলি—আমি আর পাঁচজনের মতো। আমাকে শুনতে নেই।

অনিল—তুমি কি বরাবরই এমনি ক'রে.....

অলি—কেন বাজে বকছেন ?

অনিল—তোমাদের পাড়ার সুশীলার আবার ....

অলি—আমি নই। পাড়ার খবর দেবার জন্য আপনাকে [illegible] রাখলো না। আমারও পাড়ার খবরে কাজ নেই।

অনিল—তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে.... অলি, নিজের বোঝা কেন বইবে ? অলি—

অলি—শুনবো না শুনবো না। (গমনোদ্যত।)

অনিল—দাঁড়াও। নিজেকে ঠকিয়ো না। আমি দেখেছি, বুঝেছি তোমার মন।

অলি—(দুকানে দুহাত চাপা দিয়ে) ছি ছি ছি!

অনিল—অলি সমাজ আমি মানি না।

অলি—আমি মানি। [illegible] বেশি ক'রে মানি।

(দ্রুত চলে গেলো।)

চতুর্থ অংক : প্রথম দৃশ্য :

(সকালবেলা। মনোমোহনের মন দীপ্তিত [illegible]। তাঁর পিছু পিছু একখানি [illegible] ছটি চেয়ার নিয়ে এলো ভোলা।)

মনোমোহন—হাঁ, ঐখানেই রাখ। আর [illegible] একটা [illegible] আলমারি আসবে। সেটা ঐখানে রেখে দিবি। কুলিদের কিছু দিতে হবে না। সব জিনিস এসো [illegible] দেবো। [illegible] তাই বলা আছে।

ভোলা—মাসিমাকে বলে দিন। আমার ভুল হয়ে যাবে।

মনোমোহন—না না। মাসিমাকে নয়। এতো দিন রইলি আর এসব বুঝবি না ? তবে তোকে এখানে কাজ করতে হবে না। (ভোলা কুণ্ঠিত হয়ে পাশের দিকে চলে যাচ্ছিলো।) শোন। আমার স্নানের তেল সাবান দাড়ি কামাবার জিনিস, দাঁত মাজার ব্রাশ— শুনেছিস ? না, অন্যমনস্ক হ'য়ে ....

ভোলা—আজ্ঞে শুনেছি। ভুলে যাবো না। মনে থাকবে।

মনোমোহন—হাঁ। ঐ যা যা বললুম, ওগুলো এই টেবিলের টানার মধ্যে রাখবি।

ভোলানাথ—আমি রাখবো ? মাসিমাকে সাজিয়ে রাখতে বলবো না ?

মনোমোহন—বেরো এখান থেকে। মাসিমা, মাসিমা, মাসিমা, মাসিমা কি খেটে খেটে মরে' যাবে নাকি ? তুই নিজে সব করবি। বুঝলি ?

ভোলা—বুঝলুম। নিজে করবো। ভুলবো না। মনে থাকবে।

মনোমোহন—আচ্ছা এখন যা। আর দেখ, তোকে বেশি খাটতে হচ্ছে, আরো খাটতে হবে। এই নে। কিছু কিনে নিবি। (টাকার থলি থেকে একটি টাকা দিলেন। ভোলা খুশি চাপতে চাপতে হাত পেতে নিল।)

ভোলা—মাসিমাকে বলবো না ?

মনোমোহন—কী ?

ভোলা—এই—পেলুম ?

মনোমোহন—না, না। খবরদার বলবি না বলছি। (অঞ্জলি এলো।)

অলি—বাবা, তুমি গরম জলেই নাইবে তো ?

মনোমোহন—কী দরকার ?

অলি—হাঁ। সাবধানের মার নেই। একি ? এই চেয়ারগুলো কখন এলো ? এই আলনা—টেবিলটা ?

মনোমোহন—ভাবছিলুম তোর ঘরে দুখানা গদি-আঁটা চেয়ার ....

অলি—না, না। আমার দরকার নেই। তা ছাড়া আমি তো আর আমার ঘরে শুই না। মায়ের ঘরে শুই।

মনোমোহন—কই ? আমি জানি না তো ? কবে থেকে ?

অলি—কাল থেকে। বাবা, মায়ের কথা বড়ো বেশি মনে পড়ে, তাই।

মনোমোহন—দেখ অলি, সংসারে দুঃখ আছেই। কষ্ট থাকবেই। তবু সেই দুঃখটাকে চাপা দিয়ে আমাদের হাসিমুখে ঘুরে বেড়াতে হবে। সবাই সেই আগেকার মতো করতে হবে। এইটেই তো শক্ত। এর নাম কর্তব্য।

অলি—এই সব জিনিস পত্র আনলে মা দেখলে কতো আনন্দ করতো। মা থাকলে নিজের ঘরে কিছুই রাখতো না। সবই তোমার ঘরে থাকতো। বাবা, মাকে তোমার মনে আছে তো ঠিক ? ভুলে যাও নি ? আমি এঘরে আসবার সময় কেমন যেনো মনে হলো মা তোমার খাটের মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তোমার হাঁটুতে ....

মনোমোহন না না। ওসব আর কিছু নেই। অনিলের চিকিৎসা সত্যিই ভালো। বলেছে, "দেখবেন আর কখনো হবে না।" তবু একটু সাবধানে থাকতে বলেছে।

অলি—সে ভার আমার ওপর। কিন্তু এতো জিনিস থাকতে আবার এই সব

টেবিল চেয়ার আয়না-আলমারি কেন? ভোলা বলছিলো কাচের বাসন কি সব আসবে নাকি? কী হবে বাবা? ভেঙে যাবে তো অল্পেতেই কাঁসার বাসন কি আমাদের কম রয়েছে?

মনোমোহন—ভোলা? (ডাকলেন।)

অলি—ভোলাকে কেন?

মনোমোহন—ও' তোকে বলতে গেলো কেন?

অলি—বললেই বা।

মনোমোহন—না। সামান্য হাঁচি-কাশির খবরটিও তোকে দিতে হবে নাকি?

অলি—মিছিমিছি তুমি রাগ করছো কেন বাবা?

মনোমোহন—না, করবে না? ব্যাটা ভারি শয়তান।

অলি—তুমি মিথ্যে দোষ দিচ্ছো। ভোলার মতো মানুষ খুব কম।

মনোমোহন—আচ্ছা হয়েছে। আর সুপারিস্ করতে হবে না।

অলি—হরি খুড়ো আসে নি?

মনোমোহন—না, কেন? তাকে কেন?

অলি—এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। প্রায়ই আসে কিনা।

মনোমোহন—আসবে না? আমি একলাটি কাটাতুম কি ক'রে ওহরি না আসতো। ঐ একটা মানুষ আসে, বসে। তবু দুদণ্ড সময় কাটে। তা ছাড়া লোকটার বোধ-শোধও আছে। সেদিন মনুসংহিতাখানা.. (হরিচরণ এলো।) এই যে। বলতে বলতেই। এসো, বোসো।

হরিচরণ—বাঃ (ঘরের বাহারে বিস্মিত অঞ্জলি চলে' যাচ্ছিলো) কেমন আছো মা অঞ্জলি?

অলি—ভালো আছি।

হরিচরণ—বেশ বেশ। (মনোমোহনের অলক্ষিতে) এসো মা এসো। (অঞ্জলি চলে গেলো।) মেয়ে দেখে কী বললে হে?

মনোমোহন—কী দেখে?

হরিচরণ—এই সব সাজ-সজ্জা?

মনোমোহন—বলবে আবার কি? বাড়ি আমারি তো? না মেয়ের?

হরিচরণ—না হে, মেয়ে যে সম্পত্তি দখলের নালিশ রুজু করবে তা বলিনি। বলছিলুম, হঠাৎ বাবার বাবুগিরির সখ দেখে......

মনোমোহন—বেশ তো লোক তুমি। তোমারি পরামর্শে আমি এসব করলুম আর তুমিই বলছো কি না......

হরিচরণ—আহা, পরামর্শ দেবো না? জীবনটা কি তোমার মরুভূমি হ'য়ে থাকবে চিরকাল? কিন্তু দ্বিতীয় দফা যে, দ্বিতীয় দফায় অনেক কাঠখড় (এদিক ওদিক দেখে) তাই বলছিলুম মেয়ে জানতে পারছে না তো?

মনোমোহন—কি ক'রে জানবে? আমি কি তাকে বলতে যাবো?

হরিচরণ—আহা, আন্দাজি বুঝতে পারছে না তো?

মনোমোহন—তার মানে?

হরিচরণ—বুঝছো না? বলি, ঘরের সাজ বদলানো, পাকা চুল কাঁচা করা—দেখেছো কলপটা দিয়ে তোমার বয়স দশ বারো হাত পিছিয়ে গেছে, ওটা দেখে মেয়ে কিছু......

মনোমোহন—না, না, ওর সেদিকে নজরই নেই।

হরিচরণ—তা ঠিক, মেয়ে তোমার সং। কখনো উপরে চাইতে দেখিনি। সব সময়েই মাটিতে নজর।

মনোমোহন—হুঁঃ তবে?

হরিচরণ—মেয়েটারও আবার......, সেও তো হয়, আজকাল।

মনোমোহন—অঃ, তুমি বলতে চাও আমি যখন দ্বিতীয় দফা......বেশ, তবে ওসবে কাজ নেই।

হরিচরণ—আরে রামোঃ, কথা পাকা হ'য়ে গেছে। ভদ্রলোকের কথা। তোমাকে ওর মনে ধরা বড়েই তাকে।

মনোমোহন—তবে?

হরিচরণ—সে হয় না। শুভকর্ম সমাধা হ'য়ে যাক। ওসব এমনি ঠাট্টা করছিলাম হে, ঠাট্টা করছিলাম। (ভোলা এলো।)

ভোলা—কাচের সব বাসন এসেছে।

মনোমোহন—এঃ, এই সকলেই পাঠিয়েছে? দুপুরে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলুম যে। সেই সময় আমি থাকবো না, নাঃ, সবাই মিলে আমাকে জ্বালাবে দেখছি। ভোলা, যেখানে হোক্ রাখতে বল। (ভোলা চলে গেলো)।

হরিচরণ—কাচের বাসন আনাচ্ছো? কী রকম সব বাসন?

মনোমোহন—টেবিলে খাবার সব রকম বাসন। চায়ের সেট......

(অঞ্জলি এলো)

অলি—বাবা, ওগুলো মায়ের ঘরে রাখলুম না। আমার ঘরে রেখেছি। পরে দেখে শুনে ঠিক জায়গায় রাখলো। কেমন?

মনোমোহন—হ্যাঁ হ্যাঁ, যা হয় করিস্। (ক্ষণকাল নীরব)

অলি—হরিকাকা এসবে আপনার কী সুখ হয় বলুন তো?

হরিচরণ—কী বলছো মা-জননী?

অলি—এই সেদিন পর্যন্ত মায়ের সেবা না হ'লে বাবার চলতো না আর আজ সব উল্টে গেলো? বাবা, আমি সব বুঝেছি। চুলের কলপ দেখেই......।

মনোমোহন—ওটা কলপ নয় তো। বড চুল উঠছিলো। টাক হয়ে যাচ্ছিলো টাক্ আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

হরিচরণ—তোমার দুচক্ষে তোমার টাক দেখতে পাবে কি করে হে?

মনোমোহন—থামো, থামো। ইয়ার্কি করবার সময়-অসময় নেই, না?

অলি—আমি দিদি সবই রয়েছি। মায়ের স্মৃতি ঘরের সর্বত্র জ্বল জ্বল করছে—এতো সহজে এসব ভুলবে? মায়ের এতো বড়ো অসম্মান...(অশ্রুমুখী)

মনোমোহন—থাম অলি থাম্। অমনি চোখ পানসে হয়ে এলো। আমি কি সখের বিয়ে করছি?

অলি—সখের কি দুঃখের জানতে চাই না। মা-কে তো ভুললে? বিয়ে তো করছো? ঘরের এই সব সাজসজ্জা বদলানো..... মানেই.....আর তোমার ঐ কটা চুল আমাকে ছুঁচ বেঁধাচ্ছে (চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলো, হরিচরণ নির্বাক, মনোমোহন বিরক্ত ও বাক্যরুদ্ধ।)

মনোমোহন—হরিচরণ, দু এক দিনের মধ্যেই বন্দোবস্ত হওয়া যাক, বেশি দেরি করলে মেয়েটা কেঁদে মরে' যাবে। সম্মানের হানিটাই ঠিক করো। পরেরটা নয়।

হরিচরণ—ওদের সামনে বাড়াবাড়ি করতে গেলে তা হবে।

মনোমোহন—মোসাহেবি আরম্ভ হলো! আমি কাঁদাস না খেতে খেতে শাড় হলে কারে নিয়ে করতে পারছি সব ওদের ছেড়ে মেয়ে পার করবার বেলা বাড়াবাড়ি করতে পারবে না? নাঃ পরশুই ......না, না...... কালই বন্দোবস্ত হওয়া যাক। ওখানে অন্য কোনো থাকা যাবে দু'দিন। তারপরে সই মিলে একেবারে এখানে এসে পড়া যাবে। তখন আর ভাবি না।

হরিচরণ—তা বটে। তখন ঐ অলিই তাকে মা বলে নেবে।

মনোমোহন—নিশ্চয়ই। আমার স্ত্রী, ধর্মপত্নী, সহধর্মিণী—ওর মা হবে না? নিশ্চয় হবে। (অঞ্জলি এলো)

অলি—বাবা, বিয়ে করা তোমার হবে না।

মনোমোহন—হবে না মানে? সব ঠিক ঠাক—

অলি—সব ভেঙে দাও।

মনোমোহন—আরে পাগলি মেয়ে। এ যে আমার কর্তব্য। স্ত্রী বিনা কি ধর্ম হয়?

হরিচরণ—রামকে স্বর্ণ সীতা গড়ে' তবে যজ্ঞ করতে হয়েছিলো।

অলি—বাবাও মায়ের পাথরের মূর্তি গড়ে রেখে দিক।

হরিচরণ—নির্জীব মূর্তির চেয়ে সজীব রক্ত মাংসের মূর্তি আরো ভালো না কি মা?

অলি—ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। ভালো। খুব ভালো।

আমারই ভুল হ'য়েছে। (চলে গেলো ক্ষণকাল নীরব।)

মনোমোহন—হরিচরণ, আর দেরি নয়।

হরিচরণ—রামোঃ, শুভস্য শীঘ্রং।

মনোমোহন—অজিতটা......

হরিচরণ—ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ। ধর্মের ও' বুঝবে কী? এসব কি সখের বিয়ে?

মনোমোহন—ঠিক তাই। এসো। (ঘর থেকে চলে' যাবার জন্য অগ্রসর হ'লো। অঞ্জলি বেগে এসেই হঠাৎ থমকে' দাঁড়িয়ে আবার তেমনি বেগে চলে' গেলো। দুই বৃদ্ধ বিব্রত ও হতবুদ্ধি।)

চতুর্থ অংক : দ্বিতীয় দৃশ্য

(বাগান। রাত্রি প্রথম প্রহর। আকাশে চাঁদ। ভোলা বেঞ্চ দুখানি মুছছে।)

লতা—হ্যাঁ রে ভোলা, বেঞ্চ এতো ধুলো হ'লো কি ক'রে বলতো?

ভোলা—সন্ধ্যের আগে ঐ যে ঝড় হ'লো?

লতা—হ্যাঁরে তোর মাসিমা এখনই জিনিস-পত্তরগুলো সাজাচ্ছে নাকি? তবে যে বললে নামিয়ে ঘরে রেখেই আসবে। এখনো তো এলো না?

ভোলা—না, না, সাজাবে না। সে সব অমিই করবো। জানো লতা দিদি, দাদা-মশাই মাসিমাকে যে কী ভয়ই করে!

লতা—ভয় করে? কেন রে?

ভোলা—বুড়ো বয়েসে বিয়ে করছে কিনা। মাসিমা রাগ করছে, দাদামশাই আমাকে বলে গেছে মাসিমা যেনো কিছু না করে। অতো বুড়ো আবার কি না বিয়ে, লোকে বলবে কী! ছি'

লতা—কখন গেছে? বিয়ের দুদিন আগেই গেলো দেখছি।

ভোলা—যাবে না? মাসিমা খালি খালি কাঁদে, রাগ করে। তারপর রূপো কার বউ নিয়ে আসবে। মাসি, দাদামশাই আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে গেছে, এই দেখো। (ট্যাঁক থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট বার করলো। আবার রাখলো।) বলেছে আবার পরে দেবে, যদি ঠিক হুকুম মতো কাজ করি। পালাই, মাসিমা আসছে। (অঞ্জলি এলো। ভোলা চলে গেলো।)

অলি—লতা, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম না? জিনিসগুলো সাজাতে বসিনি ভাই। হাতে যে ছুঁচ বিঁধছে। মা'র স্মৃতি এ বাড়ি থেকে এতো সহজে মুছে যাবে, ভাবতেই পারছি না। মা'র ঘরে গিয়ে মা'র ফটোর দিকে চেয়ে বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠলো। মনে হচ্ছে ওঘরে বোধ হয় আর যেতে পারবো না। লতা, আমরা এতো সেবা করি, যত্ন করি, ভালোবাসি—আর পুরুষে এতো শিগ্‌গির ভুলে যায়? ওরা এতো কঠিন কেন ভাই?

লতা—সবাই নয়।

অলি—তা হবে।

লতা—রাগ করবি না অলি, একটা কথা বলবো?

অলি—কী?

লতা—কথা দে, রাগ করবি না?

অলি—না।

লতা—অনিলবাবুর প্রস্তাবে রাজি হ'লে কী হয়? কর না বিয়ে?

অলি—(রেগে) কী!

লতা—তোর মা'র তো ইচ্ছে ছিলো, আর তুইও তো ওকে......ওকে ভালোবাসতে পারবি না?

অলি—থাম পাপিষ্ঠা। ঠাট্টারও একটা সীমা আছে জানিস?

লতা—এ বুঝি ঠাট্টা? ঠাট্টা তো করছে তোর বাবা। তোকে একাদশীর উপোস করতে দিয়ে নিজে বিয়ে......

(অঞ্জলি সুলতার মুখ চেপে ধরলে।)

অলি—সে বিচার আমার নয়।

লতা—নয় মানে? নিশ্চয়ই সে বিচার তোমার-আমার। ওরা যা খুসী করবে আর আমরা বলবো না? এই সেদিন তোর মা মারা গেলো আর আজ সেখানেই "মা" হ'য়ে আসছে?...... তারে তারে জিনিস আসছে, ঘর সাজানো হচ্ছে। (ভোলা এলো)

ভোলা—মাসিমা, ছবির দোকান থেকে ক্যালেণ্ডার ছবি এনেছে। কোথায় রাখবো?

অলি—আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছিস, তার উপর।

ভোলা—কী বললে?

অলি—তোর যেখানে খুসী সেখানে রাখ্। আমি কী জানি?

ভোলা—আরে, আমি কী করবো? আমিও তো বুড়োকে বারণ করেছিলুম বিয়ে করতে।

লতা—খুব বলির। তুই বারণ করেছিলি কি রে?

ভোলা—আমি তো আর কিছু বলবো না। মাসিমা খালি খালি বকবে আমাকে! আমি এখানে থাকবো না, আমি মা'র কাছে পাটনায় চলে যাবো। (ভোলা চলে গেলো।)

লতা—অলি, কিছুদিন অন্য কোথাও গিয়ে থাকবি? চল্‌-না আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবি?

অলি—সে কি অন্য কোথাও হ'লো? এই ক'পা এগিয়ে তোদের বাড়ি!

লতা—তবে, এ বাড়ি নয় তো? এ বাড়িতে কি তোর কোথাও ভালো লাগবে? এ বাড়ির মাটিতে আর কি তুই পা ফেলতে পারবি?

অলি—আচ্ছা লতা, অনিলবাবু অমন কথা মুখে আনলো কি ক'রে?

লতা—ওর সাহস আছে। ও' মেয়ে মনুষ্যকে ভালোবাসতে পারে।

অলি—অকণ্ঠে বললেন, "তোমার মায়ের অন্তিম ইচ্ছে পূরণ করতে চাই।" বললে যে আমার মন বুঝেছে তাই সাহস পেয়েছে। আমি ঘর থেকে বোধ হয় পালিয়ে গেলুম। সে কিছুক্ষণ বোধ হয় দাঁড়িয়েছিলো। কানে গেলো যেনো বলছে, "আর কি আসবো?" আমি যেনো বললুম, "না"। চুপ ক'রে চলে' গেলো বোধ হয়, তখন আমার বুক ফেটে গেলো। আচ্ছা লতা, সব পুরুষে জোর করে আর উনি আমার কথা মেনে নিলেন কেন? জোর তো করতে পারতেন? আরে দুদণ্ড থেকে আমাকে জোর ক'রে দাবী জানাতে পারতেন তো?

লতা—বীর যে। দস্যু তো নয়; ভীরুও নয়। পুরুষ যদি ঐ রকম হয় তবে তাকে বিয়ে করা চলে।

অলি—সত্যি? তবে সব সমস্যার মীমাংসা করে দেনা ভাই, তুই-ই ওকে বিয়ে কর না?

লতা—সেই বঙ্কিমবাবুর কথা। যাকে বিয়ে করতে পারি না, তার বিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। তাই না?

অলি—অমন ক'রে বলিস নি লতা।

লতা—তারপর আর আসে নি?

অলি—না। তোর কি মনে হয় আবার আসবে?

লতা—যদি আসে কি রকম ক'রে তাড়াবি অলি? তখন শুধু 'না' বলেছিলি এবার ভোলাকে দিয়ে তাড়াবি?

অলি—ছি! কী বলছিস?

লতা—তবে? পুলিশ ডেকে?

অলি—আঃ, থামবি না?

লতা—তবে? তোর বাবাকে দিয়ে?

অলি—অমন কথাও বলতে পারলি?

লতা—তবে? বলবি আসতে?

অলি—না, না। ওসব বলিস নি আর। আসবে না।

লতা—যদি আসে তাড়িয়ে দিস। হাত ধরে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিস, কেমন? পারবি? পারবি না?

অলি—না। বলবো পায়ে পড়ি, আর এসো না।

লতা—শুনবে তোর কথা?

অলি—শুনবে।

লতা—যদি না শোনে?

অলি—ওর পায়ে মরে' পড়বো আমি।

লতা—ছি! আর ও' সেই মরা দেহটা সারা জীবন কাঁধে ব'য়ে বেড়াবে? কে দোষ করলো যাতে এতো দুঃখে ওকে পেতে হবে? (ভোলা এ'লো

ভোলা—(অলিকে) মাসিমা? (এক খণ্ড লিপি দিলো।)

অলি—কে দিলো?

ভোলা—বলতে বারণ করেছেন। তুমি পড়ে' দেখো। (ভোলা চলে' গেলো। অলি পত্র পড়ে' অবশাঙ্গ)

লতা—কী হ'লো? অলি? কার চিঠি? দেখি? (চিঠি নিয়ে পড়া শেষ হ'তেই অঞ্জলি সুলতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।) কাঁদ্। ভাববার ক্ষমতা নেই; কাঁদ্। অলি, অনিল ঠিকই লিখেছে। অলি তুই রাজি হ'। তোর জীবন মিথ্যের বোঝা ব'য়ে বেড়াস নি। অনিল বীরপুরুষ। (অঞ্জলি মুখ তুললো।)

অলি—আমি পারবো না।

লতা—পারবি না?

অলি—না।

লতা—কেন?

অলি—সে হয় না। (ভোলা এলো।)

ভোলা—মাসিমা, কাঠের গোলা থেকে কি সব জিনিস এলো আবার।

লতা—এখনও? এতো রাত্রেও?

ভোলা—কালও আসবে। দাদামশাই পরশু আসবেন।

লতা—চুলোয় আসবেন। (ত্রস্ত ভোলা চলে' গেলো।) অলি, এখনো ফেরাতে মন চাইছে?

অলি—না।

লতা—কী না?

অলি—জানি না। ভয় করে। (এমন সময় অনিল এলো ধীরে ধীরে।) না। এসো না। চলে' যাও। আমার শেষ জোরটুকু ছিনিয়ে নিয়ো না। (অনিল চলে' যাচ্ছিলো।) না, যেয়ো না। (অনিল দাঁড়ালো। অলি অনিলের দিকে এক পা এগিয়েই "উঃ" ব'লেই মর্ম-পীড়িত।)

চতুর্থ অঙ্ক: তৃতীয় দৃশ্য:

(প্রথম রাত্রি। মনোমোহনের নবসজ্জিত ঘর। মনোমোহন তামাক খাচ্ছেন। নববধূ দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ালো।)

মনোমোহন—জানতে পেরেছি। এসো বোসো। দেখছো কেমন হ'য়েছে?

নববধূ—ঐ আলমারিতে কাপড় চোপড় থাকবে বুঝি?

মনোমোহন—থাকবে কি গো? আছে। অন্য সময় খুলে দেখো।

বধূ—ড্রেসিং টেবিলটা চমৎকার।

মনোমোহন—পছন্দ হ'য়েছে? তা হ'লেই হোলো। কি জানো, মেয়ের হ'লো লক্ষ্মী। তোমরা খুসী থাকলেই.....

বধূ—বাবা-মা পুজোর সময় কলকাতা আসবে বলেছে। এলে কোথায় থাকবে? এখানে আনবে তো?

মনোমোহন—আনবো না? নিশ্চয় আনবো। এইখানেই থাকবেন না তো কোথায় থাকবেন?

বধূ—তোমার যদি ইচ্ছে হয় তাঁদের অমত হবে কেন? তাঁদের জন্যে আমার মন কেমন করবে। এখানে থাকলে......

মনোমোহন—তোমার কি মন কেমন করছে? না, না, মন-কেমন আবার কি। যতো দিন না বিয়ে হয় ততো দিনই বাপের ঘর।

বধূ—মা বলে, ছেলের চেয়ে স্বামী বড়ো।

মনোমোহন—ঠিকই।

বধূ—কই, মেয়েকে দেখছি না?

মনোমোহন—ভোলা? (ডাকলেন। ভোলা এলো। অপাঙ্গে একবার নববধূর দিকে দৃষ্টি দিলো।) অলি কোথা?

ভোলা—লতা মাসির বাড়ি।

মনোমোহন—ওঃ আচ্ছা তুই যা। (ভোলা চলে গেলো।) লতা ওর সমবয়সী। দুটিতে ভারি ভাব। দুদিন বাড়ি ছিলাম না। মেয়ের আর এখানে থাকতে মন সরেনি। (বধূ ওঁর পায়ের কাছে বসলো।) ওকি হ'লো? নামলে কেন মাটিতে?

বধূ—পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবো। দিতে হয়। মা বলে।

মনোমোহন—না, না, না, না। আরে বাপরে। প্রথম দিন থেকেই এতো কষ্ট। ওঠো। (বধূ উঠে বসলো।) আরে মেয়ে আসুক না একবার। দেখবে তখন। যদি একবার দেখে তুমি পায়ে হাত দিয়েছো, অমনি ছুটে এসে পা দুটো দখল ক'রে নেবে।

বধূ—কেন? আমার বুঝি অধিকার কম?

মনোমোহন—আরে রামোঃ। তুমি ওটা বুঝলে না। কেন করবে জানো? তোমাকে কষ্ট করতে দেবে না বলে'। হুঁঃ ওকে আমি বিলক্ষণ জানি। আমারই মেয়ে তো। গর্ব করবার মতো মেয়ে। অমন মাতৃভক্তি তুমি কখনো দেখোনি। দেখবে না। তুমি ভাবতেই পারবে না ও' তোমার পেটের মেয়ে নয়। কিন্তু সন্ধ্যে তো অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে। এখনো এলো না? ভোলা? (ডাকলেন। ভোলা এলো।) অলি কখন আসবে জানিস্?

ভোলা—লতা মাসিকে ব'লেছিলো দুচার দিন ওখানে থাকবে।

মনোমোহন—দু'চার দিন থাকবে? সে কি কথা? তুই লতাকে খবর দিয়ে আয়।

ভোলা—আচ্ছা। (চলে' গেলো।)

মনোমোহন—আজ একটু সকাল সকাল শুয়ো। পথে কষ্ট হ'য়েছে। আমি একটু দেরিতে শুই।

বধূ—তুমি না শুলে আমি শোবো না। শুতে নেই। মা বলে।

মনোমোহন—আচ্ছা আচ্ছা, আমি আজ সকাল সকালই শোবো। একবার হরিচরণের আসবার কথা ছিলো। এলো না তো?

হরিচরণ—(ঘরে ঢুকতে ঢুকতে) এই যে হরি-চরণ এসেছে। অনেক দিন বাঁচবো হে। দুঃখভোগটা দীর্ঘকালই করতে হবে দেখছি।

মনোমোহন—বোসো, বোসো। (ধীরে ধীরে বধূ চলে' গেলো।)

হরিচরণ—বাঃ, ঘরের চেহারা ফিরে গেছে দেখছি। কেমন, গিন্নির পছন্দ হ'য়েছে?

মনোমোহন—কী পছন্দ?

হরিচরণ—আরে, তোমাকে নয়। ঘর ঘর।

মনোমোহন—আমাকে নয় কেন? আমাতে অপছন্দের কী আছে হে?

হরিচরণ—আরে রামোঃ। তুমি তাই বুঝলে? বলছি, এমন সাজিয়েছো ঘরখানি; আমিই যখন ঘরে ঢুকলুম, প্রথমে তোমাকে নজরেই পড়েনি। টেবিল, আলমারি, খাট, সোফা—এ একেবারে মোচ্ছবের ব্যাপার।

মনোমোহন—বেশ হ'য়েছে ঘরখানা, নয়? আমাকে একটি একটি ক'রে সব জিজ্ঞাসা করছিলো। দেখলুম খুসীতে মুখখানা ভরে' গেছে।

হরিচরণ—মেয়েটিকে কেমন মনে হচ্ছে?

মনোমোহন—আমার পায়ে হাত বুলোতে যাচ্ছিলো।

হরিচরণ—বলো কি? তুমি সত্যই মনোমোহন। তোমার মেয়েকে দেখছি না? সে কোথায়?

মনোমোহন—ঐ যে ওর বন্ধু লতা, ওদের বাড়ি।

হরিচরণ—ঐ যে-মেয়েটা দুটো না তিনটে পাশ করলো? বিয়ে করেনি?

মনোমোহন—আরে, বিয়ে করেনি তো অনেকেই আজকাল। বাইশ বছরের আইবুড়ো মেয়ের আর অভাব নেই। বিয়ে হয় কই?

হরিচরণ—যা বলেছো। ছোঁড়ারা নিজেই খেতে পায় না আবার বউ পুষে খাওয়াবে? অনেকে আবার অবস্থায় কুলোলেও বিয়ে করতে চায় না কিন্তু।

মনোমোহন—এটি শিক্ষার কুফল। স্ত্রী ছাড়া, দাম্পত্য জীবন ছাড়া, গার্হস্থ্য ছাড়া ধর্ম হয় না এটা ক'জন বোঝে?

হরিচরণ—তবেই হ'য়েছে। ওরা যেনো ধর্ম ধর্ম ক'রে হেদিয়ে গেলো আর কি। সে

যাক্, মেয়েটাকে কিন্তু থান্ এখন পরিয়ো না।

মনোমোহন—আমার তো ইচ্ছে নয়। কি জানো হরিচরণ, মেয়েটার সংযম শক্তি অসাধারণ।

হরিচরণ—শাপভ্রষ্টা কোনো দেবী আর কি! (সুলতা এলো।)

লতা—এই যে মেশোমশাই। (প্রণাম করলো।)

হরিচরণ—আমি আসি ভাই মনোমোহন।

মনোমোহন—এসো। (হরিচরণ গেলো। অপাঙ্গে সুলতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে গেলো। নববধূ এলো।)

লতা—মাসিমা। (প্রণাম করলো।) আমি অলির বন্ধু, লতা।

বধূ—অলি এলো না?

লতা—পরে আসবে মাসিমা। মেশোমশাই, আপনি চলে' গেলেন, বাড়ি ফাঁকা। অলি হাঁফিয়ে উঠলো। আমাদের ওখানে নিয়ে গেলুম। তবু ভুলে থাকবে। তা সেখানেও কান্না। বড্ড কাঁদছে।

মনোমোহন—ঐ ওর দোষ। বড্ড কাঁদে। আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে না। বিয়ের সময় সে কী কান্না! (হরিচরণ এলো।)

হরিচরণ—মনোমোহন, কিছু টাকা দিতে পারো? একদম মনে ছিলো না। অনিল ডাক্তার আমার ছেলেকে দেখেছিলো। ভিজিটের দরুণ পনেরোটা টাকা পাবে।

মনোমোহন—কাল নিয়ো। এখন আবার বাক্স খোলা......

লতা—অনিল ডাক্তার তো এখানে নেই!

হরিচরণ—তাই নাকি? নেই এখানে?

লতা—ফরাক্কাবাদ চলে' গেছে।

হরিচরণ—ফরাক্কাবাদ কেন?

লতা—বিয়ে ক'রে সেখানে গেছে। সেইখানেই নাকি ঘর পাতবে।

হরিচরণ—যাক্ দুর্ভাবনা গেলো।

লতা—ঘটকালির 'ফি'টা মারা গেলো বলুন।

হরিচরণ—হরিচরণ সে পাত্র নয়। সে আমি অন্য হিসেবে নেবো। যা চেয়েছি তা নেবেই। না হ'লে দাতার অকল্যাণ হয় কিনা। (ভোলা এলো।)

মনোমোহন—অলি এলো?

ভোলা—না তো।

মনোমোহন—আমি একটু শুই। (এগিয়ে গেলেন খাটের দিকে। বধূ পায়ের দিকের বালিশ ঠিক ক'রে দিলো। লতা কখন সরে' পড়লো। মাথার বালিশ সরাতে গিয়ে একখানা চিঠি বেরিয়ে পড়লো।)

মনোমোহন—এটা কী? (পড়তে পড়তে বিমূঢ়।) এসব কি সত্যি? হরিচরণ, এ-ও কি হ'তে পারে? (অজ্ঞাতে হাতটা হরিচরণের দিকে বাড়ালো। হরিচরণ সিথন পাঠ করলো।) অনিল অলিকে বিয়ে ক'রে ফরাক্কাবাদ চলে' গেছে?

হরিচরণ—বাপের, সমাজের, ধর্মের কোনো তোয়াক্কা করলে না? সমাজ, ধর্ম কিছুই মানলে না?

মনোমোহন—এ কী হ'লো? এ যে সর্বনাশ হ'লো। অলি বিয়ে করলো? অনিলকে? ওযে বিধবা......(আকস্মিক উৎপাতে ক্ষিপ্তপ্রায়।)

[যবনিকা]

মনোবিদ্যায় মনঃসমীক্ষণের দান

ধনপতি বাগ

মনোবিদ্যা বলতে এখানে আমি যা বোঝাতে চাই তা' ঠিক দার্শনিক মতের মনস্তত্ত্ব না হলেও কতকটা মনস্তত্ত্বের তাত্ত্বিক দিক ঘেঁষা বলা যেতে পারে। মানুষের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করতে মনস্তত্ত্বের যেটুকু কাজে লাগে তাকেই এখানে মনোবিদ্যা বলে অভিহিত করতে চাই। ইংরাজীতে যাকে বলে Psychology of the normal mind। এই ইংরেজী বাক্যটি শুনলেই স্বভাবত মনে হবে যে মনঃসমীক্ষণ মানেই হচ্ছে Psychology of the normal mind। যাঁরা মনোবিদ্যা নিয়ে একটু বেশী নাড়চাড়া করেন তাঁরা এইখানেই বলে উঠবেন অতো ভণিতার দরকার কি বলে দিলেই হয় Psychoanalysis। মনঃসমীক্ষণ মানে Psychoanalysis বলতে মোটেই আপত্তি নেই, কিন্তু সাধারণে যে মনোভাব নিয়ে Psychoanalysisকে মনঃসমীক্ষণের সাথে যুক্ত করতে চান সেই মনোভাবকে মেনে নেওয়া সম্বন্ধে কিছু আপত্তি থেকে যায়। সাধারণের ধারণা মনঃসমীক্ষণের কারবার শুধু বিকৃত-মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থদের নিয়ে; পাগলা ছাগলা মানুষই হচ্ছে তার প্রয়োগের প্রকৃত এবং একমাত্র ক্ষেত্র। স্বাভাবিক মানুষের সুস্থ মনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টাকেও তাঁরা হয়তো অসুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ বলে মনে করবেন। যাঁরা অতো গোঁড়া নন তাঁরা উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্বীকার করলেও সেটা যে কোথায় এবং কতখানি তার সম্পূর্ণ ধারণা না থাকাতে সুস্থ মস্তিষ্কে মনঃসমীক্ষণের প্রভাব যে একটা কুফলের সৃষ্টি করে এ ধারণা মনের মধ্যে সযত্নে পোষণ করেন। এদের মনে এরূপ ধারণার সৃষ্টি কেমন করে হয় এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় তা নয়।

গোঁড়া এবং [illegible] উদার উভয়েরই ধারণা তাঁদের কাছে স্বাভাবিক হলেও তা সত্য নয়। অ-প্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের মনোজগৎ বিশ্লেষণেই মনঃসমীক্ষণের শুরু হলেও অস্বাভাবিক মনের বিশ্লেষণ লব্ধ জ্ঞানের চাবিকাঠি দিয়ে স্বাভাবিক মনের যে সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মূল্য মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। ঐ সমস্ত প্রকাশিত তথ্যের সমস্ত বিষয়গুলিরই সবিশেষ বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, তাই তাদের মধ্যে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ এখানে করবো। তার আগে একটা কথা এখানে জেনে রাখা ভাল,—প্রকৃতিস্থ-অপ্রকৃতিস্থ বা স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি। অনেকের ধারণা (বিশেষ করে যাঁরা এখনো এরিস্টটল যুগের দার্শনিক তত্ত্বে মশগুল) যে, স্বাভাবিক মন এবং অস্বাভাবিক মন এদের উভয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতের। এ ধারণা কিন্তু মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এর মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নেই। যিনি সমাজের মধ্যে অতি সাধারণ রকমের লোক এবং একেবারে বদ্ধ পাগল এই উভয় প্রকারেরই লোক দেখেছেন তিনি একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন এই দুয়ের মধ্যে এমন বহু লোককে তিনি চেনেন বা জানেন যাদের ঐ দু'রকমের কোনটার কোটাতেই ফেলা যায় না। আর একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই সমস্ত লোকের আচার ব্যবহার বিবেচনা করে তাদের পরস্পর সাজালে অতি সাধারণ থেকে বদ্ধ পাগল পর্যন্ত সারিবদ্ধ যে-কোন দু'জন লোককে বেছে নিলে তাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ তা' ধরা কঠিন হয়ে পড়বে। তা' হলে স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিকের ভেদ চিহ্ন অঙ্কিত করা এক মহা সমস্যায় দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু একটা কথা যদি আমরা মনে রাখি যে আজকে আমাদের

মধ্যে যাঁকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে করছি তিনিই যদি ভিন্ন দেশে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের পরিবেশের মধ্যে যেয়ে উপস্থিত হন তা'হলে সেখানকার লোকের কাছে তাঁর অপ্রকৃতিস্থ প্রতিপন্ন হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে, কেউ স্বাভাবিক কিম্বা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় আছেন কি না তার বিচার করতে গেলে সেই ব্যক্তি ঐ সময়ে যে পরিবেশের মধ্যে বাস করছেন তাকে উপেক্ষা করা চলে না; অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি যে সমাজে বাস করছেন সেই সমাজই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর মানসিক অবস্থা বিচারের মানদণ্ড। এক সমাজ থেকে অন্য সমাজের মানদণ্ড যদি ভিন্ন হয়, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকের মানদণ্ডও তাহলে ভিন্ন হতে বাধ্য। এ অবস্থায় যদি মনঃসমীক্ষকেরা বলেন যে স্বাভাবিক মন এবং অস্বাভাবিক মন এরা ভিন্ন জাতের নয় এদের তফাৎটা কেবল ক্রম নিয়ে (in degree) তা' হলে তাতে আপত্তির কোন কারণ থাকে না।

আর একটা কথা এখানে বলে রাখা ভাল। অ-প্রকৃতিস্থদের মধ্যে এমনও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যে-গুলিকে পৃথিবীর কোন দেশেই প্রকৃতিস্থ বলে সাব্যস্ত করা চলে না। কিন্তু এই সব দৃষ্টান্ত সর্বদেশে এক হলেও সর্বকালে যে এক নয় এ-কথা স্মরণ রাখতে হবে। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ইতিহাসে হবে না। পাগল বিকৃত-মস্তিষ্ক বলে যে লোকদের এককালে বিষ খাইয়ে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে তাঁরাই আবার পরবর্তী-কালে মহাপুরুষ ও বিজ্ঞানী বলে সম্মান পেয়েছেন। স্থান-কাল, পাত্রাপাত্র সব ভুলে গিয়ে যে লোক উন্দাম হয়ে গিয়েছে পরে সেই লোকই আবার সুচিকিৎসার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালিয়ে চলেছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কাজেই বিভিন্ন লোক নানা ধরণের মানসিক অবস্থায় থাকলেই যে তাদের মানসিক প্রকৃতির মূলগত বৈষম্য থাকতে হবে, একথা ঠিক নয়।

এর পর যে সমস্ত ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের আহৃত জ্ঞান মনোবিদ্যাকে পুষ্ট করেছে তাদের মধ্যে কয়েকটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে। প্রথমেই সংজ্ঞান (unconscious) মনের কথা ধরা যাক। মনের যে স্তরে বা অংশে সাধারণভাবে, স্বেচ্ছায়, নিজ ইচ্ছাকৃত শত চেষ্টায়ও আমাদের স্মৃতি পৌঁছুতে পারে না, মনের সেই স্তর বা অংশের নাম দেওয়া হয়েছে সংজ্ঞান বা অচেতন মন। এইরূপ সংজ্ঞান, আ-সংজ্ঞান (Sub-conscious) প্রভৃতি শব্দ-গুলি বহুদিন আগে থেকেই মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে চলে আসছে। কিন্তু তাদের সম্যক এবং সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা মনঃসমীক্ষণ যেভাবে দিয়েছে, মনস্তত্ত্ব সাহিত্যের কোন দিক থেকেই ওরূপ সংজ্ঞা দেওয়া কখনও সম্ভব হয়নি। মানুষের মনের উপর অবসংজ্ঞান মনের প্রভাব যে সমস্ত বাঁকাচোরা পথ বেয়ে চলে, সেই সমস্ত বিচিত্র পথের সন্ধান মনঃসমীক্ষণ ছাড়া আর কেউ-ই দিতে পারে না।

হিস্টিরিয়ার রোগী আপনারা সকলেই দেখেছেন। বাল্যকালের কোন বিশেষ ঘটনার স্মৃতি চাপা পড়ে থাকাই হচ্ছে এই রোগের মূল কারণ। পরবর্তী জীবনে রোগী হাজার চেষ্টা করলেও ঐ পূর্ব স্মৃতিকে স্মরণ করতে পারে না। চলতি শারীরবিদ্যা এবং মনোবিদ্যা হিস্টিরিয়া রোগের তথ্যানুসন্ধানে যা সাহায্য করেছে, তা নিতান্তই সামান্য। এই অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াও একান্তই মামুলি ধরণের। তাই চোখের সামনে হাজার রোগী থাকলেও সে রোগ নিরাময়ের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই ওদের দিয়ে সম্ভব হয়নি। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের কল্যাণে হিস্টিরিয়া রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াও আজ আর অসম্ভব নয়। এই রোগের আসল স্বরূপ কি আরো এমন অসুখ হোলই বা কেন, দিনে দিনে কিভাবেই এ বেড়ে ওঠে, এসবেরই সম্পূর্ণ এবং সুষ্ঠু উত্তর দিয়ে মানব-মনের পূর্ব স্মৃতিকে উদ্ধার করতে মনঃসমীক্ষণ আজ সমর্থ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের কার্যকারিতা সম্পর্কে দু' একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা—এই দুয়ের সম্বন্ধ খুবই নিকট। একটিকে ধরে টান দিলে অপরটি সাড়া না দিয়ে পারে না। সেইজন্য আমাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে কেউ আমাদের স্মৃতি-শক্তির রাজ্যে ঝড় বইয়ে যদি তাকে কাবু করতে পারে এবং তার উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তাহলে বুদ্ধিমত্তা ... থাকলেও তার স্ফুরণের পথে নানা বাধা সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী।

এ ধরণের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। তার বিশেষভাবে খুঁটিয়ে না দেখলেও এই জাতীয় লোক সহজেই চোখে পড়ে। স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট মিলবে। যে ছেলের স্মৃতিশক্তির রাজ্যে কোন গোলমাল ঘটেছে, তার পক্ষে পঠিত জিনিসের পুনরাবৃত্তি সহজসাধ্য হয় না। ফলে তাকে আমরা বোকা বলে ধরে নিই। সামান্য একটু তলিয়ে যদি আমরা দেখি, তাহলে এ ধরণের ছেলে মেয়ে যথেষ্ট চোখে পড়বে। সকলেই কোন না কোন সময়ে লক্ষ্য করেছেন, এমন একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি।

স্কুলের কতকগুলি ছাত্রছাত্রীদের বা বাড়ির কোন কোন ছেলেমেয়েদের উল্লেখ করে অনেক সময় বলতে শোনা যায়: অমুক ছেলেটা দিন-দিন যেন বোকা হয়ে যাচ্ছে, ছেলেবেলায় ওতো এমন বোকা ছিল না, যত বড় হচ্ছে, ততই যেন ছেলেটা নির্বোধ হয়ে উঠছে। অবশ্য যেসব ছেলেদের উপলক্ষ্য করে এই ধরণের কথা বলা হয়, তারা সকলেই যে সত্যি বড় হয়ে বোকা হয়ে যায়, তা নয়। তবে কতকগুলি ছেলেমেয়ে যে বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিতে তদনুপাতে উৎকর্ষ লাভ করে না, সে কথাও সত্যি। এমনটি যে হয় তা আমরা সকলেই দেখি। স্কুলের সুনাম রাখার

জন্য ক্ষমতা থাকলে কখনো বা তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়েও দিই। কিন্তু কেন এমন হোল, কিভাবে এর প্রতিবিধান হতে পারে, সেকথা আমরা ভাবি না। এই ধরণের বোকামি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বয়স বাড়ার একটা নিকট সম্পর্ক আছে। ছেলেমেয়েদের এই ধরণের পরিবর্তনকে এক প্রকারের মানসিক রোগ বললে কিছুই ভুল বলা হয় না এই রোগ সাধারণত বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তির মুখেই ঘটে থাকে। শুধু এই-ই নয়, এই বয়সে তাদের মধ্যে আরো হরেক রকমের পরিবর্তন হওয়ার সময়। সেই পরিবর্তন দু'চার জনের মধ্যে ঠিক স্বাভাবিক নিয়মে না ঘটে ভিন্ন পথে চালিত হলেই যত গোলমালের সৃষ্টি হয়। এই সব গোলমাল বেত্রাঘাত, ঘরে বন্ধ করে রাখা, খেতে খেলতে না দেওয়া-জাতীয় শাস্তি দিয়ে শোধরাতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আরম্ভের একেবারে সূত্রপাতে সহানুভূতি-পরায়ণ অভিজ্ঞ শিক্ষক ও মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে এদের মনের মোড় ঘুরে দিয়ে ঠিক পথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেরূপ শিক্ষক বা মাতা-পিতার সংখ্যা খুবই অল্প। কাজেই ঐসব ছেলেমেয়েদেরও অল্পবয়সে দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। যতই তারা বেয়াড়া বেপরোয়া হয়ে ওঠে, ততই তাদের প্রতি নির্যাতনও বেড়ে ওঠে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণকে কাজে লাগালে অতি আশ্চর্য রকমের ফল পাওয়া যায়। মনঃসমীক্ষণ এই রোগের মূল কারণ অনুসন্ধান করে প্রক্ষুব্ধ মনে অভিভাবনের প্রলেপ দিয়ে মনের অস্বাভাবিক উত্তাপকে দূরে করে তাকে স্থায়ীভাবে শান্ত স্নিগ্ধ করে তোলে। এইভাবে তথাকথিত বোকা ছেলের পক্ষে বুদ্ধিমান হওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে, পৃথিবী সে বৃষ্টি নিজেকে বুকে সংগ্রহ করে নিজেকে ফলে ফুলে ভরিয়ে তুলে ধন্য হয়। আবার বর্ষণের ধারা অতিমাত্রায় হলে সেই বৃষ্টির জলই করে তাকে নিরাভরণা। সারা অঙ্গ তার ভরে ওঠে কালিমায়। প্রকৃতির সঙ্গে পৃথিবীর এই যে সম্পর্ক, প্রক্ষোভের (emotion) সঙ্গে মানুষেরও কতকটা সেই সম্পর্ক। যে প্রক্ষোভের গুণে কবিপ্রাণ আনন্দে উঠেছে ভরে, ভরিয়ে তুলেছেন তিনি বিশ্ব-মানবের মন তাঁর কথায়, ছন্দে সুরে: যে প্রক্ষোভ সাধারণকে করে তুলেছে অসাধারণ, বিশ্ববরেণ্য: সেই প্রক্ষোভ বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলেই আবার মানুষ পশুর পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে। উল্টো পথে চলে মানুষকে কুপথের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, নানা দুষ্কর্ম করিয়ে নিচ্ছে তাকে দিয়েই। মানব-মনে প্রক্ষোভের এই লুকোচুরির কারসাজি নানা দিক থেকে নানাভাবে রূপায়িত করেছে মানুষকে। মনঃসমীক্ষণ এই প্রক্ষোভের স্বরূপ চিনতে পেরেছে, শুধু তাই নয়, প্রক্ষোভ বিপথগামী হলে বহু ক্ষেত্রে তার মোড় ঘুরিয়ে পথনির্দেশ করাও আজ অসম্ভব নয়।

অথচ এমন দিন ছিল, যখন মনোবিদ্যায় প্রক্ষোভ নিয়ে আক্ষেপের শেষ ছিল না। জার্মান মনোবিদ টিশনার আর এক মনোবিদ ম্যাডিসন বেণ্টলির কাছে এক পত্রে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রক্ষোভ নিয়ে আমাদের বিড়ম্বনা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, অধুনা ভুল বলে প্রমাণিত জেমস-লাংগেএর প্রক্ষোভ সম্বন্ধীয় তত্ত্বকেই উল্টে পাল্টে নাড়াচাড়া করা ছাড়া আমাদের আর অন্য উপায় নেই। ভুল বলে যদি ওকে বাদ দেওয়া যায়, তাহলে মনোবিদ্যার কোন বই লিখতে হলে প্রক্ষোভের অধ্যায়ের শীর্ষে ঐ নামটি লেখা ছাড়া লেখবার মত আর কিছুই থাকে না। বই লেখকের পক্ষে এ এক বিড়ম্বনা বটে! মনের মধ্যে হাজার প্রক্ষোভ সঞ্চিত হতে থাকবে, অভিমানে বুক ভরিয়ে দিয়ে মনকে সারাক্ষণ যে ভার করে রাখবে, তার দেওয়া দুঃখ অষ্টপ্রহর সহ্য করবো অথচ কোনরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে যদি তাদের স্বরূপ প্রকাশ না করতে পারি, তাহলে আক্ষেপের বিষয় নয় কি? মনঃসমীক্ষণের কল্যাণে এ আক্ষেপ করার অবকাশ যে আজ আর নেই, সেকথা আগেই বলেছি।

আমাদের চিন্তাধারা, কথা-কাহিনী এবং কাজের সঙ্গে প্রক্ষোভ যেরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে, তার সম্যক পরিচয় দিয়ে এবং তার প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে মনঃসমীক্ষণ তাকে যেভাবে আমাদের সামনে এনে ধরে দিয়েছে, তার গুরুত্ব বিবেচনা করলে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এই প্রক্ষোভ সম্বন্ধীয় তত্ত্বকেই মনঃসমীক্ষণের সর্বাপেক্ষা বড় দান বলে মনে হয়। এছাড়াও বহু দিক থেকে বহু বিষয়ে মনোবিদ্যা মনঃসমীক্ষণের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অনুভূতির উভয়-বলতা (Ambi-valance of feelings), প্রক্ষোভের বিচিত্র ধরণের রূপান্তর, গূঢ়ৈষা (Complex) মানসিক দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের উপরে প্রভাব বিস্তার প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। শিশু-জীবনের প্রক্ষোভের ধরণ-ধারণ নির্বাচনে মনঃসমীক্ষণ কতদূর সাফল্যলাভ করেছে, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

অধিকাংশ লোকের মনে মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে একটা খুব ভুল ধারণা বরাবর স্থান পেয়ে আসছে। মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চুলচেরা ঐতিহাসিক বিচার বাদ দিলে 'ফ্রয়েড'ই যে মনঃসমীক্ষণের প্রবর্তক, সেকথা কেউ-ই অস্বীকার করবেন না। ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণের যে অংশটুক জনসাধারণকে সবচেয়ে বেশী রূঢ় আঘাত করেছে, সেটা হচ্ছে তাঁর 'থিওরি অব লিবিডো' (Theory of Libido)। আমরা একে 'লিবিডো তত্ত্ব' বলে অভিহিত করতে পারি। এরি মধ্যে আবার লিবিডো কথাটা নিয়েই যত গোলমালের সূত্রপাত। বাঙলা পরিভাষায় এই শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে 'কামশক্তি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমার মনে হয় বাঙলা ভাষার পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে এইখানেই আরম্ভ হয়েছে অনেক কিছু ভুল বোঝার পালা। গোলমাল শুধু বাঙলা ভাষায় নয়, অন্য ভাষাতেও এর কমতি নেই। ইংরাজীতে এর বদলি শব্দ হিসাবে Sex (কাম) শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ যখনই কাম বা কামশক্তি কথাটি শুনলো তখনি তার মনে একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হোল। তার ফলে সে এই তত্ত্বকে তথা এইরূপ মতের প্রবর্তককে অসামাজিক ও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে ধরে নিলে। এই প্রসঙ্গের সম্যক আলোচনা অবশ্য এখানে সম্ভব নয়; তবে মোটামুটি বলা যেতে পারে, এই থেকেই আস্তে আস্তে মানুষের মনে মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা দৃঢ় হতে চললো। তাই এখন 'ফ্রয়েড' লিখিত বই মানেই কাম সম্বন্ধীয় কিম্বা ঐ রকম একটা কিছু হবেই এ ধারণা সাধারণ লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এবং এই জন্যই ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও মনঃসমীক্ষণকে খুব কম লোকেই সুদৃষ্টিতে দেখে থাকেন। "লিবিডো তত্ত্বে"র মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানী যে সত্যি করে কি বলতে চাইলেন তা প্রথমে মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল লোক ছাড়া কেউ তলিয়ে বুঝতে চাইলেন না। বাইরের রুক্ষ আবরণ দেখেই চোখ বুজালো ভিতরের কল্যাণী মূর্তির সে সন্ধানই করলে না।

স্বপ্নাদিষ্ট কবি মংখক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী

সাধারণ পাঠকের নিকট মংখক কবি সুপরিচিত নহেন। মংখকের জন্মভূমি কাশ্মীর, কাশ্মীর শারদাপীঠ দেবী সরস্বতীর প্রিয় ক্ষেত্র। আচার্য অভিনব গুপ্ত, ধ্বনিকার আনন্দ বর্ধন, মম্মট ভট্ট, কল্হন, বিল্হন দামোদর গুপ্ত প্রভৃতি শত শত মনীষী যে দেশের অলংকার সেই দেশে কবিত্বের ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ সহজ নহে, কিন্তু মংখক সেই দুর্লভ প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন বিল্হন কবি গর্ব করিয়া বলিয়াছেন—

সহোদরাঃ কুঙ্কুমকেসরাণাং ভবন্তি নূনং
কবিতা বিলাসাঃ।
ন শারদাদেশমপাস্য দৃষ্টস্তেষাং যদন্যত্র
ময়া প্ররোহঃ॥

কবিতা তো কুঙ্কুমকেসরেরেই সহোদরা। শারদা দেবীর প্রিয় ক্ষেত্র কাশ্মীর ছাড়া আর কোথাও তাহাদের উৎপত্তি দেখিলাম না। মংখক প্রভৃতি শত শত কবি বিল্হনের এই গর্ব সার্থক করিয়াছেন। সেকালে কবিত্বের যে মানদণ্ড ছিল তাহার পরিমাপে মংখক মহাকবি, কিন্তু কবিত্ব ব্যতীতও তাঁহার কাব্যে এমন অনেক বস্তু আছে যাহা আধুনিকদের চিত্তে কৌতূহলের উদ্রেক না করিয়া পারে না। মংখকের কাব্যের এইরূপ বৈশিষ্ট্যের কিছু আভাস দিতেছি।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা জয়সিংহের রাজত্বকালে মংখক আমাদের আলোচ্য কাব্য 'শ্রীকণ্ঠচরিত' প্রণয়ন করেন, এই কাব্য ব্যতীত 'মংখককোশ' নামক তাঁহার রচিত একখানা কোশগ্রন্থও আছে। শ্রীকণ্ঠচরিতের টীকাকার জৈন মনীষী জোনরাজ। কলহন তাঁহার নিজের সময় পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস স্বকৃত রাজতরঙ্গিনীতে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন জোনরাজ দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিনীর প্রণেতা। এই রাজতরঙ্গিনীতে কলহনের পরবর্তীকাল হইতে গ্রন্থকারের নিজের সময়ের পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস আছে। জোনরাজ ঐতিহাসিক পণ্ডিত, সুতরাং টীকা মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যক্তি বিশেষের তিনি যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

মংখক স্বপ্নাদিষ্ট কবি। বহু দেশে বহু কবি অভীষ্ট দেবতার নিকট হইতে স্বপ্নে কাব্য রচনার নিমিত্ত প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। ভারতের রাজকবি শ্রীহর্ষ যখন কেবল কাব্যরসিক অন্তরের প্রেরণায় রত্নাবলী, নাগানন্দ প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়াছেন বাণভট্ট রাজা ও সর্সিক রাজপারিষদবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্য অচ্ছোদ সরোবরের তীরের নিভৃত নিবাসের স্বপ্নজাল অনুরূপ ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সেই সময়ে ইংলণ্ডের য়্যাংলো স্যাকসন মিল্টন 'সিডমন'—স্বপ্নাদেশে ঐশ মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বাঙলার অধিকাংশ মঙ্গল কাব্য রচয়িতা স্বপ্নে দেবতার নিকট হইতে কাব্য-রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। সেদিন পর্যন্ত মধুসূদন স্বপ্ন না দেখিয়াও তাঁহারও যে অন্ততঃ একটা স্বপ্ন দেখা উচিত ছিল গৌড়জনকে তাহা জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন; কুললক্ষ্মী স্বপ্নেই নাকি তাঁহাকে বাঙলা ভাষার রত্নভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ভাস কবির 'স্বপ্নবাসবদত্ত' আছে, ভীমট নামক কবি 'স্বপ্নদশানন' নামক নাটক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজশেখর সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। এই সকল নাটকের নায়ক নায়িকারা স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে কবিদের স্বপ্নের ছড়াছড়ি নাই। মংখক কিন্তু স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তবে এই স্বপ্নেরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে, তৃতীয় সর্গের ৬৯ শ্লোক হইতে এই স্বপ্নাদেশের একটি রমণীয় বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কোনও দেবতা আসিয়া মংখককে স্বপ্নে কোনও আদেশ করেন নাই। কবির পিতা মরদেহ পরিহার করিয়া শিবনগরী কৈলাসের নাগরিক হইয়াছেন, তিনি স্বপ্নে শিবরূপে আবির্ভূত হইয়া কবিকে আদেশ করিলেন এবং কবি তাহা স্পষ্ট শ্রবণ করিলেন। কবি সেই আদেশে সুধীবর্গের সমাদৃত ও নির্দোষ কাব্য রচনা করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন।

পিতুর্বিভ্রাণস্য স্মররিপুপুরৌ পৌরপদবীং
নিয়োগেন স্বপ্নে পদমুপগতেন শ্রবণয়োঃ।
প্রবন্ধং সন্ধায়েত্যধিকবিবুধশ্লাঘ্য নিরব-
দ্যমং মংখঃ সৌখ্যং কিমপি হৃদয়ে কন্দলয়তি॥

শ্রীকণ্ঠ চরিতের অন্তিম শ্লোকে কবি এই সংবাদ দিয়াছেন। কবি মঙ্গল কাব্যের কবিদের ন্যায় কেবল গ্রন্থের প্রারম্ভেই স্বপ্নাদেশ কীর্তন করিয়া গ্রন্থের মহিমা বাড়াইবার চেষ্টা করেন নাই, গ্রন্থের শেষেও সংবাদটি প্রদান করিয়া পাঠকদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। 'বিজয়বন্ধু মজুমদার প্রভৃতি মনীষী মনে করিতেন জয়দেব তাৎকালিক প্রাকৃতে গীত-গোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার কাব্যকে সর্বভারতীয় করিবার জন্য সংস্কৃতে তাহার তর্জমা করিয়াছেন যাহা হউক প্রাকৃত ভাষায় জয়দেবের কবিত্বের পরিচয় আমরা বেশী পাই নাই; তাঁহার "চল সখি কুঞ্জং" প্রভৃতি অনুস্বার বিসর্গযুক্ত বাঙলা সরস্বতীকেই আমরা বাঙলা সাহিত্যের শীর্ষে স্থান দিয়াছি, কাশ্মীর কবি মংখককেও অনুরূপভাবে মঙ্গল কাব্যের জনকরূপে অভ্যর্থিত করিতে পারা যায় কি না পণ্ডিতগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। শ্রীকণ্ঠচরিত ও দেবলীলা মহাদেবের ত্রিপুরদাহ তাহার বর্ণনীয় বিষয়। দেবতার মহিমা কীর্তনের সহিত মহাকাব্যের অনুকূল লক্ষণসমূহ তাহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে, মঙ্গল কাব্যের বহু লক্ষণ তাহাতে পাওয়া যাইবে। 'শ্রীকণ্ঠচরিত' না বলিয়া অনায়াসে মংখকের কাব্যকে 'শ্রীকণ্ঠ মঙ্গল' বলা চলিতে পারে, সুতরাং মঙ্গলকাব্যের জনক বলিয়া তিনি যে পূজার দাবী করিতে পারেন তাহা হঠাৎ অস্বীকার করা যায় না। আপত্তি হইতে পারে মংখক বাঙালী নহেন, কিন্তু জয়দেবকেও তো আমরা ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না, উড়িষ্যার শিশু পাঠ্য ইতিহাসেও জয়দেব যে উড়িয়া ছিলেন তাহা বেশ বড় হরপে ছাপা হইতেছে। বিশ্বম্ভরের রথ টানিয়া যাহারা হাত শক্ত করিয়াছেন তাহারা জয়দেবকে লইয়া বেশ টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে অহিংস থাকিতে হইলে আমাদের একটা আপোষ মীমাংসা করিতেই হইবে। হয়তো বলিতে হইবে জয়দেবের ভাষাটা বাঙলা কিন্তু রচিটা পুরাদস্তুর উড়িয়া, মংখককে লইয়াও এইরূপ একটা আপোষ মীমাংসা করিলে মন্দ হয় না। কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের গৌড়দেশীয় প্রণয়িনী ছিলেন, নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট ও তৎপুত্র কবি অভিনন্দন কাশ্মীরে বাস করিলেও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, শত্রু ও মিত্রভাবে কাশ্মীরের সহিত বাঙলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, প্রত্নবিদেরা চেষ্টা করিলে হয়তো মংখকের সহিতও গৌড়দেশের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন। চণ্ডিদাস একজন কি তিনজন, কৃষ্ণ কীর্তনের চণ্ডিদাস আসল কি নকল ইত্যাদির অভিনয় শতাধিক রজনীর উপর হইয়া গিয়াছে এই অভিনয়ে আসর আর জমে না, বয়সের আধিক্য বশতঃ বহু অভিনেতাও নূতন ভূমিকা গ্রহণে অক্ষম,—নূতনেরা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

মংখক কবির শ্রীকণ্ঠচরিত কাব্যের কতগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। দণ্ডী প্রভৃতি মহাকাব্যের যে লক্ষণ করিয়াছেন শ্রীকণ্ঠ চরিত পরিপূর্ণরূপে সেই সকল লক্ষণাক্রান্ত তবে ইহার নায়ক লৌকিক নহে, স্বয়ং দেবাদিদেব ইহার নায়ক। সৌষ্ঠবের জন্য কবি দোলক্রীড়া, বসন্ত, পুষ্পচয়ন জলক্রীড়া, সন্ধ্যা চন্দ্র, চন্দ্রোদয়, পানকেলি ক্রীড়া ও প্রভাত বর্ণনার জন্য এক একটি সর্গ ব্যয় করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনার মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে—যাহারা প্রকৃতই কাব্যরসপিপাসু তাহারা এই সকল সর্গে প্রচুর আনন্দ পাইবেন। কবি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চবিংশ সর্গে যথা-

ক্রমে সুজন ও দুর্জনের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি ও কাব্য বিষয়ে তাঁহার অভিমত, স্বদেশ ও স্ববংশ বর্ণনা এবং তাঁহার সমকালীন কবি ও মনীষীদিগের বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। মূল কাব্যের পক্ষে এই সকল অবান্তর, কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সকল অংশও কাব্য হিসাবে নিকৃষ্ট নহে। কালিদাস প্রভৃতি মহাকবি ছিলেন, তাঁহাদের রচনা আমরা আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী প্রভৃতি যেরূপ কাব্যরচনার সহিত নানা প্রবন্ধে কাব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানাইয়া গিয়াছেন তাঁহারাও যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে যে আমরা কত উপকৃত হইতাম তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যাঁহাদের নিকট আমরা কাব্যবিচার শিক্ষা করি তাঁহারা পাণ্ডিত্যে যত বড় কবিত্বে তত বড় নহেন। মংখক কবি ও কাব্যের বিচারক। মংখক কালিদাস নহেন, কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন কালিদাসের ন্যায় মহাকবিও তাহা করিলে যে কত উপকার হইত বলা যায় না। ভারবি ও মাঘ প্রসঙ্গক্রমে উৎকৃষ্ট রচনা কিরূপ লক্ষণবিশিষ্ট হওয়া উচিত তাহা বলিয়াছেন, কিন্তু মংখকের ন্যায় বিস্তৃতভাবে কেহই বলেন নাই। স্বদেশ, স্ববংশ ও সমকালীন পণ্ডিতদের মংখক যেরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন অন্যান্য কবিরা যদি তাহার আংশিক অনুষ্ঠানও করিতেন তবে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আরও বিস্তৃত, উজ্জ্বল ও নির্ভরযোগ্য হইত সন্দেহ নাই।

বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয় করেন নাই এমন কবি বোধহয় কোনও কালেই ছিল না। কাশ্মীরের ন্যায় পণ্ডিতবহুল স্থানে এই ভয় যে আরও কত বেশী ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। মংখক বড় দুঃখে বলিয়াছেন—

চামীকরস্য সৌরভসম্লানির্মালতীস্রজাম্।
শ্রোতুর্নির্মৎসরত্বংচ নির্মাণাগোচরং বিধেঃ॥
(২৫।১১)

অর্থাৎ বিধাতার সৃষ্টিতে সুবর্ণের সৌরভের মত ব্যবহারে মলিন হয় না এমন মালতীর মালা, এবং (পরের কবিতায়) মাৎসর্য পোষণ করেন না এমন শ্রোতা বা পাঠকও দুর্লভ। কিন্তু মংখক সমালোচনার ভয়ে ভীত নহেন, কালিদাসের ন্যায় তিনিও তাঁহার কবিতা-কাঞ্চন বিদ্বানের সমালোচনাগ্নিতে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে চাহেন। মূর্খের প্রশংসায় তিনি আস্থাবান নহেন, নিরপেক্ষ ও রসগ্রাহী মনীষীর অভিমতের জন্যই তাঁহার আগ্রহ (২৫।১২-১৩)। তাঁহার কথা—

নো শক্য এব পরিহৃত্য দৃঢ়াং পরীক্ষাং
জ্ঞাতুং মিতস্য মহতশ্চ কবের্বিশেষঃ।
কো নাম তীব্রপবনাগমমন্তরেণ—
ভেদেন বেত্তি শিখিদীপ মণিপ্রদীপৌ?
(২।৩৭)

কোনও কবির শক্তি অতিশয় পরিমিত কেহও বা মহতী শক্তির অধিকারী, প্রবল বায়ুর বেগ ব্যতীত যেমন অগ্নিশিখাযুক্ত সাধারণ প্রদীপের এবং স্বতঃ প্রভা উদ্গিরণকারী মণিময় দীপের পার্থক্য অন্য কেহ ধরাইয়া দিতে পারে না, কঠিন পরীক্ষা ব্যতীত সেইরূপ সাধারণ কবি ও মহাকবির পার্থক্যও কেহ ধরাইয়া দিতে পারে না।

বোধহয় আমাদের কবির সমাজে বিরুদ্ধ সমালোচক সংখ্যায় একটু বেশীই ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কিছু আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া কবি শান্ত হইতে পারেন নাই। তিনি খল সমালোচকদের রাহুর সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—'রাহু রাহুই আর কিছু নহে। সূর্যাশ্রয় (সূর্য-আশ্রয়) করিয়াও রাহু যেরূপ বিবুধ (দেবতা) হইতে পারে নাই, সূর্যাশ্রয় (সূরী বা পণ্ডিতদের আশ্রয়) করিয়া খলরূপ রাহুগণও তেমনি বিবুধ (পণ্ডিত) হইতে পারে নাই। (২।৩)

মংখকের সময়ে বোধ হয় কবিদিগের একটা বন্ধুগোষ্ঠীও থাকিত, পরস্পর-বন্ধুভাবাপন্ন বহু কবি ও পণ্ডিত লইয়া এই গোষ্ঠী রচিত হইত, গোষ্ঠীর কোনও লেখকের রচনার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলে গোষ্ঠীর অন্তর্গত অন্যান্য পণ্ডিতেরা লেখনী ধারণ করিতেন। কবি বলিয়াছেন, সচ্চক্র (সৎ-চক্র, সুদর্শন অথবা সাধুদিগের চক্র বা গোষ্ঠী) অত্যন্ত (বুদ্ধির) তীক্ষ্ণতা লইয়া বর্তমান না থাকিলে দুর্জন রাহু কর্তৃক অপহৃত কাব্যামৃত কখনও 'সুমনোজনে'র (মনস্বী অথবা দেবতাদের) প্রাপ্য হইত না (২।২)। প্রাচীন অলঙ্কারিকগণ নৈসর্গিক প্রতিভা, বহুশাস্ত্র পাণ্ডিত্য এবং প্রবল চেষ্টা বা অভ্যাসই কাব্য-নির্মাণের কারণ বলিয়াছেন (দণ্ডী কাব্যাদর্শ ১।১০৩)। বামন প্রতিভাকে কবিত্বের বীজ বলিয়াছেন, রুদ্রট (১।১৬) প্রতিভা দুই প্রকার স্বীকার করিয়াছেন সহজা ও উৎপাদ্যা। আধুনিকগণ প্রতিভা বলিতে যাহা বুঝেন, রত্নেশ্বরকৃত সরস্বতী কণ্ঠাভরণের টীকায় একটি উদ্ধৃতি ভিন্ন অন্য কোথাও তাহার সেরূপ ব্যাখ্যা দেখি নাই। উদ্ধৃতিটি এই—

রসানুগুণ শব্দার্থ-চিন্তাস্তিমিত চেতসঃ।
ক্ষণ বিশেষ স্পর্শোত্থা প্রজ্ঞৈব প্রতিভা কবেঃ॥
সাহি চক্ষুর্ভগবতস্তৃতীয়মিতি গীয়তে॥

অর্থাৎ রসসৃষ্টির অনুকূল শব্দ ও অর্থের চিন্তায় চিত্ত যখন আর্দ্র থাকে, তখন একটি বিশিষ্ট ক্ষণের একটি বিশিষ্ট স্পর্শে একটি অপূর্ব জ্ঞানের উদয় হয়—এই অপূর্ব জ্ঞানালোকই প্রতিভা—ইহা ভগবানের তৃতীয় নেত্র। বোধ হয় ইহাই প্রাচীনদের নৈসর্গিকী প্রতিভা। পণ্ডিতেরা কিন্তু এই প্রতিভাকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দিলেও ইহাকে পাণ্ডিত্য ও অভ্যাসের সহিত একাসনে বসাইয়া দিয়াছেন।

মাত্র তাহাই নহে—দণ্ডী এমন কথাও বলিয়াছেন যে, প্রতিভা না থাকিলেও কেবল পাণ্ডিত্য ও চেষ্টার বলে ঘসিয়া-মাজিয়া কবি হওয়া যায় (কাব্যাদর্শ—১।১০৪)। মংখক পাণ্ডিত্য ও চেষ্টার মূল্য অস্বীকার না করিলেও ঘসিয়া-মাজিয়া যে কবি হওয়া যায়, তাহা স্বীকার করেন নাই। মংখক বলেন—কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য জননী সরস্বতীর দুইটি স্তন, যে সন্তান দুইটি স্তন হইতেই প্রচুর দুগ্ধ পান করে নাই, তাহার কবিত্বের সর্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব কিরূপে সম্ভব হইবে (২।২৭)? বামন—বিশিষ্ট পদ-রচনাকে রীতি এবং রীতিই কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন। মংখক বলেন—যাহাদের রসবহুল অর্থরত্ন নাই, সুবর্ণসমূহের (স্বর্ণ এবং সুন্দর বর্ণ) সম্পদ যাহাদের নাই, তাহারা কেবল রীতি দ্বারা (বাক্যের রীতি এবং পিতল) কিরূপে কবিদিগের ঈশ্বর হইতে পারেন (২।৬)? কবি মুরারি মিশ্র একস্থানে অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি "গুরুকুলবাসক্লিষ্টঃ" অর্থাৎ বহুদিন গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যার্জন করিয়াছেন, সুতরাং বড় কবি হওয়া তাহাকেই সাজে। মংখক মুরারির ন্যায় প্রাচীন কবির সম্বন্ধে কোনও দুরুক্তি না করিয়া মাত্র বলিয়াছেন—গুরুগৃহে বহুদিন বাস ও বহু বিদ্যার্জন করিয়াও যাহা সম্ভব হইতে না-ও পারে, কাহারও কাহারও কেবল কবিত্ব-শক্তির প্রভাবেই কাব্য-রচনার সেই মহারহস্য আয়ত্ত হইতে পারে (২।৪)। কুন্তক প্রভৃতির মতে বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণস্বরূপ। মংখক বলেন, ঔদার্য প্রভৃতি গুণের অভাবে বাক্য যদি রসহীন হয়, তাহা হইলে সারমেয়ের বক্র পুচ্ছাগ্রের ন্যায় মাত্র বক্রতাযুক্ত উক্তিও সাধুদিগের অস্পৃশ্য হয় (২।১৪)। সম্পূর্ণ নির্দোষ কাব্য প্রায় অসম্ভব—মংখক তাই বলেন—ধৌত ধবলবস্ত্রেই তো কজ্জল-বিন্দু পতিত হইলে লক্ষ্য হয়, মলিন বস্ত্রে তাহা লক্ষ্যই হয় না। কাব্যে যে দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে মাত্র তাহার প্রভূত গুণ আছে বলিয়া (২।৯)। নির্দোষ শব্দার্থ লইয়াই কাব্য—সম্মাট এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং এ কটাক্ষের তিনিই লক্ষ্য। মংখক রসবাদী। তাঁহার মতে কাব্য-রচনা বড় কঠিন, অর্থ থাকে তো পদশুদ্ধি থাকে না, আবার পদশুদ্ধি থাকে তো রীতি দুষ্ট, রীতিও যদি ভাল হয়তো বক্রোক্তি নাই, আবার হয়তো সকলই আছে—এক রস ব্যতীত সকলই ব্যর্থ। কাব্যের অর্থাদি সম্পদ যিনি রক্ষা করিতে পারেন, তাহার রসসম্পদও আবির্ভূত হয়, যে সূর্য কিরণ দ্বারা জগৎ সন্তপ্ত করেন, তিনিই আবার বারিবর্ষণে পৃথিবী প্লাবিত করেন (২।৩০—৩১)। কবি বলেন যে, পূর্ব পূর্ব কবিগণ কবিতারূপ ইক্ষুযষ্ঠি নিষ্পেষণ করিয়া রসটুকুই নিতেন আধুনিক কবিরা অনুপ্রাস যমকাদি রূপ তাঁহারা খোসা চর্বণ করিতেছেন। কেহ কেহ নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অভাবে চুপ

করিয়া থাকেন, সময় পাইলে একটু ছোটখাট রসিকতা করিয়া কবিত্ব খ্যাতি অর্জন করিতে চাহেন, ইঁহারা যেন বর্ম ও অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া কাঠের তলোয়ারেই যুদ্ধ-জয় করিতে চাহেন। দিন-রাত্রি পরকৃত উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠ করিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটা চতুষ্পদী রচনা করেন, এমন কবি অনেক আছেন; কিন্তু সমুদ্রের লহরীমালার ন্যায় যাহাদের কবিতা অনর্গল ও স্বতঃ-প্রবাহিত এমন কবি দুর্লভ ২।৪২,৪৮,৫১)। খল সমালোচকেরা অসহ্য হইলেও একস্থানে কবি তাহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে খলেরা কুকুরের মত, কুকুর আছে বলিয়াই যেমন ধনীদের গৃহ হইতে চোর রত্নগুলি অপহরণ করিতে পারে না, ইহারা চীৎকারে গৃহস্থকে জাগাইয়া দেয়; খল সমালোচক আছে বলিয়া এক কবির সুন্দর উক্তিগুলি কবিত্বাভিলাষী আর কেহ চুর করিতে পারে না (২।২২)। কাব্যের উৎকৃষ্ট অপকর্ষ সম্বন্ধে মংখকের মত বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে উৎসাহী পাঠক মূলগ্রন্থ দেখিতে পারেন।

শ্রীকণ্ঠ চরিতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আত্ম-পরিচয়ের সহিত সমসাময়িক মনীষীদিগের পরিচয় প্রদান। কবি কাব্য-রচনা করিয়াছেন, কিন্তু "আ-পরিতোষাদ বিদুষাং" তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বিদ্বৎ-পরিষদ খুঁজিবার জন্য তাঁহার বেশী দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। কবির পিতা ছিলেন ভক্তিমান পণ্ডিত, কবিরা চার সহোদর, জ্যেষ্ঠ শৃঙ্গার কাশ্মীরপতি সুসসলের প্রধান ধর্মাধিকারী, প্রয়োজন হইলে তিনি যে সেনাধ্যক্ষের কাজ করিতেন, সে পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ভ্রাতা ভৃঙ্গ,—ইনি মহাপণ্ডিত এবং বোধ হয় সংসারে আসক্তিহীন ছিলেন, ভৃঙ্গ ছিলেন বৌদ্ধ সাধক, কিন্তু সেজন্য তিনি অন্য ভ্রাতাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হারান নাই। ভৃঙ্গ বৌদ্ধ হইলেও বৈভাষিকদের ক্ষণভঙ্গবাদে বিশ্বাস করিতেন না, কবি ইহা বলিয়াছেন, সম্ভবত তিনি সৌত্রান্তিক শ্রেণীর বৌদ্ধ ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা অলংকার বা লংকক মহাপণ্ডিত। সূত্রকার পানিনি, বার্তিককার কাত্যায়ন ও ভাষ্যকার পতঞ্জলির গ্রন্থ লইয়া পানিনির ব্যাকরণ বলিয়া ইহার একটি নাম ত্রিমুনি ব্যাকরণ। অলংকার ব্যাকরণ শাস্ত্রে এমন বহু নূতন উদ্ভাবন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে চতুর্থ মুনি বলা হইত। এই অলংকার পণ্ডিতকে মহারাজ সুসসল সান্ধিবিগ্রহিকের পদে নিয়োগ করিয়া-ছিলেন, ইহা ব্যতীত কাশ্মীরমণ্ডলের বাহিরে অবস্থিত কাশ্মীরের অধিকৃত প্রদেশসমূহের তিনি শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার একটি স্বতন্ত্র রাজসভাও ছিল। এই সভায় বহু পণ্ডিত সর্বদা উপস্থিত থাকিতেন। ইঁহারা এক একজন বৃহস্পতিকল্প এবং নানাবিধ রাজকার্যের অধিকার ইঁহাদের উপর ন্যস্ত। মংখক স্বীয় গ্রন্থ লইয়া এই সভায় চলিলেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রভাকরমতের মীমাংসক শ্রীগর্ভ এবং তাঁহার দুই পুত্র মণ্ডন ও শ্রীকণ্ঠ; বাস্তু-শাস্ত্রে পরম অভিজ্ঞ দেবধর এবং সাহিত্য-বিদ্যার পরমাচার্য নাগধর, কুমারিলভট্টসদৃশ মীমাংসক ত্রৈলোক্য ও পণ্ডিতপ্রবর দামোদর, কবির স্বকীয় শিষ্য ষষ্ঠ পণ্ডিত এবং মীমাংসক জিন্দুক, রাজপুরী নামক স্থানের সান্ধিবিগ্রহিক অভিজ্ঞ সাহিত্যিক জল্হন ও গোবিন্দ পণ্ডিত, সাহিত্যাচার্য সান্ধিবিগ্রহিক অলকদত্তের যোগ্য শিষ্য কল্যাণ এবং মহাপণ্ডিত ভূড্ড ও তাঁহার সতীর্থ শ্রীবৎস, তর্কশাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আনন্দ, সুকবি পদ্মরাজ, বৈদান্তিক শ্রীগুণ্ন এবং অশেষ শাস্ত্রবিদ্ যাজ্ঞিক লক্ষ্মীদেব, বৈয়াকরণ জনক-রাজ, সাহিত্যিক প্রকট এবং মহাকবি শম্ভুর পুত্র অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যবর আনন্দবর্ধন এবং তাঁহার ভ্রাতা সুহল। ইঁহারা ব্যতীত সেস্থানে ছিলেন—বহু ছাত্রের অধ্যাপক নানা শাস্ত্রজ্ঞ জোগরাজ, কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দের দূত মহাশাব্দিক সুহল এবং কোঙ্কনরাজ অপরাদিত্যের দূত তেজকণ্ঠ। এই পণ্ডিত-সভায় মংখক স্বরচিত শ্রীকণ্ঠচরিত অর্পণ করিলেন ও তাহা সাদরে গৃহীত হইল। মংখক স্বয়ং সুসসলদেবের পুত্র তৎকালীন কাশ্মীর-রাজের অধীনে একজন পদস্থ রাজপুরুষ ছিলেন, পণ্ডিতেরা সকলেই তাহার বন্ধুবর্গের মধ্যে তথাপি বিনা বিচারে তাঁহার গ্রন্থ গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

পণ্ডিতবহুল রাজসভার একটি সুন্দর ছবি আমরা মংখকের প্রসাদে পাইয়াছি। কবি মংখক স্বরচিত কাব্য লইয়া ভ্রাতার সভায় গিয়াছেন—বয়োজ্যেষ্ঠদের বন্দনা করিয়া ও কনিষ্ঠদের বন্দনা লাভ করিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দের দূত সুহল মংখকের বন্ধু ও সুপণ্ডিত, মংখককে দেখিয়াই তাঁহার কণ্ঠকণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল, তিনি পূরণের জন্য এক সমস্যা উপস্থিত করিলেন—

> "এতদ্ বভ্রুকচামুকারিকিরণং
> রাজদ্রুহোঽহ্নঃশির-
> শ্ছেদাভং বিয়তঃ প্রতীচি
> নিপতত্যব্ধৌ রবের্মণ্ডলম্।"

দিবস রাজদ্রোহ করিয়াছে, এইদেশ কেশসদৃশ লোহিত কিরণে আচ্ছন্ন তাহার সূর্যমণ্ডলরূপ মস্তক ছিন্ন হইয়া আকাশ হইতে যেন পশ্চিম সমুদ্রে পড়িতেছে।

মংখক সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা পূরণ করিলেন—

> "এষাপি দূরমা প্রিয়ানুগমনং
> প্রোদ্দামকাষ্ঠোত্থিতে
> সন্ধ্যাগ্নৌ বিরচর্য্য
> তারকমিষাজ্জাতাস্থিশেষস্থিতিঃ॥"

দেখ চারিদিকে ধূসরলোহিত সন্ধ্যারূপ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, পতিব্রতা আকাশলক্ষ্মীই যেন এই চিতা জ্বালিয়া তাহাতে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন, এই তারকাগুলি তাহার দগ্ধাবশিষ্ট দেহের অস্থিসমূহ। উক্তিপ্রত্যুক্তরের মধ্য দিয়া যেন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় উজ্জ্বল, বৈদগ্ধীর উল্লাসে সমৃদ্ধ একটা জীবন্ত চটুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবি মংখকের পূর্বে বিল্হন প্রভৃতি রাজস্তুতিমূলক বিক্রমাঙ্কদেব চরিত ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন—তাহার সময়েও রাজ-স্তুতিকারীর অভাব ছিল না। কবি বার বার গর্ব করিয়া বলিয়াছেন যে রাজস্তুতির দ্বারা তিনি আত্মাবমাননা করেন নাই, তাঁহার স্তুতির বিষয় দেবাদিদেব মহাদেব। "নরেণ স্তূয়তে নর" (২৫।৬)—মানুষ মানুষের স্তুতি করে ইহা তাহার অসহ্য। অনেকে (বনেরা) পর্বতের পাদ-দেশে মণিরত্ন আনিয়া বিক্রয় করিতে বসে—কিন্তু সেস্থানে যাহারা থাকে তাহারা তাহার মূল্য বুঝিবে কি। সেইরূপ রাজার পাদদেশে সূক্তিরত্নাহরণও মূল্যহীন সেস্থানে যাহারা থাকে তাহারা তাহার মূল্য বুঝে না। নানা ভঙ্গীতে নানা কথায় কবি মনুষ্য কর্তৃক মনুষ্য স্তুতির অসারতা কীর্তন করিয়াছেন।

কবি মংখকের বর্ণিত সভা ভারতের দুর্দিনের পূর্বাহ্ণের একটি অপরূপ চিত্র। তখন দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, ভারত তখনও মুসলমান রাজশক্তির অধীন হয় নাই। হিন্দুরাজ্যে হিন্দু-সংস্কৃতির চর্চা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিয়াছে। রাজসভায় মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি হইতে স্বয়ং রাজা অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্পদে সমৃদ্ধ ও বিদ্যোৎসাহী, পণ্ডিতেরা রাজদূত প্রভৃতি উচ্চ-পদে নিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থান করেন, শাস্ত্রের সহিত শাস্ত্র, ধর্মনীতির সহিত রাজনীতি ও অর্থনীতির সমভাবে চর্চা হইতেছে। তখনও দেশে শাস্ত্রচর্চায় শৈথিল্য আসে নাই, আনন্দে জড়তা প্রবেশ করে নাই। এই সময়ের শারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশনে দেখিতে পাই—স্থানে স্থানে অভিনয়ের জন্য যথারীতি প্রেক্ষাগৃহ ছিল এবং শারদাতনয় ও তাহার গুরু দিবাকরের ন্যায় মহাপণ্ডিত তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার পরেই মুসলমানের আগমন—প্রলয়ের এক উচ্ছ্বাসে যেন এই দৃশ্য ভাসিয়া গেল। তখন হিন্দু সংস্কৃতি ভয়ে ভয়ে কোন-রকমে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে মাত্র। মুসলমান রাজত্ব গিয়াছে, ইংরাজও গিয়াছে—আছি আমরা সেই প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধি-কারী, আমরা কি করিতে পারি—তাহা দেখিবার জন্য বর্তমান জগৎ এবং ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের বংশধরেরা প্রতীক্ষা করিতেছে।

খেলাধূলা

টবল

অন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ স্মৃতি ফুটবল কাপ [প্রতি]যোগিতার খেলায় বাঙলা দল বিজয়ীর সম্মান [লাভ] করিয়াছে। বাঙলা দলের এই সাফল্য আনন্দ[জন]ক সন্দেহ নাই, তবে বাঙলা দল একরূপ ভাগ্য বলেই কাপ বিজয়ী হইয়াছে বলিলে [অন্যা]য় করা হইবে না। প্রতিযোগিতার সূচনায় [বাঙ]লা দল যেরূপ শক্তিশালী ছিল ফাইনাল খেলার [সম]য় সেরূপ ছিল না। বাঙলা দলের কয়েকজন [শ্রে]ষ্ঠ খেলোয়াড় হঠাৎ শেষ সময় খেলায় অংশ [গ্রহণ] করেন না। তাঁহারা অসুস্থ বলিয়াই নাকি [খেল]তে পারেন নাই। কিন্তু যাঁহারা ফাইনালের [দ]িনে মাঠে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বিনা [দ্বিধা]য় বলিতে পারেন যে ঐ সকল খেলোয়াড়কে [সুস্থ] ও অক্ষত দেহে মাঠে দর্শকগণের মধ্যে [বসি]য়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে সাধারণতই [সন্দে]হ জাগে যে খেলায় অংশ না গ্রহণের পশ্চাতে [কোন] বিশেষ কারণ আছে। পূর্বে হয়তো ঐ কারণ [আই] এফ এর পরিচালকমণ্ডলী প্রকাশ করিলে [খেলা]র শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইতে [পারি]ত না। বর্তমানে খেলা শেষ হইয়াছে। [এখ]ন আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলী অনায়াসে [সে]ন কিছু প্রকাশ করিতে পারেন। বিশেষ করিয়া [ইতিম]ধ্যেই অনেক প্রকার আলাপ আলোচনা করিতে [শুরু] করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন [খে]লোয়াড়গণ নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষপাতদুষ্ট [মনো]ভাবের প্রতিবাদেই খেলায় যোগদান করেন [নাই]।" আবার কেহ কেহ বলিতেছেন "দায়ী [স্থা]য়ী খেলোয়াড়গণকে দলভুক্ত না করায় [খে]লোয়াড়গণ অসুস্থতার অজুহাতে খেলায় [যোগ]দান করেন নাই।" এই সকল আলাপ [আলো]চনার কোন ভিত্তি আছে বলিয়া আমরা [বিশ্বা]স করি না। কেন এই সকল কথা উঠিল [তা]হাই এখনও পর্যন্ত আমরা স্থির করিতে পারি [না]। আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর উচিত [প্রকৃ]ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেওয়া।

বাঙলা দলের কৃতিত্ব

বাঙলা দল এইবার লইয়া তিনবার উক্ত কাপ [বিজ]য়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। ১৯৪১ সালে [প্র]থম যখন এই প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হয় তখন [বাঙ]লা দল ফাইনালে দিল্লী দলকে পরাজিত করিয়া [কা]প বিজয়ী হয়। ইহার পরে ১৯৪২ ও ১৯৪৩ [সা]লে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় না। ১৯৪৪ [সা]লে দিল্লীতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইলে [বাঙ]লা দল ফাইনাল পর্যন্ত উঠিতে সক্ষম হয়। [কি]ন্তু ফাইনালে দিল্লী দলের নিকট পরাজয় বরণ [করে]। ১৯৪৫ সালে পুনরায় বাঙলা দল ফাইনালে [বো]ম্বাই দলকে পরাজিত করিয়া অর্জিত গৌরবের [পু]নরাবৃত্তি করে। ১৯৪৬ সালে বাঙ্গালোরে [প্রতি]যোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাঙলা দল [ফা]ইনালে উঠিয়া মহীশূর দলের নিকট পরাজিত [হয়]। ১৯৪৭ সালে বাঙলা দল গত বৎসরের [পরা]জয়ের কালিমা দূরীকরণে সক্ষম হইল। প্রতি[যোগ]িতা মোট পাঁচবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং [প্রত্যে]কবারই বাঙলা দল ফাইনালে উঠিয়াছে ও [তিন]বার বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। বাঙলা [দলে]র সাফল্য কৃতিত্বপূর্ণ একথা বলাই বাহুল্য।

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা যেদিন [শেষ] হয় ঠিক সেইদিন আই এফ এর পরিচালক[মণ্ড]লী বাঙলা ও বোম্বাই দলের খেলোয়াড়গণকে [...]নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করেন। এই ভোজ সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ মৈনুল হক ঘোষণা করেন যে, আগামী বৎসরে লণ্ডনের বিশ্বঅলিম্পিক অনুষ্ঠানে বাঙলা ফুটবল দল প্রেরণের ব্যবস্থা একরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ফেডারেশনের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী বিভিন্ন প্রদেশের খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের খেলা দেখিয়া ২৫ জনকে লইয়া সাময়িকভাবে একটি দল গঠন করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। উক্ত মনোনীত ২৫ জন খেলোয়াড়কে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা হইবে ও প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিতে হইবে। ঐ সকল প্রদর্শনী খেলা শেষ হইলে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বোম্বাইতে শেষ ট্রায়াল খেলা হইবে ও চূড়ান্তভাবে ভারতীয় দল গঠন করা হইবে। নির্বাচিত খেলোয়াড়গণকে এক মাস নিয়মিত শিক্ষাধীনে রাখা হইবে। বিশ্বঅলিম্পিক অনুষ্ঠানের কিছুদিন পূর্বে খেলোয়াড়গণকে হয়তো বা জাহাজে অথবা বিমানযোগে লণ্ডন অভিমুখে প্রেরণ করা হইবে। তাহার মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় যতগুলি দল যোগদান করে বাঙলা দলই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সুতরাং বাঙলার অধিকাংশ খেলোয়াড়দের লইয়াই ভারতীয় দল গঠিত হইবে ইহাই সকলে চিন্তা করিতেছেন। ফলতঃ ইহা হয় নাই। ২৫ জনের মধ্যে বাঙলা হইতে মাত্র ৮ জন খেলোয়াড়কে লওয়া হইবে। ঐ ৮ জন খেলোয়াড়ের নাম এখনও প্রকাশিত করা হয় নাই, তবে আমাদের যতদূর ধারণা নিম্ন-লিখিত ৮ জনই খেলোয়াড় মনোনীত হইবেন:—

মহাবীর (মোহনবাগান), টি আও (মোহন-বাগান), এস মান্না (মোহনবাগান), সুনীল ঘোষ (ইস্টবেঙ্গল), পি চন্দ (ইস্টবেঙ্গল), মেওয়ালাল (বি এ রেলওয়ে), এস নন্দী (বি এ রেলওয়ে) ও আর দাস (ভবানীপুর)।

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। মানকড় বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম খেলায় পরাজিত না হওয়ায় অনেকেই এখন হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন "ভারতীয় দলকে যতখানি শক্তিহীন বলা হইয়াছিল ততটা নহে। খেলার ফলাফল খুব শোচনীয় হইবে না।" কিন্তু আমরা এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি না। কারণ জানি কিরূপ অবস্থার মধ্যে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। প্রাকৃতিক আবহাওয়া খারাপ থাকায় খেলা পুরা তিনদিন হইতে পারে নাই। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে সিক্ত মাঠে কোন দলই ভাল খেলিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া ভারতীয় দল সর্বপ্রথম যে দলের সহিত খেলিয়াছে তাহাকে মোটেই অস্ট্রেলিয়ার দল বলা চলে না। ঐ দলে অস্ট্রেলিয়ার একটিও টেস্ট খেলোয়াড় নাই। পরবর্তী খেলায় ডন ব্রাডম্যানের ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলিবার কথা আছে। ঐ খেলায় ভারতীয় দল যদি প্রকৃতই শক্তিশালী হইয়া থাকে তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ব্যায়াম

পুনাইচকবাগ ত্রিপোলী এ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিহার প্রাদেশিক শারীরিক শিক্ষা সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিহার সরকারের বহু মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। বিশেষ আমন্ত্রণে যুক্তপ্রদেশ ও বাঙলা প্রদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট পরিচালক এই সম্মেলনে [যোগ]দান করেন ও বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তিন দিন ধরিয়া এই সম্মেলনের কর্মসূচী পরিচালিত হয়। স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন ক্লাবের শত শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। বিহারের সকল জেলার প্রতিনিধিই এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সকলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া মনে হইল বিহারে শীঘ্রই ব্যাপকভাবে শারীরিক শিক্ষা ছড়াইয়া পড়িবে। বিহারের প্রাদেশিক সরকারও এই উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। এই সম্মেলনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তবে সম্মেলনের সকলেই একমত যে, ব্যাপক শারীরিক শিক্ষা প্রবর্তন ব্যতীত জাতি কর্মঠ ও শক্তিশালী হইতে পারে না। বিহারের একটি ক্ষুদ্র ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের আপ্রাণ চেষ্টার ফলেই এই সম্মেলন সম্ভব হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান বিহারের কতখানি উপকার করিয়াছে পরে সকলেই অনুভব করিবে এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। বাঙলা দেশেও শীঘ্রই কলিকাতা মহানগরীতে এইরূপ শারীরিক শিক্ষা সম্মেলন হইবে। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ। সম্মেলন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে। ইহারা বিরাট আয়োজন করিতেছেন। বাঙলা সরকার অথবা বাঙলায় কোন বিত্তশালী ব্যক্তিই এখনও পর্যন্ত ইহাদের সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হন নাই ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। দেশ যতদিন পরাধীন ছিল কেহই কিছু বলিতে পারিত না। কিন্তু স্বাধীন দেশের মানুষ শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যদি এখনও অনুভব না করে তবে কবে করিবে? শক্তিহীন, অকর্মণ্য জাতি কখনও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না—ইহা সকল সময়েই সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে। শারীরিক শিক্ষাই একমাত্র সহজ ও সরল পথ যাহার দ্বারা একটি জাতি দ্রুত উন্নতির পথে চালিত হইতে পারে।

চিত্রশিল্প প্রতিযোগিতা

ঢাকেশ্বরী মিলের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আগামী নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহে একটি প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী হইবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বমূলক চিত্র প্রদর্শনীতে বিশেষ স্থান লাভ করিবে। উক্ত বিষয়ের চিত্রাদির জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। সাহায্য করিতে ইচ্ছুক শিল্পী ও প্রতিষ্ঠান-পরিচালক নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলে আমাদের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন। অনিল চৌধুরী, পরিচালক, প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী, ২নং ঢাকেশ্বরী মিলস্, পোঃ লক্ষ্মীনারায়ণ মিলস্, ঢাকা।

এপার ওপার

মার্শাল পেত্যার সংবাদ

ফরাসী উপকূল থেকে কিছুদূরে বিস্কে উপসাগরে ছোট একটি দ্বীপ, আইল দ্য ইউ, দৈর্ঘ্যে ছয় মাইল, প্রস্থে আড়াই মাইল। ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসে 'অ্যাডমিরাল মুসেংস' নামক জাহাজে করে' ফ্রান্সের একদা বীরশ্রেষ্ঠ মার্শাল পে'ত্যাকে এই দ্বীপে বহন করে আনা হয়। ৯০ বৎসর বয়স্ক ভূতপূর্ব সেনাপতিকে অবশিষ্ট জীবন এই দ্বীপে কাটাতে হ'বে; তিনি যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। বৃদ্ধত্ব তাঁকে বুলেটের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

যদিও অত ছোট দ্বীপে তিনি বাস করছেন কিন্তু সমুদ্র দেখেছেন সেই প্রথম দিন যেদিন প্রবেশ করলেন দ্বীপের একটি পুরাতন কেল্লায়।

প্রতিদিন সকালে কেল্লা মধ্যস্থ প্রাঙ্গণে তাঁকে আধ ঘণ্টা বেড়াতে দেওয়া হয়। এই ভ্রমণের সময় একটি বেরালের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। বেরালটি যেন ঈশ্বর প্রেরিত, কারণ ইঁদুরের উৎপাত তথা অনিদ্রার হাত থেকে বেরালটি তাকে বাঁচিয়েছে। কেল্লার প্রহরীরা যা খায় তাই থেকেই তাঁকে খেতে দেওয়া হয়; তবে প্রধানত আলু। দুধ, ফল অথবা মিষ্টান্ন কিছুই তাঁকে দেওয়া হয় না। লৌহ নির্মিত শয্যাধারে স্বহস্তেই শয্যারচনা করতে হয়। আরাম কেদারা তাঁকে দেওয়া হয়নি, দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে' দেওয়া হয়, জানালা মোটা গরাদ-শোভিত। সপ্তাহে দু'খানি পত্র লেখবার ও পাবার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছে। খবরের কাগজ দেওয়া হয় একখানি যার নাম লা ম'দে। সময় কাটাবার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করছেন। মার্কিন সাময়িক পত্র তাঁর পড়তে ইচ্ছে হলেও দেওয়া হয় না। তাঁর বয়স যদিও ৯০ বৎসর পার হয়েছে, ডাক্তাররা বলেন যে, তাঁর শরীর এখন ৬০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির সমতুল্য, বয়সানুযায়ী অথর্ব নাকি হননি।

ফুটপাত-কবি লিলিয়ান ব্রাউন, "আমি একটি বেহালা" লিখে যশস্বিনী হন

বৃদ্ধ মার্শালের সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধা পত্নীও নির্বাসন দণ্ড মেনে নিয়েছেন, তবে স্বামীর সঙ্গে তাঁকে একত্রে থাকতে দেওয়া হয় না। মাদাম পে'ত্যা থাকেন দ্বীপের গ্রামের সরাই-খানার একটি ঘরে। অতি কষ্টেই তাঁকে বাস করতে হয়, বিশেষ করে' শীতের সময়। তখন ঘর গরম করা যায় না, দুরন্ত ঠাণ্ডা হাওয়াকে রোধ করবার মতো ক্ষমতা কাঠের দেওয়াল ও দরজা জানালাগুলির নেই। জলেরও কষ্ট আছে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হয়, অবশ্য সতর্ক প্রহরীর সম্মুখে। পে'ত্যাকে পাহারা দেবার জন্য একজন দলপতির অধীনে ৬৬ জন প্রহরী আছে। মার্শাল পে'ত্যার পত্নী ছাড়া আরও একজন আছেন, তিনি হলেন গ্রামের পাদ্রী; নিয়মিত বাইবেল শুনিয়ে যান।

ভার্দুনের বীরের একমাত্র আক্ষেপ এই যে, তাঁর সামরিক মর্যাদা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তবে তিনি আশা করেন, মৃত্যুর পর একজন মার্শালের প্রাপ্য সামরিক প্রথা অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টী থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন না।

ফুটপাতে কবি

কলকাতা শহরে ফুটপাতে ভবিষ্যৎ বক্তা জ্যোতিষী, গোলদীঘির রেলিংএর গায়ে শিল্পীর আঁকা ছবি, কোনো কোনো স্থানে গায়কের দেখা পেলেও কবি-বহুল শহরে কবিতা বিক্রয়রত

[illegible] [illegible], ফুটপাত-কবিদের প্রতিষ্ঠাতা

কবির দর্শন এখনও পাওয়া যায়নি। তবে কবিতার বইএর অনেক অবিক্রীত সংখ্যা অবশ্য কিনতে পাওয়া যায়।

নিউইয়র্ক শহরে ফ্রান্সিস ম্যাকক্রুডেন নামে জনৈক কবি রেলিংএর গায়ে ঝুলিয়ে প্রথম কবিতা বিক্রয় করতে শুরু করেন; তারপর তিনি তিরিশখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত করেছেন কিন্তু রাস্তার ধারে কবিতা বিক্রয়ের অভ্যাস আজও ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর দেখাদেখি আরও অনেকেই তাঁর মতো কবিতা বিক্রয় করতে শুরু করেছেন।

একজন মহিলা, লিলিয়ান ব্রাউন। চল্লিশ বৎসর হলো কবিতা রচনা করছেন। "আমি একটি বেরাল" কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। জো গুল্ড হলেন উদাসী কবি। তিনি বলেন সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান হল তাঁর লিখিত "বর্তমান সময়ের মৌখিক ইতিহাস।" যত কথোপকথন তিনি শুনেছেন সবই নাকি এই বইএ লিপিবদ্ধ করেছেন। (সেই সুকুমার রায়-চৌধুরীর "চলচিত্তচঞ্চরী"র মতো নাকি?) আর একজন কবি হলেন জন ক্যাবেজ, তিনি নিউ-ইয়র্কের "ধাপার" সভাকবি। নিউইয়র্কের শহর-পরিষ্কার বিভাগে তিনি কুড়ি বৎসর চাকরী করেছিলেন, সেইজন্য তাঁর কবিতায় সাক্ষাৎ বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর "আটটি ঘণ্টা" নামক বইখানি সিনেমার ছবিতে উঠেছে। কবি বলেন যে, তারা আমার বই অনুযায়ী সবই করেছে কেবল গন্ধটুকু বাকি রয়ে গেছে। এমনি আরও কত কবি আছে। ভাগ্যে নিউইয়র্কের কবিরা "কবির লড়াই" জানে না! তবে আমাদের দেশের ফুটপাথে অমন কবির দেখা পেলে বিয়ের পদ্য প্রীতি-উপহার দু'একখানা লিখিয়ে নেওয়া যায়।

"অ্যাটমিৎস্কায়া বম্বা"

রাশিয়ার লোকেরা তাদের ভাষায় অ্যাটম বোমাকে বলে অ্যাটমিৎস্কায়া বম্বা। গুজব এই যে, রাশিয়া অ্যাটম বোমা তৈরী করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে যদিও তা "ওৎচিং সিক্রেটনা" (অত্যন্ত গোপনীয়)। রাশিয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক উন্নতির সংবাদ অনুমতি বিনা প্রকাশিত হবে না। কোলা উপদ্বীপ এবং শাখালিন দ্বীপে ইউরেনিয়াম পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে; তাছাড়া আরও ইউরেনিয়াম সংগ্রহের জন্য সমগ্র রাশিয়াতে জোর অনুসন্ধান করা হচ্ছে। আবশ্যক হ'লে তারজন্য উট, ঘোড়া, প্যারাশুট বাহিনী এমনকি বল্গা হরিণেরও সাহায্য নেওয়া হবে।

সমস্ত কাজটি তদারক করবার জন্য ভার দেওয়া হয়েছে পলিট ব্যুরোর (কমিউনিস্ট দলের রাজনৈতিক শাখা) একজন গণ্যমান্য সদস্যের ওপর। তাঁর নাম ল্যাভ্‌রেন্তি প্যাভেলিচ বেরিয়া, তিনি স্ট্যালিনের স্বদেশ-বাসী। এশিয়াস্থিত রাশিয়ার মধ্যে ইউরাল পর্বতের পূর্বে কাজাখস্তানের স্তেপভূমিতে অ্যাটম বোমা নির্মাণের জন্য আনুষঙ্গিক গবেষণার জন্য বিজ্ঞানাগার নির্মিত হবে। এই অঞ্চলে অনুমতি বিনা কোনো ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। বেরিয়ার সহকারী হলেন নিকোলাই ভংনীনসেনস্কি, তিনি ইউ এস এস আর অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সভ্য।

বিজ্ঞান শাখার কর্ণধার হলেন অধ্যাপক পিয়টর ক্যাপিৎসা, মস্কোর পদার্থ বিজ্ঞান সমস্যা প্রতিষ্ঠানের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। ক্যাপিৎসা লণ্ডনে ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটরীতেও গবেষণা করেছেন। ক্যাপিৎসার প্রধান সহকারী স্ট্যালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক বোগোলিউবভ এবং জার্মানী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ড থেকে আগত প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ। কিছুদিন পরে যখন আর মার্কিন যুক্তরাজ্যের অ্যাটম বোমায় একচেটিয়াত্ব থাকবে না, তখন?

সুকুমার রায়

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় যে-বই আমাদের মনকে সব চেয়ে বেশি দোলা দিয়েছিল তার নাম 'আবোল-তাবোল'। এমন মজার বই আজ পর্যন্ত আর একখানাও পড়িনি। যেমন মজার কবিতা, তেমনি মজার ছবি। একই কবিতা বার বার পড়েছি, একই ছবি বার বার দেখেছি, —তবু আশ মেটেনি। কিন্তু এই মনের মতো বইখানির রচয়িতা যে কে তখন তা ঠিক জানতাম না। সুকুমার রায়ের নাম হয়তো এক-আধবার গুরুজনরা করতেন। আমরা তাঁর লেখায় মশগুল ছিলাম ব'লে বোধ হয় সে-নাম কানে ঢুকত না। কে লিখেছেন তা জানার চেয়ে কী লিখেছেন তা জানার দিকেই আমাদের আগ্রহটা ছিল বেশি। অসম্ভবের ছন্দে মাতিয়ে দেওয়ার জন্যে যেভাবে তিনি আমাদের ডাক দিয়েছিলেন তাতে সাড়া না দেওয়ার উপায় ছিল না। তাঁর আমন্ত্রণের ভাষা আজও মনে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে:

"আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।
আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাব-হীন।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে।"

আমাদের মন তখন যে ঠিক কি চাইত 'আবোল-তাবোল' পড়ার আগে তেমনভাবে তা বুঝি নি। কবি সুকুমার রায়—শিল্পী সুকুমার রায় ছোটদের মনের খোরাক আশ্চর্যভাবে জুগিয়েছেন। হাঁস আর সজারু মিলে হয়ে যাচ্ছে 'হাঁসজারু', বক আর কচ্ছপে 'বকচ্ছপ', হাতি আর তিমিতে 'হাতিমি'।

"হাতিমি'র দশা দেখে—তিমি ভাবে জলে যাই,
হাতি বলে "এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।"

কী মুস্কিল বলুন তো? 'হাতিমি'র ছবি না দেখলে অবশ্য এই জন্তুর বিপদের মর্মটা পুরোপুরি বোঝা শক্ত। হেড অফিসের বড়বাবু ঝিমুতে ঝিমুতে হঠাৎ ক্ষেপে চেঁচিয়ে উঠলেন: "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি!" "গোঁফ হারানো! আজব কথা!"

"সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সামনে ধ'রে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষনো তা হয়না।
* * * *
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা
"এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা!
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
* * * *
"গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি
কারো কেনা?
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে
যায় চেনা।"

গঙ্গারাম যে পাত্র হিসাবে মন্দ নয়—সে কথা তো অনেকেরই জানা আছে। এই কবিতার শেষের দিকে যে খোঁচাটুকু আছে তা পরম উপভোগ্য। তার মুখের গড়ন অনেকটা ঠিক পেঁচার মতন, ঊনিশবার সে ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়েছে, "মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার", পিলের জ্বর আর পাণ্ডুরোগে কেবল সে ভোগে," কিন্তু তারা উচ্চ ঘর, কংসরাজের বংশধর!" ভীষ্মলোচন শর্মার গানের গুঁতোটা যে কি রকম, ভুক্তভোগী মাত্রেই তা অন্তর্নিহিত জানেন। পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় চলতে যদি চান তাহ'লে ছবি দেখে আপনার ঘাড়ের সঙ্গে খড়োর কল জুড়ে নিন।

"সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যে রকম রুচি—
মণ্ডা মিঠাই চপ্ কাটলেট্ খাজা কিংবা লুচি।
মন বলে তায় 'খাব খাব', মুখ চলে তায় খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে।
এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁস রবে না চলবে কেবল ধেয়ে।"

ছায়া ধরার ব্যবসার কথা, ছায়ার ওষুধের গুণের কথা ইতিপূর্বে কেউ শুনেছেন? ছায়ার নানা রকম ওষুধ আছে। যাঁর ঘুম হয় না, তিনি জেনে রাখুন:

"নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাকবে তাহার নাক।"

সর্দিকাশিতে ভুগছেন? তা হ'লে:

"চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।"

"আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে" বেঁচে থাকাটাই তো রীতিমতো এক সমস্যা। এরও ওষুধ আছে:

"আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে বাঁচতে যদি চাও,
তেঁতুল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।"

কুমড়োপটাশের খবর রাখেন? তিনি নাচলে, কাঁদলে, হাসলে, ছুটলে বা ডাকলে আমাদের কি কি করণীয় তার বিশদ বর্ণনা মুখস্থ করে রাখা উচিত। ঠিক কুমড়োপটাশকে এ-সংসারে দেখতে না পেলেও এই জাতের লোক কখনো-কখনো দেখা যায় বৈকি। কাতুকুতু বুড়ো, হাতুড়ে, বোম্বাগড়ের রাজা, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, রামগরুড়ের ছানা, ট্যাঁশ্ গরু প্রমুখ জীব বিশেষ সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। তাই বড়োরাও এই সব কবিতা পড়লে হাসতে হাসতে ফেটে পড়েন। তাঁরা হয়তো সহজ অর্থ ছাড়াও কবিতার মধ্যে অন্য কিছুর আভাস পেতে পারেন। কেউ কেউ হয়তো বা নিজের মধ্যেই এই বইয়ে বর্ণিত কোনো জীবের প্রকৃতিগত মিল খুঁজে পেয়ে চমকে উঠবেন। কিন্তু 'খেয়াল-রসের' এই বই ছোটদের সঙ্গে সমানভাবেই তাঁরা উপভোগ করতে পারবেন। গ্রন্থকার 'কৈফিয়ং' দিতে গিয়ে বলেছেন: যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার।" বলা বাহুল্য, এই রকম বিষয় নিয়ে সার্থক শিল্প সৃষ্টি করা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী। বাঙলা শিশু-সাহিত্য যে কয়জন লেখকের চেষ্টায় আজ শৈশব অতিক্রম করতে পেরেছে তাঁদের মধ্যে সুকুমার রায়ের নাম অবিস্মরণীয়। 'আবোল-তাবোল' ছাড়া আর কোনো বই না লিখলেও তিনি অমর হ'য়ে থাকতেন। তাঁর 'হযবরল' আর এক অতুলনীয় কীর্তি। 'হযবরল' পড়তে পড়তে Lewis Carroll-এর 'Alice's Adventures In wonderland'-এর কথা মনে পড়ে যায়। ছক এক, কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশ, গল্পও আলাদা। অ্যালিসের গল্পের যেমন বাঙলা অনুবাদ সম্ভব নয়, 'হযবরল'-রও তেমনি ইংরেজি অনুবাদ অসম্ভব। এই দুটি গল্পের জাত এক, রস এক; কিন্তু ঘটনা সম্পূর্ণ পৃথক। ছোটদের জন্যে মজার গল্প, হাসির গল্প অনেকেই আজকাল লিখছেন বটে; কিন্তু তাঁদের চেষ্টা অনেকটা কাতুকুতু বুড়োর মতো। খেলো রসিকতা আর ভাড়ামি করেই তাঁরা শিশু-সাহিত্যের আসর মাৎ করতে চান। সুকুমার রায় হলেন জাত-লিখিয়ে; তাই তাঁর রঙ্গ ও ব্যঙ্গ উঁচু দরের। তিনি লিখতেন রাস টেনে। তাঁর বই পড়ে শেষ করলেও একটা রেশ থেকে যায়। হাল-আমলের অধিকাংশ শিশু-সাহিত্যিকরা লেখেন রাস ছেড়ে দিয়ে। ফলে আমরা নিরাশ হই।

সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা'র মধ্যে ছোটদের চারটি কৌতুক-নাট্য আছে:—'ঝালাপালা,' 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান' আর 'হিংসুটে'। প্রথম দুটি নাটক লিখেছিলেন তিনি কুড়ি বছর বয়সে। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের নাটকের একান্ত অভাব। তাদের উপযোগী হাসির নাটক তো নেই বললেই চলে। এ দিক থেকে 'ঝালাপালা' শিশু-সাহিত্যের এক মস্ত অভাব শুধু যে পূরণ করেছে তা নয়—শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধও করেছে। নাটকের গানগুলির সুকুমার রায়ের করা স্বরলিপি নাট্যকারের সুরজ্ঞানের পরিচায়ক।

তাঁর 'পাগ্‌লা দাশু' ও 'বহুরূপী'র মধ্যেও অনেক সুন্দর মজার গল্প আছে। তাঁর পাঁচখানা বই-ই আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর এই সব বিচিত্র লেখা পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়, মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে (১৩৩০ সালের ২৪-এ ভাদ্র) তাঁর মৃত্যু না হ'লে আমাদের শিশু-সাহিত্য আজ আরো কতো এগিয়ে যেতে পারত! ১২৯৪ সালের ১৩ই কার্তিক সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই তারিখটি বাঙলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। বাঙালি ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙিয়ে তাদের মুখে তিনি হাসি ফুটিয়েছেন, তাদের সঙ্গে এমন এক অপরূপ জগতের তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যেখানে বিধিনিষেধের গণ্ডি নেই; তাঁর কথায়—

"হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে
সুরের নেশায় ঝরনা ছোটে,
আকাশকুসুম আপনি ফোটে
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।"

তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অকালমৃত্যুর পর বলেছিলেন: "সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাঙলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিলো সেই জন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন! বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না।"

রঙ্গজগৎ

ডকুমেণ্টারী ও সংবাদ-চিত্র

আমাদের চিত্রশিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে এই দুটো অভাবের কথা। ডক্যুমেণ্টারি ও সংবাদচিত্র পরিবেশনের দিক থেকে আমাদের চিত্রশিল্প অত্যন্ত দুর্বল। আরও দুঃখের কথা এই যে আমাদের চিত্রশিল্পপতিরা যেন ইচ্ছা করেই এই দুর্বলতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাই যদি না হবে, তবে আজও আমাদের দেশের ছায়াচিত্রের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দুই প্রকারের চিত্র একেবারে অবজ্ঞাত কেন? আনন্দ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক সাধারণের জ্ঞানের প্রসার ও জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি করাও চিত্রশিল্পের অন্যতম দায়িত্ব। সুলভ অর্থের লোভে বিদেশী শাসনের অজুহাতে আমাদের চিত্রশিল্পপতিরা এতকাল এই জাতীয় দায়িত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই এগিয়ে গেছেন। কিন্তু আজও যদি তাঁরা সে প্রয়াস করেন, তবে সেটা তাঁদের পক্ষেও শেষ পর্যন্ত যেমন ক্ষতিকর হবে, তেমনই আমাদের দেশ ও জাতির পক্ষেও হবে মারাত্মক।

জনমানসকে বিভিন্ন বিষয়ক শিক্ষাদীক্ষায় উদ্দীপিত করে তুলতে হলে, কালের সঙ্গে তার অগ্রগতিকে সমপর্যায়ে টেনে তুলতে হলে, ডক্যুমেণ্টারি ও সংবাদচিত্র নির্মাণ করা অপরিহার্য। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা বা সোভিয়েট রাশিয়ার চিত্রশিল্পের দিকে তাকালেই আমার ঐ উক্তির তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভারতবর্ষে আমরা আজ স্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি—সত্য; কিন্তু অশিক্ষিত ও দরিদ্র ভারতীয় জনমানসে এই স্বরাষ্ট্রের প্রকৃত তাৎপর্য আজও ধরা পড়েছে কি না সন্দেহের বিষয়। অথচ এ সম্বন্ধে জনমানসকে যদি আমরা উদ্বুদ্ধ করে তুলতে না পারি, তবে ভারতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংস্থাপন সম্ভব হবে না। রাষ্ট্রব্যবস্থার সকল খুঁটিনাটির সঙ্গে জনমানসের পরিচয় যদি আমরা ঘটাতে পারি, তবেই জনসাধারণ তাদের গণতান্ত্রিক

...র্তব্য সম্বন্ধে উদ্বোধিত হয়ে উঠতে পারে। কাজে ছোট বা বড় ডকুমেণ্টারি চিত্র আমাদের ...লাংশে সহায়তা করতে পারে। আমাদের ...ষ্ট্রযন্ত্রের রূপ কি, আমাদের অর্থনৈতিক ...বস্থার কার্যক্রম কি—এসব সম্বন্ধে ...স্তবানুগ সুন্দর সুন্দর ডকুমেণ্টারী চিত্র ...র্মাণ করা সম্ভব। এতে জনগণ শুধু ...আনন্দই পাবে না—পাবে অশিক্ষা ও কুসংস্কার-...দূরণকারী প্রকৃত শিক্ষাও।

সংবাদচিত্রের ক্ষেত্রে আমাদের চিত্রশিল্প যে ...ত দুর্বল—এবার একাধিক ঘটনায় আমরা ...র প্রমাণ পেয়েছি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই ...গাষ্ট আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ...কটি যুগান্তরকারী দিন বলে বিবেচিত হবে। ...ই দিন ভারতের স্বাধীনতা লাভের উৎসবকে ...ন্দ্র করে একাধিক প্রদেশের চিত্রশিল্প-...তিষ্ঠান একাধিক চিত্র নির্মাণ করেছেন। ...কন্তু দুঃখের বিষয় এর একখানি চিত্রও ...আশিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ...আমাদের জাতীয় জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ...দিন যে এভাবে চলচ্চিত্রে অবজ্ঞাত হল তার ...জন্য দায়ী কে? আমাদের সংবাদ চিত্রের ...দুর্বলতাই নয় কি? দ্বিতীয়ত, কিছুদিন ...পূর্বে এই কলকাতার বুকে হিন্দু-মুসলমানদের ...মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের মহান উদ্দেশ্যে ...ভারতের বাণীমূর্তি মহাত্মা গান্ধী আমৃত্যু ...অনশন আরম্ভ করেছিলেন। মহানগরীতে ...অদ্ভুতপূর্ব উপায়ে সাম্প্রদায়িক শান্তি ...স্থাপনের মধ্যে গান্ধীজীর এই অনশন-ব্রতের ...সাফল্যপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। আমাদের ...দেশের কোন চিত্র-প্রতিষ্ঠান জাতীয় জীবনের ...এত বড় একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকেও সংবাদ-...চিত্রে রূপায়িত করতে এগিয়ে আসেন নি। ...রূপ একখানি চিত্র নির্মিত হলে ভারতের ...বুকে স্থায়ী হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রচেষ্টার ...অনেকটা সহায়ক হত একথা নিঃসংশয়ে বলা ...যায়। আমাদের চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির গতানু-...গতিকতার মোহ ও প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টির ...অভাবই যে এ ব্যর্থতার জন্যে দায়ী সেকথা ...অনস্বীকার্য।

আমরা জেনে সুখী হলাম যে ভারত ...গভর্নমেণ্টের প্রচার-দপ্তর ইনফরমেশন ফিল্মস্ ...অব ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড ...নামে সরকারী সংবাদচিত্রনির্মাণকারী ...প্রতিষ্ঠান দুটিকে পুনরুজ্জীবিত করার মনস্থ ...করেছেন। যুদ্ধকালে এ দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল ...নিছক সরকারী প্রচার-যন্ত্র। আমরা আশা ...করি জাতীয় সরকারের হাতে পড়ে এ দুটি ...প্রতিষ্ঠান ডকুমেণ্টারী ও সংবাদচিত্র নির্মাণে ...অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং বাস্তবানুগ ...উপায়ে জাতি সংগঠনে সহায়তা করবে।

নূতন ছবির পরিচয়

জাগরণ—বড়ুয়া আর্ট প্রোডাকসন্সের ছবি। পরিচালক: বিভূতি চক্রবর্তী; বিভিন্ন ভূমিকায় মলিনা, দেবী মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গো-পাধ্যায়, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্তী, পদ্মশ্রী, মধুছন্দা প্রভৃতি।

নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়েও কাহিনীর দুর্বলতা ও যান্ত্রিক অপকর্ষের জন্যে ছবি কিভাবে ব্যর্থ হতে পারে 'জাগরণ' তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই ছবিতে কম পক্ষে ৫।৬ জন নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন। কিন্তু ছবিখানি মুহূর্তের জন্যেও মনের উপর কোন রেখাপাত করতে পারে না। এর জন্যে প্রধানত দায়ী হল গল্পের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও কৃত্রিমতা। আজকাল বাঙলা ছবিতে সস্তা স্বদেশপ্রেমের বুলি আউড়িয়ে দর্শক মন জয় করার যে প্রয়াস দেখা যায়, 'জাগরণ'ও তার ব্যতিক্রম নয়। গ্রামের প্রজানিপীড়ক অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে শিক্ষিত যুবকের নেতৃত্বে নিষ্পেষিত প্রজাদের অভ্যুত্থান, একান্ত জমিদার-পত্নীর সহায়তা, নিঃস্বার্থকর্মী শিক্ষিত যুবকটির সাথে জমিদার-কন্যার প্রণয় এবং শেষ পর্যন্ত নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে তাদের মিলন ও অত্যাচারী জমিদারের হৃদয় পরিবর্তন—এই হল মূল কাহিনী। কাহিনীটি অত্যন্ত মামুলী ও সস্তা পাঁচে ভরা—মুহূর্তের জন্যেও হৃদয়ে কোন সাড়া জাগে না। সংলাপ অত্যন্ত দুর্বল ও চরিত্রের অনুপযোগী। দীর্ঘ বক্তৃতা হৃদয়ে কোন সাড়া তো জাগায়ই না—বরং দর্শকমনে বিরক্তির সৃষ্টি করে।

অভিনয়াংশও অত্যন্ত দুর্বল। একমাত্র মলিনা ছাড়া অপর কেউ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করতে পারেন নি। এই চিত্রে একাধিক নবাগতা অভিনেত্রীর দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অভিনয় নৈপুণ্যের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। চিত্রখানির পরিচালনা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। আলোকচিত্র ও শব্দ গ্রহণ সমালোচনার অযোগ্য। এক কথায় আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়েছি।

"বাস্তুভিটা" অভিনয়

গত ১৫ই অক্টোবর ইউনিভার্সিটি ইনস্টি-টিউট হলে পশ্চিম বঙ্গের উদ্যোগে ও পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ঘোষের উপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন নাটিকা "বাস্তুভিটা" সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ হইয়াছে। পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটার আকর্ষণ অপ্রতিরোধনীয়; কিন্তু নানা কারণে বর্তমানে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তথাকার সংখ্যালঘু সম্প্র-দায়ের বহুস্মৃতি-বিজড়িত কর্মস্থল ও পৈতৃক বাসগৃহের মায়াও বুঝি বা কাটাইতে হইবে! একাধারে আর্থিক অবস্থার অনিশ্চয়তা, জীবন ও ধনসম্পত্তিগত নিরাপত্তা ও নারীর সম্ভ্রম রক্ষার সমস্যা ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর স্মৃতি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিমণ্ডলী এই সমস্যাকে জটিলতর করিয়াছে। অন্যদিকে বাস্তুর মায়া। এই ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে পূর্ব পাকিস্থানের সাধারণ স্বল্পবিত্ত অধিবাসীদের মনে যে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব ও আলোড়ন সৃষ্ট হইয়াছে তাহাই এই নাটকটির উপজীব্য।

স্বল্পপরিসরে নাট্যকার প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রতিই সুবিচার করিয়াছেন। মঞ্চে ক্ষণিক স্থিতির মধ্যেও গ্রামের মোড়ল বাক্তিত্বশালী, দৃঢ়চেতা সোনা মোল্লা, দাঙ্গায় নিহত জামাতার শোকে আচ্ছন্ন প্রতিহিংসা-লোলুপ ইয়াসিন, গ্রাম্য চাষী-ধীবর, মক্তবের মাষ্টার আমীন মুন্সী —সর্বোপরি আত্মভোলা সদাব্রতী পাঠশালার পণ্ডিত মহেন্দ্র ও তার স্ত্রী মানদা, এমন কি মাঝি আব্বাস পর্যন্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া দর্শকদের সমক্ষে জীবন্তরূপে উপস্থিত হইয়াছে—নিমেষের মধ্যেই তাহাদের স্বরূপ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

মৃগাঙ্ক ঘোষ

ষ্টুডিও সংবাদ

বিখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত নিউ থিয়েটার্সের নতুন দোভাষী চিত্র 'অযান্ত্রিক'র কাজ সমাপ্ত-প্রায়। চিত্রখানির পরিচালক বিমল রায়।

* * * *

নিউ থিয়েটার্স কর্তৃক চিত্রে রূপান্তরিত শরৎচন্দ্রের "রামের সুমতি" বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষায়। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মলিনা, ছবি রায়, অমর মল্লিক, ফণী রায়, রাজলক্ষ্মী, মায়া বসু, শম্ভো প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন পংকজ মল্লিক।

* * * *

শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এভারেষ্ট ফিল্মস্ লিমিটেডের দ্বিতীয় বাঙলা চিত্র 'ভাঙা গড়া'র চিত্রগ্রহণ ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। এই চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন গোপাল ভৌমিক ও সংলাপ রচনা করেছেন নরেন্দ্র ঘোষ।

* * * *

প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত আওয়ার ফিল্মসের 'নতুন খবর' চিত্রখানি নবেম্বর মাসের গোড়ার দিকেই কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে বলে আশা করা যায়। সাংবাদিকদের জীবনকথা নিয়ে এই চিত্রকাহিনী গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমতী ভারতী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, পরেশ ব্যানার্জি, অমর মল্লিক, নবদ্বীপ প্রভৃতি।

দেশী সংবাদ

১৭ই অক্টোবর—রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবনের যে অংশ হস্তচ্যুত হইয়াছিল, অদ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার দখল নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক গঠিত রবীন্দ্র ভারতীর হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই উপলক্ষে অদ্য উক্ত ভবন প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বৃক্ষ রোপণ উৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী বকুল বৃক্ষ রোপণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য সংগ্রহ অভিযান কিরূপ অগ্রসর হইতেছে, তাহার একটি বিবরণ প্রদান করিয়া অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী বলেন যে, ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী বর্তমান মাসে ১৫,২১৯ টন ধান্য ও ৪৫০২ টন চাউল অর্থাৎ চাউলের হিসাবে মোট ১৪,৬৪৮ টন চাউল সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘাটতি জেলাগুলিতে জনপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ বিশেষ পারমিটে ১৫১,৫০০ মণ ধান্য ও ১০,৮৪৫ মণ চাউল ক্রয় করেন।

১৮ই অক্টোবর—জুনাগড়ের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের নেতা শ্রীযুত শামলদাস গান্ধী এক বিবৃতিতে বলেন যে, কাথিয়াবাড়ের মুসলমানরা জুনাগড়ের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেছে এবং কেহ কেহ উক্ত গভর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্যও করিতেছে।

১৯শে অক্টোবর—পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতিতে ভারতের মুসলমানগণকে দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিনিধিমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান **ভারতীয় জাতীয়** কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য এক আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবীই ভারত বিভাগের জন্য দায়ী।

২০শে অক্টোবর—উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম লীগ দলের নেতা মিঃ লতিফুর রহমান এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হইতেছে ভারত ও পাকিস্থানের পুনর্মিলন। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নাই।

অদ্য প্রকাশ্য দিবালোকে বালীগঞ্জের এক জনাকীর্ণ রাজপথে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার একটি পে অফিসের সম্মুখে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ডাকাত দল গুলী চালাইয়া উক্ত ব্যাঙ্কের জনৈক পিওন, ক্যাশিয়ার ও একজন সশস্ত্র প্রহরীকে আহত করে এবং কিঞ্চিদধিক ৯৭ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

দিল্লীতে দুই হাজার মুসলমানের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ডাঃ দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সভাপতি সেখ আবদুল্লা দুই জাতি নীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে, ইহার ফলেই ভারত বিভক্ত হইয়াছে।

২১শে অক্টোবর—মামুদাবাদের মহারাজ কুমার মহম্মদ আমীর আলি খান মুসলিম লীগ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা দিবসের চতুর্থ স্মৃতি-বার্ষিকী অদ্য কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে গড়ের মাঠে ছাত্রকর্মী ও জনসাধারণের এক বিরাট সমাবেশ হয়। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লীতে তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেন যে, তিনি আর একটি মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনিয়াছেন। ইহা সাম্প্রদায়িক হত্যা নহে। নিহত ব্যক্তি একজন হিন্দু সরকারী কর্মচারী। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি কাজ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় একজন সৈনিক তাঁহাকে গুলী করিয়া মারে। গান্ধীজী বলেন যে, সামান্য কারণে এইভাবে বন্দুক ব্যবহার করা অশুভ লক্ষণের পরিচায়ক।

২২শে অক্টোবর—পেশোয়ারে এক বেতার বক্তৃতায় সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী খান আবদুল কোয়ায়ুম খান খোদাই খিদমদ্গার নেতা খান আবদুল গফুর খান ও তাঁহার সহকর্মীদের কার্যকলাপের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পাকিস্থান রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কোনরূপ প্রকাশ্য অথবা গুপ্ত কার্যকলাপ গভর্নমেণ্ট কোনক্রমেই বরদাস্ত করিবেন না।

নয়াদিল্লীতে নিঃ ভাঃ দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের ষ্টাণ্ডিং কমিটির বৈঠকে হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিজাম সরকার কর্তৃক গণ-আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র সজ্জার প্রস্তাবে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়।

২৩শে অক্টোবর—পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্না এক বিবৃতিতে বলেন, "পাকিস্থান **কদাপি** আত্মসমর্পণ করিবে না; দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে এক অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত করার সর্বপ্রকার প্রস্তাবকে তাহারা অগ্রাহ্য করিবে।

২৪শে অক্টোবর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও সহঃ সভানেত্রী শ্রীলাবণ্যপ্রভা দত্ত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, টাঙ্গাইল ও মির্জাপুরে পরিভ্রমণ করিয়া অদ্য বিমানযোগে কলিকাতা পৌঁছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট শ্রীযুত ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন যে, সর্বত্রই কংগ্রেস ও লীগের নেতা ও কর্মিগণ যে কোন উপায়ে শান্তি বজায় রাখার জন্য যুক্তভাবে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গে শান্তি অব্যাহত আছে।

২৫শে অক্টোবর—কাশ্মীরের ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী মিঃ আর এন ব্যাটরা এক বিবৃতিতে বলেন যে, কাশ্মীরের রামকোটের সীমান্তবর্তী মানসেরা হইতে প্রায় একশত লরীযোগে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বহু আফ্রিদী, পাকিস্থানের বিদায়ভোগী বহু সৈন্য ও বেপরোয়া গুণ্ডাবাহিনী ২৩শে অক্টোবর তারিখে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করে। মিঃ ব্যাটরা বলেন যে, আক্রমণকারীরা অ-মুসলমানদের হত্যা, গৃহদাহ, নারী ধর্ষণ ও লুঠতরাজে প্রবৃত্ত হয়।

রাজকোটের সংবাদে প্রকাশ, জুনাগড়ের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট জুনাগড় রাজ্য এলাকার ১২টি গ্রাম দখল করিয়াছে।

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

স্বদেশী যুগের অন্যতম খ্যাতনামা কর্মী শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা গত শুক্রবার আজিমগঞ্জে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল।

২৬শে অক্টোবর—আফ্রিদী ও অন্যান্য উপজাতিরা পশ্চিম ও উত্তর দিক হইতে কাশ্মীরে সশস্ত্র অভিযান চালাইবার ফলে যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পর্যালোচনার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য নয়াদিল্লীতে মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠক আহ্বান করেন। কাশ্মীরের সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ ব্যাটরা পণ্ডিত নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কাশ্মীরের অবস্থা জ্ঞাপন করেন। মিঃ ব্যাটরা ভারতীয় ডোমিনিয়ন গভর্নমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

রাজকোটের সংবাদে প্রকাশ, জুনাগড়ের নবাব তাঁহার বেগম সহ ও যুবরাজ সহ বিমানযোগে করাচী যাত্রা করিয়াছেন। অস্থায়ী জুনাগড় সরকার পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী পন্থা অনুসরণ করিয়া রাজ্যে আর একটি এলাকা দখল করিয়াছেন। অস্থায়ী সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, শনিবার মধ্য রাত্রি পর্যন্ত অমরাপুরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী ১৬টি গ্রাম দখল করা হয়।

বাঙলার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত অনঙ্গ চক্রবর্তী তাঁহার শ্রীরামপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

২৭শে অক্টোবর—কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে এবং কাশ্মীরের মহারাজের অনুরোধক্রমে ভারতীয় সৈন্যদল কাশ্মীরে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই অক্টোবর—বৃটেন আরব রাষ্ট্রগুলিকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, আরব লীগ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া প্যালেস্টাইন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলে গুরুতর ফলভোগ করিতে হইবে।

১৭ই অক্টোবর—লণ্ডনে ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি জানুয়ারী মাস হইতে বলবৎ হইবে এবং এই সময় ব্রহ্ম স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিবে।

২১শে অক্টোবর—মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, মঁসিয়ে কে ভি নোভিকোভ আমেরিকায় সোভিয়েট দূত নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্যালেস্টাইন হইতে বৃটিশ বাহিনী অপসারণের পর প্যালেস্টাইনের ইহুদী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তা মিঃ ডেভিড বেন গুরিয়নের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

নিউইয়র্কে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদে গ্রীস হইতে বিদেশী সৈন্যাপসারণের দাবী জানাইয়া পোল্যাণ্ড যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ব্রাজিল রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

২৫শে অক্টোবর—লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, প্রশান্ত মহাসাগরের পেকার, জার্ভিস এবং আর কয়েকটি দ্বীপ লইয়া বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কলহ দেখা দিয়াছে। ঐ দ্বীপগুলি যুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ শাসনাধীন ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পর মার্কিন নৌসৈন্যরা ঐগুলি দখল করিয়া রহিয়াছে।

২৬শে অক্টোবর—মাঞ্চুরিয়ার কিরিন নামক গুরুত্বপূর্ণ সহরটি দখলের জন্য গত দশদিন যাবৎ চীনা সরকারী বাহিনী ও কম্যুনিষ্ট সৈন্যদলের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(৪০শ সংখ্যা হইতে ৫১শ সংখ্যা পর্যন্ত)

ধবল ও কুষ্ঠ

গাত্রে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গাদি স্ফীত, অঙ্গুলাদির বক্রতা, বাতরক্ত একজিমা সোরায়েসিস ও অন্যান্য চর্ম্মরোগাদি নির্দোষ আরোগ্যের জন্য ৫০ বর্ষোর্দ্ধকালের চিকিৎসালয়

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আপনি আপনার রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপুস্তক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া।
ফোন নং ৩৫৯ হাওড়া।

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।
(পূরবী সিনেমার নিকটে)

আই, এন, দাস

(আর্টিষ্ট)

ফটো এন্‌লার্জমেণ্ট, ওয়াটার কলার ও অয়েল পেণ্টিং কার্যে সুদক্ষ চার্জ সুলভ. অদ্যই সাক্ষাৎ করুন বা পত্র লিখুন। ৩৫নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

কাশ্মীরের বাহিরে সীমান্ত অঞ্চল হইতে উপজাতীয় পাঠানেরা যে কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে, পাকিস্থান সরকার একথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।; শুধু তাহাই নয়, তাঁহারা যে এই আক্রমণে বাধাদান করেন নাই, এমন স্বীকৃতিও পরোক্ষভাবে তাঁহাদের বিবৃতিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা দয়া করিয়া এই কথা জানাইয়াছেন যে, পূর্ব পাঞ্জাবের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাঠানেরা পশ্চিম পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, তখন পাকিস্থান সরকার অতি কষ্টে তাহাদিগকে নিবারণ করেন। কিন্তু কাশ্মীরের বেলায় তাহাদের অনুরূপ কৃপার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট কাশ্মীরে নরঘাতক দুর্বৃত্তদের বীভৎস শোণিতোৎসবে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া পাকিস্থান সরকার মহা রুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন ও তম্বী দেখাইয়াছেন। মানবতা-বিরোধী এমন মনোবৃত্তি সংযত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের শান্তি নাই; প্রকৃতপক্ষে এই ক্রূরতা এবং স্বৈরাচারিতাপূর্ণ রাজনীতির খেলা সমগ্র জগতের পক্ষে আতংককর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাশ্মীরে যদি এই প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়, তবে ভারতের অন্যত্রও এই নীতির দৌরাত্ম্য দুর্দমনীয় গৃধ্নুতায় আত্মপ্রকাশ করিবে। পণ্ডিত জওহরলাল কাশ্মীর রক্ষায় দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইয়া এই জন্যই সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

'লড়কে লেঙ্গে' নীতির মহিমা

উপজাতীয় পাঠানেরা কাশ্মীর আক্রমণ করে। পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই আক্রমণে উৎসাহ যোগাইয়াছেন, গান্ধীজী এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে পাকিস্থান রাজ্যের ভিতর দিয়া দুইশত মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া দলবদ্ধভাবে পাঠানদের পক্ষে কাশ্মীরের সীমান্ত অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব হইত না। পণ্ডিত জওহরলাল এই অভিযান সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'আক্রমণকারীরা সশস্ত্র ও সমরবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং উপযুক্ত নেতাদের অধীনে তাহারা পরিচালিত হইতেছে। ইহারা সকলেই পাকিস্থান হইতে এবং পাকিস্থানের ভিতর দিয়া কাশ্মীরে গিয়াছে।' পণ্ডিতজী প্রশ্ন করিয়াছেন, "ইহারা কি করিয়া সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল এবং কিরূপে তাহারা আধুনিক সমরোপকরণে সজ্জিত হইল, পাকিস্থান গভর্নমেণ্টকে একথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমাদের আছে। ইহা কি আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ নয়? ইহা কি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসুহৃদের কাজ নয়? পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট কি এতই দুর্বল যে, তাহারা অন্য দেশ আক্রমণের জন্য তাঁহাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়া অস্ত্রশস্ত্র আসা বন্ধ করিতে পারেন না? অথবা ইহাই কি তাঁহাদের ইচ্ছা? তৃতীয় কোন কারণ নাই।" উদ্দেশ্য এবং বিধেয় সত্যই এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী মিঃ আবদুল কোয়ায়ুমের বক্তৃতায় সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকে না। তিনি তীব্র ভাষায় কাশ্মীর আক্রমণের জন্য পাঠানদিগকে প্ররোচিত করিয়াছেন। সিন্ধুর শিক্ষাসচিব পীর এলাহিবক্সের বিবৃতি তাহাও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি হুংকার ছাড়িয়া কাশ্মীর সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে রাজ্যের সকলকে উস্কাইয়াছেন। ইহাদের এই ধরণের উত্তেজক বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র ভারতে কিরূপ আতঙ্ককর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে, ইঁহারা সে বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই এবং তাহা দেখা দরকারও ইঁহারা বোধ করেন নাই। 'লড়কে লেঙ্গে' পাকিস্থানের চিরন্তন নীতি ধরিয়াই ইঁহারা চলিতেছেন। ইঁহাদের অবলম্বিত এই ধরণের দৌরাত্ম্যপূর্ণ নীতির ফলে অন্যত্র যাহাই ঘটুক, সে বিবেচনার ধার ইঁহারা ধারেন না। সমগ্র ভারত নির্দোষ-নিরীহের রক্তস্রোতে ভাসিয়া যাক, তাহাতে ইঁহাদের বিবেকে একটুও বাধে না। পাকিস্থানী নীতির এইখানেই বাস্তবতা। গুণ্ডামীর জোরে পাকিস্থান কায়েম করিয়া সর্দারী চালাইতে পারিলেই এই নীতির নিয়ন্তাদের চতুর্বর্গ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এমন নির্বিবেক প্রবৃত্তিকে মানুষের প্রতি মর্যাদাবোধ যাঁহাদের বিন্দুমাত্র আছে, তাঁহারা কতদিন বরদাস্ত করিয়া লইবে?

উদ্দেশ্য কি?

মৌলবী আবুল কালাম আজাদ নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলমানদিগকে লইয়া একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। দেখিতেছি, ইহাতে মিঃ শহীদ সুরাবর্দীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। তিনি করাচী হইতে মিঃ জিন্না এবং মিঃ লিয়াকৎ আলী খানের সঙ্গে মোলাকাত করিয়া ফিরিয়াই নিজে ৯ই নবেম্বর আর এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। সুরাবর্দী সাহেবের আমন্ত্রণের মুখবন্ধে মুসলিম লীগের প্রভূত মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে এবং তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লীগের কল্যাণময়ী শক্তির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্বে লীগের বিজয়ধ্বজা প্রোথিত করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব-মুসলিম লীগ গড়িবার বিরাট সংকল্প পর্যন্ত রহিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিক পুরুষ এবং মিঃ জিন্নার রাজনীতিক চাতুরী লীলায় তিনি অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীভুক্ত। রাজনীতির পাকচক্র কিভাবে খেলিতে হয়, তাহা তাঁহার জানা আছে। তিনি বিনয় সহকারে একথা বলিয়াছেন বটে যে, মৌলানা আজাদের আহূত সম্মেলনের সঙ্গে তাঁহার আহূত সম্মেলনের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, তবে স্বতন্ত্র একটা সম্মেলন এখনই আহ্বান করা তাঁহার পক্ষে ক প্রয়োজন ছিল? সে সম্মেলনও আবার পর্দার আড়ালে করিবার প্রস্তাব হইতেছে। বলা বাহুল্য, মৌলানা আজাদের আহূত সম্মেলনকে জমিয়ৎ-উল-উলেমা পুনর্গঠনের নাম দিয়া কোণঠাসা করিয়া নিজের সম্মেলনের রাজনীতিক গুরুত্ব বাড়াইতেই মিঃ সুরাবর্দী উদ্যত হইয়াছেন। পাছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানগণ মৌলানা আজাদের দলভুক্ত হইয়া পড়েন এবং লীগের প্রসার এখানে নষ্ট হয়, ইহাই তাঁহার চিত্তে আশঙ্কার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা সুরাবর্দী সাহেবকে এই চেষ্টা হইতে বিরত হইতেই পরামর্শ প্রদান করিব। বলা বাহুল্য, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা ছাড়া লীগের অন্য কোন নীতি নাই এবং সাম্প্রদায়িকতাকেই তাঁহারা এই কার্যে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। লীগের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। লীগওয়ালারা পাকিস্থান পাইয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের পক্ষে লীগের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবার কোন সার্থকতা নাই। মিঃ জিন্নার সর্বময় কর্তৃত্বে লীগ এখনও পরিচালিত হইতেছে। লীগ-দলপতি বর্তমানে পাকিস্থান সরকারের রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। এক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়া তথাকার মুসলমানদের পক্ষে লীগের নিয়মানুবর্তিতা স্বীকার করা সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহাদিগকে সেদিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করাও আমরা অসঙ্গত বোধ করি না। দুই-জাতিত্বের নীতি লীগের প্রাণস্বরূপ। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দুই-জাতিত্বের কোন স্থান নাই। হিন্দু এবং মুসলমান রাষ্ট্রের দিক হইতে এখানে সকলেই সমান এবং ধর্মে দুই হইলেও তাহারা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের ঘাড়ে লীগের দুই-জাতিত্বের ভেদবাদ চাপানোর উদ্যম আমরা অনিষ্টকর বলিয়াই মনে করি। যাঁহারা মুখে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দোহাই দিয়া অন্তরে অন্তরে লীগের ভেদবাদকেই বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের আন্তরিকতা স্বতঃই সন্দেহ সৃষ্টি হয়। চৌধুরী খালেকুজ্জমানের ব্যাপার এক্ষেত্রে আমাদের মনে পড়ে। কথার চোটে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের এক শেষ প্রদর্শন করিয়া তিনি অবশেষে উড়োজাহাজযোগে পাকিস্থানে

সম্পষ্ট দিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই মিঃ জিন্নার অন্তরঙ্গ দলে স্থান লাভ করিয়াছেন। যাহারা এইরূপে দোমুখো মতে বিশ্বাসী, তাঁহাদের পক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয়। এখানকার মুসলমানদের জন্য তাঁহাদিগকে মাথা ঘামাইতে হইবে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু যদি বাঁচে, মুসলমানও বাঁচিবে। তাঁহারা সুখে-দুঃখে জাতির সকলের সঙ্গে এক হইয়াই চলিবে।

রাজদ্রোহের নূতন সংজ্ঞা

পূর্ব বাঙলা প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন করাচীতে গিয়া সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় রাজদ্রোহের নূতন একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কৃপায় রাজদ্রোহের অনেক রকম সংজ্ঞা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু স্বাধীন পাকিস্থানের গণতান্ত্রিকতার নীতিতে একান্ত বিশ্বাসবান বলিয়া যিনি পদে পদে নিজের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহার মুখে রাজদ্রোহের একটি অভিনব সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে। খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করিয়াছেন —"যদি হিন্দুস্থান অথবা পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে পুনর্মিলনের পক্ষে কোনরূপ প্রচারকার্য, আন্দোলন অথবা বিবৃতি বাহির করা হয়, তাহা হইলে আমার গভর্নমেণ্ট কর্তৃক তাহা রাষ্ট্রের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতারূপে গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।" রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহের প্রবৃত্তি দমন করিবার অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টের আছে; কিন্তু জনগণের স্বাধীনতায় অসঙ্গত হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক রীতি সম্মত নয়। আধুনিক প্রত্যেক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সাধারণের কতকগুলি মৌলিক অধিকারকে মানিয়া চলিতে হয়। সেগুলি না মানিলে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। আইনসম্মতভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিলে কিম্বা তদনুকূলে কোনরূপ মত প্রকাশ করিলেই রাজদণ্ডের কঠোর নিপীড়নে পিষ্ট হইতে হইবে—শুধু স্বৈরাচারী শাসকদের মুখেই এমন উক্তি শোভা পায়। এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব পাকিস্থানের অন্যতম মন্ত্রীর একটি বক্তৃতা উদ্ধৃত করিতে পারি। পূজার কয়েকদিন পূর্বে পূর্ব পাকিস্থানের মন্ত্রী মিঃ হবিবুল্লা বাহার ময়মনসিংহের একটি জনসভায় বলেন, "অন্য প্রদেশের সঙ্গে বাঙলার তুলনা চলে না। বাঙলা দেশের হিন্দু এবং মুসলমানের একই ভাষা, একই হরফে তাহারা লিখে। তাহাদের সাহিত্য, শিল্প, সভ্যতা এবং শিক্ষা একই। পলাশীর যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমান তাঁহাদের একই জননীর জন্য এখানে সংগ্রাম করিয়াছে। মোহনলাল, মীরমদন, সিপাহী-বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতাদের নাম আমরা ভুলি নাই। আমরা ক্ষুদিরাম এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে বিস্মৃত হই নাই। ইঁহাদের নাম এখনও বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান তরুণদিগকে সমানভাবে পাগল করিয়া তোলে। তবে আমাদের মধ্যে লড়াই কিসের?" খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের নির্দেশিত রাজদ্রোহের সংজ্ঞার সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে এমন উদার মানবতা এবং স্বদেশপ্রেমিকতাপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করাও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়; কারণ এই মতবাদ সুসংহত হইয়া পরে উভয় বঙ্গের মধ্যে ভেদরেখাকে বিলীন করিয়া দিতে পারে। বস্তুত খাজা নাজিমুদ্দীন রাজদ্রোহের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, যদি তাহা মানিয়া চলিতে হয়, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। উভয় বঙ্গের শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী আশা করি, তাঁহার এই অভিমত সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবেন।

পাকিস্থানের অস্ত্রসজ্জা

পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্না একটি জরুরী বিধান জারী করিয়া সমগ্র পাকিস্থানে ন্যাশনাল গার্ড দল গঠনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ন্যাশনাল গার্ডদল পাকিস্থানে পূর্ব হইতেই ছিল এবং এতদিন পর্যন্ত পাকিস্থানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সর্দারী ফলাইয়া তাহারা তাহাদের রাষ্ট্রসেবা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়াছে। কিন্তু সরকারী হিসাবে এই দলের কোন মর্যাদা ছিল না। মিঃ জিন্নার নূতন আদেশে গার্ডদল সে মর্যাদা লাভ করিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, এতদিন ঘরের খাইয়া সর্দারীতেই তাহাদিগকে আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে হইত; অতঃপর তাহারা সরকার হইতে বেতন পাইবে এবং কার্যত এই দলকে পাকিস্থান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করা হইবে। সরকারের আহ্বানে এই দলের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যে কোন সময়ে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সুতরাং অত্যন্ত জরুরী এই বিধান। শত্রুপক্ষ হইতে দেশ আক্রমণের আতঙ্ক দেখা না দিলে সাধারণত স্বাভাবিক শান্তির অবস্থায় কোন সরকার এইরূপ রণরঙ্গ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হন না। মিঃ জিন্না কিছুদিন হইতে অবিরত শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। সেদিনও তিনি পাকিস্থান রক্ষার জন্য সকলকে জীবনদানে প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত দলও সমস্বরে কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে আস্ফালন চালাইতেছেন। পাকিস্থানের পক্ষে এইরূপে আতঙ্কের কারণ কি, অনেকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন; কিন্তু এ প্রশ্ন অবান্তর। মিঃ জিন্না সুচতুর রাজনীতিক। তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি পরিকল্পনা লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সেই পরকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার পথে যাঁহারা তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবে বলিয়া তিনি মনে করেন, তাহারা তাহার শত্রু। এই শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ঝটিকা-নীতি অবলম্বনে তিনি হিটলারের সমতুল্য। এক্ষেত্রে অন্যায় বা অন্যায়ের বিচার তাঁহার নাই এবং সেই হিসাবেই তাঁহার নীতির বাস্তবতা এবং সার্থকতা। মিঃ জিন্নার এই নীতি প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় আমরা যথেষ্ট রকমেই পাইয়াছি এবং সেইজন্যই আমাদিগকে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছে; কারণ, মিঃ জিন্নার ঝটিকা-নীতির গতি কখন কোনদিকে আসিয়া পড়িবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট এবং সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সরকারসমূহকে এজন্য পূর্ব হইতেই সতর্ক থাকা উচিত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যার অন্ত নাই। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা-প্ররোচক কৌশলপূর্ণ প্রচারকার্যে আমাদিগকে যাহারা কৃতার্থ করিতে চাহেন, তাহাদের সংযত হওয়াই ভাল। দেশরক্ষার জন্যও ভারত সরকারের প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বাঙলার কথা বিশেষভাবে বলিব। বাঙলার তরুণ দল সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য সর্বদাই উৎসুক। এবং সামরিক স্পৃহায়ও তাহাদের অভাব নাই। তারপর, সে সামরিক স্পৃহাকে কার্যক্ষেত্রে সার্থক করিতে হইলে স্বদেশপ্রেমের যে তীব্র প্রেরণা অন্তরে থাকা আবশ্যক বাঙলা দেশের তরুণদের তাহা পর্যাপ্তরূপে রহিয়াছে। বৈদেশিক শাসনের নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বাঙলার তরুণদল সে ক্ষাত্রবীর্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরাও বাঙলার যুবকদের সে বীর্যবলের কাছে সন্ত্রস্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। চারিদিকে অবস্থা ক্রমেই উত্তেজনাজনক হইয়া উঠিতেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আমরাও নিরাপদ নহি। আমাদিগকে গৃহশত্রুদের সম্বন্ধে যেমন সতর্ক থাকিতে হইবে, সেইরূপ বাহির হইতে আক্রমণ প্রতিহত করিবার সামর্থ্যও আমাদের পক্ষে সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রয়োজন। বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে রাজনীতিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন ভেদ আমরা স্বীকার করি না। এইরূপ অবস্থায় সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের কল্পনা এবং সাম্প্রদায়বিশেষের অপকৃষ্টতার বেদনা মিথ্যা প্রচারকার্যের কৌশলে মনের কোণে পাকাইয়া তুলিবার খেলা যাহারা এখনও খেলিতে চায়, তাহাদিগকে কোনক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

প্র-না-বি-র এলবাম

চিত্র-চরিত্র

দেশ পত্রিকার পাঠকদের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করি। পুরো এক বৎসরকাল তাহারা ইন্দ্রজিতের খাতা পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। খুব সম্ভব ইন্দ্রজিৎটা ছদ্মনাম। এত নাম থাকিতে লেখক কেন ইন্দ্রজিৎ নাম গ্রহণ করিলেন জানি না, তবে পৌরাণিক ইন্দ্রজিৎ যে-বাহিনীর উদ্দেশ্যে শরক্ষেপ করিয়াছিল, আধুনিক ইন্দ্রজিতের মনে তেমন কোন ইঙ্গিত যে ছিল না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত: তার একটা প্রধান কারণ যদিচ দুইজন ইন্দ্রজিৎ-ই অলক্ষ্যচারী, তথাপি দ্বিতীয় জনের নিক্ষিপ্ত বস্তু আদৌ অস্ত্র নয়। ইহুদীরা যখন মুসার নেতৃত্বে 'Promised Land'এর দিকে চলিয়াছিল, মরুভূমির মধ্যে যখন তাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, তখন আকাশ হইতে অদৃশ্য হস্ত তাহাদের সম্মুখে Manna বর্ষণ করিয়াছিল, দুর্গম পথের দুর্লভ পথ্য, সে এক অপূর্ব খাদ্য। আমাদের ইন্দ্রজিতের সাপ্তাহিক অধ্যায়গুলি অদৃশ্য লেখকের সেই Manna বর্ষণ, বাঙলা জর্নালিজমের ধূসর মরুভূমিতে। এবারে গোটা বৎসরের সঞ্চয় গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া বিপণির পণ্যরূপে শোভা বর্ধন করিবে আশা করা যায়। এতক্ষণ পাঠকের সৌভাগ্যের কথা বলিলাম, কিন্তু প্র-না-বি'র সৌভাগ্যও অল্প নয়। অনেক পাঠক তাঁহাকে ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া প্রশংসাসূচক চিঠি পাঠাইতেন। তাঁহারা অকাট্য যুক্তিসংযোগে প্রমাণ করিয়া দিতেন যে, ও-লেখা প্র-না-বি'র না হইয়া যায় না। সাহিত্য সমালোচনা করিয়াই নাকি তাঁহাদের হাড় পাকিয়াছে। পাকা হাড়ে আঘাত লাগিলে আর জোড়া না লাগিতেও পারে, আশঙ্কায় তাঁহাদের ভুল ভাঙিবার চেষ্টায় বিরত ছিলাম। তাছাড়া পরের প্রশংসা আত্মসাৎ করিবারও একটা সুখ আছে, এ যেন প্রশংসার পকেটমারা। এতদিন যদি চাপিয়া ছিলাম, তবে এখন আবার প্রকাশ করিতে গেলাম কেন? না করিয়া করি কি? ইন্দ্রজিতের মতো তো আর সত্যই লিখিতে পারি না, কাজেই স্বীকার করিয়া ফেলিয়া উদারতা প্রদর্শন করাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। অপরের মতো লিখিবার বিদ্যা না থাকিতে পারে, কিন্তু অপরের প্রশংসা যে দীর্ঘকাল চাপিয়া রাখা উচিত হয় না, সেটুকু বুদ্ধি আশা করাও কি নিতান্ত অন্যায় আশা।

এ বৎসর প্র-না-বি যে পর্যায় লিখিতে যাইতেছে, তাহার নাম প্র-না-বি'র এলবাম বা চিত্র-চরিত্র। এই জাতীয় রচনা না ইতিহাস, না জীবন-চরিত, না সমালোচনা, না তজ্জাতীয় অন্য কিছু। ইতিবাদের চেয়ে নেতিবাদের দ্বারাই এগুলির পরিচয় দেওয়া সহজ। কোন একজন লোকের একখানি ছবি দেখিলে পাঠকের মনে যে ভাব যেভাবে ও যে পরিমাণে উদ্রিক্ত হইতে পারে, প্র-না-বি'র এলবামে সেইটুকু ধরিবার চেষ্টা হইবে।

করকোষ্ঠীতে বিশ্বাস করে না, এমন মানুষ বিরল। ভূতে বিশ্বাস করে না, ভগবানে বিশ্বাস করে না, ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, এ সত্যে বিশ্বাস করে না, এমন মানুষ যথেষ্ট আছে। কিন্তু করকোষ্ঠীতে অবিশ্বাসী? আমার কেমন যেন সন্দেহ হইতেছে, আমার পাঠক-পাঠিকার করপদ্মগুলি ইতিমধ্যেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। হায়রে, হাত দেখিতেই যদি জানিব, তবে প্র-না-বি'র এলবাম লিখিতে যাইব কেন। আমি বলিতেছিলাম, করকোষ্ঠীর আঁকজোকগুলিতে যদি কিছু জীবন-সত্য থাকে, তবে মানুষের মুখমণ্ডলের বলিচিহ্ন ও রেখায় আরও কত বেশি সত্য নিহিত। মুখ-মণ্ডলের কোষ্ঠীর সত্য উদ্ধারই প্র-না-বি'র এলবামের উদ্দেশ্য।

ওই যে মুখমণ্ডলকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রের বিন্ধ্যপর্বতের মতো এক-খণ্ড মাংস উদ্ধত হইয়া আছে, পাঠক তুমি যাকে গদ্যে নাক এবং কবিতায় নাসিকা বা নাসা বলিয়া থাকো—ওটা কি শুধু ঘ্রাণ গ্রহণ করিবার জন্যই সৃষ্ট? তবে তো দুটা ছিদ্রমাত্র থাকিলেই চলিত। ওই নাকটি মানব-ব্যক্তিত্বের "ইব মানদণ্ড!" ওই নাকের রহস্য সম্যক অবগত হইলে মানব-ইতিহাসের, মানব-জীবনের কত সত্যই না জানা যাইত! শুক-নাসিকা বা তিল-ফুল-নাসিকা বা বংশীনাসিকা, এসব তো কেবল কাব্য কথা। নাকের জাতিভেদের কাছে হিন্দু সমাজও হার মানে। অরবিন্দের নাকটা দেখিয়াছ, বঙ্গোপসাগরের মুখে গঙ্গার মোহানার মতো চওড়া। বিবেকানন্দর নাকটা যেন একটা উদ্যত ঘুষি। দেশবন্ধুর নাক প্রকাণ্ড একটা চ্যালেঞ্জ। বঙ্কিমচন্দ্রের নাক ওষ্ঠাধরকে যেন চাপিয়া ধরিয়াছে। আর পূর্ণিমা রাতের তারাগুলি যেমন থাকিয়াও নাই, রবীন্দ্রনাথের নাসিকা তেমনি সমগ্র মুখমণ্ডলের সঙ্গে একান্ত সুষম, স্বতন্ত্রভাবে চোখে পড়ে না। চাণক্যের নাকটা খুব সম্ভবত হরধনুর মতো প্রকাণ্ড একটা তোরণসদৃশ কিছু ছিল, সেই নাকের বঙ্কিম-স্বপন ছিল মহারাজ নন্দের নিদ্রার এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের চিন্তার বিঘ্ন। মানুষের ইতিহাস বহুল পরিমাণে তাহার নাকের ইতিহাস, পাঠক নাক বড় সামান্য জিনিস নয়। অথচ কত সহজে, কেমন অবলীলাক্রমে এত বড় একটা ঐতিহাসিক বস্তু সকলে বহন করিয়া চলিয়াছি, জানিতেও পর্যন্ত নাক সম্বন্ধে অচেতন হইয়াই থাকি (ঘুষিটা তেমন প্রবল হইলে পরেও অচেতন হইতে হয়)। নাক, চোখ, কান, ওষ্ঠাধরের ব্যাখ্যা করিয়া ব্যক্তির অন্তর্জীবন ও চরিত্রকে প্রকাশ করাই এই এলবামের উদ্দেশ্য, সেই কারণে এগুলির অপর নাম চিত্র-চরিত্র।

বাঙলা সাহিত্যে জীবন-চরিত বিরল কেন? জীবনীর বিষয়ীভূত মানুষ কি এদেশে বিরল? মানুষেরই জীবন-চরিত সম্ভব, দেবতার নয়, কারণ সব দেবতারই জীবন একপ্রকার, আর বৈচিত্র্যই জীবন-চরিতের প্রধান সম্পদ। চৈতন্য-দেবের জন্মের পরে এদেশে তাঁহার ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যদের জীবন-চরিত লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে সবকে জীবনী না বলিয়া পুরাণ-কথা বলাই সঙ্গত, যেহেতু তাঁহাদের দেবতা বলিয়া প্রমাণ করাই সেসব জীবন-কথার লক্ষ্য। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ কিনা, জানি না, কিন্তু শিল্পীর লক্ষণ নিশ্চয়ই নয়। ছবি আঁকিতে গেলে শাদা-কালো দুই রকম বর্ণই ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু অতিভক্তি নিছক শাদা রঙ ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করিতে চায় না, ফলে চিত্র হয়, কিন্তু বিচিত্র হয় না, আর বৈচিত্র্যেই মানুষের আগ্রহ। প্র-না-বি'র এলবামে শাদা কালো দুই রকম আঁচড়ই পড়িবে। কোন কোন পাঠক হয়তো প্র-না-বি'কে ভক্তিহীন বা নাস্তিক মনে করিবে, কিন্তু প্র-না-বি'র উত্তর এই যে, মানুষ-আঁকা তাঁহার উদ্দেশ্য। শাদা তুলিতে অঙ্কিত শুভ্র নিরঞ্জন পুরুষ জীবন-চরিতের বস্তু নয়। ভগবানের কি জীবন-চরিত সম্ভব? মানবীকরণ শিল্পের লক্ষ্য। ভগবানেরও জীবন-চরিত লেখা যাইতে পারে, যদি আগে তাঁহাকে মানুষ করিয়া তুলি। বিষ্ণুর জীবনী লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের জীবনী রামায়ণ—কবিগুরু কি তাহাতে কালো তুলি চালাইতে দ্বিধাবোধ করিয়াছেন?

প্র-না-বি'র এলবামে চার শ্রেণীর চিত্র-চরিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। দেশী, বিদেশী, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক। দেশী চিত্র যেমন রামমোহন ও গান্ধী। বিদেশী চিত্র বার্নার্ড শ' ও টলস্টয়; ঐতিহাসিক যেমন আকবর ও বুদ্ধ, আর কাল্পনিক বলিতে বুঝিতেছি যেমন কালিদাসের দুষ্যন্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ রায়। অঙ্কিত চিত্রগুলির সমস্তই যে মহত্ত্বের সমপর্যায়ভুক্ত হইবে, এমন নয়; কারণ আগেই বলিয়াছি, বৈচিত্র্য প্রদর্শন প্র-না-বি'র উদ্দেশ্য, নিছক মহত্ত্ব বর্ণন নয়।

এবারে গোটা একটা বৎসর পাঠকের ধৈর্যের সহিত প্র-না-বি'র প্রগল্‌ভতার লড়াই চলিতে থাকিবে। সেই অকৃত বিরক্তির জন্য আগাম ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্র-না-বি এবারে এলবাম খুলিয়া বসিবে।

গৌরীশৃঙ্গের পথে

শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বসু

সাতসাগরের ডাক

গোবিন্দ চক্রবর্তী

সাত সাগরের তীরে
যদিও বেজেছে শিঙা ফেরাবার ডাকে
সূর্য-সেনাদের
আজো যারা সীমান্তে ফেরার;
যদিও পড়েছে রোদ কোনো কোনো বাঁকে
মহাপৃথিবীর,
দুর্গের দুর্গমে আর
ধ্বসে গেছে কোথা কোথা রাত্রির প্রাচীর—
তবু যেন তারা আর
কভু ফেরে নাক!

অনেক যুগান্ত চ'লে যাবে—
পৃথিবী দিগন্তে আরো শুভ্র বেলা পাবে,
স্বচ্ছ হবে আরো এ সময়,
রৌদ্র হবে তীব্র জ্যোতির্ময়,
মেলে নাক তবু যেন তাদের সন্ধান।

তাহারা হারাক
অবলীন কুয়াসার পাঁজরে পাঁজরে!

সূর্য-সুত সূর্য-সেনা
সূর্য-লগ্ন খুঁজে যাক মৌন চিরকাল।
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে,
কাশের প্রান্তরে,
কেবল টহল দিক অম্বরে অম্বরে
অনন্তের অন্তহীনে
তুরঙ্গ-সওয়ার!

তাদের অজেয় অভিযান
দৃঢ় দৃপ্ত হোক।
শূন্য হ'তে মহাশূন্যে
শূন্যহীনতায়ঃ
তারা যেন অবিরাম ঊর্ধ্বে উঠে যায়—

স্বপ্নাতীত নক্ষত্রেরো ধ্যানাতীত তীরে
ছিঁড়ে যায় ছিন্ন ভিন্ন অন্তিম তিমিরে
রাত্রির সমস্ত শিল্প করে বিনিঃশেষ!

সাত সাগরের তীরে
ক্লান্ত শিঙা বেজে বেজে হোক হয়রাণ
অজ্ঞাতবাসের কাল ফুরোয় ফুরাক,
শোনে না, শোনে না তবু ফেরার আহ্বা
যেন সূর্য-সেনা;
ফেরারী ফৌজ যেন কখনো ফেরে না।

ডেকো না তাদের।
জয় হোক অনাদ্যন্ত অমর সূর্যের।
জয় হোক লোকে লোকে অজর রুদ্রের।
চারদিকে চিরভোর হোক। *

* প্রেমেন্দ্র মিত্র'র 'ফেরারী ফৌজ' পা

আত্মহা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রলয়ের মেঘে ঘন কালো ক্রন্দসী,
ত্রস্ত-প্রাণীরা পথে ঘরে নিরুপায়—
ছায়াবীথিতলে ঝলকায় কত অসি
চকিত দীপ্ত অশনি-বহ্নি প্রায়।

গৃহ-অরণ্য এই দেখি একাকার,
আবর্ত আনে দিগন্তে আলোড়ন—
মানুষ-শ্বাপদ চেনা যেন গুরুভার,
মারণ-যজ্ঞ ডেকেছে আত্মহন্।

ধরিত্রী দেহ আবার গর্ভবতী?
প্রসব-ব্যথার এমন পূর্বাভাষ?
চরম ক্ষয়ের পরম আত্মরতি—
ঘনায় জীবনে গভীর সর্বনাশ।

নবসৃষ্টির শিশু যদি আজ আসে
প্রবীণ পৃথিবী দেবে কোন্ দায়ভাগ?
কোন্ কুসুমের সুরভিত আশ্বাসে
মুকুলিত হ'বে প্রদীপ্ত অনুরাগ?

উজ্জ্বল প্রেম জ্বলে-পুড়ে ছাই হবে,
নবসৃষ্টির শিশু হ'বে হাড়সার—
কঙ্কালে তার প্রবীণেরা কথা কবে,
ভোঁতা হয়ে যাবে তরুণ প্রাণের ধার।

ক্রন্দসী শুধু বিদ্যুৎ বিদ্রূপে
ছড়াবে প্রলয় অন্ধ অবনীকূপে।

শরতের এক শান্ত প্রভাতে নন্দরাম জেল থেকে খালাস পেল। জেলখানার নীচেই নদী, ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গা। নদীর ধারে একটা শান বাঁধান জায়গায় নন্দরাম বসল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে কারামুক্তি,—নন্দরাম পিছন ফিরে তাকাল। লম্বা একটানা চলে গেছে কারাগৃহের সুউচ্চ প্রাকারশ্রেণী, চোখে পড়ে শুধু দোতলার সেলের গবাক্ষ আর গেটে প্রহরারত সঙ্গীনধারী মূর্তি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার নদীর দিকে চোখ ফেরাল নন্দরাম।

জলরাশি ছুটে চলেছে উন্মত্তের মত। স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে একখানা পালতোলা নৌকা। ওপারে ছায়াচ্ছন্ন গ্রামখানি অস্পষ্ট দেখাচ্ছে, একটা ঝুঁকেপড়া বটগাছের ডাল জলের উপরে লুটিয়ে পড়েছে। এপারে বাঁধের উপর প্রাতর্ভ্রমণ সমাপন করে বাড়ি ফিরছেন বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ের দল। বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া গৃহিণীরা আসর জমিয়েছেন স্নানের ঘাটে। ধরিত্রী এক নূতন রূপে ধরা দিল নন্দরামের চোখের সামনে।

জেলখানার পেটা ঘড়িতে এগারটা বাজল। চমকে দাঁড়াল নন্দরাম। কয়েদীদের মাটি কাটার কাজ শেষ হল এতক্ষণ। বাকী আছে পুকুর থেকে জল ছেঁচে বাগানে ছড়িয়ে দেওয়া। তারপর ঘর্মাক্ত পিরাণটা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সকলে পুকুরের জলে। স্নানের শেষে সানকি-ভরা লপসি আর ওয়ার্ডারদের ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কার,—অজানিতে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল নন্দরাম। পাঁচ বৎসর পরে মুক্তির আনন্দ তার একান্ত বেসুরো মনে হতে লাগল। কারাগারের শৃঙ্খলিত জীবনই আজ হয়ে উঠল পরম কাম্য। এই সুন্দর শান্ত ধরণীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আর, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রয়েছে তার দরদী বন্ধু খোকা আর কেষ্টো।

দীর্ঘমেয়াদী কয়েদী দুজনেই, খুন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। খুনী কয়েদীদের আভিজাত্য জ্ঞান প্রচুর, সাধারণ কয়েদীদের এড়িয়ে চলে তারা। তাই নন্দরামের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হওয়ার একটা ইতিহাস আছে।

নারীঘটিত ব্যাপারে নন্দরামের কারাদণ্ড হল। কারাগারের অতিথিদের হিসাবমত তার স্থান সর্বনিম্ন শ্রেণীতে, কিন্তু নন্দরামের সুশ্রী চেহারা সব ওলটপালট করে দিল। খোকা ও কেষ্টো তখন নিঃসঙ্গ কারাবাস করছে সাত বৎসর, নন্দরামকে তারা লুফে নিল। শ্রেণী বৈষম্যের এই লজ্জাহীন উৎখাতে ক্ষুব্ধ হলেও অন্যান্য কয়েদীরা বিরাগ প্রদর্শন করতে সাহস করল না।

মুক্তির দিন নদীতীরে দাঁড়িয়ে পুরাতন সব কাহিনী স্মরণ করতে লাগল নন্দরাম। পিতা-[illegible] বাড়ি, প্রায় ধ্বংসস্তূপে [illegible] ঘরে সে আর বিধবা মা। [illegible] আবহাওয়া কিরকম [illegible] নন্দরামের। সমুন্নত বন-শ্রেণী, [illegible], দীঘির কাল জল, [illegible] নিয়ে যেত অজানা শূন্য [illegible] অজ্ঞাত আকুলি বিকুলিতে [illegible]। কণ্টকাকীর্ণ ঝোপের [illegible] তার কেটে যেত সুখশয্যায়, [illegible] জলে সে পা ডুবিয়ে বসে [illegible]।

[illegible] সবাই তার মার কাছে অনু-[illegible] নানাবিধ। গ্রামের বৌঝিরা জল আনতে পারে না, কিরকম বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থাকে তোমার ছেলে। মায়ের অশ্রুসিক্ত তিরস্কার বর্ষণ হত,—বংশের দোষ যাবে কোথায়। কর্তাদের ধারা পেয়েছিস তুই। প্রতিবেশীদের নালিশ আর মায়ের তিরস্কার মস্ত একটা বিস্ময় মনে হত নন্দরামের। কোথায় এর উৎপত্তি আর কিই বা এর কারণ, সে বুঝে উঠতে পারল না অনেক চেষ্টা করেও।

একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল অত্যন্ত আকস্মিক ও রহস্যজনক ভাবে। দীঘির জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে নন্দরাম। নরম শেওলার স্পর্শে পায়ের শিরায় জেগেছে চাঞ্চল্য, ঠাণ্ডা জলে রক্তে উঠেছে পুলকের বন্যা। দীঘির ওপারে ঘনায়মান বনরাজি, সূর্যকিরণে ঝকমক করছে। তাদের ব্যাকুল হাতছানি নন্দরাম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সে, বনের ডাক শুনতে পেয়েছে। কিন্তু চোখের অথবা মনের ভুল হয়েছিল তার। ঘনায়মান বনরাজি নয়, বনান্তরালে দাঁড়িয়েছিল একদল মেয়ে, ভিন-গাঁয়ের; চড়কের মেলা দেখতে আসছিল। হাতছানিটা মনের ভুল।

তার পরের সব ঘটনা নন্দরামের ভাল মনে নেই আজ। বিচারের সময় প্রকাশ পেল, একটি মেয়ের সামনে হিংস্রভাবে দাঁড়িয়েছিল সে। তার মতলব যে সাধু নয়, একথা বলাই বাহুল্য। বিচারে আরও প্রকাশ পেল তার পিতৃবংশের কীর্তিকলাপ।

সাতসাগরের ডাক

গোবিন্দ চক্রবর্তী

সাত সাগরের তীরে
যদিও বেজেছে শিঙা ফেরাবার ডাকে
সূর্য-সেনাদের
আজো যারা সীমান্তে ফেরার;
যদিও পড়েছে রোদ কোনো কোনো বাঁকে
মহাপৃথিবীর,
দুর্গের দুর্গমে আর
ধ্বসে গেছে কোথা কোথা রাত্রির প্রাচীর—
তবু যেন তারা আর
কভু ফেরে নাক!

অনেক যুগান্ত চ'লে যাবে—
পৃথিবী দিগন্তে আরো শুভ্র বেলা পাবে,
স্বচ্ছ হবে আরো এ সময়,
রৌদ্র হবে তীব্র জ্যোতির্ময়,
মেলে নাক তবু যেন তাদের সন্ধান।

তাহারা হারাক
অবলীন কুয়াসার পাঁজরে পাঁজরে!

সূর্য-সুত সূর্য-সেনা
সূর্য-লগ্ন খুঁজে যাক মৌন চিরকাল।
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে,
কাশের প্রান্তরে,
কেবল টহল দিক অম্বরে অম্বরে
অনন্তের অন্তহীনে
তুরঙ্গ-সওয়ার!

তাদের অজেয় অভিযান
দৃঢ়, দৃপ্ত হোক।
শূন্য হ'তে মহাশূন্যে
শূন্যহীনতায় ঃ
তারা যেন অবিরাম ঊর্ধ্বে উঠে যায়—

স্বপ্নাতীত নক্ষত্রেরো ধ্যানাতীত তীরে
ছিঁড়ে যায় ছিন্ন ভিন্ন অন্তিম তিমিরেঃ
রাত্রির সমস্ত শিল্প করে বিনিঃশেষ!

সাত সাগরের তীরে
ক্লান্ত শিঙা বেজে বেজে হোক হয়রান—
অজ্ঞাতবাসের কাল ফুরায় ফুরাক,
শোনে না, শোনে না তবু ফেরার আহ্বান
যেন সূর্য-সেনা;
ফেরারী ফৌজ যেন কখনো ফেরে না।

ডেকো না তাদের।
জয় হোক অনাদান্ত অমর সূর্যের।
জয় হোক লোকে লোকে অজর রুদ্রের।
চারদিকে চিরভোর হোক। *

---

* প্রেমেন্দ্র মিত্র'র 'ফেরারী ফৌজ' পাঠে

আত্মহা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রলয়ের মেঘে ঘন কালো ক্রন্দসী,
ত্রস্ত-প্রাণীরা পথে ঘরে নিরুপায়—
ছায়াবীথিতলে ঝলকায় কত অসি
চকিত দীপ্ত অশনি-বহ্নি প্রায়।

গৃহ-অরণ্য এই দেখি একাকার,
আবর্ত আনে দিগন্তে আলোড়ন—
মানুষ-শ্বাপদ চেনা যেন গুরুভার,
মারণ-যজ্ঞ ডেকেছে আত্মহন্।

ধরিত্রী দেহ আবার গর্ভবতী?
প্রসব-ব্যথার এমন পূর্বাভাষ?
চরম ক্ষয়ের পরম আত্মরতি—
ঘনায় জীবনে গভীর সর্বনাশ।

নবসৃষ্টির শিশু যদি আজ আসে
প্রবীণ পৃথিবী দেবে কোন্ দায়ভাগ?
কোন্ কুসুমের সুরভিত আশ্বাসে
মুকুলিত হ'বে প্রদীপ্ত অনুরাগ?

উজ্জ্বল প্রেম জ্বলে-পুড়ে ছাই হবে,
নবসৃষ্টির শিশু হ'বে হাড়সার—
কঙ্কালে তার প্রবীণেরা কথা কবে,
ভোঁতা হয়ে যাবে তরুণ প্রাণের ধার।

ক্রন্দসী শুধু বিদ্যুৎ বিদ্রূপে
ছড়াবে প্রলয় অন্ধ অবনীকূপে।

প্রতিশোধ

অমর সান্যাল

শরতের এক শান্ত প্রভাতে নন্দরাম জেল থেকে খালাস পেল। জেলখানার নীচেই নদী,—ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গা। নদীর ধারে একটা শান বাঁধান জায়গায় নন্দরাম বসল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে কারামুক্তি,—নন্দরাম পিছন ফিরে তাকাল। লম্বা একটানা চলে গেছে কারা-গৃহের সুউচ্চ প্রাকারশ্রেণী, চোখে পড়ে শুধু দোতলার সেলের গবাক্ষ আর গেটে প্রহরারত সঙ্গীনধারী মূর্তি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার নদীর দিকে চোখ ফেরাল নন্দরাম।

জলরাশি ছুটে চলেছে উন্মত্তের মত। স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে একখানা পালতোলা নৌকা। ওপারে ছায়াচ্ছন্ন গ্রামখানি অস্পষ্ট দেখাচ্ছে, একটা ঝুঁকেপড়া বটগাছের ডাল জলের উপরে লুটিয়ে পড়েছে। এপারে বাঁধের উপর প্রাতর্ভ্রমণ সমাপন করে বাড়ি ফিরছেন বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ের দল। বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া গৃহিণীরা আসর জমিয়েছেন স্নানের ঘাটে। ধরিত্রী এক নূতন রূপে ধরা দিল নন্দরামের চোখের সামনে।

জেলখানার পেটা ঘড়িতে এগারটা বাজল। চমকে দাঁড়াল নন্দরাম। কয়েদীদের মাটি-কাটার কাজ শেষ হল এতক্ষণ। বাকী আছে পুকুর থেকে জল ছেঁচে বাগানে ছড়িয়ে দেওয়া। তার-পর ঘর্মাক্ত পিরাণটা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সকলে পুকুরের জলে। স্নানের শেষে সানকি-ভরা লপসি আর ওয়ার্ডারদের ক্ষণে ক্ষণে হুংকার,—অজানিতে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল নন্দরাম। পাঁচ বৎসর পরে মুক্তির আনন্দ তার একান্ত বেসুরো মনে হতে লাগল। কারাগারের শৃঙ্খলিত জীবনই আজ হয়ে উঠল পরম কাম্য। এই সুন্দর শান্ত ধরণীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আর, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রয়েছে তার দরদী বন্ধু খোকা আর কেষ্টো।

দীর্ঘমেয়াদী কয়েদী দুজনেই. খুন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। খুনী কয়েদীদের আভিজাত্য জ্ঞান প্রচুর, সাধারণ কয়েদীদের এড়িয়ে চলে তারা। তাই নন্দরামের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হওয়ার একটা ইতিহাস আছে।

নারীঘটিত ব্যাপারে নন্দরামের কারাদণ্ড হল। কারাগারের অতিথিদের হিসাবমত তার স্থান সর্বনিম্ন শ্রেণীতে, কিন্তু নন্দরামের সুশ্রী চেহারা সব ওলটপালট করে দিল। খোকা ও কেষ্টো তখন নিঃসঙ্গ কারাবাস করছে সাত বৎসর, নন্দরামকে তারা লুফে নিল। শ্রেণী বৈষম্যের এই লজ্জাহীন উৎখাতে ক্ষুব্ধ হলেও অন্যান্য কয়েদীরা বিরাগ প্রদর্শন করতে সাহস করল না।

মুক্তির দিন নদীতীরে দাঁড়িয়ে পুরাতন সব কাহিনী স্মরণ করতে লাগল নন্দরাম। পিতা-মহের আমলের প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত। দুখানি ঘরে সে আর বিধবা মা। ছেলেবেলা থেকেই গ্রামের আবহাওয়া কিরকম রহস্যময় মনে হত নন্দরামের। সমুন্নত বন-শ্রেণী, নিবিড় ঝোপঝাড়, দীঘির কাল জল, —তার মনকে উড়িয়ে নিয়ে যেত অজানা শূন্য পথে। কি একটা অজ্ঞাত আকুলি বিকুলিতে চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠত। কণ্টকাকীর্ণ ঝোপের উপরে সারা দুপুর তার কেটে যেত সুখশয্যায়, শেওলাভরা দীঘির জলে সে পা ডুবিয়ে বসে থাকত।

কিছুদিনের মধ্যেই তার মার কাছে অনু-যোগ আসতে লাগল নানাবিধ। গ্রামের বৌঝিরা জল আনতে পারে না, কিরকম বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থাকে তোমার ছেলে। মায়ের অশ্রুসিক্ত তিরস্কার বর্ষণ হত,—বংশের দোষ যাবে কোথায়। কর্তাদের ধারা পেয়েছিস তুই। প্রতি-বেশীদের নালিশ আর মায়ের তিরস্কার মস্ত একটা বিস্ময় মনে হত নন্দরামের। কোথায় এর উৎপত্তি আর কিই বা এর কারণ, সে বুঝে উঠতে পারল না অনেক চেষ্টা করেও।

একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল অত্যন্ত আকস্মিক ও রহস্যজনক ভাবে। দীঘির জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে নন্দরাম। নরম শেওলার স্পর্শে পায়ের শিরায় জেগেছে চাঞ্চল্য, ঠাণ্ডা জলে রক্তে উঠেছে পুলকের বন্যা। দীঘির ওপারে ঘনায়মান বনরাজি, সূর্যকিরণে ঝকমক করছে। তাদের ব্যাকুল হাতছানি নন্দরাম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সে, বনের ডাক শুনতে পেয়েছে। কিন্তু চোখের অথবা মনের ভুল হয়েছিল তার। ঘনায়মান বনরাজি নয়, বনান্তরালে দাঁড়িয়েছিল একদল মেয়ে, ভিন-গাঁয়ের; চড়কের মেলা দেখতে আসছিল। হাত-ছানিটা মনের ভুল।

তার পরের সব ঘটনা নন্দরামের ভাল মনে নেই আজ। বিচারের সময় প্রকাশ পেল, একটি মেয়ের সামনে হিংস্রভাবে দাঁড়িয়েছিল সে তার মতলব যে সাধু নয়, একথা বলাই বাহুল্য বিচারে আরও প্রকাশ পেল তার পিতৃবংশের কীর্তিকলাপ।

নন্দরামের চিন্তার ধারা সহসা দিক পরিবর্তন করল।

বহু বিস্তৃত তাদের বংশ পরিচয়। তার পিতামহ বংশের স্বনামধন্য পুরুষ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যে কটি মহাপুরুষ স্বদেশবাসীর শ্মশানশয্যার বিনিময়ে রাতারাতি জমিদার হয়ে বসেছিলেন, ইনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর সে-যুগের সাহেবীয়ানা একালেও বিস্ময়ের মনে হয়। নীলকুঠির মালিক রবার্টস ছিল তাঁর প্রাণের বন্ধু, এবং জনশ্রুতি আছে এই রবার্টসকে তিনি স্বহস্তে গুলী করেন। ফলে লাভ হয় তাঁর নীলকুঠির অট্টালিকা ও বিবি রবার্টস। বিবি রবার্টসের মৃত্যুর পর তার দেহ সৎকার হল হিন্দুমতে। পুরোহিতদের প্রবল আপত্তি নন্দরামের পিতামহের অর্থের জোরে খণ্ডন হয়ে গেল।

নন্দরামের পিতারা চার ভাই। চারজনই পিতার আদর্শ ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নীলকুঠি চারভাগে বিভক্ত হল। ব্যারাক প্যাটার্নের বাড়ি, ভাগ করার বিশেষ অসুবিধা হল না। বড় ও মেজভাই প্রকাশ্যভাবে রক্ষিতা রাখলেন বাড়িতে। মদ্যপান ও বাইজীর নাচ তাঁদের অলস জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল।

সেজভাই ছিলেন বাপের প্রিয়পুত্র। রবার্টসের হত্যার দিন তাঁর জন্ম, কাজেই বাপের সৌভাগ্যের মূলে তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর নামটাও পিতার দেওয়া, এবং একমাত্র তাঁরই পিতার সম্মুখে মদ্যপান করবার সাহস হয়েছিল। পিতার মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ মুখে গঙ্গাজল দিচ্ছেন, কোথা থেকে সেজভাই এসে হাজির; বললেন,- দাদা, বাবার অপমান করো না, গঙ্গাজল মুখে দিয়ে ওঁর শেষযাত্রাপথ কলঙ্কিত করো না। এই বলে হুইস্কির বোতল নিঃশেষে উপুড় করে দিলেন পিতার মুখে। মৃত্যুপথযাত্রীর স্তিমিত নেত্র বিস্ফারিত হয়ে উঠল। চোখ মেলে দেখলেন সম্মুখে প্রিয় তৃতীয় পুত্র। হস্ত প্রসারিত করে তাকে আলিঙ্গন করবার চেষ্টা করলেন, তারপরই সব শেষ।

ছোটভাই পিতার জীবদ্দশাতেই তান্ত্রিক-ভাবাপন্ন হয়ে উঠেন। স্বজনবর্গের বিস্তর উপরোধ ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কৌমার্য ভঙ্গ করলেন না বটে, কিন্তু কামিনীকাঞ্চনের প্রতি মোহ তাঁর উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথেই অগ্রসর হয়ে চলল। পঞ্চমকারের সাধনার দমক আত্মীয়স্বজনের কাছেও তাঁকে ভীতিপ্রদ করে তুলল, এবং নানারূপ গুজব ছড়িয়ে পড়ল তাঁকে কেন্দ্র করে। গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে বিভাকে একদিন সন্ধ্যার পর থেকে পাওয়া গেল না। জমিদার ও বিচারক হিসাবে বড়ভাই সুশান্তর কাছে খবর এল, কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টা ও অনুসন্ধান বিফল হল। পরদিন বিভাকে পাওয়া গেল মৃত

একটি মেয়ের সামনে হিংস্রভাবে দাঁড়িয়েছিল

অবস্থায়। তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, বার বছরের মেয়ে বিভাকে কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে দৈহিক উপভোগের পর। থানা পুলিশ হল, সকলের সন্দেহ পড়ল কনিষ্ঠ সুকান্তর উপর, কিন্তু প্রমাণ জুটল না একটিও।

এদিকে সুকান্তর লীলাখেলার দিন ঘনিয়ে এসেছিল। কোন্ এক কুক্ষণে তার নজর পড়ল সেজভাই প্রশান্তর রক্ষিতা পদ্মমণির উপর। বেচারা পদ্মমণি পা দিল ছোটবাবুর ফাঁদে। খবর পৌঁছল প্রশান্তর কাছে। তাঁর তখন অবসর নেই, নূতন একদল বাইজী এসেছে! যাহোক কিছুদিন পরে পদ্মমণি নিখোঁজ হল। ইদানীং সুকান্তর চ্যালেঞ্জে পুলিশ চালাক হয়ে উঠেছিল। তারা পদ্মমণিকে বার করল এক কদমগাছতলায় মাটির নীচে ধ্বস্তাবস্থা। লাস ও সুকান্ত একসঙ্গে চালান হল সদরে। বিচারে প্রকাশ পেল, সুকান্ত ও পদ্মমণি কদমতলায় রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা অনুষ্ঠান করে ও তারপর কৃষ্ণ স্বহস্তে রাধার গলদেশ কর্তন করে। বিচারশেষে সুকান্ত চলে গেল আন্দামানে নূতন জীবনের গোড়াপত্তন করতে, প্রশান্ত ও সেজভাই নীলকান্ত বংশের অপমানে নেশার ঝোঁকে একদিন আত্মহত্যা করে বসলেন ও নিঃসন্তান ভ্রাতাদের সম্পত্তি সুশান্তর দখলে এল।

কনিষ্ঠদের গৌরবে সুশান্ত অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে ছিলেন এতদিন। সুপ্ত সিংহ এইবার জেগে উঠল। বিক্রমে নীলকুঠি ও তার করে একটা ওয়েলার ঘোড়া আমদানী হল। চতুঃসীমা উঠল কেঁপে। অনেক টাকা খরচ সাড়ে ছ'ফুট লম্বা বলিষ্ঠ দেহ সুশান্ত ওয়েলার পৃষ্ঠে সমাসীন হয়ে তাঁর অনুজদের কাবেলী আভিজাত্যকেও টেক্কা দিয়ে বসলেন। বিশ মাইল দূরে আর এক কুঠিয়াল সাহেবকে কুঠিছাড়া করে তাঁর স্বদেশীয়ানার অভিমানও তৃপ্ত হল।

কিন্তু সুশান্ত মহাজন পাকা ভুলে গিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনলেন। নারীমাংসের লোভ তাঁকে পেয়ে বসল। মেজভাই প্রশান্তর পন্থা তিনি অনুসরণ করলেন না, নজর পড়ল প্রতিবেশী চৌধুরীদের বিধবা ভ্রাতৃবধূর উপর। চৌধুরীরা উগ্র ক্ষত্রিয়, তাদের বড়কর্তা দৈহিক শক্তি ও মেজাজের উগ্রতায় সুশান্তর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। বিচারের ভার তিনি নিজের হাতে নিলেন ও একদিন রাতারাতি সদলবলে নীলকুঠি আক্রমণ করে বসলেন। চৌধুরী কর্তার ক্রুদ্ধ তরবারির আঘাতে সুশান্তর জীবনান্ত হল বিরামশয্যার একপ্রান্তে, তাঁর স্ত্রী মাধবী নাবালক শিশুকে নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। শূন্যমার্গে রবার্টসের আত্মা বোধহয় সেদিন তৃপ্ত হল!

—অভিশপ্ত পিতৃবংশ! সে কি বংশের প্রায়শ্চিত্ত করছে? এই ত শুরু হয়েছে, পথচলা এখনও অনেক বাকী! নন্দরাম শিউরে উঠল।

গ্রামে সাড়া পড়ে গেল: নীলকুঠির মালিক ফিরে এসেছে। কৃত্রিম অভ্যর্থনা হল প্রতিবেশীদের তরফ থেকে, মাতব্বরেরা দূর থেকে খোঁজ নিয়ে গেল। চারিদিকে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব. লম্পট নন্দরাম জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে।

গ্রামের আবহাওয়া নন্দরামকে বিস্মিত করল। পাঁচ বৎসরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেলা দশটা না বাজতেই পথঘাট প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। ছেলেবুড়ো সকলেই ছোটে শহরের দিকে উপার্জনের নেশায়। বৃক্ষ অভিমানে নীরবে প্রতীক্ষা করে গ্রামের মাঠ, তরুশাখে আর শিহরণ জাগে না পূর্বেকার মত, দীঘির কাল জলে দেখা দিয়েছে ঈষৎ সবুজের আভাস।

পরিবর্তন হয়নি শুধু তার মা মাধবীর আর নীলকুঠির। ইটের স্তূপ পাঁচ বৎসর আগেকার মতই সাজান রয়েছে, অশ্বত্থগাছের চারাটা বড় হয়েছে অনেক, হলঘরের ছাদের একটা দিক সেইরকম ঝুলে রয়েছে।

মাধবী বললেন,—আর নয়, তোর সঙ্গেই এ বংশের শেষ হয়ে যাক। ও বাড়ির গিন্নী আজ বলছিলেন, বিয়ে দাও ছেলে শুধরে যাবে।

মুচকে হাসল নন্দরাম, মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে একটুও মতভেদ নেই তার। কিন্তু যারা যাবার তারা ত চলে গেছে জীবনকে নিঃশেষে উপভোগ করে। এ সংসারে থেকে গেল যে, সেকি কাল কাটাবে দুঃসহ তপশ্চর্যায়? মায়ের দিকে তাকাল সে, কী কঠোর তাঁর মুখের ভঙ্গী। তার শৈশবে কোমল মাধুর্যে বিকশিত ছিল এই মায়েরই মুখ, খালি কাঁদতেন তিনি তখন। তবে কি বৈধব্যজীবনের তাপসবৃত্তি তাঁকে সংসারের প্রতি নির্মম করে তুলেছে? কি একটা অজানা আশঙ্কায় নন্দরাম ব্যাকুল হয়ে উঠল।

তার পিতার হত্যাকারী চৌধুরীকর্তা এখনও বেঁচে, একদিন ডেকে পাঠালেন নন্দরামকে। পিঠ চাপড়ে বললেন,—যা হবার হয়ে গেছে। একটু সাবধানে থেকো বাপু, গাঁয়ের কোন মেয়ের অপমান হলে আমি কিন্তু সহ্য করব না।

নন্দরাম বেপরোয়াভাবে তাকাল কর্তার দিকে। কর্তার মুখে বিদ্রূপের হাসি, চোখের কোণে দম্ভ। নন্দরাম নিঃশব্দে প্রস্থান করল।

সেদিন দুপুরবেলা মাধবী ডেকে পাঠালেন তাকে। বললেন,—সব শুনেছি আমি। চৌধুরীকেও একটুও দোষ দিইনে, কিন্তু সে তোমার পিতৃহন্তা এইটুকু মনে রেখো।

মাধবীর ঘরে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া একটা বন্দুক। চুপি চুপি বললেন,—প্রতিশোধ নিতে চাও তো ওই রয়েছে। তবে এই বন্দুকও অভিশপ্ত, তোমার পিতামহ রবার্টসের হত্যাকাণ্ডে প্রথম এর সদ্ব্যবহার করেন।

বৈকালবেলা দীঘির ঘাটে বসে মাধবীর কথাই মনে মনে আলোচনা করছিল নন্দরাম। অস্তগামী সূর্য তরুবীথিকার অন্তরালে ঢাকা পড়েছে, গাছের তলা অন্ধকার হয়ে এল, দীঘির জলে কিছুই দেখা যায় না আর। নন্দরাম বিচার করে দেখল, তার মায়ের ভিতর দিকটাও যেন অতলস্পর্শী অন্ধকারে চাপা পড়েছে। মন আর নূতন কিছু গ্রহণ করতে পারছে না, মাধবীর বক্তব্য কিনারায় এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

সেদিনের কথা মনে পড়ল, যেদিন তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছিল। দোষ মনের নয়, প্রাকৃতিক পারিবেষ্টনী তার চিত্ত চঞ্চল করে তুলেছিল। চড়কের মেলায় ভিনগাঁয়ের মেয়েরা প্রতি বৎসরই আসে, মুক্ত হাসি আর উচ্ছ্বসিত কলরোলে দীঘির পাড় পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু সেদিন কোন্ এক অজানা নেশা তাকে বিহ্বল করে তুলেছিল কে জানে! একি শুধু বংশের ধারা না আর কিছু? নারীর প্রতি আকর্ষণ পিতৃপিতামহের শোণিতে সৃজন করে এসেছে উন্মত্ত তুফান, তার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে সেই শোণিতেরই কণা। বংশের দোষ একেবারে অস্বীকার করা যায় না!

তার অপরাধ কি নারকীয় পর্যায়ভুক্ত?

কারা এসে দাঁড়িয়েছে তাকে ঘিরে

আদালতে বিচারক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন,—মেয়েদের স্পর্শ করবার চেষ্টা তুমি কেন করেছিলে? উত্তর সে দিতে পারেনি। কারণ সে নিজেই তা জানে না, আর জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবও নয়। তার পূর্বপুরুষেরা নারীকে দেখেছিলেন কামনার সামগ্রীরূপে, এবং তাঁদের পরিণামও হয় ভয়াবহ। রমণীর রমণীয় মূর্তি সে দেখেছে আকাশচুম্বী বনস্পতির হরিৎ পত্রে, গোধূলির বিষণ্ণ আলোয়, প্রান্তরের শ্যামশস্য হিল্লোলে। এ কি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে?

রাত্রে বিনিদ্র অবস্থায় মাধবীর কথা বিচার করে দেখবার অবকাশ পেল নন্দরাম। অদ্ভুত লোক তার এই মা! মাত্র আঠার বৎসরে জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে চল্লিশের গোড়ায় এসে পৌঁছেছেন। অলঙ্কারশূন্য দেহ, থান কাপড় পরা, মাথার চুল খাট করে ছাঁটা। জীবনের একমাত্র বিলাস পূজো আহ্নিক ব্রত উপবাস, যেন এর মধ্যেই তাঁর বেঁচে থাকার সার্থকতা। আজ দুপুরে মায়ের নূতন রূপের পরিচয় পেয়েছে নন্দরাম; সুশান্তর হত্যাকারীকে ভুলে যান নি তিনি, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করছেন।

এতদিন পরে প্রতিশোধ গ্রহণের তাৎপর্য নন্দরাম ঠিক বুঝে উঠতে পারল না; স্বামী-হন্তার উপযুক্ত শাস্তিতে মাধবীর চিত্তদাহ হয়ত কথঞ্চিৎ প্রশমিত হবে, আর তাকে আত্মগোপন করতে হবে কারাপ্রাকারের অন্তরালে। নন্দরাম হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বিছানায় বসল। ঠিক হয়েছে! তার মত সমাজবহির্ভূত জীবের কারাগারই উপযুক্ত স্থান। দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর কয়েদীরা এখন বিশ্রাম লাভ করছে প্রগাঢ় সুপ্তির কোলে। কারারক্ষীরা ঘুমে কাতর, ক্ষণিক শিথিলতা এসেছে তাদের কর্তব্যের মধ্যে। বাহিরের জগৎ তাদের কাছে একটা দুঃস্বপ্নের বেশ পরিগ্রহ করেছে।

বিছানা থেকে মেঝেয় লাফিয়ে পড়ল নন্দরাম। দেওয়ালে টাঙ্গান আয়নায় ছায়া পড়েছে,—লম্বা সুকুমার দেহ, প্রথম যৌবনের সকল চিহ্ন অঙ্গে অঙ্গে নিষিক্ত। কারাগারের বন্দু কেস্ট ও খোকার কথা মনে হল নন্দরামের, মৃদু হেসে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে গ্রামের পথে চলেছে একটিমাত্র পথিক। অচঞ্চল তার গতি, হাতে পুরোনো ধরণের বন্দুক। পথচলতি পথিক চাইল আকাশের দিকে, সেখানে বসে গেছে কালপুরুষ ও সপ্তর্ষির প্রহরা। ছেলেবেলায় শোনা একটা গল্প মনে পড়ল তার,—মানুষের মনের নিত্যকার খবর রাখে এই কালপুরুষ, রজনীতে তার আবির্ভাব হয় বিপথগামী মানুষকে পথ-নির্দেশ করতে। কী ঝকমক করছে আজকের রাতে এই কালপুরুষ, তুলনায় সপ্তর্ষি অনেকটা নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। তারই দিকে যেন তাকিয়ে আছে শূন্যমার্গের এই অস্ত্রধারী পুরুষ!

সুস্পষ্ট একটা আহ্বানধ্বনি সহসা তার কানে বাজল,—নন্দরাম! বাড়ি ফিরে চল! এই গভীর রাত্রে চৌধুরীকে পাবে না তুমি, বাড়ি ফিরে যাও!

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নন্দরাম সেখানেই বসে পড়ল। কালপুরুষের ডাক, অমান্য করবার শক্তি তার নেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, দীঘির ধারে পথের উপর সে বসে আছে, বন্দুকটা কখন হাত থেকে খসে পড়েছে। কী অসহ্য অন্ধকার, হাওয়া আলো যেন চিরকালের মত মরে গেছে। সুপ্ত জগতে নীরব দর্শক শুধু নন্দরাম আর শূন্যে কালপুরুষ।

একটা চাঞ্চল্য কিন্তু সে ক্ষণকালের মধ্যে অনুভব করতে লাগল। কারা এসে দাঁড়িয়েছে তাকে ঘিরে। অস্ফুট গুঞ্জন মনের পরতে পরতে

বাদ্যযন্ত্র তৈরী করতেও ইস্পাতের তার ব্যবহৃত হয়

লোহা এবং ইস্পাত ব্যতীত আধুনিক সভ্যতা অচল। সালফিউরিক অ্যাসিড এবং লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন ও ব্যবহার দেখে দেশের শিল্প কতদূর উন্নত তা বোঝা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশী ইস্পাত উৎপন্ন হয়, বৎসরে ছয় কোটি ষাট লক্ষ টন, ইয়োরোপে আট কোটি দশ লক্ষ টন, রাশিয়াতে দু' কোটি কুড়ি লক্ষ টন এবং ইংলণ্ডে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টন। আর ভারত, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্ত ইস্পাত উৎপাদন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টন। অথচ আমাদের এই ভারতেই রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম লোহা ও ইস্পাত নির্মাণের কারখানা।

ভারতবর্ষে টাটার লৌহ কারখানা ব্যতীত বাঙলা দেশে দুইটি লৌহ কারখানা আছে, একটি বার্নপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী, অপরটি কুলটীতে বেঙ্গল আয়রন কোম্পানী। এদের অবশ্য কাঁচা মালের জন্য বিহারের উপর নির্ভর করতে হয়। চতুর্থ কারখানাটি আছে মহীশূরের ভদ্রাবতীতে, তার নাম মাইসোর আয়রন ওয়ার্কস্। ভারতবর্ষে লোহা ও ইস্পাত নির্মাণের কাঁচা মালের অভাব নেই, তথাপি কেন যে লৌহ শিল্পের প্রসার হয়নি তার কারণ এতদিন ছিল পরাধীনতা। বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে লোহা ও ইস্পাত এতদিন আমদানী করা হয়েছে; রপ্তানি করতে দেওয়া হয়েছে কম পরিমাণে। এখন যখন দেশ স্বাধীন হ'ল তখন লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহার বাড়বে, কারণ জাহাজ, মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন, রেল ইঞ্জিন আমাদের দেশেই তৈরী হবে। আর এ জন্য প্রচুর পরিমাণে লোহা ও ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। আর পুল রেল ও ট্রাম লাইন, তার ইত্যাদি তৈরী করতে যে পরিমাণ লোহা ও ইস্পাত বিদেশ থেকে আমদানী করা হ'ত তা ক্রমশ বন্ধ হ'বে। টাটার মত সাত আটটি বড় কারখানা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হ'তে বেশী সময় লাগবে না এমন আশা করা যেতে পারে।

খনি খুঁড়লেই যেমন কয়লা পাওয়া যায়, লোহা সেই রকম অবস্থায় পাওয়া যায় না। লোহা অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে থাকে, তা মাটির ওপরেও পাওয়া যায় অথবা খনি খুঁড়েও ওপরে তুলতে হয়। তার পর এই মিশ্রিত ধাতু থেকে কারখানায় লোহা নিষ্কাশন করতে হয়। যে পদার্থ থেকে লোহা নিষ্কাশন করা হয়, তার ইংরেজী নাম 'আয়রন ওর'; এই রকম 'কপার ওর', 'সিলভার ওর' ইত্যাদি এক এক ধাতুর এক বা ততোধিক প্রকার 'ওর' থাকতে পারে। লোহারও এই রকম
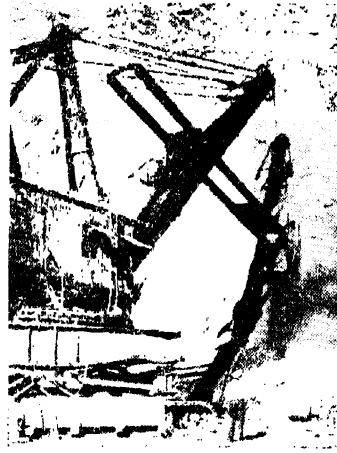
বিরাট যন্ত্র দ্বারা লোহার 'ওর' সংগ্রহ করা হচ্ছে

তিন চার প্রকার ওর আছে যথা,—হিমাটাইট, লাইমোনাইট, ম্যাগ্নেটাইট ও সাইডরাইড। হিমাটাইটের রং হ'ল লাল এবং আমাদের দেশে এইটিই সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। সিংভূম, ধলভূম, ময়ূরভঞ্জ, গুরুমৈসিনি ইত্যাদি অঞ্চলে হিমাটাইট পাওয়া যায়, তবে জামসেদপুরের কাছে বাদাম পাহাড়ে ম্যাগ্নেটাইট পাওয়া যায়। ম্যাগ্নেটাইট চুম্বকের মত লোহা আকর্ষণ করে। বিহারে যে লোহার 'ওর' পাওয়া যায় তা খনি খুঁড়ে তুলতে হয় না; তা মাটির ওপর মাটির স্তরের মতো অনেক ফিট পুরু এবং কয়েক বর্গ মাইল স্থানব্যাপী। ইংলণ্ডে কিন্তু খনি খুঁড়ে 'ওর' তুলতে হয়, সময় সময় ছয় শত ফিট গভীর গর্ত খুঁড়তে হয়।

লোহার 'ওর' যেখানে পাওয়া যায় তার কাছে কয়লা ও চুণা পাথর (লাইমস্টোন) পাওয়া গেলে কাজের বেশ সুবিধা হয়। লোহা, কয়লা আর চুণাপাথর যেন একই পরিবারভুক্ত। লোহা গালাতে গেলে অপর দুটি না হ'লে কাজ চলে না। কয়লা গালাতে গেলে খনি থেকে যে কাঁচা কয়লা তোলা হয় তা দিলে চলে না। কাঁচা কয়লার মধ্যে অনেক মূল্যবান পদার্থ লুকিয়ে থাকে। খোলা বাতাসে কয়লা জ্বালালে তার মূল্যবান পদার্থগুলি নষ্ট হয়ে যায়, অথচ লোহা গালাবার জন্য এই সব মূল্যবান পদার্থগুলি কাজে লাগে; সেজন্য কাঁচা কয়লা ব্যবহার করা যায় না। এই জন্য কাঁচা কয়লাকে 'কোক্-অভেন' নামক বায়ুহীন চুল্লীতে পুড়িয়ে কোক্ কয়লা তৈরী করে নেওয়া হয়। এই চুল্লীগুলি সিলিকার ইঁট দিয়ে তৈরী। এক একটি চুল্লী চল্লিশ ফিট লম্বা, পনেরো ফিট উঁচু, কিন্তু চাওড়া মাত্র দেড় ফিট। চুল্লীগুলিকে বাইরে থেকে উত্তপ্ত করবার ব্যবস্থা আছে। এই চুল্লীর মধ্যে কয়লা ভরে' ষোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা তাপ দেওয়া হয়। তারপর বৈদ্যুতিক একটি দণ্ডের সাহায্যে উত্তপ্ত, লাল কোক কয়লাকে চুল্লী থেকে বার করে' দেওয়া হয় এবং সেই উত্তপ্ত কয়লার ওপর জল ঢেলে তাদের ঠাণ্ডা করা হয়। চুল্লীর মধ্যে কয়লা যখন গরম হতে থাকে, সেই সময় যে সমস্ত গ্যাস নির্গত হয় সেগুলি পৃথক নল দিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করে' অনেক মূল্যবান জিনিস পাওয়া যায়, যেমন বেঞ্জল, টলুইন, আলকাতরা ইত্যাদি। আলকাতরা ত' রত্নগর্ভা, তা থেকে প্রসাধন সামগ্রী, ওষুধ, সার, রং থেকে আরম্ভ করে' প্রায় চারশ' রকমের বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায়।

পরিবারের তৃতীয় সভ্য চুণাপাথর অথবা লাইমস্টোন। চুণাপাথর ছাড়া লোহা গালানো

ঝোলা পুল তৈরী করতে হ'লে ইস্পাত নইলে চলে না

অসম্ভব। লোহার 'ওর' থেকে আসল লোহাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চুণাপাথর খুব প্রয়োজনীয়, আর লোহার 'ওর'কে বেশ ভাল করে সহজে গালিয়েও দিতে পারে চুণাপাথর। সবচেয়ে বড় কাজ যা চুণাপাথর করে তা হ'ল যে লোহার ওরে যে সকল দূষিত পদার্থ থাকে, সেগুলিকে চুণাপাথর পরিষ্কার করে দেয় এবং এই নিষ্প্রয়োজনীয় দূষিত পদার্থগুলি যাদের বলা হয় 'স্ল্যাগ' তারা লোহা গালাবার বিরাট চুল্লীতে, গলিত লোহার ওপর ভাসতে থাকে। এক কথায় চুণাপাথর লোহা গালাবার কাজটিকে বেশ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

লোহার কারখানার কথা বললে প্রথমেই মনে পড়ে সেই বিরাট চুল্লীর কথা, যার নাম ব্লাস্ট ফার্নেস। ব্লাস্ট ফার্নেসের সমতুল্য রাক্ষস খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। ইস্পাতের তৈরী আর ভেতরে ফায়ার ব্রিকের অস্ত্র দেওয়া. ৯০ ফিট উঁচু আর ২০ ফিট পর্যন্ত চওড়া এই ফার্নেসের প্রতি ২৪ ঘণ্টায় আহার লাগে ৮০০ টন 'ওর', ৪০০ টন কোক কয়লা আর ১০০ টন চুণাপাথর; তাছাড়া অনলে ইন্ধন জোগাবার জন্যও ১২০০ টন বাতাস। এই আহার জুটলে তবেই সে দেয় ৬০০ টন গলিত লোহা, ৬০০ টন স্ল্যাগ আর ১৪০০ টন গ্যাস। এই বিরাট চুল্লীর আহার লাগে নিরত, কিন্তু নিদ্রা নেই।

এই সমস্ত রসদ বিশেষ গাড়ী বা বাল্তি সাহায্যে ব্লাস্ট ফার্নেসের চূড়োয় অবিরত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ব্লাস্ট ফার্নেসে ঢালা হচ্ছে 'ওর', কোক ও লাইমস্টোন, ওজন করে। খাদ্য দেবার পর উত্তাপ প্রয়োগ করা হয়. উত্তাপ বড় ভীষণ ২০০০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত। এই উত্তাপ সহ্য করাবার জন্যই কয়লাকে 'কোক' করে নেওয়া হয়। এর ওপর আবার আলাদা নল দিয়ে ভেতরে গরম বাতাস চালানো হয়। এই ভীষণ গরমে লোহার 'ওর' গলে যায়; তলায় তরল লোহা জমা হ'তে থাকে, আর সেই তরল লোহার ওপর সরের মতো ভাসতে থাকে খাদ যার নাম 'স্ল্যাগ' অথবা ধাতুমল। এই ভীষণ গরম তরল লোহাকে বিরাট হাতা দিয়ে সংগ্রহ করা হয়। উত্তাপে আবার হাতা যাতে না গলে যায়, সেজন্য এর ভেতরেও ফায়ার ব্রিকের অস্ত্র দেওয়া থাকে। পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টা অন্তর এই তরল লোহা সংগ্রহ করা হয়।

'স্ল্যাগ'কেও আলাদা করে সংগ্রহ করা হয় এবং একে টুক্রো টুক্রো করে ভেঙে ফেলা হয় ও নানারকম কাজে লাগানো হয়, যথা— রেললাইনে খোয়ার মতো দেওয়া হয়, রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয় এবং কনক্রীট তৈরীর উপকরণ হিসেবে কাজে লাগানো হয়।

তরল লোহা যা সংগ্রহ করা হ'ল, তার নাম পিগ আয়রণ অথবা লৌহ-পিণ্ড। বহুদিন পূর্বে বেলজিয়ামে রাইন উপত্যকায় একপ্রকার চুল্লীতে লোহা গালানো হ'ত। গলিত লোহাকে একটি বড় ও কতকগুলি ছোট গর্তে সংগ্রহ করা হ'ত ঠিক যেন মাতা শূকর ও তার শাবকগুলি গর্তে আশ্রয় নিচ্ছে। এই থেকে "পিগ্ আয়রন" কথার উৎপত্তি। পিগ আয়রন থেকে তৈরী করা হয় 'কাস্ট' অথবা ঢালা লোহা আর ইস্পাত। ঢালা লোহার জন্য অল্পই রেখে সবটাই ইস্পাত করা হয়। ঢালা লোহা ভঙ্গুর। একে গালিয়ে ছাঁচে ফেলে রেলিং ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। ঢালা লোহা ও ইস্পাত ছাড়া আর একরকম যে লোহা তৈরী করা হয়, তার নাম 'রট' অথবা পেটা লোহা। পেটা লোহা ঢালা লোহার মতো ভঙ্গুর নয়। এ থেকে পাইপ, শিকল, তার বল্টু ইত্যাদি তৈরী করা যায়। এই লোহাকে পিটলে ভাঙে না।

ঢালা এবং পেটা লোহা অথবা ইস্পাতের পার্থক্য হ'ল এদের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ। ঢালা লোহাতে কার্বন থাকে সবচেয়ে বেশী, শতকরা দুই থেকে পাঁচ ভাগ, আর ইস্পাতে সবচেয়ে কম; শতকরা .২৫—১.৫ ভাগ পর্যন্ত। ঢালা লোহাতে এদের মাঝামাঝি কার্বন থাকে, .১২—.২৫% কার্বন ছাড়াও অবশ্য আরও অন্য খাদ থাকে।

পর্তুগীজ কথা 'এস্পাদা' বাঙলায় দাঁড়িয়েছে ইস্পাতে যেমন গ্লাস হয়েছে গেলাস। আমরা কথায় বলে থাকি ছেলে ত' নয় যেন "ইস্পাতের টুকরো", তখনি আমরা ইস্পাতকে একটি বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকি। এই ইস্পাত

ব্লাস্ট-ফার্নেসের নক্সা

বেসেমার কনভার্টার

তৈরী করতে যথেষ্ট সাবধানতা, বিশেষ ধৈর্য ও সুনিপুণতার প্রয়োজন। তবে বিজ্ঞান এই সকল কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছে নানারকম যন্ত্র আবিষ্কার করে'।

যে লোহাতে শতকরা ০.৫—২.০ ভাগ কার্বন থাকে, সেই লোহাকে নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী উত্তপ্ত করে' ঠাণ্ডা করলে সেই লোহা কঠিন ও মজবুত হয়ে ইস্পাতে পরিণত হয়। উত্তাপ ও শীতল করবার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে' বিভিন্ন প্রকৃতির ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ইস্পাত চেনা যায় তার, কাঠিন্য, দৃঢ়তা এবং সম্প্রসারণতা দেখে। ইস্পাত হ'ল দু' রকমের, কার্বন স্টিল ও অ্যালয় স্টিল। কার্বন স্টিলের গুণ চেনা যায় তাতে কত পরিমাণ কার্বন আছে এবং কত পরিমাণ তাপ কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তাই দেখে। আর 'অ্যালয়' অথবা ধাতু মিশ্রিত ইস্পাত হ'ল যাতে কার্বনের সঙ্গে অন্য ধাতুও মিশ্রিত থাকে, যথা—নিকেল, ক্রোমিয়াম, কোবল্ট, টাংস্টেন ইত্যাদি। এক একপ্রকার অ্যালয় স্টিলের এক একপ্রকার ব্যবহার আছে।

বর্তমানে ইস্পাত তৈরী করবার চারটি পদ্ধতি আছে, যথা—বেসেমার, ওপেন হার্থ, ক্রুসিবল ও ইলেকট্রিক।

১৮৫৬ সালে সার হেন্‌রি বেসেমার একটি ডিম্বাকৃতি চুল্লী নির্মাণ করেন, যার নাম বেসেমার কনভার্টার। হেন্‌রি বেসেমার লৌহ ও ইস্পাত যুগের যোগসূত্র। এই বেসেমার কনভার্টার হ'ল লোহার কারখানার প্রতীক। রাত্রে বিচিত্র বর্ণের অগ্নিশিখা চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চল আলোকিত করে' সে জানিয়ে দেয় যে, সে এখন কাজ করছে।

গলিত লোহা বেসেমার চুল্লীর মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়, তারপর তলা দিয়ে জোরে হাওয়া চালানো হয়। বাতাসের অক্সিজেন গলিত লোহার দূষিত পদার্থগুলি যথা সালফার, ফসফরাস এবং প্রয়োজনমতো কার্বন দূর করে দেয়। ১০।১৫ মিনিট হাওয়া চালাবার পর যা তৈরী হ'ল, তা হ'ল পেটা লোহা; কিন্তু এইবার তাকে ইস্পাতে রূপান্তরিত করতে হবে, সেজন্য এতে "স্পিগেলিসেন" নামে একটি সংকর ধাতু মেশানো হয়। স্পিগেলিসেনে থাকে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও কার্বন। একটি বেসেমার চুল্লীর ধারণ শক্তি ২৫ টন। এই চুল্লীতে ইস্পাত প্রস্তুত করতে সময় লাগে ৩।৪ ঘণ্টা; কিন্তু 'ওপেন হার্থ' পদ্ধতি দ্বারা আরো বেশি সময় লাগে, প্রায় ১২ ঘণ্টা। তবু 'ওপেন হার্থ' পদ্ধতি দ্বারা ভাল ইস্পাত প্রস্তুত হয়।

ঢালা ও কিছু ভাঙা লোহা এবং আয়রন অক্সাইড একত্রে ওপেন-হার্থ চুল্লিতে গ্যাস দ্বারা ৮।১০ ঘণ্টা উত্তপ্ত করা হয়। এই চুল্লীগুলি মাপে ৪০×১২×২ ফিট এবং ভিতরে ম্যাগ্নেসিয়ার ইঁটের অস্তর দেওয়া থাকে। গলিত লোহা থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ দূর হয়ে গেলে এতেও স্পিগেলিসেন যোগ করে ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়।
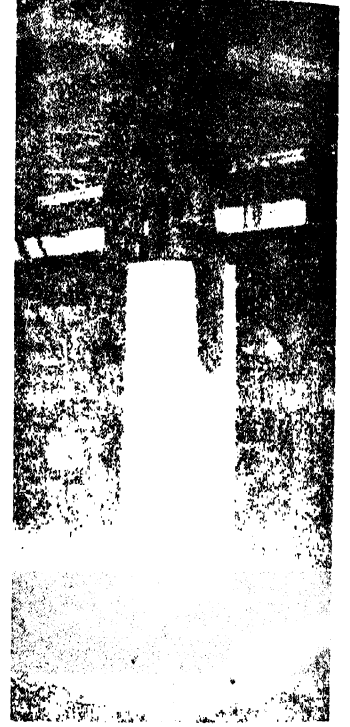
উত্তপ্ত ইস্পাতের ইনগট (বাট)

সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, স্প্রিং ইত্যাদি প্রস্তুত করবার ভাল ইস্পাতের দরকার হলে ক্রুসিবল অথবা বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তা তৈরী করা হয়। গ্র্যাফাইটের প্রস্তুত বড় বড় বাটীতে পেটা লোহা গালিয়ে তাতে আবশ্যক মতো পরিষ্কার কাঠ কয়লার মারফৎ কার্বন যোগ করে' দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে যে ইস্পাত প্রস্তুত হয়, তার নাম ক্রুসিবল স্টিল।

বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ইস্পাত প্রস্তুত করবার সুবিধা এই যে, ইচ্ছামতো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়; এইজন্য ভাল ইস্পাতও তৈরী হয়। সর্বাপেক্ষা ভাল ইস্পাত বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তৈরী করা যায়। একাধিক প্রকারের বৈদ্যুতিক চুল্লী আছে।

ইস্পাতের তৈরী রান্নার বাসনও পাওয়া যায়

যে কোন চুল্লী থেকে গলিত ইস্পাত রিয়ে আসে। সে গলিত ইস্পাতকে বড় বড় াচে ঢেলে বড় বড় থামি (ইনগট) তৈরী করে' খা হয়। এই খামিগুলির প্রত্যেকটি বর্গ ঞ্চ সমানভাবে উত্তপ্ত করবার জন্য তাদের োকিং পিট'এ নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ খানে গরমে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। সোকিং ট থেকে গরম লাল খামিগুলিকে রোলিং লে পাঠানো হয়, সেখানে পাতলা পাত থেকে লের লাইন পর্যন্ত নানারকম জিনিস প্রস্তুত রা হয়। রোলিং মিল যেন রান্নাঘর, যেখানে দা মেখে, নরম ময়দা থেকে নানারকম খাবার রী করা হয়।

অন্য ধাতু মিশ্রিত যে সকল ইস্পাত পাওয়া য়, তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ঃ—

ম্যাংগানিজ স্টিলঃ শতকরা ১১ থেকে ১৪ গ পর্যন্ত ম্যাংগানিজ থাকে। এই ইস্পাত য়ে ভাল সিন্দুক তৈরী হয়।

সিলিকন স্টিলঃ শতকরা ০·৩৫ থেকে ভাগ পর্যন্ত সিলিকন থাকে। এই ইস্পাত েশ নমনীয়। ভাল স্প্রিং এই ইস্পাত দ্বারা তরী করা যায়।

নিকেল স্টিলঃ শতকরা ৪ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত নিকেল থাকে। এই ইস্পাত শক্ত ও মজবুত, উত্তাপে বেশী বাড়ে না। মোটরগাড়ির নানা অংশ তৈরী করতে এই ইস্পাত ব্যবহৃত হয়।

ঘড়ীর ছোট্ট আধার তৈরী করবার জন্য ইস্পাতের ছাঁচ ঢালাই হচ্ছে

ক্রোমিয়াম স্টিলঃ শতকরা ২ থেকে ২০ ভাগ পর্যন্ত ক্রোমিয়াম থাকে। এই ইস্পাত বেশ মজবুত, মর্চে ধরে না। স্টেনলেস্ অথবা এভারব্রাইট্ স্টিল এর আর এক নাম। নানা-প্রকার যন্ত্র, বেয়ারিং, ঘড়ির কেস্, রান্নার বাসন, ফাউন্টেনপেনের টুপি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

টাংস্টেন স্টিলঃ মাত্র ০·১ থেকে ২·৫% ভাগ টাংস্টেন যোগ করে' এই মজবুত ইস্পাত তৈরী হয়। লেদ যন্ত্রের জন্য যন্ত্র তৈরী করতে এই ইস্পাত ব্যবহৃত হয়।

ভ্যানাডিয়াম স্টিলঃ এতেও ধাতুর মাত্রা টাংস্টেনের সমান। এর তুল্য মজবুত ইস্পাত খুব কম আছে। মোটরগাড়ির অ্যাক্সেল, ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট, গিয়ার ইত্যাদি তৈরী হয়।

মলিবডিনাম স্টিলঃ শতকরা ৪ থেকে ৫ ভাগ মলিবডিনাম থাকে। এই ইস্পাত খুব ধকল সহ্য করতে পারে এবং অ্যাসিড একে নষ্ট করতে পারে না। দ্রুতগতিতে যে সমস্ত ইস্পাতের যন্ত্র চালাতে হয়, সে সব যন্ত্র এই ইস্পাত দ্বারা তৈরী করা হয়।

এক বা ততোধিক ধাতু মিশিয়েও ইস্পাত তৈরী করা হয়। কিন্তু সবাইকে হার মানিয়েছে জার্মান রাসায়নিকেরা, কাচের মতো স্বচ্ছ ইস্পাত প্রস্তুত করে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ কারখানা, লোহার কারখানা, জামসেদপুরে। শুধু ভারতের শ্রেষ্ঠ কারখানা নয়, পৃথিবীর মধ্যে এটি একটি আধুনিকতম কারখানা; আধুনিক পদ্ধতিতে ইস্পাত এখানে তৈরী হয়। তথাপি এই কারখানার অনতিদূরে শালগাছের নীচে, পাহাড়ের কোলে এখনও সেই প্রাচীন পদ্ধতিতে লোহা গালানো হয়; মাটির চুল্লীতে, সেকেলে যন্ত্রপাতি ও পুরনো হাপরের সাহায্যে। আশেপাশের চাষীরা কিন্তু এই লোহার তৈরী যন্ত্রই পছন্দ করে।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যন্ত্রপুরীর কাজ চলে, সেমার চুল্লীর বহু বিচিত্র বর্ণের অগ্নিশিখা দূরের উঁচু শালগাছটার চুড়ো আলোকিত করে। সেই শালগাছের নীচে ব'সেই কোল আর মুণ্ডা, সাঁওতাল আর ওরাও আদিবাসী কামারেরা হাপর চালিয়ে যায়।

তাদের চুল্লীরও দু'একটা স্ফুলিঙ্গ এদিকে ওদিকে উড়ে পড়ে। একদিন সেইখানেই হয়ত গড়ে' উঠবে ক্রুপ আর স্কোডার সমতুল্য কারখানা।

(৪)

যত সাম্পান আর বজরাগুলোর ভীড় এদিকটা। একেবারে পাড়ে এসে ভিড়ে না, পাড়ের কাছ বরাবর এসে নোঙর ফেলে। কাঠের তক্তা ফেলে কিংবা কোমর জল পার হ'য়ে পেঁ'ছোতে হয় বজরায়। নদী উপনদীর শাখা প্রশাখা বেয়ে অনেক দূরে গ্রামান্ত থেকে আসে এই সব সাম্পান—কেউ আনে ধান, কেউ আনে মসলাপাতি কেউ বা অন্য কিছু। দূরে সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে কালো দেখায় চরের সীমানা। প্রকান্ড চর—অনেক বছর ধরে তিল তিল করে পলিমাটি পড়ে পড়ে নদীর বুক ফুঁড়ে উঠেছে এই চর।

নানারকমের আগাছা, কাশফুল আর শিশু গাছে ঢাকা এই চরকে বসতিহীন বলেই মনে হয় প্রথমে—কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই ইতস্তত জ্বলে ওঠে আলোর বিন্দু। চরকে আর যেন প্রাণহীন মনে হয় না।

কয়েক ঘর মাত্র জেলের বাস এখানে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ডিঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এরা—খাল, নদী পেরিয়ে একেবারে মার্টাবান উপসাগরের মুখে গিয়ে হাজির হয়। ঢেউয়ের ধাক্কায় টলমল করে ওঠে ডিঙ্গি—আর জেলেরা রূপালী জাল ছড়িয়ে দেয় উপসাগরের সবুজ জলের উপরে। সারা রাত সাগর ছেঁচে জীবিকা আহরণের চেষ্টা চলে—অবিরত চলে ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম।

ঠিক এমনি জীবনই তো সীমাচলমের। একটা সাম্পানের ওপর বসে বসে ভাবে সীমাচলম। সারা জীবন শুধু সংগ্রাম—ঢেউয়ের ধাক্কায় ওর সাম্পান তো টলমল করছে অবিরত। হয়ত বিরাটতর কোন ঢেউয়ের ঝাপটায় কোন অতলে তলিয়ে যাবে একদিন। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই নিবিড় কালো হ'য়ে আসে নদীর জল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। তারপর একসময়ে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে চমকে ও মুখ ফেরায়। নদীর জল ভেঙে কে একজন যেন আসছে এদিকে। হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে সেই দিকে ফেলতেই বুঝতে পারে সীমাচলম কো টিন আসছে সাঁতরে। তার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলো সে। এত দেরী করলো যে কো টিন? সন্ধ্যার আগেই তো আসবার কথা ছিল তার?

লুঙ্গীটা নিংড়োতে নিংড়োতে সীমাচলমের সামনে এসে দাঁড়ালো কো টিন।

এত দেরী যে। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি।

ঃ পথে একটু দেরী হ'য়ে গেলো। ইসুফ সায়েবের বিবি আর ছেলেটার কলেরার মতন হ'য়েছে, ইসুফ সায়েবও নেই এখানে তাই দেখাশুনো করে এলুম একটু। আশে পাশের লোকগুলো দিব্বি হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। দু একজনকে ডাকতে স্পষ্টই বললোঃ ও সব ছোঁয়াচে রোগ ঘাঁটতে কে যাবে বলো! পরের রোগ বাড়ীতে বয়ে এনে ছেলেপিলের সর্বনাশ করবো শেষে।

হাসে সীমাচলম। এ বিষয়ে সব প্রাচ্যদেশই বুঝি এক। পরের রোগ ঘরে টানতে কেউ রাজী নয়।

ঃ খবর কি?

ঃ সাড়ে আটটায় বৈঠক বসবে আজকে। হাজির থাকবেন আপনি।

ঃ হাজির তো থাকতেই হবে। মা পানের কাকাও নেই এখানে, কাজেই সমস্ত কিছু তো আমাকেই করতে হবে। আচ্ছা, আমি উঠি। তুমি থাকো এখানে। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ লাল বজরা আসবার কথা আছে। ঠিক থেকো তুমি। সীমাচলম বজরা থেকে নামতে শুরু করে। কাঠের তক্তা পার হ'য়ে ডাঙ্গায় এসে ওঠে।

সত্যি ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। শুধু বৈঠক আর আলোচনা, গ্রাম ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ আর সেই সংবাদ বহন করে আনা দলপতির কাছে—এইটুকুই তো কাজের পরিধি। কিন্তু কবে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দাবানলের রূপ নেবে। কবে হবে খান্ডবদাহন। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত লাল হয়ে উঠবে লেলিহান শিখায়—বাতাসে মাংসের পোড়া গন্ধ আর লালচে ধোঁয়া বারুদের।

হন হন করে আরো এগিয়ে যায় সীমাচলম। এখনো অনেকটা পথ। পাহাড়ের একেবারে গা ঘেঁষে গাঁয়ের ইস্কুলবাড়ী—এদেশী ভাষায় বলে চাউঙ্গ। সেখানে রাত্রে গুটিকতক ছাত্র নিয়ে পালি ত্রিপিটক বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়ান বৃদ্ধ আ ঠুন। বাইরের জগত এই কথাটাই জানে। কিন্তু শাস্ত্র সেখানে পড়ানো হয় ভালো করেই জ সীমাচলম।

চাউঙের ভিতর ঢুকেই একটু অপ্র হয়ে পড়ে সীমাচলম। সবাই এসে গিয়ে জুতোটা খুলে রেখে আস্তে আস্তে ঘ মধ্যে ঢুকে পড়ে সীমাচলম।

গুটি ছয়েক লোক। প্রত্যেককেই সীমাচলম। মাসে একবার দুবার ক'রে হয় এদের সঙ্গে। সকলেই কর্মী। একটু দ দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আ ঠুন। প লম্বা কালো কোট আর সেই রংয়েরই প্যাণ্ট। ডান হাতটা কোলের ওপর নিস্প ভাবে পড়ে রয়েছে। বাঁ হাতটা কনুই প কাটা। অনেক বছর আগে কোন পু সায়েবের গুলীতে জখম হয়েছিল হা বাকী অংশটা হাসপাতালেই রেখে আ হয়েছিল। হাতটার জন্য এখনও মাঝে আক্ষেপ করেন আ ঠুন। বাঁ হাতটাই সব তার। এই হাতে পিস্তল একটা থাকলে গজের মধ্যে এগোবার সাহস ছিল না কার একথা জানতো বোধ হয় পুলি লোকেরা। যাক, ডান হাতটা অনে পটু হ'য়ে এসেছে। মুখোমুখি একবার দাঁড় পারলে আবার পরীক্ষা হবে।

সীমাচলম ঘরে ঢুকতেই মুখ আ ঠুন ঃ এসো। বজরা এসেছে নাকি?

ঃ আজ্ঞে না, খবর পেলাম রাত বারো একটার আগে বোধ হয় আসবে না।

ঃ হুঁ, কো টিনকে বলে এসেছো থাক

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, কো টিন বসে আছে বজ

ডান হাতটা আস্তে আস্তে মুঠো ক আ ঠুন। কপালের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে আর কুঞ্চিত হ'য়ে আসে দুটি চোখ। কি এ ভাবছেন তিনি। অনেকক্ষণ পরে কথা ব খুব থমথমে গলার স্বর ঃ তোমাকে আমা দেশের ভাষাটা আরো ভালো করে শিখতে ঠিক পার্বত্য অঞ্চলে যে ঢংয়ে কথা বলা সেই ঢংটা আয়ত্ত করতে হবে, না হলে চা মজুরদের ভেতরে কাজ করার অসুবিধা হ আমার ইচ্ছা শানস্টেটে তোমায় পাঠিয়ে দে ওই দিকটা আমাদের লোকজন নেই বি অথচ খুব বিশ্বাসী একজন লোকের প্রয়ো সেখানে। চীন-সীমান্ত থেকে অনেক মালপ পাহাড়ের পথ দিয়ে খচ্চরের পিঠে করে আ মাঝে মাঝে, সেই সব জিনিস নির্বিঘ্নে চাল দিতে হবে ভিতরে পুলিশের চোখ এড়ি ফুকলিমকে রাখা চললো না সেখানে—পুলি তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তাকে

মৌলমিনে সরিয়ে দিয়েছি। তুমি দিন চারেকের মধ্যেই রওনা হ'য়ে পড়বে।

এ অনুরোধ নয় এ আদেশ। এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি চলে না, কোন প্রতিবাদ তো নয়ই। চুপ করে শোনে সীমাচলম। খড়ের কুটোর মতন ভেসে চলেছে ও এক তরঙ্গ থেকে আর এক তরঙ্গে। এই খড় একদিন সবুজ তৃণ ছিল—সতেজ আর মসৃণ ছিল এক সময়ে—একথা যেন ভাবাই যায় না।

মুখটা তুলেই দেখে সীমাচলম আ ঠুনোর দৃষ্টি ন্যস্ত তারই ওপরে। সাপের মত নিষ্পলক দৃষ্টি,—কটা দুটি চোখের তারায় অপূর্ব দীপ্তি আর কেমন যেন মাদকতা। সমস্ত শরীর ঝিম-ঝিম করে ওঠে আর অবসন্নতা নামে শরীর ঘিরে। ওর কি মত তাই বুঝি জানতে চায় আ ঠুন। কি আবার মত হতে পারে ওর। সাধ্য কি ওর প্রতিবাদ করবে এই আদেশের। বলবে না এভাবে নিজের জীবনকে খণ্ড খণ্ড করতে পারি না আমি। তোমাদের এ আগুন থেকে আমায় অব্যাহতি দাও। আমি বাঁচতে চাই আরো পাঁচজনের মত—এ রুদ্র গৈরিকের আবরণ আমার নয়—বিভূতি আর রুদ্রাক্ষের মালা নাও তোমরা খুলে। আমি ক্লান্ত। আমি বিধ্বস্ত।

এ সমস্ত কথা বলে না সীমাচলম। এসব কথা বলার ফল কি হতে পারে তাও অজানা নেই তার। একটু বারুদের গন্ধ আর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকবে ওর লাশ। সাইলেন্সর দেওয়া পিস্তলের আওয়াজও হবে না একটু। আ ঠুনের আদেশ অমান্য করে এ পর্যন্ত বাঁচে নি কেউ।

এগিয়ে যায় সীমাচলম ঃ যেদিন আদেশ করবেন সেই দিনই রওনা হবো আমি।

বেশ, বেশ ঃ ঘাড় নাড়ে আ ঠুন। ভারি খুশি মনে হয় তাকে।

ডান হাতটা নেড়ে নেড়ে বলে ঃ ভারতবর্ষ আর চীনের মাঝখানে এই বর্মা দেশ। ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিতে এই দুই দেশের তুলনা হয় না কোন দেশের ইতিহাসে। অসংখ্য বন্ধুর পার্বত্য পথ আর গিরিরন্ধ্র দিয়ে অনবরত চলেছিল সংস্কৃতির আদান-প্রদান। আজো প্যাগোডার খোদিত শিলালিপিতে, শহরের নামের মধ্যে, দেশবাসীর আচারের মধ্যে এই সংস্কৃতির পরিচয় রয়ে গেছে! এবার নতুন অধ্যায়ের শুরু, রাজনৈতিক জন-জাগরণের কাজে তুমি রয়েছ ভারতবাসী আর আমি রয়েছি চীন—এদের জীবনে নতুনতর এক অধ্যায়ের সূচনা করবো আমরা।

কেমন যেন মনে হয় সীমাচলমের। ও কি যোগ্য নাকি এসব কাজের? জানে কি আ ঠুন—শুধু এক তরুণীর স্মৃতিকে ভোলবার জন্য সাগর পার হ'য়ে এসেছে সে। কোন দিন সে ভেবে দেখেনি দেশের এই বিরাট রূপ—এই পরিব্যাপ্তি। কতো দুর্বল ও। এই বিরাট দায়িত্বের ভারে ও তো গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে! মাদ্রাজের অখ্যাত পল্লীর এক সন্তান—নিজের দয়িতাকে ছিনিয়ে আনবার মত সাহস যার ছিল না—সে আনবে ছিনিয়ে স্বাধীনতা বৈদেশিক শক্তির কবল থেকে—লক্ষ মানুষের মধ্যে আনবে জন জাগরণ!

আ ঠুনকে সিকো করে বাইরে চলে আসে সীমাচলম। এবারে বৈঠক বসবে আ ঠুনের। সে বৈঠকে আজ থাকবার দরকার নেই সীমাচলমের। গভীরতর তত্ত্ব আলোচিত হবে সেখানে—জাতির ভাঙাগড়ার ইতিহাস।

নদীর পারে এসে আস্তে ডাকে সীমাচলম।

ঃ কোটিন, কোটিন।

ঃ হ্যাঁ, জেগে আছি। আপনি ঘরে যান। কাল ভোরে দেখা করবো আপনার সঙ্গে।

নদীর ধারের রাস্তা ধরে বাড়িতে ফিরে যায় সীমাচলম। খালি বাড়ি। মাপানের কাকা আর খুড়ি উপস্থিত কেউ নেই এখানে। মাঝে মাঝে কোথায় যেন সংঘের কাজে বেরিয়ে যান তাঁরা। দিন পনেরো হ'লো তাঁরা নেই।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় সীমাচলম।

বৃদ্ধা পরিচারিকা এসে ঘরের বাতি কমিয়ে দিয়ে যায়। তারপর অসংখ্য চিন্তা আর ভাবনার স্রোত। এক সময়ে চোখদুটো বন্ধ হ'য়ে আসে সীমাচলমের।

স্টেশনে এসেছিলেন মাপানের কাকা আর দু' একজন। গাড়ি ছাড়বার আগে পর্যন্ত বার-বার সতর্ক করে দিলেন মাপানের কাকা ঃ খুব সাবধানে যেন থাকে সীমাচলম। কোন রকম অসুবিধা হ'লেই যেন চিঠি লিখে জানায় তাঁকে। গিয়েই আ ঠুনের পরিচয়পত্রটা যেন কাজে লাগায় সে।

ভারি কষ্ট হয় সীমাচলমের। চোখের পাতাগুলো যেন ভিজে ভিজে ঠেকে। এত মিষ্ট ক'রে কথা বুঝি কেউ বলে নি ওকে। ক'দিনেরই বা আলাপ, কিন্তু আপনজনের মত মনে হয় মাপানের কাকাকে। বিপদ হ'লে জানাবে বই কি—নিশ্চয় জানাবে তাঁকে।

সঙ্গে আ ঠুনের চিঠি রয়েছে একটা হোকপানের এক বিখ্যাত আলু ব্যবসায়ীর কাছে। সে আলুর ব্যবসা—আমদানী রপ্তানি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করতে এসেছে এই হবে তার পরিচয়। তারপর তিনি লোক সঙ্গে দেবেন যে লোক তাকে চৈনিক সীমান্তের ছোট্ট এক শহরে পেঁ'ছে দেবে।

পাংলাং পাহাড়শ্রেণীর কোলে ছোট্ট আর পরিচ্ছন্ন শহর হোকপান। পাহাড়ের সানুদেশ জুড়ে বিস্তৃত আলুর চাষ। আলু ব্যবসায়ী দু' একজন শুধু ফসলের সময়টা থাকে এখানে। দর্মা আর কাঠে ঘেরা ছোট ছোট থাক থাক বাড়িগুলো জুড়ে কেবল শানদের বসতি। বর্মীদের চেয়েও আরো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা; আরো যেন কোমল।

হোকপান শহরে পেঁ'ছাতে প্রায় সাড়ে আটটা হয় সীমাচলমের।

একেবারে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আবদুল গণি সায়েবের বাংলো। আবদুল গণি সুদূর গুজরাট প্রদেশের লোক—ব্যবসার সম্ভাবনায় এখানে এসে পত্তন করেছেন। তাঁর আর এক ভাই আছেন রেঙ্গুন শহরে। তিনি এখান থেকে আলু চালান দেন ভাইয়ের কাছে। আলুর ব্যবসার জালের দুটি প্রান্ত ধ'রে আছেন দুটি ভাই। প্রচুর টাকা কামিয়েছেন দুজনে। বর্মা দেশে আলু বলতে গণি সায়েবের আর তার ভাইকেই বোঝে সকলে। ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না এ'রা। এহেন গণি সায়েবের সঙ্গে আ ঠুনের আলাপ হল কি করে, এও একটা ভাববার বিষয়। কি ক'রে যে আলাপ হ'য়েছিলো এ-কথাটা গণি সায়েবের মুখেই শুনেলো সীমাচলম। একই হাসপাতালে ছিলো দুজন পাশাপাশি। যেবার হাতে গুলী লেগে হাসপাতালে ছিলো আ ঠুন, ঠিক সেই সময় তার বিছানার পাশেই ছিলেন আবদুল গণি অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন করবার জন্য। সেই সময় পরিচয় হ'য়েছিলো দুজনের। গণি সায়েব শুনেছিলেন কোথায় যেন শিকার করতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন আ ঠুন। সঙ্গের বন্ধু শিকারীর গুলী এসে কব্জিতে বিঁধেছিলো তাঁর। ব্যাপারটা বুঝতে পারে সীমাচলম ইংরেজ রাজত্বে গুলী খেয়ে সেই অবস্থায় তাদের সীমানা পার হ'য়ে এই করদ রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আ ঠুন, এখানে শ-বোয়াদের (শান রাজা) প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে এসে চিকিৎসা করেছিলেন। দেরি করার ফলেই হয়ত পচে গিয়েছিলো হাতটা, কনুই থেকে কেটে সমস্ত বাদ দিতে হ'য়েছিলো।

আরো অনেক কথা শুনেছেন গণি সায়েব। সরকারের জরিপ বিভাগে বড়ো কাজ করতেন আ ঠুন। সেই কাজের জন্য মাঝে মাঝে চীন-সীমান্তেও যেতে হ'তো তাঁকে। সেরে উঠে তাঁর বাংলোয় অনেককাল কাটিয়েছিলেন আ ঠুন। সেই সময়টাই বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়।

আপনার বলতে কেউ ছিল না গণি সাহেবের। অনেককাল আগে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাঁর স্ত্রী। সেই থেকেই গণি সায়েব একলা। সারা বাংলোয় তিনি আর একটি যুবতী পরিচারিকা এদেশীয়া। দু' একদিনের মধ্যেই তাদের পরিচয়টা সহজ হ'য়ে আসে সীমাচলমের কাছে। আবার বিয়ে না করার হেতুটাও পরিষ্কার হ'য়ে আসে। এ বিষয়ে কিন্তু গণি সায়েব কোন রকম লুকোচুরি করেন না। স্পষ্টই বলেন, ঃ এ না থাকলে তো মরে যেতাম আমি। এই বিদেশে আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায়

এর ওপর নির্ভর করেই তো আছি। আমি মনে সব কিছুই এর। কথাটা বলতে বলতে কাছে দাঁড়ানো মেয়েটির নরম গালে অলতো টোকা মারেন। মেয়েটি লজ্জায় লাল হ'য়ে আসে—চোখ দুটো ছলছল করে। আস্তে বলে : পাইন গাছের মত দীর্ঘায়ু হ'ন কর্তা। আরো একশ' বছরের আলুর ফসল তুলুন ঘরে।

ভারি ভাল লাগে সীমাচলমের। মরুদগ্ধ প্রান্তরের মাঝখানে ঘন সবুজে ঢাকা ওয়েসিসের টুকরো। ওর চিরদিনের এই তো ছিলো কল্পনা—পৃথিবীর নিরালা কোণে এমনি একটি নিভৃত নীড় আর পাশে মমতাময়ী এক নারী। চেয়ে চেয়ে আর আশ মেটে না সীমাচলমের।

কিন্তু এ আশ্রয়ে বেশী দিন থাকা চলবে না সীমাচলমের। মাপানের কাকার জরুরী এক চিঠি আসে, আ ঠুনের আদেশে তাকে রওনা হ'তে হবে সীমান্তে।

প্রায় দিন তিনেকের পথ। উৎরাই আর চড়াই ভেঙে ভেঙে পথ যেন দীর্ঘতর মনে হয়। পাইন আর ইউকেলিপটাসের ঘন বন—শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে এই নিরুদ্দেশ যাত্রার যেন শেষ নেই।

এখানেও চিঠি ছিল আ ঠুনের। পাহাড়ের চূড়ার ওপরে ওয়ারলেস স্টেশন—তারের শাখা-প্রশাখা অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে। এর পাশেই বা মঙ সায়েবের কোয়ার্টার। সেখানে গিয়েই ওঠে সীমাচলম। বা মঙ এক কথার মানুষ। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'তেই স্পষ্ট বলে তাকে : আপনাদের কাজ সম্বন্ধে আমি সবই জানি। আ ঠুন আমার মামা হন। তিনি কয়েক বছর ছিলেন এখানে। কিন্তু আমার বাড়িতে নানা কারণে আপনাকে থাকতে দেবার পক্ষে অসুবিধা রয়েছে। আমি সরকারের চাকর—এই আমার অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপজীবিকা, কাজেই পুলিশের খানাতল্লাসীর ভয়ে চাকরি টিকবে না আমার। কাজেই এখান থেকে মাইল দুয়েক নীচে আমার পুরোনো পরিত্যক্ত যে কোয়ার্টার আছে, সেখানেই থাকতে হবে আপনাকে—খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হবে না। আমার চাকর এখান থেকেই খাবার পেণছে দেবে আপনার। তবে দয়া করে আমার সঙ্গে আলাপের বিশেষ চেষ্টা করবেন না। এই চাকরী আমার ভরসা—এই চাকরী ক'রে আমাকে বাপের দেনা শোধ করতে হবে। হুজুগে মাতবার আমার সময় নেই।

অনাড়ম্বর, স্পষ্ট কথাগুলো বুঝতে অসুবিধা হয় না মোটেই। কেন কথা বলে না সীমাচলম। আ ঠুন বলেছিল প্রেরণা, আ ঠুনের ভাগ্নে বললো হুজুগ। বুদ্ধি দিয়ে যুক্তির বিচার করবার মত মনের অবস্থা নয় সীমাচলমের। হয়ত হুজুগ, হয়ত প্রেরণা—কিন্তু তার কাজ তাকে করে যেতেই হবে। এই বিরাট জালে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে সে—এ বাঁধন কাটবার মত জোর আর সাহস তার নেই।

পাহাড়ের একটু নীচেই পুরোনো কোয়ার্টার। ওপর থেকে খুব কাছেই মনে হয়, কিন্তু পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগে। পরিত্যক্ত কোয়ার্টার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছাতের টিনগুলো ঝুলে পড়েছে নীচে। দেয়ালের কাঠগুলোর জায়গায় জায়গায় বেশ বড়ো রকমের ফাঁক। তবে মনে হয় ইতিমধ্যে ঝাড়পোঁছ করে কিছুটা যেন বসোপযোগী করা হয়েছে। একটি মাত্র ঘর—কোন রকমে একটা মানুষ মাথা গুঁজে থাকতে পারে।

অবসন্ন শরীর নিয়ে এসব আর খুঁটিয়ে দেখবার ইচ্ছা ছিলো না সীমাচলমের। কোন রকমে বিছানাটা পেতেই শুয়ে পড়ে সে। সারা-দিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তির পরে ঘুম আসতে তার মোটেই দেরি হয় না।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুক পিঠের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। কাঠের ফাঁকে ফাঁকে নিজের জামাকাপড়গুলো গুঁজে দিয়ে আবার বিছানায় ঢলে পড়ে সে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ কড়া রোদ উঠে গিয়েছে। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দে ধড়মড় করে উঠে পড়ে সীমাচলম। উঠে গিয়ে সে দরজাটা খুলে দেয়। দরজার সামনেই বা মঙ সায়েবের ছোকরা চাকর দাঁড়িয়ে—যে কাল সীমাচলমকে পেণছে দিয়ে গিয়েছিলো এখানে। হাতে ট্রেতে চায়ের কেৎলী আর প্লেট ঢাকা কি যেন রয়েছে। বাঃ, ওটার মুখেই ধূমায়মান চা—দিনটা ভালোই যাবে আজ। বা মঙ সায়েবের আতিথেয়তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকতেই পারে না। সীমের বীচি ভাজা আর চা সহযোগে প্রাতরাশ শেষ করে সীমাচলম। তারপর পোষাক বদলে বাইরে পা দিয়েই সে চমকে ওঠে।

পাহাড়ের পর পাহাড়—যতদূর চোখ যায় কেবল পাহাড়ের শ্রেণী। গাছে ঢাকা সবুজ পাহাড় নয়—রুক্ষ, কর্কশ, ঊষর প্রান্তরের স্তূপ। রোদের তেজে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। নিচে পাহাড়ের বুক চিরে আঁকাবাঁকা পথের রেখা। কোথাও জনমানবের সমাগম নেই। শুধু প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজত্ব।

অনেক দূরে সাদা প্রস্তরফলক ঝলসে ওঠে সূর্যের আলোয়। ওটা কি জানে সীমাচলম। ওখানে লেখা আছে বৃটিশ রাজ্য এখানেই শেষ। অপর পার থেকে চীন দেশ সুরু হলো। সেই প্রস্তর ফলকের পাশেই ছোট্ট টিনের শেড। কাষ্টমের ঘর। এখানেই যাত্রীদের মালপত্তর খানাতল্লাসী করা হয়। নিষিদ্ধ জিনিষ থাকলে আটকানো হয় তাদের আর পাশপোর্ট পরীক্ষা করা হয়। এ সমস্ত খবর সে শুনেছিলো আ ঠুনের কাছে।

বাঁ দিকে পাহাড়ের ওপরে বেতারের দীর্ঘ দণ্ডটা ঝকমক করে উঠছে সূর্যের আলোয়। কত দূর দূরান্তের বার্তা ওরই মধ্য দিয়ে ভেসে চলে ইথারে ইথারে। ওই দীর্ঘ বেতার দণ্ডের সংগে যেন মিল রয়েছে ওর। প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে সংবাদ বহন করে বেড়ায় ও।

শুধু সংবাদ নয়—ও বহন করে জিনিষ—অপরিহার্য সব জিনিষ বিদ্রোহের একান্ত সংগী পরাধীন জাতির পাশুপত অস্ত্র। কে জানে যদি জয়ী হয় এ সংগ্রাম—স্বাধীন বর্মার ইতিহাসে ওর নামও হয়ত থাকবে। হাতিয়ার চালান করেছিলো নির্ভীকভাবে সীমাচলম সুদূর চীনসীমান্ত থেকে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে। সাগর পার হয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে এই পুরুষ স্বাধীনতার মরণ পণ গ্রহণ করে বর্মার মাটিতে পা দিয়েছিলো—আত্মীয় পরিজন সমস্ত পিছনে রেখে—স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে সঞ্জীবিত করে-ছিলো সমস্ত জনসাধারণকে। স্বাধীনতার সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক সীমাচলম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে সীমাচলম হয়ত ঐ রকম এক প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ হবে এই সব কথাগুলো। চীন আর ব্রহ্ম সীমান্তের যাত্রীরা বিস্ময়ে মাথা নত করবে ওর অতুলনীয় শৌর্যের কথা ভেবে। কিন্তু কেউই জানবে না আসল কথাটা। দেশ স্বাধীন হোক আপত্তি নেই সীমাচলমের, পশুশক্তি পরাজিত হোক আনন্দের কথা—কিন্তু এ পথ নয় সীমাচলমের। সে মুক্তি চায় এ বাঁধন থেকে। কিন্তু এ বাঁধন ছাড়াতে গেলে—আ ঠুন রয়েছে বাধা, সমস্ত বর্মা দেশ জুড়ে রয়েছে আ ঠুনের সহস্র অনুচর যারা তার মত বিশ্বাস-ঘাতককে হত্যা করতে একটুও দ্বিধা করবে না। কে জানে, এইখানেই হয়ত আশে পাশে কত গুপ্তচর লুকিয়ে আছে আ ঠুনের। কোন দিন সন্দেহজনক কোন কাজ করলে দণ্ড দিতে তারা বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হবে না। ওরাই চালান দেওয়া হাতিয়ার দিয়ে ফুটো করে দেবে ওর মগজ।

মাসে দুবার করে এই পথে জিনিষ আসে। কাষ্টমের লোক সতর্ক হয়ে ওঠে সেই সময়টা। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে দেখা যায় ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়া আর খচ্চরের সার। এরা আসে মাইল চল্লিশেক দূরের চীনে শহর থেকে। কাষ্টমসকে ফাঁকি দিয়ে আমদানী করে চীনের বিখ্যাত সিল্ক আর কুখ্যাত কোকেন। এ ছাড়া আরও সমস্ত জিনিষ থাকে তাদের সংগে—সেসব জিনিষ নিষিদ্ধ নয়। কাষ্টমসুয়ের হাতে কিছু দিলেই ছেড়ে দেয় তারা।

সমস্ত নির্দেশ দেওয়া ছিল আ ঠুনের চিঠিতে। ঠিক দিনে পাহাড়ের বন্ধুর পথ ধরে অনেক এগিয়ে যায় সীমাচলম। কাষ্টমসয়ের অফিস পিছনে রেখে ছোট পাহাড়টা ডিঙিয়ে আরো দূরে। ছোট্ট একটা পাহাড়ী ঝর্ণা। সরু রুপোলী ফিতার মত শীর্ণ জলের ধারা—ধারে ধারে প্রকাণ্ড কালো কালো পাথরের রাশ। এদিকটা তবু কিছুটা গাছ পালার আভাস

আছে। ঝর্ণার পাশেই কমলালেবুর বন—তারই মধ্যে ছোট পায়ে চলা পথ। মাঝে মাঝে এই পথ দিয়ে দূরের গাঁ থেকে আসে সব লোক—বড় বড় পাহাড়ী ছাগল নিয়ে। দু একটা বাড়িতে দুধ দিয়ে আবার এই পথে ফিরে যায় তারা—সোজা পথে আসলে গেলে অনেকটা ঘুরপথ হবে।

এই পথেই পা বাড়ায় সীমাচলম। দুধারে ঘন গাছের ঝোপ। বটগাছের মত ঝুরি নেমেছে কোন কোন গাছে—মোটা দড়ির মত জট। সেই জট ধরে নামতে বিশেষ অসুবিধা হয় না সীমাচলমের। কিছুটা নামার পরেই 'কেলেম ঠর্জদির' বিরাট গাছ—এই গাছের নির্দেশও দেওয়া ছিল চিঠিতে। সেই গাছ বরাবর এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। ব্যস, আর কোন কাজ নেই তার এখন—শুধু অপেক্ষা করতে হবে চীনদেশ থেকে সীমান্ত পার হয়ে যে লোকটি আসবে তার জন্য।

অনেকটা সময় কেটে যায়। গাছের ছায়ায় আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে সীমাচলম। ভারি ঠান্ডা এই জায়গাটা—অনেকদূর থেকে পাহাড়ী ঝর্ণার ঝির ঝির শব্দটা ভেসে আসছে আর কমলালেবুর কেমন মিষ্ট গন্ধ বাতাসে। নেশা আনে এই গন্ধ আর এই ছায়া আনে অবসাদ।

আচমকা একটা শব্দে ধড়মড় করে উঠে পড়ে সীমাচলম। ঘুমিয়ে পড়েছিলো বুঝি সে। চোখ দুটো কুঁচকে চেয়ে থাকে পথের দিকে। অনেক দূর থেকে ঝর্ণার শব্দের সংগে আরো একটা কিসের শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে। ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে শব্দটা। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি হলে যেমন হয়, তেমনি শব্দ যেন।

কাছে আসতেই বুঝতে পারে সীমাচলম ঘোড়ারই খুরের আওয়াজ। ইতস্ততঃ ছড়ানো পাথরের টুকরোর ওপরে ঘোড়ার নালের ঠোকাঠুকিতে বিচিত্র শব্দ। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় অশ্বারোহীকে। আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা, গলায় এবং মাথায় সাদা লোমের বন্ধনী। পাহাড়ী ঝর্ণার কাছে বরাবর এসে লাগাম টেনে ধরলো সজোরে—ঘোড়াটা সামনের পা দুটো তুলে ধরে শূন্যে—তারপর একরাশ ধুলো উড়িয়ে নেমে আসে পায়ে চলা পথ বেয়ে। সীমাচলম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় পথের মুখে। ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ে লোকটি তারপর সীমাচলমের সামনে এসে বিশুদ্ধ বর্মাভাষায় বলে ঃ সংবাদ কুশল তো? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে নাকি?

ঃ না, খুব অনেকক্ষণ নয়। আপনার কষ্ট হয়নি পথে।

ঃ কষ্ট একটু হয়েছিলো—মানে কষ্ট ঠিক নয়—অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলুম একটু।

ঃ কি রকম?

ঃ এখান থেকে মাইল ত্রিশ দূরে প্রচণ্ড বরফ পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বছর যেন অনেক আগেই শীতটা পড়বে মনে হচ্ছে। বরফের মধ্যে ঘোড়া ছোটানো বড় বিপজ্জনক—তাই—ঘোড়া বেঁধে একটা সরাইখানায় অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

ঃ বরফ পড়া শুরু হয়েছে এত কাছে, কিন্তু এখানে তো গরম রয়েছে বেশ।

ঃ এই সব পাহাড়ে দেশে এইরকমই হয়। পাহাড়ের চূড়োয় হয়ত প্রচুর বরফ পড়ছে অথচ নীচের দিকে উপত্যকায় দেখবেন ঝিক ঝিক করছে রোদ। এদেশের আবহাওয়া বড় বিশ্বাসঘাতক।

কথা বলার সংগে সংগে লোমের টুপি আর অংগাবরণ খুলে ফেলে লোকটি। খর্বকায় প্রৌঢ় গোছের লোকটি। সারা মুখে গভীর বলিরেখা—মনে হয় ঘোড়ার পিঠে আর পাহাড়ে পাহাড়েই জীবনের বেশীর ভাগটা কেটেছে যেন। হাতের দস্তানা দুটো খুলে ঘোড়াটাকে বাঁধে ছোট একটা গাছের সংগে তারপর সীমাচলমের দিকে চেয়ে বলে ঃ একটু মাপ করবেন আমায়—বড্ড তৃষার্ত বোধ হচ্ছে। একটু জল খেয়ে আসি ঝর্ণা থেকে।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন স্বপ্ন বলে মনে হয় সীমাচলমের। কোনদিন স্বপ্নেও বোধ হয় কল্পনা করেনি ও—পাহাড়ের বুকে এমনি করে আত্মগোপন করে থাকবে ও আর পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে আসবে এক অশ্বারোহী বৃহত্তর জগতের সংবাদ বহন করে। ভাবতেও যেন রোমাঞ্চ জাগে সীমাচলমের দেহে।

লোকটি মুখে চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে এসে বসে সীমাচলমের গা ঘেঁসে। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সীমাচলমের দিকে তারপর বলে ঃ আপনি বুঝি সমতলভূমির বাসিন্দা। কোথায় বাড়ি আপনার?

ঃআমাকে কোন জাত বলে মনে হয় ঃ পরখ করে সীমাচলম।

ঃ আপনাকে—আপনাকে জেরবাদী বলেই মনে হচ্ছে।

জেরবাদী কাকে বলে জানে সীমাচলম। ভারতীয় আর বর্মীর রক্তের সংমিশ্রণে সংকর জাতি হলো জেরবাদী।

ঃ আমি কিন্তু খাঁটি ভারতীয়।

ঃ তাই নাকি, কোন প্রদেশের লোক বলুন তো আপনি।

ঃ মাদ্রাজের।

ঃ ও, তাই নাকি, আমাদের চোখে অবশ্য আপনাদের সব প্রদেশের লোককে একই রকম দেখি। আপনি অনেকদিন আছেন বুঝি এদেশে।

ঃ হ্যাঁ, তা প্রায় বছর তিনেক।

ঃ বছর তিনেক এমন কি বেশী। তার তুলনায় এদেশের ভাষাটাকে বেশ শিখেছেন তো আপনি।

আপনি কি চীনদেশীয় ঃ এবারে প্রশ্ন করে সীমাচলম।

ঃ হ্যাঁ, চীনও বলতে পারেন, বর্মীও বলতে পারেন ঃ হাসে লোকটি।

ঃ মানে?

ঃ মানে, বাবা হচ্ছেন চীনদেশের আর মা এই দেশের মেয়ে। বাবার এখানে হোটেল ছিল—মারই হোটেল অবশ্য, বিয়ের পরে বাবাই হাতে পেলেন সব। বিয়ের আগে বাবা 'পানি'র ব্যবসা করতেন। পানি কাকে বলে জানেন তো—এই যে ছোট সাইজের ঘোড়া আমার ঘোড়ার মত। এই সব পানি পাহাড়ে ওঠবার কাজে ভারী দরকারী। সরু আর খাড়াই পথ দিয়ে অন্য ঘোড়ার যাওয়াই অসম্ভব, কিন্তু এরা ঠিক চলে যায়। অল্প দিনে পথঘাট সমস্ত চিনে ফেলে এরাঃ কথাটা বলে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে নিজের ঘোড়াটির দিকে। তারপর কি মনে করে হঠাৎ উঠে যায়। ঘোড়ার পিঠের থলি থেকে ঘাসের গোছা বের করে ফেলে দেয় তার মুখের সামনেঃ আহা ভোর চারটে থেকে একটি দানাও পড়েনি এর পেটে।

ঃ চলুন এবার যাওয়া যাক ঘরের দিকে ঃ সীমাচলম উঠতে ব্যস্ত হয়।

ঃআর একটু অপেক্ষা করুন। কাস্টমস্‌য়ের লোকগুলো যায় নি এখনও। অন্য অন্য বারে কাস্টমস্‌য়ের অফিসের গা দিয়েই চলে যেতুম আমরা—ওই বড়ো পাহাড়ের তলায় গিয়ে মিলতুম ফকেলিম সায়েবের সংগে। কিন্তু কাস্টমস্‌য়ের লোকগুলো সন্দেহ করতে আরম্ভ করলে। তবে ফকেলিমের দোষ ছিল বইকি। আফিংয়ের ঝোঁকে কথাটা সে বলেই ফেলেছিলো কাস্টমস্‌য়ের লোকদের কাছে। ওদের সংগে খুব ভাব ছিলো ফকেলিমের। প্রায় রোজ সন্ধ্যাতেই মদ আর জুয়ার আড্ডা বসতো। ফকেলিম এখন কোথায় বলতে পারেন?

ফকেলিম এখন কোথায় জানতো সীমাচলম। কিন্তু কোন লোকের গতিবিধি আর অবস্থানের কথা সকলের কাছে বলা হয়ত সমীচীন হবে না এই ভেবে উত্তরটা এড়িয়ে যায় সীমাচলমঃ কি জানি, ঠিক বলতে পারি না।

ঃআমি এই নতুন জায়গাটার নির্দেশ পেয়েছিলাম চিঠিতে, কিন্তু আরো বেশী শীত পড়লে তো এজায়গাটা ঢেকে যাবে বরফে—তখন এই পথে ঘোড়া চালানো তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটে চলতে পারবেন না আপনি। সমস্ত গাছপালা বরফে সাদা হয়ে যাবে। অবশ্য শীতকালটা আমিও আসবো না। সে সময়টা কাজ একটু মন্দা থাকে অন্ন নিয়ে আসারও ভারী অসুবিধা। তবে সেই সময়টা কাস্টমস্‌য়ের লোকদের কিন্তু খুব ফাঁকি দেওয়া যায়। বেচারা দরজা জানলা বন্ধ করে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে মদে বেহুঁস হয়ে থাকেঃ কথাটা বলতে বলতে হেসে ওঠে লোকটি তারপর হাসি থামিয়ে বলেঃ চলুন এবার রওনা হওয়া যাক। আপনার নামটা আমি জেনেছি। আপনাদের লোকই জানিয়েছে আমাকে। আমার নাম হচ্ছে আঃ নি, মনে থাকবে তো। (ক্রমশঃ)

রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলার অবদান

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দীর্ঘজীবন ইতিহাসের আলোচনা করিয়া পুঁথি উদ্ধার, তাম্রফলক পাঠ ও মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। অর্থাৎ বাঙালী তাহার কীর্তি ভুলিয়া গিয়াছে। এই কথাই তাঁহার গুরুস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল সেকালের কথা নহে—একালেও আমাদিগের সমসাময়িককালেও আমরা দেখিতেছি—বাঙালী আত্মবিস্মৃতির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছে না। আর অন্যান্য প্রদেশের লোকও কখন বা অজ্ঞতাহেতু কখন বা কোন উদ্দেশ্যে বাঙালীর কীর্তির গুরুত্ব অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ডক্টর পট্টভী সীতারামিয়া কংগ্রেসের যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের পরিচালকদিগের অনুমোদিত এবং কংগ্রেস কর্তৃক প্রচারিত হওয়ায় তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাহাতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়, পরিচালনে, পরিবর্তনে, পরিবর্জনে ও পরিবর্ধনে বাঙলার অবদান যথাসম্ভব অবজ্ঞাত হইয়াছে। অল্পদিন পূর্বেও তিনি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতির কথায় বলিয়াছেন—"তিনি ভারতীয় খৃষ্টান" ছিলেন। তিনি যে বাঙালী তাহার উল্লেখ করা হয় নাই এবং তিনি কোনকালে হিন্দুধর্মত্যাগী না হইলেও তাঁহাকে "ভারতীয় খৃষ্টান" বলা হইয়াছে। সাধারণ ইংরেজকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্ভ কবে? তবে সে যেমন বলে, "ক্লাইভের এদেশে আগমন হইতে", তেমনই সীতারামিয়া, বোধ হয়, মনে করেন—কংগ্রেসের প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর প্রাদুর্ভাব হইতে। আর বোধ হয় সেইজনাই তিনি গান্ধীজীর ভ্রমের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টান ছিলেন।

ভারতের যে জাতীয় আন্দোলন—তাহার স্বাধীনতা আন্দোলন তাহাতে বাঙলার অবদান অসাধারণ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষ করিয়া বাঙলায় জাতীয় আন্দোলন প্রবল হইয়াছিল এবং তাহা দলিত করিবার জন্য এদেশের বিদেশী শাসকরা উগ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন—বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে লালা লাজপত রায় বলিয়াছিলেন, বাঙলায় যে চণ্ডনীতি চলিতেছে, সেজন্য দুঃখিত না হইয়া তিনি বাঙালীদিগকে অভিনন্দিত করিতেছেন—কারণ, ভগবানের অশেষ কৃপায় বাঙলাই ভারতবর্ষে নবযুগ প্রবর্তনে নেতৃত্ব লাভ করিয়াছে। সে কথা সেই অধিবেশনের সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলেও স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষের মান বাঙলাই রক্ষা করিতেছে এবং বাঙলা যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে সে সমগ্র ভারতবর্ষের সহযোগ লাভ করিবে।

পরিতাপের বিষয়—কার্যকালে, যখন বাঙলা বৃটিশ পণ্য বর্জন করিতে আরম্ভ করে এবং তাহা বিদেশীর প্রভাবমুক্ত স্বায়ত্তশাসন লাভের সোপান মনে করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন বালগঙ্গাধর তিলকের মহারাষ্ট্র ও লাজপত রায়ের পাঞ্জাব ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের নেতারা তাহার বিরোধিতাই করিয়াছিলেন। সেই বিরোধীদিগের মধ্যে বোম্বাইএর ফিরোজশা মেটা ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মাদ্রাজের আনন্দ বানু ও কৃষ্ণস্বামী আয়ারের সঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও ছিলেন।

সে যাহাই হউক, লালা লাজপত রায় বলিয়াছিলেন, বাঙলাই প্রথম ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়াছিল বলিয়া সে-ই জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিল। কথাটা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। বাঙলায় গণতন্ত্রের বীজ বহুদিন পূর্বে বপন করা হইয়াছিল। বাঙলায় রাজা গোপালের রাজ্যারম্ভ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে। বাঙালীরা মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ অরাজকতা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাঁহাকে রাজা মনোনীত করিয়াছিলেন। শাসক মনোনীত করা তাহার পূর্বে কবে, কোথায় হইয়াছে?

তাহার পরে বাঙলায় গণ-আন্দোলন—সিপাহী বিদ্রোহের অল্পদিন পরে নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিবাদে। তাহাই এদেশে সমগ্র ভারতে—প্রথম সত্যাগ্রহ। কিভাবে বাঙলার প্রজারা—নরনারী সকলেই সেই সত্যাগ্রহে যোগ দিয়া তাহা সাফল্য সমুজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আজ দিবার স্থান নাই।

তবে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা যে নব ভাবের শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাও প্রথম এই বাঙলায়। সেই শিক্ষা বাঙলার হিন্দুরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া তাহা প্রযুক্ত করিতেছিলেন, তহাতে এতদিনে অর্থাৎ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে যাহা হইয়াছে, তাহাই যে অনিবার্য তাহা কোন কোন দূরদর্শী ইংরেজ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে রিচার্ডস অন্যতম। তাঁহার বিরাট গ্রন্থ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—শিক্ষার বিস্তারলাভ ঘটিতেছে; অতঃপর তাহার গতিরোধ করা সম্ভব হইবে না। ....বিদ্যালয়, সাহিত্য সভা, মুদ্রিত পুস্তক এই সকলের সাহায্যে হিন্দুরা অল্পকাল মধ্যেই প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবে এবং তাহার ফলে যে শক্তির উদ্ভব হইবে, ৩ লক্ষ বৃটিশের অস্ত্র তাহা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে না। তিনি বলিয়াছিলেন—ইংরেজ সাবধান হও। তোমরা যদি কুটিল পথ বর্জন না কর—ন্যায় পথ অবলম্বন না কর, তবে অল্পকাল মধ্যেই তোমরা তোমাদিগের ভারত সাম্রাজ্যের পতনে বুঝিতে পারিবে বুদ্ধিমান জাতির স্বার্থের ও ইচ্ছার বিরোধী হইলে বাহুবল একান্তই অসার হয়।

আজ শতবর্ষেরও কিছু অধিককাল পরে তাঁহার সেই উক্তি পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি যেন ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন। যে স্বদেশী আন্দোলন—স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাহারই প্রবর্তনকালে বাঙলার দুইজন কবি সেই কথা বলিয়াছিলেন। প্রথম রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়াছিলেন—

"এদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই
বাঁধন টুটবে।
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
এদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি
ফুটবে;
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥

* * * *

এখন তোরা যতই গর্জাবে ভাই তন্দ্রা ততই
ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥
ওরা ভাঙতে যতই যাবে জোরে গড়বে ততই
দ্বিগুণ ক'রে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে
ঢেউ উঠবে॥
তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন
জগৎ-প্রভু,
ওরা ধর্ম যতই দলবে, ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে॥"

কাব্যবিশারদ ইংরেজকে বলিয়াছিলেনঃ—

"নীতি-বন্ধন করো না লঙ্ঘন
রাজ-ধর্ম আর প্রজার রঞ্জন;

হইয়ে রক্ষক হয়ো না ভক্ষক
অবিচারে রাজ্য থাকে না কখন।
করেছ কল্যুষে এ রাজ্য অর্জন
কল্যুষ কল্মষে করো না শাসন
অবাধে হবে না দুর্ব্বল দলন—
দুর্ব্বলের বল নিত্য নিরঞ্জন।

ধ্বংস কংসাসুরে যদুবংশ দল,
চন্দ্র-সূর্য বংশ গেছে রসাতল,
গৌরববিহীন পাঠান মোগল—
হয় পাপ-পথে সবার পতন।

কাল-জলধিতে জলবিম্বপ্রায়
উঠে কত শক্তি কত মিশে যায়;
তোমরা কি ছিলে উঠেছ কোথায়—
আবার পতনে লাগে কতক্ষণ?"

বাঙলায়—কলিকাতায় প্রথম ইংরেজি বদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত ও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তাহার নিজস্ব গৃহের ভিত্তি স্থাপন হয়। বাঙালীরা তাহাতে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার চেষ্টা সমর্থন করিয়া লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই এদেশের লোকের প্রতীচ্য শিক্ষালাভের আগ্রহ প্রকাশ পায়।

যে বৎসর রামমোহন ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই বৎসরেই যাহাকে আমরা "নিয়মানুগ আন্দোলন" বলি বাঙলায় তাহা প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস সেই পথ অবলম্বন করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সার টমাস মনরো মাদ্রাজের গভর্নর নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। কর্মভার গ্রহণের অল্পদিন পরেই তিনি এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলেন—

"সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সহিত বিদেশীর শাসনের সামঞ্জস্য নাই, কাজেই সেই দুইটি দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকিতে পারে না। স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রথম কর্তব্য কি? বিদেশীর শাসন হইতে স্বদেশের মুক্তিসাধন এবং সেই কার্যের জন্য সর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করাই স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রথম কর্তব্য।"

ইহা এদেশের বিদেশী শাসকরা বুঝিতেন। সেইজন্যই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তাঁহাদিগের চক্ষুশূলে ছিল। লর্ড মেটকাফ এদেশের সংবাদপত্রের মতপ্রকাশে স্বাধীনতা প্রদান করায় বিলাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক-দিগের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এবং সেই অপমানে বড়লাটের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এদেশে ইংরেজের শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহারা সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দানে বিমুখ ছিলেন। কেহ বা কেবল ভারতীয় ভাষায় চালিত সংবাদপত্রের, কেহ বা সকল ভাষায় চালিত সংবাদপত্রের অধিকার হরণ করিয়া—সত্য ও মত প্রচারের পথ বন্ধ করিয়া ন্যায়ের অবমাননা করিয়া গিয়াছেন। কত সংবাদপত্রকে অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছে ও কত পরিচালককে কারাদণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাহা বিবেচনা করিলেই এদেশে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধ হয়।

এদেশে বৃটিশ শাসনের প্রথম সময়ে ইংরেজ সংবাদপত্র সম্পাদকের পক্ষেও এদেশ হইতে বিতাড়িত হওয়া অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগের একজন—সিল্ক বাকিংহাম—এদেশ ত্যাগে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই আদেশ প্রচারের পক্ষকাল মধ্যেই বৃটিশ সরকার বাঙলায় (তখন বাঙলার বাহিরে বৃটিশের অধিকার বিস্তৃত হয় নাই)—শাসনের সুবিধার ও শান্তিরক্ষার অজুহাতে এক নিয়ম প্রণয়ন করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করিবার জন্য ১৫ই মার্চ তাঁহাদিগের সুপ্রীম কোর্টে দাখিল করেন। তাহাতে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। ১৫ই মার্চ ঐ "নিয়ম" সুপ্রীম কোর্টে মঞ্জুরীর জন্য দাখিল করা হইলে ১৭ই মার্চ—নিম্নলিখিত ৬ জন বাঙালী তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া এক আবেদন করেনঃ—

চন্দ্রকুমার ঠাকুর
দ্বারকানাথ ঠাকুর
রামমোহন রায়
হরচন্দ্র ঘোষ
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসন্নকুমার ঠাকুর

অবশ্য ইংরেজের আদালতে ইংরেজ সরকারের কৃত নিয়মের বিরুদ্ধে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু ৬ জন বাঙালী যে তাহা অনিবার্য জানিয়াও "নিয়মানুগ পদ্ধতিতে" তাঁহাদিগের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া-ছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। যখন ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বড়লাট হইয়া লর্ড মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন, তখন সে জন্য তিনি তাঁহার প্রভুদিগের ও অন্য স্বদেশীয়দিগের বিরাগভাজন হইলেও এদেশের লোক তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জ্ঞাপন করেন এবং মানপত্র দিয়াই সন্তুষ্ট না হইয়া সাহিত্যিক কার্যে ব্যবহারার্থ সাধারণের অর্থে একটি গৃহ নির্মাণ করাইয়া সেই "মেটকাফ হলে" তাঁহার নাম স্মরণীয় রাখিবার ব্যবস্থা করেন। কলিকাতার সাধারণ পাঠাগার ও এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির কার্যালয় ঐ গৃহে অবস্থিত ছিল। গঙ্গার কূলে ঐ গৃহ এখনও বিদ্যমান, কিন্তু তাহাতে আর জনসাধারণের অধিকার নাই। সোসাইটির কার্যালয় পূর্বেই তথা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পরে লর্ড কার্জন বড়লাট হইয়া আসিয়া ভারত সরকারের "ইম্পি-রিয়াল লাইব্রেরী" এক আইন করিয়া ঐ গৃহে আনিয়া কলিকাতার সাধারণ লাইব্রেরী তাহার দ্বারা গ্রাস করান। কিছুদিন পরে লাইব্রেরী অন্য গৃহে স্থানান্তরিত করা হয় এবং "মেটকাফ হল" সরকারের একটি কার্যালয়ে পরিণত করা হয়। জনগণকে তাহা-দিগের সম্পত্তিতে বঞ্চিত করা সংগত কিনা, তাহা কে বলিবে? যখন কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, তখন সরকার বে-আইনী আইন করিয়া অনাচার করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে অন্যায় ন্যায় হয় না। এখন আবার লাইব্রেরীটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

সে যাহাই হউক, যখন লর্ড মেটকাফকে অভিনন্দিত করা হয়, তখন এক সভায় দ্বারকা-নাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, তিনি যখন অন্য পাঁচ জনের সহিত একযোগে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টে "নিয়মের" বিরুদ্ধে আবেদন করেন, তখন কেহ কেহ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন, ইংরেজ সরকার তাঁহাকে ফাঁসি দিবেন। মহারাজা নন্দ-কুমারের ফাঁসির স্মৃতি তখনও লোক ভুলিতে পারে নাই—তাহাতে ইংরেজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য অন্যায় পথ অবলম্বনের আগ্রহ সপ্রকাশ ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রথম বার য়ুরোপে গমন করেন। তাঁহার য়ুরোপ গমন য়ুরোপে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন, দ্বারকানাথ ফ্রান্সে যাইলে তথাকার রাজা পরিষদসহ তাঁহার অনুষ্ঠিত এক সান্ধ্য সম্মিলনে আসিয়াছিলেন। যে গৃহে সম্মিলন হয় তাহা তখন ফ্রান্সে মহিলাদিগের পরম আদরের—কাশ্মীরী শালে সজ্জিত ছিল। সম্মিলনশেষে তিনি প্রত্যেক মহিলা অতিথির স্কন্ধে একখানি ঐ শাল উপহার ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন জর্জ টমসন নামক একজন ইংরেজ তথায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। টমসন বৃটিশ অধিকারে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধন জন্য আন্দোলন করিতে নানা নগরে বক্তৃতা করেন এবং আমে-রিকায়ও গমন করেন। তিনি ম্যাঞ্চেস্টার নগরে যে ৬টি বক্তৃতা করেন, সে সকল ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায়, বৃটেনের স্বার্থের সহিত ভারতবাসী-দিগের আর্থিক উন্নতির সামঞ্জস্য সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলেন, হিন্দুস্থানে বৃটেনের প্রজাদিগের অসহায় ও শোচনীয় অবস্থাপন্ন প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য—তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইলে কেবল যে তাহার দ্বারা অন্যান্য জাতিরও অবস্থার উন্নতি হইবে, তাহাই নহে, পরন্তু যে সকল হিন্দু ও মুসলমান দুর্ভিক্ষ ও

দেনা হইতে অব্যাহতিলাভ করিবে, তাহারা অন্তহীন ঐশ্বর্যের খনিতে কাজ করিবে এবং সেই ঐশ্বর্য বৃটেনের লাভ হইবে। বৃটেনের পক্ষেও পণ্যোপকরণ সংগ্রহকালে যে দেশের উপকরণ গ্রহণ করা সুবিধাজনক সেই দেশ হইতেই তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে—অর্থাৎ বৃটেন অল্প মূল্যেই উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে।

বৃটেনবাসীরা যেরূপ স্বার্থান্ধ তাহাতে তাহারা যদি বুঝিতে পারে, ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি সাধনে তাহাদিগেরও স্বার্থ-সিদ্ধি হইবে, তবে যে তাহাদিগের পক্ষে ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি সাধনে আপত্তি থাকিতে পারে না, তাহা বলা বহুল্য। বোধ হয়, সেইজনাই টমসনের কথায় তাহারা কর্ণপাত করিতেছিল। দ্বারকানাথ টমসনকে তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে যাইতে অনুরোধ করেন এবং টমসন সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন।

টমসন যে সময় কলিকাতায় উপস্থিত হয়েন, তাহাকে ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে সন্ধিক্ষণ বলিলে অসংগত হয় না; হয়ত তাহা মহেন্দ্রক্ষণও বলা যায়। তখন বাঙলার যুবকেরা ইংরেজী শিখিয়া আপনাদিগের অসহায় অবস্থা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছিলেন। মুসলমান শাসন ও বিদেশীর শাসন এবং তাহাতেও অনাচার ও অত্যাচার অনেক ছিল। কিন্তু নবীনচন্দ্র তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে মহারাণী ভবানীর মুখে যে উক্তি দিয়াছেন, তাহা অনেকের বিবেচ্য ছিলঃ—

"জানি আমি, যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্ধপঞ্চশতবর্ষ; এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু হয়ে বিদূরিত
জেতাজিত বিবভাব, আর্সত্ত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত।
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতিধর্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপজাত উপবৃক্ষ মত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।"

মুসলমান শাসকগণ এই দেশেই বাস করায় দেশের লোকের শোষিত অর্থ দেশেই থাকিত ও ব্যয়িত হইত। ইংরেজ শাসনে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় পরাধীনতার দুঃখ যেমন অধিক অনুভূত হইতেছিল, তেমনই দেশের লোক আপনাদিগের অধিকার সঙ্কোচও বুঝিতেছিল। সেই সকল কারণে কলিকাতার শিক্ষিত তরুণগণ দেশাত্মবোধের প্রেরণা অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু সেই দেশাত্মবোধ কোন পথে—কোন উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিবেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

সেই সময় বৃটেনের রাজনীতিক আন্দোলনের আদর্শ লইয়া আসিয়া টমসন তাহা বাঙলার ইংরেজী শিক্ষিত তরুণদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। কাজেই তাঁহার আগমন এদেশে জাতীয় আন্দোলনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিল।

তখন কলিকাতায় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কাজেই তাঁহারা জর্জ টমসনের উপস্থিতির সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। টমসন ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে সকলের মধ্যে কতকগুলির বিবরণ পাওয়া যায়।

২০শে এপ্রিল যে সভা হয়, তাহাতে বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা ভারতের কল্যাণ কামনা করেন তাঁহাদিগের সম্প্রীতিপূর্ণ সহযোগ এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও সমাজে স্থান, জন্মস্থান নির্বিশেষে বৃটিশ সরকারের স্থায়িত্ব ও যোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। যখন বৃটিশ সরকারের স্থায়িত্ব কামনা লইয়া সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যে গৃহীত চতুর্থ প্রস্তাবে বৃটিশ রাজ্যের রাজার প্রতি আনুগত্য রক্ষার কথা থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ইহার ৪০ বৎসরেরও অধিককাল পরে এদেশে ইংরেজ সরকারের নির্বিঘ্নতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই ইংরেজ হিউম কংগ্রেসের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যখন হিউম রাণী ভিক্টোরিয়ার জয়োচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন চারিদিক হইতে তুমুল হর্ষধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল। বৃটেনের রাজার প্রতি আনুগত্য ইংরেজমাত্রেরই "ধর্ম" এবং তখন এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাহার প্রভাব হইতে অব্যাহতিলাভ করেন নাই। জীবনের সায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—"জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলাম,—ইউরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে।" তাহাও সেই প্রভাবের অন্যতম কারণ।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী ও জমীদার সভা সম্মিলিত হইয়া বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে পরিণত হয়। ভারতে ইহাই ঐ শ্রেণীর প্রথম প্রতিষ্ঠান।

জর্জ টমসনের প্রধান যে কীর্তি—দেশাত্ম-বোধের সেই শৈশবে যে সকল শিক্ষিত বাঙালী যুবক জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহা-দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। সেই সঙ্ঘে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের অগ্রণী ও প্রবর্তক।

ইঁহাদিগের চিন্তার ও ভাবের ধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা অল্পদিনের মধ্যেই সপ্রকাশ হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের গৃহে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে যে সভা হয়, তাহাতে দক্ষিণারঞ্জন 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচারালয়ের ও পুলিশের বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ প্রবন্ধ রাজদ্রোহদ্যোতক মনে করিয়া সভা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করেন—বলেন, তিনি কলেজ রাজ-দ্রোহীদিগের আড্ডায় পরিণত হইতে দিবেন না। তাঁহার ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া যুবকগণ হিন্দু কলেজের গৃহে সভা করা বন্ধ করিলে ডক্টর দ্বারকানাথ গুপ্ত ও ডক্টর গৌরীশঙ্কর মিত্র ফৌজদারী বালাখানায় তাঁহাদিগের ডাক্তারখানা বড়ীর দ্বিতল সভাধিবেশন জন্য ব্যবহার করিতে দেন।

টমসনের অনেক বক্তৃতাও এই স্থানে ও উল্টাডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে হইয়াছিল। এই বাগানবাড়ি বর্তমান রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ সম্পত্তি পাইয়া অজরনাথ মিত্র উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করিলে উহাতে এখন বহু বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে। মূল গৃহখানি এখনও বিদ্যমান।

রামগোপাল ঘোষ পরে রাজনীতিক কার্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলায় তাঁহাকেই দেশবাৎসল্যের প্রথম পরি-চায়ক বলিয়াছেন।

সেই সময় হইতে বাঙলায় রাজনীতিক আন্দোলন দিন দিন ব্যাপ্তিলাভ করিতে থাকে এবং বাঙলার তরুণেরা তাহাতে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। এদিকে কেবল বক্তৃতায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না বুঝিয়া সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতারা প্রথমে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্র প্রচার করিতে থাকেন এবং তাহাই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে পরিণত হয়। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই পত্রে তাঁহাদিগের সহকারী থাকিয়া ক্রমে তাহার সম্পাদক হইয়া সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ করেন। লর্ড ডালহৌসী বড়লাট হইয়া আসিয়া যখন নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া কতকগুলি সামন্ত রাজ্য বৃটিশের অধিকারভুক্ত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন, তখন হরিশচন্দ্র সেই নীতির তীব্র নিন্দা করেন। বাঙলার নীলকর-দিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি যে কাজ করেন, তাহা এদেশের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে কৌতূহলী পাঠক নীলকরদিগের অত্যাচারের পরিচয় পাইবেন। সেই নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করায় পাদ্রী লং কারাদণ্ড ভোগ করেন এবং তাহা সরকারের ব্যয়ে প্রচার করার অপরাধে সরকারী কর্মচারী সিটনকারের পদপরিবর্তন হয়। নীলকরদিগের

বরুদ্ধে আন্দোলনজনিত অতি শ্রমে অকালে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সেই সময় বাঙলার পল্লীগ্রামেও "ধীরাজের" গান শুনা হইত ঃ—

"নীল বাঁদরে সোনার বাঙলা করলে
এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লং-এর হ'ল কারাগার।
প্রজার হ'ল প্রাণ বাঁচান ভার।"

মাদ্রাজের পরমেশ্বরণ পিলাই বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য সাংবাদিকদিগের মধ্যে হরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম।"

'হিন্দু পেট্রিয়টের' পরে বহু সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশাত্মবোধের প্রচারে ও রাজনীতিক কার্যে এই সকল পত্রের কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সহসা—অতর্কিতভাবে আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাবের মত—সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিল। সিপাহী বিদ্রোহ তুচ্ছ ঘটনা—একবার বারিপাত মাত্র বলিলে অসঙ্গত হইবে। তাহা প্রাকৃতিক দুর্যোগের—ভূমিকম্পের বা প্রবল ঝড়ের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য। তাহাতে বিদেশী সরকারের চমক ভাঙিয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সিপাহী বিদ্রোহকে কয়জন ষড়যন্ত্রকারীর কাজ মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কাণপুরের য়ুরোপীয় হত্যা প্রভৃতি কয়টি ঘটনার কথা বলিয়া ভারতীয়দিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুরতার নিন্দা করিয়া সভ্য জগতে আপনাদিগের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। নিষ্ঠুরতা যদি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তবে উভয় পক্ষেই তাহা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ রুশ চিত্রকর ভারেস্টাগিন "ভারতে ইংরেজ কর্তৃক প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা" নামক যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে ইংরেজের নিষ্ঠুরতার পরিচয় সপ্রকাশ। তাহাতে চিত্রিত হইয়াছে—একজন বৃদ্ধ মুসলমানকে কামানের মুখে বাঁধিয়া তোপে সহস্র খণ্ড করিয়া উড়াইয়া দিবার আয়োজন হইতেছে। এই প্রসিদ্ধ চিত্রকর যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের কুব্যবহার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। রুশিয়ার স্বৈরশাসনে অভ্যস্ত ব্যক্তির নিকটও এদেশে ইংরেজের ব্যবহার নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

যখন ইংরেজরা আপনাদিগের দোষ গোপন করিবার জন্য একদিকে ভারতীয়দিগের অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুরতা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে এবং আর একদিকে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যে হইয়া ভারতবাসীকে অত্যাচারে ভীতিবিহ্বল করিতে ব্যস্ত তখনও বড়লাট লর্ড ক্যানিং নিরপেক্ষ থাকিবার চেষ্টা করিয়া এদেশে ইংরেজদিগের দ্বারা ঘৃণিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঘৃণাভরে তাঁহাকে "দয়ালু ক্যানিং" বলিত। ইংরেজের মিথ্যাচরণই কিন্তু সিপাহীদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। তখন সৈনিকদিগের বন্দুকে যে টোটা ব্যবহৃত হইত, তাহা দন্তে কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। তাহা গরুর ও শূকরের চর্বিতে সিক্ত করা থাকিত। তাহা অবগত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা তাহা ব্যবহার করিতে আপত্তি করে; তাহাতে তাহাদিগের ধর্মহানি হয়। কিন্তু ইংরেজ রাজকর্মচারীরা অনায়াসে মিথ্যা কথা বলেন—যাহাতে টোটা সিক্ত করা থাকে, তাহাতে গরুর বা শূকরের চর্বি থাকে না! সিপাহীরা কিন্তু প্রকৃত কথা জানিতে পারিয়া বিদ্রোহী হয়। তাহারা বিদ্রোহী হইবার পরে তাহারা অন্যান্য কারণে ইংরেজদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিদিগের দ্বারা চালিত হইয়াছিল।

এদেশে ইংরেজরা ভারতীয়দিগকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে এবং লর্ড ক্যানিং এক বৎসরের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করেন। সেই অবস্থায় দেশে রাজনীতিক আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হয়। কিন্তু সে আন্দোলন আর বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য তাহা মন্দ গতি হইলেও সুযোগ পাইলেই প্রবল হইবার অপেক্ষায় ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের কয় বৎসর মাত্র পরে বাঙলায় নীলকরদিগের অত্যাচার দূর করিবার জন্য প্রজার সত্যাগ্রহের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহা বড়লাটকেও শঙ্কিত ও চিন্তিত করিয়াছিল এবং তাহার সাফল্যও অসাধারণ।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্রই একদিকে তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে সংবাদপত্রের প্রভাব অনুভব করিতে এবং অপরদিকে ইংরেজ শাসকদিগকে সংবাদপত্রের রচনায় লোকের মনোভাব বুঝিতে শিক্ষা দেন। অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার পরে ঐ পত্রের সম্পাদকরূপে কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার আরব্ধ কার্য অগ্রসর করিতে থাকেন।

কৃষ্ণদাস জমিদার সভার সম্পাদক এবং সাংবাদিক হিসাবে ধীরপন্থী হইলেও তাঁহাকে একাধিকবার শাসকদিগের কার্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে হইয়াছিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধিস্থানীয় রাজনীতিকগণ ডাবলিন সহরে সমবেত হইয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহাতে বলা হয়—তাঁহাদিগের মত এই যে, আয়র্লণ্ডের কার্য আইরিশদিগের পরিচালনাধীন না হইলে সে দেশের লোকের অভিযোগের অবসান হইবে না। তখনই আয়র্লণ্ডে "হোমরুল"—স্বায়ত্ত শাসন আন্দোলনের আরম্ভ হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আরও ব্যাপক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা "হোম রুল লীগ" প্রতিষ্ঠিত হয়।

আয়র্লণ্ডও ভারতবর্ষের মত ইংরেজদের অধীন দেশ ছিল। কৃষ্ণদাস কিরূপ মনোযোগ সহকারে অন্যান্য পরাধীন দেশে মুক্তির আন্দোলন লক্ষ্য করিতেন, তাহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে "ভারত হোম রুল" শীর্ষক 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত প্রবন্ধে বুঝিতে পারা যায়। ঐ প্রবন্ধে তিনি আইরিশ নেতা বাটের যুক্তির বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, বিলাতে পার্লামেণ্টে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থায় এদেশের সমস্যার সমাধান হইবে না। এদেশে হোম রুল প্রবর্তিত করিয়া এদেশেই দেশবাসীর দ্বারা দেশ শাসন করিতে হইবে। বৃটেনের বহু উপনিবেশ ভারতবর্ষের তুলনায় আকারে ও লোকসংখ্যায় ক্ষুদ্র হইলেও দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভ করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা পায় নাই। ভারতবাসীর স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভের যোগ্যতায় যাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করেন, কৃষ্ণদাস তাঁহাদিগের যুক্তির অসারত্ব প্রতিপন্ন করেন এবং দেখাইয়া দেন, ভারতবর্ষে ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীর অধিকার উল্লেখেরও অযোগ্য—তথায় সরকারী কর্মচারীরাই প্রবল পক্ষ এবং তাঁহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা বেসরকারী সদস্যদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। দেশে কর ধার্য করা সম্বন্ধে যদি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের কোন অধিকার না থাকে, তবে সে ব্যবস্থাপক সভার লোকের প্রতিনিধি সভা বলিয়া বিবেচিত হইবার দাবী থাকিতে পারে না। সেইজন্য ভারতবাসীরা হোম রুল চাহিবেন—ইহাই কৃষ্ণদাস বলেন।

ডক্টর বেসাণ্ট এদেশের জন্য হোম রুল আন্দোলন প্রবর্তিত করিবার বহু পূর্বে কৃষ্ণদাস হোম রুল চাহিয়াছিলেন।

কলিকাতা যেমন তখন সমগ্র ভারতের রাজধানী তেমনই রাজনীতিক আন্দোলনেরও কেন্দ্র। সেই কেন্দ্র হইতে রাজনীতিক আন্দোলন সমগ্র ভারতে ব্যাপ্তিলাভ করিত। সমগ্র ভারত রাজনীতিক ব্যাপারে কলিকাতার নেতৃত্ব স্বীকার করিত।

আনন্দমোহন বসু যে ব্রাহ্ম সমাজের লোক ছিলেন, সেই ব্রাহ্মসমাজ কেবল ধর্ম বিষয়ে নহে, পরন্তু সকল বিষয়ে মুক্তির জন্য কাজ করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা বাঙলায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আনন্দমোহন বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই সমাজের লোক ছিলেন। বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আনন্দমোহন ছাত্রদিগকে রাজনীতিক কার্যে প্রণোদিত করিবার জন্য "স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাতে যোগদান করিলে উভয়ের চেষ্টায় তাহা শক্তিশালী হইয়া উঠে। তখনই তাঁহারা এদেশের (কেবল বাঙলার নহে) মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য একটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন ঃ—

"তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতে আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষের কর্ম নয়; অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক।"

এই অভাবানুভূতির ফলে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই এক সভা করিয়া—রাজনীতিক কার্যের জন্য "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা প্রতিষ্ঠার পরে—এক বৎসরের মধ্যেই বিলাতে ভারতসচিব ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ জন্য পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর বয়স ২১ বৎসর হইতে ১৯ বৎসর করেন। একে এদেশের তরুণদিগের পক্ষে বিলাতে যাইয়া পরীক্ষা প্রদানের পথে নানা বিঘ্ন—তাহাতে বয়স ১৯ বৎসর হইলে তাহাদিগের সেই পরীক্ষা প্রদানের পথ আরও বিঘ্নবহুল হইবে। হয়ত সেইজন্যই ভারতসচিব লর্ড সলসবেরী সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারত সভা তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। স্থির হয়, সে বিষয়ে পার্লামেণ্টে এক আবেদন-পত্র প্রদান করা হইবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে লোকমত গঠিত করিয়া সেই আবেদন-পত্রে লোকের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হইবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া সভা করিয়া, লোকমত জাগ্রত করিয়া লোকের স্বাক্ষর গ্রহণের ভার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া হইলে তিনি প্রথম উত্তর ভারতে গমন করেন। তিনি নানা প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া যে সকল সভা করেন, সেই সকলে ভারতে জাতীয়তার উদ্বোধন হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার কার্যের অসাধারণ সাফল্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণে যাইতে বলিলে তিনি মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও গমন করেন। তখনই বুঝিতে পারা যায়, সমগ্র দেশ প্রস্তুত হইয়া কেবল নেতার নির্দেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। চারিদিকে নব-জাগরণের লক্ষণ দেখা গেল।

হেনরী কটন তাঁহার 'নিউ ইণ্ডিয়া' পুস্তকে সুরেন্দ্রনাথের এই পরিভ্রমণের কথায় বলিয়াছেন :—

ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের মস্তিষ্ক ও দেশের কথা তাঁহারাই ব্যক্ত করেন। এখন বাঙালীরাই পেশওয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র ভারতে লোকমত নিয়ন্ত্রিত করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা শিক্ষায় ও রাজনীতিক স্বাধীনতাবোধে বাঙালীদিগের সমকক্ষ না হইলেও সে বিষয়ে বাঙালীদিগের অনুসরণ করিতেছেন। ২৫ বৎসর পূর্বেও ইহার চিহ্নমাত্র ছিল না এবং পাঞ্জাবে বাঙালীর প্রভাব লর্ড লরেন্স, মণ্টগোমারী বা ম্যাকলাউডের কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু গত বৎসর একজন বাঙালী যে ইংরেজিতে বক্তৃতা করিয়া উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন, তাহা রাজোচিত শোভাযাত্রার আকার ধারণ করিয়াছিল। আজ বর্তমান সময়ের তরুণদিগের নিকট সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে মুলতানে যেমন, ঢাকায়ও তেমনই উৎসাহের সঞ্চার হয়।"

সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষকে দেশাত্মবোধে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

পার্লামেণ্টে পেশ করিবার জন্য আবেদনপত্র লইয়া যাইবার ভার দিয়া লালমোহন ঘোষকে বিলাতে পাঠান হয়। তখনও তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত ছিল। তাহা আত্মপ্রকাশ করিলে বিলাতের লোক তাহার ঔজ্জ্বল্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়। উইলিয়ম ডিগবী বলিয়াছেন, বিলাতে তৎকালীন বক্তা-দিগের শিরোমণি ব্রাইটের সহিত লালমোহন এক মঞ্চ হইতে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং তাঁহার সমকক্ষ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছেন। বিলাতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে—জন ব্রাইটের সভাপতিত্বে তিনি বড়লাট লর্ড লিটনের ভারতীয় নীতি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বিলাতের তৎকালীন মন্ত্রিমণ্ডল ভয় পাইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারতে "স্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিস" পরীক্ষার জন্য নিয়ম করেন। সেই নিয়ম ৭ বৎসর তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভারতবাসীর মধ্যে লালমোহনই প্রথম বিলাতে পার্লামেণ্টে সভ্যপদ প্রার্থী হইয়া-ছিলেন। বিলাতের উদারনীতিক দল তাঁহাকে প্রার্থী মনোনীত করেন। নির্বাচনের মাত্র ৪ দিন পূর্বে যদি আইরিশ নেতা পার্নেল আইরিশ নির্বাচকদিগকে উদারনীতিক দলের মনোনীত প্রার্থীদিগকে ভোট দিতে নিষেধ না করিতেন, তবে যে লালমোহন নির্বাচিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যে ৩ হাজার ৫ শত ৬০ জন ইংরেজ নির্বাচকের ভোট পাইয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার চেষ্টায় বৃটেনের লোকের মনোযোগ ভারতীয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি সেবার নির্বাচনে পরাভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু সে পরাভবের গৌরব জয়ের গৌরব অপেক্ষা অধিক।

ইহার পরে এদেশের রাজনীতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয়দিগের আন্দোলন। এই আন্দোলনে ইংরেজদের সঙ্গে ফিরিঙ্গী, ইহুদী, আর্মেনিয়ান—সকলে যোগ দেওয়ায় হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন :—

"চির শিক্ষা বৃটেনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাব—টুট্ টুট্ টুট্!
ধুপছাড়া ভায়ারা সবে শুনে তবে বলি,
আরমেনিয়া যাও হে কেহ—কেহ চুণাগলি।"

প্রেসিডেন্সী শহরে যে শ্রেণীর ভারতীয় রাজকর্মচারীরা য়ুরোপীয় বৃটিশপ্রজার বিচার করিতে পারেন, মফঃস্বলেও সেই শ্রেণীর ভারতীয় বিচারকদিগকে সেই অধিকার দিবার প্রস্তাব ইলবার্ট বিলে ছিল। অধিকার অতি সামান্য—অতি সঙ্গত। কিন্তু এদেশে য়ুরোপীয়রা তাহাতে উগ্র হইয়া উঠেন—

"গেল রাজ্য, গেল মান,
ডাকিল 'ইংলিশম্যান,"
ডাক ছাড়ে ব্রানসন,
কেশুইক, মিলার—
'নেটিবের' কাছে খাড়া নেভার—নেভার।"

বড়লাট লর্ড রিপন ঐ বিলের সমর্থক থাকায় অপমানিত হয়েন—এমন কি বলপূর্বক লাটপ্রাসাদের রক্ষীদিগকে পরাভূত করিয়া বড়লাটকে ধরিয়া কলিকাতা চাঁদপাল ঘাটে জাহাজে তুলিয়া বিলাতে পাঠাইবার ষড়যন্ত্রও হইয়াছিল।

কলিকাতা টাউন হলে এক সভায় ব্যারিস্টার ব্রানসন প্রভৃতি এদেশের লোককে অশিষ্ট, অভদ্র ভাষায় গালি দেন। লালমোহন ঘোষ এক বক্তৃতায় তাহার উপযুক্ত উত্তর দিয়া বলেন—এই সকল লোক যদি কখন কোন সভাদিতে উপস্থিত হয়, তবে যেন তাহাদিগকে এমনভাবে অপমানিত করা হয় যে, তাহারা এ দেশ ত্যাগ করে। লালমোহনের এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নীরা ব্রানসনকে মামলায় ব্যারিস্টার নিযুক্ত করিতে বিরত হইলে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাঙলা এইরূপে উদ্ধত য়ুরোপীয়কে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "জাতীয় ধনভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই বৎসর নানা স্থানের প্রতিনিধিগণকে লইয়া কলিকাতায় তিনদিনব্যাপী জাতীয় কন্‌ফারেন্স হয়। তাহার বিবরণ ইংরেজ ব্লাণ্ট তাঁহার পুস্তকে দিয়াছেন। এই কনফারেন্সই পরে কংগ্রেসে পরিণত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন বোম্বাই শহরে বাঙালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেই সময়েই কলিকাতায় কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

ব্লাণ্ট বলিয়াছেন, বেসরকারী য়ুরোপীয়রা বিশেষ চা-কর প্রভৃতি যেরূপ অনায়াসে তাহাদিগের ভারতীয় ভৃত্যদিগকে প্রহার করে, সময় সময় হত্যা করে তাহা নিবারণ করা ইলবার্ট বিলের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এদেশে ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রে সে বিলের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়, এমন কি বলা হয় যে, উহা আইনে পরিণত হইলে য়ুরোপীয় মহিলারাও ভারতীয়দিগের ষড়যন্ত্রে লাঞ্ছিতা হইবেন।

"নেভার" সে অপমান,
হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান

আমাদের "জানানা"
দেহে প্রাণ, বিবিজান,
কখন তা হবে না!

লর্ড রিপনকে আক্রমণে য়ুরোপীয় রাজকর্মচারীরাও উৎসাহ দিতে থাকেন। ক্রমে বিলাতের সংবাদপত্রেও এদেশের য়ুরোপীয়দিগের মত প্রতিধ্বনিত হয়। রাণী ভিক্টোরিয়াও বিচলিত হয়েন।

শেষে সার অকল্যাণ্ড কলভিনের চেষ্টায় একটা "মীমাংসা" হয়। তাহাতে বিলের সমর্থকদিগের সম্পূর্ণ পরাভব হয়। ব্লাণ্ট বলিয়াছেন, তখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন। সে সময় মনে হইয়াছিল, ভারতীয়দিগের প্রতিবাদ কেবল কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। কিন্তু লর্ড রিপন ভারতীয়দিগের প্রিয় ছিলেন এবং তিনি যে ন্যায়ের পথই গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিয়াই ভারতবাসীরা কোন উগ্র ব্যবস্থা অবলম্বনে বিরত থাকেন। ভারতীয় নেতারা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা শান্ত না থাকিলে ভবিষ্যতে কোন বড়লাটই ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থন করিতে সাহস করিবেন না।

কিন্তু হেমচন্দ্রের "মন্ত্র-সাধন" কবিতায় লর্ড রিপনকেও "মনুষ্য-হৃদয় সহিত খেলার জন্য তিরস্কার করিয়া বলা হয়ঃ—

"না হৈও নিরাশ, ভারত-সন্তান;
সাহস উৎসাহে যে গর্ব নির্বাণ
করিলে অনার্যে—আজও সে বিধান
এ মহা-মন্ত্রের সাধন-প্রথা।"

এই কথা ভারতবাসী ভুলে নাই। তবে তাহার সেই মহা-মন্ত্রের সাধনে বিলম্ব হইয়াছে, এই মাত্র। বাঙলায় বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষ করিয়া যে স্বাধীনতা-আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়।

লর্ড রিপন ভারতবাসীর অতি সামান্য অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। কিন্তু সেইজন্য কৃতজ্ঞ ভারতবাসীরা তাঁহাকে যেভাবে বিদায়ী সম্বর্ধনায় সম্মানিত করেন, তাহা ভারতে অভূতপূর্ব। তাঁহার পরবর্তী বড়লাট লর্ড ডাফারিনের যে জীবনচরিত বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের আছে, তাহা পূর্বে ব্যারিস্টার নর্টনের ছিল। তাহাতে নর্টনের স্বহস্তলিখিত মন্তব্যে দেখা যায়, যাহাতে বোম্বাইএ লর্ড রিপণকে যেরূপে সম্বর্ধিত করা হইয়াছিল, কলিকাতায় তাঁহাকে সেইরূপে সম্বর্ধিত করা হয়; সেজন্য তিনি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির নিকট গোপনে প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি অত্যন্ত তীব্র হয়েন।

ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয়দিগের আন্দোলনের সাফল্যে ভারতবাসী বুঝিতে পারেন, যেভাবে এদেশে রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালিত হইতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইবেই। সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বহুপূর্বে যেমন আন্দোলন কালেও তেমনই বুঝাইয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত একটি কবিতার একাংশ এইরূপঃ—

"শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকার!
'ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও' সার;
দেহি দেহি দেহি—বল বার বার
না পেলে গালি দাও মিছামিছি।
দানের অযোগ্য চাও তবু দান,
মানের অযোগ্য চাও তবু মান,
বাঁচিতে অযোগ্য, রাখ তবু প্রাণ,
ছি ছি ছি ছি ছি ছি ছি! ছি! ছি! ছি!"

ইহার বহুবর্ষ পরে রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই লিখিয়াছিলেন—

" 'দাও দাও' বলে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু
যদি মান পেতে চাও প্রাণ পেতে দাও
প্রাণ আগে কর দান।"

লর্ড রিপনের বিদায়ী সম্বর্ধনায় ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা উপলব্ধ হয়। সেই উপলব্ধির ফলে বোম্বাই নগরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঙালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। সে অধিবেশনে বোধ হয় ৭২ জন লোক উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা কেহই নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। তখন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য—

(১) সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যাঁহারা ভারতের কল্যাণকর কার্যে নিযুক্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয়;

(২) দেশবৎসলদিগের মধ্যে প্রাদেশিক, সাম্প্রদায়িক বা ধর্মোদ্ভূত কুসংস্কার দূরীকরণ;

(৩) প্রয়োজনীয় ভারতীয় ব্যাপারে শিক্ষিত ভারতীয়দিগের মত সংগ্রহ;

(৪) পরবর্তী দ্বাদশ মাসের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ।

রাজনীতির কথা, বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই গোপন রাখা হইয়াছিল।

কিন্তু কলিকাতায় পরবর্তী অধিবেশনেই কংগ্রেস জাতীয় প্রতিনিধি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠা রূপে গ্রহণ করে। সে অধিবেশনে প্রতিনিধি সংখ্যা ৪ শত ৩৬—প্রত্যেকেই নির্বাচিত। সেবার আলোচিত প্রস্তাবসমূহ রাজনীতিক বিষয় সম্বন্ধীয়। প্রসিদ্ধ কবি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেবার প্রতিনিধিদিগকে অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে বলেন—ভবিষ্যতে আমরা ব্যক্তি বা পরিবার হিসাবে বাস না করিয়া জাতিরূপে বাস করিব।

এদেশে য়ুরোপীয়গণ কংগ্রেসের এইরূপ সংকল্প দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন। যে লর্ড ডাফারিন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় মিস্টার হিউমকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনিই কংগ্রেসকে "অজ্ঞাত রাজ্যে লম্ফ" ও কংগ্রেসপন্থীদিগকে "মুষ্টিমেয় মাত্র" বলিলেন। তিনি কি তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কংগ্রেস যে পথ গ্রহণ করিয়াছে, সেই পথে ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করিবে?

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে পথ গৃহীত হয়, কংগ্রেস সেই পথে ২০ বৎসরকাল অগ্রসর হইয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাতেই নূতন কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করে; সভাপতি দাদাভাই নৌরজী বলেন—স্বরাজ আমাদিগের কাম্য; আর কংগ্রেস বাঙালীর দ্বারা রাজনীতিক অস্ত্র হিসাবে বৃটিশ পণ্য বর্জন সমর্থন করিতে বাধ্য হয়। সে সমর্থন কংগ্রেসের বহুমতে হয়।

সেই পরিবর্তনের কারণ—বাঙলায় বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষ্য করিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলন। সরকার বাঙালীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গ-বিভাগে কৃতসংকল্প হইলেই বাঙলার লোক তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সে আন্দোলন দেশব্যাপী স্বাধীনতার আন্দোলন। বিদেশী সরকার সেই আন্দোলন দলিত করিবার জন্য যেমন উগ্র নীতি প্রবর্তন করেন, লোক তেমনই তাহা প্রযুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হয়। বাঙলা তখন রাজনীতিক আদর্শ ঘোষণা করে—বিদেশীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কলিকাতায় 'সন্ধ্যা' সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে বলেন, তিনি বিধাতার নির্দিষ্ট স্বরাজ-সাধনায় যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য বিদেশী আমলাতন্ত্রের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন।

এই নূতন ভাব বাঙলায় আত্মপ্রকাশ করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। বাঙলার মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অরবিন্দ দেখাইয়াছেন। অরবিন্দ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন রাজনীতিক আন্দোলনের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া 'লোক-রহস্যে' ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তাহাকে বিদ্রূপ করেন এবং কেবল বিদ্রূপ করিয়া—তাহার ত্রুটি দেখাইয়া নিরস্ত না হইয়া দেশের মুক্তির জন্য কি প্রয়োজন, তাহা দেখাইয়াছিলেন—দেখিয়াছিলেন ও দেখাইয়াছিলেন প্রজাশক্তির প্রতিক্রিয়া দ্বারা রাজশক্তি প্রহত করিতে হয়। তিনি লোককে ভিক্ষা-নীতি বর্জন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে বলেন—তাঁহার জননীর হস্তে ভিক্ষাপাত্র নাই, তাঁহার দ্বিসপ্ত কোটি ভুজে "খর করবালে"। তিনি 'আনন্দ-মঠে' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে শক্তি-মন্ত্র প্রদান করেন এবং দেখান, বাহুবল নৈতিক বলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; নৈতিক বললাভের জন্য প্রথমে ত্যাগের প্রয়োজন—ত্যাগ দেশের জন্য সর্বস্ব পণ, দেশকে মুক্ত করিতে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ। তাঁহার কর্মী ও যোদ্ধারা বৈরাগী—তাঁহার দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আর সব আনন্দ বর্জন করিয়া কেবল দেশসেবায় নিযুক্ত। কারণ, যিনি স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিকে দেশ অপেক্ষা অধিক

ভালবাসেন, তাঁহার দ্বারা দেশোদ্ধার সম্ভব নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, নৈতিক শক্তিলাভ করিতে হইলে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সঙ্ঘবদ্ধতা প্রয়োজন। সেইজন্যই দেবী চৌধুরাণীর শিক্ষার ব্যবস্থা—আনন্দমঠের সঙ্ঘ নিয়মের কঠোরতা। তিনি দেখাইয়া দেন—নৈতিক বল লাভের জন্য তৃতীয় প্রয়োজন রাজনীতিক কার্যে ধর্মের প্রেরণা ও প্রয়োগ। 'ধর্মতত্ত্বে' তাহার আভাস—'কৃষ্ণচরিত্রে' পূর্ণ কর্মযোগের আদর্শ প্রতিষ্ঠা। এই নৈতিক শক্তির সাধনার স্বরূপ "বন্দে মাতরম" সঙ্গীতে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নূতন দেশাত্মবোধের গুরু।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রারম্ভে বাঙালীর মৃত্যুঞ্জয়ী কার্য সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে—বাঙলার আন্দোলনে স্বদেশী প্রভৃতি সকল জাতীয় আন্দোলন স্থান লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য বাঙলা কেবল জাতীয়তার জন্মস্থান ও বাল্যলীলার ক্ষেত্রই নহে—দেশাত্মবোধের রণ-ক্ষেত্রও বটে। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতবাসী জয়লাভ করিয়াছে।

বাঙলার "হিন্দু মেলা" সর্বপ্রথম উল্লেখ-যোগ্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। তাহার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সব ভারত সন্তান" গান রচিত হয়।

বাঙলায় রাজা রামমোহন রায় প্রথমে স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। বাঙলায় প্রথম দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ যুবকগণ সমবেত চেষ্টায় রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং সেই সময়ে যে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই ভারতে সেই শ্রেণীর প্রথম প্রতিষ্ঠান। বাঙলায় কংগ্রেসের পূর্বগামী জাতীয় সম্মেলন আহূত হয়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বাঙালী। বাঙলাই জাতীয় আন্দোলনকে মুক্তির আন্দোলনে পরিণত করিয়া তাহার সংগ্রাম রূপ প্রদান করে এবং বাঙালী তরুণ যেমন প্রথম বোমা নিক্ষেপ করে—তাহার সঙ্গী বাঙালী তরুণ তেমনই পুলিশের নিকট ধরা না পড়িয়া আত্মহত্যা করে। কারাগারেও বিশ্বাসঘাতক সহকর্মীকে গুলী করিয়া মারিয়া বাঙালী যুবক হাসিতে হাসিতে মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়া ফাঁসি যায়। বাঙলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বর্তমান যুগে প্রথম ইংরেজের সহিত যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। বাঙলায় দেশাত্মবোধের "অপরাধ" ধর্মে পরিণত হয়। বাঙলার লোকমত বঙ্গ বিভাগ নাকচ করাইয়া আপনার শক্তি প্রকট করিয়াছিল। বাঙলায় সংবাদপত্র সম্পাদক প্রথম ইংরেজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া বলেন, স্বরাজের কার্যের জন্য তিনি বিদেশী আমলাতন্ত্রের নিকট কৈফিয়ৎ দিবেন না। বাঙলা স্বদেশীর সূত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মিলন স্থাপন করে এবং বাঙলায় মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, মুন্সী দেদার বক্স, ডক্টর গফুর ও আবদুল হোসেন হিন্দুর সহিত দেশসেবায় সহযোগ করেন। বাঙলা স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্তিত করিয়া বৃটিশ বয়কট আরম্ভ করে। বাঙলায় জাতীয় অগ্রগামী দলের মুখপত্র 'বন্দে মাতরম' ঘোষণা করেন—বিদেশীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতাই আমরা চাহি। বাঙলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম তাঁহার তূর্যনাদে দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান করেন। বাঙলাই রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলকের পক্ষ সমর্থন জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যবহারজীবীদিগকে বোম্বাইয়ে পাঠাইয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাঙালী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা ইংরেজ-শাসিত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙলাই ভারতবর্ষকে "বন্দে মাতরম" মন্ত্র দিয়াছে।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পরেও বাঙলার অবদান অসামান্য। ডক্টর বেসাণ্ট ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দানের "অপরাধে" বৃটিশ সরকার কর্তৃক আটক থাকায় বাঙলাই তাঁহাকে কংগ্রেসের সভানেতৃত্ব প্রদান করে। লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে বাঙলায় কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের সহিত অসহযোগ নীতি গ্রহণ করে।

গয়ায় নির্বাণ-মুক্তির সন্ধান পাইয়া বুদ্ধ যেমন ধর্মচক্র প্রবর্তন জন্য বারাণসীতে গমন করিয়াছিলেন, তেমনই আপনার অনুশীলন-তীক্ষ্ণ প্রতিভা দেশসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য অরবিন্দ বরদা ত্যাগ করিয়া বাঙলায় আসিয়াছিলেন।

কংগ্রেসে যেরূপ অসহযোগের পদ্ধতি গৃহীত হয় তাহাতে বাঙলার চিত্তরঞ্জন দাসই প্রথম আপত্তি উত্থাপন করেন। গয়ায় তিনি সভাপতি হইলেও নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া "স্বরাজ্য" দল গঠিত করেন এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হয়েন। তাহার পরে দিল্লীতে কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে তাঁহার মতই গৃহীত হয়। তিনি সকল বাধাকে চূর্ণ করিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি সত্যই মৃত্যুহীন প্রাণ আনিয়াছিলেন এবং দেশের জন্য সেই প্রাণ দিয়াছিলেন।

যিনি তাঁহার বিস্ময়কর কার্যে পৃথিবীর সকল দেশের সম্মান আকৃষ্ট করিয়াছিলেন—সেই সুভাষচন্দ্র মহাভারতের স্বপ্ন দেখিয়া সেই স্বপ্ন সফল করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। আজ আমরা তাঁহার জয় উচ্চারণ করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন— বঙ্গভূমি অবনতাবস্থায়ও রত্নপ্রসবিনী। তাঁহার বহু সন্তানের চেষ্টায় স্বাধীনতা সংগ্রাম স্মরণীয় হইয়া আছে। সে সংগ্রামে বাঙলার অবদান ভারতবর্ষ শ্রদ্ধানত হইয়া স্মরণ করিবে। সেই অবদানে বাঙলা পুণ্যভূমি। তাই আমরা মনে করি—

"এই দেশেতে জন্ম,
যেন এই দেশেতে মরি।"

অনুবাদক—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

[টলস্টয়ের বিখ্যাত উপন্যাসগুলি নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কিন্তু The Devil বইখানি এখনও তেমন পরিমাণে সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এ বই তর্জমা করার তিনটি বিষয়ে সার্থকতা আছে। প্রথমত এতে টলস্টয়ের ব্যক্তিগত জীবনের একটি সংকটময় অধ্যায়ের পরিচয় পাওয়া যাবে। সেই হিসেবে, আত্মজীবনীর একটা বড় উপকরণ এতে মিলবে। দ্বিতীয়ত সমাজ-জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে টলস্টয়ের মতামত এতে পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। যৌন প্রলোভন নারী-দেহে শয়তানী মোহ বিস্তার করে কেমন করে মানুষকে নৈতিক অধঃপতনের পথে নিয়ে আসে, আত্ম-নিরোধ এবং সংযমের শিক্ষায় ও সাহায্যে মানুষ সে প্রলোভন জয় করে আবার কেমন আত্মস্থ হয়—এই সব সমস্যার সন্ধান পাওয়া যাবে এই উপন্যাসে। টলস্টয়ের এই ধারণার সঙ্গে বর্তমান যুগের চিন্তাধারার পুরো মিল না থাকলেও তাঁর কঠিন সংযম, অদ্ভুত স্তব্ধ-গম্ভীর লেখনী এবং নির্মম বিশ্লেষণ শ্রদ্ধার বস্তু। তৃতীয়ত বহুদিন পর্যন্ত এ বই অপ্রকাশিত ছিল। গল্পের শেষ কেমন দাঁড়াবে টলস্টয় সে বিষয়ে ঠিক করতে না পেরে দুটি উপসংহার লিখে গেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হলে তিনি কোন্‌টি গ্রহণ করতেন, সেটা অনুমানের বিষয়। তবে এই ছোট উপন্যাসখানির শিল্প-কৌশল, আঙ্গিকের ঋজু কঠিনতা এবং বক্তব্যের দৃঢ়তা রসজ্ঞ বাঙালী পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করবে। —অনুবাদক]

ইউজিন আর্তেনিভের সামনে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে যে-যে উপকরণের প্রয়োজন, তার কিছুরই অভাব ছিল না। বাড়িতে ইউজিনের যে শিক্ষালাভ হয়েছিল, তার ভিত্তিটা ছিল পাকা। পিটার্সবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রী নিয়ে সে সসম্মানে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছিল। সম্প্রতি তার পিতার লোকান্তর হয়েছে বটে কিন্তু তাঁরই খাতিরের সূত্রে বড় সমাজের উচ্চ ও অভিজাত কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে ইউজিনের যথেষ্ট আলাপ ও হৃদ্যতা আছে। তা ছাড়া, কোনো এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর আনু-কূল্যে ইতিমধ্যেই সে এক রাজ দপ্তরে সরকারী কাজ জোগাড় করে নিয়েছে।

উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া পৈতৃক সম্পত্তিটাও নেহাৎ কম নয়। ভালোই বলতে হবে যদিও আয়ের দিক্ থেকে এটা খুব নিশ্চিত, লাভবান ছিল না। তার বাবা বেশির ভাগ বাইরে-বাইরে কাটাতেন, অধিকাংশ সময়ে থাকতেন পিটার্সবুর্গে। নিজে ও স্ত্রী দুজনে মিলে বেশ ভালভাবেই খরচপত্র করে বাস করতেন আর দুই ছেলেকে বছরে বছরে প্রত্যেককে ছ' হাজার করে রুবল দিতেন তাদের নিজস্ব খরচের জন্যে। বড় ছেলে হল এ্যান্ড্রু, সে ছিল ঘোড়-সওয়ার সৈন্যদলে। প্রতি বছরেই গ্রীষ্ম-কালটায় মাস দুই তিনি এসে থাকতেন নিজের জমিদারীতে। কিন্তু মহাল পরিদর্শন করা, টাকা আদায়, সম্পত্তি দেখাশুনো করা—এ সমস্ত কোন কাজেই তিনি মাথা ঘামাতেন না। সমস্ত জমিদারী চালনার ভারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁর নায়েবের ওপরে। কিন্তু এই ভদ্রলোক ছিলেন নামেই ম্যানেজার, কাজ তিনি একটা বড় করতেন না। ধূর্ত ও অসৎ লোক,—কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ এবং বেশির ভাগ সময়েই মহালে অনুপস্থিত থাকতেন।

বাপের মৃত্যুর পর ছেলেরা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিতে বসল। কিন্তু ভাগ করতে গিয়ে দেখা গেল, বিস্তর দেনার দায়। এতো বেশী যে পারিবারিক উকীল ভদ্র-লোক পরামর্শ দিলেন যে, এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার অস্বীকার করে সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়াই ভালো। খালি পিতামহীর কাছ থেকে পাওয়া দশ হাজার রুবলের বিষয়টা রাখা যেতে পারে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী আর এক জমিদার এসে অন্য রকম পরামর্শ দিলেন। বৃদ্ধ আর্তেনিভের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের টাকা লেন-দেন চলত। কয়েকখানা বন্ধকী খত ও হাতচিঠা ছিল তাঁর কাছে। এগুলোর আদায়ের চেষ্টাতেই তিনি পিটার্সবুর্গ থেকে এলেন ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে। এসে বললেন যে, দেনা আছে সত্যি বটে, কিন্তু তারও একটা বিহিত করা যায়। দেনা মিটিয়ে যদি কিছু হাতে নগদ আর বিষয়-আশয় রাখতে চায় ছেলেরা, সে ব্যবস্থা অনায়াসেই হতে পারে। মস্ত বড় যে জঙ্গলের মহলটা রয়েছে সেইটে আর কিছু বার দিকের খুচরো জমি বিক্রী করে ফেললে সুরাহা হবে। কেবল সেমিয়োন্‌ভ তালুকটা যেটা সব চেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি, অর্থাৎ চার হাজার বিঘে আন্দাজ পোড়ো মাটির জমি, চিনির কারখানা, আর দুশো বিঘের মস্ত বড় বিল—এইটে রাখলেই যথেষ্ট। যদি এই বিষয়টুকুই ভালো মত তম্বির-তদারক করা যায়, জমিদারীতে নিজে বসবাস করে বুদ্ধি খাটিয়ে চাষ আবাদ করা যায়—তাহলে ঐ আবাদেই ফলবে সোনা। অনর্থক খরচ বাঁচিয়ে যে মিতব্যয়িভাবে জমি-জমা চালাতে জানে, তার পক্ষে গুছিয়ে নেওয়া কিছু শক্ত নয়।

তাই বাপের মৃত্যুর পর ইউজিন এল জমিদারীতে এবং বসন্তকালটা এইখানেই কাটালে। এই সময়টা বাজে নষ্ট না করে সে জমিদারীর সমস্ত কাগজ-পত্র হিসেব আদায় তন্ন তন্ন করে দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিলে। বেশ কিছুদিন মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করার ফলে ইউজিনের দৃঢ় ধারণা হল যে, সমস্ত বিষয়-আশয়ের মধ্যে আসল সম্পত্তিটা বাঁচানই দরকার। তাই সে ঠিক করলে যে, সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে মাকে নিয়ে জমিদারীতেই বাস করবে আর নিজে হাতে জমিদারী চালাবে। তখন বড় ভাইয়ের সঙ্গে সে একটা আপোষ করে ফেললে। বছরে বছরে ইউজিন্ এ্যান্ড্রুকে চার হাজার করে রুবল দেবে। নয়তো একসঙ্গে সে আশি হাজার রুবল থোক্ টাকাটা নিয়ে একটা লেখা-পড়া করে দিক ছোট্ট ভাইকে ওই সর্তে নিজের অংশটা ছেড়ে দিয়ে।

এই বন্দোবস্তই বাহাল হ'ল। পাওনাদার জমিদারের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে বড় ভায়ের সঙ্গে একটা বিলি-ব্যবস্থা করে ইউজিন মাকে নিয়ে এসে প্রকাণ্ড বাড়ীটায় বসবাস করতে লাগল। তারপর বিশেষ উৎসাহের সহিত এবং

খানিকটা সতর্কভাবে সে জমিদারী-চালনায় মনোনিবেশ করলে। সাধারণ লোকের ধারণা, যে বৃদ্ধ মানুষদেরই গোঁড়ামি আর সংস্কার থাকে এবং তাদের মনোভাবটা হয় বেশি মাত্রায় রক্ষণশীল। আর যারা নবীন ও তরুণ তারাই চায় নূতনত্ব, পরিবর্তন। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। দেখা গিয়েছে, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী লোকরাই বেশির ভাগ স্থিতিশীল জীবনের পক্ষপাতী—যারা স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তিতে জীবন-যাপন করতে চায়, কিন্তু ভেবে দেখে না এবং ভাববার সময়ও নেই, কিভাবে জীবনটা কাটানো উচিত। তাই তারা এমন একটি সুপরিচিত জীবন-আদর্শকে অনুসরণ করে, সেই জীবন-যাত্রার ছক-মাফিক আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলে গড়ে পিটে নেয়, যার সম্বন্ধে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

ইউজিনের বেলায়ও তাই হয়েছিল। গ্রামে এসে বসবাস করে তার ধারণা এবং লক্ষ্য হল পুরানো দিনের জীবন-প্রণালীকে আবার ফিরিয়ে আনা। তার বাবা তেমন সাংসারিক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না; তাই পিতামহের আমলের চাল-চলন, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ইউজিন্ বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। এখন সমগ্র জমিদারীতে খেত-খামার, বাগান-বাগিচা, এমন কি বসত বাড়িতেও—সর্বত্রই সে চেষ্টা করতে লাগল পিতামহের জীবনের ধারাটি ফিরিয়ে আনবার জন্যে। অবশ্য বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কিছুটা অদল-বদল করতেই হল। কিন্তু মোটামুটি সেই বিগত দিনের হাল-চাল, অতীত জীবনের সুরটাকে ফুটিয়ে তোলাই হল তার প্রধান উদ্যম এবং কর্তব্য। শান্তি, শৃঙ্খলা, সুনিয়ম এবং সর্বসাধারণের সন্তোষ—এই সবগুলোই হল বড় ব্যাপার। কিন্তু এভাবে বন্দোবস্ত করতে হলে চাই অশেষ ধৈর্য ও পরিশ্রম। সর্বপ্রথম কর্তব্য হল নানা পাওনাদার এবং ব্যাঙ্কের দেনাগুলো পর পর মিটিয়ে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে আগে কতক-গুলি জমি বিক্রী করা জরুরী হয়ে পড়ল এবং কতকগুলি পুরানো খৎ উসুল করিয়ে নেওয়া আর নতুন খতে সময়ের মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। তা ছাড়া অর্থেরও প্রয়োজন। চারশো বিঘে ফসলের জমি আর চিনির কারখানা সমেত ভালো সেমিয়োনভ্ তালুকখানা বাঁচাতে হলে চাই কাজের সুবন্দোবস্ত—কিছুটা জমি বিলি করে দেওয়া আর কিছুটা খাসে রেখে জন-মজুর লাগিয়ে ফসল বাড়ানো। এ ছাড়া রয়েছে প্রকাণ্ড বাগানখানা। সেটাকে ভালো-মত পরিষ্কার না করালে দেখাশুনা না করলে শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে, অব্যবহারে জঙ্গল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এ সবের জন্যে চাই অর্থ, চাই প্রচুর পরিশ্রম। অনেক—অনেক কাজ পড়ে রয়েছে সামনে। কিন্তু ইউজিনও পিছপাও হবার লোক নয়। দেহে তার প্রচুর শক্তি, মনেও কঠিন, দৃঢ় সংকল্প। বয়েস তার ছাব্বিশ হয়েছে। মাথায় মাঝারি, ডাঁটো চেহারা, আঁট-সাঁট গড়ন। কুস্তি আর ব্যায়ামে পেশীগুলো পরিপুষ্ট, লোহার মত শক্ত। চেহারা দেখলেই মনে হয় বলিষ্ঠ ব্যক্তি, রক্ত-কণিকায় জীবনী-শক্তির অভাব নেই। মুখ থেকে ঘাড় পর্যন্ত প্রাণশক্তির শোণিত আভাস। দাঁতগুলি ঝক-ঝকে পরিষ্কার, চুল আর ঠোঁট মোটা নয় অথচ বেশ নরম আর কুঞ্চিত। তার দেহের একমাত্র ত্রুটি তার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। অল্প বয়স থেকেই চশমা ব্যবহার করে চোখের স্বাভাবিক তেজ অনেকটা কমে গিয়েছে। এখন একটা প্যাঁস-নে ছাড়া সে চলতেই পারে না। সর্বক্ষণ পরকোলা ব্যবহার করার ফলে নাকের ওপর বরাবরের মত একটা দাগ বসে গিয়েছে।

এই হল মোটামুটি তার বাইরের চেহারা। আর অন্তরের চেহারা সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, তার সঙ্গে যতই মেলামেশা করা যায়, ততই মানুষটাকে ভালো লাগে। ভিতরকার মানুষটির এইটিই হল বৈশিষ্ট্য। তার মা বরাবরই তাকে বেশি স্নেহ দিয়ে এসেছেন। আর সবাইকে যত না ভালো বেসেছেন তার চেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন এই ছেলেকে। এখন স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর অন্তরের সমস্ত স্নেহপ্রীতি এই এক জায়গায় শুধু ঢেলে দেন নি, তাঁর সারা জীবনের অর্থ যেন এইখানেই নিবদ্ধ করেছেন। শুধু যে মা-ই তাকে ভালো-বেসেছেন, তা নয়। স্কুলের, তারপর কলেজের সমস্ত বন্ধু-সঙ্গীরাও তাকে খুব পছন্দ করত। শুধু পছন্দ নয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করত। যারই সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তারই ওপর তার একটা প্রভাব বিস্তার হয়েছে। তার মুখের কথায় অবিশ্বাস করা এক রকম অসম্ভব বললেই হয়। যার মুখে এমন সরল সততার ছাপ, বিশেষ করে যার চোখে এমন নির্মল অকুণ্ঠ চাহনি, তার কোনো কথায় বা আচরণে এতটুকু শঠতা বা প্রতারণার আভাস সন্দেহ করা ধারণার বাইরে।

মোট কথা ইউজিনের চরিত্রে একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল যেটি তাকে যাবতীয় সাংসারিক কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যে উত্তমর্ণ একজনকে টাকা ধার দিতে অস্বীকার করেছে, ইউজিনকে সে বিশ্বাস না করে পারে-নি। গ্রামের কোনো বৃদ্ধ অগ্রণী হোক, নকল নবীশ হোক্ অথবা কোনো দরিদ্র কৃষকই হোক ইউজিনের সঙ্গে কোনো প্রবঞ্চনার কথা কল্পনাও করতে পারত না। অন্য কারুর সঙ্গে কূটচাল বা ধূর্ত মতলব তাঁরা ফাঁদতে পারে, কিন্তু এমন একজন খোলা-মেলা, চমৎকার সরল-হৃদয় লোকের আন্তরিক সংস্পর্শে এসে সে চিন্তা তারা ভুলে যেতে বাধ্য হয়।

মে মাসের শেষ। শহরে থাকতে ইউজিন চেষ্টা চরিত্র করে খালি জমিগুলো বন্ধকী থেকে ছাড়িয়ে নেবার বন্দোবস্ত করেছিল যাতে সেগুলো কোনো কারবারী লোককে বিক্রী করা যায়। সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের কাছ থেকেই ইউজিন কিছু টাকা কর্জ করলে। কেননা জোত-জমার কাজে রসদের দরকার। চাষের জন্যে চাই হালের বলদ, গরুর গাড়ি আর ঘোড়া। তা ছাড়া খেত-খামারের ফসল মজুত করবার জন্যে চাই গোলাবাড়ি এবং তার জন্যে টাকার প্রয়োজন তো আছেই।

ইউজিন বন্দোবস্ত করে নিল এক রকম। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি গাড়ি করে চালান আসতে লাগল। ছুতোররাও কাজ আরম্ভ করে দিল আর সত্তর আশিখানা গাড়ি ভর্তি জমির জন্যে প্রচুর সার এনে ফেলা হল। কিন্তু তবু এই সব কাজকর্ম শুরু হওয়ার মধ্যেও কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার ভাব রয়েছে, যেন সব কিছুই সত্যের আগায় ঝুলছে।

এই সব কাজ-কর্ম ও চিন্তায় যখন ইউজিন অত্যন্ত জড়িত ও ব্যস্ত, সেই সময় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি তার মনের মধ্যে জাগতে লাগল। ব্যাপারটা তেমন গুরুতর না হলেও নিতান্ত উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। এক এক সময় রীতিমতই বিশ্রী লাগে।

বয়েস যখন কাঁচা ছিল, ইউজিনের জীবন আর দশজন সাধারণ যুবকের মতই চলেছিল। অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান যুবকরা সাধারণত যেভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, ইউজিনও সেইভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে চালিয়ে এসেছে। নানা ধরণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইতিপূর্বে তার যৌন সম্পর্ক ঘটেছে। ইউজিন উচ্ছৃঙ্খল বা কামুক প্রকৃতির লোক নয়। কিন্তু তাই বলে সাধু-সন্ন্যাসীর মত জিতেন্দ্রিয় পুরুষও নয়। স্ত্রীলোকের প্রতি তার যে আকর্ষণ, অর্থাৎ যে কারণে ইউজিন মেয়েদের প্রতি ঝুঁকেছে, সেটা একান্তই জৈব আকর্ষণ। স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে আর তার নিজের ধারণা—মনটাকে খোলা ও পরিষ্কার রাখতে হলে স্ত্রীলোকের দৈহিক সম্পর্ক অপরিহার্য পুরুষের পক্ষে। বয়েস যখন তার বছর ষোলো, তখন থেকেই তার যৌন জীবন সুরু হয় এবং এতদিন চলেছে বেশ সন্তোষজনক-ভাবেই। বিশেষ কোনো গোলমালে পড়তে হয় নি দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে। কোনো হাঙ্গামা যে পোয়াতে হয়নি ইউজিনকে তার প্রথম কারণ হল ইউজিনের দৃঢ় মন ও সংযম। কোনও দিনই সে ইন্দ্রিয় ভোগের দাস হয়নি। দেহের ও মনের লাগাম বেশ কড়া হাতেই সে ধরতে জানে। তাই একদিনের জন্যেও সে বিব্রত বোধ করেনি। এ যাবৎ কোনো কুৎসিত রোগ তার দেহকে আশ্রয় করতে পারে নি। ব্যভিচার-প্রবৃত্তিকে শক্ত হাতে দমন করে রাখার ফলে কোনো স্ত্রীলোক তাকে খেলার পুতুল হিসেবে ব্যবহার করতে সাহসও করে নি। অবশ্য

মোহে আচ্ছন্ন হবার মত পুরুষ সে নয়। প্রথম জীবনে পিটার্সবুর্গে একটি মেয়ে ছিল তার রক্ষিতা। সেলাইয়ের ব্যবসা ছিল তার। কিন্তু দেখা গেল তার আদুরে ও নাটুকে ভাবটা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ইউজিনের ধাতে এ সব পোষালো না। ঘাড়ে চড়ে বসবার আগেই ইউজিন তাকে সযত্নে ঝেড়ে ফেলে অন্য ব্যবস্থা করে নিল। ব্যক্তিগত জীবনের এই পর্যায়টি মোটামুটি বেশ মসৃণভাবেই গড়িয়ে এসেছে। এ যাবৎ তা নিয়ে ইউজিনকে বিশেষ কোনো বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু আজ প্রায় দু মাস হতে চলল ইউজিন মফঃস্বল এসে বাস করছে। এ সম্বন্ধে কি যে করা যায় সে বিষয়ে এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারে নি। অবস্থান্তরে তাকে আজ অনেক দিন দেহকে উপবাসী, নিরুদ্ধ করে রাখতে হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক আত্মদমনের ফলে শরীর ও মনের ওপর টান পড়তে সুরু হয়েছে। তা হলে কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত কি তা হলে দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে শহরেই ছুটতে হবে? তাই যদি যেতেই হয়—কোথায় কেমন করে তা সম্ভব হবে? এই সব চিন্তাই গত কয়দিন ধরে ইউজিন ইভানিরকে উত্তপ্ত ও বিব্রত করে তুলেছে। ইউজিনের বিশ্বাস এবং ধারণা যে শরীরের ধর্মকে বহুদিন দাবিয়ে রাখা চলে না আর তার নিজের ক্ষেত্রে সে প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করছে। তাহলে বর্তমান অবস্থায় সেই প্রয়োজনের খাতিরেই তাকে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয়! কিন্তু ইউজিনের এও মনে হল যে, এখন সে তো স্বাধীন নয়, কাজের ও দায়িত্বের চারিদিকের বাঁধনে তাকে শক্তভাবেই বেঁধে ফেলেছে। তাই আপনার অজ্ঞাতসারেই আশে-পাশের প্রতিটি যুবতী নারীর পিছু-পিছু তার সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরতে লাগল।

নিজের গ্রামে বসে কোনো নিন্দনীয় ব্যাপার বা কেলেঙ্কারী করার পক্ষপাতী নয় ইউজিন। এখানকার কোনো বিবাহিতা কিংবা কুমারী মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করা ইউজিনের মনঃপুত নয়। লোকমুখে সে শুনেছে যে, এ সমস্ত ব্যাপারে তার বাপ-পিতামহ অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁদের সমসাময়িক অন্যান্য জমিদার বা অভিজাত বংশীয় লোকদের মত তাঁরা ছিলেন না। স্থানীয় কোনো স্ত্রীলোক অথবা কৃষকদের মেয়েদের সঙ্গে তাঁরা কোনো প্রকার সংস্রবে আসেন নি। তাই ইউজিনও স্থির করেছিল সেও নিজের গ্রামে বসে এই রকম কোনো ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়বে না।

কিন্তু যত দিন যায় ততই দেহের দাবী বাড়তে থাকে। তখন ইউজিন ভেবে দেখলে যে, কাছাকাছি কোনো শহরে এ ধরণের ব্যাপার জানাজানি হয়ে পড়লে বিপদের অশঙ্কা বেশি। ক্রীতদাস প্রথা উঠে গিয়েছে, মুখ বুজে সহ্য করবার পাত্রও আজকাল কেউ নয়। তার চেয়ে এইখানে গ্রামেই ভালো। ইউজিন অনেক ভেবে স্থির করলে—হ্যাঁ, তাই ঠিক। গ্রামের বাইরে অজানা জায়গায় জড়িয়ে পড়া মোটেই যুক্তিসংগত নয়। তবে এটা অবিশ্যি দেখতে হবে কেউ জেনে না ফেলে। কারণ ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে অসম্ভ্রমের সীমা থাকবে না। ইউজিন এই ভেবে মনকে বোঝালে যে, বর্তমানে তার এ ধরণের চেষ্টা মোটেই অন্যায় নয়। কেননা সে তো কাম প্রবৃত্তির দাস হয়ে ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করতে যাচ্ছে না। যা কিছু করতে যাচ্ছে, সেটা স্বাস্থ্যেরই খাতিরে নিছক শরীরধর্ম পালনের জন্যে।

সংকল্প স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ইউজিন যেন আরো বেশি চঞ্চল, আরো অস্থির হয়ে উঠল। যখনই সে গ্রামের বয়োবৃদ্ধ বা মোড়লের সঙ্গে অথবা চাষী-মজুর, ছুতোরদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলত, তখনই ঘুরে-ফিরে সেই একই কথায় এসে পৌঁছুত অর্থাৎ স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ। আর স্ত্রীলোকের কথা একবার উঠলে সে প্রসঙ্গ থামাতে চাইত না। এখন থেকে গ্রামের মেয়েদের ওপর নজরটা তার আরো বেশি করে যেন প্রখর হয়ে উঠল, চাউনীটাও হল তীক্ষ্ণতর। (ক্রমশ)

পাঞ্জাব বাঙলার মতই বিভক্ত হইয়াছে। পাকিস্থান পাঞ্জাব হইতে হিন্দু ও শিখরা যে পূর্বে পাঞ্জাবে আসিতেছেন—দলে দলে লক্ষ লক্ষ আসিতেছেন, ভারত সরকার তাহার জন্য যেমন ব্যবস্থা করিতেছেন, পূর্ব পাঞ্জাবের সরকার তেমনই তাঁহাদিগের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিতেছেন। পূর্ববঙ্গ হইতেও হিন্দুরা পশ্চিম বঙ্গে ও বিহারে আসিতেছেন। কিন্তু ভারত সরকার তাঁহাদিগের আসিবার জন্য তেমন কোন ব্যবস্থাই করিতেছেন না—পশ্চিম বঙ্গের সরকার তেমনই তাঁহাদিগের বাসের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। এমন কি পশ্চিম বঙ্গের সরকার কয় মাস পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহাও পালিত হয় নাই।

(১) কলিকাতায় "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের" পর হইতে যে সকল গৃহ মুসলমানরা হিন্দুদিগের নিকট বা হিন্দুরা মুসলমানের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন—সে সকল পূর্বাধিকারীদিগকে দিবার চেষ্টা করা হইবে।

(২) জমির অধিকারীরা যে জমির মূল্য ৫ বা ১০ গুণ হাঁকিতেছেন, তাহা বন্ধ করা হইবে। সেজন্য অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে।

এই দুইটি কাজের প্রয়োজন কত অধিক তাহা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পূর্ববঙ্গের অল্পাবিস্তর অত্যাচারের অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। মুসলমানদিগের জিদই মানিয়া লইয়া পাকিস্থান বাঙলার মুসলমান সরকার যে ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির করিতে দেন নাই, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। তাহার পর—

(১) বিক্রমপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে প্রতিমা নিরঞ্জনের চিরাচরিত প্রথা বন্ধ করিতে হইয়াছে। 'আনন্দবাজারে'র সংবাদদাতা ঢাকা হইতে সংবাদ দিয়াছেন—"বিক্রমপুরান্তর্গত আবদুল্লাপুর, পাইকপাড়া, ছোরার দেউল, নাটেশ্বর, নগর কসবা, সুধারচর, রিকাবীবাজার, ফিরিঙ্গীবাজার, রামনগর, কমলাঘাট; পানাম ও অন্যান্য গ্রাম হইতে প্রায় ১০০ সুদৃশ্য প্রতিমা বড় বড় নৌকায় ধলেশ্বরী নদীতে আনীত হয়। প্রত্যেকটি নৌকায় রোসনাই, নাচ, গান, বাজী পোড়ান হয়। আরও সহস্র সহস্র নৌকা আরোহণে লক্ষাধিক নরনারী এই অপূর্ব মনোহারী নৌ-শোভাযাত্রা দেখিতে আসে। এই নৌকাগুলিতেও আলোকসজ্জা হয় এবং বাজী পোড়ান হয়। আলোকমালায় নদীর জল যেন হাসিতে থাকে। শেষ রাত্রিতে প্রতিমা বিসর্জনের পর এই অনুষ্ঠানের শেষ হয়।

পাকিস্থান বাঙলার ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ করেন, সন্ধ্যার পূর্বেই নিরঞ্জন শেষ করিতে হইবে।

(২) "ঠাকুরগাঁও থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর হাট, বালিয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী একটি অঞ্চল—এই তিন জায়গা হইতে দুর্গা প্রতিমা ভঙ্গ ও অপসারণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।"

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সংবাদ প্রচারে সত্য গোপন করাও যে সময় অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত, সেই সময়ে এই দুইটি সংবাদই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে এইরূপ অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা মুসলমান-

দিগকে যে ক্ষুদ্র অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তাহাও যে রক্ষিত হইয়াছে, এমন বলা যায় না। প্রকাশ্যস্থানে গো-কোরবাণী করিতে মুসলমানদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল। সেই অনুরোধও রক্ষিত হইয়াছে কি না, তাহা বাঙলার মন্ত্রীরা কলিকাতার প্রায় উপকণ্ঠে গড়িয়াহাট হইতে বোড়াল গ্রামের মধ্যে প্রকাশ্য রাজপথে গো-কোরবাণী হইয়াছে কি না, তাহা পুলিসকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। যদি ঐরূপ কোরবাণী হইয়া থাকে, তবে কি সেজন্য কাহাকেও দণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হইবে?

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী পূর্ববঙ্গের লোক। তিনি পূর্ববঙ্গে যাইয়া বক্তৃতায় বলিয়াছেন—পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠগণ গৃহত্যাগ করিলে তাহা সংগত হইবে না। তাঁহারা যদি দ্রুত পশ্চিমবঙ্গে গমন করেন, তবে পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদিগকে স্থানদান করা সম্ভব হইবে না। তিনি এমন ভয়ও দেখাইয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের যে সকল ধনী পশ্চিমবঙ্গে গিয়াছেন, তাঁহারা যদি জনগণের সহিত তাঁহাদিগের সঞ্চিত অর্থ ভাগ করিয়া লইতে অসম্মত হন, তবে তাঁহার সরকার হয়ত দরিদ্রের সুবিধার জন্য তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র কর দিতে বাধ্য করিবেন।

আমরা এই উক্তিতে বিস্ময়ানুভব না করিয়া পারি না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের সরকার যদি এতদিনেও পূর্ববঙ্গাগতদিগের স্থানদানের ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাদিগের অনিচ্ছার বা অযোগ্যতার বা উভয়েরই পরিচায়ক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? আমরা বার বার বলিয়াছি, জমির মূল্য যাহাতে অধিকারীরা অকারণ বৃদ্ধি করিয়া জুয়াখেলা করিতে না পারেন, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদিগের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিতে অর্ডিনান্স জারী করিতে অযথা বিলম্ব করিতেছেন। নবদ্বীপে কিরূপ লোকসমাগম হইয়াছে, সেকথা জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্তা মেজর-জেনারেল চট্টোপাধ্যায় বলিতে পারিবেন। তথায় কেন পার্শ্ববর্তী জমি পূর্বমূল্যে দিতে অধিকারীদিগকে বাধ্য করা হইতেছে না। ঐরূপ অবস্থা সর্বত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যে অল্পসময়ের মধ্যে ভারত সরকার ও পূর্ব পাঞ্জাবের সরকার পশ্চিম পাঞ্জাবত্যাগী লক্ষ লক্ষ লোকের বাসব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা পশ্চিমবঙ্গে কি জন্য অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? যে বিভাগ ফলে আজ বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল স্বস্থানে আছেন, সেই বিভাগের জন্য আন্দোলন পরিচালনকালে কি বলা হয় নাই, বিভক্ত হইলে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে সাহায্য করিবে? সে সাহায্য কিরূপে প্রদত্ত হইতেছে?

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ধনীদিগকে অতিরিক্ত করদানে বাধ্য করা আইনতঃ ও নীতি হিসাবে সমর্থিত হইতে পারে কি?

কলিকাতাতেই কি পুনর্বসতি আশানুরূপ সফল হইতেছে! সংবাদপত্রে বিবৃতিতে লোককে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নহে। মন্ত্রী কিছুদিন বাগমারীতে, কিছুদিন ফৌজদারী বালাখানা অঞ্চলে বাস করিয়া এখন আর এক অঞ্চলে গমন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিবৃতিগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় ঈপ্সিত পুনর্বসতি কার্য সম্পন্ন হইতেছে না। গঙ্গাধরবাবু লেনে, লিণ্টন স্ট্রীটে, ফৌজদারী বালাখানা অঞ্চলে মুসলমানরা বিপন্ন ও বিব্রত হিন্দুদিগের যে সকল গৃহ যে কোন মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন, সে সকল পূর্বাধিকারীদিগকে দিবার ব্যবস্থা না করিলে কোন ফল ফলিবে না। একথা কি সত্য নহে যে, আণ্টনীবাগান লেনে এখনও কোন কোন হিন্দুগৃহে মুসলমানরা অনধিকার প্রবেশ করিয়া বাস করিতেছে? কেন আজও তাহাদিগকে মামলা-সোপর্দ করা হইতেছে না? কেন তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য করা হইতেছে না?

পাঞ্জাবে যে এখনও স্থানত্যাগকারী হিন্দু ও শিখদিগের উপর, অত্যাচার হইতেছে, পাকিস্তান সরকার তাহার কোন প্রতীকার করিতের্ছেন না। মিঃ সুরাবর্দী আজ বলিতেছেন—"বর্তমান অবস্থায়" স্থানত্যাগকারীদিগের উপর অত্যাচার নিন্দনীয়। তিনি পাকিস্তানের সম্বন্ধে কি মনোভাব পোষণ করেন, সে বিষয়ে বাঙলার হিন্দুদিগের সন্দেহ থাকা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও পরিধেয় সমস্যাও সাধারণ নহে। যে সময় নূতন সরকারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা দুঃসময়। কারণ তখন প্রধান খাদ্যশস্যের চাষের সময় আর ছিল না। সে বিষয়ে আগামী বৎসর বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপাতত আমাদিগের মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্যায়রূপে চাউল রপ্তানি না হইলে এবার পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই। আশু ধানের ফসল ভাল হইয়াছে। তবে বাঙলার যে সকল স্থানে আশুধানের চাষ অধিক, সে সকলের অধিকাংশই পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে। বোরো সম্বন্ধেও কতকটা তাহাই বলিতে হয়। তবে আমন ধান্যের ফসল যেরূপ হইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে, তাহাতে দুর্ভিক্ষ সম্ভাবনা নাই। আমরা আশা করি, রবিশস্যের চাষে সরকার কৃষকদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শাকসব্জীর চাষও অধিক করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গে গুড় প্রস্তুত করিতেও লোককে উৎসাহ দিতে হইবে। যদি নানাস্থান হইতে—বিশেষ ব্রহ্ম হইতে গোলআলুর বীজ আবশ্যক পরিমাণ সংগৃহীত হয় এবং তাহা বণ্টনের সুব্যবস্থা হয় ও আবশ্যক সার দেওয়া যায়, তবে লোক অনাহারে থাকিবে না। কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আশ্বাস ও আশা দিয়াছেন, বাহির হইতে মৎস্য আমদানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাহা অবশ্যই সুসংবাদ। আমরা জানি, বাঙলার কতকগুলি স্থানে গমও ভাল হয়। সে সকলের মধ্যে মুর্শিদাবাদ অন্যতম।

মন্ত্রীদিগকে আমরা বলিব, তাঁহারা যে পরিবেষ্টনে—যে পদ্ধতিতে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সেই পরিবেষ্টন বর্জন করিতে হইবে—কায়েমী কর্মচারীদিগের পরামর্শই বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া লোকমত সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে কোন কোন মহকুমায় বা জেলায় প্রশংসার্হ কাজ করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র প্রদেশের সমস্যা তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমার বহির্ভূত। অনেকস্থলে সে সমস্যা সমগ্র ভারতের এমন কি আন্তর্জাতিক সমস্যার সহিতও জড়িত। কাজেই সে সকলের জন্য বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্য ও লোকের সহযোগ যে প্রয়োজন, তাহা যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন। দেশের লোক সে সহযোগ করিতে ইচ্ছুক।

কি আহার্য, কি পরিধেয়, কি ইন্ধন—কোন বিষয়েই তাঁহারা বিশৃঙ্খলা দূর করিতে পারিতেছেন না—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিবৃতির পর বিবৃতি দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। লোক অবস্থার পরিবর্তন—উন্নতি অনুভব করিতে চাহে। তাহা না হইলে তাহাদিগের অসন্তোষ অবশ্যম্ভাবী হইবে। যে সকল কর্মচারী মুসলিম লীগের শাসনকালে দেশের লোকের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই—যাহাদিগের সম্বন্ধে দুর্নীতির অভিযোগও যে উপস্থাপিত না হইয়াছে, এমন নহে, তাহাদিগকে কার্যভার দিয়া রাখিতে হইলে তাহাদিগকে সতর্ক ব্যবহারে শাসনে রাখা প্রয়োজন। অনাচার এখনও হ্রাস পাইয়াছে বলা যায় না। কলিকাতায় যে কোন বস্তিতে অনুসন্ধান করিলেই দরিদ্রের প্রতি কত অত্যাচার অনায়াসে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। চোরাবাজার যে চলিতেছে, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। এইজন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের যোগ্যতা প্রয়োজন।

যদিও ভারতবর্ষ বিভাগের ফলে আমরা বাঙলার কথায় পশ্চিমবঙ্গের কথাই মনে করি, তথাপি সম্বন্ধ, সংস্কৃতি ও সংস্কারের যে বন্ধন পশ্চিমবঙ্গের সহিত পূর্ববঙ্গকে বদ্ধ করিয়াছে, তাহা ছিন্ন করা সম্ভব নহে। সেইজন্যই পূর্ববঙ্গের দুঃখে আমাদিগের পক্ষে বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। চট্টগ্রাম যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পীড়িত হইয়াছে, তাহাতে আমরা দুঃখিত। এবার চট্টগ্রামে যে বাত্যা ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছে, তাহাতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবরের ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসই মনে পড়ে।

যে দিকে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস গিয়াছিল, সেদিকে বহু গ্রামে অর্ধেক অধিবাসী ও বহু গবাদি পশু জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুমান ১৪ হাজার লোকের মৃত্যু হয় এবং ১৫ হাজার গবাদি পশু নিহত হয়। চাকমা অঞ্চলে যে ক্ষতি হয়, তাহা ব্যতীত এক হাজার ৭ শত ৬০খানি নৌকা নষ্ট হয়। অনেক গৃহের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাহার পরে বিসূচিকা সংক্রামকরূপে দেখা দেয়। তখন সার সি সি ষ্টিভেন্স বাঙলার ছোটলাট। তিনি ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া লোককে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবার ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু ক্ষতি যে অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করার ভার পাকিস্তান সরকারের, তথাপি চট্টগ্রামের বাঙালীদিগের বিপদে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সেইজন্যই পশ্চিমবঙ্গ হইতে যথাসম্ভব সাহায্যদানের আয়োজন হইয়াছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে অভাব যেরূপ প্রবল, তাহাতে ইচ্ছা থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে আশানুরূপ সাহায্য প্রদান দুঃসাধ্য হইত। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে সাহায্য প্রেরিত হইবে। পাকিস্তানের সরকার কি করিবেন, তাহা জানিবার জন্য লোকের আগ্রহ স্বাভাবিক। বাঙলায় যখন মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, তখন সুভাষচন্দ্র বিদেশে প্রতিষ্ঠিত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে চাউল দিতে চাহিলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাদিগের দেশের ইংরেজ সরকার যে ভুল করিয়াছিলেন, আশা করি, পাকিস্তান সরকার সে ভুল করিবেন না। তাঁহারা যদি বিপন্নদিগকে আবশ্যক সাহায্য প্রদান করিতে অক্ষম হন, তবে সেজন্য অপরের সাহায্য প্রার্থনা করাই তাঁহাদিগের পক্ষে সংগত। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষকালে বড়লাট লর্ড কার্জনের প্রার্থনায় জার্মানী উল্লেখযোগ্য সাহায্য করিয়াছিল। পাকিস্তান সরকারের সাহায্যদান কার্য সাম্প্রদায়িকতাজনিত একদেশদর্শিতায় ত্রুটি-পূর্ণ হইবে কি না, তাহা দেখিবার বিষয়। গত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষকালে বাঙলায় মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের পরিচালিত নীতির বিষয় স্মরণ করিয়া আমরা একথা বলিতেছি।

আজ যখন ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনের সম্মুখে উপনীত, তখন যে দেশের লোক স্বাধীনতা লাভের অদম্য আগ্রহের প্রতীক সুভাষচন্দ্রকে কৃতজ্ঞতাসহকারে স্মরণ করিয়া বিদেশে তাঁহার দ্বারা স্বাধীন ভারত সরকারের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা-দিবসের স্মরণোৎসব করিবে, ইহা যেমন সংগত তেমনই স্বাভাবিক। কলিকাতায় এই স্মরণোৎসব যেভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইবে—তিনি জাতির হৃদয়ে স্বাধীনতার যে হোমানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, জাতি তাহা কখনও নির্বাপিত হইতে দিবে না, পরন্তু প্রাচীন ভারতের অগ্নিহোত্রি দ্বিজদিগের প্রথার অনুসরণ করিয়া সংকল্প করিয়াছে—

"যথা অগ্নিহোত্রীদ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ
চিরদীপ্ত রবে হুতাশন।"

আমরা যতই কেন কামনা করি না—

"সহস্র বৎসর শান্তির সলিলে
শীতল হউক ধরা।"

মানুষের মনে এখনও শান্তির সলিলে অন্যায় স্বার্থের কলুষ প্রক্ষালিত হইয়া যায় নাই। কাজেই স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমেরিকা স্বাধীনতা অধিকৃত করিবার পরেও তাহাকে গৃহযুদ্ধ করিয়া তবে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষে তাহা হয় ইহা যত অনভিপ্রেতই কেন হউক না, হওয়া যে অসম্ভব তাহাও বলিতে পারা যায় না। আর বাহির হইতেও যে এ দেশ আক্রান্ত হইতে পারে, তাহা মনে রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে তাহার আত্মরক্ষা দুষ্কর হইবে—এই যুক্তির উত্তরে মিস্টার জিন্না বলিয়াছিলেন, যদি প্রয়োজন হয়, পাকিস্থান অন্যান্য মুসলিম রাজ্যের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। কাশ্মীরে যাহা হইয়াছে জুনাগড়ে যাহা হইতেছে এবং হিন্দুবহুল হায়দরাবাদে যাহা হইতে পারে—তাহাও অবজ্ঞা করিলে তাহা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না।

কাজেই সুভাষচন্দ্র যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই আদর্শ তাহার উপযোগিতাকাল অতিক্রম করে নাই, কখনও করিবে কি না সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। সেইজন্য সুভাষচন্দ্র কর্তৃক পরাধীন ভারতের বাহিরে—তাহার পরাধীনতা দূর করিবার জন্য স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের মুক্তির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। সেই ঘটনার স্মরণোৎসব এ দেশের জাতীয় উৎসবে পরিণত হইবে। তখন যে আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা কখন নির্বাপিত হইবে না।

বিলাতের প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ও যোদ্ধা ক্রমওয়েল কোন যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহার সৈনিকদিগকে বলিয়াছিলেন—ঈশ্বরের অনুগ্রহে আস্থা রাখ—(অর্থাৎ তাঁহার কৃপায় আমরা জয়ী হইব) —কিন্তু অস্ত্র যেন ব্যবহারোপযোগী থাকে, সে বিষয়ে শিথিলপ্রযত্ন হইও না।

সেই কারণে সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মরণোৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বীণা দাস

সেদিন সকাল থেকে অবিশ্রাম বৃষ্টি। পিচ্ছিল, পা রাখা যায় না এমনি রাস্তা দিয়ে সবশুদ্ধ সারাদিন প্রায় মাইল দশেক হাঁটাহাঁটি করে শেষকালে যখন চাটগাঁ সহরে ফেরার জন্য নৌকায় ওঠবার কথা, তখন কোঁয়েপাড়া গ্রামের ছেলেরা বলে বসল, "আপনাকে আর একটু কষ্ট দেব, আর আধমাইল এরকম—।" কিছুতেই রাজী হই না, এখন যদি নৌকা না ধরি কাল ভোরে সহরে পেঁছতে পারব না। সকালে সেখানে একটা কাজ আছে। ছেলেরাও কিছুতেই ছাড়ে না "এত রাতে অভুক্ত আপনাকে ছেড়ে দেব কি করে! খাওয়ার সব আয়োজনও হয়ে গেছে। মাত্র আধমাইল তো? তারপর এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে নৌকায় নিশ্চয়ই তুলে দেব।" অগত্যা ঘোর অনিচ্ছাতেও আবার গ্রামের বর্ষা রাতের 'আধমাইল' অতিক্রম করে গিয়ে পেঁছিলাম একটি পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত গৃহে। হাত পা ধুয়ে ভাতের থালা সামনে পেতেই মনটা খানিকটা প্রসন্ন হয়ে উঠল; গরম ভাত, ঘি, আলু ভাজা, ডিম ভাজা, আমসত্বের চাটনী।

খেয়ে উঠে আঁচিয়ে বল্লাম—"এবার তাহলে বেরিয়ে পড়ি।" গৃহকর্ত্রী হাতে মসলা দিতে দিতে বল্লেন, "পাগল হয়েছ মা? এত রাতে এই দুর্যোগের মধ্যে তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পারি? কাকপক্ষীও এখন বেরোয় না।" "মা, এ তোমার সেই আর এক রাতের অতিথির মতই —না?" একটি ছেলে মন্তব্য করল।

"হ্যাঁরে আমারও সে কথাই মনে পড়ছিল!"

"কিন্তু মাসিমা, আজ যেতে যে আমাকে হবেই, কাল সকালে একটা কাজ রয়েছে।" "সকালে কাজ তাতে কি। ভোর রাতে আমি তোমাকে তুলে দেব। সকাল ৮টার আগেই চাটগাঁ সহরে পেঁছে যাবে। এখন বিছানা করে রেখেছি। শুয়ে পড় লক্ষ্মীমেয়ের মত। আহা, দেশের কাজ করো বলে শরীরের দিকে কি কেউ তাকায় না গো?" —এরপর আর কথা চলে না। শুভ্র বিছানায় ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে ছোট মেয়ের মত আবদারের সুরে বল্লাম "একবার ঘুমুলে কিন্তু আমি সহজে উঠতে পারি না। তুলে দেবার ভার আপনার মাসিমা।" "সে কি দিদি, আপনি না আজ রাতে ফিরবেনই? সে ধনুর্ভঙ্গ পণ এখন গেল কোথায়?" ছেলেরা পরিহাস করল। উত্তরে হাসলাম, মাসিমাকে বললাম, "কিন্তু আপনার সেই আর এক রাতের অতিথির কথা তো শুনলাম না এখনও। গল্প করুন মাসিমা।"

"হ্যাঁ মা সেই গল্পটা হোক আজ একবার।" ছেলেরাও সায় দিল। আলোটা কমিয়ে মাসিমাকে ঘিরে আমরা সবাই বসলাম।

"সে আজ পনেরো-ষোলো বছর আগের কথা। সে রাতটাও এমনি দুর্যোগেরই রাত—এমনি চোখ-ধাঁধানো অন্ধকার। কর্তারা সেদিন কেউই বাড়ি নেই। আমরা মেয়েরা রয়েছি। আমার মেজ ছেলেটি তখন সবে তিন বছরের। তোরা আর কেউ হোসনি। আমার এক ভাগ্নি এসে রয়েছে —তার মাত্র ৬ দিনের শিশু। রাতে রান্নার পাট সবে সেরে বেরিয়েছি। বাইরে কার যেন গলার স্বর। কর্তারা কেউ এলেন কিনা দেখতে গিয়ে দেখি—এক শাঁখারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকছে, "শাঁখা নেবেন মা, শাঁখা?" এত রাতে এই দুর্যোগে শাঁখা বেচবারই সময় বটে। তবু বয়সে তো তখন অনেক কম, লোভও আছে। "কই দেখাও দেখি তোমার শাঁখা।" শাঁখারীর মাথায় একটা সুটকেস, সেটা নামিয়ে খুলে ধরল; কয়েক জোড়া অতি সাধারণ শাঁখা রয়েছে। নেড়েচেড়ে দেখলাম, কোনওটাই তেমন মনে ধরল না। 'না বাছা! এ তোমার ভালো শাঁখা নয়।' শাঁখারী লজ্জা পেল "আচ্ছা মা, এরপরে আপনার জন্য ভালো শাঁখা নিয়ে আসব।" "এ ছাড়া অন্য শাঁখা আর নেই, বাক্সের তলায় অত কি রয়েছে?" তলার জিনিষ আর সে বের করে না কিছুতেই; কুণ্ঠিত স্বরে বলে "না সে ও তেমন ভালো না। আবার পরে একদিন ঠিক আপনার ওই হাতের পরার যোগ্য শাঁখাই নিয়ে আসব মা।" তারপর একটু থেমে "কিন্তু মা, আজ তো বড় রাত হয়ে গেছে, বাইরে বড় দুর্যোগও। ভিন গাঁয়ের লোক আমি। আজ রাতটা যদি আপনার এখানে—।" কি আর করি! সত্যি কথাই তো। এত রাতে কোথায় বা যায় ও। কাকপক্ষীও যে দুর্যোগে বেরুতে পারে না। —শোবার একটা তাই জায়গা করে দিলাম। তা ছাড়া খাওয়াও।" আমি একটু অবাক হয়ে বল্লাম, "চেনাশোনা নেই, হঠাৎ একটি লোককে বাড়িতে রাখতে রাজী হলেন কি করে মাসিমা?" "কি জানি বাপু, শাঁখারীর কথাগুলো বড় মিষ্টি লাগছিল। তা ছাড়া অমন দুর্যোগের রাত—কোথায় বা যায় ও।" "তারপর?" "তারপর আর কি! আমাদেরই ভাতের থেকে দুটি ভাত খাইয়ে দিলাম। আহা বড় তৃপ্তি করে খেয়েছিল। এই বাইরের ঘরেই বিছানা পেতে দিলাম। তারপর একেবারে রাত থাকতেই ভোর হবার আগেই উঠে পড়ে আমাকে ডেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল, ওর সেই শাঁখার বাক্স মাথায় নিয়ে।"

"তারপর?" "তারপর একটু বেলা যেতেই আমার দেওররা বাড়ি ফিরে এসে সে কি রাগারাগি? "যাকে তাকে তুমি বাড়িতে ঠাঁই দাও! কোনও কাণ্ড জ্ঞান নেই। একি তোমার একার বাড়ি? জানো, কাল কে এখানে এসেছিল?" "কে আবার আসবে? সে তো এক শাঁখারী।" "শাঁখারী না আরও কিছু। ওই তো সেই লক্ষ্মীছাড়া সূর্য সেন, সারা দেশটায় আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন ঠেলা সামলাও এর!" ওদের কথা শুনে বুকে আমার সে কি কাঁপুনী মা। চোখের জল আর রাখতে পারি না! কত পুণ্য করেছিলাম যে, অমন লোককে আমার ঘরে পেয়েছিলাম। কেবলি মনে হয়, আহা অসময়ে কেন বুঝিনি! —দেওরদের বকুনী এদিকে আর থামে না। আমি খালি চোখ মুছি, আর ভাবি কর্তা কখন ফিরবেন।"

"তিনি ফিরে কিছু বললেন না?" "না, তিনি কেন বকবেন, খুশীই হলেন বরং, বল্লেন, "ঠিকই করেছ—গ্রামের পরিবারের মুখ রেখেছ।" আমার দেওরগুলি আবার একটু অন্যরকম কিনা, ওদের কথাবার্তা ওই ধরণের।"

"তারপর?" "তারপর আর কি! —সন্ধ্যা হতে না হতেই সারা গ্রাম আর সারা বাড়ি পুলিশে ছেয়ে ফেল্ল। সমস্ত বাড়িটা তছনছ করতে লাগল। জিনিষপত্র, দরজা জানলা সব ভেঙেচুরে একাকার। যেন গোটা বাড়ীটাকে একেবারে ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারলে তবে ওদের আক্রোশ মেটে। আমরা বুড়ি শুদ্ধ লোক সারা রাত ঠায় এমনি ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে বাড়ির ওই উঠোনে দাঁড়িয়ে। আমার ভাগ্নীটি ৭ দিনের শিশু—তাকে নিয়েই সবচেয়ে বিপদ। আমার মা'এর গায়েও ছিল ১০৪ ডিগ্রি জ্বর।" "তারপর?" "তারপর আর নেই মা, এবার তুমি ঘুমোও, আমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাই। ভোরে তো আবার ওঠা চাই।" চোখ মুছতে মুছতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বন্ধ ঘরে আলো নিভিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। চোখে ঘুম কিন্তু আর এল না; এলো ওই গল্পেরই পথ বেয়ে ১৬।১৭ বছর আগেকার সেই অদ্ভুত দিনগুলি একটির পর একটি ভীড় করে! এই বাড়িতে এই ঘরে ওই পল্লী নারীর অন্তরের অন্তস্থলে সেদিনগুলি চিরদিনের জন্য রেখে গিয়েছে তাদের দুর্লভ পদধূলি। —মনে হচ্ছিল বাইরে থেকে ভেসে আসা ঝড়-বৃষ্টির আওয়াজের সঙ্গেও যেন মেশানো রয়েছে সেই রাতের "পসারীর" কণ্ঠস্বর।

স্মৃতিতে, বিষাদে, রোমাঞ্চে মনটা আপ্লুত হয়ে উঠতে লাগল। মনে মনে বারে বারে আবৃত্তি করতে লাগলাম "তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়েছ, তাই তো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাইতো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, পাহাড়পর্বত ডিঙ্গাইয়া চলিতে হয়।" "মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার।"

উত্তরায়ণ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমি নেমে পড়লাম।

'তুমি বসে ততক্ষণ মম-এর গল্প পড়, মীরা।'

'তুমি', ঘাড় ফিরিয়ে ও আমার মুখের দিকে তাকাল।

'বেশি দেরি হবে কি?'

'পাগল' মীরার হাতে হাত ঠেকিয়ে হাসলাম। 'দশ-পনেরো মিনিট ধরে রাখ।' হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াই। শহরের শেষ প্রান্তে এসেছি আমরা। গাছের ঘন ছায়া এখানে ওখানে। রাস্তার ওপারে একসারি খোলার ঘর। খড়-কাটা কল ঘুরছে একটা ঘরে। খড়ের কুচি ঝরে পড়ছে বৃষ্টিধারার মতো। বললাম মীরার চোখে চোখে চেয়ে, 'ইদিকে এলাম যখন লোকটার সঙ্গে দেখা করে যাওয়া ঠিক কিনা, আবার কবে—'

চোখ সরিয়ে নিয়ে মীরা গম্ভীর হল।

'তুমি তোমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করবে আমি বারণ করতে পারি।'

দুশ্চিন্তায় আমার মন আবার ভারি হয়ে গেল।

'বারণ তুমি করতে পারও যে, বেড়াতে এসে মাঝপথে নেমে আমি আমার মক্কেলের সঙ্গে মোলাকাত করব, আইনত বাধা দেবার অধিকার তোমার আছে বৈকি।' হাসলাম।

'হয়েছে, চুপ কর।' কোলের ওপর মেলে-ধরা বইয়ের পাতায় মীরা চোখ রাখল। 'দেখা করার কাজ চট্ করে সেরে চলে এস। সন্ধ্যার আগে আমরা বাড়ি ফিরব।'

দুশ্চিন্তা কাটল। আশ্বস্ত হলাম। বস্তুত অবিশ্বাস করবে, অপ্রাসঙ্গিক কিছু ভাববে, এমন কিছু করিনি আমি মীরার জীবনে, মীরার আমার পরিচ্ছন্ন মার্জিত নিটোল সুন্দর দু'বছরের এই বিবাহ-জীবনে। বিবাহ-জীবন! না, আমি বড়ো বেশী সতর্ক, বড়ো হুঁসিয়ার। জীবনের প্রাক-মধ্যাহ্ন অবধি অকৃতদার থেকে পয়সা জমিয়েছি, সংযত হয়েছি, সম্ভ্রান্ত করেছি নিজেকে। তিল তিল করে গড়ে তুলেছি আমার চারদিকে বিশ্বাসের এক পরিমন্ডল। আর ভেবেছি যেদিন দারা আসবে, সেদিন যেন আমার ঘরের দেয়ালে এমন একটিও ফুটো না থাকে, যা দিয়ে অশান্তির বিন্দুমাত্র বায়ুও এসে ঢুকতে পারে। হৃদয়ের, অর্থের পুরু প্রলেপ দিয়ে অবিচ্ছিন্ন অপ্রতিরোধ্য করে রাখব জীবন।

মীরার সম্মতি নিয়ে আমি গলির ভিতর পা বাড়াই। হ্যাঁ, ওর সম্মতির আমার এত প্রয়োজন। কথায় কাজে চলায় হাসিতে। নাহলে কেবল আমার ভয় সুর কেটে যাবে, হবে ছন্দপতন।

বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে, 'বুড়ো বয়সে বিয়ে করে বেজায় বৌ-ন্যাওটা হয়েছিস্।' চুপ ক'রে থেকে ওদের বলতে দিই। 'অবিনাশের কিসের ভয়! টাকা নেই, না স্বাস্থ্য? না যথেষ্ট মনের তারুণ্য?' তারপর ভাল্‌গার হয়ে এক সময়ে ওরা যখন মন্তব্য করে, 'এমন বিত্ত ও স্বাস্থ্যবান পুরুষকে পাঁচজন মীরাদেবীর তুষ্ট করাই তো সমীচীন, আর এক মীরাকে সন্তুষ্ট রাখতে ও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে! কিসের ভয়, কাকে ভয়।' শুনে আস্তে আস্তে সরে এসেছি।

গলি ধরে একটু এগোতে সামনে পানের দোকান। দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়ির নম্বর-গুলো দেখলাম একবার।

'পান দাও।' দোকানের দরজা ঘেঁষে দাঁড়াই।

'ভাল সিগারেট আছে?' পকেটে সিগারেটের কৌটো রেখেও আমি সিগারেট কিনি। আর দুটো বাড়ির পরেই যে ঊনিশের বি আমি দেখতে পেয়েও যেন দেখছি না।

ভয়? তবে আর মীরাকে সঙ্গে নিয়ে আসা কেন! দরকার হলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব আমি সস্ত্রীক, আমি স্বতন্ত্র! সম্পূর্ণ জীবনের বর্ম পরে এসেছি তো এই জন্যেই। না, কাজল চিঠি দিয়েছে বলে নয়, ইচ্ছে করেই এসেছি আমি। অবিনাশ এসেছে—যে-ভয় তাকে সংকুচিত সন্ত্রস্ত শঙ্কিত করে তুলেছে, সেই ভয়ের মূলোৎপাটন করতে। অবিনাশ সহজ হোক, সবল হোক, মীরার সঙ্গে সার্থক জীবন যাপনে কিছুতে যেন না আটকায়।

এতকাল পর ও ঠিকানাই বা পেল কোথায়, কেনই-বা এই চিঠি, ভাবি। অতীত? কিন্তু অতীতে আমি দরিদ্রও ছিলাম। এখন আর তা আছি নাকি! এখন আমার ক্ষমতার চাপ বুঝছে তিনটে ব্যাঙ্ক, দুটো রাইস্ মিল। অতীতে অবিনাশ মাস্টার অধরবাবুর বৈঠকখানার পাশের ঘরে বসে সকাল বেলা মুড়ি চিবিয়ে প্রাতঃরাশ করত এখন চলে মুরগির ডিম পাউরুটি মাখন জ্যাম্ জেলি। তবে?

অতীতের কিছুই নেই যখন তুমি কেন! একটা সিগারেট ধরাই। অতীত কর্তিত করে অবিনাশ অবিনাশ হয়েছে। হবে।

অধরবাবুর বাড়িতে থেকে যখন টিউশনি করতাম, মনে আছে, আমার একখানার বেশি শার্ট ছিল না। আজও বিকেলে এই বেড়াতে বেরোবার আগে মীরা আমার আধ ডজন শার্ট শুধু ক্লিনিং-এ পাঠিয়েছে।

অথচ অপরাধ সবটাই আমার ছিল কি? দু' পা এগোতে এগোতে ভাবি। যে-অতীত এমন করে অতীত হতে পারত না, তার জন্যে আমার চেয়ে অধর উকীল দায়ী ছিলেন বেশি। অধরবাবুর স্ত্রী।

গমগমে সেরেস্তা। আত্ম-অভিমানে গালের চর্বি থলো থলো। কোর্টে যাবার আগে কথাটা তিনি কাজলের মা'র মুখে শুনলেন। পাশের ঘরে বসে আছি আমি, খেয়াল করেননি। নাকি আমি শুনতে পাব বলেই অধরবাবু জোরে জোরে বললেন, 'তাই বলে মেয়ের গলায় দা বসাতে বলছ নাকি! হয়েছে শহরে ডাক্তার আছে, ব্যবস্থা একটা করাতেই হবে। উপায় কি!' একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলতে শুনলাম কাজলের মা'কে। 'তাই বলে অবিনাশ মাস্টারের হাতে তো আর আমি মেয়ে দিতে—' বলে অধরবাবু জোরে জোরে ডাকলেন কাজলকে। কাজল এসেছিল। কথা ওর শুনিনি। অধরবাবু বলছেন, 'আজ স্কুলে যাবে না?' ঠিক কি উত্তর করেছিল কাজল বোঝা গেল না। 'কাজ নেই এখন ক'দিন ইস্কুলে গিয়ে। তোমার মা'র সঙ্গে ঘরের কিছু কাজকর্ম শেখ। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ওটাও শিখতে হয়।' বলে অধরবাবু হাসলেন পর্যন্ত। শুনলাম, পরে স্ত্রীকে বলছেন, 'মাস্টারকে আমি নিজেই বলে দিচ্ছি, তুমি—তোমার ওর সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই। বরং ঠাকুরকে জানিয়ে রেখো ওবেলা থেকে ওর আর চাল নিতে হবে না।'

তারপর আমার ঘরে এসে তিক্ত জঘন্য যতটা বিষ আছে জিভের ডগায় জড়ো করে গুটিকয়েক কথা বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। বাস্ এই পর্যন্ত। না কোনো ভূমিকম্প, না ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি।

মেয়ের প্রত্যাসন্ন বিপদের ভয়কে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার মতো নার্ভ নিয়ে অধর-বাবু যখন ঋজু ও কঠিন হয়ে নাক-মুখ কুঞ্চিত করে ঘৃণাভরে আমাকে আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন, মনে হয়েছিল তখন

...াৎ মনে করেছিলেন তিনি আমিই পাপ, ...র্তমান কলঙ্ক ও-বাড়ির। আমি চলে গেলে ...ন্ধ শুভ্রতায় সারা বাড়ি ঝলমলিয়ে উঠবে। ...ন্ত্র ট্রেনে বসে কাজলের মা'র কথাগুলো ...বলাম। দুজনের (আমার ও কাজলের) ...তর্কে ভুলের ফলে কালো সাপ বাসা বাঁধলো ...য়ের শরীরে, যে-কোন মায়ের মন আঁৎকে ...রে, স্বাভাবিক। রক্ত শুকিয়ে যায় বুকের। ...বার মন স্থির হয়, সর্বকিছু স্বাভাবিকও ...কে এক সময়। বিশ্বাসের শক্ত মাটি যখন ...য়ের নীচে ঠেকে। কাজলের মা'র মুখে রক্ত ...রে এল, বললাম যখন, 'আমি তো আছি। ...ক্ষম, কিন্তু অপদার্থ নই। লেখাপড়া কিছু ...ন শিখেছি চেষ্টা-চরিত্র করে চাকরি একটা ...টাতে পারবই। কাজলের হয়তো কষ্ট হবে, ...। কিন্তু—'

কিন্তু তার চেয়েও সহজ পথ পৃথিবীতে ...ছে কাজলের মা' স্বামীর কাছে শুনলেন। ...ত্র আছে। ছেলে পড়ার হয়নি কিছু।

এবং পরদিন তো দেখলামই। ছেলে পড়তে ...য়ে আবার তিনি সোজা হয়েছেন, শক্ত সমর্থ। ...সামরী গৃহিণী।

আমি যখন বিদায় নিয়ে আসি মহিলা ...মার মুখের দিকে তাকাতে ঘৃণাবোধ ...রেছেন। কথা কননি।

নাকি কাজলও তাই বুঝেছিল! দশ হাজার ...কা বাবা বিয়ের জন্যে আলাদা করে রেখেছেন। ...র্বনাশের মেঘ দেখে আঁৎকে উঠে আগের রাত্রে ...দিদার হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে কান্নায় ...রো টুকরো হবার লজ্জায় বুঝি সারাদিনে ...মার সঙ্গে ও একবার দেখাই করলে না।

...বাক্স বিছানা রিক্সায় তুলে মাসীমাকে প্রণাম ...করার জন্যে যখন উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম, ...খি, রান্নাঘরের দরজায় মা'র পাশে উবু হয়ে ...সে মেয়ে লুচি-ভাজা শিখছে। লম্বা বেণী ...দুলিয়ে দিয়েছে পিঠে। গা ধুয়েছে। নতুন ...রে চুল বেঁধেছে, টিপ পরেছে। দু'দিন ওর ...আহার-নিদ্রা স্নান প্রসাধন বন্ধ ছিল।

...দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রিক্সায় ফিরে এসেছি।

...এই। অপরাধ যেখানে স্বীকৃত হল না, সেখানে আর অপরাধী কি! মোটামুটি যা খবর পেয়েছিলাম, দূর থেকে সবদিকই তো ভাল ছিল। কাজল আবার কলেজে ফিরে গিয়েছিল। পরীক্ষা পাশ করেছিল। স্কুলে রিসাইট করে সোনার মেডেল পেয়েছিল। তারপর বিয়ে হয়ে গেছে। ধাপে ধাপ অগ্রসর। আটকায়নি কোথাও, দাগ লাগেনি, না একটু আঁচড়।

আর, আমি পুরুষ। অবারিত রাস্তা। নিজের করে সুন্দর করে আমার পৃথিবী গড়েছি। অর্থ করেছি, প্রতিপত্তি কিনেছি, মীরাকে এনেছি। সবাই যা করে।

এখন হঠাৎ অসময়ে এতদিন পরে এই পত্রাঘাত কেন।

অশান্তি কোন্ দিক থেকে আসে কেউ বলতে পারে? আমার যেমন সংসার আছে, তেমনি তোমার। তোমার সংসারে তোমার স্বামী তোমার—বিয়ে করলে সংসার কার না হয়। অপ্রীতিকর এক ব্যাপার অন্ধকার সেই আতঙ্ক অধরবাবুর বুদ্ধির বা কাজলের মনের জোরে হোক চাপা যখন পড়েছে, মেরে যখন ফেলেছ, সব দিক বাঁচলো।

এটা ঠিক, মোহাচ্ছন্ন অতীতের ওই আতঙ্ককে সেদিন আলোর ফুল করে যতোই আমরা বরণ করার চেষ্টা করতুম, দারিদ্র্য খণ্ডাতে পারতুম না। এতদিনে, এই ক'বছরে আমাদের পৃথিবী পুরানো হয়ে যেতো। আকাঙ্ক্ষিত অনাকাঙ্ক্ষিত আরো ক'টি এসে আমাদের ঘর ভরে তুলতো। কে জানে। উদয়াস্ত খেটে খেটে ক্লান্ত জীর্ণ অস্থিসার অবিনাশ। অবিমৃষ্যকারিতার লজ্জা ঢাকতে গিয়ে অস্থির অসহিষ্ণু অত্যাচারী কখনো। কাজল নিস্পন্দ। মুখ তুলে তাকাবার মতো চোখ নেই ওর। পৃথিবীর এক অপদার্থ মা' হবার লোভ করতে গিয়ে বেচারা সব হারালো।

সত্যি, তখন বিয়ে করলে স্রেফ মরে যেতে হত দুজনকে। আজ আমি মীরাকে গাড়ি কিনে দিয়েছি।

সেদিন কাজলের জন্যে একটি ঝি রাখার ক্ষমতাও কি আমার ছিল! পারতুম না।

নাকি—কথাটা মনে হতে বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করলে আজ আমার মনের অবস্থা তা নেই বটে, কিন্তু ভাবলাম অসুখী হবার কারণই বা কী থাকতে পারে। দেখে শুনে যথেষ্ট পয়সা খরচ করে বিয়ে দিয়েছেন অধরবাবু মেয়ের। বড় চাকরি করে ছেলে শুনেছিলাম।

আসলে তাই। এবং এ-ই স্বাভাবিক। মনে মনে হাসি পেল আমার। হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেট ফেলে দিয়ে নতুন সিগারেট ধরাই। বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে অগ্রসর হই।

অর্থাৎ সুখের উত্তুঙ্গ শিখরে আমি সমাসীন। আর দশজন আত্মীয়-বন্ধুর মতো তোমার চোখের সামনেও যদি আমার সৌভাগ্যের রামধনু অন্তত একদিনের জন্যেও মেলে ধরতে না পারলাম, তো করলাম কি! এই?

এই করে ওরা। বিয়ের পরে পুরানো এক সম্পর্ককে (যতো অপ্রিয়ই হোক) সহজ ও স্বাভাবিক করার আর্ট পুরুষের চেয়ে মেয়েরা ভাল জানে। তাছাড়া কাজল।

আমি চলে এসেছি, কিন্তু দূরে থেকে শুনিনি শুনিনি করেও তো কানে এসেছিল, ক'দিনের কথা আর—অধরবাবু নাকি সরবে ঘোষণা করতেন, বার-লাইব্রেরীতে বসে আরদালী চাপরাশী বয় খানসামা নিয়ে পশ্চিমের বড়ো শহরে আছে মেয়ে আর জামাই। তিনি তাঁর মেয়ের নাম আগে উচ্চারণ করতেন, তারপর জামাইর। কেননা মেয়ে চৌখোস বেশি, জামাই পিছনে। অর্থাৎ স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভায় কাজলের রিসাইট শুনে মহকুমা হাকিম যত না মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি হয়েছিল হাকিমের ছেলে স্বপনকুমার।

আমাদের স্বপন!

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম সেদিন।

আমাদের এক ক্লাস নীচে পড়তো, বুঝি বয়সেও দু' এক বছরের ছোট হবে, মুখচোরা লাজুক চিরকেলে ফার্স্টবয় স্বপনকুমারের চেহারাটা অনেককাল পর বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

ব্রাইট গার্ল অধরবাবুর। একটা কাজের মতো কাজ করল বটে। দশজনের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কাজলের বিয়েতে দূরে থেকে বাহবা জানিয়েছি আমিও।

সেই কাজল। বণাঢ্য জীবনের পুরু প্রলেপ মেখে আজ যদি ও আরো অবারিত উচ্ছল অদ্ভুত রূপ ধরে কে আটকায় বলো।

তাই কি হয়নি?

অধরবাবু ঘোষণা করেছিলেন বয় আরদালী চাপরাশী খানসামার কথা। কাজল চিঠিতে উল্লেখ করেছে গাড়ির কথা বাড়ির কথা। অর্থাৎ ক্লাইসলারখানা তাড়াতাড়িতে আনা হয়নি সঙ্গে। নয়তো গাড়ি পাঠানো যেতো। কিন্তু বাড়ি চিনতে আপনার কষ্ট হবে না। বড় রাস্তা পার হয়েই তিন-চারটে খোলার ঘর, তারপর ফাঁকা একটুকরো জমি, তারপরেই মস্ত ইউকালিপ-ট্যাস গাছ, সামনে লাল পাথরের বাড়ি দেখতে পাবেন।

কতো নির্লজ্জ নির্বোধ, ভাবি, ভেবেছি। দিন সতেরো আগে আমার অফিসের ঠিকানায় প্রথম যেদিন চিঠিটা এল পড়ে মনে মনে রাগ হয়েছিল। কবে এল এরা কোলকাতা। ব্রাইট গার্ল। তোমার সুখের স্বর্গধাম আর দশজনকে ডেকে দেখাও, আমায় কেন। চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কাগজ-ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে মনে মনে বলেছি।

আবার কাল এক চিঠি। ভীষণ প্রয়োজন আমাকে।

একি অসহ্য বিরক্তিকর দারুণ অস্বস্তিকর এক ব্যাপার দাঁড়াতে চলেছে না। কেন প্রয়োজন, কী—

'কাকে আপনার চাই?' হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠলাম।

ইউকালিপট্যাস্ গাছের নীচেই আমি দাঁড়িয়েছি বটে এবং একটা লাল রঙের বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে আছি এতক্ষণ। খেয়াল ছিল না।

'এ-ই তো উনিশের—' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেলাম।

স্বপন!

অবিশ্যি মনে মনে যে-চেহারা আঁকছিলাম, মোটা বেতনের মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের উদ্ধত গর্বিত রাসভারী চেহারার স্বপনকুমার এ নয়। ময়লা একটা পাঞ্জাবি গায়, শুকনো রুক্ষ চুল। বড় বেশি ক্লান্ত নিস্তেজ চোখ। যা ছেলেবেলায় ওর এতটা ছিল না। যদিও ভাল ছেলে বরাবরেরই। সরল ও সুধীর। স্নিগ্ধ গম্ভীর।

কিন্তু মার্জিত নিরীহ চেহারায়, বুদ্ধি-দীপ্ত কৈশোরের নিষ্কলঙ্ক চোখে আজ দেখলাম বুদ্ধিহীনতার ঘোলাটে ছায়া। যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত, বিষণ্ণ।

স্বপন আমায় লক্ষ্য করছিল কিছুক্ষণ ধরে। কি ভেবে আমি আশ্বস্ত হলাম। অন্তত তখনকার জন্যে।

'আমার নাম অবিনাশ দত্ত।' বললাম মৃদু হেসে।

আমায় চিনতে ওর কষ্ট হয়েছিল সত্যি, কেননা সেই কবে স্কুল ছাড়ার পর থেকে এমন কোন সুযোগ হয়েছিল কি যে, আমায় ও ভাববে। ভাবছিলাম আমি। কাজলের বিয়ের রাত থেকে আজ অবধি। ভাবতে ভাবতেই এসেছি। অবিশ্যি সে-ভাবনাকে আমি গোপন রেখেছি অনেক যত্নে অনেক তপস্যায়। রাখতে হয়েছে।

'আপনাকে আমার দরকার। আপনাকেই খুঁজেছি।' স্বপন ঘাড় নাড়ল। আমার স্বাভাবিকতা একটু যেন থতিয়ে গেল, ঢোক গিললাম একটা। ফের সহজ হয়ে স্বচ্ছ গলায় বললাম, 'কাজলের চিঠি পেয়েছি। কবে আসা হল কোলকাতায়? ছুটি?'

একটা কথা না। অবনতমস্তকে স্বপন ঘুরে দাঁড়াল। অর্থাৎ ভেতরে চলুন। বাড়ির মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ও নিঃশব্দে এইটুকু শুধু জানাল। অবাক লাগল ওর হাবভাবে।

আমিও চুপ। আর কথা বললাম না। কপার্লের একটা রগ টিপটিপ করছিল। দেখলাম একবার আড়চোখে ঘড়ির কাঁটা।

কিন্তু এসে যখন পড়েছি অপেক্ষা আমায় করতেই হবে। দেখতে হবে দৃপ্ত নির্ভীক হয়ে যতখানি দেখবার। প্রস্তুত হয়েই কি আমি আসি নি।

বুঝলাম কাজল বাড়ি নেই। বাড়িটা চুপচাপ।

স্বপন আমায় নিয়ে সরাসরি তার বৈঠক-খানায় ঢুকল।

এগিয়ে দিলে চেয়ার। একটা বন্ধ জানালার কবাট ঠেলে খুলে দিলে হাত দিয়ে। তারপর পাখা খুলে দিলে সুইচ্ টিপে।

টেবিলের দুটো কাগজ খসখসিয়ে উঠল। একদিকের দেয়ালে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল তিনবার। স্বপন তখনও কথা বলছে না। আমায় বসিয়ে রেখে দিব্যি মাথা নামিয়ে পায়চারী করছে। দুই হাত পেছনে, আঙুলে আঙুল জড়ানো। চিন্তিত, ভারগ্রস্ত।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি অসহিষ্ণু একটা হাই তুলতে গেছি এমন সময় স্বপন স্থির হয়ে দাঁড়াল, স্থির চোখে তাকাল আমার মুখের দিকে।

'আপনাকে ডেকে এনে আমি লজ্জিত, যদিও আমার ইচ্ছা ছিল না—'

'না না, তাতে কি।' এতক্ষণ পর মুখ খুলতে পেরে আমিও হাল্কাবোধ করলাম। নড়েচড়ে বসলাম চেয়ারে। সিগারেট ধরাই।

'না, ও বলছিল কি না বিয়ের আগে যতদিন বাবার কাছে ছিলাম, দ্বিতীয় আর কোনো পুরুষের সঙ্গে মিশবার উপায় ছিল না। এক ছিলেন অবিনাশবাবু। বাড়িতে থেকে পড়াতেন আমায়। যদি কিছু জানতে হয় বরং ওঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো। ভদ্রলোক এই কোল-কাতায়ই থাকেন।'

'দুজনের জানা নেই এমন কোনো বিষয় ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে না কি?' কাজলের এককালের মাস্টার আমি, যেন সেই সূত্রে একটা অভিভাবকত্বের ভঙ্গি টেনে শব্দ করে এখন হেসে ওঠলাম।

আমার মুখনিঃসৃত কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার দিকে অসহায় চোখে চেয়ে রইল স্বপন। উদ্‌ভ্রান্ত বিষণ্ণ চোখে কী যেন বিশ্লেষণের গলদ্‌ঘর্ম চেষ্টা। আর এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে উদাত্ত গলায় বললাম, 'খুব ভাল মেয়ে, বুঝলে এমন মেয়ে, অন্তত আমার চোখে কাজলের মতো একটি—এক কথায় তোমরা যাকে বলো রাইট্—'

আমার কথায় মন নেই স্বপনের, লক্ষ্য করলাম, কড়িকাঠের দিকে ওর মেলে ধরা চোখ।

আর একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি রিস্ট্‌ওয়াচ্ দেখব, স্বপন মুখ নামাল।

'যে ব্যাপার আমি চাইনি, যা চিরদিন আমি ঘৃণা করেছি, আজও করি, তাই নিয়ে আপনাকে ডেকে এনে—' বিড়বিড় করছিল ও।

তারপর স্বপন মাঝপথে থেমে গেল। দরজার দিকে ফেরানো ওর চোখ। যেন দরজার বাঁকে দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে থেমে গেছে এমন হ'ল মুখের ভাব।

কাজল।

চৌকাঠে পা দিয়েই ও আমায় দেখেছে, কিন্তু তাকাল না, দেখছিল স্বপনকে। নতমস্তক স্বপনের আপাদমস্তক লক্ষ্য করল তির্যক রোষকটাক্ষ হেনে হেনে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই চাউনিতে।

যেন বাজার করে ফিরেছে কাজল। হাতে দু'একটা টুকিটাকি জিনিস। এক হাতে ব্যাগ, ছাতা। কপালে ঘামের বিন্দু। রাগে কাঁপছিল ও। সুঠাম উন্নত দেহ। অনেকদিন পর আবার মুখোমুখি দেখলাম।

বলছিল স্বপনের দিকে তাকিয়ে, 'যে-ব্যাপার তুমি চাওনা, যা ঘৃণা কর! ভণ্ড, ইতর, অভদ্র। চাও না, তাই রাতদিন পোকা হয়ে কুটকুট করছে অই একটি বিষয় তোমার মাথার ভেতর।'

স্বপন সত্যি আর মাথা তুলছে না। স্থির হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের মতো।

কাজল আমার চোখে চোখে তাকাল। যেন অনেকটা শান্ত হয়েছে এবার। ঘাম মুছল কপালের।

'মানুষ কতো নীচ কতো হীন · কুৎসি হলে এসব সন্দেহ মাথায় আনতে পারে আপনা ধারণা আছে অবিনাশবাবু?'

'ব্যাপার কি!' অস্থির ও উদ্বিগ্ন হ গিয়েও আমি স্থির হলাম, নিশ্চিত হলা কাজলের বুদ্ধিমার্জিত চোখের দিকে চেয়ে।

'ওঁর এলাহাবাদের বিলাত-ফেরত ডাক্ত বন্ধু বলেছে। সেবার আমার অসুখের সম চিকিৎসা করতে এসে ওঁকে বলে গেছে—' কাজল থামল।

'কি বলে গেছে, কি আবার বলল?' আ হাসলাম। আড়চোখে কাজলকে নয়, দেখল স্বপনকে।

'কি বলেছে আপনি একবার ওঁকে জিজ্ঞে করুন, একবার ও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করুক কাজল আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, '—আম শিক্ষিত, প্রগতির আলো পেয়েছি, হোয়াট্ ফুল্—কতো বড় মূর্খ হলে মানুষ—' কাজ থামল।

'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না শিশুর মতো সরলভাবে যেন ওদের দিকে চে আছি। অকুণ্ঠ, অপরিবর্তিত।

'আমি মা হতে পারছি না কেন?' তি অবাঞ্ছিতএকটা ঢোক গিলে কাজল মাথা নাড় 'এই নিয়ে রাতদিন ডাক্তার বন্ধুর সং গবেষণা। আর দিনের পর দিন আমায় কে প্রশ্ন আর প্রশ্ন।'

আমি চুপ করে ছিলাম।

'ইচ্ছা করে জীবনকে জটিল করে তো ভুল সন্দেহে মগজ থেঁত্‌লানো কি বিকৃত রু নয়, অবিনাশবাবু? আত্মধ্বংসী আনন্দ! এ ক'রে ক'রে নিজে তো পাগল হয়েছেই, আম পর্যন্ত মাথা খারাপ করতে বসেছে।' অস্ফ যন্ত্রণার মতো কাজল একটা শব্দ করল।

'সন্দেহ ভাল নয়।' প্রাজ্ঞ বিচক্ষণের মত ঘাড় কাৎ করে আমি হাতঘড়ি দেখলাম।

'বলুন, একবার বলে যান দেশের ও নামকরা শিক্ষিত ব্রিলিয়্যাণ্ট ছেলেটিকে একবার দেখুন পালিশ ঝকঝকে মনের নী কতো ক্লেদ এরা লুকিয়ে রাখতে পারে।' নিশ্ব ফেলবার জন্যে কাজল একবার থামল, ক পরে, 'এর মীমাংসা করতেই আমি ছুটে এসে কোলকাতা। আমি কবে কার সঙ্গে মিশে বিয়ের আগে কে এসেছিল আমার জীবনে ও ওঁকে বলতে হবে, একবার শুনুন। কত অধঃপতন, কতো দুর্বল মন হলে মানুষ এ ভাবতে পারে। তাই বললাম ওকে, কারে সঙ্গে তো মিশিনি এক ছিলেন বাড়িতে মাস্ট মশাই—অবিনাশবাবু, আছেন এই শহরে। ক তাঁকেই ডেকে দিচ্ছি, তোমার সামনে আ তাঁকে জিজ্ঞেস করব।' বিরক্ত কুঞ্চিত ভ্রু ট করে কাজল দেয়ালের দিকে তাকাল, বলল যে নিজের মনে মনে, 'আমার তো কোনো দুর্বল নেই, কেন পারব না জিজ্ঞেস করতে।'

শেষ সিগারেট ধরিয়ে আমি নিশ্ব ফেললাম।

অদ্ভুত আশ্চর্য এক কাজলকে আ

রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম। ইস্পাতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও কট্‌মট্ করে দেখছিল স্বপনকে। আর মরা মাছের মতো চোখ ক'রে স্বপন, কাজলকে নয়, দেখছিল আমাকে। যেন কী ও খ'ুজছিল। ঠান্ডা গলায় বললাম, 'মিথ্যা সন্দেহ সত্যি ভাল নয় স্বপন-বাবু। জীবনে এতে অশান্তি বাড়ে ছাড়া কমে না।' বলে দ্রুত দীর্ঘ পায়ে চৌকাঠ পার হয়ে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

কাজল আবার গর্জন করছে শুনলাম। যেন হাতের জিনিসগুলো দুড়দাড় করে ছ'ুড়ে ফেলছে ও মেঝেয়।

'ব্রুট্, ইতর, পশু। বাড়াবাড়ি করলে আমি বাবার কানে এসব কথা তুলব, মনে রেখো।' রূক্ষ কঠিন গলায় শাসাচ্ছে ও স্বামীকে।

হাল্কা স্বচ্ছন্দ শীস্ দিতে দিতে আমি ছুটলাম গাড়ির দিকে মীরার কাছে। খড়কাটা কলটা চুপ করে গেছে তখন। নিভন্ত আলো।

এপার ওপার

ভারতের সিল্ক শিল্প

তিন হাজার বৎসর ধরে ভারতে সুন্দর সিল্ক তৈরী হয়ে আসছে এবং সেই সিল্ক বিদেশে অত্যন্ত সমাদৃত হত। এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর আগমনের পর থেকে দেশীয় অনেক শিল্পের মতো সিল্ক-শিল্পও তখ হ'তে আরম্ভ হ'ল, তার ওপর ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশের সিল্ক প্রস্তুতকরণ ও চীন এবং জাপানের প্রতিযোগিতা ভারতীয় সিল্ক্-শিল্পকে প্রায় নষ্ট করে' দিলে। বিদেশে সিল্ক রপ্তানি ক্রমশঃ কমতে লাগল এবং আমদানীর পরিমাণ বাড়তে লাগল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেশটির শিল্পরূপে রেশমশিল্প পুনরুজ্জীবিত হলো। ১৯৩৪ সালে আমদানী মালের ওপর শুল্ক বসিয়ে সরকার কুটিরশিল্পকে কিছু রক্ষাকবচ' দিলেন। ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ইম্পিরিয়াল সেরিকালচার কমিটি নিযুক্ত হয়। কয়েক বৎসর হ'ল মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ভারত সরকার কর্তৃক ইম্পিরিয়াল সেরিকালচার ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে এবং একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। কয়েকটি প্রদেশে শাখা কেন্দ্রও খোলা হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন চীন ও জাপানের সিল্ক আমদানী বন্ধ হয়ে যায় তখন ভারতীয় সিল্ক ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভবান হবার সুযোগ পেয়েছিলেন, সিল্কের দাম শতকরা ২০০ থেকে ৪০০ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী সিল্ক উৎপাদন করতে পারে বিহার, যার মূল্য ৪২ লক্ষ টাকা; তারপর মহীশূরে ৩৮ লক্ষ টাকা; বাঙলা ২০ লক্ষ টাকা। মধ্যপ্রদেশ ১৪ লক্ষ টাকা এবং কাশ্মীর ও জম্মু ১২ লক্ষ টাকা। জাতীয় সরকারের হাতে পড়ে এই পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাবে তাতে আর সন্দেহ কি?

অধ্যাপক পিকার্ড

ষোলো বৎসর আগে অধ্যাপক পিকার্ড বিশেষভাবে তৈরী বেলুনে শূন্যে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে বেড়িয়ে এসেছিলেন; তিন বৎসর পরে তিনি ডক্টর কজিন্স নামে একজন সহকারী নিয়ে পুনরায় স্ট্রাটোস্ফিয়ারে উঠেছিলেন. এই দু'জন অধ্যাপকই বেলজিয়ামের ব্রুসেলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ'রা দু'জনে এখন ঠিক করেছেন যে, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে থেকে কিছুদূরে গাল্ফ অফ গিনিতে সমুদ্রগহ্বরে আড়াই মাইল নীচে নামবেন। তারা যে ডুবো জাহাজে নীচে নামবেন তা সাড়ে তিন ইঞ্চি পুরু ধাতু দ্বারা গঠিত যাতে তা ভীষণ জলের চাপ প্রতিরোধ করতে পারে। গভীর সমুদ্রের নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

মাতৃত্ব-পদক

সন্তান জন্ম উৎসাহিত করবার জন্য পাঁচ অথবা ছয়টি সন্তানের জননীকে "মাতৃত্ব পদক" দিচ্ছেন রাশিয়া সরকার; সাত থেকে নয়টি সন্তানের মাকে দেওয়া হয় "মাতৃত্ব-গৌরব পদক" এবং যাদের দশটির অধিক সন্তান আছে সেইসব মায়েদের দেওয়া হয় "বীরমাতা পদক"। আমাদের দেশে এই পদক প্রচলন করলে অনেকেই "বীরমাতা পদক" পাবেন কিন্তু আপাততঃ বিপরীত কোনো পদক প্রবর্তন করা যেন বিশেষ প্রয়োজন হয়ে' পড়েছে।

খুনী ও রাসায়নিক

রাসায়নিকেরা খুনীকে কি করে ধরতে পারে তার এক আশ্চর্য প্রমাণ পাওয়া গেছে; গায়ের জোরে অথবা পিস্তল দেখিয়ে নয়, রসায়নের সাহায্যে, যা রাসায়নিকের অস্ত্র। ক্যালিফোর্ণিয়ার একটি শহরে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি লোককে আক্রমণ করা হয় কিন্তু এক টুক্‌রো সুতো ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। সেই সুতো এনে রাসায়নিককে দেওয়া হ'ল। রাসায়নিক সেই সুতোর ধুলো সংগ্রহ করলেন এবং প্রত্যেকটি কণা পরীক্ষা করে' জানিয়ে দিলেন যে এই সুতো আসছে এমন এক খামার থেকে যেখানে আছে পাইন গাছ; একটি মহার্ঘ গাছ, একটি জার্সি-গরু, একটি লালচে-বাদামী রংয়ের ঘোড়া, সাদা-কালোয় মেশানো খরগোস এবং রোড আইল্যান্ড নামক লাল মুর্‌গি। তারপর পুলিসের পক্ষে সেই খামারটি এবং আসামীকে খ'ুজে বার করা সহজ হ'ল। রাসায়নিকের পর্যবেক্ষণ শক্তির বাহাদুরী আছে।
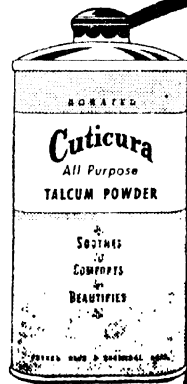
ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল সর্বপ্রথম খেলায় পার্থে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিলে কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করেন, "ইহার দ্বারা দলের ঠিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। উভয় দলই অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য খেলায় নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে যখন খেলা হইবে তখন উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে ভারতীয় দল কিরূপ শক্তির অধিকারী।" এই সকল সমালোচকগণ ভ্রমণের দ্বিতীয় খেলায় এডিলেডে ভারতীয় দল শক্তিশালী দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের সহিত যেরূপ সমানে লড়িয়াছে তাহাতে নিশ্চয়ই বলিবেন, "ভারতীয় দল শক্তিহীন নহে। টেস্ট খেলাতেও শোচনীয় পরাজয় বরণ করিবে না। খেলিতে পারে ইহার প্রমাণ দিবে।" আমরা এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন না করিলেও কিছুটা করিতে বাধ্য। কারণ, প্রকৃতই ভারতীয় দল বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যানের পরিচালিত দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে কল্পনাতীত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। বিশেষ করিয়া অমরনাথ প্রত্যেক ইনিংসে ব্যাটিংয়ে অপূর্ব দৃঢ়তা ও অভাবনীয় সাফল্যলাভ করিবেন ইহা আমাদের ধারণাতীত ছিল। প্রত্যেক ইনিংসে তিনি দলের নৈরাশ্যজনক সূচনার গতিরোধ করিয়া সম্মানজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। অমরনাথ অধিনায়কোচিত ক্রীড়ানৈপুণ্যের অবতারণা করিয়াছেন ইহা বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি হইবে না। এই খেলার ফলাফল টেস্ট খেলার ভারতীয় দল সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা মনে জাগ্রত করে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতীয় দল টেস্ট খেলাতেও অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করুক এই কামনাই করি।

ভারতীয় বনাম দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া

ভারতীয় বনাম দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের চারি দিনব্যাপী খেলা এডিলেড মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ভারতীয় দল শেষ সময় অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ব্যাটিং করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ভারতীয় দলের বোলিং সুবিধাজনক না হওয়ায় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম তিনজন খেলোয়াড় নীহাস, ক্রেগ ও ডন ব্রাডম্যান প্রত্যেকে শতাধিক রাণ করেন। ইহার ফলে সকলেরই ধারণা হয়, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দল রেকর্ড সংখ্যক রাণ সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় না। প্রথম দিনে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দল ৩ উইকেটে ৩৭৯ রাণ সংগ্রহ করিলেও দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ৮ উইকেটে ৫১৮ রাণ করিতে সক্ষম হয়। দ্রুত উইকেট পতন লক্ষ্য করিয়া ব্রাডম্যান ইনিংস পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। ভারতীয় দল খেলা আরম্ভ করিয়াই পর পর দুইটি উইকেট দুই রাণের মধ্যে হারায়। মানকড় ও হাজারী একত্রে খেলিয়া পতন রোধ করেন। মানকড় ৫৭ রাণ ও হাজারী ৯৫ রাণ করিয়া আউট হন। অমরনাথ এই সময় খেলিতে নামেন। দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে মাত্র ২২৪ রাণ হয়। ভারতীয় দল ইনিংসে পরাজিত হইবে এই ধারণাই সকলের মধ্যে হয়। তৃতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হইলে দেখা যায় অমরনাথ ও সারভাতে অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত রাণ তুলিতেছেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারতীয় দল ৩৫০ রাণ পূর্ণ করেন। অমরনাথ শতাধিক রাণ করেন। ভারতীয় দলের ইনিংস ৪৫১ রাণে শেষ হয়। ভারতীয় দলকে মাত্র ৬৭ রাণ পশ্চাতে ফেলিয়া অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। তৃতীয় দিনের শেষে তিন উইকেটে ১০১ রাণ করেন। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইবে এই আশা করিবার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। চতুর্থ দিনের সূচনায় ফাদকারের বোলিং বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তিনি তিন রাণে তিনটি উইকেট পতন সম্ভব করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ২১৯ রাণ করিয়া পুনরায় ডিক্লেয়ার্ড করে। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের ন্যায় খেলা আরম্ভ করিয়াই ১৭ রাণে ২টি উইকেট হারায়। মানকড় দৃঢ়তার সহিত খেলিতে থাকেন। ৫টি উইকেট ৬০ রাণে পড়িয়া যায়। চা-পানের সময় আশংকা হয়, ভারতীয় দল পরাজিত হইবে। খেলা আরম্ভ হইলে অন্যরূপ ফলাফল প্রদর্শিত হয়। অমরনাথ ও মানকড় সাবলীল ভঙ্গীতে খেলিয়া রাণ তুলিতে আরম্ভ করেন। ব্রাডম্যান ঘন ঘন বোলার পরিবর্তন করেন। কিন্তু এই দুইজন খেলোয়াড়কে বিব্রত করিতে পারেন না। দিনের শেষ পর্যন্ত খেলিয়া মানকড় ১১৬ রাণ ও অমরনাথ ৯৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। ভারতীয় দলের ৫ উইকেটে ২৩৫ রাণ হয়। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ভারতীয় দল ইনিংস পরাজয়ের অবস্থার পরিবর্তন করিয়া এইরূপ প্রশংসনীয় পরিসমাপ্তি করিতে পারিবে ইহা কাহারও কল্পনায় ছিল না। সকলেই চমৎকৃত হন। ভারতীয় দলের এই খেলা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে। বিজয় মার্চেণ্ট, ও আর এস মোদী এই দুইজন ব্যাটসম্যান যদি এই দলের সহিত থাকিতেন ফলাফল আরও কত ভাল হইত সেই কথা স্মরণ করিয়া বর্তমানে সত্যই বেদনা অনুভব করিতে হইতেছে।

খেলার ফলাফল:—

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস:—৮ই উইঃ ৫১৮ রাণ (নীহাস ১৩৭, ক্রেগ ১০০, ব্রাডম্যান ১৫৬, হেমেন্স ৩১, মানকড় ১২৭ রাণে ৪টি ও সারভাতে ৮৩ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস:—৪৫১ রাণ (মানকড় ৫৭, হাজারী ৯৫, অমরনাথ ১৪৪, সারভাতে ৪৭, নোবলেট ৬৫ রাণে ৩টি, অসওয়াল্ড ৭০ রাণে ২টি ও ওনীল ১১০ রাণে ১টি উইকেট পান।)

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস:—৮ উইঃ ২১৯ রাণ (নীহাস ৪৯, নোবলেট নট আউট ৫০, ফাদকার ৫৯ রাণে ৪টি ও মানকড় ৫১ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—৫ উইঃ ২৩৫ রাণ (মানকড় ১১৬ রাণ নট আউট, অমরনাথ ৯৪ রাণ নট আউট, ওনীল ৪০ রাণে ২টি ও নোবলেট ৪৮ রাণে ২টি উইকেট পান।)

ফুটবল

আই এফ এ-এর পরিচালকমণ্ডলী এক জরুরী সভায় স্থির করিয়াছেন, আগামী ১৫ই নবেম্বর ক্যালকাটা মাঠে শীল্ড ফাইন্যাল খেলা হইবে। গত ৪ঠা অক্টোবর এই খেলার মীমাংসা হইয়া যাইত, কেবল অতি উৎসাহী দর্শকগণের কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপের জন্যই তাহা সম্ভব হয় নাই। আগামী ১৫ই নবেম্বর খেলাটি নির্বিঘ্নে শেষ হইলেই সন্তুষ্ট হইব।

ভারতীয় দলের অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ মৈনুল হক আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলার দিন ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় ফুটবল দল আগামী বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে প্রেরিত হইবে। ইহার জন্য নাকি সকল ব্যবস্থাই শেষ হইয়াছে। প্রায় একমাস পূর্বে এই উক্তি তিনি করেন। ইহার পর কি কি ঘটনা বা কি কি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা কোন কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। উক্তির মধ্যেই কি ইহার পরিসমাপ্তি, না ইহার পরও কিছু আছে জানিতে ইচ্ছা হয়।

সন্তরণ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য অসময়ে কোনরূপে ওয়াটার পোলো খেলার এক প্রতিযোগিতা শেষ করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতায় সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব দল সাফল্যলাভ করিয়াছে। যে কয়টি দল যোগদান করিয়াছিল, তাহার মধ্যে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের খেলোয়াড়গণই জড়তাবর্জিত ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারেন। অপর সকল দলের কেহই দীর্ঘকাল অনুশীলন করেন নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং যোগ্য দলই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তবে এই কথা না বলিয়া পারি না যে, বাঙলার ওয়াটার পোলো স্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়াছে। নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইলে বাঙলা দলকে বোম্বাই দলের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে হইবে, সেই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

ওয়াটারপোলো খেলার নমুনা আমরা দেখিলাম। সন্তরণের বিভিন্ন বিভাগে বাঙলার সাঁতারুগণ কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, দেখিবার আশায় আছি। জানি না বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন কি না। ইতিপূর্বে দিন পরিবর্তন, স্থান পরিবর্তনের হিড়িক যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহাতে আশংকা, স্থগিত হইলেও হইতে পারে।

ব্যায়াম

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ সারা বাঙলা দেশে তথা সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাহাতে বিরাটভাবে "বীরাষ্টমী উৎসব" উদ্‌যাপিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকল স্থানের অনুষ্ঠানের খবরাখবর আমরা পাই নাই। তবে যে কয়েকটি দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহাতে বিনা দ্বিধায় আমরা বলিতে পারি, "সত্যই ইহাদের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে।"

নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ইহারা দেশবাসীকে সাম্য ও ঐক্যের পথে চালিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহাদের সেই উদ্দেশ্য কতকটা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বীরাষ্টমী উৎসবের মধ্য দিয়া বীরধর্ম ও বীরের পূজারী করিবার যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন, সত্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। দেশবাসী ইহা একদিন উপলব্ধি করিবে এবং ইহাদের আহ্বানে সাড়া দিবে এইটুকু বিশ্বাস আমাদের আছে।

"আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু,
শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।"

ফটো—মনোবীণা রায়

কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী

আজকের এই আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করবার সামর্থ্য আমার নাই। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর জন্মভূমি এই ঝামটপুর। ঝামটপুর আমার কাছে স্বপ্নরাজ্য বলে মনে হচ্ছে। এখানকার নরনারীকে আমি নূতন রকম দেখছি। আজ ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠের সময় ঝামটপুরের নাম যখন শুনেছিলাম, তখন আমার মনে সেই নামের সঙ্গে একটা স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের শাস্ত্রে আছে নাম, ধাম, আর কাম একসঙ্গে মনের উপর কাজ করে। বেদেও দেখা যায়, ঐ সত্যেরই নির্দেশ করা হয়েছে। সাম বেদের ঋষি প্রার্থনা করছেন, ইন্দ্র, তোমার নাম আমার অন্তরে সৃষ্টি কর, তবেই তোমার ধাম বা রূপের দিকে আমার দৃষ্টি যাবে; আর আমার মন তোমার প্রতি উন্মুখ হবে, তখন রসের দ্বারা বিভাবিত হয়ে আমি তোমাকে পতিস্বরূপে লাভ করবো। এই গ্রামে যে প্রতিবেশের মধ্যে কবিরাজ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমরা তা ধারণা করতে পারি না। বড়ন স্টেশন থেকে গ্রামে হরিৎ বর্ণের ঢেউ খেলানো ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ীখানা যখন গ্রামের দিকে আসছিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার দিগন্ত ছেয়ে গিয়েছে। কান পেতে থাকলাম—গান শোনা যায় কিনা। মীনকেতন রামদাস একদিন হরিনাম গান করতে করতে এই গ্রামে এসেছিলেন। সে গানের সুর এখানকার আকাশে বাতাসে বাজে কি? বাইরের এ কানে সে গান বাজছিল না বটে; কিন্তু ভিতরে অন্তরের তারে তারে সে সুরের সঞ্চার হ'চ্ছিল। ঝামটপুর এই নামের সঙ্গেই এখানকার সাধক সন্তান সে সুরটি বেঁধে দিয়ে গেছেন। যে কাব্যময় পটভূমিকায় তিনি এই গ্রামের নামটির অবতারণা করেছেন, তাতে আমাদের সকলের মনে গ্রামটি স্বপ্নলোকের অপূর্ব মাধুরী সঞ্চার করে। অকিঞ্চন কাঙ্গাল বৈষ্ণবের উদার মহিমাকে আনুষ্ঠানিক লোক বিধির উপর স্থান দিয়ে কবি মানবতার যে মধুর স্পর্শে আমাদের অন্তরকে উদ্বেলিত করে তুলেছেন, তার কাছে আমাদের ধরা আর সাড়া দিতেই হয়। মানুষের সে পরম মর্যাদার কাছে বাইরের সব বস্তুবিচার তুচ্ছ হয়ে পড়ে।

ঝামটপুর এই নামের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের ঠাকুর নিত্যানন্দের রূপের অপরূপ বিভঙ্গী চোখের সামনে জেগে উঠে। তাতে বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন, কামগায়িত্রী, কামবীজে যার উপাসনা তাঁর রসময় উদ্দীপনা আমাদের মনেও খেলে যায়। ঝামটপুরে এসে এখানে আপনাদের দেখে এইসব অনুভূতি একসঙ্গে আমার মনে কাজ কচ্ছে এবং সেই ভাবময় প্রভাবের ধারা আমার মনকে মেনে নিতে হচ্ছে। এখানে এসে আমার অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত যে আনন্দ আমি অনুভব কচ্ছি তার কারণ বোধ হয় এই। এ অনুভূতি আমার কাছে নিত্য হোক, সত্য হোক, আমি এই প্রার্থনা করছি। ভাবের এই নেশায় যদি মনকে এখান থেকে মিশিয়ে নিতে পারি, তবে এই পুণ্যতীর্থে আসা আমার অনেকখানি সার্থক হবে।

বাংলার ইতিহাসে আজকার এই দিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিরাজ গোস্বামীর আজ তিরোভাব তিথি। তাঁর অবদান বাংলার ইতিহাসে কতখানি, আমার মনে হয়, এবিষয়ে আমরা এখনও যথেষ্টরূপ অবহিত হ'তে পারি নি। দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে একটা জাতির সংস্থিতি এবং তার অগ্রগতির বিচার করতে গেলে দেখা যায়, সমাজের মনোমূলে ব্যাপ্তি চেতনা যাঁরা জাগিয়েছিলেন, তাঁদের অবদানই সে ক্ষেত্রে বড় হয়ে যায়। বাইরের রাষ্ট্রনীতিক বিপর্যয়কর কর্ম-সাধনার বিচারগত মূল্য যতই বড় হোক্ না কেন জাতির মনের মূলে ঔদার্যপূর্ণ প্রাণরস সঞ্চারের কাছে তাহা কিছুই নয়। বাংলার বুকের উপর দিয়ে রাষ্ট্রনীতিক কত বিপর্যয়ের প্রবাহ ব'য়ে গেছে, কত রাজা বাদশা সে বন্যায় ভেসে কোথায় চলে গেছেন; কিন্তু কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী আজও বেঁচে রয়েছেন। জাতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মূলে তাঁর সাধনার ধারা এখনও সঞ্চারিত হ'চ্ছে। আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, পরিবর্তনই উন্নতি নয়, কিন্তু সে পরিবর্তনের মূলে ব্যাপ্তি-চেতনার সংবেদনা থাকা প্রয়োজন। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, বিপ্লবই প্রগতি নয়, সে বিপ্লবের মূলে প্লবরস অর্থাৎ সেবা ও প্রেমের তাড়না থাকা আবশ্যক। বাংলার বিভিন্ন পরিবর্তন এবং বিপর্যয়ের মধ্যে নানারূপ বিপ্লবের ধারার ভিতর দিয়ে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সাধনাগত বৃহত্তের জন্য এই বেদনা কতখানি কাজ করেছে উপর টপকা কতকগুলো সামাজিক তথ্যের ফর্দ ধ'রে আমরা তার পরিমাপ করতে পারবো না। সে সংশ্রয় শত বিপর্যয়ের মধ্যেও এদেশের জনমনকে ভেঙ্গে পড়তে দেয় নাই, তার প্রাণধর্মকে সঞ্জীবিত রেখেছে। এই দিক থেকেই তার বিচার করতে হবে।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী কবি ছিলেন। বৃন্দাবনের পুণ্যশ্লোক গোস্বামীদের নিকট থেকে তিনি কবিরাজ এই উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন। কবি বলাতে অনেক কিছুই বোঝায়, আমাদের প্রাচীনেরা কবিকে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছেন। অন্তরে কতকগুলি ভাবের সাড়া জাগিয়ে তোলাকেই তাঁরা কবিত্বের পরম ধর্ম বলেন নাই। বিভিন্ন ভাবকে এক মহাভাবের উন্মেষে বিকশিত ক'রে তুলে সকল অভাবের ঊর্দ্ধে মানুষের মনকে নিত্য, সত্যের সংশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করাকেই তাঁরা প্রকৃত কবিত্ব বলে অভিহিত করেছেন। এখানেই কবিত্বের সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ এসে পড়ে। মানুষের বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন দুঃখের থেকে তাকে সুখের সংস্পর্শে নিয়ে যাওয়ার কথা উঠে। এই হিসাবে কবি যিনি তিনি মনীষী, তিনি তত্ত্বদর্শী। সাময়িক কতকগুলি ভাব সৃষ্টি করাতেই কবিত্ব পর্যবসিত নয়। সব অভাবের মধ্যে আমাদের জীবনের ধারা যাতে প্রাণরসে পুষ্ট থাকে এমন ইষ্টতত্ত্বের সঙ্গে মানুষের মনের বিভিন্ন অনুভূতিকে ঘনিষ্ঠ করে তোলার উপরই কবির প্রকৃত কৃতিত্ব নির্ভর করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কবিত্ব অনুমানের বিষয় নয়, কবির অবদান প্রাণময়। অন্য কথায় কবিত্ব-শুধু কতকগুলি সিদ্ধান্ত নয়, পক্ষান্তরে কবির সৃষ্টি এবং দৃষ্টি জীবন্ত। মানুষের মনের মূলে যে বেদনা রয়েছে এবং সেই বেদনাকে আশ্রয় করে তার মনে যে সব ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সাড়া দিচ্ছে কবির সাধনায় মানুষ তার সঙ্গতিময় পরিস্ফূর্তি অন্তরে লাভ করে। যেখানে অনুমানের অন্ধকার ছিল, সেখানে রূপ ফোটে, মনের আগ্রহে যে বস্তু আভাসে ছিল, শুধু আয়াস দিচ্ছিল, তা বিগ্রহে প্রকাশ পেয়ে কবির সাধন-বিভবের রসবিলাসে চিত্তকে নিমজ্জিত ক'রে দেয়।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী শুধু ভাব দেন নাই; তিনি উপাধিগত বিভিন্ন ভাবকে অতিক্রম ক'রে আমাদের মন মহাভাবের প্রজ্ঞানময় বিগ্রহকে কিরূপে লাভ করতে পারে, তিনি সে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা তাঁর সাধনার লক্ষ্য হ'তে পারে; কিন্তু তাহাই তাঁর সাধনার বড় কথা নয়। তাঁর দার্শনিকতা শুধু বিচারেই পর্যবসিত হয় নাই; প্রত্যক্ষতার রসানুভূতিতে তাহা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। সে দার্শনিকতার বিচার আমাদের সকলের পক্ষে বুঝে উঠা কঠিন হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর সাধনার বাঙ্ময় স্ফূর্তিতে যে দেবতাটি আমাদের অন্তরে জেগে উঠেন তাঁর প্রভাবে আমাদের পড়তেই হয়। তাঁর সংস্কৃতপূর্ণ বহুল কাব্যগ্রন্থ, কারো কারো পক্ষে দুর্বোধ হ'লেও কবির সিদ্ধজীবনের সম্পদে দ্বার সকলের পক্ষেই তিনি অনিরুদ্ধ রেখেছেন। এইখানেই তাঁর সাধনার বিশেষত্ব। বিচার রস নয়, বিচারকে ডুবিয়ে যে রস উপচে ওঠে সেইটুকুই হ'ল রস। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সাধনার এই রস-ধর্মই প্রকৃতপক্ষে তাঁকে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী, বিশেষভাবে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপাদ ব্রহ্মতত্ত্বের যে নিরূপণ করেছিলেন, সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ রয়েছে। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সাধনায় সে সব সিদ্ধান্ত জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। প্রকৃত পক্ষে দর্শন যেখানে অন্তরের গাঢ় এবং গাঢ় অনুভূতিতে মানুষের জীবনের সঙ্গে স্পর্শ হয় তখন তাহা কাব্যেই পরিণত হ'য়ে থাকে এবং সেইখানেই তার সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা। দার্শনিকেরা নিজকে রাখে, কিন্তু দার্শনিকতা যেখানে কাব্যে পরিণত হয়, সেখানে তা বীজে চলে যায়, অর্থাৎ অহঙ্কার সেখানে ডুবে যায়; সাধক সর্বাত্মতা লাভ করেন। তাঁর সাধনা সকলের হয়, সকলের কাছে তাঁর কথা মধুর হয়ে উঠে। তখন তিনি "সবাকার উপদেষ্টা [illegible] ঠাকুর, নয়নে শ্রবণে মনে বচন মধুর।"

বৈষ্ণব মহাজনগণ কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে কবি ভূপতি বলেছেন—এ আখ্যা সঙ্গতই হয়েছে। আধুনিক সমালোচকেরা কেহ কেহ তাঁর লেখাতে ভাষা এবং ছন্দের ত্রুটি দেখতে পান। কিন্তু ভাষা ও ছন্দের গতি পরিবর্তনশীল। সে সব ছেড়েও কবি সনাতন একটি সচেতন বস্তু দিয়ে থাকেন এবং সেখানেই কবিত্বের সার্থকতা। ভাষা ও ছন্দের উপর কবিরাজ গোস্বামীর দখল যে কম ছিল না, তাঁর গোবিন্দ লীলামৃত এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের তিনি যে টীকা করে গেছেন, তাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি আধুনিকতার দৃষ্টিতে যাঁরা তার ভাষা ও ছন্দের ত্রুটির কথা তোলেন

তাঁদের এই কথা বলবো যে, সে সব ত্রুটি সত্ত্বেও 'ত্রুটি ন গারয়তে স্বাং অপশ্যাতাম্' এমন যাঁর রূপ কবিরাজ গোস্বামী তাঁকে আমাদের কাছে মূর্তিমন্ত করে দিয়ে গেছেন। কবির রসানুভূতির আলোতে ত্রুটির অর্থ বদলে গেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকতমাঝ' এখনও বাংলার অগণিত নরনারী কবিরাজ ঠাকুরের সাধনার ভিতর দিয়ে সেই-রূপ সুধারস পান করছে। পুরাণকে এইভাবে নিত্য-নতুন যিনি করতে পারেন তাঁকেই বলব মহাকবি। এঁরা জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

'বৈষ্ণব চিনিতে নারে বেদের শকতি', সুতরাং কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে চিনব, বুঝব, এ শক্তি আমাদের কি আছে? বৈষ্ণব সাধকগণ কেহ কেহ তাঁকে মঞ্জরীরূপে উপলব্ধি করেছেন এবং কস্তুরী-মঞ্জরী ব'লে অভিহিত করেছেন। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ, মোটামুটিভাবে বলতে গেলে রসের ভিতর দিয়ে রূপকে জাগায়ে তোলাই মঞ্জরীদের বিশেষত্ব। শুধু তাঁদের কৃপাবলেই রস-সাধক সেবাতে অনুগতি লাভ করে থাকেন। চণ্ডীদাস বলেছেন, 'কেবা অনুগত, যাহার সহিত শুনিলে বুঝিবে কেনে, মনে অনুগত মঞ্জরী সহিত সাধিয়া দেখহ মনে। ঝামটপুরের অধিবাসী আপনারা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কৃপার সঙ্গে আমাদের মনে তেমন সাধ জাগাবার সামর্থ্য আপনাদেরই আছে। আপনারা সামান্য নহেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ধাঁহারা সাধক, তাঁরা ঝামটপুর এই নামে অন্তর্গূঢ় রস-সংবেদনের পথে আপনাদের এই পুণ্য ধামের কৃপা এবং আপনাদের কৃপা অনুদিন প্রার্থনা করেন। মনোময় বেদনাতেই এই সাধনার ধারা ফুটে উঠেছে। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু আমাদের সকলের, এ কথা সত্য; কিন্তু ঝামটপুরে তিনি নিত্য। এই নাম, এই ধামের সঙ্গে তাঁর মাধুরী সর্বদা স্ফুর্ত। এ কথা ভুললে চলবে না। আপনাদের সকলের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব রয়েছে।

আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি; আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের অবসর আজ আমাদের মেলেছে। আমাদের ঘরের ঠাকুর যাঁরা, তাঁদের যেন আমরা বিস্মৃত না হই; বাইরে চারিদিকেই বিপদের ভয় এবং নিরাশ্রয় অবস্থা। জাতির সংস্কৃতির আপনারা অধিকারী। জাতির এই বিপদে আপনাদের সম্পদ বাহির করুন। কবিরাজ গোস্বামীর অবদানের মহিমা জাতির সম্মুখে প্রদর্শন করুন। পশ্চিমবঙ্গবাসী আপনারা, শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমির অধিবাসী আপনারা, আপনাদের উপর জাতির ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। বর্তমানে ঈর্ষা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কোলাহল এবং দুর্নীতি সর্বত্র অনাচার সৃষ্টি করছে, কবিরাজ গোস্বামীর প্রেমময় অবদানই এই দুর্দিনের অবসান ঘটাতে পারে। তিনি যে ধন আমাদিগকে দিয়ে গিয়েছেন, তাহা সামান্য নয়। আমাদের বর্তমান দৈন্য এবং কার্পণ্য দূর ক'রে আমরা গোস্বামী প্রভুর কৃপাবলে জীবন ধন্য করতে পারি। অসুরের বৃত্তি পরস্পরের প্রতি হানাহানি বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি, এগুলি কোনদিনই মাথা পেতে লয় নাই। মহাপ্রভুর প্রেমের প্লাবনে এখানকার সংস্কৃতি সব দিক হ'তে অনুপ্রাণিত। অসুরের দম্ভ, দর্প এখানে স্থায়ী হবে না। এই তো আমার বিশ্বাস। ঝামটপুরের পুণ্যভূমি ধূলি স্পর্শে, আর আমাদের দেশে সে বিশ্বাস দ্বিগুণতর সত্য হয়ে উঠছে।

সজ্জনগণ! নিখিল বঙ্গ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্মৃতি সমিতি এই পুণ্যময় ধামের সেবা করতেই চাহেন, তাঁরা আপনাদের সেবাই প্রার্থনা করেন। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর স্মৃতি পূজা, স্মৃতিরক্ষা বা তাঁর অবদানের প্রচার—এ সব তো আপনাদেরই সেবা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি ও দেশের সেবা। শুধু তাই নয়, বর্তমান আসুরিক দৌরাত্ম্যে অভিভূত-প্রায় জগতে বিশ্বমানবেরই সেবা। আমাদের এই সেবাকার্যে আপনাদের সহযোগিতা ভিক্ষা করবার জন্যেই সমিতির পক্ষ থেকে আমরা এসেছি এবং এই শ্রীধাম দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তরুণদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ রয়েছে। তাঁরা যেন মনে না করেন যে, বৈষ্ণবতা শুধু কতকগুলো বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের গোঁড়ামী এবং আধুনিকতা বা প্রগতিবাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। যুবকদের মধ্যে যদি কারো এমন ধারণা থাকে, তবে তা সম্পূর্ণই ভুল। বৈষ্ণব সাধনা মানবতাকেই সব চেয়ে বড় ক'রে দেখে। মানুষকে এত বড় মর্যাদা অন্য কোন সাধনাই বোধ হয় দিতে পারে নাই। অন্য অনেক সাধনা স্বর্গ পুণ্য প্রভৃতি পরোক্ষ বিচারকেই লক্ষ্য রেখেছে। কিন্তু বৈষ্ণব সাধনায় এই ধরণের পরোক্ষতার স্থান নাই। বৈষ্ণব জগৎকে উড়িয়ে দেয় নাই, তাঁরা এই জগতের সর্বত্র এখানকার নরনারীর মধ্যেই তাঁদের প্রাণের ঠাকুরের প্রেমের লীলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এখানকার মূর্খ দরিদ্র, পতিত এবং তাপিতের সেবার ভিতর দিয়াই তাঁরা পরমার্থকে উপলব্ধি করেছেন। বৈষ্ণব সাধনা প্রকৃতই স্বরাজের সাধনা। রাধামাধবের মধু মাধুরী বিশ্বের সর্বত্র সঞ্চারিত করে প্রেমময় জীবনে বৈষ্ণব স্বরাজ সাধনাকে সার্থক করেছেন। আসুন, কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর আনুগত্যের পথে আমরাও জাতিকে দুর্নীতি এবং দুর্গতি থেকে মুক্ত করে আমাদের বহু তপস্যায় অর্জিত স্বরাজকে সার্থক করি।*

* ঝামটপুরে নিখিল বঙ্গ কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিরূপে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিপি।

জাগরণ—শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ বুকস্ লিমিটেড, ১৬০।১এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য দুই টাকা।

'জাগরণ' গীতিনাট্য। জাতীয়তা-বোধ উদ্দীপক একটি ভাব গানে ও বর্ণনায় রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে গান-গুলির স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে। ২১১।৪৭

সমাজ-দর্শন—শ্রীনলিনীকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বুকষ্টান্ড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সুষ্ঠু ও কল্যাণপ্রদ সমাজ গঠনের নানাবিধ ইঙ্গিত এই বইটির সর্বত্র পাওয়া যাইবে। বইটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া মূল্যবান।

বিপ্লবী অশোক—শ্রীজ্যোতি সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—পূর্বভারতী, ১২৬-বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। মূল্য বারো আনা।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে একটি রহস্যময় কাহিনীর রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। উহা 'অজন্তা' গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ।

অন্তর ও বাহির—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

'অন্তর ও বাহির' নূতন ধরণের বই। একটি জিজ্ঞাসু ও দার্শনিক বাল্যজীবনের ক্রমবিকাশ শৈশব হইতে গল্পাকারে বিবৃত হইয়াছে। কাহিনী বলার সঙ্গে সঙ্গে লেখক নানা কৌতুকপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। তাহার ফলে বইটি আগাগোড়া সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

নবকল্লোল (মাসিকপত্র, শারদ সংখ্যা)—শ্রীকুমারকৃষ্ণ বসু সম্পাদিত; ৬নং রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; এই সংখ্যার মূল্য ৮০ আনা।

এই সংখ্যার অধিকাংশ রচনার লেখক-লেখিকাই নবীন। কয়েকটি লেখা আমাদের ভালো লাগিয়াছে। আমরা এই নূতন মাসিক পত্রখানির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ২২০।৪৭

রূপমঞ্চ—সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়। কার্যালয়—৩০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এবং চিত্রশিল্পী ও টেক্‌নিশিয়ানদের বহু-সংখ্যক ছবিতে সমৃদ্ধ এই পূজা সংখ্যা পাইয়া আমরা প্রীত হইলাম। মঞ্চ ও পর্দা অনুরাগী পাঠকদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য সম্পাদক উহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। নিছক মঞ্চ ও পর্দা সংক্রান্ত পত্রিকা হইলেও উহার সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেরই রচনায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। তাহা ছাড়া, চলচ্চিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতা-প্রসূত অনেক প্রবন্ধ আছে যাহা পাঠে ঐ শিল্পের বহু অজানা বিষয় পাঠকদের জানিবার সুযোগ হইবে। ২২১।৪৭

কিশোর-কিশোরী—কার্যালয় ২৭-১, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪। এই সংখ্যার মূল্য আট আনা।

কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী নানা গদ্য পদ্য রচনায় সমৃদ্ধ। ২২০।৪৭

রঙ্গনাদ—সম্পাদক শ্রীহিরণ্ময় দাশগুপ্ত। মূল্য এক টাকা। রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র সম্পর্কিত নানাবিধ প্রবন্ধ ও চিত্রে সুশোভিত। ২২২।৪৭

জাতীয় সরকার ও চলচ্চিত্র

গত সংখ্যায় ডকুমেন্টারী ও সংবাদচিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে চলচ্চিত্র জনসমাজকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তোলার কাজে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে। এই কথাটা আমাদের জাতীয় সরকার ইতিমধ্যেই বুঝতে শুরু করেছেন এবং তাই তাঁরা পুনরায় সংবাদচিত্র নির্মাণের কাজটা হাতে তুলে নিয়েছেন। এটা সুখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু একমাত্র সংবাদ-চিত্র হাতে তুলে নিলেই সরকারী কর্তব্য ফুরিয়ে যাবে না কিংবা এ প্রচেষ্টা শুধু ভারত গভর্ন-মেণ্টের হাতেই ছেড়ে দিয়ে প্রাদেশিক গভর্ন-মেণ্টগুলির চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়। বৃহত্তর জাতীয়তার ক্ষেত্রে আমরা ভারতবাসীরা এক ও অবিভাজ্য, সত্য—কিন্তু এই মূলগত ঐক্যের মধ্যে আবার যথেষ্ট বৈচিত্র্যেরও সন্ধান মেলে। বিভিন্ন প্রদেশে আছে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি। সেই সব কিছুকে একত্রিত করে গড়ে উঠেছে আমাদের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাসৌধ। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিই শুধু ভিন্ন নয়—তাদের মূল সমস্যাগুলিও ভিন্ন। তাই বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে শিক্ষা-মূলক চিত্র নির্মাণে অগ্রণী হতে হবে। জাতীয় সরকার আজ শুধু কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত নয়—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই অধিষ্ঠিত আছে জাতীয় সরকার। সুতরাং প্রতি প্রদেশ যদি নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী চিত্র নির্মাণে হাত দেয়, তবে ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে নীতিগত কোন বিরোধ হবার সম্ভাবনা নেই আদৌ।

আমরা জেনে সুখী হলাম যে, ইতিমধ্যেই ভারতের একাধিক প্রদেশ এই কাজে ব্রতী হয়েছে। ইতিপূর্বেই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে বাংলা গভর্নমেণ্ট তাঁদের শ্রমিকনীতি ও পাটচাষীদের জীবনযাত্রা নিয়ে দুখানি চিত্র নির্মাণে হাত দিয়েছেন। যুক্তপ্রদেশ গভর্নমেণ্টের অর্থ ও সংবাদ সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ দত্ত পালিওয়াল এলাহাবাদের কংগ্রেসকর্মীদের একটি সভায় ঘোষণা করেছেন যে, যুক্তপ্রদেশ গভর্নমেণ্ট সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির প্রচার বন্ধ করার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও মৈত্রী গড়ে তোলার জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছেন। এই উদ্দেশ্যে তারা চিত্র নির্মাণ কার্যেও হাত দিয়েছেন। জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্যে গভর্নমেণ্ট কি কি করছেন তা দেখানোর জন্য এবং অন্যান্য বহুবিষয়ক শিক্ষামূলক চিত্র নির্মাণেও যুক্তপ্রদেশ গভর্নমেণ্ট হাত দিয়েছেন —একথা আমাদের জানিয়েছেন শ্রীযুক্ত পালি-ওয়াল। এই ধরনের সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা সত্যই আশার কারণ খুঁজে পাচ্ছি। ভারতের সমাজ জীবনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ যেরূপ ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছে তাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তিত হয়ে ওঠবার কারণ আছে। প্রচারমূলক চলচ্চিত্র এই বিদ্বেষ-বিষ দূরীকরণে যে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে সে বিশ্বাসও আমার আছে। এদিক থেকে আমাদের চিত্রশিল্পের যতটুকু করণীয় ছিল, তার একাংশও আমরা তার কাছ থেকে পাইনি। সস্তা স্বদেশপ্রেমের প্যাঁচ দিয়ে আমাদের চিত্র-

নবাগতা অলকা দেবী : দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় "বিচারক"এ দেখা যাবে।

শিল্পের মালিকদের প্রচুর পয়সা লুটবার চেষ্টা করতে দেখা যায়, কিন্তু এসব গঠনমূলক দিকে তাঁদের নজর পড়ে না।

আমাদের জাতীয় সরকার চলচ্চিত্রের উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করুন এটা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। সেরূপ হলে ব্যক্তিগত উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তির পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। তবে জাতীয় চিত্রশিল্পের যে সব দিকে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অভাব অনটন আছে সে সব সম্বন্ধে আমাদের চিত্রাধিপতিরা এখনও সজাগ না হলে —সরাসরি প্রভুত্বের প্রয়োজন আছে বৈকি। এ ত আর বৈদেশিক সরকার নয় যে, চিত্রশিল্পের টুঁটি টিপে ধরাই হবে তার লক্ষ্য! এ হল জাতীয় গভর্নমেণ্ট—গভর্নমেণ্ট যা করবেন তা আমাদের বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণের জন্যেই করবেন। স্বাধীন দেশের চিত্রনির্মাতারূপে তাঁদের নবলব্ধ দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের চিত্র মালিকগণ যদি এখনও সজাগ না হন, তবে আঘাত দিয়ে তাঁদের ঘুম ভাঙাতে হবে।

নূতন নাটক

মিনার্ভায় শ্রীমতী—এই নাটকখানি প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের বহু-বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রিয় বান্ধবী'র নাট্যরূপ। 'প্রিয় বান্ধবী' ইতিপূর্বে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে—এবার হল নাট্যরূপায়িত। উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া কঠিন ব্যাপার—বিশেষ করে 'প্রিয় বান্ধবী'র মত উপন্যাসের যার নায়ক নায়িকার জীবন অনেকটা ছন্নছাড়া—বোহেমিয়ান ধরণের। তাদের জীবনে বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে, নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতও আছে। কিন্তু একটা মঞ্চোপযোগী নাটকের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে এবং নির্বাচিত দৃশ্য সংস্থানের মধ্যে সে সব ফুটিয়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। রঙ্গমঞ্চের চেয়ে চলচ্চিত্রে এ কাজ সহজতর। এই বাধার কথা স্বীকার করে নিয়ে যদি নাট্যরূপের বিচার করি তবে মুক্তকণ্ঠে বলতে হয় যে নাট্যরূপ দাতা শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত নৈপুণ্যের সঙ্গেই এ কাজ সমাপ্ত করেছেন। ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্রের একাধিক গল্প উপন্যাসকে নাট্যরূপায়িত করে তিনি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, 'শ্রীমতী'র মধ্যেও আমরা সেই কৃতিত্বের পরিচয় পেলাম। 'শ্রীমতী' দেবনারায়ণবাবুর খ্যাতিকে বাড়াবে বই কমাবে না। আড়াই ঘণ্টার উপযোগী নাটকে পরিণত করতে গিয়ে 'প্রিয় বান্ধবী'র অনেক কিছুই দেবনারায়ণবাবুকে বর্জন করতে হয়েছে। তার জন্যে মূল সুর ব্যাহত হয় নি কোথাও। তবে একটা কথা নাটক দেখতে দেখতে বার বার আমার মনে হয়েছে। নাটকে নায়িকা শ্রীমতীর চরিত্রটি যত প্রাধান্য পেয়েছে, সে তুলনায় নায়ক জহর প্রাধান্য পেয়েছে অত্যন্ত কম। বোহেমিয়ান জহরের চরিত্রে যে একটা আদর্শবাদ ছিল (তা সে আদর্শবাদ ভুয়ো সমাজবিরোধীই হোক আর অবাস্তবই হোক) সে কথাটা নাটকের শেষ দৃশ্যে পৌঁছনোর আগে বোঝাই যায় না। কিন্তু শ্রীমতীর গতি ও প্রকৃতি প্রথম থেকেই স্পষ্ট ও নির্ভীক। বোধ হয় এই জন্যেই মঞ্চে শ্রীমতীর পাশে অভিনয়ে জহরকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়। অবশ্য এ জন্যে জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় নৈপুণ্যের অভাবও কিঞ্চিৎ দায়ী। নায়িকা শ্রীমতীর ভূমিকায় সরযূবালা অনবদ্য অভিনয় করেছেন। তাঁর বচনভঙ্গী, তাঁর চলাফেরা ও

র মুখের ভাবব্যঞ্জনা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি শ্রীমতী চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে দিতে পেরেছেন। সরযূবালার পাশে নায়ক জহররূপে জহর গাংগুলী দুর্বল অভিনয় করেছেন। দুই চারটি নাটকীয় মুহূর্তে ছাড়া তাঁর অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়নি। অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে ভাল অভিনয় করেছেন দুলাল-রূপে শ্যামলাহা, বাড়িওয়ালারূপে আশু বসু এবং রমারূপে ফিরোজাবালা। সংগীতাংশ দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেনি। দৃশ্যসজ্জা প্রশংসনীয়। 'শ্রীমতী' নাট্যরসিক জনসমাজকে আনন্দ দিতে পারবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

নূতন প্রভাত

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর এই নাটকটি সম্প্রতি জনরক্ষা সঙ্ঘের প্রযোজনায় কালিকা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে গেছে। নাট্য-পরিচালনা করেছিলেন খ্যাতিমান চিত্র পরিচালক বিমল রায়। এ'দের প্রোগ্রামে লেখা ছিল যে, এ'রাই 'নূতন প্রভাতে'র প্রথম অভিনয় করছেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে কথাটা ঠিক নয়। 'নূতন প্রভাত' প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলেন ডি ডি প্রোডাকসন্স সঞ্জীব দাসের পরিচালনায় প্রায় তিন মাস আগে এবং যথাসময়ে তার সমালোচনা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অভিনয় ও প্রযোজনা কৌশলের দিক থেকেও জনরক্ষা সংঘ ডি ডি প্রডাকসন্সের তুলনায় উন্নতি দেখাতে পেরেছেন —এমন কথা বলতে পারি না। মায়ের ভূমিকায় চিত্রাভিনেত্রী মলিনার অভিনয় সুন্দর হয়েছিল। ডি ডি প্রোডাকসন্সের সৌজন্যে প্রাপ্ত বীরবল কান্তরামের ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন। রহিমের ভূমিকায় সুশীল দাশগুপ্তের অভিনয়ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অন্যান্য ভূমিকার অভিনয় হয়েছিল চলনসই।

ষ্টুডিও সংবাদ

বিগত মহালয়ার দিন ন্যাশন্যাল সাউন্ড ষ্টুডিওতে সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলীর প্রথম বাণী চিত্র 'শুধু ছবি'র মহরৎ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এই চিত্রের কাহিনীকার বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং পরিচালকও তিনিই। অভিনয়াংশে আছেন ছবি বিশ্বাস, সন্তোষ সিংহ, সরযূবালা, রেণুকা রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, অচিন্ত্যকুমার প্রভৃতি।

* * * *

লক্ষ্মী পূজোর দিন কৃষ্ণা পিকচার্সের প্রথম চিত্র 'কুহকিনী'র শুভ মহরৎ রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন খগেন রায়। চিত্রকাহিনীও তিনিই রচনা করেছেন।

* * * *

'অভিযাত্রী'র প্রযোজক বসুধারা বাণী চিত্রের দ্বিতীয় ছবির কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে বলে প্রকাশ। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন সুপরিচিত ক্যামেরাম্যান শ্রীবিভূতিপতি ঘোষ। শোনা গেল যে চিত্রাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা জে কে ব্যানার্জি এই চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

* * * *

মণীন্দ্রলাল বসুর বিখ্যাত উপন্যাস 'রমলা'কে চিত্রে রূপান্তরিত করার প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজন সমাপ্ত হয়েছে বলে প্রকাশ। চিত্রখানির প্রযোজক বেঙ্গল মুভিটোন এবং পরিচালক বি মৈত্র। শীঘ্র চিত্র গ্রহণ কার্য আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

* * * *

উদয়ন প্রোডাকসন্স 'কৈশোরিকা' নামক একটি ছোটদের শিক্ষামূলক ছবি তোলার কাজে হাত দিয়েছেন। মিঃ উদয়নের পরিচালনায় ন্যাশনাল সাউন্ড ষ্টুডিওতে চিত্র গ্রহণ কার্য বেশ কিছুদূর এগিয়েছে বলে জানা গেল।

দেশী সংবাদ

২৭শে অক্টোবর—নয়াদিল্লীতে গণ-পরিষদ ভবনে আঞ্চলিক এশিয়া শ্রমিক সম্মেলনের দুই সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তিন শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ভারত গভর্নমেণ্টের শ্রমসচিব শ্রীযুত জগজীবনরাম সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

কাশ্মীরের নেতা শেখ আবদুল্লা এক বিবৃতিতে বলেন যে, কাশ্মীরের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। কাশ্মীরের জনসাধারণকে পাকিস্থানে যোগদানার্থ চাপ দিবার জন্যই কাশ্মীর আক্রমণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক কাশ্মীরীর প্রথম কর্তব্য হইতেছে, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা।

ঢাকার এক হিন্দু জনসভার সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমবেতভাবে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয়। তিনি বলেন, এরূপ ব্যবস্থা অসম্ভব। যদি প্রতিদিন পাঁচ হাজার লোককেও পশ্চিম বঙ্গে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হয়, ১ কোটি ২০ লক্ষ লোককে অপসারণ করিতে ১০ বৎসর সময় লাগিবে।

২৮শে অক্টোবর—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অসুস্থ হইয়া পড়ায় মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলীর সহিত আলোচনার জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও পণ্ডিত নেহরুর লাহোর যাত্রা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

২৯শে অক্টোবর—শ্রীনগর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, দশ হাজার জাতীয় সম্মেলন স্বেচ্ছাসেবকের সহযোগিতায় ভারতীয় ডোমিনিয়নের সৈন্যেরা অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিয়াছে। আজ আরও বহু সৈন্য শ্রীনগরে প্রেরিত হইয়াছে। বরমুলায় আক্রমণকারীদের অগ্রগতি প্রতিহত করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে কাশ্মীরের সর্বশেষ পরিস্থিতির বিষয় আলোচিত হয়। শেখ আবদুল্লা, প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত মহাজন এই বৈঠকে যোগদান করেন।

জুনাগড় হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, রাজকোট এজেন্সীর ডেপুটি পুলিশ ইন্সপেক্টর মানভাদারের রাজপ্রাসাদ ও তত্রত্য কতিপয় ব্যক্তির বাড়িতে খানাতল্লাসী করিয়া প্রাপ্ত আটটি লরী ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী রাজকোট লইয়া গিয়াছেন। ভারত গভর্নমেণ্ট রাজকোট এজেন্সীর ডেপুটি পুলিশ ইন্সপেক্টরকে মানভাদার দখল করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজকোট হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, বরোদা রাজ্যের ৩০০ সৈন্য ধারী হইতে জুনাগড়ের অন্তর্গত বাবরীবাদের নিকটবর্তী দেদান যাত্রা করিয়াছে।

হায়দরাবাদের সংবাদে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী ছত্রীর নবাব, স্যার ওয়াল্টার মংকটন, স্যার সুলেতান আমেদ ও নবাব আলী নওয়াজ জংকে লইয়া গঠিত হায়দরাবাদ আলোচনা কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। নবাব মইন নওয়াজ জং, মিঃ আবদুর রহিম ও মিঃ পিঙ্গল বেংকটরাম রেড্ডীকে লইয়া একটি নূতন কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

ভারত গভর্নমেণ্ট আঞ্চলিক এশিয়া সম্মেলনে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সামাজিক নিরাপত্তা যাহাতে কল্যাণকর হয়, এজন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, জীবিকানির্বাহ-যোগ্য বেতন এবং উপযুক্ত বাসভবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৩০শে অক্টোবর—কাশ্মীর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গতকল্য হইতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর টেমপেস্ট ও স্পিটফায়ার বিমানবহর আক্রমণ শুরু করে এবং বরমুলা-শ্রীনগর সড়কের পাটান গ্রামে শত্রুবাহিনী ও মোটর সমাবেশের উপর বোমা বর্ষণ করে। দুই তিন স্থানে যুদ্ধ চলে এবং আক্রমণকারীদের সমূহ ক্ষতি হয়। ভারতীয় সৈন্যদলের হতাহতের সংখ্যা সামান্য। ১৫ জন সৈন্য নিহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ভারত হইতে কাশ্মীরে অবিরত সৈন্য ও সমর সম্ভার প্রেরিত হইতেছে। কাশ্মীর বাহিনীর সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিংএর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

অদ্য পুনায় বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, মহীশূর ও হায়দরাবাদ কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে হায়দরাবাদে অবিলম্বে দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান হয়।

৩১শে অক্টোবর—অদ্য শেখ আবদুল্লা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। গতকল্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানসমূহ শ্রীনগর-বরমুলা সড়কে প্রতিপক্ষের মোটর সমাবেশের উপর সাফল্যের সহিত দ্বিতীয়বার আক্রমণ চালায়। ভারতীয় সৈন্যেরা পাটান পাহাড়ে সুরক্ষিত পরিখা খনন করিয়া অবস্থান করিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের মদ্য বর্জন নীতি অনুসারে অতঃপর প্রতি শনিবার মদ্য বর্জন দিবস ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতার গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের রোটারী হলে জিওলজিক্যাল, মাইনিং এণ্ড মেটালার্জিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার (ভূতাত্ত্বিক, খনিজ ও ধাতুজ গবেষণা সমিতির) ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারত ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টের পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ সচিব শ্রীযুত এন ভি গ্যাডগিল প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

১লা নবেম্বর—অদ্য বেলা ১০ ঘটিকায় লাহোরে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের এক অধিবেশন হয়। পরিষদের অধিবেশনে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। বেলা আড়াইটার সময় লাহোর গভর্নমেণ্ট হাউসে মিঃ জিন্না ও লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মধ্যে কাশ্মীর পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। তিন ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা চলে।

ভারতীয় ডোমিনিয়নের সৈন্যদল বাবরীবাদ ও মংগ্রোলে প্রবেশ করিয়াছে; ভারত সরকার উক্ত দুইটি অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কাশ্মীর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, শ্রীনগরের পশ্চিমে আক্রমণকারীরা একটি স্থানে হানা দেয়; কিন্তু তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। প্রতিপক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। ভারতীয় ডোমিনিয়নের একজন সৈন্য আহত হয়।

যুক্ত প্রদেশের নবনিযুক্ত গভর্নর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিমানযোগে আমেরিকা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

২রা নবেম্বর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য এক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীরে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ভারত গভর্নমেণ্ট রাষ্ট্র সঙ্ঘের ন্যায় কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, আক্রমণকারী দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, তাহারা সমর-বিদ্যায় সুশিক্ষিত; তাহাদের নেতৃবৃন্দও দক্ষ। তাহারা সকলেই পাকিস্থান অঞ্চল হইতে এবং পাকিস্থান অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে।

নয়াদিল্লীতে প্রার্থনান্তিক ভাষণে মহাত্মা গান্ধী কাশ্মীরে গোলযোগের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের দুইজন প্রাক্তন অফিসার কাশ্মীর আক্রমণকারী দলের নেতৃত্ব করিতেছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

পূর্ব বঙ্গের স্বাস্থ্যসচিব মিঃ হবিবুল্লা বাহার এক বিবৃতিতে বলেন যে, গত ২৩শে অক্টোবর চট্টগ্রামের ঘূর্ণিবায়ুর ফলে অনুমান ৫ শত লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৩০শে অক্টোবর—কমন্স সভায় কমনওয়েলথ বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ ফিলিপ নোয়েল বেকার কাশ্মীরে সংঘর্ষ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন যে, কোন পক্ষেই যুদ্ধ ব্যাপারে বৃটিশ অফিসার নিযুক্ত করা হইবে না।

৩১শে অক্টোবর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যালেস্টাইনকে ইহুদী ও আরব দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। ১৯৪৮ সনের ১লা জুলাই হইতে এই দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। অদ্য নিউইয়র্কে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বিভাগ সাব-কমিটির অধিবেশনের পর মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ জনসন এক সাংবাদিক বৈঠকে ইহা প্রকাশ করেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন কি না জানা যায় নাই। প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে ছয় মাসের মধ্যে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

১লা নবেম্বর—চীনা সরকারী খবরে জানা যায় যে, অদ্য মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী চোংচুনের উত্তর পূর্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত প্রধান বিমানঘাঁটির উপর কম্যুনিস্ট বাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় আক্রমণ চালায়।

২রা নবেম্বর—আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ আবদুর রহমান আজম ঘোষণা করেন যে, প্যালেস্টাইন সীমান্তে বর্তমানে লেবানন, সিরিয়া ও মিশরীয় সেনা সমাবেশ চলিতেছে।

ইংলণ্ড ও ওয়েলসের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল নির্বাচনের ফলাফল দৃষ্টে মনে হয় যে, জনমত সুনিশ্চিতভাবেই রক্ষণশীলদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ৩৮৮টি শহরের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল নির্বাচনে রক্ষণশীল দল ৬৩১টি আসন লাভ করিয়াছে এবং শ্রমিক দল ৬৮৩টি আসন হারাইয়াছে। বৃটিশ রক্ষণশীল দল অদ্য শ্রমিক গভর্নমেণ্টের পদত্যাগের দাবী জানাইয়াছে।

শোক-সংবাদ

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, মূর্তিতত্ত্ব ও মু[illegible] তত্ত্বে সুপণ্ডিত এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যা[illegible] ভোকেট শ্রী[illegible]জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ ([illegible] পি-আর-এস, মহাশয় গত ১১ই কার্তিক মধ্য[illegible] মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করি[illegible] ছেন। তিনি মজঃফরপুরের উকিল শ্রীশি[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর জ্যে[illegible] পুত্র ছিলেন।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্ত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | **সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ**

পঞ্চদশ বর্ষ] শনিবার, ২৮শে কার্তিক, ১৩৫৪ সাল। Saturday, 15th November, 1947. [২য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কাশ্মীরের শিক্ষা

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হস্তক্ষেপের ফলে এবং প্রধানতঃ কাশ্মীরের জনগণের স্বদেশ প্রেম প্রণোদিত বীরত্বের জন্য কাশ্মীর নরঘাতক এবং লুণ্ঠন-কারী আততায়ীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কাশ্মীরে হানা দিয়া ইহাদের এই দারুণ দৌরাত্ম্য চালাইবার মূলে কাহারা ছিল, কাহারও এখন আর তাহা বুঝিতে বাকী নাই। বস্তুতঃ পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের যদি পৃষ্ঠ-পোষকতা না থাকিত তবে ভারতের ভূস্বর্গে শোণিতসিক্ত এই বিভীষিকা সৃষ্টি করা সম্ভব হইত না। সীমান্তের পাহাড়িয়া দস্যু ব্যবসায়ীর দল দুর্গম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া এই সংগ্রাম চালাইতে সমর্থ হইত না। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী কাশ্মীরের উপর এই আক্রমণকে নিপীড়িত জনগণের মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তিই তাঁহার এই বোকা বুঝি ভুলিবে না। কাশ্মীর সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সেখানকার প্রজারা বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়াছিল, ইহা আমরা জানি; কিন্তু আজ সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহিরাগত আততায়ীদিগকে উৎখাত করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। সুতরাং কাশ্মীরবাসীদের স্বার্থ বা স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করাই আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পাকিস্থান হইতে তাহারা যে সাহায্য পাইয়াছে, এবিষয়েও সন্দেহ নাই। আক্রমণকারীরা আধুনিক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা মেশিনগান, ব্রেন গান, এমন কি বিমান ধ্বংসী কামান পর্যন্ত প্রয়োগ করিয়াছে। সেনাবাহী মোটর লরীতে তাহারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে হানা দিয়া সেগুলি দখল করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। লুণ্ঠনকারী পাহাড়িয়াদের নিজেদের মাথায় এতো বুদ্ধি খেলে না এবং বুদ্ধি থাকিলেও এইসব সামরিক উপকরণ সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। বলা বাহুল্য কাশ্মীরে এইভাবে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া মুসলিম লীগের 'লড়কে লেঙ্গে' নীতির অনুরাগীরা দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রথম অভিপ্রায় ছিল সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার প্রভাবে কাশ্মীরের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া সেখানে নিজেদের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করা এবং কাশ্মীরের এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারতের সর্বত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক মনোভাব জাগাইয়া তোলাই তাহার অপর অভিপ্রায় ছিল। বস্তুতঃ পাকি-স্থানের নামে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক প্রচার-কার্য জিয়াইয়া রাখা লীগ-নীতির ধারক এবং বাহকদের প্রচ্ছন্ন ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ প্রচারকার্য চালাইতে হইলে তাহার একটা উপলক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম পাঞ্জাবে, জুনাগড়ে তাঁহারা অনর্থ সৃষ্টি করিয়া সে কাজ হাসিল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পরে কাশ্মীরে সেই নীতি ব্যাপকভাবে অবলম্বন করা হয়। কাশ্মীর ঠাণ্ডা হইলে সেই কুটিল নীতির গতি কোন দিকে আবর্তিত হইবে, তখন ত্রিপুরা না হায়দরাবাদ কোন পুরোভাগে ঝটিকা উঠিবে এখনও বলা যাইতেছে না। তবে মিঃ জিন্নার অনুগামী দল যে সহজে নিবৃত্ত হইবেন ইহা মনে হয় না; কারণ, বিভেদ ও বিদ্বেষমূলক মতবাদকে মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতায় জাগ্রত রাখিবার উপরই তাহাদের ভবিষ্যৎ যে নির্ভর করিতেছে এবং প্রগতিমূলক মনোবৃত্তির সম্প্রসারিত দৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার সুখের স্বপ্ন যে সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিবে ইহা তাঁহারা ভাল করিয়াই বুঝেন সুতরাং বিদ্বেষ জাগাইয়া রাখা চাই-ই। হিন্দু মুসলমান রাজনীতিক অধিকারের সূত্রে ধর্মগত কুসংস্কার ভুলিয়া—স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার পথে এক হইতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা ঘটিতে দিবেন না। ইহাই তাঁহাদের সঙ্কল্প। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানেরা তাঁহাদের এই কুট-নীতির মহিমা বুঝিয়া লইয়াছেন। পূর্ব এবং পশ্চিম—উভয় বঙ্গের মুসলমান সমাজ সে নীতির মূলীভূত দুর্গতি ও অনাচারের সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত হইয়াছেন। চারিদিকের অর্থনীতির দারুণ দুর্দশার মধ্যে তাঁহারা শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতিবেশ বজায় রাখিয়া সংগঠনের পথে রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনে সমধিক প্রয়াসী। লীগের বিদ্বেষমূলক প্রচারকার্যের ফলে বাঙলার মাটি আর ভ্রাতৃরক্তে সিক্ত হইবে না। লুণ্ঠনকারী এবং নারীহরণ-কারীদের দৌরাত্ম্য বাঙলার সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ সমাজে আর এক-দিনের জন্যও প্রশ্রয় পাইবে না আমরা ইহাই আশা করি।

হায়দরাবাদ

পণ্ডিত নেহরু সেদিন আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বিপদ যে কাটে নাই, ইহা আমরাও বুঝিতেছি। সাম্রাজ্যবাদীর দল এখনও ওত পাতিয়া রহিয়াছে এবং তাহারা ভারতের বুকে পুনরায় উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। বলা বাহুল্য, ভারতের অন্তর্দ্রোহই তাহাদিগকে এই সুযোগ প্রদান করিতে পারে এবং এক্ষেত্রে মিঃ জিন্না ও তাঁহার অনুরাগীরাই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য সকল রকমে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন এবং সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের দুরভিসন্ধির সহায়ক শক্তির কূট-নীতিক খেলার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কাশ্মীরের ব্যাপার এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যথেষ্টরূপে সচেতন করিয়া দিয়াছে; কিন্তু কাশ্মীর ব্যতীত অপর একটি স্থানেও বিপদের আশংকা ঘনীভূত হইতেছে। আমরা হায়দরাবাদের কথা বলিতেছি। ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া সম্প্রতি এ সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, নিজাম সরকার একদিকে যেমন ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সূত্র দীর্ঘায়িত করিয়া কালহরণ করিতেছেন, অপর-দিকে তেমনই তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপর চরম আঘাত হানিবার সুযোগের প্রতীক্ষায় আভ্যন্তরীণ উদ্যোগ-আয়োজন দ্রুততা ও নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। বস্তুত হায়দরাবাদে শস্ত্র-সজ্জা অনেক দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে এবং নিজাম সরকারের অবলম্বিত নীতির ফলে মাদ্রাজ উপকূলবর্তী বেজোয়াড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার মধ্যেই যথেষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। হায়দরাবাদ রাজ্যের অবস্থানই এরূপ যে, এখান হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি সমরোদ্যম প্রযুক্ত হয়, তবে সমগ্র ভারতে একটা দারুণ বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে; তখন যুগপৎ মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশের উপর তাহাতে আঘাত আপতিত হইবে। আমরা আশা করি, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হায়দরাবাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে প্রযুক্ত হইবে এবং নিজাম সরকার যাহাতে কোনরূপ দুরভিসন্ধি কার্যে পরিণত করিতে না পারেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তৎসম্বন্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন করিবেন। কাশ্মীরের ব্যাপারে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে দৌরাত্ম্য এবং উপদ্রবের সমর্থনে প্রচারকার্যকে কঠোর হস্তে দমিত করা হয় নাই। আমরা এদিকে কর্তৃ-পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্যের কথা মুখে বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালানো যেমন রাজদ্রোহমূলক অপরাধ, সেইরূপ সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন দেশীয় রাজ্যে ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের ব্যাপারে বিরোধী পক্ষকে সমর্থন করাও সুস্পষ্টভাবেই রাজদ্রোহজনক কাজ। বলা বাহুল্য, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকিয়া যাঁহারা এইভাবে বিরোধী প্রতিপক্ষের নীতি সমর্থন করেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহাদের স্থান হওয়া উচিত নহে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকিতে হইলে সেই রাষ্ট্রের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। তেমন চেষ্টায় যাঁহাদের মন সাড়া না দেয় এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শকে সমর্থন করিতে যাঁহাদের বিবেকে বাঁধে, তাঁহাদের অন্যত্র গমন করাই উচিত। নিজাম সরকার তথাকার জনমতকে দলন করিয়া বর্তমানে পাকিস্থানী ভেদবাদীদের ক্রীড়নকস্বরূপে আগুন লইয়া খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গণ-তান্ত্রিকতা কিংবা মানবতা কোন দিক হইতেই তাঁহাকে সমর্থন করা চলে না। স্বেচ্ছাচারী নিজামের এই দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইবে। আমরা জানি, প্রবল জনমতের কাছে নিজামের দুষ্ট পরামর্শদাতার দলকে পিষ্ট হইতেই হইবে। সমগ্র দেশীয় রাজ্যে আজ জনশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, সামন্ত নৃপতিবর্গের মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারের নীতি তাহাতে ভাসিয়া যাইবে। জুনাগড়কে অবশেষে জাগ্রত জনমতের চাপে পড়িয়া এই সত্যকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। এতদিন পরে জুনাগড়ের নবাব সুবোধের মত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে সম্মত হইয়াছেন। জুনাগড়ে এবং কাশ্মীরে যাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে, হায়দরাবাদেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

এক জাতি, এক দেশ

গত ৯ই নবেম্বর পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিগণ লীগের দুই জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে অবিসংবাদিতভাবে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা মিঃ সুরাবর্দীর আমন্ত্রণ সম্পূর্ণ সন্দেহশূন্যভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং ইহার কারণও রহিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী পাকিস্থান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন, অথচ এখনও তিনি পশ্চিম বঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন নাই। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা মিঃ সুরাবর্দী দুই কূলই বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমানে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কোন রাষ্ট্রের আনুগত্যের দিক হইতে এইরূপ ছেলেখেলা চলে না। মিঃ সুরাবর্দীর এক পথ ধরা উচিত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান সমাজ পাকিস্থানী ভেদবাদের নীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা অভ্রান্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, সে নীতির ফলে তাঁহাদের অনিষ্ট ছাড়া কোন কিছুই সাধিত হয় নাই। মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থকে তুষ্ট পুষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা দুই জাতির নীতির বেদীতে আর বলি পড়িতে যাইবেন না। বস্তুতঃ আমরাও ইহাই বুঝি যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দুদের সঙ্গে তাঁহাদের সুখে দুঃখে এক হইয়াই তাহাদিগকে থাকিতে হইবে। পরের উস্কানীতে নাচিয়া নিজের ঘরে আগুন দিবার দুর্বুদ্ধি বুকে লইয়া যাহারা আছে, তাহাদিগকে কোনক্রমেই আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এরূপ অবস্থায় লীগ যতদিন পর্যন্ত দুই জাতিতত্ত্বের যুক্তি না ছাড়িবে এবং ধর্মগত সংকীর্ণ সংস্কারকেই কার্যতঃ সমর্থনের প্রগতিবিরোধী নীতি বর্জন না করিবে, ততদিন পর্যন্ত লীগের মধ্যে থাকা কেন, লীগকে তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন না। সম্প্রতি কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আহূত একটি জনসভায় শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ সত্যই বলিয়াছেন, বর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশানালিষ্ট মুসলিম বা জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলিয়া কথার কোন অর্থ হয় না। এখন এখানকার মুসলমানেরা সকলেই জাতীয়তাবাদী এবং যে জাতীয়তাবাদী নহে, সে বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকদের স্থান কারাগারই হওয়া উচিত। আমরাও এই কথার সমর্থন করি এবং কথাটা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সমাজ তাঁহাদের বিবেকানুমোদিত সে কর্তব্য প্রতিপালনে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মনোবল সুসংহতভাবে জাগ্রত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সমাজের এই আদর্শ সমগ্র ভারতকে উদ্দীপ্ত করিয়া প্রগতিবিরোধী প্রবৃত্তির উদ্দাম অনাচারের বিভীষিকা হইতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিবে, আমরা এই আশা করি।

মিঃ সুরাবর্দী ও লীগ

মিঃ সুরাবর্দী কর্তৃক আহূত মুসলিম সম্মেলনের অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলনে শহীদ সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের সম্মুখে তিনি সুস্পষ্ট কোন কর্মপন্থা উপস্থিত করেন নাই। তিনি লীগের দুই জাতিতত্ত্বের নিন্দা করেন নাই এবং ভারত বিভাগের মূলে সে তত্ত্ব যে কার্য করিয়াছে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস নহে। তিনি শুধু এই কথাই বলিয়া-ছেন যে, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুই জাতিতত্ত্বের সমাধি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু

লিম লীগ মিঃ সুরাবর্দী সাহেবের এই
ক স্বীকার করিবে কি? আমরা জানি,
গের সর্বাধিনায়ক মিঃ জিন্না হইতে আরম্ভ
য়া লিয়াকত আলী এবং হামিদ চৌধুরী
ন্ত তেমন অভিমত প্রকাশকে রক্তচক্ষুতেই
ভর্নান্দত করিবেন। মুসলিম লীগ দুই
ততত্ত্বের ধারক-বাহক শুধু নয়, প্রকৃত-
ক্ষ উক্ত অনুদার সাম্প্রদায়িক মতবাদ
। এবং তাহার পাকিস্থানী নীতির প্রাণ-
পে। এরূপ অবস্থায় যাহারা দুই জাতি-
ত্বর বিরোধী কিংবা বর্তমানে যাহারা সেই
তির প্রয়োগ-নৈপুণ্যকে দেশ ও জাতির
বা মুসলমান সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর
করেন, তাহাদের পক্ষে সোজাসুজি লীগ
ন করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করা ছাড়া
ন্তর থাকে না। কারণ এক জাতিতত্ত্বের
রই কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতিক আদর্শ
তষ্ঠিত। মিঃ সুরাবর্দী এই মুখ্য প্রশ্নটিকে
শলে এড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে
মানের এই উত্তেজক পরিবেশের মধ্যে
লিম লীগের ভবিষ্যৎ কি হইবে সে সম্বন্ধে
বেচনা জরুরী নয়। আমরা তাঁহার এই
দ্ধান্ত সমর্থন করিতে পারি না। আমরা
কথাই বলিব যে, ঐ প্রশ্নটি ভারতীয়
ক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের কাছে বর্তমানে
পেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। আজ তাহা-
কে সোজা এই কথা বলিয়া দেওয়ার সময়
সিয়াছে যে, লীগ যখন দুই জাতিতত্ত্বের
রিপোষক এবং সে নীতির মন্ত্রগুরু
ঃ জিন্না লীগের সর্বময় কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত,
খন লীগের সংগে তাঁহারা কোন সম্পর্কই
খিতে পারেন না। নিজেদের বিবেক বুদ্ধিকে
ইভাবে নিষ্ঠিত হইয়াই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের
সলমানগণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ
রিতে পারেন। বস্তুতঃ লীগের কার্যে
হানুভূতিমূলক একটা অস্পষ্ট মনোভাব
ইয়া তাঁহাদের পক্ষে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ
ম্ভব হইতে পারে না। পাকিস্থানের
অন্তর্ভুক্ত মুসলমান সমাজকে উদ্দেশ করিয়া
মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন, পাকিস্থানকে আমরা
আমাদের জন্য সংগ্রাম করিতে বলি না।
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী আমরা, আমাদের
নিজেদের মুক্তিপথ আমরা নিজেরাই দেখিয়া
লইব। মিঃ সুরাবর্দীর এই যুক্তিকে সত্য
করিয়া লইতে হইলে দুই জাতিতত্ত্বের যে নীতির
উপর নির্ভর করিয়া পাকিস্থানের কর্ণধারগণ
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদিগের
মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে জিয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা
করিতেছেন, অকুণ্ঠ ভাষায় তাহার মূলে আঘাত
করা দরকার। পাকিস্থান মুসলমানদের নিজ
বাসভূমি, সেখানে মুসলমানরাই সর্বেসর্বা এবং
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে হতভাগা মুসলমানদের
স্থান হইয়াছে তাহাদের বিপদ আপদে আমরা
তাহাদের বল ও ভরসা, পাকিস্থানী নীতিতে
প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাঁহারা এইসব বুলি বৃষ্টি
করিতেছেন, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সত্যকার প্রীতি
স্থাপন করিতে হইলে আগে তাহাদের মুখ বন্ধ
করা প্রয়োজন। এই কাজ করিতে হইলে
কংগ্রেসের আদর্শ স্বীকার করিয়া লইয়া
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদিগকে
জাতীয়তার মর্যাদাবুদ্ধিতে দৃঢ় হইতে হইবে।
মিঃ সুরাবর্দী এই সত্যটি স্বীকার করিয়া
লইলে আমরা সুখী হইব।

কানাইলাল

বিগত ২৪শে কার্তিক আত্মদাতা বীর
কানাইলালের স্মৃতিপূজা সম্পন্ন হইয়াছে।
ইটালীর স্বদেশপ্রেমিক সন্তান ম্যাটসিনীর মতে
স্বদেশসেবার জন্য যাহারা প্রাণদান করেন,
তাঁহাদের মৃত্যু ঘটে না। আত্মদাতা সেই বীর-
বৃন্দের শোণিতবিন্দু হইতে শত শত বীরের
জন্ম হইয়া থাকে। কানাইলালের সম্বন্ধে এই
কথা বলা যাইতে পারে। ব্রিটিশের কারাকক্ষে
অবরুদ্ধ অবস্থায় রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া
বাঙলার এই বীর সন্তান যেদিন সিংহ বীর্যে
বিশ্বাসঘাতকের বুকে অগ্নিবাণ প্রয়োগ
করিয়াছিল, সেদিন বাঙলার সর্বত্র প্রাণপূর্ণ
সংবেগের এক বিপুল শিহরণ খেলিয়া যায়।
কানাইলাল এবং এই বীরব্রতে তাহার সহযোগী
সত্যেনের শোণিত বিন্দু হইতে বাঙলার সুপ্ত
বীর্য জাগিয়া উঠে। স্বদেশের প্রতি বিশ্বাস-
ঘাতককে হত্যা করিয়া মৃত্যুবরণের পথে বাঙলা
দেশে ইঁহারাই প্রথমে পথ প্রদর্শন করেন।
বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই নিহত হইবার
সতেরো বৎসর পরে অনন্ত সিং এবং প্রমোদরঞ্জন
নামক দুইজন যুবক ইঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ
করেন। কানাইলালের আত্মদান বস্তুতঃই
বাঙলার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।
সমগ্র দেশ এই বীর সন্তানের স্মৃতি দীর্ঘ দিন
অন্তরেই পূজা করিয়া আসিয়াছে। আমাদের
স্মরণ আছে, কানাইলালের ফাঁসির কিছুদিন
পরে চন্দননগরে তাঁহার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা
করার প্রস্তাব হয় এবং শোনা গিয়াছিল,
শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা প্যারিস হইতে সেজন্য
আবক্ষ মর্মর মূর্তি পাঠাইবার আয়োজন
করেন। কিন্তু বৈদেশিক শাসনের
শ্বাসরোধকর প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যে তেমন
প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়
নাই। ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।
কানাইলাল, যতীন মুখুজ্যের নাম পর্যন্ত করা
একদিন এদেশে নিষিদ্ধ ছিল, আজ আর সে
দুঃখ আমাদের নাই। আমরা বীরের পূজা
করিবার অধিকার আজ অর্জন করিয়াছি।
আশা করি, আত্মদাতা বাঙলার এই বীর
সন্তানের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার জন্য অবিলম্বে
ব্যবস্থা হইবে। বৃহত্তাদর্শে প্রাণদানের পরম
মহিমায় উজ্জ্বল এবং মৃত্যুর পরপারে অমর
মহিমায় প্রতিষ্ঠিত কানাইলালের স্মৃতির
উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন
করিতেছি।

বাঙলার অস্থায়ী গভর্নর

পশ্চিম বাঙলার গভর্নর শ্রীযুত চক্রবর্তী
রাজাগোপাল আচারী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের
অনুপস্থিতি কালের জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের
গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং
তাঁহার স্থলে স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র অস্থায়ী-
ভাবে পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন।
স্যার ব্রজেন্দ্রলালের এই নিয়োগে আমরা সুখী
হইয়াছি। তিনি আমাদের সকলের সুপরিচিত;
বাঙালী হিসাবে এখানকার সভ্যতা এবং
সংস্কৃতি এবং এদেশের জনগণের অন্তরের
অনুভূতির সংগে স্যার ব্রজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ
সম্পর্ক রহিয়াছে। শাসন কার্যে দক্ষতা সম্বন্ধে
স্যার ব্রজেন্দ্রলাল যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন
করিয়াছেন। ব্রিটিশের প্রভুত্ব ভারত হইতে
অপসারিত হইবার পর সামন্ত রাজাসমূহে
স্বেচ্ছাচারের একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। সেই
প্রতিকূল প্রভাবের মধ্যেও স্যার ব্রজেন্দ্রলালের
নিয়ন্ত্রণে বরোদার রাষ্ট্রনীতি কোনরূপ
বিপর্যস্ত হয় নাই এবং বরোদা ভারতীয়
যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়া দেশীয় রাজ্য
সমূহের কাছে সর্বাগ্রে আদর্শ সংস্থাপন করে।
আমরা আনন্দের সংগে পশ্চিম বঙ্গের নূতন
অস্থায়ী গভর্নরকে আমাদের অভিনন্দন
জ্ঞাপন করিতেছি।

অশান্তির উত্তেজনা

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায়
এতদিন পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ-
ভাবে শান্তি এবং সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু
সম্প্রতি কিছুদিন হইতে টাঙ্গাইলের কোন
মুন্সেফের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনামূলক বক্তৃতার
ফলে মধুপুর, গোপালপুর, ঘাটাইল প্রভৃতি
অঞ্চলে অশান্তির ভাব সৃষ্টি হইয়াছে এবং
শোনা যায়, হিন্দু বয়কটের আন্দোলনও নাকি
আরম্ভ করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাও
প্রকাশ, এই অঞ্চলের নানাস্থানে ইহা
লইয়া সভাসমিতি হইতেছে। আমরা
পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজি-
মুদ্দিনের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি।
অন্য দিকে ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায়
ত্রিপুরা ষ্টেটের জমিদারীতে খাজনা বন্ধের
আন্দোলন আরম্ভ করিবার চেষ্টা হইতেছে।
পূর্ববঙ্গের শান্তি এখনও সুদৃঢ় আকার ধারণ
করে নাই। এই সময় এই ধরণের আন্দোলনে
কয়েকজনের সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব-স্পৃহা পূর্ণ
হইতে পারে; কিন্তু নিরীহ লোকদের সর্বনাশ
ঘটিবে। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের শুভকাঙ্ক্ষী
নেতাদিগকে যথাসময়ে এ সম্বন্ধে সতর্কতা
অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্র·না·বি·র এলবাম

চিত্র-চরিত্র

রাজা রামমোহন

রাজা রামমোহন নব্য ভারতের ব্রাহ্ম মুহূর্তের বিরাট পুরুষ।

ব্রিগস অঙ্কিত রামমোহনের একখানি তৈলচিত্র আছে। এই ছবিখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ছবিটির পটভূমিতে বামাংশ ঘেঁষিয়া একটি মসজিদ, আরও একটু বামে একটি মন্দির, খানিকটা মাত্র দৃশ্য, পটভূমির দক্ষিণাংশ একটি স্তম্ভের ছায়ায় প্রায়ান্ধকার, প্রায়ান্তর্হিত, কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ থাকিয়া যায়, ওইটুকু সরিলেই একটি গির্জা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য পটভূমি একটি আদর্শ ভূমি এবং সাহেবের দৃষ্টির ভারতভূমি। ভারতবর্ষের মন্দির মসজিদ গির্জা। ভারতবর্ষের নারিকেল কুঞ্জ এবং অজ্ঞাত পরিচয় তরুরাজির প্রচুর শ্যামলিমা। কিছুই বাদ পড়ে নাই, কেবল খুব সম্ভব বিনয়বশাৎ গির্জাটিকে সাহেব গোপনে রাখিয়াছেন। বিনয় না কূটনীতি।

ছবিখানির পুরোভাগ অধিকার করিয়া শালপ্রাংশু রামমোহন। রামমোহনের উচ্চতা সবিশেষ জানি না, দীর্ঘাকার ছিলেন বলিয়াই পরিজ্ঞাত। আভূমি-বিলম্বিত জোব্বা পরিধান হেতু তাঁহার স্বাভাবিক দীর্ঘতা দীর্ঘতর বলিয়া প্রতিভাত। ঊর্ধ্বাঙ্গে একখানি মূল্যবান শাল জড়িত। দক্ষিণ হাতে লাল রঙের একখানি গ্রন্থ, পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে, তর্জনীর দ্বারা পৃষ্ঠাঙ্ক এখনো চিহ্নিত। রাজার শিরোদেশের শালের পাগড়ি ও কুঞ্চিত বাবরি স্মরণ করাইয়া দেয় মনের বিচারে তিনি চিরকালীন হইলেও কালের বিচারে সেই সময়কার যখন বাবরি রাখাই সাধারণ নিয়ম ছিল, যদিচ তার উপর শালের পাগড়ি সকলের জুটিত না। পূর্ণায়ত অধরোষ্ঠের উপরে স্বল্প গুম্ফ, তার গম্বুজ সদৃশ ললাটের নীচে ক্ষুদ্রায়ত চোখ দুইটির দৃষ্টি উদার, শান্ত এবং দূরদর্শী। কিন্তু ঈষৎ একটু যেন টেরা। মহত্ত্বের সঙ্গে টেরাচোখের অসামঞ্জস্য নাই।

আমাদের দৃষ্টি যতই বাস্তবপন্থ হোক রামমোহনের বাস্তব মূর্তি আচ্ছন্ন।

একজন বিদেশী যে দৃষ্টিতে রামমোহনকে দেখিয়াছিল, এখানে তার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার বর্ণনায় রামমোহনের বস্তুগত রূপ ধরা পড়ে। লোকটি বলিতেছে রামমোহনের দেহকে স্থূল না বলিয়া বলিষ্ঠ বলা উচিত, না-ফর্সা, না-কালো, তাঁহার মুখমণ্ডলের অনুপাতে চোখ দুইটি ছোট, নাকটা দক্ষিণ দিকে একটু হেলানো; গুম্ফ স্বল্প, চুল দীর্ঘ, ঘন এবং কুঞ্চিত; তাঁহার অবয়বে শক্তি, শান্তি ও সম্ভ্রম বিরাজিত। বিদেশীর এই বর্ণনা আমাদিগকে অনেক পরিমাণে বাস্তব রামমোহনের কাছে লইয়া যায়। নাকের দক্ষিণায়ন গতির উল্লেখ ভাবমূর্তিতে অচল।

আর একটি বালক রামমোহনের বর্ণনা করিয়াছেন, বালক বলিয়াই তাঁহার চোখে বাস্তব মানুষটি ধরা পড়িয়াছে, বালক বলিয়াই মহিমার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনকে তাঁহার দেখিতে হয় নাই। বালকটির বয়স আট নয় বৎসর, নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বালক দেবেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে রাজাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, এত ঘনিষ্ঠ যে অনাবৃত দেহ। খাটো একখানা তেল-ধুতি পরিহিত বলিষ্ঠ বিশাল পুরুষ রামমোহন সারা গায়ে প্রচুর তেল মাখিয়া প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় সবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন এই দৃশ্য দেবেন্দ্রনাথকে ভীত করিয়া তুলিত।

কখনো প্রাতরাশের সময়ে দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে রামমোহন বলিতেন দেখো, বেরাদার, আমি মধু ও রুটি খাইতেছি, আর লোকে বলে আমি গোমাংস খাই।

আবার কখনো কখনো বালক দেবেন্দ্রনাথকে দোলনায় দোলাইতে দোলাইতে অবশেষে বলিতেন বেরাদার এবার আমাকে দোল দাও দেখি!

দুপুরবেলা রাজার বাগানে লিচু-লোভী দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া রাজা বলিতেন, রোদ্রে ঘুরিওনা, কত লিচু খাইবে খাও। রাজার ইঙ্গিতে মালি সরস, নধর, আরক্ত লিচুর গুচ্ছ আনিয়া বালকের হাতে দিত।

এই সব ছবির টুকরায় রাজার যে পরিচয় পাওয়া যায় এমন আর কিসে। মানুষ মাত্রেই অভিনেতা। অভিনেতার আসল পরিচয় নেপথ্যে, মানুষের আসল পরিচয় বালকের চোখে। বালকেরা মানুষ চিনিতে প্রায়ই ভুল করে না, তাহাদের মতো মনস্তত্ত্বের অশিক্ষিত পটুতা আর কাহার?

রামমোহনকে যে আমরা এখনো সম্যক বুঝিতে পারি নাই, তার কারণ তাঁহাকে আমরা শিষ্যের দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, ভক্তের দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, বয়স্কের ও অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বালকের দৃষ্টিতে দেখি নাই। আর একটা কারণ রামমোহন একান্তভাবে ভারতবর্ষীয় হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহার চরিত্রের নজির নাই। এদে তাঁহার চেয়ে মহত্তর, বৃহত্তর পুরুষ জন্মিয় ছেন, কিন্তু ঠিক এই শ্রেণীর পুরুষ আর ... জন্মায় নাই। কোন্ রহস্যবলে ইউরোপী রেণেসাঁস-মন্ত্রকে তিনি যেন আত্মসাৎ করিয় ছিলেন। দাবানলের স্ফুলিঙ্গ কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া আসিয়া পড়ে, রেণেসাঁ দাবানলের স্ফুলিঙ্গ তাঁহার চিত্তে আসি পড়িয়াছিল। তাই রামমোহনের বিচারে পরিপ্রেক্ষিত এদেশের মহাপুরুষগণের চরি নয়, রেণেসাঁস-পরবর্তী ইউরোপীয় মনীষিগণ মানুষ হিসাবে তিনিই প্রথম রেণেসাঁস বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শিল্পীহিসে প্রথম যেমন মাইকেল মধুসূদন। অথ এক সময়ে আমরা মধুসূদনের তুলনা করিতাম ভারতচন্দ্রের সঙ্গে। মাইকেলের পট ভূমি মিলটন। রামমোহনের পটভূমি এদেশী কেহ নয়। যে-বিদেশী মনীষীর সঙ্গে তাঁহার অন্তর্জীবন, জীবনদর্শন ও সাধনগতির সর্বাধি ঐক্য—তাঁহার নাম বেকন। দুজনেই অদম জ্ঞান-গরুড়!

"তরুণ গরুড় সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে...........
অমর বিহঙ্গ শিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়।"

সেই বিশ্বের নাম অখণ্ড-মানব জীবন

বেকনের সমকালীন Marlow Faust-এর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার বর্ণনা করিয়াছেন। কামিনী কাঞ্চনের আসক্তির তীব্রতা একটা উচ্চ স্তরে গিয়া পৌঁছিলে মহত্তর ক্ষুধায় পরিণত যে হইতে পারে, মধ্যযুগের সাধনা এই সত্য বুঝিত না। এই সত্য রেণেসাঁসের আবিষ্কৃতি। যে-অগ্নিতে সীতা দগ্ধ হন নাই, অথচ লঙ্কা ভস্মীভূত হইয়াছিল দুই কি এক নয়? গ্রীক-সংস্কৃতির স্বর্ণকুম্ভের অবারিত গর্ভ হইতে Faust Spirit দশক্রোশী ধাপ ফেলিয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে। মানব জীবনের কোন প্রদেশই তাহার কাছে নগণ্য নয়, অগণ্য নয়। Goethe Faust চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি নিজেই যে Faust! তাই তো সাহিত্য, শিল্প, চিত্র, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি সর্বত্র তাঁহার গতি! বেকনের ছিল 'মানব জীবনের সমগ্রতা তাঁহার জ্ঞানের পরিধি।' রামমোহনেরও যে তাই! সেইজন্যাই দেখি—এদেশের ধর্ম সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সর্ব বিষয়ে তাঁহার সমান আসক্তি। অবশেষে বেদান্ত প্রচারক এই মনীষীকে দিল্লীর বাদশাহের রাজদূত হইয়া ইংলণ্ড যাইতে হইল। একি বিচিত্র নয়? কিন্তু বৈচিত্র্যই যে রেণেসাঁসের

বন-স্পন্দন। রামমোহন বৈদান্তিক না হইয়াও ন্ত প্রচারক, আর ধর্মগুরু হইয়াও র্জনে উদাসীন নহেন। অর্থ ও পরম-কে একত্র সমন্বয়ের চেষ্টা, স্বর্গ ও মর্ত্য, লোক ও পরলোককে সমমূল্যে স্বীকার বার চেষ্টারই রূপান্তর। এই মৌলিক টুকু না বুঝিলে অনেক রেণেসাঁস চরিত্র বাধ্য ঠেকিবে, মহত্ত্বের ও নীচত্বের এমনি মিশ্রণ! দাভিঞ্চি, বেনভেনুতো সেলিনি, ন।

রামমোহন অর্থোপার্জনে অবহেলা করেন ; কারণ সংসার তাঁহার কাছে অবহেলার য় ছিল না। রেণেসাঁসের এই লক্ষণটি লীর সংস্কৃতিকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কেল চল্লিশ হাজার টাকার স্বপ্ন দেখিতেন। লংকার অধীশ্বর রাবণ তাঁহার কল্পনাকে ল করিয়া তুলিত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের অগোচরে এই রেণেসাঁস ধর্মকেই বরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এত মহাপুরুষের মধ্যে যাঁহাকে তিনি আদর্শ মানব বলিয়া গ্রহণ করিলেন তিনি মথুরাপতি কৃষ্ণ, রণনীতিক, রাজনীতিক এবং ধর্মপ্রচারক, ব্রজের গোপালকে বঙ্কিমচন্দ্র বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ আদর্শ মানব হইতে পারেন; কিন্তু সে কেবল রেণেসাঁসবাদীর দৃষ্টিতেই। রবীন্দ্রনাথও এই ধারার অন্তর্গত। তাঁহার ভগবান রাজা। ভগবানের রাজরূপই তাঁহার প্রিয়বস্তু।

রামমোহনের দৃষ্টিতেও ভগবান রাজা। দরবারী পোষাকে সজ্জিত হইয়া তিনি উপাসনা-গৃহে যাইতেন। বলিতেন, যিনি রাজার রাজা, সকলের প্রভু তাঁহার দরবারে কি দীনের মতো যাওয়া চলে।

রামমোহনকে বুঝিতে হইলে রেণেসাঁসের ইন্দ্রধনুর তোরণের তল দিয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে। তার ফলে তাঁহাকে যদি সম্পূর্ণ আমাদের দেশের বলিয়া মনে না হয়, তবু সম্পূর্ণ আমাদের সকলের বলিয়া নিশ্চয় মনে হইবে।

অর্থোপার্জনকে যাঁহারা হীন মনে করেন, বাঈজীর গানের আসরকে আধ্যাত্মিক সীমান্তের বহির্ভূত মনে করেন, কূটনীতির সূত্র ধারণকে দুর্নীতি বলিয়া মনে করেন, সেই সব দুর্বল যকৃৎ ব্যক্তিদের জন্য রামমোহন চরিত্র সৃষ্ট হয় নাই। রামমোহন চরিত্রে উচ্চাবচতা ছিল, উচ্চাবচ না হইলে কি পর্বত-মালা হয়? নীতিবাগীশ ও ধর্মধ্বজিগণ রামমোহন চরিত্রের খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করুক। দোষগুণে ভুলভ্রান্তি লইয়া মানবজীবন যাহাদের প্রিয় রামমোহন তাহাদের বান্ধব। তিনি 'আধুনিক মানুষ।'

পুরুষোত্তম দাস টণ্ডন

টণ্ডনজী যুক্তপ্রদেশের পরিষদের স্পীকার থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি দু'বার প্রদেশ পরিষদের স্পীকার পদে মনোনীত ছিলেন।

টণ্ডন সাহেবের বাড়ি প্রয়াগে, তিনি বান ব্রাহ্মণ। ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি ন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, তারপর ওকালতি

পুরুষোত্তম দাস টণ্ডন
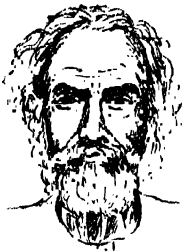
ড় দেন ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ২৩ সালে যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের প্রাদেশিক পতি ছিলেন। আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ ণ করার জন্য তাঁর দেড় বৎসর কারাদণ্ড ছিল। কিছুকাল তিনি লাহোরে পাঞ্জাব নাল ব্যাঙ্কের সম্পাদক ও সাধারণ অধ্যক্ষ লেন। ১৯২৯ সালে তিনি লালা লজপৎ রায় ষ্ঠিত সার্ভেন্ট অফ পিপলস্ সোসাইটিতে পতিরূপে যোগদান করেন। তিনি কিছুকাল হাবাদ মিউনিসিপ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। এলাহাবাদের একটি পার্ক তাঁর নাম বহন করছে। মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য তিনি ১৯৩০-এর পর চারবার কারাবরণ করেছেন। হিন্দী সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত। হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের তিনি একজন বড় পাণ্ডা।

মাদাম পেত্যাঁ

৫১ সংখ্যায় আমরা মার্শাল পেত্যাঁর সংবাদে জানিয়েছি যে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধা পত্নী মাদাম অয়জিনি পেত্যাঁও নির্বাসন দণ্ড স্বেচ্ছায়

মাদাম পেত্যাঁ যে সরাইখানায় থাকেন সেই সরাইওয়ালার পত্নী ও কন্যা এবং তিনি স্বয়ং

মার্শাল পেত্যাঁ ও তাঁর পত্নী

মেনে নিয়ে সেই দ্বীপেরই সরাইখানায় বাস করছেন। বর্তমান সংখ্যায় তাঁর ছবি দেওয়া হল। প্রতিদিন তিনি আবহাওয়া উপেক্ষা করে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যান। ফেরবার সময় স্বামীর পরিত্যক্ত পোষাক নিয়ে আসেন, সেগুলি মেরামত করে কেচে ও ইস্ত্রী করে আবার দিয়ে আসেন। মার্শাল পেত্যাঁকে কোনো চিঠিপত্র দেওয়া হয় না। তাঁর নামের চিঠিগুলি যার সংখ্যা বেশ ভারী তা সবই তাঁর পত্নীকেই দেখা-শোনা করতে হয়। মাদাম পেঁত্যার আন্তরিক কামনা এই যে, নির্জনে যতদূর সম্ভব তিনি স্বামীর নিকটেই থাকেন।

আব্দুল কোইয়ুম খাঁ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পাকিস্থান ডমিনিয়ন-ভুক্ত হওয়ার পর থেকে সেখানকার প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন আব্দুল কোইয়ুম খাঁ। কাশ্মীর অভিযানে তিনি নাকি অন্তরীক্ষে থেকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন। আসলে তিনি একজন কাশ্মীর মুসলমান কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে বসবাস করছেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি পেশোয়ার আদালতে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। প্রাদেশিক শাসন কর্তৃত্বভার মঞ্জুর হওয়ার পর তিনি প্রাদেশিক পরিষদে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হ'য়ে তিনি কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদে আসন লাভ করতে সমর্থ হন। কেন্দ্রীয় পরিষদে তিনি উপ-জাতীয়দের প্রতি ইংরাজ সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করে নাম করেন। গত যুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় পরিষদে তিনি কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার ছিলেন। ১৯৪৫ সাকে সীমলা সম্মেলনের পর তিনি কংগ্রেস দল ত্যাগ ক'রে মুসলিম লীগে যোগদান করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মন্ত্রীরূপে পণ্ডিত নেহরু যখন সীমান্তে গিয়েছিলেন তখন তাঁ বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন হয়েছিল তাতে কোইয়ুম খাঁ বড় রকমের অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। খান সাহেবের মন্ত্রিত্বের তিনি কঠি সমালোচক ছিলেন। ফ্রণ্টিয়ার পাবলিক সেফ অর্ডিনান্স অমান্য করার জন্য মর্দানে গত মা মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

বিনাদোষে কারাদণ্ড

মার্কিন মুল্লুকের কোনো একটি সরাইখা আক্রমণ এবং একজন পাহারাওয়ালাকে হত্যা অপরাধে জো ম্যাজ্‌জেকের ৯৯ বৎসর কা দণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু তার মায়ের বিশ্ব ছিল তার পুত্র মোটেই অপরাধী নয়। তি অফিস বাড়ির মেঝে মোছার কায আর করলেন। ডাক্তারে বলেছিল যে তার হৃদ দুর্বল এবং যে কোনো মুহূর্তে তা বন্ধ হ যেতে পারে; কিন্তু তা উপেক্ষা করেন। ঐ ব করে তিনি পাঁচ হাজার ডলার জমিয়ে ফে এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন যে, পাহারাওয়ালার হত্যাকারীকে যে ধরতে পা তাকে তিনি পাঁচ হাজার ডলার দেবেন। খব কাগজের একজন সাংবাদিকের সেই বিজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয় এবং তারই চেষ্টার প্রমাণিত হয় যে, জো ম্যাজজেক নির্দোষ। ত তার এগারো বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করা গেছে। যাইহোক তাকে মুক্তি দেওয়া হয় চব্বিশ হাজার ডলারের একখানি চেক দে হয়। তার মা যে ব্যাঙ্ক বাড়ির মেঝে মুছেছি এমন একটি ব্যাঙ্কে জো টাকা জমা রেখেছে

শিবশঙ্কর

শ্রীতারাপদ রাহা

শিবশঙ্করকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। তার কাহিনী শুনলে আপনাদের অনেকেও হয়ত কিছুদিন পারবেন না।

শিবশঙ্কর—এ নামটা শুনেই আপনাদের অনেকে হয়ত এ-ও মনে করতে পারেন, বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সঙ্গে এ নামের বুঝি কিছু সম্বন্ধ আছে।

তা আছে এবং আছে বলেই আপনাদের কাছে তার কাহিনী আমি আজ শুনাতে যাচ্ছি।

আট নয় বৎসর আগেকার কথা—অর্থাৎ সন তারিখ সঠিক মনে না পড়লেও এটুকু বেশ মনে আছে যুদ্ধ তখন সুরু হয়ে গেছে, কিন্তু বেঙ্গলে তখনও বোমা পড়েনি।

বর্ষাকাল—বোধ হয় আষাঢ় মাসই হবে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, আর আমি তখন দক্ষিণ কলিকাতার একটা বই এর দোকানে দাঁড়িয়ে এ-ও-বই দেখছিলাম। দোকানের মালিক আমার বিশেষ পরিচিত,—অনেকটা বন্ধু শ্রেণীর বললেই চলে,—তা ছাড়া গল্প উপন্যাস লিখি বলে বেশ একটু খাতিরও করেন। তাই সময় পেলেই বিকেলের দিকে এখানে এসে দেখি নতুন বই কি এল,—পেলে মনের সাধে পাতা উল্টাই।

এমনি করে কি একখানা নবাগত ইংরেজি নভেলের পাতা উল্টাচ্ছিলাম—এমন সময় দোকানের মালিক ধীরেনবাবুর ছোট ভাই হীরেন হঠাৎ বাইরে থেকে এসে বললে, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা—মানে পরিচয় করতে চান।

গম্ভীর ভাবে মাথা দুলিয়ে বললাম,—বেশ ভাল কথা। বলে রাখা দরকার নতুন কোন ভদ্রলোক তখন আমার সঙ্গে পরিচয় করতে এলে আমার বেশ রোমাঞ্চ জাগত,—কারণ তখন এ কথা বুঝতে সুরু করেছি আমার সঙ্গে নতুন পরিচয় করতে আসা মানেই আমার লেখার কিছু তারিফ করা,—আর লেখকের জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না।

হীরেন আমার সম্মতি পাওয়া মাত্র আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই বেরিয়ে গেল।—বই-এর পাতার উপর চোখ রেখে আমি তখন ভাবছিলাম কেমন লোক হবে এ ভদ্রলোক কে জানে।

হীরেনের সে ভদ্রলোক পাশেই কোন দোকানে হয়ত দাঁড়িয়েছিলেন—কারণ হীরেন ঘর থেকে বেরুবার প্রায় মিনিট খানেকের মধ্যেই তাকে এনে হাজির করলে। আমি তখনও গম্ভীর ভাবে বই-এর পাতা উল্টাচ্ছি।

আড়চোখে ভদ্রলোককে দেখে নেবার একটু ইচ্ছা হচ্ছিল,—কিন্তু সেটা শোভন নয় বলে অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত করলাম,—কিন্তু অপেক্ষা করতে আর আমার হ'ল না,—হীরেন আমাকে লক্ষ্য করে ভদ্রলোককে বললে, —ইনি হচ্ছেন—

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বলে উঠলেন—জানি, প্রসিদ্ধ কথা শিল্পী সুনীল রাহা। নমস্কার!

আশ্চর্য হয়ে ফিরে দাঁড়ালাম: এ ত বয়স্ক লোকের কণ্ঠ নয়। আশ্চর্য এত হয়েছিলাম যে, প্রতিঅভিবাদন জানাতে নমস্কার করতে হয়ত আমার একটু দেরীই হয়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাইশ তেইশ বছরের একটি ছেলে হাতজোড় করে আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ মৃদু হাসি হাসছে: আমি আপনার একজন অনুরাগী ভক্ত,—অনেক লেখা পড়েছি আপনার, বড় ভাল লাগে আমার, লেখা পড়েই দেখতে ইচ্ছা হ'ত—লোকের কাছে খবর নিয়ে দেখেছি অনেক আগেই, তারপর আলাপ—মানে পরিচিত হতে একটু ইচ্ছা হ'ল—তাই—

মনে মনে বললাম,—কথা ত বেশ শিখেছ, ভাই,—এই বয়সে এ রকম কথা ত বড় কেউ বলে না, মুখে বললাম,—বুঝলাম,—কিন্তু বড় বেশি বাড়িয়ে বলছেন যে আমায়'

শুনবার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা যেন তার একটু আঁধার হয়ে এল: না, না,—একটুও মিছে বলিনি—সত্যিই আপনার লেখা আমার ভীষণ ভাল লাগে।

বললাম,—কিন্তু প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী-টিল্পী, —ও সব কি,—প্রসিদ্ধি আমি এখনও কিছুই লাভ করতে পারিনি,—একটু আধটু লিখতে চেষ্টা করি—এই মাত্র।

ছেলেটির মুখখানা আবার খুশিতে ভরে উঠল: না, না,—চারিদিকে আপনার নাম কেমন ছড়াচ্ছে তা জানেন না আপনি,...আমাকে আর 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না,—'তুমি' বলেই কথা বলবেন আমার সঙ্গে।

বয়স তখন আমার তিরিশ ছাড়িয়ে আরও দু'এক বছর এগিয়ে গেছে,—সুতরাং বাইশ তেইশ বছরের ছেলের সঙ্গে অনায়াসে 'তুমি' বলে কথা বলাও চলে,—কিন্তু অত শীগ্‌গীর কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা তেমন ভাল বোধ করি না,—তাই একটু গম্ভীর হয়ে বললাম,—এই রকম কথা বলাই আমার অভ্যাস,—সাধারণত প্রথম আলাপের সঙ্গে যদি আমি দেখি মেয়েরা ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে—আর ছেলেরা হাফ-প্যাণ্ট ছেড়ে ধুতি ধরেছে তা হ'লেই আমি 'আপনি' চালাই।

আমার কথাটা শুনে দেখলাম ছেলেটা একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল।

প্রথম দিনেই আর বেশি এগুতে দেওয়া ঠিক হবে না মনে করে বইয়ের দোকান থেকে সরে পড়বার উদ্দেশ্যে ধীরেনবাবুকে বললাম, কটা বাজে?

ধীরেনবাবু ঘড়ি দেখে বললেন,—ছ'টা দশ।

আসি, সাড়ে ছ'টায় আবার এক জায়গায় 'এনগেজমেণ্ট' আছে,—নবাগত ছেলেটির দিকে চেয়ে বললাম—আচ্ছা চলি, নমস্কার।

নমস্কার!

—বলতে গিয়ে ছেলেটির মুখখানা যেন একটু আঁধার হয়ে এল: এত শীঘ্র আমাকে ছেড়ে দিতে হবে,—হয়ত সে এটা আশা করেনি।

কাজের চাপে কয়েকদিন আর ধীরেনবাবুর দোকানে আসা হয়নি,—চার পাঁচ দিন পরে আবার যেদিন এলাম, ধীরেনবাবু বললেন,—সেদিনকার সেই ভদ্রলোক এর মাঝে দু'দিন এসে আপনার খোঁজ করে গেছে।

ভদ্রলোক?—বলুন সেই ছেলেটি!

হ্যাঁ, সেই ছেলেটি, ছেলেটির গুণ আছে মশায়, শুনলাম তার অনেক কথা: এতদিন উদয়শঙ্করের সাথে দেশ-বিদেশে বেড়িয়েছে, নেচে বেড়িয়েছে তাঁর সঙ্গে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম,—বটে!......আগে চিনতেন না বুঝি আপনি,—আপনার ভাইয়ের সঙ্গে ত দেখি ওর বেশ ভাব!

হ্যাঁ, ভাইয়ের সঙ্গে ভাব কিছুটা হয়েছে বটে,—কিন্তু সে-ও বেশি দিনের কথা নয়,—অল্প কয়েক দিন হ'ল ও'র সঙ্গে ভাব হয়েছে,—আর রকম দেখে মনে হয় আপনার সঙ্গে পরিচয় করবে বলেই ওকে বাগিয়েছে।

মনে মনে ভাবলাম,—হতে পারে,—

হীরেনের বয়স ত পনের ষোলর বেশি নয়,—ওকে যে-কোন কাজে লাগানো এমন আর কি আশ্চর্য। উদয়শঙ্করের সঙ্গে নেচে বেড়িয়েছে শুনে ছেলেটির সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে নিজেই কৌতূহলী বোধ করতে লাগলাম;—বললাম,—ছেলেটির সম্বন্ধে আর কিছু জানলেন? —হীরেন জানে?

না,—হীরেনের সঙ্গেও ত বেশি দিনের পরিচয় নয়,—তবে খবর নিয়েছি ছেলেটি এখন আছে রেল লাইনের ও-পারে এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

এর পরেই আমার মনে হ'ল ধীরেনবাবুর কাছে ছেলেটির সম্বন্ধে একটু বেশি কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছি। প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বললাম,—যা'ক,—তারপর নতুন বইটই কিছু আপনার এল?—বলে ধীরেনবাবুর জবাবের অপেক্ষা না করে—নিজেই বই-এর তাকের দিকে এগিয়ে গেলাম,—ধীরেনবাবুও—কিছু কিছু এসেছে,—এগিয়ে দেখুন—ব'লে হিসাবের খাতার দিকে নজর দিলেন।

বইয়ের তাকে বই নাড়তে নাড়তে ভাবছিলাম, ছেলেটি আজ একবার এলে মন্দ হয় না,—ওর সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যায়ঃ উদয়শঙ্করের দলে নাচত,—সাধারণের দলে ত তবে ওকে ফেলা যায় না,—সেদিন আর একটু আলাপ করাই দেখছি ভাল ছিল।

হঠাৎ কেন ফাঁকে আমার মুখ থেকে ধীরেনবাবুর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল,— ছেলেটির নাম কি—জানেন?

খাতার উপর থেকে মুখ না তুলেই ধীরেনবাবু উত্তর দিলেন,—না, নামটা আর জানা হয়নি, জিজ্ঞাসা করতে ভুল হয়ে গেছে।

নিজের কৌতূহলের জন্য আবার লজ্জাবোধ ফিরে এল আমার,—সুতরাং সেদিন এ প্রসঙ্গ আর উঠল না।

সেদিন রাত্রে শুয়ে মনের রাশ যখন আলগা করে দিয়েছিলাম, তখন আর দশটা ব্যাপারের সঙ্গে ছেলেটির চেহারাও আমার চোখের সামনে একবার ভেসে উঠল : ব্যাকব্রাশ করা চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল,—ছেলেটি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল দোকানে। গায়ের পাতলা জামাটাও আধভেজা হয়ে গিয়েছিল, তার মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটি নেটের গেঞ্জি। মেদবর্জিত ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রঙ ফরসা,—দাঁতগুলি সামান্য একটু উঁচু। সব কিছু মিলিয়ে চেহারাটা শিল্পীর মতই বটে ঃ হবেই ত, উদয়শঙ্করের সঙ্গে অমনি নেচে বেড়ালে চেহারা ভাল না হয়ে যায়! আরও দশ কথা ভাবতে ভাবতে কোন ফাঁকে শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কাজের চাপে বইয়ের দোকানে আর কয়েকদিন যাওয়া হয়নি। ছেলেটির সঙ্গে আর দেখা না হওয়ায় তেমন করে আর তার কথা মনে পড়েনি। এমনি করে আর কয়েক দিন দেখা না হলে হয়ত তার কথা একরকম ভুলেই যেতাম।

কিন্তু তা আর হ'ল কই!

ছেলেটির সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন সাতেক পরে কলেজে থার্ড ইয়ারের একটা ক্লাস নিয়ে সবে প্রফেসার্স রুমে এসেছি এমন সময় বেয়ারা একখানা স্লিপ নিয়ে এল—

শ্রীযুক্ত সুনীল রায়ের দর্শনপ্রার্থী

শিবশঙ্কর (শিল্পী)

চিরকুটখানা পেয়ে একটু অবাক হয়ে গেলাম ঃ কই, কোন শিল্পীর সঙ্গে হালে ত আমার কোন কাজ কারবার নেই, কারো কাছে কোন ছবি করতেও ত দিইনি, তাছাড়া আমার কোন গল্পের বইও সম্প্রতি সচিত্র করে প্রকাশ করবার আয়োজন চলছে না, তবে কে এ! যাই হ'ক শিল্পী যখন দর্শনপ্রার্থী, তখন দেখা তাকে আমার দিতেই হবে, বেয়ারাকে বললাম, নিয়ে এস বাবুকে, বলেই আমাদের বিশ্রামাগার থেকে নিজেও বেরিয়ে এলাম ঃ কি জানি কে, কি প্রয়োজনে এসেছে, কথাবার্তা অপরের অসাক্ষাতে হওয়াই ভাল।

মিনিট খানেকের মাঝেই দর্শনপ্রার্থী শিল্পীকে নিয়ে বেয়ারা ফিরে এল।

কিন্তু এ কি, এ যে সেই ছেলেটি! ছেলেটি উদয়শঙ্করের দলে ছিল, 'শিবশঙ্কর' নামের তাৎপর্য এবার বোধগম্য হ'ল।

ঈষৎ অপরাধীর মত সলজ্জ হাসি হেসে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে ছেলেটি বললে, বিঘ্ন করলাম বোধ হয়!

না, আমার লিজার আছে এখন, কি খবর বলুন!

আপ্যায়নের হাসি হাসতে গিয়ে ছেলেটির ঈষৎ উঁচু দাঁতগুলি প্রায় বেরিয়ে পড়ল। লক্ষ্য করলাম দাঁতগুলি বেশ সাদা, দেখে মনে হয় বেশ দস্তুর মত মাজাঘষা হয় ওদের। ছেলেটি বললে, বইয়ের দোকানে যান না আপনি কয়েকদিন, বাড়ির ঠিকানা জানিনা আমি, ধীরেনবাবুও বলতে পারলেন না, তাই কলেজের ঠিকানায় এসেছি।

শিবশঙ্করের কথা বলার ভঙ্গী এবং মুখের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল আমার পিছু পিছু ছুটে বিঘ্ন করার জন্যে একটা অপরাধ-বোধ সে কিছুতেই এড়াতে পারছে না, তাই তাকে একটু স্বস্তি ও সাহস দিবার জন্যে মৃদু হেসে বললাম, আমার সৌভাগ্য! সেদিন ধীরেনবাবুর কাছে আপনার কথা কিছু কিছু শুনলাম, আপনি নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের দলে ছিলেন?

শিবশঙ্করের ঈষদুন্নত দাঁতগুলি আবার প্রকাশিত হয়ে পড়ল ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ক' বছর?

তা বছর দুয়েক হবে।

ছেড়ে এলেন কেন?

সে সব অনেক কথা, ধীরে সুস্থে বলব একদিন।

বুঝলাম শিবশঙ্কর আমার সঙ্গে শুধু আজ কথা বলতে আসেনি, একটা স্থায়ী ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র সে স্থাপন করতে চায়, একথা তারই পূর্বাভাস, বললাম,—বেশ, তাই হবে, আজ কি খবর?

সলজ্জকাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সে বললে,—আপনার বাড়ির ঠিকানাটা?

ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললাম—নং সাদার্ন্ড পার্ক।

লেকের একেবারে কাছে?

হ্যাঁ, কাছেই।

সাহিত্যিকের একেবারে উপযুক্ত স্থান, বলে শিবশঙ্কর নিজেই একটু হেসে নিলে।

আমি আর কোন জবাব দিলাম না।

আমায় চুপ থাকতে দেখে—দেখি ও আবার তার স্বচ্ছন্দ ভাব হারিয়ে ফেলছে, এরপর একটু চুপ করে মুখে ঈষৎ অপরাধীর ভাব ফুটিয়ে শিবশঙ্কর বললে, মাঝে মাঝে যদি আপনার ওখানে যাই আমি, বিরক্ত হবেন আপনি?

গম্ভীর হয়ে বললাম,—আসবেন।

কখন একটু অবসর থাকে আপনার?

বিকেলে সন্ধ্যার কাছাকাছি আসবেন, রবিবার হ'লে সকালের দিকে।

আমার এ কথাটা শুনে দেখি শিবশঙ্করের মুখ খুশিতে ভরে উঠল।

এরপর কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বিশেষ বিবেচকের মত সে বিদায় নিল, যাবার সময় সে নমস্কার করে বলে গেল, বিশ্রামের ব্যাঘাত করে গেলাম আমি, সেজন্য ক্ষমা—

না, না,—কিছু হয়নি, এখানে এসে পড়াতে না হলেই আমাদের বিশ্রাম।

তাহলে আসছে রবিবার সকালে আসছি আমি আপনার ওখানে।

আসবেন।

নমস্কার।

নমস্কার।

ছেলেটি চলে যাবার পর মনে হচ্ছিল, ছেলেটির কথাবার্তা বলার ভঙ্গী একেবারে নিখুঁত। হবেই ত—কত বড় শিল্পীর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে এতদিন!

রবিবার সকালে বসে আমার এক উপন্যাসের প্রুফ দেখছিলাম, এমন সময় শিবশঙ্কর এসে মধুর হেসে নমস্কার করে দাঁড়াল। ও যে আসবে সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, মনে থাকলে হাতের কাজ হয়ত সেরে রাখতাম। যাই হ'ক আমার তখন মাত্র একটা গ্যালি মাত্র বাকী আছে। বললাম, আপনি একটু বসুন,

। আমার হয়ে এল, সেরে একেবারে ন্ত হয়ে কথা বলা যাবে, পাবলিশারের সকালে এসেই নিয়ে যাবে কিনা!

হাঁ, হ্যাঁ, সেরে নিন সেরে নিন।

সামনে শ্রীনিকেতনের মোড়াটা দেখিয়ে ম, বসুন, আর টেবিলের উপরকার কাগজ য়ে বললাম, ততক্ষণ চোখ বুলোন—

শিবশঙ্কর মৃদু হাসি দিয়ে আমার কথার দিলে, কিন্তু আসন গ্রহণ সে আর করলে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আমার ঘরটা। নজর দিল শ্রীনিকেতনের মোড়ার কার সেই ছবিটায়, তারপর ঘরে ঘুরে তে লাগল দেয়ালের ছবি, আলমারীর বই, র ম্যাগাজিন তারপর খুঁটিনাটি—সব, টেবিলের উপরকার, লেখার প্যাড, কলম-, পিনকুশান আর জেমক্লিপের ছোট সোটা পর্যন্ত।

মিনিট দশেক পরে আমার প্রুফ দেখা শেষ, কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে শিবশঙ্করের শ্যে বললাম, তারপর, কি খবর বলুন!

শিবশঙ্কর মোড়াটায় বসে মৃদু হেসে লে, দেখছিলাম আপনার ঘর, সুন্দর, মানে র সাজানো, দেয়ালের ছবিগুলিও একেবারে চেস্ট', এই 'হোপ' আর 'মোনালিসা'র ছবি ম কলকাতায় কত দোকানে চেষ্টা করলাম, তে পারলাম না, আপনি কোত্থেকে লেন, বিলেত?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, না, এইখানেই ওয়া যায়, কিন্তু তা আর বলতে সুযোগ লাম না, শিবশঙ্করই কেমন এক অদ্ভুত বদারের সুরে বলে বসল, এটা কিন্তু পনার অন্যায়, হাঁ, দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ রৎচন্দ্রের ছবি রেখেছেন অথচ তাঁদের পাশে জের একটা ছবি নেই!

কথাটা শুনবামাত্র মনে হ'ল, এ বলে কি, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ছবির পাশে আমার ছবি! ন্তু সত্য কথা বলতে গেলে এ কথা বলতে , কথাটা শুনে খুশিও লাগছিল এ নে ঃ লেখার দিক দিয়ে নামটাম সত্যিই আমার একটু হচ্ছে...... মেয়ে

শিবশঙ্কর আমার ঘরের দেয়ালেলে, যাও. র একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, ওয়ে— নিং' করা ঘর আপনার, অথ মত তখনই স্কো করেননি? শিবশঙ্কর কি

শিবশঙ্করের কথাবার্তা শুনে অথবা আর আমার ক্রমেই শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে ছেলেটির! হবেই ত, কেমনন ঘরের ছবির ঘোরাফিরা করেছে এতদিন। পাশেই—একখানা শ্পীইত শুধু ন'ন, ছবি,—আর দু'খানা ভাল জানেন, মনে পড়লাম্বঝলাম, এ দু'খানি তিনি প্রথম বিলেত যান। ম সুন্দর,—একখানায় সম্বন্ধেও ক্রমেই আমি বিবী কলসী মাথায় জল উঠতে লাগলাম, জিজ্ঞাস্যখানায়—বনপথে তিনটি রিণী।

সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হ'ল কি করে,— প্রথম আলাপ হ'ল কি করে?

শিবশঙ্কর শুনে আশ্চর্য হয়ে হেসে বললে, বাঃ উনি যে আমার বাবার বন্ধুর ছেলে, তা ছাড়া আমার বাবার কাছেই যে উনি প্রথম ছবি আঁকতে শেখেন।

ওঃ আপনার বাবাও তাহ'লে আর্টিস্ট বলুন!

মৃদু সলজ্জ হাসি হেসে শিবশঙ্কর বললে, হাঁ, বাবা একদিন বেশ নামকরা আর্টিস্ট ছিলেন, ইন্দোরের কোর্ট-আর্টিস্ট ছিলেন তিনি।

বললাম, এমন বাপের ছেলে আপনি, নিজেও কিছু ছবি আঁকা শিখলেন না কেন তাঁর কাছে, উদয়শঙ্কর শিখে নিতে পারলেন, আর আপনি তাঁর ছেলে হয়ে—

কথাটা আর শেষ করতে দিলে না শিবশঙ্কর, মৃদু রহস্যময় হাসি হেসে বললে, তিা। কিছু শিখেছি বই কি! ন না,

কিছু কিছু শিখেছেন? তাই হয় না—

শিবশঙ্করের উপর শ্রদ্ধা আর বোনেরা বেড়ে যাচ্ছিল। সে আমার কথা হেনে বলাবলি বলে গেল, এইসব করতে গিয়েই ক্ষুন্ন হয়ে তেমন হ'ল না! । আজ দিন

সান্ত্বনা দিয়ে বললামচ্ছ— লেখাপড়া, যা সব শি কদর কি একটু কম! শুধু—বিজয়শঙ্কর,—নৃত্য- আঁকতে শিখেছেশঙ্করের নাম—

ঈষৎ বিষণ্ণ, শুনেছি মনে হচ্ছে,—কিন্তু শিখতে লক্ষে সৌভাগ্য হয়নি আমার।

বাবার শরী—বড় সুন্দর নাচে।

কি পর আর দুই একটা কথা বলে অসুখ ওে মানে গায়ে বল পেলেই শিবশঙ্করকে চোখ তে বলে আমি সেদিনকার মত বিদায় ফেলাম।

দুই তিন দিন পরেই শিবশঙ্কর এলে,— হাতে তার মাসিক পত্রিকা ঃ স্বর্ণবীণা—। মুখখানা বড় হাসি হাসি।

কি ব্যাপার কি,—বড় খুশি দেখায় যে!

শিবশঙ্কর স্বর্ণবীণাটা আমার হাতে দিলে, —খুলে দেখি তাতে ওর এক কবিতা বেরিয়েছে, —দেখে আমারও বড় আনন্দ হ'ল—বললাম,— 'চিরাবিও'—ম্বার ত খুলে গেল,—এবার দু'হাতে চালান,...যাই বলেন নাম করবেন আপনি, মশায়,—শিল্পের আর কোন দিক বাদ রাখলেন না আপনি দেখছি—

মৃদু হেসে সে উত্তর দিলে,—আপনাদের পাশে শুধু একটু বসতে চাই,—শুধু এই,— আর কি?

এবার গল্প উপন্যাসে হাত দিন আর কি,— ও আর বাদ থাকে কেন?

শুনে শিবশঙ্কর কথা না বলে শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

এরপর দিন পনেরর মাঝে কয়েকটা জিনিস আদানপ্রদান হয়েছে আমাদের মধ্যে। শিবশঙ্কর

চামড়ার কাজ? ,—

হাঁ,—ভেড়ির চামড়ার উপরে নানারকম,টার। আঁকার কাজ,—তা ছাড়া নানা রক্ম, কিন্তু বানানো— এখার ফাঁকে

আমি রীতিমত আশ্চর্য হয়ে মনে পড়বে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম ঃ— অসাধারণ! চলে যাচ্ছেন নাকি

শিবশঙ্কর পূর্বে কলে?

প্রথমে এসেই আপনা বলে, না,—তবে চিরদিন ছবি দেখছিলাম — পাব, তা ত না-ও বড় এক ভুল —

কি? এখনই অবশ্য কোথায়ও যাচ্ছে।

বলাম বিদায়ের প্রসঙ্গ তোলাতেই মনটা থাকল্ হয়ে গেল। বললাম,—সে কথা ঠিক,— কিন্তু কথা দিন আপনি, যদি কোথাও যান— তবে আপনার গীটার আপনি নিয়ে যাবেন—

শিবশঙ্কর মাথা নেড়ে বললে, না, না,— এ গীটার আমি আপনাকে 'প্রেজেণ্ট' করছি,— কোন অবস্থাতেই ফিরিয়ে নেওয়া এ চলবে না,—

এমনি করে অনেক কথা কাটাকাটি হ'ল শেষে বাধ্য হয়ে ছবি ও গীটার দুই-ই হাত পেতে নিতে হ'ল আমার।

আমি ওকে কিছু দেব দেব মনে করেও কিছু দেওয়া হচ্ছিল না,—ও নিজেই একদিন আমার লেখা দুখানা বই নিয়ে গেল,—ও দুইখানা নাকি তার পড়া হয়নি,—আর একদিন চেয়ে নিয়ে গেল আমার একখানা ফটো—বলে গেল এ থেকে দুখানা বড় করে আঁকবে ও,— একখানা থাকবে ওর কাছে, একখানা দেবে আমায়। ঐ বয়সের ঐ রকম ছবি একখানাই মাত্র আমার ছিল, বললাম,—সাবধান, হারায় না যেন—

বললে, পাগল,—আপনার থেকে আমার কাছে বেশি সাবধানে থাকবে—

শিবশঙ্করের সাথে জীবনে আমার এই শেষ কথা।

এর পর কয়েকদিন শিবশঙ্কর আর আসছে না দেখে একটু চিন্তিত বোধ করছিলাম, একদিন গিয়ে খোঁজ করে আসাও উচিত বলে মনে হচ্ছিল,—কিন্তু কাজের তাগিদে এক মুহূর্তও সময় পাচ্ছিলাম না—তখন পূজার আগে দিন পনেরর মাঝে এক পাবলিশারের একখানা নভেল দিতে হবে।

সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও শিবশঙ্করের ওখানে যাওয়া আর আমার হয়ে ওঠেনি। নভেল আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল,— উপসংহারের মুখে—তাই খুব জোরে কলম চালাচ্ছিলাম। সকাল বেলার দিকে ঘরের দুই দরজাই বন্ধ করে অবিরত লিখে যাচ্ছিলাম,— এমন সময় ঘরের বাইরের দরজায় করাঘাত হ'ল,—দুম্, দুম্, দুম্,

কে?

আবার করাঘাত হ'ল দুম্, দুম্—

এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম, কে?

গম্ভীর নারীকণ্ঠে উত্তর এল,—দরজা খুলুন।

বিশেষ বিরক্ত হয়ে দরজা খুললাম, ঘরে প্রবেশ করলেন বছর চল্লিশ বয়সের এক মহিলা,—এ'কে আমি আগেও দেখেছি, প্রায়ই সাইকেলে যাতায়াত করেন বালীগঞ্জের পথে। দেখেছি, অথচ পরিচয় নেই নামও জানি না।

মহিলা সাইকেলটি গেটের গায়ে ঠেসান দিয়ে রেখে ঘরে ঢুকেই বললেন,—আপনি সুনীলবাবু?

হাঁ

নমস্কার।

নমস্কার।...

মনের বিরক্তি মনে চেপেই বলতে হ'ল বসুন।

হাঁ, বসব বই কি,—দু মিনিট বসব বলেই এসেছি,—আপনার কাজের বিঘ্ন না করে আমার উপায় ছিল না,—

জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলাম।

মহিলা—উদ্ভ্রান্তের মত বলে উঠলেন,—মুক্তির কোন খবর রাখেন আপনি?

মুক্তি,—কে মুক্তি?

এদানীং আপনার কাছে প্রায়ই আসত, তার অসুখ হলে—তাকে দেখতে গিয়েছিলেন—আপনি অক্ষয়ের বাড়ীতে,—আমি তার মা।

ওঃ—শিবশঙ্করের কথা বলছেন?

শিবশঙ্কর?—কে শিবশঙ্কর?

কেন আপনার ঐ ধর্মছেলে, উদয়শঙ্করের দলে ছিল না, নাম ওর শিবশঙ্কর নয়?

ফুঃ,—শিবশঙ্কর! —উদয়শঙ্করকে কোন-দিন চোখে দেখেছে ও?

তবে?

তবে টবে পরে হবে,—ওর কোন খোঁজ-খবর জানেন আপনি?

না,—ও ত দিন পনের এখানে আসে না। আমিই ওর খোঁজ করতে যাব ভাবছিলাম।

আর খোঁজ করেছেন,—পাখী শিকলি কেটেছে

মানে?

মানে—আজ চার দিন হ'ল সে আমার মেয়ের হারটা নিয়ে—তার জিনিসপত্র নিয়ে সটকেছে,—দুধ দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলাম আমি,......

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম,—ও অপনার মেয়ের হার চুরি করে নিয়ে গেল?

চুরি নয়,—বাটপাড়ি,—হারটা মেরামত করতে দেওয়া হয়েছিল ওর কাছে,—ও বলত,—ওর না কি কোন জানা ভাল স্যাকরা আছে?

মনে মনে ব্যথিত হয়ে বললাম,—আশ্চর্য, আমি ভাবতেই পারছি না,—এমন দরদ দিয়ে কবিতা লিখতে পারে যে—

মহিলাটি চেয়ারে একটু ঠেসান দিয়ে বসেছিলেন,—আমার কথা শুনে একেবারে সিধে হয়ে উঠলেন,—কবিতা,—কবিতা আবার লিখল কবে ও! নির্মলবাবু বলে এক ভদ্রলোক কবিতা লেখেন,—তাঁর কবিতার খাতা চেয়ে নিয়ে এসে নিজের নামে ছাপিয়ে দিয়েছে, স্বর্ণবীণা নামে এক মাসিক পত্রিকায়,—তাই নিয়েই ত গোলমাল শুরু,—

উত্তেজিত নারীকণ্ঠ শুনে সুলতাও এগিয়ে এসেছে ঘরে।

বললাম,—গোলমাল—কি হ'ল তা নিয়ে।

মহিলা বললেন,—তিনি এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে,—শাসিয়ে গেছেন,—তার-পর উকিলের চিঠি দেছেন—পাঁচশো টাকার দাবীতে নইলে মোকদ্দমা করবেন তিনি।...... কোথায় গেল সে বলুন ত! মনে করেছিলাম আপনার এখানে এসে একটা কিছু পাত্তা মিলবে।

ওর বাড়ীর ঠিকানা ত আপনি জানেন,—সেখানে একবার খোঁজ করুন না?

সেখানে কি আর যাবে, আবার কোথায় গিয়ে কার সাথে মা মাসী পাতিয়ে নেবে—ঐ কাজ ওর—

সুলতা অবাক হয়ে শুধু শুনছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিজয়শঙ্করের কথা, —বললাম, বিজয় বলে তার এক বন্ধু আছে,—তার কাছে গিয়ে দেখুন ত?

মহিলাটি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সোজা হয়ে বললেন,—এই দেখুন তার কথা বলতে ভুলেই গেছি,—তার কাছেও গিয়েছিলাম—ঠিকানা জানতাম না,—নির্মলবাবুর কাছে ঠিকানা জেনে তার কাছে গেছি, ক্ষতি করেছে তারই সব চেয়ে বেশি,—কতকগুলি সুন্দর সুন্দর লেদার গুডস্ এনেছিল তার কাছ থেকে,—সেগুলি বিক্রী করে মেরে দিয়েছে,—তা ছাড়া তার সব চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে—তার কাছ থেকে একটা দামী গীটার এনেছিল, সেটাও কোথায় বিক্রী করে গিয়েছে। বিজয়বাবু ত এর পালানোর কথা শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন—চামড়ার জিনিস—তার নিজের হাতের তৈরী,—না হয় কিছু টাকা লোকসান হ'ল—কিন্তু গীটারটা ছিল—তার একেবারে প্রাণের জিনিস—বাজাবে বলে এনে শেষে এই কাজ!

সুলতা আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। আমি মৃদু হেসে মহিলাটিকে বললাম,—দেখুন, মুক্তির মা—

মহিলাটি বিরক্ত হয়ে বললেন,—আর মুক্তির মা নয়,—ডাকতে হলে জেনে রাখুন আমার নাম কমলা দেবী—

মৃদু হেসে বললাম,—বেশ,—শুনুন কমলা দেবী—আপনার বাড়ীতে খেয়ে আপনার যে ক্ষতি সে করে গিয়েছে—তা পূরণের ব্যবস্থা আমার হাতে নেই বটে,—কিন্তু বিজয়বাবুর ক্ষতিপূরণ কিছুটা হয়ত আমি করতে পারব

মানে?

মানে হয়ত বিজয়বাবুরই হাতে তৈরী লেদার গুডসের গোটা দুয়েক জিনিস আমার কাছে আছে,—আনকোরা নতুনই আছে,—ও বলেছিল ওর নিজের হাতের তৈরী।

পাগল! ও কোনদিন লেদার গুডস্ তৈরী করতে পারত না......

আর সব চেয়ে বড় কথা তাঁর গীটারও আছে আমার কাছে—

দেখুন ত, দেখুন ত কি পাজী—কত বিক্রী করেছে সে আপনার কাছে?

বিক্রী করে নি,—এ সবগুলিই আমি বিজয়বাবুকে ফেরত দিতে চাই,—পারেন ত তাঁকে একবার আসতে বলবেন।

কমলা দেবী উত্তেজিত হয়ে বললেন—আজ সন্ধ্যায়ই নিয়ে আসব তাঁকে আপনার কাছে।

হাত জোড় করে বললাম,—আজ সন্ধ্যায় নয়,—কাল সকালে আসবেন,—ঠিক এই সময়।

পরদিন বেলা সাড়ে আটটার কাছাকাছি বিজয়বাবুকে সঙ্গে করে এলেন কমলা দেবী। খবর পেয়ে সুলতাও এসে জুটল বৈঠকখানা ঘরে।

বিজয়বাবুকে দেখলাম সত্যিই শিল্পীর মত চেহারা,—বয়স সাতাশ আটাশ, মুখখানা হাসি হাসি।

বিজয়বাবু আমাকে ও সুলতাকে নমস্কার করে—চেয়ারে বসতেই আমি সেই দুটি লেদার-গুড্স ও তাঁর গীটারটা এনে তাঁর হাতে তুলে দিলাম,—

বিজয়বাবু সশ্রদ্ধ নমস্কারের সঙ্গে সেগুলি গ্রহণ করে বললেন,—বড়ই লজ্জার কথা—এমনি একটা অপ্রীতিকর ঘটনার ভিতর দিয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় হবে,—আপনার লেখার আমি একজন অনুরাগী ভক্ত, আলাপ করবার ইচ্ছা অনেক দিনই ছিল,—কিন্তু কি দুর্দৈব, শেষে—

—না, না, তাতে কি হয়েছে—! এরূপ একটা ঘটনা না হলে হয়ত আপনার সঙ্গে দেখাই হ'ত না!

হেসে উঠলেন বিজয়বাবু ঃ সাহিত্যিক কিনা, কথায় পারবার উপায় নেই......এগুলি দিচ্ছেন ত আমায়,—কত টাকা এর জন্য নিয়েছিল, সে আপনার কাছ থেকে, সেটা—

'নট্ এ ফারদিং'—এগুলি নিজের বলে উপহার দিয়েছিল আমায়,—বলে একটু হাসলাম আমি।

কমলাদেবী বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—হাসছেন আপনি একটুও রাগ হচ্ছে না আপনার,—বুঝছেন না—কি 'রাসকেল' ওটা।

সুলতাও আমার হাসি দেখে বিরক্ত হয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে।

ঠাকুর এসে চা দিয়ে গেল।

বিজয়বাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন,—ওটা আমি ফেরত নিয়ে যাচ্ছি—ওটা আমার ইটালিয়ান সাহেবের কাছ থেকে কেনা,—দিলেই অমনটি আর পাবার উপায় নেই, কিন্তু লেদার গুডস দুটি ফেরত নেব না—ও দুটো আপনাকে প্রেজেণ্ট করে যাচ্ছি।

হাত জোড় করে বললাম,—মাপ করবেন,—কেন, এ আনন্দটুকু আমায় পেতে দেবেন না।

ইচ্ছা হয় অন্য কিছু দেবেন আপনি মাথা পেতে নেব—এ দুটি নয়।

সুলতা কমলাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা মাস্টারবাবু কি ছবি আঁকতে পারতেন,—কিছু না।

তবে—বড় করে ছবি করবেন বলে যে একটা ফটো নিয়ে গেলেন,—ও ছবিটা ত তোমার নেই, তাই না?

চোখ ইশারায় সুলতাকে—এ সব কথা বলতে মানা করলাম।

সুলতা তা লক্ষ্য না করেই কমলাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, ওর বাবা কি ইন্দোরে আর্টিস্ট ছিলেন?

বিরক্ত হয়ে মুখ-চোখ বিকট করে কমলাদেবী উত্তর দিলেন—মিছে কথা বলতে একটুও বাধে না ওর—ওর বাপ হচ্ছেন বাঁকুড়ার একজন ফটোগ্রাফার, চিরকাল সেখানেই কাটিয়ে গেলেন—

আমি বললাম—নাচ-গান বোধ হয় একটু জানে!

নাচ-টাচ কিছু জানে না, গান একটু-আধটু জানে—তারই ত' টিউশন করে দু'-চার টাকা পেত—

কিন্তু আপনার মেয়ে মালাকে নাচ শিখিয়েছে ত' ঐ-ই—

পাগল! মালা নাচ শিখেছে তাদের নাচের স্কুল থেকে—

ঘৃণায় আর রাগে বিকৃত হয়ে উঠেছে কমলাদেবীর মুখ—সুলতারও দেখি তাই—মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে গেল—বাপরে, কি মিথ্যাবাদী! অল্প থেকে রক্ষা পাওয়া গেল—

বিজয়বাবুই শুধু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না—কিন্তু মুখের ভাবে তার বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ক্রোধ-বিরক্তির সঙ্গে একটা ঘৃণার ভাবই জাগছে তাঁর মনে—

সেদিন ওরা বিদায় নেবার বেলায় বিজয়বাবু উত্তেজনাহীন শান্ত মুখেই নমস্কার জানিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কমলাদেবী রীতিমত বিরক্ত হয়ে কণ্ঠে শ্লেষ ছড়িয়েই বলে গেলেন—আশ্চর্য আপনার ধৈর্য, সুনীলবাবু—এমন একটা স্কাউণ্ড্রেলকে আপনি একটু ঘৃণা করেন না—এত সব কাণ্ড করে গেল সে—অথচ একটুও রাগতে দেখলাম না আপনাকে—আচ্ছা, আসি নমস্কার—

ওরা চলে গেলে সুলতা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—বাব্বা, আচ্ছা পাখোয়াজ ছেলের পাল্লায় পড়া গেছল—অল্প থেকে বিদায় হয়েছে তাই রক্ষে—

সুলতা আমার কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে একটু পরেই চলে গেল। আমি বসে বসে কিছুক্ষণ শিবশঙ্করের কথাই ভাবতে লাগলাম—

ওদের কাছে সে স্কাউণ্ড্রেল, রাসকেল, চোর, বাটপাড়, মিথ্যাবাদী ওরা তাকে ঘৃণা করে—কিন্তু আমি—তার কথা ভাবতে গেলেই মনে হয় সে বলছে—না এসে থাকতে পারিনে—সন্ধ্যা হলেই কি যেন নেশার মত টানছে—যেন বলছে—আপনাদের পাশে শুধু বসতে চাই। অপরাধ সে করেছে—কিন্তু কেন? সেকথা ভাবতে গেলে অন্তরটা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আমার। ......সে হয়ত ভাবত, এই রকম একটা 'পোজ' না নিলে আমি তাকে পাত্তাই দেব না—অথচ আমার পাশে এসে বসা তার চাই-ই চাই।

এমনি করে ভাল আমায় কয়জন বেসেছে—মিথ্যা কথা সে বলেছে—অপরের কবিতা চুরি করেছে—কিন্তু কেন?

দীর্ঘ আট-নয় বছর কেটে গেছে—কিন্তু সেই মিথ্যাবাদী বাটপাড় ছেলেটিকে আমি আজও ভুলতে পারি নি।

বড় ছবি করে দেবে বলে আমার যে ফোটো নিয়ে গেল সে—এখন তার অর্থ আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার।

স্বপ্ন

চুন্-চান্ ইয়ে

চুন্-চান্ ইয়ে একজন তরুণ চৈনিক লেখক। **বিগত মহাযুদ্ধে টোকিও থেকে শত্রু-লাঞ্ছিত হ'য়ে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন ও সামরিক শাস্তিতে যোগ** দেন। তারপর তাঁর ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় বহু প্রতি**ষ্ঠানে তিনি অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে কেম্ব্রিজে "কিংস্ কলেজে" গবেষণা করছেন। ছোট গল্পে তাঁর আন্তরিক অনুভূতি আর গল্প লেখার** সুনিপুণ হাত,—প্রশংসনীয়।]

পাহাড়ের ওপর তখন এত গরম যে নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। আর সেই রোদ্দুরে ঘর্মাক্ত কলেবরে, পায়ে ফোস্কা নিয়েও আমি সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি। শেষে একটা ছোট্ট ঢালু জায়গা দিয়ে নামতে নামতে 'টিং টিং লেক'টা দেখতে পেলাম। সূর্য তখন অস্তোন্মুখে, আর বেশ ঠাণ্ডা নির্মল বাতাস আস্তে আস্তে গায়ের ওপর বয়ে যাচ্ছিল। এখানে এখনও যুদ্ধের বিভীষিকা আসেনি, আর মাথার ওপর জাপানী এরোপ্লেনও ঘড় ঘড় আওয়াজ করছে না। যুদ্ধকে পেছনে ফেলে এসেছি। সত্যিই, বেশ একটা শান্তির দীর্ঘ-শ্বাস ফেললাম। লেকের ওপার থেকে একাকী একটি কুকুরের ডাক কানে এল, তারপর লেকের চারদিকে আবার সমস্ত নিঝুমে—চুপচাপ্।

পেছন থেকে জীর্ণ কাপড়ের পুঁটলীটা সামনে রাখলাম; তারপর সেটাকে বালিশের মত মাথায় দিয়ে নরম ঘাসের ওপর সটান শুয়ে পড়লাম। ওপরের নীল আকাশটা লেকের জলের মত শান্ত। সূর্যাস্তের লাল গোধূলি রঙ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে। নীড়ে ফিরে যাচ্ছে এক ঝাঁক রাজহাঁস। তাদের করুণ কাকলি আস্তে আস্তে পূর্বদিকে মিলিয়ে গেল। সূর্য তখন ডুবে গেছে।

চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু ভাল করে কান পেতে শুনলে অনেকদূর থেকে একটি ক্ষীণ মেয়েলি সুরের রেশ ভেসে আসছে, যেন বহুদূরে সৈকত থেকে ঢেউ-ভাঙা শব্দ-শেষের মত। বাতাসে কান পেতে মনে হল, সে সুর যেন আরো সুন্দরভাবে ভেসে আসছে। তারপর আমি বুঝতে পারলাম কি হচ্ছে। মনে পড়ল যখন মধ্যচীনের কোন এক গাঁয়ের রাখাল ছিলাম, তখন মেয়েদের গলায় এই গান শুনে কেন জানি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো আমার মন।

জনমানবশূন্য জায়গায় এই গান শুনে বিস্মিত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কাছাকাছি নিশ্চয়ই মানুষের কোন বসতি আছে। 'সারাদিন আমার কিছু খাওয়া হয়নি—এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল আমি যেন অনেকদিন অনাহারী হয়ে রয়েছি। ঘাসের ওপর শুয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম—বোকার মত বসে থেকে কোন লাভ নেই। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে গানের রেশটা যেদিক থেকে আসছিল, সেইদিকে চলতে লাগলাম।

লেকটার দক্ষিণ দিকে কতগুলো গাছের ফাঁকে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। লাঙল কাস্তে হাতে নিয়ে জনকয়েক চাষা, ছেঁড়া প্যাণ্টপরা কয়েকটা গাঁয়ের ছেলে আর গাঁয়ের বৃদ্ধ স্বজনেরা তামাক টানতে টানতে ফিরে যাচ্ছে। ভীড়টা আস্তে আস্তে জনহীন হয়ে আসছে। কারুর মুখে একটা রক্তশূন্য ভঙ্গী নয় তো কেউ বা আবার আশ্চর্যদৃষ্টিতে গাঁয়ের আখড়ার ওপর নর্তকী মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে আছে; আর মেয়ে দুটি সামনের মাঠের রহস্যময় অন্ধকারের দিকে চেয়ে রয়েছে। গাঁয়ের মেয়েদেরও চোখের পাতা তখনও ভেজা। বুঝলাম এ দুঃখের গানটা তাদের সরল মনকে গভীর-ভাবে নাড়া দিয়েছে। জানতাম এ গান দুঃখের, কারণ এর পেছনের ঘটনাও বেদনাময়। পিঠের ওপর পুঁটলীটা ঝুলিয়ে যখন কোন রকমে আমি সেখানে এসে দাঁড়ালাম, তখন সমস্ত গাঁয়ের লোকেরা বাড়ি ফিরে গেছে। মনে হল—এরা সৌভাগ্যবান ! যুদ্ধ আসেনি এদের কাছে—এখনও। কেন জানিনে কি ভেবে আমি দুঃখিত হলাম।

একজন বৃদ্ধ আর সেই মেয়ে দুটির সামনে আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে মাঠের ঘনায়মান অন্ধকার দেখতে লাগলাম। স্তব্ধতা ভেঙে বৃদ্ধ বললেন, ঘরবাড়িহারা হয়ে তুমিও কি আমাদের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াও নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জাপানীরা যেদিন 'উহ্যাং' দখল করে তার আগের দিনই আমি পালিয়ে আসি।

—যাক বাবা, দুঃখের দিনে তা'লে সহায় পেলাম। চল আজকে রাতটার মত মাথা গোঁজবার একটা জায়গা খুঁজে নেওয়া যাক্।

চলতে লাগলাম। তিনি অগ্রভাগে, আমি মধ্যবর্তী আর মেয়ে দুটি একেবারে পশ্চাতে। আমার ভীষণ সংকোচ হতে লাগল, প্রথমত, মেয়ে দুটি অপরিচিতা, তারপর তারা পেছনে আসতে আসতে হয়তো আমার চলার ভঙ্গীটাকে লক্ষ্য করছে। তিনি বললেন,

—বুঝলে ভায়া, আমি একজন গাইয়ে।

গলায় চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা, দুটো বাজাবার কাঠিশুদ্ধ যে ড্রামটা ঝুলছিল, তার দিকে চেয়ে বললাম,—ও! আচ্ছা আপনি কি বাজনা বাজান ?

অত্যন্ত বিশ্বাসের সুরে বললেন,—কেন এই যে ড্রাম দেখছো, এই ড্রামই তো আমি বাজাই। তারপর খানিকক্ষণ থেকে আমাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললেন,

—এই দলের মূল গায়েন তো আমিই।

সত্যিই একটু হতবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলাম, কিসের দল ?

—কেন, থিয়েটারের দল! ঐ যে তোমার পেছনে যারা আসছে, ওরাই তো আমার দুই মেয়ে। কিন্তু ওরাই আমার দলের আসল শিল্পী। সত্যি বলতে বাবা, ওরা যা চমৎকার নাচে! একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

কথা বলতে বলতে আমরা একটা বহু শতাব্দীর পুরানো মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। মন্দিরটা পাহাড়ের নীচেতে।

—বুঝলে ভায়া, আজ আমাদের এইখানেই থাকা যাবে।

আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলাম। জায়গাটা এত শান্ত আর নির্জন যে, ঘিয়ের প্রদীপটা জ্বালানো সত্ত্বেও একটি ইঁদুর এদিক-ওদিক লাফালাফি করে পালালো না। সেই পুরানো যুগের প্রদীপের আবছা আলোয় কি করবো বুঝতে না পেরে নিঝুমে হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম; শুধু পুঁটলীর লম্বা দড়িটা ধরে কাপড়ের বাণ্ডিলটা দোলাতে লাগলাম।

আবছা আলোয় সামনে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখিয়ে বললেন,—এই ই আমার বড় মেয়ে ভায়োলেট। আর এটি আমার ছোট মেয়ে স্প্রিং। তারপর তিনি সেই স্তূপীকৃত খড়ের গাদার ওপর আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে, একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

—যাক, কোনরকমে ভালোয় ভালোয় দিনটা গেল।

ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় আমি একটু হাসলাম। মেয়ে দুটিও এত সুন্দর একটা বন্ধুত্বের হাসি হাসলো—তা অবর্ণনীয়; সে হাসিতে ছিল হৃদয়ের আন্তরিকতা। তাদের চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সে দৃষ্টিতে নিরুদ্ধ আর আতিথ্যের একটা চাওয়া রয়েছে। ৫

কথাটা হঠাৎ আমার মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধকে বললাম—সুরজামজী, আমায় আপনার দলে নেবেন?

—সে কি, তোমায় যে ছাত্তোর ছাত্তোর মনে হচ্ছে। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, বিদ্বান! সত্যি বলছি বাবা, এ কাজ যে বড় শক্ত।

বেশ জোরেই বললাম,—তাতে কি হয়েছে! আমি এরু erhu (দ্বিতার বাদ্যযন্ত্র) বাজাতে পারি। আর আপনার দলে একটু গান-টানও গাইতে পারবো, অবিশ্যি আপনার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। আমার কথার শেষদিকে যেন আন্তরিকতার সুর কমে এল। যাই হোক, তাঁর প্রশংসায় বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন,

—বেশ বাবা, আমাদের দলে যদি থাকতে চাও, এসো না! বেশ তো আমাদের আপনার মত থাকবে!

তখন ভীষণ আনন্দিত হয়ে উঠলাম, আর সেই অপরিচিতাদের সঙ্গে সঙ্কোচ কেটে গিয়ে খুব নিবিড় হয়ে পড়লাম। রাত্রিতে রান্না করবার জন্যে আগুন, মশলা ইত্যাদি এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করলাম। তাদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, তারা মাঞ্চুরিয়া থেকে আসছে। আসল বাড়ি তাদের মধ্যচীনে। তাই ওদের সেই গান আমার কাছে অত পরিচিত লেগেছিল।

ভায়োলেটের শান্ত মেয়েলি গলার স্বর আমার ভীষণ ভালো লাগলো। কেন জানি ভালবাসলাম—স্প্রিংয়ের কালো চোখ দুটোকে—বড় বড় টানা চোখ দুটো গভীর রাত্রির মত কালো।

রাতের খাওয়া শেষ করে খড়ের গাদার ওপর বৃদ্ধ ভদ্রলোক শুয়েই ঘুমোলেন। কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার জিব আর ঠোঁট নাড়া দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিলাম। কারণ, ইতিপূর্বে ঘুমন্ত কোন লোককে এ রকম করতে দেখিনি। ভায়োলেট তেমনি শান্ত নারীকণ্ঠে বললে,

—ওমনি করে ওর দিকে তাকিও না। চাঁদের দিকে চেয়ে দেখ, আজ বোধ হয় পূর্ণিমা। মাথা তুলে মন্দিরের উঠোনের ওপর মেঘহীন আকাশের স্বচ্ছ চাঁদকে দেখলাম। তখন মধ্য-চীনে জাপানীদের আক্রমণের কথা, প্রায় সমস্তই ভুলে গিয়েছিলাম। বলে উঠলাম—

—কি অপূর্ব! আমি যেন চাঁদের দেবীকেও দেখতে পাচ্ছি—ঐ দারুচিনি গাছের অস্পষ্ট ফাঁক দিয়ে স্বপ্নের মত যেন চেয়ে রয়েছে।

আমার কথা বলাটা এত জোরে হয়ে গিয়েছিল যে, স্প্রিং আমাকে তিরস্কার করে থামিয়ে দিলে।

—ইস, চুপ করো।

তারপর পুরোনো একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে,

—দেখ না, কি হচ্ছে!

গাছটার দিকে তাকালাম। গাছটা এমন কিম্ভূতকিমাকার আর ঝুরি-নামা যে, দেখে মনে হয় একশ' বছরের পুরনো। দেখলাম পাখীর পালকের মত কতগুলো পাতা ঝরে পড়লো। আর উঁচু ডালের ওপর পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে মনে ভাবলাম,—ওঃ! আমার গলার আওয়াজে বেচারী পাখীটার ঘুম ভেঙে গেছে।

স্প্রিং আগের চেয়ে শান্তস্বরে বলতে লাগল,—একটা কথা আমায় মনে করিয়ে দিলে। ………কেউ যদি ঘুমন্ত কোন পাখীর তিনবার ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনতে পায়, তাহলে সে যে স্বপ্নটা দেখবে, সেটা ঠিক সত্যি হবেই হবে।

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

—তা, তুমি ক'বার শুনেছ?

—ঠিক তিনটি বার।

—তাহলে তো তুমি ভালো স্বপ্ন দেখবে।

ঠোঁটটা একটু ফাঁক করে সে আস্তে আস্তে বললে,

—আমার সন্দেহ হয়। নইলে এ বছর ধরে শুধু দুঃস্বপ্নই আমরা দেখছি………।

—কি আশ্চর্য কথা! একটাও ভালো স্বপ্ন দেখোনি? কেন বল তো?

স্প্রিং কোন উত্তর দিতে পারল না। সেই উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো। আর আমি হতভম্ব হয়ে তার গভীর কালো দৃষ্টির মধ্যে ডুবে গেলাম। সেই গম্ভীর স্তব্ধতা ভেঙে ভায়োলেট বেশ সুনিপুণভাবে উত্তর দিল,

—তার কারণই হচ্ছে, আমাদের জীবন এত অশান্ত বলে। সেই বছর চারেক আগে জাপানীরা যখন আমাদের গাঁ পুড়িয়ে দিলে তারপর থেকে তো একদিনেরও শান্তি নেই। যেখানেই যাই, সেখানেই পেছনে পেছনে শত্রু।

স্প্রিং হঠাৎ বলে উঠল,

—এখানে নিশ্চয়ই আমরা শান্তিতে আছি। যে দিন তিনেক হল আমরা তো জাপানীদের কোন খবরই শুনিনি।

মনে হল নতুন কোন চিন্তা এসেছে তার মধ্যে।

আমি একটু মাথা নাড়তে নাড়তে ভাবলাম,

—কি হয় দেখাই যাক না। তাদের কল্পনাতাকে ভাঙতে ইচ্ছে করল না। তাই বললাম,

—তাহলে তুমি ভালো স্বপ্নই দেখবে। কিন্তু কি রকম স্বপ্ন তুমি দেখতে চাইছ? কোন পরশ-পাথরের স্বপ্ন, না সুখের দেশে উড়ে যাবার জন্যে একজোড়া ডানার স্বপ্ন?

স্প্রিং একটা শান্ত নিশ্বাস ফেলে বললে,—নাঃ, ভবঘুরের মেয়েদের ও রকম উচ্চাশা নেই। শুধু শিক্ষিত হতে ইচ্ছে করে, যাতে লিখতে পড়তে দুই পারি। সত্যি, যদি গান পড়তে আর লিখতেও পারতাম। ওঃ! মায়ের গলার গানগুলো এত ভালবাসতাম আমি! নাচতেও মা ভাল পারতো, রোজগার ক'রতও বাবার চেয়ে বেশি।

হঠাৎ সে চুপ করে গেল, যেন স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে দৃষ্টি হারিয়ে গেল। বুঝলাম, ভায়োলেট একটা ব্যথার দীর্ঘশ্বাসটা গোপন করল। তারপর বললে,—লেখাপড়া শিখতে আমারও বড় ইচ্ছে করে।

স্প্রিং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,—তা বৈকি! আহা, ঐ মোড়লের কি নামটা যেন; আখড়ায় তুমি যখন আরেকদিন নাচছিলে তিনি তোমার প্রশংসা করেই বাবাকে বললেন যে, তার বউ মারা গেছে ছেলেপিলে নেই, তোমাকেই মেয়ের মত রাখবে, ইস্কুলে পড়াবে। কিন্তু তুমিই তখন 'দরকার নেই' বলেছিলে। বাবার কষ্টের জীবন তুমিই তো ভাগাভাগি করে চেয়ে নিয়েছিলে।

ভায়োলেট খুব আস্তে আস্তে বললে—মোড়লের আলাদা দুরভিসন্ধি ছিল সে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু চেয়েছিল………

আমাদের এই আলোচনার মধ্যে বজ্রকণ্ঠে একটা চীৎকার এল—বাঁচাও, বাঁচাও! দিয়ে দাও আমার স্ত্রীকে। চীৎকারটা এল খড়ের ওপর শুয়ে থাকা সেই বৃদ্ধের কাছ থেকে। মনে হল নির্জন জায়গায় তাকে সাপটাপ কামড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি আমি একটা লাঠি খুঁজতে গেলাম, কিন্তু ভায়োলেট আমাকে থামিয়ে বললে,

—কিছু করতে হবে না, দুঃস্বপ্ন দেখছেন... জাপানীরা আমাদের গাঁয়ে এসে যখন মাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তারপর থেকেই বাবা অমনি চেঁচান। মাকেও দেখিনি আর। হয়তো মা আর নেই-ও………।

বুঝলাম ঘটনাটা বেদনার। পাছে তারাও ব্যথা পায়, আর আমিও শুনে কষ্ট পাই, সেজন্যে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না।

আস্তে আস্তে বললাম,—এবার একটু শুয়ে নেয়া যাক। আমার মত এই ভবঘুরের জন্যে কাল হয়তো তোমাদের একটু বেশী পরিশ্রম করতে হবে। 'শুতে যাই' না বলে তাদের তরুণ হৃদয়কে আশান্বিত করার জন্যে বললাম,—যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হবে, তখন সকলের জন্য নিশ্চয়ই অবৈতনিক ইস্কুল খোলা হবে। তখন সকলেই গান লিখতে বা পড়তেও পারবে।

তারপর শুতে চলে গেলাম।

পরেরদিন সকালবেলাতেই কাছাকাছি একটা গাঁয়ের মধ্যে গেলাম। আমি বাজাতে লাগলাম erhu আর বৃদ্ধ তাঁর ছোট্ট ড্রামটি বাজাতে লাগলেন। আমার বাজনা আর স্প্রিংয়ের গানের সঙ্গে সঙ্গে জলকন্যাদের মত ভায়োলেট নেচে যেতে লাগলো। তারপর ভায়োলেট গাইলো, স্প্রিং নাচলো। আর সেই মিষ্টি সুরে শুধু আমিই যে গভীরভাবে অভিভূত হলাম, তা নয়—গাঁয়ের লোকেরাও হল। তার রক্তিম ঠোঁটের

বিষণ্ণ মধুর হাসি তাদের ভালো লাগলো। কিন্তু আজ তেমন বিশেষ ভীড় হল না।

একটু বিমর্ষ হলাম, কারণ ওস্তাদের মত আমি এতক্ষণ বাজালাম, আর ভায়োলেট গাইলো, শুধু এই নির্জন আখড়ায়। ড্রামের ছড়িটা হাত থেকে ফেলে, পাথরের ওপর বসে পড়ে বললেন,—ব'স মা, একটু বিশ্রাম নে।

মেয়েটি ঠোঁটের ওপর ম্লান হাসি টেনে বাবার পাশে বসে পড়ল।

খানিক পরে তল্পিতল্পা বেঁধে অন্য একটা গাঁয়ের দিকে এগোতে লাগলাম। তখন দুপুর গড়িয়ে পড়েছে। রাস্তায় সার সার লোক হেঁটে যাচ্ছে; মাথাটা তাদের সামনের দিকে নুয়ে পড়া, পিঠের ওপর টুকরীতে তাদের ছেলে আর একটি বাণ্ডিলে কাপড় ঝুলছে, পেছনে পেছনে কতগুলো জিব বারকরা কুকুর আসছে। লোক-গুলোর তামাটে কপাল থেকে রোদ্দুর লেগে টস টস করে ঘাম পড়ছে। বুঝলাম, কি ব্যাপার। তবু নিশ্চিত হবার জন্য একজন চাষীকে জিজ্ঞেস করতে, সে বললে,

—জাপানীরা খুব কাছে এসে পড়েছে। আজ সকালেই তো আমাদের গাঁয়ের ওপর বিরাট একটা লোহার ঈগল, কতোগুলো যেন ডিমের মত ফেলে দিয়ে চলে গেল। আর তা ফেটেই তো পঁচিশটা জোয়ান মরদ, তিনটে গাই গরু আর ছটা ছাগল মরল।

আমাদের বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন,—উঃ পৃথিবী কি! তারপর মেয়েদির দিকে ফিরে বললেন,

—তোদের যে কি ব্যবস্থা করব, কিছুই বুঝতে পারছি না। আর, দিনকে দিন তো বুড়ো হাড়ে ঘুণ ধরছে......

মাথাটা নত করে মেয়ে দুটি চুপচাপ করে রইলো। তারপর চলতে চলতে আবার একটি গাঁ পেলাম। কিন্তু সেটাও জনমানবশূন্য, পরেরটাও তাই। সারাদিন খাবার জন্যে কিছুই রোজগার হয়নি, তার ওপরে পা যেন আর চলতে চায় না। শেষে বৃদ্ধ বললেন,—নাঃ, আর তো পারি না। আর এগিয়ে গিয়েই বা কি হবে? চল কালকের সেই মন্দিরটাতেই ফেরা যাক।

মন্দিরে ফিরে গিয়ে আমরা আর যেন দাঁড়াতে পারছিলাম না। খড়ের গাদার ওপরেই মেয়ে দুটি বসে পড়ল, আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে রইলাম, আর বৃদ্ধ বসলেন আমাদের মুখোমুখী। সবাই চুপচাপ; কিন্তু মেয়ে দুটির সরল চোখে কেমন জানি একটা অসহায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় দৃষ্টি, কিন্তু তাও কত বিষণ্ণ। বৃদ্ধটি অনবরত তার টেকো মাথা চুলকে চলেছিলেন, আর মেয়ে দুটি চুপ করে তার দিকে তাকিয়েছিল।

—নাঃ, খাবারের ব্যবস্থা তো কিছু করতেই হবে দেখছি। দেখি, মোড়লের কাছ থেকে যদি কিছু চাল জোগাড় করে আনা যায়।

তারপর তিনি ভায়োলেটের দিকে একবার তাকালেন।

—মোড়লকে তো দুষ্টু লোক বলে মনে হয় না রে আমার। সে হয়তো সত্যিই মেয়ের মত তোকে রাখতে চেয়েছিল।

তারপর তিনি ছায়ার মত বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ঘণ্টা দুয়েক বাদে হাতে ছোট্ট একটা চালের থলি নিয়ে এলেন। স্প্রিং আস্তে আস্তে তাকে বসালে আর ভায়োলেট শান্তভাবে হাওয়া করতে লাগলো। কিন্তু বৃদ্ধ তবুও যেন একটু ভারাক্রান্ত।

—ব'স মা, তোরা ব'স।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভায়োলেটের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তোর একটা ব্যবস্থা করেছি। দুঃখ করিস না মা ভায়োলেট ও তো পাত্র খারাপ নয়।

—কি বলছো বাবা, ভায়োলেটের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

—কেন, চাল আনতে গিয়ে তো মোড়লের সঙ্গে কথা হল। সে তোকে বড় পছন্দ করে। ওই বললে যে, এখন ইস্কুল-টিস্কুল নেই বলে পড়াতে পারবে না, কিন্তু তবুও সে তোকে গ্রহণ করতে রাজী, আর সুখের কথাও সে বলেছে। উদ্দীপ্ত দৃষ্টির মত ভায়োলেট জ্বালাময়ী সুরে জিজ্ঞাসা করল,

—বাবা, তুমি কি তার কাছে দিব্যি মেনেছ?

—তা বৈকি।

—বা—বা! আমাকে তোমাদের দল ছাড়া করো না।

—নির্বোধ!

কিন্তু কণ্ঠস্বর আরো শান্ত করে বললেন,

—মা, মোড়লের বয়স একটু বেশী হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আর কতদিন এমনি ঘুরবি! তোর উঠতি কাল; আর না খেয়ে খেয়ে আমিও তো আরো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। মোড়লের বেশ টাকাকড়ি, জমিজমা আছে, তোর কোন কষ্ট হবে না। তোর ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে লেখাপড়া শিখে দশজনের মত বিদ্বান হয়ে উঠবে। আর আমার তো এই চিরকালটা ঘুরে ঘুরে.........আস্তে আস্তে বৃদ্ধের কণ্ঠ শান্ত হতে হতে একবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

ভায়োলেট মায়েদের মত শান্তভাবে মাথা নীচু করলে। বাইরের আঙিনার বাতাসে একটা গোলমাল ভেসে এল। বৃদ্ধ মাথা তুলে আস্তে আস্তে বললেন,

—যা মা, আর দেরী করিস না, তোকে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছে। জাপানীদের জন্যে মোড়ল শীঘ্রই একটা ভালো গাঁয়ে চলে যাচ্ছে। যা মা, তৈরী হয়ে নে।

অসভ্য মোড়লের নায়েবটা দুজন বাহক নিয়ে ঘরে ঢুকলো। অর্ধ অনাবৃত বাহক দুটোর সারা শরীর পেশীবহুল। মনে হচ্ছিল, এরা যেন কাউকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক নির্বাক হয়ে বসেছিলেন। তারপর হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন,

—ভায়োলেট, বুড়ো বাপের মুখ চেয়ে যা মা, যা। আর তুই যাতে সুখে থাকতে পারিস তার ব্যবস্থা আমি বাবা হয়ে করব না। যা মা, আশীর্বাদ করি, স্বামী ছেলে নিয়ে ঘরকন্না করতে পারিস যেন!

ভায়োলেট আর কোন কথাই বললে না। তারপর সে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল, আর অসভ্য নায়েবের আদেশে বাহক দুটো চেয়ারটা কাঁধে তুলে দোলাতে দোলাতে চলে গেল। অন্ধকার হয়ে আসছে। পশ্চিম দিগন্তে অসমাপ্ত একটা সুন্দর রামধনু। সামনের বড় গাছটার পাতা-গুলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন মৃদু প্রতিবাদের সুরে মর্ মর্ করে গান গাইছে।

হঠাৎ একটা অসহায় কান্নার সুর ভেসে এল। সে কান্না যেন মা-হারা কোন শিশুর। কান্না শুনে বুঝলাম—কে। কিন্তু শীঘ্রই আবার চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে এল। আকাশের ঘনায়মান অন্ধকারে রামধনুর শেষ বাঁকটা মিলিয়ে যাচ্ছে।

হৃদয়টা ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আমি প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠেছিলাম—এই আমার পূর্বপুরুষদের দেশ। এই আমাদের জীবন। এই আমার জন্মভূমি। আস্তে আস্তে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেলাম। সারাক্ষণ তিনি দু'চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন।

—আপনার ঘুমে ব্যাঘাত করার জন্যে ক্ষমা করুন। সুরদাসজী, আপনাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, তবু শত্রুদের রুখবার জন্যে আমি যুদ্ধে চললাম সুরদাসজী। সুরদাসজী আমার দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে বললেন।

—বেশ যেও। সারাদিন আজ তোমার খাওয়া হয়নি। রাত্তিতে এক সঙ্গে খেয়েদেয়ে কাল তুমি যেও।

তিনি আবার চোখ বন্ধ করলেন, আর কিছু খেতেও অসম্মতি জানালেন। আমার কেন জানি একা-একা লাগছিল। মন্দিরের বেদীটায় খড়ের গাদার ওপর স্প্রিং যেখানে বসেছিল, সেখানে গেলাম। ভেবেছিলাম, ও হয়তো দিদির জন্যে চুপিচুপি কাঁদছে। কিন্তু সে ওই মিলিয়ে-যাওয়া রামধনুটার শেষ বিন্দুর দিকে তাকিয়ে বলছে,

—কি অদ্ভুত! ঠিক তিনবার ডানার শব্দ শুনলাম, অথচ কাল তো কোন স্বপনই দেখলাম না.........

হঠাৎ আমি যখন বললাম—ও কুসংস্কার। স্প্রিং চমকে উঠল।

সে তাড়াতাড়ি বলতে লাগল,

—না, না, মা বিশ্বেস করতো।.........আচ্ছা তুমি সত্যিই ছাত্র ছিলে?

নিশ্চিন্ত করার জন্যে বললাম,—নিশ্চয়ই, ছিলাম বৈকি।

অনুনয়ের সুরে ও বললে,—বেশ, তাহলে

কেমন করে পড়তে হয়, শিখিয়ে দাও না। আর তার পাশে বসার জন্যে সে আমার হাত ধরে টানলে।—তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দাও, আমাদের এতটুকু সময়ও নষ্ট করার নেই।

বালির ওপর ছড়ি দিয়ে আমাদের ভাষার কতগুলো ছবি আঁকলাম। প্রথমটাই ছিল রামধনু। তারপর তাকে বোঝাতে লাগলাম—এই রামধনুর ছবিটার দুটো ভাগ। ডানদিকটা দেখতে ঠিক একটি পোকার মত, আর বাঁদিকটা বেশ কারুকার্য করা। তাহলে 'রামধনু' এই কথাটির ছবিটা একটি কারুকার্য করা কীট।

তার উদ্দীপ্ত দৃষ্টি নিয়ে সে বলে উঠল,

—সত্যি, আমাদের ভাষাটা রিকম কাব্যিক ....আমার ভীষণ ইচ্ছে করে মায়ের গলার সেই গানগুলো গাইতে। মা ওগুলো প্রায়ই গাইতো......বললাম—চুপ কর। সারা ঘরটায় আবার নিস্তব্ধতা। মনে হল, আমাদের এই কাব্যিক ভাষা, তার দিদির ভাগ্যের কথা—সমস্তই সে যেন ভুলে গেছে। কেমন একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লাম, পড়াতেও আর ইচ্ছে করল না। ভীষণ ক্লান্তির ভাব দেখিয়ে আমি শুতে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। বার বার ভায়োলেটের সেই শান্ত মেয়েলি সুর, কিংশুক ঠোঁটের ম্লান হাসিটা যেন আমার হৃদয় ভেঙে দিতে চাইল।

পরের দিন ভোর থাকতেই উঠে পড়লাম। ভাবলাম, যাবার সময় সুরদাসজী, আর স্প্রিংয়ের কাছে বিদায় চেয়ে নেব। বৃদ্ধের ফোলা চোখের পাতা কাঁপছিল, স্তব্ধতা ভাঙতে সাহস হল না। স্প্রিংও চুপচাপ। বিদায় না চেয়েই আমায় যেতে হবে। কিন্তু যেই বেরুতে যাচ্ছি, স্প্রিং বেদনা-ম্লান সজল চোখে সকালের প্রথম আলোর মত তাকালে।

—তুমি চলে যাচ্ছ! শোন, কালকে রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি। ভারাক্রান্ত হৃদয়েই জিজ্ঞেস করলাম,—ভালো স্বপ্ন নিশ্চয়ই?

তার বেদনা-ধূসর ঠোঁটে একটু ম্লান হাসি টেনে বললে,—হুঁ। স্বপ্ন দেখলাম, সুন্দর একজন ছাত্রের সঙ্গে দিদির যেন বিয়ে হয়েছে, আর দিদি যেন এখন গান লিখতেও পারে, পড়তেও পারে...........।

আরেকটুকু হলেই বলতে যাচ্ছিলাম—হয়তো সত্যিই। কিন্তু মেয়েটির সামনে আমি নিরুত্তর, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষ কথা আমায় সে বলেছিল,—বিদায়, কিন্তু তার ক্রন্দনোন্মুখ দৃষ্টিতে সে যেন আরো কিছু বলতে চেয়েছিল যা আমি বুঝিনি। তারপর তাদের ছেড়ে চলে এলাম। কতদিন ধরে তার সেই কালো গভীর দৃষ্টি মনে করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। শুধু আজ যেন আমি তার গভীর চাওয়ার অর্থ বুঝতে পারলাম।

অনুবাদক—**সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়**

বিজ্ঞানের কথা

পতঙ্গ জগতের পঞ্চম বাহিনী

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

পঞ্চমবাহিনী কথাটি গত মহাযুদ্ধের আমদানী। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে খবরের কাগজে বক্তৃতায়, রেডিও প্রভৃতির আলাপে এই কথাটির ব্যবহার আমরা বহুবার শুনেছি। ইংরাজি ভাষায়ও একথাটি এসেছে স্পেনদেশের গত অন্তর্বিদ্রোহ থেকে। সাধারণ-ভাবে এখন তাদেরই পঞ্চম বাহিনী বলা হয় যারা বন্ধু সেজে আপনজনের সর্বনাশ করে। পতঙ্গ জগতে এই জাতীয় পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্ব বহুকাল পূর্ব হতেই ছিলো। মানুষের আবির্ভাবেরও লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে পিঁপড়ের আবির্ভাব হয়েছিল পৃথিবীতে। মৃত্তিকা-ভ্যন্তরের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সেই আদিম যুগের যেসব পিঁপড়ের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের গায়ে দেখতে পাওয়া গেছে নানা শ্রেণীর এটিলি জাতীয় জীবের চিহ্ন। এরা আজও পতঙ্গ জগতে পঞ্চম বাহিনীর কাজে নিযুক্ত আছে।

পতঙ্গ জগতে পঞ্চম বাহিনীর উপদ্রব বেশি পিঁপড়ের বাসার ভিতরে। এ পর্যন্ত পিঁপড়ের বাসায় দু' হাজারেরও অধিক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পরভৃত বা পঞ্চম বাহিনীর সন্ধান পাওয়া গেছে। ওদের মধ্যে পিঁপড়ের স্বজাতীয়ের সংখ্যাই বেশি। পিঁপড়ের বাসায় গুবরে পোকা, মক্ষিকা জাতীয় পঞ্চম বাহিনীও বহু দেখতে পাওয়া যায়।

এদের সকলেই যে মনুষ্যসমাজের পঞ্চম বাহিনীর ন্যায় পশ্চাৎদিক হতে ছোরা বসিয়ে আশ্রয়দাতার প্রাণ হরণ করে তা নয়, এদের অধিকাংশই একটু খাবার পেলেই সন্তুষ্ট। কতক কতক অবশ্য খাবারের সঙ্গে আশ্রয়দাতার গায়ের রক্তও শোষণ করে। কিন্তু পতঙ্গ জগতে এরূপ পঞ্চম বাহিনী সংখ্যায় খুব বেশি নয়।

পিঁপড়ের বাসায় এরূপ ভিন্ন শ্রেণীর পঞ্চমবাহিনীর ভিড়ের বিশেষ কারণ পিঁপড়ের বাসার ভিতরের আরাম, খাবারের প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা। বাসার ভিতরে অতিরিক্ত রোদ বৃষ্টি ঠাণ্ডারও ভয় নেই। তাছাড়া পিঁপড়ে অতিশয় অতিথিবৎসল। বিশেষ উপদ্রব না করলে ওদের স্বশ্রেণীর যে কোন জীব ওদের বাসায় আশ্রয় নিতে আসলে ওরা সাদরে তাদের আশ্রয় দেয়। তাদের চরিত্রের এই উদারতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের বাসা আজ নানা জাতীয় পরাশ্রয়জীবীতে (parasite) ভরে গেছে। (পরাশ্রয় জীবী বা পঞ্চম বাহিনী কথাটি একই অর্থে ব্যবহার করা চলে)।

পিঁপড়ে গুবরে পোকা বা মক্ষিকা ভিন্ন অন্য এক শ্রেণীর পঞ্চম বাহিনী আছে যারা পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। কুকুরের গায়ে যে এটিলি দেখতে পাওয়া যায় ওরা সেই শ্রেণীর জীব। মাকড়সার ন্যায় ওদের চার জোড়া করে পা। পতঙ্গ জাতির পা তিন জোড়া! শৈশবা-বস্থায় উপরোক্ত শ্রেণীর এটিলিদেরও তিন জোড়া করে পা থাকে। তাতেই অনুমান হয় এককালে ওরাও হয়তো পতঙ্গ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো কিম্বা একই বংশ থেকে ওদেরও জন্ম। পিঁপড়ের বাসায় কখনো কখনো এই এটিলি জাতীয় জীব হাজারে হাজারে দেখতে পাওয়া যায়। বাসার ভিতরে ওদের কখনো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেখা যায় না। কখনো বা একক কখনো বা পাঁচ, ছয়টি এক সঙ্গে একই পিঁপড়ের ঘাড়ে পিঠে, মাথায় বা পায়ে সংলগ্ন হয়ে থাকে। বাসার ভিতরে পিঁপড়েরাই ওদের এদিক ওদিকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। খাবার পায় ওরা আশ্রয়দাতার কাছ থেকেই। আশ্চর্যের বিষয় খাবারও কেড়ে নেবার বা তার জন্য জোর জুলুমেরও প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক পিঁপড়ের বাসার ভিতরেই একটি করে আস্তাকুঁড় থাকে। সেখানে বাসার যত সব আবর্জনা যেমন পিঁপড়ের ময়লা, মৃত ছানা বা পিঁপড়ে, অব্যবহার্য খাবার, গায়ের পরিত্যক্ত খোলস বা চামড়া প্রভৃতি সব সেই আস্তাকুড়ে নিয়ে ফেলা হয়। পঞ্চম বাহিনী এটিলিগুলির খাদ্য হচ্ছে সেই সব আবর্জনা। পিঁপড়েরা সেই সব আবর্জনা মুখে করে তুলে নেবার সময় তাদের গায়ে সংলগ্ন পঞ্চম বাহিনীর দল তাদের আশ্রয়দাতার ঘাড় পিঠ বা পায়ে সংলগ্ন থেকেই তাদের মুখ থেকে নিজের জন্য সেই সব আবর্জনার অংশ তুলে নেয়। এতে অবশ্য পিঁপড়েদের পরিশ্রমের অনেকটা লাঘবই হয়। কিন্তু যেভাবে এরা আশ্রয়দাতা পিঁপড়ের গায়ে জুড়ে থাকে তাতে অনেক সময়ই ওদের চলতে অসুবিধে হয়। অনেক সময় এইসব অনাহূত অতিথিদের ভারের চাপে বাসার কাজে ভাল করে ওরা যোগও দিতে পারে না। বাসায় তখন দিনরাত্রি তাদের অলসভাবেই জীবনযাপন করতে হয়। তার ফলে অকর্মণ্য হয়ে ক্রমে ক্রমে

ওরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পোষা পিঁপড়ের কৃত্রিম বাসায় অনেক সময়েই পঞ্চম বাহিনীর এইরূপ উপদ্রবে বহু পিঁপড়েকে মরতে দেখা যায়। যারা কৃত্রিম বাসায় মধু-সঞ্চয়ী পিঁপড়ে (Honey-ant) পালন করেন অনেক সময়ে পঞ্চম বাহিনীর উপদ্রবে তাদের বাসা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। পিঁপড়ের বাসাটি ধ্বংস না হবার পূর্বে ওদের বাসা হতে তাড়ানো যায় না। ওদের তাড়াবার জন্য পিঁপড়েদের জলে ফেলে দিয়েও দেখা গেছে ওদের তাড়াতে পারা যায় নি। যতক্ষণ পিঁপড়ের দল জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকে ততক্ষণ ওরাও মরার মত হয়ে আশ্রয়দাতা পিঁপড়ের গা আকড়ে ধরে পড়ে থাকে। পিঁপড়ের দল সাঁতার কেটে জল থেকে উঠে পড়ামাত্র সংগে সংগেই ওদের প্রাণশক্তি ফিরে আসে।

অন্য এক শ্রেণীর পঞ্চম বাহিনী আছে, ওদের ব্যবহার অতিশয় অদ্ভুত। ওরা ওদের আশ্রয়দাতাকে ব্যবহার করে অনেকটা ঘোড়ার মতো। সেই জন্য ওদের অশ্বারোহী পঞ্চম-বাহিনী বলা যেতে পারে। এই শ্রেণীর এটিলি ওদের আশ্রয়দাতার গায়ে সর্বক্ষণ একই জায়গায় আকড়ে ধরে বসে থাকে না। যখন তখনই ওদের একটি পিঁপড়ের গা থেকে অন্য একটি পিপড়ের পিঠের উপর লাফিয়ে পড়তে দেখা যায়। আশ্রয়দাতা পিঁপড়েগুলি যেন ওদের ঘোড়া আর ওরা যেন সার্কাসের খেলোয়াড়। সার্কাসের কসরতের মতো ওরা চলন্ত পিঁপড়ের পিঠে পিঠে কেবলি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে বেড়ায়। আশ্চর্যের বিষয় ওদের এইরূপ ব্যবহারে পিঁপড়ের দলের ভিতরে কোন রকম বিরক্তি বা আক্রোশের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না, এমন কি ওদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যেন ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন। পিঁপড়ের পিঠে পিঠে এইরূপ কসরৎ প্রদর্শনের কারণ ওদের দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমনের চেষ্টা। এক শ্রেণীর পঞ্চম বাহিনী পিঁপড়ের পিঠে ভর না করে আশ্রয় নেয় ওদের ডিমের গাদার ভিতরে। এরা আয়তনে খুবই ছোট। ডিমের গায়ে যখন ওরা লেগে থাকে তখন ওদের দেখায় কণা পরিমাণ একটু দাগের মতো। খুব কাছে চোখ নিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে দেখা যায় ওরা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। পিঁপড়ের এইসব ডিম ওদের ঠিক খাদ্য নয়। পিঁপড়ের দল জিব দিয়ে ডিমের গা চেটে চেটে পরিষ্কার করবার সময় ডিমের গায়ে যে লালা লেগে থাকে এটিলিদের তাই খাদ্য। এতে ডিমের ক্ষতি হলেও ডিমের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য ডিমের গায়ে লালার প্রলেপ থাকা বিশেষ প্রয়োজন—পিঁপড়েদের কোন অনিষ্ট হয় না। সুতরাং পিঁপড়ের দল ওদের তাড়াবারও কোন চেষ্টা করে না। ডিম স্থানান্তরিত করবার সময় পঞ্চম বাহিনীর দলও ডিমের গায়ে আশ্রয় নিয়ে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যখন ডিম ফুটে ছানা হয়, তখন ডিমের পৃষ্ঠদেশের খাদ্য ওরা আর খেতে পায় না। তখন কি এই পঞ্চমবাহিনী দলকে অনাহারে প্রাণ হারাতে হয়? তা নয়, পঞ্চমবাহিনীর দল তখন আশ্রয় নেয় পিঁপড়ে বাসার রাণীর পিঠে কিম্বা কখনো কখনো ছড়িয়ে পড়ে বাসার ভিতরে নানা স্থানে।

পিঁপড়ের গায়ের এই সব পঞ্চমবাহিনীর দল নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। উপরোক্ত কয়েক-শ্রেণী ভিন্ন অন্য এক শ্রেণীর পঞ্চমবাহিনী আছে ওদের সামনের পা বেশ লম্বা লম্বা। ওরা একবার যে পিঁপড়ের উপর ভর করবে তাকে ছেড়ে অন্যত্র যাবে না কখনো। ওরা বাহনও বদলায় না। আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের ন্যায় একবার যার ঘাড়ে চেপে বসবে তার আর মুক্তির আশা নেই। এদের প্রধান বিশেষত্ব সব সময়েই সামনের লম্বা পা উপরে তুলে কেবলি নাড়ায়। তখন তাদের পাগুলিকে দেখায় পতংগ জাতির মুখের শুঁড়ের মতো। এরা শুধু একক নয়, কখনো কখনো পাঁচছয়টিও এক সংগে একটি পিঁপড়ের উপরে চেপে বসে, কিন্তু এক জায়গাতে নয়। এমনভাবে পিঁপড়ের গায়ে ছড়িয়ে বসবে যাতে পিঁপড়ের চলাফেরা করতে অসুবিধা না হয়। ছয়টি যদি হয় তাহলে একটি বসবে চিবুকের নীচে, দুটি যথাক্রমে মাথার দুধারে, একটি পিঠের উপরে ও দুটি পশ্চাদ্ভাগে দুধারে। যে জায়গায় বসবে দিনের পর দিন সেই একই জায়গা জুড়ে বসে থাকবে—ওদের নড়তে চড়তে বড় একটা দেখা যায় না। খায় কি এরা? পিঠে চেপে বসে কি আশ্রয়দাতারই সর্বনাশ করে? ততটা দুষ্টবুদ্ধি ওদের নেই। পাশ দিয়ে কোন পিঁপড়েকে যেতে দেখলে সামনের একটি লম্বা পা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তার গায়ে সুড়সুরি দিতে থাকে অমনি পিঁপড়েটি সেই স্থানে দাঁড়িয়ে তার মুখের খানিকটা খাবার উগরিয়ে তার মুখে ঢেলে দেয়। কিম্বা চলতে চলতে একটি পিঁপড়ে যখন অন্য পিঁপড়েকে খাওয়াতে থাকে তখন তার পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন এটিলিটিও নীচে ঝুঁকে মুখ নামিয়ে দিয়ে সেই খাবারে ভাগ বসায়। আশ্চর্যের বিষয় এইরূপ খাবার শোষণে পিঁপড়েদের ভিতর থেকে কোন বাধাই আসে না। পতংগজাতির মধ্যে, শুধু পতংগই নয় প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে এমন কি মানুষের মধ্যেও এরূপ আতিথ্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

পঞ্চবাহিনীর শোষণ হ'তে পিঁপড়ের বাচ্চাদেরও রেহাই নেই। সময় সময় পঞ্চম-বাহিনীর দল বাচ্চাদের ঘাড়েও চেপে বসে। বেচারারা এরূপে ভার বহনে অভ্যস্ত নয়, বারবার ওরা ঘাড় থেকে ওদের ফেলে দেবার চেষ্টা করে। বাচ্চাগুলি চিৎ হয়ে উপুড় হয়ে কাৎ হয়ে নানাভাবে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ওদের ঝেড়ে ফেলতে চায় কিন্তু কর্মলি নেহি ছোড়তা। এটিলির দলও তখন এদিকওদিকে ঘুরে মাটিতে চাপা পড়বার সম্ভাবনাকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। শেষকালে বাচ্চাদেরই হার মানতে হয়। অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া ভিন্ন তখন ওদের আর গত্যন্তর থাকে না।

এইসব পঞ্চমবাহিনীকে দেখতে হলে খুঁজতে হয় পিঁপড়ের বাসার ভিতরে। কারণ বাসার ভিতরে যেসব পিঁপড়ে সদাসর্বদা নানাকাজে ব্যাপৃত থাকে তাদের ঘাড়েই ওরা ভর করে। যেসব পিঁপড়ে খাবার অন্বেষণে বাসার বাইরে ঘুরে বেড়ায় তাদের গায়ে এ জাতীয় এটিলি বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

এদের মধ্যে কতক একেবারে খাঁটি পঞ্চম বাহিনী। পিছন দিক থেকে আশ্রয়দাতার পিঠে ছোরা মারতেও এরা দক্ষ। ওরা আশ্রয়দাতার পিঠের উপর চেপে বসে আশ্রয়দাতার রক্ত শোষণ করে। সাধারণতঃ পিঁপড়ের পশ্চাৎ দিকের অংগের উপরই এরা আক্রমণ চালায়—মুখের ধারালো দাড়া দিয়ে পিঁপড়ের গায়ের চামড়া কেটে ভিতরে রক্ত শোষণ করে। একবার এরা যে-পিঁপড়ের ঘাড়ে চাপে তার মৃত্যু অনিবার্য। সৌভাগ্যের বিষয় এ জাতীয় পঞ্চম বাহিনী সংখ্যায় খুব বেশি নয়।

কয়েক জাতীয় মক্ষিকা এবং ডাঁশ জাতীয় পতংগও পরাশ্রয়জীবী বা পঞ্চম বাহিনীভুক্ত হয়েছে। এরা আকারে সকলেই ক্ষুদ্র; এরা থাকে পিঁপড়ের সংগে পিঁপড়েরই বাসায়, শোষণ করে ওদেরই খাদ্য। কতক আবার পিঠে চেপে বসে ওদের রক্তও শোষণ করে, জাভা দ্বীপে ও দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন স্থানে এক জাতীয় মক্ষিকা দেখতে পাওয়া যায় যারা ঠিক পিঁপড়ের বাসায় বাস না ক'রে বাসার কাছাকাছি আশপাশে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। পিঁপড়ের দলকে খাবার নিয়ে বাসার দিকে যেতে দেখলেই ওরা ভিক্ষুকের ন্যায় ওদের সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। পিঁপড়ের দল অমনি থেমে যায় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই কতক খাবার ওদের মুখে তুলে দেয়।

এইসব পরাশ্রয়জীবীর দল নানাশ্রেণীতে বিভক্ত, কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক—অন্যের খাদ্য শোষণ করা। পরের উপর নির্ভর ক'রে ক'রে আজ ওরা এতটা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে যে অন্যে খেতে না দিলে আজ ওদের আর বেঁচে থাকবার উপায় নেই।

প্রেত বিহার

(ভ্রমণ-কাহিনী)

গোবিন্দ চক্রবর্তী

আমাদের টাঙা চলেছে।

ঝলসানো গ্রাম, বাউণ্ডুলে পথ, পাকানো ঘুসির মত রুক্ষ, রুক্ষ খণ্ড পাহাড়, তপ্ত শাণিত হাওয়া আর মাথায় মার্চের জ্বলন্ত প্রকাশ।

আপাতত আমরা পাঁচজন।

বুড়ো ঘোড়া, শীর্ণ সহিস, নাস্তিক আমি, পুণ্যবান জ্যেঠামশাই আর মিঃ টিকিধারী।

প্রফুল্লদা ধর্মশালাতেই রয়ে গেলেন— টিকিধারী আমাদের পুরোহিত। আসল নাম গয়াদত্ত মিশ্র।

মুণ্ডিত মস্তকে এক টুকরো কালো আগুনের মত লকলকে শিখা তাঁর।

চলেছি প্রেতশিলা।

পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করতে।

আমার পিতার প্রেতাত্মা নাকি সেখেনে আমৃত্যু গালে হাত দিয়ে ব'সে আছেন, আজ গোটা একুশ বৎসর, আমারই শুভ আগমন প্রতীক্ষায়। গয়া দত্ত মিশ্রের অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে, আমার হাত থেকে গোটা গোটা যবের পিণ্ড প্রেতশিলার পাথরের ওপর খসে পড়তেই, তাঁর স্বর্গারোহণের পাসপোর্ট মিলে যাবে নাকি তৎক্ষণাৎ।

বাবা যখন মারা যান, আমার বয়স চার বৎসর। মনে জীবনের রীতিমত রাত্রিকাল।

তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, লোকাচার, ধর্মবুদ্ধি, সমাজ ও জীবনদর্শন—কোনটার সঙ্গেই পরিচয় ঘটবার অবকাশ হয়নি কোন। মন যেটাকে নিয়ে গড়ে উঠলো আমার নিটোল পঁচিশ বৎসর—তা' বুদ্ধিবাদী। তার্কিক এবং বস্তুতান্ত্রিক। না হওয়াটাই বিচিত্র এবং মায়ের সঙ্গে গরমিলটাও ঠিক সেই কারণেই স্বাভাবিক। তিনি সেই দলেরই মানুষঃ ইটে ও কাঠে গড়া মন্দিরেই আকাঠ হয়ে গেছে যাদের মন, মন্দিরের পেছনের বিশাল আকাশটা পোড়ো জমির মতই ফেলনা হয়ে রইলো চিরকাল। দুই পাশে এই দুই কালের দেয়াল। আমার ব্যক্তিত্ববোধ হেঁটে চললো কতকটা তার মাঝখান দিয়েই। অধম পুত্রের মতি ফেরাতে পরাস্ত হয়ে হয়ে যখন এইভাবে ক্রমশ মুষড়ে পড়ছিলেন মা, আমার জ্ঞানসূর্য হঠাৎ একদিন দপ করে কেমন জানি জ্বলে উঠলো। বেরিয়ে পড়লাম গয়া। সঙ্গী দুজন। গ্রাম সম্পর্কে জ্যেঠামশাই আর কলকাতার মেস সম্পর্কে প্রফুল্লদা। মার বেপরোয়া আশীর্বাদ আর বাগ মানে না।

আশ্রয় মিললোই একটা।

জ্যেঠামশাই পুণ্যবান ব্যক্তি। বহুত তীর্থ চুঁড়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলেছেন।

তেজারতি, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী এবং তীর্থভ্রমণ। সবগুলোই তাঁর একনিষ্ঠ বৌদিক উত্তরাধিকার।

গাড়ি থেকেই অভয়দান করছিলেন ক্রমাগতঃ আশ্রয়ের জন্যে তুমি কিছু ভেবো না, বাবাজী।

আমার ঠাকুর রয়েছেন ওখেনে। আত সদাশয় ব্যক্তি। নামমাত্র মূল্যে এবং সম্পূর্ণ স্বগৃহের মত ব্যবস্থায় সমস্ত ঠিক হয়ে যাবেখন—

বলা বাহুল্য, এত খুঁটিনাটি ব্যাপারে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন চিরকালই কম। সুতরাং এতেও দুশ্চিন্তা ছিল না বিন্দুমাত্র।

কিন্তু স্টেশনে নেমেই প্রফুল্লদা উদ্ধার করলেন আশ্চর্যভাবে।

যা কিছু রিক্সার ওপর চাপিয়ে দিয়েই বল্লেনঃ চলুন—

কোথায়?

বিস্মিতই হলাম, কারণ তৈরী ছিলাম না।

কিন্তু তিনি বেপরোয়া, ঝর ঝর করে মিথ্যা বলে গেলেন একেবারে প্রমাণিত সত্যের মতঃ

আরে, বল্লুম যে তখন আমার নিজেরই আস্তানা রয়েছে। আসুন, আসুন—আর দেরী করবেন না—

ইঙ্গিতটা বুঝলাম। আর দ্বিরুক্তি করলেন না জ্যেঠামশাইও।

খেরো খাতা বগলে ছরিদারের দল হাঁ হয়ে রইলো।

শেষরাত্রের একটা আচ্ছন্ন হাওয়া উঠেছে। কৃষ্ণ চতুর্দশীর পাতলা জ্যোৎস্নায় ঝিম ঝিম করছে এখেন-ওখেনের ছড়ানো পাহাড়। দূরে একটা অনতিউচ্চ পাহাড়ের মাথায় আলো। অনুসন্ধানে জানা গেল পরে—ওটা ব্রহ্মযোনি। গয়া শহরের জল সরবরাহের ট্যাঙ্ক রয়েছে ওখেনে। বস্তি ও বসতিতে এক টুকরো উপনিবেশ।

বৈশিষ্ট্যবিহীন পথঘাট, বৈচিত্র্যবিহীন বাড়িঘর। শহরের কোন মৌলিক ঔজ্জ্বল্য নেই।

জ্যেঠামশাই বিরক্ত হলেন কিন্তু দারুণ, রিক্সা থেমে যেতেই এটা কি হলো? এ যে ভারত সেবাশ্রম।

প্রফুল্লদা মৃদু হাসলেন ঃ ঠিকই ধরেছেন।

রাগে তিন হাত পেছিয়ে গিয়ে ধাঁ করে একটা ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়ালেন জ্যেঠামশাইঃ

তবে বল্লেন না কেন আমাকে আগে, আমি চলে যেতাম আমার ঠাকুরের ওখেনে। না মশাই— এ সবের কোন মানে হয় না আপনাদের—ওঁকে ঠাণ্ডা করার মন্ত্র আমার জানা ছিল; সেটা প্রয়োগ করতেই একেবারে শান্ত, শিষ্ট ভূজঙ্গম।

চুপি চুপি বল্লেন, তা বাবাজী ঠিক। চুপি চুপিই বলছি তোমাকে—ঠাকুরের ওখেনে বড় পয়সার খাঁই।

তা' এখেনে যদি অল্পে-স্বল্পে হয়, মন্দ কি!

আমিও বল্লুম আস্তে আস্তেঃ তা ও'দের সবটাই দেবভাব ত! হবেই একটু অমন—

কি বুঝলেন জ্যেঠামশাই, বোঝা গেল না ঠিক।

পিলপিল করে মানুষ আসছে—পিঁপড়ের ঝাঁকের মত।

পুণ্য চাই, পুণ্য চাই।

যে কোন মূল্যে পুণ্য এরা ক্রয় করবেই। যেন এইটুকুর জন্যেই বেঁচে ছিল এতকাল।

জীবনের পাপ সম্পর্কে এর এক কণাও যদি কেউ সচেতন হ'তো!

দেখতে দেখতে ভর্তি হয়ে যায় উঠোনটা। উই-ঢিবির মত গড়ে ওঠে ট্রাঙ্ক, সুটকেশ আর গাঁটরি, হোল্ড-অলের স্তূপ। জোড়া জোড়া চোখ জ্বল জ্বল করে খুঁজতে থাকে একখানা ভালো ঘর। কেউ কারো জন্যে এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পর্যন্ত রাজী নয়। কেন করবে?

কাঁখে রয়েছে তোমার কচিছেলে, চিল্লাচ্ছে দুধের অভাবে, গলার শির ছিঁড়ে যদি মরেও যায়, ত যাক দুধ মিলবে না একটি ফোঁটাও তোমার প্রতিবেশীর থেকে, যদিও হয়ত সেখেনে ধসেছে তুমুল চায়ের আসর।

এরা সকলেই পুণ্যার্থী।

তবে আশ্রম সম্পর্কে, আশ্রমের কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে যে কোন কৃতঘ্নেরও কৃতজ্ঞতা আসা উচিত।

এ'দের নিঃস্বার্থ সেবা, অমায়িক ব্যবহার, দ্বিধালেশশূন্য উদার আদানপ্রদান—রীতিমত শ্রদ্ধার দাবী রাখে।

ইংরেজি 'এল' টাইপের দোতলা ধর্মশালা। আমাদের ঘর মিলেছে ওপরতলাতেই।

জ্যেঠামশাই আর প্রফুল্লদা নেমে গেছেন নীচে।

জ্যেঠামশায়ের উদ্দেশ্য চিরকালই মহৎ— সে সম্বন্ধে ভুল করবার কিছু নেই।

কিন্তু প্রফুল্লদা কোথায় গেলেন—সেই কথাই ভাবছি আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি এই তীর্থ-উৎসব।

উঠোনের ওপারে ঝকঝকে, তকতকে মন্দির।

স্বামী প্রণবানন্দজীর সুবিশাল তৈলচিত্র—সিঁড়িতে উঠতে গিয়েই দাঁড় করিয়ে দেয় এক মুহূর্তে একটা স্তম্ভিত শ্রদ্ধায়। যদি কোন আত্মিক মূর্তি থাকেই ভারতের, তারই একটা টুকরো প্রতিলিপি যেন এই ফটোগ্রাফ। রক্ত ও চৈতন্যকে খানিক আচ্ছন্ন করে, এমন কিছু একটা রয়েছে সে চোখে-মুখে। দেখেছি ত'—তবু তাকায় ক'জন চোখোচোখি! যারা আরসোলার মত খর খর করে উঠছে, আর নামছে উপর থেকে অষ্টক্ষণ, তাদের প্রয়োজন মন্দিরে নয়, তার লাগোয়া অফিস-ঘরটায়।

আমাকে কেন এখনো দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে উঠোনে আর এক ঘণ্টা পরে এসে আমার, অমুক পেয়ে গেল কেন দক্ষিণ-খোলা অমন চওড়া ঘর?

জবাব দাও।

দিতেই হবে এর জবাব সঙ্ঘ কর্তৃপক্ষকে—যদিও তাঁদের তরফ থেকে নেই কোন কিছুর জন্যেই কোন নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া। তবু ছুটতে হবে তার পেছনে, তাকে শান্ত করতে পরিতুষ্ট করতে। একেকজন পুণ্যার্থীর পুণ্যের ঝাঁঝ আবার এতই বেশী, অনেক সময় এ'দের রীতিমত গলে যাবার মত অবস্থাও হয় সে ঝলসানিতে।

সিগারেটটায় দুচোখ বুজে একটামাত্র ব্যাকুল টান লাগিয়েছি, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন জ্যেঠামশাই: আরে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখেনে—ওঃ, তা যাক। তা তৈরী হয়ে নাও তাড়াতাড়ি—বেরিয়ে পড়া যাক ঝটপট। বেলা ত' দেখতে দেখতে চড়ে উঠলো—ওদিকে ঠাকুর এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই কখন থেকে—

ঠাকুর!

মাথায় যেন ক'সে কে লগুড়াঘাত করলে।

এখেনেও এসেছেন আপনার ঠাকুর—সিগারেটটা পেছন দিয়ে ফেলে দিয়ে, হতাশ হয়ে তাকালাম ও'র মুখের দিকে।

একটা দিগ্বিজয়ী গৌরবে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ও'র মুখমণ্ডল। আরে বাবাজী, ও'দের কাছে কি আর কিছু অগোচর থাকে। ঠিক খবর পেয়েছেন কেমন করে—এখেনে এসে গেছি। বড় গেটটার কাছে তখন গিয়ে একটু দাঁড়িয়েছি আর ঠিক খপ্ করে এসে চেপে ধরলেন কোথা থেকে, আরে, আপনি না নদীয়া জিলার লোক আছেন—। ও'দের কাছে কি আর মিথ্যা বলা যায় কিছু তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে।

ব'লে দিলাম সব ফর ফর করে—

এই অকুণ্ঠ নির্বুদ্ধিতায় ভেবেই পেলাম না—কিভাবে প্রকাশ করবো আমার প্রতিক্রিয়া।

প্রফুল্লদা এসে হাজির।

সব শুনে বল্লেন—বেশ ত। এসেছেন ভালোই। ডাকুন আপনার ঠাকুরকে—স্বামীজীর এখেনে এসে ত' তাঁকে দিয়ে কোন চুক্তি না করিয়ে কোন উপায় নেই যাবার। এ এখেনের নিয়ম।

প্রসঙ্গক্রমে জানানো ভালো—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এখেনে আস্তানা পড়বার পর থেকেই এই সব তথাকথিত পুরুত-পাণ্ডাদের একচ্ছত্র যাত্রী-শাসনে বেশ খানিক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছেই।

আশ্রমের প্রধান কর্মী এখেনে স্বামীজী নামেই আখ্যাত।

পাণ্ডারা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেন এ'কে, কারণ যে কোন অনুষ্ঠানেই একটা নির্দিষ্ট চুক্তি ইনি সম্পন্ন করিয়ে দেন যাত্রীদের সঙ্গে। একটা মোটা লাভের অংশ এইভাবে আঙুলের ফাঁক দিয়ে, দিতেই হয় গলিয়ে নিতান্ত নিরুপায়ে।

ততক্ষণে ধুলো তেতে উঠেছে, বিষ্ণু-মন্দিরের কাছাকাছি এলাম যখন।

কেমন ঘিন ঘিন করছে গায়ের ভেতরটা।

অনেকগুলো গলি-ঘুঁজি, নোংরা ঘিঞ্জি কতকগুলো সুড়ঙ্গ-পথ, পথের ধারে ধারে ভেড়ুয়া সন্যাসী, ভিখিরী আর কুষ্ঠরোগী। একটা অত্যন্ত কদর্য আবহাওয়া।

এক বুক হাওয়া নিতে পারা গেল তবু ফল্গুর ধারে এসে।

হু হু করে বালি উড়ছে দূর হতে দূরে, মাঝে মাঝে বালুস্তর চিরে কচিৎ চুলের মত একেকটা ক্ষীণ জলস্রোত।

আকাশলীন অন্তঃসলীলা নদী। এপারে-ওপারে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গিরি-তরঙ্গ।

স্তব্ধ বিন্ধ্যরেঞ্জ।

শুধু গয়া শহরের নীচে এসে হুল্লোড় আর কোলাহল। অনেক মানুষের আদান-প্রদান। ব্যবসায়িক মন্ত্র-বিদারণের কলুষিত পরিবেশ। চোর, ভিখিরী আর পাণ্ডার নারকোৎসব।

তা'ছাড়া যতদূর চাওঃ তপঃক্লিষ্ট এক বৈরাগী ভৈরবীমূর্তি কি এক বিশেষ নিবেদনের মুদ্রায় যেন ধ্যানস্থা।

জানি না, কোন মহান আদর্শবাদ ছিল তাঁদের মনে, আসমুদ্র-হিমাচল তীর্থ-রচনার মানচিত্র এ'কেছিলেন যাঁরা অতীতকালে। যদিবা হয়—পথে-প্রান্তরের ছড়ানো মানুষকে মাঝে মাঝে একটা মহাসম্মেলনের সুযোগদান, একটা আধ্যাত্মিক স্বার্থে এক আকাশের নীচে এনে একটা আত্মিকতা বা আত্মীয়তার প্রতিবেশিত্ব জমানো—একালে এসে যে সেটা চরম ভাবে মার খেয়েছে। সেটা মানতেই হবে।

ধর্ম আর ধারণ করে না আজকের মানুষকে, ধর্ম ধ'রেছে মানুষকে জাপ্‌টে অক্টোপাসের মত।

একটা দানব মূর্তি ক্রমশ প্রকট হ'য়ে উঠেছে ধর্ম কথাটার সর্বাঙ্গে।

গড্ডালিকা প্রবাহের মত অভ্যাসের আর সংস্কারের তাড়নায় আসে বটে দলে দলে মানুষ, কিন্তু তার মধ্যে নেই এমন আর কিছু, যা' আকৃষ্ট করতে পারে, ঘনিষ্ঠ করতে পারে অথবা নত ক'রে আনতে পারে শ্রদ্ধায়।

যে যেখেন থেকে পারছে চিনে জোঁকের মত শুষে নিচ্ছে তোমার রক্ত—তুমি নিরুপায় নিঃসহায়।

—প্রতিবাদের একটা ছোটো 'ষ্যাঁ' 'উঁ' পর্যন্ত ফোটবার উপায় নেই তোমার গলা থেকে।

ভয়, ধর্মের নয়—ধর্মের আর সমাজে প্রেতের যেটা কথায় কথায় আঙুল উঁচিয়ে আ[illegible] অদৃশ্যকালে, কল্পিত পরলোকে।

—এই সব নানানখানা নিয়ে আলা[illegible] চলছিলো প্রফুল্লদার সঙ্গে।

উনি ইতিহাসের ছাত্র—অনেক অলি-গলি[illegible] সন্ধান রাখেন ভারতীয় উত্তরকালের; নজী[illegible] টীকা, তথ্য, ভাষ্য ঢের জড়ো করছিলেন এ সবে[illegible] খণ্ডনে এবং প্রাচ্য দর্শনের আসল মানস-মূর্তি[illegible] প্রকাশে। সময় কাটছিলো বেশ, কিন্[illegible] চিরকালের মহৎ ব্যক্তি জ্যেঠামশাই।

যব, তিল, সরষে, সরা আর সাক্ষাৎ পুণ্য[illegible] মূর্তি গয়াদত্ত মিশ্রকে নিয়ে ধাঁ করে এ[illegible] গেরিলা-আক্রমণ করলেন পেছন থেকে।

সারা ফল্গু নদী তন্ন তন্ন করে ঢু[illegible] বেড়াচ্ছি, আর এইখেনে মসগুল হয়ে আ[illegible] তোমরা। কি বিপদ! তা স্নানাদি সম্প[illegible] হ'য়েছে ত?

বলা বাহুল্য, ও-কাজ হয়ওনি বা মনে[illegible] ছিল না। আর জলই বা খুঁজবো কোথায় এ[illegible] শুকনো ডাঙায়।

জ্যেঠামশায়ের তামাটে মুখ বেগুনী হ[illegible] উঠেছে রৌদ্রে—সেটার রঙ আরও ঘোর হ[illegible] উঠবার আগেই টিকিধারী, কিন্তু ফাঁসিয়ে দিলে[illegible] ব্যাপারটা বেশ মোলায়েমভাবে।

আরে আইসেন, আইসেন—হামি লি[illegible] যাচ্ছি। যেখানে শ্রাধ্ হোবে, সিখানেই সে[illegible] লিবেনখন স্নান—

মাথা ঘুরে গেল স্নানের জায়গা দেখে।

ফল্গুরেই বুকে, গত বর্ষার জল জমে তৈরী হ'য়ে আছে ছোটখাটো একটা ডোবা মত।

গরু-মানুষে বাচবিচার নেই, সারা দুনিয়াকে পবিত্রতা দান করছে সে।

তেত্রিশ কোটি দেবতার অর্ঘ্য নিবেদনও চলেছে সেই থেকেই।

থিক থিক ক'রছে মেয়েমানুষ। বেশীর ভাগই দক্ষিণ ভারত আর বাঙলা।

কিন্তু সবচেয়ে মর্মবিদারক এই মাদ্রাজীরা। মাদ্রাজের কোন অঞ্চলের অধিবাসী এরা—জানি না।

কয়লার মত কালো কুচকুচে শরীরে অবলীলাক্রমে একটা মাত্র কৌপীন এ'টে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল পুরুষ।

ইতস্তত করতে করতে কয়েক পা এগিয়েছি—করুণ নারীকণ্ঠে আকৃষ্ট হ'য়ে পেছন ফিরে তাকালাম।

একটা খণ্ড হট্টগোল উঠছে এক তরুণীকে কেন্দ্র করে।

ভাজা বালির মত চটপট করে ফুটছে কটকটে তেলেগু বা কানাড়ি।

জনকয়েক কৌপীনধারী কয়েক জোড়া খড়ম উঁচিয়ে ধ'রেছে তার মাথায়।

আর কয়েকজন মধ্যবয়েসী নারী মেয়েটির ঊর্ধ্বাংশের কাপড় ধরে হিড় হিড় করে টানছে।

নারীর নারীত্বকে বিবস্ত্রীকরণের এই অমানুষিক দৃশ্য—এর আর তুলনা মিলবে না।

এবং এও বোধ করি ধর্মের জন্যই।

মেয়েটিকে দিয়ে সারানো হবে কোন মহান ব্রত, কে জানে! সেই কারণেই বুঝি দিগম্বরী হয়ে তাকে স্নান করতে হবে। মেয়েটির প্রতিবাদেই এই ঝামেলা। কিন্তু সে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে পারলে না তাকে—হিড় হিড় করে টেনে এনে, সেই বিশাল জনতার মধ্যে, ফেলাই হোলো শেষ পর্যন্ত সেই ডোবায়।

হিন্দু-সভ্যতার গালে মাদ্রাজের মত বিশ্রী চড় আর কেউই মারে নি।

এ তারি একটা নমুনা।

স্বাস্থ্য ভালো নয় প্রফুল্লদার।

একটু হাঁফের দোষ আছে। শরীরের ওপর একটু বেশী পরিশ্রমের ঝাঁকানি পড়লেই শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট বাড়ে।

ফল্গুর কাজ সেরে বিষ্ণু-মন্দিরে উঠতে গিয়েও হলো তাই—হঠাৎ উনি বসে পড়লেন।

নদীগর্ভ থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ ফিট ওপরে মন্দির।

কাটা পাথরের সিঁড়ি নেমে এসেছে থাকে থাকে।

গয়াদত্তকে নিয়ে ওদিকে হনহন করে আগিয়ে চলেছেন জ্যেঠামশাই।

এখুনি হয়ত ফুটে উঠবে ও'র মুখে-চোখে বিরক্তির ছায়া, হে'কে বল্লামঃ আগান আপনি। এলাম বলে আমরা—

বেলা হয়ত এগারোটা নাগাত হবে, কিন্তু এরি মধ্যে আকাশ সাদা হয়ে উঠেছে ইসপাতের মত—বাতাসে রীতিমত আগুনের ঝাঁঝ।

হিসেব নেই—দু'পয়সা, চার পয়সা আর ছ'পয়সার—টুকরো টুকরো দাবী-দাওয়া মিটাতে হয়েছে কতবার।

মাত্র একটু মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছি, তেলক-কাটা একটা বছর আষ্টেকের ছেলে, বোধ হয় মাতৃস্তন্যের গন্ধ মিলোয়নি তখনও মুখ থেকে, একটা কেউ-কেটার মত রুখে এসে দাঁড়ালো হঠাৎ।

এ বাবু, যাইছেন কোথা ?

কী ব্যাপার!

বিস্মিত হ'য়ে পাশের দিকে তাকিয়েছি, আরেকটা অপরিচিত সমর্থনকারী মুখ থেকে বাণী নির্গত হলোঃ

আপনার পিতার শ্রাদ্ধ ত হয়ে গেল। এখন ওকে দিয়ে পিতাকে প্রণাম করিতে হবে। ওকে দক্ষিণা দিবেন, ভোজন করাইবেন, স্বর্ণ-গোধন ইত্যাদি দান-ধ্যান করিবেন—

চন্ চন্ করে জ্বলে উঠলো আপাদমস্তক। ইচ্ছে হলোঃ ঠাস করে একটা থাপ্পড় ধরিয়ে দি ছেলেটার গালে।

কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে কেবল একটা অঙ্গুলি-সঙ্কেত করলাম অন্যত্র যাবার।

ঘটনার গতি পাল্টে গেল এবার আশ্চর্যভাবে।

পাশে ছিল যে এতক্ষণ আনাচে-কানাচে, সে নিজেই এতক্ষণে সম্মুখ হয়ে উঠলো মূর্তিমান।

তা সে যা ইচ্ছা হয় করিবেন, আমারটা চুকায়ে দিন—

ইতিপূর্বে কোন তিলমাত্র কাজে তাকে দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারলাম না, সপ্রশ্ন চোখ তুলে ধরলাম তার চোখে—তোমার ?

রীতিমত ঘোষণাই ফুটে উঠলো তার কণ্ঠে—হাঁ, হাঁ, আমারই। যে জলে আপনি স্নান করিলেন, শ্রাধ্ করিলেন—

সে জায়গা খনন করিয়াছে কে ? আমার পাওনা নাই ?

মুদ্রানীতির নিতান্ত একটা তুচ্ছ অঙ্কেই দুটো ব্যাপারই চুকলো সন্দেহ নেই, কিন্তু জেনে শুনে নিঃসঙ্কোচে যে একটা পাপ করলাম—সে কথাটা ভুলবার নয়।

প্রাদেশিকতা সমর্থন করিনে—দুই জাতি-তত্ত্বও মাথায় ঢোকে নি কোনদিন।

কিন্তু বাঙলার ভূগোলের গণ্ডি পেরুলেই মাটির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই—কতখানি রুক্ষ আর কর্কশ যে মানুষের মন, তা সংস্পর্শে না এলে হৃদয়ঙ্গম হয় না রীতিমতভাবে।

পৃথিবীর কথা অনেক বড়, শুধু ভারতীয় পরিবেশের মধ্যেই যাও বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বে, পাঞ্জাব—যেখেনেই। নিছক ধর্মের চিঁড়ে ভিজিয়ে ভারত-মাতা বা পাকিস্তান-পিতার কোন প্রিয় সন্তানেরই প্রীতি অর্জন করতে পারবে না। তিন পয়সার দেশলাই কিনতে হবে তোমাকে দু'আনায়, ছ'আনার কার্লটনের দাম দিতে হবে নগদ চল্লিশ পয়সা—দৈনন্দিনের যে কোন তুচ্ছতম প্রয়োজনের প্রতিটি পদে পদে খোঁচট খেতে হবে সাংঘাতিকের। কোথাও সম্মান নেই বাঙালীর।

কায়েদ-ই-আজমের লকেট-আঁটা পাঞ্জাবী মুসলমানের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হতে দেখেছি বাঙালী মুসলমানকে ফিরতি ট্রেনের কামরায়, বীর সাভারকরী চেলার হিন্দু-নিগ্রহের উল্লাস চোখে পড়েছে যেখেনে-সেখেনে, নিজেকেও তার নায়ক হিসেবে দেখতে হ'য়েছে বহুবার।

সেই কথাটাই আরো একবার মনে পড়লো প্রেতশিলার পথে, টাঙা নিতে গিয়ে।

যে যা ইচ্ছে, দর হাঁকে। কোন বালাই নেই চক্ষুলজ্জার।

আমারই চোখের ওপর, ঐ একই গন্তব্যের জন্য যথেষ্ট স্বল্পমূল্যে টাঙা পেলেন এক বিহারী ভদ্রলোক, তার তিনগুণ দর দিয়েও আমার ভাগ্য আর সুপ্রসন্ন হলো না।

অবশেষে যেটা মিললো—তার ঘোড়া ও সহিস, প্রথমেই তুলে ধরেছি তাদের চেহারা।

প্রফুল্লদার অসুস্থতা বেড়ে গেল আরো। সুতরাং ধর্মশালাতেই রেখে যেতে হলো ও'কে।

তখন সমস্তটা গয়া প্রায়, জ্বলছে।

যাওয়া-আসায় এই আট-দশ মাইল পথ, তার ওপর পঁচিশ ফিট উঁচু পাহাড়ে ওঠা-নামা এই দারুণ তাপে, বড় কম কথা নয়।

কিন্তু বিষিয়ে উঠেছে সারাটা মন।

সেই এক দৃশ্য, সেই বেপরোয়া জুয়াচুরি আর বদমায়েসীর রাজত্ব।

বৈষ্ণবতার অমিয় লালিত্যে কোথাও এক ফোঁটা শান্তির শৈত্য নেই বিষ্ণুমন্দিরে। কারুশিল্পহীন রুক্ষ পাথরের মহলে মহলে কেবল নরমেধ যজ্ঞের জমাট-বাঁধা পাপ, প্রতিদিন যে পাপের স্রোত বইছে অবিরাম—বলির পাঁঠার মত সার বেঁধে মন্ত্র পড়ছে কতকগুলো অপরিপুষ্ট মানবাত্মা, অর্ধেক মন্ত্রই থাকছে অনুচ্চারিত, প্রতি দু'মিনিট তিন মিনিটে এ-নামে আর ও-নামে ট্যাঁক থেকে নামিয়ে দিচ্ছে পয়সার কাঁড়ি আর গদাধরের পাদপদ্মের ছোট কুণ্ডটার মধ্যে কি কুশ্রীভাবেই না কিলবিল করছে পাণ্ডাদের রোমশ ঘর্মাক্ত হাত—আধুলি আর সিকি কুড়োনোর।

সমস্ত রক্ত বিদ্রোহ করে ওঠেঃ এই ধর্ম ? আধ্যাত্মিকতা ? আত্মার মুক্তি-উৎসব!

আমার জীবন্ত আত্মার যেখেনে লজ্জার অন্ত নেই, মৃত পিতৃ-আত্মার সেখেনে মিলবে শান্তি ?

রেল-ফটকটা অতিক্রম করে টাঙা পড়লো এবার আরো বাজে রাস্তায়।

পাশেই একটা পাহাড়। অতিকায় জন্তুর মত পিঠ পেতে বসে আছে যেন রৌদ্রে—শিকারের আশায়।

রামের নামে তার নামকরণ হয়েছে রাম-শিলা, সুতরাং সেও শিকারী।

ক'ড়ে আঙুলের ডগার মত চূড়োর ওপরে একটা মন্দির।

জ্যেঠামশায়ের পুণ্যাগ্রহ একবার ও-পথেও ধাওয়া করবার চেষ্টা করেনি যে এমন নয়, আরেকটা বাড়তি-দক্ষিণার লোভে চক চক করে উঠেছিল বুঝি গয়াদত্তের চোখ দুটোও, কিন্তু আমার ছদ্ম-গাম্ভীর্যে শেষ পর্যন্ত কখন ও'রা চুপসে গেলেন আস্তে আস্তে।

সূর্যের আগুন-ঢালার অন্ত নেই, যত লঝ্‌ঝড় পথ—ঘোড়াটা হোঁচট খাচ্ছে তার চেয়ে আরো বেশী, সুমুখে জনশূন্য জ্বলন্ত দিগ্বলয়, পথের আশেপাশে মানুষের জীবনযাত্রার কঠিন করুণ কাহিনী।

ভাবতে ঠাণ্ডা হয়ে যায় রক্ত; সত্যিই তারা মানুষ কি না?

খিদিরপুর-টিটাগড়ের বস্তি অঞ্চলে ছড়িয়েছে অন্যান্য শিল্প-অঞ্চলের আনাচে-কানাচেও পাক দেওয়া আছে কিছু কিছু; কিন্তু সেদিন সেই বিহারী কুমোরদের জীবনধারণের আর জীবন-যাপনের যে নিষ্ঠুর উলঙ্গ ছবি চোখে পড়েছে, প্রদেশের একেবারে দূরান্তিক ভেতরের অবস্থা না জানি তার চেয়ে আরো কি সাংঘাতিক, আরো কি মর্মান্তিক।

তুমুল তর্ক চলেছে গয়াদত্তের সঙ্গে।

সত্যিই একটা আক্রোশ ফুটে উঠেছে আমার।

কিন্তু তলিয়ে দেখতে গেলে মায়া হয় গয়াদত্তের ওপর।

সত্যিই কতটুকু দায় তার—সে ত' একটা ভাড়াটে পুরুষমাত্র।

ভাবিয়া দেখেন—টাঙার হোঁচট খাওয়ার তালে তালে বলতে লাগলো গয়াদত্ত; পাণ্ডার বাড়ি ত' আপনি দেখিয়াছেন।

দেখেছি বৈকি!

প্রাসোদোপম অট্টালিকায় বিলাস-ব্যসনে প্রমত্ত ছোটখাটো এক টুকরো উজ্জয়িনী।

গায়ে গরদ, পরণে গরদ পায়ে লক্ষ্ণৌর জরিদারী চটি—আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে ফর্সির নল টানছিলেন মহামহিমান্বিত পাণ্ডা প্রবর।

সন্দেহ হয়—ফিরে গেছি কিনা মোগলযুগে, সম্রাট আলমগীরের রাজসভাতেই।

আশে-পাশে পারিষদ-অমাত্যবর্গ! সম্মুখে ভক্তি-গদগদ অপোগণ্ডের দল। প্রণাম ঠুকছে *সেই জরিদারী চটির ডগায়, আর ভেট জোগাচ্ছে* কড়কড়ে কাঁচা নোটের।

ওদিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা খটখটে ঝুনো নারকেল।

প্রতিটি যাত্রীর ফলদানের মহৎ ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে তাতেই।

খাতা নিয়ে খাজাঞ্চি দাঁড়িয়ে এ-পাশে—নোতুন যাত্রীদের নামধাম টুকে নিচ্ছে ত্বরিতহস্তে।

এদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনাগত রক্তের একটা মোটা ইনভেস্টমেণ্ট।

হামার মতঃ গয়াদত্তের কণ্ঠস্বর করুণ—অমন ষাইট-সত্তর জন পুরোহিত আছে। হামাদের শুধু মাসে পনেরো বিশ রূপেয়া—ব্যাস খতম। এখান হ'তে পনেরো মাইল দূরে পাহাড়ের ধারে ছোটো গাঁ আমার। অল্প জমি আছে আবাদের। সেখেনে 'বহু' বাল-বাচ্চা, বুড়া মা-বাপ, বিধবা বহিন সব রহিয়াছে।

কি করিব, তাহাদের খোরাক দিবে কে? কিন্তু ইহাতেই কি খোরাক মিলে, বাবু?

খোরাক?

মানুষের মত বাঁচতে চাওয়ার কথা, মালিকের বিরুদ্ধে অসন্তোষের কথা বলে—এ কোন গয়াদত্ত।

আজকের মানুষের অন্তরে অন্তরে ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে যে তীব্র অসন্তোষের অগ্নিগিরি গয়াদত্তের ক্ষুদ্র প্রাণকুণ্ডেও লেগেছে এসে তাহলে তার আলোড়ন?

সমস্ত দিনের ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আর উপবাসে নুয়ে পড়ছে আমার সমস্ত দেহ-মন—তবু যেন স্পষ্ট অনুভব করলামঃ

মেরুদণ্ডের ভেতরে ভেতরে একটা দ্রুত বিদ্যুৎ-সঞ্চারণের জীবন্ত উল্লাস।

যাবার পথে যে কাহিনীর স্বল্পমাত্র আভাস পাওয়া গিয়েছিল গয়াদত্তর পাণ্ডুর ঠোঁটে ফিরতি-পথের টাঙায় আরেক গয়াদত্তকে যেন নতুন করে তুলে ধরলো আমার চোখের ওপর, সে কাহিনীর ক্রমঃপ্রকাশ। মহাজনী-কারবারী জ্যেঠামশাইকে আর যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের চতুঃসীমার কোথাও।

পাঁচশো ফিট খাড়া, ন্যাড়া পাহাড়—প্রেতশিলা।

সেখেনেও সেই একই বেনেতী ব... লুণ্ঠন আর অপহরণের কৌশলী চাতুর্য।

কোন বৈচিত্র্য নেই, কোন নতুনত্ব ... প্রেতের এতটুকু 'টুঁ' শব্দ পর্যন্ত মিললে... কোথাও।

মানুষের এই দুর্বার নির্লজ্জতার কু... পনায় প্রেতও বুঝি লজ্জায় পালিয়েছে এ' ... ছেড়ে।

চৈত্র-মধ্যাহ্নের রোষ-কষায়িত প্রেতশি... পা পাতা যায় না পাথরের ওপর এক নি... দুরূহ পথচলা।

মনে হয়, কারা যেন মশাল জে... চারিদিকে—তারই রুদ্ধ হল্কা ছুটে আ... কেবল হু হু করে।

শুধু ক্ষুধা আর ক্ষুধা।

ক্ষুধার জীবন্ত প্রেত ছটফট করে বেড়... কেবল দিকে দিকে দু'পাশের প্রান্তরে প্রা... আর সেই পার্বত্য চড়াই-উৎরায়ের ... ভাঁজেও।

সে জ্বলন্ত পাহাড়েও একেকটা ... ঝোপের ফাঁকে, আর কোন বা ন্যাড়া গা... আবছায়াতে, শিরা-সংক্রামিত একেকখান ... হাতের কী মর্মন্তুদ কাতরানি।

চলতি টোঙার পিছু পিছু দু'মা... তিন মাইল ধরে সামান্য একটা পয়সার জ... বা কি কঠিন আত্মনিগ্রহ।

টোঙা চলেছে।

গয়াদত্তও বকে চলেছে হুড় হুড় ক... তার অনাবিল দারিদ্র্যের ইতিহাস।

আমার চোখের ওপর ভাসে কেবল ... কঙ্কালের ভুখা-মিছিল, বিশাল শ্মশান-মূ... ভারতবর্ষ।

আর অসংখ্য মানুষের প্রেতায়িত ক্রন্দ... ক্ষুধা, ক্ষুধা আর ক্ষুধা!

ভিক্ষার হাত বিদ্রোহের বজ্র হয়ে উ... করে?

প্রাথমিক শিক্ষা

অধীরকুমার মুখোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌ সি

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। গুরুত্ব হিসাবে এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাই সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ তিনটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় এর সঙ্গে জড়িত। প্রথম হল—দেশের শিক্ষিতের হার। বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বছর বছর পাইকারী হারে হাজার হাজার ছেলে পাশ করছে। অথচ দেশের বেশীর ভাগ লোকই লিখতে পড়তে জানে না। এ অবস্থা দেশের শিক্ষাগত উৎকর্ষের পরিচয় নয়। দেশের শিক্ষিতের হার বাড়াতে হ'লে দেশের সর্বশ্রেণীর লোককে অন্তত লেখাটা-পড়াটা শেখাতে হবে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কত বড় একটা ব্যাপার জড়িয়ে রয়েছে। তারপর দ্বিতীয় কথা হল—মাধ্যমিক শিক্ষার কথা। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রে ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষায় যাবে। অতএব এই প্রাথমিক শিক্ষা এমনতর হওয়া উচিত যে, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম ধাপেই যেন সে কোন অসুবিধা না পায়। প্রাথমিক শিক্ষা যদি ভাল হয়, মাধ্যমিক শিক্ষাও সফল হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ হলে, মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যর্থতা আসা স্বাভাবিক। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পরবর্তী শিক্ষার সফলতা-ব্যর্থতার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এই প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে। তৃতীয় কথাটা সবচেয়ে বড় কথা—সেটা হ'ল ছাত্রের সারা ভবিষ্যৎ জীবনের কথা। আধুনিক মনোবিদ্যার মত এই ঃ শিশুর প্রথম ষোল বছর যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, যে আবহাওয়ার মধ্যে সে বেড়ে ওঠে, সে সবই তার ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিফলিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার কারবার শিশুদের নিয়েই। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি তাদের হৃদয়ে উচ্চ আদর্শ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনও সেই ধরণেরই হয়ে উঠবে। যদি সে আদর্শ, সে পরিবেষ্টনের সংস্পর্শ না ঘটে, তবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন যে বড় একটা কিছু হবে না, তাতে সন্দেহ নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষার কাজ শুধু শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা নয়। সারা জীবনটার ভিত্তি গড়ার কাজ অজান্তে তারই মাঝে হয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যর্থতা

দেশের শিক্ষিতের সংখ্যা, মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্য ও ভবিষ্যৎ জীবন গঠন—এই তিনটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় প্রাথমিক শিক্ষার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু একবার আলোচনা করে দেখা যাক, প্রাথমিক শিক্ষা কতখানি তার কর্তব্য সম্পাদন করছে। দেশের শিক্ষিতের হার শত-করা দশজনও হয়নি। মেয়েদের কথা যদি ধরা যায়, শতকরা চারজনও লেখাপড়া জানে না। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার ব্যাপারটা কিরকম মন্থরগতিতে চলছে! বাঙলা দেশে ১৯২০ সালে শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আইন পাশ হয়। আর আজ ২৬ বছরের মধ্যে সে ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছে মাত্র কলিকাতা, চাঁদপুর ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায়, আর কোথাও নয়। কলিকাতা মানে মাত্র দুটি পাড়ায়। তারপর পল্লী অঞ্চলের জন্য আইন করতে লেগে গেল আরও দশ বছর—১৯৩০ সাল। কার্যকরী প্রয়োগ আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। তা ছাড়া যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই তো চার বছরের পড়া সম্পূর্ণ শেষ করে না। প্রথম শ্রেণীতে যারা ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে শতকরা ২০ জন মাত্র শেষপর্যন্ত চার বছরের পাঠ শেষ করে। এই তো গেল শিক্ষাবিস্তারের অবস্থা!

মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সংযোগের কথাটা একবার বিবেচনা করা যাক্‌। আগেই বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রের এমন জ্ঞানলাভের সুযোগ থাকা দরকার যাতে সে মাধ্যমিক শিক্ষাতে গিয়ে কোন অসুবিধা ভোগ না করে। কিন্তু সত্যিকারের অবস্থা দেখা যায় ঠিক বিপরীত। একটা উদা-হরণ নেওয়া যাক্‌। মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরাজী একটা আবশ্যিক বিষয়, কিন্তু অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী একটা ঐচ্ছিক বিষয়। এমন ক্ষেত্রে যে ছেলে ইংরাজী পড়েনি, সে তো মাধ্যমিক শিক্ষায় এসে মহা অসুবিধায় পড়বে। তা ছাড়া, পরীক্ষার ব্যবস্থাও খুব ভাল হয় না। পরীক্ষা সাধারণতঃ কতকগুলি নির্দিষ্ট চিরা-চরিত প্রশ্নাবলীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। এ অবস্থা অবশ্য শুধু প্রাথমিকে নয়, মাধ্যমিক এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতেও প্রচুর দেখা যায়। এতে হয় কি, সমগ্র বিষয়টির জ্ঞানলাভে ছাত্রের উপর চাপ পড়ে না। ফাঁকা ফাঁকা শিখেই সে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে যখন সে মাধ্যমিক শ্রেণীতে আসে, তখন সে তার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

তারপর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের কথা। এ সম্বন্ধে তো কিছুই হয় না। একটি ছেলের অন্তর্নিহিত শক্তির স্বরূপ ও পরিমাণ নির্ণয় এবং সেই শক্তির বিকাশের উপযুক্ত সহায়তা করা সাধারণ শিক্ষকের সাধ্য নয়। এর জন্য প্রয়োজন মনোবিদ্যায় সুশিক্ষিত শিক্ষক। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থাতেও একটা জিনিস আশা করা যায়— সেটা হল শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা আর একটা উচ্চাশা জাগিয়ে দেওয়া। ভাল শিক্ষকের লক্ষণ তিনি কতখানি শেখাতে পেরেছেন, তা নয়। ছাত্রের মধ্যে শিখবার, জানবার একটা চিরকালীন অতৃপ্ত বাসনার যিনি সঞ্চার করেছেন, তিনিই সার্থক শিক্ষক। এর মধ্য দিয়েই তার ভবিষ্যৎ জীবনের তিনি অনেকখানি কাজ করে যান। কিন্তু বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষকেরা সে কাজ কতখানি করতে পারছেন সন্দেহ। তা-ই যদি হত, তাহলে বিদ্যালয় ছাড়বার পর পুঁথিপত্রের সঙ্গে তাদের এতখানি ব্যবধান থাকত না।

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতির অকার্য-কারিতা দূর করতে হলে এর প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন করতে হবে। এ সম্বন্ধে দু-একটি পরিকল্পনাও পেশ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সরকারী পরিকল্পনা হিসাবে সার্জেন্ট পরি-কল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সার্জেন্ট পরিকল্পনা

এটি যুদ্ধোত্তরকালের ৪০ বছরের একটি পরিকল্পনা। সমগ্র ভারতের শুধু প্রাথমিক নয়, সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা ব্যাপক সর্বাঙ্গ-পূর্ণ রূপ এর মধ্যে দেবার চেষ্টা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তারই একটু আভাস দেওয়া যাক। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, তিন থেকে ছ' বছরের শিশুরা নার্সারি স্কুলে থাকবে। সেখানে শিশু শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। ছয় থেকে তের বছর পর্যন্ত আট বছর আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা। ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও অবসরবিনোদন এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ও বেতনসংক্রান্ত আলোচনাও এর মধ্যে আছে। সারা ভারতে এর জন্য খরচ হবে বার্ষিক তিনশত কোটি টাকা। এর মধ্যে দুইশত কোটি টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। বাঙলা দেশে এর জন্য খরচ হবে ৫৭ কোটি টাকা। আশার কথা, তার মধ্যে আনুর ৪০ কোটি টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। সার্জেন্ট পরিকল্পনা চালু হলে বাঙলা দেশে আরও অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে এবং

শিক্ষকদের বেতন হবে তিরিশ টাকা থেকে আরম্ভ করে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা করবার কিছু নেই। বরং যে দেশে কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না, সরকার পক্ষ থেকে যদি সেখানে এরকম কোন ব্যবস্থা হয়, তাহলে তাকে অভিনন্দিত করতেই হবে। বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার খাতে পরিকল্পনায় যথেষ্ট খরচ করবার ব্যবস্থা আছে। তবে, জানি না, টাকার জন্য পরিকল্পনা পিছিয়ে না যায়। এর মানে এই নয় যে, সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় অনেক টাকা খরচ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে একথা ভুললে চলবে না যে ভারতে চল্লিশ কোটি লোকের বাস। তাদের জন্য তিনশত কোটি টাকা মানে মাথাপিছু বাৎসরিক সাড়ে সাত টাকা ব্যয়। ইংলণ্ডে আজ মাথাপিছু খরচ হয় পঞ্চাশ শিলিং। অর্থাৎ ইংলণ্ড যা খরচ করে, আমরা খরচ করব তার চার ভাগের একভাগ। সুতরাং ভারতের মত বিরাট দেশে শিক্ষাবিস্তারে তিনশত কোটি টাকা চাওয়া এমন কিছুই নয়। তবে জেনে রাখা ভাল, এখন ভারতে শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র তেত্রিশ কোটি টাকা; আর বাঙলা দেশে অনুমান তিন কোটি টাকা। অতএব এত টাকা কোথা হতে আসবে, সে একটা মস্ত বড় প্রশ্ন। তবে সার্জেণ্ট বলেছেন, টাকা না জুটলে প্রথমে অল্প অংশ নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। পরে টাকা পেলে অন্যান্য স্থানেও কাজ শুরু হবে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বলে কোন পর্যায় নেই। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। ১৯৩৮ সালে গান্ধীজীর প্রেরণায় এই পরিকল্পনা (বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি) রচিত হয়। এর মূল কথাগুলো এই। সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত, এই সাত বছর, প্রত্যেককে আবশ্যিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এতে ইংরেজি শেখানো হবে না। তার জায়গায় রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী শিখতে হবে। আর বাকী সব মাতৃভাষাতেই শেখানো হবে। শিক্ষার মূলসূত্র হবে পরস্পরের সহযোগিতা—প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। এই সহযোগিতা মূর্ত হবে কর্মের মধ্য দিয়ে। তাই ছেলেমেয়েরা সব একসঙ্গে খেলবে, একসঙ্গে কাজ করবে। সবচেয়ে প্রধান কথা, প্রত্যেককে একটা বিশেষ শিল্প শিখতেই হবে এবং এই শিল্পকে কেন্দ্র করে তাকে অন্যান্য পুঁথিগত শিক্ষালাভ করতে হবে। যেমন,, যদি কেউ শিল্প হিসাবে 'তাঁত' বেছে নেয়, তবে এই তাঁতশিল্পকে উপলক্ষ্য করেই তাকে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য সব শিখতে হবে। যেটুকু এই উপলক্ষ্য করে শেখানো যাবে না, সেটুকু অবশ্য সাধারণভাবে শেখানো হবে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার অনেক ব্যবস্থাই অতি চমৎকার। এই যে সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়স নির্বাচিত করা হয়েছে, এ অতি বিবেচনা-প্রসূত। সাত বছর বয়সের আগে অক্ষর-জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু একটা বিষয় হৃদয়ঙ্গম করবার মত শক্তি ছেলেমেয়েদের হয় না। আর চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে রাখা বিশেষ প্রয়োজন; কারণ এই সময়টাতে তাদের বয়ঃসন্ধিকাল যায়। এ অবস্থাটা দুর্বার অবস্থা। এই সময়টা বিদ্যালয়ের পরিবেষ্টনে থাকলে তাদের পক্ষে ভালই হবে। তবে সাত বছরে কতখানি শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে, সেটা একটা চিন্তার বিষয়। গান্ধীজী অবশ্য মনে করেন, ম্যাট্রিক পাশ করে দশ বছরে ছেলেরা যা শেখে, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার ফলে সাত বছরেই তারা তা শিখবে—হয়তো বা বেশীই শিখবে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো মাতৃভাষার সাহায্যেই মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু দশ বছরেও ছেলেরা শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারছে কিনা সন্দেহ। সেই জন্যই আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড এগার বছরের ম্যাট্রিক কোর্সের কথা বলেছে।

গান্ধীজী শিল্পশিক্ষাকে মুখ্য স্থান দিয়েছেন তিনটি কারণে। প্রথমত, হাতের কাজকে যাতে লোকে ছোট করে না দেখে। দ্বিতীয়ত, শিল্পদ্রব্য বিক্রী করে যে অর্থ আসবে, তার সাহায্যে প্রত্যেক বিদ্যালয় স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। তৃতীয়ত, হাতের কাজের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের মানসিক বৃত্তিরও বিকাশ ঘটবে। এ সবের বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই। তবে শিক্ষাকে এত বেশী শিল্পকেন্দ্রিক করলে কিছু অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী। প্রথম কথা, এত শিল্প-জানা লোক করবে কী? দেশে তো শিল্পীর অভাব নেই। তাদেরই অন্নবস্ত্র জুটছে না। তাছাড়া কলকারখানা না বাড়ালে, হাজার হাজার শিল্প-জানা লোক বেরুলেও কোন ফল হবে না। প্রচুর কলকারখানা ও শিল্প-ব্যবসায়ের সুযোগ থাকলে শিল্পশিক্ষা ব্যতিরেকেও ভাল ফল হবে। তা না হলে শিল্পশিক্ষার প্রভৃত ব্যবস্থা করেও কোন ফল হবে না। যদি কেউ বলেন—তাঁরা কলকারখানায় যোগদান করতে যাবে কেন, তারা গড়বে কুটীরশিল্প। কিন্তু কুটীরশিল্পের উৎপাদন কখনও যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার বিরুদ্ধে আর একটা কথা বলবার আছে। এমন ছেলেও আছে যাদের শিল্পশিক্ষার দিকে মন নেই। এমন কি, ঘোরতর বিরাগই আছে। অথচ সেসব ছেলেকে যদি সাধারণ শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া হয়, তবে সে এককালে হয়তো একটা বড় সাহিত্যিক, কথাশিল্পী, বক্তা, রাজনীতিক বা দার্শনিক হয়ে উঠবে। কিন্তু জোর করে তাকে যদি শিল্প শেখানো হয়, তবে তার ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয় প্রতিভার বিকাশে সেটা একটা শোচনীয় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এখনও এই ধরণের ব্যাপার অনেক ঘটে। আই এস-সি পাশ করলে সব লাইন খোলা থাকবে, এইজন্য অনেক অভিভাবক কিছুমাত্র বিবেচনা না করেই ছেলেকে বিজ্ঞানের কোর্সে ভর্তি করে দেন। কিন্তু এমন ছেলে অনেক আছে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশের উপর যাদের রীতিমত বিরাগ বা অঙ্ক ও বিজ্ঞানের বিষয় যাদের কিছুমাত্র ভাল লাগে না। ফলে হয়কি তাদের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় না। এমন ছেলের কথাও শোনা গেছে যে, আই এস-সিতে ফেল করেছে। পরে বি-এ ও এম-এতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে পাশ করেছে। শিক্ষার কাজ প্রত্যেকের নিজস্ব মানসিক বৃত্তির বিকাশে সহায়তা করা। যাদের সাহিত্য-কলা, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি অ-শিল্পীয় বিষয়ের দিকে মন, বুনিয়াদি শিক্ষা-ব্যবস্থা তাদের প্রতিভার স্বাধীন বিকাশে একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করবে, যদি না এই দিকের পরিকল্পনায় কিছু ব্যবস্থা করা হয়।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনার এখনও প্রয়োগ হয়নি। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার কিছুটা প্রয়োগ কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে দু'এক জায়গায় হয়েছিল। মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পর সেসব উঠে গেছে। এখন পরিকল্পনার কথা থাক। পরিকল্পনার প্রয়োগ হোক আর না-ই হোক, আমাদের শিক্ষার কাজ চালিয়ে যেতেই হবে। অতএব শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণভাবে দু'চার কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? আগেকার মত ছিল, শিক্ষার কাজ হল একটা আদর্শ অনুযায়ী ছেলেদের তৈরী করা। ছেলেরা যেন কাদামাটি। শিক্ষকের কাজ তা দিয়ে কোন একটা পাত্র তৈরী করা।

আজকালকার বৈজ্ঞানিক ধারণা কিন্তু অন্যরকম। শিক্ষকের কাজ কোন আদর্শ অনুযায়ী ছেলেকে গড়ে তোলা নয়, তার নিজস্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করা। ছেলেরা যেন বীজ। বীজের মত কতকগুলো পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সে তার পরিপূর্ণতা লাভ করবেই। শিক্ষকের কাজ মালীর কাজ। তাদের বিকাশ ঠিক রকম চলছে কিনা লক্ষ্য রাখা। আজকাল পাশ্চাত্যে যেসব পরিকল্পনার কথা শোনা যায়—মণ্টেসরি প্রথা, ডাল্টন পরিকল্পনা, প্রোজেক্ট পদ্ধতি—এসবই এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেসব

পদ্ধতি এখানে প্রয়োগ করা হয় না। সেসব করতে হলে একেবারে অন্য রকমের আবেষ্টনীর প্রয়োজন। সে পরিবেষ্টন আমাদের দেশে নেই। আমাদের গণ্ডির মধ্যে আমরা কী করতে পারি, যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা যতটা সম্ভব সার্থক হতে পারে?

শিক্ষকের কাজ

প্রথম, শিক্ষার্থীদের নিজে থেকে বুঝবার, নিজে থেকে জানবার জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ দিতে হবে। একটুতেই তাদের সব উত্তর ধরিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এতে সময় একটু বেশী লাগে সত্য, কিন্তু তাদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হয় এবং যা শেখে তা সুদৃঢ়ভাবে রয়ে যায়। দ্বিতীয়, তাদের সবার মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগিয়ে দিতে হবে—'আমাকে বড় হতে হবে'। এই উচ্চাশার বাণী তাদের সব সময় শোনানো দরকার। তৃতীয়, কতখানি শেখানো হল—তার চেয়ে বড় কথা, তাদের মধ্যে আরও শিখবার, আরও জানবার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা। অনেক শিখেও যদি জানবার ইচ্ছা না থাকে, সেখানেই তো তার জ্ঞানের পরিধি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কম শিখেও যদি জ্ঞানপিপাসা থাকে, তাহ'লে একদিন সে অনেক শিখবে এবং শিক্ষা তার একটা দৈনন্দিন কার্য হয়ে থাকবে। চতুর্থ, প্রত্যেক ছাত্রকে শেখান দরকার যে, সে সমাজের একজন, অনেকের মধ্যে একজন, এবং সেইজন্য তাকে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। এই শিক্ষার অভাবে অনেকে পরবর্তী জীবনে একটা স্ব স্ব প্রধান ভাবের জন্য ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি ডেকে আনে। সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতির বৃহত্তর ক্ষেত্রের অনেক অশান্তির বীজ এরই মধ্যে নিহিত। পঞ্চম প্রত্যেক ছাত্র যাতে নিজের দেশ, নিজের জাতীয় বৈশিষ্টাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে, সেদিকে তাদের উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ, শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের দেখা দরকার যে বিষয়টির প্রত্যেক অংশ যেন তাদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এমন ভাবে রচিত হওয়া উচিত যেন বিষয়টির সম্যক জ্ঞানের পরিচয় লওয়া যায়। মাধ্যমিক শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষায় যে রকম short cut-এর প্রচলন হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যেন তার আমদানী না হয়। এ ভিত্তি গঠনের ব্যাপার। এতে কোন ফাঁকি বা অহেতুক করুণার স্থান নেই। এতে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষাকে পঙ্গু করে দেওয়া হবে। সপ্তম, ছেলেদের একটানা পড়ানো উচিত নয়। সবারই তো কম বয়স। ঐ বয়সে কেউ আধ ঘণ্টার বেশী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারে না। ওর বেশী হলে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পাঠে আপনা থেকে আর উৎসাহ পায় না। আধ ঘণ্টা করে period ক'রে প্রত্যেক এক ঘণ্টার পর দশ মিনিট করে ছুটি দেওয়া ভাল। এই সময়টাতে তাদের বাইরে বেরুতে, খেলাধুলো ছুটোছুটি করতে দেওয়া দরকার। আর একটা বিষয় যেন পর পর দুটো periodএ পড়ানো না হয়। দিনে তিন ঘণ্টার বেশী স্কুল না বসাই উচিত।

আর একটা জিনিস বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। সেটা হল ছাত্রদের প্রহার করা। একটু-আধটু প্রহার করা খুব খারাপ নয়। তাতে দায়িত্ববোধটা সজাগ হয়। কিন্তু বেত্রাঘাত, বিষম প্রহার ও নানা উৎকট প্রকারের প্রচলিত শাস্তি- এসব কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এতে ভাল কিছুই হয় না, মন্দ হয় প্রভূত। পাঠ তখনই সফল হবে যখন শিক্ষার্থী সেটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে। আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলে সেদিকে তার মন যাবে, শিখতে সে আনন্দ পাবে এবং সে শিখবেও। কিন্তু যদি কোন বিষয় শেখাবার জন্য তাকে অত্যধিক প্রহার করা হয় তবে এই প্রহার ব্যাপারটা তার একটা প্রীতিকর বিষয় না হওয়াতে একটা অপ্রীতিকর মনোভাব ঐ বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তাই সে বিষয়টি শিখতে না চেয়ে তাকে এড়িয়ে চলতেই চাইবে। অংক শেখাবার জন্যে যে ছেলেকে খুব মারধর করা হয়, অংক সে কিছুই শিখতে পারে না এবং চিরজীবন সেটাকে এড়িয়ে চলে—এ দৃষ্টান্ত অনেকেই দেখেছেন। অতএব প্রহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষকেরা যা করতে চাইছেন, হচ্ছে তার উল্টো। অতএব সময় সময় ধৈর্যচ্যুতি হবার কারণ ঘটলেও এই অভ্যাস ত্যাগ করা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা

সরকারী বিভাগে দেখা যায়, যিনি যত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, তাঁর বেতনও তত অধিক। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারে ঠিক তার বিপরীতটা দেখা যায়। সমগ্র শিক্ষাজীবনের ভিত্তি গড়বার ভার প্রাথমিক শিক্ষকদের হাতে। এ ভিত্ত ভাল হলে, পরবর্তী শিক্ষা সার্থক হবে। এ ভিত্ত কাঁচা হলে, সমগ্র শিক্ষা জীবনই বানচাল হয়ে যাবে। সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজ ব'লে, তাঁদের পারিশ্রমিক হয়েছে সবচেয়ে কম। অনেক প্রাথমিক শিক্ষকের গড় বেতন মাসিক ৭্ টাকা। এ তাঁদের দুরবস্থার কথা নয়; সমস্ত দেশের গ্লানির কথা, অপমানের কথা যে আমরা শিক্ষালাভ করতে চাই, কিন্তু শিক্ষাগুরুকে তার জন্য উপোসী থাকতে হয়। সরকার তো কর্তব্যে অবহেলা করছেই, কিন্তু জনসাধারণও কি তাদের কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন করে? প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাহিনা মাত্র চার আনা থেকে বার আনা। শুনেছি তা-ও অনেক বাকী থাকে। এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে দেবার এই অক্ষমতার কারণ দারিদ্র্য। দারিদ্র্য নয়, স্বভাবের দোষই এ রকম অবস্থার সৃষ্টি করেছে। না দিলেও চলে যদি চলুক—এই ভাব। শিক্ষকদের প্রতি জনসাধারণের আচরণ সরকারের মতই নির্দয় উপেক্ষাময়। প্রত্যেক অভিভাবকের এ কথা ভাবা উচিত যে, শিক্ষকেরা তো তাঁদেরই কাজ সমাধা করছেন—তাঁদেরই প্রিয় সন্তানসন্ততিকে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলছেন। তার বিনিময়ে এটা তো তাঁদের দেখা উচিত যে, সেই শিক্ষকের পরিবারের কেউ যেন উপোসী না থাকে। এই দুর্দিনে তাঁদের কর্তব্য মাহিনা ছেড়ে আরও যতভাবে যতটা সম্ভব শিক্ষকদের সাহায্য করা।

দেশের শিক্ষার ব্যয় সরকারের বহন করবার কথা। অন্যান্য দেশে এই ব্যবস্থাই চলে। অন্যান্য দেশে যদি এ রকম হয়, ভারতের মত দরিদ্র দেশে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা আরও বেশী হওয়া দরকার। সরকারী সাহায্য ব্যতীত শিক্ষকদের অবস্থা কিছুতেই উন্নত করা যেতে পারে না। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য যদি সরকার ব্যাপকভাবে উচ্চ শিক্ষাকর বসায়, তাও সমর্থনযোগ্য। কারণ আমরা জানব, অনেক করই তো দিই, এ করটা তবু যাবে জাতির যারা মেরুদণ্ড সেই শিক্ষকদের মুখে অন্ন তুলে দিতে। শিক্ষার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কখনও অসন্তুষ্ট শিক্ষকদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সমাধা হবে না।

অনুবাদক—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

[২]

মনে মনে কোনও একটি বিষয়ের নিষ্পত্তি করা এক, আর তাকে কাজে পরিণত করা আর এক জিনিস। শুধু মন স্থির করলে কি হবে? কাজে অগ্রসর হওয়া চাই। কিন্তু সেইখানেই বাধে মুস্কিল। কোনও স্ত্রীলোকের কাছে এমনি একটি প্রস্তাব নিয়ে নিজে থেকে এগিয়ে যাওয়া? অসম্ভব। কার কাছে? কোথায়? নাঃ—এ কাজ আর কোনও লোকের মধ্যস্থতায় সারতে হবে। কিন্তু সেই তৃতীয় ব্যক্তি কে—যাকে এসব কথা খুলে বলা যায়?

একদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ইউজিন। তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের সন্ধানে জঙ্গল-মহালের এক চৌকিদারের কুটীরে এসে সে পৌঁছুল। চৌকিদার পুরানো পরিচিত লোক—তার বাবার শিকার-সঙ্গী। সাবেক আমলে বহুবার শিকারের খোঁজে সে ইউজিনের বাবার সঙ্গে ঘুরেছে, বন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। আজ ওরি সঙ্গে বসে বসে ইউজিন অনেকক্ষণ গল্প করল। এই সরল বনপ্রহরী কত কথাই শোনাল তাকে—শিকারের উত্তেজনা আর স্ফূর্তি-আমোদের কত কাহিনী! বসে বসে, গল্প শুনতে শুনতে ইউজিনের মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল—আচ্ছা! এই ছোট্ট ছাউনি ঘরে কিংবা বনের মধ্যেই কোন নিভৃত জায়গায় সে ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? কিন্তু কি ভাবে সে বন্দোবস্ত করা যায়, তার হদিস্ পায় না ইউজিন। বুড়ো দানিয়েল কি রাজী হবে ভার নিতে? হয়তো তার এ-প্রস্তাব শুনে বৃদ্ধ আশ্চর্য, হতভম্ব হয়ে যাবে। আর ইউজিন নিজে? কথাটা পেড়ে শেষকালে যদি প্রত্যাখ্যান জোটে কপালে, তাহলে লজ্জার আর পরিসীমা থাকবে না। কিংবা এমনও তো হতে পারে—বুড়ো চট্ করে সহজেই রাজী হয়ে যাবে।

বুড়ো দানিয়েল অনেকটা আপন মনেই উৎসাহিতভাবে গল্প করে যাচ্ছে, আর ইউজিন খানিকটা অন্যমনস্কভাবে শুনে যাচ্ছে।

দানিয়েল বলছিল, "একবার সত্যিই শিকারে ক্লান্ত হয়ে আমরা দূরে গিয়ে পড়েছিলুম। বিশ্রামের জন্যে সেই গ্রামের পাদ্রি-গিন্নীর মেঠো ঘরখানায় গিয়ে আশ্রয় নিই। ঐখানেই ফিয়োদর জাখারিচ প্রিয়ানিশ নিকভের জন্যে একটি মেয়ে মানুষ জোগাড় করে আনি।"

ইউজিন মনে মনে বলে উঠল, "এইবার ঠিক হয়েছে!"

দানিয়েল বুড়ো কি যেন একটু ভেবে বললে, "আপনার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর কিন্তু উঁচু দরের লোক ছিলেন। এসব ছ্যাবলামির ব্যাপারে তিনি কখনও নামতেন না।"

"এর কাছে দেখছি সুবিধে হবে না।" ইউজিন মনে মনে বলল চিন্তিতভাবে। তবু পরখ করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল দানিয়েলকে —"আচ্ছা, এসব কুৎসিত ব্যাপারে তুমি নিজেকে জড়ালে কেমন করে?"

"কেন এর মধ্যে খারাপটা কি হল?" মেয়েটি আনন্দের সঙ্গেই রাজি হয়ে গিয়েছিল আর ফিয়োদর জাখারিচ—তিনিও খুবই খুসি এবং তৃপ্ত হয়েছিলেন, মাঝখান থেকে আমি এক রুবল বকশিস পেলুম। তাছাড়া ফিয়োদরের কি দোষ বলুন? চটপটে স্ফূর্তি-বাজ লোক— একটু-আধটু টানেও......"

"এইবার কথাটা পাড়া যেতে পারে" ইউজিন আশ্বস্ত হয়ে ভাবল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল।

"কি জানো দানিয়েল—আমার এক-এক সময়ে মনে হয় অসহ্য—মানে, এভাবে নিজেকে চেপে রাখা......"

ইউজিন বুঝতে পারে, কথাগুলো বলতে বলতেই সে লজ্জায় আর সঙ্কোচে লাল হয়ে উঠছে।

দানিয়েল শুধু একটু হাসে। ইউজিন আবার বলে, "আমি তো সাধু-সন্ন্যেসি নই। তাছাড়া আগেকার অভ্যেস......"

ইউজিন মনে মনে ভাবে—কেন বোকার মতন এসব কথা সে বলছে! কিন্তু দানিয়েলের মুখে মৌন সম্মতির লক্ষণ দেখে আশ্বস্ত বোধ করে।

"আচ্ছা মানুষ তো আপনি!" দানিয়েল বলে ওঠে। "আমাকে আগে বলতে হয়—তাহলে এতদিনে একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যেত। সে যাই হোক—কাকে চাই, আমাকে শুধু একটু জানিয়ে দেবেন।

"ওঃ! তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। আমার কাছে সবই সমান—অবিশ্যি কানা-কুৎসিত না হলেই হল। আর রোগ-টোগ যেন না থাকে।"

"নিশ্চয়ই। তা তো বটেই। আচ্ছা—দেখি......" দানিয়েল নীরবে একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, "ওহো ঃ, ঠিক হয়েছে। এইবার মনে পড়েছে—বেশ খাসা জিনিস......"

ইউজিন ইতিমধ্যে আবার লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে।

"এমন সরেস মেয়ে এ অঞ্চলে মেলা দুষ্কর" —দানিয়েল ফিস্ ফিস্ করে বলে। "জানেন, গেল বছর ওর বিয়ে হয়েছে। আর স্বামীটিও এমন! এখনও পর্যন্ত কোনও ছেলে-পুলে হল না। ভেবে দেখুন—ওর দাম কত—অবিশ্যি যে চায়, তার কাছে!"

অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জায় ভ্রূ কুঞ্চিত করে ইউজিন। বলে—"নাঃ, নাঃ—ও সবের দরকার নেই। আমি চাই, মানে—বরং এমন যদি কেউ থাকে—যার শরীরে কোনও রোগের বালাই নেই, আর যেখানে হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ পোয়াতে হবে না। মনে করো—এমন কোনও স্ত্রীলোক, যার স্বামী বিদেশে থাকে কিংবা সৈন্যদলে কাজ করে বা অমনি কিছু। মোট কথা—ঐ নিয়ে কোনও হৈ-চৈ আমি পছন্দ করি না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। আগেই আমি সেটা ঠাউরেছিলুম। ওই স্টীপানিডাকেই আনবো শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে। ওর স্বামী থাকে সদরে,—আর্মির লোকের মতই। বড় একটা বাড়ি আসে না। আর চমৎকার মেয়েমানুষ স্টীপানিডা। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নীরোগ। ভারি ছিম্‌ছাম্। মনে ধরবে আপনার, এ আমি বলে দিলুম। দেখবেন আপনি—আপনার তৃপ্তিও হবে। এই তো সেদিন বলছিলুম ওকে—তুমি একটু আধটু বেরোও না কেন? নিজেকে অতো গুটিয়ে রাখলে কি চলে? কিন্তু ও কি বলে, জানেন?

"তা হলে, কখন—কবে?" ইউজিন কথা-

র্তা সংক্ষিপ্ত করে আনে। "কালই—আপনি দ বলেন, মানে যদি আপনার মর্জি হয়। মি তো ঐ পথেই যাচ্ছি তামাক কিনতে। বার সময় একবার ডাক দেবো'খন। এখানে সবো, ধরুন কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া রে। নয়তো রান্নাঘরের পিছনে ছোট্ট গানটায়, যেখানে স্নানের ঘরটা দেখা যাচ্ছে,—খানেও থাকতে পারি। যা বলেন আপনি। পুর বেলায়ই ভালো। কেউ থাকে না তখন দিকটায়। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই একটু য়, ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময়টা বেশ রিবিলি......"

"আচ্ছা, ঐ কথাই রইল।"

ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরল ইউজিন। তার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, প্রবল একটা ত্তেজনায় অস্থির ও চঞ্চল। সে ভাবতে লাগলঃ

"আচ্ছা, এর পর কি দাঁড়াবে? চাষার ঘরের য়ে কেমনতর হবে কে জানে? ধরো, দেখতে যদি অত্যন্ত বিশ্রী হয়,—কুৎসিৎ, স্পর্শের যোগ্য! তা হলে? নাঃ নাঃ, তা হতেই পারে । দেখতে-শুনতে তো ভালোই, দানিয়েল লল।"

রাস্তায় আসতে আসতে আশে-পাশের য়েকটি দরিদ্র কৃষক ঘরের মেয়েকে বিশেষ-বেই লক্ষ্য করে' ইউজিন আশ্বস্ত করে পনার উত্তেজিত মনকে। তবু আবার মন ন্দেহ-দ্বিধায় দুলে ওঠে। ভাবে, "কিন্তু তাকে লবো কি ক'রে? করবোই বা কি?"

সারাটা দিন এই রকম অস্থিরভাবে কাটল উজিনের। কিছুতেই যেন আত্মস্থ হতে পারছে না। পরের দিন দুপুর বেলায় সে গল সেই জঙ্গলের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। দানিয়েল দাঁড়িয়েছিল প্রতীক্ষায়, দরোজার ঠিক ামনেই। চোখোচোখি হতেই নীরব, অর্থপূর্ণ র্তনিতে সে মাথা নেড়ে বনের দিকে ইঙ্গিত রল।

একটা গরম রক্তের স্রোত যেন হঠাৎ গিয়ে াক্কা দিল ইউজিনের হৃৎপিণ্ডে। এই আকস্মিক ালোড়নটা বেশ সচেতনভাবেই সামলে নিল উজিন। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌ল ান্নাঘরের পিছনে ছোট বাগানটার দিকে।

নির্জন বাগান কেউ কোথাও নেই!

সেখান থেকে গেল স্নানের ঘরের দিকে। সখানেও কারুর পাত্তা নেই। কাউকে দেখতে া পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল ইউজিন। আশে-পাশে াঁকি মেরে দেখল, কেউ আছে কি না। ঘর ালি। আবার বেরিয়ে এল, এদিক ওদিক চেয়ে দখল সে। তারপর হঠাৎ কানে ভেসে এল কটা শব্দ—মট্ করে ছোট গাছের ডালভাঙ্গার ব্দ। শব্দটা লক্ষ্য করে চারদিকে দৃষ্টি ারাতেই নজরে পড়ল—দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। াঁড়িয়ে আছে একটু দূরেই—ঝোপের মধ্যিখানে, ছাট খাদ্‌টার ওপারে।

খাদ্‌টা পার হয়ে যেন ছুটেই চল্‌ল ইউজিন। জায়গাটা কাঁটাগাছে ভর্তি। ইউজিন লক্ষ্য করেনি। জোরে যেতে যেতে কাঁটাগুলো গায়ে ফুটতে লাগল ইউজিনের। মাঝপথে নাক থেকে খসে পড়ল প্যাঁসনে চশমাটা। তবু ঢালু জায়গাটার গা বেয়ে অনিশ্চিত পদে ছুটেই চলল একরকম, যতক্ষণ না ঐ পারে উঁচু ঝোপটার কাছে পেণছানো যায়।

পরনে মেটে-লাল রঙের স্কার্ট। তার ওপর ধব্‌ধবে শাদা, চিকনের কাজ করা একটি এপ্রন বাঁধা, কোমরের সঙ্গে। মাথায় টক্‌টকে লাল একখানা রেশমি রুমাল। দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, শুধু পায়ে। তাজা সরস বৃন্ত যেন। আঁট-সাঁট গড়ন আর সুঠাম দেহশ্রী নিয়ে একটি সতেজ ফুটন্ত দেহ-বল্লরী। মুখে লাজ-নম্র স্মিত হাসির রেখা।

প্রথমে সে-ই কথা বললেঃ

"ওধার দিয়ে তো একটা পথ আছে—ঘুরে এসেছে এইখানে। ঐ পথ দিয়ে এলেই পারতেন।'

তারপর একটু থেমে আবার বললে, "আমি কিন্তু আগেই এসেছি। অ—নে—ক ক্ষণ হ'ল দাঁড়িয়ে আছি।"

ইউজিনের মুখে কোনও কথা বেরুল না। স্থির ও ধীর পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল শুধু। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে যেন পরখ করে নিল একবার। তারপর গায়ের ওপর রাখল নিজের হাত।

প্রায় মিনিট পনেরো কুঁড়ি পরে হল ছাড়াছাড়ি।

এদিক ওদিক নজর করে খুঁজতেই পাওয়া গেল পড়ে-যাওয়া প্যাঁস্‌নে চশমা-জোড়াটা। কুড়িয়ে নিয়ে ইউজিন চল্‌ল দানিয়েলের সন্ধানে।

দেখা হওয়া মাত্রই দানিয়েল প্রশ্ন করলেঃ "হুজুরের আশ মিটেছে তো?"

জবাব এড়িয়ে ইউজিন তার হাতের মধ্যে গুঁজে দিল একটা রুবল।

তারপর ফিরতি মুখে বাড়ি।

হ্যাঁ, যথেষ্ট তৃপ্ত হয়েছে ইউজিন। কেবল, প্রথমটায় গভীর একটা লজ্জাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তারপর সে আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। এখন আর কোনও গ্লানিবোধ হচ্ছে না।

ব্যাপারটা বেশ সহজেই নিষ্পন্ন হয়ে গেল। কোনও হাঙ্গাম পোয়াতে হয়নি তাকে। আর সব চেয়ে যেটা নিশ্চিন্ত আরামের কথা, তা হল এই যে, বর্তমানে ইউজিন বেশ সুস্থ বোধ করছে। শরীরে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, যেন অনেক দিন পরে সে খুঁজে পেল স্বাভাবিক প্রশান্তির দৃঢ়তা।

আর মেয়েটি? তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ভাবেনি ইউজিন। ভালো করে তার অবয়বগুলো খুঁটিয়ে দেখবার মতন অবকাশ ও মনের অবস্থা ছিল না ইউজিনের। কেবল এইটুকু জেনে আর নিজে দেখে সে নিশ্চিন্ত এবং তৃপ্ত যে, মেয়েটির শরীর নিরোগ, সতেজ আর পরিচ্ছন্ন। দেখতে কিছু খারাপ নয়,—যাতে মনের ইচ্ছাশক্তি গুটিয়ে যায়। বেশ সরল প্রকৃতির মানুষ, অন্ততঃ কোনও ছলা-কলার ধার ধারে না।

"কার বউ কে জানে!" আপন মনেই শুধায় ইউজিন। "ও হো! পেশ্‌নিকভের বউ, দানিয়েল তো তাই-ই বলেছিল। কিন্তু কোন্ পেশ্‌নিকভ্? ও নামে তো দু' ঘর আছে এই গাঁয়ে। হয়তো, বুড়ো মাইকেলেরই ছেলের বউ হবে। হ্যাঁ, তাই তো! বুড়োর ছেলে তো মস্কো শহরেই থাকে। কোনো এক সময়ে দানিয়েলের কাছে পুরো খবর সব নিতে হবে।"

(ক্রমশঃ)

(শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ)

কয়দিনের জন্য পূর্ববঙ্গে যাইয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙালীমাত্রেরই স্বস্তি অনুভব করিবার কারণ ঘটিয়াছিল। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আশংকা দূর হইতেছে এবং স্থানত্যাগীর সংখ্যাও হ্রাস হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়া আসিয়াছেন, মুসলমানরা পূর্ববঙ্গে শান্তি রক্ষার জন্য আন্তরিকভাবেই আগ্রহশীল। সকলেই তাঁহাকে তাঁহাদিগের একজনরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। আর পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁহাকে যে স্নেহ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি অভিভূত হইয়াছেন। তাঁহারই মত ত্যাগী কংগ্রেসকর্মী শ্রীসতীন সেন বরিশাল হইতে গান্ধীজীকে তার করিয়া জানাইয়াছেন, কতকগুলি সাধারণ ব্যাপারে এবং সংখ্যাল্প সম্প্রদায় সম্পর্কিত কতকগুলি ব্যাপারে শাসক সম্প্রদায়ের ব্যবহার যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে 'সত্যাগ্রহ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। তিনিই পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যে পদে অধিষ্ঠিত, পাকিস্থান বঙ্গে সেই পদের অধিকারী খাজা নাজিমুদ্দীনকে তার করিয়াছেন—"সরকারী নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রতিমা নিরঞ্জন স্থগিত আছে। ম্যাজিস্ট্রেট পরিত্যক্ত গৃহ সকল কালবিলম্ব না করিয়া অধিকার করিতে চাহিতেছেন। বাড়ির ভাড়া নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারীর ব্যবহার নির্মম। সাধারণ শাসনকার্য যেরূপ, তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ (অর্থাৎ হিন্দু) সম্প্রদায়ের লোকেরা আতঙ্কিত হইয়া স্থানত্যাগ করিতেছেন। শাসকদিগের কার্যহেতু সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের আতঙ্ক ও স্থানত্যাগ নিবারণের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।" এই অভিযোগ কি ডক্টর ঘোষ অবগত নহেন?

সেন মহাশয়ের অভিযোগের উত্তরে পাকিস্থান বঙ্গের সরকার যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা হিন্দুর চিরাচরিত অধিকারে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপে অসম্মতি জ্ঞাপনই করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যেহেতু গত বৎসর মুসলিম লীগ সরকার (হয়ত হিন্দুদিগকে বেদনা প্রদানের জনাই) চকবাজারের পথে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই হেতু পাকিস্থান সরকার তাহাই প্রথা বলিয়া নির্দিষ্ট করিবেন।

বোধ হয়, জন্মাষ্টমীর মিছিলের ছাড় দিয়াও তাহা বন্ধ করিবার জন্য মুসলমানদিগের দাবী রক্ষাও নাজিমুদ্দীন এই কারণেই করিয়াছিলেন। হিন্দুরা পাঁচ শতাব্দী যে অধিকার সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা পাকিস্থানে তাঁহারা সম্ভোগ করিতে পাইবেন না—মুসলমানদিগের এই দাবীই পাকিস্থান সরকার শিরোধার্য করিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গের সংবাদ—ঢাকা শহরের এক পল্লীতে ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের গৃহ বলপূর্বক অধিকৃত ও তথা হইতে আসবাবপত্র বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের যানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশে যে এজাহার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, গত ২১শে অক্টোবর বেলা প্রায় একটার সময় প্রায় একশত মুসলমান ঐ বাড়ির দোরের তালা ভাঙিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া তদবধি তথায় বাস করিতেছে। গত ২৪শে অক্টোবর রাত্রিকালে বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের লরীতে ঐ গৃহের প্রায় সাত হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র কোথাও লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ২২শে তারিখে অর্থাৎ ঘটনার পরদিন থানায় এজাহার দেওয়া হয়; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই এবং অবৈধভাবে যাহারা ঐ গৃহ অধিকার করিয়াছে, তাহারা তথায় বাস করিতেছে। নিরুপায় হইয়া ২৯শে তারিখে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এই বিষয় জানান হইয়াছে। প্রকাশ, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার রহমতুল্লা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অভিযোগের বিষয় অনুসন্ধানের জন্য লালবাগ থানার দারোগাকে নির্দেশ দিতে আদেশ করিয়াছেন। বলা প্রয়োজন, ২২শে তারিখে লালবাগ থানার দারোগার নিকটে এজাহার দিয়া কোন ফল না পাইয়া অভিযোগকারীকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে হইয়াছিল।

খাজা নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন —বিভক্ত ভারতবর্ষকে বা বিভক্ত বাঙলাকে মিলিত করিবার কথা বলিলে তাহা রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া বিবেচিত ও দণ্ডনীয় হইবে। পূর্ববঙ্গের অর্থসচিব মিস্টার হামিদুল হক চৌধুরী সে সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন—বিভাগ বিনষ্ট করার কল্পনাও অসঙ্গত এবং সে বিষয়ে বর্তমান অবস্থায় আলোচনাও বিপজ্জনক। মিস্টার হামিদুল হক চৌধুরী ভারত সরকারের কিরূপ নিন্দা করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নবগঠিত নবদ্বীপ (নদীয়া) জিলায় যে হাঙ্গামার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার স্বরূপ প্রথমে প্রকাশিত হয় নাই বটে, কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া শেষে পশ্চিমবঙ্গের সরকার তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়—

পেটুয়াডাঙ্গা গ্রামের মুসলমান অধিবাসীরা হিন্দুদিগকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল; প্রচলিত প্রথামত তাহারা ঈদ উপলক্ষে গো-কোর্বাণী করিতে বিরত থাকিবে। ২৫শে অক্টোবর মুসলমানরা একটি গরু কোর্বাণী করে। মুসলমানদিগের এই ব্যবহারের ফলে গ্রামের মুসলমান ও গোয়ালা (হিন্দু) দুই দলে অসদ্ভাব উদ্ভূত হয়। সংবাদ পাইয়া নাকাশিপাড়া থানার দারোগা গ্রামে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান কর হয়; যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার পরেও উভয় দল শান্তিতে বাস করিবে। কিন্তু ২৮শে অক্টোবর থানার দারোগার নিকট সংবাদ পৌঁছে, ঐ গ্রামের মুসলমানগণ নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামের মুসলমানদিগের সহযোগে গ্রামের হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। তিনি অতিরিক্ত পুলিশ চাহিয়া স্বয়ং স্বল্পসংখ্যক পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া দেখেন—অন্যান্য গ্রাম হইতে একত্রিত মুসলমানরা স্থানীয় মুসলমানদিগের সহিত একযোগে গোয়ালা পল্লীতে ইস্টক ছুড়িতেছে এবং গৃহ লুণ্ঠন করিতেছে। পুলিশ সতর্ক করিয়া দিলে তাহারা নিরস্ত হওয়া ত দূরের কথা, গোয়ালাদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগের দ্বারা তিনজন কনস্টেবল আহত হয়। তখন পুলিশ গুলী চালাইলে ছয়জন মুসলমান নিহত হয়; তাহাদিগের মধ্যে একজন গ্রামের, অবশিষ্ট পাঁচজন নিকটবর্তী গ্রামসমূহের। আহতের সংখ্যা প্রকাশ করা হয় নাই। জানা যায়, চাপড়া থানার এলাকা হইতে কয় হাজার মুসলমান মারাত্মক অস্ত্র লইয়া পেটুয়াডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হইতেছিল- পুলিশের চেষ্টায় নদী পার হইয়া আসিতে পারে নাই।

জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন এবং ২৯শে অক্টোবর কলিকাতা হইতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও পাঠাইতে হইয়াছিল।

অপরাধীরা যদি উপযুক্ত দণ্ডভোগ না করে, তবে তাহারা যে আরও অপরাধ করিতে সাহসী হইবে, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। অপরাধীদিগের সম্বন্ধে অকারণ ক্ষমাভাব প্রদর্শন অপরাধীকে সংশোধন করার প্রকৃষ্ট পন্থা বলা যায় না। বিশেষ যাহারা ক্ষমাকে দৌর্বল্যের পরিচায়ক বিবেচনা করে, তাহারা যে শ্রেণীর লোক, সে শ্রেণীর অন্যায় প্রবৃত্তি ভয় ব্যতীত সংযত থাকে না। তাহারা উদারতার অসদ্ব্যবহারই করিয়া থাকে।

কাশ্মীরের ব্যাপার লইয়া মিস্টার লিয়াকৎ আলী খাঁ যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাও

মুসলিম লীগ নেতৃগণের অপরিবর্তিত মনোভাবেরই পরিচায়ক। কলিকাতা, নোয়াখালি, পাঞ্জাব—এই তিন স্থানে মুসলমানদিগের কার্যের জন্য সুরাবর্দী ও লিয়াকৎ আলী খাঁ দুঃখ প্রকাশও করেন নাই; ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিলে বাধা প্রদানকারীদিগকে দণ্ডদানের কল্পনাও খাজা নাজিমুদ্দীন করিতে পারেন নাই। আর মিস্টার জিন্নার সম্বন্ধে সেই কথাই বলা যায়—"মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলে ডেঙ্গায় বসে টান।"

মিস্টার শহীদ সুরাবর্দী উৎকট অশান্তি সৃষ্টির কারণ হইয়া এখন শান্তির প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যখন "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" ঘোষণা করেন, তখন বলা হইয়াছিল, তিনি মুসলিম লীগের অনুগত, সুতরাং লীগের নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য। তিনি এ পর্যন্ত লীগের আনুগত্য অস্বীকার করেন নাই এবং আপনার কৃতকর্মের ফল দেখিয়াও তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন নাই—ত্রুটি স্বীকার করেন নাই। সে অবস্থায় তিনি যে পশ্চিমবঙ্গে লীগের কাজই করিতেছেন না, তাহা কে বলিতে পারে? তিনি স্বতন্ত্র বঙ্গে স্বয়ং প্রাধান্য লাভের যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে; এখন যদি তিনি সত্যসত্যই স্বার্থত্যাগ করিতে চাহিতেন, তবে কৃতকর্মের জন্য প্রথমে কি তাঁহার পক্ষে দুঃখ প্রকাশ ও মুসলিম লীগের আনুগত্য অস্বীকার করাই প্রয়োজন নহে? কিন্তু তিনি যে তাহা করেন নাই, সেই জন্য তাঁহার শান্তি প্রচার-প্রচেষ্টার আন্তরিকতায় লোকের সন্দেহ পোষণ অনিবার্য। তিনি যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের যে জিলা হিন্দুপ্রধান হইলেও পাকিস্থানভুক্ত হইয়াছে, সেই খুলনায় রেলে যাত্রীদিগের প্রতি যে ব্যবহার হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের মধ্যে রেল-চলাচলের ব্যবস্থার পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইতে পারে। গত ১৫ই কার্তিক কলিকাতার সুপরিচিত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস খুলনা হইতে আসিবার সময় ট্রেনে একদল মুসলমান তরুণ কর্তৃক প্রহৃত হইয়াছেন। এই দলের কাজ—যাত্রীদিগকে উত্যক্ত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি। পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছেন, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড নামক বে-সরকারী দলের অত্যাচারের অবসান ঘটান হইতেছে। আমরা জানি, যশোহরেও তাঁহাকে এই দলের অত্যাচার সম্বন্ধে অভিযোগ জানান হইয়াছিল। খুলনা রেল লাইনে—বিশেষ খুলনা স্টেশন হইতে ফুলতলা স্টেশন পর্যন্ত দলটি তাহাদিগের অনাচারের ও অত্যাচারের খাসমহল করিয়াছে। পাকিস্থান হইতে দ্রব্যাদি আনয়নেও বাধা প্রদানের সংবাদও বিরল নহে। কলিকাতার আর একজন কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী পাকিস্থানে কতকগুলি গাছ কিনিয়া তক্তা করিবার জন্য আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছে—যে কয়টি গাছ কাটা হইয়াছে, তিনি কেবল সেই কয়টিই লরীতে লইয়া যাইতে পারেন; যেগুলি কাটা হয় নাই, সেগুলি লইতে পারিবেন না।

যদি পশ্চিমবঙ্গ হইতে পাকিস্থানে মাল চালান বন্ধ করা হয়, তবে কি পাকিস্থান সরকার তাহাতে সম্মত হইবেন?

পূর্বে পাকিস্থান সরকারের সহিত সেবাব্রত রেড ক্রশ প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ কি? যখন দেশ বিভক্ত হইয়াছে, তখন উহারও দেনা-পাওনা বিভক্ত হওয়া সঙ্গত। বাঙলায় রেড ক্রশের তহবিল হইতে যে টাকা এখন ঢাকায় পাঠান হইতেছে, তাহা কি হিসাবে—কাহার নির্দেশে পাঠান হইতেছে? যদি বলা হয়, তহবিলের টাকার অধিক ভাগ পশ্চিমবঙ্গে—বিশেষ কলিকাতায় সংগৃহীত হইলেও প্রতিষ্ঠান যখন অখণ্ড বঙ্গের ছিল, তখন পূর্ববঙ্গ তাহার ভাগ পাইতে পারে, তবে বিভাগ সম্পূর্ণ করিয়া লওয়াই প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর রেড ক্রশ প্রতিষ্ঠানে যোগদানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া জানাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র না হইলে তিনি তাহাতে যোগ দিতে পারেন না। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেড ক্রশ প্রতিষ্ঠানে সাহায্যও বন্ধ করিবেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। আমরা অবগত হইয়াছি, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দুঃস্থদিগের জন্য দুগ্ধ বিতরণেরও অসুবিধা ঘটিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে দুগ্ধের অভাব অত্যন্ত অধিক। বিদেশ হইতে যে দুগ্ধ আমদানী করিয়া রেড ক্রশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অনেক শিশু ও রোগী মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছে। তাহার সরবরাহ হ্রাস করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আমরা এ বিষয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রের সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহের যেমন অব্যবস্থা, কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি তেমনই অসাধারণ। এই অবস্থায় কলিকাতায় শিশু ও রোগীদিগকে প্রদান জন্য দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু করাই প্রয়োজন।

হিসাব বিভাগ না হওয়ায় বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের লরী ও শ্রমিক সরবরাহকারীদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। পূজার পূর্বে যখন তাঁহারা দেখান, তাঁহাদিগের প্রাপ্য প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা হইয়াছে, অথচ তাঁহাদিগকে ধারে যেমন পেট্রোল কিনিতে না পারায় নগদ টাকা দিতে হয়, তেমনই শ্রমিকদিগকে পারিশ্রমিক প্রতিদিন দিতে হয়, সুতরাং তাঁহারা টাকা না পাইলে আর কাজ করিতে পারিবেন না, তখন তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছিল, ১৫ই আগস্টের পূর্বের প্রাপ্য দুই সরকারে বিভক্ত না হইলে তাঁহারা টাকা পাইবেন না। তাঁহারা তাহাতে বলেন, তাঁহারা বাঙলা সরকারের কাজ করিয়াছেন—হিসাবনিকাশ বাঙলা সরকারকেই করিতে হইবে। টাকা না পাইলে তাঁহারা কাজ করিতে অক্ষমতা জানাইলে শেষে পশ্চিমবঙ্গের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ তাঁহাদিগকে বলেন, তাঁহারা ১৫ই আগস্ট হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক মাসের প্রাপ্যের বিল করিলে সে টাকা পাইবেন। কার্যকালে কিন্তু তাঁহারা ১৫ই আগস্ট হইতে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্য টাকাই পাইয়াছিলেন। ইহা কি অব্যবস্থারই পরিচায়ক নহে?

এই বিভাগের সম্বন্ধে অভিযোগ, তাহাতে মুসলিম লীগের সময়ের ত্রুটিগুলি সংশোধিত হয় নাই—

(১) মণ দশ টাকা বার আনা দরে যে চাউল ক্রীত হইতেছে, তাহার জন্য ব্যয় মণকরা চার আনা ধরিলে এগার টাকা হয়। ব্যবসায়ীরা মণকরা দুই হইতে চার আনা মাত্র লাভ পাইতেন। সরকারী লাভ যদি এক টাকা হয়, তাহা হইলেও চাউল বার টাকায় বিক্রীত হইতে পারে। কিন্তু ষোল টাকায় চাউল বিক্রয় করা হইতেছে।

(২) আমেরিকা হইতে যে গম ও ময়দা আসিতেছে, তাহা সরকারের ব্যবস্থায় খিদিরপুর ডক হইতে বেহালার গুদামে যাইতেছে; তথা হইতে তাহা হাওড়ায় কলে যাইয়া—পরে কাশীপুরে গুদামজাত হইয়া, তথা হইতে বণ্টন করা হইতেছে। এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হয়, বাঙলায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে পাঞ্জাব হইতে যে গম আমদানী করা হইত, তাহা কলে যাইবার পরে তাহাতে কেবল সরকার লাভই করিতেন। সর্দার বলদেব সিংহ তখন পাঞ্জাবের খাদ্যবিভাগের মন্ত্রী। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কেন্দ্রী সরকার ও বাঙলা সরকার যাহা করিতেছিলেন, তাহা চোরাবাজারের ব্যাপার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেন্দ্রী সরকারের পক্ষে স্যার আজিজুল হক এবং বাঙলা সরকারের পক্ষে মিস্টার সুরাবর্দী সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু "হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না"—তাই তাঁহারা ধরা পড়েন এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া স্যার কলিন গারবেট বলেন, এক দফাতেই বাঙলা সরকার প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে সিমলায় সর্দার বলদেব সিংহ দেখাইয়া দেন,

১৫ই আগস্ট হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব হইতে যে পঞ্চাশ হাজার টন গম প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতেই বাঙলা সরকার কুড়ি লক্ষ টাকা লাভ করেন। এ লাভ মানুষকে অনাহারে হত্যার বিনিময়ে করা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান মন্ত্রীরা দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা দুর্ভিক্ষকালে কারারুদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাও সেই লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষের বিবরণ অবগত আছেন। তাঁহারা যদি সেই নিবার্য দুর্ভিক্ষ যাঁহারা অনিবার্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অনুসৃত পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে না পারেন, তবে তাহা একান্তই পরিতাপের বিষয় হইবে। আমরা মন্ত্রীদিগকে রোল্যান্ডস কমিটির মন্তব্য বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি—

"So widespread has corruption become ....that we think that the most drastic steps should be taken to stampout the evil which has corrupted the public service and public morals."

লক্ষ্য করিবার বিষয়, কমিটি প্রথমেই সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যে দুর্নীতির প্রসারের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই কর্মচারীদিগকে দুর্নীতিমুক্ত করিবার কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে ?

আমরা চিনি বণ্টন সম্বন্ধে অভিযোগের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। গঙ্গার পূর্ব পারে কলিকাতায় যে সময় মিষ্টান্নের অভাব—অধিক মূল্য দিলে—অনুভব করা যায় না, সেই সময়ে যে পশ্চিম কূলে হাওড়ায় চিনির অভাবে মিষ্টান্নের দোকান বন্ধ থাকার কারণ মন্ত্রীরা অবশ্যই বিবেচনা করিয়াছেন।

নিয়ন্ত্রণ যদি অপ্রয়োজন হয়, তবে তাহা অনাচার এবং নিয়ন্ত্রণে অব্যবস্থা ঘটিলে তাহা অত্যাচার হয়। আমাদিগের বিশ্বাস, এই দুই বিষয় বিবেচনা করিয়াই গান্ধীজী নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটাইতে বলিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এবার ধানের ফলন যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে দেশের লোকের অন্নাভাব হইবার কথা নহে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে আর নিয়ন্ত্রণ-প্রথা রক্ষার কোন কারণ থাকিতে পারে কিনা, তাহা বিশেষভাবেই বিবেচ্য। বিশেষ নিয়ন্ত্রণ যেভাবে পরিচালিত হইলে অভাবের সময় সমর্থনযোগ্য সেভাবে পরিচালিত হইতেছে না—এই অভিযোগই চারিদিক হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কিরূপ অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বহু ও জটিল। যাহাতে সেই সকল সমস্যার সমাধান শীঘ্র হয়, সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। সে কার্যে দেশের লোক তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে আগ্রহশীল—তাঁহাদিগকে সেই আগ্রহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

মোহানা

শ্রীহরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

(৫)
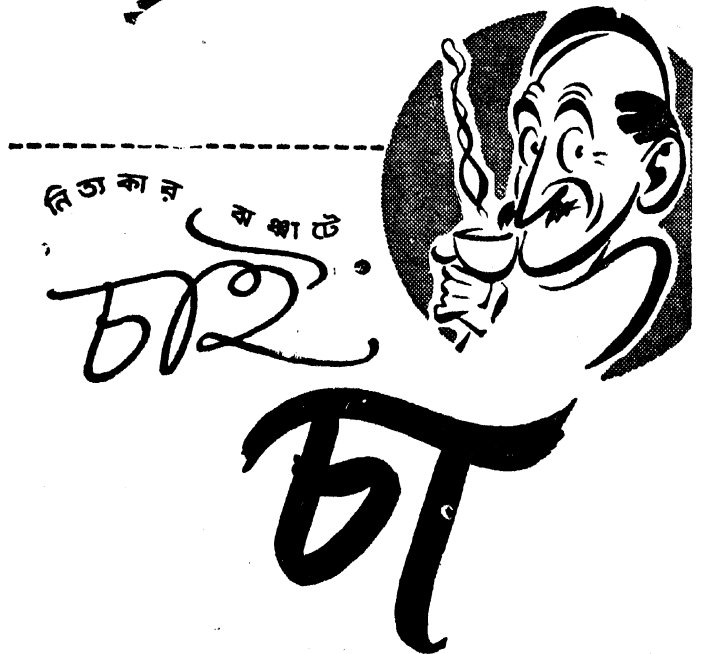
শুকনো শুয়োরের মাংস একতাল আর বেশ কয়েক ভরি আফিং—ঠিক জায়গায় ছাড়তে পারলে ভালোই রোজগার হবে আঃ নির। আর সীমাচলমের জন্য এসেছে পাঁচটা অটোম্যাটিক—বিভিন্ন অংশগুলো খোলা অবস্থায়। এগুলো অবশ্য নিয়ে যাবার লোক আসবে হোকপান থেকে। সেই লোক না আসা পর্যন্ত জিনিসগুলো থাকবে সীমাচলমের জিম্মায়।

রাত্রে পাশাপাশি শোয় সীমাচলম আর আঃ নি।

ঃ এখানে আপনাকে কোন একটা ব্যবসা নিয়ে থাকতে হবে কিন্তু, নয়ত শুধু শুধু বসে থাকলে চট করে সন্দেহ করবে লোকে।

ঃ হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই পাহাড়ী শান কয়েকজন চেয়ে চেয়ে দেখে আমার দিকে। ওরা বোধ হয় বুঝতে পারে এ জায়গায় আমি বেমানান।

ঃ আচ্ছা ছবি আঁকা আসে আপনার? মাঝে মাঝে বিদেশীরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলতে আসে এখানে। আমি দেখেছি কয়েকবার ওই পাহাড়ী ঝর্ণার কাছে বিরাট ক্যানভাস পেতে ছবি আঁকতে বসে। ছবি আঁকা জানা নেই আপনার?

ঃ ছবি আঁকা, না। আর তাছাড়া দিনের পর দিন এতে কি আর ভোলে লোকে। দেখা যাক অন্য একটা উপায়।

বা মঙের পাঠানো খাবার সেদিন ভাল করে খায় দুজনে। বাইরে বেশ কনকনে বাতাস। শীতের আমেজ। আর কিছুদিন পরেই বোধ হয় শুকনো পাতার স্তূপ জড়ো করে আগুন জ্বালাতে হবে। অনেকটা বাঁচোয়া—বা মঙ সায়েব মিস্ত্রি লাগিয়ে কাঠের বড়ো বড়ো ফুটোগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। দেখা সাক্ষাৎ না হলেও কর্তব্য কাজ ঠিক করে যাচ্ছে বা মঙ সায়েব। খাবার পাঠানো থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি সমস্ত খবর নেয় সে লোক মারফৎ।

একই বালিশে পাশাপাশি মাথা রাখে দুজনে। একটু পরেই আঃনির নাসিকা গর্জন শুরু হয়। আহা, বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো বেচারী। সারাদিনের দীর্ঘ পরিশ্রম। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে সীমাচলম ঢলে পড়ে নিদ্রার কোলে।

খুব ভোরে উঠেই রওনা হ'য়ে পড়ে আঃনি। সীমাচলম অনুরোধও করেছিল আর একটা রাত কাটিয়ে যেতে, তবুতো নির্বান্ধব পুরীতে কথা বলবার লোক থাকবে একটা। কিন্তু থাকবার উপায় নেই আঃ নির। উপত্যকায় নেমে হাটে চালান দিতে হবে শুয়োরের শুটকী মাংস আর আফিংয়েরও গতি করতে হবে একটা। কাজেই আর বাধা দেয় না সীমাচলম। আবার একমাস পরে হয়ত দেখা হবে আঃ নির সংগে। এর মধ্যে আর আসার সুবিধা হবে না তার। আবার এক-টানা জীবন—কোন বৈচিত্র্যের স্বাদ নেই কোন-খানে। ক্লান্তি আসে সীমাচলমের। কবে শেষ হবে এই জীবনযাত্রার। ওর বিপ্লবীর এই ছদ্মবেশ খসে পড়ে সহজ সরল জীবনে ফিরে যাবে ও।

শীতের প্রকোপ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বাইরে বেরোনই দায়। অনবরত বরফ ঝির ঝির করে—গাছে পাতায় বরফের স্তর জমে উঠেছে। এর মধ্যে বার দুয়েক এসেছিলো আঃনি। শীতে যেন আরও বুড়োটে দেখায় তাকে। কিছু জিনিসপত্রও এনেছিলো সংগে করে, সে সব জিনিস চালান করে দিয়েছে সীমাচলম। উপস্থিত হাত খালি তার। আঃনির সম্বন্ধেও ধারণা বদলে গেছে সীমাচলমের। ও ভেবেছিলো আঃনি বুঝি ওদের দলেরই লোক, ওরই মতন আঠুনের হাতে হাত দিয়ে সংকল্প নিয়েছিলো স্বাধীনতার। বলেছিলো দেশ ছাড়া অন্য দেবতা নেই আমাদের। ফয়াকে 'সিকো' করতে গেলেই সারা শরীরে পরাধীনতার শিকল ঝন ঝন করে বেজে ওঠে। এ শিকল না খোলা পর্যন্ত ভগবানকেও উপাসনা করবার অধিকার নেই আমাদের।

না, তা নয়। আঃনি শুধু জিনিস দিয়েই খালাস। পরিবর্তে মোটা রকমের কিছু পেয়ে থাকে সে—ব্যস ঐটুকুই তার সম্পর্ক। তার দরিদ্র জীবনের এই একমাত্র অবলম্বন। এর জন্য বিপদ তুচ্ছ করে, প্রাণ তুচ্ছ করে আনাগোনা করে সে।

এবারে অনেকদিন যেন আসেনি আঃনি। আসার সময় তার হয়ে গেছে অনেকদিন। রোজই সীমাচলম অপেক্ষা করে আর ফিরে আসে মনক্ষুণ্ণ হয়ে। এই নির্জন জীবনযাত্রার একমাত্র সংগী এই আঃনি। ওর সংগে গল্প করে তবু খানিকটা অবসাদ কাটে সীমাচলমের।

সেদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছে বরফ পড়া। শ্লেটের মত মিশ কালো আকাশ—হাত কয়েক দূরের জিনিসও দেখা যায়না ভালো করে। ঘরে শুকনো পাতা আর কাঠের স্তূপ জ্বালিয়ে শরীরটা গরম ক'রে নেয় সীমাচলম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখা যায়নি। পুরনো খবরের কাগজ খুলে চুপচাপ বসে একলা।

দরজায় শব্দ হ'তেই লাফিয়ে উঠে পড়ে সীমাচলম, বাইরের ঘোড়ার খুরের শব্দও যেন কানে আসে তার। আঃনি আসলো বুঝি এতদিন পরে।

দরজা খুলেই কিছু পিছিয়ে যায় সীমা-চলম। না, আঃনি তো নয়—আপাদমস্তক চামড়ার পোষাকে আচ্ছাদিত। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখে সীমাচলম। কিশোর বয়স্ক এ আবার কে আসলো এখানে।

ঃ কে তুমি।

ঃ বাবা খুব অসুস্থ। আসতে পারলেন না আজ, খুব জরুরী ব্যাপার বলে না এসে আমার উপায় ছিল না। দরজাটা দয়া করে ছাড়ুন। এই শীতে জমে যাবো যে।

লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দেয় সীমাচলম। কিশোরটি একেবারে লাফ দিয়ে আগুনের ধারে গিয়ে বসে। হাত দুটো আগুনের ওপর সেঁকতে সেঁকতে বলে ঃ ও, এরকম বরফ পড়া আমার আঠারো বছরের জীবনের মধ্যে দেখিনি আমি। বরফের উপর দিয়ে কতবার যে পা হড়কে হড়কে গেছে ঘোড়ার তার ঠিক নেই। এই রাস্তায় ঘোড়ার পা হড়কানোর মানে জানেন তো, একেবারে হাজার হাজার ফিট তলায় বাহনশুদ্ধ নিশ্চিহ্ন।

ভারি মিষ্টি লাগে সীমাচলমের, ছেলেটির কথা বলার ভঙ্গী। এই দুর্যোগে কিশোর বয়সী এই ছেলেটি কি করে আসলো এতটা পথ অতি-ক্রম করে! আঃনি নিশ্চয় খুবই অসুস্থ, নইলে এই আবহাওয়ায় কেউ কাউকে বাইরে পাঠায় নাকি?

ঃ খুব অসুস্থ বুঝি তোমার বাপ।

ঃ হ্যাঁ, বেশ অসুস্থ। হাঁপানী কিনা এই সময়টা বড্ড বাড়ে আর পংগু করে ফেলে বাপকে।

ঃ কিন্তু এই দুর্যোগে তুমি না বেরোলেই পারতে। বেকায়দায় পড়লে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়তে কতক্ষণ।

খিল খিল করে হেসে ওঠে ছেলেটি ঃ ঘোড়া ফেলে দেবে আমাকে। আপনি শোনেননি বুঝি সারা হোয়াং কো শহরে আমার বাবার মত ঘোড়-সওয়ার এখনও কেউ নেই। বাবার পরেই আমি। কাল সকালে আপনাকে ঘোড়ার নানারকম

কসরৎ দেখাব এখন। আর এই আবহাওয়ার কথা বলছেন? বেশ কয়েক গজ ভালো সিল্ক পাওয়া গেছে, বাজারে ভালো দামই পাওয়া যাবে। আর তা ছাড়া আপনার মালমশলাও যোগাড় করেছি কিছু,— মোটা রকমের কিছু না পেলে সারাটা শীতকাল বাবার চিকিৎসা চালাবো কি করে।

ছেলেটির কথায় অভিভূত হ'য়ে যায় সীমাচলম। সত্যি, এইটুকু ছেলের এতটা দায়িত্ব-বোধ! নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পথের সমস্ত কিছু বিপদ মাথায় করে সে বেরিয়ে পড়েছে,—বাপের চিকিৎসা আর পথ্য জোগাড় করতে হবে যে তাকে!

ঃ তোমার বাড়িতে বাবা ছাড়া আর কেউ নেই বুঝি।

ঃ এক মাসী আছে দূর সম্পর্কের। সেই থাকে বাবার কাছে। বাবার আর ছেলেপুলে? না, আর কেউ নেই,—কোল জুড়ানো মাণিক আমি একলাই।

ঃ তোমার মা?

এইবার যেন একটু ছল ছল করে ছেলেটির চোখ দুটো। আগুনের আভায় কেমন যেন ম্লান আর বিষণ্ণ দেখায় তার মুখ।

ঃ মা, মা—মারা গেছে অনেক আগে। আমি তখন খুব ছোট—ধরা গলায় কথা বলে ছেলেটি।

কথা আর বাড়ায় না সীমাচলম। দুটো প্লেটে খাবার সাজাতে শুরু করে আর দুটি গ্লাসে মদ। এ সমস্তই বা মঙের দেওয়া। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় সীমাচলমের দিনের পর দিন এভাবে রসদ জুগিয়ে চলেছে কি বা মঙ নিজের পয়সায়? বোধ হয় নয়! নিশ্চয় আঠুনের হাত আছে এর মধ্যে। ওর স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখের সমস্ত নির্দেশ নিশ্চয় পাঠিয়েছে আঠুন। এই পৃথিবীর প্রান্তসীমায় যতটুকু করা সম্ভব সবই করছে আঠুন।

খাওয়া দাওয়ার পরে শয্যা পাততে শুরু করে সীমাচলম। একটিমাত্র বালিশ সম্বল, সেটি ছেলেটির দিকেই এগিয়ে দেয় সে। ছেলেটি কিন্তু আপত্তি জানায় এতে।

ঃ না, না, বালিশ আমার লাগবে না। গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে শোয়া যার অভ্যাস তার ঘুম হয় নাকি এই নরম বালিশে। সারা রাত ছটফট করবো শুধু।

ছেলেটির কথা বলার ভঙ্গীতে হেসে ফেলে সীমাচলম।

ঃ তা হোক, এক বালিশেই শোয়া যাবে দুজনে। তুমি আজ খুব ক্লান্ত, শুয়ে পড়ো চট করে।

ঃ সেটা অবশ্য অস্বীকার করতে পারছিনে আজ। বাতিটা নিভিয়ে দিই তা হ'লে। বাতি থাকলে আবার চোখ বুজতে পারি না আমি। শোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাতিটা নিভিয়ে দেয় সে। কাঠের আগুনের স্তিমিত নীল আভা। কাঠগুলো পুড়ে লাল হয়ে গিয়েছে। সীমাচলম আরো কতকগুলো কাঠ আর কাগজের স্তূপ ঠেলে দেয় আগুনে। গনগন করে ওঠে আগুনের আঁচ। বেশ কিছুক্ষণ জ্বলবে এখন। ঝলকে-ওঠা আগুনের আলোয় পলকের জন্য দেখতে পায় সীমাচলম—ছেলেটি পাশ ফিরে শুয়েছে—ঘুমিয়েই পড়েছে হয়ত।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় সীমাচলমের। নিভে এসেছে আগুনটা। সমস্ত ঘরটা যেন কনকন করছে বরফের মত। হাত পা পর্যন্ত অসাড় হ'য়ে আসছে। হাত দিয়ে আরো দু' একটা কাঠের টুকরো আগুনে ঠেলে দেয়। শীতে কুঁকড়ে শুয়েছে ছেলেটি একেবারে তার বুকের ওপর। কেমন যেন মায়া হয় সীমাচলমের। আহা, এত ক্লান্ত যে নির্জীবের মত পড়ে আছে ছেলেটি—শীতবোধ করার শক্তিও বুঝি চলে গেছে তার।

আবার এক সময়ে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। ছেলেটি দুটি হাত দিয়ে চেপে ধরেছে তাকে—নিশ্বাস প্রায় রোধ হয়ে আসছে তার। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার মত যথেষ্ট শীত পরিচ্ছদ নেই বেচারীর গায়ে। একটা চামড়ার পোষাকে এই পাহাড়ে শীতের হাত থেকে বাঁচা যায় নাকি?

ছেলেটির হাতদুটো ধরে একটু সরিয়ে শোয়াতে গিয়েই চমকে উঠে বসে সীমাচলম। একি, তার সারা শরীরে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ—স্বপ্ন দেখছে নাকি ও!

ম্লান চাঁদের আলো এসে পড়েছে ছেলেটির মুখে। ক্লান্ত আর নিমীলিত দুটি চোখ। মাথার টুপীটা এলিয়ে পড়েছে এক পাশে—পিঙ্গল চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়েছে বিছানায়। ভীত সন্ত্রস্তভাবে তার বুকের ওপর আলগোছে হাতটা রাখে সীমাচলম। না, এবার আর সন্দেহ নেই। নিটোল দুটি বুক—নিশ্বাসের ছন্দে ছন্দে দুলে দুলে উঠছে। ছেলে নয় তবে, মেয়ে—হয়ত আঠুনেরই মেয়ে। কিন্তু পুরুষের কাছে এভাবে শুয়ে পড়তে একটু দ্বিধা করলো না মেয়েটি। কথাটা বলেই অযৌক্তিকতাটা মনে পড়ে যায় সীমাচলমের। দারিদ্র্যের কাছে আর কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না—উঠে না কোন দিন। বাপের চিকিৎসা আর পথ্য—এর চেয়ে বড়ো প্রশ্ন হয়ত জাগেনি মেয়েটির মনে।

অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে সীমাচলম। সুন্দরী কিশোরী—ওর দেহের যৌবন সম্বন্ধে আজও বুঝি ও অচেতন। রক্তে আবার নেশা লাগে সীমাচলমের—বহুদিনের ঘুমন্ত রক্তে আর স্নায়ুতে কিসের যেন দোলা। এই তো চেয়ে-ছিলো ও। পৃথিবীর একান্তে ছোট নীড় আর এমনি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক কিশোরী।

ঘুমের ঘোরে আবার এপাশ ফেরে মেয়েটি। একটি হাতে জড়িয়ে ধরে সীমাচলমের দেহ। এবারে আর তাকে সরিয়ে দেয় না সীমাচলম। দুটি হাতে নিবিড় আলিঙ্গনে টেনে আনে তাকে নিজের বুকের কাছে। একটু যেন চমকে ওঠে মেয়েটি, কিন্তু ঘুম ভাঙে না তার।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে সীমাচলমের। বরফ পড়া অনেকটা কম। গাছে পাতায় রোদের অল্প আভাস। মেয়েটি পাশে নেই। বাইরে গিয়েছে বোধ হয়—হাত মুখ মুছে নেয় সীমাচলম। মাথার কাছে চায়ের কেৎলী। চা তৈরী করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মেয়েটির জন্য। কোথায় গেলো মেয়েটি। ভোরে উঠেই আফিংয়ের খদ্দেরের সন্ধানে বেরিয়েছে বুঝি।

কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে সীমাচলম আর বোধ হয় ফিরবে না মেয়েটি। কেন যে ফিরবে না সেটাও যেন কতকটা আন্দাজ করলো সে। রাত্রে জেগেছিলো নাকি মেয়েটি। হয়ত বুঝতে পেরেছে তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গিয়েছে। দিনের আলোয় মুখ তাই সে দেখাতে চায়নি। তার চেয়েও বড়ো কথা—সীমাচলমের সমস্ত উচ্ছ্বাস আর আলিঙ্গনের মধ্যে দিয়ে কামনার উলঙ্গ রূপটাও হয়ত ধরা পড়ে গিয়েছে তার কাছে। বুঝেছে সে তার নারীত্বের পক্ষে এ আশ্রয় নিরাপদ নয়।

ভেবে যেন কূলকিনারা পায় না সীমাচলম। কিন্তু আঠুনের মেয়ে সত্যিই আর ফিরে আসে না।

অনেকদিন পর্যন্ত কোন খবর নেই। আঠুনের চিঠি তো নেই, মাপানের কারুরও কোন সংবাদ পায় না সীমাচলম। হাতের টাকা প্রায় ফুরিয়ে আসছে। এবার সত্যিই ভাবনায় পড়ে গেলো সে।

একদিন ভোরে চা নিয়ে বা মঙ সাহেবের চাকর আর আসলো না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সীমাচলম তারপর নিজেই বেরিয়ে পড়লো বাইরে। পাহাড় থেকে নেমে হাটের কাছ বরাবর যেতে হয়ত দু'একটা পাহাড়ী ছাগলওয়ালাদের সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে। এই শীতে গরম চা কিংবা দুধ কিছু একটা না খেলে জমে যাবে সে ঠাণ্ডায়।

পাহাড়ের নিচে নামবার মুখে দেখা হ'য়ে যায় বা মঙের চাকরের সঙ্গে।

ঃ সায়েব আপনাকে ডাকছেন একবার। বিশেষ জরুরী।

একটু আশ্চর্য হয় সীমাচলম। মাস চারেক সে রয়েছে এখানে, কিন্তু এ পর্যন্ত ডেকে তার খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি বা মঙ সায়েব। অবশ্য আতিথেয়তার কোন ত্রুটিই তাঁর হয়নি। কিন্তু বিদেশ বিভূঁইয়ে পড়ে আছে একটা ভিন দেশের লোক—ডেকে একটু খোঁজখবর নেওয়ার মতও শিষ্টতা কি ছিল না তাঁর?

ঃ আমাকে ডাকছেন, বেশ তো যাচ্ছি আমি চলো। কি ব্যাপার বলো তো—এতদিন পরে

তোমার মনিবের যে খেয়াল হ'লো আমার কথা।

ঃ আজ্ঞে তা তো কিছু জানি না। আজ সকালে উঠেই বললেন, ওখানে চা নিয়ে যাবার আজ আর দরকার নেই। একটু পরে ডেকে নিয়ে এসো তুমি ও'কে—এখানেই চা খাবেন উনি।

কথা আর বাড়ায় না সীমাচলম। লোকটির পিছনে পিছনে চলতে শুরু করে।

নিচের প্রকাণ্ড হলঘরটায় সীমাচলমকে বসিয়ে উপরে খবর দিতে যায় চাকরটি।

প্রকাণ্ড কাঠের গোল টেবিল—ইতস্ততঃ দু'একটা কাঠের চেয়ার ছড়ানো। সামনের দেয়ালে মান্দালয় দুর্গের প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো ছবি আর এক পাশে বর্মার শেষ রাজা থিবর আবক্ষ প্রতিমূর্তি।

শেষ স্বাধীন রাজা এই দেশের—চেয়ে চেয়ে দেখে সীমাচলম এর হাত থেকেই বুঝি শাসন-ভার কেড়ে নিয়েছিলো ইংরাজেরা। এর রাণী পৃথিবী বিখ্যাত সুন্দরী সুপিয়ালার কথাও শুনেছে সে অনেকবার। রাণী বুঝি বেঁচে আছে এখনো!

পায়ের আওয়াজে মুখ ফেরায় সীমাচলম। ভারী একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঘরে ঢুকছে বা মঙ। গম্ভীর প্রকৃতির লোক। চুরুটের ধোঁয়ায় মুখের সবটা দেখা পড়ছে না।

টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলে ঃ থিবর ছবিটা আমার নয়, মামাই রেখে গেছে এখানে।

কথাটা ভালো বুঝতে পারে না সীমাচলম। ঘরে থিবর ছবিটাকেও স্বীকার করতে চায় না বা মঙ। অন্য লোকের জিনিস ওটা—নয়ত বর্মার স্বাধীন নৃপতির প্রতিকৃতি রাখবার মত গর্হিত কাজ তার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়।

এ কথার কোন উত্তর দেয় না সীমাচলম। বা মঙের চেয়ারের কাছে এসে বলেঃ আপনি ডেকেছেন আমায়।

ঃ বসুন, চা খেতে খেতে কথা হবে।

কথার সংগে সংগেই চা নিয়ে ঘরে ঢোকে বা মঙের চাকর। চা খেতে খেতে কথা শুরু করে বা মঙ।

ঃ বর্মায় আপনার জানা শোনা কেউ আছে কিনা।

প্রশ্নের ধরণে একটু চমকে ওঠে সীমাচলম। তারপর মাথা নেড়ে বলে,

ঃ না, তেমন জানা শোনা কেউ নেই।

ঃ তবে কার ভরসায় এসেছিলেন এদেশে।

উত্তর দেয় না সীমাচলম।

ঃ এসব কাজে যখন নেমেছেন, সব সময় আস্তানা ঠিক করে রাখবেন একটা। বিপদের সময় দাঁড়াবেন কোথায় গিয়ে।

ঃ ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা-গুলো। বিপদ কিছু হ'য়েছে নাকি কোথাও।

ঃ বিপদ বৈকি। আঠুন ধরা পড়েছে আরাকানে। মং শানকেও ধরেছে পুলিশে। আপনার এখানেও শীগ্গির হানা দিলে আশ্চর্য হব না।

ঃ উপায়—রীতিমত ঘেমে ওঠে সীমাচলম।

ঃ সেইজন্যই তো আপনাকে ডাকা। এখান থেকে সরে পড়ুন কোথাও। কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকুন, তারপর ভালো ছেলের মতন জীবনযাপন করুন। এসব হাংগামা কি পোষায়?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সীমাচলম, তারপর আস্তে আস্তে বলে,

ঃ কোথায় যাই বলুন তো।

ঃ আপনিই বলতে পারবেন ভালো। তবে এখন রেংগুনের দিকে না যাওয়াই ভালো।

ঃ আর তো বিশেষ চেনাশোনা আমার নেই কোথাও।

ঃ আপনি এদেশে কেন এসেছিলেন ঃ খুব তীক্ষ্ণ গলার স্বর বা মঙের।

ঃ চাকরীর চেষ্টায়।

ঃ চাকরী এখন করতে রাজী আপনি।

ঃ নিশ্চয়, আপনি জানেন না ঘটনাচক্রে আমি এ দলে এসে জুটেছি। এসব ভালো লাগে না আমার। আপনি আমার গতি করুন একটা ঃ খুব উত্তেজিত মনে হয় সীমাচলমকে। পুলিশের কথায় সত্যিই ও বেশ ভয় পেয়ে গেছে বলে মনে হয়।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। ঘরের মধ্যে কোথাও ঘড়ির পেণ্ডুলাম একটা দুলছে তারই শব্দ আসছে ভেসে।

চুরুটে অনেকগুলো টান দিয়ে আস্তে আস্তে বলে বা মঙ।

ঃ আপনি আজই চলে যান এখান থেকে। হোকপান থেকে হেহোয় গিয়ে কাশিম ভাইয়ের সংগে দেখা করুন। আমি চিঠিও দিয়ে দেবো একটা। ভদ্রলোকের কাঠের বিরাট ব্যবসা, একসময় আমার বাবার কাছ থেকে যথেষ্ট উপকার পেয়েছিলো, সেকথা যদি ভুলে না গিয়ে থাকে তো আপনার একটা কিছু হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পায় না সীমাচলম। দাঁড়িয়ে উঠে দু হাতে জাপটে ধরে বা মঙের হাত ঃ আপনি যে কি উপকার করলেন আমার তা বলবার নয়। আমি আজই চলে যাবো এখান থেকে ঃ কথাটা বলেই একটু যেন চিন্তিত হ'য়ে পড়ে সীমাচলম। বা মঙের দিকে চেয়ে কি যেন একটা বলবার চেষ্টা করে, তারপর ব'সে পড়ে চেয়ারে।

ঃ একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি এখুনি। ঘরের মধ্যে ঢুকেই কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসে বা মঙ।

কম্বলের ভিতর থেকে হাতটা বের করে রাখে টেবিলের সামনে। হাতে নোটের তাড়া। নোটগুলো এগিয়ে দেয় সীমাচলমের দিকে ঃ নিন, রেখে দিন এগুলো আপনার কাছে। পথের রাহা খরচ আর যতদিন একটা কিছু উপায় না হয় এতেই চালিয়ে নেবেন কোনরকমে। বাবার দেনা শোধ করার জন্য যা রেখেছিলাম, তা থেকেই দিলুম আপনাকে এনে। হিসেব করেছিলুম সামনের বছরের মধ্যেই শোধ করতে পারবো সমস্তটা, কিন্তু ভুল হ'য়ে গেলো হিসেবে। আরো একটা বছর লাগবে বোধ হয়।

চোখ দুটো ছল ছল ক'রে ওঠে সীমাচলমের। চোখ তুলে বা মঙের দিকে চাইবার সাহসও বুঝি ওর হয় না। হাতের মুঠোর মধ্যে কেঁপে ওঠে নোটের তাড়াটা। আমতা আমতা করে বলে ঃ এতখানি আপনি করলেন আমার জন্য, কি বলে ধন্যবাদ দেবো আপনাকে। আপনার কথা কোনদিন ভুলবো না।

ঃ আজ্ঞে, ওই দয়াটি করবেন না অনুগ্রহ করে। মনে রেখে চিঠি পত্র আর দেবেন না যেন, কিংবা ঋণ শোধ করবার ইচ্ছায় ডায়েরীতে নাম ধাম টুকে রাখবেন না। শেষকালে আপনার সংগে আমাকেও টানাটানি করবে পুলিশে। সব কথা দয়া করে ভুলে যাবেন, মশাই যান। আমাকে বাঁচতে হবে, বাপের দেনা শোধ করে যেতে হবে। ওসব ঝক্কি সামলাতে পারবো না

আশ্চর্য হ'য়ে যায় সীমাচলম। এতখানি প্রাণ কোথায় লুকানো ছিল এতদিন। অজানা অপরিচিত একজনের হাতে জীবনের সমস্ত সম্বল তুলে দেওয়ার মত নিঃস্বার্থ ত্যাগের কোথায় তুলনা।

চৌকাঠ পার হ'য়ে নেমে আসে সীমাচলম। বা মঙ আসে সংগে সংগে। ফটকের কাছে এসে দাঁড়ায় সীমাচলম।

ঃ আজ সন্ধ্যায় আমি রওনা হবো। হয়ত কোনদিন আর দেখা হবে না আপনার সংগে। আপনি যা করলেন আমার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তাকে ছোট করবো না।

ঃ কি আর করেছি মশাই—একধারে বাপের দেনা আর একদিকে মামার দেনা এই শোধ করছি সারা জীবন।

ঃ মামার দেনা।

ঃ হ্যাঁ, তাই একরকম বই কি। মার ভাই মামা, তাকে তো আর উপেক্ষা করতে পারি না। তার পাল্লায় পড়েই তো আপনাদের এই অবস্থা, কাজেই আপনাদের সাহায্য করা মানেই তো তাঁর দেনা শোধ করা।

ফটক পার হ'য়ে পথে পা দিতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। বা মঙ আবার আসছে পিছনে।

ঃ দিন হাতটা এগিয়ে, আবার কবে দেখা হবে ঠিক কি। সীমাচলমের হাতটা বুকের ওপর চেপে ধরেই ছেড়ে দেয় বা মঙ। তারপর প্রায় দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সন্ধ্যার সংগে সংগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সীমাচলম। বা মঙের চাকরটি ঠিক সময়েই হাজির থাকে। খুব সুবিধা যে বরফ পড়াটা অনেকটা কমে এসেছিলো। নয়ত

পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওই অন্ধকারে চলাই দুষ্কর হ'তো। পাহাড় থেকে নামতেই পিছনে হাত দিয়ে দেখালো চাকরটি। পিছনে চেয়ে দেখলো সীমাচলম। সারা আকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে। আগুন লেগেছে বুঝি কোথাও।

ঃ হ্যাঁ, আপনার থাকবার ঘরটা বা মগু সায়েবের হুকুমে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোন চিহ্ন রাখার প্রয়োজন নেই—একথাই উনি বলেছেন।

পাহাড়ের তলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সীমাচলম।

বিরাট কারবার কাশিম ভাইয়ের। সালুইন নদীর ধার ঘেঁষে মস্ত বড়ো কাঠের কারখানা। গোটা ছয়েক হাতি শুঁড়ে করে বয়ে নিয়ে আসে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠগুলো তারপর ভাসিয়ে দেয় সালুইনের জলে। কারখানার একটু দূরেই কাশিম ভাইয়ের বাংলো।

বাংলোয় ছিলেন কাশিমভাই। সীমাচলম চিঠিটা দ্বারোয়ানের কাছে দিয়ে রাস্তার ধারেই বসে পড়ে। তিন দিন আর তিন রাত্রির পরিশ্রমে অবসন্ন বোধ হচ্ছে, সমস্ত শরীরটা আর চোখের পাতাদুটো নিজের থেকেই জুড়ে আসছে যেন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে ফিরে আসে দ্বারোয়ান। সীমাচলমকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের একটা ঘরে বসিয়ে দিয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। হঠাৎ বাইরে সম্মিলিত কলরব শিশুকণ্ঠের। দরজার দিকে একটু এগিয়েই ও থেমে পড়ে, খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকেন কাশিমভাই। টকটকে ফর্সা রংয়ের লম্বা চওড়া হৃষ্টপুষ্ট চেহারা—এক মুখ হাসি। দুটি হাতে দুটি ছোট ছেলের হাত ধরা আর কোলে আর একটি।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম তারপর মুসলমানী কায়দায় সেলাম ক'রে বলেঃ আদাব।

ঃ আদাব, আদাব। বসুন।

সীমাচলম বসবার আগেই একটা ইজি-চেয়ারে থপাস করে বসে পড়েন তিনি। একটু পরিশ্রমেই হাপাতে শুরু করেন। ছেলেমেয়ে-গুলি ইজিচেয়ার ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঃ আর বলেন কেন। দু'দুটি পরিবার সরে পড়লো মশাই, একেকটি গুটিকয়েক পুষ্যি ঘাড়ে চাপিয়ে আমার। এই দেখুন না সামনে তিনটি আর দুটি আছেন ওপরে। জ্বালাতন মশাই জ্বালাতন। থাকগে, আপনার কথাই বলুন এবার। বা মগুর চিঠিও পড়লুম কিন্তু কারখানার কাজের চেয়ে বাড়ির কাজ করে আমায় উদ্ধার করুন মশাই।

ঃ বাড়ির কাজ?

ঃ হ্যাঁ, এই পুষ্যিকটির লেখাপড়ার ভার নিন। আমায় রেহাই দিন। যতটা সোজা ভাবছেন ততটা সোজা নয়। এর আগে দুটি মাস্টার ঘায়েল হ'য়ে সরে পড়েছে—এসব ডাকাত ছেলেপিলে মশাই, প্রাণের তোয়াক্কা করে না।

এইবার হেসে ফেলে সীমাচলম। নাবালক ছেলেগুলোর গুণ্ডামীর বহর শুনে নয়, সে হাসে কাশিমভাইয়ের বলার ভঙ্গীতে।

ঃ বেশ তো। এদের পড়াবার ভারই দিন আমায়। আমি রাজী।

ঃ এখুনি, এখুনি। আজ রাতটা থাক মশাই, কাল সকাল থেকেই শুরু করবেন পড়ানো। কিন্তু মাইনে পত্তরের কথাটা বলুন। কি হ'লে চলবে আপনার।

ঃ ওসব ঠিক আছে, আপনি যা দেবেন তাইঃ টাকার প্রসঙ্গে একটু যেন বিব্রত হ'য়ে পড়ে সীমাচল। দরকষাকষি আসে না ওর ধাতে।

ঃ থাক, সে পড়ে ঠিক করা যাবে। আপনার থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আজ ব্যস্ত রয়েছি একটু। আলাপ করবো এরপর একদিন ভালো করে। উঠে পড়েন কাশিমভাই।

ম্যানেজারের ভাইয়ের কাছে সব কথা জানতে পারে সীমাচলম। ম্যানেজার মিঃ নায়ার—কর্মঠ ব্যক্তি, কাশিমভাইয়ের ডান হাত। তাঁর ভাই মিঃ শঙ্করন নায়ার ভবঘুরে লোক—দাদার পরগাছা—বন্দুক ঘাড়ে করে শিকার আর চাঁদিনী রাতে শাম্পান বেয়ে ওপারের বস্তিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—এই ক'রেই কাটায় সময়টা। সীমাচলমের সঙ্গে প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই পরিচয় হ'য়ে যায় আর আরো দু' একদিনের মধ্যেই সে পরিচয় নামে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতায়।

তার কাছেই কাশিমভাইয়ের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম পক্ষের একটিমাত্র মেয়ে অপরূপ সুন্দরী—একবার শুধু কোন 'পে য়েতে' দেখেছিলো শঙ্করণ, সেই থেকে সমস্ত দুনিয়া বিস্বাদ হ'য়ে গেছে শঙ্করনের কাছে। মেয়েটি নাকি অত্যন্ত লাজুক। তারপরের বারটি সন্তান দ্বিতীয় পক্ষের বর্মী রমনীর গর্ভের। নাক সিঁটকায় শঙ্করন, বলে শুয়োরের পাল—সর্বদাই ঘোৎ ঘোৎ করছে।

প্রায়ই ছলছুতো করে আসে শঙ্করণ সীমাচলমের কাছে, পড়াবার সময় চুপটি ক'রে বসে থাকে এক কোণে আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখে ওপরের সিঁড়ির দিকে চেয়ে। কিন্তু কোনদিন ছায়াও দেখা যায় না মেয়েটির। সীমাচলমও কোনদিন দেখেনি মেয়েটিকে এমনকি তার গলার আওয়াজও সে শোনেনি।

মেয়েটির নাম বুঝি ফাতিমা। অনেকরকম ভাবে তার কথা জিজ্ঞাসা করে শঙ্করণ। ছোট ছেলেটিকে ডেকে বলে মাঝে মাঝেঃ আচ্ছা তোমার দিদি দিনরাত ঘরের মধ্যে বসে বসে কি করে বলোতো?

কি আবার করবে?

পড়ে, কি পড়ে?

কেন বাবা কতো মোটা মোটা বই আনিয়ে দেন দিদির জন্য, কি সুন্দর সুন্দর সব ছবির বই। দিদি খুব পড়তে ভালোবাসে।

বিস্মিত হয় শঙ্করণ। সীমাচলমেরও আশ্চর্য লাগে। নিভৃতে একান্তে ব'সে কি এত পড়ে মেয়েটি।

রীতিমত আক্ষেপ করে শঙ্করণ ঃ এ আবার কি শখরে বাবা, এই বয়সে খাও, দাও, স্ফূর্তি করো, তা নয় বই কোলে দিনরাত এ আবার কি ঢং। বুঝলে সীমাচলম, মেয়েটির নির্ঘাৎ মাথা খারাপ আছে, নইলে এই বয়সে এমন হয় কখনো?

কোন কথা বলে না সীমাচলম। অন্নদাতার মেয়ের সম্বন্ধে অহেতুক কৌতূহলে ওর কাজ নেই। মাথার ওপরে আচ্ছাদন আর একমুষ্টি অন্ন হারানো যে কি ব্যাপার সেটা হয়ত সযত্ন-লালিত শঙ্করণ বুঝবে না, কিন্তু হাড়ে হাড়ে বোঝে সীমাচলম। পথকে অবলম্বন করতে আর রাজী নয় সে।

ছেলেগুলোর সম্বন্ধে যতটা ভয় দেখিয়ে-ছিলেন কাশিমভাই, আসলে অতটা দুর্দান্ত কিন্তু নয় তারা। ভালবেসে, বুঝিয়ে কিছু বললে তারা খুবই শোনে। ভালোই লাগে সীমাচলমের।

পড়ার ঘরে হঠাৎ একদিন এসে ঢোকেন কাশিমভাই। ঢুকেই কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বলেন, পড়ার সময় বিরক্ত করতে আসলুম আপনাকে।

সে কি কথা—চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম।

ঃ দেখুন ব্যবসা সম্পর্কে আমাকে দিন কয়েকের জন্য রেঙ্গুনে যেতে হবে। ম্যানেজার রইলেন তিনি প্রত্যেকদিন এসে খোঁজ নেবেন এদের। আপনিও দয়া করে একটা দিন দেখবেন এদের। অসুখ-বিসুখ হলে সোজা সিভিল সার্জনকে ফোন করে দেবেন, তাঁকে আমার বলাও আছে। টাকাপত্তর যা দরকার ম্যানেজারের কাছেই পাবেন।

ঃ এসব কথা বলে আমায় কেন লজ্জা দিচ্ছেন। আপনার অনুপস্থিতিতে কোন অসুবিধা হবে না এদের। আমি এদের আমার ছোট ভাই বোনের মতন দেখি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ঃ বেশ বেশ ভারি খুসী হলুম আপনার কথা শুনে। আমার বড়ো মেয়েও বলছিলো যে, ছেলেমেয়েগুলো আপনাকে খুব ভালবাসে। খেতে শুতে বসতে কেবল আপনার গল্প।

কেমন যেন মনে হয়, সীমাচলমের। বড়ো মেয়েটি বলে নাকি এসব কথা? বলে মাস্টারটিকে ভারি ভালোবাসে তার ভাইবোনেরা—তার কথা বলে আর তার গল্প করে। এতদিন বড়ো-মেয়েটির সম্বন্ধে একটা অশরীরী অস্তিত্বের কল্পনা করেছিলো সীমাচলম—প্রাণহীন-নিশ্চেতন, কিন্তু রক্ত মাংসের রূপ নিয়ে যেন সে দাঁড়ায় আজ তার সামনে। বড়ো মেয়েটি সীমাচলমের সম্বন্ধে আলোচনা করে তার বাপের সঙ্গে। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে হয়ত ভাবে

তার ভাইবোনদের পড়াশুনার কথা—আর—হয়ত—মাথাটা ঝেঁকে চিন্তার হাত এড়ায় সীমাচলম।

অসল খবর নিয়ে আসে শঙ্করণ।

: ব্যবসায়ের কথাটা সব ভুয়ো বুঝলে ভায়া, আসল ব্যাপারটি কি জানো?

: কি?

হুঁ, সাদি গো সাদি। বুড়োর তৃতীয় পক্ষ আসছে এবার। বিছানা খালি যবে নাকি?

: সত্যি নাকি—ভারি আশ্চর্য লাগে সীমাচলমের।

: হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার দাদাকে সব বলে গেছে। রেঙ্গুনেই হচ্ছে বিয়ে। অল্পবয়সী জেরবাদী ছুঁড়ি বুঝি আসছে এবার। আরে ভাই, টাকার জোর থাকলে সবই হয়।

মুস্কিলে পড়ে যায় সীমাচলম। কথা না বাড়ানোই ভালো! কিন্তু নতুন বৌ ঘরে আনবে না কি কাশিমভাই জীবনের এই সায়াহ্নে। ছেলেমেয়েদের যত্ন হবে কি আগের মতো? কথাগুলো মনে হতেই হাসি পায় সীমাচলমের। ওর এত মাথাব্যাথার দরকার কি? মাইনে করা গৃহশিক্ষক ও, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ভারটুকু নিয়েই ওর সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় কি।

এত ভাবনায় ওর কি প্রয়োজন।

কিন্তু সত্যিই ভাবনার মধ্যে পড়ে সীমাচলম।

দুপুরে বেলা খেয়ে দেয়ে হাল্কা একটা নভেল হাতে নিয়ে সবে শোবার আয়োজন করছে সে, এমন সময় ইব্রাহিম এসে দাঁড়ালো দরজায়। কাশিমভাইয়ের সবচেয়ে ছোট ছেলে ইব্রাহিম—বছর ছয়েক বয়স।

: মাস্টারমশাই।

কি ব্যাপার? ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ে সীমাচলম। কি আবার হলো হঠাৎ? অসুখ-বিসুখ নাকি কারুর।

ভেতরে এসো ইব্রাহিম। কি হ'য়েছে বলোতো। পায়ে পায়ে ভিতরে এসে ঢোকে ইব্রাহিম। সীমাচলমের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় আর হাত বাড়ায় বইটার দিকে : ওটা কি বই মাস্টারমশাই।

বলছি, কিন্তু কি বলিতে এসেছিলে বলোতো।

দিদি আপনাকে ওপরে ডাকছে একবার।

আচমকা কথাটা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সীমাচলম। ইব্রাহিমকে আরো কাছে টেনে জিজ্ঞাসা করে।

কে ডাকছে আমায়?

দিদি ডাকছে। দিদি আমায় বললে, খোকা তোমার মাস্টারমশাই ঘুমিয়েছেন কিনা দেখে এসোতো। না যদি ঘুমিয়ে থাকেন, তো বলবে বিশেষ প্রয়োজনে আমি একবার ডেকেছি।

বিশেষ প্রয়োজন? কি এমন প্রয়োজন থাকতে পারে ওর সংগে। ডজন খানেক বেয়ারা চাকরানী রয়েছে, তা'ছাড়া ম্যানেজার মিঃ নায়ার রোজ-খবর নিয়ে যাচ্ছেন এসে? কিন্তু ততক্ষণে হাত ধরে টানতে শুরু করেছে ইব্রাহিম : চলুন, চলুন। দেরি হ'লে আবার বকবে দিদি আমায়।

সন্ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে সীমাচলম। দুপুরবেলা থমথমে একটা ভাব। সব ঘরগুলো নির্জন। সামনে রোদের আলোয় চিক চিক করছে সালুইনের জল।

প্রকাণ্ড বসবার ঘর। অনেকগুলো মেহগনি কাঠের টেবিল আর চেয়ার। একটা চেয়ারে সীমাচলমকে বসতে বলে ইব্রাহিম।

পিছনে একটা খস খস আওয়াজ শুনে ঘুরে বসে সীমাচলম। সামনে পাতলা একটা চিক ফেলা। চিকের ওপারে অপূর্ব সুন্দরী এক কিশোরী। আবছা দেখা যায় শরীরটা, কিন্তু অস্পষ্টতার মধ্যেও কেমন যেন নিটোল মাধুর্যের আভাস। চিকের তলার দিকে চেয়েই আবিষ্টের মত চেয়ে থাকে সীমাচলম। চমৎকার দুটি পা। মনে হয় যেন শ্বেতপাথরের তৈরী। অনেক আগে ওদের গাঁয়ে কুমোরের তৈরী মহাসরস্বতীর দুটি পায়ের কথা মনে পড়ে সীমাচলমের। কিন্তু সে পা'দুটিও বুঝি এত সুন্দর নয়।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য ঠিক দুপুরবেলা বিরক্ত করলাম আপনাকে।

পরিষ্কার গলার আওয়াজ! কিন্তু কি আভিজাত্য সে কণ্ঠস্বরে। চেয়ার ছেড়ে নিজের অজানিতে দাঁড়িয়ে ওঠে সীমাচলম।

আজ্ঞে, বিরক্ত আর কি! কি কথা জিজ্ঞাসা করবেন বলুন : অসম্ভব কাঁপছে সীমাচলমের গলার স্বর।

আপনি বসুন, বলছি।

চেয়ারে বসে পড়ে সীমাচলম। কি এমন কথা জিজ্ঞাসা করবে মেয়েটি?

বাবার খবর কি জানেন?

তিনি তো কাজে গেছেন রেঙ্গুনে। বোধ হয় দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

কি কাজে গেছেন জানেন কিছু আপনি?

আজ্ঞে না। বোধ হয় ব্যবসা সম্পর্কে কিছু হবে। ম্যানেজার সায়েবের জানবার কথা, ডেকে পাঠাবো তাঁকে?

না, দরকার নেই। তিনি জানলেও বলবেন না কিছু। কিন্তু সত্যি বলছেন কিছু জানেন না আপনি?

বিব্রত হ'য়ে পড়ে সীমাচলম। যেটুকু সে জানে, তা বলা চলে না কি এই কিশোরীর কাছে। আর তা ছাড়া কতটুকুই বা জানে সে। শঙ্করণ আয়ারের কাছে শোনা কথার উপর নির্ভর করে কিছু বলা চলে না কি মনিবের মেয়ের কাছে?

হাত দিয়ে চেয়ারের হাতলটা খুটতে খুটতে আমতা আমতা করে উত্তর দেয় সীমাচলম : সঠিক কিছুই জানিনা আমি। আপনি দয়া করে ম্যানেজার সায়েবের কাছেই খোঁজ নেবেন।

সশব্দ একটা দীর্ঘশ্বাস। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। অনেক বেদনা এ নিঃশ্বাসে। কি এত ব্যথা মেয়েটির।

আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না। মিছামিছি বিরক্ত করলাম আপনাকে।

না, না, এসব বলে আমায় লজ্জা দেবেন না। আমি তো আপনাদেরই হুকুমের চাকর।

সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় সীমাচলম।

শুনুন।

কিছুটা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে সে। আবার কেন ডাকছে মেয়েটি।

আমি যে এসব কথা জিজ্ঞাসা করেছি আপনাকে, একথা বলবেন না যেন কাউকে।

আজ্ঞে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে সীমাচলম। নেমে এসে নিজের ঘরে ঢুকেই ও চমকে ওঠে।

তক্তপোষের ওপরে ব'সে আছে শঙ্করণ। একখানা বালিশ কোলে নিয়ে কি একটা গান ভাঁজছে গুন গুন করে।

সীমাচলম ঘরে ঢুকতেই ভুরু দুটো নাচাতে শুরু করে শঙ্করণ : এসো বন্ধু, আজ বড্ড ধরা পড়ে গেছো। তোমার এ গোপন অভিসার সফল হোক। কিন্তু অভাগা শঙ্করণই বাদ।

শঙ্করণকে ভারি ভয় করে সীমাচলম। কোন কথা আটকায় না ওর মুখে; আর তিলকে তাল করতে ওর জুড়ি নেই।

কি ব্যাপার, দুপুর বেলা কি মনে করে—অন্য কথা বলার চেষ্টা করে সীমাচলম।

কিছুই মনে করে নয় ভাই। কিন্তু কতদিন চলছে এ ব্যাপারটা? কাশিমভাই শহরে যাবার পর থেকে বুঝি?

কি যে বলো যা তা, তার ঠিক নেই।

তা তো হবেই ভাই। কিন্তু এই নির্জন দ্বিপ্রহরে—হঠাৎ ওপরে যাওয়ার কি এমন দরকার পড়লো ভাই। যাক্‌, ফতিমা বিবির পছন্দ আছে।

না, তোমার সংগে কথা বলে লাভ নেই। যা মুখে আসে, তাই বলো তুমি। ইব্রাহিমের এয়ার-গানটা তোলা ছিল তাকে, সেইটা পেড়ে দেবার জন্য গিয়েছিলাম ওপরে।

ওহো তাই নাকি। খাক পেড়ে দিয়েছো তো এয়ার-গানটা? ঘায়েল হয় নি কেউ?

মুচকে মুচকে হাসে শংকরণ। দাঁড়িয়ে ওঠে বলে—এবার চলি ভাই। একটা কথা বলতে দাদা পাঠিয়ে দিলেন তোমার কাছে। কালই ফিরে আসছেন কর্তা বিকেলের গাড়িতে। চাকরবাকরদের ঘরদোর ঝেড়ে-মুছে রাখতে ব'লো আর সকালে দাদা এসে বাড়ি সাজানো সম্বন্ধে আলাপ করবেন তোমার সংগে। বাড়ি সাজাতে হবে বৈকি। জোড়ে ফিরছেন যে কর্তা। সংগে তৃতীয় সংস্করণ।

সেদিন ভোর থেকেই হৈচৈ শুরু হয় বাড়িতে। বাগানে গাছে গাছে বাতির বন্দোবস্ত করা হয়। গেটের দুপাশে দুটি কাঁচের পদ্মর মধ্যে জ্বলবে লাল রংয়ের আলো। আর মোটরটি নানা রংয়ের ফুল দিয়ে সাজানো হয় আগাগোড়া। স্টেসনে যাবে মোটর আর এই মোটরেই ফিরবেন কাশিমভাই বৌ নিয়ে।

সকাল থেকে কোন কাজে হাত দেয় নি সীমাচলম। হাত দেবার মত কোন কাজও অবশ্য ছিল না; কিন্তু কেমন যেন মনে হয় তার। আবার বিয়ে করতে গেলেন কেন কাশিম ভাই। এই সব ছোট ছেলেমেয়েগুলোর কি হবে অবস্থা। এর চেয়েও বড় আর এক প্রশ্ন জাগে সীমাচলমের মনে। কি বলবে ফাতিমা? ওর নিশ্চয় ধারণা সবই জানে সীমাচলম,—কিন্তু এড়িয়ে গেছে তাকে।

বিশ্রী লাগে সীমাচলমের যখন বিকালে ভাল পোষাক পরে ইব্রাহিম এসে হাত ধরে সীমা-চলমের।

চলুন মাস্টার মশাই—মাকে নিয়ে আসি।

তোমার মা আসবেন বুঝি আজ।

হাঁ, ও মা জানেন না বুঝি আপনি। সবাই তো জানে। ম্যানেজার কাকা বললো মাকে আমরা আনতে যাবো স্টেসন থেকে।

কোন কথা বলে না সীমাচলম। ইব্রাহিমের হাতটা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

জানেন মাস্টারমশাই, মাকে কতদিন দেখি নি। অনেকদিন আগে আমি ঘুমুচ্ছিলাম বিছানায়, আর চুপি চুপি মা পালিয়ে গিয়েছিল কোথায়। দিদি বলে, মা নাকি অনেকদূরে বেড়াতে গেছে। আজ মাকে এমন বকবো আমি।

ইব্রাহিমের হাতটা চেপে ধরে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে সীমাচলম। অবোধ শিশু, ওর মাকে আনতে যাবে স্টেসন থেকে?

সিগন্যাল ডাউন হবার সংগে সংগেই চঞ্চল হয়ে ওঠে সবাই। ম্যানেজার সায়েব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এগিয়ে আসেন প্ল্যাটফর্মের দিকে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে পিছনে রইল সীমাচলম আর শংকরণ। কারখানার তরফ থেকে কুলিরা প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া এনেছে ব'য়ে আর স্টেসনের বাইরে ব্যাণ্ডপার্টির বিরাম নেই বাজনার।

চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সীমাচলম—সকলেই এসেছে স্টেসনে—কিন্তু কই ফাতিমা তো আসে নি।

কথাটা শঙ্করণকে বলতেই হেসে ওঠে শঙ্করণ। ছাগলের নজর শাকের ক্ষেতে। বাড়িতেই আছে বোধ হয়—কাশিমভাইয়ের বউকে বরণ করে তোলবার লোক চাই তো একজন।

স্টেসনে গাড়ি ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই খুব জোরে শুরু হয় ব্যাণ্ডের বাজনা। ম্যানেজার সায়েব হাত দিয়ে কোটটা টেনে নিয়ে কেতা-দুরস্ত হয়ে দাঁড়ালেন স্ত্রীকে সঙ্গে করে।

ভীড় বিশেষ হয় না এ স্টেসনে। লোক যারা নামবার আগের জংসনেই নেমে গেছে সব। বলতে গেলে একরকম কাশিমভাইয়ের কারখানার জন্যই পত্তন হয়েছে স্টেসনটির।

কাশিমভাই নামলেন একমুখ হাসি নিয়ে। ম্যানেজারের স্ত্রী গাড়ির মধ্যে উঠে গিয়ে নব-বধূকে নামিয়ে নিয়ে আসে। আপাদমস্তক সিল্কের বোরখায় ঢাকা। মুখের সামনে ঝুলছে অনেকগুলো বেলফুলের মালা। হাতের চেটো দুটি মেহেদী পাতায় রাঙা। প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হলো। কাশিমভাই পকেট থেকে নোটের তাড়া বার করে দিলেন ম্যানেজার সায়েবের হাতে। তিনি আবার কুলিদের দিকে চেয়ে কি যেন বললেন চেঁচিয়ে। অসহ্য গোলমাল আর হৈ চৈ।

হাত দুটো তুলে ইঙ্গিতে বাজনা থামাতে বললেন কাশিমভাই। তারপর চেঁচিয়ে বললেন—ইব্রাহিম কই ইব্রাহিম।

ইব্রাহিমের হাত ধরে এগিয়ে আসে সীমাচলম। কাশিমভাই হাত বাড়িয়ে ইব্রাহিমের হাতটা ধরতে চাইলেন, কিন্তু ইব্রাহিম শক্ত করে ধরে থাকে সীমাচলমের হাত। কিছুতেই এগিয়ে যাবে না সে।

ব্যাপারটা বোঝে সীমাচলম। অভিমান হয়েছে তার। এতদিন পরে ফিরে এলো মা, একবার কি আদর করে ডাকতে নেই তাকে। আগেকার মতন কোলে করে গালে গাল দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে নেই। অভিমানে চোখদুটো ছল ছল করে আসে তার। দু'হাতে কাশিম ভাইয়ের হাতটা সরিয়ে দিয়ে শক্ত হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

মোটরে ওঠবার সময়ও আপত্তি জানায় ইব্রাহিম। অন্য ছেলেমেয়েরা ম্যানেজার সায়েবের মোটরে গিয়ে ওঠে কিন্তু মুস্কিলে পড়ে ইব্রাহিম। মাকে ছেড়ে অন্য মোটরেও যেতে ইচ্ছা নেই তার, অথচ মা না ডাকলে কেনই বা যেতে যাবে সে তার সংগে।

কাশিমভাই দু'একবার টানাটানি করে সীমাচলমের দিকে চেয়ে বললেন ঃ মাস্টার-মশাই, আপনিও আসুন ওকে নিয়ে, নয়ত ওকে মোটরে ওঠানো মুস্কিল দেখছি।

ইব্রাহিমকে নিয়ে সীমাচলম উঠে ড্রাইভারের পাশে। তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ইব্রাহিম। লাল হ'য়ে যাচ্ছে দুটি চোখ আর ফুলে উঠেছে গলার শিরগুলো।

মোটর চলতে শুরু করতেই বলেন কাশিমভাই ঃ শুনছো, বোরখা খুলে ফেলো। গরমে সিদ্ধ হ'য়ে যাবে যে।

উত্তরে চুড়ির আওয়াজ হ'লো একটু। বোধহয় বোরখাটা একটু খুললো মেয়েটি।

নদীর ধার দিয়ে মোটর যেতে আর একবার শোনা যায় কাশিমভাইয়ের গলা ঃ ওই যে ও ধারে মস্ত বড় কারখানা দেখছো, লম্বা একটা চিমনি ওইটেই আমার কারখানা। আজ কারখানা বন্ধ, অন্যদিন হ'লে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতো ওই চিমনী দিয়ে।

হাসি পায় সীমাচলমের। দাম্পত্য আলাপের নমুনায় হাসি পাবারই কথা। মেয়েটি কি ভাবছে কে জানে কাশিমভাইকে। বিরাট একটা কারখানার মালিক—এর চেয়ে আর কি পরিচয়ই বা থাকতে পারে ওর।

মেয়েটি কি যেন বলে ফিস ফিস করে। নিজের অজানিতেই চোখটা তোলে সীমাচলম। সামনের কাঁচের পিছনের সমস্ত কিছু প্রতি-ফলিত হয়েছে। ও অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে।

বেলফুলের মালাগুলো সরে গেছে একপাশে। বোরখাটা মুখ থেকে তোলা। এ'রাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল সুন্দর মুখখানি ঘিরে। এ মুখ ভুল হবার যো নেই সীমাচলমের। নিষ্পলক দৃষ্টিতে ও চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। হামিদা এলো বুঝি কাশিমভাইয়ের সংসারে। ওর মনিব কাশিমভাইয়ের নবতম সংগ্রহ ওরই হারাণো হামিদাবানু।

(ক্রমশঃ)

প্রাণ-পুরুষ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

বৈশাখ, করোনা ক্ষমা! জীবনের বন্ধ্যা অন্ধকারে
অমিত সূর্যের বীর্য হানো; আনো অকৃপণ অঙ্গীকারে
দয়িতার লজ্জা-ভাঙা প্রত্যাশার প্রখর সকাল।
শোননি কি হে আসন্ন, হে উদ্যত উদ্দাম-উত্তাল
কোমল-বিধুর চোখে কুমারী যে-কামনা জানালো!
তোমার অম্লান মন্ত্র উচ্চারণ করি বিপ্রমুখে
এসো তুমি, মৃত্তিকার এ-পতিম্বে, সান্নিধ্যের সুখে
হে কুমার! পৃথিবীর হে প্রেমিক ঋতু আনো আলো।

কোরক-উজ্জ্বল ক্ষণে আবর্তিত তমোপরস্তাৎ
জ্যোতির্ময় শান্তি আনো। কামনার উচ্ছল প্রপাত
তৃষ্ণার গভীরে তাই শান্ত করে দাও সংগোপন
রুদ্ধশ্বাস বক্ষে লীন পরিচিত বক্ষের স্পন্দন?

লীলায়-বিলাসে আনো মত্ততার উদার সান্ত্বনা
মুহূর্তের অঙ্কতলে একবিন্দু তপ্ত স্বর্ণকণা।

কাশ্মীর-প্রসঙ্গ

শ্রীযতীন্দ্র সেন

ভূ-**স্বর্গ** কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনা সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যে ভূখণ্ড এতদিন পার্বত্য প্রকৃতির শ্যাম স্নিগ্ধ ছায়া-সুনিবিড় ক্রোড়ে অজস্র ফলফুলে শোভিত এবং স্বচ্ছন্দবিহারী বিহগকুলের কলতানে মুখরিত হয়ে বিরাজ করছিল, আজ সেখানে শুরু হয়েছে জিঘাংসু পরস্বলোভী বর্বর আক্রমণকারীদের বিভীষিকাসঞ্চারী মধ্যযুগীয় ধ্বংস-অভিযান, হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ; কাশ্মীরের মনোরম উপত্যকা-ভূমির নানা স্থান ধূমকুণ্ডলী আর লেলিহান অগ্নিশিখায় সমাচ্ছন্ন। উৎপীড়িতের আর্তনাদে, বারুদ ও বিস্ফোরকের তীব্র গন্ধে প্রকৃতির লীলা-নিকেতন কাশ্মীরের বায়ুমণ্ডল ভারী হয়ে উঠেছে।

বিপন্ন কাশ্মীরের আহ্বানে, যারা মানবতার শত্রু, ভারতের স্বাধীনতার শত্রু ও শান্তি ব্যাঘাতকারী, তাদের বিরুদ্ধে ভারতকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে। কাশ্মীরের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের অত্যল্পকাল মধ্যেই ভারতীয় মুক্তি-ফৌজ বিমানযোগে কাশ্মীরের ভূমিতে অবতরণ করে শত্রুসৈন্য বিতাড়নে সাফল্যের সংগে অগ্রসর হচ্ছে। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের ত্রিশ মাইল দূরবর্তী শত্রুকবলিত বরামূলা ভারতীয় সৈন্য পুনরধিকার করে নিয়েছে। পলায়নপর শত্রুচমূ ভারতীয় সৈন্যের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে হতাহত বা বন্দী হচ্ছে। বর্বর আক্রমণকারীদের মধ্যযুগীয় অভিযান এবং এর পশ্চাদ্বর্তী হীন দুরভিসন্ধিপূর্ণ চক্রান্তজাল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

দুঃখের বিষয়, ভারতের বহু-প্রতীক্ষিত অপরিসীম ত্যাগ ও দুঃখ বরণের ফলে অর্জিত স্বাধীনতার প্রথম অধ্যায় রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও তজ্জনিত নানা সমস্যায় কলঙ্কিত ও বিড়ম্বিত হয়েও শেষ হল না—গূঢ়াচারী, বিদ্বেষসঞ্চারী রাজনীতিক আবর্তের ফলে ভারতকে রণক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

কাশ্মীরের ভৌগোলিক পরিচিতি

ভারতের শীর্ষদেশে মুকুটের মত ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর অবস্থিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাশ্মীরের অবস্থান-ক্ষেত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূখণ্ডের উত্তরে ও পূর্বে রুশিয়া, চীন ও তিব্বতের সীমারেখা এসে মিশেছে।

কাশ্মীরের উত্তরে পামির মালভূমি—যাকে 'বাম-ই-দুনিয়া', 'পৃথিবীর ছাদ' বা 'Roof of the World' বলা হয়। এই উত্তর সীমানায়ই কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর অপর পার্শ্বে গোবি মরুভূমি অবস্থিত। কাশ্মীরের দক্ষিণে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব, পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা পাঠানীস্থান এবং পূর্বে তিব্বত।
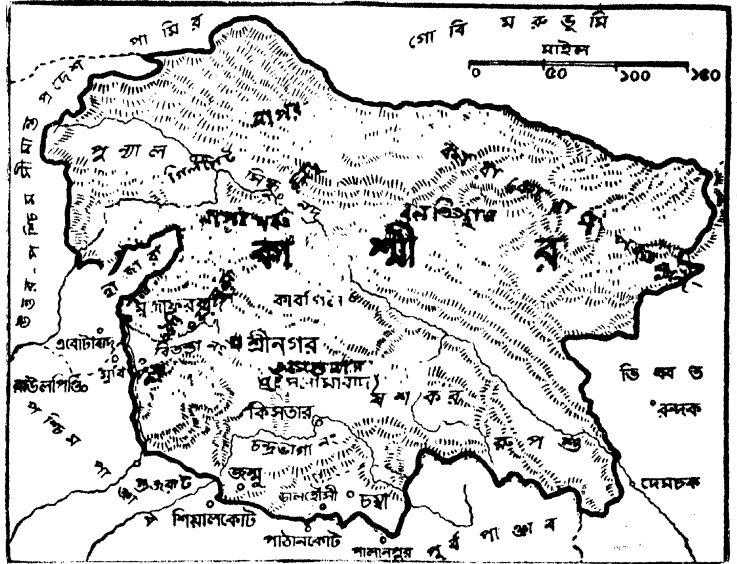
ভৌগোলিক হিসাবে এই পার্বত্য ভূখণ্ডটিকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) উত্তরভাগে তিব্বতীয় ও অর্ধ-তিব্বতীয় পার্বত্য ভূখণ্ড, যার মধ্যে চিত্রল, ইয়াসিন, পুনিয়াল, গিলগিট উপত্যকা, হুনজা, নাগর ও বলতিস্থান অবস্থিত। এই স্থানগুলি একত্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে না হলেও, সাধারণত দর্দিস্তান (Dardistan) নামে পরিচিত। (২) মধ্যভাগে ঝিলাম উপত্যকা। এখানে কাশ্মীরের বিশ্ববিশ্রুত মনোরম 'হ্যাপি ভ্যালি' অবস্থিত। (৩) দক্ষিণভাগে বসতিপূর্ণ অর্ধ-পার্বত্য ভূখণ্ড; এখানে জম্মুতে কাশ্মীরের মহারাজার শীতকালীন বাসভবন অবস্থিত।

আয়তন ও লোকসংখ্যা—৮৪,৪৭১ বর্গ মাইল পরিমাণফলবিশিষ্ট এই রাজ্যটিতে ১৯৪১ সালের লোক-গণনা অনুসারে ৪০,২১,৬১৬ জন লোকের বাস। লোক-সংখ্যার শতকরা ৭৪ জন মুসলমান এবং অবশিষ্ট ২৬ জন হিন্দু।

রাস্তাঘাট—মোটর চলাচলের উপযোগী একটি রাস্তা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ঝিলাম উপত্যকা দিয়ে গিয়েছে। এই রাস্তার নাম ঝিলাম-ভ্যালি রোড, দৈর্ঘ্য ১৩২ মাইল; আর একটি রাস্তার নাম বানিহাল কার্ট রোড (Banihal Cart Road), দৈর্ঘ্য ২০০ মাইল। এই রাস্তাটির দ্বারা কাশ্মীরের মহারাজার গ্রীষ্মাবাস শ্রীনগর শীতাবাস জম্মুর সংগে যুক্ত হয়েছে।

রাজস্ব ও ব্যবসায়-বাণিজ্য—১৯৪৩-৪৪ সালে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছিল। এই বৎসরের হিসাব অনুসারে আমদানির পরিমাণ ৫ কোটি ৩ লক্ষ টাকা, রপ্তানি ৯০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা।

এই রাজ্যটির এক-অষ্টমাংশ বন দ্বারা আবৃত। দেবদারু, পাইন প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষে এখানকার অরণ্য অঞ্চল সমাচ্ছন্ন। অরণ্য-সম্পদ থেকে ১৯৪৫ সালে আয় হয়েছিল এক কোটি দশ লক্ষ টাকা।

কৃষি-শিল্প—সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ও কিষেণগঙ্গা বিধৌত এই মনোরম পার্বত্য ভূখণ্ড ফুলফল শোভিত। পশুপালন ও কৃষির সঙ্গে এখানে আপেল প্রভৃতি নানা রকমের

ফলের চাষও বহুলে পরিমাণে হয়ে থাকে। কৃষিকার্যে জলসেচের জন্য কাশ্মীর ও জম্মুতে দশটি খাল আছে। তাছাড়া খিরামে যে বাঁধ প্রস্তুত হচ্ছে, তার ফলে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি উৎপাদিত হবে এবং প্রায় এগার হাজার একর জমিতে ধান-চাষের সুবিধে হবে। এই জমিতে প্রায় চার লক্ষ মণ ধান উৎপাদিত হবে।

কাশ্মীরের রেশম ও পশম-শিল্প—কাশ্মীরী শাল, আলোয়ান, গালিচা 'তোষা' ও নানা রকমের শীতবস্ত্র উৎকৃষ্ট। 'তোষা' এত সূক্ষ্মভাবে প্রস্তুত হয় যে, তা একটি আংটির ভেতর দিয়ে গলিয়ে নেওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে কাশ্মীরে রেশম ও পশম-

কাশ্মীরের মহারাজা স্যার হরি সিং

শিল্প চলে আসছে। কাশ্মীরে মোগল সম্রাটগণের অধিকার আমলে গালিচা-শিল্প প্রবর্তিত হয়। প্রাচীনকালে পারস্যের নক্সা অনুসারে কাশ্মীরে গালিচা প্রস্তুত হত। তারপর থেকে নানা দেশের বিভিন্ন বা মিশ্রিত নক্সায় এবং নব-উদ্ভাবিত কাশ্মীরের নিজস্ব নক্সায়ও গালিচা প্রস্তুত হয়ে আসছে।

কাশ্মীরের দারু-শিল্পও সমধিক প্রসিদ্ধ। কাঠের উপর সুন্দর সুন্দর নক্সা খোদাই করে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সৌখীন দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়ে থাকে।

সামরিক শক্তি—কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের অক্সিলিয়ারী সার্ভিসসমেত সৈন্য-সংখ্যা ১০,২৯৭। ডোগরা, গুর্খা, কাংড়া রাজপুত এবং পাঞ্জাবী জাঠ শিখ দ্বারা এই রাজ্যের সৈন্যবাহিনী গঠিত। সামরিক ব্যয় বার্ষিক কিঞ্চিদধিক ১ কোটি ২॥ লক্ষ টাকা।

গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

কাশ্মীরের ডাল হ্রদ, উলার হ্রদ, শ্রীনগর, জম্মু প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের নামের সঙ্গে জনসাধারণ পরিচিত। কাশ্মীর রাজ্যে আক্রমণকারীদের হানা ও ভারতীয় সৈন্যগণের বিমান ও স্থলযুদ্ধের ফলে এমন অনেক স্থানের নাম খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে, যে নামগুলির সঙ্গে জনসাধারণ ভাল করে পরিচিত নয়। এই ধরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল:—

পীর পাঞ্জাল—কাশ্মীরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত পর্বতপ্রাচীর। এই পর্বতপ্রাচীর ভেদ করে যে সমস্ত গিরিপথ আছে, সেগুলির ভিতর দিয়েই ভারতের সমতল ক্ষেত্র থেকে কাশ্মীরের ঝিলাম উপত্যকা ভূমিতে প্রবেশ করতে হয়। পীর পাঞ্জালের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। এর অনেক জায়গায় তৃণগুল্মাচ্ছাদিত ফাঁকা জায়গা আছে। মাঝে মাঝে বার্চ, মাপল ও পাইন গাছের বীথিকা। ফাঁকা জায়গাগুলি ভ্রমণ ও অশ্বারোহণের পক্ষে অত্যন্ত মনোরম।

গুলমার্গ—পীর পাঞ্জাল ও শ্রীনগরের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত গুলমার্গ সমগ্র শীতকাল, এমনকি এপ্রিল মাসের দ্বিতীয়-তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত তুষারাচ্ছন্ন জনশূন্য থাকে। কুটীরগুলির কতকাংশ তুষারের মধ্যে ডুবে থাকে। মে ও জুন মাসে এই স্থান উষ্ণ ও বাসোপযোগী হয়। লোকজন এই সময় এখানে এসে বাস করতে থাকে। কিন্তু এই সময় মশার ঝাঁক অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। এই স্থানটি একটি বড় সরাইখানা ব্যতীত কিছুই নয়। এখানে কয়েকটি তাঁবু, কিছুসংখ্যক কাঠের বাড়ি, মহারাজার প্রাসাদ ও রেসিডেন্টের বাসভবন অবস্থিত।

বরামুলা বা বরাহমুলা—রাওয়ালপিণ্ডি রেল স্টেশন থেকে শ্রীনগর যাওয়ার রাস্তাটি মুরীর (Murree) নীচে ঝিলাম নদীর উপত্যকায় এসে পড়েছে। এখানে পাহাড় বিচ্ছিন্ন করে নদীটি প্রবাহিত এবং এই ঝিলাম নদীর তীরভাগ দিয়ে রাস্তাটি শ্রীনগরের দিকে চলে গিয়েছে। এই নদীর তীরে ঝিলাম-ভ্যালি রোডের ধারে দেবদারু বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন বরামুলা অবস্থিত। বরামুলার কয়েক মাইল আগে পর্যন্ত নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রখর, নৌ-চলাচল-যোগ্য নয়। বরামুলা থেকে নদীটি নাব্য এবং এখান থেকেই উপত্যকাভূমি ক্রমশ বিস্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই উপত্যকাভূমি নানা ফল-ফল ও ফসলে শোভিত। বরামুলাই ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার।

ভ্রমণকারীরা প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ ও ভ্রমণ-সুখের জন্য বরামুলা থেকে নৌকাযোগে শ্রীনগরে যাওয়া বেশী পছন্দ করে থাকে। শ্রীনগরের পথে ভ্রমণকারীরা উলার হ্রদ ও মানসবল হ্রদ দেখে যায়।

শ্রীনগর ও ডাল হ্রদ—পূর্বে তখত-ই-সুলেমান ও পশ্চিমে হরি পর্বত—এই দুই পর্বতের মধ্যে অবস্থিত ডাল হ্রদ দুই পর্বতেরই পাদদেশ চুম্বন করছে। দুই দিকে দুই পর্বতের ছায়া হ্রদের জলে পড়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এই হ্রদের দৈর্ঘ্য পাঁচ মাইল ও প্রস্থ আড়াই মাইল। নানা জাতীয় পাখী, বড় বড় নলখাগড়া ও নানা রকম জলজ উদ্ভিদের ঝোপ, ভাসমান উদ্যান, ছোট ছোট সবুজ দ্বীপ, বহু প্রমোদ-তরণী এই হ্রদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মোগল সম্রাটগণের প্রমোদ-উদ্যান নিশাতবাগ, শালিমারবাগ ও নাসিম-বাগ এই হ্রদের তীরে অবস্থিত। এই উদ্যানগুলি এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মনোরম।

কাশ্মীরের জননায়ক, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা

কাশ্মীরের রাজধানী ও মহারাজার গ্রীষ্মাবাস শ্রীনগরও হরি পর্বত ও তখত-ই-সুলেমান পর্বতের মধ্যস্থলে ঝিলাম বা বিতস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। শহরটি সুন্দর, ছবির মত, কিন্তু অপরিচ্ছন্ন।

বন্দীপুরা—গিলগিট — বন্দীপুরা উলার হ্রদের তীরে অবস্থিত। বন্দীপুরা থেকে আঁকাবাঁকা খাড়াই পথে ট্রাগবল (Tragbal) পৌঁছা যায়। ট্রাগবল থেকে বুরজিল (Burzil) ও কামরি (Kamri) গিরিপথ দিয়ে গিলগিট, গিলগিট থেকে পামির পৌঁছা যায়।

গাণ্ডারবল (Gandarbal)—উলার হ্রদের তীরে অবস্থিত। এখান থেকে হাঁটাপথে সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে এগার হাজার তিনশ' ফুট উঁচু জোজি-লা (zoji-la) অতিক্রম করে লাদকের অন্তর্গত লে'র (Leh) পথে যাওয়া যায়।

চিত্রল, গিলগিট, হুনজা, নাগর ইয়াসিন প্রভৃতি—কাশ্মীরের উত্তর অংশে উত্তর-পশ্চিম

থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানগুলি অবস্থিত এবং মুসলমান জায়গীরদারদের শাসনাধীন। এই জায়গীরদারেরা কাশ্মীরের মহারাজাকে কর দিয়ে থাকেন। বর্তমানে এই সমস্ত স্থানের কোন কোন অংশে আক্রমণকারীদের হানা দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। চিত্রল কাশ্মীরের মহারাজার সম্মতি না নিয়েই বিদ্রোহাচরণ করে পাকিস্থানে যোগ দিয়েছে।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়

"রাজতরঙ্গিনী" থেকে জানা যায়, ব্রহ্মার পৌত্র এবং মরীচির পুত্র কশ্যপ ঋষি কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালে কাশ্মীর একটি সুবৃহৎ হ্রদ ছিল, বর্তমানের মত পর্বতসমাকীর্ণ স্থলভাগ ছিল না। তিনি বরাহমুলায় (বর্তমান বরামুলায়) পর্বত কেটে হ্রদের সমস্ত জল অপসারিত করে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর স্থাপন করেন। তারপর তিনি 'এই স্থানে ব্রাহ্মণ এনে বসবাস করান।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক হুয়েন সাঙ পাঞ্জাব, কাবুল, গান্ধারকে (কান্দাহার) কাশ্মীরের অন্তর্গত দেখেছিলেন। তিনি ৬৩১ থেকে ৬৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার বরাহমুলা বা বরামুলা থেকে পীর পাঞ্জালের ভিতর দিয়ে এসে ভারতে প্রবেশ করেন। মহাভারত থেকে জানা যায়, পৌরাণিক যুগে এই সমস্ত স্থান কিরাত, দরদ খস ('কিরাতাঃ দরদাঃ খসাঃ') প্রভৃতি অনার্য-জাতীয় লোকের বাস ছিল।

সম্রাট অশোকের সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তার ঘটে। ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ দিকে নব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয়কালে কাশ্মীরে ভারতের অন্যান্য স্থানের মত হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কাশ্মীরে হুবিষ্ক, কনিষ্ক প্রভৃতির রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের কিছুটা বিস্তার ঘটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য থেকে যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কাশ্মীরে সহদেব নামে এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি দেবদারু বৃক্ষ রোপণ করেন। এই দেবদারু বৃক্ষটি কাশ্মীরের বহু ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তন দেখেছে। ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে এই বৃক্ষ-রোপণের প্রথম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্ভবত আজ পর্যন্ত এই বৃক্ষটি বর্তমান; গত বৎসর ১৯৪৬ সালে জম্মু-কাশ্মীর প্রদর্শনীতে উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগে ৬৩০ বৎসরের প্রাচীন এই দেবদারু বৃক্ষটি প্রদর্শিত হয়েছিল।

কাশ্মীরে ১৪২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু-শাসন বর্তমান ছিল। সহদেবই এই শেষ নৃপতি। এই বৎসর তিব্বতীয় (ভোটজাতীয়) রিন-চেন সহদেবকে হত্যা করে রাজা হন এবং সহদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি পরে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। এক ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি মাথায় আঘাত পান এবং ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। সহদেবের মুসলমান কর্মচারী শাহ মীর রিন-চেন-এর আত্মীয় উদয়নদেবকে সিংহাসনে বসান এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই রাজা হন। শাহ মীরের পর সামসুদ্দীন ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। (১)

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর কাশ্মীর আক্রমণ করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যের শাসনাধীন হয়। (২)

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আহম্মদ শাহ্ দুরাণীর তৃতীয়বার ভারত আক্রমণের ফলে কাশ্মীর আফগান শাসন কর্তৃত্বাধীন হয়।
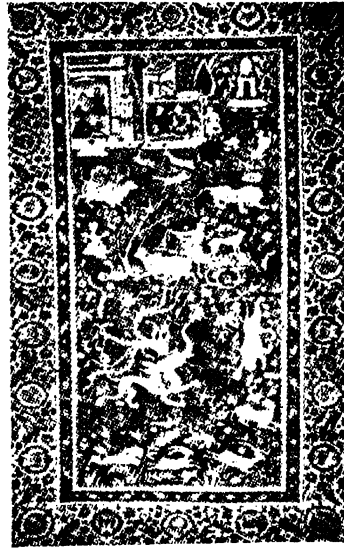
প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী গালিচার কারুকার্যের নমুনা

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রণজিৎ সিং কাশ্মীর আক্রমণ এবং সিংহাসন অধিকার করেন। ১৮৪৬ সালে প্রথম শিখ যুদ্ধের ফলে কাশ্মীর ইংরেজের শাসনাধীন হয়।

শিখশক্তির অধীনস্থ জম্মুর শাসনকর্তা গোলাব সিং-এর মধ্যস্থতায় শিখ ও ইংরেজদের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তদনুসারে দেড় কোটি টাকার বিনিময়ে শিখশক্তিকে ইংরেজদের বিজিত রাজ্য ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু শিখ-রাজ দলীপ সিং দেড় কোটি টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় এক কোটি টাকার বিনিময়ে কাশ্মীর, হাজারা এবং সিন্ধু নদ ও বিপাশার মধ্যবর্তী পাঞ্জাবের অংশ ইংরেজকে প্রদান করেন। জম্মুর শাসনকর্তা গোলাব সিং ইংরেজকে টাকা প্রদান করে উক্ত অঞ্চলের অধিকার লাভ করেন।

গোলাব সিং-এর পর রণবীর সিং, তাঁর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিং এবং প্রতাপ সিং-এর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র বর্তমান মহারাজা স্যার হরি সিং ইন্দ্র মহীন্দ্র বাহাদুর কাশ্মীরের গদীতে আরোহণ করেন।

আধুনিক কালের কাশ্মীর

কাশ্মীরের বর্তমান মহারাজা লেফটেন্যান্ট-জেনারেল হরি সিং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে গদীলাভ করেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আমলে কাশ্মীরের মহারাজা একুশটি তোপের সম্মানের অধিকারী ছিলেন। কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের গদীর ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ করণসিংজীর বয়স বর্তমানে ১৬ বৎসর। তিনি ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের (State Assembly) নাম 'প্রজা-সভা'। প্রজা-সভায় ৭৫ জন সদস্য আছেন,—৪০ জন নির্বাচিত, ৩৫ জন মনোনীত। প্রজা-সভার বৎসরে মাত্র দু'টি অধিবেশন হয়।

শৈলমালা সমাকীর্ণ, ফুল-ফল-সুশোভিত কাশ্মীরের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য প্রচুর। সাধারণ কৃষি, ফল চাষ, রেশম ও পশম-শিল্পও বিশেষ উন্নত। কৃষি, বন, শিল্প, আবগারী, অন্যান্য রাজস্ব থেকে আয়ও যথেষ্ট। লবণ, কয়লা, তামা, প্রভৃতি খনিজ-সম্পদও কাশ্মীরে বর্তমান। বহুস্থানে স্বর্ণখনিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিন্তু কাশ্মীরের জনসাধারণের অধিকাংশই দরিদ্র, শোষিত,—যথোপযুক্ত আহার ও পরিচ্ছদ অনেকের ভাগেই জোটে না। প্রজাগণের অধিকাংশই মুসলমান। রাজা ডোগরা রাজপুত-বংশীয়,—হিন্দু। হিন্দু রাজার প্রতি নিরন্ন, জীর্ণবস্ত্রপরিহিত প্রজাদের যে অভিযোগ, তা বিদ্বেষে পরিণত হয়ে ক্রমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিণত হয়। রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। তারা ক্রমে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। সমগ্র কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে।

কাশ্মীরে কোন সরকারী চাকুরী মুসলমানদের ভাগ্যে সাধারণতঃ জুটত না। স্বয়ং শেখ আবদুল্লা চাকুরী-প্রার্থী হয়েও চাকুরী পাননি। চাকুরীর ক্ষেত্রে এইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহারে শিক্ষিত মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হন। তার ফলে শেখ আবদুল্লা, মৌলবী ইউসুফ শাহ ও মৌলবী হামদানি একটি বিরোধী দল গঠন করেন। কাশ্মীরের মোল্লা-মৌলবী, সাম্প্রদায়িক হারে চাকুরী-প্রার্থী শিক্ষিত মুসলমানগণও এই তিনজন নেতাকে সমর্থন করে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলন ক্রমশ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক আকার

(১) ও (২) 'দি ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অব্ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া'—শ্রীহেমচন্দ্র রায় প্রণীত, ১৭৭—১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ধারণ করল। আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-ভঙ্গীর জন্য কাশ্মীরী মুসলমানগণ কাশ্মীরী পণ্ডিতদিগকে উচ্ছেদ করবার জন্য চেষ্টিত হল।

আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করার ফলে কাশ্মীরের মহারাজা নিজেকে বিব্রত বোধ করলেন। ১৯৩১ সালে শেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তা ছাড়া কারাদণ্ড, সামরিক আইন, বেত্রদণ্ড, পিটুনী কর প্রভৃতি দমননীতির সাহায্যে আন্দোলন ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে।

অবশেষে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশন শাসনব্যাপারে ও চাকুরীর ক্ষেত্রে কতকগুলি সংস্কারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। এই সুপারিশগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিত্বে ও সরকারী চাকুরীতে মুসলমানগণের কিছু সংখ্যাবৃদ্ধির সুপারিশ উল্লেখযোগ্য।

তদন্ত কমিশনের এই সমস্ত সুপারিশ যাতে কার্যকরী হয়, তার উদ্দেশ্যে 'মুসলিম সম্মেলন' নামে একটি দল গঠিত হয়। ১৯০৯ সালে কাশ্মীরের মহারাজা এবং তাঁর স্বধর্মী হিন্দু প্রজাগণকে উৎখাত করবার উদ্দেশ্যে মুসলিম সম্মেলন উগ্র আকার ধারণ করলে কাশ্মীর রাজ্যের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী স্যার হরিকিষণ কাউল মুসলিম সম্মেলনের নেতৃত্বয়ের অন্যতম মৌলবী ইউসুফ শাহকে হাত করে উপস্থিত বিপদ থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করেন। কিছুসংখ্যক মুসলমান সরকারী চাকুরীও লাভ করেন। এর ফলে মুসলিম সম্মেলন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

কাশ্মীরের দলগত রাজনীতির এই পরিণাম লক্ষ্য করে এবং কাশ্মীরের অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করে শেখ আবদুল্লা মুসলিম সম্মেলন ত্যাগ করে মুসলমান, হিন্দু, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে 'জাতীয় সম্মেলন' নামে একটি প্রগতিপন্থী অসাম্প্রদায়িক দল গঠন করেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যে সংগ্রাম চলছিল, অসাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সেই সংগ্রাম পরিচালিত হওয়ায় কাশ্মীরে বিপুল জনজাগরণের সূচনা হয়।

প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা মন্ত্রি-সভা গঠন, যুক্ত নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তন, সংখ্যা-লঘুদের জন্য আসন-সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে জাতীয় সম্মেলন আন্দোলন শুরু করে।

শেখ আবদুল্লা কংগ্রেসের অনুরাগী হয়ে পড়েন এবং মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ফলাফল লক্ষ্য করে শেখ আবদুল্লাও 'কাশ্মীর ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯৪৬ সালের ২১শে মে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শেখ আবদুল্লার পক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর যাত্রা করলে, তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। পণ্ডিত নেহরু নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ও পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে কাশ্মীরে প্রবেশ করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর কাছে মহারাজা এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, শেখ আবদুল্লাকে দণ্ডিত করা হবে না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শেখ সাহেবকে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কাশ্মীরের মহারাজা সেদিন তাঁর বিভীষণ-রূপী প্রধানমন্ত্রী কাকের পরামর্শে যে ভুল করেছিলেন, সেই ভুলের ফলেই আজ কাশ্মীরে ধ্বংসের দাবানল জ্বলে উঠেছে। কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। সেদিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত জননায়ক শেখ আবদুল্লার হাতে আজ দুর্যোগের ঘনঘটার মধ্যে মহারাজা রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করেছেন, আর অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তৎ-কালীন প্রধান মন্ত্রী রামচন্দ্র কাক আজ কারাগারে আবদ্ধ!

কাশ্মীরের বিমান-ঘাঁটিতে ভারতীয় সৈন্যগণ অবতরণ করছে

নূতন ছবির পরিচয়

স্বয়ং-সিদ্ধা—আই, এন্, পিকচার্সের ছবি।

কাহিনী ঃ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ নরেশ মিত্র; সুর-সংযোজনা ঃ নিতাই মতিলাল। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দীপ্তি রায়, নরেশ মিত্র, উমা গোয়েঙ্কা, বন্দনা দেবী, পার্থ মজুমদার, গুরুদাস ব্যানার্জি, শিবশংকর সেন প্রভৃতি।

ন্যাট্ হ্যামসুনের একখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের একটি জায়গায় চমৎকার একটি উক্তি আছে। সেই উক্তিটির যথাযথ উদ্ধৃতি দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন—তবে তার ভাবানুবাদ করলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রেমের স্পর্শে বুদ্ধিমানেরা বোকা বনে যায় আর বোকারা হয়ে ওঠে বুদ্ধিমান। 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবিখানি দেখতে দেখতে আমার এই উক্তিটির কথাই বার বার মনে পড়েছে—বিশেষ করে এই উক্তির শেষাংশটি। প্রেমের পরশমণির স্পর্শে কি করে একটি জড়বুদ্ধি অশিক্ষিত মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হল—'স্বয়ংসিদ্ধা'য় তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সুতরাং কাহিনীটির রূপক হিসেবে খানিকটা মূল্য আছে যদিও বাস্তবতার মাপকাঠিতে বিচার করলে এর অনেকখানিকেই মনে হবে অবাস্তব ও অসম্ভব। এই মূলে কাহিনীর সঙ্গে মিশে আছে সেই চিরপরিচিত পুরাকালীন জমিদার বাড়ীর গৃহ-বিবাদ, মৃতা সপত্নীর পুত্রকে ফাঁকি দিয়ে নিজের ছেলেকে জমিদারীতে বসানোর জন্যে বিমাতার আগ্রহাতিশয্য, বড়-ভাইকে ফাঁকি দেবার জন্যে ছোট ভাইয়ের কূট চক্রান্ত। যে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ জমিদারের চরিত্র এই চিত্রে দেখা যায়, সে চরিত্রও আমাদের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণীতে দুর্লভ। এসবই বাঙলার বিগত দিনের কাহিনী।

কাহিনীর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা যাই থাক না কেন, 'স্বয়ংসিদ্ধা' জনপ্রিয়তা অর্জন করবে—এ বিষয়ে কোনই সংশয় নেই। চিত্রের জনপ্রিয় হবার পক্ষে যেসব উপাদান থাকা প্রয়োজন, 'স্বয়ংসিদ্ধা'র মধ্যে সে সবের ব্যত্যয় নেই। প্রথমত কাহিনীটি সহজগ্রাহ্য এবং ঘটনাপ্রবাহে দ্রুত আবর্তিত। ছবির একটানা গতি মুহূর্তের জন্যেও ঝুলে পড়েনি। প্রথম থেকে শেষ অবধি দর্শকমনকে টেনে রাখার ক্ষমতা আছে এ ছবির। দ্বিতীয়ত অভিনয়াংশ ভাল এবং তৃতীয়ত সঙ্গীতাংশও সুন্দর। তার উপর কাহিনীকার চন্ডীর মধ্যে যে বীর্যশুল্কা

বাঙালী নারীর দৃঢ়চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তা বাঙালী মনের কাছে আবেদন না জানিয়ে পারে না। সুতরাং জনপ্রিয় চিত্ররূপে 'স্বয়ংসিদ্ধা'র সাফল্য সুনিশ্চিত। এর জন্য কাহিনীকার মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। তবে কৃতিত্বের প্রধান অংশ বোধ হয় প্রাপ্য পরিচালক নরেশ মিত্রের। তিনি যে শুধু সেলুলয়েডের উপর

চন্দ্রশেখর চিত্রের নায়ক নায়িকা
অশোক-কানন

অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই কাহিনীকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তাই নয়—তিনি অধিকাংশ নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীকে সুযোগ দিয়ে এবং তাঁদের দিয়ে ভাল অভিনয় করিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু জনপ্রিয় চিত্র হলেও 'স্বয়ংসিদ্ধা' বাণীচিত্র হিসাবে নিখুঁত হয়েছে এমন কথা বলতে পারি না। যান্ত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি তো আছেই—তা ছাড়া আছে কাহিনীগত প্রচার-প্রাবল্য। কোন কোন জায়গায় অভিনয়ে মঞ্চ-ধর্মী নাটুকেপণাও চোখে পড়ে। নায়িকা চন্ডীর যে দৃঢ়, তেজোদ্দীপ্ত অথচ মধুর চরিত্র লেখক এঁকেছেন তা সর্বাংশে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, লেখক এবং পরিচালক এই দৃঢ় চরিত্রটিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেই নিরস্ত হতে পারেন নি—তাঁরা বারবার করে এই প্রসঙ্গে আমাদের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই গোঁড়া হিন্দুয়ানী প্রচারের ফলে বুদ্ধিবিদগ্ধ দর্শক মনের কাছে 'স্বয়ংসিদ্ধা'র আবেদন কমে যেতে বাধ্য। চেষ্টা করলে এই প্রচার-প্রাবল্য যথেষ্ট কমানো যেত এবং তার ফলে ছবিখানির উৎকর্ষই বৃদ্ধি পেত। অধর্মের উপরে ধর্মের জয় নীতিকথা হিসাবে যতই মনোরম হোক, কোন সাহিত্য বা শিল্পে তার আধিক্য দোষেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'স্বয়ংসিদ্ধা'র মধ্যে এই বস্তুটিরই আধিক্য দেখা গেল।

উপরে যেসব কথা লিখলাম তা সত্ত্বেও 'স্বয়ংসিদ্ধা' জনপ্রিয় হবে। তার কারণ নির্দেশও পূর্বেই করেছি। অধিকাংশ নবাগত অভিনেতা অভিনেত্রী হলেও 'স্বয়ংসিদ্ধা'র অভিনয়াংশ বেশ শক্তিশালী। বিশেষ করে নায়িকা চন্ডীর চরিত্রে নবাগতা শ্রীমতী দীপ্তি রায়ের অভিনয় দেখে মনে হল যে তাঁর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল—অবশ্য যদি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয়কলার চর্চা করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সুন্দর, বাচনভঙ্গী চমৎকার এবং তাঁর চলা-ফেরার মধ্যে একটা দৃপ্ত তেজস্বিতার পরিচয়

পাওয়া যায়। অন্যান্য ভূমিকারও অধিকাংশ সুঅভিনীত। জমিদারের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তাঁর মধ্যে মাঝে মাঝে নাটুকেপণার বিকাশ বাদ দিলে তিনি সুঅভিনয় করেছেন বলা চলে। আলোকচিত্র গ্রহণে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা গেল। কোথাও কোথাও চিত্রগ্রহণ মোটামুটি ভাল হয়েছে আবার কোথাও বা চিত্রগ্রহণ নিম্নস্তরের। সে তুলনায় শব্দগ্রহণ ভাল। সংগীতাংশ সত্যই প্রশংসার্হ। যে কয়খানি কণ্ঠসংগীত আছে তার প্রত্যেকখানিই সুগীত। সুর-সংযোজনায় নিতাই মতিলাল বৈচিত্রের পরিচয় দিয়েছেন।

স্টুডিও সংবাদ

কোয়ালিটি ফিল্মসের প্রযোজনায় পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের 'বিচারক' নামক বাঙলা ছবির চিত্রগ্রহণ কার্য ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এগিয়ে চলেছে।

* * * *

শ্রীবাণী পিকচার্সের প্রথম বাঙলা ছবি 'যে নদী মরুপথে'র প্রাথমিক কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলে প্রকাশ। শীঘ্রই চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ হবে। এই চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীঅখিলেশ চট্টোপাধ্যায়।

* * * *

যুগবাণী পিকচার্স নামে একটি নতুন চিত্রপ্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। প্রকাশ, যে সেই চিরাচরিত বিরহ-প্রেমের চিত্রনির্মাণ করা এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ নয়। কয়েকজন বিশিষ্ট দেশসেবক ও কর্মী এই চিত্রপ্রতিষ্ঠানটির পিছনে আছেন বলে জানা গেল। দেশের ও জাতির বিভিন্ন সমস্যাকে এঁরা চিত্র মারফৎ দেশবাসীদের সামনে তুলে ধরবেন বলে আমাদের আশা দিয়েছেন। ভাত ও কাপড়ের সমস্যা নিয়ে এঁরা প্রথম একখানি সমস্যামূলক চিত্রনির্মাণে হাত দেবেন বলে এই চিত্রের নামকরণ করা হয়েছে—'ভাত ও কাপড়।'

* * * *

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শৈলজানন্দ প্রোডাকসন্সের "ঘুমিয়ে আছে গ্রাম" নামক ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

* * * *

সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে নবগঠিত কল্প চিত্রমন্দিরের প্রথম বাঙলা সবাক চিত্র 'ওরে যাত্রী'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ছবিখানি পরিচালনা করবেন রাজেন চৌধুরী। কাহিনী রচনা করেছেন নিতাই ভট্টাচার্য ও রমা চক্রবর্তী। মহরতের দিন দীপক মুখার্জি ও মৃদুলা গুপ্তের চিত্রগ্রহণ করা হয়েছিল।

* * * *

এই সপ্তাহে কলকাতায় দুখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র মুক্তি লাভ করেছে। তার একখানি হল পাইয়োনীয়ার পিকচার্সের বহু প্রতীক্ষিত 'চন্দ্রশেখর' ও অপরখানি হল সাহিত্যিক-পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত আওয়ার ফিল্মসের 'নতুন খবর'। প্রথমখানি উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপে এই সর্বপ্রথম বাঙালী দর্শকসমাজ অশোককুমার ও কানন দেবীকে একই চিত্রে অভিনয় করতে দেখবেন। তা ছাড়া এই চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন যশস্বী পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসু। দ্বিতীয়, চিত্রখানি উল্লেখযোগ্য হল তার বিষয়বস্তুর দিক থেকে। 'নতুন খবরে'র কাহিনী গড়ে উঠেছে সাংবাদিকদের জীবনকথা অবলম্বন করে। বাঙলা ছবিতে এধরণের বিষয়বস্তুর আমদানী এই প্রথম। যাই হোক, ছবিখানি সম্বন্ধে আমাদের পরে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

মঞ্চ পরিচয়

বাংগলার প্রতাপ

স্বর্গত ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটক 'প্রতাপাদিত্য' পেশাদার ও সখের অভিনেতারা বহুদিন ধরে অভিনয় করে আসছেন। তাই হঠাৎ যখন শুনেছিলাম যে, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক 'বাঙলার প্রতাপ' রঙমহল মঞ্চস্থ করবেন ব'লে স্থির করেছেন তখন মনে একটু আশঙ্কা হয়েছিল। ভেবেছিলাম, হয়তো বা সেই একই কাহিনীর আধুনিক নাট্যরূপ শচীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। কিন্তু অভিনয় দেখে সে ভুল ভাঙল। 'বাঙলার প্রতাপ' ও 'প্রতাপাদিত্যের' বিষয়বস্তু এক নয়। যুবক প্রতাপের কার্যকলাপ ও বর্বর পর্তুগীজদের দেশ থেকে বিতাড়নের কাহিনী শচীন্দ্রনাথ 'বাঙলার প্রতাপে' নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, প্রতাপের বাঙলার পতন কেন হয়েছিল, তার কারণও কৌশলে তিনি দিয়ে গেছেন। 'বাঙলার প্রতাপ' নাটক হিসাবে রসিকদের খুশি করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অভিনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী 'কার্ভালোর' ভূমিকায়। চৌধুরী মহাশয়ের অভিনয় কিছুদিন থেকে বড়ো একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর এরকম অভিনয় অনেকদিন দেখিনি। অঞ্জলিকার ভূমিকায় রাণীবালাও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'প্রতাপের' ভূমিকায় শ্রীমিহির ভট্টাচার্যকে ভালো মানালেও তাঁর অভিনয় আশানুরূপ হয়নি। বসন্ত রায়ের ভূমিকায় শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সুন্দর। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় শ্রীরবি রায়, শ্রীসন্তোষ সিংহ ও শ্রীবিজয়কার্তিক দাসের অভিনয় প্রশংসনীয়। পরিশেষে শ্রীসুকৃতি সেনের সুর-সংযোজনার কথা উল্লেখ না করলে 'বাঙলার প্রতাপের' পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের 'অভ্যুদয়ের' গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন এ-বিষয়ে সুকৃতিবাবুর দক্ষতা কতোখানি। মোটের উপর, 'বাঙলার প্রতাপের' অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে। —বসুভূতি

দেশী সংবাদ

৩রা নবেম্বর—কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা একটি জরুরী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ নেতার উপর বিভিন্ন বিভাগের ভার অর্পণ করা হয়। শ্রীনগর-বরমুলা রাস্তায় সৈন্যরা পাটন গ্রাম নিঃশত্রু করিয়াছে।

কলিকাতায় বৈদ্যুতিক রেল চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত প্রস্তাবিত বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার যে অংশটি কলিকাতা শহরের মধ্য দিয়া যাইবে, সেই অংশের জন্য সমতল হইতে উন্নীত প্রায় ২৫ মাইল বৈদ্যুতিক রেলপথ তৈয়ারী করা সম্পর্কে ইতিমধ্যে প্রাথমিক সারেজমিন কার্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিতে পাঁচ বৎসর লাগিবে।

নয়াদিল্লীর এক প্রেসনোটে প্রকাশ যে, প্রায় ৩০ লক্ষ অ-মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রায় ১০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী এখনও ভারতে আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্ট উক্ত দাবী মানিয়া লইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে শীঘ্রই সরকারী ঘোষণা কর হইবে।

৪ঠা নবেম্বর—ত্রিপুরা রাজ্যের পাকিস্থানে যোগদানের দাবী করিয়া গত সপ্তাহে কয়েকজন মুসলিম লীগওয়ালার উদ্যোগে কুমিল্লায় তিনটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের অংশস্বরূপ চাকলা-রোসনাবাদ জমিদারী এলাকার প্রজাদের অভাব অভিযোগ পূরণ করিবার দাবী সভায় জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত জমিদারী পূর্ববঙ্গ প্রদেশের অন্তভুক্ত। প্রস্তাবে ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে ১৫ দিনের মধ্যে পাকিস্থানে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রজাসাধারণের অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে হইবে। অন্যথায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করা হইবে।

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিংহ অদ্য কাশ্মীর পরিদর্শন করেন। গতকল্য শ্রীনগরের আনুমানিক ১০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ভারতীয় সৈন্যদলের সহিত হানাদারদের আর একটি সংঘর্ষ ঘটে। কয়েক ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে বহু আক্রমণকারী হতাহত হয়।

বালেশ্বরে এক জনসভায় শ্রীযুত শার্ঙ্গধর দাস আজাদ নীলগিরি গভর্নমেণ্ট গঠনের কথা ঘোষণা করেন। প্রজামণ্ডলের সভাপতি শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র মহান্তীকে প্রধান করিয়া এবং আরও ছয়জনকে লইয়া এই গভর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছে।

৫ই নবেম্বর—কাশ্মীরের রাষ্ট্রনায়ক শেখ আবদুল্লা এক বিবৃতিতে বলেন যে, বর্তমান অবস্থার ফলে যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে কাশ্মীর উপত্যকায়ই পাকিস্থানের সমাধি রচিত হইবে।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজসরকারের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, কেবল উপজাতীয়েরাই কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া পাকিস্থানী বেতার ও সংবাদপত্রে বিশেষ জোর দিয়া বলা হইলেও তদ্দ্বারা ইহার খণ্ডন হয় না যে, পাকিস্থানের মধ্য দিয়াই কাশ্মীর রাজ্যকে আক্রমণ করা হইয়াছে। বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থানী সৈন্যদলের কয়েকজন অফিসারও হানাদারদের মধ্যে রহিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাহারা নিরস্ত্র নরনারী ও শিশুদিগকে হত্যা করিয়াছে; নারী নিগ্রহ, লুণ্ঠন এবং আরও নানারকম বর্বরোচিত

কার্য করিতে তাহারা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় নাই।

শিলংয়ের সংবাদে প্রকাশ, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য ও পাকিস্থান সীমান্ত হইতে ক্রমবর্ধমান অশান্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গত কয়েকদিন ধরিয়া সশস্ত্র সৈন্য চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। তাহারা ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতেছে।

৬ই নবেম্বর—শ্রীনগর হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে শহরের উপকণ্ঠে অদ্য প্রাতে বেশ বড় রকমের লড়াই চলে। উভয়পক্ষ প্রায় কাছাকাছি যাইয়া উপস্থিত হয় এবং মেশিনগান চলে। চারি ঘণ্টাকাল লড়াই চলিবার পর হানাদারদের আক্রমণ প্রতিহত হয়।

মণিপুরে ষ্টেট কংগ্রেস সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় যে, হায়দরাবাদে বহু লোক নিহত হইয়াছে এবং শহরের দুইটি অঞ্চলে আগুন জ্বলিতেছে। ইত্তেহাদ-উল-মসলেমিন দল যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' আরম্ভ করিয়াছে এই ঘটনা তাহারই ফল। ২৭শে অক্টোবর হইতে এক লক্ষের উপর লোক হায়দরাবাদ ত্যাগ করিয়াছে।

পেশোয়ারে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কাবুলে মহম্মদ ইয়াহিয়া জান খাঁরের নেতৃত্বে অস্থায়ী আজাদ-পাঠানীস্থান গভর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। তদুপরি গভর্নমেণ্টের উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে একজন প্রভাবশালী দূত দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছে।

৭ই নবেম্বর—শ্রীনগর উপত্যকায় শহরের উত্তর-পশ্চিমে অদ্য যে বড় রকমের যুদ্ধ হয় তাহাতে ভারতীয় বাহিনী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাঁজোয়া গাড়ি ব্যবহার করে। বিমান বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় পদাতিকগণ অগ্রসর হয়। শ্রীনগর ও বরমুলার মধ্যে যে প্রধান রাস্তা রহিয়াছে সেখানে এবং শ্রীনগরের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ প্রান্তরে হানাদারগণ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছে। ভারতীয় সৈন্য তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয় ও বহু লোককে হতাহত করে।

৮ই নবেম্বর—কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যরা বরমুলা দখল করিয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্ট আগামী ২৪শে নবেম্বর হইতে কর্তিত খাদ্য রেশন পুনর্বহাল করিয়া পুনরায় সপ্তাহে মাথাপিছু ২ সের ১০ ছটাক রেশন দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গৌহাটির সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য পুলিশ ইম্ফলে সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালায়। ফলে ২০ জন আহত হইয়াছে।

৯ই নবেম্বর—রাজকোটে এই মর্মে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, জুনাগড় কর্তৃপক্ষ ও অস্থায়ী জুনাগড় গভর্নমেণ্টের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শেষ হইয়াছে এবং জুনাগড় কর্তৃপক্ষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছে। জুনাগড়ের দেওয়ান জানাইয়াছেন যে, তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে কর্তৃত্বভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। কয়েকটি মাঝারি ধরণের ট্যাঙ্ক সহ এক ব্যাটেলিয়ন ভারতীয় সৈন্য আজ অপরাহ্নে জুনাগড় শহরে প্রবেশ করিয়াছে। স্থানীয় জনগণ ভারতীয় বাহিনীকে অভিনন্দিত করে।

কাশ্মীর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বিরামহীন অভিযান চলে। ভারতীয় সৈন্যদল অদ্য অবিশ্রান্তগতি শত্রু-সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উরির পথে আরও অগ্রসর হইয়া যায়। হানাদারদের আরও অধিক পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ভারতীয় সেনাদের হস্তগত হয়।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে পশ্চিম বঙ্গ মুসলিম সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সম্মেলনে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, যে ভ্রান্ত ও উদ্ভট দুই জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবীর দরুণ দেশ বিভাগ হইয়াছে তাহাই দেশের জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি ও দুর্ভোগের কারণ; সম্মেলন সমস্ত ভারতীয় মুসলমানকে দুই জাতিতত্ত্ব ও লীগের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভারতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানান।

ভারত গভর্নমেণ্টের পরামর্শক্রমে পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর শ্রীযুত রাজাগোপালচারীকে ভারতের অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল এবং স্যার বি এল মিত্রকে পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পশ্চিম বাঙলার সদস্যগণের এক সম্মেলন হয়। উহাতে উভয় বঙ্গের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র প্রাদেশিক কমিটি গঠন এবং উহার সাপেক্ষে প্রত্যেক অংশের সদস্যগণকে লইয়া অবিলম্বে দুইটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটি গঠনের দাবী উত্থাপিত হয়।

ভারত ব্যবচ্ছেদের ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আলোচনার জন্য অদ্য কলিকাতায় মিঃ সুরাবর্দী কর্তৃক আহূত মুসলিম নেতৃসম্মেলনের অধিবেশন হয়। মিঃ সুরাবর্দী বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

বিদেশী সংবাদ

২রা নবেম্বর—নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ঘোষণা করেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অছিগিরির অধীনে অর্পণের কোনরূপ নৈতিক দায়িত্ব নাই বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার তরফ হইতে যে দাবী উত্থাপিত হইয়াছে, উহা অত্যন্ত বিস্ময়কর।

৭ই নবেম্বর—লণ্ডনে সোভিয়েট ব্যাপারের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবযুক্ত মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সীমানা পামীরে আসিয়া ভারতের সহিত যুক্ত হইয়াছে বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন কাশ্মীরের ঘটনাবলীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছে। কয়েকজন রাশিয়ান "আনন্দবাজার পত্রিকার" লণ্ডনস্থ সংবাদদাতাকে বলেন যে, কাশ্মীরে হানাদারদের পেছনে মৃতকল্প সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন রহিয়াছে।

নিউইয়র্কে সম্মিলিত রাষ্ট্র রাজনৈতিক কমিটিতে ভারতবর্ষ-দক্ষিণ আফ্রিকা বিরোধ সম্পর্কে আলোচনার জন্য আনীত প্রস্তাবটি ৮—২৫ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

লণ্ডনে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের হাই-কমিশনার শ্রীযুত ভি কে কৃষ্ণ মেনন কাশ্মীর সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন যে, কাশ্মীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, হানাদারদের কাশ্মীর প্রবেশে পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের সমর্থন অথবা যোগসাজস রহিয়াছে।

৮ই নবেম্বর—প্যারিসের এক সংবাদে প্রকাশ, চন্দননগরকে "স্বাধীন নগর" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩ ষাণ্মাসিক—৬৷৷০

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—
সাময়িক বিজ্ঞাপন—৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জ্ঞাতব্য।

সম্পাদক—"দেশ" ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ] শনিবার, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ সাল। Saturday, 22nd November, 1947. [৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের আদর্শ

কংগ্রেস সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা এবং সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংকল্পশীল সংগ্রামের আদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে। নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্ররোচিত হইয়া কংগ্রেস অভ্রান্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে যে, অখণ্ড ভারতের এক-জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রীয়তার প্রতিষ্ঠাকেই সে তাহার মুখ্য লক্ষ্য স্বরূপে অবলম্বন করিয়া চলিবে। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের দীর্ঘ দিনের চেষ্টা সার্থক ও জয়যুক্ত হইয়াছে এবং লোকায়ত্ত গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে, ইহাও দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই বিভাগের ফলে উত্তর ভারতে নিদারুণ বিপর্যয় সংঘটিত হইয়াছে এবং দেশের অন্যত্রও অল্প-বিস্তর তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বলা বাহুল্য, মুসলিম লীগের দুই জাতি মতবাদই এইসব অনর্থের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ এড়াইবার জন্যই কংগ্রেস ভারত বিভাগে সম্মত হইয়াছিল; কিন্তু দুই জাতি মতবাদকে কংগ্রেস কোনদিনই সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অর্থনীতি প্রভৃতি সব দিক দিয়াই ভারতবর্ষ এক। স্বাধীনতা লাভের পর অখণ্ড ভারতের আদর্শকে এখন বাস্তব রূপে দেওয়াই কংগ্রেসের একমাত্র কর্তব্য। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, মানব-সভ্যতা এবং গণতান্ত্রিকতার নীতিকে কংগ্রেস আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল শোণিতস্রাবী সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে। কংগ্রেসের সে সংগ্রাম আত্মত্যাগের পরম মহিমায় উজ্জ্বল। আজ স্বার্থপর কতকগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদীর হুমকীতে পড়িয়া কংগ্রেস তাহার আদর্শকে বিসর্জন দিতে পারে না। বলা বাহুল্য, মধ্য-যুগীয় অনুদার বর্বরতার বিক্ষোভে ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত হয় এবং ফ্যাসিস্টপন্থীদের অন্ধ মতবাদে বিভ্রান্ত গুণ্ডাদের নিষ্ঠুর আঘাতে হতাহত নির্দোষের রক্তস্রোতে এই পুণ্যভূমি ক্রমাগত সিক্ত হইতে থাকে ইহা নীরবে দাঁড়াইয়া দেখা কংগ্রেসের পক্ষে আত্মঘাতেরই সমতুল্য। বস্তুতঃ কংগ্রেস যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে ডরায় নাই, সেইরূপ প্রগতিবিরোধী এই শক্তিকেও সে ভয় করিয়া চলিবে না। কংগ্রেস ভারতের সমষ্টি জনমনের প্রতি পরিপূর্ণ মর্যাদা এবং শ্রদ্ধাবুদ্ধি পোষণ করিয়া থাকে। প্রগতিমূলক রাষ্ট্রীয়তার প্রতি জনগণের মনোবৃত্তি বিকাশের স্বাভাবিক পথেই সে নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। তাহার পথ গুণ্ডানীতির পথ নয়। সে লাঠি উঁচাইয়া ধরিয়া এমন কথা বলে না যে, জন-সাধারণকে দুই জাতিতত্ত্বের ভেদবাদ মানিয়াই চলিতে হইবে এবং যে ভগবানের বিধানস্বরূপে ইহা না মানিবে সে দুষমণ। ভারতের জনগণের রাষ্ট্রীয় উন্নতির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথই কংগ্রেস উন্মুক্ত রাখিতে চায়। আমরা জানি, কংগ্রেসের আদর্শ অচিরেই জয়যুক্ত হইবে এবং ভেদবাদীদের ডাণ্ডার কাছে এদেশের জনগণের মনোধর্ম পরাভব স্বীকার করিবে না। কারণ ভারতবর্ষ জুলু বা হটেনটটের দেশ নয়। এ দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এখনও যুগাগত ঐক্য ও সংহতির প্রাণশক্তির ধারায় সঞ্জীবিত রহিয়াছে। বহু যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে জাগ্রত এমন একটা জাতিকে পারস্পরিক ভেদ বিদ্বেষের আরণ্য জীবনে লইয়া যাওয়া সুদীর্ঘ কালের জন্য সম্ভব হইতে পারে না। যাহা অসত্য, যাহা অন্যায়, সাময়িকভাবেই তাহা জয়যুক্ত হইতে পারে; কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের উপর বহুদিন প্রভুত্ব বিস্তার করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। ভারতের বুক জুড়িয়া সাম্প্রদায়িক ভেদ-বাদীরা এতদিন ধরিয়া বর্বরতার যে বীভৎস তাণ্ডব চালাইয়া আসিয়াছে, সত্যই আজ তাহার অবসান ঘনাইয়া আসিয়াছে। জাগ্রত জনমতের হুঙ্কারে নিষ্ঠুর স্বৈরাচারীদের কিরীট কাঁপিয়া উঠিতেছে এবং তাহাদের ধ্বজা ধূলায় লুটাইতেও আর দেরী নাই। কাশ্মীরে, জুনাগড়ে ভারতের সব দেশীয় রাজ্যে আমরা সে পরিচয় পাইতেছি।

ভারতীয় মুসলিম সম্মেলন

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক আহূত মুসলিম সম্মেলনের দিল্লী অধিবেশনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলন রাষ্ট্রনীতি হইতে সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধনের আদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া মৌলানা

আজাদ ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজের কর্তব্যের কথা বুঝাইয়া বলেন। মৌলানা সাহেবের মতে লীগের আদর্শ ভারতীয় মুসলমান সমাজের পক্ষে সর্বতোভাবে অনিষ্টকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। মুসলমান সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই যাহাদের কাম্য, এরূপ অবস্থায় লীগের ভেদমূলক মতবাদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার মূলে কোন যুক্তিই তাঁহারা খুঁজিয়া পাইবেন না। সুতরাং এপথ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়তার পথই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান সমাজকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে দ্বিধা পোষণ করিবার কোন অবসর যে নাই, মৌলানা সাহেব সে কথাও বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, গত দশ বৎসর ধরিয়া লীগ সমাজের সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ বিসর্পিত করিয়া রাখিয়াছে, দ্রুত সমাজ দেহ হইতে তাহা বিদূরিত করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য ধর্মগত সংস্কারকে রাজনীতির সহিত না জড়াইয়া দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বহুল প্রচার করা আবশ্যক। বাঙলা দেশের সম্বন্ধে এই সম্পর্কে যদি কোন কথা বলিতে হয়, তবে আমরা বলিব, এই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের প্রচার ও প্রসারের উপরই এখানকার ভবিষ্যৎ শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। দুঃখের বিষয়, মিঃ সুরাবর্দী এপথে চলিতেছেন না। তিনি কূটনীতির পথে লীগের ধর্মগত ভেদবাদকেই জিয়াইয়া রাখিতে উৎসুক। বলা বাহুল্য এপথ মারাত্মক। কারণ, স্বদেশপ্রেমই রাষ্ট্রকে সংহত ও শক্তিশালী করিতে পারে। সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ এই স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বিরোধী। সহযোগী 'আজাদ' লীগের অনুরাগী এবং নীতি হিসাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সহযোগীর আনুগত্য থাকিলেও ভেদবাদমূলক লীগ নীতিরই তিনি কার্যতঃ সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি লীগ-নীতির মূলীভূত এই ত্রুটির কথা সহযোগীকেও পাকে প্রকারে স্বীকার করিতে হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানের সংগঠন তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া গত ২৮শে কার্তিক সহযোগী লিখিয়াছেন—"ওহাবী আন্দোলনের পরে মুসলমানেরা সক্রিয়ভাবে আজাদীর আন্দোলনে বড় বেশী যোগদান করে নাই। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙালী হিন্দু সমাজ যে সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এবং তাহার প্রত্যেকটিতে মধ্যবিত্ত পরিবারই কোন না কোনরূপ নির্যাতন ভোগ করিয়াছে; কাজেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সে সমাজ-চেতনাসম্পন্ন ও নূতন দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ। মুসলমানদের গত দুই পুরুষ সেই নির্যাতন প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করে নাই বলিয়া তাহাদের মধ্যে সে দায়িত্ববোধ ও চেতনার অভাব।" সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলে জনগণের যে দায়িত্ব বা চেতনাবোধ থাকা প্রয়োজন, লীগ তাহা জাগাইতে পারে নাই এবং এইখানেই লীগের সহিত কংগ্রেসের মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বলা বাহুল্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লীগের প্রশংসনীয় অবদান কিছুই নাই। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কল্যাণকামীদিগকে এই সত্যটি সোজাসুজি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক মতবাদকে রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় মর্যাদাবোধ জাগাইতে না পারিলে বর্তমান সমস্যার প্রতীকার হইতে পারে না। লীগের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া মুসলমান সমাজ যত শীঘ্র এই সত্যটি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন এবং কথা ও কাজে তাহা অসংশয়িত চিত্তে সত্য করিয়া তুলিতে অনুপ্রাণিত হন, ততই মঙ্গল।

প্যাটেলের স্পষ্টবাদিতা

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দৃঢ়চেতা এবং স্পষ্টবাদী পুরুষ; এজন্য আমরা তাঁহাকে প্রশংসা করি। সম্প্রতি তিনি জুনাগড়ে গিয়া দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্বন্ধে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেণ্টের নীতি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সর্দারজীর কথায় দুরভিসন্ধি-পরায়ণ ব্যক্তিদের মনের অনেক ঘোট ছুটিয়া যাইবে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "বর্তমানে যে সমস্ত বিপদ দেখা দিতেছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের সম্মুখীন হইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে। পাকিস্থান বোধ হয় ভাবিয়াছিল যে, ভারত সরকার গোলযোগের মধ্য দিয়া চলিতেছে। এই অবস্থায় দেশীয় রাজ্যে গোলমাল সৃষ্টি করিলে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে। আমি তাহাদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিতে চাই যে, এই সমস্ত গোলমাল এক সঙ্গে উপস্থিত হইলেও সেগুলির সম্মুখীন হইবার মত ক্ষমতা আমাদের আছে। যদি তাহারা আমাদের শক্তি পরীক্ষায় সত্যই উদ্গ্রীব হইয়া থাকে, আমরা তাহাতে রাজী আছি।" প্রসঙ্গক্রমে হায়দরাবাদের কথা উত্থাপন করিয়া সর্দারজী বলেন, "হায়দরাবাদ যদি সময়ের নির্দেশানুযায়ী কাজ না করে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা জুনাগড়ের ন্যায়ই দাঁড়াইবে।" বস্তুতঃ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে জুনাগড়ের সমস্যার অবসান হইয়া গিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। এখন তথাকার নবাব বাহাদুর করাচীর পুণ্যতীর্থে পৃষ্ঠপোষক তাঁহার প্রভুবর্গের প্রসাদ যত খুশি আস্বাদন করুন, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। কাশ্মীরের অবস্থাও আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে বলা যায়; শুধু গিলগিট প্রভৃতি কয়েকটি সীমান্তবর্তী স্থানে শীতের এই অবসরে দস্যুদল আত্মগোপন করিয়া থাকিবার সুযোগ পাইবে; সে কিছু দিনের জন্য। ফলতঃ ইহাদের দৌরাত্ম্যপূর্ণ আস্ফালনের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে। হায়দরাবাদের লড়কে লেঙ্গে দলের পক্ষে এ অবস্থা ঠিক সুবিধাজনক নয়, ইহাও বুঝা যায়। তাই দেখিতেছি, হায়দরাবাদের লীগানুরাগী নেতা নবাব ময়েন নওয়াজ জঙ্গ সাহেবের কাছে সর্দার প্যাটেলের পরামর্শ মনঃপূত হয় নাই। তিনি নিতান্ত মোলায়েম ভাষায় বলিয়াছেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মীমাংসায় পৌঁছিতেই তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, এমন অবস্থায় সর্দারজীর উক্তি সমীচীন হয় নাই। নবাব বাহাদুর এবং তাঁহার দলবলের নীতির চাতুরী আমরা বুঝিয়া লইয়াছি। কিন্তু হায়দরাবাদের জনসাধারণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইতে চায়। কূটনীতির কোন খেলাতেই এই দাবীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা যাইবে না, শুধু সর্দারজী কেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয়তার প্রতি মর্যাদাবোধ যাঁহার আছে, তিনিই এমন কথা বলিবেন। গুণ্ডামির জোর ভারতের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বেশীদিন আর চলিবে না, সর্দারজী এই সত্যই অভিব্যক্ত করিয়াছেন এবং এইরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শনের প্রকৃতপক্ষেই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ত্রিপুরা রাজ্যের বিরুদ্ধে কিছুদিন হইতে যে চক্রান্ত পাকাইয়া তোলা হইতেছিল, তাহার জোর ঢিলা হইয়া পড়িতেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃঢ়তাপূর্ণ নীতিরই যে ইহা ফল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন, ত্রিপুরা জেলার চাকলা রোশনাবাদে জমিদারী স্টেটে কতকগুলি অভিসন্ধিপরায়ণ লোক খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করে, সম্প্রতি কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সে আন্দোলন বন্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা পূর্বেই অবলম্বন করা উচিত ছিল। কারণ ঐ আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের শান্তি বিজড়িত রহিয়াছে।

মিঃ সুরবর্দীর নূতন ব্রত

মিঃ সুরাবর্দী কর্মিৎকর্মা পুরুষ। তিনি সকল সময় সংগ্রামশীল মনোবৃত্তি লইয়া চলেন। বিগত কয়েক বৎসর লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের অধিনায়কস্বরূপে এই লীগের সমর-নীতির প্রয়োগক্ষেত্রে আমরা তাঁহার এই শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। বাঙলা লীগের কর্তৃত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া সুরাবর্দী সাহেবের মন নূতন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে উধাও হইয়া ঘুরিতেছে। এখন তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থান উভয় স্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন এবং এতদুদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে লীগের সমরকেন্দ্র করাচী ও

লাহোরে ঘন ঘন ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙলাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার নামে কিছুদিন আগে তিনি শান্তিকামীর যে অভিনয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে কাজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে মিঃ সুরাবর্দীর মনস্বিতা আর পর্যাপ্ত পরিস্ফূর্তি পাইতেছে না। তিনি সেদিন সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান সরকারের কাছে অভিনব কার্যক্রম উপস্থিত করিয়াছেন। উপদেশ দেওয়াতে অবশ্য দোষ নাই এবং বুদ্ধি যাহার আছে তিনি উপদেশ দানের ক্ষমতাও রাখেন; কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার এই শুভবুদ্ধি সুরাবর্দী সাহেবের এতদিন কোথায় ছিল? নোয়াখালিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর যখন অবর্ণনীয় অত্যাচার হইতেছিল, তখন আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য সুরাবর্দী সাহেবের এই মনোবৃত্তির কোন পরিচয় পাই নাই। পক্ষান্তরে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবলম্বিত নীতিকেই তিনি প্রশ্রয় দিয়াছেন বলিয়াই আমরা জানি। বলা বাহুল্য, বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেসব কারণে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে সুরাবর্দী সাহেবের কর্মসাধনার অনেকখানি প্রেরণা কাজ করিতেছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি যদি লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতিকে অনর্থক রকমে প্রশ্রয় না দিতেন, তবে কলিকাতার ঐতিহাসিক নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত না, নোয়াখালিতে বর্বরতার বিক্ষোভ দেখা দিত না এবং বিহার ও পাঞ্জাবে আগুন ছড়াইত না। মিঃ সুরাবর্দীর পূর্বতন সেই মনোভাবের সত্যই পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি? অনেকের মনে এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ রহিয়াছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য শুভেচ্ছা সত্যই যদি তাঁহার অন্তরে দেখা দিয়া থাকে, তবে মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তিমূলক লীগ-নীতি পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শকে তাঁহার সকল মন দিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া কর্তব্য এবং পূর্ব সংস্কার হইতে মুক্ত মনে লীগের বিগত কয়েক বৎসরের কর্মতৎপরতাকে তাঁহার বিচার করা দরকার। যদি তিনি সেভাবে বিচার করিতে সমর্থ হন, তবে বুঝিতে পারিবেন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে লীগের প্রশংসনীয় অবদান কিছুই নাই। লীগ স্বদেশপ্রেম জাগায় নাই, মানবতার বিরোধী মনোভাব লইয়া সে আগাগোড়া চলিয়াছে। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিদেশী বিজেতাদের বিরুদ্ধে লীগ এক ফোঁটা রক্তও ব্যয় করে নাই, পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্ররোচনার পথে লীগ নির্দোষ নরনারীর বুকের রক্তে ভারত সিক্ত করিয়াছে। মানবতা-বিরোধী এই বিদ্বেষের বলে লীগ আজ পাকিস্থান লাভ করিতে পারে; কিন্তু ধ্বংসমূলক সে নীতিকে সম্বল করিয়া স্থায়ীভাবে কোন রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইহা সূর্যের আলোর মতই সুস্পষ্ট যে, পাকিস্থানের অধিনায়কগণ যদি লীগ-নীতির প্রাণবস্তু ভেদ ও বিদ্বেষবুদ্ধি এবং তাহার মূলীভূত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রনীতি হইতে পরিহার করিতে না পারেন, তবে বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত লীগের সৌধ তাসের ঘরের মতই ভাঙিগয়া পড়িবে। লীগের নায়কেরা দুই জাতির নীতি মানাইবার জন্য যত তর্জন গর্জনই করুন না কেন, শুধু জিগীরের জোরে পাকিস্থানকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না; কারণ নৈতিক যুক্তির জোর গলার জোরের অনুপাতে বাড়ে না। ফলত উদারতা, স্বদেশপ্রেম এই সব মানবোচিত মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রগঠনের মূলে শক্তি জোগায়। লীগ সেদিক হইতে গর্ব করিবার মত কোন শক্তিরই এ পর্যন্ত পরিচয় দিতে পারে নাই।

আচার্য কৃপালনীর সতর্কবাণী

আচার্য কৃপালনী কংগ্রেসের সভাপতি-পদ ত্যাগ করিয়াছেন এবং ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার স্থলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রবীণ জননায়ক। দুই দুইবার তিনি রাষ্ট্রপতির আসনে সমাসীন হইয়া তাঁহার নেতৃত্ব-শক্তি এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা জাতির সর্বাধিনায়কস্বরূপে তৃতীয়বার সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক। জাতির পরম দুর্যোগের সন্ধিস্থলে তিনি যে অপরিসীম যোগ্যতা এবং মনস্বিতার সঙ্গে জাতিকে পরিচালিত করিয়াছেন, দেশ তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবে না। রাষ্ট্রপতিস্বরূপে তিনি নিঃ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সর্বশেষ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা নানা দিক হইতেই উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। ভারতে রাষ্ট্রে যে পরিবর্তন এবং তৎসহ পাকিস্থানের মনোভাবের ফলে যে সকল জরুরী সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তিনি অবিলম্বে সেইগুলির সন্তোষজনক সমাধানের অপরিহার্যতার কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, —"আমি অহিংসায় আস্থাবান; কিন্তু বল-প্রয়োগের পিছনে যে ন্যায়সঙ্গত দাবী আছে, তাহাও আমি বুঝি। সকল রাষ্ট্রের মত আমাদের রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী আছে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে তাহাও আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। আমার মতে সর্বপ্রকার দুর্বলতাই পাপ। সেই পাপের প্রশ্রয় দেওয়া অপরাধ। যদি মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত অহিংসার পথে অগ্রসর হইয়া শক্তি আমরা সঞ্চয় করিতে না পারিয়া থাকি, তাহা হইলে বল-প্রয়োগের শৃঙ্খলাপূর্ণ শক্তির পরিচয় দিতে আমরা যেন অক্ষম না হই। আমাদের আয়োজন অসম্পূর্ণ থাকিবার কোন কারণ নাই। প্রচুর দ্রব্যসম্ভার রহিয়াছে, প্রয়োজনাতিরিক্ত লোকবল রহিয়াছে। প্রয়োজন শুধু উদ্যোগের। প্রতিটি নগরে, প্রতিটি শহরে, প্রতিটি পল্লীতে সশস্ত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ গণ-বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই বাহিনী সংগ্রামে বা শক্তিতে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিবে।" আচার্য কৃপালনীর এই উক্তির গুরুত্ব আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। পাঞ্জাবের বিপর্যয় সম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ পূর্ব হইতে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, পণ্ডিত জওহরলাল তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য কৃপালনী বাঙলার কথাও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙলা এখনও পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু, বেলুচিস্থান হইতে অনেক ভাল আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, "বাঙলায় পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান, সীমান্ত প্রদেশ বা সিন্ধুর ঘটনা ঘটিবে না যদি কেহ ইহা কেহ বলেন, তবে তাঁহাকে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাহীন ভবিষ্যৎ বক্তা বলিলে অন্যায় হইবে না। এ বিষয়ে পাকিস্থান কি করিবে, তাহাই কি চিরদিনই আমাদের বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে? বস্তুত বাঙলাদেশে অশান্তি ঘটিবার কোন কারণ দেখা দিয়াছে, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। আমরা আশা করি, পাঞ্জাব বা সীমান্ত প্রদেশে যেরূপ অসভ্য বর্বর উপদ্রব ঘটিয়াছে, বাঙলায় তাহা সম্ভব হইবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এ সত্যকেও অস্বীকার করিলে চলিবে না, যে পূর্ব পাকিস্থানের নীতির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র বাঙলায় নহে। বাঙলার বাহিরে অবাঙালীর হাতে সে নীতি-নিয়ন্ত্রণের সর্বময় অধিকার রহিয়াছে, সুতরাং আমাদের পক্ষে সে নীতির ভবিষ্যৎ পরিণতি অনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় সমগ্র বাঙলার শান্তিকে সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই পশ্চিম বঙ্গের সরকারকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় দেশরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন এবং পশ্চিম বঙ্গে তরুণদিগকে অবিলম্বে সমর-স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা দরকার। আমরা লীগের ঝটিকা-নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার এবং সংযত রাখিবার পক্ষে ইহাই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানসম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করি।

জুনাগড়ের কথা

শ্রী যতীন্দ্র সেন

জুনাগড়ের ভৌগোলিক বিবরণ

ভারতের পশ্চিমে আরব সাগরের দিকে যে ভূ-খণ্ড ঠিক যেন ঠোঁটের মতো বেরিয়ে আছে, তাকে বলা হয় কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপের উত্তরে কচ্ছ উপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্বদিকে কাম্বে উপসাগর। কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত জুনাগড় রাজ্য।

কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে মোট ২৬৮টি দেশীয় রাজ্য, জায়গীর ও তালুক বর্তমান। সমগ্র উপদ্বীপটিতে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন যেন শাখা-প্রশাখা মেলে ছড়িয়ে আছে।

কাথিয়াবাড়ের ২৬৮টি রাজ্য, জায়গীর ও তালুকের মধ্যে মাত্র ১৬টির নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ শাসনের আমলে এই ১৬টি রাজ্যের তোপ-ধ্বনি দ্বারা সম্মানিত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছিল। অবশ্য এই বিশেষ 'সম্মানিত' রাজ্য কয়েকটির মধ্যে জাফরাবাদের মতো এত ক্ষুদ্র রাজ্যও আছে, যার আয়তন মাত্র ৫৩ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১৩,৮৩৭। এই ষোলটি রাজ্যের নাম কচ্ছ, জুনাগড়, নবনগর, ভবনগর, পোরবন্দর, ধ্রাংগোধ্রা, রাধানপুর, মোর্ভি, গোন্ডাল, জাফ্রাবাদ, ওয়াংকানের, পালিতানা, ধ্রোল, লিম্বড়ি, রাজকোট ও ওয়াধওয়ান।

জুনাগড়ের বর্তমান নবাব মহব্বৎ খাঁ

জুনাগড়ের আয়তন ৩,৩৩৭ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৬,৭০,৭১৯। অধিবাসিগণের শতকরা ৮২ জনই হিন্দু ও অন্যান্য, অবশিষ্ট মুসলমান। উল্লিখিত ষোলটি স্টেটের মধ্যে লোকসংখ্যার দিক থেকে জুনাগড়ের স্থান প্রথম, ইংরেজ প্রদত্ত সম্মানের দিক থেকে দ্বিতীয়, আর আয়তনের দিক থেকে তৃতীয়।

জুনাগড়ের সমুদ্রবর্তী তীরভূমির দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল এবং ১৭টি ছোটখাটো বন্দর আছে, তার মধ্যে ভেরাবল প্রধান। ভেরাবল প্রাচীন যুগের প্রভাস বা আধুনিক সোমনাথ-পত্তনে অবস্থিত।

এশিয়াখণ্ডের মধ্যে একমাত্র জুনাগড়ের গির্-অরণ্য অঞ্চলেই পশুরাজ সিংহের ক্ষয়িষ্ণু বংশধরার অবশিষ্ট কয়েকটি অদ্যাপি বিদ্যমান।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচিতি

বহু পবিত্র পৌরাণিক স্মৃতি-বিজড়িত প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র বর্তমান জুনাগড় রাজ্য পৌরাণিক সৌরাষ্ট্র এবং পরবর্তীকালে সোরাঠ নামে পরিচিত ভূমির (বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সমুদ্রকূলবর্তী বন্দর সুরাট নয়) অন্তর্গত।

জুনাগড় রাজ্যের পশ্চিম সীমায় সমুদ্র-তীরে পুরাণপ্রসিদ্ধ 'প্রভাস' ও আধুনিক প্রভাসপত্তন অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন। এই প্রভাসপত্তনের 'দেহোৎসর্গ' নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছিল।

জুনাগড়ে সম্রাট অশোক, রুদ্রদমন মহাক্ষত্রপ ও স্কন্দগুপ্তের প্রস্তর-শাসন অদ্যাপি বর্তমান।

পৌরাণিক যুগে সৌরাষ্ট্রভূমি, অর্থাৎ আধুনিক জুনাগড়, যদুবংশের, তথা শ্রীকৃষ্ণের শাসনাধীন ছিল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জুনাগড়সহ সমগ্র কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ, গুজরাট মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধীন হয়। চন্দ্রগুপ্তের পর জুনাগড়সহ সমগ্র উপদ্বীপটি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

পরবর্তীকালে জুনাগড় রাজা রুদ্রদমন মহাক্ষত্রপের শাসনাধীন হয়। একদা এই ভূমিতে স্কন্দ গুপ্তেরও শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বল্লভী বংশের ধ্রুবাসনও এখানে এক সময় রাজত্ব করেছিলেন।
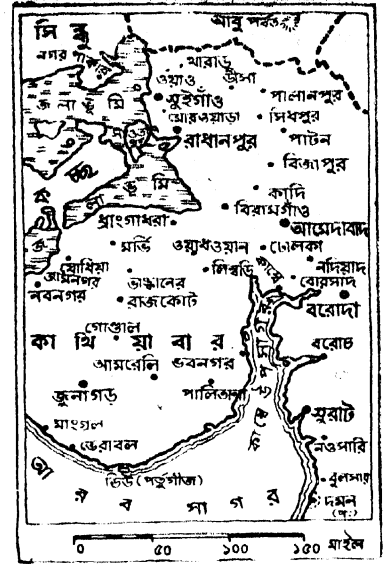
খৃষ্টীয় ৮৯৩ থেকে ৯০৭ অব্দ পর্যন্ত সমগ্র কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ প্রথম মহেন্দ্র পালের শাসনাধীন ছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে কাথিয়াবাড় গুর্জর-প্রতিহারসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এক সময় প্রাচীন সৌরাষ্ট্রভূমি পঞ্চসরের চাপোৎকট বংশীয় নৃপতি কর্তৃক বিজিত হয়েছিল। চাপোৎকটরা 'চাবড়া' (Cavada) 'চাওরারা' (Cawara), চৌড় বা চৌর (Cauda or Caura) নামেও পরিচিত ছিল।

কাথিয়াবাড়ে প্রথম মহেন্দ্র পালের রাজত্বের পর (৯০৭ খৃঃ) প্রথম মহীপালের শাসনকালে গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে। তার ফলে কাথিয়াবাড়ে চালুক্যবংশীয়দের প্রাধান্য ঘটতে থাকে। গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের চালুক্যবংশের

জুনাগড়ের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রনায়ক শ্যামলদাস লক্ষ্মীদাস গান্ধী

প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজের সম্বন্ধে প্রচলিত গুজরাটী কাহিনী থেকে জানা যায়, চৌরবংশের শেষ রাজা সামন্ত সিংহের রাজত্বকালে (৭২০-৯৫৬ খৃঃ) কান্যকুব্জের অন্তর্গত কল্যাণকটকের রাজা ভুবনাদিত্যের তিন পুত্র রাজি, বিজা ও দণ্ডক ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ ধারণ করে সোমনাথে তীর্থভ্রমণে আসেন। সোমনাথ-গমনের পথে সামন্ত সিংহের পদাতিক সৈন্যগণের কুচকাওয়াজ দেখে সেই সম্বন্ধে রাজি মন্তব্য প্রকাশ করেন। এতে সামন্ত সিংহ রাজির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে স্বীয় কন্যা লীলাবতীর বিবাহ দেন। লীলাবতী গর্ভাবস্থায় মারা গেলে তাঁর পেট চিরে এক জীবিত সন্তান বের করা হয়। মূলা নক্ষত্রে পেট চিরে সন্তান বের করার জন্য এই সন্তানের নাম রাখা হয় মূলরাজ বা মূলারাজ। ইনিই গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের চালুক্যবংশের আদি-পুরুষ বলে খ্যাত।

মূলরাজ ৯৪১ থেকে ৯৯৬ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বলে অনুমিত হয়।

এক ঐতিহাসিক মতে মূলরাজের মৃত্যুর ২৫ বৎসর পর ভীম কাথিয়াবাড়ের রাজা হ'ন। অন্য এক ঐতিহাসিক মতে মূলরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চামুণ্ড, তার পর তাঁর পুত্র বল্লভরাজ, তাঁর পর বল্লভরাজের ভ্রাতা দুর্লভ-রাজ এবং দুর্লভরাজের পর তাঁর ভ্রাতা নাগরাজের পুত্র ভীম রাজা হ'ন।

ভীমের রাজত্বকালেই ১০২৫ খৃষ্টাব্দে গজনির সুলতান মামুদ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। "কিতাব-জৈন-উল্-আখবার-"এর মতে সোমনাথের মন্দিরে শিবলিঙ্গ ছাড়াও বহু রৌপ্য ও স্বর্ণনির্মিত দেববিগ্রহ ছিল।

হিন্দু রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বার পর জুনাগড় ক্রমাগত আব্দুর রহমান-এল-মুরী, খলিফা-এল মনসুর, আলা-উদ্দীন খিলিজি, মহম্মদ তোগলক, আমেদা-বাদের সুলতান মহম্মদ বেগ্রা, সম্রাট আকবর ও আওরঙ্গজেবের সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হতে থাকে। অবশেষে সমগ্র কাথিয়াবাড় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আধুনিক জুনাগড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

জুনাগড়ের বর্তমান নবাবের পূর্বপুরুষ আফগানিস্থানের 'ইউসুফজাই' পাঠান জাতীয় বাবি-বংশীয়গণ সেই বংশের ওসমান খাঁর নেতৃত্বে হুমায়ুনের সঙ্গে ভারতে আগমন করে। ওসমান খাঁ মোগলদরবারে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁ সম্রাট শাহজাহানের প্রিয় পাত্র হ'ন এবং গুজরাটের কয়েকটি গ্রাম জায়গীর স্বরূপ পান। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর খাঁর পুত্র শের খাঁ মুরাদের সঙ্গে গুজরাটে যান এবং তিনি ও তাঁর চার ছেলে মোগলদের পক্ষে যুদ্ধ করে, বিদ্রোহ দমন করে প্রতিপত্তি লাভ করেন। শের খাঁর ছেলেরা রাধানপুরে, বালাসিনোর ও রণপুরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে শের খাঁ মোগলশক্তির পতনের সময় নবাব বাহাদুর খাঁ বাবি বাহাদুর নাম গ্রহণ করে' নিজেকে জুনাগড়ের স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করেন। ইনিই প্রথম বাহাদুর খাঁ এবং বর্তমান জুনাগড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

জুনাগড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম বাহাদুর খাঁ বাবি-বাহাদুরের একখানি প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি

প্রথম বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম মহব্বৎ খাঁ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে জুনাগড়ের নবাব হন। অতঃপর যাঁরা পর পর জুনাগড়ের গদিতে আরোহণ করেন, তাঁদের নাম ও খৃষ্টাব্দ ক্রমিকভাবে উল্লেখ করা গেলঃ—প্রথম হামিদ খাঁ (পুত্র,—১৭৭৪), দ্বিতীয় বাহাদুর খাঁ (পুত্র,—১৮১১), দ্বিতীয় হামিদ খাঁ (দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র,—১৮৪০), দ্বিতীয় মহব্বৎ খাঁ (ভ্রাতা—১৮৫১), তৃতীয় বাহাদুর খাঁ (পুত্র,—১৮৮১), রসুল খাঁ (ভ্রাতা,—১৮৯২)।

রসুল খাঁর পর বর্তমান নবাব মেজর সার তৃতীয় মহব্বৎ খানজী-রসুল খানজী বাবি-বাহাদুর ১৯১১ সালের ২রা জানুয়ারী জুনাগড়ের গদিতে আরোহণ করেন এবং ১৯২০ সালের ৩১ মার্চ রাজ্যের পূর্ণ কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন।

জুনাগড় রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও তার পরিণতি

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই জুনাগড়ের নবাব এরূপ অভিমত প্রকাশ করে আসছিলেন যে, তিনি অন্যান্য প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন না। কিন্তু ভারতীয়গণের নিকট ব্রিটিশ কর্তৃক শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের দিবস, গত ১৫ই আগষ্ট জুনাগড় পাকিস্থান ইউনিয়নে যোগদান করে।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীর ইম্পি-রিয়াল হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নবনগর-অধিপতি জামসাহেব এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে বলেন যে, জুনাগড়ের রাজ্যের ভৌগোলিক সংস্থান এমনই যে, এই রাজ্যের

জুনাগড়ের প্রভাসপত্তনে অবস্থিত গজনির সুলতান মামুদ কর্তৃক ১০২৫ খৃষ্টাব্দে লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত সোমনাথের মন্দির

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অন্য রাজ্যের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত। এই সমস্ত অংশ দিয়ে যাতায়াতকারী লোকজন জুনাগড়ের সৈন্যগণ দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে। বেলুচী, পাঞ্জাবী ও সিন্ধী মুসলমান সৈন্য ও পাকিস্থান থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ জুনাগড়ে আমদানী করা হচ্ছে। জুনাগড়ের প্রধান বন্দর ভেরাবলে পাকিস্থানের রণতরী 'গোদাবরী' ও সৈন্যবাহী অপর দুটি জাহাজ পেঁছেছে। এই সময়ের আট মাস আগে শোনা গিয়েছিল যে, সিন্ধু ও কচ্ছের ভিতর দিয়ে আগত জুনাগড় ও হায়দরাবাদ থেকে অগ্রসর সৈন্যদলের চাপে ভারতীয় রাষ্ট্রকে উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত করে ফেলা হ'বে এবং কাথিয়াবাড়ের অন্যান্য দেশীয় রাজ্য লুপ্ত হ'বে। পুলিশ, সৈন্যবিভাগ ও জনরক্ষিবাহিনী মুসলমানদের দিয়ে গঠিত। নানা কারণে আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুরা জুনাগড় ত্যাগ করে রাজকোট, জেঠপুর ও অন্যান্য স্থানের আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করছে।

জুনাগড় রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রে ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য বিভাগ এক ইস্তাহার প্রকাশ করে' জুনাগড়ের সমস্যা গণভোটের দ্বারা মীমাংসা করবার প্রস্তাব করেন। এই দিন বোম্বাইয়ের মাধববাগে প্রবাসী জুনাগড়ের অধিবাসিগণের সভায় জুনাগড়ের ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুত শ্যামলদাস লক্ষ্মীদাস গান্ধীর নেতৃত্বে অন্যান্য পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে যে অস্থায়ী জুনাগড় সরকার গঠিত হয়, ভারত সরকার তা মেনে নেন। এই অস্থায়ী সরকার জুনাগড়ের জনগণের নিকট গত ২৫শে সেপ্টেম্বর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

অতঃপর অস্থায়ী সরকার জুনাগড়ের নবাব সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কর্মসূচী অনুযায়ী সৈন্য সংগ্রহ করে একটির পর একটি গ্রাম দখল করতে থাকেন। গ্রামবাসিগণ জাতীয় সরকারের সৈন্যগণকে বিপুলভাবে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে থাকে। জুনাগড়ের নবাব-সৈন্যদের সঙ্গে অস্থায়ী সরকারের সৈন্যগণের সংঘর্ষ হতে থাকে। তাতে উভয় পক্ষের কিছু সৈন্য হতাহত হয়।
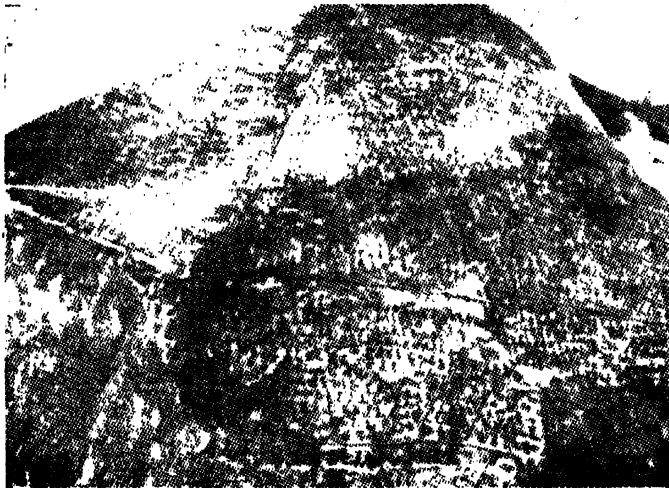
গত ৯ই নবেম্বর জুনাগড়ের দেওয়ান শাহ্ নওয়াজ ভুট্টো রাজকোটের আঞ্চলিক কমিশনারের নিকট লিখিত এক পত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে জুনাগড়ের শাসনভার গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। কয়েকটি মাঝারি ট্যাঙ্কসহ এক ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য গত ৯ নবেম্বর অপরাহ্ন ৬টায় জুনাগড়ের দখল নেওয়ার জন্য জুনাগড়ে প্রবেশ করে এবং তারা রাস্তার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান স্থানীয় অধিবাসিগণ কর্তৃক সাদরে অভিনন্দিত হয়। জুনাগড়ে নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন। বর্তমান ঘটনাবলী থেকে বোঝা যাচ্ছে জুনাগড়ের উপর নবাব মহব্বৎ খাঁর অধিকার লুপ্ত হ'তে বসেছে। জুনাগড়ের এই ঘটনা থেকে হায়দরাবাদেরও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। বর্তমান যুগে জনগণের মত উপেক্ষা করে কোন রাজাই যে আর স্বৈরতন্ত্র চালাতে পারেন না, জুনাগড়ই তার প্রমাণ।

জুনাগড়ের গির্ পাহাড় অঞ্চলে সম্রাট অশোকের প্রস্তর-শাসন

(৬)

কথাটা সীমাচলম বলে ফেলে একদিন।

ঠিক কাশিমভাইয়ের কাঠের কারখানার পাশে প্রকাণ্ড একটা বাগান পড়েছিল অনেকদিন ধরে। ফল আর ফুলের গাছ গাছড়ায় ভরা প্রকাণ্ড বাগান—কিন্তু উপেক্ষিত আর অযত্ন-বর্দ্ধিত। কোন এক সময়ে এইসবের খেয়াল ছিল কাশিমভাইয়ের যৌবনের প্রথম ঝোঁকে। তারপর কাজকারবারে জড়িয়ে পড়ে একঘর ছেলেপুলে নিয়ে এইসব বিলাসের আর অবসর হয়নি তার। সেই বাগানের ঠিক মাঝখানে একতলা কাঠের বাংলো হয়ত একসময়ে কাশিমভাইয়ের প্রমোদ-ভবনই ছিল। কিন্তু বহুদিন সংস্কারাভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

এই বাংলোখানাই চেয়ে নেয় সীমাচলম।

ঃ কেন, আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে না কি এখানে? কাশিমভাই রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েন যেন।

ঃ না, না, ও কথা বলবেন না। আমি নির্জনে একটু পড়াশোনা করতে চাই। তাই বলছিলাম, ও বাংলোটা তো আপনার পড়েই আছে।

ঃ বেশ তো তা আর কি, আমি আজই ম্যানেজারকে ডেকে মেরামত করতে বলে দিচ্ছি ঘর দুটো। অনেকদিন ব্যবহার হয়নি কি না।

ঘর দুটো মেরামত হয়ে যায় বেশ ভালো মতেই। বাগানটারও সংস্কার হয় কিছুটা। নির্জন পরিবেশে ভালোই লাগে সীমাচলমের। সকালে আর বিকেলে কাশিমভাইয়ের বাড়িতে পড়িয়ে আসে সীমাচলম—তারপর অখণ্ড অবসর। শঙ্করণের কাছ থেকে প্রচুর বই যোগাড় করেছে সে, কাশিমভাইয়ের লাইব্রেরী থেকেও নানান রকমের বই নিয়ে আসে মাঝে মাঝে। কাশিমভাই বোধ হয় কোনদিন পাতা উল্টিয়েও দেখেননি এসব বইয়ের। কিন্তু বড়লোকের খেয়াল লাইব্রেরী একটা থাকা চাই বৈ কি! দেশ বিদেশ থেকে মোটা মোটা পার্শেলে নানারকমের বই আসে কাশিমভাইয়ের নামে।

দিনগুলো একটানা মন্দ কাটে না সীমাচলমের।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সমস্ত কিছু নতুন-রূপ নেয় যেন। খাওয়া দাওয়ার পরে বিছানায় বসে বসে কাশিমভাইয়ের ছেলেমেয়েদের অঙ্কের খাতা দেখছিলো সীমাচলম, এমন সময় হঠাৎ কড়া নাড়ার আওয়াজে ও চমকে ওঠে। ঠিক দুপুর বেলা আবার কে আসলো বিরক্ত করতে! সময়ে অসময়ে শঙ্করণই আসে ওর কাছে, কিন্তু কদিন ধরে পাত্তা নেই শঙ্করণের। কোথায় বুঝি শীকার করতে গেছে সে। সীমাচলমকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলো সে, কিন্তু এসব ভালো লাগে না সীমাচলমের। ঘাস আর নলখাগড়ার বন ভেঙে আধ মাইল জলার মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে বনতিতির আর বালিহাঁস মারার ধৈর্য নেই ওর। তাছাড়া সামনেই কাশিমভাইয়ের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা—এ সময়ে কোথাও নড়বার ফুরসৎ নেই তার।

দরজা খুলে দেখলো সীমাচলম কাশিমভাইয়েরই এক চাকর দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, হাতে তার গোটা তিনেক বই।

ঃ কি ব্যাপার?

ঃ আজ্ঞে নতুন-মা পাঠিয়ে দিলেন এই বই কটা। আজকের সকালের মেলে এসে পৌঁছেচে বইগুলো।

তার হাত থেকে বইগুলো নেয় সীমাচলম। হামিদাকে নতুন মা বলে চাকরবাকরেরা। কিন্তু হামিদা কেন পাঠাতে গেলো এইসব বই তাকে! কাশিমভাইয়ের কাছে বলা আছে নতুন কোন বই এলে তার কাছেই আসে সমস্ত বই। সে বইয়ের নম্বর দিয়ে লাইব্রেরীর তালিকাভুক্ত করে নেয়। লাইব্রেরীর দেখাশোনার ভারটাও এসে পড়েছে তার ওপরে।

কিন্তু এসব কথা নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামায় না সীমাচলম। প্রভুর বদলে প্রভুপত্নীই যদি পাঠিয়ে থাকে বইগুলো—তাহ'লেই বা কি এমন অশুদ্ধ হয়ে গেছে সব? সীমাচলমকে চেনে না কি হামিদাবানু। বহুদিনের ফেলে আসা সন্ধ্যার সামান্য একটা ঘটনা মনে রেখেছে নাকি হামিদাবানু। তা ছাড়া হামিদাবানুর সংগে দেখা হবার কোনরকম অবকাশ দেয়নি সীমাচলম। এই সবের ভয়েই সে সরে এসেছে কাশিমভাইয়ের বাড়ি থেকে। কি জানি যদি মুখোমুখি দেখাই হয়ে যায় কোনদিন।

বইগুলো হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে সীমাচলম। তিনখানি বইই ভারতে মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লেখা। লেখক খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি। এঁর লেখা আরও দু'একবার পড়েছে সীমাচলম। বর্মা সম্বন্ধেও কয়েকটা অধ্যায় লেখা আছে। কিভাবে মণিপুর গিরিরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করলো মুঘল কৃষ্টি আর সভ্যতা। সুজার পলায়ন কাহিনী, আরাকান রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া থেকে শুরু করে বর্মার রাজধানীতে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শার মৃত্যুকাহিনী পর্যন্ত ভারি মনোজ্ঞ করে লেখা আছে। পড়তে পড়তে তন্ময় হ'য়ে যায় সীমাচলম। কয়েকটা পাতা উল্টানোর সংগে সংগেই কিন্তু ও চমকে উঠে বসে। ছোট সবুজ রংয়ের খাম একটা পিন দিয়ে আঁটা পাতাটার ওপরে। এ আবার কি! বিছানার ওপরে উঠে বসে সীমাচলম। কম্পিত হাতে খামটা খুলে ফেলে। সবুজ রংয়ের কাগজে দুলাইন লেখা শুধু

'বিদেশী বন্ধু,

তোমাকে প্রথম দিনেই আমি চিনেছি। তোমার সংগে আমার কোথায় দেখা হতে পারে জানাবে। —হামিদাবানু।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে সীমাচলমের। একি! একি করেছে হামিদা? অনেক দিন আগেকার সামান্য একটু চেনাকে অনায়াসেই তো ভুলে যেতে পারতো সে। কোটিপতির পরিণীতা স্ত্রী আজ সে, তার প্রভুপত্নী—এ সমস্ত বুঝেও কি আত্মসংবরণ করতে পারেনি হামিদা। চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো সীমাচলম। কিন্তু ছিঁড়েও শান্তি নেই তার। কি জানি হাওয়ায় যদি বাইরে যায় কাগজের টুকরোগুলো। হারেমের পবিত্রতা নষ্ট হবে যে শুধু তাই নয় বিশ্রী একটা হৈ চৈ শুরু হবে চারদিকে। অতীতকে আর স্বীকার করতে চায় না সীমাচলম। ফেলে আসা সব কিছু নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে ওর জীবন থেকে।

কাগজের টুকরোগুলো এক সঙ্গে করে জ্বালিয়ে দেয় সীমাচলম। মিষ্ট একটা গন্ধ বেরোয় কাগজের টুকরোগুলো থেকে—হামিদার চুলেও ঠিক এমনি গন্ধ পেয়েছিলো সীমাচলম প্রথম দিন। চেয়ে চেয়ে দেখে সীমাচলম—বিবর্ণ হ'য়ে আসে সবুজ কাগজের টুকরোগুলো তারপর এক সময়ে সব ছাই হয়ে যায়।

সেদিন বিকালে সালুইন নদীর ধার দিয়ে অনেক দূরে চলে যায় সীমাচলম। রবার গাছের ঘন অরণ্য—অশ্রান্তভাবে ঝিঁঝির একটানা ডাক। নদীর জলে পা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ সে ব'সে রইলো। বাড়ি ফিরলো যখন, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। শুক্লপক্ষের রাত—পাতলা জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে পথঘাট। আজকে আর পড়াতে যাবার হাঙ্গাম নেই। শুক্রবারে পড়ে না ওরা—সপ্তাহে এই দিনটাই ছুটি পায় সীমাচলম।

মন ঠিক করে ফেলেছে সীমাচলম। এসব আর নয়। কাশিমভাইয়ের সমস্ত বিশ্বাস

ভেঙে চুরমার ক'রে দিতে কিছুতেই সে পারবে না। শান্ত পরিমিত জীবন এসব ছেড়ে প্রদেশ থেকে প্রদেশে ঘুরে বেড়ানো আর সম্ভব হবে না তার দ্বারা। তার দিক থেকে কোন সাড়া না পেলেই নিস্তেজ হ'য়ে যাবে হামিদা। এক সময়ে ভুলে যাবে ওকে—কিন্তু ঘরভাঙার মন্ত্র সীমাচলম কোনদিন শোনাবে না ওকে—যে মন্ত্র সর্বনাশ এনেছে ওর জীবনে।

মাঝে মাঝে অন্য কথাও মনে হ'য়েছে সীমাচলমের। প্রণয়নিবেদন তো নাও হ'তে পারে, হয়ত কোন একটা কথাই আছে ওর সঙ্গে। একথা কিন্তু মনে ধরেনি তার। কি এমন কথা থাকতে পারে ওর সঙ্গে যার জন্য এভাবে চিঠি পাঠালো হামিদা। না আর নয়, নিজের অন্নেরই ঠিক নেই ওর, কোন সাহসে ওর ছন্নছাড়া জীবনে আর একজনকে ডেকে আনবে পাশে।

মাঝ রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। অনেক দূরে থেকে কিসের যেন শব্দ ভেসে আসছে। অনেকগুলো লোকের সম্মিলিত গলার আওয়াজ। বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠে পড়ে সীমাচলম। ফটক পার হ'য়ে রাস্তায় এসেই থমকে ও দাঁড়িয়ে পড়ে।

সালুইন নদীর বুকে কতকগুলো শাম্পান দেখা যাচ্ছে—অন্ততঃ গোটা দশেকের কম নয়। প্রত্যেক শাম্পানে জ্বলছে অনেকগুলো মশাল। সেই কম্পমান মশালের আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে সব কিছু। এপারেই আসছে শাম্পানগুলো—মাঝে মাঝে ভীষণভাবে চীৎকার ক'রে উঠছে বর্মী ভাষায়। কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলো না সীমাচলম কিন্তু দু একটা যা বুঝতে পারলো তাতেই শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো সে।

জ্বালিয়ে দাও জেরবাদী-কালার কাঠের মিল। ম্যানেজারকে টেনে এনে সমস্ত শরীর ঝলসে দাও মশালের আগুনে। আমাদের ইজ্জৎ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে কালারা।

প্রথমে মনে হয় সীমাচলমের—ডাকাতই হবে বুঝি এরা। ওপার থেকে লুঠ করতে এসেছে কাশিমভাইয়ের কুঠি আর কাঠের মিল। কিন্তু ইজ্জতের কথা কি বলছে এরা? ডাকাতের আবার কিসের ইজ্জত।

দেরী করে না সীমাচলম। প্রাণপণে দৌড়ে কারখানায় গিয়ে হাজির হয়। কারখানাতেও হৈ চৈ শুরু হ'য়েছে। চৌকিদারেরা জেগে উঠেছে। কারখানার ভিতরেই ম্যানেজার সায়েবের বাংলো। কারখানার গেট পার হ'য়ে ম্যানেজার সায়েবের বাংলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সীমাচলম। মিঃ নায়ারও উঠে পড়েছিলেন। নৈশবেশের ওপরে লম্বা কোট চড়িয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নেমে এসেছেন নিচেয়।

ঃ আ, কি ব্যাপার বলুন তো?

ঃ ঠিক বুঝতে পারছি না, ডাকাতি ব'লেই মনে হচ্ছে। কিন্তু কাঠের কারখানায় কি লুটতে আসছে ওরা ঃ মিঃ নায়ারকেও উত্তেজিত মনে হয়।

ঃ কিন্তু কাশিম সায়েবের কুঠি লুঠ করতে আসছে না তো ওরা।

ঃ কাশিম সায়েবের কুঠি? কি জানি, আজ চল্লিশ বছর উনি আছেন এখানে—আশে পাশের গ্রামের সকলেই ভয় করে ওঁকে। বুঝতে পারছি না কিছু ঃ কথাগুলো বলেই ম্যানেজার ছুটে যান গেটের দিকে ঃ সমস্ত লোহার দরজা বন্ধ করে দাও কারখানার। আমাদের যে গোটা দশেক বন্দুক আছে সমস্ত নিয়ে তৈরী হয়ে থাকো সবাই।

এপারে এসে লাগে সাম্পানগুলো। মশালহাতে করে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে সবাই কাদার ওপরে। বিশ্রী একটানা গোলমাল—একটানা চীৎকার, ঠিক বোঝা যায় না কথাগুলো। কাশিমভাইয়ের কুঠির দিকে নয়—মিলের দিকেই এগিয়ে আসে সকলে। মশালের আলোয় চকচক করে উঠে ধারালো দা আর শড়কীর ফলাগুলো। মিলের কাছ বরাবর আসতেই গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়। ফাঁকা আওয়াজ, কিন্তু তাতেই কাজ হয় যথেষ্ট। জনতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মিলের ফটকের সামনে। দোতলার ওপর থেকে আওয়াজ করেছিলেন মিঃ নায়ার। সেইদিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে সকলে। ম্লান চাঁদের আলোয় বীভৎস দেখায় কঠিন মুখগুলো বর্মীদের। পাথরের তৈরী বলে মনে হয়। মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়—উড়ছে অবিন্যস্ত চুলের রাশ আর জ্বলে জ্বলে উঠছে ছোট ছোট রক্তাভ চোখগুলো তাদের।

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চীৎকার করে ওঠে কয়েকজন ঃ নেমে এসো সামনে। এদেশের মেয়েদের ইজ্জতের কতখানি দাম তা ভালো করে জানিয়ে দিই কালাদের।

উপর থেকে চীৎকার করে ওঠেন মিঃ নায়ার—কি বলতে চায় তারা, কিসের ইজ্জত, মানে মানে যদি না হঠে যায় তো গুলি করতে বাধ্য হবে মিলের দারোয়ানরা। প্রাণের মায়া যদি থাকে তো এক পা যেন এগোয় না কেউ।

ঃ কিসের ইজ্জত! বিকট আওয়াজ ক'রে ওঠে প্রৌঢ় গোছের একজন। চীৎকার করে উঠেই ভীড় ঠেলে পিছনে ঢুকে যায় সে। তারপর একটু পরেই ক'জন যেন ধরাধরি করে কি একটা নিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলে কারখানার ফটকের সামনে।

মশালের আলোয় দিনের মত স্পষ্ট দেখায় সব কিছু। সীমাচলম আর মিঃ নায়ার প্রায় একসংগেই আর্তনাদ করে ওঠেন। বীভৎস দৃশ্য—বিস্ফারিত চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে সীমাচলম।

শঙ্করণ নায়ারের ক্ষতবিক্ষত শব। চোখদুটো উপড়ে ফেলা হয়েছে—মাথার চুলগুলো রক্তে ভিজে লেপ্টে রয়েছে কপালের ওপরে। সারা শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে দা আর শড়কীর আঘাতে।

প্রৌঢ় লোকটি দুহাতে বুক চাপড়ায় আর চীৎকার করে ওঠে ঃ আমার মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করার ঐ ফল। খণ্ডবিখণ্ড করেছি কালার দেহ, আজ কেরোসিন দিয়ে এই মিলের সৎকার করবো আমরা। আমি গাঁয়ের লুজি—আমার ইজ্জতের অনেক দাম।

তার কথার সংগে সংগেই আবার চীৎকার করে ওঠে আর সবাই। মশালগুলো আকাশের দিকে তুলে ধরে গর্জন করে উঠলো যেন।

মিঃ নায়ারকে এবার বেশ বিচলিত মনে হয়। তিনি মুখ ফিরিয়ে বলেন সীমাচলমকেঃ আপনি মিঃ কাশিমভাইকে টেলিফোনে খবর দিয়েছেন কি? বিশ্রী কাণ্ড দেখছি শুরু হলো। পাগল হয়ে গেছে এরা বন্দুকের গুলীতে মোটেই ভয় পাবে না। একজন ঘায়েল হলে দশজন এসে দখল করবে তার জায়গা।

হ্যাঁ, টেলিফোন করে দিয়েছি তো কাশিমভাইকে ঃ সীমাচলমের তালু পর্যন্ত শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে।

ঃ কি বল্লেন তিনি।

ঃ তিনি শয্যাগত কলিক বেদনায়। আর একজন কে ধরেছিলেন ফোন।

বিব্রত হয়ে পড়ে ম্যানেজার সায়েব। ঠিক এই সময়ে আবার কলিক ব্যথায় শয্যাশায়ী হলেন কাশিমভাই সায়েব। ব্যথাটা অবশ্য মাঝে মাঝে হয় তার হয় যখন তখন যেন আর দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না। বিছানায় মূর্তির মতন পড়ে থাকেন আর মধ্যে মধ্যে দাঁতে দাঁত টিপে অসহ্য চীৎকার। এ অবস্থা তাঁর অনেকবার দেখেছেন মিঃ নায়ার। তার মানে কাশিমভাইয়ের এখানে আসা আজ অসম্ভব। প্রৌঢ় লুজিকে নিশ্চয় চেনেন কাশিমভাই, এই উত্তেজিত জনতাকে হয়ত তিনিই পারতেন কিছুটা পরিমাণ শান্ত করতে। কে আবার ফোন ধরল আজ!

কে যে ফোন ধরলো ভালো করেই জানে সীমাচলম। তার কণ্ঠস্বরে সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের শিহরণ অনুভব করছে সে। কিন্তু ম্যানেজার সায়েবের উত্তরে বলে ঃ কি জানি, বুঝতে পারলাম না ঠিক।

মহা মুস্কিল ঃ কপালের ঘাম মুছে আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়ান মিঃ নায়ার ঃ তোমরা নরহত্যা করেছো—ফাঁসী হবার মতো কাজ করেছো তোমরা। পুলিশে ফোন করে দেওয়া হয়েছে এখনি এসে পড়বেন তাঁরা। তোমাদের উচিত শাস্তিই হবে।

কথাটা শেনা মাত্র আবার চীৎকার ক'রে ওঠে প্রৌঢ় ঃ নরহত্যা? দরকার হ'লে সমস্ত কালাদের দা দিয়ে কুপিয়ে কাটবো—আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে পার পেয়ে যাবে তোমরা। এই কালাকে দু'দিন

সাবধান করে দিয়েছি আমি নিজে, তারপর আজ ধরেছি একেবারে হাতে নাতে। তাড়া খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো শুয়োরের ছানা, কিন্তু বাঁচতে পারেনি আমাদের হাত থেকে : কথার ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে শংকরণের শব দেহটায় লাথি মারে প্রৌঢ় বর্মীটা : আর পুলিশের কথা বলছো বুঝি : হো হো করে হেসে ওঠে লোকটি : লুজি হ'য়ে পুলিশের খবর বুঝি কিছু রাখি না আমি। পুলিশসায়েব ঘোড়ার পিঠে চড়ে তদন্তে গিয়েছেন জিগপিন গাঁয়ে—এখান থেকে বাহান্ন মাইল দূরে। খবর পেলেও ভোরের আগে আসতে পারছে না কেউ। তার আগেই সমস্ত কাজ শেষ হ'য়ে যাবে আমাদের।

ভীড়ের মধ্যে থেকে আবার একজন কে যেন এগিয়ে আসে, ছোকরা গোছের একজন। হাতের মশালটা ঘুরিয়ে চীৎকার করে ওঠে : কথা থাক এখন—আমাদের দেশ চড়াও হয়ে যারা আমাদেরই সর্বনাশ করতে শুরু করেছে নিপাত যাক তারা। কালাদের কারখানার চিহ্ন পর্যন্ত রাখবো না আমরা।

মশালের আলোয় সেই লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হয় না মিঃ নায়ারের। কো মঙ—কয়েকদিন আগে কাঠ চুরির অপরাধে একেই তাড়ানো হয়েছিলো কারখানা থেকে। সেদিন চাকরির জন্য হাঁটু গেড়ে বসেছিলো সে অনেকক্ষণ ধরে ম্যানেজার সায়েবের সামনে, আজ কিন্তু উদ্ধত ভাব। হাতের মশালের আগুনে ছাই করে দেবে সমস্ত কারখানা।

এইবার শঙ্কিত হয়ে ওঠেন মিঃ নায়ার। থানাতেও ফোন করেছিলেন তিনি, কিন্তু সবাই বাইরে গেছে তদন্তে। সত্যিই অন্ততঃ ভোরের আগে কেউই এসে পৌঁছুবে না এদিকে। কিন্তু তার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়েই যাবে।

: তোমরা বন্দুক নিয়ে তৈরী থাকো। যতক্ষণ গুলি আছে সমানে চালিয়ে যাও। তারপর সবই ভগবানের হাত।

মিঃ নায়ারের স্ত্রী আর ছেলে দুটি চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। সীমাচলম জানলার কপাট ধরে নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মরিয়া হয়ে উঠেছে সবাই—তিনচারশ লোকেরও বেশী। গুলী করে আর কটাকে মারতে পারবে এরা। মিঃ নায়ারও তৈরী হয়ে নেন বন্দুক নিয়ে।

প্রৌঢ় লোকটি উত্তেজিতভাবে জনতার দিকে চেয়ে কি যেন বলছে দুটো হাত তুলে। চঞ্চল আর বিক্ষুব্ধ জনতার অবিশ্রান্ত চীৎকারে চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে রাত্রির আকাশ।

হঠাৎ অনেক দূরে মোটরের হর্ণ। প্রথমে অস্পষ্ট তারপর স্পষ্ট একটানা শব্দ। জনতা সহসা দু'ভাগ হয়ে যায়। ভীষণ জোরে আসছে মোটরটি অনবরত হর্ণের শব্দ করে। কাছে আসতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন মিঃ নায়ার : যাক, কাশিমভাই এসে গেছেন। যাহোক একটা কিছু করবেন তিনি।

ঝুঁকে পড়ে দেখে সীমাচলম। প্রকাণ্ড লাল মোটর কাশিমভাইয়ের। যাক্ ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন তিনি। কিন্তু কিভাবে থামাবেন এই উত্তেজিত জনতাকে? হাত দিয়ে কপালের ঘাম মোছে সীমাচলম।

মোটরের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায় শড়কী আর দা হাতে বর্মী জনতা। যেই আসুক, দাম দিতে হবে আমাদের ইজ্জতের। কাশিমভাই যদি এসে থাকেন—স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেবে তাঁকে এ কারখানা তারা ছাই করবেই।

কিন্তু কাশিমভাই নয়—এক পা এক পা করে মোটর থেকে পিছিয়ে আসতে শুরু করে সবাই।। এ আবার কে?

মিঃ নায়ার আর সীমাচলম অভিভূতের মত চেয়ে থাকে। মোটরের দরজা খুলে নামে হামিদাবানু। বর্মীর পোষাক। কালো সিল্কের লুঙ্গি পুঁতির আর জরির কাজগুলো জ্বলে জ্বলে উঠছে মশালের আলোয়। দুটি হাতে দামী জড়োয়া গয়না আর কানে চুনীর দুটি ফুল। মোটর থেকে নেমেই দরোয়ান দাঁড়াবার যে উঁচু চাতালটা ছিলো কারখানার ফটকের সামনে, লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে তার ওপরে।

একটা হাত তুলে ধরে উত্তেজিত জনতার সামনে তারপর চীৎকার করে বলে : আমার বর্মী ভাইরা, কাশিমসায়েব অসুস্থ, তাঁর প্রতিভূ হয়ে আমিই এসেছি আপনাদের কাছে। বলুন আপনাদের কি বলবার আছে?

আশ্চর্য একটুও কাঁপছে না হামিদবানুর গলা। অচঞ্চল, স্থির, সংযত গলার স্বর। শুধু বাতাসে কপালের কাছে উড়ছে দু একটা চুল, গলায় জড়ানো সিল্কের দামী বন্ধনীটা দুলছে এদিক থেকে ওদিকে।

মিনিট দুয়েক ব্যাপী স্তব্ধতা, তারপর ফেটে পড়ে প্রৌঢ় রুদ্ধ আক্রোশে : আমাদের মেয়ের ইজ্জতের দাম চাই আমরা। এ কারখানা আর ম্যানেজারের বাংলো পুড়িয়ে ছাই করে দেবো। ওর কোন আত্মীয়কে আমরা জীবিত থাকতে দেবো না।

প্রৌঢ়ের ইঙ্গিতে শংকরণের শবের দিকে চোখ ফেরায় হামিদা। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়েই আবার মুখ ফেরায় জনতার দিকে : দুর্বৃত্তের এর চেয়ে উপযুক্ত শাস্তি আমি নিজেও কল্পনা করতে পারলুম না। মেয়েদের ইজ্জতের মর্যাদা যারা রাখতে জানে না, তাদের মৃত্যু এইভাবে হওয়া উচিত। যে সমাজে মেয়েদের অবমাননাকারীর শাস্তি হয় না সে সমাজে পুরুষ নেই, তারা আছে নপুংসক। এগিয়ে আসুন আপনি দুষ্টের সমুচিত শাস্তি আপনি দিয়েছেন, ফয়া আপনার কল্যাণ করুন।

কেমন যেন হয়ে যায় প্রৌঢ় লোকটি। একবার হামিদবানুর দিকে চেয়ে কিন্তু এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এইবার হামিদাবানু এগিয়ে যায়। গলা থেকে সবচেয়ে দামী হারটা খুলে জড়িয়ে দেয় লুজির হাতে। বলে :

ফয়ার কাছে এই প্রার্থনা করি, স্ত্রীলোকের মর্যাদা যেন আপনার স্বারা চিরদিন রক্ষিত হয়। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝতে পারছি না আমি, এই পশুটার দেহ নদী পার করে কেন কষ্ট করে বহন করে আনলেন আপনারা? নদীর ওপারে ঝোলাবার মত উপযুক্ত গাছের ডালের অভাব ছিলো নাকি?

পিছন থেকে কে যেন চীৎকার করে ওঠে : ওর আত্মীয়স্বজনকে উপহার দেবার জন্য এনেছি ওর দেহ। আর যত বিষের মূল এই কারখানা। এই কারখানা জ্বালিয়ে দেবো।

কুঞ্চিত হয়ে ওঠে হামিদার সুন্দর দুটি ভ্রূ। জনতার দিকে ফিরে চীৎকার করে ওঠে : যত বিষের মূলে এই কারখানা, এ কি বলছেন আপনারা। এখানে একশ'র বেশী মেয়ে কুলী কাজ করে, বলতে পারবে কেউ একদিনের জন্যও কোনরকম অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছে তাদের সংগে? কাশিমভাই সমস্ত উৎসবে নিজে তাদের সংগে বসে খাওয়া দাওয়া করেছেন। আমার বিয়ের সময় প্রত্যেককে দামী লুঙ্গী আর ফানা দেওয়া হয়েছে একজোড়া।. এই কারখানার সংগে কি সম্পর্ক ওই নরপশুটার। এই কারখানার মালিক কিংবা ম্যানেজারের কাছ থেকে কোনরকম খারাপ আচরণ কোনদিন পেয়েছেন আপনারা? বছর দুইয়েক আগেও বন্যায় যখন সমস্ত গাঁ ডুবে যায় আপনাদের, কাশিমভাই নিজে শাম্পানে করে করে চাল বিলিয়ে বেড়িয়েছিলেন—সে সব কথা নিশ্চয় ভুলে যাননি আপনারা। আর তা ছাড়া, এ কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কি সুবিধা হবে আপনাদের? যে সব মেয়ে কুলীরা এখানে কাজ করে আপনাদেরই মেয়ে আর বোনেরা, তারা কারখানা পুড়ে গেলে কাজ করতে যাবে নামটুর রূপোর খনিতে কিংবা টিনের কারখানায়। সেখানে মর্যাদা কি অক্ষুণ্ণ থাকবে তাদের, বলুন আপনারা? আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের এ নিয়ে কোন হৈ চৈ করবো না আমরা। আপনাদের ইচ্ছা হয়, এই মাদ্রাজী কালার দেহ নিয়ে যেতে পারেন সংগে করে, কিংবা যদি বলেন, আমরাই আপনাদের সামনে দাহ করতে পারি দেহটা নদীর ধারে। এই কারখানা অন্ন জোগাচ্ছে আপনাদের আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে, একে ধ্বংস করা মানে নিজেদেরই সর্বনাশ করা।

কথাগুলো আস্তে আস্তে বলে হামিদাবানু। ধীর গলার আওয়াজ কিন্তু প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট। আবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম—সব কিছু ওর কাছে যেন একটানা স্বপ্নের মত মনে হয়। এত শক্তি কোথা থেকে পেলো হামিদাবানু। এই সাহস আর এই বলার অপূর্ব ভঙ্গী।

হামিদাবানুর কথাগুলো যেন কাজ করে জনতার মধ্যে। লুজি পিছন ফিরে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করে। প্রথমে খুব উত্তেজিত—

কয়েকটা কথার বিনিময়—তারপর এক সময়ে ঝিমিয়ে আসে সব কিছু। অনেকগুলো মশাল নিভে আসে আস্তে আস্তে। লুঙ্গিকে ঘিরে গোল হ'য়ে বসে জনতা—কিছুক্ষণ পরে পিছনের সবাই পিছিয়ে যায় নদীর দিকে। সামনের কয়েকজন এগিয়ে এসে তুলে নেয় শঙ্করণের মৃতদেহ তারপর লুঙ্গি এসে দাঁড়ায় হামিদার সামনে, বলে ঃ চললুম আমরা।

কোন কথা বলে না হামিদাবানু। চাঁদের আলোয় কেমন যেন পান্ডুর আর বিষণ্ণ দেখায় তার মুখ। কারখানার পাঁচিলে হেলান দিয়ে চুপ করে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

বর্মীরা পায়ে পায়ে শাম্পানে গিয়ে ওঠে। ছলাৎ ছলাৎ করে দাঁড়ের শব্দ জলের ওপরে; ফিরে যাচ্ছে ওরা।

এতক্ষণে নেমে আসেন মিঃ নায়ার। সীমাচলমও দ্রুতপদে নেমে আসে পিছন পিছন।

কারখানার ফটক খুলে হামিদাবানুর কাছে গিয়ে দাঁড়ান ম্যানেজার সায়েব ঃ বিবিসায়েবা, কারখানার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে। মহা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন আজ আমাদের, নইলে দু'তরফে অনেকগুলো খুন খারাপি হয়ে যেত আজ।

এবারেও হামিদাবানু নির্বাক। দুটি চোখে পলক নেই তার। ফ্যাকাশে মুখে রক্তের বিন্দুমাত্র আভাসও নেই।

তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। আস্তে ডাকে ঃ হামিদা। হামিদা ফিরে চায় তার দিকে, একটা হাত বাড়িয়ে দেয়—তারপর দুলে ওঠে সমস্ত শরীরটা তার। খুব জোর একটি নিঃশ্বাস—মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগেই হামিদার শরীরটা জাপটে ধরে সীমাচলম। দু' হাতে পাঁজাকোলা করে তাকে নিয়ে আসে মিঃ নায়ারের বাংলোয়।

দুটি ছেলে নিয়ে মিঃ নায়ারের স্ত্রী আচ্ছন্নের মত পড়েছিলেন পাশের ঘরে। মিঃ নায়ার মুখে-চোখে জল ঝাপটে অনেক কষ্টে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন তার।

কিন্তু হামিদা সম্পূর্ণ অচেতন। তার মাথাটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ বাতাস করে সীমাচলম। মিঃ নায়ারের কাছ থেকে ব্র্যান্ডি নিয়ে আস্তে আস্তে ঢেলে দেয় হামিদাবানুর মুখে—কিন্তু মুখে যায় না সবটা, কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে খুব জোরে কেঁপে ওঠে হামিদাবানুর সমস্ত শরীরটা। আস্তে চোখ দুটো সে খোলে। লাল দুটি চোখ, আর কেমন যেন উদাস দৃষ্টি।

ঝুঁকে পড়ে সীমাচলম ঃ হামিদা, হামিদা!

বেশ কিছুক্ষণ পরে কথা বলে হামিদাবানু ঃ তুমি টেলিফোনে ডেকেছিলে। তোমার কাতর গলার আওয়াজে আমি সাড়া না দিয়ে পারিনি বন্ধু।

কোন কথা বলে না সীমাচলম। চোখ দুটো বুজে এসেছে হামিদাবানুর। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথাটা কোল থেকে নিয়ে আস্তে আস্তে বালিশে শুইয়ে দেয়।

পাশেই একটা চেয়ারে বসেছিলেন মিঃ নায়ার। খুব চাপা গলায় বল্লেন ঃ বিবিসায়েবা ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝি।

ঃ হ্যাঁ।

পায়ে পায়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সীমাচলম। অনেক দূরে সালুইন নদীর ওপারে ঘন ঝোপ আর পাহাড়ের ওপরে জ্বলজ্বল করছে শুকতারা। ভোর হবার বুঝি আর দেরি নেই।

বেশ কয়েক দিন পরে দেখা মেলে কাশিম ভাইয়ের। সামনের ঘরে ছেলেগুলোকে নিয়ে পড়ানোয় ব্যস্ত ছিলো সীমাচলম। হঠাৎ কাশির শব্দ করে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকেন কাশিমভাই।

ঃ কেমন পড়াশুনো করছে আপনার ছাত্রেরা।

একটু বিব্রত হয়ে পড়ে সীমাচলম। এ প্রশ্নটা একটা ভূমিকা মাত্র, তা বুঝতে তার একটু অসুবিধে হয় না। কিন্তু কি কথা বলবেন তিনি? অসময়ে এভাবে এ-ঘরে কোনদিনই তো তিনি আসেন না।

ঃ থাক আজ এই অবধি—ছেলেদের দিকে চেয়ে বলেন কাশিমভাই; তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সীমাচলমের দিকে ফিরে বলেন ঃ চলুন, মিলের দিকে যাবো একবার। আপনাকে পথে নামিয়ে দেব। কাশিমভাইয়ের গলায় আদেশের সুর। কোথায় যেন হয়েছে কিছু একটা। কোন কথা না বলে পিছনে পিছনে বাইরে চলে আসে সীমাচলম। গাড়িতে উঠে সন্তর্পণে বসে তাঁর পাশে। প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করে কাশিমভাইয়ের কথার। কিন্তু সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুরুটে কেবল টানের পর টান দিয়ে চলেন কাশিমভাই। সাড়া নেই যেন তার। ভারী অস্বস্তিবোধ করে সীমাচলম। কেমন যেন থমথমে পরিস্থিতি—ঝড়েরই পূর্বাভাষ বুঝি। প্রচণ্ড এক ঝড়ে আবার বুঝি নিশ্চিহ্ন হবে তার নীড়—তারপর বিসর্পিল অনন্ত পথ —ধুলোর ঝাপটা আর উত্তপ্ত রোদ. বাঁচিয়ে আবার চলা শুরু হবে।

ঃ রাখো।

আচমকা কাশিমভাইয়ের গলার আওয়াজে একটু চমকে ওঠে সীমাচলম। প্রচণ্ড ঝাকুনী দিয়ে থেমে যায় গাড়িটা। সালুইন নদীর ধারে ছোট এক গোরস্থান—অল্প একটু জায়গা ঘিরে। চাঁদের ম্লান আলোয় অস্পষ্ট দেখা যায় সাদা কবরগুলো। আশে পাশে বুনো ফুলের গাছ—কেমন যেন একটা উগ্র সুরভি ভেসে আসে বাতাসে।

কাশিমভাই জোর পায়ে একেবারে নদীর শান-বাঁধানো চাতালটায় গিয়ে বসেন। উপায় নেই সীমাচলমের—তার ইঙ্গিতে পাশেই বসতে হয় তাকে।

আকিয়াবে আমার অফিস রয়েছে একটা। সেখানে আমার একজন কাজ-জানা লোকের প্রয়োজন। আপনাকে সেখানেই পাঠাবো ভাবছি। অফিসের দেখাশোনা করবেন—আমার সংগে যোগাযোগও ছিন্ন হবে না। তেলের কলগুলোও বিশেষ সুবিধের চলছে না—আপনি গিয়ে একটা বন্দোবস্তও করতে পারবেন সেগুলোর।

কোন কথা বলে না সীমাচলম। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়, তারপর উঠে দাঁড়ায়. তারপর নদীর ধার দিয়ে দিয়ে চলতে শুরু করে। কিছুদূরে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখে কাশিমভাইয়ের দিকে। নমাজে বসেছেন কাশিমভাই। হাঁটু গেড়ে বসে কাতর প্রার্থনা হয়তো জানাচ্ছেন খোদাকে। আল্লা,—আমার গৃহে শান্তি ফিরিয়ে দাও। সর্পরূপী শয়তানকে এখান থেকে সরিয়ে দাও রসুলাল্লা। আমার মোনাজাত পূর্ণ করো।

নিঃশ্বাস ফেলে জোর পায়ে চলে আসে সীমাচলম। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না তার। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে। কি একটা যেন অভিশাপ কিছুতেই কোথাও স্থায়ী হতে দেবে না ওকে। একটু ঘর বাঁধার আভাস পাওয়ার সংগে সংগে কার যেন অমোঘ নির্দেশ আসে ঘর ভাঙার। পিঠে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে অনুর্বর পথের ওপর দিয়ে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু। শুভলক্ষ্মী মা পান আর হামিদাবানু একের পর এক শুধু চাবুকের আঘাতে ওকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে। (ক্রমশ)

বিজ্ঞানের কথা

শ্যাম দেশের লড়ায়ে মাছ

শ্রীহিমাংশু সরকার

লড়ায়ে মাছ শ্যামদেশের এক বিশেষ জাতের মাছ। এই মাছ অনেকদিন ধরেই শ্যামদেশে-পাওয়া যায়। সাধারণ জলাশয়ে অন্যান্য মাছের সঙ্গে এরা বাস করে। আগে এই মাছ এদেশ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যেত না। এখন সারা পৃথিবীতে এদের বংশ ছড়িয়ে পড়েছে।

এরা কৈ, খলসের স্বজাতি। এই লড়ায়ে মাছের বৈজ্ঞানিক নাম বেলটা স্প্লেন-ডীয়াস'। শ্যামদেশের প্রায় সব খাল, বিল পুকুরেই পাওয়া যায়। স্বাভাবিক জলাশয়ে বাস করার সময় এদের প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। কারণ এরা জলজ উদ্ভিদের মধ্যে হয় সূর্যের উত্তাপ অথবা মৎস্যভুক পাখীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য লুকিয়ে থাকে। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মাছ প্রায় দু ইঞ্চি লম্বা হয়। স্ত্রী মাছ পুরুষ মাছ অপেক্ষা কিছু ছোট।

এই মাছের রঙ অবস্থাবিশেষে বদলায়। এরা যখন চুপচাপ থাকে তখন এদের রং মেটে মেটে বাদামী অথবা সবুজ দেখায়। তার সঙ্গে আবছা আবছা কাল দাগ থাকে। অনেক সময় আবার এ দাগও দেখা যায় না। পুরুষ মাছ-গুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এদের গায়ে একটা উজ্জ্বল আভা দেখতে পাওয়া যায় আর তাদের শরীরের সমস্ত পাখনা ছড়িয়ে পড়ে। কানকোর পাশের চামড়ার অংশ দুপাশ থেকে বেরিয়ে আসে। অনেক সময় এদের গায়ের রঙ নীল অথবা লাল দেখায়। এইসব বিভিন্ন ধরণের সুন্দর রঙএর জন্য এদের যে কোন মিঠে জলের মাছের চেয়ে সুন্দর দেখায়।

এই জাতীয় মাছ খুব বেশিদিন বাঁচে না। সাধারণত গরম দেশে দুবছর এদের বাঁচতে দেখা যায়। ঠাণ্ডাদেশে কিন্তু চার বছর পর্যন্ত এরা বাঁচতে পারে।

শ্যামদেশের লোকেরা এই মাছের লড়ায়ের ওপর বাজী ধরে। চার রকম লড়ায়ে মাছ শ্যাম-দেশে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর মধ্যে শুধু এক রকম মাছই খুব নাম করেছে এবং সারা পৃথিবীতে পরিচিত।

শ্যামদেশে কবে থেকে এই মাছেরা লড়ায়ে মাছ বলে নাম কিনেছিল তা বলা শক্ত। তবে কয়েক শত বৎসর থেকেই যে এই মাছ খুব যুদ্ধপ্রিয় তা শ্যামদেশীয়রা জানে।

প্রায় ১৮৫০ সাল পর্যন্ত শ্যামদেশের লোকেরা এই সব মাছ যখন জলাশয়ের মধ্যে লড়াই করত তখন থেকেই তার ওপর বাজী রাখত। কিন্তু যাতে লোকেরা আরও ভাল করে এবং নিয়মিতভাবে এই মাছের লড়ায়ের ওপর বাজী ধরতে পারে তার জন্য এই মাছের নিয়মিত চাষ আরম্ভ করা হয়েছে। পরে অবশ্য দেখা গেল যে এই মাছ লড়ায়ের জন্য যত না হোক তাদের রঙএর জলুসের জন্য বেশী জনপ্রিয়।

সাধারণ মাছেদের মধ্যেও একটি মাছ আর একটি মাছকে যে আক্রমণ করে এটা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই বেলটা জাতীয় মাছের মত এত লড়াই প্রীতি আর অন্য কোন মাছের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। যুদ্ধ-প্রীতি এই মাছেদের, পুরুষ মাছের একটি বিশেষত্ব আর এই লড়াই প্রীতি এদের এতই বেশী যে মাছ কোন রকম সুযোগ সুবিধা পেলেই লড়াই করতে আরম্ভ করবে। আমাদের এটাই মনে হতে পারে যে বোধ হয় এদের লড়াই করবার ইচ্ছাটা শুধু বড় মাছেদের মধ্যেই দেখা যায় তা নয়, এটা এদের মধ্যে ছোট বেলা থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। এদের যখন দু মাস বয়স তখন থেকেই এদের এই ধরণের লড়ায়ের ইচ্ছা জাগে।

এদের সব সময় এই যুদ্ধংদেহি ভাবের জন্য পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মাছকে যে শুধু আলাদা আধারের মধ্যে রাখতে হয় তা নয় এমনকি যাতে এরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে না পায় সেজন্য এই আধারগুলো আড়াল করে রাখতে হয়। এই মাছ কোন জলাশয় থেকে তুলে এনে যদি কোন আধারে রেখে দেওয়া হয় তাহলে কয়েকদিন বাদেই এদের অন্য মাছের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ পাবে। অবশ্য এটা ঠিক যে এদের এই যুদ্ধস্পৃহা এদের বন্দী অবস্থায় রাখার জন্যই ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেইজন্য যেসব মাছের বাচ্চা বন্দী অবস্থায় জন্মায় লড়ায়ের ইচ্ছাটা তাদের মধ্যেই প্রবল হয়। বুনো মাছ যাদের সাধারণ জলাশয় থেকে ধরা হয় তারা খুব বেশী হলে পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশী যুদ্ধ করতে চায় না। অথচ যেসব মাছ জলাধারের মধ্যে বন্দী অবস্থায় রাখা থাকে তারা একসঙ্গে
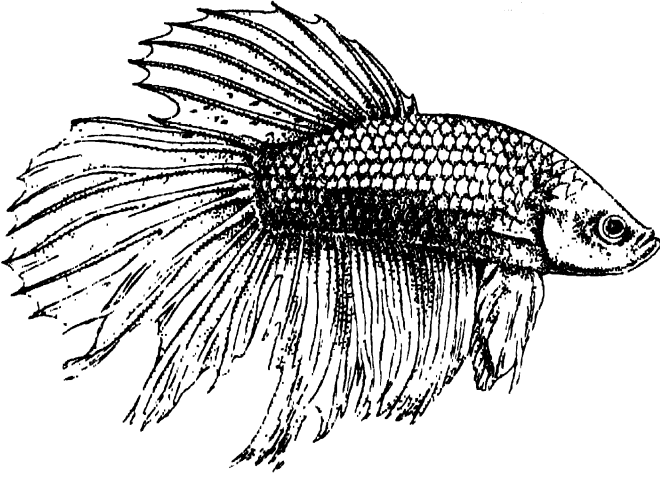
না থেমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লড়াই করতে পারে। এই যুদ্ধের মধ্যে এরা মাঝে মাঝে বাতাস নেবার জন্য শুধু যা থামে। আক্রমণ করার আগে যখন এরা পায়তারা কষতে থাকে তখন এদের খানিকটা বিশ্রাম হয় বলা যেতে পাবে। এই সময়েও এদের সব পাখনা, কান্‌কোর পাশের চামড়া সমস্ত ছড়ান থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাধারণত তিন ঘণ্টার বেশী একটা মাছ যুদ্ধ করতে পারে না। তবে এমনও দেখা গিয়েছে যে, অনেক সময় সমস্ত দিনরাত ধরে অক্লান্তভাবে এরা যুদ্ধ করে।

শ্যাম এবং অন্যান্য দেশে যেখানে এইসব মাছ এখন পাওয়া যায় সেইসব দেশে যুদ্ধের জন্য প্রায় একই আকারের দুটো পুরুষ মাছ বেছে নিয়ে দুটো জায়গায় আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়। এই সময় যদি মাছ দুটো তাদের পাখনা বিস্তার করে একজন আর একজনের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে তাহলেই তখন দুটো মাছকে একটা পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। একটা পাত্রে ছাড়ার সংগে সংগেই দুটো মাছই তাদের পাখনা এবং কান্‌কোর পাশের চামড়া ছড়িয়ে রঙ বদলাতে আরম্ভ করে। এরপর একজন আর একজনের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক আক্রমণ করবার পূর্বে মাছ দুটো পাশাপাশি এসে একটু আগে-পেছু হয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে। তারপরই খুব দ্রুত গতিতে একজন আর একজনকে আক্রমণ করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করবার সময় এদের গতি এত দ্রুত হয় যে অনেক সময় তা লক্ষ্যই করা যায় না। যুদ্ধের সময় বেশীর ভাগই পুচ্ছ এবং পিঠের পাখনার দ্বারা মাছেরা আক্রমণ করে। এর মধ্যে পিঠের পাখনা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। যুদ্ধের পরে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এইসব পাখনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যে সব মাছ খুব ঘন ঘন লড়াই করে তাদের পিঠের পাখনার কোন অস্তিত্বই প্রায় থাকে না। পাখনা ছাড়া শরীরের পাশও আক্রমণ করবার একটা জায়গা। এই আক্রমণের ফলে অনেক সময় শরীরের এইসব অংশ থেকে আঁশ খসে যায়। কান্‌কোর ওপরও মাছ কামড়ে দেওয়ার ফলে অনেক সময় ক্ষতি হয়।

এদের যুদ্ধের হারজিত এদের শরীরের আঘাতের চিহ্নের ওপর নির্ভর করে না। এক পক্ষ যুদ্ধ করতে করতে যখন সমস্ত শক্তি হারিয়ে কাবু হয়ে পড়ে তখন বোঝা যায় যে সেই পক্ষ হেরে গেছে। এটা বুঝতে পারা যায় যখন দেখা যায় যে একপক্ষ অপর পক্ষের আক্রমণের সময় প্রতিআক্রমণ না করে মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

যেই কোন লড়াই শেষ হয়ে যায় অমনি মাছ দুটোকে আলাদা করে ফেলা হয়। আর সেই সংগে যদি এদের লড়াইয়ের হারজিতের ওপর কোন বাজী ধরা থাকে তাহলে সেই সময় দেনা-পাওনাও চুকিয়ে ফেলা হয়। মৎস্য ব্যবসায়ীরা যখন যুদ্ধ করাবার উদ্দেশ্যেই এই মাছদের পালন করে তখন তারা লক্ষ্য রাখে যে, কোন পরাজিত মাছ যেন কোন বাচ্চা উৎপাদন না করতে পারে।

কোন লড়ায়ের পর মাছেদের পাখনা এবং শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়ার দরুণ এদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই কারণে এদের চাল-চলন থেকে এটা বুঝতে পারা যায় না এতে এদের কোন অসুবিধা হচ্ছে। এমন কি যদি দরকার হয় তাহলে এরা আবার যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে যাবে। লড়াই করবার জন্য এদের যে পাখনাগুলো নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো আবার জন্মাবার দরুণ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এদের চেহারা আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে শরীর থেকে আঁশ খসে গেলেই একটু অসুবিধার সৃষ্টি করে কারণ তখন ঐসব স্থানে রোগের বীজাণ আক্রমণ করে।

এই ধরণের মাছের লড়াই দেখতে যার অভ্যস্ত তাদের কাছে এটা খারাপ লাগে না লড়াই করার দরুণ মাছগুলো মারা না পড়লে যাদের একটু স্নেহ মমতাবোধ আছে তা এ ধরণের মাছের লড়াই দেখে কেন আন পায় না।

এই মাছ কৈ, খলসে জাতীয় মাছেদের মত নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বাতাসের ওপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করে। নিশ্বাসের জন্য প্রত্যে প্রাণীরই অক্সিজেন দরকার। জলচর প্রাণী জলের সংগে মিশ্রিত অক্সিজেন, আর স্থলচরে বায়ুর সংগে মিশ্রিত অক্সিজেন শ্বাস গ্রহণে যন্ত্রের দ্বারা নেয়। কিন্তু কয়েক ধরণের মা আছে যারা জলের সংগে মিশ্রিত অক্সিজে ছাড়াও বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয়। এরজ এদের শ্বাস গ্রহণের যন্ত্র ছাড়াও শরীরে ভেতরে আরও একটি স্থান থাকে যেটি বাত থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতেই শু সাহায্য করে। দরকারের সময় মাছ এ স্থানে অতিরিক্ত জমা করে রাখা অক্সিজে ব্যবহার করে। এইজন্যই এইসব ধরণের মাছে জল থেকে ডাঙগায় তুলে ফেল্‌লেও মাছ অনে ক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। 'বেল্‌টা সুপ্লে ডীয়াস'ও এই ধরণের মাছ। সেই কারণে এদে জলের ওপর থেকে মাথা উঁচু করে বাতাস থে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে দেখা যায়। সাধা জলে যখন এরা বাস করে, তখন বাতাস নে সময় এরা একবার মাথাটা তুলে খানি বাতাস নিয়ে আবার ডুব দিয়ে জলের নী চলে যায়। কারণ তা না হলে মৎস্যভুক পা এদের ওপর ছোঁ মারবে।

কৈ মাছের মতই এদের বাতাস থেকে সং করা অক্সিজেন মাথার দুপাশে দুটো গর্তের স্থানে জমা করে রাখে। এই গর্ত দুটোর ম খানিকটা বাল্বের মত অংশ থাকে, অক্সিজেন জমা করে রাখতে সাহায্য করে।

মাছেরা বাতাস থেকে নেয়া অক্সি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহারের পর মুখ বের করে দেবার সময় জলের ওপর বুদ ছাড়ে। এই বুদবুদের সংগে এরা এদের মু ভেতর থেকে একরকম লালা জাতীয় মিশ্রিত করে দেয়—যার দরুণ বুদবুদগু জলের ওপর ছাড়ার সংগে সংগে মিলিয়ে গিয়ে জলের ওপর অনেকক্ষণ ধরে বেড়ায়। এই ধরণের বুদবুদগুলোর ভিত মাছেরা নিজেদের ডিম রাখবার বাসার ব্যবহার করে। আবার অনেক সময় যখন

থেকে বাচ্চা বার হয়, তখন সেগুলোও এই বুদবুদের বাসার সাহায্যে জলে ভেসে বেড়ায়। কিছুক্ষণ বাদে যখন বুদবুদগুলো জল লেগে ভেঙে যেতে আরম্ভ করে, তৎক্ষণাৎ মাছ আবার জলের ওপর বুদবুদ ছাড়তে থাকে। এই কারণে মাছের ডিম অথবা বাচ্চা সব সময়েই বুদবুদের বাসার মধ্যে থাকতে পায়। এই ধরণের বুদবুদ কেবলমাত্র পুরুষ মাছেরাই তৈরী করে।

পুরুষ মাছ যখন এই রকম বুদবুদ ছাড়তে থাকে, তখন স্ত্রী মাছকে পুরুষ মাছের পাত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরের দিন সকাল বেলায় বুদবুদগুলো পরীক্ষা করলে তার মধ্যে লাখ লাখ ডিম রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। মাছ একবারে ডিম না ছেড়ে বারে বারে ডিম ছাড়ে। ডিম ছাড়ার পর ডিম যখন ডুবে যেতে আরম্ভ করে, তখন পুরুষ ও স্ত্রী মাছ মুখে করে খুব সতর্কতার সংগে এই সব ডিম আবার সংগ্রহ করে বুদবুদের বাসার মধ্যে রেখে দেয়।

স্ত্রী মাছের কাজ শুধু ডিম ছাড়া, এবং পুরুষ মাছের সংগে ডিম সংগ্রহ করে রাখা পর্যন্ত। এর পর ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার আগে থেকে আরম্ভ করে বাচ্চা ফুটবার সময় পর্যন্ত কাজ হচ্ছে পুরুষ মাছের।

এই মাছেরা বৎসরের মধ্যে অনেকবার ডিম ছাড়তে পারে। একবারে একটা স্ত্রী মাছ দু'শ থেকে সাত শ' ডিম ছাড়ে, আর বৎসরের মধ্যে একটা স্ত্রী মাছ প্রায় আড়াই হাজার থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত ডিম ছাড়তে পারে। ডিম না ফোটা পর্যন্ত ডিমগুলো বুদবুদের বাসার মধ্যে থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ঘণ্টা সময় লাগে। ডিম ফোটাবার জন্য জলের উত্তাপ প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকা দরকার।

ডিম ফোটবার পর বাচ্চাগুলোর পাখনা গজানর আগে পর্যন্ত বুদবুদের বাসার নীচে বাস করতে থাকে। এই সময় যদি কোন কারণে বাচ্চারা বাসা ছেড়ে চলে আসে, তাহলে পুরুষ মাছ আবার তাদের যথাস্থানে নিয়ে যায়। বাচ্চাদের এই অসহায় অবস্থার সময় পুরুষ মাছ এদের মুখের ভেতরে নিয়ে আবার বুদবুদ ছাড়তে থাকে, এতে করে বাচ্চা মাছেরা শ্বাস-প্রশ্বাসের দরুণ যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন পেতে থাকে। পুরুষ মাছ সব সময়ই লক্ষ্য রাখে, যাতে করে বাইরের কোন শত্রু এই বাচ্চা মাছদের কোন ক্ষতি না করতে পারে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই সব বাচ্চা মাছেদের প্রধান শত্রু হচ্ছে স্ত্রী মাছেরা। সাধারণ অবস্থায় ডিম পাড়ার সংগে সংগেই পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছকে আর ডিমের কাছে থাকতে দেয় না; তাকে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে তবে পুরুষ মাছ নিশ্চিন্ত হয়। আধারে ডিম ছাড়বার সংগে সংগেই স্ত্রী মাছকে সরিয়ে ফেলা ভাল। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাবার জন্য পুরুষ মাছেরই প্রয়োজন বেশী। যদি ডিম ছাড়বার পর পুরুষ মাছকে কোন কারণে সরিয়ে ফেলা হয়, তা'হলে দেখতে পাওয়া যায় যে, ডিম থেকে আর বাচ্চা ফুটছে না।

মজা এই যে, পুরুষ মাছ যে ডিম এবং বাচ্চাদের লোভ সম্বরণ করে, খায় না, তা নয়—এই সময় এদের গলার খাদ্যনলী এমনভাবে বুজে থাকে যে, এদের এই নলীর ভেতর দিয়ে এই ধরণের খাদ্য যেতে পারে না। পুরুষ মাছ অবশ্য নিজের কিম্বা পরের বাচ্চা চিনতে পারে না। অন্য কোন 'বেলুটা' জাতের মাছের ডিম অথবা বাচ্চা হলেও তা নিজের মতই করে পালন করে।

এই মাছ সাধারণ অবস্থায় মানুষের যথেষ্ট উপকার করে। এরা সমস্ত দিন ধরেই মশার বাচ্চা খায়। এদের প্রধান খাদ্যই হচ্ছে মশার বাচ্চা। সারা বছর ধরেই এরা মশার বাচ্চা খায়। হিসেব করে দেখা গেছে, একটা পূর্ণ-বয়স্ক মাছ প্রায় দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার মশার বাচ্চা খেতে পারে। অবশ্য বাচ্চা অবস্থায় প্রথমেই এরা মশার বাচ্চা খেতে পারে না। তার কারণ এদের মুখ তখন এত ছোট থাকে যে, এরা মশার বাচ্চা তখন গিলেত পারে না। মশার বাচ্চা খাবার আগে পর্যন্ত এরা ছোট ছোট জলজ প্রাণী খায়। মাছেরা সব সময় মশার জ্যান্ত বাচ্চা খায়। মরা মশার বাচ্চা দিয়ে দেখা গেছে মাছ সেগুলো খেতে চায় না।

এই মাছ যখন সব দেশেই বাঁচে, তখন আমাদের মত দেশেও এই ধরণের মাছ যদি মশার ডিম ধ্বংসকারী মাছেদের সংগে যোগ করে দেওয়া যায়, তাহলে অনেক উপকার পাওয়া যেতে পারে।

অদৃষ্ট

সুভদ্রাকুমারী চৌহান

"বৌদি, তুমি কেন সাদা কাপড় পর?"

"কেন পরি তা কি করে বোঝাই মুন্নী!"

"কেন বৌদি? মা তোমায় রঙীন কাপড় পরতে দেয় না বুঝি?"

"আমার অদৃষ্ট আমায় পরতে দেয় না মুন্নী, মা কি করবেন।"

"অদৃষ্ট? সে আবার কে বৌদি? সেও কি মার মত তোমাকে দিন রাত বকাবকি করে?"

সাত বছরের মুন্নী দু' হাত দিয়ে কিশোরীর গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে ঝুলতে ঝুলতে প্রশ্ন করল—"অদৃষ্ট কোথায় থাকে? আমাকে দেখাও না বৌদি?"

শিল থেকে পিষ্ট মসল্লা একটা বাটিতে তুলতে তুলতে কিশোরী এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "অদৃষ্ট কোথায় কি জানি?"

আঁচলে চোখের জল মুছে ফেলে কিশোরী তরকারিটা উনুনে চাপিয়ে দিল। রান্নার আর আধ ঘণ্টা বাকী আছে। এর মধ্যে মুন্নীর মা সগর্জনে রান্নাঘরে প্রবেশ করে বলল, "সাড়ে দশটা বাজে তবু রান্না নামল না। ছেলেরা কি না খেয়ে ইস্কুলে যাবে? বাপ, বকে বকে সারা হয়ে গেলাম। ঘরে এমন কোন্ কাজটা করতে হয় যে, রান্নাটাও সময়ে হয় না? সংসারে কাজ কি সব মেয়েমানুষই করে না তুই একাই কেবল করছিস্?"

এক নিঃশ্বাসে মুন্নীর মা এই কথাগুলি বলে একটা পিঁড়ি পেতে রান্নাঘরে বসে পড়ল। কিশোরী ভয়ে ভয়ে বলল, "মাইজী, নয়টাও এখন বাজে নি। আর আধ ঘণ্টার ভেতর আমার রান্না হয়ে যাবে। তুমি কেন আবার রান্নার জন্যে কষ্ট করবে?" চিমটা দিয়ে প্রহারোদ্যতা শাশুড়ী বলল, "কি বললি আমি মিথ্যে বলেছি? কতবার বলেছি যে, আমার কথার উপর কথা বলবি না, তবুও মুখ চালাবে। বাস্ কোন্ গর্বে ভুলে আছিস? জানিস তোর মত পঞ্চাশটাকে আঙ্গুলে তুলে নাচাতে পারি? যা—রান্নাঘর থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যা।"

চোখ মুছতে মুছতে কিশোরী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বালিকা মুন্নী মার এই কঠোর ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল। কিশোরী যেতেই সেও তার পিছুপিছু গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মায়ের তিরস্কারে তাকে ফিরে আসতে হল। এই বাসায় প্রায় প্রতিদিনই এই রকম ঘটনা হয়। এটা প্রাত্যহিক।

* * * *

ছেলেমেয়েরা খেয়ে দেয়ে আধ ঘণ্টা আগেই স্কুলে পৌঁছল। রান্না সেরে যখন মুন্নীর মা

হাত ধুচ্ছে তখন তার স্বামী রামকিশোরবাবু মক্কেলদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাসায় এলেন। ঘর-দুয়ার খালি দেখে বললেন, "কই এরা সব গেল কোথায়?"

নথ দুলিয়ে মুন্নীর মা বলল—"যাবে কোথায়? ইস্কুলে গেছে। কত বেলা হয়েছে সে খেয়াল আছে?"

ঘড়ি দেখে রামকিশোরবাবু বললেন, "এখন সাড়ে নটা বেজেছে। আমারও ত কাছারী যাওয়ার সময় হল না?"

মুন্নীর মা ঝঙ্কার দিয়ে বলল—"নিশ্চয় তুমি আহ্লাদী বউর কথা শুনেছ। সে বলেছে নটা আর তুমি একটু ভাল মানুষি করে বলছ সাড়ে নটা। ওর কথা কখনো মিথ্যে হতে দেবে না কিনা! সকলেই সত্যবাদী আর যত মিথ্যে বলি আমি। আমি ত দেখি এই বাড়িতে চাকর-বাকরের যেটুকু সম্মান আছে আমার সেটুকুও নেই। বলে মুন্নীর মা জোরে কাঁদতে শুরু করল।

"তোমাকে মিথ্যুক আমি বলিনি। ঘড়িও তো খারাপ হতে পারে? এতে কাঁদবার কি হল?" বলতে বলতে রামকিশোরবাবু স্নান করতে চলে গেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর স্বভাবের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। কিশোরীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর নানা রকম দুর্ব্যবহার তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। সামান্য সামান্য কথায় কিশোরীকে প্রহার করা গালি দেওয়া অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ছিল। এর কারণ এই যে, রামকিশোরবাবু পুত্রবধূ কিশোরীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিশোরী তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র পুত্রের স্ত্রী। নিষ্ঠুর বিধাতা বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই কিশোরীর সিঁথির সিঁদুর মুছে নিয়েছেন। কিশোরীর বাপের বাড়িতেও কেউ নেই। এই অভাগিনী বিধবা সকলেরই করুণার পাত্রী, কিন্তু যখনই মুন্নীর মা কিশোরীর প্রতি রামকিশোরবাবুর স্নেহপরায়ণতা দেখেন তখন তার কিশোরীর উপর বিদ্বেষ আরো বেড়ে যায়। রামকিশোরবাবু নিজে স্ত্রীকে অত্যন্ত ভয় করে চলতেন। কিশোরীর উপর স্ত্রীর এই অত্যাচারের কথা জেনেও কিছু প্রতিকার করতে পারতেন না। মোট কথা তিনি স্ত্রীকে চটিয়ে অশান্তি ঘটাতে চাইতেন না। এই কারণে প্রায়ই তিনি চুপ করে যেতেন। আজকেও বুঝতে পারলেন যে, কিছু একটা হয়েছে আর এর জন্য কিশোরীকে উপোস করে থাকতে হবে। এইজন্য তিনি কাছারী যাবার আগে কিশোরীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বললেন—"উপোস করে থেকো না মা, খেয়ে নিয়ো কিন্তু, তুমি না খেলে আমি বড় দুঃখ পাব।"

"খেয়ে নিয়ো কিন্তু তুমি না খেলে আমি বড় দুঃখ পাব।" রামকিশোরবাবুর এই কথাটা মুন্নীর মা শুনে ফেলল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন আগুন ধরে গেল, মনে মনে বলল, "এই লক্ষ্মীছাড়ীর উপর এত দরদ? কাছারী যেতে যেতে আদর করে যাওয়া, খাওয়ার জন্য খোসামোদ করা। আমার সঙ্গে একটা কথা বলবারও সময় হল না। আমিও দেখব কেমন করে খায়? খাবে বাপের মাথা।" মুন্নীর মা খাওয়া দাওয়া সেরে বাকি খাবার-গুলো ঝিকে দিয়ে হেঁসেল উঠিয়ে বার হয়ে গেল। কিশোরী রান্নাঘরে গিয়ে সব বাসন খালি দেখতে পেল। ভাতের হাঁড়িতে সামান্য কিছু ভাতের কণা লেগেছিল, তাই উঠিয়ে মুখে দিয়ে জল খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

আজ রামকিশোরবাবু কাছারীতে কোন কাজ না থাকায় তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলেন। মুন্নীর মা বেড়াতে গিয়েছিল। বাসায় স্ত্রীকে কোথাও না দেখে তিনি পুত্রবধূর ঘরের কাছে এলেন। কিশোরীর দুর্দশা দেখে তাঁর চোখে জল এসে গেল। আজ চন্দন বেঁচে থাকলে কি ওর এই দশা হয়? নিজেকে নিজে ধিক্কার দিলেন। কিশোরীর পরনে একটা ছেঁড়া কাপড়। কাপড়টা এত ছিন্ন যে, লজ্জানিবারণ করা দুষ্কর। বিছানা নামে খাটের উপর ছেঁড়া কাঁথা পাতা। মাটিতে হাতের উপর মাথা দিয়ে কিশোরী শুয়ে আছে। তন্দ্রা লেগে আসছে এমন সময় পায়ের শব্দে উঠে মাথায় কাপড় দিতে গেল, কাপড়টা একটু টানতেই সেটা ফেঁসে গেল। যে দিকটা টেনেছিল সেটা হাতের সঙ্গেই নেমে আসল। তার বাসি ফুলের মত করুণ চেহারা আর ছলছল চোখ দেখে রামকিশোরবাবু স্নেহে বিগলিত হয়ে গেলেন। তিনি সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি খেয়ে নিয়েছ ত মা।"

কিশোরীর মুখ দিয়ে বার হল—'না', কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, "খেয়ে নিয়েছি বাবু।" রামকিশোরবাবু বললেন,—"আমার মনে হচ্ছে তুমি খাওনি।"

কিশোরী চুপ করে রইল। অন্যদিকে মুখ ফেরান ছিল। মাটিতে নখ দিয়ে আঁচড় কাটছিল আর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। রামকিশোরবাবু আবার বললেন—"তুমি খাওনি না? আমার দুঃখ এই যে, তুমিও বুড়ো শ্বশুরের কথা রাখলে না।" কিশোরী ভাবছিল এর কি উত্তর দেবে সে, কিছুক্ষণ পরে বলল, "বাবু, আমি আপনার কথা রেখেছি, রান্নাঘরে যা ছিল তাই খেয়েছি, মিথ্যে বলছি না।"

রামকিশোরবাবুর বিশ্বাস হল না, তিনি ঝিকে ডেকে জিজ্ঞেস করাতে ঝি বলল,—"আমার সামনে ত বউ কিছু খায়নি, মাইজী ত আগেই রান্নাঘর খালি করে দিয়েছেন, খাবে কি?"

রামকিশোরবাবু স্ত্রীর এই হীন প্রবৃত্তির কথা শুনে কুপিত হলেন আর পুত্রবধূর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আজ তাঁর পকেটে পঞ্চাশটি টাকা ছিল, তিনি তার থেকে দশটা টাকা কিশোরীকে দিতে দিতে বললেন, "এই টাকাটা তোমার কাছে রেখে দাও মা, দরকার মত খরচ করো।" ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের মত মুন্নীর মা সেই ঘরে প্রবেশ করে মাঝ পথেই টাকাটা কেড়ে নিল। সেটা আর কিশোরীর হাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। মুন্নীর মা বললেন—"বাবারে বাবা। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কলির চৌদ্দ পোয়া পুরতে আর বাকি নেই। শূন্য বাড়িতে ছেলের বউর ঘরে ঢুকতে তোমার লজ্জা হল না। তোমার আহ্লাদেই ত ও এরকম মাথায় চড়েছে। কিন্তু আমি ভাবতেও পারি নি যে, ব্যাপার তলে তলে এত দূর গড়িয়েছে। বুড়ো বয়সে এই কীর্তি ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এই পাপের বোঝাতেই ত পৃথিবীর এই দুর্দশা।"

তীরের মত বেগে মুন্নীর মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রামকিশোরবাবুও চুপচাপ চলে গেলেন। তিনি খুব বেশী বৃদ্ধ নন, কিন্তু নিত্য এই রকম ঘটনা আর উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুশোক তাঁকে বয়সের থেকে অনেক বেশী বৃদ্ধ করে দিয়েছে। গ্লানি আর ক্ষোভে অস্থির হয়ে তিনি বাইরে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসলেন। কেবলই চন্দনের কথা মনে পড়ছিল। বালিসে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেললেন।

"কাঁদছো কেন বাবু?" পিছন থেকে এসে মুন্নী বাবার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল। রামকিশোরবাবু বিরক্তির সুরে বললেন—"নিজের অদৃষ্টের জন্য মা!" সকালে মুন্নী বৌদির মুখে অদৃষ্টের নাম শুনেছে আর তার পরেই তাকে কাঁদতে দেখেছে। এখন আবার বাবাকেও অদৃষ্টের নামে কাঁদতে দেখে বলল—"অদৃষ্ট কোথায় থাকে বাবু? সে কি মার কেউ হয়?" মুন্নীর এই শিশুসুলভ প্রশ্নে এত দুঃখেও রামকিশোরবাবুর হাসি এল, তিনি বললেন—"হ্যাঁ, সে তোমার মায়েরই বোন।" মুন্নী বিশ্বাসের সুরে বলল—"তাই ত সে তোমাকে আর বৌদিকে এমন করে কাঁদায়।"

অনুবাদিকা—**জয়ন্তী দেবী**
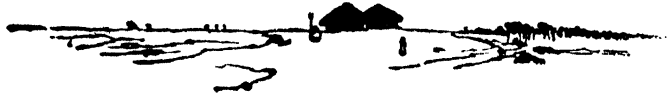
দাদু আর নাতনী।

হেসে খেলে দিন চলে যায়। বিপত্নীক বৃদ্ধ দাদু, আত্মভোলা লোক। লেখা পড়া আর চিকিৎসা নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। নাওয়া খাওয়া, কলেজ যাওয়ার কথা মনে থাকে না। নাতনীকে প্রত্যহ প্রতিটি কথা ও প্রতিটি কাজ স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। তাগিদ দিয়ে নাওয়ান, খাওয়ান, কলেজ পাঠান এবং ঘুম পাড়ান নিয়ে রোজই নাতনীকে কৃত্রিম রাগ ও শাসন করতে হয়। নাতনী যত রেগে যায়, দাদু তত হাসে, বলে, আজ শেষ, কাল থেকে একেবারে রুটিন বাঁধা সময়ে ঠিক যন্ত্রের মতন নাওয়া, খাওয়া, ঘুমানো সব কাজ করব।

নাতনী গরম সুরেই বলে, সেত' তুমি রোজই বল। আজ আর কোন কথা শুনছি নে।

বড্ড কাজ পড়ে গেছে। প্রবন্ধটা দু' চার দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

কবে তোমার কাজ থাকে না বলতে পার? যারা কাজ তৈরী করে তাদের কাজের কি শেষ আছে!

তা' নেই! মানুষ আরাম চায়, কুড়েমি হল সবচেয়ে বড় আরাম এবং মদের চেয়ে বেশি স্টিমুলেণ্ট। তা ছাড়া আমি বুড়ো—

থাক্ থাক্ বক্তৃতায় তুমি পিছু পা নও। কথার প্যাঁচ তুমি কলেজে দিও, আমাকে নয়। আজ থেকে, মানে এখ্‌খুনি এই রুটিন অনুসারে তোমাকে চলতে হবে।

লক্ষ্মী দিদিভাই, আজ—

না, আজ থেকেই, এবং এখ্‌খুনি।

আজ যে শনিবার, বারবেলা।

নাতনী হেসে ফেলে। বলে, তুমি আবার বারবেলা মান। সত্যি, এ বয়সে এত খাটলে, সময় মত নাওয়া খাওয়া ও বিশ্রাম না করলে বাঁচবে কি করে?

বাঁচব না যে, এ চরম সত্য। মৃত্যু আছে বলেই ত আমার জন্ম ও বেঁচে থাকবার একমাত্র প্রমাণ।

দর্শনশাস্ত্র এখন থাক দাদু। এবার চল।

দিদিভাই, এ কথা ত অস্বীকার করতে পার না যে, সময় আর নেই। মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌঁছেছি, আমার যাবার সংকেত ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, বিশ্রাম ত' আর নয়, মৃত্যুর পর ত চির বিশ্রাম রয়েছে।

চিরবিশ্রামের সংবাদটা, যে দেবতা তোমায় দিয়ে গিয়ে থাকুন, সাময়িক জীবনের সাময়িক বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথাটাও তার বলে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু—

আর কিন্তু নয়।

এই চ্যাপটারটা শেষ করেই আসছি, কাল আবার কলেজ কিনা।

আজ শনিবার বারবেলা, কাল—

ও তাই ত, কাল রবিবার। কিন্তু কাল যদি রবিবারই হবে তবে এত পড়ছি কেন। নিশ্চয়ই রবিবার নয়।

তোমার পড়া শনি রবির ধার ধারে না, ওটা স্বভাব। গত জন্মে দন্ডজল মাস্টার ছিলে, ছেলেদের অভিশাপ লেগেছিল তাই এ জন্মে কেবল পড়তেই হচ্ছে।

উঁহু! ঠিক মনে পড়েছে। বললেই হল। তাই ত বলি শুধু শুধু পড়তে যাব কেন। কাল যে কলেজের ছেলেরা আসবে। মাইনে নিই, কর্তব্য ত পালন করতে হবে।

যথেষ্ট কর্তব্য পালন হয়েছে, এবার চল।

তুই যা, আমি এলাম বলে।

পাঁচ মিনিট।

না, দশ মিনিট—প্লিজ।

না।

প্লিজ!

তা' হলে এক মিনিটও নয়।

তা' হলে ভাই আমি পাঁচমিনিটে রাজি আছি।

এখন দশটা।

ধন্যবাদ।

এমনি চলে। একদিন নয়, দুদিন নয়। আজ প্রায় ছ' সাত বছর ধরে চলছে।

ছোট সংসার। দাদু আর নাতনী। কিন্তু কাজের অন্ত নেই।

দাদু মনস্তত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ব বিষয়ে কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন। দাদুর নাম রায়বাহাদুর ডাঃ জগানন্দ চৌধুরী, এম এ, পি এইচ ডি (বার্লিন)। নাতনী কনকলতা দর্শনশাস্ত্রে এম এ পড়ে।

রায় চৌধুরী কলেজ আর লেখাপড়া করে সময় কুলিয়ে উঠতে পারেন না, তার ওপর রয়েছে রোগীর চিকিৎসা এবং বিশেষ বিশেষ রোগীকে বাড়িতে এনে পর্যবেক্ষণ (স্টাডি) করা। কনকলতার কাজ শুধু লেখাপড়া আর আত্মভোলা দাদুর সেবা করা নয়, রোগীদেরও ভার গ্রহণ করতে হয়।

একদিন ডাঃ চৌধুরী এক অদ্ভুত রোগী নিয়ে এলেন। রোগী কোন কথা বলে না, শুধু বই পড়ে আর তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবে। ভাবতে ভাবতে কিসের ভয়ে যেন ঘন ঘন আঁৎকে ওঠে।

রোগী যুবক, সুদর্শন এবং ভদ্র।

কনকলতা খানিক রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে বলল, দাদু, একে কেন নিয়ে এলে?

চিকিৎসা করব বলে।

তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ভাল করলনি। এ রোগী ভাল হবে না।

কি করে বুঝলে?

যারা অতিরিক্ত কথা বলে, মারধর ছেড়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, সারাক্ষণ 'থুম' ধরে শুধু ভাবে তারা আর কখনো ভাল হয় না। ওটাই নাকি একেবারে পাগল হয়ে যাবার শেষ লক্ষণ।

ডাঃ চৌধুরী শুধু হাসলেন, কোন কথা বললেন না।

কনকলতা বলল, তুমি হাসলে যে বড়?

হাসলাম এইজন্য যে, এত রোগী দেখে এবং এত শিখেও তুমি কিছু শিখতে পারনি। এত চট্ করে হতাশ হতে নেই। ভাল করে লক্ষণগুলি লক্ষ্য করে তারপর নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসা কর।

পাগলের চিকিৎসা আমার দ্বারা হবে না। পাগল ঘেঁটে ঘেঁটে আমিও তোমার মত পাগল হই আর কি।

আমি কি পাগল?

পাগল হবার বাকি কি।

হঠাৎ পাশের ঘরে একটি আর্তস্বর শুনে ডাঃ চৌধুরী ও কনকলতা দু'জনেই চমকে উঠলেন।

কনকলতা বলল, ব্যাপার কি?

পুনরায় শব্দ শুনে ডাঃ চৌধুরী ছুটে পাশের ঘরে গেলেন, কনকলতাও পিছনে পিছনে গেল।

ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন, যুবকটি ভয়ে কুঁকড়ে বিছানায় পড়ে দু'হাতে কান চেপে বালিশে চোখমুখ গুঁজে রয়েছে।

ডাঃ চৌধুরী খানিক তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে?

যুবকটি শংকিতভাবে মুখ তুলে তাকাল এবং পাশের খোলা জানালাটির দিকে চোখ পড়তেই পুনরায় আঁৎকে উঠে বালিশে মুখ চেপে ধরল।

ডাঃ চৌধুরী তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন, কনকলতাও তাকাল।

কনকলতা খানিক তাকিয়ে প্রশ্ন করল এখানে ভয় পাবার কি আছে?

ডাঃ চৌধুরী গম্ভীরভাবে বললেন, রক্ত দেখে ভয় পেয়েছে। লোকটির রক্ত আতংক। সেদিন নখ কাটতে গিয়ে সামান্য রক্ত পড়েছিল, সামান্য রক্ত দেখেই ভয়ে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠেছিল। খুব সম্ভব খুনী।

খুনী!

খুন না করলেও, খুন সংক্রান্ত কোন দুর্ঘটনায় লোকটি পাগল হয়েছে। ভয় পেলে নাকি?

ভয় করবার কথা নয়? কোনদিন হয়ত উপকারের প্রতিদান দেবে আমাদের খুন করে। কাজ নেই দাদু, একে বিদেয় কর। হয়ত সত্যি সত্যি পাগল, নয়ত পুলিশের ভয়ে পাগল সেজেছে। যদি পাগলই হয় তবে খুনী পাগল, যে কোন 'মুডে' খুন করতে পারে।

আমি বেশ ভাল করে স্টাডি করেছি। খুন করবার লোক নয়। নিশ্চয় কোন রহস্য এর পিছনে রয়েছে।

সেবারের কথা মনে নেই?

কোনটা?

পাগল সেজে এসেছিল, তারপর সুযোগ বুঝে সিন্দুক সাফ করে পালিয়ে গেল।

সেবার আমার সন্দেহ হয়েছিল।

সন্দেহ হয়ে লাভ কি। তোমার আবার জাল পাগলদের স্টাডি করবার কৌতূহল জেগে বসে। ফলে আট হাজার টাকা গচ্চা গিয়েছিল। তারপর সেই কেসটা, আমি তখন খুব ছোট, তোমাকে এক পাগল খুন করতে এসেছিল।

খুন—না তেমন কোন ঘটনা ত ঘটেনি।

বাঃ! দিদিমা তখন বেঁচে, একরাত্রে বঁটি নিয়ে তেড়ে এসেছিল।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, সে অনেক দিন আগের ব্যাপার। লোকটা তার জ্ঞাতিশত্রু মনে করে আমায় খুন করতে এসেছিল। তবে এ কেসটা একেবারে অন্য ধরণের। এ ছেলেটি শিক্ষিত ভদ্র এবং উঁচু বংশের।

পাগলের আবার বংশ ও শিক্ষাদীক্ষা। একে তুমি বাড়িতে না রেখে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।

এ ধরণের রোগী সচরাচর পাওয়া যায় না। একে দিয়ে আমার গবেষণাটা প্রমাণ করবার সুবিধা হবে।

আগে প্রাণ ত' বাঁচাও।

ডাঃ চৌধুরী হেসে বললেন, ভয় নেই দিদি, চুল পাকিয়েছি পাগল ঘেঁটে। মানুষ চিনি, এ ছেলেটি অন্য ধরণের, কোন ক্ষতি হবে না। দু'দিন স্টাডি কর দেখবি, তোর কৌতূহল কেমন বেড়ে যাবে।

ডাঃ চৌধুরী যুবকটির পাশে গেলেন এবং গম্ভীরভাবে খানিক তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, শোন। যুবকটি সভয়ে মুখ তুলে তাকাল। ডাঃ চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, তুমি কিসের ভয় পাচ্ছ? হ্যাঁ, বল, বল! ভয় কি!

রক্ত—হত্যা!

কে হত্যা করল?

যুবকটি চারিদিকে কি যেন খুঁজে বেড়াল। কি এক আতংক যেন তাকে ঘিরে রয়েছে, সে অনুভব করতে পারছে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, তোমার নাম কি?

নাম। নাম ত' জানি না।

সব কিছুরই ত' নাম থাকে, আমার নাম আছে, এর নাম আছে, তোমারও নাম আছে। এই যে বইটা পড়ছিলে, এতে কত নাম পেয়েছ। এই ধর চাকরটির নাম বলাই, গৃহস্বামীর নাম শশধর, যুবকটির নাম বিনয়। তেমনি তোমারও ত' নাম রয়েছে।

আমার নাম কি ছিল?

নিশ্চয় ছিল, তোমার কি মনে পড়ছে না। মনে কর ত'।

যুবক খানিক ভেবে বলল, আমার নাম বোধ হয় ছিল কিন্তু মনে পড়ছে না। কেন মনে পড়ছে না?

তোমার বাড়ি, যেখানে তুমি আগে থাকতে —তোমার বাবা মা, ভাইবোন ছিলেন।

যুবক অনেকক্ষণ ভেবে বলল, মনে পড়ছে না।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, বেশ ভাল করে মনে কর। সুন্দর তোমাদের বাড়ি ছিল, তোমার বাবা মা, ভাইবোন, আর কত লোক ছিলেন। তারা তোমায় কত ভালবাসতেন।

ভালবাসতেন—বাবা মা, ভাইবোন—তারা ছিলেন—আমি ছিলাম—সুন্দর বাড়ি। হারিয়ে গেলাম—খুঁজে পাচ্ছি না।

যুবক বলতে বলতে থেমে গেল এবং চোখবুজে ভাবতে লাগল। খানিক পরে যুবক ঘুমিয়ে পড়ল।

ডাঃ চৌধুরী কনকলতাকে ইসারা করে উঠে গেলেন। কনকলতা যাবার পূর্বে একটু থমকে দাঁড়াল। এমন ভদ্র সুপুরুষ যুবক খুনী আসামী! তাহার বিরূপ মনটা করুণায় ভরে উঠল। মস্তিষ্ক বিকৃতি ও স্মৃতিহীনতার জন্য হয়ত একটি সুখী পরিবারের সুখশান্তি সব শেষ হয়ে গেছে। আশ্চর্য! ওই চোখ, ওই মুখ, এমন কণ্ঠস্বর—না, না কিছুতেই খুনী হতে পারে না।

কিন্তু—! কনকলতা শেষ করতে পারল না, চিন্তাধারাকে চেপে দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাঃ চৌধুরী বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, কনকলতাকে হঠাৎ দ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখে প্রশ্ন করলেন, কি?

কনকলতা একটু থমকে গেল, তারপর স্বাভাবিক ভাবেই বলল, তোমার সঙ্গে সাইকো-এনালাইসিস আমার মিলছে না।

কেন?

এ লোকটি খুনী হতেই পারে না।

তবে পাগল হল কেন?

পাগল ত' নয়, স্মৃতি লোপ পেয়েছে, এবং কথায় ও কাজে আর চিন্তাধারায় অসংলগ্নতা হয়েছে।

তবে খুন যদি না হয় ত' প্রেম ঘটিত কোন ব্যাপার নিশ্চয়।

তা' নিশ্চয়ই নয়।

ডাঃ চৌধুরী হাসলেন।

হাসলে যে?

এমনি।

এমনি নয়। তুমি যা ভেবেছ তা' নয়। আমার যুক্তি আছে, তাই বলছি লোকটি খুনী নয়।

যুক্তি তোমার নেই। আছে ভাবপ্রবণ অনুবৃত্তি। একদিন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

কনকলতা আর কোন কথা বলল না, লজ্জা এড়াবার জন্য পড়বার ঘরে চলে এল এবং সাইকোলজির একটি বই খুলে পড়তে বসল।

পাতার পর পাতা উল্টে নিয়ে হঠাৎ এক সময় কনকলতা বুঝতে পারল কিছুই সে পড়েনি। বইখানি সে বন্ধ করে সমুখের জানালার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে পড়ল, দাদু তাকে মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অনেক পড়িয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে মনস্তত্ত্বের গবেষণাও করেছে কিন্তু এই লোকটি যেন কেমন অদ্ভুত, অত্যন্ত বিসদৃশ। কোন নিয়মেই মিল খায় না। যুক্তি তর্কে হয়ত একে খুনী আসামী সাব্যস্ত করা যায় কিন্তু সত্য সত্যই ত' সে তা নয়। হতে পারে না। কিন্তু কেন?

কেন তার জবাবও সে পায় না।

আশ্চর্য!

কনকলতা শুধু মনস্তত্ত্বের জটিল যুক্তি-তর্কের সমস্যা সমাধানেই চলতে পারে না, মানুষের জীবন তাকে ভাবায়। কেন মানুষ এমন হয়, কেন এমনিভাবে ভুল করে। এর জন্য কত জীবন, কত সুখশান্তি পূর্ণ সংসার হয়ত ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে। কত জীবন, কত পরিবারের কাল্পনিক দুঃখদুর্দশার কথা মনে করে সে কতই না বেদনা অনুভব করেছে।

কেন মানুষ পাগল হয়? কি সে অপরাধ করেছে, যার জন্য শিক্ষাদীক্ষা, বংশমর্যাদা, সুখ শান্তি, ঐশ্বর্য বিভব, প্রভাব প্রতিপত্তি, মানসম্মান সবই ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই যুবকটি যদিও স্মৃতিহীন এবং কাজে ও কথায় মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায় তবু কত ভদ্র। লোকটি যে উচ্চ শিক্ষিত ছিল

তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকটির সংগে যত সে মিশেছে ততই এর মহত্ত্ব ও ভদ্র আচরণে মুগ্ধ হয়েছে। লোকটি এমন কি অপরাধ করেছিল, এমন কি ত্রুটি রয়ে গেছে এর জন্মরহস্যে যার পরিণামে স্মৃতি লোপ পেল, মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটল। হয়ত এই যুবককে কেন্দ্র করে তার পিতামাতা, ভাই বোন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণেও ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বুক বেধে ছিল। হয়ত কোন কুমারী একে স্বামী নির্বাচন করে রঙিন জাল বুনেছিল। হয়ত এর অর্থ সাহায্যে বহু পরিবার বেঁচে ছিল। কোন সুদূর পল্লীগ্রামে হয়ত কোন দুঃস্থ আত্মীয় এখনও মনিঅর্ডার পিয়নের প্রতীক্ষা করছে। কে জানে এই নির্মম রহস্যের পশ্চাতে কত মর্মান্তিক কাহিনী অলক্ষ্যে রচিত হয়েছে।

কত কথাই কনকলতার ভাবুক মনে গুঞ্জরিত হয়। মানুষের এত বড় ইতিহাসে কত রহস্য, কত বিস্ময়, কত সুখদুঃখের কত বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী স্তরে স্তরে আঁকা হয়ে যাচ্ছে। কে তার হিসাব করতে পারে!

কনকলতা মাঝে মাঝে থেমে যায়। কিন্তু পারে না। বারে বারে নানা ঘটনা নানাভাবে তার মনে আলোড়ন তোলে। এতদিন যে দৃষ্টিভংগীতে ভেবে এসেছে তার সঙ্গে কি আজিকার ভাবনাধারার পার্থক্য নেই? আজ কি নূতন সুরের রেশ অলক্ষ্যে বেজে উঠতে চাইছে না?

যুবক ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ এক দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠল।

কনকলতা অদূরে বসেছিল। চীৎকার শুনে চমকে উঠল। প্রশ্ন করল, কি হয়েছে?

একটা স্বপ্ন দেখেছি।

স্বপ্ন! কি দেখেছ?

স্বপ্ন—স্বপ্ন—ভয় করছিল। কেন ভয় করছিল?

যুবক কেন ভয় করছিল, কি সে দেখেছে পুনরায় স্মরণ করতে চেষ্টা করতে লাগল।

বল, থামলে কেন? কি দেখে ভয় পেয়েছ?

ভয় পাচ্ছিলাম?

খুব ভয় পেয়েছ।

হ্যাঁ, ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।

বল, বল কেন ভয় পেয়েছিলে? তোমাকে তাড়া করে এসেছিল—কে যেন খুন হয়েছে—রক্ত—চীৎকার—ভীষণ রক্ত।

যুবক বলে উঠল, হ্যাঁ রক্ত রক্ত। মাধবী চীৎকার করে উঠেছিল, তার বুক থেকে রক্ত পড়ছিল। সে বলেছিল, সুমিত্র, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

কনকলতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, থামলে কেন, বল, বল। তারপর তুমি পালালে।

হ্যাঁ, আমি পালালাম। চারিদিকে লোক, মাথাগুলি লাল, হাত থেকে আগুন বের হতে লাগল। তাদের সংগে মীরজাফর। তারপর কী যেন বিকট শব্দে পড়তে লাগল, বাড়িঘর ধ্বসে পড়ল, আগুন জ্বলে উঠল। পম্পাই নগরীর ধ্বংসস্তূপে কাদের কান্না শুনতে পাচ্ছি। এখনও শুনতে পাচ্ছি—ওই দেখা যাচ্ছে মাধবীর বুকে রক্ত, কাদের মরণ আর্তনাদ।

যুবক চোখ বুঁজে পড়ে রইল।

খানিকক্ষণ পরে যুবক উঠে বসল। ভয়ে ও বিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কনকলতা জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি সুমিত্র?

আমার নাম সুমিত্র! কেন?

এইমাত্র যে তুমি বললে?

বলেছিলাম—কখন?

স্বপ্ন দেখে!

হয়ত স্বপ্নে দেখেছিলাম, কিন্তু এখন কিছুই মনে পড়ছে না।

মাধবীকে তুমি চেন?

মাধবী—মাধবী—না মনে পড়ছে না।

তোমার নাম সুমিত্র, মাধবী তোমার বিশেষ পরিচিত।

যুবক গভীরভাবে ভাবতে লাগল।

কনকলতা প্রশ্ন করল, মাধবীকে তুমি গুলি করেছ, খুন করেছ?

মাধবী! খুন—যুবক বলতে বলতে থেমে গেল এবং ভাবতে লাগল।

মাধবীকে তুমি ভালবাসতে? কিছুই মনে পড়ছে না। মনে কর তোমার নাম সুমিত্র, মাধবী তোমার মাধবী। ভুল করে তাকে হত্যা করা হয়। পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করতে আসে, তুমি পালিয়ে যাও। মনে করত!

যুবক ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ল।

কনকলতা খানিক প্রতীক্ষা করল, তারপর ধীরে ধীরে একটি চাদর গলা পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

পরদিন সকালবেলা কনকলতা এসে দেখল সুমিত্র বহু পূর্বেই জেগেছে এবং একখানা বই নিয়ে স্বাভাবিক মানুষের মতই পড়ছে।

কনকলতা খানিক লক্ষ্য করল। লোকটিকে দেখে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়। যেন লোকটির কিছুই হয়নি। আত্মচেতনাহীন অবস্থায় লোকটি সাধারণ অবস্থায় থাকে; হাবভাবে, চিন্তাধারায় কোন দ্বন্দ্ব, কোন অসংগতি প্রকাশ পায় না। লোকটির মাঝে মাঝে যখন আত্মচেতনা জাগে তখন সবকিছুই ওলটপালট হয়ে যায়। এই অসংগতি ও বিশৃংখলা কৃত্রিম নয়, স্বাভাবিক।

কনকলতা প্রশ্ন করল, মুখ ধোয়া হয়েছে?

সুমিত্র বইখানি রেখে দিয়ে বলল, হাঁ।

কনকলতা বলল, চল চা খেতে যাই।

সুমিত্র ও কনকলতা চায়ের টেবিলে এসে বসল। টোস্টে জ্যাম্ মাখাতে মাখাতে কনকলতা প্রশ্ন করল, কাল রাত্রের কথা মনে পড়ে?

সুমিত্র খানিক ভেবে বলল, না, মনে পড়ছে না।

কাল তুমি স্বপ্ন দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিলে?

ভয় পেয়েছিলাম? কেন ভয় পেয়েছিলাম?

কনকলতা রাত্রের ঘটনাটি বলে প্রশ্ন করল, মাধবী কে?

মাধবী—মাধবী। দাঁড়াও, মনে হচ্ছে মাধবীকে যেন চিনি।

সুমিত্র ভাবতে লাগল।

কনকলতা বলল, তোমার নাম কি সুমিত্র? তুমি কি মাধবীকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খুন করেছিলে?

আমি সুমিত্র—মাধবী—বিশ্বাসঘাতকতা—খুন দরদর করে রক্ত পড়ছিল—পুলিশ—বোমা!

তারপর?

সুমিত্র ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। অতীত ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়ে কেমন যেন ছটফট করতে লাগল। অনেক কিছুই যেন জানে, অনেক কথা মনে পড়তে চায় কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। মনে হয় মনে পড়বে, কিন্তু কিছুতেই মনে আসছে না। সুমিত্রের মুখ ক্লান্তিতে, পরিশ্রমে আর অক্ষমতার বেদনায় ভরে উঠল।

খানিক প্রতীক্ষা করে কনকলতা প্রশ্ন করল, তোমার কি কোন কঠিন ব্যাধি হয়েছিল?

সুমিত্র কোন জবাব দিল না।

কনকলতা পুনরায় প্রশ্ন করল, তোমার কি কোন প্রিয়জনের অকালমৃত্যু হয়েছে? বাবা, মা ভাই, বান্ধবী—কারো মৃত্যু।

মনে পড়ছে না।

তুমি কি সৈনিক ছিলে?

সৈনিক!

সৈনিকদের কখনো কখনো এমন হয়। যাদের স্নায়ু দুর্বল থাকে তারা বোমাবর্ষণে, বীভৎস নরহত্যায় এত ভয় পেয়ে যায় যে, মানসিক সাম্য হারিয়ে ফেলে।

বোমা বর্ষণ! সুমিত্র যেন চমকে উঠল।

এই চাঞ্চল্য কনকলতার দৃষ্টি এড়াল না। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, জাপানী বোমাবর্ষণ, কত লোকের মরণ আর্তনাদ, ভয়াবহ শব্দ—

হ্যাঁ, ভীষণ শব্দ, মেসিন গান থেকে গুলি-বর্ষণ, ঘরবাড়ি ধ্বংস, আগুন, নরনারীর চীৎকার। ওই আমি যেন শুনতে পাচ্ছি। মাধবী মরল—রক্ত—বোমা—গুলি!

তারপর?

তারপর, সব যেন দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পাচ্ছি না, অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে। কারা চীৎকার করছে। আমায় শুনতে দাও, আমি শুনব।

সুমিত্র টেবিলের উপর মাথা রেখে চোখ

বুজল। শিথিল হাত থেকে ধীরে ধীরে টোর্চটি পড়ে গেল।

এ্যাটর্ণী তারিণী লাহিড়ী চৌধুরী পরিবারের বিশেষ বন্ধু। প্রায় প্রত্যহই তিনি আসেন। নানাভাবে তিনি এ পরিবারের সহিত জড়িত। আপদে বিপদে তিনি সাহায্য করেন, সুপরামর্শ দেন। ডাঃ চৌধুরীর বিষয় সম্পত্তি, শেয়ার প্রভৃতির তিনিই তত্ত্বাবধান করেন।

তারিণীবাবুর পুত্র সুবিমল এম এ ও ল পাশ করে ইনকামট্যাক্স বিভাগে ঢুকেছিল, সম্প্রতি অফিসার হয়েছে। কনকলতার সহিত সুবিমলের বিয়ের সম্ভাবনা পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই বহুদিন যাবৎ অনুমান করছিল। সুবিমলের পদোন্নতি হওয়ায় অনুমানটা বাস্তবে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ দিক থেকে যদিও কোন পাকাপাকি কথা হয়নি তবে উভয় পক্ষেরই সম্মতি রয়েছে এবং কনকলতার এম-এ পরীক্ষার পর তাদের বিয়ে হবে এরূপ প্রায় স্থির হয়ে আছে।

অজ্ঞাতকুলশীল এক সুদর্শন যুবককে হঠাৎ গৃহমাঝে স্থান দেওয়ায় তারিণীবাবু মনে মনে যথার্থ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু কখনও কোন কথা প্রকাশ করেননি।

তারিণীবাবু ভাল করেই জানেন যে, ডাঃ চৌধুরী নীতিবাদী। তিনি তার কর্তব্য থেকে এক চুল সরে দাঁড়ান না। যখন যা করব বলে স্থির করেন তা শেষ না করে বিরত হন না। অনেক সময় অদ্ভুত খেয়ালের জন্য তাঁকে বিপদে পড়তে হয়েছে এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। সেজন্য তিনি দুঃখিত হননি।

যেমনি দাদু, তেমনি তৈরী হয়েছে তার নাতনী। দুজনেই খেয়ালকে জেদে পরিণত করে। ব্যবহারিক জীবনে যেটা খেয়াল, সেটাই যেন তাদের মানবিক কর্তব্য, আদর্শ এবং গবেষণার অঙ্গ।

সুমিত্রের সঙ্গে কনকলতার ঘনিষ্ঠতা তারিণীবাবু প্রীতির চোখে দেখতে পারেননি। ডাক্তারের সহকারিণী হিসাবে রোগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা কোনদিনই সমর্থন করেন নাই, বিশেষ করে যুবক রোগী। এ নিয়ে ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্কও হয়েছে কিন্তু ডাঃ চৌধুরী তার অহেতুক ভয়কে সহাস্যে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বরঞ্চ পাল্টা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন, মানুষের সেবা করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। রোগীর জাতি, ধর্ম, বংশ, ভদ্র অভদ্র, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য কোন কিছুরই বিচার নেই। রোগীর চেনাশোনার প্রয়োজন হয় না কারণ রোগী সন্তানতুল্য। সেবা ধর্ম পালন করতে গেলে ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে এবং বিপদ যদি আসে তা' হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া আমি নিজের স্বার্থের খাতিরেও ত রোগী ধরে আনি। মশাই, গবেষণা কি চাট্টিখানি কথা। রোগী যে পাই তা ত সৌভাগ্যের কথা।

কনকলতাও দাদুর প্রতিধ্বনি করে। দাদু যে চিকিৎসক, পুরুষ মানুষ—তার পক্ষে যা চলতে পারে, একজন অবিবাহিত যুবতী নারীর পক্ষে যে তা একেবারেই চলতে পারে না এ সহজ কথাটি পর্যন্ত বুঝতে চায় না। দাদুর পক্ষে যা সহজ ও স্বাভাবিক তা যে তার পক্ষে সর্বনাশা হতে পারে এ ধারণাই যেন এতখানি বয়সেও কনকলতার জন্মায়নি।

এই অপ্রিয় সত্য কথা এত কঠিন যে কোন মহিলাকে বলা যায় না, বিশেষ করে ভাবী পুত্রবধূকে। তাই তারিণীবাবু এতদিন চুপ করে কোনভাবে আত্মসংবরণ করেছিলেন, কিন্তু যখন থেকে সুবিমলের প্রতি কনকলতার ঔদাসীন্য প্রকাশ পেতে লাগল তখন তারিণীবাবু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। অনেকবার তিনি বলি বলি করেও কিছু বলতে পারলেন না। বিষয়টি এত দুর্বল এবং অভদ্রোচিত যে, এ বিষয়ে কোন কথা বলা তারিণীবাবুর মত স্বার্থপর ও চতুর ব্যক্তির পক্ষেও লজ্জাকর বলে মনে হল। তিনি সুমিত্র ও সুবিমলকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বহুবার বিচার করেছেন। সর্বদিক বিবেচনা করে যদিও বুঝতে পেরেছেন যে, অসম্ভব কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না তবু আশংকা দূর করতে পারেননি। তার কেবলি আশংকা হয় যে, কনকলতা চিকিৎসার অজুহাতে যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে সুমিত্রের প্রতি অনুরাগ জন্মাতে পারে; এবং দাদু ও নাতনী যে ধরণের খেয়ালী ও জেদী লোক তাতে এই অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের সঙ্গেও বিয়ে ঘটতে পারে। গোড়াতেই যদি বাধা না দেওয়া যায় তবে শেষ পর্যন্ত একটা নাটকীয় কেলেংকারী ঘটবেই।

তারিণীবাবু অনেক কিছুই ভাবলেন এবং অনেক কিছু বলবার জন্য মুসাবিদা করলেন কিন্তু কনকলতাকে সোজাসুজি কিছু বলতে সাহস পেলেন না। মেয়েটি যদিও বয়সে অনেক ছোট কিন্তু তার মাঝে এমন এক গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব ও আত্মচেতনাবোধ রয়েছে যে, তিনি পিতার বয়সী হয়েও ভাবী পুত্রবধূকে কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

তারিণীবাবু মনে মনে যখন নানাপ্রকার ফন্দী আঁটিতেছিলেন তখন এক অভাবনীয় সুযোগ ঘটে গেল। হঠাৎ এক পুলিশ বিজ্ঞপ্তি তার নজরে পড়ে গেল।

পুলিশ এক ফেরারী আসামীর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে। ফেরারী লোকটি কোন এক মহিলাকে খুন করে ফেরার হয়েছে। যুবকের বয়স, চেহারার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সুমিত্রের সঙ্গে তা মিলে যায়। ঘোষণাটি পড়ে তারিণীবাবুর আর সন্দেহ রইল না যে, উক্ত ফেরারী আসামীই সুমিত্র। সুমিত্রের উপর বরাবরই তার সন্দেহ ছিল, ঘোষণাটি পড়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

তারিণীবাবু কালবিলম্ব না করে কাগজটি নিয়ে ডাঃ চৌধুরীর নিকট এলেন এবং কোন ভূমিকা না করে বললেন, হল ত মশাই। তখনই বার বার বারণ করেছিলাম, কোন কথাই কানে তুললেন না। এ্যাটর্ণী হলেও আইন নিয়ে ও ক্রিমিন্যাল চড়িয়ে খেতে হয়। এখন সামাল দিন

ডাঃ চৌধুরী চশমাটা ভাল করে চোখে এ'টে বললেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুঝি ফেল পড়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ফেল!

অনেকগুলি টাকা তবে গেল। আপনার কথাতেই ত মশাই, এত টাকার শেয়ার কিনেছিলাম। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লোকগুলি ত ভাল ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ফেল পড়বে কেন?

তবে?

তারিণীবাবু, কাগজখানি ডাঃ চৌধুরীকে পড়তে দিলেন

ডাঃ চৌধুরী কাগজটি পড়ে বললেন, এমন ঘটনা ভারতবর্ষে প্রায়ই ঘটছে। এ নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক কিংবা কোন ধনী লোকের ব্যাপার তাই পুলিশ আসামী ধরবার জন্য মোটা টাকা ঘোষণা করেছে। এ ত সাধারণ ব্যাপার, এর জন্য আপনি এত উত্তেজিত হয়েছেন কেন।

আপনাকেও যে পুলিশ নাজেহাল করবে সে খেয়াল আছে?

আমি এখন পারব না কোন পুলিশ কেস হাতে নিতে। আমার হাতে এখন ভীষণ কাজ।

সে কথা নয়। আপনি নিজেই এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন।

বলেন কি মশাই, আমি নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ পাচ্ছি না আর নিজেই কেসটি নিয়েছি।

কেস নয়—আপনি ফেরারী আসামীকে আশ্রয় দিয়েছেন। সেজন্য আপনাকে বিপদে পড়তে হবে।

খুনী আসামীকে আশ্রয় মানে?

যে যুবকটিকে আপনি আশ্রয় দিয়ে চিকিৎসা করছেন, সে ত খুনী আসামী।

তা হতেও পারে।

এ লোকটিকেই পুলিশ খুঁজছে।

এ'কেই যে খুঁজছে তা কি করে বুঝলেন?

চেহারার মিল—হুবহু মিলে যায়।

মানুষের চেহারার মিল থাকে।

দেখুন এ সকল গুরুতর ব্যাপারে 'থিওরী' চলবে না। খুনী আসামীকে আপনার বহুপূর্বেই ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

এই যুবক যে খুনী আসামী তা নিশ্চিত না জেনে কি করে পুলিশে খবর দেব।

এবার ত বুঝতে পারছেন। পুলিশের বর্ণনানুযায়ী যখন মিলে যাচ্ছে তখন আপনার অবিলম্বে পুলিশে সংবাদ দেওয়া উচিত।

এ যুবকই কি সেই ফেরারী আসামী? আপনি কি ঠিক বুঝতে পারছেন? চলুন ত এবার চেহারাটা মিলিয়ে দেখি। কিন্তু এ লোকটির ত মাথায় দোষ রয়েছে, স্মৃতিশক্তি নেই। না মশাই এ ছেলেটি নয়।

মস্তিষ্ক বিকৃতি, স্মৃতি লোপ হল মুখোস। এরা হল জাত ক্রিমিন্যাল, এমন অভিনয় করে যে, কার সাধ্য বুঝতে পারে। এরা কখনও পাগল সাজে কখনও বোবা, বোকা হয়, কখনও সাধু সন্ন্যাসীর বেশে. পুলিশকে এড়াতে চায়।

চলুন ত যাই একবার ভাল করে যাচাই করে দেখি। কাগজটা পড়তে দেব, যদি সত্যি সত্যি ফেরারী আসামী হয়, তবে কিছুতেই আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। মুখের অভিব্যক্তির পরিবর্তন হবেই।

লোকটি যে খুনী কিংবা খুন সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত সে বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এ বিষয়ে আপনি কেন রিস্ক নিতে যাবেন। এদের দ্বারা কিছু অসম্ভব নেই, আপনাকেও খুন করতে পারে। চুপি চুপি পুলিশে খবর দিন। এতদিন যে খবর দেননি তা নিয়ে দেখুন আবার কি বিপদে পড়তে হয়।

কনককে ডাকি, ওর সঙ্গে পরামর্শ করে নিই।

না, না এ সকল গুরুতর ব্যাপারে ছেলেমানুষকে আর টানবেন না। বে-আইনী কাজ করেছেন এখন কোনভবে 'হাস আপ' করতে পারলে হয়। আচ্ছা আপনাকে কিছু করতে হবে না, যা করবার আমিই করব। আপনি শুধু নিঃশব্দে থাকবেন, কেউ যেন কোন কথা না জানতে পারে। জানাজানি হলে লোকটি পালিয়ে যেতে পারে, খুন করতে পারে। শেষটায় পুলিশের কানে গেলে মহা কলঙ্কারী হবে।

কনকলতা প্রথম প্রথম মনে করত, সুমিত্র ইচ্ছা করে স্মৃতিলোপ ও মস্তিষ্ক বিকৃতির ভান করে রহস্যময় অতীত জীবন গোপন করছে। কিন্তু যতই সে সুমিত্রের সঙ্গে মিশেছে এবং প্রকাশ্যে ও অলক্ষ্যে তাকে পর্যবেক্ষণ করেছে ততই তার বিশ্বাস হয়েছে যে, সুমিত্রর সত্যই স্মৃতিলোপ হয়েছে। বহুদিন পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পেরেছে যে, লোকটি হয়ত খুনী, কিন্তু সে খুন সাধারণ নয়। ওই খুনের পশ্চাতে হয়ত বড় কোন প্রয়োজন ছিল।

সুমিত্রর অসহায় অবস্থা এবং স্মৃতিলোপ ও মস্তিষ্ক বিকৃতি তাকে কৌতূহলী করেছিল, তাকে ভাবপ্রবণ করেছিল। তাই সে স্বেচ্ছায় সুমিত্রর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছিল। লোকটির মাঝে এমন এক শক্তি ছড়িয়ে রয়েছে যে, সে কিছুতেই একে ছেড়ে যেতে পারছে না। ক্রমশ স্নেহ, প্রীতি ও মমতা তাকে জড়িয়ে নিচ্ছে। পরীক্ষা নিকটবর্তী হওয়ায়, সে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। সুমিত্রর কথাবার্তা, আচরণ, অসহায় অবস্থা এবং রহস্যময় অতীত জীবন তাকে সর্বদিক থেকে ঘিরে রয়েছে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, সে ভুল করতে চলেছে, পরে হয়ত মহাভুলের আর সংশোধন হবে না। ভুলের প্রতিকার করতে গিয়ে অজ্ঞাতভাবে আরও ভুল করে বসে। লজ্জায় তার মনটা রি রি করে উঠে, মানবতার মাঝে নারী মনটা কেমনভাবে যেন বিদ্রূপ করে ওঠে। লজ্জায় সে ভাবতে চায়, সুমিত্র অজ্ঞাতকুলশীল, স্মৃতিহীন বিকৃত মস্তিষ্ক যুবক। এর প্রতি আসক্তি শুধু অন্যায় নয়, মিথ্যা, অসম্ভব। জোর করে বলে ওঠে, এ হতে পারে না। লোকটি খুনী আসামী এবং এর অতীত ইতিহাসে হয়ত কত কুৎসিত ঘটনা জড়িত রয়েছে।

সুমিত্রর প্রতি অনুরাগকে অস্বীকার করতে গিয়ে, সুমিত্রর অতীত জীবনকে কুৎসিত ঘটনায় জড়িয়ে ভাবতে কনকলতার মন সায় দেয় না। তার মন বলে ওঠে, যে লোকটি এত ভদ্র, যার স্বভাবচরিত্র সন্দেহের ঊর্ধ্বে, সে কি করে গর্হিত ও কুৎসিত ঘটনার সঙ্গে জড়াতে পারে! লোকটি নিশ্চয়ই চরিত্রহীন দুর্বৃত্ত ছিল না। কতদিন সে সুমিত্রকে নিয়ে বেড়াতে গেছে, বহুবার নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রে মাঠের অন্ধকারময় গভীর শূন্যতায়, জনবিরল নদীতটে সুমিত্রর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কাটিয়েছে। দার্জিলিং ও পুরীতে দিনের পর দিন কাটিয়ে এসেছে। বহুবার গভীর রাত্রে সুমিত্রকে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য একা একা শয্যাপার্শে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন দিন সে সুমিত্রর চোখে পড়ে গেছে। গভীর রাত্রে নির্জনে চুপি চুপি তাক আসতে দেখে সুমিত্র আশ্চর্য হয়নি, কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়নি, শিশুর সারল্য নিয়ে কথা বলেছে।

কিন্তু সে কি ভুল করছে না? কনকলতার মনটা দমে যায়। মনে হয়, নীতির দিক থেকে সে অপরাধিনী। সুবিমলের প্রতি সে অবিচার করেছে, সমাজের প্রতি অন্যায় করেছে। যদিও সে মৌখিকভাবে সুবিমলের বাকদত্তা নয়, কোন অনুষ্ঠান দ্বারাও তাদের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়নি কিন্তু নৈতিকভাবে সে বাকদত্তা। সুমিত্রর প্রতি তার অনুরাগ ত' সে নিজে, নিজের দিক থেকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে না। এবং এই অনুরাগ যে ক্রমশ গভীর হচ্ছে তা' সে নিজেই বুঝতে পেরেছে।

নিজের মনেই সে নিজেকে অপরাধিনী ভেবে মুষড়ে যায়। মনে হয়, জনসমাজ তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে পারবে না। একজন অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে রোগী হিসাবে গৃহে স্থান দিয়ে তার প্রতি অনুরক্ত হওয়া কত লজ্জাকর বিষয়। চিকিৎসার নামে প্রণয়—ভাবতেও কনকলতার মনটা ছি ছি করে উঠল।

মনের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে কনকলতা আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে মনস্থ করল। এবং অনেক অনুশীলন করল কিন্তু পারল না।

কনকলতা যখন কিছুতেই আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারল না তখন নিরুপায়ে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে পরীক্ষার পড়া পড়বার অজুহাতে সে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

মনের সঙ্গে কনকলতার যখন এমনি বোঝাপড়া চলছে তখন তারিণীবাবু সুমিত্রকে ধরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করলেন। এত সহজ উপায়টা পেয়েও কনকলতা গ্রহণ করতে পারল না। সুমিত্রকে মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য সে কত কৃচ্ছ্র সাধন করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু মুছে ফেলতে পারেনি। চিরকালের জন্য সরিয়ে দেবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে কনকলতার মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। তার মনে হল, এ অন্যায়, এ নীচতা ও নির্মমতা।

প্রতিবাদ করে কনকলতা বলল, দাদু এ অন্যায়—এ নির্মম নির্দয়তা।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, কেন?

যার বিষয়ে কিছুই জান না, তাকে খুনের দায়ে ধরিয়ে দেবে? তুমি বেশ ভাল করেই জান যে, লোকটি অতিশয় ভদ্র, সম্ভ্রান্ত। কোন অজ্ঞাত ট্র্যাজিডি বশত স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

যদি নির্দোষ হয় তবে মুক্তি পাবে।

কি করে মুক্তি পাবে! যার স্মৃতি নেই, মস্তিষ্ক বিকৃত সে কি করে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে? আজ লোকটি ভালমন্দের বাইরে। হয়ত পুলিশ লোকটির স্মৃতিশক্তি লোপ ও মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা একেবারেই বিশ্বাস করবে না, এবং স্বীকারোক্তি করাবার জন্য নির্মম পীড়ন করবে। লোকটি হয়ত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এমন কিছু বলতে বাধ্য হবে যার পরিণামে বিনা দোষে ওর ফাঁসি হয়ে যাবে।

তাই ত'। এত কথা ত' তখন ভাবিনি। তারিণীবাবু বললেন, আইনের ভয়ে হাঁ বলে ফেললাম।

তারিণীবাবুর নাম শুনে কনকলতার মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। লোকটিকে সে কোনদিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেনি। লোকটি অতিশয় ধূর্ত। কখনও কোন কথা সোজাসুজি বলে না। তার প্রতি কথা ও আচরণে স্বার্থপরতা ও নীচতা বর্বরভাবে প্রকাশ পায়। সুমিত্র এখানে আসবার পর থেকে যেন নীচতা ও হীনতার মুখোস পরিস্ফুট হয়ে পড়েছে।

কনকলতা রাগতভাবে বলল, তারিণীকাকা কোন্ প্রকৃতির লোক তা' তুমি ভাল ক'রেই জান। তিনি লোকের মন্দ বই ভাল কোনদিন করেননি।

কাজটা ত' বে-আইনী।

বে-আইনী কি করে হল। তুমি ডাক্তার, লোকের চিকিৎসা কর। রোগীর চিকিৎসা

করেছ, কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় দাওনি, অপরাধীর অপরাধও গোপন করনি।

তারিণীবাবু আইনজ্ঞ, তিনি বললেন, আমি ভয়ে সম্মত হলাম। এখন মনে হচ্ছে, কাজটা ভাল হয়নি। যে লোক নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারে না, যার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন-হীন অবস্থায় ধরিয়ে দেওয়া সংগত হয়নি।

পুলিশে খবর দেওয়া হয়ে গেছে?

না, কাল সকালে তারিণীবাবু দেবেন।

খবর আর দেবার প্রয়োজন নাই, টাকাটা আমিই ওকে দিয়ে দেব।

পাগল, তারিণীবাবু কি টাকার জন্য ধরিয়ে দিচ্ছেন। তারিণীবাবুর টাকার অভাব কি। উনি আমার ভাল করবার জন্যই এ অপ্রীতিকর কর্তব্য করতে যাচ্ছেন। লোকের সদিচ্ছাটাও তোমার বিবেচনা করা উচিত।

তারিণীকাকা কি ধরণের লোক তা' সকলেই জানে। তিনি তোমায় ভাল ও সরল মানুষ পেয়ে বহু শেয়ার নিজের নামে transfer করিয়ে নিয়েছেন। সে শেয়ারগুলি এখন শতকরা ৫০।৬০ টাকা লভ্যাংশ দিচ্ছে।

কনকলতা তাড়াতাড়ি ফোন তুলল।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, কাকে ফোন করবে?

'তারিণীকাকাকে।' কনকলতা ফোনে তারিণীবাবুর সংগে কথা বলতে লাগল, কে? তারিণীকাকা, আমি কনক। আমি বলছিলাম, আপনি পুলিশে খবর দেবেন না।...হাঁ দাদুরও তাই মত।...এমন কি প্রমাণ পেয়েছেন?...ফোনে বলা যায় না। বেশ তবে কাল কথা বলা যাবে, তখন যা স্থির হবে তাই করা যাবে।...আমি কেন আপত্তি করছি? একজন মস্তিষ্কবিকৃত, স্মৃতিহীন এবং ভালমন্দ জ্ঞানশূন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অক্ষম ব্যক্তিকে সন্দেহ বশে খুনের দায়ে ধরিয়ে দেওয়া মানবতার দিক থেকে গর্হিত কাজ—অন্যায়।...আপনি কেন ক্রুদ্ধ হ'চ্ছেন?...দাদু বলছে, বিপদ যদি হয় তবে তারই হবে, আপনি যেন পুলিশে কোন সংবাদ না দেন। যদি সংবাদ দিতেই হয় তবে দাদু দেবে।

কনকলতা ফোন ছেড়ে দিল।

কনকলতা ডাঃ চৌধুরীকে বলল, তারিণী-কাকা এত জেদ করছেন কেন, এবং আমি এ বিষয়ে কথা বলছি বলে এত রাগ করছেন কেন? ওর উদ্দেশ্য ভাল নয় আমি বলতে পারি।

একটা ঝগড়া বাধালি ত'। যা রগচটা মানুষ আবার না চটে যায়।

তিনি রাগই করুন আর নাই করুন, পুলিশে খবর দেওয়া চলবে না।

যদি তারিণীবাবু প্রমাণ নিয়ে আসেন?

তবু নয়।

তবু নয় কেন?
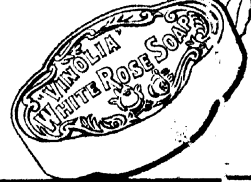
ডাঃ চৌধুরীর প্রশ্নে কনকলতার মুখখানি সহসা লজ্জায় আরক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু মুহূর্তে মধ্যে আত্মসংবরণ করে বলল, লোকটি যে শিশুর মত অসহায়। মনে কোন পাপ নেই, ভয় ডর নেই, বর্তমানে লোকটি যে অবস্থায় আছে, তাতে সে আইনকানুনের বাইরে। কিন্তু পুলিশ ত বিশ্বাস করবে না। তারা মনে করবে সমস্তই মিথ্যার মুখোস। এবং স্বীকারোক্তি করাবার জন্য নির্মম অত্যাচার করবে, পরিণামে লোকটি হয়ত অত্যাচার এড়াবার জন্য মিথ্যা স্বীকারোক্তি করে ফাঁসি যাবে। যদি এর পিছনে রাজনীতির গন্ধ থাকে তবে ফাঁসির অনুকূলে সমস্ত কিছু ছক বাঁধা পথে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

তাইত দিদি।

দাদু, একথা ভুল না যে, আইনের উর্ধ্বে মানবতা রয়েছে।

ডাঃ চৌধুরী পুলিশে সংবাদ না দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘুমাতে গেলেন।

ডাঃ চৌধুরী ঘুমাতে গেলে কনকলতা নিজের শয়ন গৃহে এল। খানিকক্ষণ জানালার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনটা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল। মনে মনে প্রশ্ন জাগল, একজন অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের জন্য কেন এমনভাবে তার মনটা শঙ্কায় আর বেদনায় ভরে উঠল? ইহা কি মানবপ্রেম? হয়ত তাই!

উত্তর শুনে মনটা তার খুশি হল না। মনে হল আরও নিকটতরভাবে যেন সে প্রত্যাশা করেছিল।

কনকলতা জানালার ধারে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মনে হল, মিথ্যা সে এতদিন পালিয়ে বেড়িয়েছে। মনের দিক থেকে সে একটুকুও দূরে যেতে পারেনি।

ঘরের আলো নিভিয়ে কনকলতা সুমিত্রের ঘরে এল। সুমিত্র নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছে। কনকলতা পাশে এসে কয়েকটি কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে লাগল। সুমিত্র তার উপস্থিতি বুঝতে পারল না।

সুমিত্রকে তার চিন্তাধারা এবং অতীত জীবন লিপিবদ্ধ করবার জন্য বলা হয়েছিল। ডাঃ চৌধুরী ভেবেছিলেন, কোন অসতর্ক মুহূর্তে কিম্বা মনের বিশেষ কোন অবস্থায় সুমিত্র হয়ত তার অতীত জীবনের কোন কথা লিখে ফেলতে পারে।

কনকলতা কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে দেখল, লেখার মাঝে কোন ক্রমিক ধারা নেই, বিভিন্ন চিন্তাধারা এলোপাথ্যারি প্রকাশ পেয়েছে।

লেখার মাঝে অতীত জীবনের কোন ইঙ্গিত না পেয়ে কনকলতা সুমিত্রের মুখের দিকে তাকাল। সুমিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, লোকটির চেহারার মাঝে যে, অভিজাত্যের পৌরুষের আর সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্টভাবে রয়েছে তা কি হীনতা, হিংস্র বর্বরতার মুখোস মাত্র? যদি তাই হয় তবে ত' সে হিংস্রতা মহত্ত্বর ও কল্যাণের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ছিল। দেশের ও দশের জন্য মানুষ কত হিংস্র কাজ করতে বাধ্য হয়। হয়ত এই লোকটি দশের দাবীতে কোন নরহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। এবং তারি অন্তর্দাহে স্মৃতিহীন হয়েছে।

সুমিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল, লোকটিকে ভালবেসে জয় করা যায় না? হয়ত ভালবাসার যাদুমন্ত্রে স্মৃতি ফিরে আসতে পারে। যদি স্মৃতি ফিরে আসে, তাতেই বা ক্ষতি কি। ভালবাসাই ত শেষ কথা। ভবিষ্যৎ শুধু ভরে উঠবে ভালবাসায়, রহস্যময় অতীত নয় চিরকালের জন্য থেকে যাবে অতীতে ঢাকা। নাই বা রইল অতীত। সমগ্র জীবনটাই ত চিররহস্যময় অতীতে ঢাকা রয়েছে। জীবন ত বর্তমানকে নিয়ে, গতি তার সম্মুখ পানে। এই ত জীবন। এবং জীবনই ত' জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

মনে মনে প্রশ্ন জাগল, সে কি সুমিত্রকে ভালবাসে? এই চিন্তাধারা এই মনের আবেগই কি ভালবাসার রূপ? কিন্তু সুবিমল? সঙ্গে সঙ্গে সুবিমলের কথা মনে পড়ে গেল এবং মনটা দমে গেল। মনে হল, সুবিমলের প্রতি কি অবিচার করা হয়নি, তারু কি নৈতিক অপরাধ হচ্ছে না? নাই বা সে মুখের কথা দিয়েছে, কিন্তু কথা না বলে কি সে সম্মতি দেয় নি। দিনের পর দিন বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্যে, ভালবাসায় স্নেহ মমতায় কি মুখের কথার চেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি দেয়নি?

সংশয় ও দ্বিধায় মনটা তার ভরে উঠল। ভাল মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নীতি, কর্তব্য সব কিছু মিলে কনকলতাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলল।

লেখার কাগজটা পাখার হাওয়ায় নীচে পড়ে গিয়েছিল, সুমিত্র কাগজটা তুলবার জন্য চেয়ারটা ঘুরাতে গিয়ে কনকলতাকে দেখতে পেল।

সুমিত্র খুশি হয়ে প্রশ্ন করল, তুমি কখন এলে?

এই ত এলাম।

কৈ, তুমি ত অনেকদিন আসনি, আমি ত তোমায় খুঁজতাম।

তুমি আমায় খুঁজতে—কেন খুঁজতে।

খুঁজতাম, কেন খুঁজতাম তাই ত'।

মনে পড়ছে না?

এখন মনে পড়ছে না। তখন কেন আসনি। আজকে তোমায় খুঁজেছিলাম। তুমি বস, তোমাকে আমার ভাল লাগে।

কনকলতার মুখখানি আরক্ত হয়ে উঠল। কনকলতার এ বিশেষ রূপ সুমিত্রের চোখেই পড়ল না।

সুমিত্র বলে চলল, তোমার কথা মত কত পড়েছি, কত লিখেছি, কত ভেবেছি, ভাবতে ভাবতে তোমার কথা মনে পড়ে যায়। তুমি ভারি ভাল।

তোমার অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে না?

না, অস্পষ্টভাবে মনে হয়, কিন্তু মনে করতে পারি না। অনেক সময় ভাবতে ভাবতে আমি যেন কোথায় চলে যাই। যখনই মনে করতে চাই তখন হারিয়ে ফেলি। এ কেমন ধারা। ভীষণ ভয় করে।

কি ভয় করে?

ভয় করে, ভাবতে ভাবতে আমি কেমন ভীত হয়ে পড়ি। কেন ভয় পাই বুঝতে পারি না।

মাধবীর কথা মনে পড়ে?

মাধবী—কে?

সুমিত্র?

সুমিত্র-মাধবী। মাধবী-সুমিত্র। নামগুলি ভারি পরিচিত মনে হয়। ওরা কারা, তুমি তাদের চেন?

সুমিত্র মাধবীকে খুন করে পালিয়েছে।

খুন! সুমিত্র আঁৎকে উঠল।

কনকলতা পত্রিকার কাটিংখানা বের করে সুমিত্রকে পড়তে দিল।

সুমিত্র কাটিংটা পড়ে চুপ করে গেল, ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কনকলতা বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি কি কাউকে খুন করেছ?

আমি খুন করেছি—রক্ত, গুলী, বোমা—।

থামলে কেন। মনে করতে চেষ্টা কর, কেন তুমি খুন করেছিলে? সেই রিভলবার, রক্ত—বল, বল।

সুমিত্র ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ভয়ে, উত্তেজনায় ও ক্লান্তিতে বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

খানিক পরে সুমিত্র কনকলতাকে প্রশ্ন করল, কেন আমি খুন করেছিলাম? আমি কি সত্যি খুন করেছি? তুমি জান, তবে কেন বলছ না?

কনকলতা কোন জবাব দিল না।

সুমিত্র অনুরোধ করে বলল, আমায় বল। আমি আর ভেবে ভেবে পারি না। আমায় দয়া কর।

আমি জানি না। তারিণী কাকা জানেন।

তারিণীকাকা! কী ভয়ংকর লোক।

ভয়ংকর কেন?

মনে হয় যেন স্পাই। স্বপ্নে যেন দেখেছিলাম।

তারিণীকাকাকে ভয় পাচ্ছ?

না। ভয় পাব কেন। যে আমার অতীত-

জীবন বলে দেবে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করব। চল!

কোথায় যাবে?

কেন, তারিণীবাবুর কাছে।

অনেক রাত হয়ে গেছে।

তা হোক।

আজ নয়। এত রাত্রে তোমায় দেখে তিনি ভয় পাবেন।

আমায় ভয় পাবেন কেন?

তুমি যে খুনী আসামী।

আমি খুনী আসামী তাই ত! সুমিত্র হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। কনকলতার মুখের দিকে ক্ষণিক তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, ভয় পাবে, কিন্তু তুমি ত ভয় পাচ্ছ না।

কনকলতা বলল, সবাই কি সবাইকে বিশ্বাস করতে পারে?

বেশ তুমি জেনে আস।

আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। এত রাত্রে কারও বাড়ি যাওয়া যায় না। এবার তুমি ঘুমোও।

আমার ঘুম পাচ্ছে না।

তুমি শোও, ধীরে ধীরে ঘুম পেয়ে যাবে।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে কনকলতা বলল, দাদু, আমি চেঞ্জে যাব।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, কিছুদিন পূর্বে দার্জিলিং, পুরী বেড়িয়ে এলাম, আবার এত তাড়াতাড়ি চেঞ্জে যাবে।

না দাদু, আমি যাব।

আমার ত' ছুটি নেই।

আমি যাব। আজই যাব।

তোমার ত' পরীক্ষা।

পরীক্ষার কয়েক দিন আগে ফিরে আসব।

কোথায় যাবে?

যেখানে হয়, এক জায়গায় যাব।

মানে?

মানে, তারিণীকাকার কবল এড়াবার জন্য অজ্ঞাতবাস করব।

তা বুঝেছি। কিন্তু সুবিমলকে আমি কি জবাব দেব। সে ত কোন অপরাধ করেনি, কোন ত্রুটি তার নেই। ঠিক আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি ভবিষ্যতের আশায় প্রতীক্ষা করছে।

কনকলতার জবাব দেওয়া হল না। চাকর এসে খবর জানাল যে, পুলিশ এসেছে। এক্ষুনি ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, এত তাড়াতাড়ি পুলিশ এসে গেল।

কনকলতা বলল, তারিণীকাকা না করাতে পারেন এমন কোন গর্হিত কাজ নেই। লোকটি কি ভয়ানক ধূর্ত, ভদ্রতা ত' দূরের কথা চক্ষু-লজ্জা পর্যন্ত নেই। তোমার নিষেধ গ্রাহ্যই করল না।

ডাঃ চৌধুরী কোন রকমে চা খাওয়া শেষ করে বাইরে গেলেন।

কনকলতা তাড়াতাড়ি সুমিত্রের ঘরে এল। সুমিত্র তখনও শয্যা ছেড়ে ওঠেনি।

কনকলতা তাড়াতাড়ি সুমিত্রকে ঠেলে দিয়ে বলল, শিগ্‌গির ওঠ।

কেন? সুমিত্র পুনরায় বালিশ আঁকড়ে পড়ল।

কনকলতা পুনরায় ঠেলে তুলে ধরে বলল, ওঠ, যাবে না?

সুমিত্রের ঘুমের রেশ ভাল করে কাটেনি, জড়িতভাবে বলল, যাব কোথায়, মান্দালয়?

'মান্দালয়' শব্দটি শুনে কনকলতা একটু চমকে উঠল, কিন্তু তার আর মুহূর্ত বিলম্ব করবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি সুমিত্রের ঘুমের রেশ ভাঙিয়ে দিতে দিতে বলল, শীগ্‌গির চল। এক্ষুনি যেতে হবে।

হ্যাঁ, এক্ষুনি চল। কিন্তু আমার মেক্-আপ। এক্ষুনি পুলিশ আসবে ধরতে। চারিদিকে শত্রু, তার চেয়ে মারাত্মক ও ভয়ানক হল গৃহশত্রু। দেশের কাজ দেশের লোকেই ব্যর্থ করে দেয়।

কনকলতা বলল, তুমি বলছ কি।

সুমিত্র যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল। বিস্ফারিত নয়নে চারদিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে সমস্ত শরীর ঢিলা করে বসে পড়ল।

কনকলতা তাগিদ দিয়ে বলল, তুমি আবার বসলে কেন। তাড়াতাড়ি কর, এক্ষুনি যেতে হবে। আর নয়, ওঠ!

কোথায় যাবে?

এতক্ষণে বলছ, কোথায়। পরে বলবখন, তুমি এক্ষুনি জামা পর।

যাব—কি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম।

সে পরে শুনবখন, তুমি আর মুহূর্ত দেরি কর না। তারপর সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমায় মনে করতে দেবে না? পরে হয়ত একেবারেই মনে করতে পারব না।

রাস্তায় তুমি ভাবতে ভাবতে যেও।

কোথায় যাবে—কেন যাবে?

পুলিশ এসেছে তোমায় ধরবার জন্য। আর দেরি করো না, তাহলে আর পালান যাবে না।

আমি পালাব কেন?

বাঃ, না পালালে তোমায় গ্রেপ্তার করবে।

কেন গ্রেপ্তার করবে?

খুনের চার্জে।

আমি কি সত্যি খুন করেছি—কাকে খুন করেছি, কেন খুন করেছি?

তা ত জানিনে।

কে জানে?

পুলিশ হয়ত জানে।

পুলিশ জানে, তবে ত ভালই হল। পুলিশ এসেছে, পুলিশ সকল রহস্যের উদ্ঘাটন করে দেবে।

কিন্তু খুনের দায়ে যে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

এমনি ব্যর্থ জীবনের চেয়ে মৃত্যু কি শ্রেয় নয়? নিজের পরিচয় জানবার জন্য বিস্মৃত অতীতকে স্মরণে আনবার জন্য কত চেষ্টা করছি, তোমরা কত চিকিৎসা করছ। ভাবতে ভাবতে স্বপ্ন দেখতে দেখতে বিভীষিকায়, আতঙ্কে কেঁপে উঠি। এ জ্বালা যে সইতে পারি না। একেবারে যদি ভুলে যেতাম, তবে কোন দুঃখই থাকত না।

যে অতীত ভয়াবহ, বিভীষিকাময় ও অকল্যাণকর তা' নাই বা পেলে ফিরে। অস্পষ্ট অনুভূতি মিশে যাক চিরতরে। রইব শুধু তুমি আর আমি।

শুধু তুমি আর আমি?

হাঁ, আমায় তুমি ভালবেসে, আমার ভালবাসা পেয়ে তুমি কি বিস্মৃত অতীতকে চিরতরে ভুলতে পারবে না। পারবে, নিশ্চয় ভালবাসায় সব মুছে যাবে, শুধু হবে নতুন জীবন। পূর্বজন্ম যদি মুছে যেতে পারে তবে এও মুছে যাবে।

কিন্তু আমায় নিয়ে তুমি ত সুখী হতে পারবে না। আমি যাই হই না কেন, এত চিকিৎসায় ও এত চেষ্টার পর এটুকু ত' বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, আমি সাধারণ মানুষের পর্যায় নই। আমাকে নিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না, সমাজেও শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আসন পেতে পারে না।

কনকলতা বলল, আমি চাইনে সম্মান, প্রীতি। নাই বা রইল তোমার অতীত, তোমার স্মৃতিশক্তি। যতটুকু তুমি ততটুকুকে ঘিরে থাক ভালবাসা।

তবু—!

না এর মাঝে তবু নেই। কি নিয়ে, কি-ভাবে যে, কার জীবন ব্যর্থ হয় এবং সফল হয় তা হিসেব করে পূর্বাহ্নে স্থির করা যায় না।

সুমিত্র আর কিছু বলল না।

কনকলতা অনেক কিছু বলতে চাইল আবেগ ভরে কিন্তু ভাষা পেল না। কি করে সে বুঝতে পারে যে, এই অসহায় স্মৃতিহীন, বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিটিকে নিজের হাতে গড়ে তোলার মাঝেই যে রয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ। জীবনে এর চেয়ে বেশি সে কিবা পেতে পারে। ওই ত ভালবাসার ভাষাহীন আনন্দোপলব্ধি, ভালবাসার পূর্ণতা।

হঠাৎ কনকলতা যেন চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি সুমিত্রের হাত ধরে বলে উঠল, আর দেরি নয়, একটু ভুলের জন্য সব শেষ হয়ে যাবে। সব তৈরি আছে চল।

কোথায় যাবে?

চল বর্মাতে পালাই। সেখানে আমার এক মাসী থাকেন।

বর্মা শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্র অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

কী ভাবছ?

বর্মা—বর্মা। খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কোথায় যেন শুনেছি কিংবা পড়েছি।

বর্মা—তাইত, মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে না, হুঁ খানিক আগে যেন বর্মার কথা স্বপ্ন দেখেছিলাম না।

লক্ষ্মীটি, আর দেরি নয়।

চল তবে। কিন্তু বর্মা—আমি কি সেখানে কোনদিন ছিলাম। কি যেন স্বপ্নে দেখলাম।

সুমিত্রের জামা পরা হল না, ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেল, চোখে মুখে তার ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দিল।

কনকলতা নিরুপায়ে নিজেই জামাটা পরিয়ে দিয়ে জুতা পায়ে এ'টে দিল। এবং সুমিত্রের হাত ধরে বলল, চল।

সুমিত্রের হাত ধরে অগ্রসর হতে গিয়ে কনকলতা থমকে দাঁড়াল।

দরজার পাশেই একদল পুলিশ। পুলিশ ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ক্ষমা করবেন, কর্তব্য এবং জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য আপনাদের শান্তি ভংগ করতে বাধ্য হয়েছি।

কনকলতা কোন কথা বলল না। সুমিত্রর চোখে মুখে কোন ভাবান্তর দেখা দিল না। সে যেন পুলিশের উপস্থিতির কোন মূল্যই বুঝতে পারেনি। এত বড় আসন্ন বিপদে যেন তার মনে সামান্য মাত্র রেখাপাতও করেনি।

পুলিশ ইন্সপেক্টর বলল, আপনারা যাকে রোগী বলে চিকিৎসা করেছেন, সে রোগী নয়। স্মৃতিলোপ, মস্তিষ্কবিকৃতি শুধু আবরণ, আসলে লোকটি খুনী ফেরারী আসামী। বেরিলীতে এক নৃশংস ডাকাতি করে ফেরার হয়েছে।

সুমিত্র উদগ্রীব হয়ে শুনতে লাগল।

পুলিশ ইন্সপেক্টর সুমিত্রের হাতে হাত-কড়া লাগাল। সুমিত্র কোন বাধা দিল না, যেন কিছুই বুঝতে পারে নি। বিস্মিত হয়ে সে কি যেন ভাবতে লাগল।

পুলিশ ইন্সপেক্টর বলল, এদের দলটি সহজ নয়। বহুদিন ধরে ডাকাতি ও খুন করে চলছে। এর নাম রামেশ্বর টাকলাদার। এ লোকটিই গ্যাং লীডার। এর বিরুদ্ধে একটা কেস নয়, বহু কেস আছে বম্বে, লাহোর, কানপুর, কলকাতা—কোথায়ও বাদ নেই।

সুমিত্র আপন মনে ভাবছিল, হঠাৎ বলে উঠল, না, না, রামেশ্বর নাম নয়। বেরিলীও নয়। আপনি ভুল করছেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর একটু বাঁকা হাসি হেসে আসামীকে নিয়ে যাবার জন্য পুলিশকে ইংগিত করল।

পুলিশ সুমিত্রকে নিয়ে বাইরে এল। ফটকে পুলিশ ভ্যান প্রতীক্ষা করছিল। সুমিত্রকে ভ্যানে ওঠান হল, সুমিত্র কোন কথা বলল না, একটু সে ভয় পেল না, চোখে-মুখে তার কোন ভাবান্তর দেখা দিল না। সে ভাব-ছিল, তেমনি ভাবতে লাগল।

গাড়ি ছাড়বার পূর্বে পুলিশ ইনসপেক্টর ডাঃ চৌধুরীকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, এমন একটা পাকা ক্রিমিন্যালকে ধরিয়ে দিয়ে প্রভূত উপকার করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগত নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। লোকটির অদ্ভুত অভিনয় দক্ষতা।

ডাঃ চৌধুরী বলেন, আপনি ভুল করেছেন। এ অভিনয় নয়, লোকটিও ক্রিমিন্যাল নয়। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারবেন। বহু মানব চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছি, এটুকু বুঝবার জ্ঞান আমার হয়েছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টর পুনরায় হাসল, কোন কথা বলল না। ডাঃ চৌধুরীর সরলতাকে বিদ্রূপ করে, না, নিজের পাকাবুদ্ধির দম্ভ প্রকাশ করে হাসল, তা বোঝা গেল না।

সুমিত্রকে নিয়ে পুলিশ ভ্যান চলে গেল।

কনকলতা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, না পারল হাত তুলে বিদায় অভিনন্দন জানাতে, না পারল মুখ তুলে তাকাতে।

কনকলতা কিছুই বলল না। একেবারেই থেমে গেল। ডাঃ চৌধুরী ভেবেছিলেন দু'-এক-দিনের ভেতর ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু কনকলতা ক্রমশ ভেংগে পড়তে লাগল। আঘাতটা সে সহ্য করতে পারল না।

ডাঃ চৌধুরী কি করবেন কিছুই ভেবে পেলেন না। কখনও কনকলতাকে পড়াতে বসেন, কখনও গল্প করেন, কখনও বেড়াতে নিয়ে যান, কিন্তু কনকলতা আঘাতটা সামলিয়ে ত নিতেই পারল না, বরঞ্চ আরও ভেংগে পড়তে লাগল।

একদিন ডাঃ চৌধুরী নিরুপায়ে বলে ফেললেন, তুমি বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, মানব-চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি—

কনকলতা নিঃশব্দে শুনতে লাগল।

ডাঃ চৌধুরী বলে চললেন, জীবনের মাঝে বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা স্থায়ী নয়।

কনকলতা হঠাৎ বলে উঠল, দাদু ওকে বাঁচাবার কি কোন উপায় নেই?

সুমিত্রকে ভুলে যাবার জন্য এবং ভুলে যাওয়াই মংগল প্রভৃতি উপদেশ দেবার জন্য ডাঃ চৌধুরী ভূমিকা রচনা করছিলেন। কিন্তু কনকলতা সে ধার দিয়েই গেল না। ডাঃ চৌধুরী কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না, চুপ করে গেলেন।

কনকলতা বলল, ওর বাড়ি ব্রহ্মদেশে এবং খুব সম্ভব রেংগুণে। চল রেংগুণ যাই।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, ছেলেটি যে খুন করে ফেরার হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছেলেটির হাবভাব, কথাবার্তা ও লেখার মাঝে প্রক্ষিপ্তভাবে যে কয়েকটি মূল্যবান কথা পাওয়া যায়, তাতে এ অনুমান করা যায় যে, ছেলেটি সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত ছিল। খুব সম্ভবত দলের কোন লোক বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তাকে এরা খুন করেছিল।

তা হলে উপায়?

আমার ত' এই বিশ্বাস। এদের পেছনে হয়ত রাজদ্রোহের, খুনের অনেক চার্জ রয়েছে কাজেই একে বাঁচান অসম্ভব।

যদি সন্ত্রাসবাদী ও খুনী হয়, তবে ওর স্মৃতিলোপ পাবে কেন?

হয়ত ভুল করে খুন করে খুব 'শক' পেয়েছে কিংবা জাপানী বোমা বর্ষণে স্মৃতিহীন হয়েছে। প্রথম দিকে লক্ষ্য করেছিলে, লোকটি ভীষণ আতংকগ্রস্ত এবং বোকা ও নিরেট ছিল।

কিন্তু এ'কে কি করে বাঁচান যেতে পারে? আমি কোন পথই খুঁজে পাচ্ছি না। কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাংগা চলেছে, তাতে কলকাতার প্রতিটি বাড়ি যেন অপর বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজ কলকাতা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বের হবার উপায় নেই, কোন সংযোগ পাওয়া যায় না। কি যে করব?

দুটো দিন প্রতীক্ষা কর।

প্রতীক্ষা করে করে ত' ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছি।

কলকাতায় যা হচ্ছে, তাতে আদালতের কাজ বন্ধ এবং অন্যান্য কাজও বন্ধ। দাংগা থেমে যাক, তারপর যা হয় করা যাবে। তুমি মন খারাপ করে এমনি থেকো না। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ সহজভাবে নিতে চেষ্টা করো।

কয়েকদিন অরাজকতার পর কলকাতার হিংস্র ও বর্বরোচিত দাংগা প্রশমিত হল। কনকলতা প্রত্যহই সুমিত্রর সংগে দেখা করবার জন্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু শহরে সান্ধ্য আইন থাকায় পারেনি এবং শহরের গোলমালে গোয়েন্দা বিভাগ অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় তাদের সংগেও কোন যোগাযোগ করতে পারেনি।

এমনি সময় ডাঃ চৌধুরীর বিশেষ বন্ধু গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ললিত সেন অপ্রত্যাশিতভাবে ডাঃ চৌধুরীর সংগে দেখা করতে এলেন।

শহরের দাংগা-হাংগামা সম্পর্কে আলোচনা করে ললিত সেন বললেন, আপনার সে রোগীটির ত' স্মৃতি ফিরে এসেছে।

ডাঃ চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, কি করে স্মৃতি ফিরে এল?

ললিত সেন বললেন, যেখানে মনোবিদ্‌রা অকৃতকার্য হয়, সেখানে পুলিশরা সফল হয়। এত দিন ধরে চিকিৎসা করলেন, সাইকোলজি-

ক্যাল ট্রিটমেণ্ট করলেন, কিন্তু কোন কিছুই করতে পারলেন না, আর আমরা কয়েক দিনের মধ্যে সব ঠিক করে দিলাম, মায় স্বীকারোক্তি।

কনকলতা চমকে উঠে বলল, খুনের চার্জ স্বীকার করেছে?

ললিত সেন বললেন, হ্যাঁ।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, আপনারা কি ট্রিটমেণ্ট করেছিলেন? ভারি আশ্চর্য মনে হচ্ছে। আমি ত' কোন ট্রিটমেণ্টই বাকি রাখি নি। কোন্ ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন?

ললিত সেন হেসে বললেন, আমাদের কোন চিকিৎসা, এমন কি পার্গেটিভ স্বরূপে ধুলাই' চিকিৎসা পর্যন্ত করতে হয়নি। দৈব চিকিৎসা।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, দৈব! আপনি যে ব্যাপারটা আরো জটিল করে তুলছেন। আমি কিছুই অনুমান করতে পারছি না।

ললিত সেন বললেন, সত্যি ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। একদিন ছেলেটিকে নিয়ে জেলে ফিরছি। একটা রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে যেমনি অপর এক রাস্তায় পড়লাম, হঠাৎ এক হাত-বোমা বিস্ফোরণ হয়। কি দুঃসাহস লোক-গুলির, রাস্তায় মিলিটারী টহল দিচ্ছে। কোন ভ্রূক্ষেপ না করে কতকগুলি যুবক একটি প্রাইভেট গাড়ির উপর হাত বোমা ফেলে গাড়িটা জখম করল এবং মুহূর্তের মধ্যে আরোহীদের খুন করে পালিয়ে গেল। আমরা ঘটনাস্থলে যেতে যেতে রাস্তা পরিষ্কার. শুধু একটা জ্বলন্ত গাড়িতে কয়েকটি মৃতদেহ পড়ে আছে। কী সে বীভৎস দৃশ্য।

কনকলতা শিউরে উঠল।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, চোখের উপর এমন নৃশংস নরহত্যা দেখে বোধ হয় লোকটির স্মৃতি ফিরে এসেছে।

ললিত সেন বললেন, হ্যাঁ। হাত বোমার শব্দে লোকটি আঁতকে উঠল। রিভলবারের আওয়াজে এবং আহত লোকদের চীৎকার শুনে লোকটি ভয়ে গাড়ির কোণে জড়সড় হয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। তারপর জ্বলন্ত গাড়িতে মানুষ পুড়তে দেখে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বহু কষ্টে লোকটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। লোকটি কেমনভাবে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ বুজে গাড়িতে শুয়ে রইল। আলীপুর জেল গেটে যখন গাড়ি এসে থামল, তখন লোকটি প্রশ্ন করল, 'আমি কোথায়?' আমি বললাম, 'আলীপুর জেলে।' লোকটি অবাক হয়ে বলল, 'রেঙ্গুণ থেকে এখানে কি করে এলাম?' আমি সংক্ষেপে সকল ঘটনা বললাম। লোকটি খানিক ভেবে বলল, আপনারা ভুল করছেন, আমি রেঙ্গুণপ্রবাসী, বাঙলা দেশের পশ্চিমে কোনকালেই যাইনি। আমার নাম ত' রামেশ্বর নয়, আমার নাম সুমিত্র রায়। তারপর ছেলেটিকে অনেক প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আর কোন জবাব দিল না।

কনকলতা প্রশ্ন করল, সুমিত্রবাবু যে রেঙ্গুণে খুন করেছিলেন, তার কোন প্রমাণ আছে? তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, না আপনাদের অভিযোগ?

ললিত সেন বললেন, রেঙ্গুণে পুলিশের অভিযোগ, প্রমাণ হবে আদালতে। সে দায়িত্ব আমাদের নয় মা। আমরা আসামী গ্রেপ্তার করতে পেরেছি, এখন ব্রহ্ম সরকারের হস্তে অর্পণ করব।

কনকলতা বলল, আপনারা খুনী স্থির করলেন কি করে এবং স্বীকারোক্তিই বা করালেন কি করে?

ললিত সেন বললেন, ডাইরী খুঁজে বের করলাম। রেঙ্গুণ পুলিশ যে ফটোগুলি পাঠিয়েছিল, তার একটির সঙ্গে এর চেহারা মিলে গেছে। ১৯৪২ সালে রেঙ্গুণে একটি সন্ত্রাসবাদী দলের অস্তিত্ব পুলিশ জানতে পারে। তাদের নেতা ছিল সুমিত্র রায়। সুমিত্র-বাবুকে আমরা নতুন চার্জ শুনালাম, সুমিত্র-বাবু কোন শব্দ করলেন না, শুধু নিঃশব্দে হাসলেন। আমরা অনেক জেরা করলাম, একটি কথারও জবাব দিলেন না। দিনরাত শুধু ভাবতেন। আশ্চর্য লোকটি—নিশ্চিত ফাঁসি জেনেও কেমন নির্বিকার। আর আশ্চর্য মশাই, লোকটি স্বেচ্ছায় সকল ঘটনা বিবৃত করে নিজের অপরাধ প্রকাশ করে এক লিখিত জবানবন্দী দিয়েছে। ধন্যি ছেলে এরা, শ্রদ্ধা না করে পারি না।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, জবানবন্দীতে কি লিখেছে?

ললিত সেন বললেন, জবানবন্দীর জন্য আমাদের চেষ্টা করতে পর্যন্ত হয়নি। সুমিত্র-বাবু দু'দিন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন, কোন কথা বললেন না। দিনরাত কেবল ভাবতেন। তারপর নিজে থেকেই জবানবন্দী দিলেন।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, মানসিক বিপ্লব চলছিল। সব দিক ভাল করে ভেবে সব স্বীকার করাই বোধ হয় স্থির করেছে।

কনকলতা বলল, জবানবন্দীতে কি লিখেছেন?

ললিত সেন বললেন, সুমিত্রবাবু জবান-বন্দীতে লিখেছেন—"মাধবী ও প্রবীরকে আমি নিজে হত্যা করেছি, অপর কোন ব্যক্তি দায়ী নয়। আমি ভুল করে মাধবীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম, তাই তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এবং অন্যান্য নির্দোষ কমরেডদের বাঁচাবার জন্য আমি স্বজ্ঞানে সকল ঘটনা স্বীকার করছি। —গত মহাযুদ্ধের অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য আমরা এক মৃত্যু-সেনাবাহিনী গঠন করেছিলাম। কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক ছিল আমাদের দলে। বিভিন্ন মতবাদ প্রীতি সত্ত্বেও আমাদের যে কোন সুযোগ ও পথ গ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করার নীতি ছিল সকলের। আমরা ভারতের বিভিন্ন দলের সঙ্গে এবং জাপান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করি। জাপানের সশস্ত্র সাহায্য পাবার প্রতিশ্রুতিও আমরা পাই। আমরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও তৈরি করতে শুরু করি এবং রেঙ্গুণে এক কেল্লা গঠন করি। রেঙ্গুণে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হবার পূর্বেই পুলিশ আমাদের কেল্লা আবিষ্কার করে এবং আমাদের বহু কমরেডকে গ্রেপ্তার করে। তাদের নৃশংসভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়। আমাদের দলের কোন এক মহিলা সদস্যা (বর্তমানে তিনি খুব সম্ভব জীবিতা, তাই তার নাম প্রকাশ করব না) আমাদের সংবাদ দেন যে, মাধবী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অভিযোগটা প্রথমে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কারণ মাধবীর মত এমন আদর্শবতী দেশপ্রেমিকা আমি জীবনে আর একটি দেখিনি। যদিও সে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর একমাত্র কন্যা ছিল, কিন্তু দেশের জন্য সে না করতে পারত, এমন কোন কাজ ছিল না। দেশের জন্যই সে প্রিয়তম এক নিকট আত্মীয়কে হত্যা করেছিল এবং নিজে বহু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

"মাধবী আমাকে ভালবাসত। কোনদিন তা প্রকাশ করেনি। ঘটনার কয়েকদিন আগে মাধবী পরোক্ষভাবে প্রেম-নিবেদন করেছিল। সেজন্য আমি তাকে ভর্ৎসনা করেছিলাম। আমাদের সকলেরই ধারণা হল, ব্যর্থ প্রেমের জন্য মাধবী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করাই স্বাভাবিক, কারণ তার মধ্যে রয়েছে বংশ-পরম্পরায় রাজভক্ত রক্ত। মাধবীকে ভুল বুঝলাম এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আমি নিজেই তাকে হত্যা করলাম। মৃত্যুশয্যায় মাধবী আমায় ক্ষমা করল এবং তার নিকটই জানতে পারি যে, কম্যুনিস্ট প্রবীর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে নয়। প্রবীর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ 'কিংস কমিশনে' ক্যাপ্টেন হয়েছে। মাধবী আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। আমি জীবনে তখন প্রথম কেঁদেছিলাম।

"প্রবীর সামরিক বিভাগে যোগ দেওয়ায় সে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। বহু চেষ্টাতেও বিশ্বাসঘাতক নরপশুকে শাস্তি দিতে পারিনি। ওই একটি লোকের জন্য এতগুলি মহৎ প্রাণ শেষ হয়ে গেল এবং বহু লোকের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেল। তাই তাকে হত্যা করাই আমার প্রধান কাজ হল। এমন সময় শুরু হল জাপানী বিমান আক্রমণ। সমগ্র রেঙ্গুণ শহর হল অরাজক। বিমান আক্রমণে কত ঘরবাড়ি ধ্বংস হল, কত লোকের গেল প্রাণ। আমিও পিতৃমাতৃহীন হয়ে আরো বেপরোয়া হয়ে গেলাম। একদিন বিমান আক্রমণের

সুযোগে এক ট্রেণের ভেতর প্রবীরকে হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকতা ও মহাপাপের শাস্তি দিলাম।

বোমা পতনের ফলে ট্রেণের ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। তারপর কখন জানি জ্ঞান ফিরে এল, আমি চলতে শুরু করলাম। সে চলার যখন শেষ হল, তখন দেখলাম আমি আলীপুর জেল হাজতে।

কনকলতা বলল, দাদু, তখন আমি বলেছিলাম না যে, সুমিত্রবাবু সাধারণ নয়।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, সত্যি ভারি অদ্ভুত ললিতবাবু। আমি একবার দেখা করতে চাই, আপনি আমার ও কনকের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন।

ডাঃ চৌধুরী ও কনকলতা সুমিত্রের সঙ্গে দেখা করতে জেলে গেলেন।

সুমিত্র বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইল। ডাঃ চৌধুরী এবং কনকলতা কাউকেই সে চিনতে পারল না। এ'দের চিনবার জন্য সে বহু চেষ্টা করল, ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠল, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, সুমিত্র তুমি আমাদের চিনতে পারছ না?

সুমিত্র খানিক চেষ্টা করে মাথা ঝ'কে না করল।

ডাঃ চৌধুরী কনকলতাকে দেখিয়ে বললেন, এ'কে?

সুমিত্র বললে, ক্ষমা করবেন, মনে করতে পারছি না।

ললিত সেন বললেন, সুমিত্রবাবু, ইনি ডাঃ চৌধুরী এবং ইনি এর নাতনী কনকলতা দেবী। এরাই আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং আত্মীয়ের ন্যায় সেবা-যত্ন ও চিকিৎসা করেছিলেন।

সুমিত্র হাত যোড় করে নমস্কার করে বলল, আমায় অজ্ঞান অবস্থায় আশ্রয় দিয়ে চিকিৎসা করেছেন। নিকটতম আত্মীয়ের ন্যায় সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। এত বড় ঋণ জীবনে পরিশোধ করবার মত নয়।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, কনককে তোমার একেবারেই মনে পড়ছে না? এতদিন সে তোমায় কতভাবে চেষ্টা করেছে পূর্ব স্মৃতি ফিরিয়ে আনবার জন্য, দিবারাত্র কত সেবা করেছে।

সুমিত্র বলল, পূর্ব জন্মে অনেক পুণ্য সঞ্চিত ছিল, তাই আপনাদের এত দয়া, এত স্নেহ অযাচিতভাবে পেয়েছি। সত্যি আমি হতভাগ্য, তাই আপনাদের কথা স্মরণ করতে পারছি না। জীবনে এটা আমার কম বড় দুঃখ নয়।

ডাঃ চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, তোমার স্মৃতি-লোপ পাওয়ার দুটি বছরের কোন ঘটনাই কি মনে পড়ছে না?

সুমিত্র বলল, বহু ঘটনা, বহু কথা অস্পষ্টভাবে এলোমেলো হয়ে চিন্তাধারায় ভীড় করে দাঁড়ায়। কত ভাবি, কিন্তু মনে করতে পারি না। মনে হয় যেন ঘুম থেকে উঠে ভুলে গেছি স্বপ্ন, রয়েছে শুধু স্বপনের রেশ।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, তোমার কি মনে পড়ে না, কনক তোমায় পুরীর সমুদ্র-সৈকতে নিয়ে গিয়েছিল, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ আর বিকট গর্জনের ভীতিপূর্ণ পরিবেষ্টনীতে তোমার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল।

সুমিত্র চিন্তিতভাবে বলল, না।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, দার্জিলিংয়ের কথা মনে পড়ে, রোদ দেখে তুমি শিউরে উঠেছিলে। মনে পড়ে না? গঙ্গায় নৌকাডুবি? আশ্চর্য! এ কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ে, একদিন দুর্গাপূজায় পাঁঠা বলি দেখে তুমি চীৎকার করে উঠেছিলে। মাথা-কাটা পাঁঠার ছটফটানি সইতে না পেরে তুমি কনককে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।

সুমিত্র বলল, সত্যি আমি লজ্জিত এবং দুঃখিত। আপনারা আমাকে ভাল করবার জন্য কত কষ্ট, কত অত্যাচার সহ্য করেছেন, কত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেছেন, কত অমূল্য সময় নষ্ট করেছেন। আপনারা আশ্রয় না দিলে আমার যে কি দুর্দশা হত, ভাবতেও পারি না।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, তোমাকে ভাল করবার জন্য কনক কি না করেছে, আশ্চর্য, আজ তুমি কিছুই মনে করতে পারছ না। এত দরদ, এত ভাল—

কনকলতা এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল, ক্ষুব্ধ অভিমান আর চেপে রাখতে পারল না, বলে উঠল, দাদু!

ডাঃ চৌধুরী বললেন, সুমিত্র যে কোন কথাই মনে করতে পারছে না।

কনকলতা বলল, ভারি ত' ব্যাপার।

সুমিত্র অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আমি আপনাদের মহত্ত্ব, মহামানবতার কথা স্মরণে আনতে পারছি না বলে যে নিজেকে কত অপরাধী ভাবছি। আমার সরলতাকে বিশ্বাস করুন।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, আমি চিকিৎসক, তোমাকে এতদিন চিকিৎসা করেছি, তোমাকে ভুল বুঝব না।

সাক্ষাতের সময় শেষ হয়ে গেছে বলে জেল-কর্মচারী জানিয়ে দিয়ে গেল।

সুমিত্র বলল, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, যে কয়েকদিন বাঁচব সশ্রদ্ধভাবে আপনাদের কথা ভাবব।

ডাঃ চৌধুরী ললিত সেনকে জিজ্ঞেস করলেন, একে বাঁচানো যায় না?

ললিত সেন বললেন, ইনি নিজে সকল কথা স্বীকার করেছেন। রাজদ্রোহের ব্যাপার, একে বাঁচান অসম্ভব। যদি ইনি আদালতে সব কথা অস্বীকার করেন—

সুমিত্র বলল, তা হয় না ললিতবাবু। আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। আমি মাধবীকে ভুল করে হত্যা করে যে অপরাধ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে। আমারই জেদের জন্য অন্যান্যদের নিষেধ সত্ত্বেও প্রবীরকে দলে রেখেছিলাম। পরিণামে এতগুলি মহৎ প্রাণ পশুর মত বলি হল।

পুনরায় সাক্ষাতের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার কথা জানিয়ে দিলে, ললিত সেন বললেন, ডাঃ চৌধুরী এবার চলুন।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, হাঁ, চলুন। সুমিত্র, শুধু আশীর্বাদ করা ভিন্ন আমাদের আর কিছু নেই। তোমার ত্যাগ, তোমার সেবা, তোমার আত্মবলিদান দেশের স্বাধীনতা এনে দিক, এই প্রার্থনা করি। তোমার মত মহৎ ও আত্মত্যাগীর সেবা করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।

সুমিত্র তাড়াতাড়ি ডাঃ চৌধুরীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, ও-কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না। আত্মত্যাগ, মহত্ত্ব জানি না, কারণ সে কথা কোনদিনই মনে পড়েনি—ও একটা শক্তি। যাদের সে শক্তি ফুরিয়ে যায়, ত্যাগ ও মহত্ত্বের কথা মনে জাগে, তারাই নিয়মতান্ত্রিকতার পথে যায় কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, আচ্ছা, আসি। মামলা সমর্থনের জন্য যত টাকা প্রয়োজন হবে, চাইতে দ্বিধা ক'র না।

সুমিত্র ললিত সেনকে নমস্কার করে, কনকলতার দিকে ফিরে নমস্কার করতে করতে বলল, আপনি ত' কোন কথাই বললেন না। আমি স্মৃতিহীন কালের কোন কথা মনে করতে পারছি না বলে সত্যি লজ্জিত এবং নিজেকে অপরাধী মনে করছি। আপনাদের ঋণ—

কনকলতা হঠাৎ বলে উঠল, 'শুধু ঋণ!' কান্নায় তার কণ্ঠস্বর ভেঙে এল, উদ্যত অশ্রু গোপন করবার জন্য তাড়াতাড়ি হাত যোড় করে বিদায় নমস্কার জানাল।

সুমিত্র স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল। মনে হল, মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে একি পরীক্ষা। সে যে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। মুহূর্তের জন্য মনে জাগল, মৃত্যুর দ্বার নিজে হাতে খুলে দিয়ে কি সে ভুল করেছে?

সুমিত্র কোন জবাব পেল না।

পুলিশ এল এবং সেলের ভেতর নিয়ে যাবার ইঙ্গিত করল।

সুমিত্র কোন কথাই ভেবে পেল না। ধীরে ধীরে চলতে লাগল। সেলের মুখে এসে ফিরে দাঁড়াল।

কনকলতা তখন অশ্রুধারা গোপন করবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছে।

সম্রাট আকবরের হিন্দুমুসলিম মিলন প্রয়াস

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, পি-এইচ্-ডি

আজ আমাদের সর্ববরেণ্য ও দেশপূজ্য মহাত্মা গান্ধী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়া এবং অমানুষিক পরিশ্রমে প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমান নরনারীর হৃদয়ে যে সুন্দর ও মধুর মিলন ও ভ্রাতৃবন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য মহান্ প্রচেষ্টায় রত এবং যে ঐক্য ও মিলনের মহৎ আদর্শের আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর মধ্যে পরিচয় পাই, সেই ঐক্য ও প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন প্রায় সারে তিনশত বর্ষ পূর্বে মহানুভব ভারত সম্রাট আকবর। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া উহা বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই মহৎ কার্যে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহার দুইজন অনুরক্ত সভাসদ্ ও দেশ হিতৈষী—আবুল ফজল ও রাজা বীরবল। আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি সেই যুগের সহিত তুলনা করিলে বর্তমান যুগে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। তখন ধর্মান্ধতার জন্য পৃথিবীর কত বড় বড় স্থানে কত অন্যায় ও অবিচার সংঘটিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু সেই তুলনায় বর্তমান যুগ কত সুন্দর ও মেঘমুক্ত। অবশ্য তাই বলিয়া আমরা মনে করি না যে, এখনও পৃথিবী এই বিষয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে; এখনও অনেক উন্নতির প্রয়োজন, তবে আমরা আশা করি, যে খণ্ড মেঘ সময়ে সময়ে এখানে ওখানে দেখা দেয় তাহা শীঘ্রই চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইবে। সম্রাট আকবরের যুগ অপেক্ষা এই যুগের জনসাধারণ প্রায় সর্বত্র আরও উদার এবং তাহাদের মন আরও প্রশস্ত। এখন দেশের কোন সংস্কার সাধন করিতে অগ্রসর হইলে যে সাড়া পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা ঐ যুগে অনেক কম সাড়া জনসাধারণের নিকট হইতে পাওয়া যাইত এবং এত অধিক বাধা বিপত্তি তখন চারিদিক হইতে ঘনায়িত হইত যে, ঐরূপ কাজ করা সেই সময় অত্যন্ত কঠিন ছিল। সেই যুগে আকবর যে মহান্ আদর্শে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহা জগতের ইতিহাসে খুবই কম।

যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াতে তিনি লালিত পালিত ও বর্ধিত হন উহার সংকীর্ণতা তাঁহার মনের ভিতরে বিশেষ কোন স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ছোটবেলা হইতেই তাঁহার মন যেন বিভিন্ন ধারায় ও রূপে পরিপুষ্ট হয়। পুঁথিগত বিদ্যার উপরে তাঁহার কখনও অনুরাগ ছিল না বটে, তাঁহার পিতার অনেক উপদেশ সত্ত্বেও তিনি অক্ষর পরিচয়-ও শেষ করেন নাই এবং শিক্ষকের পর শিক্ষকের পরিবর্তনেও তাঁহার উপরে সুফল হয় নাই, তথাপি তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল খুবই প্রখর এবং

সম্রাট আকবর

অপরে কেহ কিছু পাঠ করিলে তিনি তাহা সহজেই মনে রাখিতেন। সুফি কবি হাফেজ এবং জালালউদ্দীন রুমির কবিতা অপর কেহ পাঠ করিলে তিনি গভীর মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং এইসব কবিতা তাঁহার এত ভাল লাগিত যে, তিনি ঐরূপে অপরের কাছে শুনিয়া অনেক কবিতা মুখস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে ইহাতে যথেষ্ট সুফল হইয়াছিল, কারণ এইসব কবিতার প্রভাবে তাঁহার মনে সংকীর্ণতার পরিবর্তে উদারতাই স্থান পায়। কেহ কেহ মনে করেন তাঁহার উদারতা শুধু সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, একটা বাহ্যিক রাজনৈতিক অভিব্যক্তি, উহা তাঁহার অন্তরের বা হৃদয়ের কথা নয়। কিন্তু ইহা মোটেই সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের লেখনী হইতে বেশ বুঝা যায় তাঁহার উদারতা সম্রাটের স্বাধীন চিন্তাধারার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। তাঁহার সেই স্বাধীন চিন্তাধারা ধর্মভাবের দ্বারাও যে প্রভাবান্বিত হয় নাই একথা বলা যায় না। একদিকে আমরা যেমন তাঁহার বিচক্ষণ রাজনীতির পরিচয় পাই, তেমনি আবার তাঁহার গভীর ধর্মানুরাগের পরিচয়ও সময়ে সময়ে পাই, কিন্তু ইহা আমরা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বাদায়ুনী তাঁহার সম্বন্ধে কোন কোন স্থানে কঠোর মন্তব্য ও সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদশাহ অনেক রাত্রি ভগবৎ আরাধনায় কাটাইয়া দিয়াছেন এবং অনেকদিন প্রত্যূষে রাজপ্রাসাদের নিকটে একটি নির্জনস্থানে প্রস্তরের উপর উপবেশন করিয়া তিনি ভগবৎ চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। বাদায়ুনীর এই সব উক্তি সম্রাটের নৈতিক জীবনের উপরে বিশেষ রেখাপাত করে এবং আমাদের মনে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় করে যে তিনি শুধু সাম্রাজ্যের কার্যেই জীবন অতিবাহিত করেন নাই ভগবৎ-আরাধনা দ্বারা নিজের মনেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ধর্মালোচনায় তিনি এত আনন্দ উপভোগ করিতেন যে, তাঁহার জীবনের কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের সহিত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি এবং কখনও কখনও এমন কি পরের দিন দুপুর পর্যন্ত এইরূপ সদালোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতেন। এইরূপ সকল ধর্মের উচ্চ ও মহৎ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে তাঁহার মনের প্রসারতা আরও বৃদ্ধি পায়।

তাঁহার কর্মপদ্ধতি দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন ঐ যুগের মানুষ ছিলেন না, কোন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তিনি কখনও আবদ্ধ থাকিতেন না। ধর্মানুরাগ এবং রাজনীতির প্রয়োজন—উভয় কারণেই তাঁহার মন ঐ সময়কার সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরে ছিল। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার নিকটে সমব্যবহার পাইত, সকল ধর্মাবলম্বীর লোকই বিনা বাধা ও বিপত্তিতে স্ব স্ব ধর্ম পালন করিতে সমর্থ হইত এবং গুণানুসারে সকলেই সরকারী

চাকুরী লাভ করিতেও পারিত। আকবরের পিতামহ বাবর হিন্দুস্থানের উপরে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না, তাঁহার প্রাণ কাবুলের পাহাড় পর্বত, গাছপালা, ফল ও ফুলের জন্য উদ্বেলিত হইত, কিন্তু আকবরের সেরূপ হইত না। তিনি জানিতেন ভারতবর্ষই তাঁহার দেশ, এখানেই চিরকাল বসবাস করিতে হইবে এবং এখানকার মাটিতেই তাঁহার সুখ দুঃখ নিহিত। অপরাপর ভারতবাসীর মতন তিনি নিজেকেও একজন ভারতবাসী মনে করিতেন এবং তাহাদের শুভেচ্ছা ভালবাসা ও প্রেমের উপরেই যে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিত তাহা তিনি ভালভাবেই বুঝিতেন। প্রজাগণের মধ্যে কে কোন্ ধর্মাবলম্বী তাহা তিনি ভাবিতেন না—ভারতের অধিবাসী হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলকেই ভারতবাসী হিসাবেই তিনি দেখিতেন। তাঁহার প্রেমের দুয়ার শত্রুর নিকটেও খোলা থাকিত। প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা সকলের মন জয় করিবার জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান থাকিতেন, যেখানে এ পথে পরাভব হইয়াছে তখন কঠিন পন্থা অবলম্বন করিতে কখনও দ্বিধা বোধ করেন নাই, কিন্তু সহজে তিনি কোথাও রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন নাই।

মনুষ্য চরিত্র বুঝিবার শক্তি এবং জাতিবর্ণ নির্বিচারে গুণীর প্রতি উপযুক্ত সমাদর প্রদর্শন তাঁহার যেমন ছিল তেমন খুব কম লোকেরই দেখা যায়। যখন তিনি কোন গুণীর সন্ধান পাইতেন তখন শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াও তাঁহাকে পাইবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। এইরকমভাবেই তিনি তানসেন, রাজা বীরবল এবং রাজা টোডরমল্ল প্রভৃতি অনেক গুণী ব্যক্তিকে তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সময়োপযোগী সাহায্য ও গুণীর সম্যক সমাদরের অভাবে অনেক সময়ে যেমন বহু গুণী-ব্যক্তি হস্তাবিহীন পুষ্পের ন্যায় উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইবার এবং সৌরভ বিতরণ করিবার পূর্বে শুকাইয়া যায় সেইরূপ বহুগুণীর সদগুণাবলীর উন্মেষের সুযোগ হইত না যদি তাঁহারা এই মহানুভব সম্রাটের সান্নিধ্যে আগমন ও সময়োচিত সাহায্য প্রাপ্ত না হইতেন। তিনি যেরূপ বহু যত্নে ও ক্লেশে বিভিন্ন পুষ্পোদ্যান হইতে মহামূল্য পুষ্পসমূহ আহরণ ও স্নেহে বন্ধনে প্রতিপালন করিয়াছিলেন সেইরূপ কোন্ যুগে কয়জন নৃপতি করিয়াছেন? ইহা দ্বারা তিনি নিজে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু সম্রাটের হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রচেষ্টায় বীরবল ও আবুল ফজলের অবদান অতুলনীয়। আকবরের ন্যায় তাঁহারাও উদারতা ও মহানুভবতার অনেক পরিচয় দিয়াছেন এবং দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌখ্য ও প্রেম স্থাপনের জন্য সম্রাটকে আপ্রাণ সাহায্য করিয়াছেন।

যতদূর সম্ভব সম্রাট উভয়কেই তাঁহার কাছে কাছেই রাখিতেন এবং অনেক প্রয়োজনীয় রাজকার্য-বিষয়েও তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একটি ঘটনা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে, তিনি তাঁহাদের সংস্পর্শচ্যুত হইতে কত অনিচ্ছুক ছিলেন। এক সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোন পার্বত্যজাতি মুঘলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং তাহাদের দমন করিবার জন্য একজন সুদক্ষ সেনানায়কের প্রয়োজন হইয়াছিল। আবুল ফজল ও বীরবল উভয়েই ঐ বিদ্রোহ দমনের কর্তৃত্বভার লইবার জন্য খুব আগ্রহান্বিত হইলেন, কিন্তু সম্রাট প্রথমতঃ কাহাকেও দূরে পাঠাইতে রাজী হইলেন না; অবশেষে উভয়ের অতিরিক্ত আগ্রহে ও পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া একজনকে অতি অনিচ্ছার সহিত পাঠাইতে রাজী হইলেন। কিন্তু কাহাকে পাঠাইবেন? উভয়েই যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে ভাগ্য-পরীক্ষা (লটারী) করা হইল। রাজা বীরবলের ভাগ্যেই নাম উঠিল এবং তিনিই ঐ অভিযানের সেনানায়ক নিযুক্ত হইলেন। সম্রাট অতি কষ্টে তাঁহাকে বিদায় দিলেন, কিন্তু এই বিদায়ই যে তাঁহার শেষ বিদায় হইবে তাহা কেহ কখনও ভাবে নাই। ঐ অভিযানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সম্রাট তাঁহার বিয়োগ শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আকবর যেরূপ অন্তরের সহিত সাম্রাজ্যের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোককে একত্রিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এইরূপ সুন্দর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের কোন রাজাকে এত ক্লেশ স্বীকার করিতে ইহার পূর্বে বা পরে দেখা যায় নাই। তাঁহার জীবনের প্রধান সাধনা ছিল সাম্রাজ্যের সকল প্রজাকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া তাহাদের মৈত্রী-বন্ধন এত সুদৃঢ় করা যে ভবিষ্যতে সে বন্ধন যেন কখনও ছিন্ন না হয়। এই মহৎ প্রেরণায় সকলে একত্রিত মিলিত হইয়া নবীন উৎসাহে সোনার ভারতকে নব-ভাব-ধারায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য—যাহাতে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চিরশান্তি ও আনন্দ বিরাজমান হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসভূমি ভারতে মিলন-যজ্ঞ সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে তিনি এক নূতন ধর্মের সৃষ্টি করিলেন—ইহাই হইল—দীন-ইলাহী ("The religion of God")। এই ধর্মের প্রধান অংগ হইল একেশ্বরবাদ—ভগবান এক ও অদ্বিতীয়। অনেক রীতিনীতি এবং ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে যাহা ভাল মনে করিয়াছেন তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুই চারিটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করিতেছি। এই ধর্মের প্রত্যেক সভ্যকে তাহার জন্মদিবসে গরীবদিগকে দান করিতে হইত এবং ভোজের ব্যবস্থা করিতে হইত। বাদশাহ আদেশ দিয়াছিলেন প্রত্যেক সভ্য যেন মাংস আহার বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। তাহারা অপরকে মাংস খাইতে দিতে পারে কিন্তু নিজে উহা স্পর্শ করিবে না। জন্ম-মাসে কেহ কখনও মাংসের কাছেও যেন না যায়। সূর্য ও অগ্নির প্রতি প্রত্যেক সভ্যের ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইত। কেহ এই ধর্ম গ্রহণ করুক আর না করুক তাহাতে কাহারও নিজ মতানুসারে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইত না। ধর্মের স্বাধীনতা তিনি কখনও কাহারও হরণ করেন নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বটে। কিন্তু সমস্ত সমসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিয়া পক্ষ-পাতিত্ববিহীনভাবে মত প্রকাশ করিতে গেলে ইহাই উজ্জ্বল হইয়া উঠে যে, তিনি ধর্মের ব্যাপারে কাহারও উপরে অন্যায় বা অবিচার করেন নাই। এইরূপ করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধে ছিল, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার স্বপ্ন ও সাধনা ছিল ভারতকে একটি মনোরম ও প্রীতিপ্রদ উদ্যানে পরিণত করা—যেমন একটি উদ্যানে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর ফুল দর্শকের মনোরঞ্জন করে তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ এই ভারত-উদ্যানের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবে। তাঁহার জীবিতকালে এই দেশে একটি স্নিগ্ধ ও সুশীতল মলয়ানীল প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে দেশের অগ্রগতি অনেকাংশে ব্যাহত হয়। সম্রাট জাহাংগীর এবং সাজাহান প্রয়োজনানুসারে মোটেই আকবরের পদাংক অনুসরণ করিতে পারেন নাই এবং সম্রাট ঔরংগজেব আকবরের আদর্শ হইতে বিভিন্ন পথেই চলিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা সকলে আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে হয়ত ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত এবং যে কাজ ঐ মহানুভব সম্রাট সাড়ে তিনশত বর্ষ পূর্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার ভার এই দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পরে বর্তমানে দেশের নেতাদের উপরে পড়িত না। যে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য মুঘল সম্রাট আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আজ এই দেশের বর্তমান সুযোগ্য দেশপ্রেমিক ও সেবকগণ সুসংহতভাবে সমাধান করিবেন এই আশাই আমরা সর্বদা পোষণ করি।

প্র-না-বি-র এলবাম
চিত্র-চরিত্র

গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী বহু-চিত্রিত ব্যক্তি। এত চিত্র, এত মূর্তি আর কোন ব্যক্তির রচিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কোন ব্যক্তির খ্যাতি যত বাড়িতে থাকে তাহার ছবির গতি তত নামিতে থাকে; নামিতে নামিতে অবশেষে একদিন পানের দোকানে গিয়া পোঁছায়। তখন তাঁহার খ্যাতির বনিয়াদ পাকা হইল বলিতে পারা যায়, তখনই সে 'জনগণমন অধিনায়ক।'

নন্দলাল বসু অঙ্কিত মহাত্মাজীর ডান্ডী যাত্রার ছবিখানি আমার সব চেয়ে প্রিয়। এই ছবিখানি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় গান্ধী কেবল মহৎ পুরুষ নয়, বৃহৎ পুরুষও বটে। পটের পুরোভাগ অধিকার করিয়া বিরলতম রেখায় অঙ্কিত সরলতম মূর্তিটি; যাত্রার আনন্দে দুই পায়ের মাংস পেশীর মধ্যে কানাকানি পড়িয়া গিয়াছে; ধৃতযষ্ঠি দক্ষিণ হস্তের পেশীগুলির স্ফীতিতে গান্ধীর মনের দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ; আর যষ্ঠিখানার মধ্যেও যেন এক অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। মুখ ঈষৎ নত, চোখের দৃষ্টি মাটি সম্মার্জিত করিয়া চলিয়াছে, মুখমন্ডলে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও বিষাদের কোমলতার ছায়াতপ; প্রসারিত পদদ্বয়ে দশক্রোশী ধাপ। আর ছবিখানির পটভূমির খোপে খোপে বালখিল্য মনুষ্যমূর্তি, ডান্ডী-যাত্রার সহচর, চল্লিশ কোটির ঊন-আশীটি প্রতিনিধি। ওই মূর্তিগুলির তুলনায় পুরোভাগের মূর্তিটি কি বিরাট! "আমি যাত্রা সুরু করিলে সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিবে।" ওই মূর্তিগুলি সেই উদ্বেলিত ভারতবর্ষের উচ্ছ্বসিত ঊর্মিমালা।

এই চিত্রের গান্ধী মূর্তিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার একটি একরোখা ভাব বিজড়িত। গান্ধী ও চার্চিল চরিত্রে শতরকম প্রভেদ সত্ত্বেও একটা চরম জায়গায় দুজনের মিল আছে। দুজনেই প্রচন্ড একরোখা। এই মিলটুকু আছে বলিয়াই কোনকালে তাহাদের আর মিলন ঘটিল না। মূলে প্রভেদ না থাকিলে কখনও সত্যকার মিলন ঘটে কি? প্রকৃতিগত ঐক্য দুইজনকে পৃথক করিয়া রাখে।

আবার এই একরোখা ভাবের মূলে আছে গান্ধী-চরিত্রের সরলতা। আপাত-বৈচিত্র্য এবং নানা মিশ্রতন্তুর সন্নিবেশ সত্ত্বেও গান্ধী-চরিত্র একান্ত সরল। গান্ধী-ব্যক্তিত্ব একখানি মাত্র পাথর কুঁদিয়া তৈয়ারী। জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরা সকলেই 'মনোলিথিক' পাথরের মূর্তি। গান্ধী-চরিত্রের এই সরলতাই জনগণের পক্ষে তাঁহাকে সহজবোধ্য করিয়াছে। ঠিক এই কারণেই চার্চিলও ইংলণ্ডের জনগণের পক্ষে সহজবোধ্য। জনচিত্ত মিশ্রধাতুকে প্রশংসা করিতে পারে, যাদুঘর পর্যন্ত অনুসরণ করিতে পারে, কিন্তু বোমাবর্ষণ বা লাঠি বর্ষণের নীচে গান্ধী ও চার্চিলকেই অনুসরণ করিবে।

গান্ধী-চরিত্রে এই সরলতার কারণ গান্ধী-চরিত্র মূলত মধ্যযুগীয়। এবারে পাঠকের সহিত আমার ভুল বোঝার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। মধ্যযুগ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্কটের উপন্যাস হইতে সংগৃহীত। গিরিশিখরের চূড়ায় দুর্ভেদ্য প্রাকারের দুর্গ-প্রাসাদ, আপাদ-মস্তক লৌহবর্মে আবৃত বীরপুরুষের দল, দ্বন্দ্বযুদ্ধের আসরের একান্তে উপবিষ্ট সুন্দরী সমাজ, বিজন পার্বত্য প্রদেশের মধ্যে বিচিত্রকীর্তি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এইসব উপাদানে আমাদের মধ্যযুগ গঠিত। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই মধ্যযুগের লক্ষণ, কিন্তু নিতান্তই বাহ্য লক্ষণ। মধ্যযুগের স্বরূপ এসব হইতে ভিন্ন। মধ্যযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র মানুষের আত্মা। উত্তর-রেনেসাঁস কালের মনোবিজ্ঞান আত্মাকে অস্বীকার করিয়াছে, বলে আত্মার প্রমাণাভাব; আর প্রমাণ ছাড়া কোন বস্তুকে সে স্বীকার করিতে রাজী নয়। কিন্তু একটা কথা ভুলিয়া যায় যে, মানুষের হাতে প্রমাণ যেমন একটা অস্ত্র, বিশ্বাসও তেমনি আর একটা অস্ত্র। প্রমাণের চালক বুদ্ধি। বিশ্বাসের চালক আত্মা। মনোবিজ্ঞান বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে সম্মত নয়, কারণ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে নাস্তিক। কিন্তু মনোবিজ্ঞানই কি একমাত্র জ্ঞান? তবে প্রজ্ঞা কি? উত্তর-রেনেসাঁস কালে বিজ্ঞানের যে স্থান, মধ্যযুগে সেই স্থান ছিল প্রজ্ঞার। প্রজ্ঞার রঞ্জনরশ্মিতে অন্তরের রহস্যভেদ সম্ভব, প্রজ্ঞার আলোকে আত্মা আত্মোদ্ঘাটন করে।

মনোবিজ্ঞান মানুষের বুদ্ধি, কর্তব্যজ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিকেই স্বীকার করে, কেবল যে অদৃশ্যাবৃন্তের সহিত এ সমস্ত বিধৃত, যাহা আছে বলিয়াই এ সমস্তই কেন্দ্র-গতবৎ নিয়ন্ত্রিত হইয়া সক্রিয়, সেই বিন্দুটিকে সে স্বীকার করে না। সেই অদৃশ্য, অজ্ঞেয় (প্রজ্ঞার সাহায্য ব্যতীত) বিন্দুটিই আত্মা। উত্তররেনেসাঁস বিজ্ঞানী বিনাসূতায় মালা গাঁথিতে চায়; তাই ফুলের বহুত্ব মালার একত্বে পরিণত হয় না। মধ্যযুগ অনায়াসে আত্মার সূত্রে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে এক করিয়া অখন্ড বিশ্বমাল্য রচনা করিয়াছিল। নিরর্থক বহুর বিড়ম্বনা তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। তাহার সাধন-রত অঙ্গুলিতে বিশ্বমাল্য জপমাল্যের মত আবর্তিত হইত। এই কারণেই মধ্যযুগ সরল। সে সরলতা অজ্ঞতাপ্রসূত নয়, প্রজ্ঞা-প্রসূত। এই কারণেই মধ্যযুগের মানব-চরিত্র এত সরল ছিল, সাধন-লব্ধ সরলতা। রেনেসাঁসের প্রারম্ভ হইতে এই সরলতার অন্তর্ধানের সূত্রপাত। সূত্রকে অস্বীকার করিবামাত্র মালা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ফলে একরাশ ফুল আছে, মালা কোথায়? বৃন্তচ্যুত অসমন্বিত বুদ্ধি, নীতিবিজ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছে, এক একজন এক একদিকে টানে। বুদ্ধি যদি আণবিক বোমা প্রস্তুত করে, নীতি-জ্ঞান তাহাকে সমর্থন করিতে পারে না, সৌন্দর্যবোধ যখন আশ্রয় সন্ধান করে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তখন ইফেল টাওয়ারের মতো একটা লোহার শূল খাড়া করিয়া বলে—এটাই সুন্দর। ফলে কেন্দ্রচ্যুত বৃত্তিগুলা মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিরন্তর হানাহানি করিয়া মরে। মানুষের ব্যক্তিত্ব আজ আর অখন্ড নয়, শত খন্ড মানুষ আজ আত্মবিরোধী। এই কারণে আধুনিক মানব এমন অ-সরল, মিশ্র উপাদানের ভারে সে এমন পীড়িত।

গান্ধীকে যখন মধ্যযুগীয় ব্যক্তি বলি, তখন বলিতে চাই যে, তাঁহার চরিত্রে উত্তররেনেসাঁস পর্বের বিশ্লেষণী প্রক্রিয়া সক্রিয় হইয়া উঠিয়া অরাজকতা ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই। জগৎ তাঁহার কাছে বহু ফুলের বিড়ম্বনা নয়, এক-সূত্রে গ্রথিত একটি জপমাল্য। জগৎকে তিনি যেমন সহজে বোঝেন, তাঁহার অন্তর্নিহিত সরলতার জন্যে জনচিত্তও তাঁহাকে তেমনি সহজে বোঝে। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার ফলে সংস্কৃতিমান সম্প্রদায় রেনেসাঁসের অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু অশিক্ষিত সর্বজন এখনও মধ্যযুগের উপান্তে বিরাজিত, ওইখানে গান্ধীর সহিত তাহাদের মিল, সেইজন্য গান্ধী যখন বলেন যে, তিনি সর্বজনের প্রতিনিধি, সেকথা এমন সত্য। আবার ওই একই কারণে শিক্ষিত লোকে, রেনেসাঁসের পূর্বাচল ইউরোপের শিক্ষিত লোকে গান্ধীকে বুঝিতে এমন অযৌক্তিক অজ্ঞতা দেখায়।

আত্মা-বিশ্বাসী বলিয়াই গান্ধী আত্ম-বিশ্বাসী, জগৎ ও জীবনের সমুদয় সমস্যাকে তিনি ভিতরের দিক হইতে স্পর্শ করিতে চান, সম্ভব হইলে সমাধান করিতে চেষ্টা করেন। এই অন্তর্লোকের বাণীকেই তিনি বলিয়া থাকেন, 'Inner Voice'। অন্তরের দিক হইতে বাহিরের দিকে তাঁহার গতি বলিয়া প্রেমের দ্বারা অন্তরের পরিবর্তন ঘটাই

সমস্যা সমাধান তাঁহার পন্থা। এযুগের বহুঘোষিত 'Objective Condition'-এর গান্ধী আবিষ্কৃত প্রতিষেধক 'Subjective Condition। দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিলে জগৎ পরিবর্তিত হয়, অন্তরের পরিবর্তনে দৃষ্টি পরিবর্তিত। আজকার যুগ এসবকে অবাস্তব মনে করে, মধ্যযুগে ইহাই ছিল একমাত্র বাস্তব। তবু তো হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিতেছে। কোনদিন ভারত-রাষ্ট্রের হৃদয় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গান্ধীকে সত্যাগ্রহ করিতে হইলে আমি অন্তত বিস্মিত হইব না।

আশ্চর্য এই লোকটি—গান্ধী! কৈলাস শিখর হইতে স্খলিত তুষার স্তূপের সূক্ষ্ম, শুভ্র রেণুপুঞ্জে দিঙমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গিয়া যেমন দিব্যভাবে আবিষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি এক প্রকার স্বর্গীয় উন্মাদনা আছে গান্ধীর হাসিতে। সেই হাসির শুভ্র উত্তরীয়ে শ্রোতাদের একইভাবের আবেশে জড়াইয়া নেয়! আর গান্ধীর চোখের অতল করুণার তুলনা কৈলাস সানুশায়ী মানস সরোবর। গান্ধীর কথায় কৈলাস শিখরকে মনে পড়াই স্বাভাবিক। কৈলাসেশ্বর ভারতবর্ষের ধ্যানের প্রতীক। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি ভারতবর্ষের শিল্পকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে এমন আর কিছু নয়। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি রচিতে শিল্পিগণ অগোচরে ধ্যানী শিবকেই আদর্শ ধরিয়া লইয়াছে। ভবিষ্যতের শিল্পী সমাজ ধ্যানী গান্ধীর মূর্তি রচনা উপলক্ষ্যে ধ্যানী শিব-বুদ্ধকেই দৃষ্টির সম্মুখে রাখিবে। ভবিষ্যতের ধ্যানী গান্ধী মূর্তি ত্রয়ীর এক অপূর্ব সমন্বয়। গঙ্গা প্রবাহে নদনদী আসিয়া মিলিবা মাত্র তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়, তখন সবই গঙ্গা। ভারতের ধ্যান-প্রবাহেও তেমনি একটি মোহিনী শক্তি আছে, স্বাতন্ত্র্যলোপকারিণী শক্তি। শিব-প্রবাহ, বুদ্ধ-প্রবাহ আসিয়া পড়িয়াছে, এবারে গান্ধী-প্রবাহ আসিয়া পড়িয়া মূল-প্রবাহের শক্তি বর্ধন করিল। ভারতের ধ্যান-গঙ্গার শক্তি বর্ধনে যে সহায় হইতে পারিল না, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার স্থান নাই। গান্ধী এই প্রবাহের যেমন শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, এমন আর কে? গান্ধীর নাম ভারত ইতিহাসের শিরোদেশে।

এপার ওপার

টবে টোম্যাটো

টবে টোম্যাটো জন্মানো একটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়, এবং জমি থাকতে কেউ টবে টোম্যাটোর চাষ করে না, কিন্তু আজকের জার্মানীতে অনেককেই টবে টোম্যাটোর চাষ করতে হচ্ছে। সেখানে ভীষণ খাদ্যাভাব, চাষ-বাস বন্ধ, জমি সব নষ্ট হয় গিয়েছে, চাষ হয়, তবে খুব কম। খাদ্যের জন্য বিদেশীদের ওপর তাদের নির্ভর করতে হচ্ছে, বিদেশীরা দয়া করে যা খেতে দিচ্ছে তারা তাই খাচ্ছে। সহরগুলি ভগ্নস্তূপে ভর্তি, সামান্য ফসল ফলাবারও একফালি জমি বিরল, যদিও বা প্রকাশ্যে একফালি জমিতে ফসল ফলানো যায় তাহলে চুরি যাবার আশঙ্কা আছে। অতএব ভাঙা বাড়ীর মধ্যে অথবা ছাদে কিংবা আর কোনো সুবিধাজনক স্থানে টবে কিছু কিছু ফসল ফলাবার চেষ্টা চলছে, যেটুকু খাদ্য পাওয়া যায়। টব যদিও বললুম কিন্তু মাটির অথবা কাঠের টব জার্মাণীতে এখন পাওয়া যায় না, তাই ভাঙা বালতি, বড় টিনের পাত্র, অব্যবহার্য বাথটাব ইত্যাদিতে, টোম্যাটো, লেটুস, পেঁয়াজ, এমন কি তামাক গাছের চাষ করছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের ফ্রাউ ওয়াণ্ডারার নামক ষাট বৎসর বয়স্কা একজন মহিলা এই উপায়ে এক বৎসরে ৫০০ পাউণ্ড টোম্যাটো উৎপন্ন করেছেন। কিছু তিনি বোতলে করে শীতকালের জন্য রেখে দিয়েছেন, কিছু নিজে খেয়েছেন, কিছুর বিনিময় রুটি কিনেছেন। আর একজন ভদ্রলোক, পিটার মিট্‌কি তিনি তামাকের চাষ করেছিলেন। তামাক পাতার পরিবর্তে তিনি কিছু সিগারেট সংগ্রহ করেছিলেন।

হোম্যান হাণ্ট একজন বড় শিল্পী। "জগতের আলো" নামে একখানি ছবি তিনি এক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেছিলেন। ছবিটিতে যীশুকে দেখানো হয়েছে, মধ্যরাত্রে বাম হাতে একটি আলো নিয়ে ডান হাত দিয়ে একটা ভারী দরজায় তিনি আঘাত করছেন। প্রদর্শনীতে ছবিখানি যখন উন্মোচিত হ'ল, একজন সমালোচক মন্তব্য করলেন, "মিস্টার হাণ্ট লক্ষ্য করেননি কি আপনি এখনও সম্পূর্ণ করেন নি? দরজার হাতল ত' আঁকেন নি?"

শিল্পী জবাব দিলেন; "প্রয়োজন নেই, ঐ দরজা হ'ল হৃদয়ের দরজা, ও কেবল ভেতর থেকেই খোলে।"

গণতান্ত্রিক কথার অর্থ হ'ল; আমি তোমার সমান নই, তুমি আমার সমান।

ফ্রাউ ওয়াণ্ডারার তাঁর টোম্যাটো গাছে জল দিচ্ছেন।

শের-ঈ-কাশ্মীর

ছয় ফিট চার ইঞ্চি দীর্ঘ কাশ্মীরের জনগণের নেতা সেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীরিরা বলে "শের-ঈ-কাশ্মীর"। ঘরে বসে বাণী প্রেরণ করে', দলগত রাজনীতি অথবা পুস্তক রচনা করে' এই উপাধি তিনি পাননি. তিনি জনগণের সেবা করে' জনগণের হৃদয় থেকে আদরের এই নামটি আদায় করে নিয়েছেন। যদি কোনো ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে কেন স্কুলে যাচ্ছে, তবে সে উত্তর দেবে 'সেখ্ সাহেব যেতে বলেছেন," যদি দেখা যায় কোনো কাশ্মীরি কোনো ভাল কায করছে তহলে ধরে নিতে হবে যে তা সে সেখ্ সাহেবের নির্দেশেই করছে। জনগণের ওপর এমনই তাঁর প্রভাব।

সেখ আবদুল্লা সামান্য একজন শাল ব্যবসায়ীর পুত্র। ১৯০৫ সালে তাঁর জন্ম। ১৯৩০ সালে তিনি এম এস-সি পরীক্ষায় পাশ করেন, কিন্তু রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার জন্য সরকারী চাকুরী তিনি পাননি। শেষ পর্যন্ত ৮০ টাকা বেতনে একটি শিক্ষকতার চাকরী যোগাড় করেন। এই সময়েই সরকারী স্বেচ্ছাচারিতা ও চূড়ান্ত নিষ্পেষণ তাঁকে আঘাত করে। তিনি প্রথমে কাশ্মীরের মুসলমানদের সহযোগিতায় "মুসলিম কনফারেন্স" স্থাপন করেন, উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের জন্য সুখ সুবিধা আদায় করে' নেওয়া এবং তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করা। স্কুল শিক্ষক হলেন রাজনীতিক। রাজ্যে হ'ল মুসলিম আন্দোলন, ১৯৩১ সালে শেখ আবদুল্লাকে কারাগারে প্রেরণ করা হ'ল। আন্দোলনের জন্য কিছু ফল হ'ল, শাসনতান্ত্রিক কিছু সুখ-সুবিধা পেলেও প্রজাদের হিমালয় প্রমাণ দারিদ্র্যের কোনো তারতম্য হলো না। এই অবস্থা বহুদিন চলল। শেখ আবদুল্লা লক্ষ্য করলেন যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত কোনো দল কৃতকার্য হতে পারে না, তখন তিনি হিন্দু ও শিখ নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯৩৯ সালে ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা করলেন। ন্যাশন্যাল কনফারেন্স সেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে রাজ্যে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসন সংস্কার দাবী করলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রচারিত হল "নিউ কাশ্মীর" নামে পুস্তিকা, দাবী জানানো হলো "কুইট কাশ্মীর।" পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৬ সালের মে মাসে সের-ঈ-কাশ্মীরকে দিল্লীতে আহবান করলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক তাকে গ্রেপ্তার করেন, সেই সংগে ন্যাশনাল কনফারেন্সের আরও তিন শ' সভ্যকে। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। জনমতকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। রামচন্দ্র কাকের স্থলে সের-ঈ-কাশ্মীরকে বসাতে হয়েছে।
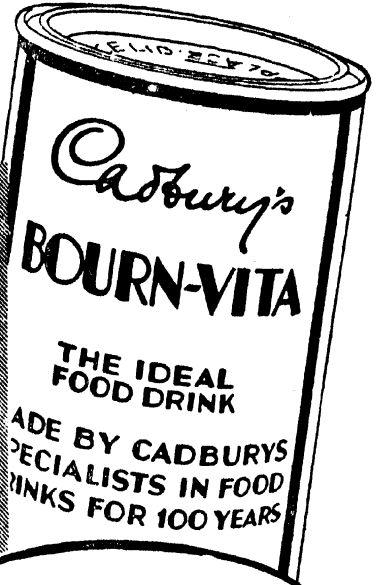
সেবগ্রামে তিনদিন

শ্রীসন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরী

বর্তমান যুগের মহামানব মহাত্মা গান্ধীর সাধনার ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ সেবাগ্রাম সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার কৌতূহল অনেকেরই হয়। সম্প্রতি তথায় যাইয়া আমি সেখানকার শিক্ষানীতি, কর্মপদ্ধতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সেবাগ্রামের বাহ্যিক বিবরণ দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, সেখানকার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে যতদূর সম্ভব বিরত থাকিব, পূর্বেই সেকথা বলিয়া রাখা ভাল।

আমার সঙ্গী ছিলেন বিশ্বভারতীর তিনজন কর্মী: তাঁদের মধ্যে একজন শিল্প শিক্ষক, একজন সঙ্গীত শিক্ষক ও আর একজন বিজ্ঞান শিক্ষক। এদেশের কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র দেখিবার জন্য আমরা নানাস্থানে গিয়াছিলাম, সেবাগ্রাম সেই সকল স্থানের মধ্যে অন্যতম। প্রথমে আমরা দিল্লী ও জয়পুরে যাই। জয়পুর হইতে যাত্রা করিয়া দিল্লী হইয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসযোগে গত ত্রিশে জুলাই অপরাহ্ন সাড়ে চারটায় আমরা ওয়ার্ধা পৌঁছিলাম। স্টেশন হইতে সেবাগ্রাম আশ্রম প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। দুইখানি টাঙ্গায় করিয়া আমরা আশ্রম অভিমুখে রওনা হইলাম। এদেশের অপরাপর ক্ষুদ্র শহরেরই মত ওয়ার্ধা, সুতরাং টাঙ্গায় করিয়া এই শহরের ভিতর দিয়া যাইবার সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত বৈচিত্র কিছু দেখিলাম না। শহর ছাড়িয়া রেলপথ পার হইয়া গ্রামের ভিতর যখন প্রবেশ করিলাম তখনই ওয়ার্ধার আপন পরিচয় পাওয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আমরা আশ্রমের উপকণ্ঠে প্রবেশ করিলাম। দূর হইতে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম একটি ত্রিবর্ণ পতাকাতলে সমবেত আশ্রমবাসীদিগের একটি সভা হইতেছে। সভাস্থল হইতে গানের সুর আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সান্ধ্যোপাসনা হইতেছে। আশ্রমে টাঙ্গা আসিয়া থামিতেই তালিম সংঘের সচিব শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম এবং ওখানকার শিল্পশিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদের সহিত দেখা হইল। ইঁহারা পূর্বে শান্তিনিকেতনে থাকিতেন ও আমাদিগের পরিচিত। যে গৃহে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল শুনিলাম সেবাগ্রামে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন কালে ঐ গৃহেই কমিটির সভ্য ও বিশিষ্ট অতিথিগণ অবস্থান করেন। গৃহটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইল, মাটির দেওয়াল ও মেঝে, খোলার আচ্ছাদন, প্রত্যেক ঘরের সংলগ্ন একটি স্নানের ঘর, সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা।

ওখানে আমরা কখন কোথায় কি দেখিতে যাইব, আমাদিগকে কখন কি করিতে হইবে ওখানকার কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিয়া একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আমরা সেইমত চলিতে থাকিলাম।

পরদিন অর্থাৎ একত্রিশে জুলাই প্রাতে ছয়টার সময় জলযোগ কর্মসূচীতে উল্লেখ ছিল। আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে প্রাতরাশের জন্য উপস্থিত হইয়া আমাদিগের জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদিগের জন্য পৃথক পৃথক স্থান আছে। ভোজনপাত্র বলিতে প্রত্যেকের সাধারণতঃ একটি করিয়া বাটি ও একটি গেলাস থাকে, সকলেই নিজের নিজের পাত্র লইয়া আসেন। শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত তিন চারিজন আহার্য আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের ভিতর হইতে একজন সকলকে উদ্দেশ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন 'শান্তি', অমনি সকলেই কথাবার্তা বন্ধ করিয়া নীরব হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই আদেশ করিলেন 'পরিবেশন শুরু', আহার্য পরিবেশন করা হইল। পুনরায় আদেশ হইল 'মন্ত্র', সকলেই সমস্বরে মারাঠি ভাষায় সুর সহযোগে প্রার্থনার মন্ত্রপাঠ করিলেন। প্রার্থনা শেষ হইবার পর সকলে আহার করিলেন। যে তিনদিন ছিলাম প্রাতরাশ একই প্রকার ছিল। যাঁতায় ভাঙ্গা ভুট্টা জলে সিদ্ধ করিয়া তৈল লবণাদি সংযোগে এই 'নাস্তা' বা জলযোগ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। আহারান্তে নিজ নিজ পাত্র লইয়া বাসন পরিষ্কার করিবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া সকলে বাসন পরিষ্কার করেন।

নাস্তার পরে সাড়ে ছয়টা হইতে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত শিশুগণ কর্তৃক আশ্রম পরিষ্কার করিবার কার্য ও তাঁহারা যে ছাত্রাবাসে বাস করেন কর্মসূচীতে তাহা আমাদের দেখিবার বিষয় ছিল। কোদাল খুরপি হাতিয়ার লইয়া শিশুরা বাহির হইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ রাস্তা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ বা জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কাজ করিবার পর সকলে একটি কূপের পাড়ে স্নান করিতে গেলেন। পালা করিয়া কূপ হইতে জল তুলিবার কাজ চলিতেছিল।

ছাত্রাবাস আমাদিগের গৃহের মত মাটিরই। দীর্ঘ একটি ঘর, তাহার একদিকে একটি বারান্দা। বারান্দার শেষভাগ ঘিরিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষ করা হইয়াছে। দীর্ঘ ঘরের এক প্রান্তে 'ছাত্র পরিচালক' তাঁহার পুঁথিপত্র, দুই চারখানি পরিধেয় ও সামান্য আর কয়েকটি সামগ্রী লইয়া বাস করেন। বাকি অংশে দুই সারিতে অন্যূন পঞ্চাশ জন ছাত্র থাকেন। ঘরে কোন আসবাবপত্র নাই। প্রত্যেকের একটি করিয়া চরকা দেওয়ালের পাশে পাশে রাখা আছে। বালকদিগের একটি করিয়া কেরোসিনের আলো দেওয়ালে টাঙানো। বারান্দার প্রান্তে যে কক্ষ আছে তাহার ভিতর ছাত্রদিগের ছোট-ছোট বাক্স ও শয্যা পরিষ্কার করিয়া গুটাইয়া তাকের উপর তুলিয়া রাখা। সমগ্র ছাত্রের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে দৈনিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত করেন, অবশিষ্ট সকলে ছাত্রাবাসে থাকেন। যে ছাত্রাবাসের বর্ণনা করিলাম উহা বালকদিগের। বালিকাদিগের পৃথক আবাস আছে।

ছাত্রাবাসের অনতিদূরে মলমূত্র ত্যাগের স্থান। বাঁশ ও কাঠ দিয়া এক একজনের ব্যবহারোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রত্যেক ঘরের তলায় চারিটি করিয়া কাঠের ছোট ছোট চাকা। ইচ্ছামত এখানে ওখানে সেগুলি টানিয়া লইয়া যাওয়া যায়। ঘরগুলি কোথাও বসাইবার পূর্বে সেখানে মাটিতে গর্ত করিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক ঘরে একটি করিয়া বালতিতে মাটি রাখা থাকে। ঘরগুলি ব্যবহারের পর উপর হইতে ঐ মাটি ছড়াইয়া দিয়া দুর্গন্ধ মাছি প্রভৃতি নিবারণ করা হয়। ঘরগুলি স্থানান্তরিত করিবার পরে কয়েক মাসের মধ্যে মলমূত্র যখন মাটির সহিত মিশিয়া সারে পরিণত হয় তখন সেই সার কৃষিকার্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

রোগীদের থাকার জন্য একটি পৃথক স্থান আছে, সেটিও মাটির ঘর। তাহার বিশেষত্বের মধ্যে চারিদিকে বাঁশের জাফরি করিয়া যতদূর সম্ভব অধিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমরা যখন সেখানে গিয়াছিলাম তখন দুইজন ছাত্র অসুস্থ হইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা,

পথ্যাদির ব্যবস্থা এমন কি চিকিৎসার ভারও ছাত্রদিগের উপর ন্যস্ত থাকে। সাধারণ রোগের জন্য ব্যবহৃত মোটামুটি এলোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদীয় ঔষধ পার্শ্বের একটি ঘরে রাখা আছে। কি অবস্থায় কোন ঔষধ কি পরিমাণে দেওয়া কর্তব্য তাহা সাধারণভাবে সকল ছাত্রই জানেন। মধ্যে মধ্যে একজন চিকিৎসক আসিয়া প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন।

ঐদিন আমাদের সাড়ে সাতটা হইতে সওয়া আটটা পর্যন্ত সময় রন্ধনশালা দেখিবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। রন্ধনশালায় যাইবার পথে একদল বালক বালিকা কৃষিকার্য করিতেছেন দেখিলাম। যথাসম্ভব, আশ্রমে উৎপন্ন সব্জি হইতেই আহার্য প্রস্তুত করা হয়। রন্ধনের কার্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীরাই করেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কয়েকজন শিক্ষক সেই সময়ে শিক্ষালাভের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রন্ধনশালায় আপনহাতে জোয়ারের রুটি ও অন্যান্য আহার্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। উনান ধরানো হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধনকার্যের নানা পর্যায়ের ভিতর দিয়া রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, খাদ্য বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে তাহা তাঁহারা ঐ বিভাগের বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে লাভ করিতেছিলেন। একজন ছাত্রী রন্ধনশালার যাবতীয় হিসাব বিবরণী প্রভৃতি লিখিতেছেন দেখিতে পাইলাম।

রন্ধনশালা দেখিবার পর আশ্রমের নিকটবর্তী গ্রাম সেগাঁওয়ে প্রাক বনিয়াদি বা নার্সারি বিদ্যালয় ও পল্লীসংগঠন কার্য দেখিতে যাই। সেগাঁওয়ের নামেই আশ্রমের নাম সেবাগ্রাম করা হইয়াছে। বর্ষায় সেই গ্রামে যাইবার পথ দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের অপরিষ্কার জল নিকাশের একটি অপ্রশস্ত খাল অতিক্রম করিয়া পল্লীতে প্রবেশ করিতে হয়। সেগাঁওয়ের কুটিরগুলি ও তাহার পারিপার্শ্বিক দর্শন করিয়া সেখানকার অধিবাসী ও বাঙলা দেশের দরিদ্র কুটিরবাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে মনে হইল না।

ঐ গ্রামের প্রাকবনিয়াদী বিদ্যালয়ে দুইটি শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী দুই তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদিগের জন্য। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা দেওয়ালে বিলাতি মাটির পলাস্তারা দিয়া যে ব্লাকবোর্ড করা আছে তাহার উপর খড়ি দিয়া আপন খুশি মত আঁক কাটিতেছেন, কেহ বা ছোট ছোট কাঠের টুকরো লইয়া ঘরবাড়ি গড়িতেছেন, তুলো না লইয়াই কেহ কেহ তকলি কেবল ঘুরানো অভ্যাস করিতেছেন, আর কেহবা পাথরের ঘুঁটি লইয়া খেলা করিতেছেন দেখিতে পাইলাম। বলা বাহুল্য শিশুসুলভ কলহ চীৎকারে বিদ্যালয় মুখর ও প্রাণবন্ত ছিল। নানারূপ বীজ, খোলা-মালা, ঝিনুক, পাথর, মাটির ছোট ছোট হাঁড়িকুড়ি এলামাটি গেরিমাটি জাতীয় কিছু রং, খেজুর পাতার ডাঁটা হইতে প্রস্তুত তুলি, তাল পাতার টোকা, ছোট বাক্স অথবা তক্তার গায়ে কাঠের গোল চাকতি জুড়িয়া প্রস্তুত গাড়ি, কাঠির দুই প্রান্তে সুতা দিয়া দুইটি টিনের কৌটার ঢাকনি ঝুলাইয়া তৈয়ারী দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি সরঞ্জাম শিশুদিগের জন্য বাঁশের পাটাতন করিয়া তাহার উপর রাখা আছে। এক প্রান্তে একটি উনান, কিছু তৈজসপত্র ও রন্ধনের দ্রব্যাদিও আছে। কখনো কখনো শিশুদের রন্ধন করবার খেয়াল হইলে প্রাপ্তবয়স্কদিগের পরিচালনাধীনে রন্ধন হয়, শিশুরা রন্ধনকার্যে যথাসম্ভব সাহায্য করেন। ঐ বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুগ্ধ দেওয়া হয়। শিশুরা নিজেরাই পানপত্র আনয়ন, পরিবেশনাদি করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে আমাদের অবস্থানকালে এই দুগ্ধপানের সময় হইল। পরিবেশনকালে দুগ্ধ যাহাতে মাটিতে না পড়ে বা সকলকে ঠিক একই পরিমাণে দেওয়া হয়, এজন্য পরিবেশনকারী শিশুটি যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন, তাহা তাহার মুখভঙ্গি ও অঙ্গ-সঞ্চালনে ফুটিয়া উঠে, ইহা লক্ষ্য করিয়া আমরা উপভোগ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বর্ষ শ্রেণীর শিশুরা সুতা কাটাইয়ের নানা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ঐ সকল কাজের সম্পর্কে যে সমস্ত নামবাচক, গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহার সাহায্যে শিক্ষক শিশুদিগকে ভাষা শিক্ষা দিতেছিলেন।

প্রাক বনিয়াদি বিদ্যালয় দর্শনের পর আমরা সেগাঁওয়ের শিশুমঙ্গল সমিতিতে যাই। সেখানে দুইজন মহিলাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সেগাঁওয়ে যতগুলি শিশু আছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের পরিচয় ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা তথ্য পৃথক্ পৃথক পুস্তকে লিখিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রামে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ, চিকিৎসার ফলাফল, সাধারণ স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি পরিসংখ্যান লেখা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সমিতি হইতে প্রসূতিদিগের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার ভার লওয়া হইয়া থাকে। এজন্য সাধারণ ঔষধপত্রাদিও এইখানে রাখা হয়।

সকাল এগারোটায় মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। যথাসময়ে আমরা আহার করিবার ঘরে গেলাম। এই ঘরটি অন্যূন দুইশত জন স্বচ্ছন্দে বসিয়া আহার করিতে পারে এরূপ প্রশস্ত। বাদামি রঙের পাথরের টালি দিয়া মেঝে ঢাকা, টালির উপরিভাগ সমতল করিবার জন্য অর্থব্যয় করা হয় নাই, মোটামুটিভাবে ঐগুলি কাটা হইয়াছে; ইটের দেওয়াল ও টালির আচ্ছাদন। দেবদারু জাতীয় স্থানীয় এক প্রকার গাছের কাঠ ও বাঁশ দিয়া আচ্ছাদনের জন্য কাঠামো প্রস্তুত করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে কাঠের খুঁটি দিয়া তাহার উপর বৃহৎ আচ্ছাদনের ভার চাপানো আছে। এই ঘরটি সভাগৃহরূপেও ব্যবহৃত হয়। মাটিতে তালপাতার চাটাই পাতিয়াই আহারে ও সভায় বসিবার প্রথা। আমাদিগের প্রত্যেককে একটি থালা, দুইটি করিয়া বাটি ও একটি গেলাস দেওয়া হইয়াছিল। ঐগুলি আমরা আহার করিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। আহারের জন্য সকলে উপবেশন করিলে দুইজন শিক্ষার্থী প্রত্যেকের থালার উপর কিছু কিছু চাউল দিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বরাদ্দের চাউলের সহিত যে ধান কাঁকর প্রভৃতি থাকে তাহা সকলে মিলিয়া বাছিয়া ফেলিতে হয়। এজন্য প্রত্যহ মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে পনেরো মিনিট কাল নির্দিষ্ট আছে। আমরা সানন্দে আশ্রমের সকল প্রথা পালন করিয়াছি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের নিকট যে চাউল দেওয়া হইয়াছিল তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। তাহার পরে সকলের নিকট হইতে পরিষ্কৃত চাউল সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইল। প্রাতরাশের সময় যেরূপ প্রার্থনাদি হয় সেইরূপ মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজনের পূর্বেও হইয়া থাকে। আহার্যের মধ্যে সাধারণতঃ ভাত, ডাল, ক্ষেত্রে উৎপন্ন কুমড়ার তরকারি, জোয়ারের রুটি ও তাহার সহিত ঘৃতের পরিবর্তে তিলের তৈল এবং ঘোল থাকিত। খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন বাধা নিষেধ নাই, প্রয়োজন মত যিনি যতটুকু চাহেন তাঁহাকে তাহা দেওয়া হয়। ডাল চাই ভাত চাই বলিয়া চীৎকার করিয়া পরিবেষণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পদ্ধতি সেখানে নাই, নীরবে হাত তুলিয়া বক্তব্য জানাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। শরীর গঠন ও রক্ষার পক্ষে এই খাদ্যের মূল্য যথোপযুক্ত আছে কিনা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম বলিয়াছিলেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্য হইতে মানুষের যতটুকু তাপ গ্রহণ করা আবশ্যক সে তাপ এই খাদ্যে আছে বলিয়া ইহাকে তাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত মনে করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি আহারের পরে সকলেই আপন আপন পাত্রাদি ধৌত করেন। আহার করিবার স্থানও আহারান্তে নিজে পরিষ্কার করিবার প্রথা আছে। ভোজন-গৃহের অনতিদূরে বাসন মাজিবার জায়গা। কূপ হইতে জল উঠাইয়া সরাসরি একটি বিলাতি মাটির বড় চৌবাচ্ছায় তাহা ধরা হয়। টিন দিয়া চৌবাচ্চাটি আবৃত থাকে। ঐ জলাধার সংলগ্ন কতকগুলি কল আছে, তাহাতে হাতমুখ ধোওয়া বাসন-মাজা ইত্যাদি হয়। এইস্থানে পরিষ্কার করিয়া একটি চাতাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার একপ্রান্তে

রক্ষিত দুইটি টিনের পাত্রের মধ্যে আহারান্তে যে যৎসামান্য উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকে তাহা সকলে ফেলিয়া দেন। চাতালের অপর একদিকে একটি আধারে করিয়া বাসন মাজিবার জন্য ছাই রাখা থাকে। দ্বিপ্রহরের মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হয়। ঐ সময় হইতে অপরাহ্ন আড়াইটা পর্যন্ত বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

আড়াইটার সময় সভাগৃহে চরকা ও তকলি লইয়া আশ্রমের অধিবাসিগণ সমবেত হন, এবং আধঘণ্টাকাল সকলে সুতা কাটেন। ইহাকে 'সূত্রযজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অপরাহ্ন তিনটার সময় শিল্প শিক্ষকের গৃহে তাঁহার শিশু ছাত্রছাত্রীগণ যে সমস্ত চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন তাহা দেখিবার জন্য যাই। শিশু শিল্পীদিগের বয়স নাম প্রভৃতি লিখিয়া প্রায় একশত ছবি যত্ন সহকারে রাখা হইয়াছে। অধিকাংশ ছবি প্যাস্টেল রং দিয়া আঁকা। কয়েকখানি চিত্র হইতে শিশুদিগের মনোবিজ্ঞানের যে রহস্য শিল্প শিক্ষক উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা তিনি আমাদিগকে বলেন এবং অনুশীলনের দ্বারা শিশু ক্রমে ক্রমে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতেছেন তাহা দেখান। বিদ্যালয়ের প্রায় একশত কুড়িজন শিক্ষার্থীর মধ্যে আনুমানিক আটদশজন চিত্রাঙ্কণের ক্লাসে যোগদান করেন। একটি গৃহে শিক্ষার্থীদিগের দ্বারা অঙ্কিত কয়েকটি প্রাচীরচিত্র দেখিলাম। চিত্রাঙ্কণ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গত কয়েক বৎসর করা হইয়াছে। এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া যে সুফল হইয়াছে একথা শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম আমাদিগের প্রশ্নের উত্তরে জানান।

এখান হইতে আমরা কাটাই ও বয়ন বিভাগে যাই। এই সমগ্র বিভাগ যে গৃহে অবস্থিত তাহাকে 'রবীন্দ্রভবন' বলা হয়। সুতাকাটা ও বয়নকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। তুলার বীজ নিষ্কাসন, পিঞ্জন, পাঁজ তৈয়ারী, চরকা ও তকলিতে সুতা কাটাই, ফেটি তৈয়ারী, বয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক পর্যায়ের কাজ ছেলেমেয়েরা ভালভাবে শিক্ষা করেন। সাধারণত সকালে হাতেকলমে এই সকল কাজ করা হয়। এই কাজ করিতে করিতে ইতিহাস গণিতাদি বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন শিক্ষার্থীদিগের মনে উদিত হয় এবং সুচারুরূপে কার্য করিবার নিমিত্ত ঐ সকল বিষয়ের যে জ্ঞান প্রয়োজন অপরাহ্নে সেই সম্বন্ধে আলোচনা ও সেই শিক্ষাদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একখানি কাপড় প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণ সুতার প্রয়োজন হইবে তাহা নিরূপণ করিতে গণিতের যে বিষয়বস্তু জানা আবশ্যক শিশুদিগকে অপরাহ্নে সে সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিল্পের ভিতর দিয়া অপর নানা বিষয় শিক্ষাদান সম্পর্কে আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম বলেন যে, কাজ করিতে করিতে শিশুর মনে যখন গণিত বিজ্ঞানাদি বিষয়ের প্রশ্ন উঠে এবং যখন শিশু সেই প্রশ্নের উত্তর চাহেন কেবল তখনই সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞানদান করা হয়। শিশু যদি কোন প্রশ্ন না করেন তবে তাঁহারা ঐরূপ জ্ঞান দানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না।

প্রতিদিন শিক্ষার্থী কি কাজ কি পরিমাণে করিলেন এবং নিখিল ভারত কাটুনি সংঘের নির্ধারিত মজুরির হার অনুসারে তাঁহার শ্রমের কি মূল্য হইল তাহার খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। ঐ সকল দৈনিক বিবরণী হইতে মাসের শেষে মাসিক বিবরণী লিখিতে হয়। আমরা যেদিন 'রবীন্দ্রভবনে' যাই সেদিন মাসের শেষ তারিখ বলিয়া সকলকেই ঐ মাসিক বিবরণী লিখিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতে দেখি। শিক্ষার্থীদিগের দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যে লাভ হয় তাহা হইতে শিক্ষকদিগের বেতনের ব্যয় নির্বাহ করাই এই বিভাগের লক্ষ্য। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একজন করিয়া শিক্ষক আছেন। এই বিভাগে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে সাধারণ বুনানিই দেখা যায়, টুইল প্রভৃতি অন্যবিধ বুনানির কোন বস্ত্র সেখানে প্রস্তুত হইতে দেখি নাই। উৎপন্ন দ্রব্যে রঙের ব্যবহার অল্পই দেখিলাম।

সন্ধ্যা ছয়টায় অর্থাৎ দিনের আলো থাকিতে থাকিতে নৈশ আহার সম্পন্ন করিতে হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনে যে প্রকার আহার্য থাকে এই আহারের সহিত তাহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ভোজনের কিছুক্ষণ পরে প্রার্থনা ও সঙ্গীতের মহড়ায় আমাদিগকে উপস্থিত থাকিতে বলা হইয়াছিল। পরদিন পহেলা আগস্ট লোকমান্য তিলকের জন্মতিথি, তাহার জন্যই ঐ মহড়ার আয়োজন। প্রার্থনার পরে কয়েকটি নামগান ও স্বদেশী সঙ্গীত হইল। গানের সহিত একটি বালক বাঁশের বাঁশি বাজাইতেছিলেন ও সকলে মিলিয়া তালে তালে করতালি দিতেছিলেন। হিন্দুস্থানী ও মারাঠি ভাষাতেই অধিকাংশ গান গাওয়া হইয়া থাকে তবে অনেক ছাত্রছাত্রী আগ্রহ সহকারে শ্রীযুক্তা আশা দেবীর নিকট হইতে রবীন্দ্র সঙ্গীতও শিক্ষা করেন। সঙ্গীত শিক্ষাদানের জন্য সম্প্রতি একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

পরদিন লোকমান্যের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে বিদ্যালয় ছুটি ছিল। ঐ দিন প্রাতে শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবাল উত্তর বনিয়াদী শিক্ষা বিভাগের প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন উৎসবে পৌরোহিত্য করিলেন। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে পতাকাদণ্ড প্রোথিত হয়। পতাকাকে কেন্দ্র করিয়া অর্ধবৃত্তাকারে প্রাঙ্গণে কয়েকটি রেখা টানা হইয়াছিল। আশ্রমের শিক্ষার্থীগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া সামরিক ভঙ্গিতে পদক্ষেপ করিতে করিতে ঐ চিহ্নিত রেখার উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম রেখার সর্বকনিষ্ঠ শিশুরা, দ্বিতীয় রেখায় তদূর্ধবয়স্ক বালকগণ, তাহার পশ্চাতে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীগণ দণ্ডায়মান হইলেন। নারীদিগের জন্য অর্ধবৃত্তাকার রেখাগুলির বাহিরে এক পার্শ্বে, শিক্ষকদিগের নিমিত্ত অপর পার্শ্বে এবং বহিরাগতদিগের জন্য বৃত্তরেখার সম্মুখে সরল রেখায় দণ্ডায়মান হইবার জন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এই সকল রেখা নির্দিষ্ট সারের বাহিরে কাহাকেও অসংলগ্নভাবে অবস্থান করিতে দেখি নাই। মাল্যদানের পরে শঙ্খধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলিত হইল। তদনন্তর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হইলে সেখানকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এই প্রাঙ্গণ হইতে তখন সকলে পদব্রজে সভাগৃহে গমন করিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত অগ্রবাল পহেলা আগস্ট কি জন্য পালন করা হইতেছে, সাতই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথি, পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস এবং নানা কারণে আগস্ট মাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিজন্য গুরুত্বপূর্ণ; দেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে আমাদিগের কর্তব্য, স্বাধীনতালাভ করিলে প্রত্যেক নাগরিকের কিরূপ প্রবুদ্ধ চেতনা ও দায়িত্ববোধ আবশ্যক সে সম্বন্ধে বলেন।

সভার পরে আমাদের কর্মসূচীতে উত্তর বনিয়াদী শিক্ষা বিভাগ দর্শন করিবার কথা লিখিত ছিল সুতরাং যথাকালে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। এই বিভাগের লক্ষ্য হইল শিক্ষার্থীগণকে নিজের নিজের গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী করা। গৃহ হইতে যতদূর সম্ভব কোনরূপ সাহায্য না লইয়া যাহাতে তাঁহারা স্ব স্ব ব্যয় বহন করিতে পারেন তজ্জন্য বিদ্যালয়ে কৃষি গোপালন বয়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কার্যের ভিতর দিয়া সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত তাঁহাদিগকে পরিচিত করাও এই বিভাগের উদ্দেশ্য। কৃষিকার্যের জন্য ভূমি বলদ লাঙ্গল, গোপালনের জন্য গাভী গোশালা, সুতা কাটাই ও বয়নের জন্য চরকা তাঁত ও অন্যান্য সরঞ্জাম প্রভৃতির নিমিত্ত যে মূলধন আবশ্যক হইয়াছে তাহা বিদ্যালয় হইতেই দেওয়া হইয়াছে। বনিয়াদী বিভাগে প্রস্তুত বয়নশিল্পের দ্রব্যের সহিত এই বিভাগে উৎপন্ন সামগ্রীর কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিলাম না।

অপরাহ্নে আমরা নিখিল ভারত কাটুনি সংঘ বিভাগ দেখিতে গেলাম। সম্পূর্ণ ব্যবসায় নীতিতে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইলেও সেখানে শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও আছে। কাটাই ও বয়নের যাবতীয় কার্য কুটির শিল্পোপযোগী পদ্ধতিতে কি করিয়া প্রবর্তন করা যাইতে পারে এই বিভাগ তাহার সমাধানে

নিযুক্ত আছেন। হাতে কাটা সুতার পাক সাধারণতঃ সর্বত্র সমান হয় না, একারণ সেই সুতায় বয়নের কাজ মিলে প্রস্তুত সুতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া থাকে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য দুই বা তদধিক সুতা একত্রে পাকাইয়া লইবার নিমিত্ত একটি কাঠের তৈয়ারী যন্ত্র উদ্ভাবন করা হইয়াছে দেখিলাম। দুই তিনটি এইরূপ যন্ত্র সেখানে আছে। খাদি শিল্পে ইহার ব্যাপক ব্যবহার কতদূর সফল হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করা হয় নাই। অনূ্যন পাঁচশত শিল্পী কাজ করিতে পারেন সমগ্র শিল্পশালায় এরূপ স্থান আছে। আনুমানিক একশত জনকে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত থাকিতে দেখিলাম। ইহার মধ্যে প্রায় সত্তর আশি জন আশ্রমের অধিবাসী। তুলার বীজ নিষ্কাসন হইতে আরম্ভ করিয়া বস্ত্র বয়ন পর্যন্ত যাবতীয় কার্যে মজুরীর হার এই বিভাগ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেই হার অনুসারে উপার্জনেচ্ছু ব্যক্তিগণ উপার্জনের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। উৎপন্ন নানাবিধ বস্ত্রে রং করিবার জন্য যে রঞ্জক দ্রব্য ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা বিদেশী। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম দেশী রং সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত করিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই। বস্ত্রে রঙের ব্যবহারে শিল্পীদিগের অবাধ স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়।

পরদিন অর্থাৎ দোসরা আগস্ট প্রাতে আমরা আপন আপন দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইলাম কারণ ঐদিনই অপরাহ্ণে আমাদিগকে মগনওয়াড়ি যাত্রা করিতে হইল। তাহার পরে মহাত্মাজী যে কুটিরে বাস করেন তাহা দেখিতে যাই। মহাত্মাজী তখন আশ্রমে ছিলেন না সুতরাং শূন্য কক্ষই দর্শন করিলাম। কুটিরটি একান্ত সাধারণ ধরণেরই। প্রবেশ পথ ও গৃহের সম্মুখস্থিত ক্ষুদ্র বারান্দাটি বাঁশের ঝাঁপ দিয়া ইচ্ছামত উন্মুক্ত ও বন্ধ করা যায়। ঝাঁপগুলির একপ্রান্ত গৃহের আচ্ছাদনের সহিত রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। অপর প্রান্ত উঁচু করিয়া ভূমি সংলগ্ন দণ্ডের উপর চাপাইয়া ঝাঁপ উঠাইয়া রাখা যায়। এই গৃহের মেঝে মাটির, ভূমি হইতে আন্দাজ একহাত মাত্র উচ্চ, দেওয়ালও মাটির। গৃহে কোন আসবাবপত্র নাই বলিলেও চলে। একধার খোলা এইরূপ তিন চারিটি ছোট প্যাক বাক্স উপর্যুপরি সাজাইয়া একটি দেরাজ প্রস্তুত করিয়া ঘরের এক কোণে রাখা হইয়াছে। আর এক কোণে ঐ কাঠেরই আন্দাজ দুই হাত উচ্চ ও দেড় হাত প্রস্থ একটি আলমারি আছে। মাটিতে একটি মাদুর পাতিয়া বসিয়া গান্ধীজী কাজকর্ম করেন। এইখানে উচ্চে তাকের উপর একটি বৃহদাকারের তালপত্রের পাখা রহিয়াছে। গান্ধীজী যেখানে বসেন তাহার সন্নিকটেই অন্তরালে তাঁহার সেক্রেটারীর বসিবার স্থান। গৃহের একপ্রান্ত সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র স্নানের ঘর আছে। ইহাই হইল মহাত্মাজীর বাসগৃহ। ইহার পার্শ্বেই আর একটি গৃহে তাঁহার অফিস হয়। বাঁশের জাফরির ফাঁক দিয়া বাহির হইতে এই অনাড়ম্বর গৃহের মধ্যে কিছু কাগজপত্র ও সামান্য কয়েকটি আসবাব ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করিলাম না। বাসগৃহের অনতিদূরে কয়েকটি বৃক্ষ আছে। একটি বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি প্রতিদিন সান্ধ্যোপাসনা করেন, তাহার সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে আশ্রমবাসিগণ প্রার্থনার সময় সমবেত হন।

এইস্থান দর্শন করিয়া আমরা সভাগৃহে যাই। শিক্ষার্থীদিগের উপর আশ্রমের যে নানা কার্যের ভার ন্যস্ত থাকে তদ্বিষয়ে বিবরণী পাঠ ও তাহা লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক করিবার জন্য তখন ঐ গৃহে একটি সভা হইতেছিল। আশ্রমজীবনের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য একটি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিবার প্রথা আছে। মধ্যে মধ্যে মন্ত্রী পরিবর্তন হয়। খাদ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পানিমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন মন্ত্রী শিক্ষার্থিগণের ভিতর হইতে তাঁহাদিগের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। প্রত্যেক মন্ত্রীকে তাঁহার আপন বিভাগের সকল খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হয়। কোন ত্রুটি ঘটিলে প্রতিকারের কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাঁহার বিভাগের কার্য কি ন্যায় হইয়াছে, কার্যভার গ্রহণের সময় তাঁহার নিকট কি কি দ্রব্য কি পরিমাণে দেওয়া হইয়াছিল, কার্যকাল অন্তে কি অবশিষ্ট আছে ইত্যাদি নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেককে বিবরণী লিখিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁহার বিবরণীতে কোন তারিখে তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কার্যভার গ্রহণের সময় পূর্ববর্তী মন্ত্রীর নিকট হইতে তিনি ক্লোরিন, ফিনাইল, থার্মোমিটার ইত্যাদি কোন দ্রব্য কি পরিমাণে পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলেন। কার্যকালে কয়জন কি রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইল, ম্যালেরিয়া প্রভৃত সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিহত করিবার নিমিত্ত কি প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা হইল, পানীয় জল বিশোধনের জন্য কি প্রচেষ্টা হইয়াছে, কতটুকু কি ঔষধ ও অপরাপর দ্রব্য খরচ হইয়াছে এবং তাহাতে কি অর্থব্যয় হইল ইত্যাদি তিনি বিবরণী হইতে পাঠ করিলেন। সভায় বিবরণী পাঠের পর সমালোচনা ও বিতর্ক হয়, মন্ত্রিগণকে প্রত্যেক প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। বিবরণী সন্তোষজনক না হইলে অনুমোদিত হয় না, অননুমোদিত বিবরণী সংশোধন করিয়া পুনরায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেশ করিতে হয়। এই সভায় আশ্রমের সকলেই উপস্থিত ছিলেন কিন্তু শিক্ষার্থিগণই ইহাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিলেন। ছাত্রপরিচালক সভাপতিত্ব করেন। সভায় কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে তিনি হস্তোত্তলন করেন, পরে সভাপতি তাঁহাকে তাঁহার বক্তব্য বলিতে আদেশ করিলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহা বলেন। যাঁহাদিগের উপর মন্ত্রিত্বের ভার ন্যস্ত থাকে তাঁহাদিগকে দৈনন্দিন অপর কার্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাঁহারা স্ব স্ব কার্যের ভিতর দিয়া নানা জ্ঞান লাভ করেন। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিবিধ মন্ত্রীর দায়িত্ব বহন করিতে দিয়া অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভের সুযোগ দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। সাধারণতঃ যে সমস্ত কাজের জন্য অন্যত্র ভৃত্য নিয়োগ করা হয় তাহা সমস্তই সেখানে আশ্রমবাসিগণ নিজেরাই করিয়া থাকেন। আশ্রমে কোন দাসদাসী নাই।

এই সভাভঙ্গ হইলে আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আশ্রম হইতে রওনা হইবার পূর্বে আমরা শ্রীযুক্ত আর্যনায়কের গৃহে যাইয়া তাঁহার ও তদীয় সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা আশা দেবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলাম। বিদায়কালে তাঁহারা আমাদিগকে বলিলেন, 'আমরা সেবাগ্রামে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শই অনুসরণ করিতেছি। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নূতন কিছু নহে। নানা ব্যবহারিক কর্মের ভিতর দিয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা শিশুরা যে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহাই যে প্রকৃত শিক্ষা একথা রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে বলিয়াছেন। সমাজের মধ্যে যাহারা নিম্নস্তরের তাহাদের শিশুদিগের শিক্ষার জন্য আমরা আমাদের সাধ্যমত রবীন্দ্রনাথের বাক্যকে কার্যে রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছি।'

টাঙ্গা আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা ধীরপদে তাহাতে আসিয়া উঠিলাম। আশ্রমবাসীদিগকে শেষ অভিবাদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গা ছাড়িয়া দিল। আশ্রম পরিবেষ্টনীর পরিবর্তে ধীরে ধীরে ওয়ার্ধার দিগন্ত প্রসারিত সবুজ তরঙ্গায়িত মাঠ আমাদিগকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মেঘ আকাশ আবৃত করিয়াছিল, তাহার ফাটল দিয়া অস্তরবির স্বর্ণরশ্মি ধরিত্রীর বুকের পরে ঝরিয়া পড়িতেছিল। দিগন্তের কোলে নীরদবর্ণের গিরিরাজি দূরে ঘনবনানী, রৌদ্র ছায়ার আলিম্পনে তাহার বর্ণ কোথাও হরিৎ কোথাও ঘন নীল। বিচিত্র গঠনের উপলসমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, তাহাদের শুভ্রতা মাঠের বনের পাহাড়ের আকাশের বর্ণকে নিবিড়তর করিয়া দিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেবাগ্রামের শেষ চিহ্নটুকুও আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার সুর আমার অন্তরের সপ্ততন্ত্রীতে ধ্বনিতে থাকিল।

(পূর্বানুবৃত্তি)

[৩]

মফঃস্বলে পল্লীজীবনের যেটা এতদিন ধরে' ছিল সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং অসুবিধা,—অর্থাৎ বাধ্য হ'য়ে জোর-করা আত্ম-সংযমের অভ্যাস, সেটার প্রয়োজন আর রইল না। ইউজিনের চিত্তে এখন আর কোনো উদ্বেগ নেই। মনের স্থৈর্য এবং স্বাধীন চিন্তায় এখন আর কোনো ব্যাঘাতই ঘটছে না। সহজ এবং সুস্থভাবে এখন আবার নিজের সমস্ত কাজ-কর্মে মন দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু মুশ্কিল হচ্ছে এই, বৈষয়িক ব্যাপারে ইউজিন স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়িত করেছে এবং তার আনুষঙ্গিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সেটা মোটেই সহজ নয়। রীতিমত কঠিন কাজ। কখনো কখনো মনে হ'ত ইউজিনের, যে শেষ পর্যন্ত এ কাজ তার পক্ষে সম্ভবপর হ'য়ে উঠবে না। হয়তো অবশেষে তাকে তালুকটি বিক্রী ক'রে ফেলতে হ'বে। তাহ'লে তো তা'র এতদিনের অক্লান্ত চেষ্টা পণ্ডশ্রম হ'য়ে দাঁড়াবে। তখন দাঁড়াবে এই যে, সে কৃতকার্য হ'তে পারল না,—যে গুরুভার ভবিষ্যতের আশায় একদিন আপন হাতে সে তুলে নিয়েছিল, তাতে সমাপ্তির ছেদ টানবার মতো তার সামর্থ্য আর নেই। ভবিষ্যতের এই চিন্তাই তাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ক'রে তুলল। একটা গোলমালের জের মিট্তে না মিট্তেই, আর একটি গোলমালের সূত্রপাত হয়। শুরু হয় নতুন ক'রে দুশ্চিন্তা, অভাবিতের আকস্মিক আবির্ভাবে।

জমিজমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার পর থেকেই একটা না একটা দুর্ঘটনা লেগেই আছে। পিতার দেনার দায় একটির পর একটি হুড়মুড় ক'রে এসে তার ঘাড়ে পড়তে লাগল,—যে সমস্ত ঋণের কথা সে তো জানতোই না, কল্পনাও করেনি। সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, তার বাবা ডাইনে-বাঁয়ে, সব জায়গাতেই ধার করেছিলেন। মে মাসে যখন দেনা-পাওনা সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল, ইউজিন ভেবেছিল এবং আশাও করেছিল যে, জমিদারির খুঁটিনাটি তা'র নখদর্পণে এসে গেছে। কিন্তু হঠাৎ, গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে, একখানা চিঠি তা'র হস্তগত হ'ল। তাই থেকে বোঝা গেল যে, ইসিপোভা নামে এক বিধবার কাছে তার বাবার বারো হাজার রুব্ল পরিমাণের এক দেনা এখনও বাকী রয়ে গেছে, মেটানো হয়নি। অবিশ্যি এ দেনার প্রমাণ হিসেবে কোনো হাত-চিঠা ছিল না। ছিল একখানা সাধারণ রসিদ মাত্র,—যে'টা ইউজিনের উকিল মহাশয় বললেন, অনায়াসেই অস্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে রসিদখানাকে যে অগ্রাহ্য ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায়, মাত্র এই কারণেই পিতৃকৃত ঋণকে অস্বীকার করবার মতো বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি ইউজিনের মাথায় এল না। কেবল একটা জিনিস সে নিশ্চিত ক'রে জানতে চায়, যে এ দেনা তা'র বাবা সত্যিই ক'রে গেছেন কি না।

একদিন যথানিয়মে খাবার টেবিলে বসতে গিয়ে সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল,

'আচ্ছা মা, এই কালেরিয়া ইসিপোভা নামে স্ত্রীলোকটি কে?'

'কে? ইসিপোভা? তোমার ঠাকুর্দা তাকে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু কেন বলতো?

ইউজিন চিঠির সব কথাই খুলে বলল মাকে।

'কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে, যে এই টাকা আবার চাইতে তার একটুও লজ্জাবোধ হ'ল না! তোমার বাবা তো তার জন্যে অনেক কিছু ক'রে গেছেন!'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, মা, যে এটাকা কি সত্যিই আমরা তাঁর কাছে ধারি?'

'তা—সে এখন সঠিক কি করে বলি বলো? তবে একে ঋণ বলা যায় না। তোমার বাবার ছিল দয়ার শরীর......।'

'বুঝলুম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাবা কি এটা ধার মনে করেছিলেন?'

'তা আমি বলতে পারি না,—মানে, জানি না। খালি এইটুকু জানি আর বুঝতে পারছি, যে ও-দেনাটা বাদ দিলেও এমনি তোমার পক্ষে চালানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার.....'

ইউজিন বেশ বুঝতে পারল, যে মেরী পাভ্লোভ্না কি যে বলবেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই ছেলের মনোভাব আঁচ করে কথা বলছেন মাত্র।

ছেলে জবাব দিল, 'তুমি যেটুকু বললে, মা, তাই থেকে অন্ততঃ বোঝা গেল যে, টাকাটা শোধ করতেই হবে। কালই যাব তার ওখানে। কথা বলে দেখবো একবার, দেনাটাকে আরও কিছুদিন স্থগিত রাখা যায় কি না।'

'তোমার অদৃষ্ট। তবে তুমি যা বলছ ও করতে চাইছ, আমার মনে হয় সেইটাই সব চেয়ে ভালো। আর তাকে জানিয়ে দিয়ো যে সবুর তাকে করতেই হবে।'

মেরী পাভ্লোভ্না এইটুকু বলে ক্ষান্ত হলেন। মনে তাঁর অসীম শান্তি। ছেলে যে বিবেক বুদ্ধিতে এই সিদ্ধান্ত করেছে, তাতে তাঁর যথেষ্ট গর্ব বোধ হল।

ইউজিনের বর্তমান সাংসারিক অবস্থা সত্যিই তাকে উভয় সঙ্কটে ফেলেছে। আরও মুস্কিল হয়েছে এই যে মা রয়েছেন তার সঙ্গে। তিনি ঠিক অনুমান করতে পারছেন না ছেলের দুরবস্থা। সারাটা জীবন তিনি কাটিয়েছেন এক ভাবে। আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত জীবন গড়ে তুলেছে তাঁর স্বতন্ত্র মন আর দৃষ্টি। তাই তিনি ধরতেই পারেন না ছেলে কি গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মাথাতেই ঢোকে না কোনো বিপদ, অথবা বিপর্যয়ের পূর্বাভাষ। যদি এমন কোনোদিন আসে, আজই হোক আর কালই হোক, যখন অবস্থার ফেরে সংসারে আশ্রয় বলতে আর কিছুই থাকবে না, মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও মিলবে না,—ভিটেমাটি সব কিছু বিক্রী করে ছেলেকে চলে যেতে হবে আর ইউজিনের নিজের রোজগার অথবা মাইনে—তা' বড় জোর বছরে হাজার দুই রুবল—এরি ওপরে নির্ভর করে ছেলের আশ্রয়ে তাঁকে বাকি জীবন কাটাতে হবে,—এই সব কথা তাঁকে মোটেই চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন করে না। এই নিশ্চিত সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হলে একমাত্র উপায় হ'ল কঠিন শৃঙ্খলা—সব কিছু খরচ কমানো এবং বাঁচিয়ে চলা। এই সহজ, বাস্তব সত্য কথাটি তিনি বুঝেও বোঝেন না। তাই তিনি ধারণা করতে পারেন না ইউজিন কেন আজ-কাল এতো হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে,—কেন সে সমস্ত ব্যাপারে, মালী- চাকর-সহিসদের মাইনে, এমন কি খাইখরচ প্রভৃতি সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়েও এতটা সতর্ক হয়ে চলেছে। তা ছাড়া আর পাঁচজন বিধবার মতন স্বর্গত স্বামী সম্বন্ধে তাঁর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। যদিও পতির জীবদ্দশায় স্ত্রীর এতোখানি নিষ্ঠা দেখা যায়নি, তবু বৈধব্যে সে মনোভাব এখন

সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে। তাই স্বামী যা করে গেছেন, যে বিধি-ব্যবস্থা চালু করে গেছেন, তা যে ভুল বা অন্যায় হওয়া অস্বাভাবিক নয় কিংবা তার কোনো রদ-বদল হতে পারে, একথা তিনি মনেও স্থান দিতে পারেন না।

অনেক ভেবে ও কষ্ট করে সংসার চালায় ইউজিন। মাত্র দু জন কোচম্যান ও সহিস দিয়ে আস্তাবল পরিষ্কার আর দু জন মালীর সাহায্যে বাগান-বাড়ী আর সংলগ্ন জমি ও বাগিচাগুলো পরিচ্ছন্ন অবস্থায় টিকিয়ে রাখা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

মেরী পাভ্‌লোভ্‌না কিন্তু সরল মনেই বিশ্বাস করেন যে তিনি আদর্শ জননী। ছেলের মুখ চেয়ে তিনি অনেকখানি আত্মত্যাগ করছেন। বুড়ো পাচক যা রেঁধে দেয়, তাই তিনি অম্লান বদনে মুখে তুলছেন। বাগানটা ভালো মত পরিষ্কার হয় না, সরু পথগুলো আগাছায় ভরে গেছে। বাড়ীতে একটাও খানসামা নেই, মাত্র একজন বালক-ভৃত্য। এতে সম্ভ্রম রক্ষা করা দায়। তবু, এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তো কোনো নালিশ জানান না। নানান অসুবিধার মধ্যে বাস করেও ছেলেকে কোনো অভিযোগ না করে তিনি তো মায়ের যথাকর্তব্যই পালন করছেন।

তাই এই নতুন দেনার খবর যখন পাওয়া গেল, ইউজিন দেখল সর্বনাশ। তার সব-কিছু আশা-ভরসা, পরিকল্পনা বাতিল হবার জোগাড়। এ দেনা মিটিয়ে আবার সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতন সামর্থ্য আর অবকাশ আর মিলবে কি না সন্দেহ। মেরী পাভ্‌লোভ্‌না কিন্তু অত-শত বুঝলেন না। তিনি এটাকে নিলেন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা হিসেবে, যে ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউজিনের সচ্চরিত্র, তার আন্তরিক মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। তার বেশি কিছু নয়। তা ছাড়া ছেলের সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে মায়ের মনে কোনো দুশ্চিন্তার বালাই ছিল না। তিনি ভাবতেন আর মনেমনে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন যে ইউজিনের বিয়ে হবে একটা মস্ত সার্থক ব্যাপার। সে বিয়েতে ঘরে আসবে অনেক ধন-দৌলত, আসবে প্রতিষ্ঠা। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন দশ বারো ঘর ভদ্র পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, যারা এই বংশে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সৌভাগ্য বলেই মনে করবে। তাই আর দেরি না করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ইউজিনের বিয়েটা চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

মেরী পাভ্‌লোভ্‌না ভাবতে থাকেন।

(৪)

ইউজিন নিজেও ভাবে। প্রায়ই ভাবে নিজের বিয়ের কথা। তবে মা যেমন করে ভাবেন আর দেখেন বিয়ে-ব্যাপারটা, তেমন করে কখনোই নয়। বিবাহ জিনিষটাকে সাংসারিক সুবিধা ও সচ্ছলতার কৌশল বা উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধে তার রুচিতে ও বিবেকে। বিয়ের সাহায্যে নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেওয়া অথবা বর্তমানে কোনো উন্নতির ব্যবস্থা করে নেওয়া, একথা ভাবতেও তার মন ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে যায়। ইউজিনের মনোগত অভিপ্রায় এবং কামনা হ'ল কাউকে ভালোবেসে সম্মানজনক প্রস্তাবে তাকে বিয়ে করা। ইতিমধ্যে যেসব মেয়েদের সঙ্গে তার পূর্বেই আলাপ ছিল কিংবা যাদের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়েছে, সম্প্রতি মনে মনে নিজেকে তাদের সঙ্গে তুলনা করত, বিচার করত আপন মনেই পরস্পরের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিয়ে। এদিকে কিন্তু স্টীপানিডার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কটা তখনও চলেছে, এমন কি একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত এসে দাঁড়িয়েছে। এতখানি যে দাঁড়াবে, সে কথা পূর্বে ইউজিন ভাবেনি, অনুমানও করতে পারেনি। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এখন তাই।

ব্যভিচারের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক ইউজিনের কখনোই ছিল না। তার ওপর চরিত্রে ও প্রকৃতিতে সে কামুক স্বভাবের মানুষ নয়। যে জিনিষটা সে খারাপ বলে ভাবত বা জানত সে কাজটা গোপনে লুকিয়ে-চুরিয়ে সেরে নেওয়া তার ধাতে নেই। তাই প্রথম প্রথম স্টীপানিডার সঙ্গে গোপন মিলনের ব্যবস্থা সে নিজে থেকে কোনো দিনই করতে পারেনি। প্রথম দিন স্টীপানিডার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর ইউজিন ভেবেছিল, এই শেষ! কিন্তু দেখা গেল, তা হয় না। কিছুদিন যেতে না যেতেই ইউজিন লক্ষ্য করল যে সেই একই কারণে একই ধরণের একটা দৈহিক অস্বস্তি আর মানসিক অপতৃপ্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, তাকে পীড়িত করে তুলছে।

ইউজিন এবার স্পষ্টই বুঝতে পারল আকর্ষণটা কোথায় এবং কী ধরণের। যে অস্বস্তির চাপা গুমোটে মন আর শরীর উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে, সেটার উৎপত্তি হল একজন বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ আবেদন। সে আকর্ষণ নৈর্ব্যক্তিক নয়, দেহ-নিরপেক্ষও নয়। সে আকর্ষণ ইঙ্গিত-বাহন। সঙ্গে টেনে আনছে সেই উজ্জ্বল কালো চোখের চঞ্চল তারা দুটি, সেই ভরাট গলার ঈষৎ কম্পমান আওয়াজ—'কতোক্ষণ হ'ল দাঁড়িয়ে আছি!' মনে পড়ে যাচ্ছে বারে-বারেই সেই তাজা, আঁট-সাট জীবন্ত তনুদেহের পরিচিত সৌরভ। চোখের সামনে যেন ভাসতে থাকে কোমরে আঁট-করে বাঁধা সেই ছোট গাউনের বুকের কাছটায় একটু উঁচু হয়ে ওঠা সুডোল স্তনাগ্র-চূড়ার নিটোল আভাস। আর চারদিকে ঝক্‌ঝকে হলুদ তবক-মোড়া সোনালী রোদের থর থর ঝাঁঝের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সেই ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত হেজেল ও মেপ্‌ল্ গাছের ঝোপ।

তাই নিতান্ত লজ্জায় সংকুচিত হয়ে এলেও মন তার আবার ছুটল। ইউজিন আবার এগিয়ে গেল বুড়ো দানিয়েলের সন্ধানে। (ক্রমশ)

শ্রীযুক্ত সতীন সেন বরিশালের অন্যতম কংগ্রেস নেতা। তিনি গত ৮ই নবেম্বর যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—

পূর্ব্ববঙ্গে যদি শান্তি বিরাজিত আছে বলিতে হয়, তবে সে শান্তি মৃতের শান্তি।

তিনি বলিয়াছেন, নিখিল ভারত সম্পর্কিত, প্রাদেশিক ও স্থানীয় কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে নির্বিঘ্নতার ভাব দেখা যাইতেছে না এবং লোক স্থান ত্যাগ করিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের অত্যাচারের ভয়ে পুলিসে এজাহার দিতে সাহস করে না—অত্যাচার নীরবে সহ্য করে—পাছে শান্তি নষ্ট হয়। মিস্টার জিন্না প্রমুখ মুসলীম লীগ নেতৃগণের কথা অনুসারে পূর্ব্ববঙ্গে কাজ হইতেছে না।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে সরকারের কর্মচারীরা কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিজস্ব সংবাদদাতার গত ৬ই নবেম্বর ঢাকা হইতে প্রেরিত সংবাদে জানিতে পারিঃ—

"দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টের একোমোডেশন অফিসার মিঃ আবতাব মহম্মদ খাঁ 'আনন্দবাজার' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'এর ঢাকা অফিসকে বর্তমান বাড়ি হইতে না সরাইয়া ছাড়িবেন না। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ২৬নং পুরাণা পল্টনস্থিত 'আনন্দবাজার' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'এর ঢাকা অফিস বাড়িটি একোমোডেশন অফিসার রিকুইজিশন করেন। ঐ বাড়িটি ৪ কোঠাযুক্ত একটি ছোট একতলা বাড়ি। ইহা 'আনন্দবাজার' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'এর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অফিস ও বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হয়। উক্ত অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীযুত উষারঞ্জন রায় এই সম্পর্কে একোমোডেশন অফিসারের নিকট এই মর্মে আবেদন করেন যে, ঐ এলাকাটি সেক্রেটারিয়েট, অন্যান্য গভর্নমেণ্ট অফিস, মন্ত্রীদের বাসস্থান, ডাক তার ও টেলিফোন অফিসের নিকটে এবং সাংবাদিক হিসাবে কাজ করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। সুতরাং প্রার্থনা করা হয় যে, বাড়িটি রিকুইজিশনমুক্ত করিয়া তাঁহাকে যেন বিনা বাধায় সাংবাদিকের কর্তব্য করিতে দেওয়া হয়। শ্রীযুত রায় আরও বলেন যে, বাড়িটি ভাড়া নিয়াছেন—'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' এবং ইহা তাঁহাদেরই দখলে আছে। বাড়িটিতে তাঁহার ব্যক্তিগত দখল নাই।

শ্রীযুত রায় ঐ মর্মে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকট এবং জনস্বাস্থ্য সচিব মৌলবী হবিবুল্লা বাহারের নিকট আবেদন করেন। প্রধান মন্ত্রী এখনও শ্রীযুত রায়ের আবেদনের উত্তর দেন নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

"কিন্তু ইতিমধ্যে গতকল্য সন্ধ্যায় লালবাগ থানা হইতে একজন পুলিস কর্মচারী শ্রীযুত রায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত রায়ের বাসস্থানে গিয়া শ্রীযুত রায়ের ভ্রাতাকে বলেন, আজই তিনি শ্রীযুত রায়ের জিনিষপত্র ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিবেন। যাহা হউক, তিনি (পুলিস কর্মচারী) শ্রীযুত রায়কে বাড়ি ত্যাগ করার জন্য আরও দুই দিনের সময় দিতেছেন।"

এইরূপ অবস্থায় যদি পূর্ব্ববঙ্গের মফঃস্বলের অধিবাসীরা আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতে না পারে এবং দলে দলে পাকিস্থান ত্যাগ করে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে?

মুসলিম লীগের ছত্রচ্ছায়ায় হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া মুসলমানরা কিরূপ মনোভাবসম্পন্ন হইয়াছেন, তাহা মুসলমানে মুসলমানে মতভেদের শোচনীয় মতভেদের পরিণাম দ্যোতক একটি সংবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায়—

"কুষ্ঠিয়া, ৯ই নবেম্বর—কুষ্ঠিয়ার নিকটবর্তী বিষ্টুদিয়া গ্রামের প্রভাবশালী মুসলমান জোতদার মৌলবী ফজলর রহমানকে গত ৩রা নবেম্বর রাত্রিতে খুন করা হইয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, মৃতব্যক্তি তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত মসজিদে প্রার্থনা করিতে যাইবার সময় শুনিতে পান যে, সন্নিহিত গৃহে এক দল মুসলমান গ্রামোফোন বাজাইতেছে। তাঁহার প্রার্থনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাজনা বন্ধ রাখিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে অনুরোধ করেন। তাহারা তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। ইহার ফলে মৃতব্যক্তির সহিত উক্ত দলের ঝগড়া হয়। মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় উক্ত দলের লোকদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় তাঁহাকে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া হত্যা করা হয়। এ সম্পর্কে পুলিস দুইজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

"ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার" এই সংবাদ সত্য হইলে বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুদিগের উপর অসমর্থনীয় আন্দোলনে অভ্যস্ত হইয়া মুসলমানরা এখন মুসলমানদিগের সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে যাইয়া বিপন্ন হইতেছেন।

কুমিল্লায় পাকিস্থান সরকারের কর্মচারীরা রামমালা ছাত্রাবাস—দাতব্য প্রতিষ্ঠান অধিকার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ছাত্রাবাসটি পরলোকগত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং উহাতে একশত ২৫টি ছাত্রকে রাখিয়া বিনামূল্যে আহার্য ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। কাজেই ইহা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান।

ময়মনসিংহ জিলার খারুয়া গ্রাম হইতে সংবাদপত্রে জানান হইয়াছেঃ—

"গত ১০ই কার্তিক রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ময়মনসিংহ জিলার নান্দাইল থানার অন্তর্গত খারুয়া গ্রামের জনৈক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে বাড়ির পুরুষদিগের অনুপস্থিতির সুযোগে ৪০।৫০ জন দুর্বৃত্ত আসিয়া স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করে, বহু জিনিসপত্র নষ্ট করে এবং লুঠ করিয়া লইয়া যায়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ হাজার টাকা। এই ঘটনায় স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।"

তাহাদিগের আতঙ্ক যে অসঙ্গত নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্থানের ষড়যন্ত্র সুপ্রকাশ হইয়াছে। ত্রিপুরা সামন্ত রাজ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার তথায় (কাশ্মীরেরই মত) সেনাদল প্রেরণ প্রয়োজন মনে করেন। কিন্তু শুনা যাইতেছে, ত্রিপুরার সংবাদ কলিকাতায় আসিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংবাদ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারী (বৃটিশ আমলাতন্ত্রের শিক্ষায় শিক্ষিত ও সিভিল সার্ভিসে চাকুরীয়া) ঐ সংবাদ প্রচার নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। যদি ইহা সত্য হয়, তবে হিন্দুর পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কলিকাতায় ও ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রচার নিষিদ্ধ করিয়া যিনি সত্য গোপন করিয়া শান্তিরক্ষার অজুহাত দেখান তিনি কি তাঁহার পদের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন? সর্দার বল্লভভাই পেটেল কি এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে কোন কথা বলিয়াছেন?

পূর্ব পাকিস্থানের সরকারের সম্বন্ধে অভিযোগ—গত ৭ই নবেম্বর একখানি অতিরিক্ত মালগাড়ী ট্রেনে কয়েক লক্ষ টাকার রেলের উপকরণ পাকিস্থানে সরান হইতেছিল। মাজদিয়ায় সন্দেহক্রমে উহা ধরিয়া ফেলা হয়। গত ৯ই নবেম্বর কাঁচড়াপাড়া স্টেশনের উত্তরের হিন্দুস্থানের রেল লাইন ভারত সরকারের অধীনে আনা হইয়াছে। এই ঘটনা তাহার দুইদিন পূর্বের।

রাণাদিয়া হইতে কোন ভদ্রলোক "আনন্দবাজার পত্রিকায়" পত্র লিখিয়াছেনঃ—

"আমাদের বাড়ী বিক্রমপুরের লৌহজঙ্গ থানার অন্তর্গত রাণাদিয়া গ্রামে। আমাদের বাড়ী শ্যামবাবুর বাড়ী নামে পরিচিত। আমরা বাড়ীতে ৩।৪ জন লোক থাকি; বাকী লোক

মেয়ে ও ছেলেদিগকে নিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যায়। এই সুযোগে গত ২০শে আশ্বিন হইতে ২৩শে আশ্বিন পর্যন্ত চারি রাত্রিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দলে দলে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া ঘরের তালা ভাঙিয়া বহু মূল্যবান তৈজসপত্র নিয়া যায়। যে কয়জন লোক আমরা বাড়ীতে ছিলাম তাহাদিগকে কিছু বলায় তাহারা আমাদিগকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমরা অনেক কষ্টে প্রাণে বাঁচিয়াছি। কয়েকদিন পূর্বে আমাদের বাড়ীর কয়েকজন লোক প্রয়োজনীয় মালপত্র নিবার জন্য কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল। তাহারা যখন মালপত্র নৌকায় ভরিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে, সে সময় কতিপয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দুষ্ট লোক তাহাদের নৌকা আটক করে এবং তাহাদের নিকট হইতে জোর করিয়া এইরূপ লিখাইয়া লয় যে,—'আমরা স্বেচ্ছায় এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় আমাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেছে না।' পরে তাহাদের নিকট হইতে জোর করিয়া কিছু টাকা লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দেয়।"

পাকিস্থান সরকার এইরূপ কার্যের প্রতীকার করিতেছেন না। সুতরাং পাকিস্থান বঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের অবস্থা শোচনীয় এবং তথায় যে শান্তির কথা আমরা শুনিতেছি, তাহা শ্রীযুত সতীন সেনের কথায়—মৃতের শান্তি।

অথচ পশ্চিম বাঙলার সরকার পূর্ববঙ্গ হইতে আগতদিগের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। সেদিন কলিকাতা বড়বাজারে মাহেশ্বরী ভবনে পশ্চিম বঙ্গের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকমল রায় বলিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গ পরিদর্শন ফলে তিনি বলিতে পারেন, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এই কয়টি জেলায় এবং নদীয়ার ও যশোহরের যে অংশ পশ্চিম বঙ্গভুক্ত হইয়াছে তাহাতে এত "পতিত" জমী আছে যে, তাহাতে পূর্ববঙ্গের সকল হিন্দুকে পুনর্বসতি করান সম্ভব। স্থানের অভাব নাই। কেবল তাহারা এখনই আসিলে তাহাদিগকে আহার্য প্রদানের উপায় বাঙলা সরকার কেন্দ্রী সরকারের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া করিতে পারিবেন না। কাজেই ভারত সরকার না বলিলে তিনি যেমন পূর্ববঙ্গের নির্যাতনপীড়িত হিন্দুদিগকে প্রকাশ্যভাবে পশ্চিম বঙ্গে আসিতে বলিতে পারেন না, তেমনই কেন্দ্রী সরকার পাঞ্জাবে যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া আহার্যের অভাব পূর্ণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে তিনি পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগকে চলিয়া আসিতে বলিতেও অক্ষম।

কিন্তু এই বিষয়ে বাঙলার লোক বিপন্ন। কারণ, কেন্দ্রী সরকার বলিতেছেন, পশ্চিম বঙ্গের সরকার যখন অধিবাসী বিনিময়ের কথা বলিতেছেন না, তখন তাঁহারা সেকথা বলিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন কেন? আবার পশ্চিম বঙ্গের সরকার বলিতেছেন, ভারত সরকার না বলিলে তাঁহারা কেন ও কিরূপে অধিবাসী বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন? এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বিপন্ন হইতেছেন।

দেশ বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিবার সময়েই মিস্টার জিন্না বলিয়াছিলেন, অধিবাসী-বিনিময় দুঃসাধ্য নহে। অধিবাসী-বিনিময় হইলে পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুরা ক্ষতিপূরণ পাইতেন। এখন যাঁহারা—বাধ্য হইয়া—স্থানত্যাগ করিতেছেন, তাঁহারা পাকিস্থান সরকারের নিকট কোনরূপে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারেন না। মুসলমানরাও তাঁহাদিগের সম্পত্তি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে অধিকার করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহারা সম্পত্তি বিক্রয় করিলেও উপযুক্ত মূল্যলাভের আশা করিতে পারেন না।

প্রতিদিন যে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা স্থানত্যাগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। শ্রীযুত সতীন সেন তাঁহার বিবৃতিতে অবশ্য-স্বীকার্য সত্য বলিয়াছেন।

সেই অবস্থায় অধিবাসী-বিনিময়ের বিষয় কখনই উপেক্ষণীয় বলা যায় না।

অবশ্য বিবেচনা করিয়া আমরা এক বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারি না। পশ্চিম বঙ্গে এখনও কিজন্য মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড নিষিদ্ধ করা হইতেছে না? তাহারা কি পাকিস্থানের ও মুসলিম লীগের আনুগত্যই স্বীকার করে? কাজেই তাহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত নহে। সে অবস্থায় তাহারা কি কারণে নিষিদ্ধ হইবে না? যদি তাহারা বলে, তাহারা জনহিতকর কার্যেই ব্যাপৃত থাকিবে, তবে কি তাহাদিগকে "শান্তিসেনা" দলে যোগ দিতে বলাই কর্তব্য নহে? তাহারা যদি পাকিস্থানের ও মুসলিম লীগের আনুগত্য স্বীকার না করে, তবে পশ্চিম বঙ্গে কিরূপে তাহাদিগের স্থান হইতে পারে? আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।

পাকিস্থানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। বনগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে যেভাবে পূর্ববঙ্গ হইতে মুসলমান আমদানী অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে "ইনফিলট্রেশন" বলে তাহা হইতেছে, তাহা কি পশ্চিম বঙ্গের সরকার অবগত নহেন? তাহার ফল কি হইতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অবগত হওয়া যেমন প্রয়োজন, সীমান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা করা তেমনই কর্তব্য।

পশ্চিম বঙ্গে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নাই—এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও সহিত আমাদিগের দীর্ঘকালের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণতিলাভ করিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদিগের মনের জন্য মুসলিম লীগের ভক্তদিগের দ্বারা লাঞ্ছিতই হইয়াছেন। কিন্তু 'শহীদ সুরাবর্দী' যখন রাতারাতি জাতীয়তাবাদী হইয়া দেখা দেন তখন যদি আমরা বহুরূপীর বর্ণপরিবর্তন স্মরণ করি, তবে কি তাহা আমাদিগের পক্ষে অপরাধ হইবে? দেশবন্ধু তাঁহাকে আদর দিয়া যেরূপে বিব্রত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্যার আবদুর রহিম মত প্রকাশ করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন জাতি এবং একত্র বাস করিতে পারে না। তাহাই মিস্টার জিন্না পরিবর্ধিত করিয়াছেন এবং তাহারই ভিত্তিতে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত। মিঃ শহীদ সুরাবর্দী তাহারই সমর্থক। তিনি পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার জন্যই কলিকাতায় হিন্দুর বিরুদ্ধে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণা করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে মুসলমান প্রধান মন্ত্রীদিগের মধ্যে তিনিই অগ্রণী ছিলেন। বাঙলায় যখন তিনি "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণা করেন, তখন সিন্ধু প্রদেশেও তাহা হয় নাই। তাহার পরে নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় যে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মুসলমানগণ হিন্দুদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা আচার্য কৃপালনীর বিবৃতিতেই দেখা যায়। সেই মিঃ শহীদ সুরাবর্দী যে শুদ্ধ হইয়াছেন, ইহা সহসা বিশ্বাস করা যায় না। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কৃতকর্মের আইনগত ফল হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য—এ সন্দেহ অনেকে পোষণ করেন। তিনি অল্পদিন পূর্বে কলিকাতায় যে সভা অনুষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ বিশ্লেষণ করিলেও মনে হয়, তিনি তাঁহার মতের পরিবর্তন করেন নাই—এখনও বলিতে চাহেন, হিন্দুরা মুসলমানের উপর অত্যাচার করিতেছেন! তিনি যে এখনও মিস্টার জিন্নার দরবারে আছেন তাহাতেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়! যেরূপ "অপরাধে" মিস্টার জিন্না বাঙলায় মিস্টার ফজলুল হককে দণ্ড দিয়াছিলেন, মিঃ শহীদ সুরাবর্দীর "অপরাধ" কি তদপেক্ষা গুরুতর নহে?

আমরা আশা করি, বাঙালী গভর্নর স্যার রজেন্দ্রলাল মিত্র এ বিষয়ে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলকে উপযুক্ত পরামর্শ দিবেন। বাঙলায় যদি আবার অশান্তি প্রবল হয়, তবে তাঁহাকে সেজন্য বিব্রত হইতে হইবে।

আমাদিগের বিশ্বাস, বাঙলায় মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের স্থান নাই; তাহা নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। বাঙলায় সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় কার্যভার বৃটিশ আমলাতন্ত্রের শিক্ষায় শিক্ষিত সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়াকে দিলে বাঙলার উপকার না হইয়া অপকারই হইবে। তাঁহারা জাতীয়ভাবের অনুশীলন করেন নাই। ত্রিপুরার ব্যাপার বিশেষভাবে বিবেচ্য। মন্ত্রীদিগকে অসহিষ্ণুতা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি কোন সরকারী কর্মচারী মন্ত্রিমণ্ডলের কোন কাজের ত্রুটি দেখাইবার চেষ্টা করেন, তবে তাহা "রাজদ্রোহ" বিবেচনা না করিয়া তাঁহার উপস্থাপিত যুক্তি স্থিরভাবে

বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া গ্রহণ বা বর্জন করাই সঙ্গত।

আমরা জানি, বাঙলার অতি দুর্দিনে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আব্রাহাম লিঙ্কনের উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে—

"To find up the nation's wounds, to care for him who shall have borne the battle and for his widow and children—to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves."

সে কাজ যে ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডের স্পর্শে সম্পন্ন হইতে পারে, কেহ তাহা মনে করেন না। সেইজন্যই লোকের সহযোগ ও সাহায্য লইয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। লোকমত উপেক্ষা করিয়া দল গঠন করিয়া পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিলে বিপরীত ফলই ফলিবে।

বর্তমানে মন্ত্রিমণ্ডল ৩ মাস সম্পূর্ণ কার্য-ভার লাভ করিয়াছেন। তাহারও দেড় মাস পূর্বে তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভার পাইবেন। সেই সময় হইতেই তাঁহারা বাঙলার সর্ববিধ উন্নতির জন্য পরি-কল্পনা রচনায় অবহিত হইবেন—উপযুক্ত লোককে আহ্বান করিয়া সেই কার্যে প্রযুক্ত করিবেন—এই আশাই দেশের লোক তাঁহাদিগের নিকট করিয়াছিল। কারণ, তাঁহারা যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাহা দেশের লোকের উন্নতির জন্য সর্ববিধ ত্যাগস্বীকারের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজও দেশের লোক সেরূপ কোন পরি-কল্পনার আভাস পর্যন্ত পায় নাই। অথচ দেশের বর্তমান দুরবস্থায় সেইরূপ পরি-কল্পনার জন্য লোকের আগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার নির্বাচনের জন্য বীরভূমে যাইয়া ময়ূরাক্ষী নদীর জল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই পরিকল্পনা নূতন নহে—বহুদিনের, কেবল কার্যে পরিণত করা হয় নাই। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিব, সরকারী দপ্তরখানায় যে সকল চাকরীয়া কাজ করেন এবং অনেক অকাজ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপরেই যদি বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল নির্ভর করেন, তবে তাঁহাদিগের ভুল করিবার সম্ভাবনা অধিক হইবে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক কেনাল পরিকল্পনা তাহার প্রমাণ। সেই খাল খননের প্রয়োজন প্রতিপন্ন হয় নাই; কিন্তু বাঙলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড লিটন যখন সেচ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারকে সমতল ভূমিতে সেচ ব্যবস্থা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিলেন, তখন খাল কাটা না হইলেও খাল কাটার জন্য বহু লক্ষ টাকার মাটিকাটা জাহাজ বিলাতে ক্রয়ে বিলম্ব হইল না। সেই "রোণল্ডসে" "ফয়ার্স" প্রভৃতি ড্রেজারের প্রয়োজন বা উপযোগিতা কি তাহা দেখা হইল না। আর যে মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া বিলাতের নির্মাতাদিগকে ধনী করা হইল তাহা সঙ্গত কিনা, তাহাও কেহ দেখিলেন না। শেষে বহু-দিন সেই অব্যবহার্য ড্রেজার রক্ষার জন্য বার্ষিক হাজার হাজার টাকা ব্যয় হইলে বাঙলার লোকের প্রতিনিধি যতীন্দ্রনাথ বসু ব্যবস্থাপক সভায় বলিলেনঃ—সেগুলি ভাঙিয়া ভাঙ্গা লোহা হিসাবে বিক্রয় করিলেও বার্ষিক অপব্যয় হইতে অব্যাহতিলাভ করা যায়।

শিক্ষা সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা রচনার কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি না। যাহাকে "বুনিয়াদী" শিক্ষা বলা হয়, তাহা ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসা পাইয়া বুনিয়াদী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা বাঙলার উপযোগী কিনা, তাহা বিবেচিত হয় নাই। তাহা বিবেচনা করিবার অধিকারী বাঙলার লোক। লর্ড কার্জন একবার এদেশের কৃষকের কথায় বলিয়াছিলেন, সে সরকারের নীতি রচনার কার্যে সাহায্য করিতে আহূত হয় না, কিন্তু সেই-ই সেই নীতির ফলভোগ করে—তাহার ফলে উপকৃত বা অপকৃত হয়। সে কথা অতি সত্য। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি কোন নীতি অবলম্বিত হয়, তবে তাহাতে উপকারের মত অপকারের সম্ভাবনাও থাকে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা যে দেশের লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া রচনার কোন আয়োজন হয় নাই—সেজন্য যে পরামর্শদাতাদিগকেও আহ্বান করা হয় নাই, তাহা আমরা অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না।

দিল্লী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পশ্চিম বঙ্গের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের নূতন মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী জানাইয়াছেনঃ—

গান্ধীজী প্রতিদিন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্জনের জন্য বহু পত্র পাইতেছেন। কিন্তু তিনি গান্ধীজীকে বলেন, যতদিন বর্তমান অভাব থাকিবে, ততদিন নিয়ন্ত্রণ রাখিতেই হইবে।

তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন—আগামী বর্ষে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যাভাব ৯ লক্ষ টন হইবে।

কিন্তু এই অভাব কেন হইবে তাহাও তিনি বলেন নাই, তাহা দূর করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাও বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই। হয়ত বলা হইবে, সে কাজ তাঁহার নহে—কৃষি বিভাগের মন্ত্রীর।

গত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছিল, বিলাতের মত শিল্পপ্রধান—শিল্পপ্রাণ দেশেও চেষ্টায় খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন অনেক বর্ধিত করা গিয়াছিল। বাঙলায় কি সেরূপ কোন চেষ্টা হইয়াছে? এ বিষয়ে অনেক কথাই বলিবার আছে এবং আমরা পরে তাহা বলিব। কিন্তু আপাততঃ ইহা বলা প্রয়োজন—এবার পশ্চিম বঙ্গে যেরূপ ধান ফলিয়াছে, তাহাতে কি পশ্চিম বঙ্গের লোকের অভাব হইবার কথা? অবশ্য সরকারী হিসাবে নির্ভর করা দুষ্কর। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষে বাঙলায় ৩০।৩৫ লক্ষ লোক অনাহারে বা অল্পাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্বে কেন্দ্রী সরকারের তৎকালীন খাদ্যসদস্য—তিনিও একজন বাঙালী—সরকারী হিসাবে নির্ভর করিয়া কলিকাতায় বলিয়াছিলেন, ভয় নাই; বাঙলায় যে ধান্য উৎপন্ন হইবে, তাহাতে বাঙলা "দেশ বিদেশে বিতরিবে অন্ন", কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় হয়, তখন তিনি বলেন নাই—তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন বা তাঁহাকে ভুল বুঝান হইয়াছিল।

আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য, বাঙলার সরকার লোককে শারীরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার মত খাদ্য প্রদানের কোন ব্যবস্থা করেন না। যখন নাজিমুদ্দীন সচিবসঙ্ঘে মিঃ শহীদ সুরাবর্দী খাদ্য বিভাগের সচিব ছিলেন, তখন তিনি ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী নীহার চক্রবর্তী লোককে আশ্রয়শিবিরে যে খাদ্য দিয়া-ছিলেন, তাহাতে যে লোকের জীবনধারণ অসম্ভব তাহা চিকিৎসকদিগকে দিয়া বিশ্লেষণ করাইয়া দেখান হইয়াছিল। তাহাকেই আমরা তখন "সুরাবর্দী-চক্রবর্তী" মার্কা খাদ্য বলিয়া-ছিলাম। প্রত্যেক মানুষের সুস্থ থাকিবার জন্য কি খাদ্য একান্ত প্রয়োজন, তাহা হিসাব করিয়া বাঙলায় খাদ্যের পরিমাণ বর্ধিত বা হ্রাস করা হয় না। অথচ ইউরোপের সকল দেশে তাহা করিয়া সরকার দেশের লোকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন।

চারুচন্দ্র বলিয়াছেন—খাদ্যোপকরণ ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ তিনি বর্জন করিতে চাহেন। কবে তাহা হইবে? গল্প আছে, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক অতি কৃপণ পিসীমা ছিলেন। মহারাজা গোপাল ভাঁড়কে বলিয়াছিলেন, গোপাল যদি একদিন পিসীমার কাছে প্রসাদ পায়, তবে তিনি তাহাকে ১০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন। গোপাল প্রতিদিনই যাইয়া পিসীমাকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ চাহিত। বিরক্ত হইয়া পিসীমা একদিন বলিয়াছিলেন—"তোকে প্রসাদ দিব না—ছাই দিব।" গোপাল অত্যন্ত আনন্দ দেখাইয়া বলিয়াছিল, "পিসীমার কি দয়া; আপনি ছাই-ই দিন—আপনার হাতের বন্ধ মুষ্টি খুলুক।"

কাপড়, চিনি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ কবে বর্জন করা হইবে?

সিনেমা গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা

গত মাসাধিককালের মধ্যে কলকাতার সিনেমা গৃহগুলোতে—বিশেষ করে বাঙালী পরিচালিত সিনেমা গৃহগুলোতে বাঙালী দর্শকসাধারণের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সম্বন্ধে একাধিকবার আলোচনা করতে হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত। আবারও সেই অপ্রিয় কাজই করতে যাচ্ছি। এই ধরণের অপ্রিয় সমালোচনা করবার ইচ্ছা না থাকলেও একে এড়িয়ে যাবার যো নেই। স্বাধীন দেশের আত্মনিয়ন্ত্রিত ও সংযত জাতিরূপে যদি আমরা নিজেদের পরিচিত করতে চাই, তবে জাতীয় চরিত্র থেকে সর্ববিধ অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমাদের উৎপাটিত করতে হবে। কোন কর্মক্ষেত্রেই হোক, আর ফুটবল খেলার মাঠ কিংবা সিনেমা গৃহেই হোক আমাদের সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী আচরণ করতে শিখতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝেই প্রেক্ষাগারে দর্শকদের আচরণে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং সেটা আমাদের অতিমাত্রায় পীড়িত করে তোলে।

এই ধরুন, সেদিন বিশেষ একটি প্রাতঃকালীন চিত্র-প্রদর্শন উপলক্ষে উত্তর কলকাতার 'শ্রী' নামক সিনেমা গৃহে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেছে। কোনক্রমেই কি এইরূপ একটা দুর্ঘটনা ঘটা উচিত ছিল? এই দুর্ঘটনার ফলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছিল, দর্শকদের উপর লাঠি চালাতে হয়েছিল—প্রায় ২০ জন লোককে পুলিশ ধরেও নিয়ে গেছে। এই দুর্ঘটনার মূল কারণটা কিন্তু অত্যন্ত তুচ্ছ। চিত্র-প্রদর্শন চলতে চলতে হঠাৎ যন্ত্র-বিভ্রাটে ছবি দেখানো বন্ধ হয়ে যায়। এতেই দর্শক সাধারণের একাংশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, অপারেটিং রুমে হানা দেবার চেষ্টা করে—কিন্তু এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তারা প্রেক্ষাগারের আসবাবপত্র ভাঙা শুরু করে। যে সাদা পর্দার উপর ছবি প্রতিফলিত হয়, সে পর্দায়ও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে প্রকাশ। দর্শকদের একাংশ বক্স অফিসেও হানা দেবার চেষ্টা করেছিল বলে জানা গেল। যাই হোক, যথাসত্বর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পড়ায় হাঙ্গামা আর বেশী দূর এগুতে পারেনি। উক্ত প্রেক্ষাগৃহটির প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেল।

আমাদের মতে দর্শক সাধারণের পক্ষে এই ধরণের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করা আদৌ শোভন কিংবা যুক্তিসংগত হয়নি। যন্ত্র যে সর্বদা ঠিক ভাবে চলবে, এ গ্যারাণ্টি বোধ হয় কেউ দিতে পারে না কিংবা এ কথাও সত্য নয় যে, উক্ত খ্যাতনামা সিনেমা গৃহটিতে প্রায়ই ওই ধরণের যন্ত্র-বিভ্রাট হয়। এ অবস্থায় দর্শকদের একাংশের অতটা উত্তেজিত হওয়া উচিত ছিল কি? ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ কোন রসঘন মুহূর্তে ছবি বন্ধ হয়ে গেলে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধরণের আকস্মিক যন্ত্র-বিভ্রাটকে ক্ষমার চোখে না দেখে উপায় কি? এ ক্ষেত্রে দর্শকদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রদর্শনী-যন্ত্র

বাঙলার মঞ্চ ও চিত্র জগতের উদীয়মান অভিনেতা কমল মিত্র। অগ্রদূতের পরিচালনায় পথের দাবী (হিন্দি) চিত্রে সব্যসাচীর ভূমিকায় ইঁহাকে দেখা যাইবে।

ভাল করা সম্ভব না হলে তারা সিনেমা গৃহের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে টিকিটের দাম ফেরত নিতে পারত। কিন্তু চায়ের কাপে ঝড়ের মত এ ধরণের দুর্ঘটনা সৃষ্টি করা কোন দিক থেকেই উচিত হয়নি। এতে প্রেক্ষাগারের মালিকদের যেমন আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে, তেমনই দর্শকদেরও পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। অথচ এই দর্শকরাই আবার এই সিনেমা গৃহে ছবি দেখতে যাবে। সিনেমা গৃহের মালিক এবং দর্শকদের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক নেই—এ সম্বন্ধে দর্শকদের মনে যেমন স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত, তেমনই জাতীয় চরিত্রে সকল সুশৃঙ্খলতা ও নিয়মানুবর্তিতার অনুসরণেও তাদের উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

চলচ্চিত্রে ক্রিকেট-শিক্ষা

ভারতবর্ষের ক্রিকেট শিক্ষার্থী ও ক্রীড়ামোদীদের পক্ষে একটা অত্যন্ত সুখবর সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। মিঃ জে সি জোন্স নামে ইংল্যাণ্ডের একজন চিত্র-প্রযোজক ক্রিকেট সম্বন্ধে শিক্ষামূলক চিত্রাবলী নির্মাণে হাত দিয়েছেন। এই সব চিত্রে অংশ গ্রহণ করবেন বিলেতের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা। শীঘ্রই এই ধরণের চিত্র আমরা ভারতে পর্দার বুকে প্রতিফলিত দেখার সুযোগ পাব বলে জানা গেল। এই চিত্রে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন ইংল্যাণ্ড ও মিডেলসেক্সের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় বিল্ এডরিচ্। তিনি একাধারে ব্যাটসম্যান, ফাস্ট বোলার এবং ফিল্ডাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তা ছাড়া চিত্র-কাহিনীরও বর্ণনাকারী তিনি। শ্লো বোলার ও উইকেট কিপারের ভূমিকায় দেখা যাবে যথাক্রমে জিম্ সিম্স ও গডফ্রে ইভান্সকে। বিষয়বস্তু তিন ভাগে বিভক্ত—ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং। প্রত্যেকটি বিষয় দশ মিনিট করে দেখানো হবে।

বৃটেনে এই ধরণের চিত্র নির্মাণ এই প্রথম। দুরকম ভাবে এই চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এক ধরণের ছবি হবে শুধু সাধারণকে আনন্দ দেবার জন্যে—আর অন্য ধরণের ছবির মূল উদ্দেশ্য

দেশী সংবাদ

১০ই নবেম্বর—ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির তপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত বসু ঠাকুর ত ৫ই নবেম্বর তাঁহার মালখানগরস্থ বাসভবনে রলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯ বৎসর হইয়াছিল।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে নুষ্ঠিত এক মহতী স্মৃতিসভায় কলিকাতার ধিবাসিবৃন্দ বাংগলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীর নাইলাল দত্তের পুণ্যস্মৃতির প্রতি তাঁহাদের কান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেন। ০ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৮ সালের ১০ই নবেম্বর াসির মঞ্চে কানাইলাল আত্মবিসর্জন রিয়াছিলেন।

জুনাগড়ের দেওয়ান স্যার শা নওয়াজ ভুট্টো রাচীতে সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, লাপ আলোচনা সাপেক্ষে জুনাগড় রাজ্যের াসনভার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করা ইয়াছে।

পশ্চিম বংগের গভর্নর শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী দ্য নয়াদিল্লীতে ভারতের অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেলরূপে এবং তাঁহার স্থলে স্যার বি এল মিত্র পশ্চিম বংগের অস্থায়ী গবর্ণররূপে শপথ গ্রহণ করেন।

ভারতের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং অদ্য বরমূলা পরিদর্শন করেন। বরমূলায় প্রবেশ করার পরই কাশ্মীর সরকার সর্বাগ্রে সেখানকার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার চৌধুরী ফয়জুল্লা খাঁকে গ্রেপ্তার করে।

১১ই নবেম্বর—ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় সেনাদল প্রেরণ করা হইয়াছে। পাকিস্থান সন্নিহিত রাজ্য সীমান্তে উপদ্রুত অবস্থা দেখা দেওয়ায় ভারত সরকার ত্রিপুরায় সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আগষ্ট মাসের প্রথমভাগে ত্রিপুরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি উহার পাকিস্থানে যোগদানের দাবী জানাইয়া রাজ্য-সন্নিহিত পাকিস্থান অঞ্চলে জোর আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আজ শ্রীনগরে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসংগে কাশ্মীরের জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া বলেন, "অতীতের মত ভবিষ্যতেও মরা ভারত ও কাশ্মীর একত্র দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটি কে বাধা দিব।"

১২ই নবেম্বর—মহাত্মা গান্ধী কুরুক্ষেত্র শ্রয়প্রার্থী শিবিরের আশ্রয়প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে ল ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে এক বেতার তা করেন। বক্তৃতায় মহাত্মাজী বলেন ভারত ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের সকল শ্রয়প্রার্থী যাহাতে পুনরায় নিজ নিজ জীবনে তিষ্ঠিত হয় এবং তাহারা যে স্থান হইতে তাড়িত হইয়াছে, নিরাপদে ও সসম্মানে তাহারা াহাতে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া যাইতে পারে, জন্য তাঁহার সাধ্য অনুযায়ী যাহা যাহা করা ম্ভব তাহার সবই তিনি করিবেন। ভারতবর্ষে হাত্মা গান্ধীর ইহাই প্রথম বেতার বক্তৃতা।

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা ইয়াছে যে, আগামী ৩০শে নবেম্বর সর্বাধিনায়কের হেড কোয়ার্টার্স ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং অতঃপর ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের সেনাদল পুনর্গঠনের জন্য কোন নিরপেক্ষ ও যুক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকিবে না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

ভারতীয় সৈন্যগণ বরমূলা-উরি রোড ধরিয়া অগ্রসর হইয়া মোহরা অধিকার করিয়াছে। শ্রীনগর-সহ কাশ্মীর উপত্যকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ইহাই প্রধান কেন্দ্র।

১৩ই নবেম্বর—ভারত সরকারের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অদ্য সদলবলে রাজকোট হইতে জুনাগড়ে গমন করেন। জুনাগড়ে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসংগে সর্দারজী সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রশ্ন করেন যে, তাহারা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিবে না পাকিস্থানে যোগদান করিবে? ইহার উত্তরে সহস্র সহস্র লোক হাত তুলিয়া উচ্চস্বরে জানায়, "ভারতবর্ষ।" সর্দারজী তখন প্রশ্ন করেন যে, এ সম্পর্কে কোন মতবিরোধ আছে কি না। ইহার উত্তরে জনতা সম্পূর্ণ নীরব থাকে।

ত্রিপুরার মহারাণী শ্রীযুক্তা কাঞ্চনপ্রভা দেবী কলিকাতা হইতে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। রাজ্য-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি দিল্লীতে ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবেন।

১৪ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পুনরধিবেশনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে উত্থাপনের জন্য দুইটি প্রস্তাবের খসড়া অনুমোদিত হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের অনুসরণীয় একটি জাতীয় নীতি বিবৃত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্থান উভয় ডোমিনিয়নে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকরা শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করিতে পারে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উড়িষ্যা সরকার আজ নীলগিরি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। উড়িষ্যা পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ বি রায়ের অধিনায়কত্বে উড়িষ্যার তিনশত সশস্ত্র পুলিশ নীলগিরি রাজ্য সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এক শক্তিশালী ভারতীয় বাহিনী শ্রীনগর হইতে ৬৩ মাইল দূরে অবস্থিত উরি শহর অধিকার করিয়াছে। উরিতে শক্তিশালী ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতির ফলে মজঃফরাবাদ জেলার অধিবাসীদের মনে আস্থার ভাব ফিরিয়া আসিবে।

১৫ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। আচার্য কৃপালনী অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগের বিষয় ঘোষণা করেন এবং ওয়ার্কিং কমিটিকে পুনর্গঠিত করিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা অপরিবর্তনীয়। আচার্য কৃপালনী তাঁহার বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বর্তমান সম্পর্ক সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ৫০ মিনিট-ব্যাপী ভাষণে দেশের সাম্প্রদায়িক অবস্থার উল্লেখ করিয়া সদস্যগণকে কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্যক্রমের প্রতি একনিষ্ঠ থাকিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী কণ্ট্রোল প্রথা রহিত করার উপর জোর দেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীনগরের সংবাদে প্রকাশ, আক্রমণকারী উপ-জাতিদল গুলমার্গ শহর ত্যাগ করিয়াছে।

মিঃ জিন্নার পার্সনাল সেক্রেটারী মিঃ কে এইচ খুরশেদকে কাশ্মীর রক্ষা বিধান অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলার তিরুভুর বিভাগের ৮টি গ্রাম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে এবং এই গ্রামগুলি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

১৬ই নবেম্বর—দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বাতিল, বে-সরকারী সৈন্যদল গঠন বন্ধের দাবী জানাইয়া এবং দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি বিশ্লেষণ করিয়া অদ্য নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত

রাজকুমারী এলিজাবেথ ও তাঁহার পিতামহী রাণী মেরী। রাজকুমারীর অষ্টাদশ জন্মতিথিতে গৃহীত ফটো।

লেঃ ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেন। ২০শে নবেম্বর রাজকুমারী এলিজাবেথের সহিত ইঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে

রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হায়দরাবাদ-বেরার সীমান্ত অঞ্চলে পাকোরার নিকট নিজামের সৈন্যদল ও ভারতীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, শ্রীরামানন্দ তীর্থের নেতৃত্বে অস্থায়ী হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট গঠনের উদ্যোগ আয়োজন শুরু হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী অদ্য নয়াদিল্লীতে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রক্ষা করা অপরাধ। ইহা দুর্নীতি ও চোরা-কারবারের সহায়ক।

বিদেশী সংবাদ

১০ই নবেম্বর—লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্না পার্লামেণ্টের জনৈক রক্ষণশীল সদস্যের মারফৎ মিঃ এটলীকে জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানকে সাহায্য করিতে অগ্রসর না হন, তবে পণ্ডিত নেহরুর সহযোগিতায় রাশিয়া ভারতীয় উপ-মহাদেশ শাসন করিবে। যে রক্ষণশীল সদস্য মিঃ জিন্নার এই সতর্কবাণী বহন করিয়া লইয়া যান, তিনি সম্প্রতি করাচী পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

১১ই নবেম্বর—লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের সহিত হায়দরাবাদের একটি সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজামের লণ্ডনস্থ এজেণ্ট জেনারেল মীর নওয়াজ জঙ্গ পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন।

ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন রাজকুমারী এলিজাবেথ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র লেঃ ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেনের বিবাহে যোগদানের জন্য ভারত হইতে বিমানযোগে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ২০শে নবেম্বর তারিখে এই বিবাহানুষ্ঠান হইবে।

শ্যামের নূতন শাসন কর্তৃপক্ষের ডেপুটি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার লেঃ জেনারেল ফিন চুন হাওয়ান অদ্য বলেন যে, শ্যামের স্থায়ী বাহিনী ও প্রতি-রোধকারী সৈন্যদলের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। গত রবিবার উল্লিখিত নূতন দল শাসন কর্তৃত্ব দখল করেন।

১৩ই নবেম্বর—শ্যামের যে প্রতিনিধি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার সভাপতি পং শ্রীচাঁদ গতকল্য ব্যাংককে উক্ত পরিষদের অধিবেশন আহবানের চেষ্টা করিলে গ্রেপ্তার হন।

বৃটিশ অর্থসচিব ডাঃ হিউ ডালটন পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস অর্থসচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নর-নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে একটি গোলটেবিলে মিলিত হইবার প্রস্তাবটি অদ্য শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতির রাজনৈতিক কমিটিতে উত্থাপন করেন।

ফরাসী লেখক আঁদ্রেই জিদকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

১৪ই নবেম্বর—ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন অদ্য লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন।

কমন্স সভায় ব্রহ্ম স্বাধীনতা বিল গৃহীত হইয়াছে। এই বিলে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী হইতে ব্রহ্মকে বৃটিশ কমনওয়েলেথর সংস্রবমুক্ত করিয়া স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

রাজকুমারী এলিজাবেথ

প্রাচীনকালে সভ্যতার বিকাশ যখন হয়নি তখন কেনাবেচার কাজ চলতো শুধু দ্রব্যবিনিময়ের সাহায্যে। যেমন ধরুন, কোন শিকারী হয়তো বাঘের ছালের বদলে পেতে পারতো একটী ছাগল কিম্বা কিছু শস্য আবার ছালের বদলে বৌও যোগাড় হ'তো। কিন্তু বাঘের ছালে যদি কারও প্রয়োজন না থাকে তাহলেই হয় মুস্কিল, বিনিময়ে আর কিছু সংগ্রহ করা তখন সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এই অবস্থার মধ্যে ইচ্ছা থাকলেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা সকলের পক্ষে সহজ ছিল না এবং তার প্রতি আগ্রহও বিশেষ দেখা যেতো না। কারণ, সঞ্চয়ের নমুনা ছিল অদ্ভুত হয়তো এক কাঁদি কলা, না হয় বস্তাভর্ত্তি শস্য, অথবা একপাল মেষ। স্থায়িত্বের দিক থেকে এসবের সার্থকতা কোথায়? বছরের শেষে লাভের অংশই বা তাতে কই?

এখন ক্রয় ও সঞ্চয়ের ব্যাপার অনেক সহজ হয়ে এসেছে। বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই তাই বর্তমান খরচের তাগিদ এড়িয়ে সঞ্চয়ের দিকে নজর দিচ্ছেন। সঞ্চিত অর্থ যাতে ভালোভাবে খাটানো যায় সেদিকেও দৃষ্টি চাই। ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেটএ টাকা খাটানো যে সম্পূর্ণ নিরাপদ সে কথা বোধ হয় আজ আর বলে দিতে হবে না। এই উপায়ে অর্থের পরিমাণ পূর্ণকাল পরে শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যায়; তার মানে ১০৲ টাকা ১২ বছর পরে দাঁড়ায় ১৫৲ টাকায়। সুদের উপর ইনকাম ট্যাক্স ধরা হয় না। ইচ্ছা করলে এখন আপনি ৫৲ টাকা থেকে ১৫,০০০৲ টাকা মূল্যের সার্টিফিকেট কিনতে পারেন। যাদের সঞ্চয় অল্প তাদের জন্য ।০ আনা, ॥০ আনা এবং ১৲ টাকা দামের সেভিংস স্ট্যাম্প নির্দিষ্ট আছে।

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করুন

ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

টাকা খাটাবার সর্বোত্তম উপায়

সরকার নিযুক্ত এজেন্টের নিকট, পোষ্ট অফিস এবং সেভিংস ব্যুরোতে পাওয়া যায়।

AC-210

'দেশ'-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩ **ষাণ্মাসিক—৬৷৷০**

"দেশ" পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাময়িক বিজ্ঞাপন—৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জ্ঞাতব্য।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সূচীপত্র

"আপনার ত্বকের
সুশান্ত যত্ন নিতে দিন
লাক্স টয়লেট সাবানকে"
রেহানা বলেন।
LUX
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য সাবান
L/TB. 169-111-40 BG
LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

পুরস্কার
উচ্চ শ্রেণীর হাতঘড়ী
চামড়ার স্যুটকেস্
প্রভৃতি পুরস্কার
দেওয়া হইবে।
নিয়মাবলীর জন্য
পত্র লিখুন
এন,পি, হাউস
পোষ্ট বক্সনং ১১৪৩৮
কালকাতা

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ]   শনিবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ সাল।   Saturday, 29th November, 1947   [৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

এক দেশ—এক জাতি

গত ৫ই অগ্রহায়ণ হইতে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর পরিষদের ইহাই প্রথম অধিবেশন। পরিষদের এই অধিবেশনের প্রথম প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদাতা বীরগণের স্মৃতির পূজা করা হইয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে। বিদেশী শাসনের অবসানে পরিষদের কার্যক্রমে কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তন অনেকের দৃষ্টিতেই পড়িবে এবং অতীতের সহিত বর্তমানের পার্থক্য গভীরভাবে উপলব্ধি হইবে। অতীতে শ্বেতাঙ্গ বণিক দলের প্রতিনিধিগণ স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক-স্বরূপে কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রগতিবিরোধীপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়া জনমতের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন এবং যত রকম পীড়নমূলক নীতিকে সমর্থন করিতে ইঁহাদের অপরিসীম আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। বর্তমানে পরিষদ হইতে এই সব পরস্বত্বোৎসাদনকারীদের দৌরাত্ম্য একান্তভাবে উৎখাত হইয়াছে। তারপর সাধারণের দুর্বোধ্য বিদেশী বুলির যেখানে ঝড়-বৃষ্টি বর্ষণ দেখা গিয়াছে, বর্তমানে সেখানে দেশবাসীর অন্তরের ভাষায় আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশী ভাষাগত পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য গর্বের পর্ব শেষ হইয়াছে এবং জাতি বিশেষ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে সমর্থ হইতেছে। পরিষদে মুসলিম লীগ দলের নীতি বর্তমান অধিবেশনে অপর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছিল। এই দল দীর্ঘদিন সাম্প্রদায়িক নীতিকে মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া বাঙলার শাসনযন্ত্র দখল করিয়াছিলেন; বর্তমানে তাঁহারা সরকারবিরোধী দলের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মুসলিম লীগ দলের প্রতিনিধিগণের পক্ষে রাষ্ট্রনীতিক সহযোগিতার কার্যানুরোধে সরকারবিরোধী দলে এইভাবে স্থান গ্রহণ করাই মুখ্য বিষয় নয়; পরন্তু তাঁহারা কংগ্রেসের এক-জাতিত্বের আদর্শকে আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পরিষদে লীগ দলের নেতা মিঃ এ এফ এম রহমানের বক্তৃতায় এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়াছে। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় একথা বুঝাইয়া বলেন যে, পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—দেশ এইভাবে বিভক্ত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমানগণ মনে করেন যে, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এক শক্তিশালী নূতন জাতি গঠিত হইতেছে। মুসলিম সম্প্রদায় সর্বান্তঃকরণে এই জাতি গঠনে সহযোগিতা করিবেন এবং নিজদিগকে ঐ জাতির অংশস্বরূপে অভিহিত করিতে গৌরব বোধ করিবেন। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে, এখন হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানগণ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে গঠিত জাতীয় কর্মসূচী সমর্থন করিবেন। ভারতীয় মহাজাতি গঠন এবং তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিতে তাঁহারা যথাশক্তি সাহায্য করিবেন। তাঁহারা এই বিশ্বাস করেন যে, সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে যে পার্থক্য আছে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বিদূরিত হইবে এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু বলিয়া কোন সাম্প্রদায়িক বিভেদ থাকিবে না। বলা বাহুল্য, মিঃ রহমান যে বিভেদের কথা বলিয়াছেন, কংগ্রেস তাহা কোনদিনই স্বীকার করিয়া লয় নাই। হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়কে লইয়া গঠিত এক ভারতীয় জাতিকেই কংগ্রেস তাহার আদর্শস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আজ ভারতের মুসলমান সমাজ কংগ্রেসের সেই এক-জাতিত্বের আদর্শকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করার ফলে এখানকার রাজনীতিতে ভবিষ্যতে লীগের সত্তা বস্তুত অবাস্তব হইয়া পড়িল। কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং আদর্শের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বিরোধ জীয়াইয়া রাখা অতঃপর আর চলিবে না। যাঁহারা তেমন চেষ্টায় এখনও প্রবৃত্ত হইবেন আমাদের বিশ্বাস, জাগ্রত জনমতের প্রবল স্রোতে তাহাদিগের প্রতিকূলতা ভাসিয়া যাইবে। বীরভূমের বিগত নির্বাচনে আমরা জনমতের এই শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। আমরা জানি, বীরভূমের নির্বাচনে কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সকল শক্তিকে সংহত করা হইয়াছিল। হিন্দুসভার পক্ষ হইতে এত বড় এবং ব্যাপক সমর-সজ্জা আর কোনদিন দেখা যায় নাই। দেশব্যাপী একটা বিপুল এবং বিপর্যয়কর পরিবর্তনের পর দেশবাসীর পক্ষে আত্মবুদ্ধিতে সংস্থিত হওয়া অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রেও হয়ত সে ভাব কতকটা দেখা দিয়াছিল; কিন্তু জাতীয়তাবাদের অগ্নিময় আদর্শ সমগ্র বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। বাঙলা দেশ নিজের আদর্শগত সে বেদনা এবং চেতনা বিস্মৃত হইতে পারে না। বহু বিপর্যয় এবং দ্বন্দ্বমূলক বিচারের

ভিতরও সেই সত্যই তাহাকে সুসমাহিত করে। বীরভূমেও তাহাই ঘটিয়াছে। বিদেশীর প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আমরা জাতির প্রাণসত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছি, এখন আর সাম্প্রদায়িক ভ্রান্ত প্রচার-কার্য আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিতে সমর্থ হইবে না এবং যাহারা এইভাবে আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের পদ, মান ও প্রতিষ্ঠাগত হীন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবে, তাহাদের অনিষ্টকর উদ্যম অঙ্কুরেই ধ্বংস পাইবে। জাগ্রত জনমত এই শ্রেণীর দুরভিসন্ধি-পরায়ণদের বিষ দাঁত নিষ্কাশিত করিয়া ছাড়ে, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

পূর্ববঙ্গের সমস্যা

তিন মাসের অধিক কাল হইল পূর্ববঙ্গে নূতন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিন মাস সময়ের মধ্যে কোন গভর্নমেণ্টের বিচার করা চলে না। স্যার নাজিমুদ্দীন গভর্নমেণ্ট পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে যেসব দীর্ঘ পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা কোন বিচার করিতেও চাহি না; কিন্তু রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য সম্বন্ধে যেসব ব্যবস্থা নিতান্তভাবে প্রতিপালিত হওয়া উচিত, স্যার নাজিমুদ্দীনের শাসনে এখনও সেসব বিধি-ব্যবস্থা হইতেছে না, এইজন্যই নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে হইতেছে। স্যার নাজিমুদ্দীনের শাসনে পূর্ববঙ্গে মোটামুটিভাবে শান্তি বজায় আছে এবং এ পর্যন্ত গুরুতর আকারের কোনরূপ অশান্তি দেখা দেয় নাই, ইহা সত্য। কিন্তু অশান্তি না ঘটিবার হিসাব কষিয়াই কোন রাষ্ট্রের স্বাভাবিক শান্তির বিচার করা চলে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বাভাবিক বিকাশের অবাধ প্রতিবেশের উপরই রাষ্ট্রের স্বাভাবিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতিগত সৌহার্দ্য এবং মানবতামূলক বিচারবুদ্ধিই পূর্ববঙ্গের বর্তমান অশান্তির অভাবের মূলে কাজ করিতেছে; বস্তুত তথাকার অশান্তি রাহিত্যের মূলে শাসক দলের কোন কৃতিত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কার্যতঃ এই তিন মাস সময়ের মধ্যেও পূর্ববঙ্গের শাসনবিভাগ কার্যকরভাবে বিনাস্ত করা সম্ভব হয় নাই। স্বয়ং মৌলবী ফজলুল হককেও সম্প্রতি স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের বিচার-বিভাগ উপযুক্ত সংখ্যক বিচারকের অভাবে এলাইয়া পড়িয়াছে। শুধু বিচার-বিভাগ নয়, সব বিভাগেরই বলিতে গেলে এইরূপ এলোমেলো অবস্থা। শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয় চলিতেছে না, চিকিৎসকের অভাবে হাসপাতালে রোগীদের যথাযোগ্য শুশ্রূষা হয় না, ডাক বিভাগ এবং তার বিভাগের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে যেখানে তারের খবর পাইতে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার অধিক বিলম্ব ঘটে না, সেখানে দশ-বার দিন বিলম্ব ঘটিতেছে। চিঠিপত্রের জন্য ভগবানের উপর ভরসা করিয়া থাকিতে হয়। অধিকাংশ পোস্টাফিসেই খাম, পোস্টকার্ড বা টিকিট মিলে না। ডাক বিভাগ ও তার বিভাগের এই রকম চূড়ান্ত অব্যবস্থার ফলে এক শ্রেণীর লোকের চরম দুর্দশা দেখা দিয়াছে। বিদেশ হইতে মনিঅর্ডারের টাকা আসিলে তবে সংসার চলে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকেরই এইরূপ অবস্থা। মনিঅর্ডারের টাকা তিন দিন বা বড়জোর চার দিন যেখানে বিলম্ব ঘটিত, এখন সেই টাকা পাইতে তিন-চার সপ্তাহও কাটিয়া যাইতেছে। অনেক স্থানে মনিঅর্ডার ঠিকমত পেঁছিতেছে না এবং পেঁছিলেও পোস্ট অফিসে টাকার অভাবে সেগুলি বিলি হয় না। বলা বাহুল্য, এই অভাবে সমগ্র পূর্ববঙ্গ কয়েক মাসের মধ্যে যেন পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা স্যার নাজিমুদ্দীনের কাছে বিনীতভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে, পাকিস্থানের ফাঁকা মহিমা কীর্তনের দ্বারাই সেখানে সভ্য রাষ্ট্রের আদর্শ বজায় রাখা যাইবে না। আজও যাঁহারা ফাঁকা বুলিতে মনের বল কোন গতিকে খুঁজিয়া পাইতেছে, দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অসুবিধার কঠোর আঘাতে তাঁহারা ফাঁকা বুলির ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং সাম্প্রদায়িকতাগত আত্মতৃপ্তির জোর তাঁহাদের শিথিল হইয়া পড়িবে। স্যার নাজিমুদ্দীন পাকিস্থান শত্রুদের দ্বারা বিপন্ন হইয়াছে এই জিগীর তুলিয়াছেন। বস্তুতঃ পাকিস্থানের তেমন শত্রু কোন পক্ষ নাই। স্যার নাজিমুদ্দীন পূর্ববঙ্গের জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিজড়িত সমস্যাসমূহের সমাধানে তৎপর হউন। লোকের যেখানে অভাব, সেখানে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করুন। স্বদেশপ্রেমের উপরই সব রাষ্ট্রের বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়া থাকে। তিনি এই স্বদেশপ্রেমকে জাগ্রত করিয়া শাসনকার্যে হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতা সুদৃঢ় করিয়া তুলুন। আমাদিগকে দুঃখের সহিত এই কথা বলিতে হইতেছে যে, রাষ্ট্রীয়তা বা স্বদেশ-প্রেমকে জাগ্রত করিবার জন্য পূর্ববঙ্গে এখনও তেমন কোন প্রচেষ্টা হইতেছে না। সেখানে এখনও মোজাহেদ বাহিনী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক সংস্কারবিজড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। অথচ পূর্ববঙ্গের প্রতি ইঞ্চি ভূমি স্বদেশপ্রেমিকদের রক্তধারায় অনুরঞ্জিত। পূর্ববঙ্গের এই সব স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ সাম্প্রসায়িকতা জানিতেন না; তাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্যই প্রাণ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের বৈপ্লবিক আন্দোলন কংগ্রেস হইতে অনপেক্ষ বা স্বতন্ত্র ছিল। পূর্ববঙ্গের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কগণ ইঁহাদের গৌরবময় স্মৃতির উজ্জীবনের পথে রাষ্ট্রকে সুগঠিত করিতে কেন সংকুচিত হইতেছেন, আমরা বুঝিতে পারি না। শত শত মাইল দূরে করাচীতে অবস্থিত কর্তাদের দিকে তাকাইয়া না থাকিয়া পূর্ববঙ্গের শক্তি এবং সংস্কৃতিকে স্বদেশ-প্রেমের উদার আদর্শে জাগ্রত করিয়া তুলিলে সেখানকার সব সমস্যার সমাধান হইতে বিলম্ব ঘটিবে না, আমরা এই কথাই বলিব।

পুলিশের কর্তব্য পালন

আমরা দমন-নীতির পক্ষপাতী নহি কিন্তু শান্তিরক্ষা ও আইন রক্ষার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কঠোরতা অবলম্বন করা আমরা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বর্তমানে দেশের সর্বত্র একটা উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব দেখা দিয়াছে। সেদিন ২৪ পরগণা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সেকথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, "আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি সত্য; কিন্তু একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। শৃঙ্খলা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি হয় না; সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিতে হইবে। ডক্টর ঘোষের এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা একেবারে অস্বীকার করি না। মনীষী ইমার্সন বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার স্বাধীনতাই কিছু না কিছু উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব বহন করিয়া আনে। বস্তুত মানুষের মনের অন্তর্নিহিত বন্ধন-মুক্ত বৃত্তির স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসই অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে উদ্দামতার মধ্য দিয়া দেখা দেয়। এই মনোভাবকে অভ্রান্ত ভাবে আদর্শের পথে নিয়ন্ত্রিত করাই নেতাদের কর্তব্য এবং জনগণের নেতৃত্বের সেইখানেই পরীক্ষা হইয়া থাকে। গত ২১শে নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষাণ সভা এবং রামেশ্বর দিবস উপলক্ষে গঠিত ছাত্রদের মিছিলের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব যে কিছু কিছু ছিল আমরা ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদিগকে একথাও বলিতে হইতেছে পুলিশ এক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া কাজ করে নাই এবং মন্ত্রিমণ্ডলও উপযুক্ত নেতৃত্ব শক্তির পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। আমরা জানি, পুলিশ সেদিন অজস্র ভাবে কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার যে এতটা বহ্বারম্ভে পরিণত হয়, সেজন্য প্রধানত পুলিশই দায়ী। কলিকাতা শহরে ১৪৪ ধারা বর্তমানে বহাল নাই; সুতরাং শোভাযাত্রা করাও বে-আইনী

কাজ নয়। ছাত্র শোভাযাত্রাকে লালদিঘীতে যাইতে দিলে কাহারো কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। কৃষকদের মিছিল পরিষদের সম্মুখে গেলেই যে গুরুতর কোন অনর্থ ঘটিত, আমরা ইহাও মনে করি না। ডক্টর ঘোষ এ সম্বন্ধে গত মঙ্গলবার ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও আমরা এই কথাই বলিব। এক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক যুগের অতীত স্মৃতি টানিয়া না আনিয়া জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডল সহজভাবেই মিছিলের সম্মুখে আসিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া, যেখানে মিছিলের উপর কাঁদুনে গ্যাস বর্ষণ করা হয়, প্রধান মন্ত্রী সে-স্থানের নিকটেই ছিলেন; এরূপ অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই পুলিশের ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য ছিল। দেশের কৃষক ও ছাত্রগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি জাতীয় গভর্নমেণ্টের যে স্বাভাবিক মমত্ব-বুদ্ধি বিদ্যমান, ইহা পুলিশের স্মরণ রাখা কর্তব্য। সেদিন পুলিশ যে সে কর্তব্য পালন করে নাই, একথা আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি এবং তাহার যথোচিত প্রতিকার চাহিতেছি। জনসাধারণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিলে আমরা তাহার নিন্দা করিতে ভীত হইব না; কিন্তু স্বাধীন দেশের নূতন প্রতিবেশের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকেও আমরা সমধিক অবহিত হইতে বলি।

রেলপথের সংকট

গত কয়েক বৎসর হইতে রেল-ভ্রমণে যে সংকট দেখা দিয়াছে, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ভারত গভর্নমেণ্টের যানবাহন সচিব ডাক্তার জন মাথাই বাজেট-বরাদ্দ পেশ করিয়া রেলের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সঙ্গে মালপত্রের মাশুলের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেট উত্থাপন-কালে রেলপথের যে আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, বাস্তবিকপক্ষে আয় তাহা অপেক্ষা বেশীই হইয়াছে, তথাপি খরচ সঙ্কুলান করা সম্ভব হয় নাই। সচিব মহাশয় ইহার কতকগুলি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রমিক অসন্তোষ নিবারণকল্পে গভর্নমেণ্ট যে বেতন-কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য গভর্নমেণ্টকে ১৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অধিক দিতে হইবে। ইহা ছাড়া কয়লার মূল্যে বৃদ্ধি পাওয়াতে গভর্নমেণ্টকে মোট দুই কোটি টাকা অধিক খরচ করিতে হইবে। যানবাহন সচিবের যুক্তি আমরা উপলব্ধি করিলাম; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদিগকে এই কথা বলিতে হইতেছে যে, ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি না করিয়া ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই ভাল হইত। বলা বাহুল্য, আজকাল রেলপথে দুর্নীতির অবাধ রাজত্ব চলিতেছে। রেলের কুলী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ কর্মচারীরা পর্যন্ত এই দুর্নীতির পঙ্কে সমানভাবে লিপ্ত হইয়াছেন। রেলকর্মচারীদের দুর্নীতির ফলে সহস্র সহস্র যাত্রী বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিতেছে। টিকিট ক্রয়ের ঝঞ্ঝাটে অনেকে টিকিট কিনিতেই চাহে না, কিছু ঘুষ দিলেই সমস্যা মিটিয়া যায়। ইহা ছাড়া নিম্ন শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া উচ্চ শ্রেণীতে ভ্রমণ করাও একটা যেন রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানেও দায়ে পড়িলে সামান্য কিছু ঘুষের পথের খোলা রহিয়াছে। ফলে যাহারা ন্যায্য পয়সা দিয়া টিকিট ক্রয় করেন, যত অসুবিধার ঝক্কি তাঁহাদিগকেই পোহাইতে হয়। কর্তৃপক্ষ রেলপথে ভ্রমণের ভাড়া বৃদ্ধি করিলেন, কিন্তু এই দুর্নীতির প্রতিকার হইবে কি? ইহার পর পাকিস্থান, হিন্দুস্থানের সমস্যার জটিলতা রেলপথে সবচেয়ে বেশী। ইহার ফলে রেল-পরিচালনায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। গাড়ি চলাচলে কোন নিশ্চয়তা নাই। বড় বড় ষ্টেশনগুলিতে পর্যন্ত সর্বপ্রকার অব্যবস্থা চলিতেছে, ফলে যাত্রীদের কষ্টের অবধি থাকিতেছে না। গাড়িতে গরু-ভেড়ার মত গাদাঠাসা হইয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি লইয়াও লোকের নিশ্চিন্ততা নাই। যান-বাহন সচিব এই সব দুরবস্থার যদি কিছু প্রতিকার করিতে সমর্থ হন, তবে আমরা কিছু ভাড়া বেশী দিয়াও স্বাধীন ভারতে সত্যই তাঁহার জয়গান করিব, কারণ প্রাণের দায়, বড় দায়।

যুক্তি ও নীতি

মিঃ সুরাবর্দী প্রত্যক্ষ রাজনীতির কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি অতঃপর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থানের মধ্যে শান্তির প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবেন। এমন কাজে একটা সুবিধা আছে। ইহাতে কোন পক্ষেরই আদর্শ বা নীতির মধ্যে ধরাবাঁধা পড়িতে হয় না এবং নেতৃত্বে স্পৃহা বর্জন করিবার কৌশলে নেতৃত্ব-মহিমা পুরোপুরি উপভোগ করা চলে; সুতরাং বিনয়ের পথে ইহা বড় ন্যায় বা চাতুর্যপূর্ণ নীতি। দেখিলাম সুরাবর্দী সাহেব বাঙলায় ফিরিয়া শান্তি প্রচারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ঢাকার ছাত্রদের এক সভায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রচার করিয়াছেন। মুসলিম লীগের দুই জাতিতত্ত্ব লইয়া হিন্দু সংবাদপত্রসমূহে বড় বেশী বাড়াবাড়ি করা হইতেছে বলিয়া মিঃ সুরাবর্দীর অভিযোগ। তিনি বলেন, দুই জাতির ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয় নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অঞ্চল হিসাবেই ভারত বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভাগের পর দুই জাতিতত্ত্বের কোন যুক্তি আর টিকে না। মিঃ সুরাবর্দীর যুক্তিতে অভিনবত্ব আছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মুসলিম লীগের কর্ণধারগণ সাম্প্রদায়িক দুই জাতিতত্ত্বের যুক্তির পথেই আজও নিজেদের শক্তির সাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে যত রকমের অনর্থ পাকাইয়া তুলিতেছেন। কাশ্মীর মুসলমানদের দেশ, সুতরাং সীমান্তের পাঠানদিগকে কাশ্মীর দখল করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তোলা হইয়াছে। শত সহস্র নরনারীর রক্তে কাশ্মীরের ভূমি সিক্ত হইয়াছে, নারীর সতীত্ব মর্যাদা পশুদের দৌরাত্ম্যে বিধ্বস্ত হইয়াছে। জুনাগড়ের নবাব মুসলমান, সুতরাং সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দাবীর গলা টিপিয়া মারিতে হইবে। লীগের কর্ণধারগণ এই যুক্তি চালাইতেছেন। হায়দরাবাদের নিজাম ইসলাম ধর্মাবলম্বী, সুতরাং হায়দরাবাদের অধিবাসীরা শতকরা ৭৫ জনের অধিক হইলেও কাঠমোল্লাগিরির জোরে সেখানে স্বেচ্ছাতন্ত্র অব্যাহত রাখা চাই। এইভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার বা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিকতা মুসলিম লীগের আদর্শ নয়, দুই জাতিতত্ত্বের পথে বিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতেই তাঁহারা আগ্রহান্বিত। মিঃ সুরাবর্দী দুই জাতিতত্ত্বের অবসান ঘটিয়াছে এই কথা প্রচার করিতেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে মুসলিম লীগের অবলম্বিত বর্তমান নীতির বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত সাহসের সঙ্গে তাঁহাকে একটা কথাও বলিতে শুনিতেছি না। শুনিতেছি, লীগ কাউন্সিলের আসন্ন অধিবেশনে লীগ ভাঙিয়া দেওয়া হইবে। ইহা খুব সুবুদ্ধির কথা এবং এই শুভকার্য নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইলে আপদ অনেকটা চুকিয়া যায়; কারণ ভারতের বর্তমান রাজনীতিতে লীগের অস্তিত্ব একান্তই অনর্থকর। লীগ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না, এইখানেই তাহার সাম্প্রদায়িকতা রহিয়াছে। কংগ্রেস বিশেষভাবে হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার দাবীর কথা তোলে না; অসাম্প্রদায়িক-ভাবে দেশ বা রাষ্ট্রের সকলের স্বার্থ রক্ষাকেই সে ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ধর্মগত কুসংস্কার হইতে এইভাবে ভারতের রাজনীতি যতদিন পর্যন্ত মুক্ত না হইবে, ততদিন বিরোধ-বৈষম্যের অবসান হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। মিঃ সুরাবর্দী সত্যই যদি প্রগতি-শীল মতবাদ সম্প্রসারণের সাহায্যে ভারতের দুর্গত জনগণের দুঃখ ও দুর্দশা দূর করিবার জন্য বেদনাবোধ করিয়া থাকেন, তবে মুক্তকণ্ঠে সাম্প্রদায়িকতাকে উৎখাত করিতে ব্রতী হউন। দুই নৌকায় পা দিয়া চলিবার পথ তাহা নয়।

কাশীর মন্দির

শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু

[শ্রীবিনায়ক মাসোজির সৌজন্যে]

রাজনীতিক পটভূমিকায় হায়দরাবাদ

শ্রীযতীন্দ্র সেন
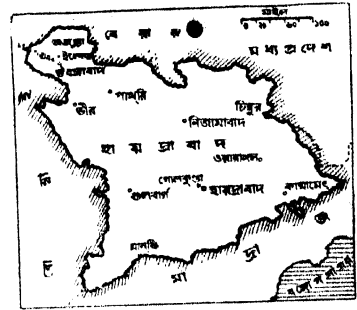
ভারতের ভাগ্যাকাশে কিছুকাল থেকে যে দুষ্ট গ্রহের উদয় হয়েছে তারই ফলে ভারতে গুপ্তঘাতী রাজনীতির খেলা চলেছে। হয়ত একদিন এই গুপ্তঘাতী রাজনীতি আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু সে কথা যারা ছায়াবাজীর পুতুল-নাচের রজ্জু চালনা করছে তারা আজ বুঝতে পারছে না। এই গুপ্তঘাতী রাজনীতির ফলেই প্রভূত রক্তমোক্ষণ করে' ভারত খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই, ভারতীয় রাষ্ট্রকে হীনবল ও পঙ্গু করবার জন্যে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে চক্রান্ত চলেছে এবং এই উদ্দেশ্যে যে কয়েকটি দুষ্টক্ষত সৃষ্টির অপকৌশল ও অপপ্রয়াস চলেছে, তার মধ্যে কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দরাবাদ প্রধান।

যারা দীর্ঘকাল ধরে' নির্লজ্জভাবে প্রশ্রিত ও স্পর্ধিত হয়েছে, যাদের রাজনীতির মূল কথা হ'ল বিদ্বেষ—যে বিদ্বেষের বিষক্রিয়া আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি—তাদের অভিধানে ন্যায়-নীতি, যুক্তি-বিচার বলে কোন কথা নেই। তার ফলে দাবী হয়ে ওঠে স্বার্থান্ধ, যুক্তিহীন। কোন দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের অধিকাংশ মুসলমান হলে এবং রাজা হিন্দু হলেও, অথবা রাজা মুসলমান হ'লেই এবং প্রজাদের অধিকাংশ হিন্দু হ'লেও, এই উভয় প্রকার রাজ্যকেই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে, এক্ষেত্রে সংলগ্নতার প্রশ্ন অবান্তর, নব গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় রাজ্যের প্রজাদের মতামত নেওয়ারও কোন আবশ্যকতা নেই,—তার কোন মূল্যও নেই। শাঁখের করাতের মতো এই দাবীর দুমুখো ধার যেখানে আসতেও কাটে, যেতেও কাটে,—ন্যায় ও যুক্তি সেখানে টিকতে পারে না। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে স্বৈরতন্ত্র যে অচল এবং প্রজাসাধারণের মতামত যে উপেক্ষা করা চলে না, প্রজাদের অসম্মতি সত্ত্বেও জুনাগড়ের নবাবের পাকিস্থানে যোগ দেওয়ার ফলে তথায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তা থেকে হায়দরাবাদের শিক্ষালাভ করা উচিত।

জুনাগড়ের নবাব স্যার তৃতীয় মহব্বৎ খাঁ নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্থান-রাষ্ট্রে যোগদান করে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন এবং কাশ্মীর ও জম্মুর মহারাজা হরিসিং পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দোদুল্যমান থেকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন থাকবার যে সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকেছিলেন, রাজনীতিক বিপ্লবের প্রচণ্ড অভিঘাতে তার পটপরিবর্তন হয়েছে। এই দুই রাজ্যের নাটকীয় পরিণতি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক দেশীয় রাজ্যসমূহকে নবতম ঐতিহাসিক গতিপথের ইঙ্গিত প্রদান করছে।

হায়দরাবাদের নিজাম স্যার মীর ওসমান আলি খাঁ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার জন্যে নিযুক্ত পূর্বতন কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে সম্প্রতি নিযুক্ত প্রতিক্রিয়াশীল কমিটির মারফতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা ব্যাপদেশে বৃথা কালহরণ করছেন এবং 'এক পা এগুই তো দু'পা পেছুই'-নীতি অবলম্বন করে,

হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম-উল-মুলক্ চিন্‌কিলিচ্ খাঁ (আসফ জাহ্)

যতদূর মনে হয়, শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হবার জন্য সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় করছেন এবং প্রগতিশীল প্রজা আন্দোলনের অভিসংঘাতে বিপন্ন ও শঙ্কিত হয়ে বিষময় সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি ও প্রচণ্ডতম দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুর্কমেন-জাতীয় যে বীরপুঙ্গব নিজাম রাজ্যের পত্তন করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর নিজাম ওসমান আলি খাঁও তাঁরই মধ্যযুগীয় নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে রাজ্য শাসন করছেন,—শত প্রকারে নিপীড়িত প্রজাবৃন্দের বুকের ওপর দিয়ে কঠোর শাসনের রথচক্র বিজয়গর্বের দৃপ্ত মহিমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! এই মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন স্বৈরাচারী শাসক এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি যে, বিংশ শতাব্দী সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দী নয়,—তখন যা অনায়াস-সাধ্য ছিল, এখন তা দুঃস্বপ্নের মত। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী অথবা তার পূর্বতন আরও কয়েক শতাব্দী ছিল রাজ্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগ, আর বিংশ শতাব্দীতে সুরু হয়েছে সাম্রাজ্যের খান খান হয়ে—ধূলিসাৎ হয়ে ভেঙ্গে পড়বার যুগ।

বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ধারার অমোঘ গতিনির্দেশ স্বৈরতন্ত্রের অবসান সূচনা করছে। এই নির্দেশ উপেক্ষা করে যে সমস্ত মধ্যযুগীয় আড়ম্বর ও ক্ষমতাপ্রিয়, অলীক-শক্তিমদান্ধ দেশীয় রাজ্য এখনও স্বৈরতন্ত্রের অভিলাষী এবং গণতন্ত্রের নামে আতঙ্কিত, তাদের জন্য বর্তমান যুগধর্মের চরম শিক্ষা উদ্যত হয়ে আছে। নবজাগ্রত গণতান্ত্রিক শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশকেও বিপর্যস্ত হয়ে মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদী নীতি-পরিহারে বাধ্য হতে হয়েছে। ব্রিটিশ-শক্তির তুলনায় দেশীয় রাজ্যগুলি ছোট-বড় কয়েকটি বুদ্বুদ মাত্র!

ইংরেজ-শাসনের যুগে যারা ছিল বিদেশীয় প্রভুর পদলেহী বিশ্বস্ত ভৃত্য, পরশাসন-মুক্ত দেশে,—স্বাধীন দেশে আজ তাদের মনে দেখা দিয়েছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা! বিদেশী প্রভুর সম্মুখে যারা মস্তক তিলমাত্র উন্নত করে দাঁড়াতে, কণ্ঠ সামান্যতম উচ্চ স্বর-গ্রামে চড়িয়ে দন্তস্ফুট করতে সাহস করেনি, আজ তারা ভারতের বহু ক্লেশ, বহু ত্যাগ, বহু আত্মবলির পর অর্জিত স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জ্যামুক্ত ধনুকের মত মেরুদণ্ড সোজা করে স্বাধীনতার স্বপ্ন-সৌধ রচনায় রত হয়েছে। ভারতের সংহতি ও স্বাধীনতার এরা মূর্তিমান অপহ্নব, ঘোরতর শত্রু।

প্রকৃত কথা এই যে, এরা এদেশে স্বতন্ত্র অথবা বিদেশী হয়েই রয়ে গেছে, এদেশের নাড়ীর সঙ্গে এদের যোগ নেই। এদেশের কল্যাণ এদের অলীক কল্পনা-বিলাস মাত্র,—শাসন, শোষণ আর ঐশ্বর্য আড়ম্বর ও বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে মধ্যযুগীয় শাসকোচিত দাপট
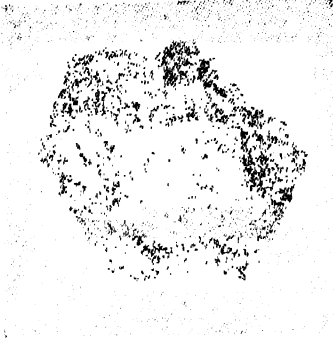
উপরে :—বোধিদ্রুম-অঙ্কিত অন্ধ্ররাজগণের কয়েকটি মুদ্রা। ডান পাশে :—সুপ্রাচীন অন্ধ্ররাজগণের 'প্রতিষ্ঠান' (আধুনিক পাইথান) নগরীর ধ্বংসাবশেষের একটি দৃশ্য।
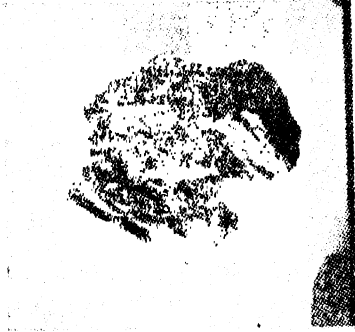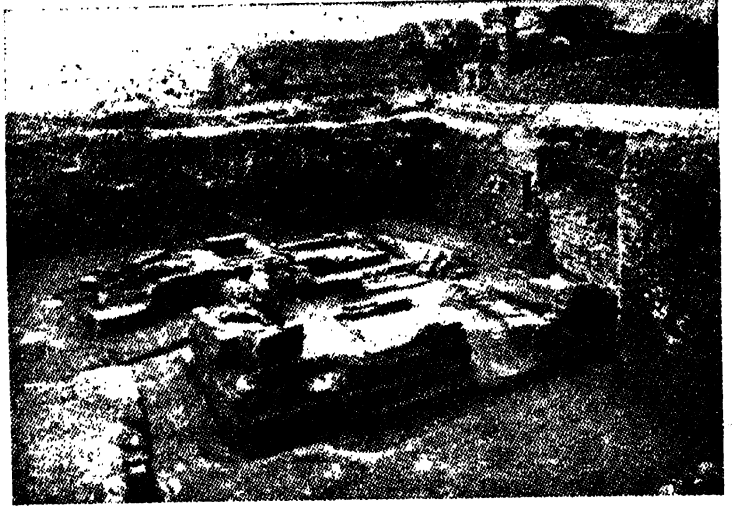
উপরে :—কয়েকটি মুদ্রা এক সংগে লেগে আছে। যে বস্ত্র খণ্ড দিয়ে এগুলি বাঁধা ছিল, তার দাগ এখনও এগুলির গায়ে লেগে আছে। ডান পাশে :—প্রতিষ্ঠান নগরীর পয়ঃ-প্রণালীর নিদর্শন।

ডান পাশে :—পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্যাদি উদ্ধারের জন্য গভীর খাত খনন করা হয়েছে। নীচে :—স্বস্তিক চিহ্ন-অঙ্কিত একটি মুদ্রা।

অজন্তা : ১নং গুহাভ্যন্তরে বিরাট বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি

ইলোরা : প্রসিদ্ধ কৈলাস মন্দির প্রাঙ্গণে একটি স্তম্ভ ও অন্যান্য গৃহ

দেখানই এদের মূলকথা। তাই ভারতের স্বাধীনতা এদের স্বাধীনতা নয়, ভারতীয় রাষ্ট্রের অখণ্ড সত্তার মধ্যে এদের সত্তা নিহিত নয়। যথেচ্ছ শোষণ ও স্বৈরশাসন-বিরোধী গণতন্ত্র ও প্রগতিশীলতার নামে এদের ভয়. তাই বশংবদ রাজকুলের একমাত্র শরণ ইংরেজ শাসনের পক্ষপুট ছায়ার অবসান ঘটায় এরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

এদের মধ্যে যারা কালের গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারছে না বা পারবে না, তাদের অস্তিত্বের অবলোপ বা পূর্বতন স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই ঐতিহাসিক শিক্ষালাভ করেছে জুনাগড় আর কাশ্মীর। হায়দরাবাদ আজ কোন পথে চলেছে, অদূর ভবিষ্যতে সে প্রশ্নের উত্তর দেবেন হায়দরাবাদের ভাগ্যবিধাতা।

হায়দরাবাদের ভৌগোলিক বিবরণ

তিনদিকে মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কর্তৃক বেষ্টিত হায়দরাবাদ যেন দাক্ষিণাত্যের ঠিক মর্মস্থলে অবস্থিত। জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দরাবাদের স্থান প্রথম: আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয়,--কাশ্মীরের পরেই এর স্থান। লোকসংখ্যা ১৯৪১ সালের গণনা অনুসারে ১,৬৩,৩৮,৫৩৪, আয়তন ৮২,৬৯৮ বর্গমাইল। একদা প্রথম শ্রেণীর রাজ্য ফ্রান্সও হায়দরাবাদ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১২ ভাগ মুসলমান এবং ৮৮ ভাগ হিন্দু ও অন্যান্য হলেও এবং গড়ে বার্ষিক ১৫,৮২,৪৩,০০০, টাকা রাজস্বের অধিকাংশ হিন্দুদের দ্বারা প্রদত্ত হয়ে থাকলেও রাজ্যের তথাকথিত শাসনপরিষদে, শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে, সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে হিন্দুরা অবহেলিত।

রাজ্যের অধিবাসীদের শতকরা ৫০ জন তেলেগু-ভাষী, ৪৫ জন মারাঠী ও কানাড়ী-ভাষী এবং মাত্র ৫ জন উর্দু-ভাষী হ'লেও হায়দরাবাদে উর্দুই রাষ্ট্রভাষা, শিক্ষার মাধ্যম উর্দু, আদালতের ভাষাও উর্দু। নগণ্যসংখ্যক উর্দু-ভাষীর জন্য বিপুল সংখ্যক অ-উর্দু-ভাষীদের যে শিক্ষা ও বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অসুবিধা হয়, তা ধারণাতীত।

নিজাম রাজ্যের শাসন পরিষদের মোট ২২ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন সরকারী ও ৮ জন মাত্র বে-সরকারী 'নির্বাচিত' সদস্য। সদস্যগণের প্রায় সকলেই মুসলমান, নগণ্য-সংখ্যক হিন্দু সদস্যের শাসন পরিষদে স্থান হয়ে থাকে।

"১৯১৩ থেকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে ৮২ জন সিভিল সার্জেন নিযুক্ত করা হয়, তার মধ্যে মাত্র ১ জন হিন্দু।...হাইকোর্টের ৯ জন জজের মধ্যে ২ জন মাত্র হিন্দু, ১৫ জন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে মাত্র ১ জন হিন্দু, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সবাই মুসলমান। ১০০ জন মুন্সেফ বা তালুক অফিসারের মধ্যে ১০ জন মাত্র হিন্দু। কেরাণী এবং পিওন প্রায় সবাই মুসলমান। নতুন কোন পদে লোক নিয়োগের দরকার হলে হিন্দুদের কোন মতেই নেওয়া হয় না, কোন পদ খালি হলে মুসলমানদেরই আহ্বান করা হয় সর্বপ্রথম।" (১)

১৯৪৫ সালের ১লা ডিসেম্বর সেকেন্দ্রাবাদের শাসন কর্তৃত্বও ইংরেজ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিজাম বাহাদুরকে প্রদত্ত হয়।

হায়দরাবাদে ১৭টি জেলা ও১০৮টি সাব-জেলা আছে। হায়দরাবাদের একটি মাত্র মিউনিসিপ্যালিটি -- হায়দরাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি মাত্র ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটির মোট সদস্য-সংখ্যা ৩৬ জনের মধ্যে ২৩ জনই সরকারী সদস্য, মাত্র ১৩ জন নির্বাচিত। এই ১৩ জনের আবার মাত্র ১০ জন কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট এক বিশেষ নির্বাচক-মণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত। (২)

হায়দরাবাদের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষি-জীবী। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম, তৈলবীজ ও তুলা প্রধান।

খনিজদ্রব্যের মধ্যে হায়দরাবাদ রাজ্যে

---

(১) ও (২) "দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন" শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিলাবাদ জেলার টান্ডুরে একটি ও বরঙ্গল জেলার যেলান্ডু তাল্লুকের কোঠাগুড়িয়াম্ নামক স্থানে একটি—এই দু'টিকয়লার খনি আছে। ১৯৪২ সালে ১২,১৪,০১৯ টন পর্যন্ত কয়লা উত্তোলিত হয়েছিল। গোলকুন্ডায় সোণার খনি অবস্থিত।

এই রাজ্যে মোট ৬টি কাপড়ের মিল আছে। তা ছাড়া ১৩টি দিয়াশলাইয়ের কারখানা, ২টি সিগারেটের কারখানা, ১৬টি বোতামের কারখানা, ১টি সিমেন্টের কারখানা, ১টি কাচের কারখানা, ১টি বিস্কুটের কারখানা, ১টি কাগজের মিল ও অন্যান্য কয়েকটি কারখানা আছে। কোটাপেটে সিরপুর কাগজের মিলে সংবাদপত্র-মুদ্রণোপযোগী কাগজ প্রস্তুত করবার চেষ্টা চলছে।

হায়দরাবাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান

অজন্তা:—ঔরঙ্গাবাদ থেকে ৫৫ মাইল দূরবর্তী অজন্তা পর্যন্ত বরাবর মোটর চলে। অজন্তা শহর থেকে চার মাইল দূরে গুহাগুলি অবস্থিত।

খৃঃ পূঃ ২০১ অব্দ থেকে ৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত এই গুহাগুলি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ্ এই গুহাগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। গুহাগুলি দুইভাগে বিভক্তঃ (১) বিহার ও (২) (২) চৈত্য। বিহারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও শ্রমণগণ বাস করতেন এবং চৈত্যে উপাসনা হ'ত। পাথর কেটে তৈরি করা কারুকার্যশোভিত কক্ষগুলির দেয়ালে গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনী নিয়ে অঙ্কিত সুন্দর সুন্দর বৃহদাকৃতি প্রাচীর-চিত্র ও অন্যান্য নানা বিষয়ক প্রাচীর-চিত্রও আছে। চিত্রগুলি সুপ্রাচীন ভারতের কলা-নৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন আছে। বহু শতাব্দী যাবৎ এই গুহা-গুহগুলি লতাগুল্ম ও বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন এবং পক্ষী ও হিংস্র পশুর আবাসভূমি হয়েছিল।

ইলোরা:—অজন্তা ও ইলোরার ইতিহাস-খ্যাত প্রাচীন ভাস্কর্য নিদর্শন বিশ্ববিশ্রুত। পাহাড় কেটে অপূর্ব কারুকার্যখচিত গুহ, মন্দির ও নানা মনোরম মূর্তি নির্মিত হয়েছে।

ইলোরার ৩৪টি গুহার মধ্যে হিন্দুগণ ১৭টি, বৌদ্ধগণ ১২টি ও জৈনগণ ৫টি নির্মাণ করিয়েছিলেন। ঢালু পাহাড়ের গা কেটে ইলোরার গুহাগুলি নির্মিত হয়েছে, আর অজন্তার গুহাগুলি নির্মিত হয়েছে খাড়া পাহাড়ের গা কেটে। ঢালু পাহাড়ের গা কেটে নির্মিত হয়েছিল বলে ইলোরার প্রত্যেকটি গুহার সামনেই চত্বরের মত কিছুটা জায়গা আছে।

ইলোরার ১০নং গুহাকে বলা হয় "সূত্রধারের (ছুতোর) গুহা।" ঐতিহাসিকদের মতে সপ্তম শতকের প্রথম দিকে গুহাটি নির্মিত হয়েছিল। এই গুহার কারুকার্যময় রেলিং-বিশিষ্ট বারান্দা ও দরজার উপরে অশ্বত্থরাকৃতি গবাক্ষ দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। এই গুহার মধ্যে গ্যালারি, মন্দির ও একটি বিরাটকায় বুদ্ধমূর্তি আছে। হিন্দুগণ কর্তৃক যে সমস্ত গুহা নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে কৈলাসমন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রকূটবংশীয় কৃষ্ণরাজা এই কৈলাস মন্দির নির্মাণ করান। এরূপ কথিত আছে যে, এই মন্দির নির্মাণ করতে ২ লক্ষ টন পাথর কেটে সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল। এই মন্দিরের এক দেয়ালে লঙ্কাধিপতি রাবণ কৈলাস পর্বত নাড়াচ্ছেন—এই দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে।

জৈনগণ কর্তৃক নির্মিত ৩৩নং গুহাটিকে বলা হয় 'ইন্দ্রসভা'। এই গুহাটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে হয়। এই গুহার মধ্যবর্তী হল ঘরটিতে ১২টি স্তম্ভ আছে। দেওয়ালের মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে জৈন তীর্থঙ্করগণের মূর্তি খোদিত আছে।

পাইথান:—আধুনিক কালের পাইথান (প্রাচীন নাম 'প্রতিষ্ঠান') খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে অন্ধ্রবংশীয় শালিবাহনের রাজধানী ছিল। এরও বহু পূর্বে, সম্ভবত খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক অথবা তারও পূর্বে এই স্থানে অন্ধ্রগণের রাজধানী ছিল। গোদাবরী উপত্যকায় অবস্থিত এই স্থানটি বর্তমানে খনন করে বহু প্রাচীন প্রাসাদ, অট্টালিকা ও পয়ঃপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ বের করা হয়েছে। অন্ধ্রগণের কয়েকটি মুদ্রাও এই স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। পাইথান অন্ধ্র-বংশীয় দ্রাবিড়গণের গৌরবোজ্জ্বল সুপ্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করছে। প্রাচীন পালি-সাহিত্যে এই স্থানের বিবরণ আছে। এখানকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অলঙ্কার ও মণি-মাণিক্য, মালার গুটি প্রাচীন 'বারুগোজা' (আধুনিক ব্রোচ) বন্দর থেকে প্রাচীন গ্রীস, রোম ও মিশরে রপ্তানি হত।

হায়দরাবাদ রাজধানী:—এই শহরটি ভারতবর্ষে চতুর্থ স্থানীয়। এই শহরটি ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে গোলকুন্ডার তৎকালীন অধিপতি মহম্মদ কুলি খাঁ কর্তৃক স্থাপিত হয়। মুসী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরের ১২টি সিংহদ্বার আছে।

হায়দরাবাদ শহরে চরমিনার একটি দর্শনীয় ভবন। বর্গাকৃতি এই ভবনটির চারটি মিনারের এক একটি ১৯০ ফুট উঁচু এবং এর এক একটি পাশের বিস্তৃতি ১০০ ফুট। চরমিনারের নিকটে মক্কা মসজিদ অবস্থিত। এই মসজিদের তোরণদ্বারের নির্মাণ-কার্য ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্পূর্ণ করান। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কয়েকজন নিজাম পরলোক-গমন করেছেন, তাঁদের সমাধি আছে। চরমিনারের দক্ষিণে মহারাজা চান্দুলাল ও নবাব তেগ জঙ্গের কারুকার্যখচিত প্রাসাদ দুটি অবস্থিত।

শহর থেকে ৬ মাইল দূরে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮ সালে স্থাপিত) ও শহরের দক্ষিণভাগে নিজামের 'ফালাকনুমা' প্রাসাদ অবস্থিত। এই প্রাসাদে সাধরণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

গোলকুন্ডা:—গোলকুন্ডা ১৫১২ থেকে ১৬৮৭ খৃঃ—১৭৫ বৎসর যাবৎ কুতবশাহী রাজ্যের রাজধানী ছিল। গোলকুন্ডা দুর্গ ৩ মাইল দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দুর্গের গ্রানাইট পাথরে তৈরি ৮০টি বুরুজ আছে। এই সমস্ত গ্রানাইট পাথরের এক একটি খণ্ডের ওজন ১ টন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে গোলকুন্ডা রাজ্যের জনৈক মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই সম্রাট আওরঙ্গজেবের হস্তে এই দুর্গের পতন সম্ভব হয়।

দুর্গাভ্যন্তরে জাম্মি মসজিদ দর্শনীয়। দুর্গের প্রধান অংশের উচ্চতা ৩৫০ ফুট। দুর্গের আধ মাইল উত্তরে গোলকুন্ডার কুতব-শাহী মুসলমান নৃপতিগণের সমাধিক্ষেত্র। ১৭০ ফুট উঁচু মহম্মদ কুলির সমাধি-ভবন কারুকার্যময় ও দর্শনীয়। কুতবশাহিগণ ২০০ বৎসর যাবৎ এখানে রাজত্ব করেন।

পূর্বে ইউরোপীয়গণ বিশ্বাস করত এবং এখনও এদেশে এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, গোলকুন্ডায় হীরার খনি আছে এবং তাতে প্রচুর হীরা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে গোল-কুন্ডায় কোন হীরার খনি নাই। গোলকুন্ডায় এক সময় বহুসংখ্যক কারিগর বাস করত, যারা হীরা কেটে পালিশ করত। এ থেকে মনে হয়, তখন গোলকুন্ডা হীরার ব্যবসায় ক্ষেত্র ছিল এবং এখান থেকে বিভিন্ন দেশে হীরা চালান হ'ত বলেই হয়ত হীরার খনি আছে বলে গোলকুন্ডা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজাম রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত পুর্তিয়াল নামক স্থানে হীরা পাওয়া যেত। কৃষ্ণা জেলায় কোলার নামক স্থানেও হীরা পাওয়া যেত। এখানেই বিশ্ববিখ্যাত 'কোহিনূর' পাওয়া গিয়েছিল।

বিদর:—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,৫০০ ফুট উঁচু মালভূমিতে এই প্রাচীন স্থানটি অবস্থিত। নবম বাহমনী নৃপতি আহম্মদ শাহ্ ওয়ালি ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার আবহাওয়ায় আকৃষ্ট হয়ে এই নগর স্থাপন করে গুলবার্গা থেকে তাঁর রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত করেন। ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন সিংহাসন লাভ করেন এবং তিনি এখানে অনেক সুন্দর প্রাসাদ ও উদ্যান রচনা করেন। কালক্রমে বাহমনি রাজ্য ভেঙে গোলকুন্ডা, বিজাপুর, আহম্মদনগর বিদর ও বেরার এই পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়।

গুলবার্গা:—গুলবার্গার প্রথম অধিপতি আলাউদ্দিন বাহমণি শাহ্ অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। ঐতিহাসিক ফিরিশ্তার বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি দশ হাজার গাঁট স্বর্ণ-নির্মিত বস্ত্র, মখমল ও সাটিন তাঁর অমাত্যদের উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি ২০০ খানা মণিমাণিক্যখচিত তরবারি অমাত্যদিগকে প্রদান করেছিলেন।

ফিরোজ শাহ্ বাহমণির রাজত্বের সময় গুলবার্গার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ১৩টি ভাষায় তাঁর ১৩ জন বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি

...ধ্রে সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। গুলবার্গায় ...র কারুকার্যখচিত সমাধি-সৌধটি দর্শনীয়।

গুলবার্গায় ৩৮,০০০ বর্গ ফুট আয়তন ...শিষ্ট জাম্মি মসজিদ ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ...হম্মদ শাহ্ বাহমণির রাজত্বকালে নির্মিত হয়। ...ই মসজিদের কিছু দূরে চিশ্‌তি বংশীয় ...কির বন্দর নওয়াজের দরগাটি প্রসিদ্ধ। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ্ ওয়ালি এই দরগা তৈরি করিয়ে দেন এবং ফকিরকে কয়েকটি বড় বড় গ্রাম ও মূল্যবান দ্রব্য উপঢৌকন দেন।

ঔরঙ্গাবাদ:—দাক্ষিণাত্যের এই প্রাচীন রাজধানী বর্তমানে নিজাম-রাজ্যের একটি ঐশ্বর্যপূর্ণ শহর। এই শহরের উত্তর-পূর্বে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মহিষী বেগম রাবিয়ার সমাধি-

হায়দরাবাদের বর্তমান নিজাম মীর ওসমান আলি খাঁ

সৌধ বিদ্যমান। রাজপুতনা থেকে তিন শতাধিক গাড়ি ভর্তি মার্বেল পাথর এনে এই সমাধি ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত গাড়ির সবচেয়ে ছোট গাড়িখানি ১২টি বলদে টেনেছিল। এর কাছেই আওরঙ্গজেবের ধর্মোপদেষ্টা চিশ্‌তি বংশীয় বাবা শাহ্ মজফ্‌ফরের সমাধি। এই সমাধিটির নাম 'পান-চাক্কি'। শহরের দক্ষিণ-পূর্বে আওরঙ্গজেব নির্মিত দুর্গ-প্রাসাদ। ঔরঙ্গাবাদে বেগম রাবিয়ার সমাধিভবনের নিকটবর্তী গুহাগুলি দ্রষ্টব্য। গুহাগুলির মধ্যে নয়টি উল্লেখযোগ্য। গুহাগুলি বৌদ্ধ কীর্তির নিদর্শন এবং ইলোরার গুহাগুলির মত। গুহাগুলির কোনটা মন্দির, কোনটি বা সভাগৃহ। কতকগুলি গুহার কারুকার্য চিত্তাকর্ষক।

রোজা:—ঔরঙ্গবাদের নিকটবর্তী উচ্চ-প্রাচীর বেষ্টিত ও সাতটি সিংহদ্বারবিশিষ্ট শহর। এখানে অতি সাধারণ একটি সমাধিতে প্রবল প্রতাপশালী মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নশ্বরদেহ সমাহিত রয়েছে।

দৌলতাবাদ:—দৌলতাবাদের প্রাচীন নাম দেবগিরি। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক এই স্থানের নামপরিবর্তন করে দৌলতাবাদ রাখেন।

১২৯৩ খৃষ্টাব্দে, আলাউদ্দিন খিলিজি দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের পূর্বে এই স্থান দখল করে প্রায় ৭॥ হাজার সের খাঁটি সোনা, প্রায় ১০ হাজার সের রৌপ্য, প্রায় ২৫ সের হীরা ও প্রায় ৮৭॥ সের মুক্তা লুণ্ঠন করেন। এখানে মহম্মদ তোগলক ২৫ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্মাণ করান। দুর্গ-প্রাকারে এখনও কতকগুলি কামান স্থাপিত আছে দেখা যায়। কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই ৩০ ফুট দীর্ঘ একখানি ছবি এখনও দুর্গমধ্যে বিদ্যমান।

হানামকোন্দ:—নিজাম-রাজ্যে বহু প্রাচীন হিন্দু মন্দির বর্তমান, তন্মধ্যে হানামকোন্দে অবস্থিত মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অপূর্ব কারুকার্যখচিত এক হাজার স্তম্ভশোভিত মন্দিরের সুন্দর হলটি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কাকতীয় বংশের রুদ্রদেব এই মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দির গাত্রে বীরযোদ্ধা দানশীল রুদ্রদেবের কীর্তিকাহিনী উৎকীর্ণ আছে।

প্রাচীন ইতিহাস

দক্ষিণ ভারতের তথা হায়দরাবাদের পৌরাণিক যুগের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্য পর্বত থেকে দক্ষিণ দিকে গিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে ইন্দোনেশিয়ায় আর্য সভ্যতা বিস্তারের জন্য গিয়েছিলেন। যবদ্বীপে অগস্ত্য মুনির প্রস্তর মূর্তি অদ্যাপি বর্তমান। অগস্ত্য মুনিই দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়গণের মধ্যে আর্য সভ্যতার বিস্তার সাধন করেছিলেন বলে অনুমিত হয়।

খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকে অন্ধ্রগণ দক্ষিণ ভারতে প্রবল ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের সময় মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়ও হায়দরাবাদের কতকাংশ তাঁর শাসনাধীনে ছিল।

মৌর্য সম্রাটগণ খৃঃ পূঃ ৩২২ থেকে ১৮৫ শতক পর্যন্ত ১৩৭ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করেন এবং এই সময় পর্যন্ত হায়দরাবাদ ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অংশ তাঁদের শাসনাধিকারে ছিল। মৌর্যগণের পর অন্ধ্রজাতীয় শালিবাহন বংশ কৃষ্ণা নদী থেকে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করে। দাক্ষিণাত্য থেকে মগধ, মধ্যভারত, মালব পর্যন্ত এই বংশের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। গোদাবরী নদীর তীরবর্তী 'প্রতিষ্ঠান' বা 'পাইথান' (Paithan বা 'পাইটুন' Pytoon) শালিবাহনদের পশ্চিম রাজধানী এবং কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী বেজওয়াড়ার সন্নিহিত 'ধান্যকটকে' এদের পূর্ব রাজধানী অবস্থিত ছিল। সিমুক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর ভারতের কতকাংশে একশ' বছরের উপর শান্তিতে আধিপত্য করবার পর অন্ধ্র-সাম্রাজ্য গ্রীক, শক ও পার্থিয়ানদের আক্রমণে উপদ্রুত হতে লাগল। মালব ও কাথিয়াবাড়ের শক-রাজগণ অন্ধ্রগণ কর্তৃক অধিকৃত অংশ পুনরায় দখল করে নিয়ে দাক্ষিণাত্যেরও উত্তর-পশ্চিম অংশ জয় করল। এর ফলে অন্ধ্রগণ-অধিকৃত সমগ্র দক্ষিণ ভারত শকদের দ্বারা বিজিত হবার আশঙ্কা দেখা গেল। এই সময় শাতবাহন বা শালিবাহন বংশের গৌতমপুত্র শাতকর্ণী ১০৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়ে শকদের পরাজিত করে
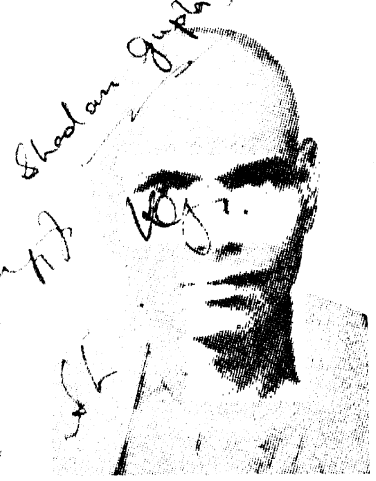
হায়দরাবাদ স্টেট কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থ

কেবল যে মালব ও কাথিয়াবাড় পুনরায় দখল করে নিল তা নয়, গুজরাট ও রাজপুতনারও বিস্তৃত অংশ জয় করল। ২৫ বৎসর রাজত্বের পর অন্ধ্র-সম্রাট গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পুত্র পুলেমায়ী সিংহাসনারূঢ় হন।

এই সময় মালব ও কাথিয়াবাড়ের শকগণ রুদ্রদমন নামক পরাক্রান্ত শক-নৃপতির নেতৃত্বাধীনে মিলিত হয়ে প্রাধান্য লাভ করে এবং উত্তর ভারত থেকে অন্ধ্রদের অধিকারচ্যুত করে। পুলেমায়ীর সঙ্গে রুদ্রদমনের কন্যার বিবাহ হলেও অন্ধ্র ও শকদের কলহ ও সংঘর্ষের অবসান ঘটে না। দক্ষিণ ভারতের মধ্যেই অন্ধ্র সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে ২২৫ খৃষ্টাব্দে শালিবাহন (অথবা শাতবাহন) বংশের শাসনকাল শেষ হয়। অন্ধ্র সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ কদম্ব, আভীর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে

যায় এবং তজ্জন্য স্বভাবতই শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

অন্ধ্রদের পতনের সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় শতক থেকে দাক্ষিণাত্যে পহ্লবেরা ক্রমশঃ প্রবল হতে থাকে। পহ্লবেরা পার্থিয়ান বলে কথিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা দাক্ষিণাত্যেরই অধিবাসী। তৃতীয় শতকের মধ্যে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে পহ্লবদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

চতুর্থ শতকের প্রথমেই বেরারের নিকটে ভকতকবংশীয় রাজগণ প্রবল হয়ে ওঠেন। এই বংশের ৮ জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। প্রথম নৃপতি মহারাজা প্রথম প্রবর সেন সম্রাট বলে অভিহিত হয়েছিলেন এবং বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই বংশের চতুর্থ নৃপতি দ্বিতীয় রুদ্র সেন গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা শ্রীপ্রভাবতীকে বিবাহ করেছিলেন। অষ্টম ও শেষ রাজা হরি সেন উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতের নানা অংশে ও অন্ধ্র দেশসমূহে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে ভকতক বংশের পতন হয়। দু'শত বছর রাজত্বের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ভাস্কর্য ও কারুশিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। অজন্তার কোন কোন গুহা ও মন্দির ভকতকগণ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে চালুক্য বংশীয় কীর্তিবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীর বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের উপর আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

৭৫৩ খৃষ্টাব্দে চালুক্য বংশের পতন হয়। দ্বিতীয় কীর্তি বর্মন দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশীয় দন্তীদুর্গ কর্তৃক পরাজিত হন। দন্তীদুর্গের খুল্লতাত কৃষ্ণরাজা ইলোরার পাহাড় কেটে কৈলাস মন্দির নির্মাণ করান। ইলোরার গুহাবলীর ভাস্কর্য-নৈপুণ্য বিশ্ববাসীর বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

দন্তীদুর্গ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তাঁর কাকা কৃষ্ণরাজা সিংহাসনারূঢ় হন। তাঁর পরবর্তী নৃপতি দ্বিতীয় গোবিন্দ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। দ্বিতীয় গোবিন্দের পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুব, ধ্রুবের পর গোবিন্দ (৭৯৪—৮১৪), তাঁর পর অমোঘবর্ষ (৮১৪—৮৭৭) রাজা হন। অমোঘবর্ষের সময় থেকেই রাষ্ট্রকূটগণ শক্তিহীন হয়ে পড়েন এবং পাল ও গুর্জর প্রতীহারগণ প্রবল হয়ে উঠতে থাকেন। অমোঘবর্ষ বর্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত 'মানাক্ষেত' (বর্তমান মালখেদ) নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

রাষ্ট্রকূট বংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণ (অকালবর্ষ) ৯২০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন, তাঁর পর তাঁর পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র রাজা হন এবং সর্বশেষ রাজা দ্বিতীয় কর্ক চালুক্য তৈলপগণ কর্তৃক ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হন। এই বংশের মোট ১৪ জন নৃপতি দক্ষিণ ভারতে এবং উত্তর ভারতের কতকাংশে ৭৫৩ থেকে ৯৭৩ পর্যন্ত ২২০ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করেন।

রাষ্ট্রকূটগণের পর আর একটি বড় বংশ দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করে। এই বংশেরই নাম চালুক্য-তৈলপ। 'কল্যাণ' নামক স্থানে (বর্তমান নিজাম রাজ্যের কল্যাণপুর) চালুক্য-তৈলপ বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল বলে এই বংশ 'কল্যাণ' নামেও পরিচিত।

এই বংশের প্রথম রাজা তৈল দশম শতকের চতুর্থ পাদে (৯৭৩ অথবা ৯৭৭) হায়দরাবাদের উত্তরাংশের তৎকালীন অধিপতি 'পরমার'-বংশীয় রাজাকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের সুদূর দক্ষিণে চোল ও চেলদিগকে এবং চেদী রাজ্যের 'কালাচুরি' বা 'হৈহয়'দিগকেও পরাজিত করেন। এইভাবে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ও মধ্য ভারতের কতকাংশে এঁদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৈল-এর পর জয়সিংহ, দ্বিতীয় সোমেশ্বর, বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল (২য় অথবা ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য), তৃতীয় সোমেশ্বর ও চতুর্থ সোমেশ্বর রাজত্ব করেন। তৃতীয় সোমেশ্বরের (১১২৭) সময় থেকেই চালুক্য-তৈলপবংশীয়দের অবনতি ঘটতে থাকে। চতুর্থ সোমেশ্বরের (১১৮৩) পর চালুক্য তৈলপ ও কালাচুরিবংশীয়দের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগে যাদব বংশীয়দের অভ্যুদয় হয়। যাদবগণ পৌরাণিক যদু ও শ্রীকৃষ্ণের বংশোদ্ভূত বলে দাবী করতেন।

যাদব বংশীয় ভিল্লম চালুক্য ও কালাচুরিদের পরাভূত করে দেবগিরিতে (বর্তমান নিজাম রাজ্যের দৌলতাবাদে) রাজ্য স্থাপন করেন।

ভিল্লম্ প্রায় পাঁচ বৎসর (১১৮৭—১১৯১) রাজত্ব করবার পর মহীশূরের অন্তর্গত দ্বারসমুদ্রের 'হয়শাল' নামে পরিচিত যাদব বংশের অপর শাখার দ্বিতীয় বীরবল্লাল কর্তৃক সম্ভবত নিহত হন। ভিল্লমের পৌত্র সিংঘন হয়শালদের পরাজিত করেন এবং উত্তর ভারতের মুসলমান শাসক ও নানা হিন্দু নৃপতিকে পরাজিত করে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর-ভূভাগ থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী অতিক্রম করেও তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত করেন।

সিংঘনের প্রপৌত্র রামচন্দ্র ১২৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা হন এবং ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজ্য আলাউদ্দীন খিলিজী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রামচন্দ্র পরাজিত হয়ে আলাউদ্দীন খিলিজীকে একালীন ৬০০ মণ মুক্তা, ২ মণ মণিমাণিক্য, ১০০০ মণ রৌপ্য, ৪০০০ খণ্ড রেশম বস্ত্র ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস দিয়ে, রাজ্যের কতকাংশ ছেড়ে দিয়ে এবং বাৎসরিক করদানে প্রতিশ্রুত হয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। কয়েক বৎসর পর রামচন্দ্র করদানে অসম্মত হওয়ায় মুসলমান সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক পরাজিত হন। পাঁচ বৎসর পরে রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্কর পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৩১২ সালে মালিক কাফুর কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

আলাউদ্দীন খিলিজির মৃত্যুর পর রামচন্দ্রের জামাতা হরপাল দাক্ষিণাত্যে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 'বিদ্রোহী' হরপাল মুসলমান সৈন্যগণ কর্তৃক পরাজিত এবং বন্দী হয়ে দিল্লীতে নীত হন। জীবন্ত অবস্থায় তাঁর গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এইভাবে হায়দরাবাদে তথা দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়।

হরপালের শোচনীয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে হিন্দু শাসনের কার্যত অবসান ঘটলেও হায়দরাবাদের তেলিঙ্গনা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আরও প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। এই রাজ্যের কাকতীয়বংশীয় অধিপতি শেষ চালুক্য সম্রাটগণের সামন্ত-নৃপতি হিসাবে রাজত্ব করছিলেন। হায়দরাবাদের উত্তর-পূর্বে বরঙ্গল নামক স্থানে তাঁর রাজধানী ছিল। চালুক্য বংশের পতনের পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৪২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করবার পর এই বৎসর বাহমনি বংশীয় আহম্মদ শাহ্ কর্তৃক পরাজিত হন এবং এই রাজ্যের বিলোপ সাধিত হয়। এই রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজগণের মধ্যে গণপতির নাম (১৩শ শতকের প্রথমার্ধ) উল্লেখযোগ্য। ইনি চোল, কলিঙ্গ, সেবানা, কর্ণাট ও লাট (গুজরাটের পূর্বাংশ)-এর নৃপতিগণকে পরাজিত করেছিলেন। এঁর পর এঁর কন্যা রুদ্রদামা কৃতিত্বের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন।

মুসলমান শাসনকাল—হায়দরাবাদ নিজাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আলাউদ্দীন খিলিজির আক্রমণের ফলে দাক্ষিণাত্যে সার্বভৌম হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটে এবং প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত পাঠানগণের করতলগত হয়। বর্তমান হায়দরাবাদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পাঠান-গোষ্ঠীর শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। গোলকুণ্ডা ও হায়দরাবাদ সহর ১৫১২ থেকে ১৬৮৭ খৃঃ পর্যন্ত কুতবশাহী নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। বিদর ও গুলবার্গা বাহমনী বংশের এবং দৌলতাবাদ (প্রাচীন দেবগিরি) তোগলক বংশের শাসনাধীন হয়।

১৬৮৭ খৃঃ পর্যন্ত সমগ্র হায়দরাবাদ ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য কতকগুলি অংশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই সমস্ত স্থানে পাঠান-শাসনের অবসান ঘটে।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মোগল-সম্রাট

মনবংশীয় চিন্ কিলিচ্ খাঁকে 'নিজাম-মুলক্' উপাধি দিয়ে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ক করে পাঠান। ইনি পরে আসফ জাহ্ গ্রহণ করেন। ইনি ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে দরাবাদ রাজ্য স্থাপন করেন। ইনিই বর্তমান ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পর থেকে দরাবাদের শাসকগণ 'নিজাম' উপাধি ধারণ আসছেন।

হায়দরাবাদের বর্তমান নিজাম জেনারেল মীর ওসমান আলি খাঁ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গ্রহণ করেন এবং ১৯১১ সালে গদীতে রোহণ করেন। ইংরেজ শাসনে হায়দরাবাদের জাম ২১টি তোপধ্বনির সম্মান প্রাপ্ত রছিলেন।

হায়দরাবাদে প্রজা-আন্দোলন ও বর্তমান পরিস্থিতি

হায়দরাবাদের নিজাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নীদিগের অন্যতম। হায়দরাবাদের আধুনিক গের ইতিহাস ও বর্তমান ঘটনাবলী লোচনা করলে দেখা যায়, শোষণের দ্বারা ঐশ্বর্যবৃদ্ধি ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনই হচ্ছে র্তমান নিজামের মূল মন্ত্র। ১৬ কোটি টাকার জস্বের অধিকাংশই যে সংখ্যাগুরু (৮৮%) হিন্দু প্রজাগণ প্রদান করে, তারাই য় বিচার, শিক্ষা, চাকরী, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে একরূপে বঞ্চিত। হিন্দুরা হায়দরাবাদ রাজ্যে কিরূপ বৈষম্যদুষ্ট ব্যবহার পেয়ে থাকে, তার সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে উল্লিখিত উদাহরণগুলি থেকেও কতকটা ধারণা করা যাবে।

অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের মত হায়দরাবাদ রাজ্যেও নিজাম ও তাঁর শাসন পরিষদের বশংবদ সদস্যগণের খেয়ালখুশি অনুসারে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। নামে-মাত্র যে শাসন পরিষদ আছে, শাসনব্যবস্থায় তার কোন বিশেষ ক্ষমতাই নাই। অনেক আইন শাসন পরিষদে গৃহীত হওয়ার আগেই প্রযুক্ত হয়। বৎসরে ২।১ বার মাত্র শাসন পরিষদের অধিবেশন বসে।

অনেক সংবাদপত্রের রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ, কোন কোন সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত ও প্রকাশ বন্ধ, রাজনীতিক সভা তো দূরের কথা, কোন প্রকার সামাজিক সভা বা বিশেষ উপলক্ষ্যে আহূত সাধারণ সভা সম্বন্ধেও কড়াকড়ি এবং তৎসম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি থেকেই হায়দরাবাদ রাজ্যে জনমতের কণ্ঠরোধ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপসাধন করবার দৃষ্টান্ত জানা যায়।

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে লক্ষ লক্ষ নির্মম নিপীড়ন-নিষ্পিষ্ট প্রজার দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য মহারাষ্ট্রীয় সম্মেলন নামে একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৮ সালের মে মাসে এই প্রতিষ্ঠানের একটি অধিবেশনের জন্য নিয়মানুযায়ী ১৫ দিনের স্থলে তিন মাস আগে আবেদন করেও অনুমতি
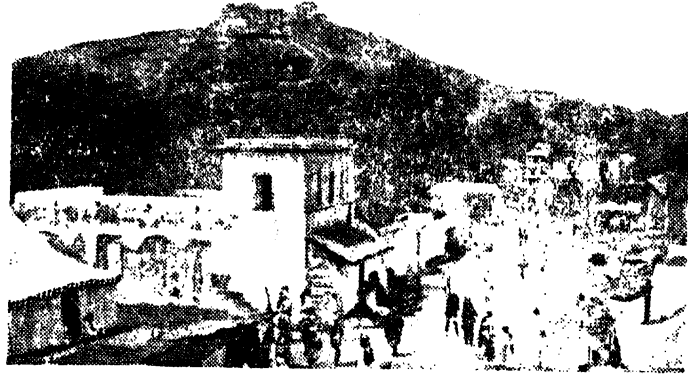
হায়দরাবাদের উত্তর-পূর্বে উপকণ্ঠে অবস্থিত চাদরঘাটের একটি বাজার

পাওয়া গেল না। অনেক আবেদন নিবেদনের পর সর্তাধীনে অনুমতি পাওয়া গেল। সভাপতির অভিভাষণের অনেকাংশ সরকারী 'সেন্সরে'র কৃপায় কেটে বাদ দেওয়া হল। অবশেষে তারিখ পিছিয়ে দিয়ে ২রা ও ৩রা জুন করা হ'ল। কিন্তু প্রথমদিনের অধিবেশনের পর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন সরকারী আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হল।

হায়দরাবাদে গান্ধী জয়ন্তী উদ্‌যাপনের জন্য আহূত সভাও নিজাম সরকারের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হায়দরাবাদ রাজ্যে হিন্দুগণ যে সমস্ত অবিচার ও উৎপীড়ন ভোগ করছে, তার কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা গেল:—

(১) হায়দরাবাদের জনসংখ্যার অতি নগণ্য ভগ্নাংশ উর্দুভাষী হলেও উর্দুই ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ও স্কুল-কলেজে শিক্ষার মাধ্যম। এতে রাজ্যের শতকরা ৫০ জন তেলেগুভাষী ও ৪৫ জন মারাঠী ও কানাড়ীভাষী ছাত্রের শিক্ষার যথেষ্ট অসুবিধা ও ব্যাঘাত হয়।

(২) রাজ্যের আদালতের ভাষাও উর্দু। এতে রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী যে হিন্দু, তাদের প্রভূত অসুবিধা হয় এবং অনেক সময় বিচার-বিভ্রাট হয়।

(৩) চাকরীর ক্ষেত্রে হিন্দুগণ চির-উপেক্ষিত।

(৪) বৈষম্যমূলক আইনের ফলে রাজ্যের অধিকাংশ ভূমি মুসলমান মহাজনদের করতলগত হচ্ছে।

(৫) বিচার বিভাগে সচরাচর হিন্দুগণের ভাগ্যে ন্যায়বিচার লাভ ঘটে না।

(৬) হিন্দুরা মন্দির, ব্যায়ামশালা প্রভৃতি স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করলে সচরাচর সে অনুমতি পাওয়া যায় না। মুসলমানগণ মসজিদ প্রভৃতি স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করলে তাতে আপত্তির কারণ ঘটে না।

(৭) রাজ্যে প্রাচীন হিন্দু মন্দির প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল, অনেক ক্ষেত্রে নানা অজুহাতে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

(৮) মুসলমান ধর্মপ্রচারে কোনরূপ বাধা দেওয়া হয় না, কিন্তু যে সমস্ত আর্যসমাজী হিন্দু-সংরক্ষণ ও ধর্মান্তরিত হিন্দুদিগকে পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য কাজ করছেন, নিজাম সরকার তাঁদের উপর খড়্গহস্ত। তুচ্ছতম কারণে বা বাজে অজুহাতে তাঁদের উপর দমননীতি প্রযুক্ত হয়।

(৯) হায়দরাবাদ রাজ্যে সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে ভীত হিন্দুগণ দলে দলে বাস্তু ত্যাগ করলেও এবং তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও গৃহ ভস্মীভূত হলেও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিন বেআইনী বলে ঘোষিত হয় না, বরং এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাব নিজামের উপর অত্যন্ত বেশী, পক্ষান্তরে হায়দরাবাদ স্টেট কংগ্রেস নিরুপদ্রবভাবে কাজ করলেও বে-আইনী বলে ঘোষিত হয় এবং তার সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থ ও অন্যান্য কর্মিগণ এবং আর্য সমাজীগণ পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইত্যাদি—

১৯৩৮ সালে হায়দরাবাদ রাজ্যে হায়দরাবাদ স্টেট কংগ্রেস নামে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এর আগে ১৯৩৭ সালে প্রজাবৃন্দের প্রবল দাবীর ফলে নিজাম সরকার শাসন সংস্কার সম্বন্ধে একটি কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। এই কমিটির রিপোর্টে সামান্য সামান্য শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়। এই রিপোর্ট দাখিলের অব্যবহিত পরেই ১৯৩৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের গেজেটের মারফতে কতকগুলি দমন-নীতিমূলক অর্ডিন্যান্স ও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

এই সব অর্ডিন্যান্স ও নিষেধাজ্ঞা জারীর

ফলে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রজা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিজাম সরকারের আলোচনা চলে। কিন্তু তাতে ফল না হওয়ায় এবং অর্ডিন্যান্স ও নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রত্যাহৃত না হওয়ায় আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকে। নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন।

এমনিভাবে নিজামের স্বৈরতন্ত্রশাসিত রাজ্যে আইনের পেষণ উপেক্ষা করে প্রজা আন্দোলন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চলতে থাকে।

১৯৪৬ সালের জুন মাসে নিজাম সরকার পুনরায় ধাপ্পাবাজীপূর্ণ এক দফা শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করেন, কিন্তু প্রজারা সে ধাপ্পা বুঝতে পেরে অনমনীয় থাকে।

দীর্ঘকাল ধূমায়িত অসন্তোষের ফলে ক্রমে গ্রামবাসী ও তহশীলদারদের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধতে থাকে। তাতে পুলিস ও সৈন্যদলের জুলুম ও অকথ্য উৎপীড়ন চলতে থাকে। হায়দরাবাদ স্টেট কংগ্রেস বেআইনী বলে ঘোষিত হয়।

পরে হায়দরাবাদ স্টেট কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। কংগ্রেসের কর্মিগণ পূর্ণোদ্যমে সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থের পরিচালনায় কাজ করতে থাকেন।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষে দুটি ডোমিনিয়নের হস্তে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। ১১ই জুন নিজাম ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর স্বাধীনতা-ঘোষণার কথা জানান। ১৭ই জুন থেকে ১৯শে জুন স্টেট কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে হায়দরাবাদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের দাবী জানান হয়। স্টেট কংগ্রেস আরও জানান যে, শাসনকার্য-পরিচালনায় প্রজাদের অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে, নিজাম নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তারূপে থাকবেন।

এই সব দাবীর ফলে নিজাম সরকার স্টেট কংগ্রেসকে বেআইনী প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করেন। জুন মাসের শেষে শোলাপুরে স্টেট কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় নিজাম সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি সমর পরিষদ গঠিত হয়।

জুলাই মাসের শেষে স্টেট কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ৭ই আগস্ট "ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান কর"—দিবসরূপে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুলিসের বাধা ও ১৪৪ ধারা জারী করা সত্ত্বেও হায়দরাবাদের প্রায় সাড়ে তিনশত স্থানে ৭ই আগস্ট দিবস প্রতিপালিত হয়। পুলিসের লাঠি চলে এবং কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১৫ই আগস্ট নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নিজাম রাজ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয় এবং অনেক ভবনে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। স্টেট কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থ ও আরও অনেকে গ্রেপ্তার হন।

নিজাম সরকার গণ-আন্দোলন ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুসৃত ভেদনীতির সাহায্য গ্রহণ করেন। হায়দরাবাদ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। আজ পর্যন্ত হায়দরাবাদ রাজ্যে অরাজকতা বর্তমান। নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ ইত্যাদি সর্ববিধ অনাচার রাজ্যের নানাস্থানে নির্বিবাদে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্য থেকে এক লক্ষের উপর হিন্দু প্রজা অন্যত্র চলে গিয়েছে।

'ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিন' নামক একটি প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের দ্বারা নিজাম পরিচালিত হচ্ছেন। পূর্বে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের সর্তাবলী আলোচনার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল, উত্তেহাদ-উল-মুসলমিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় নিজাম সে কমিটি ভেঙে দেন। এই ব্যাপারে নিজাম রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছত্রীর নবাব ও রাজনীতিক উপদেষ্টা মিঃ মঙ্কক পদত্যাগ করেন।

বর্তমানে মিঃ রিজভির নেতৃত্বে যে আলোচনা কমিটি নিজাম কর্তৃক গঠিত হয়েছে, তার সদস্যেরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দেশীয় রাজ্য বিভাগের মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে এ পর্যন্ত নিষ্ফল আলোচনা চালিয়ে আসছেন।

সম্প্রতি মিঃ রিজভি সর্দার প্যাটেল কর্তৃক আহূত হয়েছেন। হায়দরাবাদকে ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য বিভাগ কর্তৃক ৮ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। মিঃ গ্যাডগিল এক সভায় হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, হায়দরাবাদ এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করলে কেবলমাত্র এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে নিজামের অস্তিত্ব থাকবে।

হায়দরাবাদ অবিমৃষ্যকারিতার ফলে দ্রুত চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই পরিণতি কি রূপ নেবে, বর্তমানকালের ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতিই তা নির্ধারণ করবে।

আশাবরী

নির্মাল্য বসু

ক্লান্তি রেখায় দিন-সূর্যের রৌদ্র জাল;
পান্থ-পাদপ কুঞ্জের শ্যাম ছায়া কোথা?
ব্যোম্ সমুদ্রে হঠাৎ রক্ত-রাঙা সকাল!
কলরোল ওঠে 'ফটিক জলের' হেথা হোথা।

মন্দাকিনীর স্তন্য প্রবাহে জাগে না প্রাণ—
ধারা কি হারালো উষর মরুর মাঝখানে ঃ
খর-রৌদ্রের গভীর গমকে দীপক তান
শান্ত শিবের প্রসাদ বাণী কি আনে প্রাণে!

পাতা ঝরা গাছ—মাথার উপরে রুক্ষ দিন—
আর্তকণ্ঠে করুণ কামনা 'ফটিক জল'—
অমৃতান্বেষী জনগণেশের কণ্ঠ ক্ষীণ
অহোরাত্রির ঈথারে ঈথারে হ'ল উতল।

খিন্ন আশার বীণায় কি বাজে আশাবরী?
ঃ অলক্ষ্য লোকে নব-জাতকেরা ধ্যান-মগন—
আকাশের কোণা উঠবেই জানি মেঘে ভরি'
যদিও আসেনি অনাগত সেই মহালগন ঃ

মরুতটেও যে নও-জোয়ানের লাগে আমেজ
কান পেতে থাকে কপিশ আলোয় শীর্ণ চোখ।
রক্তে যদিও নীলাভ শঙ্কা—নিরুত্তেজ
তবুও স্বপ্নে ঝলমল্ করে অমৃতলোক!!

প্র-না-বি-র এলবাম

চিত্র-চরিত্র

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের শ্মশ্রুসমন্বিত মূর্তিই ারিচিত। অশ্মশ্রুক কিশোর কবিমূর্তির ়তে পরিচিত ব্যক্তি বাঙলা দেশে আজ ়লে। তাঁহার এই রূপটি এমন সুপরিচিত কোন কবি-মূর্তি কল্পনা করিতে গেলেই ীন্দ্রনাথের মূর্তি মনে পড়িয়া যায়। রবীন্দ্র-ুথের মূর্তি আজ আদর্শ কবি-মূর্তিতে ়িরণত। বাঙলা দেশে কবি বলিতে যেমন ীন্দ্রনাথকেই বুঝায়, কবি-মূর্তি বলিতেও াঁহার প্রতিকৃতিকে বুঝায়। ভবিষ্যৎ কবিগণের ািতি ও মূর্তির পথে তিনি মূর্তিমান ়রাশ্য।

কিন্তু এই কাজটিতে অর্থাৎ শ্মশ্রু রক্ষায় াঁহার নিষেধ ছিল। তাঁহার নিঃসঙ্গ কৈশোরের ়ক বন্ধুনী তাঁহাকে দাড়ি রাখিতে নিষেধ ়রিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে ়লিখিতেছেন—তিনি "আমাকে বিশেষ ক'রে ়লেছিলেন একটা কথা আমার রাখতেই হবে তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না—তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে। তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয়নি সে কথা সকলেরই জানা আছে! আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।"

এই নিষেধ লঘুভাবে আসে নাই; অন্ততঃ যে-উৎস হইতে আসিয়াছে তাহা সুগভীর। কিশোর কবির জীবনকে এই মহিলাটি বিশেষ-ভাবে যে প্রভাবিত করিয়াছিলেন সে কথা 'ছেলেবেলার' পাঠকদের সুবিদিত। কাজেই কবির মুখে যখন তাহার অবাধ্যতার প্রকাশ দেখি তখন চিন্তার কারণ উপস্থিত হয়, স্বতঃই প্রশ্ন জাগে কবি কেন দাড়ি রাখিয়া মুখের সীমানা ঢাকিতে গেলেন। এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ও কবিত্বের অনেক রহস্য প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা।

পিতৃবিয়োগ পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের এক-খানি অশ্মশ্রুক ফটোগ্রাফ আছে। সেই ছবি-খানিতে প্রৌঢ় কবির মুখের সীমানা প্রকাশিত। কিশোর কবির সুকুমার চিবুক পূর্ণ পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, ওই ছবিখানিতে চোয়ালে চিবুকে দৃঢ়বন্ধ ওষ্ঠাধরে শক্তির কি প্রচণ্ড এবং অনাবৃত প্রকাশ। স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার কবি রচিত প্রবন্ধাদিতে, 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় যে পেশীবহুল ভাষা, যে বজ্রস্পর্শ, যে-দৃঢ়-পিনদ্ধ যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, স্বদেশী আন্দোলনকালীন অশ্মশ্রুক রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে তাহাই যেন একবারের জন্য উদ্ঘাটিত। কিন্তু উদ্ঘাটিত হোক আর নাই হোক শ্মশ্রু যবনিকার নেপথ্যে ওই প্রচণ্ড শক্তিতো বিরাজ করিতেছিল, লাস্যবেশের অন্তরালবর্তী অর্জুনের মতোই।

শক্তির অনাবৃত প্রকাশ এক প্রকার নগ্নতা। এই নগ্ন প্রকাশ মানুষকে অপমানিত করিতে থাকে। শক্তিকে সৌন্দর্যের আবরণে ঢাকিয়া দেওয়া মনুষ্যত্বের লক্ষণ, অন্ততঃ শিল্পীর লক্ষণ নিশ্চয়ই। শক্তির অনাবৃত প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মন, তাত্ত্বিক মন, আভিজাতিক মন একান্ত সঙ্কোচ বোধ করিত।

বহিঃ প্রকৃতির নীচের তলায় শক্তির প্রচণ্ডতা, বিশ্ব চালনার পক্ষে এই শক্তি অপরিহার্য, কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে তো যথেচ্ছ প্রকাশ করে না, ফুলে ফলে, রঙে পল্লবে, লাস্যে, সঙ্গীতে আচ্ছাদিত করিয়া, সুন্দর করিয়া, শান্ত করিয়া তবে প্রকাশ করে। যে-ভীম বেগে গ্রহনক্ষত্র আকাশে ঘূর্ণ্যমান—শিল্পী বিধাতা তাহার শক্তির দিক্ গুপ্ত রাখিয়া সৌন্দর্যের দিকটাই মানুষের চোখে ধরিয়াছেন। মানবদেহের শক্ত কঙ্কালটা এবং বাক্যগ্রন্থির দুর্মোঘ কঠিনতা সজীব স্পর্শে এবং সজীব ছন্দে ঢাকা পড়িয়া যায় না কি? শক্তির উদ্দাম প্রকাশ বিকারের লক্ষণ। শক্তির অযাচিত প্রকাশ মৃতের লক্ষণ। মরুভূমি তো মরাভূমি। পিরামিড তো মৃতের পুরী। চীনের প্রাচীর তো মৃত্যুর সীমানা। পিরামিড তাহার অতিকায়িক শক্তির অভ্রভেদী ঊর্ধ্বতায় মৃত্যুরই প্রতীক, তাজমহল সৌন্দর্যের কিংখাবে ঢাকিয়া দিয়া মৃত্যুকে মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ শক্তির প্রগল্ভ প্রকাশ তাহার দুর্বলতারই লক্ষণ, সৌন্দর্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলিয়াই সংযত। কিন্তু সাধারণে একথা বোঝে না। ভীমের গদাবাজি তাহার কাছে যুধিষ্ঠিরের সংযমের চেয়ে মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ শক্তির নগ্ন প্রকাশ পছন্দ করেন না। তাঁহার কাব্যের মূলে যে প্রচণ্ড সাধন বেগ আছে, শিল্পের গুণে, শিল্পীর গুণে তাহা আচ্ছন্ন, তাহার সৌন্দর্যটাই প্রকট। তাঁহার চরিত্রে যে দুর্জয় দার্ঢ্য আছে, স্বভাব-সিদ্ধ সংযম ও আভিজাতিক ব্যবহারের দ্বারা তাহা প্রচ্ছন্ন, তাহার কোমলতাই প্রকট। সেই-জন্য লঘুচিত্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাঁহার কবিতা একান্ত ললিত মধুর, তাঁহার চরিত্র একান্ত বিলাসী-সুলভ। রবীন্দ্রনাথ যে এদেশে বহু-কাল পর্যন্ত কুবোধ্য ছিলেন, এখন পর্যন্ত অনেকের কাছে দুর্বোধ্য, তার কারণ তিনি প্রকাশ্য আসরে ভীমের গদাবর্তন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় হুঙ্কার নাই, ঝঙ্কার আছে—তাঁহার বিরুদ্ধে এ একটা মস্ত অভিযোগ। রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে দেশপ্রেমিক নহেন, এই অভিযোগের মূলেও তাঁহার হুঙ্কারে অস্বীকৃতি। কেবল কিছু-কালের জন্য, স্বদেশী বন্যার সময়ে, তিনি একাধিকবার প্রচ্ছন্ন হুঙ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রবন্ধগুলি ও কয়েকটি কবিতায়। এ তাঁহার স্বভাবসঙ্গত নয়, স্বভাববিরুদ্ধ। যে শক্তির অনাবৃত প্রকাশ তাঁহার অশ্মশ্রুক ফটোগ্রাফ, তাহারই নগ্ন প্রকাশ তাঁহার প্রবন্ধে, অর্ধনগ্ন প্রকাশ কোন কোন কবিতায়। তাই একদল ভীমানুরাগী ব্যক্তির কাছে স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ মধ্যাহ্ন-রবি, তৎকালীন প্রবন্ধগুলি রচনার পরাকাষ্ঠা। আর তাহাদের কাছে 'বন্দীবীর' জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা!

বলাকা কাব্যে বসন-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি কবিতা আছে। এই কবিতাটিতে তিনি বসনকে 'দেহ-গানের তান' বলিয়াছেন। আর কাহারো বসন হোক বা না হোক রবীন্দ্রনাথের পর্যাপ্ত-স্তর বিন্যস্ত শিথিল, উদার বসন যে দেহ-গানের তান তাহাতে সন্দেহ নাই। ওই তানের আলাপেই ভাষার দীনতা আচ্ছাদিত হইয়া অপরূপ হইয়া ওঠে। এই বসন-তত্ত্ব রবীন্দ্র-নাথের জীবনতত্ত্বের অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথকে যেমন সাঁতারু পোষাকে দেখিবার কল্পনাও করিতে পারি না, তেমনি তাঁহাকে শক্তির অনাবৃত প্রকাশক রূপে ভাবিতেও অসমর্থ। এইখানে শ-র সহিত তাঁহার প্রভেদ। শ-যে শুধু সাঁতারু পোষাক পরিতে ভালবাসেন এমন নয়, ওই পোষাকটাই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সৌন্দর্যের আচ্ছাদনে শক্তিকে ঢাকিয়াছেন, তেমনি আনন্দের আবরণে দুঃখকে ঢাকিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু ধ্বংস করিয়া ফেলেন নাই, নিজের করদ মিত্ররূপে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। দুঃখ না থাকিলে শিল্প সৃষ্টি সম্ভব কিরূপে? আনন্দময় জগৎ যোগীর জগৎ, শিল্পীর জগৎ নয়। 'কানা-মাছি' খেলায় চোখটা বাঁধিয়া দিতে হয়, তবে তো আবিষ্কারের আনন্দ! শিল্পী দুঃখকে চায়, আনন্দের তীব্রতর উপলব্ধির জন্যই। সুখদুঃখের শাদাকালো টানে তাঁহার জগৎ চিত্রিত হইতে থাকে। এসত্য শিল্পী রবীন্দ্র-নাথ জানিতেন, তাই তিনি দুঃখকে জয়

করিয়া জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। **কিন্তু তাঁহার** দুঃখ দুঃখবাদীর কম্পিত Caliban **নয়,** জলটানা ও কাঠকাটা তাহার **কর্তব্য নয়। রবীন্দ্রনাথের** দুঃখ ariel **তাঁহার গানের** মিতা, ব্যথার সাকী; সে নিজে **দুঃখরূপ** হইলেও আনন্দের দ্রাক্ষাগুচ্ছকে **ইঙ্গিতমাত্রে** কবির করায়ত্ত করিয়া দিতে **সক্ষম।**

শক্তি ও সৌন্দর্য, আনন্দ ও দুঃখের **নিয়ত বিরুদ্ধ তরঙ্গাভিঘাতে রবীন্দ্র মানস সরোবর নিরন্তর আন্দোলিত। শঙ্খে সমুদ্র-** ধ্বনিবৎ **তাঁহার** কাব্যে এই আকুলতা **শব্দায়-**মান। যে কান পাতিয়া শুনিয়াছে **কবির** আর্তনাদে **সমবেদনাশীল** না **হইয়া** তাহার উপায় নাই। **কিন্তু বাহির হইতে** কি বুঝিবার উপায় আছে? আভিজাত্যের গৌরব, প্রচণ্ড অভিমান, দুর্জয় আত্মসংযম, অটল মুখচ্ছবি বিকাশ করিয়া বসিয়া আছে। পৃথিবী অচল, **তাই বলিয়া** তাহার **অভ্যন্তরে গলিত** ধাতু-**সমুদ্র কি নিরন্তর তরঙ্গিত হইতেছে না?**

এইটুকু বুঝিলে **স্পষ্ট হইয়া** উঠিবে কৈশোরের বন্ধুনীর অনুরোধ অতিক্রম **করিয়া** কবি কেন মুখের **সীমানা ঢাকিতে গেলেন।** তাঁহার বসন, ব্যবহার ও আবাসনিকেতনের মতোই **তাঁহার শ্মশ্রু তাঁহার ব্যক্তিত্বের** অংশ। এখন এমন হইয়াছে যে **অশ্মশ্রুক রবীন্দ্রনাথের** কল্পনা করিতেও **আমরা অক্ষম।**

শিল্পী : শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

(৭)

প্রথম দৃষ্টিতে আকিয়াব শহরটি ভালোই লেগেছিলো সীমাচলমের। রামরি আর বেড়ুবার পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে জেটিতে ভিড়লো জাহাজ ডুবন্ত দ্বীপ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। ফিকে সবুজ জলের রং—মাঝে মাঝে ঘোলাটে। সিঁড়ি দিয়ে জেটিতে নেমেই কিন্তু বিশ্রী লাগে সীমাচলমের। অসম্ভব ধুলো আর বালি, নোংরা নালার পাশে পাশে নীল মাছিদের ভীড়। দুর্গন্ধের চোটে পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরে।

তেলের কলের ম্যানেজারের সঙ্গে গেটের কাছেই দেখা হয়ে যায়। জাতে ফিরিঙ্গি লোকটা—বা পাটা হাঁটু পর্যন্ত কাটা। কোন্ মিলে নাকি কিছুটা রেখে আসতে হয়েছিলো আর ওর এই অঙ্গহীনতাই এখন ওর সব চেয়ে বড়ো সার্টিফিকেট। যখন তখন মজুর আর মিস্ত্রীদের শোনায় জোর গলায় ঃ দেখেছো, নিজের দেহের কিছুটা রেখে এসেছি যন্ত্রের তলায়। এসব কাজ অমনি হয় না। চুরুট ফুঁকে সুপার ভাইজারের চোখ এড়িয়ে ঘুম মারলেই হয় না। জান দিতে হয় এই সব কাজে। আধখানা পা করাত দিয়ে চিরে চিরে কেটে ফেললো ডাক্তাররা কিন্তু লাইন ছেড়েছি আমি? মিলের কাজ আমায় করতেই হবে। ভারী ভারী যন্ত্রগুলোর গায়ে হাত বুলায় আর বলে ঃ এরা সব আমার দোস্ত। কিন্তু ভারী জবরদস্ত দোস্ত। একটু অসাবধান হয়েছিলাম ব্যাস নিলে ঠ্যাংয়ের কিছুটা সরিয়ে।

অগস্টিন সায়েব এদিকে বেশ হাসিখুসি দিলদরিয়া মেজাজের লোক। কুলি মজুরদের সঙ্গে মিলে মিশে হৈ হৈ করে বেড়ান। সীমাচলম নামতেই চীৎকার ক'রে সায়েব ঃ মিঃ সীমাচলম, I hope. ঠিক আছে। কাশিম ভাইয়ের তার আর চিঠি আমি পরশু পেয়েছি। চলে আসুন সোজা।

সীমাচলমের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে আসে অগস্টিন সায়েব। ছোট্ট মিল—পাশেই কাঠের একটা ব্যারাক। খুপরী খুপরী ঘর। সীমাচলমের একলার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তিনটি ভাগ করা। বড়োটিতে থাকেন অগস্টিন সায়েব সস্ত্রীক। মধ্যেরটি উপস্থিত খালি। সীমাচলমের জন্য নির্দিষ্ট হলো সেটা। আর শেষের ঘরটায় থাকেন মিলের একাউন্টেন্ট বাঙালী ভদ্রলোক ভবতারণ বসু। সম্প্রতি একলাই রয়েছেন। দু একদিনের মধ্যেই বাঙলাদেশ থেকে স্ত্রী এসে পৌঁছাবেন তাঁর। প্রতিবেশী হিসাবে কেউই মন্দ নয়। মিলে সীমাচলমকে ঠিক যে কি কাজ করতে হবে তা সীমাচলমও জানে না। কাশিম ভাইয়ের চিঠিতে তার বিশেষ কিছু নির্দেশও ছিলো না। মনে মনে হাসে সীমাচলম। ওকে শুধু কাশিম ভাইয়ের সংসার থেকে সরাবার প্রয়োজন হয়েছিল—যত শীঘ্র হোক আর যেখানেই হোক। আগাছা সরিয়ে ফেলাই দরকার অন্য কোথাও তার স্থান নির্দেশের কি প্রয়োজন থাকতে পারে।

অগস্টিন সায়েব হুঁসিয়ার লোক। সীমাচলমের কথাবার্তায় আর চালচলনে কাশিমভাইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের যোগসূত্র আন্দাজ করতে পারেন। কর্তার জানিত লোক কাজেই তাকে কেরানীর দলে ফেলা যায় কি আর। মিলের চিঠিপত্র আর শাসনতন্ত্রের ভারটা সীমাচলমের ওপরে ছেড়ে দেন অগস্টিন সায়েব। বলেন ব্যস ভাগাভাগি করে নিলাম কাজ আজ থেকে। আমি দেখবো মেশিন আর যন্ত্রপাতি আর আপনি দেখবেন কাগজপত্তর আর অফিসের নিয়মকানুন। ঝঞ্চাট থাকবে না কোন।

ঝঞ্চাট অবশ্য থাকবার কথাও নয়। এই তেলের মিলটা কেন যে এখনও খাড়া করে রেখেছেন কাশিমভাই সায়েব তার কোন হদিশই পায় না সীমাচলম। চিনা বাদাম উৎপন্ন হয় বর্মার ম্যাগোয়ে, ইয়ে নানজং প্রভৃতি বালু বহুল জায়গায়। সেসব জায়গার দূরত্ব আকিয়াব থেকে বড়ো কম নয়। কিছুটা রেলে আর বাকী পথটা জাহাজে এসে পৌঁছায় চিনাবাদামের বস্তাগুলো। তারপর বিরাট ক্রাসারের চাপে বাদামের তেল তৈরী হয়। কিন্তু মজুরী পোষায় না মোটেই। রেল আর স্টীমার ভাড়াতেই প্রচুর খরচ হয়ে যায়। তারপর মজুরদের কথা না তোলাই ভালো। লাভের অঙ্ক যে কি পরিমাণ দাঁড়ায় বছরের পর বছর তা ভেবেই পায় না সীমাচলম। অন্য সমস্ত তেলের কলই যে সব জায়গায় চিনা বাদাম উৎপন্ন হয় তারই চার পাশ জুড়ে। এতে খরচও কম হয়—আর হাঙ্গামাও সেই পরিমাণে খুবই সামান্য। কিন্তু একথাটাও ভাবে সীমাচলম। ব্যবসায়ীদের এও একটা ভড়ং। প্রদেশের বড়ো বড়ো জায়গায় নিজেদের বিজ্ঞাপন লটকে দেওয়া—জাহির করা নিজেকে। কাঠের মিল, তেলের মিল, ধানের কল, লুঙ্গীর ব্যবসা, হাতীর দাঁতের কারবার কি নেই কাশিম সায়েবের। এর মধ্যে দু একটা যদি কম লাভজনকই নয়—তাতেই বা কি ক্ষতি।

বেশ কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবে সীমাচলম। বেশ হতো কিন্তু ওর যদি অনেক টাকা থাকতো এই রকম। দু-হাতে ছিটিয়ে ছড়িয়ে শেষ করা যেতো না কিছুতে। এই রকম বড়, বড় মিল আর কারখানায় ছেয়ে যেতো সারা দেশ। লোকের মুখে মুখে ঘুরতো ওর নাম—ওর বদান্যতার কথা, ওর ঐশ্বর্যের ইতিহাস। কিন্তু তারপর। দু হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে ভাবতে বসে সীমাচলম। প্রচুর টাকা হ'তো নিশ্চয় কিন্তু নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যেতো ওর। জীবনের সব কিছু কামনা অবরুদ্ধ হয়ে গুমরে মরতো সেই অর্থস্তূপের অন্তরালে।

আচমকা বাধা পায় সীমাচলম। পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ভবতারণবাবু। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, দিব্বি গোলগাল চেহারা—মাথায় আধুলি মাপের একটি টাক। সর্বদাই হাস্যমুখ, পৃথিবী যেন একটা বেড়াবার জায়গা এমনি মনের ভাব।

আস্তে আস্তে সীমাচলমের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে ঃ গুড মর্ণিং কেমন লাগছে নতুন জায়গাটা?

ঃ মন্দ কি, ভালোই তো। তবে আর একটু ধুলো কম হলেই যেন ভালো হতো।

ঃ ধুলোর কথা যদি তুললেন, তবে বলি। এ আর কি ধুলো দেখছেন। প্রথম যেবার আমি শ্বশুরবাড়ী যাই বিয়ের পরে। গরমকাল। ইষ্টিশন থেকে প্রায় কোশ পাঁচেক হবে শ্বশুর বাড়ি। গরুর গাড়িতে যেতে হয়। রাঢ় দেশের ধুলো মশাই বিখ্যাত ধুলো। সূর্য দেখা যায় না এমনি ধুলোর বহর। উঃ, কি ধুলোরে বাবা, তার তুলনায় তো এ সোনার দেশ।

বিস্ময়ে চোখ তুলে দেখে সীমাচলম। কয়েক দিনের আলাপে এইটুকু বুঝতে পেরেছে সে একটু বেশীই কথা বলে লোকটি। আলাপ-আলোচনায় বেশ একটু অন্তরঙ্গতার ভাব।

ঃ আপনার স্ত্রী তাহলে সেই ধুলোর দেশ থেকেই আসছেন? কি বলেন— হাল্কা পরিহাসের সুরে বলে সীমাচলম।

একটু বিব্রত হয়ে পড়েন ভবতারণবাবু। পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে হাসেন টিপে টিপে, বলেন ঃ না, এ বৌ আমার খাস কলকাতার মেয়ে। ধুলোর নামগন্ধ নেই। আমার প্রথম-পক্ষের স্ত্রী বেঁচে নেই।

কথাটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে সীমাচলম ঃ আপনার স্ত্রী আসছেন কবে?

ঃ কাল জাহাজে উঠবে। চিঠি পেয়েছি এক-খানা বড় শালার কাছ থেকে ঃ বেশ একটু উৎফুল্লই মনে হলো ভবতারণবাবুকে। উৎফুল্ল হওয়াটাই স্বাভাবিক—বিদেশে নিঃসঙ্গতার মত অভিশাপ আর আছে নাকি ? বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাসই বেরিয়ে আসে সীমাচলমের। ভবতারণবাবুর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখে তিনি চেয়ে আছেন একদৃষ্টে। ভাবটা যেন এই দীর্ঘশ্বাসের হেতুটি কি?

ব্যাপারটাকে লঘু করার চেষ্টায় সীমাচলম বলে ঃ আমার এখানে থাকাই হলো মুস্কিল।

ঃ কেন বলুন তো, মুস্কিলটা কিসের?

ঃ এ পাশে অগস্টিন সায়েব থাকবেন সস্ত্রীক, আপনারও স্ত্রী আসবেন দিন তিনেক পরেই আর মধ্যে আমি বেচারা বায়ু-ভুতো নিরাশ্রয়। হো হো করে হেসে ওঠেন ভবতারণ-বাবু তারপরেই হাসিটা থামিয়ে ঝুঁকে পড়েন সীমাচলমের দিকে ঃ আসল ব্যাপারটা মশাই শুনুন তাহলে। ওই যে ঢ্যাঙা মতন মেমটা অগস্টিন সায়েবের বাড়িতে থাকে, আপনার ধারণা বুঝি ওটি ওর স্ত্রী, হা ভগবান!

ব্যাপারটা আবছা বোঝে সীমাচলম, তবু চেষ্টা করে বিস্ময়ের ভাব আনে সারা মুখে ঃ স্ত্রী নন, সে কি উনি তো বললেন ওর স্ত্রী।

ঃ তা ছাড়া আর বলবে কি। আরে মশাই আজ দশ বছর রয়েছি এখানে। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া কি সোজা কথা। বছর তিনেক আগে এক জাহাজ ডুবি হয় মশাই এই আকিয়াবের ধারে কাছে কোথাও। চাটগাঁ থেকে আসছিলো জাহাজ—ঝড়ের ঝাপটায় ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে একেবারে চুরমার। বরাতের জোর দেখুন মশাই—সব গেলো তলিয়ে, কেবল ঐ মাগীটা তক্তা জড়িয়ে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকলো চড়ায়। অগস্টিন সায়েব শিকার করতে গিয়ে দেখতে পায় ওকে। নিয়ে এলো ঘরে তুলে। ব্যস সেই থেকে আর যাবারও নাম করে না মাগী। বলে ও নাকি জার্মাণ—ওর কর্তা বুঝি মস্ত বড় মেকানীক জার্মানীতে। কিন্তু ও যে কেন চাটগাঁয় এসেছিলো আর যাচ্ছিলই বা কোথায়, ভগবান জানেন। ও সব একেবারে বাজে কথা মশাই, ছেলে ভুলানো গল্প। জার্মানী না হাতী। লোক-ধরা ব্যবসা ওদের—এই করে বেড়ায়। আরে বলবো কি আপনাকে আমি বারান্দায় বেড়াই ভোরের দিকটা আর মাগী ড্যাবডাব করে চেয়ে থাকে পাশের বারান্দা থেকে। তবে আমার তুই করবি কচু। চোখাচোখি হ'লেই ঘরের ভেতর ঢুকে প্যাটরা খুলে বৌয়ের ফটো খুলে বসি। সাধে কি আর বিদেশ বিভূঁয়ে সাত তাড়াতাড়ি পরিবার নিয়ে আসছি মশাই।

অগস্টিন সায়েবের স্ত্রী মার্থাকে কিন্তু ভালোই লাগে সীমাচলমের। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ, দৃঢ়সম্বন্ধ দুটি ঠোঁট আর সবচেয়ে ভালো লাগে সমুদ্রের চেয়েও নীল দুটি চোখ। প্রথম দিনে অগস্টিন সায়েবের বাড়িতেই নিমন্ত্রণ ছিলো সীমাচলমের। ছেলেপিলে নেই, শুধু স্বামী আর স্ত্রী—ছোট্ট পরিচ্ছন্ন, নিটোল সংসার।

খুব কম কথা কয় মার্থা ঃ আপনার দেশ মাদ্রাজ অঞ্চলেই না?

ঃ হাঁ, মাদ্রাজ শহর থেকে বেশী দূরে নয় আমাদের গ্রাম।

ঃ মাদ্রাজ শহরটি আমার খুব ভালো লাগে। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে ভারি পরিষ্কার শহরটি।

ঃ আপনি মাদ্রাজেও ছিলেন বুঝি।

ঃ হাঁ, প্রায় মাসখানেক ছিলাম মাদ্রাজে, ক্রুগারের সঙ্গে—একটু থেমে মার্থা বলে ঃ ক্রুগার আমার স্বামীর নাম।

একটু অস্বস্তি বোধ করেন—অগস্টিন সায়েব। সুপের বাটিটায় চামচ নাড়তে নাড়তে বলেন ঃ মানে, আমার সঙ্গে মার্থার বিয়ে হয়েছে আজ বছর তিনেক হ'লো।

মার্থাকে কিন্তু বিশেষ বিচলিত মনে হয় না ঃ ক্রুগার এসেছিলো মাদ্রাজে একটা মেশিন বসাতে ওর কোম্পানীর তরফ থেকে। মাদ্রাজ থেকেই ও ফিরে গেছে বেলিনে। আমার কিন্তু ভারতবর্ষটা এতো ভালো লেগে গেলো যে, আমি বললাম এ দেশটা সমস্ত ঘুরে দেখবো আমি। ক্রুগার আমার কোন ইচ্ছায় বাধা দেয় না কখনও। আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো। আমি মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা—সমস্ত ঘুরে চিটাগাং থেকে রেঙুনে আসবার সময় দৈব-দুর্ঘটনায় পড়লাম। তারপরেই পলের সঙ্গে আমার আলাপ। তাই না—পল? জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে অগস্টিনের দিকে চায় মার্থা।

সুপের বাটি ছেড়ে ততক্ষণে কড়াইশুঁটির ঝোলে নজর দিয়েছে অগস্টিন সায়েব। ঘাড় নেড়ে মার্থার কথার জবাব দিলেন।

বেশ লাগে সীমাচলমের মার্থা আর অগস্টিন সায়বকে।

মিলের কাজ বলতে এমন কিছুই নেই। বড়ো জোর জন বিশেক মিস্ত্রী আর মজুর আর গোটা চারেক বাবু। তাহলে কি হয়, সারাটা দিন হাঁকডাকে কান পাতা যায় না মিলে—সমস্ত দিন চরকীর মতন ঘোরেন ম্যানেজার সায়েব। তার হৈ চৈয়ের ঠেলায় মনে হয় যেন হাজার খানেক কুলী মজুর নিয়ে প্রকাণ্ড একটা মিলের তত্ত্বাবধান করছেন তিনি। কোণের দিকে ছোট একটা টেবিলে একরাশ খাতাপত্তর ছড়িয়ে বসেন ভবতারণবাবু। কাজের মধ্যে তিনি পানের ডিবে থেকে পাঁচ মিনিট অন্তর পান মুখে দেন আর চশমাটা নাকের ডগায় ঠেলে দিয়ে প্রকাণ্ড লেজার খাতাটা নিয়ে দাগ দেন মাঝে মাঝে।

তাঁর পাশেই সীমাচলমের বসবার জায়গা। চিঠিপত্রের মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে চীনাবাদামের বস্তার কম ডেলিভারী নিয়ে ঝগড়া। গত সপ্তাহে সতেরো বস্তা কম এসেছে। ব্যাপারটা নিয়ে খুব কড়া করে চিঠি লিখতে হবে জাহাজ কোম্পানীকে। প্রত্যেক সপ্তাহেই গোলমাল হয় বস্তার সংখ্যায়—কারণ তলব করতে হবে এর।

ঃ আস্তে আস্তে, ব্রাদার মাসে চার পাঁচ-খানা তো চিঠি তা কি আর অত তাড়াতাড়ি শেষ করতে আছে।

হেসে ভবতারণবাবুর দিকে মুখ ফেরায় সীমাচলম ঃ কাজ যাই থাক, চটপট করে ফেলাই ভালো। দেখছেন তো অগস্টিন সায়েব কি রকম ছুটে বেড়াচ্ছেন সারা মিলে।

ঃ ওঁর কথা বাদ দিন। মনে করেছিলাম একটা ঠ্যাং গেলো, এইবার বোধ হয় ছুটো-ছুটিটা কমবে। ও বাবা, এক ঠ্যাংয়ে যেন দশ ঠ্যাংয়ের কাজ আরম্ভ করেছে সায়েব। এদিকে তো সায়েব ছুটোছুটি করছে আর ওদিকে—চোখটা মটকে হাত দুটোর অদ্ভুত ভঙ্গী করলেন ভবতারণবাবু।

ঃ ওদিকে কি?

ঃ না কি আর। সায়েব বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই মেমও হাওয়া। সমস্ত দিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় ঠিক-ঠিকানা নেই।

এ সমস্ত কথা নিয়ে খুব মাথা ঘামায় না সীমাচলম। যেখানেই থাক না মার্থা তাতে তাদের বলবার বা মনে করবার কি থাকতে পারে।

কিন্তু ব্যাপারটাকে অতটা লঘু মনে করেন না ভবতারণবাবু।

ঃ আরে মশাই ওদের কি আর একটা পুরুষে মানুষে আশ মেটে। একটাকে ছেড়ে খোঁড়া সায়েবকে পাকড়েছে, আবার কোন ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তিনিই জানেন।

বারোটা বাজতেই খাতাপত্তর বন্ধ করে ফেলেন ভবতারণবাবু। কলম পেন্সিল গুছিয়ে ড্রয়ারজাত করেন।

ঃ কি ব্যাপার, এরই মধ্যে বন্ধ করলেন চিত্র-গুপ্তের খাতা?

ঃ হে, হে, আজ উঠতে হবে তাড়াতাড়ি। একটু ইয়ে রয়েছে—বলেছি অগস্টিন সায়েবকে—

ঃ কি ব্যাপার—ব্যাপারটা অবশ্য আবছা বোঝে সীমাচলম।

ঃ ঐ ওর নাম কি, পরিবার আসবে কিনা আড়াইটে নাগাদ। একবার স্টীমার ঘাটে যেতে হবে।

এবার সমস্ত পরিষ্কার হয়ে আসে। খুব ভোরবেলাই ঝাঁটা নিয়ে সামনের বারান্দাটা নিজের হাতে পরিষ্কার করছিলেন ভবতারণ-বাবু। তারপর ছেঁড়া লুঙ্গি দিয়ে পর্দা টাঙানো হ'লো দুটো জানলায়। বাজারটাও আজ নিজেই করেছিলেন তিনি। আয়োজন সম্পূর্ণ—শুধু দেবী আসবার অপেক্ষা। মুচকি মুচকি হাসে সীমাচলম।

বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। লম্বা টানা বারান্দাটার মধ্য খানে কাঠের পার্টিশন উঠছে। ভবতারণবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন।

সীমাচলমকে দেখেই হাসলেন একটু। এই, একটু প্রাইভেসীর বন্দোবস্ত করছি। এবারে তো ফ্যামিলীম্যান হয়ে পড়লাম—একটু আব্রু না থাকলে কেমন যেন দেখায়।

একটু আব্রু? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সীমাচলম—বারান্দার একপাশ আড়াল করে প্রকাণ্ড পার্টিশন উঠেছে। নীচে রান্নাঘরের সামনেটাও দর্মা দিয়ে ঘেরা হয়েছে। মানে অন্তরালবর্তিনীকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখবার যত রকম সম্ভব অসম্ভব উপায় ছিলো সবই করেছেন ভবতারণবাবু। সত্যই তো, ঘরের বৌয়ের আব্রু আছে তো একটা। সবাই তো আর অগস্টিন সায়েব নয়।

এই কিন্তু সব নয়। ভবতারণবাবুও ক্রমে ক্রমে দুর্লভ হয়ে উঠলেন। মিলে কয়েক ঘণ্টা ছাড়া সকাল বিকাল তো দেখাই পাওয়া যায় না তাঁর। হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে সিঁড়িতে বিব্রত হয়ে পড়েন ভবতারণবাবু—পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলেন: এমন মুস্কিল হয়েছে, একেবারে একলা থাকতে পারেন না উনি। বড়ো বংশের মেয়ে, দিনরাত লোকজন ঘিরে থাকতো, এখানে একলাটি এসে হাঁপিয়ে মরছে বেচারী।

বেচারীর জন্য কষ্টই হয় সীমাচলমের। বিদেশে সত্যই একলা পড়ে গেছে মেয়েটি। শহর থেকে মিলটা এত দূরে যে অন্য কোন বাঙালী পরিবারের সংগে আলাপের যোগসূত্র রাখাও মুস্কিল।

সেদিন সকাল থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছিলো। মাথার কাছের জানলাটা খোলা থাকায় জোলো হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল সীমাচলমের। মাথাটা ভারী হ'য়ে ওঠে আর গাঁটে গাঁটে ব্যথা। বেলা একটার পর থেকে গা যেন বেশ গরমই হ'য়ে ওঠে তার। অগস্টিন সায়েবকে বলে ছুটি করে নিয়ে বাড়িতে চলে আসে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আধা-হিন্দী আধা বাঙলায় মেশানো খিচুরী ধরণের কথাবার্তা কানে যেতেই দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে অগস্টিন সায়েবের বারান্দায় পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসেছে মার্থা আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে। মুখের পাশের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। বয়স খুবই কম মনে হয়, এমন কি বছর চোদ্দ পনেরোর বেশী তো নয়ই।

এই নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিলো দুজনের মধ্যে।

মার্থা বলছিল: তোমার বয়স কত? এত অল্পবয়সে বিয়ে হয় তোমাদের?

খিল খিল করে হেসে উঠলো মেয়েটি, বললো: আমার বয়স পনেরো বছর। আমার তো তবু বেশী বয়েসে বিয়ে হয়েছে গো। আমার দিদি আন্নার বিয়ে হয়েছে ন'বছরে। আহা, দিদি আমার দশ বছরে হাত খালি ক'রে ফিরে এলো বাপের বাড়ি।

কথাটা চট করে বুঝতে পারে না মার্থা। আবার তাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হয়। বুঝতে যখন পারে, তখন একেবারে হাঁ করে ফেলে মার্থা, নীল দুটি চোখে অগাধ বিস্ময়: বলো কি—ওইটুকু মেয়ে, মাছ খাবে না, গয়না পরবে না গায়ে, হাসবে না ভাল করে,—বিয়েও করতে পারবে না আর।

না, আমাদের শাস্তর বড্ড কড়া। একটু এদিক-ওদিক হলে ছি ছি করবে লোকে। একাদশীর দিন দিদি একবার জল খেয়ে ফেলেছিল বলে গাঁয়ের লোকে কি গালাগালই করলে দিদিকে আর মাকে?

মার্থার আবার অবাক হবার পালা। বলো কি, বাঙলা দেশের সব লোকেদের এই অবস্থা।

হাঁ, শুনেছি হিন্দু মাত্রেই এই নিয়ম। তবে গরীব কিনা আমরা, তাই আমাদের উপর নিয়মের বাঁধন আরও বেশী। বড়লোকের বেলায় এত শক্ত নয় নিয়মকানুন। ওই তো আমাদের পাশের বাড়ির বনলতা, বিধবা হবার পর মাছটাই না হয় খেতো না; কিন্তু আর কি বাদ রাখতো শুনি? পানখাওয়া থেকে শুরু করে পাড়ওয়ালা কাপড়ও পরতো আর গয়নাও পরতো এক গা।

সিঁড়িতে বেশীক্ষণ আর দাঁড়ায় না সীমাচলম। জুতো ঠুকে ঠুকে জোরে জোরে ওপরে উঠে আসে। পায়ের আওয়াজের সংগে সংগেই হুড়মুড় করে একটা শব্দ হয়। আন্দাজে বুঝতে পারে সীমাচলম, ভবতারণবাবুর পরিবার সশব্দে পালিয়ে আব্রু রক্ষা করলেন নিজের।

সন্ধ্যার দিকে ভবতারণবাবু আর অগস্টিন সায়েব দুজনেই এলেন দেখতে।

অগস্টিন সায়েব একটু থেকেই উঠে পড়েন: মিঃ সীমাচলম, আজ রাত্রের মত রুটি আর দুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। শহরের দিকে যেতে হবে একবার, অমনি ডাক্তার মিণ্টকে আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি আসবার জন্য।

না, না, ডাক্তার ডাকবার দরকার হবে না। ব্যস্ত হয়ে ওঠে সীমাচলম। সর্দির জন্য একটু জ্বর হয়েছে, ও কালই ঠিক হয়ে যাবে।

ভবতারণবাবু কাছ ঘেঁষে বসেন জাঁকিয়ে, বলেন: ব্যাটার কথা ছেড়ে দিন, শহরে যাবে আড্ডা দিতে, ডাক্তার আনবার কথা কি আর মনে থাকবে ওর। যেমনি মেম তেমনি সায়েব।

কেন মেম তো মোটেই খারাপ নয়, আজ আপনার স্ত্রীর সংগে খুব আলাপ চলছিল।

আমার স্ত্রীর সংগে! চমকে ওঠেন ভবতারণবাবু। আপনি দেখলেন কোথা থেকে?

বিকালের ব্যাপারটা সমস্ত বলে সীমাচলম। সামাজিক আচার নিয়মের কথা আর আমাদের দেশের বিধিব্যবস্থার কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল দুজনের মধ্যে।

তাই নাকি, কেমন যেন একটু অনমনা হয়ে যান ভবতারণবাবু—কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে উঠে পড়েন আস্তে আস্তে।

ভবতারণবাবু উঠে যাবার একটু পরেই ঘরে ঢোকে মার্থা। ট্রেতে দুধ, রুটি আর কয়েকটা ফল।

শশব্যস্তে বিছানার ওপর উঠে বসে সীমাচলম—এ কি, আপনি কেন কষ্ট করে আনলেন এসব, চাকরদের দিয়ে পাঠালেই হ'তো।

সত্যি, বড্ড কষ্ট হয়েছে এইসব ভারী জিনিসগুলো বয়ে আনতে। আপনি শুয়ে পড়ুন তো লক্ষ্মী ছেলেটির মত।

জোর ক'রে বিছানার ওপরে মার্থা শুইয়ে দেয় সীমাচলমকে। গায়ের ওপরে কম্বলটা আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে বলে, ইস্ গা তো বেশ গরম রয়েছে দেখছি। পল গেলো কোথায়, ডাক্তারকে একটা খবর দিলে পারতো।

হ্যাঁ, উনি ডাক্তারকেই ডাকতে গেছেন শহরে।

আপনি কথা বলবেন না বেশী। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন চুপ করে।

সীমাচলমের মাথার কাছে চেয়ারটা টেনে নেয় মার্থা। একহাতে সীমাচলমের......ঘন অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে হাত চালায়। ভারি ভাল লাগে সীমাচলমের। খুব ছেলেবেলায় একবার কি একটা শক্ত অসুখ হয়েছিল ওর। ওর মা এমনি করে সারাটা দিন চুল টেনে টেনে দিত ওর শিয়রে বসে। তন্দ্রার মত আসে সীমাচলমের। জানলা দিয়ে সূর্যের ম্লান আলো এসে পড়েছে—আবছা লাল আলো। বাইরের গোলমাল একটু একটু করে কমে আসছে। সন্ধ্যা নামছে শহরতলীতে—সারাদিনের ধূলো আর ধোঁয়ার পরে খুব মনোরম মনে হয় এই সন্ধ্যা।

অনেকগুলো লোকের কলরবে তন্দ্রা ভেঙে যায় সীমাচলমের। অগস্টিন সায়েব ফিরেছেন ডাক্তারকে সংগে করে পিছনে পিছনে মার্থাও দাঁড়িয়েছে এসে।

বুক পিঠ পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। সর্দি-জ্বর—সাংঘাতিক কিছু নয়, তবে অবহেলা করলে অনেক কিছু হ'য়ে যেতে পারে। বুকের একটা মালিশ আর খাবার ওষুধ এক শিশি—এই চলুক এখন।

রাত্রির দিকে চাপা কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। কে যেন কাঁদছে গুমরে গুমরে। পার্টিসনের ওপার থেকে আসছে কান্নার শব্দ। আস্তে আস্তে বিছানার ওপরে উঠে বসে সীমাচলম। জ্বরটা একটু কম বলেই মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই ভবতারণবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া যায়—বিশবার বারণ করেছি না ওই ফিরিঙ্গী মাগীর সংগে মিশতে। ওর সংগে এত আলাপ কি তোমার? বাড়ির বৌ হয়ে বারান্দা পার হয়ে ও চুলোয় যাবার

তোমার কি দরকার? এ নিজের দেশ পাওনি, যত বদমাইসের আড্ডা—এখানে একটু সাবধান না হ'লেই সর্বনাশ। ছি, ছি, তোমার জন্য মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবার জোগাড় আমার। পাশের মাদ্রাজী ছোকরাটি পর্যন্ত যা নয় তাই বললে—

কথাগুলো বাঙলা ভাষাতে হলেও রসগ্রহণে বিশেষ অসুবিধা হয় না সীমাচলমের। মোটামুটি সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝতে পারে সে। একবার মনে হয় চীৎকার করে এই হীন আলোচনার প্রতিবাদ করতে, কিন্তু অবসাদ নামে স্নায়ু আর শিরায়। কেমন যেন একটা আচ্ছন্নের ভাব। চোখ দুটো বুজে আসে সীমাচলমের।

পরের দিন গায়ের উত্তাপ অনেকটা কম। দুপুরবেলা চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিলো সীমাচলম, এমন সময় ঘরে ঢোকে মার্থা।

ঃ কেমন আছেন আজ?

ঃ একটু ভালো। খুব কষ্ট দিলুম কাল আপনাদের।

ঃ হাঁ, বড্ড কষ্ট দিলেন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে মালিশের শিশিটা হাতে নেয় মার্থা। বলে ঃ চুপ ক'রে শুয়ে পড়ুন লক্ষ্মী ছেলের মত। মালিশটা করে দিয়ে যাই।

ঃ সে কি আপনি মালিশ করবেন কি ঃ ধড়-মড় করে বিছানায় বসে পড়ে সীমাচলম ঃ না, না, আমি করছি মালিশ, দিন আমার হাতে শিশিটা।

হেসে ফেলে মার্থা ঃ রোগী আর শিশু একই রকমের জানেন তো, তাদের কথায় কান দিলে আমাদের চলে না।

জোর করে বিছানায় শুইয়ে দেয় সীমাচলমকে তারপর ওষুধটা ঢেলে আস্তে আস্তে মালিশ করতে শুরু করে।

চোখ বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে থাকে সীমাচলম। কাল রাত্রের পার্টিশনের ওপার থেকে ভবতারণবাবুর ধমকের কথাগুলো মনে পড়ে। গণ্ডী পার হওয়াই পাপ মেয়েদের পক্ষে। সামাজিক শাসন অবহেলা করা উচ্ছৃংখলতার নামান্তর। ওদেশের মেয়েদের কিন্তু এতো সহজে অপমৃত্যু হয় না। মেয়েদের এভাবে অবরুদ্ধ করে কোন জাতই বোধ হয় রাখে না।

ঃ এ দেশটা আপনার কেমন লাগছে বলুন তো? সীমাচলম প্রশ্ন করে।

ঃ কোন্ দেশটা ভারতবর্ষ না বর্মা?

ঃ যদি বলি ভারতবর্ষ।

ঃ এতগুলো প্রাণহীন পঙ্গু লোকের বিরাট সমাবেশ আর কোন দেশে দেখিনি। ঘা খেলেও চেতনা আসে না এ রকম জাতের কল্পনাও আমরা করতে পারি না।

একটু অস্বস্তি লাগে সীমাচলমের। ঠিক এ রকম উত্তরও আসা করেনি আর প্রশ্নও করেনি এভাবে। ও জানতে চেয়েছিলো প্রাকৃতিক সৌষ্ঠবের কথা আর মোটামুটি কেমন লাগলো দেশটা—এইটুকুই। কথাটার কিন্তু একটা উত্তর না দিয়ে পারে না সীমাচলম। বলে—

ঃ দেশের লোকদের এই অবস্থার জন্য কে দায়ী তাতো জানেনই।

ঃ জানি কিন্তু বিশ্বাস করি না। পরের ওপর দোষ চাপানো কোন কাজের কথা নয়। গৃহস্থ সাবধান না থাকলেই চোরের সুবিধা হয়। নিজেদের মধ্যে আপনাদের বিভেদ, দশটা লোক থাকলে এগারটা মত—এ দেশের উন্নতির আশা খুব কম।

মুখটা ফিরিয়া দেখে সীমাচলম। মার্থার গভীর দুটি নীল চোখে কিসের যেন ছায়া। সারা মুখে আরক্ত দীপ্তি। এ কথাগুলো শুধু ওর মুখের কথা নয়—মনের কথাও বুঝি। কিন্তু এত অল্প দিনের মধ্যে এভাবে কে ভাবতে শেখালো ওকে।

ঃ আমাদের দেশের ইতিহাস পড়েছেন? শতধা বিভক্ত পিতৃভূমিকে কিভাবে একসঙ্গে আনা হয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত জাত এক-পাশে আর আমরা একপাশে। সকলের অভি-সন্ধি বিফল করে আমাদের অভিযান শুরু হয়েছে বারবার। হেরেছি কি জিতেছি সে প্রশ্ন বড়ো নয়—আপনার মাথার কাছের জানলাটা বন্ধ করে দেবো, রোদ আসছে বিছনায়?

সহসা যেন চমক ভাঙে সীমাচলমের। কোন দেশের রূপকথার গল্পই বুঝি শুন-ছিলো সে। প্রকাণ্ড এক দৈত্যের শিকল ভাঙার গল্প।

মার্থা আস্তে ভেজিয়ে দেয় জানলাটা।

একদিন ভবতারণবাবুর চীৎকারে খুব সকালে ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। তাড়া-তাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখে দরজার সামনে বিরাট জটলা। ভবতারণবাবু অগস্টিন সায়েব আর পাড়াপড়শী আরো কয়েকজন জুটেছেন এসে। ভবতারণবাবু হাতের খবরের কাগজটা ধরেন আর চীৎকার করেন তারস্বরে। আমি আজ ছ' মাস ধরে বলে আসছি, লড়াই বাধলো বলে। আমি ঠিক জানি জার্মানী প্রতিশোধ নেবেই গত যুদ্ধের। কেউ বিশ্বাস করেনি আমার কথা। হুঁঃ ইংরেজের বিরুদ্ধে কে যাবে লড়তে। আরে বাবা, এতো আর পরাধীন জাত নয়, যে পায়ের তলায় লেজ নাড়বে আর এঁটো-কাঁটা চাইবে বসে।

কলরবে সমস্ত কথাগুলো ভালো করে কানে যায় না সীমাচলমের। এগিয়ে এসে ভবতারণবাবুর হাত থেকে টেনে নেয় কাগজটা। বড়ো বড়ো শিরোনামায় স্পষ্ট করেই লেখা রয়েছে ঃ লড়াই শুরু হয়ে গেছে জার্মানী আর ইংরাজে। যে সময়ের মধ্যে জবাব দেবার কথা ছিলো জার্মানীর, সে সময় পার হয়ে গেছে। ব্যস, জার্মানী এবার থেকে ইংরাজের শত্রু বলেই পরিগণিত হলো। ন্যায়ের জন্য, সত্য রক্ষার জন অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হলো বৃটেন।

অনেকক্ষণ ধরে সংবাদটা পড়ে সীমাচলম। লড়াই সম্বন্ধে ওর স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। এর আগের যুদ্ধের সময় খুবই ছোট ছিলো। পরে মায়ের কাছে একটু একটু শুনেছিলো। সমস্ত মাদ্রাজের সমুদ্র অঞ্চল থেকে লোক সরে এসেছিলো। যে কোন মুহূর্তে জার্মান ডুবো জাহাজ "এমডেন" এসে গোলাবর্ষণ করতে পারে এই ভয়েই তটস্থ ছিলো সবাই। এবার আবার কি হবে কে জানে।

ভবতারণবাবু কিন্তু ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন ঃ দেখবে মজা, সবাই, সোনা আর লোহার দাম আগুন হ'য়ে উঠবে। গতবারের যুদ্ধে ফেঁপে লাল হয়ে উঠলো লোহার কারবারীরা। আর কোন কথা নয়, স্রেফ লোহা জোগাড় করা আর চলান দেওয়া।

অগস্টিন সায়েব কিন্তু কোন কথা বলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন শুধু। লড়াই কিছুটা বোঝেন তিনি। গতবারের লড়াইয়ে তার একমাত্র ভাই মিলিটারী পোষাক পরে হাসতে হাসতে জাহাজে উঠেছিলো—আর ফিরে আসেনি। এখনও তার একটা ফটো টাঙানো আছে অগস্টিন সায়েবের বসবার ঘরে।

বিশেষ কিছু পরিবর্তন বোঝা যায় না আকিয়াব শহরে। শুধু জাহাজঘাটে গেলে সৈন্য বোঝাই অনেকগুলো জাহাজ ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়, আর দেখা যায় জাহাজগুলোর গায়ে অদ্ভুত রংয়ের প্রলেপ। বাইরে যুদ্ধের আবহাওয়া যতটা না বোঝা যায়, তার দ্বিগুণ বোঝা যায় ভবতারণবাবুর বাসার কাছে আসলে। প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ যোগাড় করেছেন তিনি আর কাগজ পড়ে পড়ে লাল কালির দাগ দিচ্ছেন ম্যাপে।

ঃ একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর। শুধু জার্মানীতেই কাহিল অবস্থা তার সঙ্গে আবার রাশিয়া। এবার প্রভুরা কাত, বুঝলেন সীমাচলমবাবু।

সীমাচলম হাসে মুচকে মুচকে বলে ঃ কিছু লোহাটোহা জমানোর বন্দোবস্ত করুন। কারা যেন ফেঁপে লাল হ'য়ে উঠেছিলো বলছিলেন গত যুদ্ধে?

ঃ ও, সে মশাই এক আরব্য উপন্যাস। আমার মাসতুতো ভাইয়েরা। চাল নেই চুলো নেই। বাপের চোখ উল্টোবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিটেমাটি-চাটি। তারপর দুই ভায়ে মিলে মশাই ফুলের দোকান খুললো কলকাতায়। তাও টলোমলো অবস্থা। চালা ঘরে বাস—ডাইনে আনতে

ধাঁয়ে কুলোয় না। লড়াই শুরু হ'লো উনিশশো চোদ্দয়। তুখোড় ধড়িবাজ ছেলে দুটি—সব ছেড়ে কেবল বাজার ঘুরে ঘুরে পেরেক কিনতে শুরু করলো। ঘটি বাটি বেচে, ধারধোর করে স্রেফ পেরেক কেনা। মাঝ রাত্রিতে ছোটটা আবার চীৎকার করে উঠতো স্বপ্ন দেখে ঃ পেরেক, পেরেক। কত ঠাট্টাই আমরা করেছি তাই নিয়ে।

ঃ তারপর।

ঃ তারপর সেই লোহা সোনা হ'য়ে উঠলো মশাই। বাড়ী হ'লো, গাড়ী হ'লো, মেজাজই অন্য রকম হ'য়ে গেলো। দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করে তারপর দেখা করবার ফুরসৎ মিলতো তাঁদের সঙ্গে। তবে হাঁ, ভগবানও আছেন।

ঃ কি রকম? সব গেলো বুঝি আবার? কিসে গেলো?

ঃ ঘোড়া, ঘোড়া আর মানুষের যায় কিসে। বন্ধু জুটলো, বান্ধব জুটলো, একপাল মোসায়েব দিনারাত দুজনকে ঘিরে থাকতো। তাদের মধ্যেই কে একজন বুদ্ধি দিলে—ঘোড়া ধরবার। বলল সব ভালো ঘোড়ার নাম—পক্ষী-রাজের আস্তাবলতুতো ভাইদের খবর।

ঃ পক্ষীরাজরা কার্যকালে পিছিয়ে পড়লো বুঝি?

ঃ পিছিয়ে পড়বে কেন? আকাশে উধাও হলো একেবারে—সঙ্গে আমাদের ভাইদের টাকার থলি।

ভাইদের প্রসঙ্গটা বিশেষ ভালো লাগে না—সীমাচলমের। বিষয়টা পাল্টাবার চেষ্টা করে ঃ তাহলে এই লড়াইয়ে আমাদেরও ধরতে হয় কিছু, কি বলেন?

নিজের প্রশস্ত ললাটে সজোরে করাঘাত করেন ভবতারণবাবু ঃ সব এইখানে বুঝলেন সীমাচলমবাবু। এখানে যদি লেখা থাকে, তবে আপনি যাই ধরুন—সোনা হয়ে যাবে।

মুচকে হাসে সীমাচলম, বলে ঃ তেলের কলের লোহালক্কড়গুলো বিক্রী করে দিলেইতো হয়, কি বলেন সোনার দাম পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

কথাটায় বেশ একটু চমকে ওঠেন ভবতারণ-বাবু। একেবারে দাঁড়ান সীমাচলমের গা ঘেঁষে ঃ কথাটা মন্দ বলোনি ভায়া। এমনিতে তো তেলের কল উঠে যাবার যোগাড়—কলকব্জা-গুলো খুলে ঝেড়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না। একবার জাহাজে উঠে বসতে পারলে কে কার খোঁজ রাখে।

মুস্কিলে পড়ে যায় সীমাচলম। কথাটা যে এভাবে মোড় ঘুরবে তা কিন্তু আশা করেনি। তাড়াতাড়ি অন্য কথা আরম্ভ করে ঃ এবারে কি মনে হচ্ছে আপনার? হিটলার কি আর তোড়জোড় না করে নেমেছে?

ঃ হুঃ, ফুঁয়ে উড়ে যাবে মশাই, ফুঁয়ে উড়ে যাবে। ওদের তো যতো জোর আমাদের ওপর।

ঃ হবে না কেন বলুন। ওদের একজনকে দেখলে আপনারা একশোজন যে পিছিয়ে যান।

ঃ সেদিন আর নেই মশাই। আপনি বাঘা যতীনের নাম শুনেছেন, কানাইলালের নাম? চাটগাঁ আর্মারি কেসের ব্যাপার জানেন?

না, বলুন না শুনি ঃ বেশ আগ্রহান্বিতই মনে হয় সীমাচলমকে।

ঃ চেপে যান মশাই। কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে তারপর এই বয়সে শেষকাল হাজত বাস করতে হবে, কি দরকার।

ঃ হাজতবাস করতে হবে, কেন?

ঃ আর কেন, আমরা মশাই আদার ব্যাপারী, কি দরকার জাহাজের খবরে, কি বলেন?

ভবতারণবাবুর সামনে টাঙানো প্রকাণ্ড ম্যাপ-খানার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে সীমাচলম, তারপর একটু হেসে বলে ঃ সত্যি, কি দরকার জাহাজের খবরে।

সেদিন ভোরে বারান্দায় এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। সমস্ত বাড়ীটা ছেয়ে ফেলেছে পুলিশে। একটা পুলিশের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে ঠিক গেটের সামনে। দু একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরকেও ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় ধারে কাছে। মাথাটা ঘুরে ওঠে সীমাচলমের। এতদিন পরে সন্ধান পেলো নাকি পুলিশে? অনেক দিনের ফেলে আসা টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু সেদিনের সে উত্তাপ আজতো নিভে গেছে পরিমিত জীবনের অন্তরালে। সে সব স্মৃতি আর সেই পরিবেশের কথাও তো ভুলতেই চায়। কেমন যেন ভয় ভয় করে সীমাচলমের।

একটু ভোর হতেই দুজন পুলিশের লোক ভিতরে ঢোকে। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে উচ্চ কর্মচারী বলেই মনে হয়। সোজা খট খট করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে আসে। সীমাচলম পায়ে পায়ে সরে দাঁড়ায় বারান্দা থেকে—কি জানি কি চিহ্ন ফেলে এসেছে পিছনদিকে—তারই সূত্র ধরে আজ পুলিশ দাঁড়িয়েছে ওর দরজায়। আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে সীমাচলম—দরজাটা ভেজিয়ে দেয় সন্তর্পণে।

কিন্তু খুট খুট করে শিকল নাড়ার শব্দ হয়। সার্টের কলারটা ঘামে ভিজে যায় সীমাচলমের। উঠে ও ঠেলে খুলে দেয় দরজাটা।

ঃ মিঃ পল অগস্টিন থাকেন কোন কুঠুরিতে?

পল অগস্টিন! ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে সীমাচলমের। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় অগস্টিন সায়েবের ঘরটা।

সোরগোলে অগস্টিন সায়েব আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন বারান্দায়। তাঁর নাম শুনে এগিয়ে এসে দাঁড়ান সামনে।

ঃভিতরে আসুন। —ব্যাপারটা আবছা যেন বুঝতে পারেন অগস্টিন সায়েব, কিন্তু বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম। এ সময় অগস্টিন সায়েবের ঘরে যাওয়া উচিত হবে কিনা তাও ঠিক করে উঠতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসে পুলিশ ইন্সপেক্টর দুজন। তাদের পাশে পাশে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে আসে মার্থা—আর সব চেয়ে পিছনে প্যান্টের পকেটে দু হাত পুরে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে হাঁটেন অগস্টিন সায়েব। পুলিশের গাড়ীটা গেট দিয়ে একেবারে ব্যারাকের সামনে এসে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে ছোটখাট একটা ভীড় জমেছে গাড়ীটা ঘিরে—বেশীর ভাগই ছেলেপিলের দল আর পথচলতি আধাশহরে লোক। সীমাচলম এইবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে তর তর করে। জোর পায়ে হেঁটে অগস্টিন সায়েবের পাশে এসে দাঁড়ায়।

গাড়ীতে ওঠবার আগে ফিরে দাঁড়ায় মার্থা। অগস্টিন সায়েবের দিকে ফিরতে গিয়ে চোখা-চোখি হ'য়ে যায় সীমাচলমের সঙ্গে। মুচকি হাসে মার্থা ঃ চললুম, মিঃ সীমাচলম। গারদে থাকবো না বেশী দিন। এবার আমরা জিতবোই। গতবারের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে জর্মানীতে—এবার আর ভুল হবে না।

কোন কথা বলে না সীমাচলম। কিন্তু তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে, মনে হয় প্রকাণ্ড একটা দৈত্য যেন ভীষণ দাপা-দাপি শুরু করেছে বুকের মাঝখানটায়। চোখের পাতাটা ভিজে ভিজে ঠেকে। আস্তে আস্তে ভীড় থেকে সরে আসে সীমাচলম। একটু পরে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে গেটের কপাটে মাথা রেখে ছেলেমানুষের মতন কাঁদছেন অগস্টিন সায়েব। পুলিশের গাড়ীটা আর দেখা যায় না। রাশীকৃত লাল রংয়ের ধুলোর কুণ্ডলী উঠছে রাস্তার মোড়ে।

বারান্দায় উঠতেই দেখা হ'য়ে যায় ভবতারণ-বাবুর সঙ্গে। কোমরে তোয়ালে জড়ানো—পার্টিশনের পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছেন। সীমাচলমকে দেখে এগিয়ে আসেন এক পা দু পা করে।

মাগীকে ধরে নিয়ে গেল বুঝি?

কথার উত্তর দেয় না সীমাচলম। কেমন যেন বিশ্রী লাগে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করতে তাও আবার ভবতারণবাবুর সঙ্গে। বারান্দার ওপর চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে থাকে সে। অগস্টিন সয়েব তখনও দাঁড়িয়ে আছেন সেইভাবে।

হ্যাঁ, মশাই শুনছেন, কেন ধরলো বলুন তো?

ঃ আপনি ছিলেন কোথায় এতক্ষণ—চাপা বিরক্তি ফুটে ওঠে সীমাচলমের কণ্ঠস্বরে।

ঃ আমি? আর বলেন কেন মশাই। ভোর থেকে টনটন করছে পেটটা। একবার পায়খানা আর একবার ঘর এই করছি সকাল থেকে। আমি থাকলে তো স্পষ্ট জিজ্ঞাসাই করতে পারতুম ওদের কি ব্যাপার?

ঃ জিজ্ঞাসা করার আর প্রয়োজন হবে না—গলার আওয়াজটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে তোলে সীমাচলম ঃ এই ব্যারাকের কেউ বাদ যাবে না, সব যেতে হবে গারদে।

ঃ সে কি মশাই, এ আবার কি সর্বনেশে কথা? আমরা কি করলুম!—চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে ভবতারণবাবুর।

ঃ আপনাকে ওই ফিরিঙ্গী মাগীটা তাই বুঝি বলে গেলো যাবার সময়?

হ্যাঁ, মিসেস অগস্টিন বলে গেলেন যে, কেউ বাদ যাবে না। ভবতারণবাবু, মনেও ভাববেন না যে, লুকিয়ে থাকলেই পার পেয়ে যাবেন। সবায়েরই দিন আসছে।

এবারে কেঁদেই ফেলেন ভবতারণবাবু। হাউ মাউ করে কাঁদেন বসে পড়েঃ কি বিপদ দেখুন তো মশাই, আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিরীহ গোবেচারা আমায় কেন এভাবে ইয়ে করা। আমি কস্মিনকালে ভালো করে কথাও বলিনি মাগীটার সংগে—বিদেশ বিভুঁয়ে কি করি বলুন তো মশাই।

বিশ্রী লাগে সীমাচলমের। কাদার ডেলা নিয়ে খেলতে বিরক্তিই বোধ হয় তার। আস্তে আস্তে বলে ঃ বলে গেলো ইংরাজ রাজত্বের অবসান হয়ে আসছে। এবার ওদের জিত। বুজরুকি আর ফাঁকিবাজির দিন শেষ হয়ে গেছে।

ঃ বলেন কি মশাই—ওই একপাল ইংরেজ পুলিশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললে এই কথা? কেউ বললে না কিছু।

ঃ বলবে আবার কি? সত্যি কথায় বলবার আবার কি আছে। ওরাই জিতবে এবার।

কোন উত্তর দেন না ভবতারণবাবু! ফিরে গিয়ে দেয়ালে লটকানো ম্যাপটার দিকে চেয়ে দেখেন—যেখানে যেখানে জার্মানীরা এগিয়ে চলেছে আর যে সব ঘাঁটি দখল করেছে নীল পেন্সিল দিয়ে নিজের হাতে দাগ দিয়েছেন ভবতারণবাবু। অনেকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে দেখে আস্তে আস্তে বলেন ঃ ওরা তা হ'লে জিতবে কি বলেন? জিতবে বলেই যেন মনে হচ্ছে। স্ট্রেট অফ ডোভার তো ওদের কাছে নালা—নালা—স্রেফ নালা। এপারে কামান বসাবে আর পার্লামেন্ট তাক করে ছুঁড়বে গোলা। হুঁ, এবার বোধ হয় জিতেই গেলো জার্মানী।

অগস্টিন অনেকটা যেন গম্ভীর হয়ে গেছেন। অফিসে ছোটাছুটিটাও স্তিমিত হয়ে গেছে। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন তিনি। মাঝে মাঝে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন মেশিনের সামনে—কি যেন ভাবেন নিঃশব্দে, তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে জোরে জোরে পা ঠুকে ফিরে আসেন নিজের চেয়ারে।

সীমাচলম বিকালের দিকে যায় মাঝে মাঝে অগস্টিন সায়েবের ঘরে।

ঃ আসুন, আসুন—কেমন যেন নিস্তেজ গলার স্বর অগস্টিন সায়েবের।

চুপচাপ চেয়ারে গিয়ে বসে সীমাচলম। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতায় কেমন যেন বিরক্তি আসে তার। মাঝে মাঝে মনে হয়, এত অল্পতেই ভেঙে পড়লেন কেন অগস্টিন সায়েব। ক' বছরেরই বা পরিচয় মার্থার সংগে।

ঃ মার্থাকে রাখতে পারবো না তা জানতুম।

আচমকা অগস্টিন সায়েবের গলার আওয়াজে চমকে ওঠে সীমাচলম। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরেন অগস্টিন সায়েব। আস্তে আস্তে বলেন কথাগুলো।

ঃ জার্মানীর মেয়েরা দেশ ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না। ওদের কাছে দেশ সবচেয়ে বড়ো দেবতা—সব কিছু করতে পারে দেশের জন্য। লড়াই যে লাগবে, তা ও জানতো ছ' মাস আগে। কতবার আমায় বলেছে, তোমার কাছে আর থাকতে পারবো না বেশীদিন। মস্ত বড়ো একটা কাজের ভার আমার ওপরে—এখান থেকে শীঘ্রই সরে যেতে হবে আমাকে। ইংরেজের রাজত্বে বাস করতে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতো। ও বলতো, এখানের বাতাসে গোলামির বিষ।

ঃ মিসেস অগস্টিন কি এখানেই আছেন এখন?

ঃ না, কাল প্রোমে চালান দিয়েছে। শীঘ্রই রেংগুন হয়ে বোধ হয় ভারতবর্ষেই নিয়ে যাবে। কিন্তু তার পরে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথাবার্তা হয় না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামে চারদিক ঘিরে। টেবিলের ওপর ফ্রেমে বাঁধানো মার্থার ছবিখানি আবছা দেখা যায়—সারা মুখে একটা ম্লান বিষণ্ণতার ছাপ, নীল দুটি চোখে কিসের স্বপ্ন, কে জানে। (ক্রমশ)

স্বপ্ন মীন

অমল ঘোষ

ফেলি জাল সমুদ্র বিশাল ভাঙে ঢেউ
সহস্র সুন্দর কান্তি স্বপ্নমীন ক্রমে হয় জড়
নির্জন বালুর তটে, কাঁপে রশ্মি সায়াহ্ন সূর্যের,
বহুবর্ণচ্ছটাময় সরল তীর্যক চক্রাকার,
ঝলে রশ্মি স্বর্ণমীন দেহে;
গাঢ় কালো জল ছলছলে
আলোর প্রপাত ভাঙা রক্ত রাঙা দিগন্তে সিন্দুর
উঠে গান অজানিত বিপুল করুণ কলনাদে,
দোলে চিত্ত কাঁপে প্রাণ অবিরাম ধূসর হৃদয়ে।
সুদূর স্বপন ছবি অন্তরবিপ্রায় অস্তমিত
বিগলিত অন্ধকারে পারাবারে উধাও দিবস,
দিবস এ জীবনের, পশ্চাতে দিগন্তময় ভস্মময়
স্মৃতির শ্মশান, অনির্বাণ চিতাকুণ্ড
জ্বলন্ত যন্ত্রণা অতীতের।
জন্ম জন্মান্তর হতে নির্জনে এমনি একা একা
কেটেছে অযুত বেলা, তবু খেলা হয়নি নিঃশেষ,
তবু স্বর্ণ আশাময় স্বপ্নজালে চলেছে শিকার,
বার বার অন্ধকার মহাকাল বৈতরণী জলে,
পশ্চাতের চিতাভস্মে সম্মুখের বালুতট গড়ি,
খুঁজে মরি বার বার এ জীবন স্বপ্ন অন্বেষণে।

প্রত্যয়

ইসাক্ ডিন্‌সেন্

[শ্রীমতী ইসাক্ ডিন্‌সেন ডেনমার্কের কোনো এক অভিজাত পরিবারে জন্মেছেন—বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সমস্ত মানবসমাজের প্রতি ঐকান্তিক স্নেহ এবং একটি কল্যাণদৃষ্টি তাঁর রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘকাল তিনি দেশেবিদেশে ঘুরে মানুষকে জেনেছেন, চিনেছেন। পৃথিবীতে 'মাতৃত্ব' নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়েছে, আরো হবে, কিন্তু বক্ষ্যমান কাহিনীতে লেখিকা যে অপূর্ব দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর।]

গত শতাব্দীর প্রথমের দিকে ডেনমার্কের সমুদ্রতটবর্তী কোন জায়গায় একদল জেলে বাস করতো। প্রাদেশিক ভাষায় তাদের বলা হত 'প্লেজেন্ট'। একদিন তাদের সবই ছিলো—নিজেদের বাস করবার জন্যে ছোটখাটো একটু জায়গা—কুঁড়েঘর, মাছ ধরবার জন্যে নৌকো—উদার আর উন্মুক্ত আকাশের তলায় আনন্দ-উৎসব। কিন্তু নিজেদের দোষেই একদা তাদের এই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনে ভাঙন ধরলো। এলো পাপ। চুরি-ডাকাতি, মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, হত্যা, লুণ্ঠন ক্রমশ তাদের যেন পেয়ে বসলো। আশেপাশের লোকেরা এদের অত্যাচারে অস্থির এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, সুতরাং অবিলম্বে কর্তৃপক্ষ কঠিন হাতে দমন করবার ব্যবস্থা করলেন এদের। দেখতে দেখতে ডেনমার্কের কারাগারগুলি ভরে উঠলো।

সেই অঞ্চলের একজন বৃদ্ধ বিচারক এদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একবার বলেছিলেন, "এই প্লেজেন্টরা খুব খারাপ লোক নয়, এরা স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী, এমন কি বেশ বুদ্ধিমানও বলা যায়। এদের থেকে অনেক খারাপ লোক আমি দেখেছি; খালি এদের দোষ হচ্ছে এই যে, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনে বেঁচে থাকবার উপায়টা এরা জানে না—আমার আশংকা হয়, এইভাবে দিনের পর দিন যদি চলতে থাকে, তাহলে কিছুকালের মধ্যেই পৃথিবী থেকে এরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হবে!"

আশ্চর্য ঘটনা এই, 'প্লেজেন্টরা' যেন তাদের এই অন্ধকার ভবিষ্যৎকে হঠাৎ বুঝতে পারলো একদিন এবং ভীত, সন্ত্রস্ত চিত্তে মুক্তির উপায়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন নামতে লাগলো তাদের মধ্যে। দেখা গেল, কেউ স্থানীয় গণ্যমান্য কোন এক কৃষক পরিবারে বিবাহ করেছে, কেউ বা হেরিং মাছ ধরবার কোন কারবারে এসে যোগ দিয়েছে—কেউ বা কোন ব্যবসা করবার চেষ্টা করছে।

আস্তে আস্তে প্রাণের যেন স্পন্দন জাগতে লাগলো চারদিকে। কেবল এদের মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রিনী একটি মেয়ে তাদের এই জাতির সমস্ত গ্লানি, দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যকে বহন করে নিয়ে ছিটকে এসে পড়লো কোপেনহেগেন শহরে, আর তার কুড়ি বছরের ছোট্ট দুঃখ-জর্জর জীবনে নিদারুণ বেদনায় প্রায় সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় অবস্থায় পিছনে রেখে গেল তার কুমারী জীবনের পাপ, তার পরম দুঃখের ধন একটি অবৈধ শিশু-সন্তান। আমাদের গল্পের কাহিনী এই ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে।

ম্যাডাম মালার বলে একটি ভদ্রমহিলার বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেয়েটি কোপেনহেগেনের 'এডেল গেড' অঞ্চলে ছিলো। মৃত্যুর আগে তাঁকে ডেকে তার অতিকষ্টে জমানো একশ'টি টাকা তার হাতে দিয়ে মেয়েটি বললে, ম্যাডাম, আমি চললাম, আমার এই ছেলেটিকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, তুমি মানুষ করো।

ম্যাডাম মালার মৃত্যুপথযাত্রিনীর এই অনুরোধ মাথা পেতে নিলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন, ছেলেটিকে তিনি মানুষ করবেন।

ছেলেটির নাম জেনস। কোপেনহেগেনের কোন এক অন্ধকার গলিতে ছোট্ট সেই একটা পাড়ার মধ্যে আস্তে আস্তে বড়ো হতে লাগলো সে। চিনতে লাগলো পৃথিবীকে—দুঃখে বেদনায় আনন্দে তার দিন কাটতে লাগলো।

সমবয়সী সংগীদের সকলেরই মা এবং বাবা আছেন, কেবল জেনস-এর কেউ নেই। প্রায় এই কথা নিয়ে সে আকাশ পাতাল ভাবতো। সংগীরা জিজ্ঞেস করলে কোন উত্তর দিতে পারতো না। ম্যাডাম মালারও কোন সদুত্তর দিতেন না, যতো বয়েস হতে লাগলো, তার সেই শৈশব-জীবনে এই দুঃখটাই ততো গভীর হয়ে উঠতে লাগলো।

ঠিক এই সময়ে ম্যাডাম মালার-এর খুব ছোট বেলার এক বান্ধবী হঠাৎ তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এলেন। তাঁর নাম ম্যাম-জেল-য়্যান। অত্যন্ত উদার প্রকৃতির মানুষ—সন্তানহীনা। ছেলেটিকে দেখে খুব ভালো লাগলো তাঁর—আসবার সময়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করে বান্ধবীর কাছ থেকে জেনসকে তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন; ইচ্ছে—নিজের ছেলের মতো তাকে লেখাপড়া শেখাবেন, মানুষ করবেন।

জেনসও নতুন জায়গায় এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু হলে কি হবে, ভাগ্যে যা লেখা থাকে, তার তো কোন ব্যত্যয় ঘটা সম্ভব নয়—জেনস-এর বয়েস যখন পুরো ছ' বছর, তখন হঠাৎ ম্যাম-জেল-য়্যান মারা গেলেন। অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন তিনি, তাই যাবার সময়ে জেনস-এর জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলেন না। কেবল কতোগুলো বই—একটা কালো চেয়ার আর কিসব টুকিটাকি জিনিস পেলো জেনস।

আবার ম্যাডাম মালারের বাড়িতে জেনসকে ফিরতে হোল। ম্যাডাম এবার তাকে আরো যত্ন করতে লাগলেন; কারণ ছেলেটি একবার বড়ো হয়ে উঠলে তাঁর অনেক সুবিধে। একটা লণ্ড্রী ছিলো তাঁর, অন্তত সেই কাজে জেনসকে লাগিয়ে দিতে পারবেন তিনি ভবিষ্যতে।

ঠিক এই সময়ে, যখন কোপেনহেগেন শহরের এই এডেল গেডে জেনস ফিরে এলো; তখন এখান থেকে কিছুদূরে ব্রেডগেড অঞ্চলে একটি নববিবাহিত ধনী দম্পতি বাস করতো। ছেলেটির নাম জেকব আর মেয়েটির নাম এমিলি ভ্যানডাম!

এমিলির বাবা ছিলেন কোপেনহেগেনের বিখ্যাত জাহাজ ব্যবসায়ীদের অন্যতম। আর জেকব তাঁরই বোনের ছেলে। খুব ছোটবেলা থেকেই এমিলির সংগে জেকবের ঘনিষ্ঠতা—সুতরাং তারা যে একদিন পরস্পর বিবাহ করবেই, একথা সকলেই জানতো।

জেকব অতি সাদাসিধে ধরণের মানুষ, তবে ব্যবসায়ে তার বুদ্ধি ছিল খুব। এমিলির বাবাও তাকে ঠিক সেইভাবে গড়ে তুলেছিলেন, কারণ এটা ঠিক যে, তাঁর মৃত্যুর পর এই বিরাট সম্পত্তির অধিকারিণী একমাত্র এমিলিই হবে; সুতরাং তার স্বামী যাতে সেদিক থেকে যোগ্যতর হয়, সে বিষয়ে বৃদ্ধ পিতার দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিলো।

এমিলি যে অপূর্ব সুন্দরী ছিলো তা নয়, তবে তার চেহারায় ভারী সুন্দর একটা কমনীয়তা এবং ব্যক্তিত্ব ছিলো। খুব আস্তে কথা বলা তার অভ্যাস—সাধারণের কোন কাজে তার উৎসাহ ছিলো অপরিসীম—বিচার-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, রুচি, কথাবার্তা, সব দিক থেকে

এককথায় চমৎকার একটি মেয়ে এই এমিলি ভ্যানডাম।

এমিলির যখন আঠার বছর বয়েস, তখন ব্যবসায়ের প্রয়োজনেই প্রায় বছর খানেকের জন্যে জেকবকে চীন দেশে গিয়ে থাকতে হয়। তখনো এমিলির সংগে জেকবের বিয়ে হয়নি, তবে এমিলি ছিলো বাক্‌দত্তা; সুতরাং চীন থেকে ফিরেই জেকব তাকে বিয়ে করবে, এই-রকম স্থির হোল—এমিলির বাবারই এই নির্দেশ।

জেকব চলে যাওয়ার কিছুকাল পরে এমিলিদের পরিবারে 'চারলি ড্রায়ার' বলে একটি ছেলে পরিচিত হয়। সে জাহাজের একজন পদস্থ কর্মচারী—এমিলির বাবা এ ছেলেটিকেও বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন।

তখন বয়েস তেইশ বৎসর ছিলো চার্লির—খুব সুন্দর ঋজু চেহারা—তাছাড়া ১৮৪৯-এর যুদ্ধে গিয়ে যে কৃতিত্ব অর্জন করে চার্লি দেশে ফিরেছিলো, সে গৌরবের কথা সকলেই তখন শ্রদ্ধার সংগে আলোচনা করে।

যতো দিন যেতে লাগলো, এমিলির সংগে চার্লির ঘনিষ্ঠতাও ততো বেড়ে চললো। আকর্ষণও বাড়তে লাগলো পরস্পরের। সত্যি কথা বলতে এমিলির সংগে তো আর জেকবের বিয়ে হয়ে যায়নি, কেবলমাত্র বাক্‌দান—এ অবস্থায় যদি এমিলি চার্লিকে বিয়ে করে, তাহলে কারু বলবার অবশ্য কিছুই থাকে না—কিন্তু তবু জেকবকে ছেড়ে চার্লিকে বিয়ে করার কথা এমিলি ভাবতেও পারতো না।

অথচ এমন বিপদ, চার্লিকে ছেড়েও সে যেন এক মুহূর্ত থাকতে পারে না—চার্লিকে পেয়ে তার মনে হোল, জীবনে যে এতো আনন্দ, এতো রস, এতো প্রাণ-কল্লোল থাকতে পারে—ইতিপূর্বে এমিলি তা কখনো জানতে পারেনি।

এমিলির খুব অন্তরংগ বন্ধু শার্লটি টিউটিন একদিন আড়ালে সাবধান করে দিলে এমিলিকে; বললে, চার্লির সংগে অতোটা মেলামিশি করিস না ভাই—খুব যে ভালো-মানুষ তা তো মনে হয় না, কোপেনহেগেনের বহু মেয়েকে ও নাচিয়েছে, কিন্তু কাউকেই বিয়ে করেনি, চেহারাটা পেয়েছিলো কিনা, আধুনিক যুগের ডন জুয়ান বলতে পারিস।

এমিলি নীরব অবসরে আয়নার মধ্যে নিজের প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে ঠোঁট উল্টে হাসতো, মনে মনে বলতো, সে ছাড়া তার চার্লিকে জগতে কেউ বুঝতে পারেনি, সকলেই তাকে ভুল বোঝে।

এই সময়ে একদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চার্লির জাহাজ রওনা হবে স্থির হোল। যাবার আগের রাত্রে এমিলির কাছে বিদায় নেবার জন্যে চার্লি দেখা করতে এলো; এসে দেখে, এমিলি একলা ঘরে রয়েছে—আর কেউ নেই। সেই রাত্রে চাঁদের আলোয় তারা দুজনে বাগানে বেড়াতে বের হোল। যাওয়ার আগে শিশির-ভেজা একটি ছোট্ট সুন্দর গোলাপ তুলে চার্লিকে দিলে এমিলি, বললে, এই আমার স্মৃতিচিহ্ন রইলো তোমার কাছে; হাত পেতে চার্লি নিলে সেটা, তারপরে দরজার কাছে এসে দুই হাত চেপে ধরলো এমিলির, কাল সকালে আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি এমি, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে, দয়া করে আজ রাত্তিরটা আমাকে তোমার সংগে থাকতে দাও—কাল খুব ভোরেই আমি রওনা হয়ে যাবো।

সমস্ত শরীর একবার ঝিমঝিম করে উঠলো এমিলির—একী কথা সে শুনলে আজ চার্লির কাছ থেকে? একী কখনো সম্ভব? তার সমস্ত কুমারী-জীবন যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো একবার, পায়ের নীচের মাটী টলতে লাগলো—কোনরকমে অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করলো, তা হয় না—তা হতে পারে না চার্লি!

কিন্তু চার্লি তখন দুই হাতে নিজের বুকের মধ্যে তাকে নিবিড় করে টেনে নিয়েছে, পৃথিবী ভেসে গেলেও চার্লি ছাড়বে না এমিলিকে।

হঠাৎ একটা প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়লো এমিলি, তারপর দুই হাতে তাকে দূরে ঠেলে গেটের বাইরে বের করে দিয়ে নিজেই ভারী লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিলে, যেন মনে হোল, কোন ক্রুদ্ধ সিংহের খাঁচায় এপারে এই মুহূর্তে যেন এমিলি নিজেকে বাঁচিয়ে সরিয়ে নিতে পেরেছে—আর গেটের ওধারে দাঁড়িয়ে বেদনার্ত চার্লি তার দুটি হাত ধরবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো। টলতে টলতে নিজের ঘরের মধ্যে এসে উচ্ছ্বসিত কান্নায় এমিলি বিছানার উপরে লুটিয়ে পড়লো। হতভাগ্য চার্লি ড্রায়ার সেই অন্ধকার রাত্রে জাহাজে ফিরে গেল।

এই ঘটনার প্রায় মাসছয়েক পরে জেকব দেশে ফিরলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই তার সংগে এমিলির বিয়ে হয়ে গেল। এরই মাস-খানেক পরে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, সেণ্ট টমাসের কাছাকাছি কোথায় চার্লি ড্রায়ারের খুব অসুখ করে এবং কয়েকদিন হোল সেখানেই সে মারা গেছে।

বিয়ের কিছুদিন পরে হঠাৎ জেকব এক-খানি বেনামী চিঠি পেলো, তাতে লেখা ছিলো যে, সে যখন চীনে ব্যবসায়ের জন্য গিয়েছিল, সেই সময়ে এমিলি ভ্যানডামের সংগে চার্লি ড্রায়ার বলে একটি লোকের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়—সুতরাং সাবধান।

জেকব এসব কথা বিশ্বাসই করলে না, চিঠিটা নিয়ে টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দিলে।

দিন যেতে লাগলো। এক-এক করে তার-পরে পুরো পাঁচ বছর কেটে গেল; কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সন্তানাদি হোল না তাদের। জেকব এতদিন আশা রেখেছিলো, কিন্তু এইবার সে-ও হাল ছাড়লো, শেষ পর্যন্ত একটি পোষ্যপুত্র নেবার কথা ভাবলো সে, এমিলিকে একদিন ডেকেও সে একথা জানালে।

এমিলি তখনো আশা ছাড়েনি কিন্তু, আরো কিছুদিন পরে সে-ও নিরাশ হোল, স্বামীকে জানালে তার ভাগ্যে ভগবান কোন সন্তান দেননি—সে বন্ধ্যা। মনে মনে ভাবলে—স্বামীর যখন একান্তই একটি পোষ্যপুত্র নেবার ইচ্ছা, কি দরকার তাঁর সে অভিলাষে বাধা দিয়ে—এমিলি সম্মতি দিলে।

এই রকম সময়ে একদিন জেকব এডেলগেড অঞ্চলের একটা ছোট্ট গলির মধ্যে দিয়ে তার ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলো। খানিকটা আসবার পর হঠাৎ সে দেখলে রাস্তার ধারে একটা মাতাল ছোট্ট একটি ছেলেকে খুব মারছে। মারতে মারতে পাশেই একটা খানার মধ্যে তাকে ঠেলে ফেলে দিলে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে জেকব নেমে এলো নীচে, তাকে দেখে মাতালটা পালালো। জেকব নিজে সেই খানা থেকে ছেলেটিকে তুলে নিলে, বেশ চমৎকার ছেলেটি, চোখে-মুখে এখনো রক্ত লেগে রয়েছে—মুখটা ফুলে গেছে একেবারে—আশেপাশে ইতিমধ্যে রীতিমতো ভীড় জমে গেছে—খোঁজ নিয়ে জেকব জানলো, এ-ছেলেটি মিসেস মালার বলে একটি ভদ্রমহিলার বাড়িতে থাকে—এর নাম জেনস!

চকিত বিদ্যুতের মতো তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, জেকব ভাবলো, বেশ সুন্দর দেখতে ছেলেটি—একে পোষ্যপুত্র হিসেবে নিলে কেমন হয়? যেই ভাবা, সংগে সংগে সে কর্তব্য ঠিক করে ফেললো। ছেলেটির সংগে সে সেইদিনই চলে গেল মিসেস মালার-এর বাড়ি, তারপরে তাঁর সংগে দেখা করে সব জানালো সে, ছেলেটির পরিবর্তে অনেক টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে জেকব, টাকার কথায় মালার খুশী হোলেন—বললেন, তা বেশ, আপনি নেবেন এতো আনন্দেরই কথা।

বাড়ি এসে স্ত্রীকে সমস্ত কথা জানালে জেকব। অত্যন্ত হাল্কা মনে এমিলি এটাকে নিলে, উপহাসের সুরে বললে, আমি কিন্তু তার মা-টা হতে পারবো না, তা বলে দিচ্ছি বাপু—রাখতে ইচ্ছে হয় রাখো; বড়ো জোর ছেলেটির আমি কাকী কি জেঠী কি মামী হতে পারি—তার বেশী নয় কিন্তু।

জেকব তাতেই রাজি হোল এবং ঠিক হোল, এমিলি নিজেই একলা গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে আসবে—সংগে সংগে অনুরূপ ব্যবস্থা হয়ে গেল।

মিসেস মালার জেনসকে ডেকে বললেন, জেনস, তোমার মা আজ তোমাকে নিতে আসবেন, তুমি স্নানটান করে সেজেগুজে ঠিক হয়ে নাও।

এতোদিন অনেক প্রশ্ন করেও জেনস মিসেস মালারের কাছ থেকে তার মায়ের কোন কথা জানতে পারেনি, প্রথমটা শুনে সে রীতিমতো অবাক হয়ে গেল, তারপরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—কখন আসবেন? কেন এতোদিন আসেন নি তার মা—সেইদিন তার সংগীদের সে জানিয়ে দিলে, তার নিজের মা এবং বাবা তাকে নিতে আসছেন—তারা যেন দেখে!

একটু পরেই হঠাৎ দরজায় একটা গাড়ি আসবার শব্দ হোল, ছোট্ট জানালা দিয়ে জেনস মাথা উঁচু করে দেখলে, গাড়ি থেকে তার মা নেমে আসছেন, কী সুন্দর দেখতে তার মাকে!

আস্তে আস্তে এমিলি এসে ঘরে ঢুকলো—মিসেস মালার নিজে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে এলেন। অবাক আর বিস্মিত চোখে জেনস তখন এমিলির দিকে চেয়ে আছে, তার চোখের দিকে চেয়ে জেনস-এর সমস্ত মুখ অপূর্ব একটা জ্যোতিতে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, আর পারলো না—একেবারে ছুটে এসে দুই হাতে এমিলিকে সে জড়িয়ে ধরলো, বললে, মা, তুমি কোথায় ছিলে এতোদিন? আমি কতোদিন যে তোমার কথা ভেবেছি, আজ এতোদিনে বুঝি মনে পড়লো আমাকে?

এমিলি একবার মুখ ঘুরিয়ে মিসেস মালারের দিকে চাইলে, মনটা তার ঈষৎ বিরক্তিতে ভরে উঠলো, তার মনকে নরম করবার জন্যে ছেলেটিকে তো বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছে দেখছি এরা, আর ছেলেটিও তো বেশ অভিনয় করতে পারে যা হোক! কিন্তু তবু মুখে কিছুই বললে না এমিলি। আস্তে জেনসকে কাছে টেনে নিলে, তারপরে বললে, হ্যাঁ বাবা, আজ তোমায় আমি নিতে এসেছি, চলো আমার সংগে, সেখানে মস্ত বড়ো বাড়ি আছে তোমার—তুমি সেখানেই থাকবে।

মিসেস মালারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এমিলি জেনসকে সংগে করে বাড়ি ফিরে এলো।

এই বিরাট বাড়ি দেখে অবাক হোল জেনস—প্রশ্নের পর প্রশ্নে অস্থির করে তুললো এমিলিকে, শান্তভাবে এমিলি সব কথার উত্তর দিতে লাগলো।

ঘরের ভিতরে এসে জেনসকে নিয়ে এমিলি একটা ছবির বই খুলে দেখাতে লাগলো।

জেনস-এর এই বাড়ি, এই ঘর-দোর খুব ভালো লাগছিলো—এমন সময় বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ হোল।

জেনস জিগ্যেস করলো, কে মা?

—বোধ হয়, আমার স্বামী আসছেন।

—ও, আমার বাবা! তাড়াতাড়ি ছুটে সে দরজার কাছে এগিয়ে এলো।

জেকব এসে ঘরে ঢুকলো, তাকে দেখেই জেনস বললে, ও তুমি—তুমি আমার বাবা; আচ্ছা বাবা, কি করে তুমি আমাকে চিনলে সেদিন? মিসেস মালার বলেছিলেন, তুমি নাকি আমার মাথার চুলের গন্ধ পেয়ে আমাকে চিনেছো, কিন্তু বাবা, আমার কি মনে হয় জানো, তোমার ঘোড়াটাই আসলে আমাকে দেখে ঠিক চিনতে পেরেছিলো। আমি ঠিক জানি।

ব্রেডগেডে এমিলিদের সেই বাড়িতে জেনস রয়ে গেল। এমিলির বাবার সংগে জেনস-এর বন্ধুত্ব হোল সব থেকে বেশী, রোজ বিকেলে সে সেই বৃদ্ধের সংগে বাগানে বেড়াতো। এমিলির বাবা ছিলেন জাহাজের মালিক—সমুদ্রের জলকে শাসন করে বেড়ান তিনি, কিন্তু আজ তিনি এই ছোট্ট ছেলেটির শাসনে নিজেই ধরা দিলেন নিঃশেষে।

চাকর, নার্স, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান সকলের সংগে আলাপ করতো জেনস। সমস্ত বাড়ির মধ্যে জেনস যেন একটা নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য নিয়ে এলো। এমিলির বান্ধবীরা বলতো, তুমি সৌভাগ্যবতী, চমৎকার একটি ছেলে তুমি পেয়েছো এমি!

এমিলিদের বাড়িতে জেনস এসেছিলো অক্টোবর মাসে। পার্কে পার্কে হলদে আর লাল ফুলের তখন ছড়াছড়ি। তারপরে ধীরে ধীরে শীত আসতে লাগলো—ক্রিসমাস আসছে। ক্রিসমাসের স্বপ্ন দেখতে লাগলো জেনস। চোখ বুজলেই সে দেখতে পায় শান্ত আর ধীর পাদবিক্ষেপে চার্চের দিকে সকলে এগিয়ে চলেছে। তারপরে যতো দিন এগিয়ে আসতে লাগলো ততোই তার মধ্যে একটা পরিবর্তন সূচিত হোলো। কোপেনহেগেনের পথে পথে ঝির ঝির করে তুষারপাত হচ্ছে তখন চারদিকে। চুপচাপ জানলার ধারে বসে থাকতো জেনস। মনে হোতো সে যেন ডানাবদ্ধ ছোট্ট একটি পাখীর মতো এইখানে বসে আছে, উদার আর উন্মুক্ত আকাশ তাকে ডাকছে। দরোজায় ঝোলানো ঐ লম্বা সিল্কের পর্দাগুলি, ছোটো ছোটো মিষ্টি খাবার, তার খেলনা, তার নতুন কাপড়-জামা, তার এই মা আর বাবার অপূর্ব স্নেহ সব যেন তার কাছে এ জীবনের চরমতম সম্পদ বলে মনে হয়—সে যে এই পৃথিবীর একজন অতি সাধারণ মানুষ নয়, তা সে বেশ উপলব্ধি করতে পারছে আজকাল, বুঝতে পারছে সে কবি, অনুভূতির এই বিরাট দান বিধাতা তাকে অকৃপণ হাতেই দিয়েছেন।

অনেকদিন এমিলি তার এই মনের কথা জানবার বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু শান্ত আর নীরব এই কবিকিশোর কোনোদিন প্রকাশ করেনি নিজেকে, অবশেষে তাও প্রকাশিত হ'লো। হঠাৎ সে একদিন জিজ্ঞেস করলো এমিলিকে, জানো মা, আমাদের বাড়ির সেই সিঁড়িগুলো কি ভয়ানক অন্ধকার, আর তার চারদিকে এতো গর্ত যে কারুর হাত না ধরে চলাই যায় না সেখানে, বাতাসের বেগে ভেঙে যাওয়া ছোট্ট একটা জানলাও আছে, তার মধ্যে দিয়ে তুমি যদি সামনের দিকে চাও, তাহ'লে দেখবে ঠিক আমারই মতো সমান উঁচু হ'য়ে বরফ জমেছে চারদিকে।

এমিলি বললে, কিন্তু বাবা, সেটা তো তোমার বাড়ি নয়—এই হচ্ছে তোমার নিজের বাড়ি।

সমস্ত ঘরটীর মধ্যে একবার জেনস চোখ বুলিয়ে নিলে, তারপর বললে, হ্যাঁ, এটা আমার সব থেকে সুন্দর বাড়ি, কিন্তু আমার আরো একটা বাড়ি আছে, সেটা ভয়ানক অন্ধকার, ভীষণ অপরিষ্কার। তুমি জানো মা, তুমি তো একদিন গিয়েছিলে সেখানে!

এমিলি বললে, কিন্তু বাবা, তুমি তো আর সেখানে ফিরে যাচ্ছো না।

গভীর গূঢ় আর গম্ভীর দৃষ্টিতে একবার এমিলির দিকে চাইলো জেনস। তারপরে সেইভাবেই শুধু বললে 'না'!

এমিলি চেষ্টা করতো, যাতে জেনস তার অতীত জীবনকে সম্পূর্ণ ভুলে এই বর্তমানকে স্বীকার করে নিতে পারে, কথা উঠলেই সে চাপা দিতে চেষ্টা করতো এই প্রসঙ্গ। কিন্তু যখন এমিলি দেখতো, জানলার ধারে চুপচাপ বসে আছে জেনস, কিংবা খেলতে খেলতে আনমনা হয়ে গেছে, তখনই সে বুঝতে পারতো জেনস ফিরে গেছে তার সেই পুরোণো অতীতে, এমিলি আর দূরে থাকতে পারতো না, আস্তে কাছে এসে বসে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতো, বলতো, কি ভাবছিস তুই?

এমনিই একটি আচ্ছন্ন অবসরের চুল্লির কাছাকাছি সোফাতে দু'জনে ঘন হয়ে বসে একদিন গল্প করতে করতে জেনস বললে, জানো মা? আমার সেই পুরোনো বাড়িতে যাবার রাস্তার মতো আর একটি রাস্তার ধারে খুব পুরোনো একটা বাড়ি ছিলো। সে বাড়িতে একদল লোক থাকতো যাদের অনেক টাকা, আর একদল, যারা নিঃস্ব। যাদের টাকা ছিলো, তারা দামী খাটে, তারা দামী বিছানায় ঘুমোতো, আর যারা গরীব, তাদের একটু শোবারো জায়গা ছিলো না—উপর থেকে টানানো এক একটা দড়ী ধরে তারা দাঁড়িয়ে ঘুমোতো। একরাত্রে হঠাৎ আগুন লাগলো সেই বাড়িতে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো সমস্ত দিক, যারা বিছানায় সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিলো তারা পালাতে পারলো না, কিন্তু যারা নীচে দাঁড় ধরে ঘুমোচ্ছিলো তারা তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে গেলো। এই

কাহিনী নিয়ে চমৎকার একটা গান আছে, তুমি শোনোনি মা সে গান?

পৃথিবীতে এমন অনেকগুলি ছোট ছোট গাছ আছে, যখন রোপণ করা হয়, তখন তাদের কুণ্ডিত শিকড়গুলি কিছুতেই মাটির মধ্যে প্রসারিত হতে পারে না, তারা অনেক পুষ্পে-পত্রে সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু এটাও ঠিক যে তারা ক্ষণস্থায়ী! জেনসএর জীবনও যেন ঠিক এই একই সূত্রে গাঁথা ছিলো, সেও তার এই ক্ষণকালীন জীবনে অনেক আশা এবং আকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখাগুলিকে উর্ধায়িত করে দিয়েছিলো আকাশের দিকে, অনেক ফুল ফুটলো, পত্রসম্ভারে সমস্ত গাছটি মুঞ্জরিত হয়ে উঠলো, কিন্তু হায়, সেই খেয়ালী স্রষ্টা, মাটির গভীরতম প্রদেশে তার জীবনের শিকড়গুলিকে প্রসারিত করতে একেবারেই ভুলে গেলো।

এগিয়ে এলো পত্র ঝরার দিন। এবারে বিবর্ণ সেই পীতপত্রগুলি মাটিতে ঝরে পড়বে।

জেকব অনেক সময় জেনসকে গল্প বলে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতো। কখনো কখনো সে তার সেই মহাচীন ভ্রমণের গল্প বলতো তাকে, অবাক হয়ে বসে শুনতো জেনস: তার সমস্ত শিশুমনকে সেই অপরিচিত দেশের কাহিনী অভিভূত করতো। লম্বিতবেণী চৈনিকের গল্প, ড্রাগন, জেলে আর গভীর সমুদ্রের সব পাখীর কাহিনী, সব থেকে অদ্ভুত লাগতো তার এই নামগুলি ঃ তুংসং, ইয়াং সিকিয়াং!

কিন্তু হায়! কেউ তাকে বুঝলো না, সময় এগিয়ে আসতে লাগলো।

তখনো নববর্ষের উৎসব শেষ হয় নি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি ছোট্ট সম্মেলন থেকে ফিরে এসে জেনস শয্যা গ্রহণ করলো। বিবর্ণ আর পাণ্ডুর একটা ছায়া এসে পড়লো তার মুখে। এমিলিদের অতিবৃদ্ধ আর প্রবীণ গৃহচিকিৎসক এলেন, মাথা নাড়ালেন কয়েকবার, তারপরে ওষুধ দিলেন।

কিন্তু সবই বৃথা, জেনসএর জীবন যেন এই প্রতিজ্ঞাই নিয়ে এসেছিলো, ঝরে পড়তে হবে—ঝরে পড়তেই হবে এবার!

এতোদিন যা হয়নি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাই হোলো জেনসূএর। তার বিরাট কল্পনার অফুরন্ত ভাণ্ডার আজ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। সমুদ্রের বায়ুতে বিতাড়িত ছোট্ট একটি পাল-তোলা নৌকোর মতো ছুটে চললো তার চিন্তা। এখন তাকে ঘিরে যে সব চরিত্র দিনরাতি ঘুরতো, তারা তার নিজের সৃষ্টি, কোনোরকম বাধা না দিয়ে, কোনো রকম তর্ক না তুলে তারা জেনসকে মেনে নিতো, মনের এই অবস্থা তাকে অভিভূত করে রাখতো দিনরাত—একটি স্বপ্ন-দেখা শিশুর রোগশয্যা রাজসিংহাসনে পরিবর্তিত হোলো।

এমিলি নিঃশব্দে চুপচাপ বিছানার কাছে বসে থাকতো, ভারী অসহায় মনে হোতো নিজেকে। খুব ছোট আর ক্ষুদ্র হয়ে যেতো তার সমগ্র সত্তা। এমিলি-যে জীবনে সব সময়ে নিজেকে বহু চেষ্টায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে চেষ্টা করেছিলো অসৎ-জীবন থেকে সৎ-জীবনে, অন্যায় থেকে ন্যায়ে, দুঃখ থেকে সুখে, সুখবিস্মিত চোখে একদিন সে দেখলে, ছোট্ট একটি শিশুর কাছে আজ তার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছে। শারীরিক ক্ষমতায় সে অনেক দুর্বল তার থেকে, কিন্তু এক জায়গায় সে মহান—সে বিরাট, যার সত্তা অন্ধকার এবং আলোকে বেদনা এবং আনন্দকে সমান ভালো-বাসায় নিজের বুকের উপরে বন্ধুর মতো টেনে নিতে পারে, যার কাছে এমিলির যৌবনোদ্ভাসিত শান্ত সমাহিত সত্তাও সংকুচিত হয়ে আসে।

এমিলির শাশুড়ী এবং বৃদ্ধ পিতা প্রতিদিন রোগশয্যার কাছে এসে বসতেন।

তারপর শেষের দিকে সমস্ত ভ্যানডাম পরিবার এসে ছোট্ট সেই বিছানাটিকে ঘিরে দাঁড়াতো, কান্নায় উদ্বেলিত আর উচ্ছ্বসিত তারা। আর জেনস? ছোট্ট একটি পাহাড়ী নদীর মতো ঝির ঝির করে বয়ে চললো সে মহাসমুদ্রের দিকে—এবারে বিরাটতর স্বপ্ন-সাম্রাজ্যের সংগে তার পরিচয় হবে।

মার্চের শেষের দিকে জেনস মারা গেলো। এমিলির বৃদ্ধ পিতা বললেন, জেনসকে আমাদের নিজস্ব সমাধিভূমির মধ্যেই কবর দেওয়া হবে। ও যে আমাদের পরিবারেরই মানুষ—ওতো আর এখন বাইরের নয়।

সমুদ্রতটবিলগ্ন অমার্জিত পেলজেন্ট জাতির ধীবর পল্লীজাত যে কোন মানুষের পক্ষে এ সম্মান অভাবনীয়।

ব্রেডগ্রেডের এমিলিদের সেই বিরাট বাড়িতে শোকের একটা বিষণ্ণ ছায়া নামলো। প্রথম সপ্তাহের দিনগুলি যেন আর কাটতে চায় না—জেকবের মুখের দিকে চেয়ে মনে হোত, যেন তার পরম একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে—বৃদ্ধ পিতা সেই জাহাজ ব্যবসায়ী যেন পাথরে পরিণত হয়েছেন—আর এমিলি? —তার কথা অবর্ণনীয়।

দিন কাটতে লাগলো, জেকব এক সময়ে ঠিক করলো, এমিলিকে নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে একদিন। যদি মনটা একটু ভালো হয় তার। প্রায় এক মাস পরে কোপেনহেগেন থেকে এলসিনোরের দিকে একদিন মোটরে করে তারা রওনা হোল। মে মাসের ঈষৎ উষ্ণ পরিচ্ছন্ন একটি সকাল। খানিকটা আসতেই একটা বন পড়লো পথে। মোটর থামিয়ে সেই সবুজ আর ঘন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলো তারা।

চুপচাপ অনেক পথ হেঁটে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপর এসে বসলো এমিলি, তার-পরে বললে, জেকব, আজ তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই, বলো তুমি বিশ্বাস করবে?

অবাক হয়ে একবার জেকব তাকালো তার চোখের দিকে, বললে, বলো?

—না, এমিলি বললে, তুমি আমাকে কথা দাও বিশ্বাস করবে?

—কি মুশকিল, বলছি তো, তুমি বলো, সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করবো।

—সত্যি বলছো?

—হ্যাঁ।

—ঠিক?

—হ্যাঁ, ঠিক, তুমি বলো এমি, আমি বিশ্বাস করবো।

এবার জেকবের মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলো এমিলি, বললে জানো, জেনস আমার নিজেরই সন্তান।

বিস্মিত দৃষ্টিতে জেকব আবার তাকালো তার মুখের দিকে, এমিলি তখনো বলছে ঃ আমার সংগে চার্লি ড্রায়ার বলে এক ভদ্রলোকের আলাপ ছিলো, তুমি জানো না বোধ হয়, তুমি যখন চীন দেশে ছিলে, তখন তাঁর সংগে আমার গভীর ঘনিষ্ঠতা হয়।

অনেক দিন আগের তার বিয়ের সময়ে পাওয়া বেনামা একখানা চিঠির কথা আজ বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো মনে পড়লো জেকবের- তবু সে বললে, এমি—এমি, তুমি জানো না, তুমি কি বলছো!

প্রশান্ত হাসিতে সমস্ত মুখ ভরে উঠলো এমিলির। বললে, আমি সব সত্যি কথা বলছি জেকব, বলো তুমি একথা বিশ্বাস করেছো?

গম্ভীর হয়ে আস্তে মুখ নামিয়ে নিলে জেকব। কোন উত্তর দিলে না।

—বলো, বলো, তুমি বিশ্বাস করেছো।

জেকব তবু চুপ করে রইলো।

—বলো, বলো জেকব, অস্থির হয়ে উঠলো এমিলি, জেকবের দুই হাত শক্ত করে ধরে যেন সে আর্তনাদ করে উঠলো, বলো, বলো তুমি বিশ্বাস করেছো একথা—সমস্ত শরীর তার থরথর করে কাঁপছে তখন।

শান্ত আর নিস্তব্ধ বনভূমি। দূর থেকে খালি কয়েকটা পাখীর ডাক ভেসে আসছে। দুই হাতে আস্তে এমিলিকে আরো নিবিড় করে কাছে টেনে নিলে জেকব—তারপরে শান্ত আর ধীর গলায় বললে, তুমি ভেব না এমি, আমি সত্যিই বিশ্বাস করেছি।

আঃ—পরম একটি শান্তিতে, একটি নিটোল নিশ্চিন্ততার মধ্যে ফিরে গেল এমিলি—অস্পষ্ট স্বরে শুধু একবার বললে, জেনস—তারপর আস্তে স্বামীর বুকের উপরে সে তার ক্লান্ত মুখটিকে রেখে চোখ বুজলে।

অনুবাদক—শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আমাদিগের কোন পাঠক বাঙলার মন্ত্রীদিগের উক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উক্তির পরস্পর বিরোধিতার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—ইহার কারণ কি? তিনি বাঙলার খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছেন। তাহার কারণ—অক্টোবর মাসের প্রথমভাগে কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর এক হিসাব দিয়া দেখাইয়াছিলেন, বাঙলায় লোকের প্রয়োজন চাউলের অভাব না হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল উৎপন্ন হইবে, নবেম্বর মাসের প্রথমভাগে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী আর এক হিসাব দিয়া বলিয়াছেন, বিপুল ব্যয়সাধ্য সরবরাহ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ উপবিভাগ বজায় রাখিতেই হইবে; কারণ, বাঙলায় চাউলের বিশেষ অভাব!

হেমবাবুর মতে পশ্চিমবঙ্গে জমির পরিমাণ ২৮ হাজার বর্গমাইল; তন্মধ্যে ২০ হাজার বর্গমাইল ফসলের এলাকা—ইহার কতক জমিতে একাধিক ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। ২০ হাজার বর্গমাইলে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ বিঘা হয়। অনুকূল অবস্থায় এক বিঘা জমিতে ৬ মণ ধান বা ৪ মণ চাউল হয়। সে হিসাবে বাঙলায় ১৫ কোটি ৩৬ লক্ষ মণ চাউল বৎসরে উৎপন্ন হইবে। হেমবাবু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার হিসাব লইয়া তাহাতে শতকরা ৭ জন যোগ করিয়া—লোকের প্রাত্যহিক চাউলের প্রয়োজন আধ সের ধরিয়া যে হিসাব করিয়াছেন, তাহাতে—"ঝরতি পড়তি" এবং "হাজা, শুখা, চৌকী, ফেরারী" বাদ দিলেও অভাবের ছায়াপাত বাঙলায় হয় না। সে অবস্থায় কৃষির সামান্য উন্নতি সাধিত হইলে বাঙলা "ঘাটতি" প্রদেশ না হইয়া "বাড়তি" প্রদেশ হয়।

একমাস পরে চারুবাবু বলিয়াছেন—বাঙলার চাষের এলাকা ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ বিঘা নহে, পরন্তু ২ কোটি ৬৪ লক্ষ বিঘা মাত্র। কেবল তাহাই নহে, তিনি একরে ১২ মণের অর্থাৎ বিঘায় ৪ মণ ধান না করিয়া ১০ মণ ধরিয়াছেন। লোকসংখ্যায় তিনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার হিসাবে শতকরা ২ জন বৃদ্ধি ধরিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন, বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটি ২১ লক্ষ ৯২ হাজার ৫ শত মণ!

ভাণ্ডারী মহাশয়ের ভাণ্ডার যে চিরদিন অপূর্ণই থাকিবে—তাঁহার হিসাবে তাহাই বুঝান হইয়াছে এবং তাহা যে গান্ধীজীর খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবের প্রতিবাদে special pleading এমন মনে করিবার কারণ নাই।

এদিকে দেশের লোক একই সরকারের ২ জন মন্ত্রীর হিসাবে পরস্পর বিরোধিতা দেখিয়া "বাঁশবনে ডোম কাণা" হইয়াছে। উভয় পক্ষেই হিসাবে অঙ্কের সমাবেশ ভয়াবহ। উভয় পক্ষই যে সরকারী দপ্তর হইতে হিসাব পাইয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু যে হিসাব "বেবনিয়াদ" তাহার উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যবস্থা করা হয়, তাহা চোরাবালুর উপর নির্মিত গৃহের দশাই প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রীরা যাহা ইচ্ছা বলেন; কিন্তু তাহার ফল দেশের লোককেই ভোগ করিতে হয়। দুই হিসাবের মধ্যে একটি ভ্রান্ত—নহে ত দুইটিই ভ্রান্ত।

বাঙলা সরকারের এক এক বিভাগে কি এক একরূপ হিসাব প্রস্তুত হয়? বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী; বোধ হয়, কৃষি-বিভাগের মন্ত্রীর হিসাব দেখিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার বিভাগের মন্ত্রীকেও জানাইয়াছিলেন। তবে কেন লোকের পক্ষে বিভ্রান্তকর দুই প্রকার হিসাব প্রকাশ করা হইল?

আমাদিগের মনে হয়, বাঙলা সরকারের দপ্তরের কাজ পূর্ববৎই চলিতেছে এবং তাহাতে জনগণের নিকট কৈফিয়তের দায়ী নহেন এমন সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়াদিগের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যখন ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্ভিসে ইংরেজ চাকরীয়াদিগকে "আক্কেল সেলামী" হিসাবে টাকা দিয়া বিদায় করা সম্ভব হইয়াছে, তখন সেই সার্ভিসের শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষায় দীক্ষিত ভারতীয়দিগকে কেন এরূপ ব্যবস্থায় বর্জন করা হয় নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। তাহার প্রয়োজনও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যখন প্রথম ভারতীয় যুবকগণ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া ইংরেজ চাকরীয়াদিগের বড় চাকরীর খাস মহলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন ভাল ছেলেরাই সে কাজ করিতেন। ভাল ছেলে বলিলে আমরা কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলের মাপকাঠিতে ভালমন্দ মাপিবার কথা বলিতেছি না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম আমলের সিভিলিয়ান। ইঁহারা চাকরীতে উন্নতি লাভের জন্য দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে অনবহিত হইতেন না; অর্থাৎ পদোন্নতি ও অর্থই পরমার্থ মনে করিতেন না। আমরা জানি, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত যখন সিভিল সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা দিতে বিলাতে যাইতেছিলেন, তখন জাহাজে তাঁহার সহযাত্রী একজন ইংরেজ তাঁহার সিভিল সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা দিতে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "অন্তত একজন ইংরেজ চাকরীয়া নিয়োগের দুর্ভাগ্য হইতে আমার দেশকে অব্যাহতি দিবার জন্য।" তিনি যখন কোন জিলায় জজ তখন তাঁহার গৃহও পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছিল। তাঁহার "অপরাধ"—তিনি দেশসেবকদিগকে সাহায্য করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আমাদিগের ভাল ছেলেরা—যাহারা দেশের গৌরব তাহারা আর ইংরেজের চাকরী পাইতে আগ্রহ লাভ করে নাই; ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পর হইতে সেই শ্রেণীর তরুণরা সরকারী চাকরী বর্জন করিতেই চেষ্টা করিয়াছে। কাজেই বর্তমানে যে সকল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া তাঁহাদিগের অধিকাংশই দেশাত্মবোধের দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে তাঁহার বদ্ধমূল ভাব বর্জন করাইয়া নূতন অবস্থার উপযোগী করা সুসাধ্য হইতে পারে না। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"গাধারে পিটিলে, কভু হয় কি সে ঘোড়া?
লুই কি ধুইলে হয় 'গঙ্গাজলী' জোড়া?"

আর যে সকল তরুণ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিত, তাহাদিগের সম্বন্ধে সরকার কি করিয়াছিলেন? ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় নৃপেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছিলেন:—

"Many bright and brilliant young men I know.... who have come to me from time to time in connection with various matters.... young men in whom I placed great trust and great confidence, who I fondly hoped would at same time or other add to the honour, the prestige and dignity of my province.... I find them arrested and interned for causes which I cannot know, which nobody knows, which are never given out."

বাস্তবিক যাহারা দেশের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করিত তাহারা বিদেশী সরকারের ব্যবস্থায় লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। তবে অবশিষ্ট যাহারা তখনও সেই অত্যাচারী সরকারের চাকরী করিয়া দিন গুজরান করা মোটা লাভ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে, তাহারা কাহারা? তাহাদিগের নিকট দেশের লোক কিরূপ ব্যবহার লাভের আশা করিতে পারে? তাহারা দেশের হিত করিতে পারিবে? না—অহিত সাধনে অধিক ব্যুৎপন্ন?

অথচ তাহারাই সকল বিভাগ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; দেশের অর্থ শোষণ করিতেছে। তাহারা যে কোন বিদেশী সরকারের সহিত চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য বেতন পাইতেছে—একজনও বলে নাই, সে বেতন অত্যধিক বলিয়া সে লইবে না—তাহাই নহে; মন্ত্রিমণ্ডল তাহাদিগকে বিদেশী সরকার নির্দিষ্ট পদের

অতিরিক্ত বেতনও দিয়া দেশের লোকের অর্থব্যয় করিতেছেন! দেশের লোক আজ জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই সকল লোককে ইংরেজ চাকরীয়াদিগের মত বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিলে কি ক্ষতি হইত? জাতীয় সরকারে কি জাতীয়ভাবাপন্ন চাকরীয়াই প্রয়োজন নহে? এই সকল চাকরীয়ার পূর্বেতিহাস কি মন্ত্রি-মণ্ডল পরীক্ষা করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে এখনই তাহা করা কর্তব্য।

সরকারের দুই বিভাগে যে দ্বিবিধ হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া সেক্রেটারীরাই দেন নাই?

কেবল সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়াদিগের পূর্বেতিহাসই পরীক্ষার বিষয় নহে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে যে চাকরীয়া (তখন সাব-ডেপুটি?) "রিলিফ অর্গ্যানাইজেশান অফিসার এবং রাজস্ব ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী সেক্রেটারী" হইয়া—সুরাবর্দীর বামহস্তরূপে (দক্ষিণহস্ত একজন মুসলমান পুলিশ কর্মচারী) ২০শে আগস্ট ১০৭৩২ (২৭) নম্বর বিবৃতি রচনা ও প্রচার করিয়া লোককে যে খাদ্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে মানুষের দেহে প্রাণ থাকে না—তিনিও খোস মেজাজে বিদ্যমান। কেন? তিনিই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এক সের খাদ্যশস্য জলে ফুটাইয়া ৮ জনের জন্য ৪ সের খাদ্য করিতে হইবে। এ যেন হীরার হিসাবঃ—

"আট পণে আট সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥"

যে মন্ত্রীরা পূর্বে কখন শাসনকার্যে নিযুক্ত না থাকিলেও মন্ত্রী হইয়া সে কাজ করিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতেছেন, সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়াদিগকে বিদায় দিলে শাসনের কল অচল হইবে না; বরং তাঁহারা থাকিলেই তাহা হইতে পারে। আবার ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়াদিগের বেতন যত অধিক তত আর কোন দেশে—বিশেষ স্বায়ত্তশাসনশীল দেশে—নহে। তাহার কারণ, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস জাতীয় চাকরী ছিল না—বিদেশী শাসকদিগের চাকরী ছিল। জাতীয় সরকারে তাহার স্থান থাকিতে পারে না। পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী সার্ভিস গঠিত করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষ দ্রষ্টব্য। বর্তমান শাসনযন্ত্র অবস্থার উপযোগী কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া রৌল্যান্ডস কমিটি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা এই-রূপ—

"It is a habit of governmental organisations to be resistant to evolutionary changes and to lag behind progress in political ideas and administrative techniques."

কাজেই পুরাতন সরকারের শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মচারীরা বিবর্তনানুগ পরিবর্তনের বিরোধিতা করিতেই অভ্যস্ত। বৃটিশ আমলা-তন্ত্রের সময় হইতে তাঁহারা—আয়ার্লণ্ডে আইরিশ পুলিশের মত—দেশাত্মবোধদ্যোতক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দলিত করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন এবং তাহার পরে মুসলিম লীগের শাসনকালে সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রসারণে সাহায্য করিতে বিরত থাকিতে পারেন নাই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়াজ মহম্মদ খাঁনের অধীনে কাহারা ছিলেন?

সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয়, জাতীয় সরকারের কার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে চাকরী ঢালিয়া সাজিতে হইবে।

মার্কিনেও যখন খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বর্জন করা সম্ভব হইয়াছে, তখন বাঙলায় তাহা **অসম্ভব হইবে কেন**? বাঙলায় এবার ফসল ভালই হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব প্রথানুসারে এখন হইতেই অন্নাভাবের আতঙ্ক দেখান হইতেছে। বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ব্যয় বাজেটে কি ৪ হইতে ৬ কোটি টাকা হয় না? সে বিভাগের **উচ্ছেদ সাধনে** যাহারা বেকার হইবে, তাহা-দিগকেই যদি পরিকল্পনা রচনা করিতে দেওয়া **হয়, তবে কি "রক্ষকই ভক্ষক"** হইবার সম্ভাবনা থাকে না?

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি প্রস্তাবিত ব্যবস্থার কথা বলিব। কলিকাতা অঞ্চলে **লরীতে কয়লা সরবরাহের** জন্য ঠিকা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। প্রকাশ, রেলে আবশ্যক-সংখ্যক গাড়ী পাওয়া যাইতেছে না। যদি তাহাই হয়, তবে সেজন্য কে বা কাহারা দায়ী? যিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কর্তা তিনি পাকি-স্থানে গমন করেন নাই—হিন্দুস্থানেই আছেন। মুসলমান ইঞ্জিনচালক ও কয়লা দিবার লোকেরা পাকিস্থানে যাইবে স্থির হইলেই তিনি যদি সেজন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, অর্থাৎ আজ যেমন অবসরপ্রাপ্ত কিন্তু কার্য-ক্ষম চাকুরিয়াদিগকে আবার ডাকা হইতেছে তাহা করিতেন, তবে লোকাভাব ঘটিত না। যখন কয়লা ব্যবসায়ীরা আপনারা লরীর ব্যবস্থা করিয়া কয়লা আনিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অথচ এখন পশ্চিম বঙ্গের কোল কণ্ট্রোলার ক্যাপ্টেন এম এন ঘোষ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন—রাণীগঞ্জ হইতে শ্রীরামপুর, বারাকপুর, হাওড়া, বেলিয়াঘাটা ও মেটিয়াবুরুজে স্তূপে কয়লা সরবরাহের জন্য—রাজপথে (অর্থাৎ রেলে নহে) কয়লা সরবরাহের জন্য এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইবে। এজেণ্টকে আপনার যান যোগাইতে হইবে।

ইহাতে যে রেল বনাম রাজপথের সমস্যা সমুপস্থিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই ক্যাপ্টেন কে এবং এই বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা কোথায় অর্জিত ও কত দিনের? শুনিয়াছি, ইনি কলিকাতার কোন মোটর মেরামত প্রভৃতির কারখানায় মিস্ত্রী ছিলেন এবং তথা হইতে যুদ্ধে গমন করেন। ইনিই একাধারে ৩ কাজ করিবেন—

(১) ইনিই খনি হইতে রাজপথে কয়লা আমদানী করার ছাড় দিবেন;

(২) ইনিই যানের জন্য পেট্রলের ছাড় দিবেন;

(৩) ইনিই মূল্য নির্ধারণ করিবেন।

যে সময় পেট্রলের অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে, সেই সময় ইনি অবাধে পেট্রলের জন্য ছাড় দিতে পারিবেন। আর ইনিই কয়লার মূল্য নির্ধারণ করিবেন। সে বিষয়ে ইঁহার অভিজ্ঞতা কিরূপ? যে সকল ঠিকাদারের খনি ও লরী আছে, তাঁহাদিগেরই সুবিধা হইবে এবং তাঁহারাই কেহ কেহ এই ব্যবস্থার জন্য ব্যবসায়ীদিগের সমর্থনলাভের চেষ্টা করিতেছেন। যদি প্রতি লরীতে প্রতিবার ৩০ গ্যালন পেট্রল দেওয়া হয় এবং প্রতি লরীতে ৫ টন কয়লা আনিবার কথা থাকে, তবে ৫ টনের স্থানে ৭ টন আনিয়া ২ টন চোরাবাজারে বিক্রয়ের প্রলোভন কি প্রবল হইবে না? শ্রীরামপুরে স্তূপ হইবে। কিন্তু তথায় কি এখনই ৩ হইতে ৪ হাজার টন ষ্টীম কয়লা ক্রেতার অভাবে পড়িয়া নাই? আর যে বালীতে ইট পোড়াইবার জন্য কয়লার প্রয়োজন তথায় ব্যবসায়ীদিগকে আবার শ্রীরামপুর হইতে আপনারা লরীতে কয়লা লইয়া যাইতে বাধ্য হইবে। নানা শ্রেণীর কয়লা আনা হইবে—তাহাতে কি "মুড়ী মিছরির এক দর" করিবার সুযোগে অসাধুতার সুযোগই অসৎ ব্যবসায়ীরা পাইবে না?

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর অনু-মোদন ব্যতীত নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন ঘোষ এই অভিনব ও আপত্তিকর ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কিন্তু কয়লা ব্যবসায়ী ও কারখানার অধিকারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহা হইয়াছে কি? আর ইহাতে কত দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে, তাহা বিবেচিত হইয়াছে কি? একই স্থানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার ফল কি বিবেচনা করা হইয়াছে?

বাঙলায় খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা শোচনীয়। কারণ, তাহাতে

(১) চোরাবাজারের উচ্ছেদ সাধিত না হইয়া সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে;

(১) খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি উল্লেখ-যোগ্যও হয় নাই।

যখন চোরাবাজারে অধিক মূল্যে দিলেই চাউল, চিনি, ময়দা, কাপড় সবই পাওয়া যায়, তখন এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, জিনিসের অভাব নাই—অভাব কৃত্রিম। আর তাহার সহিতও যে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবহেলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, তাহাও বলা যায় না; কারণ, দ্রব্য সুলভ হইলেই চোরাবাজারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সরিষার তৈলের নিয়ন্ত্রণ বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে—যেন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে

বাজারে তাহার আমদানী দেখিয়াও কি সে ষয়ে সরকারের শিক্ষা হইবে না? মন্ত্রী ণ্ডারী মহাশয় যে নানা স্থানে সঞ্চিত ধান ও উল উদ্ধার করিতে পারিতেছেন তাহাতেই **তিপন্ন হয় ধান্যের ও চাউলের** অভাব নাই; াক অতিরিক্ত লাভের লোভে বা যদি অভাব য় সেই ভয়ে তাহা বাজারে দিতেছে না। কিন্তু ন ও চাউল দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় না। ুতরাং ব্যবসার স্বাভাবিক নিয়মে তাহা বাহির রা যায় এবং তাহাতে যেমন জিনিসের দাম মে, তেমনই বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ পাষণের ব্যয় হইতে লোক অব্যাহতি পায়।

গান্ধীজী সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, নিয়ন্ত্রণ র্জন না করিয়া সরকার লোকমতের বিরুদ্ধা-রণই করিতেছেন এবং যাঁহারা নিয়ন্ত্রণের মর্থক তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হেন। কংগ্রেসের পরিচালক সংঘ গান্ধীজীর তের বিরোধিতা করিতে সাহস করেন নাই; **কিন্তু নিয়ন্ত্রণ** ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াও বলিয়া-ছেন, তাহা বর্জন করা বা না করা মন্ত্রীর ইচ্ছানুসারেই হইবে। আর মন্ত্রীরা যখন তাহার সমর্থক তখন নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা ও অত্যাচার লোককে ভোগ করিতেই হইবে। এক্ষেত্রে গান্ধীজীর বিবেচনা মন্ত্রীরা অনায়াসে পদদলিত করিয়াছেন। অথচ তাঁহারাই সকল বিষয়ে গান্ধীজীর দোহাই দিয়া থাকেন।

নিয়ন্ত্রণের ফলে লোকের দারিদ্র্য বর্ধিত হইতেছে এবং অপূর্ণাহারে বা কদর্য দ্রব্য আহারে লোকের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে—তাহারা বাঁচিয়া থাকিলেও জীবন্মৃত অবস্থায় আছে। **সমগ্র জাতির** দৈহিক দৌর্বল্য বৃদ্ধিতে জাতির ভয়াবহ ক্ষতি হইতেছে। আজও যে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের যান ও শ্রমিক সরবরাহকারী-দিগকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হইতেছে না, তাহা কি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সম্ভ্রম হানিকর নহে?

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর উৎপন্ন ধান্যের হিসাবের সহিত কৃষিমন্ত্রীর হিসাবের অসামঞ্জস্য যে অনেকেরই হাস্যোদ্দীপন করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আচার্য কৃপালনী তাঁহার কংগ্রেসের সভা-পতিপদ ত্যাগকালীন বিবৃতিতে বলিয়াছেন—

"আমরা (অর্থাৎ ভারত সরকার ও কংগ্রেস) পাকিস্থানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমাদিগের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে **পারি না।** তাহারা আমাদিগের মত আমাদিগের জাতির অংশ। তাহারা আমাদিগের সহিত একযোগে স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্যাগস্বীকার **করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে।** তাহারা আমাদিগেরই মত কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিল। আমরাই ৩রা জুনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া যে দলের আদর্শে তাহাদিগের আস্থা নাই সেই দলের কৃপার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য করিয়াছি। তথাপি কংগ্রেসের আদর্শানু-**সারে—বিভাগেই ভারতের হিত** সাধিত হইবে মনে করিয়া কংগ্রেসের নির্ধারণ গ্রহণ করিয়াছে। আমরা যে বলিয়াছিলাম, পাকিস্থানে তাহা-দিগের অধিকার রক্ষিত হইবে, সে কথায় তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল। তবে আজ আমরা **কিরূপে তাহাদিগকে** পাকিস্থানে লাঞ্ছিত হইতে দিতে পারি? তাহারা যখন বিপদ হইতে পলাইয়া ভারতে আসিতেছে তখন আমরা কিরূপে তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে অসম্মত বা কুণ্ঠিত হইতে পারি?"

পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, আচার্য কৃপালনী যেন বাঙলার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া এই উক্তি করিয়াছেন। কারণ, পাঞ্জাবে অধিবাসী-বিনিময় হইয়াছে ও হইতেছে; **অবজ্ঞাত বাঙলায়** তাহা হইতেছে না। প্রতিদিন **দলে দলে নরনারী** পূর্ববঙ্গ হইতে পলাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের সরকার তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ দায়িত্ব স্বীকার করিতেছেন না। পূর্ববঙ্গে সরকারী কর্মচারীরা যে প্রকাশ্যভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য পরিচালিত করিতেছেন, তাহা জানা গিয়াছে। গত ৯ই নবেম্বর ঢাকা হইতে সংবাদ **আসিয়াছে, কালিয়াকৈর** থানা এলাকায় সাভেজ-পুর গ্রাম হইতে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সাহা জানাইয়া-ছেন—গত ৯ই কার্তিক তিনি তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহীর শব লইয়া দাহ করিবার জন্য দুই শত কালেরও অধিক দিন হইতে শ্মশানরূপে ব্যবহৃত নদীতীরবর্তী স্থানে যাইলে পার্শ্বস্থ **গ্রামের কতকগুলি** মুসলমান আসিয়া শবদাহে বাধা দিয়া বলে, তাহারা ঐ স্থনের নিকটে গৃহ নির্মাণ করিবে, সুতরাং হিন্দুরা আর তথায় শবদাহ করিতে পারিবেন না। বহু বাদানু-বাদের পরে ৮ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইলে ঐ স্থানে শবসৎকার করিতে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু মুসলমানগণ বলে—ঐ স্থান আর হিন্দুদিগকে শ্মশানরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না।

এ সব পাকিস্থানের কথা। পাকিস্থানে মুসলমান ভাগচাষীরা প্রচলিত প্রথানুসারে হিন্দু ভূমির অধিকারীর প্রাপ্য ধান তাঁহাদিগের গৃহে পেঁছাইয়া দিতে এমন কি মুসলমানের জমীর উপর দিয়া লইয়া যাইতে দিতেও **অস্বীকার** করিতেছে। ফলে ভূম্যধিকারীর ধান ক্ষেত্র হইতেই লুণ্ঠিত হইবে।

হিন্দুস্থানে অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে কি হইতেছে? মালদহের সংবাদ—

"গত ১৩ই নবেম্বর মালদহ সহরের ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ঝিল্‌কী নামক স্থানে পুলিশ এক জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে। **প্রকাশ, একদল লোক** কালীপ্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় বাধা দেয় এবং শোভাযাত্রাকারী-দিগের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে **একজন** কনস্টেবল ও আর ৬ জন লোক আহত **হয়।** পুলিশ হাঙ্গামাকারীদিগের উপর গুলী চালাইতে বাধ্য হয়।"

পশ্চিম বঙ্গের সরকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের নীতিসংগত। পশ্চিম বঙ্গের **প্রধান মন্ত্রী** মুসলমানদিগকে প্রচলিত প্রথানু-বর্তী হইয়া আবৃত স্থানে ঈদের সময় গো-কোর্বানীর স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, তাহারা কি দণ্ডিত হইয়াছে? বারাকপুরের নিকটে বড়কাটিলে গ্রামে এবার প্রথম গো-কোর্বানী করা হইয়াছে। বারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রঞ্জিত ঘোষ কি সে বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করিয়াছেন?

আমরা ঈদের দিন গড়িয়াহাট ও বোড়াল গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে রাজপথের উপর গো-কোরবানীর অভিযোগ পাইয়াছিলাম—তাহা প্রকাশও করিয়াছি। আমরা অবগত হইয়াছি, সে ঘটনা পুলিশের গোচর করা হইয়াছিল। তাহার কি হইয়াছে?

নবদ্বীপ জিলার যে হাঙ্গামায় পুলিশ গুলী চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই ঘটনায় যাহারা হাঙ্গামাকারী ছিল, তাহাদিগের কোনরূপে দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, তবে কি তাহা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে?

আমরা শুনিয়াছি, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েও পাকিস্থানীদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখান হইতেছে। এখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর ১৬ জন পাকিস্থানী রহিয়াছেন; অথচ ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ১৬ জন হিন্দুস্থানের অধিবাসী লইবার কোন কথা নাই। একথা কি সত্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে চ্যানসেলারকে জানান হইয়াছে; কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই?

পূর্ব পাঞ্জাব সীমান্তে প্রত্যেক চতুর্থ মাইলে রক্ষিদল রক্ষা করিয়া আক্রমণ-সম্ভাবনা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার—ভারত সরকারের অনুমোদন লইয়া সেরূপ কোন কাজ না করায় পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সীমান্তে বনগ্রামের দিকে যে মুসলমানদিগের আগমন হইতেছে, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের সরকার সে বিষয়ে কি করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

যাহারা পাকিস্থান সমর্থনকারী সেই মুসলীম লীগের মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড কি অধিকারে পশ্চিমবঙ্গে থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমরা জানি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বিদেশ হইতে ফিরিয়া বাঙলায় আইনানুগ-ভাবে—সরকারের নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংসেবক দল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারেন নাই।

তিনি নাকি এই দল গঠনেরই মত আর একটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, বাঙলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য একটি বিভাগ (ডেভেলপ-মেণ্ট) প্রতিষ্ঠিত করা হউক। বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি পরস্পর সাপেক্ষ—কৃষি, সেচ, শিল্প, বৈদ্যুতিক শক্তি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি একের সহিত আর একটি কেবল সংলগ্নই নহে—এককে বর্জন করিয়া অপরের উন্নতি সাধন কষ্টকর—অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। বিধান বাবুর প্রস্তাব, তিনি বিনা বেতনে এই বিভাগের ভার লইতে প্রস্তুত। তিনি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এই বিভাগের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন। যাঁহারা বিধানবাবুর কর্মক্ষমতার পরিচয় অবগত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন, তিনি দেশের লোকের কল্যাণ কামনায় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, অবিলম্বে তাহা গ্রহণ করাই সরকারের কর্তব্য। আমরা আশা করি, সরকার তাহা করিবেন এবং বাঙলার বহু বিশেষজ্ঞ এই কার্যে বিধান বাবুর সহযোগী হইয়া যত শীঘ্র সম্ভব বাঙলাকে সুস্থ, স্বাবলম্বী, সুন্দর ও প্রফুল্ল প্রদেশে পরিণত করিতে পারিবেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যখন কংগ্রেসের মনো-নয়নে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন তিনি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন না। তিনি পূর্ব (অর্থাৎ পাকিস্থান) বঙ্গের লোক। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সদস্য নির্বাচিত না হইলে তাঁহার ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য না হওয়ায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইত। বিলাতে পার্লা-মেণ্টে এইরূপ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে—বীরভূম নির্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি পদত্যাগ করেন এবং ডক্টর ঘোষ তাঁহার স্থানে নির্বাচন প্রার্থী হন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হয় নাই। শ্রীশিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভোট গণনার ফলে দেখা গিয়াছে মোট ৩৩ হাজার ৪ শত ২২টি ভোটের মধ্যে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর ঘোষ ২২ হাজার ৪ শত ৮০টি ভোট পাইয়াছেন। বীরভূমের ভোটদাতৃগণের মধ্যে ২২ হাজার ৪ শত ৮০ জন ডক্টর ঘোষকে এবং ১০ হাজার ৯ শত ৪২ জন শিবকিঙ্কর বাবুকে ভোট দিয়াছেন।

গত সপ্তাহে গোবরডাঙ্গায় ২৪ পরগণা জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ ১৮ বৎসর পরে অনুষ্ঠিত এই সম্মিলন স্বায়ত্ত শাসনশীল ভারতের অংশ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন।

আবদুল হাফিজ

ক্ষণিকের ভালো লাগা ফোটা পুষ্প সম
ভালো লেগেছিল মোরে, এই তব প্রেম প্রিয়তম
তাই ত সোহাগ ভরে হায়
বাহুর বন্ধন মম কাড়ি নিলে মরাল গ্রীবায়
আবেশে মুদিয়া আঁখি সুনিবিড় সুখে
আমার পরশ মাগি' লুকাইলে ভীরু কম্প্র বুকে।
সুমধুর মৃদু গুঞ্জরণে
কহিলে 'ফুটিয়া থাক' চিরন্তন মম কুঞ্জবনে।

তবু ভুলে গেলে
আমার মনের বনে শতদল ছিল বক্ষ মেলে
তোমার প্রতীক্ষা করি; আজি সেই রিক্ত ফুলদলে
অনাদরে দলে গেলে অলক্তক রাঙা পদতলে।
শব্দহীন স্তব্ধ সুরে নিষ্পেষিত ঝরা ফুলগুলি
জানিলে না কি অব্যক্ত বেদনায় উঠিল আকুলি।

তোমার জীবনে বন্ধু ফুরায়েছে মোর প্রয়োজন,
তোমার পুষ্পিত দেহ মন
কাতর চঞ্চল চোখে চায় নিরিবিলি
অভিসার ভীরু বুকে খুলি ঝিলিমিলি
অনাগত পথিকের আশে
লজ্জা সুখ ত্রাসে।

তোমারে বন্দনা করি দূর হতে তন্বী সুন্দরিকা
দখিনা ফোটায় শুধু অচেতন ফুলের কলিকা;
পাতিবে আসন তব বক্ষে আসি লুব্ধ মধুকর
তব প্রিয়বর।
তুমি মোর স্বপনের মাঝে
রহিবে স্বপন হয়ে দুঃখে সুখে নিত্য সব কাজে,
জানিবে না কেহ
তোমার ব্যথার দান হবে মোর পথের পাথেয়।

মাতৃতীর্থ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

পাশের গ্রামে বিবাহের বরযাত্র গিয়াছিলাম। ললিতের বিবাহ—আসিয়া ধরিল না গেলেই হইবে না। একসঙ্গে স্কুলে পড়ি—না বলিতে পারিলাম না। সতীর্থ শঙ্কর ও সরোজ সহজেই রাজি হইল। আমাদের কাহারও বিবাহ হয় নাই—ললিতই এই পথে প্রথম পদার্পণ করিতেছে। সুতরাং কৌতূহল ছিল অপরিসীম।

সাণ্ডাডাঙা গ্রাম। গ্রামে একঘর মাত্র ব্রাহ্মণের বাস—নাম যদু চাটুজ্যে। তাঁহারই একমাত্র কন্যার সঙ্গে ললিতের বিবাহ হইতেছে। চাটুজ্যে মশায় বেশ জনপ্রিয় লোক বলিয়া মনে হইল। তাঁহার মেয়ের বিবাহে যোগদান দিতে সমস্ত গ্রামের লোক যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কেহ ময়দা মাখিতেছে, একজন একটা বড় মাছ আনিয়া উঠানে ধপাস্ করিয়া ফেলিল—কেহ ফাই-ফরমাস খাটিতেছে।

রাত্রি দশটা নাগাদ লগ্ন ছিল। আমরা ললিতকে ঘিরিয়া সভাস্থ হইয়া বসিয়াছিলাম। চুপি চুপি তার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলাম, যখন 'হাতে দিলাম মাকু, একবার ভ্যা করত বাপু' বল্বে তখন যেন ভ্যা বলিস্ নি!

ললিত হাসিয়া বলিল, পাগল হয়েছিস্ তুই?

কন্যা সম্প্রদানের সময় আমরা মেয়ের মুখ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। শুভদৃষ্টির সময় আমরাও ললিতের সঙ্গে বধূর মুখ দেখিয়া লইলাম। আট নয় বছরের ছোট্ট মেয়ে—ললাটে চন্দনের আলিম্পন—ঘুমে চোখ ঢুলিয়া আসিতেছে।

বাসরঘরের আশেপাশে, তারপর ঘরের মধ্যে যাইতেও আমাদের আটকাইল না। উৎসবের হুল্লোড় শেষ হইবার পর যখন বাসরঘরের আলো নিবিল তখনও আমরা তিনজন ললিতের ঘরের বাহিরে উৎকর্ণ হইয়া আড়ি পাতিয়া রহিলাম।

শেষ রাত্রে অপরিসীম ক্লান্তিতে চোখ দুইটি বুজিয়া আসিল। তখন আর শয্যা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

প্রত্যুষেই শঙ্কর আমাকে ঠেলিয়া তুলিল। চোখ দুইটি ঘুমে জড়াইয়া আছে—কোন রকমে খুলিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু শঙ্কর ধাক্কার পর ধাক্কা দিতেছে। চোখ খুলিতেই হইল।

শঙ্কর বিনা ভূমিকায় কহিল, আমি বাড়ি যাচ্ছি।

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, সে কি? বিয়ের বাড়ি—এত ভোরে এখনো কোন লোকজনই ওঠেনি—এখন আমরা চলে যাব কি করে? গায়ের ব্যথাও এখনো মরেনি। ললিতকেও ত বল্তে হবে।

শঙ্কর অধৈর্য হইয়া বলিল, তোমাদের আমি যেতে বলছি নে। আমি একলাই যাচ্ছি। আমার থাকার জো নেই।

ততোধিক আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি শঙ্কর? কেন তুমি হঠাৎ চ'লে যেতে চাইছ? তোমাকে কি কেউ কিছু বলেছে? কোন রকম দুর্ব্যবহার......?

শঙ্কর বাধা দিয়া বলিল, না না, সে সব কিছু নয়—আমার ভাল লাগছে না। একটু থামিয়া বলিল, আমার মন কেমন করছে।

মন কেমন করছে? ওরে আমার যাদু রে—বলি কার জন্যে শুনি?

শঙ্কর ইতস্তত করিয়া বলিল, কেন, মায়ের জন্যে।

ক্রোধ চাপিতে পারিলাম না—শ্লেষ করিয়া কহিলাম, যাদুর বুঝি দুদু খাওয়ার সময় হয়েছে? তাই মা না হ'লে আর চলছে না। তা যাও—তাড়াতাড়ি গিয়ে দুধ খাওগে। বলি বয়স কত হ'ল তার খেয়াল আছে?—আমি বালিশ আঁকড়াইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

সরোজের নাক ডাকার শব্দে ঘরখানি প্রকম্পিত হইতেছিল। সে আমাদের কথাবার্তা কিছুই শুনিতে পাইল না।

শঙ্কর আর কথা কাটাকাটি না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(২)

খেলার মাঠে একটা জটলা বাধিয়াছে। দূরে হইতে চড়া গলার স্বর কানে আসিতেছিল এবং মাঝে মাঝে দুই পক্ষের হস্ত আন্দোলনও নজরে পড়িতেছিল। কৌতূহল পরবশ হইয়াই পা দুইটা সেদিকে চালাইয়া দিলাম।

গ্রামের একান্তে এই মাঠটুকু। পাশ দিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে। প্রতিদিন অপরাহ্নে গ্রামের যত ছেলে এই মাঠেই আসিয়া জমা হয়। প্রধান খেলা ফুটবল। ফুটবলের ম্যাচ লাগিয়াই আছে। কখনো নিজেদের মধ্যে, কখনো পাশের গ্রামের ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে। এই লইয়াই কত উৎসাহ, কত উদ্যম! ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম—সিনেমা থিয়েটার নাই। তার স্থান অধিকার করিয়াছে মাঠের ফুটবল খেলা এবং খেলার পরে সন্ধ্যার আড়ালে বসিয়া একান্তে তাহারই সতেজ আলোচনা।

সরোজ আমাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিল। আমাকে সালিশ মানিয়া বলিল, এই ত যোগেশ এসেছে, ওকে জিজ্ঞাসা কর ও ত অনেক বই পড়ে, ওর কথা ত তুমি মানবে? আমার কথা না হয় হেসেই উড়িয়ে দিলে, কিন্তু যোগেশের মতটা একবার নাও......

আমি হাসিয়া বলিলাম, ব্যাপার কি সরোজ? কথার আগা নেই পিছন নেই—আমাকে সালিশ মেনে বস্লে। ঘটনাটা কি হয়েছে আগে তাই খোলসা ক'রে বলো।

সরোজ বলিল, শঙ্কর কিছুতে কি শুনবে? কোথায় শুনে এসেছে যে মহাত্মা গান্ধীর বাপের নাকি চার বিয়ে ছিল। গান্ধী তাঁর বাপের কনিষ্ঠা স্ত্রীর সন্তান। তাই নিয়ে আমার সঙ্গে সমানে তর্ক করছে। আমি বলছি না, এ হ'তেই পারে না, কিন্তু কে কার কড়ি ধারে? ওর সেই যে কথায় বলে না, ভদ্রলোকের এককথা!

শঙ্কর এইবার অন্যদের অতিক্রম করিয়া আমার নিকট আসিল। উত্তেজনায় তার ফর্সা মুখখানি তখন লাল টকটক করিতেছে। আমার হাত ধরিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিল, আচ্ছা, তুমিই বলো যোগেশ। মহাত্মাজীর বাপের চা'র বিয়ে নয়? এতে আর হয়েছে কি! অনেকেরই ত এ রকম থাকে। কিন্তু সরোজ তা কিছুতেই স্বীকার করবে না। সে বলে, মহাত্মাজীর বাপের চার বিয়ে—এ হ'তেই পারে না। এ blasphemy! কিন্তু ও জানে না যে, যে-সময়ের কথা হচ্ছে, তখন এ প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন এটা কেউ দোষের বলেই মনে করতো না।

সরোজ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় চেঁচাইয়া উঠিল, বলি শঙ্কর তুমি থামবে কি না? তোমার সার্মন (sermon) আমরা ঢের শুনেছি—এইবার যোগেশের মতটা শুনতে দাও।

আমি মহা বিপদেই পড়িলাম। এর উত্তর আমার জানা ছিল না। সত্য কথাই কহিলাম। বলিলাম, গান্ধীজীর জীবনীই পড়েছি ভাই, কিন্তু তাঁর বাপের জীবনী নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাই নি। সুতরাং তাঁর বাপ কয়বার বিয়ে করেছিলেন, তিনি কোন্ পক্ষের সন্তান, তা আমি জানি নে।

সরোজ হর্ষের আতিশয্যে লাফাইয়া উঠিল। শঙ্করের দিকে তাকাইয়া বলিল, কেমন, এইবার হ'ল ত? না তোমার আরো কোন পণ্ডিতের মত চাই? আমি সত্যি বলছি তোমার ঐ বিদ্ঘুটে ধারণা কেউ সমর্থন করবে না।

শঙ্কর যেন খানিকটা দমিয়া গেল বলিয়া মনে হইল। তার মুখখানি ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে ঘাড় নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, তুমি কার কাছ থেকে এই খবর সংগ্রহ করলে বল ত। এমনও ত হ'তে পারে যে বাস্তবিকই আমরা ঘটনাটা জানি নে।

শঙ্কর ঘাড় নীচু করিয়াই কহিল, আমি মার কাছ থেকে এটা শুনেছি। তারপর আস্তে আস্তে বলিল, আর মা ত মিথ্যা বলেন না।

(৩)

সেবার আমাদের গ্রামে কি দুর্বৎসর আসিয়াছিল জানি না। একে ত ম্যালেরিয়ার আক্রমণে গ্রামবাসী জরাজীর্ণ হইয়াই আছে, কিন্তু তবু সেটা গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। তার আক্রমণে লোকে ততটা ত্রস্ত হইয়া ওঠে না, কেন না ম্যালেরিয়ায় কেউ চোখের সামনে ধড়ফড় করিয়া মরে না। ভুগিয়া মরে। কিন্তু সেবার আরম্ভ হইল টাইফয়েড। সাত আট-দিন জ্বর ছাড়ে নাই শুনিলেই বিপদ গণিতাম —আশঙ্কা হইত তবে আর টাইফয়েড না হইয়া যায় না।

শঙ্করকে এই কাল রোগে ধরিল। আমি, ললিত, সরোজ পালা করিয়া শুশ্রূষা আরম্ভ করিলাম। শঙ্করের পরিবারের একটু বিশেষত্ব ছিল—তার বাবা শাস্ত্রী মশায় আমাদের গ্রামের গুরু। বাড়িতে টোল ছিল এবং বারো মাস সমস্ত পূজা পার্বণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হইত। তার মা অন্নপূর্ণা দেবী সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণার মতই সকলের মাতৃস্বরূপা ছিলেন। তাদের বাড়িতে কখনো ঝগড়া দ্বন্দ্ব, এমন কি চেঁচামেচি পর্যন্ত শুনি নাই।

শাস্ত্রী মশায়ের পরিবারে আর একটি প্রথা প্রচলিত ছিল যাহা সচরাচর এ-যুগে দেখা যায় না। প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া ছেলেমেয়েরা বাপ-মাকে প্রণাম করিত। স্কুল-কলেজে যাওয়ার আগে বাপ-মাকে প্রণাম করিয়া তবে তাহারা বাড়ি হইতে বাহির হইত।

পালা করিয়া আমরা রাত্রি জাগিতেছিলাম। শাস্ত্রী মশাই এবং অন্নপূর্ণা দেবী দুইজনেই বুড়া মানুষ—তার উপর আদরের সন্তানের দুরন্ত ব্যাধিতে তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা যতটা পারিতাম তাঁহাদের দূরে রাখিতেই চেষ্টা করিতাম।

মুস্কিল হইয়াছিল রোগীকে লইয়া। প্রথম কয়েকদিন বেশ জ্ঞান ছিল—প্রত্যূষে উঠিয়াই পিতামাতার পায়ের ধুলা লইয়া পুনরায় শয্যা-গ্রহণ করিত, তারপর ক্রমশ জ্ঞান থাকার অংশটা কম হইয়া আসিতে লাগিল—জ্বরের ধমকে আচ্ছন্নের মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু ভোরের দিকটায় সজাগ হইয়া উঠিত। যেন কিছু একটা খুঁজিতেছে মনে হইত। শাস্ত্রীমশায় এবং অন্নপূর্ণা দেবী শিয়রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন, সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে জানি না রোগী হাত বাড়াইয়া পায়ের ধুলো লইয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিত।

রোগীর যে কোন উন্নতি হইতেছে না, বরঞ্চ দ্রুত অবনতির দিকে আগাইয়া যাইতেছে তাহা আমরা দিনের পর দিন রোগশয্যার পাশে বসিয়া থাকিয়া টের পাইতাম। কিন্তু সেকথা প্রকাশ করিয়া বলিবার জো ছিল না। সামান্য উন্নতির কথা বলিলে শাস্ত্রীমশায় এবং অন্নপূর্ণা দেবীর মুখ যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত তাহাতে মন্দ বলিয়া তাঁহাদের মনে ব্যথা দিতে আর ইচ্ছা হইত না।

এইরূপে আটাশ দিন কাটিয়া গেল। ঊনত্রিশ দিনের রাত্রিটা জ্বলন্তভাবে বুকের মধ্যে দাগ কাটিয়া বসিয়া আছে।

ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন যে, আজিকার রাত্রিটা যদি ভালয় ভালয় কাটিয়া যায়, তবে ভরসা করি রোগীকে টানিয়া তুলিতে পারিব। তখন আমার ডিউটি। ডাক্তারের কথায় আশ্বস্ত হইয়া শাস্ত্রীমশায় পাশের ঘরে গিয়া শুইয়া-ছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী রোগীর ঘরের এক কোণে একটা মাদুরের উপর কাত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি রোগীর মুখের উপর সজাগ দৃষ্টি মেলিয়া সতর্ক হইয়া বসিয়াছিলাম।

শেষ রাত্রের দিকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হইয়া জোলো হাওয়া বহিতে লাগিল। আমি দরজাটা একটু ভেজাইয়া দিলাম। বোধহয় কোন অসাবধানতার মুহূর্তে আমার চোখে ঘুম আসিয়া থাকিবে—আমি ঢুলিতেছিলাম।

হঠাৎ একটা শব্দে ঘুমের চট্‌কাটা ভাঙিয়া গেল। সম্বিৎ পাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে যুগপৎ আমার বিস্ময় এবং ভয়ের সীমা রহিল না। দেখি শঙ্কর যে আজ কতদিন শয্যার আশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে নাই সে কি এক অমানুষিক শক্তির প্রেরণায় হামাগুড়ি দিয়া তার মায়ের পায়ের কাছে গিয়াছে এবং তাঁর পায়ের ধুলা লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিতে গেলাম কিন্তু তাহার পূর্বেই সে নিজে ধপ্ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। আমি তৎক্ষণাৎ তার বুকে কপালে হাত দিয়া দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। অন্নপূর্ণা দেবী সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসিয়াছিলেন —তিনি হাঁউমাউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। শাস্ত্রীমশায় পাশের ঘর থেকে ছুটিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন কিন্তু তখন সব বৃথা। দুর্বল রোগীর প্রাণটুকু কোন রকমে ধুক্ ধুক্ করিতেছিল—এই উত্তেজনায় এবং পরিশ্রমে তাহা অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

একদিন সরোজের সঙ্গে শঙ্করের তর্ক লইয়া মধ্যস্থতা করিয়াছিলাম—আজ সে কথা মনে করিয়া হাসি পাইল। মনে হইল শঙ্কর আমাদের দলের হইলেও আমাদের অনেক উপরে ছিল। মৃত্যু তাহাকে এক অভিনব গৌরবের মুকুট মাথায় পরাইয়া আমার চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিল।

ভৈরবের কূলে শঙ্করের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। কতদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেখানে বেড়াইতে গিয়াছি এবং শঙ্করের বিদেহী আত্মার উদ্দেশে প্রণতি জানাইয়া বলিয়াছি, হে ভক্তিমান, তুমি আমাদের অনেক উপরে ছিলে—তাই এই মাটির পৃথিবীতে তোমার স্থান হইল না। ভৈরবের কূলে যে এই মাতৃতীর্থে স্নান করিবে তার মাতৃভক্তি অচলা হইবে।

শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে দূরাগত জননীর অস্ফুট রোদনধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে—সে কি ভুল শুনিয়াছি?

আলোক চিত্র : মনোবীণা রায়

সাঁওতালী ছেলে

আর্টে অনুকরণ ও সৃষ্টি

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী

আর্টের বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে আর্ট বা শিল্প-সৃষ্টি কোনো প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার অনুকরণ বা প্রতিলিপি—না ইহা স্বাধীন সৃষ্টি? গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেন, কবি, চিত্রকর, মূর্তিকার এবং গায়ক ইঁহারা সকলেই অনুকরণকারী এবং তাঁহাদের জীবন বৃথা সাধনায় অপব্যয় করেন; কারণ যে বস্তু প্রকৃতি ও চরাচরে আমরা নিত্যই পাই, তাহার অনুকরণ করিয়া অথবা প্রতিলিখিত করিয়া কি লাভ? অস্ত গগনে বিদায়-সূর্যের বিচিত্র বর্ণসম্ভার প্রতি সন্ধ্যায় প্রকৃতি আমাদের চোখের সম্মুখে আনিয়া দেয়, তবু শিল্পী কেন দিনাবসানের ছবিটি বর্ণে বাণীতে ফুটাইয়া তোলেন এবং আমরাই বা কেন সেই ছবি দেখি? ইহা কি কেবলমাত্র অবসরবিনোদন? এ প্রশ্নের উত্তরে এইটিই সবচেয়ে বড়ো কথা যে, শিল্পীর সৃষ্টি অনুকরণ নহে; শিল্পী প্রকৃতিকে দেখেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির রূপকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সামনে নূতন একটি ভাবরাজ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং সেই নতুনত্বের ছাপই আমরা শিল্পীর সৃষ্টিতে পাই। শিল্প রচনা যে কেবলমাত্র প্রতিলিপি নহে তাহার স্বপক্ষে এই কটি কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শিল্পী জানেন যে অনুকরণ করায় কোনো সার্থকতা নাই এবং যাহা কেবলমাত্র বাস্তব-জগতের ছায়ামাত্র বা প্রতিলিপি তাহা আমাদের চোখকে অতি শীঘ্রই ক্লান্ত করে। শিল্পী কেন বৃথা সাধনা দ্বারা আমাদের পীড়িত করিবেন? যদি বলা যায় যে শিল্প আমাদের সংকীর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করে এবং যাহাকে আমরা সহজে উপলব্ধির ক্ষেত্রে পাই না বা জানি না, তাহাকেই শিল্পের মধ্য হইতে আহরণ করিয়া অনুভূতির মধ্যে লাভ করি—যেমন নাটকে, উপন্যাসে বহু বিচিত্র দুঃখ সুখ, ভাবনা এবং প্রেম ঈর্ষা দুরাশার বর্ণনা পড়িয়া উপভোগ করি, কারণ আমাদের প্রত্যহ জীবনের বৈচিত্র্যহীন ছোটো গণ্ডীর মধ্যে এই ভাবগুলির অনুভব কমই হয়। কিন্তু এই যুক্তিটি সঙ্গত নহে, কারণ যথার্থ আর্ট বা কোনো বড়ো শিল্প কখনও কোনো নূতন বিষয়বস্তু দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে না এবং আমাদের আবেগ উচ্ছ্বাসগুলিকে প্রশ্রয় দেয় না, যেগুলি কেবলমাত্র এক ধরণের তথাকথিত নাটক উপন্যাস, ছবি গানে হইয়া থাকে। যে শিল্প বড়ো এবং সুন্দর তাহাতে বিষয়বস্তু খুবই সাধারণ ও সরল হইয়া থাকে এবং ইহাতে ভাবকে প্রশ্রয় না দিয়া ভাবকে মনন করা হইয়া থাকে। এই মনন করার যে আনন্দ তাহাই শিল্পের এবং এই আনন্দ ভাবাবেগের বা উচ্ছ্বাসের সুখ হইতে ভিন্ন। সাধারণ জীবনে ভাবের আবেগ আমাদিগকে চালিত করে—আমরা হাসি, কাঁদি, প্রেম করি, হিংসা করি। শিল্পে কিন্তু আমরা ভাবকেই ধরিবার চেষ্টা করি—আবেগ হইতে দূরে রহিয়া ভাবটিকে সম্মুখে রাখিয়া দেখি। ভাষায় সুরেতে, রেখা রঙে বা পাথরে কুঁদিয়া ভাবকে প্রকাশ করিতে চাই—এক কথায় ভাবকে মনন করি। এইভাবে মনন করিবার সময়ে আমরা ভাবকে জয় করিয়া লই, ভাবের নিকট হইতে দূরে রহিয়া ভাবকে ভাবি। এইজন্য অভিনয়ে যখন দুঃখ দেখি, তখন মনে মনে দুঃখের চেয়ে সুখই অনুভব করি বেশী—ভাবাবেগের আনন্দকে লাভ করি, কারণ দুঃখ তখন বাস্তব জীবনের দুঃখ নহে যে সেই দুঃখ আমাদের অভিভূত করিবে, উহা তখন কল্পনা-জগতের দুঃখ। দুঃখের ভাবটিকে তখন আমরা মনন করিতেছি এবং মননের আনন্দটিকেই একান্তভাবে অনুভব করিতেছি। সুতরাং শিল্পকে বাস্তব জগতের অনুকরণ বলা ভুল, বরং শিল্পই বাস্তব জগতের বস্তুগুলিকে নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া রূপান্তরিত করে। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, অনুকরণ কখনও নিখুঁত হইতে পারে না এবং শিল্পী সেজন্য বৃথা সাধনাও করেন না। শিল্পী সর্বদাই কোনও নতুন সৃষ্টি করিতে চান। তৃতীয়তঃ—যদি কোথাও অনুকরণও নিখুঁত হয়, তাহা হইলে চিত্রকরের আদর বাড়িবে বই কমিবে না, কারণ অনুকরণ নিখুঁত হইলে শিল্পবস্তুকে বাস্তব বস্তুর সহিত সমান ওজনে তুলনা করা যায় এবং শিল্পীর কারিগরীই প্রশংসার বিষয় হইবে। এক্ষেত্রে কল্পনা বা ভাবের কোনো কথাই উঠিবে না। এই যান্ত্রিক কৌশল আলোক-চিত্র-শিল্পীর এবং অনেকাংশে আরও প্রশংসনীয়ভাবে ইহা কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পিগণের আছে।

কিন্তু শিল্প-সৃষ্টি-ক্ষেত্রে এই কৌশলের স্থান খুব উচ্চে নহে। যথার্থ শিল্পী ইহার জন্য লালায়িত নহেন এবং তিনি কখনও অনুকরণ করিতে চাহিবেন না। তবে অনেক স্থলে সার্থক অনুকরণ-শিল্পে আমরা শিল্পের লাভ না করিলেও তাহাকে বাস্তব বস্তুর মা[প] কাঠিতে বিচার করিবার সুখ পাই এবং তাহাতে ঐ শিল্পটির প্রতিক্রিয়া আমাদের মনে কার্যকরী ভাব জাগাইয়া দেয়। বহু তৈল-চিত্র দেখিয়াই আমাদের মনে প্রতিকৃতিটির সহিত ব্যক্তির সাদৃশ্য সম্বন্ধে বিচার জাগিয়া উঠে এবং সাদৃশ্যটি বিচারসহ না হইলে ভাব লাবণ্যের রস আমরা তেমন গ্রহণ করিতে পারি না। এক বিখ্যাত অভিনেতার দুর্বৃত্তের ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রঙ্গমঞ্চে চটি জুতা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার যথার্থ শিল্প-রসানুভূতি না জাগিয়া কার্যকরী বৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল—তিনি শিল্পের সত্যকে বাস্তবের সত্যরূপে দেখিয়াছিলেন। এইরূপে অনুভূতির পার্থক্য যাহাতে না ঘটে সেইজন্য অভিনয়-মঞ্চ করা হয় এবং ছবিতে ফ্রেম দিয়া তাহাদের বাস্তব-জগত হইতে দূরে রাখা হয়।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, শিল্প অনুকরণ নহে। তবে কি ইহা বিশুদ্ধ সৃষ্টি? যেমন শিশু কল্পনায় নানাপ্রকার খেলা করে ছোট্ট একটি কাঠি লইয়া কখনো তলোয়ার কখনো বন্দুক, কখনো বা ছিপটি এবং আর[ও] কত কী বস্তুর ভঙ্গীতে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় সেইরূপ শিল্পীও কি অবাধ কল্পনায় [illegible] ভাসাইয়া যাহা তাহা সৃষ্টি করিয়া চলেন শিল্প ও ক্রীড়ার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে দুইটি স্বাধীন কল্পনা রাজ্য গড়িয়া তোলে এ[বং] দুইটিতেই মানুষের উদ্বৃত্ত শক্তির সদ্ব্যবহ[ার] হয়। কিন্তু এ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে কারণ শিশুর কল্পনার খেলার কোনো দর্শ[ক] থাকে না বা শিশু অপরকে দেখাইবার জ[ন্য] খেলা করে না এবং সেই কারণে তাহার খেল[া] লীলায় কোনও স্থায়ী বস্তুর রচনাও ঘটে ন[া] শিশু তাহার খেলাকে অপরের বোধগম্য করি[তে] চায় না বা ঐরূপ কোনও স্পৃহা শিশু অনু

না। অপর পক্ষে শিল্প রচনার উদ্দেশ্যে ়তার ঐ ভাবগুলিই পরিস্ফুট। শিল্পীর সর্বদাই শ্রোতা বা দর্শকের আসন য়াছে। শিল্পী কেবলমাত্র নিজের অবসর ভাব-বিনোদনের জন্য শিল্প রচনা করেন না তাঁহার সৃষ্টি যাহাতে অপরের মনেও ন লাভ করে তাহার জন্য ব্যগ্র রহেন। পী তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া কিছু বলিতে প্রকাশ করিতে চাহেন—যাহা অপরের অনুভূতির দুয়ার দিয়া মুক্তিলাভ করিবে এবং সেইজন্য শিল্পী সার্বভৌমিকতা চাহেন, কিন্তু শিশুর খেলা তাহা চায় না বা পায় না। এই-জন্য শিল্প স্বাধীন সৃষ্টি হইলেও প্রকৃতি হইতে একেবারে ভিন্ন হইতে পারে না। শিল্প প্রকৃতির প্রতিলিপি নহে, অথচ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্নও নহে সুতরাং শিল্পী অনুকরণ করেন না, কিন্তু প্রকৃতি হইতেই সামগ্রী আহরণ করিয়া তাহাকে নিজের ভাবনা দ্বারা রূপান্তরিতরূপে প্রকাশ করেন। যদি শিল্পী প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিতেন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি অপরের মনে আবেদন জাগাইত না। এই জনাই শিল্পীর নিজস্ব স্বাধীন সৃষ্টির মধ্যেও কিছু সহজ সাধারণ প্রাকৃতিক বিষয় থাকা আবশ্যক। প্রকৃতি সার্বভৌম এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই শিল্পী শিল্প-রচনা করেন এবং তাহা করেন বলিয়াই তাঁহার সৃষ্টি অনাসৃষ্টিতে পর্যবসিত হয় না।

বিজ্ঞানের কথা

থুতু পোকা

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

থু ব ছোট্ট পোকাটি। রাত্রি বেলায় আলোর ়, কাছে যেসব বাদলা পোকা ভিড় করে ় বেড়ায় আকারে দেখতে অনেকটা তাদের ়—কিম্বা তাদের চেয়ে সামান্য কিছু বড়। ছোট বলে গাছের ডালে বা পাতায় বসে ়বার সময় ওদের শরীরের সম্পূর্ণ গড়নটি ়পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না, মনে হয় যেন ়টু কালচিটে দাগ পাতার গায় লেগে আছে। ়স কাচ (ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস) চোখে দিয়ে ়লে দেখায় ছোট একটি ঝিঁঝিঁ পোকার ়। ঝিঁঝিঁ পোকারই মতো ওদের পিঠে জোড়া ডানা, উপরের ডানা জোড়া বেশ পুরু শক্ত—নীচের ডানা জোড়া সিল্কের ন্যায় ়লা ফিনফিনে। উভয় ডানা জোড়াই পিঠের ়র এমন আঁট হয়ে মুড়ে থাকে যে হঠাৎ ়র গায় ডানা আছে বলে মনে হয় না। ়ঝির ন্যায় ওদের চোখ দুটিও বেশ বড় বড়।

পাতায় বা ডালে বসে থাকবার সময় ওদের ়ন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যাতে ওদের দিকে ়ট আকর্ষণ হ'তে পারে। ওদের প্রধান ়শিষ্ট্য ওদের ছানাগুলি। সকাল বেলায় নানা-়তীয় ঘাস বা গাছের পাতায় বিশেষভাবে ়ানে মেদি গাছের ঝোপের পাতায় থুতুর ়তা একটু জিনিস লেগে থাকতে দেখা যায়। ়তুর মতো জিনিসটুকু সাবানের ফেনার মতো ়লা, তার মধ্যে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ বা ভুর-়ী থাকে অজস্র। অনেকে মনে করেন পাতার ়য় এগুলি ব্যাঙের থুতু। অনেকে আবার ়লিকে ভুতের মুখের থুতুও মনে করে ়কে। কিন্তু ভুত, ব্যাং, মানুষ বা অন্যান্য ়ন জন্তুর সঙ্গেই এই থুতুর মতো জিনিস-়লির কোন সম্বন্ধ নেই। হাত দিয়ে পাতার হতে সেই থুতুর মতো জিনিস একটু সরিয়ে ়লেই তার ভিতর হতে বের হয়ে আসে অতি

ঘাসের ডগায় থুতু পোকার ছানা বা লার্ভার ফেনার মতো থুতো

ছোট একটি পোকা। এটি উপরে বর্ণিত থুতু পোকারই ছানা বা লার্ভা। প্রথম হয় ওদের ডিম, ডিম হ'তে হয় ছানা। পাতার গায় যেসব থুতুর মতো জিনিস দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি এই সব ছানারই কাজ।

এই ছানাগুলির খাদ্য গাছের কচি পাতা বা ডালের রস। ছানাগুলি ডিম হতে বের হয়েই ঠোঁট দিয়ে চুষে চুষে পাতার রস খেতে আরম্ভ করে। সেই রসের মধ্যে থাকে জলের ভাগই বেশি। জলটুকু প্রায় সম্পূর্ণই দেয় ওরা বের করে, সেই জলই ওদের গায় থাকে জড়িয়ে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সেই জলে ভুরভুরী থাকে না। জলের মধ্যে ভুরভুরী জন্মে ক্রমাগত ওদের উদরের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে। খুব সম্ভবতঃ সে সময় ওরা উপর দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসও গ্রহণ করে। পতঙ্গ জাতি মাত্রই ছানা বা লার্ভা অবস্থায় বারবার খোলস ত্যাগ করে। খোলস ত্যাগ ক'রে ক'রেই ওরা বড় ও পুষ্ট হয়। শেষ-খোলস ত্যাগ না করা পর্যন্ত থুতু পোকার ছানাগুলিও থুতুর মধ্যেই গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে।

বর্ষার সময়ই পাতার গায় ছানাগুলির উপদ্রব বাড়ে। কচি পাতা ও ডগার গায়ের রস চুষে খেয়ে খেয়ে গাছটিকে দেয় মেরে। যে গাছকে মারতে পারে না, সে সব গাছও ওদের উপদ্রবে নিস্তেজ হয়ে যায়। পাতার গায়ে ওদের

থুতু পোকার একটি ছানা বা লার্ভা

পরিচয় পাওয়া যায় থুতু দেখে। জন্মাবার পর পাতায় বসে রস খাবার সংগে সংগেই ছানাগুলির গায় এই থুতু জন্মায়। প্রথম অবস্থায় এই থুতু থাকে খুবই ছোট একটু বিন্দুর মতো। ছানাগুলি বাড়ে খুব দ্রুত। কচি পাতায় খাবার মতো রসও পায় যথেষ্ট। ছানাগুলি বড় হবার সংগে সংগে বিন্দুর মতো থুতুটুকুও আয়তনে বাড়তে থাকে, ফেনার মতো ক্রমশই তা ফুলে ওঠে, তার ভিতরে তখন অজস্র ভুরভুরীও জন্মাতে থাকে। আয়তন বৃদ্ধির সংগে সংগে ওদের খাদ্যের পরিমাণও যথেষ্ট বাড়তে থাকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় থুতুর ভিতর থেকে টস্‌টস্‌ ক'রে জল-পড়া দেখে। ছানাগুলি পাতা বা গাছের ডগা থেকে যত বেশি খাদ্য টেনে নেয় তত বেশি তার ভিতর থেকে জল বের হয়ে আসে। সেই জলই চুইয়ে চুইয়ে টস্‌টস্‌ করে নীচে ঝরে পড়ে। হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন গাছের পাতা হ'তে বৃষ্টির জল ঝড়ে পড়ছে। শেষ-খোলস ত্যাগ করবার সময় হয়ে এলে ওদের বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর ওদের গায়ের থুতুর ভিতরে ওরা আর নতুন করে জল জমাতে পারে না। কারণ সে অবস্থায় ওরা খাওয়া দেয় বন্ধ করে। ঘন থুতুর ভিতরে তখন ওরা একপ্রকার নির্জীব নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থা ওদের একদিন কি দু'দিন মাত্র থাকে। তারপরেই শেষ খোলসের ভিতর হতে একটি পূর্ণাংগ থুতু পোকা বের হয়ে আসে।

লার্ভার প্রথম অবস্থায় ওদের গায়ের রং হয় ঈষৎ শুভ্র, বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে ক্রমশ নীলাভ হয়ে আসে। রং-এর শেষ পরিণতি ঘটে গাঢ় বাদামীতে। ছানা বা লার্ভা হতে পূর্ণ পরিণত পোকায় পরিণত হতে তিন চারদিন কেটে যায়। শেষ খোলস ত্যাগ করে পূর্ণ পরিণত পোকা হবার পূর্বে ওদের গায়ের থুতু সরিয়ে নিলে ওরা পড়ে বড় বিপদে। ডিম হতে বের হয়ে প্রথম প্রথম ওরা যত দ্রুত গায়ে থুতু জমাতে পারে, বড় হয়ে তত দ্রুত থুতু জমাতে পারে না। অথচ থুতুর ভিতর লুকিয়ে থাকতে না পারলে ওদের বিপদও অনেক। তাই নিজের গা ঢাকা দেবার জন্য একটু হলেও থুতু জমাতে হয়। তাতেও যে সব সময় শত্রুর হাত হতে ওরা রক্ষা পায় তা বলা যায় না। কারণ গাছের পাতায় সংখ্যায় যে পরিমাণ থুতু দেখতে পাওয়া যায় পূর্ণ পরিণত পোকা দেখতে পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক কম। অনেক সময় গাছ-পিঁপড়েকে থুতুর ভিতর হতেও ছানাগুলিকে বের করেও আনতে দেখা যায়।

পূর্ণাংগ পোকাগুলির চলবার ভংগ অতি চমৎকার। তিন জোড়া পা থাকা সত্ত্বেও ওরা হেঁটে চলে না, আর দু'জোড়া ডানা থাকলেও ওরা উড়তে পারে না। ওদের চলা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে। গাছের ডালে যতবারই ওদের ধরবার চেষ্টা করেছি ততবারই দেখেছি ওরা পালাবার জন্য এক ডাল থেকে অন্য ডালে ছুটে পালায় লাফ দিয়ে আর সংগে সংগেই শুনতে পাওয়া যায় ধুক করে একটু শব্দ। এ শব্দ ডানার মৃদু গুঞ্জন নয়, এ অনেকটা কাঠ বা কোন ধাতু দ্রব্যের উপর কাঁকড়-কণার পতনের ধুক শব্দের ন্যায়। এ শব্দ ওদের দেহের কোন অংগ হ'তে উত্থিত হয় তা বোঝবার জো নেই। হয়তো বা লাফ দেবার সময় পিঠের মোটা ডানা জোড়ায় পরস্পরের সংগে ঘষা লেগে এ শব্দ উৎপন্ন হয়। ওদের লাফাবার শক্তিও অতি অদ্ভুত। পোকাটি দেখতে অতটুকু কিন্তু দেহের তুলনায় লাফ দেয় ব্যাঙের চেয়েও অনেক বেশি। এ পোকার অন্য কোন নাম জানা না থাকায় এস্থানে ওদের থুতু পোকাই বলা হলো। এদের বৈজ্ঞানিক নাম য়্যাফ্রোফোরা কড্রিনোটাটা। (Aphrophora quodrinotata)

অনুবাদক ঃ শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

[৪]

আবার সেই দুপুরবেলাতেই ধার্য হ'ল পরস্পরের গোপন অভিসার, সেই ছোট্ট ঘন বনের মাঝখানে পুরাণো সংকেত-স্থলে।

এইবার ইউজিন আরো ভালো করে মেয়েটিকে নজর করবার অবকাশ পেল। সুযোগ ও সুবিধামত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তাকে। মোটের ওপর ভালোই লাগল তার সব কিছু। মেয়েটির আকর্ষণ এবং মাদকতা অস্বীকার করা চলে না।

তারপর ইউজিন তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলে, জিজ্ঞাসা করলে তার স্বামীর কথা। দেখা গেল, ইউজিন যা ভেবেছিল, তাই-ই ঠিক। তার স্বামী বুড়ো মাইকেলেরই ছেলে বটে। মস্কো শহরে অনেকদিন যাবৎ আছে। সেখানে কোচম্যানের কাজ করে।

"আচ্ছা—এটা তুমি কেমন করে......?" ইউজিন প্রশ্ন করে ফেলে ইতস্তত করে। মানে সে জিজ্ঞাসা করতে চায়, সত্যি কথা জানতে চায়, কেমন করে স্টীপানিডা তার স্বামীর প্রতি এমন অবিশ্বাসী হতে পারল।

"কি কেমন করে?" পাল্টা জবাবে প্রশ্ন করে বসে স্টীপানিডা।

মেয়েটি খাসা সপ্রতিভ। রীতিমত চালাক এবং চট্‌পটে। মনে মনে তারিফ করে ইউজিন। আবার শুধোয়ঃ

"আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো—তুমি কেন আমার কাছে এলে, মানে আসো?"

"বাঃ—আসবো না!" লঘু কৌতুকের শুভ্র হাসিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে স্টীপানিডা। বলে, "সে-ও কি সেখানে মজা করে না, স্ফূর্তি করে না? আর আমার বেলায় যত দোষ?"

স্টীপানিডার উত্তেজিত কথা বলবার ভঙ্গীটুকু খুব মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করছিল ইউজিন। ভারি মিষ্টি ও সুন্দর লাগল তার সরল অথচ কপট অভিমান-মিশ্রিত জবাব, তার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, আর ঈষৎ উদ্ধত গ্রীবার কমনীয় ছাঁদটুকু।

সে যাই হোক্, ইউজিন নিজে থেকে এবারে এগিয়ে এল না। নিজে থেকে চাইল না এবং স্থিরও করল না এর পরে দুজনে আবার কোন-দিনে এসে ঐ জায়গায় মিলিত হবে। এমন কি, স্টীপানিডা যখন আপনা হতেই প্রস্তাব করল যে, এর পর থেকে দুজনের এমনি দেখা-সাক্ষাৎ চলুক, বুড়ো দানিয়েলের সাহায্যের আর দরকার নেই, ওকে তার মোটেই ভালো লাগে না, ওর মধ্যস্থতার প্রয়োজনটা কিসের—তখনও ইউজিন রাজী হল না।

আসল কথা এই—ইউজিনের মনের অন্তস্তলে ইতিমধ্যে একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। মনে মনে সে আশা করছিল, এইটেই যেন শেষ মিলন হয়। পরস্পরের আর দেখা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্টীপানিডাকে তার পছন্দই. মোটেই খারাপ লাগছে না। বরঞ্চ রীতিমত আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে ইউজিন। তবু তাদের দুজনের এই গোপন সম্পর্ক অবৈধ, নিশ্চয়ই। কিন্তু অনিবার্য কারণে যখন সেটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, তার মধ্যে এমন কিছু দূষণীয় ব্যাপার বোধ হয় নেই।

তবু—তবু মনের কোণে, জাগ্রত সত্তার গভীরে ঘনিয়ে উঠছে একটা অপ্রসাদ, একটা অহেতুক অস্বস্তি, অপরাগের মলিন ছায়া। যেখানে ইউজিন একলা, আপন চৈতন্যের সামনে মুখোমুখি, সেখানে সে কঠিন বিচারক। বিবেকের নিরপেক্ষ বিচারে তাই তার আত্ম-সমর্থন টিঁকছে না। মনে হচ্ছে, না, এ ঠিক নয়। এই দেখাই যেন শেষ দেখা হয়। আর যদি তা না হয়, প্রার্থনা তার কোন কারণে সফল না হয়, তাহলে এমন ব্যবস্থায় বা গোপন বন্দোবস্তে সে কোনমতেই অংশ গ্রহণ করতে পারবেনা—যাতে করে আবার তাদের ঘনিষ্ঠতা কায়েম হয়ে ওঠে।

এইভাবেই কাটল সারা গ্রীষ্মকালটা। এই সময়টার মধ্যে উভয়ে একত্র হ'ল প্রায় দশ-বারো বার। আর প্রত্যেক বারেই দানিয়েলের মধ্যবর্তিতায়।

একবার হ'ল কি—স্টীপানিডার স্বামী এল ঘরে, মস্কো থেকে ফিরে। তাই সেবার আসতে পারল না স্টীপানিডা ইউজিনের কাছে। বুড়ো দানিয়েল প্রতিবারই হুজুরে হাজির। এবারে অসুবিধা দেখে ইউজিনের কাছে সে প্রস্তাব তুলল,—আরেকজন স্ত্রীলোক নিয়ে এলে কেমন হয়! ঘৃণায় সংকুচিত হ'ল ইউজিন, সজোরে প্রত্যাখ্যান করল তার গর্হিত প্রস্তাব।

তারপর স্বামী একদিন চলে গেল, ফিরল তার প্রবাসের কর্মস্থলে। শুরু হ'ল আবার তাদের দেখা-শোনা। আগেকার মতই যথারীতি, নিয়মিতভাবে তারা এসে মিলত সেই পরিচিত স্থানটিতে। যে সম্পর্কে সাময়িক ছেদ পড়েছিল, আবার তা প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম প্রথম দানিয়েলকে ডাকা হ'ত, আগেকার বন্দোবস্ত অনুসারে। কিন্তু কিছুদিন পরে তার আর প্রয়োজন রইল না। দানিয়েলকে ছেড়ে দেওয়া হল। ইউজিন কেবল তারিখটার উল্লেখ করে বলে দিত, 'অমুক দিন এসো।' যথাসময়ে হাজির হ'ত স্টীপানিডা, সঙ্গে আরেকজন স্ত্রীলোক নিয়ে। সঙ্গিনীটির নাম প্রোখোরোভা। কেন না, কৃষকের ঘরের মেয়ে বা বধূ একলা ঘুরে বেড়ানো সমাজ-রীতির বিরুদ্ধ।

একদিন ভারি মুস্কিল হ'ল। যেদিন যে সময়ে স্টীপানিডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কথা ছিল ইউজিনের, ঠিক সেইদিনই সেই সময়ে, বাড়িতে এলেন অতিথির দল সপরিবারে। মেরী পাভ্‌লোভ্‌নার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এ'রা, সামাজিক শিষ্টাচার হিসেবে। সঙ্গে ছিল সেই পরিবারেরই একটি মেয়ে, বহুদিন ধরে যার ওপরে নজর রেখেছিলেন ইউজিনের মা। মনে মনে এ'চে রেখে ছিলেন ইউজিনের সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ে হলে বেশ হয়। তাই ইউজিনকে ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে বাড়িতে আটকে থাকতে হ'ল। বাড়িতে অতিথি বসিয়ে রেখে অভিসারে বেরুনো অসম্ভব। তবে ফুরসৎ পাওয়া মাত্রই ইউজিন চট্ করে বেরিয়ে পড়ল। গোলাবাড়ির পিছনে ফসল ঝাড়াই হচ্ছে, তাই দেখবার নাম করে ইউজিন ঐ পথ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বনের দিকে। পুরানো সংকেত-স্থলে অধীর আগ্রহে এসে যখন সে পৌঁছুল, দেখল জনশূন্য ঝোপ—কেউ কোথাও নেই। তবে যে জায়গাটিতে প্রতিবার স্টীপানিডা প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাক্‌ত সেই জায়গাটির আশে-পাশে হাতের নাগালের মধ্যে যত কিছু ছোট-খাটো গাছের চারা আর ডাল-পালা ছিল, সব ভাঙা-চোরা অবস্থায় পড়ে আছে। হেজেল গাছের ছোট্ট ডালগুলো দুমড়ানো,—একটা সরু লাঠির মতন মেপ্‌ল গাছের নতুন, সবুজ চারাটিকেও মচ্‌কে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

চোখের সামনে সব দেখতে পেল ইউজিন। বহুক্ষণ ধরে সাগ্রহ প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছে স্টীপানিডা। তারপর নিরাশ হয়ে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। নিষ্ফল অভিসারের ব্যর্থ আক্রোশে ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে, রেখে গিয়েছে বিরক্তি আর অভিমানের কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ। ধূলিসাৎ প্রত্যাশার ধূলিসাৎ নিদর্শন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ইউজিন। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে চলল দানিয়েলের সন্ধানে। বৃদ্ধ বন-প্রহরীকে বলে দিল যেন কাল আবার স্টীপানিডাকে আসবার জন্যে খবর দেওয়া হয়।

এল স্টীপানিডা—যথারীতি, ঠিক সময়েই। যেন কিছুই হয়নি। সহজ এবং স্বাভাবিক।

কাট্‌ল সারা গ্রীষ্মকাল এইভাবে। প্রতি-বারই উভয়ে এসে মিলত বনের মধ্যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে। কেবল একবার, শরৎ-কালের কাছাকাছি তারা পিছনকার উঠোনে ছোট্ট ছাউনি-ঘরটায় এসে উঠেছিল। তারপর কিছুক্ষণ পরেই চলে যেত যে যার নিজের ঘরে। গতানুগতিক, নিয়মিত, পূর্ব-নির্ধারিত তাদের অভিসার।

ব্যক্তিগত জীবনে, এই গোপন প্রণয় আর দৈহিক সম্পর্ক যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—এ চিন্তা কোনদিনই ইউজিনের মাথায় উদয় হয় নি স্টীপানিডার সম্বন্ধে সে কোন কিছুই ভাবত না। মানে, ভাবনার কোন অবকাশ বা প্রয়োজন বোধ করত না। টাকা দিত তাকে, এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়।

ইউজিন গোড়ায় গোড়ায় কিছুই জানত না, বুঝতেও পারে নি। তার মাথাতেই ঢোকে নি যে, তার এই গোপন প্রণয়ের কথা আর কেউ আঁচ করেছে অথবা সারা গ্রামে সে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে। পড়শীর দল যে ইতিমধ্যে হাসি-তামাসা শুরু করে দিয়েছে, গ্রামের মেয়েরা স্টীপানিডার সৌভাগ্যে রীতিমত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে, তার আত্মীয়স্বজন এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দিচ্ছে—এমন কি ইউজিনের দেওয়া টাকায় ভাগ বসাচ্ছে, সে সব খবর কিছুই জানত না ইউজিন। বুঝতেই পারে নি স্টীপানিডার প্রকৃত মনোভাব, এ ব্যাপারটাকে সে কত সহজভাবে নিয়েছে—পাপপুণ্য জ্ঞানটা তার কতটুকু—আর যেটুকু অন্যায়বোধের দরুণ মানসিক অস্বস্তি, সেটা কেমন বেমালুম চাপা পড়ে গিয়েছে ইউজিনের খোলা হাতের দাক্ষিণ্যয়। স্টীপানিডার মনে হ'ত, আর পাঁচজনে যখন তাকে হিংসা করছে, তখন মন্দটা কিসের? কাজটা মোটের ওপর নিন্দনীয় নয়, বরঞ্চ ভালই।

আর ইউজিন ভাবে:

"এটা হ'ল জৈব প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের খাতিরে, নিরুদ্ধ দেহ-ক্ষুধার নিষ্কাশন মাত্র। নিতান্তই দরকারী। নিরুপায়। মন আর অবদমিত শরীর-ধর্ম। এ নিয়ে কি করে চালানো সম্ভব? মানে কাজটা ঠিক ভাল নয়, প্রশংসা বা সমাজ-অনুমোদনের বাইরে। কেউ অবিশ্যি মুখে কিছু বলছে না এখনও পর্যন্ত। কিন্তু সবাই, অন্তত অনেকেই জেনে ফেলেছে। য স্ত্রীলোকটিকে স্টীপানিডা সঙ্গে করে আনে, সে তো জানেই। আর তার জানা মানেই আর দশজনের কাছে খবরটি বেশ রসাল, পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তা'হলে এ অবস্থায় কি করা যায়?"

ইউজিন ভাবে—"এ কাজ ঠিক হচ্ছে না। অন্যায় করাই হচ্ছে—জানি। কিন্তু করি কি? আর করবারই বা কি আছে? তবে, বেশীদিন আর নয়। এবারে দাঁড়ি টানা দরকার।"

ইউজিনের মনে সবচেয়ে বড় অস্বস্তির কারণ হ'ল স্টীপানিডার স্বামী-প্রসঙ্গ। গোড়ায় গোড়ায় সে ভাবত—স্বামীটা নিশ্চয়ই এক হতচ্ছাড়া, বাজে-মার্কা লোক। স্টীপানিডার অপছন্দ এবং অযোগ্য। কথাটা ভেবে আত্মতৃপ্তি বোধ করত ইউজিন। যেন স্খলন আর সমর্থনের একটা কিছু নিশ্চিত হেতু খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু অবাক হয়ে গেল ইউজিন, স্টীপানিডার স্বামীকে একদিন চাক্ষুষ দেখে। কি চমৎকার, লম্বা-চওড়া, বলিষ্ঠ মানুষ! খাসা ভদ্র পোযাক-আষাক। চলাফেরার ধরণে দিব্যি স্মার্ট বলেই তো মনে হয়। অন্তত ইউজিনের চেয়ে কোন অংশেই খাটো সে নয়। তবে......?

পরেরদিন স্টীপানিডার সঙ্গে দেখা হতেই কথাটা পাড়ল ইউজিন। বললে, তার স্বামীকে দেখে সে তো রীতিমত অবাক হয়ে গেছে। সে যে এ রকম, তা তো জানতো না ইউজিন—ভাবতেই পারে নি।

তৃপ্ত, গর্বিত সুরে জবাব দেয় স্টীপানিডা—"সারা গ্রামে ওর জুড়ি নেই।"

তাহলে.........?

আশ্চর্য বোধ করে ইউজিন। বিস্ময়-স্তব্ধ মনে কেবলি প্রশ্ন জাগে—

'তবে কিসের জন্যে.........?'

এর পর থেকে চলতে থাকে ক্রমাগত ঐ একই ভাবনা। মনটা চাপা অসহিষ্ণুতায় পীড়িত হয়ে ওঠে খালি খালি। একদিন এমনি খামোকা, দানিয়েলের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটায় গিয়ে বসল ইউজিন। গল্প জুড়ে দিল বুড়োর সঙ্গে। বুড়ো তো গল্প পেলে আর কিছুই চায় না। এ কথায় সে কথায় এক সময়ে সোজাসুজি বলে ফেলল দানিয়েল—

"মাইকেল তো এই সেদিন আমায় জিজ্ঞাসা করছিল—'আচ্ছা, বাবু কি আমার বৌয়ের সঙ্গে সত্যিই আছেন?' আমি বললুম অত-শত জানি না। তবে, যদি বৌ তোমার নষ্টই হয়ে থাকে, তাহলে চাষীর চেয়ে মনিবের সঙ্গে হওয়াই ভাল।"

"তারপর? মাইকেল কি বললে......?"

"বললে—'রোসো—আর ক'টা দিন। জানতে ঠিক পারবোই একদিন না একদিন। তখন মজা টের পাইয়ে দেব মাগীকে......বলে' চুপ করে রইল।"

ইউজিন শুনে চুপ করে রইল। ভাবল—'স্বামী যদি ফিরে আসে—এসে গ্রামে বসবাস করে, তাহলে ছেড়ে দেব ওকে।'

কিন্তু মাইকেল থাকে শহরে। গ্রামে ফেরবার কোন লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তাই চলতে থাকে আগের মতন। সম্পর্ক ছিন্ন হয় না।

'দরকার পড়লেই ইতি করে দেওয়া যাবে। ওতে আর হাঙ্গামা কিসের? তখন ব্যাপারটা ধুয়ে-মুছে যাবে একেবারে—নিশ্চিহ্ন।'

এই ভেবে আর জল্পনা করে নিজেকে আশ্বস্ত করে ইউজিন।

ইউজিনের কাছে এটা অবধারিত সত্য। পরিণতি আর যথাকর্তব্য সম্বন্ধে সে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত। খতম একদিন করতেই হবে। এমনিই হয়ে যাবে। মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয় অস্বস্তিকর ভাবনাগুলো। চারদিকে তার কতো কাজ! সারাটা গ্রীষ্মকাল তার কেটে গেল যেন কোথা দিয়ে। মন আর দেহ নানান কাজে ব্যস্ত, ব্যাপৃত। এদিকে নতুন একটা গোলা-বাড়ি আর একটা নতুন মরাই তুলতে হল, ওদিকে ফসল-কাটা, ঝাড়াই-মাড়াইয়ের কাজ। দম নেবার অবকাশ নেই। তার ওপর দেনার দায়—সেগুলো একে-একে চুকিয়ে ফেলা, অকেজো পতিত জমিগুলো বিক্রি করে দেওয়া—এ সমস্ত কাজে আস্টেপৃস্টে জড়িয়ে গেল ইউজিন। সারাটা দিন জমি আর ঘর—এক চিন্তা, এক কাজ। ভোর বেলায় বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে রাত্তিরে ক্লান্ত দেহ নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়া পর্যন্ত একটুও ফাঁক নেই। অবসর মেলে না অন্য চিন্তার।

এই তো কাজ—আর এই নিয়েই তো জীবন। বাস্তব, সত্য।

স্টীপানিডার সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ—সম্পর্ক বলে সেটাকে চিহ্নিত করতে চায় না ইউজিন—সেটার দিকে নজর দেবার, মন ফেরাবার সময়ই পাওয়া যায় না। অবিশ্যি এটা সত্যি যে, স্টীপানিডাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা, তার কাছে যাবার ইচ্ছা যখন জেগে উঠত ইউজিনের, অস্থির হয়ে পড়ত সে। এমন জোরে, এমন আকস্মিকভাবে সে দুর্বার কামনা এসে তাকে নাড়া দিয়ে যেত, রীতিমত ধাক্কা দিয়ে যেত যে, ইউজিন সামলাতে পারত না নিজেকে সেই সময়ে। অন্য কোনও চিন্তাই তখন আর মগজে ঢুকত না। উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় সে ছটফট করত, উন্মথিত হৃদয় আর কামনা-ক্লিষ্ট শরীরটাকে নিয়ে সে যে কি করবে, তা ভেবে ঠিক করতে পারত না। তবে এই অবস্থা, এই মনোভাবটা বেশি দিন ধরে থাকত না—এই যা রক্ষে। একটা ব্যবস্থা করে নিত ইউজিন—কোন একটা দিন সুযোগ-সুবিধামত কাছে পেত স্টীপানিডাকে। তারপর......দিনের পর দিন, সপ্তাহ ভোর কেটে যেত—এমনকি, মাসাবধিকাল পেরিয়ে যেত। ইউজিনের আর

চাহিদা থাকত না, ভুলে যেত স্টীপানিডার কথা।

শরৎকাল এসে পড়ল। ইউজিন এই সময়টা প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে যেত শহরে। যাতায়াতের ফলে অ্যানেনস্কি নামে এক পরিবারের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হল। ক্রমে সে পরিচয়টা দাঁড়াল অন্তরঙ্গ বন্ধুতায়। অ্যানেনস্কি-পরিবারের একটি মেয়ে ছিল। 'ইনস্টিটিউট' থেকে সবে সে বেরিয়েছে। বড়-লোক আর অভিজাত জমিদার বাড়ির মেয়েদের জন্যে বোর্ডিং-স্কুল গোছের প্রতিষ্ঠান হল এই ইনস্টিটিউট। সেখানে ছাত্রীদের চাল-চলন, বেশ-ভূষা, সামাজিক শিষ্টাচার প্রভৃতি কায়দা-কানুনের দিকেই নজর দেওয়া হয় বেশি। এমনতর প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা শেষ করে মেয়েটি ফিরেছে। তাই ইউজিন যখন লিজা অ্যানেনস্কায়ার সঙ্গে প্রেমে পড়ল, আর তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে বসল, তখন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। কিন্তু দুঃখ পেলেন সবচেয়ে বেশি ইউজিনের মা। ব্যাপার দেখে মেরী পাভলোভনা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। স্বপ্নভঙ্গের আঘাতে তিনি ভাবলেন, ইউজিন নিজেকে এতোখানি খেলো করল কি করে!

এই সময় থেকেই এধারে স্টীপানিডার সঙ্গে ইউজিনের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হল।

(৫)

ইউজিন কেন যে এতো দেশ আর এতো মেয়ে থাকতে লিজা অ্যানেনস্কায়াকেই পছন্দ করে বসল—তার উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

কোন পুরুষ যখন একটি বিশেষ মেয়েকে পছন্দ করে, স্ত্রীভাবে নির্বাচন করে, তখন তার কারণ খুঁজে বার করা শক্ত। কারণ অবিশ্যি ছিল এই ক্ষেত্রে—কয়েকটা স্বপক্ষে, কয়েকটা বিপক্ষে।

প্রথম কারণ হল—লিজা ধনীর ঘরের উত্তরাধিকারিণী কন্যা নয়, আদরের দুলালীও নয়, ইউজিনের মা যা একান্ত মনেই কামনা করেছিলেন। আরেকটি কারণ হচ্ছে—লিজা সরল প্রকৃতির মেয়ে, ছলা-কলার ধার ধারে না। লিজার মা মেয়েকে যেভাবে চালান, তাতে মেয়ের প্রতি সহানুভূতি হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া, লিজা এমন কিছু চটকদার সুন্দরী নয়, যাতে সকলের চোখ পড়ে তার ওপরে। সাদা-মাটা চেহারা, তবে দেখতে এমন কিছু খারাপও নয়—এই পর্যন্ত। কিন্তু লিজাকে ইউজিন যে পছন্দ করল, তার প্রধান কারণ হল এই—লিজার সঙ্গে তার আলাপ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল এমন একটা সময়ে যখন ইউজিন বিয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। মনে-মনে সাংসারিক এবং গার্হস্থ্য-জীবনের জন্যে সে তখন তৈরি হয়ে উঠেছে। বিয়ে-করা দরকার এবং বিয়ে করবো—এই জেনে আর ভেবেই ইউজিন প্রেমে পড়ল, জানালো তার প্রস্তাব।

প্রথমটা শুধু ভালো-লাগার পালা। অর্থাৎ লিজা অ্যানেনস্কায়াকে দেখতে এমনি বেশ ভালো লাগত ইউজিনের। তারপর ক্রমশ সেই ভালো-লাগার ফিকে ভাবটা গাঢ় হয়ে জমতে লাগল। যখন লিজাকে স্ত্রী-হিসেবে গ্রহণ করাই স্থির করল ইউজিন, তার প্রতি মনোভাবটা সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হতে লাগল। রূপান্তরিত হল হৃদয়ের গভীরতর আকর্ষণে। ইউজিন বুঝল—এটা প্রণয়। লিজাকে সে ভালোবেসেছে।

লিজার আকৃতি হল দীর্ঘ, ছিপছিপে ও পাতলা। তার শরীরে সব কিছুই একটু পাতলা আর লম্বাটে ধাঁচের। তার মুখের গড়ন, তার নাক উঁচু না হয়ে যেভাবে নীচের দিকে নেমে এসেছে, তার আঙুলের ডগা ও পায়ের পাতা—সমস্ত অবয়বই পেলব এবং দীঘল। মুখের রংটায় কিসের যেন সূক্ষ্ম আভাস—ফিকে-হলদে শাদায় মেশা আর তারি সঙ্গে লালচে গোলাপী। চুলগুলি বেশ লম্বা, ঈষৎ বাদামি রঙের। নরম আবার কোঁকড়ানো। আর চোখ দুটি তার সত্যিই সুন্দর—পরিষ্কার দীপ্তি ও মধুর আবেশে উজ্জ্বল। নম্র তার চাউনি, কোমল দৃষ্টিতে অনুমান ও বিশ্বাস-প্রবণতার স্পর্শ।

এই হল লিজার শারীরিক কাঠামোর বর্ণনা, তার বাহ্য আকৃতির পরিচয়। যেটা ইউজিন চোখের সামনে সর্বদাই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু তার আত্মার খবর—অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত মনের সংবাদ? সে সম্বন্ধে ইউজিন কিছুই জানে না—বলতে পারে না। কেবল দেখতে পায় তার চোখ দুটি। সে দৃষ্টিতে জবাব পেয়ে যায় ইউজিন। মনের গোপন কোণে যা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে তার, সব প্রশ্নের ইঙ্গিত-সমাধান মিলে যায় যেন লিজার চোখে। আর সে চোখের দৃষ্টি, তার বৈশিষ্ট্য ও অর্থ হল এই:

লিজা যখন ইনস্টিটিউটের ছাত্রী হিসেবে বোর্ডিং-স্কুলে থাকত, বয়েস আন্দাজ পনেরো—তখন থেকেই সে ক্রমাগত প্রেমে পড়ছে। সুপুরুষের আকর্ষণ ছিল তার কাছে অত্যন্ত গভীর। প্রেমে না পড়লে তার সুখ হত না—প্রণয়াস্পদের চিন্তাতেই তার শান্তি, উত্তেজনা, জীবনের আনন্দ আর সার্থকতা। ইনস্টিটিউট ছেড়ে যখন লিজা বাড়ি ফিরল, তারপর থেকে যত যুবা পুরুষের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়, দেখা-শোনা হয়েছিল, সকলের সঙ্গেই ঠিক একইভাবে সে প্রেমে পড়তে লাগল। কাজেই ইউজিনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া মাত্রই, লিজা তাকে ভালোবেসে ফেলল। অনবরত প্রেমে পড়ে পড়ে আর ভালোবাসার উদ্বেল ঢেউয়ের ওপর নিত্য ভেসে থাকতে থাকতে তার চোখ দুটিতে ভেসে উঠল এমন একটা বিশেষ ধরণের দৃষ্টি, একটা টল্‌টলে ভাসা-ভাসা চাউনি—যে ইউজিন তাতেই মজল, ডুবল এবং জড়িয়ে গেল নিথর চোখের দীঘল পালকের জালে।

এই শীতকালেই, ইতিমধ্যে লিজা দু জায়গায় প্রেমে পড়েছে। দু' জায়গায় এবং একই সঙ্গে। যুগবৎ দুটি যোগ্য পাত্রে হৃদয় দানের ফলে সময়টা কাটছিল লঘুর্মি নদীর একটা স্রোতের মতই। দুজনেই সুদর্শন যুবক। তারা কাছে এলেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠত লিজা। তারা ঘরে ঢুকলেই উত্তেজনায় বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে উঠত। এমন কি তাদের নামোল্লেখ মাত্রেই শুরু হত লিজার হৃদয়-চাঞ্চল্য।

কিন্তু পরে, লিজার মা একদিন সুযোগ বুঝে ইঙ্গিত করলেন মেয়েকে। বললেন, আর্তেনিভ পাত্র হিসেবে কিছু ফেলনা নয়। উপরন্তু তার উদ্দেশ্য সৎ। প্র্যাকটিক্যাল লোক, বিবাহ করাটাই তার সত্যিকারের অভিপ্রায়। অমনি লিজা স্থির, ধীর ও গম্ভীর হয়ে গেল। ইউজিন আর্তেনিভের প্রতি শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় তার মন পূর্ণ হয়ে উঠল। ভালোবাসতে শুরু করল ইউজিনকেই। প্রণয়ের মাত্রা ও গভীরতা বাড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। অবশেষে লিজা তার পরম অনুরক্ত ভক্ত হয়ে উঠল। পূর্ববর্তী দুজন প্রণয়াস্পদের প্রতি তার আকর্ষণের জোর গেল কমে—ক্রমশ সেটা দাঁড়াল শিথিল উদাসীন মনোভাবে। এর পরে যখন ইউজিন হামেশাই অ্যানেনস্কি পরিবারে যাতায়াত করতে লাগল, ঘন ঘন আসতে শুরু করল তাদের বল্‌-নাচে আর পার্টিতে তখন লিজার উত্তেজনাও বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে। ইউজিন তাদের বাড়ি এসে তারই সঙ্গে কথা কয়, নাচে যোগ দেয় বেশী করে,—জানতে চায় লিজা তাকে ভালোবাসে কি না, তারি পিছু-পিছু ঘোরাফেরা করে। এ সমস্ত দেখেশুনে লিজার প্রেমও গভীর ও গাঢ় হয়ে উঠল। শুরু হল শয্যা কণ্টক, মানসিক ছটফটানি—পুলকেরই আনুষঙ্গিক, অকারণ বেদনা। নিদ্রায় আর জাগরণে লিজার মনে ঐ এক চিন্তা—ইউজিন। ঘুমিয়ে তার স্বপ্ন দেখে, আবার জেগে জেগেও তাকে দেখতে পায়। অন্ধকার ঘরে বসে চোখ মেলে লিজা যেন স্পষ্ট দেখতে পায় ইউজিনকে। আর অন্য সব মানুষ ভেসে যায়—সব কথা ভুলে যায়। অস্পষ্ট, অদৃশ্য হয় আশ-পাশের জিনিস। কেবল একটি মানুষ। হৃদয়কে ঘটাকাশে স্ফীতালোকের মধ্যবর্তী যেন একটিই মানুষ—উজ্জ্বলতম বিন্দু হয়ে ফুটে থাকে...ভাস্বর, অম্লান।

তারপর যখন ইউজিন বিয়ের প্রস্তাব জানালো, তখন উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তারা বাগ্‌দত্ত হল। পরস্পর চুম্বন করে তারা আবদ্ধ হল পবিত্র চুক্তিতে। সবাই জানল

তাদের 'এনগেজমেণ্টের' কথা। এর পর থেকে লিজার মনে ইউজিন ছাড়া আর দ্বিতীয় চিন্তা রইল না। ইউজিনের সঙ্গ ছাড়া আর কারুর সংসর্গ ভালো লাগত না তার। ইউজিনকে ভালোবাসা আর তার ভালোবাসার প্রতিদান পাওয়া ছাড়া লিজার মনে আর অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। ইউজিনের প্রেম-স্পর্শ-ধন্যতাই তার জীবনের একান্ত কামনা হয়ে দাঁড়ালো।

ইউজিনকে নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করল লিজা। শুধুই ভাবিষ্য-পতিগত-প্রাণ হয়ে সে ক্ষান্ত রইল না। ইউজিন সম্বন্ধে তার অস্বাভাবিক গর্ব। নিজের আর বাগ্‌দত্ত স্বামীর কথা, উভয়ের প্রণয়-স্বপ্নে সে একাই বিভোর হয়ে উঠল। হৃদয় হল ভাব প্রবণ। প্রীতির সুধারসে অতি সিক্ত হয়ে যেন থেকে থেকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে লিজা। আবেগের আতিশয্য এক এক সময়ে যেন সহন-সীমা লঙ্ঘন করে যায়......স্বপ্নের ঘোর আর কাটতে চায় না......

যত দিন যায়, তত প্রেম বাড়ে। ইউজিন লিজাকে যত চিনতে থাকে, ততই মুগ্ধ হয়ে যায়। এতোখানি প্রেম যে একটি ছোট বুকের ভিতর বাসা বেঁধে আছে তারি জন্যে, সে কথা সে ভাবতেও পারে নি। এ যেন অপ্রত্যাশিত প্রণয়ের বন্যা। আরেক জনের ভালোবাসার দৃঢ়তায় সরল সহজ বিশ্বাসে আর বিকাশে নিজের ভালোবাসাও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

(৬)

শীতকাল কাটল এই ভাবে। বসন্ত এসে পড়ল। আর বসে থাকলে চলে না।

ইউজিন বেরিয়ে পড়ল কাজের তাগিদে। সেমিয়োনভ্‌ তালুকটা একবার ঘুরে আসা দরকার। কি হচ্ছে না হচ্ছে ওদিকটায়—দেখা উচিত। নায়েব-গোমস্তা আমলাদের সাক্ষাতে একটু উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন, মহালের কাজ ভালোমত চলছে কিনা, তদারক করা উচিত। তা ছাড়া ওখানকার পুরানো কুঠীটা অসংস্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে বহু দিন। এদিকে বিয়ের দিন এগিয়ে এল। এবারে কুঠীটাকে ঝালিয়ে মেরামৎ করতে হবে, বিয়ের আগেই সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেলতে হবে।

মেরী পাভলোভ্‌নার মনে কিন্তু শান্তি নেই, সন্তোষ নেই। অপ্রসন্নচিত্ত খুঁৎখুঁৎ করছে সর্বদাই ছেলের পছন্দের বহর দেখে। আজীবন সঙ্গিনী হিসেবে ইউজিন যাকে নির্বাচন করল, মেরী তাকে পুরোপুরি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছেন না। ছেলের ভবিষ্যৎ, তার বিবাহ সম্বন্ধে কত উজ্জ্বল স্বপ্ন আর আশা তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেল! বিয়েটা যতোখানি তাক্‌-লাগানো ব্যাপার হবে বলে আঁচ করে রেখেছিলেন, এ যেন তার কাছে কিছুই নয়। নেহাৎই মিইয়ে-যাওয়া একটা ঘটনা, আর দশজনের বৈচিত্র্যহীন জীবনে যেটা হামেশাই ঘটছে। খুঁৎখুঁতুনির আরো একটা কারণ ছিল মায়ের মনে। ছেলের বিয়ে একটা মস্ত বড় ঘটনা—জাঁক-জমক আর আড়ম্বরে পূর্ণ এবং সার্থক হয়ে উঠল না—সে আক্ষেপ তো ছিলই। উপরন্তু ইউজিনের শ্বাশুড়ী-ভাগ্যে তিনি আনন্দিত হ'তে পারলেন না। ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না মোটেই তাঁকে সন্তুষ্ট এবং প্রীত করতে পারেন নি। ইউজিনের শ্বাশুড়ী হিসেবে তাঁকে মনোনীত করা চলে না। নিজের থাকের লোক নন্। আগামী দিনের সম্পর্ক ধরে তাঁকে সমস্তরের শ্রদ্ধা বা বিবেচনায় আপ্যায়িত করতে মন তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে। (ক্রমশ)

ইশ্‌তাহার

সমীর ঘোষ

"আজ ভারতের চতুর্দিকে বিপদ ঘনায়মান"
—পণ্ডিত নেহরু

সার্ধ শতাব্দীব্যাপী তমসার দুশ্ছেদ্য আবরণ
মনের চোখে অপরিহার্য চশমার মতো
অঙ্গাঙ্গী হোয়ে বসেছিল।
দুর্মদ আঘাতে চশমার সেই পাথুরে কাঁচ
টুকরো টুকরো হোয়ে ভেঙে পড়লো।
এলো আলোক বন্যা,
ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ্‌ নীল চক্রে বেগবান হোয়ে
কালো আকাশের ঈথারে
ছড়িয়ে গেল রামধনুর ঔজ্জ্বল্য ঃ
আমরা স্বাধীন।

সমান্তরাল রেখায় রেলপথ হাজার হাজার মাইল
বিস্তারিত হোয়েছে।
তার কোনো লাল-ইট-বাঁধানো স্টেশন হোতে
পায়েচলা পথ শেষ হোল কোনো গ্রামে।
অধিবাসীরা সংবাদ পেলো ঃ আজ তারা স্বাধীন।
যে সংবাদ এনেছিল,
হাটের মাঝখানে সকলের কেন্দ্রবিন্দু হোয়ে
সে দাঁড়ালো,
আর তাকে লক্ষ্য করে সম্মিলিত প্রশ্ন বর্ষিত হোল ঃ
আমরা স্বাধীন?—তাহোলে কি প্রচুর তণ্ডুল
আমাদের অর্ধাশনের সমাপ্তি ঘটাতে আসছে,
আসছে কি দুর্লভ পরিধেয়
আমাদের শিশুর অঙ্গ আচ্ছাদিত করতে,
রক্ষা করতে নারীর সম্মান।

দিন গেল—মাত্র মুষ্ঠিগত কয়েকটি দিন ঃ
নিরবধি কালের রাজপথে যাদের অভিযাত্রার কোনো স্বাক্ষর
হয়তো কোনো বিন্দুতম রেখায় থাকবে না।
সেই নীলচক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা—
তারি নীচে দেখা গেল সেই নেতাকে ঃ
যাঁর শপথ ছিল স্বদেশবাসীকে
মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা।
বেদনাহত কণ্ঠে সতর্কবাণী উচ্চারিত হোল ঃ
ঘনঘটায় বিপদের ঝঞ্ঝা আমাদের অগ্রগতি
প্রতিহত করতে সমুদ্যত ঃ
স্বাধীনতা হয়তো ক্ষণস্থায়ী হবে।

বেতারে তরঙ্গ বিস্তারিত হোয়ে, মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত হোয়ে
এই সতর্কবাণী প্রচারিত হোল
দেশের নগরে নগরে—মনুষ্যবসতির স্নায়ুকেন্দ্রে।
সেই দুর্গম পায়েচলা পথের প্রত্যন্তগ্রামে
একদিন এই সংবাদ পোঁছালো।
অস্তদিগন্তে সূর্যের কোনো আলো, কোনো রঙ্‌
তখন আর বিকিরিত নয়—
হাট ভেঙে গেছে।
ধূলিধূসরিত পায়ে শ্রমিকরা ঘরে প্রত্যাবর্তন করলো,
পরিজনবর্গকে কাছে ডেকে নিয়ে শোনালো ঃ
তণ্ডুল পাওয়া যাবে না,
শিশুর অঙ্গ আচ্ছাদিত করতে,
নারীর মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখতে
পরম প্রার্থিত পরিধেয় আসবে না
—আমরা স্বাধীনতা হারাচ্ছি।

ব্র্যাডম্যান

ক্রিকেট খেলায় ব্র্যাডম্যানের নাম সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। তাঁর া এত_বেশী 'রান' কেউ তুলতে পারেনি। মতো সুনিপুণ শিল্পীও ক্রিকেট জগতে ল। ১৯২৭ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র বৎসর তখন থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীর কেট খেলে আসছেন। তখন তিনি নিউ উথ ওয়েলসের হয়ে খেলতেন এবং সেই নরই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাডিলেডে র প্রথম শতাধিক রান করেন। তাঁকে বলা "আশ্চর্য ব্যাটসম্যান।" কথাটায় অত্যুক্তি ই। সর্বাধিক রানে পৃথিবীর রেকর্ড সংখ্যা া ৪৫২ এবং এই গৌরব ব্র্যাডম্যানের। ১৯২৯ লে কুইন্সল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি এই রান-খ্যা তোলেন 'আউট' না হয়ে।

তিনি ছয়বার ৩০০র ওপর রান তুলেছেন -৪৫২ (নট আউট), ৩৬৯, ৩৫৭, ৩৪০ (নট উট), ৩৩৪ এবং ৩০৪। এর মধ্যে দুবার তিন শতাধিক রান করেছেন টেস্ট ম্যাচে। ৯৩০ সালে ৩৩৪ আর ১৯৩৪ সালে ৩০৪ র দুবারই ইংলন্ডে লীডসে। প্রথমবার লীডসে যখন তিনি ৩৩৪ রান তোলেন তার ধ্যে ৩০৯ রান এক দিনেই তোলেন এবং সেই নই লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী করেন। ২৭৩ রানের মাথায় তিনি আউট হবার একবার মাত্র সুযোগ দিয়েছিলেন। ইংলন্ডের হাটন অবশ্য টেস্ট ম্যাচে এই রান সংখ্যা অতিক্রম করে ৩৬৪তে পৌঁছেন; কিন্তু তফাৎ হল ব্র্যাডম্যানের যে রান তুলতে সাড়ে ছয় ঘণ্টা লেগেছিল সেখানে হাটনের লেগেছিল প্রায় তিন দিন। লাঞ্চের পূর্বে আর দুজন মাত্র অস্ট্রেলীয় সেঞ্চুরী করেছিলেন, একজন হলেন ভিক্টর ট্রাম্পার অপরজন সি জি ম্যাকার্টনে। এটা অবশ্য টেস্টম্যাচের কথাই বলছি। টেস্ট ম্যাচে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে তিনি আটবার দ্বিশতাধিক রান করেছেন, ৩৩৪, ৩০৪, ২৭০, ২৫৪ ২৪৪, ২০২, ২১২ এবং ২৩৪। টেস্ট ম্যাচে তিনি পর পর ছয়বার সেঞ্চুরী করেছিলেন এবং এক বৎসর পাঁচটি টেস্ট ম্যাচে মোট ৯৭৪ রান করেছিলেন। এখানে ব্র্যাডম্যানের বহু রেকর্ডের মধ্যে মাত্র কয়েকটির কথা বলা হল।

ব্র্যাডম্যানের জন্মস্থান নিউ সাউথ ওয়েলসে, ১৯০৮ সালের ২৭শে অগস্ট। তাঁর জন্ম-স্থানের নাম কুটামুন্ড্রা।

শ্রীযুত ও শ্রীমতী অ্যামেরিকা

গত যুদ্ধের পর থেকে আমরা নানা কারণে অ্যামেরিকা সম্বন্ধে একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। অ্যামেরিকা বলতে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইউ এস একেই বুঝি। এখন একজন সাধারণ মার্কিনের খোঁজ নেওয়া যাক্।

এপার ওপার

শ্রীযুত মার্কিন গড়ে ৫ ফিট ৯ ইঞ্চি লম্বা, ওজন ১৫৮ পাউন্ড, দুমাইল অফিস যেতে ১৫ মিনিট ব্যয় করেন, মাঝে মাঝে জুয়া খেলেন এবং জেতা অপেক্ষা হারার কথাই বেশী বলেন। ৬।৷০ অংশ কৃষ্ণকেশী পছন্দ করে ৩।৷০ অংশ সোনালীকেশী আর বাকি লালকেশী নারী পছন্দ করে। তিনি মনে করেন আইবুড়ো অপেক্ষা বিবাহিতেরা সুখী। তাঁর মতে স্ত্রীর সৌন্দর্যটাই প্রধান গুণ অথবা আকর্ষণ নয়; বুদ্ধি, সংসার চালাবার কৌশল এবং সঙ্গ দেওয়াই হল স্ত্রীর আসল গুণ। তিনি আরও মনে করেন যে নারীরা বড় ছিদ্রান্বেষী হয় আর নারীরা মহিলা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে।

শ্রীমতী মার্কিন গড়ে ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি লম্বা, ওজনে ১৩২ পাউন্ড, ব্যায়ামের জন্য বেড়ায়, সাঁতার কাটে, মজা করবার জন্য তাস খেলে, সে মনে করে সে তার স্বাস্থ্য রক্ষা করবার জন্য বড় বেশী খাচ্ছে। সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বামীকে সাহায্য করতে চায় এবং চাকরী অথবা ব্যবসায় অপেক্ষা বিবাহ বেশী পছন্দ করে। স্বামীর সঙ্গে সমান আসন সে দাবী করতে চায়। স্বামীর ঠাণ্ডা মেজাজ, বিবেচনা আর দয়ালুতা সে খুব পছন্দ করে। সে আশা করে যে, তার সঙ্গে স্বামীও পুত্রকন্যাদের সমান দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

মার্কিন জনসাধারণের মতে বিবাহিতদের বয়স যথাক্রমে ২৫ ও ২১ হওয়া উচিত এবং সপ্তাহে অন্তত ৫০ শিলিং আয় না হলে বিবাহ করা উচিত নয়। দীর্ঘ কোর্টসিপে এদের বিশ্বাস আছে এবং বিবাহের পূর্বে রক্ত পরীক্ষা প্রয়োজনীয় বলেই মনে করে। বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন শিথিল করা এরা পছন্দ করে না, কলেজে যৌনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা স্বীকার করে। ছেলেমেয়ে বদ হয়ে গেলে তারা মনে করে দোষটা পিতামাতারই। রাজনীতি অপেক্ষা ছেলেদের কোনো কার্যকরী বিদ্যাশিক্ষা তারা বেশী পছন্দ করে। ছেলে ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার অথবা কৃষিবিদ হওয়াটাও তারা ভাল বলে মনে করে। সাধারণ মার্কিন স্ত্রী ও পুরুষ রাত্রি দশটায় ঘুমতে যায় আর ওঠে সকাল সাড়ে ছটায়; কিন্তু শনিবার শুতে ও উঠতে আরও দেরী হয়। তারা এই দেশগুলি পর পর বেড়াতে ইচ্ছা করে যথা; ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, ইটালী, সুইজারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং নরওয়ে। নিজেদের দেশে হলে তারা সর্বপ্রথম যেতে চায় ক্যালিফর্নিয়া, ফ্লোরিডা, নিউ ইয়র্ক এবং টেক্সাস।

গোদাবরী তীরে প্রাগৈতিহাসিক নগর

হায়দরাবাদ শহর থেকে প্রায় দুশো মাইল পূর্বে গোদাবরী নদীতীরে ওয়রঙ্গল জেলায় এক প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগরীর সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। জায়গাটির নাম পালিচৌটি চেরুগুড়া; একটি নীচু পাহাড়, ঘন জঙ্গলে ঘেরা। সেখানে প্রায় এক হাজার অসংস্কৃত পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ পাওয়া গেছে। আসল নগরটি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, তবে আশা করা যাচ্ছে যে, কাছাকাছি কোথাও নগরটিও পাওয়া যাবে।

১৯৩৮ সালে জনৈক মিঃ ওয়েকফিল্ড প্রথমে একটি স্মৃতিস্তম্ভ সরিয়ে সমাধির মধ্যে প্রবেশ করেন। পরে নিজাম সরকারের পুরাতত্ত্ববিদ খাজা মহম্মদ আহমেদ এ বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাঁর মতে এই সমস্ত সমাধিগুলি সিন্দুক রূপে ব্যবহৃত হত। একটি সমাধি থেকে একটি তিন ফিট লম্বা বর্শা ফলক পাওয়া গেছে এবং অপর দুএকটি থেকে ছুরি ও কোদাল পাওয়া গেছে; এ থেকে মনে হয় যে, তারা ধাতু ঢালাইয়ের কাজে অভিজ্ঞ ছিল। সমাধির স্মৃতিস্তম্ভের পাথরগুলি যেরূপভাবে কাটা হয়েছে তাতে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বংশধরেরা আদিবাসীরূপে এইসব অঞ্চলে এখনও বাস করছে। তাদের স্থানীয় নাম রেড্ডি।

নূতন ছবির পরিচয়

চন্দ্রশেখর—পাইওনীয়ার পিকচার্সের প্রথম চিত্র নিবেদন। **বঙ্কিমচন্দ্রের** কাহিনী **অবলম্বনে পরিচালক দেবকীকুমার বসু কর্তৃক বাণীচিত্রে রূপান্তরিত। সঙ্গীত পরিচালনা : কমল দাশগুপ্ত। ভূমিকায় : অশোক কুমার, কাননদেবী, ভারতী দেবী, ছবি বিশ্বাস, অমর মল্লিক প্রভৃতি।**

চন্দ্রশেখর চিত্রখানি বাঙলার ছায়াচিত্র জগতে একটা যুগান্তর আনতে পারবে—এরূপ একটা বিশ্বাস বাঙলার বহু চিত্রামোদীর মনেই দেখা দিয়েছিল। এরূপ বিশ্বাসের মূলে কারণও অবশ্য ছিল। প্রথমত বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি বহু-বিখ্যাত উপন্যাসকে ভিত্তি করে এই চিত্র গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ চিত্র-নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছিলেন যে, এই চিত্র নির্মাণে অর্থব্যয়ের ত্রুটি তাঁরা করেননি। তৃতীয়তঃ ভারতের একজন বহুবিখ্যাত চিত্রপরিচালকের হাতে এই চিত্র নির্মাণের ভার ছিল। চতুর্থতঃ বাঙলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীর একত্র সমাবেশ ঘটেছে এই চিত্রে। দুঃখের বিষয়, এই বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও 'চন্দ্রশেখর' প্রকৃত কলারসিক ও বঙ্কিমানুরাগী দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, সাধারণ দর্শকদের কাছে চন্দ্রশেখর জনপ্রিয় হবে।

উল্লিখিত উক্তির মধ্যে কেউ কেউ হয়ত পরস্পর-বিরোধিতার সন্ধান পাবেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, এর মধ্যে আদৌ কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর' যাঁরা পড়েননি, তাঁরা এই চিত্রখানি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারবেন। যাঁরা 'চন্দ্রশেখর' পড়েছেন তাঁদের কাছে বাণীচিত্রের 'চন্দ্রশেখর' হয়ে দাঁড়াবে কতকটা পীড়ার কারণ। বাণীচিত্রে রূপান্তরিত করতে গিয়ে পরিচালক দেবকী-বাবু এমনভাবে কাহিনী, ঘটনা সংস্থান ও চরিত্রকে পরিবর্তিত করেছেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বঙ্কিমানুরাগী দর্শকদের মনে রীতিমত বিরূপতার সৃষ্টি হয়। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির হাত থেকে বোধ হয় মুক্তি পাবার জন্যেই বলা হয়েছে যে, "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস অবলম্বনে বাণীচিত্রাকারে রূপায়িত।" কিন্ত এই 'অবলম্বনে' কথাটা লাগালেই চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও চিত্র-নির্মাতা প্রতিষ্ঠান দায়মুক্ত হতে পারেন না। আমাদের মনে হয় এভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের

কাহিনীকে বিকৃত করে চিত্রে রূপান্তরিত করার চেয়ে তাঁর কাহিনী গ্রহণ না করাই ছিল সব দিক থেকে ভাল। সিনেমার জন্যে চিত্র-নাট্যরচনায় চিত্রনাট্যরচয়িতার যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকা দরকার একথা স্বীকার করে নিলেও স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচার সমর্থন করা চলে না। চন্দ্রশেখরের চিত্রনাট্য রচনায় বঙ্কিম-চন্দ্রের কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে যথেচ্ছাচার করা হয়েছে—একথা আমাদের দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয়।

চন্দ্রশেখর চিত্রের নায়ক-নায়িকা অশোক-কানন

মূল উপন্যাসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্জন করে চিত্রনাট্যকার প্রতাপ ও শৈবলিনীর রোমান্সকেই দর্শকদের চোখের সামনে বড় করে তুলে ধরেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে তিনি চন্দ্রশেখরের মত বিরাট চরিত্রকে করে তুলেছেন গুরুত্ববর্জিত, দলনী বেগমের আদর্শোজ্জ্বল আত্মবিসর্জনকে বাদ দিয়েছেন, যে সুন্দরী চরিত্র মূল উপন্যাসে অপরিহার্য তাকে নির্মম হাতে ছেঁটে বাদ দিয়েছেন, চন্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ স্বামীকে করেছেন অবহেলা। এই রোমান্স পরিবেশনের মোহে পড়ে তিনি অনেক বিকৃত তথ্যেরও সন্নিবেশ করেছেন। মূল কাহিনীতে আছে যে, প্রতাপ অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। পরজীবনে সে যা কিছু অর্থসামর্থ্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল তার সব কিছু হয়েছিল উদার-হৃদয় চন্দ্রশেখরের দয়ায়। চন্দ্রশেখর নবাব মীরকাশিমের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনিই নবাবকে ধরে প্রতাপের জমিদারী করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবিতে দেখানো হয়েছে যে, প্রতাপের পিতা নবাব দরবারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং নবাব মীরকাশিম নিজে ডেকে এনে প্রতাপকে গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। অথচ মূল উপন্যাসে দেখা যায় যে, মীরকাশিম প্রতাপকে চিনতেনও না। তা ছাড়া প্রতাপের ফাঁসির ব্যবস্থা, আমিয়েটের সঙ্গে প্রতাপের ডুয়েল লড়া প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে চিত্রনাট্যকারের কল্পনা-প্রসূত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মীর কাশিমের উদয়নালার যুদ্ধ মূল উপন্যাসে একটি কেন্দ্রীয় ঘটনা। কিন্তু আলোচ্য চিত্রে উদয়নালার যুদ্ধ আদৌ দেখানো হয়নি—তার বদলে অবান্তর ঘটনাগুলোকে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। গুরগন খাঁ ও দলনী বেগম ভ্রাতা-ভগ্নী ছিলেন এবং দলনীর প্রতি গুরগন খাঁর কোনরূপ দুর্বলতা ছিল এ ইঙ্গিত উপন্যাসে কোথাও নেই। নবাবের মুর্শিদাবাদ স্থিত নায়েব মহম্মদ তকি খাঁ দলনীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। চিত্রনাট্যকার গুরগন খাঁ ও মহম্মদ তকি খাঁকে এক করে এই প্রেমনিবেদন করিয়েছেন গুরগন খাঁকে দিয়ে। এই প্রকারের অসঙ্গতিতে গোটা চিত্রটাই ভরা।

প্রতাপ ও শৈবলিনীর চরিত্রের প্রতিও যথোপযুক্ত মর্যাদা দেখানো হয়নি। এঁদের মধ্যে বাল্যপ্রেম ছিল সত্য—কিন্তু মূল উপন্যাসের আরম্ভ হল শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের বিয়ে হয়ে যাবার আট বৎসর পরে। তখন প্রতাপও বিবাহিত। যে যুগের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন সে যুগে বেশ কম বয়সে মেয়েদের বিবাহ হত—একথা ভুললে চলবে না। কিন্তু চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, শৈবলিনী বেশ বয়স্থা হবার পরও তার বিয়ে হয়নি এবং তখনও প্রতাপের সঙ্গে চলেছে তার প্রণয়-লীলা। উপন্যাসের প্রতাপ ছিল অত্যন্ত মহানুভব, উদার, নীতিজ্ঞানী ও চন্দ্রশেখরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আর শৈবলিনীর মনে বরাবর প্রতাপের জন্যে একটা প্রচ্ছন্ন কামনা থাকলেও, সেই কামনা পরে কিভাবে ঘটনা-সংঘাতে স্বামী চন্দ্রশেখরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে রূপান্তরিত হল তাই দেখানোই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। চিত্রে শৈবলিনীর এই রূপান্তর উপেক্ষিত হয়েছে এবং প্রতাপ তার নিজস্ব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে, হয়ে উঠেছে নিছক একজন প্রেমিক-নায়ক।

সোসিয়েশন) শ্রীযুত সত্যাকিঙ্কর সেন (ঐ), শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী (ঐ), মিঃ জে ই রবসন (স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা), ই জে হিউজেস (ইউরোপীয়ান স্কুল), ব্রাদার ডিলানী (ঐ), শ্রীযুত পি কে সাহা।

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানে বাঙলার মুষ্টিযুদ্ধ দল প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে নবগঠিত কর্মপরিষদ বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনকে উক্ত বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

ফুটবল

দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। এই খেলায় মোহনবাগান দল ১—০ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করিয়া ৩৬ বৎসর পরে শীল্ড বিজয়ীর সম্মানলাভ করিয়াছে। খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। তবে দর্শকের অভাব ছিল না। এই দিনে ২৮ হাজার টাকা প্রবেশমূল্য হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে।

মোহনবাগান দল সর্বপ্রথম ১৯১১ সালে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়। ইহার পর ১৯২৩ সালে ফাইনালে উঠিতে সক্ষম হয়, কিন্তু ক্যালকাটা দলের নিকট পরাজিত হয়। ১৯৪০ সালে পুনরায় ফাইনালে উঠিয়া এরিয়ান্স দলের নিকট পরাজয় বরণ করে। ১৯৪৫ সালেও ফাইনালে উঠিয়া ইস্টবেঙ্গল দলের নিকট পরাজিত হয়। দীর্ঘকাল পরে মোহনবাগান দল শীল্ড বিজয়ী হইল ইহা খুবই সুখের বিষয়। অসময় ও নানা গোলমালের পর শীল্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ খেলার ফলাফলে বিশেষ উত্তেজনা লাভ করেন নাই।

দেশী সংবাদ

১৭ই নবেম্বর—আচার্য কৃপালনী কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগ করায় গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহার স্থলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও কংগ্রেসের

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

বর্তমান গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য কমিটি নির্বাচন সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর অদ্য নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বর্তমান অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নয়াদিল্লীতে পুরাতন কেন্দ্রীয় পরিষদ ভবনে ভারতের সার্বভৌম আইন সভারূপে ...পরিষদের (আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত) প্রথম .ধিবেশন আরম্ভ হয়। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রীযুত জি ভি মবলঙ্কার স্পীকার নির্বাচিত হন।

...ত্রিপুরার মহারাণী গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ...রাজ্যের শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিবার জন্য একটি ...কমিটি গঠন করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী রাজ্যরত্ন ...এ ভি মুখার্জি উক্ত কমিটির সভাপতি হিসাবে প্র৽াজ করিবেন। স্টেট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের তিনজন মন্ত্রী ও শ্রীযুত ...মিনীকুমার দত্ত উক্ত কমিটির সদস্য।

এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সিকিম হইতে কলিকাতার জন্য প্রেরিত ৮০,০০০ মণ আলুর বীজ রেলযোগে দার্জিলিং হইতে আসার সময় রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে।

আচার্য কৃপালনী

কলিকাতা কর্পোরেশনের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন:—চেয়ারম্যান—কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত ফণিভূষণ চক্রবর্তী। সদস্যগণ:—আলিপুরের জেলা ও সেসন জজ শ্রীযুত এস এন গুহ আই সি এস এবং পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত এস কে মুখার্জি।

সুন্দরবন প্রজা মঙ্গল সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ব্রহ্মচারী ভোলানাথ গতকল্য সাতক্ষীরা মহকুমায় কালীগঞ্জ পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ময়মনসিংহের সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় সূর্যকান্ত হাসপাতালের নিকট এক অজ্ঞাত দুর্বৃত্তের রাইফেলের গুলীতে রমেশচন্দ্র দে নামক জনৈক দোকানী নিহত ও অপর তিনজন আহত হইয়াছে।

১৮ই নবেম্বর—গতকল্য রাত্রি দশ ঘটিকার সময় কলিকাতা হইতে ১২৯ মাইল দূরে পাকিস্থান অঞ্চলে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ঈশ্বরদী স্টেশনে ১১ আপ পার্বতীপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ও ৯ আপ নৈহাটী-সান্তাহার মালগাড়ীতে এক সঙ্ঘর্ষের ফলে ছয় ব্যক্তি নিহত ও ২১ জন আহত হয়।

কটকের এক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তর ময়ূরভঞ্জসহ উড়িষ্যার প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্যের সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

১৯শে নবেম্বর—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি পুলিশ ও জিলা কর্তৃপক্ষের সাহায্যে যেভাবে একোমোডেশন বিভাগ হিন্দুদের বাড়ী জোর করিয়া দখল আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে শহরের হিন্দুদের মনে গভীর ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। গত ১৬ই নবেম্বর বহু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ কয়েকজন একজিকিউটিভ অফিসারের নেতৃত্বে টিকাটুলী অঞ্চলে সাতটি হিন্দু বাড়ি চড়াও করিয়া ঐ সব বাড়ির অধিবাসী নরনারী ও শিশুদের জোর করিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দেয় এবং বাড়িগুলি তালাবদ্ধ করে।

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় সৈন্যদল নওশেরা পৌঁছিয়াছে এবং কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের সৈন্যদলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।

অদ্য হইতে দুই বৎসরের জন্য ঢাকা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির কার্য পরিচালনার জন্য একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

২০শে নবেম্বর—স্বাধীন ভারতের প্রথম রেলওয়ে বাজেট (১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ) অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতন বাবদ পূর্বাপেক্ষা ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে। উক্ত সময়ে মোট ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা মাশুল ও ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া এবং ১৯৪৭-৪৮ সালের সাধারণ রাজস্ব খাতে অর্থ সাহায্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে বাঙলার উত্তরাংশে একটি নূতন রেল লাইন প্রতিষ্ঠ

করিয়া আসামের সহিত সরাসরি যোগ স্থাপন করা হইবে।

চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলিতে অবাঞ্ছিত সংবাদ প্রচার নিরোধের জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের হস্তে যে একটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা বলবৎ রাখিবার জন্য সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে বিল উত্থাপন করেন, অদ্য নয়াদিল্লী ভারতীয় আইন সভায় তাহা গৃহীত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বীরভূম পল্লী সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা প্রার্থী শ্রীযুত শিবশঙ্করের
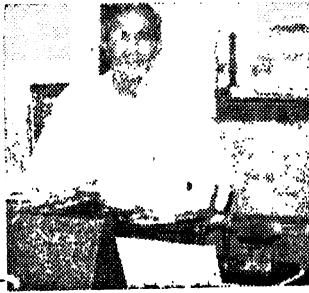
ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

মুখার্জিকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের শাসন কর্তৃপক্ষ লুণ্ঠন এবং নারী হরণের অপরাধে প্রাণদণ্ড দানের ব্যবস্থা করিয়া অদ্য অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

২১শে নবেম্বর—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর অদ্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সর্বপ্রথম অধিবেশন হয়। অধিবেশন আরম্ভ হইলে সর্বাগ্রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদগণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে পরিষদ মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেন। পরিষদে এই দিন শ্রীযুত ঈশ্বরদাস জালান ও শ্রীযুত আশুতোষ মল্লিক যথাক্রমে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। তাঁহারা কংগ্রেস দলের মনোনীত পদপ্রার্থী ছিলেন। দামোদর পরিকল্পনা সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নাসিকের সংবাদে প্রকাশ, নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে তাঁবু, বেতার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম বোঝাই বহু লরী মনমদে আটক করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, লরীগুলি হায়দরাবাদ রাজ্য অভিমুখে যাইতেছিল।

২২শে নবেম্বর—কাশ্মীর রাজ্য দেশরক্ষা বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় সৈন্যদল পুঞ্চ জেলার পর্বত ও অরণ্য সংকুল অঞ্চলে হানাদারদের উৎসাদনে ব্যাপৃত আছে। ভারতীয় সৈন্যদল সম্প্রতি বেরিপাট্টান শত্রুকবলমুক্ত করিয়াছে। জম্মু জেলায় অনুমান পাঁচশত সশস্ত্র হানাদার একটি ভারতীয় সৈন্যদলকে আক্রমণ করে।
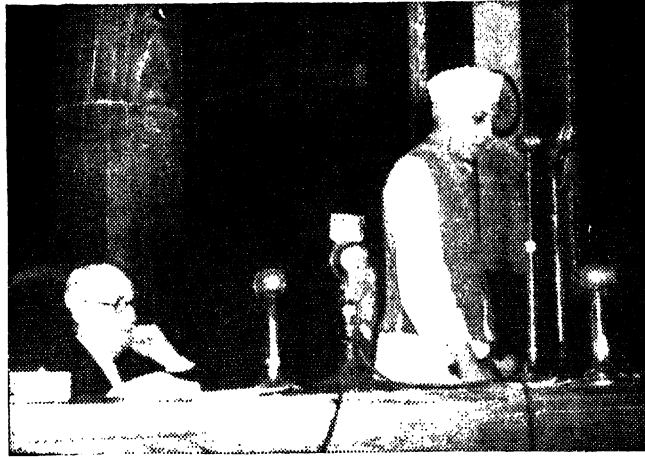
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের এসিয়ার আঞ্চলিক সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা দিতেছেন।

ভারতীয় সৈন্যদল হানাদারদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। হানাদারদের বহু লোক হতাহত হয়।

২৩শে নবেম্বর—জম্মু শহরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ আব্দুল্লা বলেন, "কাশ্মীরের মহারাজ আমাকে বলিয়াছেন যে, অস্ত্রের সাহায্যে শাসন পরিচালনার ইচ্ছা তাঁহার নাই। প্রেমের শাসনই তিনি চালাইতে চাহেন। প্রজারা যদি তাঁহার কর্তৃত্ব পছন্দ না করেন, তবে তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেও প্রস্তুত রহিয়াছেন।"

গতকল্য ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী সম্মেলন আরম্ভ হয়।

গোবরডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত ২৪ পরগণা জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বেসরকারী সেনাবাহিনী গঠন প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই নবেম্বর—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে ভারতবর্ষ যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, নিউইয়র্কে সম্মিলিত রাষ্ট্র রাজনৈতিক কমিটিতে তাহা ২৯—১৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

সোভিয়েটের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মঃ আঁদ্রে ভিসিনস্কি নিউইয়র্কে এক বক্তৃতায় মিঃ চার্চিল, যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রসচিব মিঃ জেমস বার্নেস ও জেনারেল দ্য গলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে বিপজ্জনক ভ্রান্ত ধারণা না করিয়া ইতিহাসের শিক্ষা স্মরণ করাই শ্রেয়ঃ। সোভিয়েট আমেরিকা সুহৃদ পরিষদের বৈঠকে এক ভাষণে মঃ ভিসিনস্কি বলেন, হিটলারের মত এই সকল রাষ্ট্রবিদ মনে করেন, রাশিয়াকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যাইবে। আমি তাঁহাদিগকে নেপোলিয়নের বিপর্যয়কারী 'মস্কো অভিযান হইতে ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলি।

২০শে নবেম্বর—রাজকুমারী এলিজাবেথ ও ডিউক অব এডিনবরা ফিলিপ ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বস্থান হইতে বহু আমন্ত্রিত ব্যক্তি লণ্ডনে ওয়েস্টমিনিষ্টার য়্যাবিতে বিবাহ উৎসবে যোগদান করেন।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী পল রামাদিয়েরের পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি ভিনসেণ্ট অরিয়ল অদ্য ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতা মঃ লিও ব্লুমকে প্রধান মন্ত্রীরূপে মনোনীত করিয়াছেন।

সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ অষ্ট্রিয়ার লোবাউ ীতন পরিশোধন কেন্দ্রটি দখল করায় বৃটেনের পক্ষ হইতে যে প্রতিবাদ জানান হইয়াছিল, রাশিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। বৃটেন, আমেরিকা ও ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ মিলিতভাবে এই পরিশোধন কেন্দ্রটির মালিক।

২২শে নবেম্বর—জার্মানী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য লণ্ডনে চারিটি বৃহৎ শক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের যে সম্মেলন হইতেছে, তাহার প্রাক্কালে জার্মানীস্থ সোভিয়েট মিলিটারী কম্যাণ্ডার মার্শাল সোকোলভস্কি মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদের বৈঠকে এক দীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করেন। উহাতে তিনি এই অভিযোগ করেন যে, পশ্চিম রাষ্ট্রসমূহ ইঙ্গ-মার্কিণ এলাকাগুলিকে একটি সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করিতেছে।

২৩শে নবেম্বর—পারস্য পার্লামেণ্ট তৈল প্রত্যাখ্যান করায় রুশিয়া ইহাকে বিরোধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই ইরাণীয়ান জেনারেল ষ্টাফের একজন সদ যে, পারস্যের উত্তর সীমান্তের প্রতি রক্ষা করা হইতেছে। সংগ্রাম ব্যতীত কে করিতে পারিবে না।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬॥০

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাময়িক বিজ্ঞাপন—৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জ্ঞাতব্য। সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন, অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

ঠিকানা:—আনন্দবাজার পত্রিকা
১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

পঞ্চদশ বর্ষ] শনিবার, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ সাল। Saturday 6th December, 1947. [৫ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নিজামের নীতি

অবশেষে নিজাম বাহাদুর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এক বৎসরের জন্য একটি স্থিতাবস্থা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই চুক্তির দ্বারা হায়দরাবাদ সম্পর্কিত সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। চুক্তির সর্তগুলি পড়িলে বোঝা যায়, নিজাম বাহাদুর এই চুক্তিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে কিছু বেশী সুবিধা আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সম্পর্কে নিজামের সঙ্গে ভারতের গবর্ণর জেনারেলের যে পত্রালাপ হইয়াছে তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, নিজাম সোজাসুজি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা আপাততঃ এড়াইয়া যাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন। সর্দার প্যাটেলের বিবৃতিতেও দেখা যায় যে, তাঁহারা কতকগুলি কারণে নিজামের সঙ্গে সাময়িকভাবে এইরূপ চুক্তিতে বদ্ধ হওয়া শ্রেয় মনে করিয়াছেন। সর্দারজী একথাও আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, পাকিস্থানে যোগদান করিবার ইচ্ছা হায়দরাবাদের নাই এবং হায়দরাবাদের জনসাধারণের অভিমত অনুসারেই হায়দরাবাদের সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে হইবে। কিন্তু এক বৎসর পরে নিজাম বাহাদুর ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন চুক্তির সর্তে কিংবা নিজামের পত্রে অস্পষ্টভাবেও তাহার কোন ইঙ্গিত নাই। অথচ স্থিতাবস্থা চুক্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট নিজামকে তাঁহার প্রয়োজনমত অস্ত্রশস্ত্র এবং সমরোপকরণ সরবরাহ করিবেন। ইহা ছাড়া, নিজাম গবর্ণমেণ্ট যদি অনুরোধ করেন, তবে তাঁহার রাষ্ট্রে বিদ্রোহমূলক আন্দোলন এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রচারকার্য দমন করিতে তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। নিজাম স্বেচ্ছাচারপরায়ণ শাসক; বিশেষত কিছুদিন হইতে ধর্মান্ধ প্রগতিবিরোধী দলের দ্বারা তিনি যে পরিচালিত হইতেছেন, এ সত্য বারংবার সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, নিজামের গবর্ণমেণ্ট যদি জনমতানুযায়ী পরিচালিত হইত, তবে হায়দরাবাদের সৈন্যবাহিনীর জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে আমাদের আতঙ্কের কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু হায়দরাবাদের শাসন-নীতিতে স্বৈরাচারকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার জন্য তত্রত্য শাসকমণ্ডলীর বর্তমানে যেরূপ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে নিজামকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক হইবে। সর্দার প্যাটেল তাঁহার বিবৃতিতে অবশ্য এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, নিজাম তাঁহার রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি জনমতানুমোদিতভাবে সংস্কারের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন; কিন্তু নিজামের এ সম্বন্ধে শুধু সদিচ্ছা প্রকাশই যথেষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি না। তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্থিতাবস্থা চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার মানিয়া লইতে যদি উদারতার সঙ্গে অগ্রসর হইতেন, তবে এ প্রশ্ন দেখা দিত না। হায়দরাবাদ রাষ্ট্রের কতকগুলি অভ্যন্তরীণ গুরুতর সমস্যার আগে সমাধান করিতে হইবে, তবেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চূড়ান্ত মীমাংসার সুযোগ ঘটিবে, সর্দার প্যাটেলের এই উক্তি এক্ষেত্রে আমরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। নিজাম বাহাদুর প্রগতিবিরোধী দলের বিদ্রোহ বা প্রচারকার্য দমনে অতঃপর আন্তরিকভাবে প্রবৃত্ত হইবার শুভবুদ্ধি যদি সত্যই প্রদর্শন করেন, তবে তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে সকল রকম সহযোগিতা লাভ করিবেন এবং তাঁহার রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শান্তি ও সমৃদ্ধিও সুনিশ্চিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এখনও যদি তিনি রাষ্ট্রনীতিতে স্বৈরাচার কিংবা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ক্রমাগত কৌশলপূর্ণ ভাবে সুযোগ প্রতীক্ষার পথ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে অল্পদিনের মধ্যেই জাগ্রত জনমতের সঙ্গে চরম সঙ্ঘর্ষে উপনীত হইতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি জাগ্রত জনমতের অনুকূলেই যে প্রযুক্ত হইবে এ বিষয়েও সন্দেহ নাই।

নীতির প্রয়োগ-চাতুরী

মিঃ শহীদ সুরাবর্দী মুখে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্যের কথা যতই বলুন, তাঁহার মন যে লীগের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বদ্ধ সংস্কার হইতে এখনও মুক্ত হয় নাই, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। গত ২৫শে নবেম্বর ঢাকায় ফজলুল হক হলে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এই প্রচ্ছন্ন মনোভাব প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। সুরাবর্দী এই বক্তৃতায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-নীতিকে সাম্প্রদায়িক ছোপে কা[illegible] সুকৌশলে তাঁহার মুসলমান [illegible]র গণপরিষদ এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে চাঙ্গা[illegible]রবেন এবং কংগ্রেসের ছেন এবং সেই [illegible]ক্তিকে কার্যে পরিণত করিবার [illegible]া অবলম্বনে অগ্রসর হইবেন।

লোকপ্রিয়তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। সুরাবর্দী সাহেবের মতে ভারতের উভয় রাষ্ট্রেই একপ্রকার প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতা চলিতেছে; কিন্তু পাকিস্থান অপেক্ষা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেই এই সমস্যা অধিক সংকটজনক। তিনি উদার মহিমায় বিগলিত হইয়া মুরুব্বিয়ানার সুরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে অতি কঠোর হস্তে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে, অন্যথায় দেশ অরাজকতার মধ্যে গিয়া পড়িবে ইত্যাদি। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই সংকটের কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া মিঃ সুরাবর্দী বলেন, "সৌভাগ্যক্রমে পাকিস্থানের মুসলমানগণ বর্তমানে প্রকাশ্যে কিম্বা গোপনে কেহই এই মত পোষণ করেন না যে, পাকিস্থানে কোন হিন্দু থাকিবে না; পক্ষান্তরে হিন্দুদের মধ্যে একটি অতি শক্তিশালী দল বর্তমান। ইঁহারা বলিতেছেন যে, ভারতে কোনও মুসলমান থাকিতে পারে না।" সুরাবর্দী সাহেবের মনস্তাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে হয়। পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, ভাওয়ালপুর—এই সব স্থানে হিন্দু ও শিখদের রক্তে যাহারা স্রোত বহাইয়াছে, তাহারা কাহারা? কাহারা এখনও পশ্চিম পাকিস্থান হইতে কাশ্মীরে হানা দিয়া বর্বর অত্যাচার চালাইতেছে। আজ নিগৃহীতা নারীর আর্তনাদে জম্মু সীমান্তের পাহাড়-পর্বত যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কাহাদের সে কৃতিত্ব? হিন্দুরা যে একেবারে নির্দোষ, এমন কথা আমরা বলি না; কিন্তু ভ্রান্তভাবে একপক্ষের দোষ ফুটাইয়া তুলিয়া সুরাবর্দী সাহেবের এইরূপ প্রচার-কার্যের অনিষ্টকারিতায় আমরা সত্যই শঙ্কিত হইতেছি। জানি সুরাবর্দী সাহেবের সব উক্তিতেই নৈতিক চাতুরী থাকে। এ বিষয়ে তাঁহার অনন্যসাধারণ ওস্তাদী আছে, আমরা স্বীকার করি। ঢাকার বক্তৃতায় তাঁহার সে নীতির প্রয়োগ নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি এ বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধী ও অপর কয়েকজন ভারতীয় নেতার প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু সেই প্রশংসার আড়ালে নিজের কৌশল বাগাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডলে কতিপয় সদস্যসহ অপর একটি দল রহিয়াছে, যাঁহারা ভারতের মুসলমানদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পক্ষপাতী। পাকিস্থানে এরূপ কোন দল নাই। পাকিস্থানের সমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।" সুরাবর্দী সাহেব এক্ষেত্রে কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই; বস্তুত সে সামর্থ্যও আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ...তীয় যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডলে খান ...মব মত ধর্মান্ধ প্রগতি- ... হইতে পারে না।

সুতরাং সুরাবর্দী সাহেবকেই নিরুদ্দিষ্টভাবে প্রচারকার্যের কৌশল খাটাইতে হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারভাগে তিনি এই কৌশল আবার ঝালাইয়া লইয়াছেন। কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্ররোচনাকারী সুরাবর্দী সাহেব উদার গণতান্ত্রিকতার আবেগভরে বলিয়াছেন, "দুঃখের বিষয়, ভারতের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা সংখ্যা-লঘুদের মনোভাবে অহেতুক আঘাত করিতেছেন। জবাব দিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। এইভাবে একপ্রকার নৃশংস ফ্যাসিস্টবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইহাদের অধীনে নেতৃবৃন্দ ভারতীয় মুসলমানগণকে খাটো ও নিধন করিবার কোন সুযোগ হারাইতেছেন না; অথচ ফ্যাসিস্টবাদের অধীনে তাহাদের কোনও সমালোচনা করা চলিবে না।" সুরাবর্দী সাহেব কলিকাতায় মহরমের মিছিলের কথা নিশ্চয়ই জানেন। 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' এই সব ধ্বনিও মিছিলকারীদের মুখে শোনা গিয়াছিল। হিন্দু-পাড়ার মধ্য দিয়া মহরমের বিরাট মিছিল যায়। কিন্তু কেহই প্রতিবাদে কোন কথাই তুলে নাই। এই সম্পর্কে সুরাবর্দী সাহেব ঢাকার বিগত জন্মাষ্টমী মিছিলের কথা স্মরণ করিবেন। বস্তুত মিঃ সুরাবর্দীর এই সব মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দেওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-নীতি কংগ্রেসের আদর্শে পরিচালিত হয় এবং কংগ্রেস কোনদিনই সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। স্বৈরাচারকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য কংগ্রেস সুদীর্ঘ কাল সংগ্রাম করিয়াছে এবং সে সংগ্রামে অজস্রভাবে শোণিত বিসর্জনে সংকুচিত হয় নাই। কংগ্রেসের সে অ-সাম্প্রদায়িক উদার আদর্শ মুসলিম লীগের সংকীর্ণ মতবাদে বিভ্রান্ত সমাজেরও নূতন চেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা লীগ মতবাদের অনিষ্ট-কারিতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুরাবর্দী সাহেবের সাম্প্রদায়িকতান্ধ প্রচার-কার্যের সহস্র কৌশলও সত্যের মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না।

উভয় রাষ্ট্রে শান্তি

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়াছে, আলাপ-আলোচনার পথেই তাহার সমাধান সংগত ও সম্ভবপর। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জোরের সংগেই সম্প্রতি একথা বলিয়াছেন। কিছুদিন হইল এইভাবে আলোচনা চলিতেছে। বস্তুত শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশ উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই প্রয়োজন এবং অশান্তি উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। ব্রিটিশ ভারত পরিত্যাগ করিবার পর এখানে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে, তাহাতে আমাদের কলংকই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কলংক যত সত্বর বিদূরিত হয় এবং সমগ্র ভারত শান্তি সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়, ততই মংগল। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই যে পাকি-স্থানের সংগে তাহার শান্তি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না এ ধারণা সত্য নয়। কংগ্রেসপন্থীরা ভারতবর্ষকে উপ-মহাদেশ বলেন না, একদেশ বলেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে শত্রুর মত দেখিতে হইবে, ইহা নেহাৎ গায়ের জোরের কথা। কংগ্রেস জোর করিয়া কোন মতবাদ কাহারো উপর চাপাইতে চায় না। তাহার মতে অর্থনীতি ও ঐতিহ্য প্রভৃতি কতকগুলি কারণে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া বৈদেশিক প্রভাব হইতে মুক্ত আব-হাওয়ায় স্বাধীন ভারতীয় জাতির সর্বাংগীণ বিকাশ ঘটিবে। এতদ্দ্বারা ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্র থাকিবে না, এমন কথা বলা হয় না। বস্তুত সেই সব বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব, সহযোগিতা এবং সেই সূত্রে সংহতি-বোধ বিদ্যমান রহিবে, এই কথাই বলা হইয়া থাকে। তেমন প্রতিবেশে লীগের স্বকপোলকল্পিত উপ-মহাদেশ পাছে দেশে পরিণত হয়, এই আতংকে আস্ফালন করা আমরা অনর্থক মনে করি এবং যাঁহারা সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এইরূপ সাংস্কৃতিক মিলন সমর্থন করেন, পাকিস্থানের বিধানে তাঁহাদিগকে বধ ও বন্ধার্হ গণ্য করার পাতককে আমরা পাগলামি বলি। প্রকৃতপক্ষে জনমতের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির পথেই ভারতের ভবিষ্যৎ গঠিত হইবে এবং সেই অভিব্যক্তিতে বাধা দেওয়াই গণতন্ত্রবিরোধী স্বেচ্ছাচার। এইভাবে ভেদের ভাবকে গণ্ডির মধ্যে জিয়াইয়া রাখা ফ্যাসিস্ট পন্থা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কাশ্মীর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্র লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থানের মধ্যে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, ঐসব রাষ্ট্রের জনগণের অভিমতকে প্রাধান্য দানের পথেই তাহার সুষ্ঠু-ভাবে সমাধান ঘটিতে পারে। পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট সোজাসুজি এই সত্যটি স্বীকার করিয়া লইলেই সব গোল চুকিয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট বারংবার এই যুক্তি উপস্থিত করিলেও পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট তাহাতে রাজী হইতেছে না। দেখিতেছি, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংগে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর একদিকে আলোচনা চলিতেছে, অন্যদিকে পাকিস্থান-অধিকৃত এলাকার উপর দিয়া দস্যুদল কাশ্মীর অভিযান পরিচালনা করিতেছে। এইভাবে পাকিস্থান নীতি-পরিচালকদের কথা ও কাজে একান্ত অসামঞ্জস্য ভারতের দুর্গতি বাড়াইয়া চলিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অশান্তি এবং উপদ্রব কঠোর হস্তে

দমন করিবার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টকে সর্বদা সজাগ থাকা আমরা সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে দুর্বলতা মাত্রেই পাপ। এ জগতে দুর্বল যে, সে শুধু নিজেই তাহার পাপের ফলভোগ করে এমন নয়, প্রকৃতপক্ষে তাহার দুর্বলতায় প্রবলের অসংযত শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়া সে অপরের উপর অত্যাচারের পথও উন্মুক্ত করিয়া থাকে। সুতরাং শান্তির পথ দুর্বলতার পথ নয়, সে পথ শক্তির পথ।

বর্বরতার বিক্ষোভ

সম্প্রতি খুলনায় দুইটি নারীধর্ষণের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—একটি সদর মহকুমায়, অপরটি সাতক্ষীরা মহকুমায়। সদর মহকুমার সংবাদটি এইরূপ,—গ্রামের এক হিন্দু ভদ্রলোকের কন্যাকে কতকগুলি দুর্বৃত্ত অতর্কিত অবস্থায় ধরিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলে এবং সেই অবস্থায় পাশবিক অত্যাচার করিয়া তাহার শাড়ীতে ও সায়াতে আগুন ধরাইয়া দেয়। বালিকাটির নিম্নাঙ্গ দগ্ধ হয়। সে এখন সংকটাপন্ন অবস্থায় খুলনা হাসপাতালে রহিয়াছে। সাতক্ষীরার সংবাদটি এইরূপ—শ্যামনগর থানার অন্তর্গত কালিন্দী গ্রাম নিবাসী স্বরূপ মণ্ডলের বিধবা কন্যাকে রাজপথ হইতে বলপূর্বক অপহরণ করা হইয়াছে। স্থানীয় হিন্দুরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে নাই। আমরা এই সব সংবাদে শঙ্কিত হইয়াছি। নারীহরণ ও নারীধর্ষণ এই দুর্ভাগা দেশে অবশ্য নূতন নয়। এক শ্রেণীর দুর্বৃত্তদের মধ্যে এই পাপ প্রবৃত্তি বিশেষভাবেই রহিয়া গিয়াছে এবং লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সাম্প্রদায়িকতার ভাবকে আশ্রয় করিয়া অধিকাংশ স্থলে ইহাদের এই পশু প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে। পূর্ব পাকিস্থানে এক দল লোকের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এখন মুসলমানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। স্বাধীনতালাভের এই মোহ তাহাদের মনে স্বেচ্ছাচারের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং সে স্বেচ্ছাচারের প্রবৃত্তির মূলে সাম্প্রদায়িকতার ভাব কাজ করিতেছে; এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কারণ লীগের পাকিস্থানী আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার ভাবই ষোলআনা ছিল। এখন সেই সাম্প্রদায়িক ভাবকে সংযত করিয়া জাতীয়তার উদ্বোধন না করিতে পারিলে এই শ্রেণীর দৌরাত্ম্য এবং উপদ্রবের আশংকা থাকিয়াই যাইবে। এরূপক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্থানের শাসকবর্গকে হয় মুসলমান সমাজের সামাজিক ও রাষ্ট্রগত নৈতিক চেতনা জাগ্রত করিয়া নতুবা কঠোর দণ্ড বিধানের দ্বারা এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য আবদুর রহিম নামক একজন যুবক হিন্দুর বাড়িতে ডাকাতিতে বাধা দিতে গিয়া প্রাণদান করিয়াছে। মুসলিম লীগের সমস্ত আন্দোলনের ইতিহাসে মহনীয় আদর্শে আত্মদানের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। পরন্তু লীগের সকল কার্য ভ্রাতৃবিরোধেই ব্যয়িত হইয়াছে। আত্মদানকারী এই বীর যুবকদের আদর্শ যদি পূর্ব পাকিস্থানের মুসলমান তরুণদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হয়, তবে তথাকার সমস্যা অনেকখানি কাটিয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রেলগাড়িতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যাত্রীদের উপর অকারণ সর্দারীর উপদ্রবেই ইহাদের কর্মোদ্যম এখনও প্রধানত প্রযুক্ত হইতেছে। মুসলিম সমাজের তরুণেরা সম্প্রদায়নির্বিশেষে নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য যেদিন বুকের রক্ত দিতে আগাইয়া যাইবে,, আমরা সেদিন তাহাদের জয়গান করিব এবং বৃহদাদর্শে আত্মদানের সেই আদর্শে তাহাদের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। পাকিস্থানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর শুভেচ্ছার উপদেশ বৃষ্টি না করিয়া তথাকার মুসলমান সমাজের নেতারা যুবকদের মধ্যে বলিষ্ঠ অসাম্প্রদায়িক এমন উদার আদর্শের প্রেরণা জাগাইয়া তুলুন এবং সেই প্রেরণাকে কার্যকর করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, আমাদের এই অনুরোধ।

ভাষাগত প্রদেশ গঠন

সম্প্রতি গান্ধীজী জনৈক পত্রপ্রেরকের প্রশ্নের উত্তরে 'হরিজন সেবক' পত্রে ভাষাগতভাবে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রশ্নটির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কংগ্রেস বহুদিন পূর্বেই ভাষাগতভাবে প্রদেশ পুনর্গঠনের নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু নানা কারণে কংগ্রেসের সে সিদ্ধান্ত আজও কার্যে পরিণত হয় নাই। মুখ্য কারণ এই যে, কয়েকটি প্রদেশের কংগ্রেস পরিচালিত গভর্নমেণ্ট প্রাদেশিকতার সংস্কার বশত এই সিদ্ধান্তকে এড়াইয়া গিয়াছেন। আজও প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা হইতেছে। গান্ধীজী সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। ভারতীয় গণপরিষদ কর্তৃক এই প্রশ্নটি কেন আগ্রহের সহিত গৃহীত হইতেছে না এবং স্বাধীনতালাভ করিবার পরও কংগ্রেসের বহু বিবেচিত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার জন্য কেন চেষ্টা হইতেছে না, গান্ধীজী সে কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের সর্বত্র প্রাদেশিক মনোভাব বাড়িয়া চলিতেছে এবং জাতীয়তার আদর্শ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে নেতারা প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রশ্নটি উত্থাপন করা সমীচীন বোধ করিতেছেন না। প্রাদেশিকতাকে আমরাও ঘৃণা করি এবং জাতির এই সঙ্কটকালে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করে আমরাও ইহা চাহি না; কিন্তু আমাদের মনে হয়, দেশের স্বার্থ এবং সমগ্র ভারতের স্বার্থের জন্যই প্রশ্নটি বর্তমানে আর চাপা দিয়া রাখা উচিত নয়, কারণ সে পথে সমস্যা সমধিক জটিল আকার ধারণ করিবে। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর প্রদেশসমূহের ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে সংহত ও সমন্বিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের শাসকবর্গ ইহার মধ্যেই প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করিয়াছেন। জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে এই অবস্থাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু এ কাজে সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইলে প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা একান্তভাবেই প্রয়োজন; কারণ তাহা না করিলে কতকগুলি অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষার স্বাভাবিক সংস্কৃতির পথে অভিব্যক্তিলাভ করিবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করা হইবে; জোর করিয়া অন্য প্রদেশের ভাষা তাহাদের ঘাড়ে চাপানোতে তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ শিক্ষালাভের সঙ্গত সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংহভূম, ধলভূম প্রভৃতি অঞ্চলের কথা বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙলা ভাষাভাষী। ভাষাগতভাবে প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত হইলে এই সব অঞ্চল বহু পূর্বেই বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হইত; কিন্তু এতদিনও তাহা হয় নাই। ফলে এই সব অঞ্চলের বাঙলা ভাষাভাষীদিগকে বিহারীদের রাষ্ট্রভাষার প্রভাবে আড়ষ্ট জীবন যাপন করিতে হইতেছে। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ ইহারা পাইতেছে না, এবং সে সাহিত্যের সাংস্কৃতিক মর্যাদার প্রতিবেশ প্রভাবে তাহাদের সমাজজীবন বিকাশলাভ করিতেছেনা। ইহা ছাড়া অন্য অসুবিধাও আছে। মাতৃভাষার এইভাবে মর্যাদালাভের ব্যাপার লইয়া প্রাদেশিকতার ভাবও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি অনুকূল নহে মনে করিয়া ভাষাগতভাবে প্রদেশ পুনর্গঠনের যুক্তি যাঁহারা উপস্থিত করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ আছে। পক্ষান্তরে দেশের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ভাষাগতভাবে প্রদেশসমূহের অবিলম্বে পুনর্গঠন হওয়াই আমরা একান্ত আবশ্যক মনে করি। ভাষাগতভাবে প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত যে সকল দিক হইতেই সমীচীন গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারতীয় গণপরিষদ এই প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন এবং কংগ্রেসের পূর্ব গৃহীত সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হইবেন।

প্র-না-বি-র এলবাম

চিত্র-চরিত্র

পরমহংসদেব

কোন জড়বস্তুর সহিত নির্বিকার চৈতন্যের তুলনা যদি চলে, তবে সে বস্তু চির হিমানী স্তূপ। হিমাচলের নিরুদ্দিষ্ট উত্তুঙ্গতায় চির-সংহত তুষারপুঞ্জে বিরাজমান। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানকালে তাহাদের যেমনটি দেখিয়াছিলেন, তাহারা আজিও তেমনি অবিকারী। পুঞ্জীভূত সত্ত্বগুণের মতো সেই শান্ত, শুদ্ধ, শুভ্র, তুষার-জগতের সহিত নির্বিকার চৈতন্যের পরোক্ষ তুলনা চলিলেও চলিতে পারে। সেখানে যেন পঞ্চভূতের নির্বিকল্প সমাধি। সেই সমাধি ছায়ায় দাঁড়াইলে সহসা কি কল্পনা করিতে পারা যায় যে, এই মহামৌনের স্তরে স্তরে একটা সমগ্র মহাদেশকে লালিত করিবার শক্তি ও সম্পদ ঘনীভূত হইয়া নিদ্রিত! মানসকেন্দ্রিক হিমানী জগৎ যেসব মহাবেগবান নদ-নদীকে ভারত-বর্ষের দিকে দিকে নিক্ষেপ করিয়াছে—এখানে দাঁড়াইলে সহসা কি সেকথা কল্পনা করা যায়? সিন্ধু শতদ্রু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের পূর্বসূত্র যে এই নৈঃশব্দের নেপথ্যে অন্তর্নিহিত নিতান্ত বিস্ময়কর হইলেও— ইহাই তো সত্য। নির্বিকার হিমানী স্তূপ ভারতবর্ষের নদ-নদীকে অবলম্বন করিয়াই তো সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। দুই-ই এক, কেবল অবস্থান্তর। চির হিমানীর নির্বিকার চৈতন্য নদ-নদী প্রবাহে সক্রিয় চৈতন্যরূপে প্রোদ্ভাসিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ওই চির হিমানী স্তূপ, নির্বিকার চৈতন্য; তাঁহার শিষ্যগণ নদ-নদী প্রবাহ, সক্রিয় চৈতন্য। রামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ চৈতন্যই শিষ্য-প্রবাহে বিগলিত হইয়া প্রচণ্ড-বেগে, অকৃপণ ঔদার্যে একটা সমগ্র দেশকে সিক্ত, সিঞ্চিত, গততৃষ্ণ করিয়াছে। চির হিমানীকে মানবনিরপেক্ষ, নিষ্ক্রিয় মনে করিলেও বস্তুত তাহা নয়, আত্মবিগলিত ধারায় মর্ত্যজনের তৃষ্ণার ঘাটে ঘাটে সে প্রবাহিত। রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যগণকে, বিশেষভাবে বিবেকানন্দকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই তাঁহার লীলার সমগ্র রূপ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। দুইজনে একই চৈতন্যের অবস্থান্তর; পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই জন্যেই পরস্পরে এত আকর্ষণ; ঠাকুর নিজেও বহুবার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পরমহংসদেবের দুইখানি ছবি দেখিয়াছি। একখানিতে তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। এখানা তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকৃতি। ঈষন্মুক্ত ওষ্ঠাধরের ফাঁকে দুইটি দাঁত দেখা যাইতেছে, কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার মতো তাঁহার চোখ দুইটি। চোখ দুটি অর্ধ-নিমীলিতপ্রায়, ভাবাবেশে নয়, খুব সম্ভবত স্বভাববশে। নিমীলিতপ্রায় চোখের দৃষ্টি দিয়া সংসারের প্রকৃত চেহারাকে ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা বলিয়া মনে হয়। মহৎভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন না। স্বাভাবিক অবস্থায় সংসারের রীতি-নীতি খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তিনি একান্ত সচেতন ছিলেন। কোথাও যাইবার সময়ে তাঁহার গামছা-খানি সঙ্গে লওয়া হইল কিনা, সেদিকেও তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। একবার এক মহোৎসবের মেলায় শ্রীসারদাদেবী সঙ্গে যাইবেন না শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন, বলিলেন, 'ভালোই হলো, দুজনে একত্রে গেলে সবাই বলতো হংস-হংসী এসেছে।' নিজেকে লইয়া বিদ্রূপ করিবার মতো ক্ষমতা সব মহাপুরুষের থাকে না। অনেক মহাপুরুষ অত্যন্ত বেশি মহা-পুরুষ এবং অষ্টপ্রহর মহাপুরুষ। তাঁহাদের সঙ্গ নিশ্চয়ই আসঙ্গকর নয়। রামকৃষ্ণদেবের লোকোত্তর গুণ সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাঁহার লৌকিক গুণও অল্প নহে। এমন চিত্তাকর্ষক সংলাপী সচরাচর দেখা যায় না। শ্রীম........ রামকৃষ্ণদেবের বসওয়েল।

রামকৃষ্ণদেবের আর একখানি ছবি ভাবাবিষ্ট অবস্থার। দণ্ডায়মান মূর্তি; দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে ইঙ্গিতশীল; বাম হস্তে পরমানন্দের মুদ্রা; পরিধানে শুভ্র বসন ও পিরান, আর অন্তর্লীন-ইন্দ্রিয়গ্রাম মুখমণ্ডলে এক দিব্য লোকাতীত জ্যোতি। নিতান্ত অন্ধেও বলিয়া দিতে পারে যে, এই লোকটি এই মুহূর্তে পৃথিবীর অঙ্গীভূত নয়, তাঁহার অস্তিত্ব যেন কোন্ তুরীয়লোক স্পর্শ করিয়াছে। এই ছবি দুখানিতে রামকৃষ্ণ জীবন-ধনুকের দুই কোটি, এক কোটি ভূমি-স্পৃষ্ট, অপর কোটি দিব্য-লোককে স্পর্শ করিয়া আছে, এক কোটিতে তিনি শিষ্যবৎসল গুরু, মানব-বৎসল বান্ধব, অপর কোটিতে আত্মমগ্ন, সিন্ধুতে বিন্দুলীন সত্তা, এক কোটিতে নির্বিকার চৈতন্য, অপর কোটিতে সক্রিয় চেতনা। রামকৃষ্ণ অদ্বৈতপন্থা ও দ্বৈতপন্থা—দুইটিতেই সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন, ছবি দুখানি যেন তারই একপ্রকার প্রতীক। বাস্তবিক ভারতবর্ষীয় ধর্ম-জগতে যতগুলি সাধনপথ আছে, রামকৃষ্ণ সবগুলিরই সার্থক পথিক। আর শুধু ভারতীয়ই বা কেন, খৃষ্টীয়, ইসলামি প্রভৃতি পন্থাও তিনি অধিগত করিয়াছিলেন। রামমোহনের সময় হইতে বঙ্গীয় ঊনবিংশ শতক কখনো অগোচরে, কখনো সগোচরে যে সমন্বয় সিদ্ধির প্রচেষ্টা করিতেছিল, রামকৃষ্ণে তাহার চরম। রামমোহনে যাহা সচেতন, রামকৃষ্ণে তাহা স্বাভাবিক, স্বাভাবিক বলিয়াই খুব সম্ভব তাহার মূল্য সর্বাধিক। রামমোহনে যাহা সূত্র, রামকৃষ্ণে তাহারই সাধনা। মহাধীমান রামমোহনের কার্য প্রায়-নিরক্ষর এই মহাপুরুষ সার্থকতরভাবে উদ্যাপন করিতেছিলেন, সর্বাঙ্গীণ সমন্বয় সাধনের মহৎ কার্য। ইতিমধ্যে ঊনবিংশ শতকও শেষ পাদে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

বাঙলার ঊনবিংশ শতক বুদ্ধি গৌরবে দীপ্ত, বৃহত্তর জগতের সংস্রবে গরীয়ান। এই দুটিই তাহার এবং সে সময়কার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-দের বিশিষ্ট লক্ষণ। দক্ষিণেশ্বরের এই অজ্ঞাত-প্রায় সাধকের এই লক্ষণ দুটির কোনটিই ছিল না। তথাপি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে প্রচণ্ডতম ও গভীরতম বলা যায়। প্রকৃত ব্যক্তিত্ব অন্তর্জাত। বিচিত্র সাধনপন্থাকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে যে শক্তির আবশ্যক, তাহা কি প্রচণ্ড! হিমালয়ের তুষার কোটি কোটি বৈদ্যুতিক অশ্ব-শক্তি সংহত করিয়া রাখিয়াছে। আবার সেই ব্যক্তিত্বের গভীরতাও কি অপরিসীম! সচেতন প্রয়াসের বহু যুগসঞ্জাত সংস্কারের শিলীভূত স্তর পর্যায় সবলে উৎখাত করিয়া দিয়া আত্মার অবলুপ্ত মহেঞ্জোদেড়োকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন এই ভক্ত সাধক। তাঁহার জীবনের অনেক অলৌকিক অভিজ্ঞতা বিশ্বাসের প্রত্যন্ত-ঘেঁষা। মহেঞ্জোদেড়োর অস্তিত্বও কি তূর্ণ-বিশ্বাসযোগ্য? রামকৃষ্ণের সব অভিজ্ঞতা এখনো সাধারণের আয়ত্ত নয়, মহেঞ্জোদেড়োর ভাষার চাবিকাঠি তো আজিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তৎসত্ত্বেও মহেঞ্জোদেড়ো আমাদের ইতিহাসের পরিধিকে বিস্তীর্ণতর করিয়া প্রাক্-ইতিহাসের কোঠায় ঠেলিয়া দিয়াছে। রামকৃষ্ণ কি আমাদের আধ্যাত্মিক পরিধি বাড়াইয়া দেন নাই? আমাদের ক্ষুদ্র ইহ-কে প্রাক্-ইহর সহিত যুক্ত করেন নাই? মহেঞ্জোদেড়োর রহস্য-সন্ধানীকে বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর করিতে হয়। রামকৃষ্ণ রহস্য-সন্ধানীকেও তাঁহার শিষ্য-দের উপর, ভক্তদের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

ইতিহাসকে নিতান্ত জড়বাদীর দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাহার ঘটনাস্রোতে যদি বিধাতার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয় যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে বাদ ও প্রতিবাদকে বিধাতা একই সময়ে বপন করিয়া থাকেন। বন্য মহিষ আততায়ী ব্যাঘ্রকে যেমন দুই শৃঙ্গের আঘাত প্রত্যাঘাতে ঠেলিয়া লইয়া চলে, বাদ-প্রতিবাদের ঠেলাতেও ঘটনাপ্রবাহ তেমনি গতি পায়। ১৮৩৫-এ বাঙলা দেশে ইংরেজি শিক্ষার সরকারী সূচনা; ১৮৩৬-এ রামকৃষ্ণদেবের জন্ম;

একটার টান বাহিরে, আর একটার টান ভিতরে; আর এই দুইয়ের টানাটানির সমন্বয়ের পথে নব্যবঙেগর যাত্রা। লক্ষ্য করিবার মতো বিষয় এই যে, নিরক্ষরপ্রায়, ইংরেজি-না-জানা এই সাধকের অধিকাংশ গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসী শিষ্য তখনকার পরিভাষায় যাহাদের বলিত, "ইয়ং বেঙগল।" 'ইয়ং বেঙগলের' অবিশ্বাস, আর 'ওল্ড ফুলদের' অতি-বিশ্বাস, দুইয়ের ঠেলা-ঠেলিতে নব্যবঙেগর বিশ্বাসের সূত্রপাত। মধ্য-যুগীয় সাধনপন্থা, আর চিরযুগীয় সাধন-লক্ষ্য, দুইয়ের টানাটানিতে নবযুগের সিংহদ্বার খুলিয়া গেল। শিক্ষাভিমানী বাঙলা দেশের ভাব-সাধনার গুরু এক নিরক্ষরপ্রায় সাধক।

'পরমহংস' শব্দটির কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকিলে জানি না। তবে ইহার প্রকৃতি-গত ইঙ্গিতটি বড় মনোরম। শরতের শেষে মানস সরোবর ত্যাগ করিয়া হাঁসের দল সুদূরে দক্ষিণে চলিয়া যায়, বসন্তের প্রারম্ভে আবার তাহারা 'গলিত-নীহার' কৈলাসকে লক্ষ্য করিয়া মানসে ফিরিয়া আসিয়া গতিচক্র সম্পূর্ণ করে। পরমহংস বিশ্ব-মানস হইতে যাত্রা-লীলা শুরু করিয়া আবার বিশ্ব-মানসে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে—তাহার পক্ষবিধূননে অন্তরাকাশ এখনো স্পন্দিত।
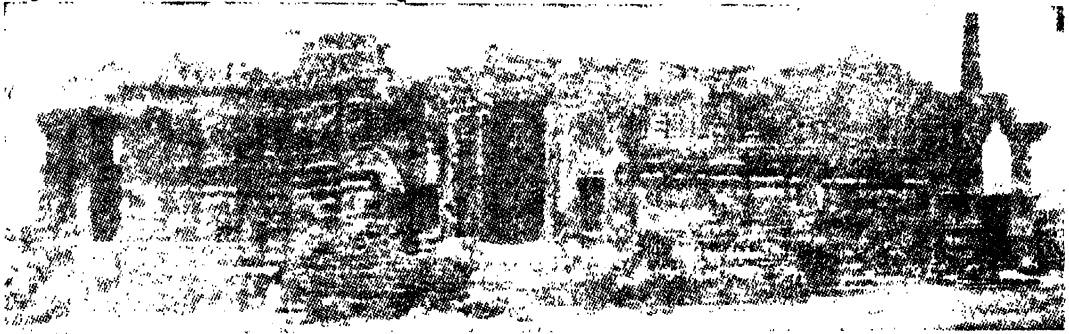
সোমনাথ লুণ্ঠন

অমরেন্দ্রকুমার সেন

আফগানিস্থানে গজনীর অধিপতি আমির-উল-গাজী-নাসিরুদ্দিন উল্লা সবক্তগীন একদা সুকোমল পালঙ্কে বিলাস শয়নে যখন সুখনিদ্রা উপভোগ করছিলেন, সেই সময় এক স্বপ্ন তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করে। ঘরের মধ্যে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড থেকে একটি গাছ ধীরে ধীরে বড় হতে হতে এতই বিশাল হয়ে উঠল যে শীঘ্রই তা আকাশ ভেদ করে ওপরে উঠে সমস্ত পৃথিবী ছায়ায় ঢেকে ফেলল। সবক্তগীন ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টায় নিমগ্ন হলেন, ঠিক এই সময়ে একজন ক্রীতদাস এসে সুসংবাদ দিলে, তাঁর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সবক্তগীন স্বপ্ন ও পুত্রের জন্ম, এই দুটি ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা ধরে নিলেন এবং অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে পুত্রের নাম রাখলেন মাহমুদ, যার অর্থ প্রশংসাভাজন।

সেইদিন রাত্রে সিন্ধুতীরে পর্শাবর অথবা পুরুষপুরে এক প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ভেঙে পড়ে যায়। সবক্তগীনের স্বপ্ন, মাহমুদের জন্ম আর এই দেবমন্দির ভূমিসাৎ, এই তিনটি ঘটনা একই দৃষ্টিতে দেখে কি ব্যাখ্যা করা যায়!

মাহমুদ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু মুখ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত। কথিত আছে, তিনি দর্পণে মুখ দেখতেন না। একদা তিনি মন্তব্য করেছিলেন—"আল্লা কেন আমার প্রতি বিরূপ? প্রজাগণ বাদশার মুখের দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে, কিন্তু আমার বীভৎস মুখ দেখে তারা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।"

মাহমুদের পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন তিনি পারস্যে খোরসানের শাসনকর্তা। পিতা কনিষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে গজনীর বাদশা করে গেছেন। মাহমুদ জ্যেষ্ঠ হয়েও সিংহাসন পাননি, কারণ তিনি ছিলেন জারজ, কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তিনি ইসমাইলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং গজনীর বাদশা হন। সুলতান-উল-আজম মমীনউদ্দৌলা নিজামুদ্দীন আবুল কাশিম মাহমুদ গাজী এই হল তার সম্পূর্ণ উপাধি। তাঁর 'সুলতান' উপাধি বোগদাদের খলিফা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এ হেন যে গজনীর সুলতান তিনি সতেরোবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন; হিন্দুস্থানের বিশ হাজার প্রতিমূর্তি ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। বিশ হাজার মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করেছেন। লুণ্ঠনকারী এই মাহমুদ ছিলেন হিন্দুধর্মের শত্রু।

ষোলোবারের পর তিনি সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। সোমনাথের সেই কাহিনী জাতির ইতিহাসে এক লজ্জাজনক প্রতীকরূপে এখনও জাগরূক হয়ে রয়েছে। মন্দির পুনর্নির্মিত হলে সেই গ্লানি হয়ত কিছু পরিমাণে দূরীভূত হবে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও শ্যামলদাস গান্ধীজী জাতির ধন্যবাদ অর্জন করেছেন।

জুনাগড়ের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে পবিত্র স্থান প্রভাসপত্তন, সেইখানে এখনও নীরবে দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথের বিশাল মন্দির, ব্যবসায়ে ফেল হয়ে যাওয়া কোটিপতির মতো। প্রবাদ এইরূপ যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীরও আগে সোম নামে কোন এক হিন্দু রাজা এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সোমনাথ নামে বিরাট শিবলিঙ্গ। এই মন্দির থেকে মাত্র কিছুদূরে ভাটকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন, আর কিছুদূরে আছে তিনটি জলধারার মিলন, সেইখানেই নাকি তাঁর পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করা হয়েছিল।

সোমনাথের বিরাট মন্দিরটি একটি দুর্গের মতো, সমুদ্রের সফেন তরঙ্গমালা তার ভিৎ ধুয়ে দিয়ে যেত। মন্দিরের প্রশস্ত বারান্দা সমুদ্রের ওপর বিস্তৃত ছিল, বারান্দাটির ভার সীসে দিয়ে মজবুত করা ৫৬টি কাঠের থাম রক্ষা

করত। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটি প্রকোষ্ঠে বিরাট শিবলিঙ্গ বিরাজ করতেন, দশ হাত দীর্ঘ আর তিন হাত প্রস্থ ছিল সেই মূর্তি। মন্দিরের উচ্চ চূড়া থেকে নীচে অঙ্গন পর্যন্ত একটি সোনার শৃঙ্খল দোদুল্যমান ছিল, আর সেই শৃঙ্খলে অজস্র ঘণ্টা বিলম্বিত ছিল। সন্ধ্যার সময় যখন দেবমূর্তিকে আরতি করা হ'ত তখন দুইশতজন ব্রাহ্মণ সেই ঘণ্টা সম্বলিত শৃঙ্খলটি আন্দোলিত করতেন, তখন সমুদ্রের গর্জন আর সেই অজস্র ঘণ্টার ধ্বনি, স্বর্ণময় দীপাধারে রক্ষিত দীপের কম্পিত শিখা, বহুমূল্যে রত্নদ্বারা প্রতিফলিত সেই আলোকশিখা সব মিলিয়ে এক অপূর্ব শোভা ও পরিবেশের সৃষ্টি করত। শিবের সেই লিঙ্গমূর্তির অবগাহনের জন্য প্রতিদিন দু'হাজার মাইল দূরে থেকে গঙ্গার পবিত্র জল আনা হ'ত, সহস্র পুরোহিত সেই মূর্তির পূজো করত, তিনশত গায়ক উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্রসহযোগে গীতবাদ্য করত, দেবতার বন্দনা গাইত সাড়ে তিনশত বন্দী, নর্তকীর সংখ্যা ছিল পাঁচশত, আর দাসদাসীর সংখ্যাও অসংখ্য। যাত্রীদের মস্তক মুণ্ডন করত তিনশত নরসুন্দর। দেবসেবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল দশ সহস্র গ্রাম। প্রতিদিন সহস্রাধিক ব্যক্তি দেবতার প্রসাদে তৃপ্ত হ'ত। সর্বাপেক্ষা অধিক যাত্রীসমাগম হ'ত চন্দ্র অথবা সূর্য-গ্রহণের সময়।

মাহমুদ যখন হিন্দুস্থানে মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস করে চলেছেন সেই সময়ে, কথিত আছে, সোমনাথের পুরোহিতগণ উক্তি করেছিলেন যে, "গজনীর বিধর্মী যদি এখানে আসে, তবে তাকে উপযুক্ত শাস্তি পেয়েই ফিরতে হবে।" এই উক্তি মাহমুদের কর্ণগোচর হয় যা তাঁর কাছে অত্যন্ত দাম্ভিকতাপূর্ণ বলে মনে হয়। তিনি অবিলম্বে সোমনাথ অভিমুখে যাত্রা করলেন। মুলতান থেকে সোজা আজমীঢ় আজমীঢ় হ'ল ধ্বংস, চলল বেপরোয়া লুঠপাট, লাভ হ'ল অপরিমিত ধনরাজি। এইবার পথে পড়বে বাইশ ক্রোশ রুক্ষ মরুভূমি। ত্রিশ হাজার উটের পিঠে বোঝাই করা হ'ল সহস্র সহস্র সৈন্যের খাদ্য ও পানীয়।

মরুভূমি অতিক্রম করে যখন অনহলবাড়ায় এসে পৌঁছুলেন, তখন তাঁর পথ পরিষ্কার করে রাজা ভীম অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বাধাহীন জলপ্রবাহের মতো মাহমুদ যত মন্দির পেলেন, সবগুলিকেই ধ্বংস করলেন; কিন্তু লুণ্ঠন করে ধনরত্ন সংগ্রহ করতে ভুললেন না। অনহলবাড়ার পর একজন সাহসী হিন্দু রাজা বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র দেশপ্রেম আর সাহস ব্যতীত তাঁর আর কিছু সম্বল ছিল না, তা মাহমুদের বিরাট বাহিনীর সম্মুখে অকিঞ্চিৎকর। দেবলপুরের রাজাও বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনিও প্রবল স্রোতে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গেলেন।

১০২৫ খৃষ্টাব্দের কোন এক বৃহস্পতিবারের বারবেলায় সোমনাথের মন্দিরের কঠিন পাথরের প্রাচীরের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন। মন্দিরের সুউচ্চ বিরাট চন্দনকাঠে নির্মিত লৌহ-পিণ্ড দ্বারা সুদৃঢ়কারী দরজা বন্ধ হয়ে গেল। প্রাচীর অথবা দরজা কোনটাই ভেদ করে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। এক রাত্রের মধ্যেই বহুশত মই নির্মিত হয়ে গেল, পরদিন সকাল থেকেই মন্দির আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। ব্রাহ্মণদের মূলধন ছিল সাহস যার উৎস ছিল অদৃশ্য দেবতার অনুভূতি। এই বলে বলীয়ান হয়ে তারা অমিতবিক্রমে এমনই যুদ্ধ করতে লাগল যে, মাহমুদের পক্ষে মন্দির জয় অসম্ভব মনে হ'ল, কোন কোন সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করতে লাগল। মাহমুদ তখন তাঁর ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে বালুবেলায় সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন—"আল্লা, হিন্দুদের দেবতা যদি তাদের দেহে ও মনে সাহস সঞ্চার করতে পারে, তবে তুমিও কি তা পার না? ধর্মযুদ্ধে আমরা কি পরাজয় বরণ করব? এইরূপে প্রার্থনা করে মাহমুদ যেন হৃদয়ে বল পেলেন, তিনি ঘোড়ায় উঠে পড়ে পাশেই যে সেনাপতিকে পেলেন, তাকে ধরে সসৈন্যে ভীষণ বেগে মন্দিরের দিকে ছুটে চললেন। এই আক্রমণের বেগ মন্দিরবাসীরা সহ্য করতে পারল না, তা ছাড়া তাদের হঠাৎ ধারণা হ'ল যে, দেবতা মূর্তি ত্যাগ করে তাদের ছেড়ে চলে গেছেন, বিধর্মীদের স্পর্শ তিনি সহ্য করবেন কেন? এই ধারণা তাদের মনে দ্রুত এমনই বদ্ধমূল হয়ে পড়ল যে, তারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। ওদিকে মাহমুদও সদলে মন্দিরে প্রবেশ করেছে। তখন পুরোহিতদের চিন্তা হল কি করে দেবমূর্তি রক্ষা করা যায়! তাঁরা মাহমুদকে দুই কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাহমুদ রাজী নন।

"যেদিন মৃত্যুর পর আমাদের পুনরুত্থানের দিন আসবে আর আল্লা প্রশ্ন করবেন কোথায় সেই কাফের যে বিধর্মীদের মূর্তি সর্বোচ্চ দামে বিক্রয় করেছে? তখন আমি কি উত্তর দোব? নরকে আমি পতিত হতে চাই না। মূর্তি আমি ভাঙবই ভাঙব।" মাহমুদ এই উত্তরই দিয়েছিলেন।

এক কুঠারের আঘাতে মাহমুদ নিজের হাতেই লিঙ্গমূর্তি ভঙ্গ করেন। মূর্তির মধ্যে রক্ষিত ছিল বহু কোটি সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যের অসংখ্য ধনরত্নরাজি। এই সবই মাহমুদের ভাগ্যে লাভ হল।

সোমনাথের যুদ্ধে বহু সহস্র হিন্দু প্রাণ দিয়েছেন। অনেকে স্ত্রী-পুত্রসহ মন্দির-প্রাচীর থেকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের জল থেকে তুলে হত্যা করা হয়। মাহমুদ গজনীতে ফিরে যাবার সময় স্ত্রী-পুরুষ বহু বন্দী নিয়ে গিয়েছিলেন। চন্দনকাঠের বৃহৎ দরজাও তিনি খুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে তা এখন আগ্রা দুর্গে রক্ষিত আছে।

সোমনাথের মূর্তিকে মাহমুদ চার ভাগ করেছিলেন। এক ভাগ পাঠিয়েছিলেন মক্কায়, এক ভাগ মদিনায় আর অপর দু'ভাগ নিয়ে যান গজনীতে। মূর্তি মস্তক ও বক্ষস্থল দ্বারা গজনীতে জামী মসজিদের সোপান নির্মিত হয়েছে, যাতে প্রতিদিন শত শত হিন্দুধর্ম-বিরোধীরা তাতে পদাঘাত করতে পারে।

গজনীতে ফিরে ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে ৬১ বৎসর বয়সে মাহমুদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে হিন্দুস্থান লুণ্ঠন করে যত হীরা-মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করেছিলেন, সমস্ত নিজের সম্মুখে এনে সাজিয়ে রাখতে বললেন। কিন্তু হায়

হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা

মাহমুদ সে সবের দিকে অনিমেষ লোচনে চেয়ে রইলেন, কিন্তু সেই বিশাল রত্নরাজি তাঁর মৃত্যু রোধ করতে পারল না। বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে তিনি কেঁদে উঠেছিলেন, সহস্র নর-নারীর হত্যাকারীর মৃত্যুকে এত ভয়!

সোলাঙ্কি বংশের বংশধরেরা আজও বেঁচে আছে। মুসলমান ভ্রমণকারী বর্ণিত সোমনাথ মন্দিরের বিবরণী আজও পাওয়া যায়, শুধুই পাওয়া যায় না সেই গজনীর মামুদকে। প্রভাস-পত্তনে আবার নির্মিত হবে সোমনাথের মন্দির, সেখানে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে মহাদেবের মূর্তি, প্রতিষ্ঠিত হবে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

জয় সোমনাথের জয়!
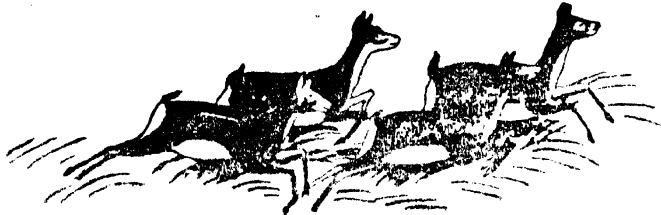
আদিবাসীর সাংস্কৃতিক সমস্যা

শ্রীসুবোধ ঘোষ

ভারতের আদিবাসী সমাজের ভাষা সম্বন্ধে পূর্বে অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, আদিবাসীদের ভাষার স্থায়িত্ব উন্নতি ও উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে তার সমাধানের উপায়ই বা কি?

আদিবাসীদের ভাষা সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করা যায়ঃ—এদের ভাষা হলো শুধু কথিত ভাষা। লিখিত ভাষা নয়, অর্থাৎ ভাষাকে লিপিবন্ধ করে রূপ দেবার মত কোন অক্ষর আবিষ্কৃত হয়নি। উপজাতীয় ভাষা আছে, কিন্তু উপজাতীয় অক্ষর বা লিপি নেই।

খৃস্টান মিশনারীরা প্রথম উপজাতীয় আদিবাসীদের ভাষাকে লিখিতভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তাঁরা রোম্যান অক্ষরকেই গ্রহণ করেছেন। কোন কোন উপজাতীয় ভাষার একটা ব্যাকরণ রচনার প্রয়াসও মিশনারী সম্প্রদায় করেছেন। বাইবেল প্রচার করার জন্যই প্রধানত মিশনারী সম্প্রদায় উপজাতীয় ভাষার জন্য এই উৎকর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু ১৮৬৬ সালেই স্যার রিচার্ড টেম্পল এই অভিমত প্রকাশ করে গেছেন যে, আদিবাসীদের ভাষার জন্য দেবনাগরী অক্ষরই প্রকাশভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তিনি বলেছেন, রোম্যান অক্ষরে গন্দি ও অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হলেও দেবনাগরী অক্ষর এ বিষয়ে বেশী উপযুক্ত। (১)

আর একটা কথা। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে আদিবাসীরা প্রধানত দ্বিভাষী (Bilingual)। একটি তাদের নিজস্ব উপজাতীয় ভাষা, পারিবারিক জীবনে উপজাতীয় ভাষা তারা ব্যবহার করে, কিন্তু বর্তমান বৈষয়িক জীবনে বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হওয়ায় আদিবাসীরা আর একটা সমতল প্রদেশের ভাষায় (হিন্দী, তেলেগু, বাঙলা ইত্যাদি) সমান দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে শিখেছে। এই অবস্থায় আদিবাসীরা যদি লেখাপড়ার ব্যাপারে রোম্যান অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত থাকে, তবে হিন্দী তেলেগু এবং বাঙলা ইত্যাদি উন্নত সাহিত্য তাদের কাছে পর হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ যদি নিজস্ব উপজাতীয় ভাষার জন্যই দেবনাগরী বা আঞ্চলিক উন্নত ভাষার (বাঙলা তেলেগু ইত্যাদি) অক্ষর তারা গ্রহণ করে, তবে একই সঙ্গে দুটি উপকার তাদের কাছে সুলভ হয়ে উঠতে পারে। নিজস্ব উপজাতীয় ভাষাকে লিপিবন্ধ করতে পারবে এবং আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেও প্রবেশ সহজ হবে। আদিবাসীদের মত সঙ্গতিহীন সমাজের পক্ষে এক সঙ্গে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের অক্ষর প্রণালী শেখবার চেষ্টা বস্তুতঃ আদিবাসীকে বিড়ম্বিত করা। সাধারণ ভারতবাসীর ছেলে তার মাতৃভাষার একটিমাত্র অক্ষর প্রণালীর সাহায্যে বিদ্যারম্ভ করে। কিন্তু আদিবাসী ছেলেকে দুই ধরণের অক্ষর প্রণালীর দ্বারা অত্যাচার করা কি উচিত?

খৃস্টান মিশনারীরা বলবেন, একটি মাত্র অক্ষর প্রণালীই হোক, কিন্তু সেটা হবে রোম্যান অক্ষর। কিন্তু এর ফলে আদিবাসী মানুষ তার হিন্দী বাঙলা তেলেগু প্রভৃতি একটি আঞ্চলিক ভাষার দক্ষতা সত্ত্বেও, সেই ভাষার সাহিত্যগত সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ একটা উন্নত ভাষা আয়ত্ত ক'রেও সেই ভাষার সাংস্কৃতিক শক্তি তার কাছে অনায়ত্ত হয়ে থাকবে, পড়তে না পারার জন্য। অথচ এই আঞ্চলিক ভাষা তার জীবনের প্রতি পদে প্রয়োজন। হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে আদালতে সভা মণ্ডপে, আইন পরিষদে—সর্বত্র আদিবাসীকে তার বক্তব্য ও ভাব প্রকাশের জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে হয়। এই আঞ্চলিক ভাষাকে মুখে মুখে ও মনে মনে শিখেও, শুধু অক্ষর পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়ে কেন সে তার শিক্ষাকে অপূর্ণ করে রাখবে?

চিরকাল ইংরাজ শাসন, ফরাসী শাসন বা জার্মান শাসন যদি ভারতবর্ষে থাকে, তবে ইংরাজী ফরাসী বা জার্মান ভাষা অবশ্য সরকারী ব্যাপারে প্রধান ভাষা হয়ে থাকবে এবং সে ক্ষেত্রে রোম্যান অক্ষরে পরিচিত হবার একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু সে রকম বৈদেশিক শাসন তো কোন দেশের পক্ষে সনাতন রীতি নয় এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য ঘুচে যেতে বসেছে। তা ছাড়া ইংরাজী ভাষা শিখে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবার সম্ভাবনা কজন আদিবাসীর ছিল? খুব অল্প সংখ্যক? সুতরাং অল্পসংখ্যক ভাবী সরকারী কর্মচারীর জন্য সমগ্র জনশিক্ষার বিষয় ইংরাজী অক্ষরে (অর্থাৎ রোম্যান অক্ষরে) পরিচালনা করার কোন অর্থ হতে পারে না। আদিবাসী জনসাধারণের পক্ষে হাটে বাজারে ভারতীয় ভাষা প্রয়োজন। সুতরাং আদিবাসীদের জন্য কোন ভারতীয় ভাষার অক্ষরই গ্রহণ করার বস্তু। ভারতীয় ভাষার অক্ষর গ্রহণ করলে, যেমন উপজাতীয় ভাষার সাহিত্য রচনা লিপিবন্ধ ও মুদ্রিত করা সহজসাধ্য হবে, তেমনি আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেও দখল সহজতর হবে। এর ফলে উভয়ের উন্নতি। আদিবাসীর নিজস্ব উপজাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ এবং ভারতীয় সাহিত্যে আদিবাসী লেখক ও চিন্তাশীলের দান সম্ভব হবে।

আদিবাসী সমাজের প্রত্যেক উপজাতীয় ভাষা এক একটা সমৃদ্ধ ব্যঞ্জনাপ্রবণ ভাষা নয়। অধিকাংশ ভাষাই শত শত অপভ্রংশে পরিণত। একই গন্দি বা সাঁওতালী ভাষা জেলায় জেলায় জঙ্গলে জঙ্গলে উপত্যকায় উপত্যকায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে এবং বিকৃতি অনুসারে পরস্পর থেকে অল্প বিস্তর পৃথক। সিংভুম জেলায় আদিবাসীদের মধ্যে নয়টি উপভাষা (Dialect) প্রচলিত। আদিবাসী সমাজের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তাদের ভাষাগত বিপর্যয়ের বহু ঘটনা হয়ে গেছে। কোন কোন গোষ্ঠী তার আদি ভাষাটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বা বর্জন করে নতুন একটি উপজাতীয় বা ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করেছে। ভাষায় ভাষায় সংমিশ্রণ হয়ে বহু সংকর ভাষার উদ্ভব হয়েছে। আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত এই সংকর ভাষাগুলি নিতান্ত দুর্বল ভাষা। এই দুর্বলতার কারণ প্রধানতঃ হলো, ভাষীদের সংখ্যাল্পতা, অল্প সংখ্যক মানুষের মুখে কথিত হয়ে কোন ভাষা বড় হয়ে উঠতে পারে না। বরং দিন দিন সে ভাষার শক্তি ও ভাবপ্রকাশের সামর্থ্য কমে আসতে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে ভাষা জিনিসটা দুর্মর। এই দুর্বল অপভ্রংশবহুল উপভাষাগুলি লুপ্ত হতে বহু সময় নেয়। অকেজো হয়েও এই দুর্বল উপভাষাগুলি টিকে আছে। মাত্র সাঁওতালী গন্দি প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতীয় ভাষা ভাষীদের সংখ্যাগুরুত্বের জন্য ভালভাবেই বেঁচে আছে। ১৯২১ সালের সেন্সাস কমিশনার মিঃ ট্যালেন্টস আরও স্পষ্ট করে এই মন্তব্য করেছেন যে—"এই সব অপরিণত স্বতঃসৃষ্ট কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে এমন কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই যা সংরক্ষণ করে রাখবার যোগ্য। সমতল প্রদেশের বেশী ঐশ্বর্যপূর্ণ সাধারণ ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে এই সব উপজাতীয় ভাষা মিশে

(1) Aboriginal Tribes of the Central Provinces—Hislop.

লুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য এবং সেজন্য দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। (২)

মিঃ গ্রীগসন বলেন—"উপজাতীয়েরা নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেললে এই একটা লাভ অবশ্যই হয় যে, তাদের লেখাপড়া শেখবার সমস্যাটি সহজে সমাধান করা সম্ভব হয়। (৩)

মিঃ সিমিংটন ভীলদের শিক্ষা সমস্যা আলোচনা ক'রে এই মন্তব্য করেছেন যে, ভীলি অথবা অন্য কোন উপভাষায় তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করাই উচিত। মিঃ সিমিংটন কোন ভারতীয় ভাষাতেই ভীলদের শিক্ষা বিধানের সার্থকতা সমর্থন করেন। কারণ উপভাষাগুলির দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা সম্বন্ধে মিঃ সিমিংটন যথেষ্ট সচেতন। এক তালুক থেকে কিছু দূরে আর একটি তালুকে গেলেই উপভাষাগুলির পরস্পরের মধ্যে মাত্রাহীন পার্থক্যের রূপটা উপলব্ধি করা যায়। এখানে এক রকম ওখানে আর একরকম। এ ভাষাগুলি বস্তুতঃ ভাষাই নয়। বলতে গেলে বলা যায় কতগুলি 'বাক্যের বিকৃতি।' (৪)

' তবে মিঃ সিমিংটন প্রস্তাব করেছেন যে, যে সব শিক্ষক আদিবাসী সমাজকে ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করবেন, তাঁরা যেন স্থানীয় আদিবাসীর উপজাতীয় ভাষা বা উপভাষা সম্বন্ধে পারদর্শী থাকেন। উড়িষ্যার আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল সম্বন্ধে তদন্ত কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও মন্তব্য করা হয়েছে যে—"খন্দমাল গঞ্জাম কোরাপুট ভৃতি আদিবাসী অঞ্চলে স্কুলের শিক্ষকেরা বশ্য উড়িয়া ভাষাতেই আদিবাসীকে শিক্ষাদান রবেন, কিন্তু শিক্ষকদেরও স্থানীয় আদি-সীর ভাষা সম্বন্ধে সম্যকভাবে পারদর্শী হতে বে।

আদিবাসীদের উপজাতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য ুণ ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনেকে প্রশংসার উচ্ছাস দখিয়ে থাকেন। যেমন, মিঃ এলুইন। গন্দি ষায় কতগুলি লোক-সঙ্গীত ও গাথা অবশ্য াছে, সাঁওতালী ভাষায় অনেক ছড়া গান ্পেকথা ও উপকথা আছে। সবই সত্যি। কন্তু বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের তুলনায় এই ব উপজাতীয় ভাষার ঐশ্বর্য কতটুকু? শুনতে অনেকের খারাপ লাগলেও সত্য কথা হলো, এই সব উপজাতীয় ভাষা সাহিত্যগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে তেমন কিছুই নয়। সব চেয়ে বড় কথা হলো, বর্তমান যুগের উপযোগী নয়। এসব উপভাষা কয়েক হাজার বছর আগেকার আরণ্য জীবনের উপযোগী ভাষা। ভাষার যাদুঘর হিসাবে এই সব ভাষাকে সাজিয়ে রাখতে অনেকে ইচ্ছে করেন, কিন্তু সেটা হলো যাদুঘর দরদীর মনোবৃত্তি,আদিবাসী দরদীর মনোবৃত্তি নয়। আদিবাসীকে উন্নতি করতে হ'লে, তাকে উন্নত ভাষার সুযোগ ও দীক্ষা দিতেই হবে।

"সিংভূমের আদিবাসী হো সমাজকে হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্য বিষয়ে অনুন্নত হয়েও এই আদিবাসী সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করেছে।" (৫)

এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর এমন অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন যে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করলে আদিবাসীর ক্ষতি হবে। হিন্দী ভাষা শিখে হো সমাজের কোন ক্ষতি হয়নি বিম্বা তারা আরও অবগত হয়নি।

সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, ভাষা জীবনের কোন একটা লক্ষ্য নয়। একটা লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়, একটা পদ্ধতি। দেখতে হবে, আদিবাসীর জীবনকে উন্নত করার জন্যই পদ্ধতি হিসাবে ভাষা কাজ ঠিক করছে কি না। হিন্দী ভাষা শেখান অর্থ হিন্দু সংস্কৃতিতে দীক্ষা দেওয়া নয়, অথবা আদিবাসী সংস্কৃতিকে লুপ্ত করে দেওয়া নয়। হিন্দী ভাষাকে আদিবাসীর সংস্কৃতিগত জীবনের বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্যগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই অথবা আরও উন্নত করার জন্যই নিয়োজিত করা যায়। যাঁরা পরিবর্তন বিরোধী, একমাত্র তাঁরাই উল্টো কথা বলেন। কিন্তু আদিবাসী সমাজকে যাঁরা আধুনিক যুগের সমাজে পরিণত হতে দেখতে চান, তাঁরা অবশ্যই আদিবাসীদের জন্য যুগোপযোগী ভাষায় সুপারিশ করবেন। হিন্দী ভাষার সাহায্যেই সুন্দর ও বিরাট 'সাঁওতালী সাহিত্য' রচিত হতে পারে। বাঙলা ভাষার সাহায্যেই বিশেষ একটি 'পাহাড়িয়া সাহিত্য' সৃষ্টি হতে পারে।

আদিবাসীর পক্ষে ভারতীয় ভাষা গ্রহণের প্রস্তাব একটা রাজনৈতিক অভিমত নয়। এর মধ্যে ভারতীয় করণের কোন আক্রমণমূলক নীতি নেই। এটা নিছক নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের অভিমত। একজন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক এ সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন দেখা যাক :

ডাঃ ম্যারেট তাঁর নৃতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে ভাষা অধ্যায়ে বলেছেন যে, উপজাতীয়দের সংস্কৃতিগত বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাকে যখন সভ্য প্রভুরা পরিবর্তন করতে চান, তখন তাঁদের পক্ষে একটু সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। আদিবাসীদের সংস্কৃতিগত বা সমাজগত বৈশিষ্ট্যের সবই বদলে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। যে সব উপজাতীয় ব্যবস্থা তাদের জীবনের উন্নতির পক্ষে হানিকর সেগুলিকে মাত্র অপসারিত করবার প্রয়াস আবশ্যক। হঠাৎ অথবা সব কিছু একদিনে বদলে দেবার চেষ্টা করলে আদিবাসীদের মানসিক গঠনের সর্বনাশ করা হবে। কিন্তু সংস্কৃতিগত এই সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে কথা সত্য, ভাষার ব্যাপারে সেটা সত্য নয়। উপজাতীয় ভাষা বদলে দিয়ে নতুন উন্নত ভাষা প্রচলিত করলে কোন ক্ষতি হবে না। (১)

লাঙ্গল দিয়ে যে সাঁওতাল ক্ষেত চাষ ও শস্য উৎপাদন করে সেও কৃষক। আবার একজন রাজপুত বা ভূমিহার ব্রাহ্মণ যখন ক্ষেত চাষ করে, সেও কৃষক। কিন্তু সাঁওতাল কৃষক ও রাজপুত কৃষকের মধ্যে মনস্তত্ত্বগত প্রভেদ অনেকখানি। হিন্দী ভাষী রাজপুত কৃষক যে মনের অধিকারী, সাঁওতাল কৃষক সে ধরণের মনের অধিকারী নয়। একজন ভাষায় উন্নত, আর একজন ভাষায় অবনত। এক্ষেত্রে উভয়ের চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবগ্রহণ ক্ষমতা ও জীবনে উন্নত হবার শক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য। এর প্রধান কারণ—ভাষাগত শক্তির তারতম্য।

আদিবাসী উপজাতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যই এবং বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক জীবনের পরীক্ষার যোগ্য হবার জন্যই তাদের পক্ষে একটি উন্নত ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করা উচিত। ভারতীয় ভাষা আদিবাসীর পক্ষে নিতান্ত 'বৈদেশিক ভাষা' নয়। কারণ, ভারতীয় ভাষা যে সংস্কৃতির বাহন সেই সংস্কৃতি আদিবাসীর পক্ষে বৈদেশিক সংস্কৃতি নয়। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির, উভয়ের ভিত্তি দূর অতীতের এক ঐতিহাসিক সম্পর্কে যুক্ত। আদিবাসী সংস্কৃতিকে প্রায় হিন্দু (Proto-Hindu) সংস্কৃতি বলা হয়েছে। সংস্কৃতিগত ঐতিহাসিক বনিয়াদ এক আছে বলেই, বর্তমানে ভাষাগত বনিয়াদ এক ক'রে দিলে কোন হানি হবে না।

(২) "There is nothing that is worth preserving in these rudimentary indiginous tongues, and there inevitable absorption in the more copious lingua franca of the plains is not at all to be regretted"—Tallents. (Census of India 1921).

(3) Notes on the Aboriginal Problems in the Mandla District

(4) "These dialects besides varying from taluka to taluka, are so far as I can ascertain merely corruptions of good speech."—D. Symington (report on the Aboriginal & Hill Tribes of the Partially excluded areas in the Province of Bombay 1940).

(5) A tribe in Transition—D. N. Majumdar

(1) "Whereas it is the duty of the civilized overlords of primitive folk to leave them their old institutions so far as they are not directly prejudicial to their gradual advancement in culture, since to lose touch with one's home-world is for the savage to lose heart altogether and die; yet this consideration hardly applies at all to the native language. If the tongue of an advanced peoples can be substituted, it is the good of all concerned"—Dr. R. R. Marett ('Anthropology').

প্রচ্ছন্না প্রকৃতি

এলেন গ্ল্যাসগো

[মার্কিন মেয়ে এলেন গ্ল্যাসগো নতুন লেখিকা —কিন্তু জীবনের সংগে তাঁর পরিচয় যে কতো গভীর তা বর্তমান গল্পটি জানিয়ে দেবে।]

আজ যে দিনের কথা আমি বলবো আমার জীবনে সে দিন এক অপূর্ব প্রভাতের আলো বিকীরিত করে উদয় হোয়েছিল। আজও দীর্ঘদিন পরে আমার চোখের ওপর ভাসছে নিউইয়র্ক হাসপাতালের জানালা দিয়ে হেলে পড়া শীতের অবসিত রৌদ্র আর শুভ্র পরিচ্ছদমণ্ডিত নার্সের দল। আর বার বার আমার মনে হোচ্ছে তার আগে মাত্র একবার সেই বিখ্যাত শল্যবিশারদ রোলান্ড মারাডিকের সংগে কথা বলবার সৌভাগ্য আমার হোয়েছিল । আমার আজো বেশ পরিষ্কার মনে আছে সেই একবার মাত্র অস্ত্রোপচার-টেবিলে কাজ করতে করতে ডাক্তার মারাডিকের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্যকে আমি আমার সমগ্র জীবনের আনন্দভাণ্ডারে সঞ্চিত রেখে অবশিষ্ট দিনগুলিকে উজ্জ্বল করে রাখতে চেয়েছিলুম।

—টেলিফোনে কথা শেষ করে আমি কিছু-ক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হোয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। তারপর প্রায় ছুটে মেট্রনের কাছে এসে বলেছিলুম, না, না, আমার নাম করেন নি, বোধ হয় কোনো ভুল হোয়েছে।

আমার মুখের দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে মেট্রন উত্তর দিলো, না, কোন ভুল হয় নি। তিনি তোমারি কথা বলেছেন। আরো বলেছেন, দিনের বেলার নার্স ঠিক সন্ধ্যা ছটায় চলে যায়, কাজেই একটুও দেরী করা চলবে না। মিসেস মারাডিককে এক মুহূর্তের জন্যেও একেলা রাখা অসম্ভব।

—বেশ আমি ছটার আগেই যাচ্ছি। আচ্ছা মিসেস মারাডিক মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন, না? আমি কিন্তু এর আগে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর সেবা করি নি। কেন যে ডাক্তার মারাডিক আমাকে পছন্দ করলেন। এতো আশ্চর্য লাগছে আমার!

—মেট্রন আমার কথা শুনে হাসতে লাগলো, তারপর কোমল গলায় বললো, দেখো, যখন এই নিউইয়র্কে বহু রোগীর সেবা করে তোমার প্রচুর অভিজ্ঞতা হবে, তখন অনেক কিছু তোমাকে হারাতেও হবে। তার মধ্যে বিশেষ দুটি জিনিষ হোচ্ছে তোমার কোমল হৃদয় আর বিচিত্র কল্পনাপ্রবণতা।

—মেট্রনের শান্ত মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ নীরব ছিলুম। তারপর বলেছিলুম, কিন্তু ডাক্তার মারাডিকের কথা মনে হোলে আমি যে অভিভূত না হোয়ে পারি না। এমন সুন্দর লোক তিনি, কি তাঁর নাম, আর তার এই দুর্ভাগ্য।

—হ্যাঁ সকলে ওঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে—এমনকি রোগীরা পর্যন্ত। মেট্রন আর কিছু না বললেও একথা মেয়েদের কারোর অবিদিত ছিল না যে, নারী যদি কোন পুরুষকে ভালোবাসতে চায়, সে পুরুষ হচ্ছে ডাক্তার মারাডিক। আমি আজো বিস্মৃত হতে পারিনি তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা। বেশ পরিষ্কার মনে আছে, দরোজা উন্মোচন করে ধীরে ধীরে যখন তিনি সেই অস্ত্রোপচারের টেবিলে এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে স্মিত-হাসিতে সর্বপ্রথমবার চাইলেন, তাঁর সেই উজ্জ্বল চক্ষু আমার যেন সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগিয়ে দিলো, কানে কানে গুণগুণিয়ে কে যেন বললো, আজ থেকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে তুমি বাঁধা পড়লে। আমি জানি, আমার এই কথা মেট্রনকে বললে তিনি হাসবেন, আমাকে কোমল গলায় তিরস্কার করবেন। কিন্তু একথা আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, সেই দৃষ্টি বিনিময়ে আমি শুধু ডাক্তার মারাডিককে ভালোবাসিনি, আমি তাঁর সেই জ্যোতির্ময় চক্ষু, কুঞ্চিত হলদে চুল আর মুখের বিষণ্ণগম্ভীর ব্যঞ্জনা অন্তরের গভীরে রেখায়িত করে নিয়েছিলুম। আর তার গলার স্বর। আমি বিশ্বাস করি না একবার সেই গলার স্বর শুনলে আর কখনো ভোলা যায়। একটি মেয়েকে আমি একবার বলতে শুনেছিলুম, ওতো গলা নয়, ওযে কাব্যঝঙ্কার।

কৌতূহল আমার বড়ো বেশি। মেট্রনকে জিগ্যেস করে বসলুম, আপনি তো মিসেস মারাডিককে দেখেছেন?

তা দেখেছি। বোধ হয় বছরখানেক হোল ও'দের বিয়ে হোয়েছে। ডাক্তারকে নিতে উনি মাঝে মাঝে হাসপাতালে আসতেন। দেখতে ও'কে ভারি সুন্দর। লোকে বলে ও'র অনেক টাকা আছে বলে ডাক্তার ও'কে বিয়ে করেছেন, আমি সেকথা বিশ্বাস করি না। আমি দেখেছি মিসেস মারাডিক ডাক্তারকে কতো ভালোবাসেন। আর দেখার জিনিস হোচ্ছে মিসেস মারাডিকের মেয়ে। মেয়েতো নয় মায়ের প্রতিচ্ছবি, যে কেউ দেখবে বলবে এই মেয়ে, ওই মা।

জানতাম আমি ডাক্তার মারাডিক এক সকন্যা বিধবাকে বিয়ে করেছেন। বিধবার নাকি প্রচুর সম্পত্তি আছে, তবে মেট্রনের কাছ থেকে জানতে পারলাম সেই সম্পত্তির মধ্যে গোলমাল আছে। মিসেস মারাডিকের পূর্বতন স্বামী উইল করে গেছেন, মেয়ে যতোদিন না সাবালিকা হোচ্ছে, তার মধ্যে বিয়ে করলে মিসেস মারাডিক সেই টাকা হোতে বঞ্চিত হবেন।

খবরটা আমার একটুও ভালো লাগলো না ঃ মিসেস মারাডিকের জন্যে বড়ো দুঃখ হোতে লাগলো।

পঞ্চম রাস্তার বাঁক পেরিয়ে যখন আমি ডাক্তার মারাডিকের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম, তখনও সন্ধ্যা ছটা বাজে নি। ঝির্‌ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বাঁক পেরোনোর সময় মনে হোল এই বৃষ্টি আর গুমোট আবহাওয়া মিসেস মারাডিকের নিশ্চয় ভালো লাগছে না।

বাড়ির সামনে এসে পড়লুম। প্রাচীন আমলের বাড়ি। এই বাড়িতেই নাকি মিসেস মারাডিক পৃথিবীর আলো সর্বপ্রথমবার দেখেন আর এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে তিনি রাজী হননি। এমনকি ডাক্তার মারাডিক তাঁর গভীর প্রেম নিয়েও এ বিষয়ে হেরে গেছেন—মিসেস মারাডিক অটল।

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘণ্টি বাজালে একজন বুড়ো নিগ্রো খানসামা এসে দরোজা খুলে দিলো। তাকে জানালাম ঃ আমি রাত্রির নার্স। আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নিঃসন্দেহ হোয়ে আমাকে সে ভেতরে ঢুকতে দিলো।

ভেতরে ঢুকে আমার চোখে পড়লো পাশে পাঠাগারে অগ্নিকুণ্ডে সুন্দর আগুন জ্বলছে। বুড়ো খানসামা ভেতরে খবর পাঠাতে গেল। যাবার সময় সে বলতে লাগলো, কবে যে বাচ্চাটার খেলা শেষ হবে—আমি বাপু এমন করে এই আধো অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে রাজী নই।

বৃষ্টিতে আমার কোটটা সামান্য ভিজে গিয়েছিল। সেটা শুকোনোর জন্যে আস্তে আস্তে আগুনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম: কিন্তু সতর্ক রইলুম যে, পায়ের শব্দ পেলেই সরে এসে সোজা হোয়ে দাঁড়াবো। হঠাৎ আমার

পায়ের কাছে একটা লাল-নীল রঙের বল পাশের অন্ধকার ঘর থেকে সজোরে গড়িয়ে এলো। আমি নীচু হোচ্ছি বলটা ধরবো বলে, এমন সময় দেখি একটি ছোট মেয়ে অদ্ভুত চাঞ্চল্য নিয়ে পাঠাগারে ঢুকলো। ঢুকেই কিন্তু নিশ্চল হোয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঃ বোধ হয় একজন অপরিচিতাকে দেখে বিস্মিত হোয়ে গেছে।

একফোঁটা মেয়ে সে, শরীর তার এতো লঘু যে, সেই সুমার্জিত মেঝের ওপর তার পায়ের শব্দ মোটে জাগে নি। বয়স তার ছয় কিম্বা সাত। পরনে স্কটদেশীয় পশমী ফ্রক, মাথায় একটা লাল ফিতে বাঁধা। বাদামী রঙের গোছা গোছা চুল সোজা কাঁধ পর্যন্ত নেমে গেছে। মুখখানি ভারি সুন্দর। আর সব থেকে সুন্দর হোচ্ছে তার চাহনী। চোখ দুটি আয়ত, কিন্তু সেই চোখে শিশুসুলভ কোনো চাঞ্চল্য নেই, আছে জীবনকে গভীর করে দেখার পরিচয়, আছে অভিজ্ঞতার তিক্তরূপ দর্শনের বেদনা।

—তোমার বল নিতে এসেছো বুঝি? আমার সেই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সেই বুড়ো খানসামার ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। খানসামা এসে পড়ার আগে আমি আর একবার বলটা ধরবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বলটা অন্ধকার ড্রয়িংরুমের দিকে গড়িয়ে চলে গেল, মেয়েটিও তার পেছনে ছুটে গেল। ইতিমধ্যে খানসামা এসে জানালো ডাক্তার মারাডিক তাঁর পড়ার ঘরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

"এইখানে বলি, ডাক্তার মারাডিকের ওপর আমার একটা মোহ ছিল। কারণ তার দুটোঃ প্রথমটা হোচ্ছে ডাক্তার মারাডিকের অস্ত্র চিকিৎসায় অপূর্ব দক্ষতা, দ্বিতীয়ত তাঁর সুন্দর চেহারা আর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার। আজকে তাঁর পড়ার ঘরে যখন তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে বললেন, মিস্ র‍্যানডোলপ্ আপনি এসেছেন বলে আমি সত্যি আনন্দ পেয়েছি, তখন ওই কথাগুলো না বলে যদি তিনি আমাকে মৃত্যুবরণ করতে বলতেন, আমি তা-ও পারতুম।

—আপনার সজীবতা আমাকে অস্ত্রোপচার টেবিলে আকৃষ্ট করেছিল। আমি তাই মেট্রনকে বলি আপনাকে পাঠিয়ে দিতে। মিসেস মারাডিকের পক্ষে যা এখন সবচেয়ে দরকার তা হোচ্ছে প্রফুল্লতা। দিনের বেলা যে নার্স থাকে তার এ সব বালাই নেই। এমন অবস্থায় সমস্ত পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে ভয় হয় শেষাবধি না ও'কে আশ্রমে পাঠাতে হয়।

এরপর ডাক্তার একজন চাকরাণীকে ডেকে আমাকে ওপরে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন, কিন্তু মিসেস মারাডিকের রোগ সম্বন্ধে কিছু বললেন না।

দশ মিনিটের মধ্যে আমি নার্সের পোষাক পরে প্রস্তুত হোয়েছিলুম। কিন্তু মিসেস মারাডিক আমাকে ও'র ঘরে ঢুকতে দিতে রাজী হোলেন না। আমি ফিরে এলুম, দিনের নার্স অক্লান্তভাবে চেষ্টা করতে লাগলো ও'র মত পরিবর্তনের। রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় মত পরিবর্তিত হোল। নার্স পিটারসনের কাছে শুনলুম রোজ তিনি এমন গোঁ ধরেন না, তবে আজ যে কি হোয়েছিল তা তিনিই জানেন।

মিসেস মারাডিকের দরোজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালুম আমরা। পিটারসন ইঙ্গিতে আমাকে নীরবে দরোজা খুলে ভেতরে যাবার কথা বললো। আমি তার কথামতো ভেতরে যাবার জন্যে যেই দরোজা খুলেছি অমনি দেখি সেই যে স্কটদেশীয় পশমী ফ্রকপরা মেয়েটি যাকে আমি পাঠাগারে দেখেছিলুম, সে ঘরের আবছা আলো থেকে বেরিয়ে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এখন আর তার হাতে বল ছিল না, একটা পুতুল ছিল। যাবার সময় পুতুলটা পড়ে গেল। ঘরে আমি ঢুকে গিয়েছিলুম। বেরিয়ে এসে পুতুলটা তুলতে গিয়ে আর সেটাকে খুঁজে পেলুম না। কোথায় গেল পুতুলটা—মনে হোল নার্স পিটারসন তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু একটা জিনিষ বড়ো খারাপ লাগলোঃ ওইটুকু মেয়ে এতো রাত্রেও জেগে আছে, এ বড়ো অন্যায়।

ঘরে একটি মাত্র মোমবাতি জ্বলছিল। মিসেস মারাডিকের শয্যার পাশে এসে দাঁড়াতে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি এক বিষণ্ণ অথচ মিষ্টি হাসি হাসলেন, বললেন, তুমি রাত্রির নার্স? তোমার নাম কি?

আমার নাম বললুম এবং দেখলুম কোনো রকম মোহ কিংবা উন্মত্ততার কোনো লক্ষণ ও'র মধ্যে নেই।

শুধু নাম নয় আমার বয়স যে মাত্র বাইশ তাও ও'কে বললুম। আর কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলুম সেই ছোট মেয়েটি আর মিসেস মারাডিকের মুখের সাদৃশ্য। উভয়ের মুখের পানপাতা আকারের গড়ন এক, রং সেই একই রকম বিবর্ণ। রেশমের মতোন কোমল মসৃণ বাদামী রংয়ের চুল আর ঘন ভ্রূলতা হোতে অনেক দূরে সন্নিবেশিত গভীর আয়তচক্ষু এক বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সকল সময় চেয়ে আছে।

বহুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হোয়ে গেল। হঠাৎ তিনি অস্ফুটস্বরে আমাকে বললেন, তোমাকে ভালো লোক বলে মনে হোচ্ছে। আচ্ছা বলো দেখি তুমি কি আমার বাচ্ছা মেয়েটাকে দেখেছো?

আমার দুচোখ হাসিতে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করে বললুম, হ্যাঁ, আমি তো তাকে দুবার দেখেছি। গড়ন দেখে বুঝতে পেরেছিলুম ও আপনার মেয়ে।

খুশীতে তাঁর সেই দুটি বিষণ্ণ চোখ হাসতে লাগলো। আমার দিকে তাকিয়ে অতি মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি তুমি বড়ো ভালো, হ্যাঁ, তুমি কি ভালো না হোলে তাকে দেখতে পেতে?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি যে আবেগ দমন করলেন তা পরিষ্কার দেখতে পেলুম। তারপর হঠাৎ আমার মাথা দুহাতে নিজের মুখের কাছে টেনে এনে বললেন, দেখো, ওকে যেন একথা বলো না, না কারুকে বলবে না তুমি ওকে দেখতে পেয়েছো।

—কারুকে বলবো না?

—না। দেখো তুমি ওকে বলবে না। করো, আমার কাছে শপথ করো তুমি ওকে বলবে না। মিসেস মারাডিকের কথা আর চাহনী থেকে একটা বিষম ভয় বিচ্ছুরিত হোয়ে উঠলো, জানো, ও চায় না সে ফিরে আসুক—ও তাকে খুন করেছে কি না।

—খুন—হত্যা!—আমার মনে হলো আমি যে রহস্যের কুয়াশায় এতোক্ষণ অন্ধ ছিলাম সেই কুয়াশা অকস্মাৎ অপসারিত হোয়েছে। মিসেস মারাডিকের ধারণা হোচ্ছেঃ তাঁর সন্তান যাকে আমি স্বচক্ষে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি, সে মৃত। আর তিনি বিশ্বাস করেন তাঁর স্বামী, ওই বিখ্যাত শল্যবিশারদ, যাঁকে আমরা হাসপাতালে পুজো করি তিনিই তাকে হত্যা করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নয় কেউ যদি এ রহস্যাবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে পশ্চাদপদ হয়। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যদি নার্স পিটারসন এই ঘটনার ওপর আলোকপাত করতে অনিচ্ছুক হোয়ে থাকে। বলো দেখি, কেউ কি সাদাচোখে এই মোহসত্তার সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে।

মিসেস মারাডিক আবার বলতে আরম্ভ করলেন, লোকে যা বিশ্বাস করে না, তা বলে লাভ নেই। কেউ মানতে চায় না যে, ও তাকে মেরে ফেলেছে, কেউ স্বীকার করতে চায় না, সে প্রত্যহ এ বাড়ীতে ফিরে আসে। কিন্তু তুমি তো তাকে দেখেছো?

—হ্যাঁ আমি তাকে দেখেছি। কিন্তু আপনার স্বামী কেন তাকে হত্যা করবেন?

আমার প্রশ্ন শুনে মিসেস মারাডিক যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, মনে হোল তাঁর চিন্তার মধ্যে যে ভয়াবহতা আছে তাকে ভাষায় রূপ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু কথা বললেন মিসেস মারাডিক, কেন খুন করবে না, ও যে আমায় কখনও, কখনও ভালোবাসে নি।

তাঁর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, বা রে, তিনি আপনাকে বিয়ে করেছেন, না ভালোবাসলে কি কখন বিয়ে করতেন?

—ওর টাকার প্রয়োজন—আমার বাচ্চা মেয়ের টাকার। জানো, আমি মরলেই সব টাকা ওর হবে।

কিন্তু ওর নিজের তো প্রচুর টাকা আছে। তাছাড়া ডাক্তারী করে তো উনি রাজৈশ্বর্য উপার্জন করবেন।

—না, ও-টাকায় হবে না। ওর লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার, একটা কঠিন রুক্ষতা আর

ধোদের থমথমে কালোছায়া যেন মিসেস রাডিককে আচ্ছন্ন করলো, স্খলিত কণ্ঠে তিনি লে গেলেন, না, আমাকে ও জীবনে কোনোদিন ালোবাসে নি। আমি জানি, আমার সঙ্গে রিচিত হওয়ার আগে অন্য, নিশ্চয় অন্য াউকে ভালোবেসেছে, হ্যাঁ ভালোবেসেছে।

* * *

উপলব্ধি করেছিলুম ও'র সঙ্গে তর্ক করা থা। হয়তো উনি উন্মাদ নন। কিন্তু ভয় আর ভক্তিহীন কল্পনা ওকে এমন অবস্থায় নেছে যে, উন্মাদ হতে আর বেশি রী নেই। ভাবলুম মেয়েটিকে খুঁজে ও'র কাছে নিয়ে আসি। পরমুহূর্তে মনে হোল এসব ব্যাপার অনেক আগে ঘটেছে। ডাক্তার মারাডিক আর নার্স পিটারসন নিশ্চয় এইভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কাজেই আমার কিছু করার নেই। বরং ও'কে ঘুম পাড়ালে কাজ হবে। শেষাবধি তাই করেছিলুম। অবশিষ্ট রাত্রিতে উনি আর জাগেন নি।

সকালে নার্স পিটারসন নিয়মিত সময়ের ঘণ্টা পরে এলো। ওষুধের প্রভাব তখনো কাটে নি, মিসেস মারাডিক নিদ্রাভিভূত। নার্স পিটারসনকে সব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নেমে এলুম খাবার ঘরে। সেখানে বৃদ্ধা তত্ত্বাবধায়িকা ছাড়া আর কারুকে দেখতে পেলুম না। সে বললো যে সকালে ডাক্তার মারাডিক যে ঘরে বসেন সেই-খানে তাঁর সকালের খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে।

—আর বাচ্ছা মেয়েটির খাবার কি নার্সারিতেই পাঠানো হোলো?

স্পষ্ট দেখলুম বৃদ্ধা চমকে উঠলো। মৃদু-কণ্ঠে আমার কথার উত্তর দিলেন, তুমি বোধ হয় জানো না এ-বাড়িতে কোনো ছোট মেয়ে নেই।

—সেকি! আমি তো কাল দুবার তাকে দেখেছি।

বৃদ্ধার মুখে একটা আশঙ্কার কালো ছায়া যেন নিবিড় হোয়ে উঠলো। প্রতিবাদ করার ভঙ্গীতে সে বললো, যে ছিল সে দুমাস আগে নিউমোনিয়ায় মারা গেছে। মিসেস মারাডিক অবশ্য বলেন, উনি তাকে দেখতে পান, কিন্তু আমরা তো জানি সে মারা গেছে।

—আপনি তাকে দেখতে পান না?

—না, আমি বাজে জিনিস দেখি না।—একটা কাঠিন্য বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে জাগলো।

মনে মনে ভাবলুম: আমারই ভুল হোয়েছে। যাকে আমি দুবার দেখেছি সে মৃত! কথাটা মনে করতে আমার একবার বুক কেঁপে উঠলো। একি রোগ মিসেস মারাডিকের!

—আচ্ছা বাড়িতে ধরুন দাসী-চাকরদেরও তো ছোট মেয়ে থাকতে পারে। দুর্ভেদ্য কুয়াশার মধ্যে আমি যেন আলোর সংকেত দেখতে পেয়েছি।

কিন্তু না, আমার কোনো অনুমানই খাটলো না। তবে এটুকুন জানলুম যে সেই যে বুড়ো নিগ্রো খানসামা যে আমায় দরোজা খুলে দিয়েছিল, ওর নাম হোচ্ছে গ্যাব্রিয়েল। ও বলে নাকি ও মেয়েটাকে দেখতে পায়। ওর কথা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করে না।

বৃদ্ধার কাছে জানলুম, মেয়েটির নাম ছিল ডরোথিয়া। ডরোথিয়া কথাটার অর্থ হোচ্ছে ঈশ্বরের দান। সে নাকি সত্যি তা-ই ছিল। তার নামকরণ হোয়েছিল মিসেস মারাডিকের প্রথম স্বামী মিঃ বালার্ডের মায়ের নামে।

বৃদ্ধার সঙ্গে কথা শেষ হোয়ে গেলে একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলুম। দাসী-চাকরদের কোনো কথা মিসেস মারাডিকের কানে দিতে দেওয়া হয় না।

আমার চা-পান শেষ হোয়েছে এমন সময় ডাক্তার ব্রানডন এলেন। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ উনি, ও'র চিকিৎসায় মিসেস মারাডিক আছেন। ডাক্তারকে আমার একটুও ভালো লাগে নি। উনি প্রসিদ্ধ ডাক্তার হোতে পারেন, কিন্তু ও'র কোনো মন অথবা হৃদয় আছে একথা আমি স্বীকার করতে পারলুম না। যারা নার্স তাদের আমি এক কথায় বোঝাতে পারবো উনি কোন শ্রেণীর চিকিৎসক। দীর্ঘাকৃতি, গম্ভীর এবং গোলাকৃতি মুখের একটি লোককে মনে করা যাক। ইনি একটি একটি করে মানুষের চিকিৎসা করেন না, এক-একদল মানুষের চিকিৎসা করেন। পড়াশোনা ও'র জার্মানিতে। ও'র শিক্ষার মূল-মন্ত্র হোচ্ছে মানুষের প্রতিটি আবেগকে দেহের কোনো অংশবিশেষের আক্ষেপ বলে স্থির করা। ও'র দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হোত এ জীবনে তিনি যে কোনো কিছু থেকেই বঞ্চিত। কেননা দেহটা ও'র কাছে কতকগুলি স্নায়ু আর আবেগের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু তো নয়।

সন্ধ্যা সাতটার সময় ডাক্তার মারাডিক তাঁর পড়বার ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ঘরে ঢুকলে ডাক্তার দরোজাটা বন্ধ করে দিলেন, তারপর আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। ও'র হাসিতে এই বাড়ির সমস্ত বিষণ্ণতা যেন উড়ে গেল। আমাকে তিনি জিগ্যেস করলেন, কাল-রাত্রিতে মিসেস মারাডিক কেমন ছিলেন?

—রাত এগারোটার সময় আমি ওষুধ দিই। তারপর উনি বেশ ভালোই ঘুমোন।

প্রায় এক মিনিট ধরে ডাক্তার নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলুম আমার ওপর তাঁর সেই অসামান্য মনোহরণকারী ব্যক্তিত্বের প্রভাব তিনি বিস্তার করছেন। আমি যেন এক প্রখর আলোকের উৎসে এসে দাঁড়িয়েছি: আমার মধ্যে কোনো কিছু গোপন, অবগুণ্ঠিত থাকবে না।

—আচ্ছা উনি কি ও'র সেই ধারণা, মানে অদ্ভুত মোহ সম্বন্ধে কোনো কিছু বলছিলেন।

জানি না অন্তরীক্ষ লোক হোতে কে যেন আমার কানে কানে বলে গেল, সাবধান! নিপুণ ভাস্করের হাতে খোদাই করা নিখুঁত মূর্তির মুখের মতো ডাক্তারের সেই সুগঠিত অপূর্ব-সুন্দর মুখ সেই অভিভূত করা সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে আমি সচেতন হোয়ে উঠলুম, অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করলুম, এই প্রাসাদ ভবনে সাংসারিক আদানপ্রদানে আমাকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। মিসেস মারাডিকের সমর্থন কিম্বা বিরোধিতা ব্যতীত অন্য কোনো মধ্যপথ আর এখানে নেই।

এক মুহূর্তের মধ্যে আমার এই উপলব্ধি শেষ হয়েছিল। আমি বেশ সহজভাবে ডাক্তারকে উত্তর দিলুম, কই বিশেষ কিছু তো বললেন না, শুধু তাঁর মেয়ে না থাকাতে কিরকম দুঃখ তিনি পাচ্ছেন সেই কথাই বলছিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ডাক্তার মারা-ডিক। তারপর ভারি গলায় বললেন, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার সঙ্গে ডাক্তার ব্রানডনের দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—উনি কি বলছেন জানো? উনি বলছেন অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। রোজাডেলে বোধ হয় পাঠাতে হবে।

আমি কোনোদিন ডাক্তার মারাডিককে বিচার করি নি। জানি না উনি সেদিন সত্যপথে চলে-ছিলেন কিম্বা অসত্যকে আশ্রয় করেছিলেন। সেদিন যা ঘটেছিল আজ সেকথাই আমি বলছি।

একটা শুভবুদ্ধি আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। আমি ডাক্তারের কথার প্রতিবাদ করেছিলুম, আমি বলেছিলুম মিসেস মারাডিক মোটেই অসুস্থ নন। ওকে অসুস্থ বলা কিম্বা উন্মাদাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় ছাড়া আর কোনও কিছু হতে পারে না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার কথায় ডাক্তার মারাডিক ভয় কিম্বা আঘাত যা হোক একটা কিছু পেয়েছিলেন। কেননা এ বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর আর কোনোদিন আলোচনা হয় নি, যদিও আমি এ ঘটনার পর প্রায় এক মাস সেই বাড়িতে ছিলুম আর সেবা করে-ছিলুম মিসেস মারাডিকের।

আস্তে আস্তে অনেকগুলি দিন চলে গেল। মিসেস মারাডিককে বেশ সুস্থ বলে বোধ হতে লাগলো। তাঁর রূপ যেন আরও বিকশিত হলো, কথায় যেন মধু ঝরে পড়তে লাগলো। আমি অবাক হয়ে মাঝে মাঝে তাকিয়ে ও'কে দেখতুম আর মনে মনে ভাবতুম উনি কি এই পৃথিবীর মানুষ!

কিন্তু ও'কে পরিবেষ্টিত করা অতুলনীয় মাধুর্যও সময় সময় একটা কালো অঙ্গ-রাখায় আবরিত হয়ে যেতো। আমি সবিস্ময়ে দেখতুম স্বামীর সম্বন্ধে ও'র কি ভয় আর কি তীব্র ঘৃণা। বারান্দায় ডাক্তার মারাডিকের পায়ের শব্দ পর্যন্ত ও'কে বিচলিত করে তুলতো!

সমস্ত মাসভোর আমি মেয়েটিকে আর দেখতে পাইনি। মাত্র একদিন রাত্রিতে

মিসেস মারাডিকের ঘরে এসে দেখি যে বড়ো জানালাটার ধাপের ওপর, ছোট ছেলেমেয়েরা নুড়ি পাথর কিম্বা গাছ দিয়ে যে রকম বাগান করে, সেই রকমের বাগান আর পিচবোর্ডের ভাঙা বাক্সের পাঁচিল তৈরী করা রয়েছে। আমি অবশ্য এ সম্বন্ধে মিসেস মারাডিককে কোনও কথা বললুম না। একটু পরে দাসী এসে যখন জানালার পর্দা টেনে দিতে গেল, আমি সেই দিকে চেয়ে দেখি সেই বাগান বাক্স সব অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দিন যেতে লাগলো। মিসেস মারাডিক প্রায় সেরে উঠলেন। আমার মনে হলো এইবার ডাক্তার বলবেন বায়ু পরিবর্তনে যেতে। কিন্তু না, যা মনে করা যায় তা হয় না।

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একদিন পরিষ্কার দিনে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। দিনটা ভারি সুন্দর ছিল। যেন বলছিল শীত শেষ হয়ে এলো, বসন্ত আসছে।

নার্স পিটারসন এসে অনুরোধ করলো মিসেস মারাডিকের কাছে কয়েক মুহূর্ত বসতে। মিসেস মারাডিকের ঘরে ঢুকে দেখি অপরাহ্ণের আলোকে সারা ঘর ভরে গেছে। ধীরে ধীরে আমি বাগানের দিকের জানালার কাছে সরে এলুম। বাগানের দিকে চেয়ে ভারি ভালো লাগলো গাছপালা আর ঝর্ণার সেই রুপালি জলধারাকে। ইচ্ছে হলো মিসেস মারাডিককে নিয়ে ওই ঝর্ণার চারপাশে যে পথটা ঘুরে গেছে, ওই পথে বেড়িয়ে আসি।

মিসেস মারাডিক বসে বসে বই পড়ছিলেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি মুখ তুলে চেয়ে নীরব হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলুম জানালার ধারে প্রস্ফুটিত ডাফোডিলের দিকে তাকিয়ে তাঁর এই মৌনতা জেগেছে। ভয়ানক ভালোবাসতেন তিনি ডাফোডিল ফুল।

মৌনতা ভেঙে আমাকে বললেন, কি পড়ছি জানো নার্স? যদি তোমার দুখানা রুটি থাকে, একখানা রুটি বিক্রয় করো, সেই মূল্যে কিছু ডাফোডিল কেনো: রুটি তোমার দেহকে পুষ্ট করে, আর ডাফোডিল আনন্দ দেবে তোমার আত্মাকে। কি সুন্দর!

মিসেস মারাডিক কিন্তু বেড়াতে যেতে রাজি হলেন না, বললেনঃ ডাক্তার মারাডিক রাগ করবেন।

ডাক্তার মারাডিকের সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণা আমার মতে একটা কুসংস্কার মাত্র। এই কুসংস্কারই মনোবিকার হয়ে মিসেস মারাডিকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অন্তত আমার মত হচ্ছে এই। অবশ্য একথা স্বীকার করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই সে সমাপ্তির সীমারেখায় দাঁড়িয়েও আমি সেদিন যেমন কিছু বুঝতে পারি নি, তেমনি আজ বর্তমানে এই মুহূর্তেও সেই অনবধারিত রহস্যকে জটিলতা-মুক্ত করতে আমি অপারগ। আমি যে ঘটনাগুলো আজ লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি, এ সমস্ত স্বচক্ষে দেখেছি। এর মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই, কোনও রহস্যের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টির কোনও ক্ষীণতম প্রয়াসও নেই।

কথায় কথায় সেই অপরাহ্ন নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর এলো সন্ধ্যার সেই পূর্বকালীন অপরূপ স্তব্ধতা যা শুধু অনুভব করা যায়, অনুভব করে শান্তির সুষমায় জীবন ভরে ওঠে। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে দরোজায় করাঘাত হল এবং দরোজা উন্মুক্ত করে প্রবেশ করলেন ডাক্তার ব্রানডন, পিছনে নার্স পিটারসন।

—বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করছো—আনন্দের বিষয়!—ডাক্তার ব্রানডন ঘরে ঢুকে একেবারে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ওই কথাগুলো বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মিসেস মারাডিকের দিকে চেয়ে বললেন, বেড়াতে যাওয়ার পক্ষে চমৎকার দিন, কি বলেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে মিসেস মারাডিক জিগ্যেস করলেন, সকালে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, উনি কে?

—উনি একজন ডাক্তার। উনিও বললেন আপনার এখন বাইরে যাওয়া দরকার।—ডাক্তার ব্রানডন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মিসেস মারাডিকের পাশে বসলেন এবং তাঁর একটা হাতের ওপর আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে বললেন, বেশি দিন অবশ্য থাকার দরকার নেই, খুব সামান্য দিন। নার্স পিটারসন আপনাকে তৈরী হয়ে নেওয়ার জন্যে সাহায্য করবে আর আমার গাড়ি তো সকল সময় আপনার জন্যে প্রস্তুত।—ডাক্তার ব্রানডন কথাশেষ করে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন।

মিসেস মারাডিকের সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি, আপনারা আমাকে পাগলা গারদে পাঠাচ্ছেন!

—না, না।—ডাক্তার ব্রানডন এলোপাতাড়ি কথা বলে চললেন।

আমার মনে হলো সেই চরম মুহূর্ত এসেছে যখন আমাকে শেষ অঙ্কের জটিলতম দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে, সকলকে জানাতে হবে এই নাটকের প্রাণের কথা কোথায় লুকোনো আছে। জানি না কোথা হতে এই অভিনয়ের শক্তি পেলুম, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর তীব্রতা নিয়ে আমার ভবিষ্যত জীবনের সমস্ত ভাবনা এক নিমেষে মুছে ফেলে ডাক্তার ব্রানডনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললুম, ডাক্তার ব্রানডন, আমি নতজানু হয়ে আপনার কাছে নিবেদন করছি আগামী কাল পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। আপনাকে আমার বহু কথা বলবার আছে।

—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতে পিটারসন মিসেস মারাডিকের গরম কোট আর টুপি হাতে করে নিলো।

করুণস্বরে কেঁদে উঠলেন মিসেস মারাডিক। মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, না, না, আমি যাবো না, আমি আমার মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

তখন পরিপূর্ণ গোধূলি। ক্ষীয়মান আলোক তখন অধিকতর ক্ষীয়মান হয়ে আসছে। এমন সময় এই ঘটনার যে চরমতম দৃশ্য দেখেছিলুম, তা আমাকে আজো অভিভূত করে। আমি দেখেছিলুম, ঘরের বন্ধ দরোজা আস্তে আস্তে উন্মুক্ত হয়ে গেল, আর সেই ছোট্ট মেয়েটি ছুটে এসে মায়ের সামনে দুবাহু উত্তোলিত করে দাঁড়ালো। তার মা সামনে একটু ঝুঁকে তাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন।

—এর পরও আপনারা অবিশ্বাস করবেন? —একটা বিদ্বেষ যেন শনশনিয়ে উঠলো আমার কথায়। আমি মা আর মেয়ের দিক হতে চোখ ফিরিয়ে ডাক্তার ব্রানডন আর নার্স পিটারসনের দিকে চাইলুম। হায়রে, কেন আমার কথা বলা? ওরা তো কিছু দেখতে পায়নি। আজ মনে হয়, ওদের কোন দোষ নেই। আমার সহানুভূতিই হয়তো জড়ত্ব ভেদ করে এই পার্থিব চোখে ওই শিশুর বিদেহী মূর্তি দেখতে সাহায্য করেছিল।

এক ঘণ্টার মধ্যে ওরা মিসেস মারাডিককে নিয়ে চলে গেল। গাড়িতে উঠে মিসেস মারাডিক আমাকে কাছে ডেকে বললেন, নার্স, আমি আর ফিরবো না। তুমি যতোদিন পারো ওর কাছে থাকো।

সত্যি মিসেস মারাডিক আর ফিরলেন না। রোজাডেলে যাবার কয়েক মাসের মধ্যে ওঁর মৃত্যু হয়।

আমি কিন্তু ডাক্তার মারাডিকের অস্ত্রোপচার টেবিলের সহকারিণী নার্স হয়ে রয়ে গেলুম। কেন জানি না, ডাক্তার মারাডিক ভালো মাইনে দিয়ে আমাকে এ কাজে বহাল রাখলেন। জানি না কি তাঁর অভিসন্ধি ছিল, হয়তো আমার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে নিজের কাছে আমাকে রেখে দিয়েছিলেন।

গ্রীষ্মকালে দু' মাসের ছুটি পেয়েছিলুম। সেই ছুটি শেষ হবার পরই এতো কাজের চাপ পড়লো যে বলবার নয়, বেশির ভাগ দিন স্নান করা কিম্বা খাওয়ার সময় পর্যন্ত পেতুম না। তাছাড়া মেয়েটিকেও আর দেখতে পাইনি। এক একদিন বিছানায় শুয়ে ভাবতুম, সব কি ভুল। মিসেস মারাডিকের কি সত্যি মাথা খারাপ হয়েছিল। আর আমারও কি চোখ খারাপ করেছিল। তা না হলে মেয়েটা গেল কোথায়?

মাসটা হচ্ছে এপ্রিল। বাগানে সেই পাথরের ঝর্ণাটার ধারে ধারে ঝাঁক বেঁধে অজস্র সোনালি রঙের ডাফোডিল ফুটতে আরম্ভ করেছে। চারপাশের বাতাসে সেই ডাফোডিলের গন্ধ যেন থরথর করে কাঁপছে। আমি ডাক্তারের কতকগুলো হিসাব দেখছি, এমন সময় বৃদ্ধ তত্ত্বাবধায়িকা এসে বিয়ের খবর দিলো। বৃদ্ধ বেশ ধীরকণ্ঠে বললো, অবশ্য আমরাও ভেবে

লুম এই রকম কিছু হবে। সত্যি হাসি-সীভরা এতো মিশুকে লোক ডাক্তার—তাকে না এতো বড়ো বাড়িতে একেলা থাকতে হয়। র, হঠাৎ গলা নামিয়ে আনে বৃদ্ধা, মিসেস রাডিকের কথা ভাবলে বড়ো কষ্ট হয়। তাঁর থম স্বামীর টাকা অপর কোন মেয়ের হবে, কথা আমি যেন ভাবতে পারি না।

—তিনি কি অনেক টাকা রেখে গেছেন?

—অনেক, অনেক টাকা! —বৃদ্ধা দুটি াত প্রসারিত করে আমাকে সেই ঐশ্বর্যের িরমাণ বোঝাতে চাইলো, বললো, দশ লক্ষেরো বশি।

—ওরা কি আর এ-বাড়িতে থাকবেন?

—তা বুঝি তুমি জানো না? সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। আর বছর এপ্রিল মাসে এই বাড়ির একখানা ইটও আর দেখতে পাবে না। এটাকে ভূমিসাৎ করে অনেকগুলো ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে।

একটা শিহরণ যেন বিদ্যুতের মতন আমার শরীর ঝাঁকিয়ে দিলো: মনে হোল মিসেস মারাডিকের এই প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংস আমার কাছে অসহ্য।

—কনের নাম কি? কোথায় আলাপ হয় তাঁর সংগে?

—সে এক কাহিনী। শোনো তাহলে—বৃদ্ধা আমার কাছে চেয়ারটা একটু টেনে আনল তারপর ফিসফিস করে বলতে লাগলো, আমার অজ্ঞাত ডাক্তার মারাডিকের প্রেম-কাহিনী। মিসেস মারাডিককে বিয়ে করার আগে এই মেয়েটির সংগে ডাক্তারের ভালোবাসা হয়। মেয়েটি কিন্তু ডাক্তার গরীব বলে বিয়ে করতে রাজী হয় না, ইউরোপে গিয়ে এক লর্ড কিম্বা রাজকুমারকে বিয়ে করে। বিয়ের পরই কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এবং এইবার সে এসেছে আবার পুরোনো প্রেমিকের কাছে। কাহিনী শেষ করে বৃদ্ধা বললো, এবার বোধ হয় ডাক্তারকে বিয়ে করার মতোন টাকা ডাক্তারের হয়েছে, তুমি কি বল বাছা?

আমি আর কি বলবো। বৃদ্ধার কথায় সায় দিয়ে বললুম, ঠিক বলেছেন আপনি।

আমার কাছে সমর্থন পেয়ে উল্লসিত হোয়ে বৃদ্ধা চলে গেল। আমি কিন্তু বৃদ্ধার দেওয়া সংবাদে আনন্দিত হোয়ে উঠতে পারলুম না। বার বার আমার মনে হোতে লাগলো এই প্রাচীন অট্টালিকা আমাদের আলোচনা শুনেছে, আর তারি কোনো অদৃশ্য অধিবাসী আমাদের আলোচনার প্রতিটি কথায় চঞ্চল বিক্ষুব্ধ হোয়ে উঠেছে।

অখুশীর হাওয়ায় যেন চারপাশ ভরে উঠলো। আমার মনে পড়লো মিসেস মারাডিকের সংগে সেই শেষতম সন্ধ্যাযাপনের কথা। সেই মিসেস মারাডিকের কথিত কবিতার কথাগুলি আমার মনে উদিত হোল। সংগে সংগে আমি ডাফোডিল দেখার জন্যে বাইরের বাগানের দিকে চাইলুম। কি আশ্চর্য, পরিষ্কার দেখলুম সেই ছোট্ট মেয়েটি ঝর্ণাকে পরিবেষ্টিত করা পথে দড়ি নিয়ে লাফিয়ে চলেছে। লাফাতে লাফাতে সে এগিয়ে এলো এবং বসবার যে সমস্ত পাথরের আসন করা ছিল সেগুলো অতিক্রম করে এসে ডাফোডিল এবং ঝর্ণার মাঝখানে দাঁড়ালো। তার সেই স্কটদেশীয় পশমী ফ্রকের ওপর বিন্যস্ত বাদামী রঙের ঋজু কেশগুচ্ছ, সেই সাদা মোজা আর কালো চটি পরা ছোট ছোট দুটি পায়ের ঘূর্ণামান দড়ির ওপর পা-ফেলা, ওকে আমার কাছে যে মাটির ওপর ও দাঁড়িয়েছিল সেই মাটির মতোন সত্য বলে প্রতিভাত করলো।

চেয়ার ছেড়ে আমি লাফিয়ে উঠলুম এবং সেই খোলা জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝর্ণার সামনে ছুটে গিয়েছিলুম। আমার শুধু মনে হোয়েছিল মাত্র একবার যদি আমি ওর কাছে পৌঁছিতে পারি, একটিবার মাত্র কথা বলতে পারি, তবে সব রহস্যের অবসান ঘটে যাবে, সব কিছুর সমাধান একটি নিমেষে মিলবে। হায়রে, আমার আকুলতা! জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দে অথবা স্কার্টের খস্খসে আওয়াজে জানি না ঠিক কি কারণে সেই বায়বীয় মূর্তিটি একবার যেন মুখ তুলে আমার ছুটে যাওয়া লক্ষ্য করলো এবং সেই মুহূর্তে উপবেশনবেদীর নীচের ছায়ায় ছায়ারই মতোন মিলিয়ে গেল। কোনো নিশ্বাস পতনের লঘুতম আঘাতে ডাফোডিলেরা দুললো না, ঝর্ণার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গবিক্ষোভিত জলের উপর কোনো ছায়াপাত হোল না। আমি গভীরতম হতাশায় ডুবে গেলুম, ঝর্ণার পাশের সোপানে বসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললুম। আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, মিসেস মারাডিকের এই বাড়ি ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই একটা হৃদয়-বিদারক কিছু ঘটবে।

সেইদিন অনেক রাত্রিতে ডাক্তার মারাডিক বাড়ী এলেন। তত্ত্বাবধায়িকা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে মহিলার সংগে ওঁর বিয়ে হোচ্ছে তারি কাছে উনি খেতে গেছেন।

ডাক্তার মারাডিক যখন ফিরে এলেন, আমি তখনো জেগে বসে আছি। সকালবেলা সেই মেয়েটিকে দেখার পর থেকে মন আমার বড়ো চঞ্চল, কিছুই ভালো লাগছিল না। ডাক্তার মারাডিক ওপরে চলে গেলেন, এমন সময় আমার টেবিলের ওপর টেলিফোন বেজে উঠলো। এতো জোরে বাজলো যে আমি রীতিমতো চমকে উঠলুম। হাসপাতাল থেকে ডাক এসেছে: জরুরী অস্ত্রোপচার, ডাক্তার মারাডিকের এখুনি যাওয়া চাই।

এরকম ডাক প্রায়ই আসে। ডাক্তারের ঘরে ফোন করতে তিনি তো তখনি সাড়া দিলেন এবং আরো বলে দিলেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি আসছেন, গাড়ী যেন প্রস্তুত থাকে।

ওপরের তলায় ওঁর জুতোর আওয়াজ পেলুম। আমি হলঘরে চলে এলুম আলো জ্বেলে ডাক্তারের টুপি আর কোট ঠিক করে রাখবো বলে। হলের অপরপ্রান্তের দেয়ালে আলোর সুইচ। আমি সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। ঘর অন্ধকার হোলেও সিঁড়ির বাঁক হোতে যে মৃদু আলোকের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তাতে করে একটা আবছা আলো মিশানো অবস্থার সৃষ্টি হোয়েছিল। দুপা এগিয়ে সিঁড়ির তিনতলার মুখে ডাক্তারের পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে ওপর দিকে চাইলুম এবং যা দেখলুম তার সত্যতা সম্বন্ধে আমি মৃত্যুশয্যায়শায়িত থেকেও শপথ গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করবো না। আমি পরিষ্কার দেখেছিলুম দোতলার বাঁকের মাথায় ছোট ছেলেমেয়েদের লাফানোর একগাছা দড়ি গোল করে জড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যেন কোনো ছোট শিশুর হাত থেকে অসাবধানে দড়ি গাছটা পড়ে গেছে। এক লাফে এগিয়ে গিয়ে আমি সুইচ টিপলুম। সমস্ত হল আর সিঁড়ি আলোকবন্যায় ভেসে গেলো। কিন্তু সবই মিথ্যা। সুইচ টিপে হাত নামাবার পূর্বে আমার কানে একটা ভয় এবং বিস্ময় মিশ্রিত চীৎকার এসে পৌঁছেছিল, আর ডাক্তারের সেই দীর্ঘ দেহ পদস্খলিত হোয়ে শূন্যে দুটি বাহু আশ্রয় কিম্বা অবলম্বনের আশায় আন্দোলিত করে একটি নিমেষে আমার পায়ের সামনে ঘাড় গুঁজে এসে পড়েছিল। সেই অসাড় এবং আহত দেহে হাত দেওয়ার আগেই আমার মন বলেছিল নিশ্চয় ওঁর মৃত্যু ঘটেছে।

এ সংসারে মানুষ যা বিশ্বাস করবে ওঁর ভাগ্যে হয়তো তাই ঘটেছিল; অন্ধকারে পদস্খলন হোয়েছিল। আর আমার কথা যদি বিশ্বাস করো, আমি বলবো, জীবনের যে দিনগুলিতে উনি একান্তরূপে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন, সেই সময়ই কোনো অদৃশ্য লোকের প্রদত্ত বিচারের রায়ে কেউ ওঁর জীবনাবসান ঘটিয়েছিল। তবে, তোমরা যদি আমাকে জিগ্যেস করো আমি বলতে পারবো না ওঁর সত্যিকারের অপরাধ কি, কারণ আমি ওঁকে কোনোদিন বিচার করতে বসি নি।

অনুবাদক: **সমীর ঘোষ**

প্রতিদিন পূর্ববঙ্গ হইতে বহু হিন্দু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে চলিয়া আসিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সরকার—পূর্ব পাঞ্জাবের সরকারের মত তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। ফলে পশ্চিমবঙ্গে আগত সেই সকল হিন্দু পরিবারের দুর্দশার অন্ত নাই। পশ্চিমবঙ্গে বহু ভূস্বামী এবং কলিকাতা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বহু সহরে বহু গৃহস্বামী যেভাবে জমীর ও বাড়ির সেলামী ও ভাড়া বাড়াইয়াছে—তাহা আইনের দ্বারা নিবারণ করিবার কর্তব্যও সরকার ভুলিয়া যাইতেছেন, তাহা একান্তই পরিতাপের বিষয়। পূর্ববঙ্গে শহরে সরকার যে ভাবে হিন্দুদিগের গৃহ অধিকার করিতেছেন, তাহাতে মনে করিতে হয়, হিন্দুদিগকে উৎপীড়িত করাই সে সরকারের কর্মচারীদিগের অনুসৃত নীতি। সেই উৎপীড়নেও বহু হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যাহারা থাকিবে, তাহারা তাহাদিগের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও দুর্দশা হেতু ধর্মান্তরিত করায় বাধা দিতে পারিবে না। সরকার অধিবাসী বিনিময় করিলে গৃহ ও রাষ্ট্রত্যাগী হিন্দুরা, সম্পত্তি প্রভৃতির মূল্য পাইতেন—এখন তাঁহাদিগকে সর্বস্বান্ত হইতে হইতেছে।

কাশ্মীর সম্পর্কে যে সকল প্রমাণ ভারত সরকারের হস্তগত হইয়াছে, সে সকলে নির্ভর করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—খাস কাশ্মীর ও জম্মুপ্রদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা পাকিস্থানের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদিগের দ্বারা সুচিন্তিতভাবে রচিত হইয়াছিল। সেই সকল কর্মচারীই উপজাতীয়দিগকে সমবেত হইতে সাহায্য করিয়াছিল—অস্ত্রশস্ত্র, লরী, পেট্রল, নায়ক দিয়াছিল।

পাঠ করিলে, সুরাবর্দীর 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কালে পূর্ববঙ্গের অবস্থা মনে পড়ে। আচার্য কৃপালনী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গে হিন্দুর প্রতি অত্যাচার পরিকল্পনানুযায়ী ছিল—সরকারী মুসলমান কর্মচারীরা কোথাও সেই কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন, কোথাও বা বাধা দেন নাই। কুমারী মুরিয়েল লিস্টার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পেট্রল সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত। কে তাহা দুর্বৃত্তদিগকে দিয়াছিল?

কাশ্মীরের ব্যাপারের পরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের যে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, লোক সে সতর্কতার কোন পরিচয় পাইতেছে না। পূর্ব পাঞ্জাবে যেমন সীমান্তে ৪ মাইল অন্তর রক্ষিদল রক্ষিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে কেন তাহা হয় নাই, তাহাই লোক জিজ্ঞাসা করিতেছে।

আমরা পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে মুসলীম ন্যাশনাল গার্ড কেন নিষিদ্ধ হয় নাই? তাহারা কি ভারতীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে? তাহারা যে 'পঞ্চম বাহিনী' হইতে পারে, সে সম্ভাবনা কি প্রবলই নহে?

লক্ষ্য করিবার বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে কোথাও হিন্দুরা মুসলমানদিগের চিরাচরিত ধর্মাচরণে কোনরূপ বাধা দেন নাই; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ও পাকিস্থানবঙ্গে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না।

গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছি, বাঙলার শাসন-ব্যাপারে বৃটিশ আমলাতন্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। কিরূপে সেই পুরাতন পদ্ধতি নানারূপে দেশের অকল্যাণ সাধিত করিতেছে, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত আমরা দিতেছি:—

(১) যাহাতে পশ্চিমবঙ্গে আলুর চাষের জন্য আবশ্যক পরিমাণ বীজ পাওয়া যায়, সে জন্য বাঙলার কৃষিমন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্করের চেষ্টা ও আগ্রহ সুপরিচিত। কেন যে তাঁহার সেই চেষ্টা ও আগ্রহ সত্ত্বেও বীজ বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহার কারণ দর্শাইয়া ভারত সরকার জানাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকার কয়টি ভুল করিয়াছেন:—

(ক) তাঁহারা বেসরকারী ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা সিমলা হইতে ৫০ হাজার মণ নইনীতাল আলুর বীজ আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বীজ কিনিবার জন্য তাঁহারা যদি সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাঞ্জাব সরকারের সহিত ব্যবস্থা করিতেন, তবে এতদিনে কেবল যে ৫০ হাজার বীজই পাইতেন, তাহা নহে; বীজ লইয়া যাইবার জন্য রেলগাড়ীর ব্যবস্থাও হইত।

(খ) বাঙলা সরকার খাদ্যের জন্য ৫০ হাজার মণ আলু চাহিয়া ভুল করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদিগের বীজের পরিমাণ কমিয়াছে।

(গ) প্রথমেই বিহার হইতে আলুর বীজ সংগ্রহ না করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভুল করিয়াছেন—অক্টোবর মাসের প্রথমভাগে বিহারে অনেক বীজ আলু মজুদ ছিল।

এই সকল ভুলের দায়িত্ব কাহার? কৃষি বিভাগের। সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া—মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘের প্রিয় মিস্টার কৃপালনী তাহার সেক্রেটারী ছিলেন। ঐ সচিব-সঙ্ঘেরই আর একজন প্রিয়পাত্র নীহার চক্রবর্তী সহকারী সেক্রেটারী। কবে, কোথায়, কিরূপে আলুর বীজ পাওয়া যায় তাহার সন্ধান রাখিয়া তাহা মন্ত্রীকে জানানই বিভাগের চাকরীয়াদিগের কর্তব্য। কাজেই ভুলের জন্য তাঁহারাই দায়ী। কেবল তাহাই নহে—আলুর বীজ আনিবার ব্যবস্থা করিতে গুজরাটী মিস্টার কৃপালনী ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ডক্টর শিক্কা দিল্লীতে গিয়াছিলেন এবং এখনও যে মিস্টার ভান সে জন্য সিমলায় রহিয়াছেন, তিনিও পশ্চিম পাঞ্জাবের লোক। মিস্টার কৃপালনীর পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। মিস্টার শিক্কা প্রাণিতত্ত্ববিদ। আলু—আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের পরেও—প্রাণিজগতে স্থান পায় নাই। তিনি কিজন্য ঐ কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহারাই কি বে-সরকারী ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা আলু আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া বিভ্রাট ঘটান নাই? বে-সরকারী ব্যবসায়ীদিগের নিয়োগের কারণ কি? রহেন্ন আলুর বীজ সংগ্রহকালেও কি অনুরূপ ব্যবস্থা হয় নাই? মিস্টার কৃপালনী, ডক্টর শিক্কা ও মিস্টার ভান—কেহই বাঙালী নহেন। কাজেই বাঙলার চাষীর প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক সহানুভূতি না-ও থাকিতে পারে। তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসনশীল পশ্চিম বঙ্গের সরকারকে ইচ্ছা করিয়া বিব্রত ও অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাঁহাদিগের আন্তরিক সহানুভূতির অভাব যে সকল অসুবিধা অতিক্রম করিবার পথে বিঘ্ন স্থাপিত করিতে পারে সে সকল ঘটা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

এক্ষেত্রে মন্ত্রীর ও কয়জন বাঙালী কর্মচারীর চেষ্টা না থাকিলে বীজ-বিভ্রাট ভয়াবহ হইত।

এই সঙ্গে আমরা আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ঢাকা হইতে কয়জন ব্যবসায়ী তাঁহাদিগের তাঁত লইয়া বহুকষ্টে কলিকাতায় আসিয়াছেন। পাকিস্থানে ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদিগের লাঞ্ছনার বিবরণ এ স্থানে প্রদান করিব না। আজ বলিবার বিষয়—গত ৪ঠা অক্টোবর বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী তাঁহাদিগকে ১০খানি তাঁত চালাইবার ছাড় ও সুতা দিবার আদেশ করিয়া পত্র তাঁহারই অধীন উপবিভাগে প্রেরণ করেন। পত্রখানি গত ২৪শে নবেম্বর পর্যন্ত উপবিভাগে দেখা যায় নাই। অথচ পত্রখানি যে সেই বিভাগে গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। সেকালে—এক সিন্ধুবালাকে গ্রেপ্তারের জন্য যাইয়া দুই সিন্ধুবালাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস কর্মচারী সে সম্বন্ধে কলিকাতায় পুলিস অফিসে যে তার করিয়াছিলেন, তাহা কিভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া-

ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। সেকালে তার আর একালে পত্র—নিরুদ্দেশের বাহাদুরী আছে। মন্ত্রী কি এইজন্য কাহাকেও দায়ী ও দণ্ডিত করিবেন? মন্ত্রীর নির্দেশ পালিত হইল কিনা, তাহা দেখিবার কি কোন ব্যবস্থা দপ্তরে নাই?

পুলিসের ব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীমতী মোহিনী দেবী, শ্রীমতী আভা বসু, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শ্রীমতী মীরা দেবী, বরিশাল মাতৃ-মন্দিরের শ্রীমতী মনোরমা বসু, মহিলা আত্মরক্ষা সমবায় সমিতির শ্রীমতী অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদুর্গা কটন মিলের ধর্মঘট সম্পর্কে পুলিসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব অসাধারণ। তাঁহারা লিখিয়াছেনঃ—

"রাত দুটায় বাড়ি পুলিস ঘিরে ফেলে। ভোর পাঁচটায় দরজা ভেঙে প্রথমে লতিকার ঘরে (আঁতুর ঘরে) ঢুকে। লতিকা দেবী পুলিসের গোলমাল শুনে শিশু-সন্তানটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেন। উত্তরপাড়ার বড় দারোগা পুলিস সার্জেণ্ট ও সিপাই নিয়ে ঘরে ঢুকেন। ওরা মায়ের বুক থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নেয়। ঐ সময় শিশুসন্তানটি চীৎকার করে কেঁদে উঠে। মায়ের করুণ কান্নার ভেতর থেকে সেই কান্নাটি বার বার বেরিয়ে আসে—'সেই যে আমার বাছা শব্দ করে কেঁদে উঠে, সে চীৎকার আর থামে নি; আর মায়ের দুধও খায় নি।' সেইদিন রাত্রিতে শিশুটি মারা যায়। প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়েছিল। কোন অসুখ তার হয়নি।............ আমরা মহিলা সাধারণের পক্ষ থেকে একটি নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করার ও মহিলাদের উপর এই অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করি এবং অপরাধী পুলিসের শাস্তি দাবী করি।"

এই অভিযোগ সম্বন্ধে সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে কোন বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই। আমরা আশা করি, এ বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান হইবে।

তাহার পরে গত ২১শে নবেম্বরের ঘটনার কথা বলা প্রয়োজন। সেদিন নূতন অবস্থায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম অধিবেশন। বাঙলায় জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনের প্রস্তাব অনেকদিন হইতে হইয়া আসিতেছে—কার্যে পরিণত হয় নাই। সেইজন্য একদল কৃষক সেই প্রথার উচ্ছেদের দাবী জানাইতে ব্যবস্থা পরিষদ প্রাঙ্গণে যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। আর সেইদিনই ছাত্রগণ শোভাযাত্রা করিয়া রামেশ্বরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে—যে লালদিঘীতে তখন তাহাদিগকে যাইতে দেওয়া হয় নাই, সেই লালদীঘিতে যাইতেছিল। পথে পুলিস তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অশ্রু-গ্যাস ব্যবহার করে। প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, ব্যবস্থা পরিষদের যখন অধিবেশন হয়, তখন ব্যতীত অন্য সময়ে পরিষদ প্রাঙ্গণে শোভাযাত্রা করার কোন বাধা নাই এবং যে কেহ—যে কোন পথে শোভাযাত্রা করিয়া লালদীঘিতে যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন, তিনি পুলিস কর্তৃক শোভাযাত্রায় বাধাদান বা গ্যাস ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না; অর্থাৎ তাঁহার অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়াই পুলিস কাজ করিয়াছিল। আর পুলিসের যে কর্মচারী ঐ ব্যাপারে নায়ক ছিলেন তিনি বলেন, কোন্‌টি ছাত্রদিগের শোভাযাত্রা, আর কোন্‌টি কৃষকদিগের তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বুঝিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি উগ্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বহু লোক পুলিসের ব্যবহারের নিন্দা করিয়া বিবৃতি দেন। ২৫শে নবেম্বর—ঘটনার ৪ দিন পরে ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী এক দীর্ঘ লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। বিবৃতিতে সেকালের আমলাতান্ত্রিক ভাব দেখিয়া অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন; তরুণগণ তাহার প্রতিবাদে কলেজে ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা করিয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী পুলিসের কার্য সমর্থন করিয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত কলিকাতার পুলিশ কমিশনার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সে অবস্থায় গ্যাস ব্যবহার পুলিসের পক্ষে প্রয়োজন ও অনিবার্য ছিল। পুলিশ যে ছাত্রশোভাযাত্রা কাহাদিগের শোভাযাত্রা, তাহা না বুঝিয়া সে সম্বন্ধে সংবাদ না লইয়া গ্যাস ব্যবহার করিয়াছিল—সে ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত হইলেও ত্রুটি। সুতরাং পুলিস বিভাগের মন্ত্রীর পক্ষে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে তাহা তাঁহার পদোচিত উদারতাব্যঞ্জকই হইত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বলেন, ছাত্ররা কেন অন্য পথ অবলম্বন না করিয়া কৃষকদিগের কাছে গেল? ইহা কি অপরাধ? কৃষকদিগের সম্বন্ধেও তিনি উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছেন। তাহারা অন্যের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছিল। পরে তিনি স্পষ্টই বলেন—সে কাজ কম্যুনিস্টদিগের। তিনি বলেন—"আমি সংবাদ পাইয়াছি, রাজনীতিক্ষেত্রে একদল লোক হিংসাশ্রয়ী হইয়া ক্ষমতা অধিকার করিতে চাহে। সেরূপ চেষ্টা হইলে সরকারও সমগ্র শক্তি ব্যবহার করিবেন।" এই শক্তি ব্যবহারের স্বরূপ কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা ডক্টর ঘোষকে অনুরোধ করিব—তাঁহার যেন রজ্জুতে সর্প-ভ্রম না হয়। কংগ্রেসই কৃষকদিগের মনে জমিদারী প্রথা লোপের আশা জাগাইয়াছে। ইহার পরে তিনি ছাত্রদিগকে শৃঙ্খলা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—এখন রাষ্ট্র দেশবাসীর, সুতরাং দেশবাসীকে পুরাতন মনোভাব বর্জন করিতে হইবে। অর্থাৎ এখন আর সরকারের বা সরকারের কর্মচারীদিগের কোন কাজে বাধা দেওয়া চলিবে না; কোনরূপে শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ করা বা সরকারের কর্মচারীদিগের আদেশ অমান্য করা দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতায় আঘাত করা। আর ভয়—আমাদিগের কোনরূপ ত্রুটি দেখিলে শত্রুরা কি মনে করিবে?

কৃষক শোভাযাত্রার পশ্চাতে যেমন, ছাত্র শোভাযাত্রার পশ্চাতেও তিনি তেমনই অপরের প্রেরণা কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পনার ভিত্তি কি? তরুণগণ ইহা ভিত্তিহীন ও তাহাদিগের পক্ষে অপমানজনক বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে—নবলব্ধ স্বাধীনতায় যে পুলিসের আচরণের কোন পরিবর্তন হয় নাই; সরকারী নীতিও অপরিবর্তিত দেখা যাইতেছে, তাহা কি বাঞ্ছনীয়?

শৃঙ্খলার অভাব কেহই সমর্থন করে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাও নানাক্ষেত্রে অসংযমে ও অন্যায়াচরণে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। 'ভারত' পত্রে তরুণদিগের ব্যবহারের নিন্দা থাকায় একদল তরুণ যে ঐ পত্রের কার্যালয়ে অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে—এসিড ব্যবহারও করিয়াছে এবং ঐ পত্রকে অবাঙালী খয়রাতি প্রতিষ্ঠানের পত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে—তাহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ, তাহাতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শারীরিক শক্তিপ্রয়োগে নষ্ট করা হয়। যুদ্ধের এবং আগস্ট আন্দোলনের পরে সমাজের সকল স্তরেই বিশৃঙ্খলাবিমুখতা দেখা দিয়াছে। ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা একদিন শ্রমিকদিগকে ধর্মঘটে অস্ত্র ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; আজ মন্ত্রী হইয়া তিনি তাহাদিগকে সেই অস্ত্রত্যাগে আগ্রহশীল করিতে পারিতেছেন না। হয়ত শৃঙ্খলাবিমুখতার ভাব দূর হইতে বিলম্ব হইবে। কিন্তু যত শীঘ্র তাহা দূর হয়, ততই মঙ্গল। আমরা আশা করি, কোন পক্ষের নেতৃবৃন্দের ব্যবহারে সে ভাবের বহ্নিতে ইন্ধন যোগ হইবে না।

ডক্টর ঘোষ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন—যে সকল সাহিত্যিক সাহিত্য-সাধনা স্থগিত রাখিয়া বীরভূমে তাঁহার নির্বাচনে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও এক্ষেত্রে পুলিসের যে ব্যবহার তাঁহার দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, তাহার সমর্থন করিতে পারেন নাই। আর মেদিনীপুরের কংগ্রেস কমিটি বহুমতে শ্রীকুমার জানার সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, বিদেশীর শাসনে দেশের রাজনীতিক নেতৃগণের কার্যের সমালোচনা করা হয়ত অভিপ্রেত ছিল না; কিন্তু এখন নেতৃগণকে সমালোচনা সহ্য করিতে হইবে—সমালোচনা আহ্বান করিলেই ভাল হয়। কারণ, গণতন্ত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতাই চাহে। গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে পুলিসের কার্য সম্বন্ধে তদন্ত দাবী করা হইয়াছে। কোন পক্ষেরই অকারণ অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন বাঞ্ছিত নহে।

এবার জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে গোবরডাঙায় ২৪ পরগণা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় বাঙলায়

ইহাই সর্বপ্রথম জেলা সম্মেলন। প্রাদেশিক সম্মেলনের মত জিলা সম্মেলনেরও বিশেষ সার্থকতা আছে। বাঙলা বিভক্ত হইবার পরে ২৪ পরগণার গঠনেরও পরিবর্তন হইয়াছে; সুতরাং তাহার অভাব ও অভিযোগও পরিবর্তিত হইয়াছে। মৌলবী নৌশের আলী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। উভয়ের অভিভাষণে নূতন সুর ঝংকৃত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে স্বায়ত্তশাসনশীল বাঙলার প্রয়োজন, অভাব, কার্যপদ্ধতি—এ সকলের আভাসও ছিল। বোধ হয়, পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেক জিলায় জিলা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইবে এবং জিলার বিশেষ সমস্যা-সমূহের বিষয় সম্মেলনে আলোচিত হইয়া সমগ্র প্রদেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে এবং লোকমত সৃষ্ট হইয়া সরকারের কার্য প্রভাবিত করিবে। গোবরডাঙ্গায় জিলা সম্মেলন সেরূপ সম্মেলনের পথপ্রদর্শক হইল।

তরুণ সমাজে বিক্ষোভের আর এক কারণ ঘটিয়াছে—"রেভলিউশনারী কম্যুনিস্ট" দলের শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে কারণ না দেখাইয়া আটক রাখা। পূর্বে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনেরই নিন্দা করা হইত। তাহার পরে—বিশেষ যুদ্ধের সুযোগ লইয়া—তদপেক্ষাও স্বৈরাচারদ্যোতক বিধান হইয়াছে; সে সকল অর্ডিন্যান্স এখনও কার্যকরী। সৌম্যেন্দ্রনাথের পত্নীকে জিজ্ঞাসার উত্তরে জানান হইয়াছে—ঐরূপ এক অর্ডিন্যান্সের বলে—জনসাধারণের নির্বিঘ্নতার হানিকর কার্যের অপরাধে তাঁহার স্বামীকে আটক রাখা হইয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থের জন্য তাঁহাকে কোথায় আটক রাখা হইয়াছে, তাহাও যেমন প্রকাশ করা হইবে না—তাঁহার সহিত কাহাকেও তেমনই সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না। ৩নং রেগুলেশনের বিরোধিতা যাঁহারা এতদিন করিয়া আসিয়াছেন—আজ যদি লজ্জা পাইয়া তাঁহারাই তাহার ব্যবস্থানুযায়ী কাজ করেন, তবে তাহাতে লোকের বিস্মিত ও ব্যথিত হইবার কারণ অবশ্যই থাকিতে পারে। সেরূপ অবস্থায় লোককে বিনা বিচারে অজ্ঞাত স্থানে আটক রাখিয়া মামলা সোপর্দ করিলেই ত লোক প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারে। তাহা না করিবার কারণ কি?

এইরূপ বিষয়ে জাতীয় সরকারের বিশেষ সতর্কতাবলম্বন কর্তব্য—ইহাই জনমত।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইতেছে—বাঙলায় আমন ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু চাউলের মূল্য হ্রাসের কোন লক্ষণই লক্ষিত হইতেছে না। সরকারের হিসাব যে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহা আমরা গত সপ্তাহে দেখাইয়াছি। যে মন্ত্রীর সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া সেক্রেটারী যেরূপ হিসাবই কেন তাঁহাকে প্রদান করুন না, যাঁহারা বাঙলার অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, এবার বাঙলায় ফসল ভাল ফলনই হইয়াছে। যদি বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করা না হয়, তবে বাঙলায় চাউলের অভাব হইবে না। তবে কিজন্য গান্ধীজীর কথাও অবজ্ঞা করিয়া নিয়ন্ত্রণ রাখা হইতেছে? গান্ধীজী নিশ্চয়ই বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিয়ন্ত্রণ বর্জন করিতে বলিয়াছিলেন—পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, নিয়ন্ত্রণ বর্জন করিলে অভাব বর্ধিত হইবে না। তিনি এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, যদি নিয়ন্ত্রণ বর্জন করিলে কুফল ফলে তবে তাহা পুনরায় স্থাপন করিলেই হইবে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত তাঁহারা সে প্রস্তাবেও সম্মত হইতে পারেন নাই। আমাদিগের বিশ্বাস, গান্ধীজী নিয়ন্ত্রণজনিত দুর্নীতির বিষয়ও অবগত হইয়াছেন। চোরাবাজার যে বন্ধ হইতেছে না, তাহা ত সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে গম ও গমজাত দ্রব্য আসে তাহা কিভাবে খিদিরপুর ডক হইতে বেহালার গুদামে, তথা হইতে হাওড়ায় ময়দার কলে এবং তথা হইতে কাশীপুর গুদামে যাইয়া তবে বণ্টন করা হয়, তাহা আমরা বলিয়াছি। তাহাতে কেবল যে ব্যয় বাড়িয়া যায়, তাহাই নহে, কিন্তু দুর্নীতির অবসরও বাড়িয়া যায়। তাহা মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘের সময়ে দেখা গিয়াছে—সর্দার বলদেব সিংহ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সরিষার তৈল নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাহা সুলভ হয়। চিনি সম্বন্ধেও যে তাহাই হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঙলা সরকারের ব্যয় প্রায় ৩ কোটি টাকা। তাহা হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারিলেই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস হইবে।

এখন প্রয়োজন—খাদ্যোপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি। সেইজন্য যদি অধিক অর্থ উপযুক্তভাবে ব্যয়িত হয়, তবে লোক বিশেষভাবে উপকৃত হইবে।

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই পূর্ববঙ্গের অমুসলমানদিগের সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের সরকারের কর্তব্য ও দায়িত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল হিন্দু ভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘে (অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে) চলিয়া আসিতেছেন লীগ স্বেচ্ছাসেবক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া একদল মুসলমান ট্রেণে ও ষ্টীমারঘাটে তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছে—ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগের বাক্স পেটরা, পুঁটলী খুলিয়া বস্ত্র ও মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছে—এই অভিযোগ ভারত সরকার পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের নির্দেশে পাকিস্থানে ভারত সরকারের হাই কমিশনার প্রতীকার জন্য পাকিস্থান সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন—এখনও উত্তর পাওয়া যায় নাই। হয়ত উত্তর পাওয়া যাইবে না। যাঁহারা পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগকে পাকিস্থান সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিয়া পূর্ববঙ্গেই বাস করিতে পরামর্শ ও উপদেশ দিতেছেন, তাঁহারা কি এই উৎপীড়ন নিবারণের কোন উপায় করিতে পারেন?

পাকিস্থান হইতেই যে কাশ্মীর আক্রমণ এখনও চলিতেছে, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন জুনাগড় লইয়া হাঙ্গামার সুযোগে কাশ্মীর আক্রমণ করা হইয়াছিল, তেমনই যে কাশ্মীরের ব্যাপারের সুযোগে পশ্চিম বঙ্গ আক্রান্ত হইতেও পারে, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই সেজন্য পশ্চিম বঙ্গকে ও ভারত সরকারকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আর প্রস্তুত থাকিবার জন্য প্রদেশে শান্তি যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা বলিতেই হইবে। প্রদেশের গঠনমূলক কার্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ রক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সীমান্তস্থিত পশ্চিম বঙ্গের করিতেই হইবে। সে কাজে কিছুমাত্র বিলম্ব করা অন্যায়।

মধ্য এশিয়ায় হিন্দু আধিপত্য

প্রাচীন হিন্দুরাজাগণ স্বদেশে যুদ্ধজয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন না। তাঁরা সুবিধা পেলেই হিন্দুকুশ, সুলেমান অথবা খিরথর পাহাড় পার হ'য়ে ওপারে হানা দিতেন। স্বেন হেডিন, সার অরেল স্টাইন এবং আরও অনেকের লেখা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে দিবোদাস নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি এবং তাঁর পুত্র সুদাস অনেকবার ইরাণ ও আফগানিস্থান আক্রমণ করে' সেখানকার উপজাতিদের অনেকবার পরাজিত করেছেন।

মহাভারতের যুগে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের জন্য তখনকার রাজারা মধ্য এশিয়া পর্যন্ত অভিযান করতেন। অর্জুনের সঙ্গে প্রমীলার যুদ্ধ ও যক্ষদের কাহিনী পাঠ করে' মনে হয় তিনি এশিয়া মাইনর ও তিব্বতেও গিয়েছিলেন। সে সময়ে এশিয়া মাইনরে অ্যামাজনদের মতো বীর রমণীদের রাজ্য ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকাসের যুদ্ধের কাহিনী সকলের জানা আছে। তিনি সেলুকাসকে পরাজিত করে' আফগানিস্থানের কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানের মাকরাণ প্রদেশ লাভ করেন।

সমুদ্রগুপ্তকে বলা হয় ভারতের নেপোলিয়ান, (নেপোলিয়ানকে ফরাসী সমুদ্রগুপ্ত বলা হ'ত কিনা সে কথা ইতিহাস লেখে না) তিনি আফগানিস্থান অথবা গান্ধার এবং মধ্য এশিয়ার রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন। তখনকার গান্ধাররাজ "দৈবপুত্রশাহী শাহানুশাহী" বালিকা উপহার পাঠিয়েছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য অক্সাস নদীর তীরে এবং তিব্বতেও যুদ্ধ করে এসেছেন।

ভারতীয় ব্রেইল

অন্ধদের যে পদ্ধতির দ্বারা লেখাপড়া শেখানো হয় তার নাম ব্রেইল পদ্ধতি। লুই ব্রেইল এক সামান্য দুর্ঘটনায় অন্ধ হয়ে যান এবং তিনি অন্ধদের পড়বার জন্য যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, তাঁর নামানুসারে সেই পদ্ধতির নাম হয়েছে ব্রেইল পদ্ধতি। পদ্ধতিটি অবশ্য বেশ সরল। কাগজের ওপর অক্ষরগুলি অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্রাকারে থাকে এবং তার ওপর হাত বুলুলে টের পাওয়া যায় কোন্‌টি কি অক্ষর। আমরা অনেক সময়ে কাগজের ওপর আলপিন ফুটিয়ে এইরূপ বর্ণমালা তৈরী করি।

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাভাষীদের জন্য এক বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা দশটি ভাষা নিয়ে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্রেইল পদ্ধতি প্রস্তুত হয়েছে। ভারত সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই কাজ ত্বরান্বিত করবার জন্য ও অন্ধদের জন্য অন্য কাজ করবার জন্য ভারত সরকার একজন অন্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষা-মন্ত্রীর অধীনে নিয়োগ করেছেন। দেরাদুনে একটি অন্ধ নিকেতন প্রতিষ্ঠা ও একটি পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনাও ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তাদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে স্কুল ও কারখানা স্থাপিত হবে।

রুমানিয়ায় মুদ্রাস্ফীতি দমন

কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকার মুদ্রাস্ফীতি দমন করবার জন্য হাজার টাকা ও তদূর্ধ্ব মূল্যের নোট বাতিল করে' দিয়েছিলেন। রুমানিয়াতেও মুদ্রাস্ফীতি দমন করবার জন্য সেখানকার সরকার প্রচলিত মুদ্রা 'লাই' টেনে নিয়েছেন এবং প্রত্যেক বিশ হাজার লাই-এর পরিবর্তে এক নতুন মুদ্রা প্রচলিত করেছেন। এই নতুন মুদ্রা ব্যক্তি অনুসারে ১৫০ থেকে ৭৫টি পর্যন্ত প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে আবার সব জিনিসের 'কণ্ট্রোল' দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেখানে একটা মজা এই যে, জনগণ চোরাবাজার প্রশ্রয় দেয় না, কিন্তু দর বেশী নিলে অথবা জিনিস থাকতে বিক্রয় না করলে জনগণই হয় তাদের শাস্তি দেয় অথবা দোকানে যে কোনো জিনিস পায় সব লুট করে নেয়। শুধু এই নয়, কেউ আবার অতিরিক্ত দামে জিনিস কিনলে তাকেও শাস্তি পেতে হয়।

নিউ ইয়র্কে এশিয়া ইনষ্টিটিউট

১৯২৮ সালে নিউ ইয়র্কে ডক্টর আপহ্যাম পোপ কয়েকজন পুরাতত্ত্ববিৎ সহযোগে এশিয়া ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল ইরাণীয় ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর মার্কিনরা এশিয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে পড়েছে। তারা এখন এই ইনস্টিটিউটকে অনেক বড় করে' ফেলেছে, অনেক নতুন বিভাগ ও অনুবিভাগ খোলা হয়েছে। সেখানে এখন ৪৭টি এশিয়ার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রাচ্যের ৩০০ প্রকার বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। নতুন বিভাগগুলির মধ্যে ভারতীয়, আরব ও চৈনিক বিভাগ উল্লেখযোগ্য। মার্কিনরা যাতে এশিয়ার নানাদেশে যেয়ে যাতে ব্যবসা অথবা চাকুরী করতে পারে এবং দেশটা যাতে একেবারে নতুন মনে করে' অসুবিধায় না পড়তে হয় সেইজন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

রুমানিয়াতে চোরাকারবারীর শাস্তি। প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েটি বেশী দামে রুটি বিক্রয় করেছে ও লোকটি তা কিনেছে, তাই দুজনকেই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। মাঝখানের দোকানদার কণ্ট্রোল অপেক্ষা কম মূল্যে প্রসাধন সামগ্রী বিক্রয় করছে। শেষের লোকটি অতিরিক্ত দামে ময়দা বিক্রয় করেছে। তার গলায় টিকিট ঝুলিয়ে সকলকে সেই কথা জানাবার জন্য তাকে শহরে ঘোরানো হচ্ছে।

(৭)

একদিন গভীর রাত্রে কড়া নাড়ার শব্দে বিছানায় উঠে বসে সীমাচলম। এতো রাত্রে আবার কে দরজা ঠেলে। বাতি জেবলে দরজা খুলেই চমকে ওঠে সীমাচলম। একি চেহারা হয়েছে ভবতারণবাবুর। উস্কো-খুস্কো চুল, লাল দুটি চোখ আর সারা মুখে গভীর চিন্তার ছাপ—

ঃ একটু আসবেন সীমাচলমবাবু, আমার স্ত্রীর অবস্থা বড় খারাপ !

ঃ সে কি, অবস্থা খারাপ, কি হয়েছে তাঁর ?

ঃ অন্তসত্ত্বা ছিলেন—ক'দিন ধরে বেশ একটু কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আজ বিকাল থেকে কেবলই ফিট হচ্ছে।

ঃ তাই নাকি, দাঁড়ান অগাস্টিন সায়েবকেও ডাকি একবার, আমি এসব বিষয়ে একেবারে আনাড়ি।

এক ডাকেই উত্তর পাওয়া যায় অগাস্টিন সায়েবের। নৈশাবাসের ওপর লম্বা কোট চড়িয়ে শশব্যস্তে ছুটে আসেন তিনি ঃ কি ব্যাপার, বিপদ-আপদ ঘটলো নাকি কিছু। তারপর সব শুনে ঘরের ভিতর থেকে স্মেলিং সল্টের শিশি বের করে আনেন একটা, বলেন ঃ আপনারা ততক্ষণ এটা ব্যবহার করুন, আমি এক্ষুণি ফিরছি ডাক্তার নিয়ে।

ভবতারণবাবুর ঘরে তাঁর স্ত্রী আসার পরে এই প্রথম ঢোকে সীমাচলম। দরজা জানলায় পর্দা এঁটে অস্বস্তিকর আবহাওয়া হয়েছে ঘরের। আলো-বাতাস আসার কোন সুযোগই নেই। মেঝেতে ছোট অপরিচ্ছন্ন বিছানা—তার ওপর শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে মেয়েটি।

ঃ ঠিক এই রকম হচ্ছে বিকাল থেকে। একবার করে জ্ঞান হয়, আবার যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কি মুস্কিলেই যে পড়েছি।

কোন কথা বলে না সীমাচলম। একটু দূরে বসে থাকে চুপচাপ। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যায় মেয়েটির মুখ, বিছানার চাদরটা শক্ত করে দুহাতে ধরে মুখের মধ্যে দেয় মেয়েটি—তবু মাঝে মাঝে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে দুঃসহ চীৎকার। ভবতারণবাবু মাথার কাছে বসে একটা পাখা নিয়ে বাতাস করেন। যন্ত্রণার কোন উপশম হয় বলে মনে হয় না। বিশ্রী লাগে সীমাচলমের। এক মুহূর্তে নীড় বাঁধার সমস্ত স্বপ্ন যেন হাওয়ায় মিশিয়ে যায়। সৃষ্টির বেদনার বীভৎস রূপে ও যেন হতবাক হয়ে যায়।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজে উঠে পড়ে সীমাচলম। তখনো সমানে কাতরাচ্ছে মেয়েটি। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাতে সবেগে আঘাত করে নিজের বুকে। নিমীলিত দুটি চোখের পাশে জলের ধারা।

এগিয়ে যায় সীমাচলম। অগাস্টিন সায়েব ফিরেছেন ডাক্তারকে সংগে নিয়ে। মিঃ উইলিয়ামস্—আকিয়াবের সিভিল সার্জন। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট চেহারা—চলনে ভংগীতে একটা আভিজাত্যের ছাপ। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই চমকে ওঠেন তিনি ঃ What is the big idea এটা বাস করার ঘর না চাল রাখবার গুদাম। জানালার পর্দাগুলো ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেলেন টেনে আর চীৎকার করে ওঠেন ঃ You are going to kill her in this dungeon.

হাঁটু গেড়ে বসে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করেই দাঁড়িয়ে ওঠেন ঃ কাছাকাছি টেলিফোন আছে কোথাও ? Immediately ambulenceএর জন্য ফোন করে দিতে হবে। কেস অত্যন্ত খারাপ।

মিলেই ফোন আছে। অগাস্টিন সায়েব তখনই ফোন করে দেন অ্যাম্বুলেন্সের জন্য। ডাঃ উইলিয়ামস্ সারাক্ষণ পায়চারী করেন বারান্দায় আর গজ গজ করেন নিজের মনে। কথাগুলো ঠিক নিজের মনে নয়, দু একটা কথা স্পষ্টই ভেসে আসে ঘরের ভিতরে। বাল্যবিবাহ থেকে শুরু করে ভারতীয় আরুপ্রথার তীব্র নিন্দা করে চলেন ডাক্তার সায়েব। জাতকে স্বাধীন হবার আগে সুস্থ আর সবল হতে হবে। আলোবাতাসহীন বন্ধ ঘরে ক্ষীণায়ু সন্তান প্রসবের মানে হয় কোন !

আম্বুলেন্সের সংগে ডাক্তার উইলিয়ামস্ আর ভবতারণবাবু দুজনেই রওনা হন। বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ার পেতে চুপচাপ ব'সে থাকে সীমাচলম আর অগাস্টিন সায়েব। কেমন যেন বিশ্রী একটা আবহাওয়া। ডাক্তার উইলিয়ামসের কথাগুলো মনে মনে ভাবে সীমাচলম। ভবতারণবাবুর স্ত্রীকে গাড়ীতে ওঠাবার পরে ডাক্তার উইলিয়ামস্ ভবতারণবাবুর দিকে ফিরে কঠোর গলায় বলেছিলেন ঃ ঈশ্বর না করুন, এ'র যদি কিছু হয়, তবে সে জন্য আপনিই সর্বতোভাবে দায়ী। জানেন না এ সময়ে মেয়েদের শারীরিক পরিশ্রম করানোর দরকার আর তারা যে ঘরে থাকে সে ঘরে প্রচুর আলো বাতাসের প্রয়োজন। তাদের এভাবে তিলে তিলে মারবার অধিকার কেউ আপনাদের দেয় নি। ঈশ্বরের কাছে আপনারা অপরাধী।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন ভবতারণবাবু। একটি কথাও বলেন না। কিই বা বলবেন তিনি। সত্যিই তো, মেয়েটির চারপাশ ঘিরে যেভাবে বাধানিষেধের প্রাচীর তোলা হ'য়েছিলো তাতেই হাঁফ বন্ধ হ'য়ে আগেই যে মারা যায় নি মেয়েটি এইটাই যথেষ্ট।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে ফোন আসে মিল থেকে। অগাস্টিন উঠে যান আস্তে আস্তে, একটু পরে ফিরে এসে বলেন ঃ তৈরী হ'য়ে নিন। হ'য়ে গেছে।

ছোট্ট দুটি কথা কিন্তু কেমন যেন মনে হয় সীমাচলমের। হ'য়ে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছে মাথায় কাপড় দিয়ে স্বল্পপরিসর ঘরটির মধ্যে, কত শাসন, কত অনুশাসন কত বাধা আর নিষেধের গণ্ডি তাকে ঘিরে। ভবতারণবাবুর অসহায় মুখটার কথা মনে পড়ে বার বার। অগাস্টিন সায়েবের সংগে সংগে পা ফেলে নীচে নামে সীমাচলম।

হাসপাতালের সামনেই দেখা হয় ভবতারণবাবুর সংগে। চুপচাপ বসে আছেন শানবাঁধানো চাতালটার ওপরে। অগাস্টিন সায়েব এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধে হাত রাখেনঃ কখন হ'লো ?

ঃ হাসপাতালে পৌঁছোবার আগেই। রাস্তাতেই শেষ হ'য়ে গেছে।।

ঃ কিছু হ'য়েছিলো নাকি?

ঃ মরা ছেলে একটা। নিঃশ্বাস ফেলেন ভবতারণবাবু।

একটু পরেই আরো কয়েকজন এসে জোটে। বরদাবাবু—কোর্টের মুহুরী, শান্তিবাবু—এখানকার কাস্টমসের কেরানী—আরো এদিকে ওদিকে দু একজন।

সারাটা পথ মৃদু গলায় হরিধ্বনি দিয়ে এলেন ভবতারণবাবু—নিস্পন্দ আর নির্বাক। কিন্তু চিতায় ছোট ছেলেটিকে মায়ের কাছে শোয়াতেই চীৎকার করে ওঠেন তিনি। সীমাচলমের কাছে এসে সজোরে জড়িয়ে ধরেন তার একটা হাত। ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠেন ছেলেমানুষের মত ঃ সীমাচলমবাবু, আমার কি সর্বনাশ হ'য়ে গেলো। উঃ হু, হু, সব গেলো আমার। ডাক্তার সায়েব ঠিকই বলেছেন, আমিই

রে ফেলেছি ওকে। ছোট্ট ঘরের মধ্যে আটকে থে একটু নড়াচড়া করতে না দিয়ে আমিই রে করেছি ওকে।

সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে সীমাচলম: না, না, একি কথা, মানুষের জীবনমরণের থা কেউ কি বলতে পারে। সবই নিয়তি ঝেলেন—কপালে মৃত্যু থাকলে কে খণ্ডাবে।

বিশ্রী লাগে আবহাওয়াটা। পায়ে পায়ে নদীর ধারে এসে দাঁড়ায় সীমাচলম। নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে কে একজন যেন দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতেই চিনতে পারে সীমাচলম। প্যান্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন অগস্টিন সায়েব জলের দিকে চেয়ে।

: এখানে একলাটি দাঁড়িয়ে আছেন?

মুখ ফেরান অগস্টিন সায়েব। ম্লান চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় তাঁর দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা, আবেগে থর থর করে কাঁপছে দুটি ঠোঁট।

একি কাঁদছেন আপনি? একটু বিস্মিতই হয়ে যায় সীমাচলম। মাথাটা সজোরে ঝাঁকি দেন অগস্টিন সায়েব: না, না, এ বিশ্রী প্রথা, ভারি নিষ্ঠুর প্রথা। উঃ এভাবে পুড়িয়ে মারা। দেখেছেন কি ভাবে—পুড়ে গেল গায়ের চামড়া আর চুলগুলো। না, না, এ প্রথার বদল হওয়া দরকার।

বেশ কয়েক মাস কাটে।

টেবিলের ওপরে কাগজপত্র ছড়িয়ে চুপচাপ বসে থাকেন ভবতারণবাবু। উস্কো-খুস্কো চুল আর কেমন যেন উদাস ভাব। কষ্ট হয় সীমাচলমের। বিদেশ বিভূঁয়ে জীবনের সংগী হারানোর ব্যথা উপলব্ধি করতে পারে সে। মাঝে মাঝে দু একটা সান্ত্বনার কথাও সে শোনায় : ভেবে আর কি করবেন বলুন। ভগবান দিয়েছিলেন তিনিই নিয়েছেন। টেনে।

: ছেলেটাও যদি বেঁচে থাকতো সীমাচলম-বাবু, তবু তার মুখ চেয়ে দুঃখ ভুলতে পারতাম কিছুটা। সেটাও চলে গেলো মায়ের সংগে: চোখদুটো জলে ভরে আসে ভবতারণবাবুর। কাপড়ের খুঁটে চোখ দুটো মোছেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

বিকালের দিকেও নিঃঝুম হয়ে বসে থাকেন ভবতারণবাবু সামনের দেয়ালে টাঙানো ম্যাপ-খানার দিকে চেয়ে। ওর মুখের দিকে চেয়ে কষ্টই হয় সীমাচলমের। যুদ্ধে হার হয়ে গেছে ভবতারণবাবুর। ওর সমস্ত প্রদেশ হাতছাড়া হয়ে গেছে। ভগ্নস্তূপের ওপর বসে সারা-জীবন দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিই বা গতি আছে।

সেদিন অফিসে অগস্টিন সায়েব এসে দাঁড়ান সীমাচলমের সামনে : মিঃ সীমাচলম, আপনাকে দিন কতকের জন্য একবার বাইরে যেতে হবে।

: বাইরে? কোথায় যেতে হবে বলুন।

: রেঙুনে যেতে হবে একবার। আমাদের একটা মেশিন এসে পড়ে রয়েছে সেখানে, আপনাকে গিয়ে তাগিদ দিয়ে সেটা পাঠাতে হবে এখানে। লড়াইয়ের হাঙ্গামে জাহাজে জিনিস 'বুক' করাই মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

: বেশ তো তাতে আর কি, যাবো। কবে যেতে হবে বলুন।

: কালই যেতে পারলে ভালো হয়। লড়াইয়ের বাজারে নতুন মেশিন কেনার তো উপায়ই নেই, পুরানো একটা কিনেছিলাম স্টীল ব্রাদার্স থেকে, কিন্তু কিছুতেই ডেলিভারী পাচ্ছি না তার।

: চিঠি পত্র যা দেবার দিয়ে দিন আমাকে। আমি কালই রওনা হবো।

সে রাত্রে ভালো করে ঘুম হয় না সীমাচলমের। আবার যেতে হবে রেঙুনে। মাপান আর আলিম, জুয়ার আড্ডা সেই হোটেল, স্বর্ণখচিত বিরাট সোয়েডাগন প্যাগোডা আর মজিদ সায়েবের কোয়ার্টার—টুকরো টুকরো সব ছবিগুলো একটার পর একটা ভেসে আসে চোখের সামনে। কতদিন কেটে গেছে তার পরে—কত বিচিত্র অধ্যায় আর বিচিত্রতর জীবন।

রেঙুনে পা দিয়েই আশ্চর্য হয়ে যায় সীমাচলম। অনেক পরিবর্তন হয়েছে শহরের। ফাঁকা জায়গাগুলোয় প্রকাণ্ড অট্টালিকা উঠেছে —আরও যেন প্রশস্ততর হয়েছে দু'একটা রাস্তা। অনেক ঘুরে ঘুরে পুরানো সেই হোটেলটার সামনে এসে দাঁড়ায়। আলিম আর মাপানের সঙ্গে দেখা করে যাবে নাকি একবার! হোটেলের মধ্যে ঢুকেই কিন্তু চমকে ওঠে সীমাচলম। ইংরাজী কায়দায় দরজার দুধারে পাম গাছের টব বসানো হয়েছে। গোলটেবিল আর সারি সারি চেয়ারপাতা। তকমাআঁটা বয় ঘোরাঘুরি করছে এদিকে ওদিকে।

ইঙ্গিতে একটা বয়কে কাছে ডাকে সীমাচলম : চীনাসায়েব কোথায় বলতে পারো? হোটেলের মালিক ছিলেন যিনি।

: হোটেলের মালিক? হোটেলের মালিক তো ডি মেলো সায়েব। খাস পর্তুগীজ। চীনা টীনা নেই এখানে।

: ও, তাই নাকি। পায়ে পায়ে ফিরে আসতে শুরু করে সীমাচলম। সিঁড়ির কাছ বরাবর যেতেই কার চীৎকার শুনতে পায়: কালাজী, কালাজী।

ফিরে দাঁড়ায় সীমাচলম। পিছন থেকে কে আবার এভাবে ডাকে ওকে। এপাশ থেকে তকমাআঁটা বেঁটে গোছের একটি বয় ছুটতে ছুটতে এসে সেলাম করে দাঁড়ায়। কাছে আসতে চেনা যায় তাকে। পুরানো চাকর বা ছিট।

: কি খবর বা ছিট, তোমার মনিবরা গেলেন কোথায়?

: আলিম সায়েব মারা গেছেন বছর খানেক হলো। তারপর হোটেল এক সায়েবের কাছে বিক্রী করে কোথায় যে চলে গেছে মাপান, তা সেও জানে না। সে কিন্তু ছাড়তে পারেনি হোটেলের মায়া—তাই এই নতুন সায়েবের কাছেই কাজ নিয়েছে আবার।

পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দেয় সীমাচলম, তারপর সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে রাস্তায় নেমে আসে।

দিন দশেকের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যায় সীমাচলমের। স্টীমারের ধার ঘেঁষে চুপ করে বসে থাকে অপস্রিয়মান জেটির দিকে চেয়ে। অনেকদূরে সোয়েডাগন প্যাগোডার সোনালী মুকুটটা ঝলমল করে। কর্মব্যস্ত শহরের পাশ কাটিয়ে মোড় ফেরে স্টীমারটা।

স্টীমারের অন্য এক কোণে তুমুল সোর-গোল। আস্তে উঠে সেইদিকে পা চালায় সীমাচলম।

গুটি পাঁচ ছয় বাঙালী ভদ্রলোক বসেছেন গোল হয়ে। একজনের হাতে একটি খবরের কাগজ। তারস্বরে চীৎকার করেন তিনি: দেখলেন হিটলারের কাণ্ডটা, একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ, একটু যদি বুঝে শুনে কাজ করে।

কথার ধরণে একটু অবাকই হয়ে যায় সীমাচলম। কেন কি আবার করলো হিটলার।

: এই সময় কোথায় লোকে শত্রুকে হাত করতে চেষ্টা করে, তা নয় পাড়াপড়শীকে চটানো। ছি, ছি, দেখেছেন কাগজটা। খামখা রাশিয়ার পিছনে লাগবার দরকারটা কি ছিলো এখন। আরে, আগে বাইরের শত্রু নিপাত হোক, তারপর না হয় রয়ে সয়ে নিজেদের ভেতরকার ব্যাপারটা মেটা।

কাগজটা দেখেছে সীমাচলম। দেখেছে রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে জার্মানী। এটা কতদূর যুক্তিযুক্ত হয়েছে হিটলারের পক্ষে, তা অবশ্য ও ভাবেনি, ভাববার প্রয়োজনই বোধ করেনি। হিটলারের সামরিক নৈপুণ্যের ওপর শ্রদ্ধা আছে ওর। এটুকু ও বোঝে যে, যা করেছে জার্মানী তার হয়ত প্রয়োজন হয়েছিলো।

দলের মধ্যে একটি ভদ্রলোক বলেন: কেন অন্যায়টা কি করেছে হিটলার? কথার উত্তরে যেন ফেটে পড়েন প্রথম ভদ্রলোকটি: হুঁ, আপনাদের রক্ত এখন গরম। বিচার-বিবেচনার ধার দিয়েও তো যাবেন না আপনারা। আমার একটি ভাই বুঝলেন, অবিকল সেই হিটলারী মেজাজ। এক ভাইয়ের সংগে জমির দখল নিয়ে মামলা বাধলো। সেই জমিতে বাগদী প্রজা ছিলো গোটাকতক। বারবার বললুম ওই বাগদীগুলোকে হাতে রাখো, অসময়ে দরকারে

লাগবে। কিন্তু রক্ত গরম তখন, আমাদের কথা কানে যাবে কেন। ব্যস, লাগলো সেই বাগ্দীদের পিছনে। অন্য ভাইটিও ঠিক তাই চেয়েছিলো। বাগ্দীদের লেলিয়ে দিয়ে দিলে তাকে নিকেশ করে।

ঃ বলেন কি, শেষ করে দিলে একেবারে? হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে যায় সীমাচলমের।

ভদ্রলোকটি পিছন ফিরে দেখেন সীমাচলমের দিকে, তারপর বলেনঃ হুঁ, এসব তো প্রায়ই হয় আমাদের দেশে। পদ্মা নদীর নাম শুনেছেন, দুরন্ত পদ্মা? এক একটা চর জেগে ওঠে পদ্মার বুকে আর জনদশেক করে মানুষ খুন হয়। যে আগে দখল নিতে পারবে চর তার। চর জাগার সংগে সংগে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিয়ালের দল। রক্তে লাল হয়ে যায় চরের মাটি। যার কব্জির জোর বেশী, তার হয় মাটি।

পায়ে পায়ে আবার জাহাজের ধারে এসে দাঁড়ায় সীমাচলম। অনেকদূরে মংকি পয়েন্টের সীমানা কালো বিন্দুর মতো দেখা যায়। চারদিকে শুধু অথৈ জল—ঘোলাটে আর ফিকে সবুজ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে সীমাচলমঃ যতো কিছু আগুন জ্বলে ওঠে এই মাটিকে ফিরে। এ যুদ্ধও তো তাই। মাটি চায় জার্মানী সে মাটি তাকে দেবে না বৃটেন—ব্যস, শুরু হয়ে গেলো লড়াই। কব্জির জোর যার বেশী সেই দখল নেবে মাটির। অনেকদিন আগে থেকে এই হয়ে আসছে যুদ্ধের ইতিহাস, আজও তাই।

জেটিতে অগাস্টিন সায়েব নিজে এসেছিলেন। মেসিনটার ব্যাপারে একটু চিন্তিতই ছিলেন তিনি। মেসিনটা সীমাচলম সংগে করে আনতে পেরেছে জেনে খুবই সুখী হলেন তিনি। মেসিনটা লরীতে চাপিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দুজনে।

ঃ মিলে একটু গোলযোগ শুরু হয়েছে—খুব গম্ভীর গলা অগাস্টিন সায়েবের।

ঃ গোলযোগ? সে কি, কিসের গোলযোগ।

ঃ আপনি চলে যাবার পরের দিনই চাকার তলায় পড়ে কুলি মারা যায় একটা। চাকাটা কিভাবে যেন লুঙ্গিতে আটকে গিয়েছিলো তার। চীৎকার শোনার সংগে সংগেই সুইচ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু মাথার খুলিটায় চোট লাগায় কিছুতেই বাঁচানো গেলো না তাকে। তার মাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে মিটিয়ে ফেলা হয়েছিলো ব্যাপারটা। কিন্তু সারাটা দিন গুজগুজ ফুসফুস চলে মিলের কুলিদের মধ্যে। কেমন যেন অসন্তোষের গুমট ভাব। কিছু যেন একটা সন্দেহ করছে ওরা।

পরের দিন সকালেই বোঝা গেলো ব্যাপারটা। একটি কুলিও কাজে এলো না, কিন্তু দল বেঁধে সব ব'সে রইলো গেটের দুপাশে। আমি যেতেই ঘিরে দাঁড়ালো আমাকে, কেন, গরীব ব'লে কি ওদের জীবনের দাম নেই নাকি। মেমসায়েবের প্রকাণ্ড লোমওয়ালা যে কুকুর ছিলো একটা তার দাম পঞ্চাশ টাকার ঢের বেশী ছিল তা কি জানে না তারা!

ব্যাপারটা বোঝাতে আমি চেষ্টা করলাম তাদের। বললাম যে কর্তাদের লিখে আরও বেশী যাতে পেতে পার তার বন্দোবস্তও আমি করবো। কিন্তু আমার কথায় কানই দিলো না ওরা,—জোট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে আর মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠলো ঃ সাদা চামড়া নিপাত যাক্। আমাদের জীবনের দাম যারা কুকুর শেয়ালের চেয়েও কম মনে করে, তাদের অধীনে কাজ করবো না আমরা।

ঃ উপায়, মিল তাহ'লে বন্ধ রয়েছে এখন।

ঃ হ্যাঁ, একরকম বন্ধই বই কি। কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক কুলিদের মুখের কথা এ নয়, পিছনে বড়গোছের কেউ যেন রয়েছে। আমি তার করে দিয়েছি কাশিমভাইয়ের কাছে, তিনি নিজে একবার আসলেই ভালো হয়। কুলিদের মনে কে যেন এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে যে সাদা চামড়া ওদের শত্রু। কাজেই ভালোভাবে কিছু বোঝাতে গেলেও আমার ওপর ক্ষেপে ওঠে ওরা।

ঃ ভবতারণবাবুকে দিয়ে চেষ্টা করলে পারতেন একবার।

ঃ ভবতারণবাবুও তো নেই এখানে। পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন।

ঃ ও, মনটা খারাপ বলে বোধ হয় জায়গা বদলি করলেন কয়েকদিনের জন্য! কিন্তু দিন পনেরো তো প্রায় যাতায়াতেই কেটে যায়।

ঃ না মনের অবস্থার জন্য নয়, আমাকে যা বলে গেলেন, বিয়ের বুঝি সম্বন্ধ ঠিক হ'য়েছে তাই গিয়ে বিয়েটা করে আসবেন চট্ করে।

বেশ একটু যেন চমকেই যায় সীমাচলম। বিয়ে করতে গেলেন ভবতারণবাবু? আবার বিয়ে আর এত শীঘ্র। সেদিনের সে কান্নার কোনই মানে নেই বুঝি।

আর কোন কথা হয় না বিশেষ। সীমাচলমের ভারি ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। কুলিদের ব্যাপার আর ভবতারণবাবুর কান্ড মিলে মাথার ভিতর পর্যন্ত যেন গুলিয়ে দেয়।

অগাস্টিন সায়েবের কথাই ঠিক।

মিলের গেটের দুপাশে ভিড় জমায় কুলির দল। শুধু ওদের মিলের কুলি নয়, আশেপাশের আরো দুএকটা মিলের কুলির পাল এসে জোটে। বেশ যেন উত্তেজিত মনে হয় ওদের। পিচবোর্ডের ওপর বড়ো বড়ো করে লাল কালিতে লেখাঃ জবাব চাই! গরীবের জানের দাম চাই!

সীমাচলম গেটের কাছ বরাবর যেতেই তাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে সবাই।

ঃ বিচার করুন এর। গরীবের প্রাণের দাম পঞ্চাশ টাকা। কে দেখবে ফেমণ্ডের কচি ছেলে আর বৌকে? পঞ্চাশ টাকায় কি হবে ওদের! বারবার বলেছি আমরা যে রাত্তির হ'য়ে গেলো আজ আর দরকার নেই, কিন্তু ওই ফ্যাকাসে চামড়ার বিলিতি ম্যানেজার কানে তুলেছে আমাদের কথা? সারাদিনের খাটুনীর পরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো ফেমণ্ড, তবু তাকে জোর করে মেসিনঘরে পাঠানো হ'য়েছিলো, বলুন তার মরার জন্য কে দায়ী?

বিরাট একটা হট্টগোল। দুহাত তুলে বহুকষ্টে তাদের থামায় সীমাচলম। আস্তে আস্তে বলে ঃ কোন একটা ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করলেই তো সমস্ত প্রশ্নের জবাব মিলবে না ভাই সব। যাতে ফেমণ্ডের বৌ আর ছেলের সুবন্দোবস্ত হয়, আমি কথা দিচ্ছি, সে চেষ্টা আমি করবো।

কলরব একটু যেন স্তিমিত হ'য়ে আসে। কিন্তু পিছন থেকে বুড়ো গোছের একজন এগিয়ে আসে জোরপায়ে। হাতে তার প্রকাণ্ড নিশান—সবুজ জমির ওপরে ময়ূরের ছবি একটা। এদেশের জাতীয় নিশান। নিশানের লাঠিটা সজোরে ঠোকে মাটিতে আর বলে।

ঃ কিন্তু আমাদের দেশের কলকারখানায় সাদা চামড়ার প্রভুত্ব আমরা মানবো কেন? কেন আমাদের ছেলেদের লোভ দেখিয়ে লড়াইয়ে ঢোকানো হ'চ্ছে? ওদের জন্যে কেন রক্ত দেবে আমাদের দেশের সন্তান?

থমথমে আবহাওয়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম। কথাগুলো যেন ঠিক কুলী-মজুরদের কথা ব'লে মনে হয় না। অনেক নীচে গেছে এর শিকড়। পঞ্চাশ টাকার দাবী এ নয়—এর মূলে আরও গভীরতর কোন স্তরে। এ চেতনা আর এ জাগরণ কে আনলো এদের মধ্যে।

পতপত করে ওড়ে সবুজ রংয়ের নিশান। বুড়ো লোকটা কোমরে হাত দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায় আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সীমাচলমের সারা দেহে বোলাতে থাকে।

ঃ বেশ যা অভিযোগ তোমাদের লিখে দাও আমাকে, আমি মনিবকে জানাবো। এর বেশী আর কি করতে পারি আমরা।

ঃ তাই হবে। তাই করবো আমরা।

জনতা দুভাগ হ'য়ে সরে যায় দুপাশে—ভিতর দিয়ে মিলে গিয়ে ঢোকে সীমাচলম। চেয়ারে বসে কিন্তু উত্তেজনায় ও হাঁফাতে থাকে।

অগাস্টিন সায়েব ছুটে আসেন তার পাশেঃ

লেন তো ব্যাপারটা। কি করা যায় বলুন এখন।

ঃ আমিও তো ভেবে কিছু কূলকিনারা চ্ছ না। কে এসব ঢোকাচ্ছে এদের মাথায় ন তো।

ঃ ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় ন একটা রাজনৈতিক দল কাজ করছে এদের ছনে। আমি পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া র তো কিছু গতি দেখছি না।

ঃ কিন্তু ফল কি ভালো হবে তার। আগে পোষে এদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে নিয়ে খা যাক। আমার মনে হয় সাময়িক একটা গুজনায় হয়ত কাজ করছে না এরা।

ঃ বেশ, এদের সঙ্গে আপোষে রফা করার ষ্টা করুন একটা। আমাকে তো দেখলেই ্লে ওঠে এরা। আমি আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে ই না। যা করবার আপনিই করুন।

সেদিন বিকেলেই মিলের মিস্ত্রি কো মং কাণ্ড ফিরিস্তি দাখিল করে অভিযোগের। ইনে বাড়ানো, মাগ্গী ভাতা প্রভৃতি মিলিয়ে ্চিশটে দফা। সেগুলোর ওপর একবার চোখ ্লিয়ে নেয় সীমাচলম তারপর বলে ঃ এ বিষয় নয়ে আলোচনা করতে হ'লে কার সঙ্গে করবো আমি?

ঃ আলোচনা—মাথাটা চুলকায় কো মং আর ক যেন ভাবে মনে মনে, তারপর বলে ঃ আপনি তা হ'লে অফিসেই চলুন আমাদের। শেয়াজীর সঙ্গে আলাপ করবেন।

'শেয়াজী' এরা পণ্ডিত কিংবা নেতৃস্থানীয় কোন লোককে বলে, তা জানা আছে সীমাচলমের।

ঃ কিন্তু কে তোমাদের শেয়াজী? কোথায় থাকেন তিনি।

ঃ শেয়াজীর নাম জানি না। খুব পণ্ডিত লোক তিনি। আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন। তিনি উপস্থিত আমাদের বস্তিতেই আছেন। কিন্তু কাল বিকেলের মধ্যেই দেখা করতে হবে, তার সঙ্গে। পরশু তিনি আবার অন্য জায়গায় রওনা হবেন।

ভারি কৌতূহল হয় সীমাচলমের। কে এই নেতা? শ্রমিকদের বস্তির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে এমনি করে চেতনার আগুন জ্বালছেন শ্রমিকদের দুচোখে! সাদা চামড়ার প্রতি তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি করছেন মজুর মহলে। দেখা করে আসতে আর ক্ষতিটা কি!

ঃ বেশ তাই যাওয়া যাবে! তোমরা কেউ এসে নিয়ে যেও আমাকে।

অগস্টিন সায়েবের কিন্তু খুব মনঃপূত হয় না এ যুক্তিটা। এতগুলো শ্রমিকদের মধ্যে একলা যাওয়াটা কি ঠিক হবে সীমাচলমের। উত্তেজিত অবস্থায় যদি মেরেই বসে ওকে?

কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হয় না সীমাচলম। না, সেরকম কিছু বোধ হয় করবে না ওরা, অন্তত এ অবস্থায় তো নয়ই। ওদের দাবী মেটাবার সম্ভাবনা তো এখনও রয়েছে যথেষ্ট। আর তা ছাড়া অদম্য একটা কৌতূহল ওর মনে —কে এই বিরাট পুরুষ যিনি অবহেলিতের মধ্যে জাগরণ আনার চেষ্টা করছেন। দুর্বল মেরুদণ্ডে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার শক্তি দিতে চাইছেন।

সেই পতাকাধারী বুড়ো লোকটি এসে দাঁড়ায় মিলের ফটকের ধারে। তার সঙ্গেই চলতে শুরু করে সীমাচলম। শহরতলী পার হ'য়ে ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে সাবধানে পা চালায় দুজনে। পথে দুএকটা কথা বলার চেষ্টা করে সীমাচলম কিন্তু খুব বিনীতভাবে বলে বুড়োটিঃ সব কিছু শেয়াজীর কাছেই শুনবেন। আসুন তাড়াতাড়ি পার হ'য়ে যাই ধানক্ষেতটা।

ধানক্ষেতের পরেই সারি সারি কাঠের বাড়ির সার। অপরিসর নোংরা গলি। মুরগী আর শুয়োরের পাল চরছে এখানে সেখানে। অনেকগুলো কাঠের বাড়ি পার হ'য়ে এক জায়গায় এসে থামে লোকটি। দর্মাঘেরা ছোট্ট একটা কুঠুরি। সামনের কপাটে খুব বড়ো ক'রে লেখা ঃ অন্ধ জাগো।

বারান্দায় গোটা কয়েক মজুর বসে জটলা করে। তাদের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢোকে সীমাচলম। ছোট্ট একটা ঘর। বর্মী প্রথায় খুব নীচু টেবিল পাতা মাঝখানে। সারা ঘরে চাটাই বিছানো। দু'একজন বুড়ো শ্রমিক বসে আছে জানলার কাছে।

ঃ আপনি বসুন একটু। উনি বাইরে গেছেন, আসবেন এখনি। চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। বাইরের বারান্দায় কালো কুকুর একটা শুয়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। চারদিক ঘিরে কেমন যেন একটা থমথমে স্তব্ধতা। টেবিলের ওপরে রাখা "তুরিয়া" খবরের কাগজটা তুলে নেয় সীমাচলম। ভীম বিক্রমে আক্রমণ শুরু করেছে জার্মানী। বৃটেন আর রাশিয়া প্রবল দুই শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছে। প্রদেশের পর প্রদেশ পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়—অনেক দিনের গড়া সভ্যতা আর শৃঙ্খলা গুড়িয়ে চুরমার হ'য়ে যায়।

বারান্দায় অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ। জোর কথাবার্তাও শোনা যায়। প্রায় দশবারোজন লোক সশব্দে ঘরে ঢোকে। সকলকেই শ্রমিক শ্রেণীর ব'লেই মনে হয়। পতাকাধারী বুড়োটি এগিয়ে যায় আর কাকে যেন উদ্দেশ্য ক'রে বলেঃ তেলের কলের কর্তার লোক এসে গেছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে।

ঃ তাই নাকি, বসিয়েছো তো ভিতরে— বাইরে থেকে গলার শব্দ শোনা যায়।

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, ঘরের ভিতর আপনার অপেক্ষা করছেন।

চলো ঃ কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে ঢোকেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটি—মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বাস, হাতে একটি কাগজের ছাতা। ফুংগী (পুরোহিত) ব'লেই মনে হয় তাকে।

এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে সীমাচলমঃ আপনার কাছেই এসেছি।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলে না লোকটি। তীক্ষ্ন আর উজ্জ্বল দুটি চোখ দিয়ে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে সীমাচলমের। ভারি অস্বস্তিবোধ করে সীমাচলম—। চেয়ে চেয়ে কি এত দেখছে ফুংগীটি। কাজের কথা শুরু করলেই তো পারে এবার। মজুরদের দাবীর কথা আর তাদের ছোটখাটো হাজারো অভি-যোগের বিষয়।

ঃ তোমার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে একথা কিন্তু ভাবিনি সীমাচলম।

চমকে ওঠে সীমাচলম। এ গলার আওয়াজ তো ভোলবার নয়। আজও কাজকর্মের অন্তরালে এই উদাত্ত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ভেসে আসে ওর কানে। চেয়ে চেয়ে দেখে সীমাচলম। ছদ্মবেশের আড়ালেও চিনতে ভুল হয় না আসল মানুষটিকে।

ঃ আপনি আকো! আপনি এখানে?

ঃ আমার এখানে থাকাটা খুব অস্বাভাবিক নয় সীমাচলম, কিন্তু সাদা চামড়ার ম্যানেজারের তরফ থেকে তোমার প্রতিনিধিত্ব—এটাই যেন আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে।

ওদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়ায় মজুরের দল। ব্যাপারটা যেন ওদের কাছেও নতুন ঠেকছে। এত মোলায়েমভাবে কি কথা বলছেন শেয়াজী। সোজা কথার সোজা উত্তর। হয় দাবী মেটানো চাই আমাদের, নয়ত মিলের কাজ বন্ধ রাখতে হবে, ব্যস, সাফ কথা।

সীমাচলমের কাঁধে একটা হাত রাখেন আকো। আস্তে আস্তে বলেন ঃ আমার সঙ্গে বাইরে আসবে একটু, অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে কোন। এদের চোখের সামনে ব্যাপারটা যেন বড্ড নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে। এসো।

কোন কথা বলে না সীমাচলম। মাথা নীচু করে বেরিয়ে আসে আকোর পিছনে। পা দুটো ওর কাঁপছে ঠক ঠক করে। গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। আবার সেই ঘূর্ণাবর্ত। দেশ থেকে দেশান্তরে যাযাবরী জীবনযাত্রা। একবার মনে হয় ছুটে ও পালিয়ে যায় আকোর আওতা থেকে কিন্তু অসম্ভব, দুর্বার এক আকর্ষণে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে সীমাচলম।

আগাছার জংগল পার হয়ে উঁচু একটা ঢিপির ওপরে বসেন আকো। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার। অনেক দূর থেকে ঝিঁঝিঁপোকার অশ্রান্ত আওয়াজ ভেসে আসে। আকাশের কোণে পাণ্ডুর চাঁদের ফালি। আকোর পাশেই বসে পড়ে সীমাচলম।

ঃ দল থেকে পালিয়ে আসার শাস্তি জানো সীমাচলম—খুব গম্ভীর গলায় আওয়াজ আকোর।

উত্তর দেয় না সীমাচলম। মাথা নীচু করে চুপ করে বসে থাকে। কেমন যেন ভয় ভয় করে ওর।

ঃ আমি জেল থেকে বেরিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি তোমাকে। ছোট বড় সমস্ত শহরে লোক পাঠিয়েছি তোমার জন্য। তুমি কেন বিনা আদেশে সরে এলে সীমাচলম।

খুব আস্তে আস্তে বলে সীমাচলম—ওর গলার আওয়াজ কেঁপে কেঁপে ওঠে—কেমন যেন সংশয় আর দ্বিধায় মেশানো কণ্ঠস্বরঃ আমায় মাপ করুন। এ পথে চলবার মত সাহস পাচ্ছি না আমি। এ পথ যেন আমার নয়।

সীমাচলম ঃ চীৎকার করে ওঠেন আকো ঃ জুতোর ঠোক্করেও কি তোমাদের চেতনা হয় না। বোঝ না, এই হচ্ছে সময়। ইউরোপের বুকে যে আগুন জ্বলে উঠেছে তার একটু ছোঁয়াচ কি লাগছে না তোমার বুকে। এ সুযোগ যদি হারাই আমরা, তবে হাজার বছরের মধ্যেও বোধ হয় আর উঠতে পারবো না।

ঃ ভয়ে ভয়ে মুখটা তোলে সীমাচলম। ম্লান চাঁদের আলোয় চোখদুটো জ্বলে ওঠে আকোর। দৃঢ়সংবদ্ধ দুটি ঠোঁট—সমস্ত শরীর আবেগে দুলে ওঠে।

ঃ ওদের আসন টলছে। হিটলার যে খেলা শুরু করেছে ও দেশে তার শেষ যে এদেশেই করতে হবে আমাদের। পারস্য থেকে চীন-জাপান পর্যন্ত সব একজোট হতে হবে। শিকর টেনে তুলে ফেলতে হবে সীমাচলম। না দাসত্ব আর নয়।

ঃ কিন্তু সামান্য একটা প্রদেশে মুষ্টিমেয় কতকগুলো শ্রমিক নিয়ে কি করতে পারবেন আপনি?

ঃ সবই করতে পারবো। প্রত্যেকটি লোকের মনে সাদা চামড়ার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে হবে। বোঝাতে হবে ওদের সংগে কোন সংশ্রব নেই আমাদের। আমাদের রসদে ওরা গোলাঘর ভরবে, আমাদের সৈন্য দিয়ে ওদের দেশ বাঁচাবে—এসব কিছুতেই চলবে না। আজ আর কোন দ্বিধা নয়—সংশয় নয়—একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সবাইকে। এই বোধ হয় আমাদের শেষ চেষ্টা। তোমাকে আমার চাই সীমাচলম। এদেশের প্রবাসী ভারতীয়দের চোখের ঠুলি খুলে ফেলতে হবে তোমাকে। বুঝিয়ে বলতে হবে তাদের—এখানে আর কোন ভেদাভেদ নেই—কোন প্রদেশের বিচার নয়, কোন ধর্মের বিচার নয়—আমরা সকলেই শুধু পরাধীন—শিকল আমাদের ভাঙতেই হবে।

এলোমেলো বাতাসে আকোর গৈরিক আচ্ছাদন ইতস্ততঃ উড়তে থাকে— দুটি চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি। এ অনুরোধ নয়—এ আহ্বান—সীমাচলমের ঘুমন্ত রক্তকণিকায় কিসের যেন সাড়া জাগে। অনেক যুগের ঘুম ছেড়ে ও যেন চোখ মেলতে চায়। দূরে অস্ত গেছে সূর্য—সমস্ত পশ্চিম আকাশে গাঢ় রক্তের প্রলেপ। রাত্রি নামবে—নিকষ কাজল রাত্রি—অনন্ত সুষুপ্তি হয়ত। কিন্তু শিকল ছেঁড়ার এ সংগ্রামে এগিয়ে যাবে সীমাচলম। কোন ক্লান্তি আর জড়তা নয়—নিশ্চিত পদ-বিক্ষেপে শুধু এগিয়ে যাওয়া।

ঃ কি আমায় করতে হবে বলে দিন।

ঃ সীমাচলম, তুমি আমার সঙ্গে থাকো শুধু। সময় আমাদের খুবই অল্প। এই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত এশিয়ার বুকে আগুন জ্বালাতে হবে আমাদের। গ্রাম থেকে গ্রামে, প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে শুধু বিদ্বেষের মশাল জ্বালিয়ে বেড়াতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কি বুঝি ভাবছেন আকো। সন্ধ্যাতারার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন, তারপর বলেন খুব আস্তে আস্তেঃ

সত্যিই আশ্চর্য লাগে, ভারতীয়রা কিছুতেই কি সচেতন হবে না। বিশেষতঃ এদেশে যারা বাস করে, তারা যেন শাসকসম্প্রদায়ের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে আছে। এদেশের লোকেদের দিকে কোনদিন চোখ ফিরিয়ে দেখে না। এদের সুখ দুঃখ, এদের ব্যথা বেদনা সম্বন্ধে কেমন যেন উদাসীন। এদের তোমাকে জাগাতে হবে সীমাচলম। ভারতীয় শ্রমিকেরা হয়ত একদিন হাত মেলাবে বর্মীদের সঙ্গে, কিন্তু চাকুরী-জীবী মধ্যবিত্তরা কোনদিন ফিরেও চাইবে না এদের দিকে।

ঃ আপনি আমায় পথ বলে দিন—আপনার নির্দেশে আপনার কথামতই আমি চলবো।

ঃ কাল বিকালে এ জায়গা থেকে আমি রওনা হবো। তুমি আমার সঙ্গে চলো সীমাচলম।

একটু ইতস্তঃ করে সীমাচলম। চলে যেতে হবে? কালই? কিন্তু এভাবে দায়িত্ব ফেলে হঠাৎ সরে যাবে আকিয়াব থেকে? কি ভাববেন অগস্টিন সায়েব? কাশিমভাই সায়েবই বা বলবেন কি? তার চেয়ে কিছুদিন থেকে বরং কাজে ইস্তফা দিয়ে গেলেই তো সর্বদিক থেকে ভালো হয়।

কিন্তু আকোর মত তা নয়। কে কি ভাবলো আর মনে করলো এই সব ছোট খাটো চিন্তা করার সময় আজ নয়। পা ফেলে এগিয়ে যেতে হবে—পিছিয়ে থাকা মানেই তো এবার মৃত্যু।

তবু যেন কেমন মনে হয় সীমাচলমের। অগস্টিন সায়েবের এতটা বিশ্বাসের বুঝি এই হবে প্রতিদান। প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে তাঁকে ফেলে চুপি চুপি এমনিভাবে আত্মগোপন? কিন্তু মুখে আর কিছু বলে না সীমাচলম, কেবল আস্তে জিজ্ঞাসা করে ঃ বেশ, কাল আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে বলুন।

ঃ সন্ধ্যার পরে আমার লোক তোমার কাছে চিঠি নিয়ে যাবে, তার সঙ্গেই চলে এসো।

অন্ধকারের মধ্যে ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে সীমাচলম। ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলছে ধানের শীষ। আবছা চাঁদের আলোয় চিক চিক করে পাতাগুলো। অনেক ধান হয়েছে এবার। ধানের ভারে শীষগুলো নুয়ে পড়েছে আলের ওপরে। পা দিয়ে ধান-গুলো মাড়াতে কষ্ট হয় সীমাচলমের। খুব সাবধানে পা ফেলে সে এগিয়ে যায়।

বিছানায় শুয়ে সে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আসে না সীমাচলমের। কেমন যেন গুমোট ভাব একটা। বাতাসও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সীমাচলম। চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বসে। পিচঢালা রাস্তাটা চক চক করে গ্যাসের আলোয়। দু' একটা গরুর গাড়ী চলেছে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে।

সবকিছু ছেড়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নতুন পরিবেশে। নিশ্চিন্ত আরাম নয়, দুর্বার সংগ্রাম—যে সংগ্রামে একটা জাতির স্বপ্ন সফল হয়, কিংবা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সীমাচলম। এ রকম আবার হয় নাকি কখনও? চীন, জাপান, বর্মা, ভারতবর্ষ সমস্ত দাঁড়াবে পাশাপাশি, সাদা চামড়ার সঙ্গে সমানে করবে লড়াই। এ যেন বিশ্বাসই করতে পারে না সীমাচলম। অনেক-দিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে যায়। পঞ্চায়েতের ভোট নিয়ে দুটো দল হ'য়ে গেলো ওদের গাঁয়ে। দুদলই রুখে দাঁড়ালো লাঠি হাতে নিয়ে। তুমুল দাঙ্গা বেধে গিয়েছিলো সেবার। নিজেদের মধ্যে সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত দলাদলি যাদের মধ্যে তারা আবার এক-জোট হতে পারবে না কি কোনদিন? কে তাদের টেনে আনবে আর পাশাপাশি দাঁড় করাবে? আকোর কথা মনে পড়ে সীমাচলমের, আঠুনের কথা মনে আসে—কিন্তু এরা পারবে নাকি সবাইকে এক করতে? কে শুনবে এদের কথা? গোটা কয়েক পিস্তল আর কিছু বারুদ—এই নিয়ে ইংরাজের মুখোমুখি সম্ভব নাকি দাঁড়ানো। কেমন যেন সংশয় জাগে সীমাচলমের মনে—যদি ঘুরে যায় চাকা, গুপ্তচরের মারফৎ সব কিছু যদি জানাজানি হয়ে যায়, এদেশের ইতিহাসে এ তো নতুন নয়, তখন, তখন কি হবে অবস্থা? কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে সীমাচলমের। নিশ্চিত মৃত্যু—এ ছাড়া আর কোন পথ নেইও—ওদেরই বুলেটের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হবে ওর শরীর। কিন্তু জয়ী যদি হয় ওরা—আর ভাবতে পারে না সীমাচলম, সামান্য চিন্তাতেও যেন শিহরণ জাগে সারা দেহে।

জানলার কপাটে মাথাটা রেখে চুপ করে বসে থাকে সীমাচলম। আস্তে আস্তে চোখ-দুটো বুজে আসে একসময়ে।

(ক্রমশঃ)

ভগ্নী নিবেদিতা

শ্রীআশুতোষ মিত্র

যে মহিমময়ী স্বাধীনচেতা রমণী নিজ দেশ, নিজ জাতি, নিজ ধর্ম এমন কি নিজ নাম পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষের আশ্রয় লাভের ফলে ভারতীয় নাম পরিগ্রহণ পূর্বক ভারতকে, ভারতবাসীকে এবং ভারতীয় ধর্মকে নিজস্ব ভাবিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, সেই সর্বজনপ্রিয়া ভগ্নী নিবেদিতার সংস্রবে সুদীর্ঘকাল থাকিয়া যে সব ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি বা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, মাত্র সেগুলিই এই প্রবন্ধে বিবৃত করিলাম।

অতএব প্রবন্ধটিকে ভগ্নীর জীবনী বলা যায় না—জীবন-নাটকের দৃশ্যবিশেষ বলা যাইতে পারে।

ভগ্নীর পূর্ব নাম মার্গারেট ই নোবল্ (Margaret E Noble) ছিল। ভারতে আসিয়া স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) নিকট ব্রহ্মচর্য লইয়া "নিবেদিতা" নাম গ্রহণ করেন। আমরা সকলেই ইঁহাকে সিস্টার (ভগ্নী) বলিয়া ডাকিতাম। একমাত্র স্বামীজী কিন্তু গুরু বলিয়া পিতৃস্নেহবশে ইঁহার পূর্ব কৃশ্চান নামের অপভ্রংশে "মার্গোর" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি লেখক অপেক্ষা কয়েক মাস পূর্বে ব্রহ্মচর্য লয়েন; তাই তাহাকে বলিতেন, আমি তোমার চেয়ে কয়েক মাসের বড় (প্রাচীন—Senior)। উনি চিরকুমারী।

মঠভুক্ত হইবার পূর্বে ভগ্নীকে একবার মাত্র দেখি স্টার থিয়েটারে তাঁহার এক বক্তৃতায়। বক্তৃতার পূর্বদিন অপরাহ্নে কলিকাতার চতুর্দিকে এক প্লাকার্ড মারা হয় এই মর্মে—স্বামী বিবেকানন্দের এক পাশ্চাত্য দেশীয়া শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতা (মিস মার্গারেট ই নোবল) একটি বক্তৃতা করিবেন এবং স্বামীজী স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। বক্তৃতার বিষয়টা ঠিক কি ছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পঠদ্দশায় হইলেও আমাদের ভিতর একটা মহা উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল, বড় বড় বক্তার বক্তৃতা এবং লেখকের প্রবন্ধ পাঠ শুনিবার। ঐ প্রকারে যে সব স্বনামধন্য ব্যক্তির বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ শুনিবার ভাগ্য আমাদের হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নাম এখানে দিতেছি—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী কৃষ্ণানন্দ (কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন), কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, মিসেস আনি বসন্ত, গোখলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সখারাম গণেশ দেউস্কর।

যাহা হউক, পূর্বোক্ত প্লাকার্ড পাঠে ভগ্নীর নামের সহিত পরিচিত না থাকায় মনে হয়, এই মহিলাটি আবার কে? ইনি আবার কি বক্তৃতা করিবেন? তবে স্বামীজী আছেন তাঁহার অভিভাষণ শুনা যাইবে। অবশেষে যথাসময়ে গেলাম। ভগ্নীর বক্তৃতা শুনিলাম। স্বামীজীর অভিভাষণও শুনিলাম। স্বামীজীর আহ্বানে মিসেস আনি বসন্ত, গোখলে আদিকেও কিছু কিছু বলিতে শুনিলাম।

ভগ্নীর বক্তৃতা শুনিয়া যুগপৎ আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার অঙ্গভঙ্গী, তাঁহার ওজস্বিতার বিকাশ বড়ই উপভোগ্য। উক্তকালে তাঁহার যে কয়টি বক্তৃতা শুনিয়াছি সেগুলিতেও ঐ ভাবই মনে উদয় হইয়াছে এবং "নিবেদিতা কেবল বক্তা নয়, ওতে বাগ্মীতাও আছে" —স্বামীজীর ঐ কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি।

পরে আমরা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভাড়াটিয়া বাগান বাটীতে মঠভুক্ত হইয়া দেখি, বর্তমান মঠের জমী ইতিপূর্বেই ক্রয় করা হইয়াছে এবং উহার উত্তর দিকের নিম্নতলে দুই-খানি পাকা ঘর আছে। এই ঘর দুইখানিতে ভগ্নী ও তাঁহার দুইটি গুরু ভগ্নী বাস

করিতেছেন। ঐ গুরু ভগ্নী দুইটির নাম মিসেস সারা সি বুল ও মিস ম্যাকলাউড। ইঁহারা উভয়েই মার্কিনবাসিনী।

আমরা প্রত্যহ অপরাহ্নে ঐ জমীর দক্ষিণ দিকে বেড়াইতে যাইতাম। ভগ্নীরাও সেই সময় উত্তর দিকে বেড়াইতেন; আর কোন কোনদিন আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া আমাদের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিতেন। লেখককে মঠের সর্বাপেক্ষা ছোট দেখিয়া ভগ্নী নিবেদিতা "Young Swami" (ছোট স্বামী) বলিয়া ডাকিতেন। মঠের বড়রা বিশেষতঃ স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ নিত্য প্রাতে ভগ্নী-গণের তত্ত্বাবধানে যাইতেন। একদিন স্বামীজীর সঙ্গে লেখককেও যাইতে হইয়াছিল।

স্বামীজী দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া একটি পদ্য লিখেন, যাহাতে মা কালীর অপূর্ব বর্ণনা আছে। কবিতাটি শেষ হইলে নিবেদিতাকে ডাকাইয়া পাঠান। তিনি আসিয়া উহা শুনেন আর উহা তাঁহার এত ভাল লাগে যে, স্বামীজীর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যান এবং নিজের নিকটে রাখিয়া দেন। পরে উহা বীর বাণী নামক পুস্তকে বাহির হইয়াছে। আমরা ঐ কবিতাটি পাঠক পাঠিকাগণের তৃপ্তির জন্য অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করিতেছি—

মূল (ইংরাজী)

Kali the Mother

The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds
It is darkness vibrant, sonant,
In the roaring whirling wind
Are the souls of a million lunatics,—
Just loose from prison-house
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain waves
To reach the pitchy sky—
The flash of lurid light
Reveals on every side,
A thousand, thousand shades
Of Death begrimmed and black—
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy;
Come Mother, Come!
For Terror is Thy name!
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er,
Thou Time, the all-Destroyer!
Come, O Mother, Come!
Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance
To him the Mother comes.

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক অনূদিত)

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ।
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি চূড়া জিনি
নভস্তল পরশিতে চায়, ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার, মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়।
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়।
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী, তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মাগো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে—
কাল নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।

মঠ-বাটী নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইলে ভগ্নীরা বালীতে রিভার টমসন স্কুলের (River Thompson School) পার্শ্বে গঙ্গাতীরে একখানি সুন্দর ছোট বাঙলায় উঠিয়া যান এবং তথায় কিছুদিন থাকেন। এখানে অবস্থানকালে ভগ্নী নিবেদিতার একটি বক্তৃতা মিনার্ভা থিয়েটারে হয়। স্বামীজী উপরের বক্সে থাকিয়া ঐ বক্তৃতাটি শুনেন। ঐ বক্তৃতার পর

মার্কিন মহিলাদ্বয় স্বদেশ যাত্রা করেন আর ভগ্নী কলিকাতায় আসিয়া ১৬নং বসু পাড়া লেনে বসবাস করিতে থাকেন।

ঐ সময় কলিকাতা মহানগরী প্লেগ মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হয়—লোক যে যেখানে পায় শহর ছাড়িয়া পলাইতে থাকে। ফলে শহর একপ্রকার লোকহীন হইয়া উঠিতে থাকে। উহা দৃষ্টে স্বামীজী "মাভৈঃ মাভৈঃ শীর্ষক এক বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া কলিকাতার ঘরে ঘরে বিতরিত করান, যাহাতে কলিকাতাবাসীকে সম্বোধন করিয়া এই মর্মে লেখা থাকে—আপনারা ভয় পাইয়া শহর ত্যাগ করিবেন না। আমরা অচিরেই আপনদের সেবায় লিপ্ত হইতেছি। কেবলমাত্র আমাদের লোকদিগকে আপনাদের বাটী পরিষ্কার করিবার অধিকার দিবেন, তাহা হইলে কোন ব্যাধির আশংকা থাকিবে না।' ইত্যাদি।

ঐ বিজ্ঞাপন বিতরিত হইবার পর দুই চারিদিনের মধ্যেই ভগ্নী নিবেদিতা সহকারীরূপে স্বামী সদানন্দকে লইয়া একদল ধাংগড় ও মেথর দ্বারা প্লেগ নিবারণ কার্য আরম্ভ করিয়া দেন। কিন্তু আবশ্যক মত উপযুক্ত সংখ্যায় ধাংগড় ও মেথরের অভাব হওয়ায় তাঁহার কার্য উত্তর কলিকাতায়ই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। তথাপি অন্যান্য স্থান হইতে আবেদনকারীদিগের বাটী পরিষ্কার করিতে তিনি কখনও বিরত থাকেন নাই। লেখককেও ঐ কার্যে দুই চারিদিন নিযুক্ত থাকিতে হয়।

যাহা হউক, ভগ্নীর ঐ সেবাকার্য এতদূর সফলকাম হইয়াছিল যে, তৎকালীন সংবাদপত্র-সমূহে ভূরি ভূরি প্রশংসা বাহির হয় এবং কলিকাতা মুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান সাহেব স্বয়ং আসিয়া পরিদর্শন পূর্বক যথোচিত সাহায্য করেন।। আর কলিকাতার স্বনামধন্য সওদাগর বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় বিনামূল্যে সমস্ত ফিনাইল দেন।

১৬নং বসু পাড়া লেন বাটীতে একদিন লেখককে লইয়া স্বামীজী আসেন এবং ভগ্নীর সহিত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানা কথা কহেন। ফলতঃ পক্ষে এই বাটীতে ভগ্নীর বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপনা হয়।

এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে স্বামীজীর সঙ্গে ভগ্নী একবার আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে ১৭নং বসু পাড়া লেনের বাটীতে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

বিদ্যালয়ের একখানি গাড়ী হয়। আর কেবলমাত্র বালিকারা যে উহাতে অধ্যয়ন করিত, তাহা নহে, অধিকন্তু পল্লীস্থ সধবা ও বিধবারা গাড়ীতে আসিয়া দ্বিপ্রহরে শিলাই শিখিতেন। তাঁহাদের শিলাইর জন্য কাপড় ভগ্নীই যুগাইতেন। ভগ্নীর ঐ প্রকারে কাপড় দিবার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রথমতঃ দুঃস্থ স্ত্রীলোকেরা জামা পরিতে পান না—তাঁহাদিগকে উহা দেওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদিগকে শিলাইর কার্য শিক্ষা দেওয়া।

বালিকাদিগকে শিখাইবার নিমিত্ত ভগ্নী জনৈকা অধ্যাপিকা নিযুক্ত করেন। এই অধ্যাপিকা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বিনী এবং কুমারী ছিলেন। ইনিই এই বিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যাপিকা। ইনি ভগ্নীর নিকট চিরকুমারীভাবে জীবন যাপন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন এবং ফলে ভগ্নী ইঁহাকে কন্যা নির্বিশেষে সদা নিজের নিকট রাখিয়া পালন করিতেন। পরে কিন্তু ইনি স্বীয়া প্রতিজ্ঞা ভংগ করিয়া বিবাহ করিয়া বসেন এবং সেই অবধি বিদ্যালয় হইতে ইঁহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়। উত্তরকালে কুমারী সুধীরা বসু অধ্যাপনা কার্য গ্রহণ করেন।

বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ভগ্নী অপর একটি কার্য করেন। স্বামী সদানন্দ এবং ব্রহ্মচারী অমূল্যচরণ (পরে স্বামী শংকরানন্দ)কে জাপান পাঠান। ইঁহাদের যাত্রার কথা শুনিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বীয় পুত্রকে ঐ সংগে পাঠাইবার মানসে ভগ্নীর সহিত দেখা করেন। তাঁহাদের জাপান ভ্রমণের ফলে যতদূর আমাদের মনে পড়ে, কয়েকটি শিলাইর কল বিদ্যালয়ে আসে।

বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে শিখাইবার নিমিত্ত ভগ্নী এক নূতন প্রথা পরিচালন করেন। তখন ঐ পন্থা কলিকাতায় একেবারে নূতন বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তাহার নাম ইংরাজীতে Kindergarten System (কিন্ডারগার্টন অর্থাৎ ক্রীড়াচ্ছলে বা কথাচ্ছলে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া)।

ঐ ১৭নং বাটীর সহিত আরও কয়েকটি ঘটনা বিজড়িত আছে, যেগুলির বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

ভগ্নী একবার স্বামীজী ও তাঁহার কয়েকটি শিষ্য ও শিষ্যার সহিত কাশ্মীর পরিভ্রমণে যান এবং অমরনাথ তীর্থ দর্শন করেন। এই ভ্রমণের বিষয় তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহার নিকট অনেক গল্প শুনিলেও সে সব এখানে দিলাম না। তবে এই কাশ্মীর অভিযানে ভগ্নীর হস্তাক্ষর এবং ইংরাজী লিখিবার ভংগী দেখিবার যে প্রথম সুযোগ আমাদের হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ নিম্নে দিতেছি—

মঠে দৈনন্দিন কার্য বিবরণ লিখিবার জন্য একখানি খাতা ছিল। উহাতে মঠে প্রাতে ও অপরাহ্নে কি কি শাস্ত্র পাঠ হইয়াছে, রাত্রের প্রশ্নোত্তর বৈঠকে কি কি প্রশ্ন করা হইয়াছে এবং সেই সব প্রশ্নের উত্তর বড়রা কি দিয়াছেন, মঠবাসীদের কে কে বাহিরে গেলেন এবং কি উদ্দেশ্যে গেলেন আর কেই বা ফিরিলেন, আগন্তুক কে কে আসিলেন—তাঁহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত প্রতিদিন লেখা হইত আর সপ্তাহান্তে স্বামীজী বাহিরে থাকিলে তাঁহার নিকট ঐ খাতা হইতে নকল করিয়া পাঠান হইত। প্রত্যুত্তরে স্বামীজী আমাদের মংগল ও শিক্ষার নিমিত্ত নিজ মন্তব্য ও উপদেশ লিখিয়া পাঠাইতেন।

বর্তমান কাশ্মীর অভিযানে স্বামীজীর আদেশে তাঁহার পক্ষ হইতে ভগ্নী কয়েকবার ঐ উত্তর লিখেন।

তাঁহার ঐ কতিপয় পত্র পাঠে ইংরাজী লিখিবার ধরণ দৃষ্টে অবাক হইতে হয়। আমাদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকও ছিলেন। বার বার ঐ পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের ইংরাজী শিক্ষা মার্কিন ধরণে হইয়াছে। আসল ইংরাজী ধরণের হয় নাই। ভগ্নীর ইংরাজী খাঁটি ইংরাজী। ইহার ব্যাকরণে ও বাক্য বা পদবিন্যাসে কিঞ্চিৎ পার্থক্য এবং নূতনত্ব আছে। আমাদের ঐরূপ সিদ্ধান্তের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছি উত্তরকালে ঘটিত নিম্নের একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা—

একবার জনৈক ভদ্রলোকের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে লইয়া গিয়া ভগ্নীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিই। ভদ্রলোকটি পূর্বে শ্রীঅরবিন্দের দৈনিকপত্র বন্দেমাতরমের একজন সহকারী সম্পাদক ছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন উক্ত পত্রখানি উঠিয়া যাওয়ায় তিনি একটি মুদ্রালয় খুলিয়াছেন, যাহাতে আমরা কয়েকখানি পুস্তক ছাপাইতেছিলাম। এই সূত্রে তাঁহার সহিত আমাদের আলাপ। যাহা হউক, ভগ্নীর সহিত পরিচিত হওয়া অবধি তিনি সময় অসময় না মানিয়া প্রায়ই ভগ্নীর নিকট আসিতে থাকেন আর ভগ্নী নিজের অমূল্য সময় নষ্ট হওয়ায় বিরক্ত হয়েন।

মনুষ্য মাত্রের প্রায় সকলেরই একটা না একটা প্রিয়, একটা না একটা খেয়াল, একটা না একটা সখ থাকে। ঐ ভদ্রলোকটির ঐ প্রকার একটা সখ ছিল ইংরাজীতে তর্ক করিবার, আর তিনি পারিতেনও তাহা। কিন্তু ভগ্নী উহা পছন্দ করিতেন না। তাই তাঁহার আসা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভগ্নী একদিন অপ্রিয় বাক্য বলেন। ফলে ভদ্রলোকের আসা বন্ধ হয়। সেইদিনই অপরাহ্নে তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভগ্নী সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন, "উনি কি ভয়ংকরী?"

পরদিন প্রাতে নিত্য যে প্রকার কার্যোপলক্ষে ভগ্নীর নিকট যাইতে হয় সেই প্রকার গিয়াছি, ভগ্নী ঐ ভদ্রলোকটির সহিত আমাদের দেখা হইয়াছে কি না এবং তিনি উঁহার বিষয় কিছু বলিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার সেই মন্তব্যটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বলিলাম—"How dreadfull is she!"

আমাদের ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী ভুল আর এই ভুল অকস্মাৎ মুখ হইতে নির্গত হওয়ায় আপনা হইতেই মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িল, আরও অধিক অবনত হইল যখন পরমুহূর্তে আমাদের পার্শ্বে উপবিষ্টা ভগ্নীর এক মার্কিনবাসিনী গুরুভগ্নী মিস ক্রিস্টিনা গ্রীন্সটাইডেল ভ্রম দর্শাইয়া পদটি সংশোধন করিয়া বলিলেন,—"How dreadful She is!"

নিজ ভ্রম মানিয়া লইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ভগ্নী নিবেদিতা অপর ভগ্নীর কথা কাটিয়া বলিলেন—"না, ও (লেখক) ভুল করে নাই বরং ঠিকই বলিয়াছে।" তখন দুই ভগ্নীতে তর্কবিতর্ক হইতে থাকে, যাহার সারাংশ এখানে দিতেছি—

অপর ভগ্নী—"উহার পদবিন্যাস ঠিক হয় নাই—উহা জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যেই হইয়া থাকে। বাক্যটি কিন্তু আশ্চর্যজনক। অতএব উহাতে "is She" না হইয়া "She is" হওয়াই বিধেয়।"

নিবেদিতা—"এক্ষেত্রে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার অপেক্ষা ও যাহা বলিয়াছে, তাহাতে বক্তার বলিবার দৃঢ়তা অধিক প্রকাশ পাইতেছে। ততএব গ্রাহ্য।"

ভগ্নী নিবেদিতারই জয় হইল। ফলে আমাদের এক নূতন শিক্ষা লাভে অধোমুখ উন্নত হইয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। তাই বলিতেছিলাম ভগ্নীর ইংরাজী এক অপূর্ব জিনিস!

মিস্ ক্রিস্টিনা গ্রীন্সটাইডেলের নাম যখন উপরে আসিয়াছে, তখন তাঁহার বিষয় যাহা কিছু জানি, সব বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। ইনি মার্কিন মহিলা এবং স্বামীজীর শিষ্যা ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। ইনি ভগ্নী নিবেদিতা অপেক্ষা বয়সে বড় এবং দীক্ষা লওয়া হিসাবেও প্রাচীন। ইনি স্বামীজীর সেই কতিপয় শিষ্য ও শিষ্যার অন্যতম, যাঁহারা স্বামীজীর সহিত সহস্র দ্বীপ (Thousand Island) নামক দ্বীপপুঞ্জে গিয়া সাধনভজন শিক্ষা করেন। ইনি ভারতের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে ব্রতী হইয়া এখানে আসিয়া ভগ্নী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ভগ্নী নিবেদিতা এমন একটি রঙিণ গাউন পরিধান করিতেন, যাহাকে ঠিক গাউন বলা যায়

না অথবা পাদ্রিনীদিগের আলখাল্লাও বলা যায় না। আর ইনি আমাদের স্ত্রীলোকের ন্যায় শাড়ী পরিতেন। উভয়েরই গলে স্বর্ণসূত্রে গাঁথা একগাছি ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা থাকিত। উভয়েই টুপি পরিতেন না তবে জুতা পরিতেন। নিবেদিতা স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহাতে কতকগুলি পুরুষোচিত গুণ ছিল; যেমন সাহস, গাম্ভীর্য প্রভৃতি। কিন্তু ইঁহাকে দেখিলে দেবী প্রতিমা বলিয়া মনে হয়। ইনি আমাদের স্ত্রীলোকের ন্যায় অনেকটা লজ্জাশীলা, ধীর নম্র। নিবেদিতা বিদুষী-বিদ্যা সদাই তাঁহার প্রতি কার্যে প্রকাশ পায়, আর ইনি এত চাপা যে, ইঁহার ভিতর বিদ্যা আছে কি না শীঘ্র জানিতে পারা যায় না। মঠের সকলে ইঁহাকে ভগ্নী ক্রিস্টিন (Sister Christine) বলিয়া ডাকিতেন; একমাত্র লেখক ইঁহাকে 'মা' (Mother Greenstidel) নামে সম্বোধন করিতেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগ্নীর কয়েকটি বক্তৃতা শুনিবার আমাদের ভাগ্য হইয়াছে। ঐ বক্তৃতা-গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কালীঘাটের বক্তৃতা। উহা মা কালীর নাটমন্দিরে হইয়াছিল। 'কালীপূজা' সম্বন্ধে ঐ বক্তৃতা। পূর্বে কখনও কোন সাহেব বা মেম ঐ পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার অধিকার পাইয়াছেন বলিয়া আমাদের স্মরণ হয় না। ভগ্নীই যেন প্রথম অধিকার পান। ঐ বক্তৃতায় তাঁহার খুব নাম হয়। কালীঘাটের পাণ্ডা গিরীন্দ্র হালদার মহাশয় সকল উদ্যোগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া বিতরণ করেন।

কয়েক মাস যাবৎ প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ভগ্নী মঠে গিয়া আমাদিগকে ধারাবাহিকরূপে দেহতত্ত্ব (Physiology), উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান (Botany) এবং অঙ্কন (Drawing) শিখান। শিক্ষা এত ভাল যে, আমরা প্রায় সকলেই ঐ সব বিষয়ে বেশ একটু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া-ছিলাম। অঙ্কনে খগেন মহারাজ (স্বামী বিমলানন্দ) অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নিজ মূর্খতা নিবন্ধন একবার এমন একটা হাস্যজনক ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছিলাম যে, উহা মনে হইলে আজও আপনাপনি লজ্জিত হই। ঘটনাটি এই—স্বামীজীর দেহত্যাগ হইতে প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে একটি জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল। ঐদিন কেবল সমবেত সহস্র দরিদ্রনারায়ণের সেবাই হইত। এক বৎসর শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ঐ এক দিনের উৎসবকে দুই ভাগ করিয়া দেন অর্থাৎ একটি রবিবারে যেমন দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইতেছিল তাহাই বহাল রহিল, অধিকন্তু পরবর্তী রবিবারে একটি সভা আহূত হইল, যাহাতে বক্তৃতাদির অবতারণা করা হইল। ঐ মর্মে কলি-কাতার রাস্তায় রাস্তায় প্লাকার্ড মারা হয় এবং বক্তৃতার দিন মেসার্স হোর মিলার কোং একখানি জাহাজ কলিকাতাবাসীদিগের যাতায়াতের সুবিধার্থে আহিরীটোলার ঘাট হইতে মঠ পর্যন্ত চলিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল।

ঐ সভার কার্যতালিকা এই প্রকার ছিল—

উদ্বোধন সংগীত—মহাকবি গিরিশচন্দ্র রচিত এবং শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র মিত্র কর্তৃক গীত।

বাঙলায় আবৃত্তি—বিপিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' হইতে।

ইংরাজীতে আবৃত্তি—লেখক কর্তৃক স্বামীজীর 'My Master' (মদীয় আচার্যদেব) হইতে।

বক্তৃতা—স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক স্বামীজীর জীবন সম্বন্ধে।

ঐ সভার বিষয় ততটুকুই বলা হইতেছে, যতটুকু এই পুস্তকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে।

যাহা হউক, যথাসময়ে কলিকাতা হইতে সহস্রাধিক গণ্যমান্য বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় শ্রোতৃরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লেখক ইতিপূর্বে কখনও ইংরাজী আবৃত্তি লইয়া জনসমাজে দণ্ডায়মান হয় নাই। অতএব আবৃত্তিকালে সে সেই শ্রোতৃমণ্ডলী দেখিয়া এতদূর ঘাবড়াইয়া গেল যে, তাহার মনে হইল সে যাহা কিছু বলিতেছে, সবই বিশ্রী এবং ভ্রমপূর্ণ হইতেছে। পরিশেষে ঘন করতালি শ্রবণে তাহার ঐ ভাব অধিকতর দৃঢ় হইল। পরে সে লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কোনও প্রকারে জনতা হইতে বাহির হইয়া পলায়নোদ্যত হইলে পথিমধ্যে ভগ্নী আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া বলিলেন, "Bravo! Welldone, Saucer eyes!*

ভগ্নীর ঐ কথাগুলিতে সে মর্মাহত হইয়া কিছু না বলিয়া পাশ কাটাইয়া হন হন করিয়া মঠ বাটীতে আসিয়া এক নির্জন স্থানে বসিল—আর ভাবিতে থাকিল, আমি ভগ্নীর কি করিয়াছি যে, তিনি আমায় শ্লেষাত্মকভাবে সম্বোধন করিয়া বসিলেন? আমার চক্ষু কি পিরীচের ন্যায়! নাঃ: আর তাঁহার নিকট যাইব না বা তাঁহার সহিত কথা কহিব না।

এই প্রকার স্থির করিয়া সে একাকী আছে, সভা ভঙ্গ হইলে তাহার নিকট সংবাদ আসিল, দেবদারু কুঞ্জে ভগ্নী কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে চা পানে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; আর তাহাকে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। সে গেল না—আহ্বানের কোন উত্তরও দিল না। পর পর কয়েকজন ডাকিতে আসিল—সে পূর্ববৎ বসিয়া রহিল। অবশেষে স্বামী সারদানন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে তোকে ডাকের ওপর ডাক ডাকা হচ্ছে, আর তুই আসছিস না কেন? তোর কি হয়েছে?"

অভিমানী সুরে সে উত্তর করিল, "নিবেদিতা আমার অপমান করেছেন।

ভগ্নী কি বলিয়াছেন, লেখকের নিকট জানিয়া লইয়া সারদানন্দ স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —"ওরে তোরই ভাল হয়েছে। তুই তার কথা আদৌ বুঝতে পারিসনি। তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, শোন।"

ইহা কহিয়া তিনি বুঝাইতে থাকিলেন, "...প্রথমে দেখ, তার আগের দুটো কথায় প্রকাশ পাচ্ছে যে, তোর আবৃত্তি শুনে তার খুব আনন্দ হয়েছে, তাই সে তার মনের ভাব ব্যক্ত করেছে, আর সত্য সত্যই তোর আবৃত্তি খুব ভাল হয়েছে—এটা সে কেন, সকলেরই মত। তারপর বাকি রইল তার শেষ কথাটা। যেটা শুনে তোর খুব অভিমান হয়েছে। এ কথাটা বুঝতে হলে আগে তোকে বুঝতে হবে—প্রত্যেক ভাষায় কতকগুলি প্রচলিত কথা আছে, যাকে আমরা Proverb বা প্রবাদ বলে থাকি। সেগুলো ভাষাভেদে বিভিন্ন হলেও মানে এক; যেমন বাঙলায় 'ডুমুরের ফুল' আর উর্দুতে 'ঈদ কা চাঁদ'। দুটো একেবারে আলাদা, কিন্তু মানে এক। কোথায় 'ডুমুরের ফুল' আর কোথায় 'ঈদ কা চাঁদ'? দুটোই ভাষাভেদে একেবারে আলাদা হয়েও দুষ্প্রাপ্য বা অদৃশ্য হওয়ায় মানে এক দিচ্ছে। বুঝেছিস?"

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

তাহ'লে বল্ দেখি—'পটল চেরা চোখ' বলতে কি বুঝিস?"

"আজ্ঞে সে ত ভাল।"

"বাঙলায় যদি সেটা ভাল, ইংরেজীতে তেমনি Saucer eye (পিরীচের ন্যায় চক্ষু)। তোর চোখ দুটো কতকটা ভাঁটার মত কি না, তাই ঐ কথাটা বলেছে। স্বামীজিকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) যে আমেরিকায় অনেকে Hypnotic eyes (যাদুকরী চক্ষু) বলত, তার কি, এখন বুঝলি—সে তোকে ভালই বলেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ভুল বুঝেছি। তাঁর কাছে মাপ চাইব।"

"এখন চল তবে, তারা সব বসে আছে" কহিয়া স্বামী সারদানন্দ চলিতে থাকিলেন। লেখক তাঁহার অনুসরণ করিল।

দেবদারু কুঞ্জে পেঁছিলে লেখকের বিলম্বের কারণ ভগ্নী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী সারদানন্দ আনুপূর্বিক বিবরণ করিলেন। শুনিয়া ভগ্নী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আর সমবেত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ সকলে সে হাসিতে যোগদান করিলেন। লেখক অপ্রতিভ হইয়া ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "Excuse me, Sister, I quite misunderstood you. (ভগ্নী, আমায় ক্ষমা করুন,—আমি একেবারে আপনাকে ভুল বুঝিয়াছিলাম)। উত্তরে ভগ্নী কহিলেন,—

That's nothing; you are young Swami, Saucer Eyes, naughty boy. অর্থাৎ আমি কিছুই মনে করি নাই, দুষ্ট বালক! তুমি ছোট স্বামী, তুমি পিরীচের ন্যায় চক্ষু-বিশিষ্ট।

উহা কহিয়া তিনি লেখককে লইয়া একে একে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, কবিবর রবীন্দ্রনাথ, গোখলে আদি গণ্যমান্য লোকের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ নিতাই হালদারের সহিত পরিচয় করাইতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"I know him already. He is my brother." (আমি উহাকে পূর্ব হইতেই চিনি। উনি আমার গুরুভ্রাতা)।

এইরূপে নিজ মূর্খতানিবন্ধন সেই হাস্যজনক ঘটনার যবনিকা পতন হইল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, তখন এমন একটা হাওয়া চলিয়াছিল, যাহাতে কি নামজাদা, কি নগণ্য প্রায় সকলেই আমরা ইংরাজ-ঘেঁষা ছিলাম। ইংরাজের সহিত কথা কহিতে পারিলে, ইংরাজের সহিত একটু মিশিতে পারিলে আমরা যেন হাতে স্বর্গ পাইতাম। আমাদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের নাম করিতে গেলে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যাহা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, মাত্র তাহাই বলিব।

ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে একজন প্রৌঢ় ছিলেন, যিনি মাঝে মাঝে ভগ্নীর প্রাতঃকালীন চা-পানের সময় আসিয়া দেখা দিতেন এবং কলকাতায় তাহার অমূল্য সময়ের খানিকটা ব্যয় করাইতেন। পরে ভগ্নীর প্রমুখাৎ জানিতে পারা যায় যে, ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ না থাকিলেও আমরা জানিতাম যে, উনি মঠ ও মিশনের বিদ্বেষী। ভগ্নী কিন্তু ইহা জানিতেন না। আর আমরাও পূর্বে জানিতাম না

---

* সাবাস, ভাল বলিয়াছ—পিরীচের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট!

যে, উনি ভগ্নীর নিকট যাতায়াত করেন। যাহা হউক, কি প্রকারে ভগ্নী ও আমাদের মধ্যে উঁহার বিষয় জানাজানি হয় এবং সে জানাজানির পূর্বে কি হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

আমরা তখন পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং শ্রীহট্ট দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য সমাপন করিয়া সবেমাত্র ফিরিয়াছি এবং সেই কার্য বিবরণ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া কলিকাতার যাবতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছি। এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে কোন কার্যব্যপদেশে ভগ্নীর নিকট গেলে তিনি কথা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট হইতে জানিতে পারেন যে, ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তি সম্পাদিত কাগজে দুর্ভিক্ষ মোচন রিপোর্ট দেওয়া হয় নাই। কেননা, সম্পাদকটি মঠ ও মিশনের বিরোধী। শুনিবামাত্র তিনি লেখককে বসিতে বলিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আসিবার নিমিত্ত একখানি পত্র লিখিলেন এবং ভৃত্যকে পত্র লইয়া যাইতে বলিতেছেন, এমন সময় ভদ্রলোকটি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। ভগ্নী পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেছিলাম; যাহা হউক, তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে।" মেম স্মরণ করিয়াছেন শুনিয়া ভদ্রলোকটি হাতে স্বর্গ পাইলেন। বলিলেন, "কেন? আমায় ডাকতে হবে কেন? আমি নিজেই এসেছি।"

ভগ্নী কহিলেন, "আজ সন্ধ্যার পূর্বে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইব—আগামী কালকের কাগজে যাহাতে সেটা বাহির হয়, আর সেই সংখ্যার ৫০ খানি কাগজ বিলসহ আমার নিকট পাঠাইবে—দাম তখনই দিব।"

ভদ্রলোকটির লক্ষ্য আমাদিগের প্রতি ছিল। সেজন্য বোধ হয় অপেক্ষা না করিয়া বা না বসিয়া 'আচ্ছা তাই হবে' বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ভগ্নী বাধা দিয়া আরও বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তাহা বোধ হয় জান। ঐ প্রবন্ধের সঙ্গে একখানি দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য বিবরণ যাইবে—তাহারও সমালোচনা যেন বাহির হয়।"

ভগ্নীর কথাগুলি বিশেষতঃ শেষ কথাগুলি এমন দৃঢ়ভাবে পুরুষোচিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল যে, ভদ্রলোকটির মনে বোধ হয় উদ্রেক হইল যে, ইনি নারী নহেন—পুরুষের বাবা।

যাহা হউক পরদিন ঐ কাগজে প্রবন্ধ এবং রিপোর্ট উভয়ই স্থান পাইল এবং তদবধি মঠ ও মিশন সম্বন্ধীয় সব কিছু স্থান পাইতে থাকিল।

দুর্ভিক্ষ-মোচন কার্যান্তে লেখক কলিকাতায় ফিরিয়া 'উদ্বোধন' পত্রের কার্যাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করে। তখন 'উদ্বোধন' কার্যালয় বসুপাড়া লেনে ভগ্নীর বাটীর সম্মুখস্থ ভাড়াটিয়া বাটীতে ছিল। এই বাটীতে অবস্থানকালে ঐ লোকটিকে প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভগ্নীর আহ্বানে তাঁহার নিকট চা পান করিতে এবং তাঁহার যাবতীয় বিলাতী পত্র, পার্শ্বেল আদি ডাকে পাঠাইতে ও অন্যান্য আবশ্যক কার্য করিতে হইত। কখন কখন ভগ্নী স্বয়ংও কার্যালয়ে আসিতেন। এজন্য উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল। আর এই ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার সাময়িকভাবে কলিকাতা পরিত্যাগকালে তাঁহার বাটী রক্ষার্থে তথায় কার্যালয় উঠাইয়া লইয়া যাইতে হয়। পরে তাঁহার প্রত্যাগমনে 'উদ্বোধনের' নিজস্ব বাটী সম্পূর্ণরূপে নির্মিত না হইলেও উহাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঐ বাটীর নির্মাণ কার্য সমাধা হইয়া গেলে শ্রীমাকে (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত জননীকে) দেশ হইতে আনাইয়া দ্বিতলে রাখা হয় আর উদ্বোধন কার্যালয় নিম্নতলে থাকে। ঠাকুর ঘরে শ্রীঠাকুরের বেদীর রেশমী আচ্ছাদন বস্ত্র ভগ্নী স্বহস্তে সেলাই করিয়া লইয়া আসিয়া স্বয়ং খাটাইয়া দেন। কেবল ইহাই নহে, শ্রীমার দ্বারা ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে এবং নিয়মিতভাবে পূজা হইতে থাকিলে একদিন ভগ্নী তখনকার কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান পেইন সাহেবকে (Mr. Payne) লইয়া আসিয়া ঐ বাটী দেখান। যাহার ফলে ঐ বাটী সার্বজনিক পূজাস্থল (Public place of worship) বলিয়া মিউনিসি-প্যালিটি কর্তৃক মানিয়া লওয়া হয়, অতএব নিষ্কর হইয়া যায়।

'উদ্বোধন' কার্যালয়ের উপর যেমন 'উদ্বোধনের' মুদ্রণ ও প্রকাশ এবং পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল, তেমনই তাহাকে স্বামীজির ইংরাজী ও বাংলা সমস্ত গ্রন্থগুলি মুদ্রিত করাইতে ও প্রকাশ করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত নূতন বাটীতে আসিয়া ভগ্নীর কয়েকখানি পুস্তক লেখক প্রকাশ করে আর সেই ব্যপদেশে তাঁহার নিকট কয়েকমাস যাবৎ নিত্যই যাইতে হয়।

তখন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং ভগ্নীকে প্রায়ই একত্রে লেখাপড়া করিতে দেখিতাম। এ বিষয়ে শরৎ মহারাজের নিকট শুনিয়াছি, ভগ্নী জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে ভাষা দেন। প্রত্যুতঃ ভগ্নী জগদীশচন্দ্রের সেক্রেটারীর কার্য করিয়া দিতেন।

ভগ্নীর ধমনীতে আইরিশ (Irish) রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় এবং তিনি ভারতের স্বাধীনতা চাহিতেন বলিয়া কিছুদিন পুলিশ তাঁহার উপর কড়া নজর রাখিয়াছিল; এজন্য তাঁহার সহিত মঠ ও মিশন জড়িত হইবার আশংকায় তাঁহাকে সংবাদ-পত্রসমূহে একটা বাহ্যিক ঘোষণা করিতে হইয়াছিল যে, তাঁহার সহিত মঠ ও মিশনের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। ঐরূপ ঘোষণা হইলেও বাস্তবিক পক্ষে কোন সম্পর্কই ছিন্ন হয় নাই বরং পূর্বে যেমনটি ছিলেন পরেও সেই প্রকার থাকেন। কেবল মাঝে দিনকতকের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এই ১৭নং বসুপাড়া লেনের বাটীতে ভগ্নীর একবার সান্নিপাতিক জ্বর (Typhoid) হয়। ক্রমে উহা মারাত্মক আকার ধারণ করে। মঠবাসী সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠেন—সকলেরই মুখ ম্লান—সকলেই কিসে ভগ্নী আরোগ্য হইবেন তাহাই ভাবিয়া অস্থির। আচার্য জগদীশচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত—লেডী বসুও তদ্রূপ! পাড়ার লোকের ত কথাই নাই। তাহাদের নিকট ভগ্নী যে স্বর্গীয়া দেবী বলিয়া পূজিতা! তাই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে উদ্বেগ ও বিষাদের কালিমা ঢালা! ডাঃ নীলরতন সরকার প্রারম্ভ হইতেই বিনা পারিশ্রমিকে প্রাণপাত করিয়া চিকিৎসা করিতে-ছিলেন। তিনি পূর্ব হইতেই বিশেষ সতর্ক হইয়াছিলেন—ভগ্নীর বাটীর সম্মুখস্থ সমগ্র গলিটিতে বিচালি ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে গাড়ীর শব্দ আদৌ না হয় এবং পাড়ার লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে চেঁচামেচি না হয়। স্বয়ং ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্বক রোগিনীর বাটীতে থাকিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার বিষয় একটি কথা না বলিলে যেন তাঁহার উপর অবিচার করা হয়—তাই বলিতেছি। তিনি* সদাই কার্যশীল,—যতক্ষণ থাকিতেন রোগিনীর ঔষধ ও পথ্য, সেবা ও শুশ্রূষা লইয়া সদাই ব্যস্ত—ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র কার্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না—যেখানে ঠিক হইতেছে না সেখানেই তাঁহার হস্তদ্বয় প্রসারিত সাহায্য করিতে। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত—একি অদ্ভুত ডাক্তার! ইঁহার শরীরে ক্লান্তি বা অবসাদ নাই, এমনই সুদৃঢ় ইঁহার শরীর! ইঁহার মনে চিন্তার লেশমাত্র নাই। যখন রোগিনীর অবস্থাদৃষ্টে সকলে বিশেষ উদ্বিগ্ন, তখন ইঁহাকে দেখিতাম মহাস্ফূর্তিতে নিজ কর্তব্য পালনে তৎপর। তখন ইঁহার মুখমণ্ডলে এমন একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিত যাহা দেখিয়া ভয়াম্বিত লোকেদের মনে আশার সঞ্চার হইত—তাঁহারা ভাবিতেন ডাক্তারের মুখ যখন প্রফুল্ল, তখন হয়ত রোগিনী বাঁচিবেন। ঠিক এই শ্রেণীর অপর একজন ডাক্তারের সঙ্গ আমাদের ভাগ্যে লাভ হইয়াছে, যাঁহার শরীর ইঁহাপেক্ষা ক্ষীণ হইলেও ঐসব গুণাবলী বিদ্যমান। এই ডাক্তারটির নাম—সুরেশ-চন্দ্র সর্বাধিকারী। বাঙলার চিকিৎসাকাশে এই দুইটি নক্ষত্র উদিত হইয়াছিল—আজ ইঁহারা কোথায়!

যাহা হউক, রোগিনীর অবস্থা একদিন এমন আকার ধারণ করিল যে, শরৎ মহারাজ পরিণাম ভাবিয়া ভীত হইলেন এবং ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিবার মানসে ভগ্নীর বাটীতে আসিলেন। জগদীশচন্দ্র সে সময় উপস্থিত ছিলেন। শরৎ মহারাজ ডাক্তারকে রোগিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উত্তর পাইলেন—আপনারা অত ভাবিতেছেন কেন? আমি ডাক্তার হিসাবে বলিতেছি, আমাদের শাস্ত্রে বিধান থাকিতে কখনই অসাধ্য বলিতে পারি না। এখনও পর্যন্ত আমি তিলমাত্র বিচলিত হই নাই বরং আশান্বিত। আমার উপর ভার, যাহা ভাল বুঝিতেছি, তাহা করিতেছি এবং করিতেও থাকিব। জানিবেন, সেই প্রকৃত ডাক্তার রোগীর অবস্থা খারাপ দেখিলে যাহার উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

উহা কহিয়া তিনি শরৎ মহারাজকে এবং জগদীশচন্দ্রকে এক স্বতন্ত্র কক্ষে লইয়া গেলেন এবং কি পরামর্শ করিলেন তাহা কক্ষমধ্যে প্রবেশা-ধিকার না থাকায় আমরা জানি না।

পরদিন যথারীতি প্রাতে লেখক গিয়া দেখে, ডাক্তার একাকী বারাণ্ডায় পাদচারণ করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার কহিলেন—তুমি আসিয়াছ, বেশ হইয়াছে। আমি বেশী লোক চাহি না। জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি আমায় সাহায্য করিতে পারিবে? উত্তরে কহিলাম—কি, আজ্ঞা করুন—যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহার বক্ষ হস্ত দ্বারা ঠুকিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, তুমি পারিবে। যাহা বলি, তাহা কর। বাহিরে একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়াছ কি? উত্তর করিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, আসিবার সময় দেখিয়াছি।

তখন পুনরায় বলিতে লাগিলেন, ঐ গাড়ীতে ভগ্নীকে এখনই আনন্দবাবুর* বাটীতে লইয়া যাইতে চাই। এর গলি গুঁজিতে আর ওর থাকা উচিত নহে। সেখানকার বন্দোবস্ত জগদীশবাবু—এতক্ষণে সব করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে ইঁহাকে কি করিয়া লইয়া যাই? এতক্ষণ পায়চারি করিতে

* তখন তিনি আদৌ বৃদ্ধ হয়েন নাই।

* বাঙলার প্রথম র‍্যাঙ্গলার (Wrangler) আনন্দমোহন বসু।

করিতে সে উপায়ও স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। (পার্শ্বস্থিত একখানি আরাম কেদারা দেখাইয়া) এই কেদারায় উঁহাকে শোয়াইয়া কেদারা শুদ্ধ গাড়ীতে লইয়া যাইব। কিন্তু সিঁড়িটা এত সংকীর্ণ যে, ঐ পথে লইয়া যাওয়া যাইবে না। একখানি করাত দিতে পার?

জনৈক প্রতিবেশীর নিকট হইতে একখানি করাত আনিয়া দিলে তিনি তাঁহার সেই সুদৃঢ়হস্তে ক্ষিপ্রগতিতে রোগিনীর কক্ষের একটি জানালার কাষ্ঠ গরাদগুলি কাটিয়া ফেলিয়া বলিলেন—এই পথে উঁহাকে কেদারাশুদ্ধ নামাইতে হইবে, আর এই কাজেই তোমার সাহায্যের দরকার। তৃতীয় ব্যক্তির আবশ্যক নাই।

তিনি বলিলেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে দ্বিতল গবাক্ষের পথে কেদারা শুদ্ধ রোগিনীকে নীচের উঠানে নামাইবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যুগপৎ স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইলাম। পরে তাঁহার কার্যকলাপে অসীম সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া মস্তক আপনা হইতে তাঁহার উদ্দেশ্যে নত হইয়া গেল, হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভরিয়া উঠিল, আর মনে হইতে থাকিল ডাক্তার যদি সকলে এইপ্রকার হয়, তাহা হইলে মানবসমাজের কল্যাণ কতই না সাধিত হয়।

অনতিবিলম্বে যানচালক এক গাছি সুবৃহৎ মোটা ও মজবুত রজ্জু আনিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে বিদায় করিয়া রজ্জুর এক অংশ দ্বারা কেদারার পদচতুষ্টয়ে দুইটি স্বতন্ত্র আংটা এমন ঢিলা করিয়া প্রস্তুত করিলেন, যাহাতে কেদারাখানি ঝুলাইতে পারা যায়। রজ্জুর অপরাংশ তখন পড়িয়া রহিল। এইবার ভগ্নীর নিকট গিয়া তাঁহার মুদিত চক্ষুদ্বয়ের উপর একখানি রুমাল চাপা দেওয়া হইলে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে উভয়ে তাঁহাকে শয্যা হইতে নামাইয়া কেদারায় শোয়াইলাম। ভগ্নীকে স্পর্শ করিলে তিনি একবার বিরক্তিব্যঞ্জক মৃদুস্বরে 'ওঃ' (Oh!) করিয়া উঠেন। ডাক্তারবাবু তদুত্তরে ইংরাজীতে বলিলেন—শয্যার উপর একভাবে শুইয়া থাকিলে শয্যাক্ষত (Bedsore) হইতে পারে। তাই কেদারায় শোয়াইয়া দিতেছি।" অতঃপর ডাক্তার আর কথা কহিলেন না। আমাদের সকলকার্য ইঙ্গিতে হইতে থাকিল।

এইবার রজ্জুর অপরাংশ, যাহা এতক্ষণ পড়িয়াছিল, পূর্বোক্ত দুইটি আংটার সহিত এমন-ভাবে বাঁধা হইল, যাহাতে ঐ শেষাংশ ধরিয়া গবাক্ষ হইতে কেদারা নিম্নে নামান যায়। ঐসব হইয়া গেলে ডাক্তারবাবু নিজ বিশাল বক্ষস্থলের জোরে ধীরে ধীরে গবাক্ষ হইতে কেদারা বাহির করিলেন। লেখক রজ্জুর শেষাংশ টানিয়া ধরিয়া রহিল, যাহাতে কেদারা না পড়িয়া যায়। ক্ষিপ্রগতিতে অথচ নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া উঠানে গিয়া ডাক্তার-বাবু হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলে লেখক ধীরে ধীরে কেদারা নামাইল। তিনি ধরিয়া রহিলেন। লেখক ইত্যবসরে নীচে গিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলে কেদারা উঠানে রাখা হইল এবং রজ্জু অসংলগ্ন হইলে উভয়ে উহা ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিলাম। এইসব কার্য এত ধীরভাবে এবং এত নিঃশব্দে হইল যে, রোগিনী ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিলেন না। কেদারাশুদ্ধ ভগ্নীকে গাড়ীতে তুলিয়া উহার দুই পার্শ্বে দুইজনে বসিলাম। একদিকে ডাক্তার-বাবু এক হস্তে রোগিনীর নাড়ী ধরিয়া এবং অপর হস্তে উত্তেজক ঔষধের (Stimulant) শিশি লইয়া আর অপরদিকে লেখক কেদারা ধরিয়া। গাড়ী যাত্রা করিল। অশ্বদ্বয় এত ধীর পাদক্ষেপে চলিতে থাকিল, যেন বোধ হইল তাহারা পাদচারণ করিতেছে।

তখনকার সে সহানুভূতির করুণ দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন কিনা বলিতে পারি না। তথাপি মর্মন্তুদ দৃশ্যের বর্ণনা করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছি।

প্রাতঃকালে ভগ্নীর বাটীর দ্বারদেশে একখানি বৃহৎকায় রবার টায়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পল্লীবাসীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তাঁহারা ভাবেন, একটা কিছু অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে অতএব পরিণাম দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। ইহার কারণ ভগ্নী যে তাঁহাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই অতি প্রিয় হৃদয়ের সামগ্রী। সকলেই তাঁহাকে কেহ ভগ্নী কেহ বা Sister বলিয়া ডাকেন এবং প্রত্যেক বাটীতে তাঁহার অবাধ যাতায়াত। অতএব তাঁহার জন্য তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি? অধিকতর উদ্বিগ্ন হইবার কারণ তাহারা দেখিয়াছেন কোচম্যানকে দড়ি আনিতে। ফলে যখন গাড়ি বসুপাড়া লেনের মধ্য দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, তখন দেখা গেল গলির দুইধারের বাটী-গুলির দ্বারদেশে, বহির্ভাগের রোয়াকে, গবাক্ষগুলি এবং ছাদ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকায় পরিপূর্ণ—সকলেই বিমর্ষ, কেহ-বা জোড়হস্তে ভগ্নীকে প্রণাম করিতেছেন আর কেহ-বা ঊর্ধে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া শ্রীভগবান সমীপে তাঁহার আরোগ্য কামনা করিতেছেন—একটি গবাক্ষভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত নারীকণ্ঠ স্পষ্টাক্ষরে শুনা গেল—"হে ভগবান, আমাদের মুখ রেখো—সিস্টার যেন সেরে ওঠেন!"

অতঃপর গাড়ি সার্কুলার রোড ধরিয়া আসিয়া আনন্দবাবুর বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারদেশে থামিল। জগদীশচন্দ্র সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কেদারা শুদ্ধ ভগ্নীকে ধরাধরি করিয়া দ্বিতলস্থ একটি প্রশস্ত কক্ষে লইয়া গিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান হইল। ডাক্তারবাবু ঔষধ খাওয়াইলেন। দুইটি বিলাতী শুশ্রূষা-কারিণী (Nurse) অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা তদবধি দিবারাত্র ভগ্নীর সেবা করিতে থাকিলেন। আমাদের থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল পার্শ্ববর্তী কক্ষে। কর্তব্য নির্ধারিত হইল —ভগ্নীর জন্য ঔষধাদি এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল হইতে নিত্য কাঁচা মাংসের কাথ (Raw meat juice) আনয়ন করা আর আগন্তুক জিজ্ঞাসু-দিগকে ভগ্নীর নিত্যনৈমিত্তিক অবস্থা জ্ঞাপন করা। আমাদের আহার অধিকাংশ দিন জগদীশ-চন্দ্রের বাটী হইতেই আসিত। দিবসে লেখক আর রাত্রে গণেন্দ্রনাথ থাকিতে লাগিলেন। কিন্তু দিন কয়েক ঐ প্রকারে থাকায় উদ্বোধনের কার্য জমিয়া যাইতে থাকে। অগত্যা লেখককে বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিতে হয়। তখন গণেন্দ্রনাথ একাই রহিলেন। লেখকের অবস্থানকালে অন্যান্য আগন্তুকের মধ্যে দুই দিন কবিবর রবীন্দ্রনাথ ভগ্নীর তথ্য লইতে আসেন; কিন্তু ডাক্তারবাবুর নিষেধ থাকায় ভগ্নীর কক্ষে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

ডাক্তারবাবুর কঠোর পরিশ্রমে এবং জগদীশ-চন্দ্রের বিশেষ তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘকাল হইলেও ভগ্নী সে যাত্রা সেই কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া সুদূর হিমাচল পরিভ্রমণ এবং অন্যান্য কার্য করিলেন বটে, কিন্তু সে স্বাস্থ্য একেবারে পুনর্লাভ করিতে পারিলেন না। সে বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী না হইলেও কথঞ্চিৎ লিখিতে চেষ্টা করিব।
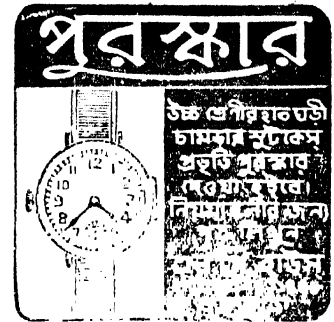
(আগামীবারে সমাপ্য)

অনুবাদক : শ্রীবিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

[৫]

মেয়ের মা কি ধরণের মানুষ—তাঁর স্বভাব-প্রকৃতিই বা কি ধাঁচের, তার কোনো খবরই জানেন না মেরী পাভ্‌লোভনা। সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তই তাঁর মনে তৈরি হয়নি। কেবল এইটুকু বলতে পারেন যে তাঁর আচার-ব্যবহার অভিজাত ঘরের মহিলাদের মতন নয়। প্রথম দৃষ্টি ও আলাপেই মেরী বুঝতে পেরেছিলেন যে ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌নাকে ঠিক 'লেডি' নামে অভিহিত করা যায় না, অন্ততঃ তাঁর রুচি ও চাল-চলনকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে বাধে। এইখানেই মেরীর আপত্তি আর মনঃকষ্ট। মনোদুঃখের প্রধান কারণ হ'ল মেয়ের মা উঁচু থাকের নন। সারাটা জীবন মেরী চাল-চলন আর সহবৎ শিক্ষাকেই উঁচু আসন দিয়ে এসেছেন। শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও সংস্কার, ভদ্রতা বোধ এবং শালীনতাকেই তিনি প্রাপ্যেরও অধিক মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। আজ তাই এতোটা নামতে হবে ভেবে, তিনি মনে কষ্ট পান। দুঃখ বোধ করেন ইউজিনের জন্যে। ইউজিনও খুঁতখুঁতে লোক,—সূক্ষ্ম তার স্নায়ু। নির্ভুল চাল-চলনের এতোটুকু এদিক-ওদিক সহ্য করতে পারে না। এই দিক্ থেকে ভবিষ্যতে তাকে অনেকখানি বিরক্তি ও হাঙ্গামা পোয়াতে হবে। অসমান সামাজিকতার জন্যে তাকে কষ্ট পেতে হবে—দেখাই যাচ্ছে। তবে সুখের বিষয়, লিজাকে মেরীর ভালো লাগে... বেশ পছন্দ।

ইউজিন লিজাকে এতটা পছন্দ করে—সেও একটা কারণ অবিশ্যি। তা ছাড়া, লিজার মতন মেয়েকে ভালো না বেসে উপায় নেই। ওর সঙ্গে মেলা-মেশা করলেই পছন্দ ও তারিফ করতে হয়। আর লিজাকে ভালোবেসে গ্রহণ করবার জন্যে মেরী পাভ্‌লোভ্‌না তো প্রস্তুত হয়েই আছেন। সেটা সত্যিই আন্তরিক সদ্ভাব থেকে।

ইউজিন দেখতে পেলে যে মা তার সুখী এবং তৃপ্ত হয়েছেন। আসন্ন বিবাহের চিন্তায় ও জল্পনায় তিনি রীতিমত ব্যস্ত, মেজাজও তাঁর প্রসন্ন। বাড়ীতে সব কিছু গোছ-গাছ করে, ঘর-সংসার গুছিয়ে দিতেই তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় করছেন। খালি নতুন গৃহিণীর আসার প্রতীক্ষায় আছেন। বৌ এলেই তার হাতে সংসার আর ছেলের ভার সমর্পণ করে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন মেরী। অবিশ্যি এই-ই নিয়ম। কিন্তু ইউজিন তাঁকে অনেক বুঝিয়েছে। আরো কিছুদিনের জন্যে নতুন সংসারে থেকে যাবার অনুরোধ জানিয়েছে। চেষ্টা করেছে মাকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে রাজী করাতে। মেরী এখনও কিছু শেষ কথা বলেন নি। ভবিষ্যতে, অর্থাৎ বিয়ের পরে, সাংসারিক বিলি-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এখনো পাকাপাকি কিছু ঠিক্ হয়নি।

সন্ধ্যে বেলায় চা খাবার পরে, মেরী পাভ্‌লোভনা বসে বসে 'পেশেন্স' খেলছিলেন এক মনে। পাশে বসে ইউজিন তাস গুছোচ্ছিল। এই সময়টাই যা নিরিবিলি। মা ও ছেলে একত্র মুখোমুখি বসে দুদণ্ড আলাপ-আলোচনা করতে পায়, মনের কথা খুলে বলবার সুযোগ পায়।

এক দান খেলা শেষ করে তাসগুলো ভাঁজাতে ভাঁজাতে মেরী পাভ্‌লোভনা ছেলের দিকে একবার তাকালেন। তারপর একটু যেন ইতস্তত করে ইউজিনকে বললেন,—

"জেন্যা, তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলুম। মানে—এমনি সাধারণভাবে বলছি। আমি অবিশ্যি জানি না তুমি আবার কিভাবে নেবে। তবে পরামর্শ হিসেবে খালি বলছি যে বিয়ে হবার আগেই, তোমার অন্য যদি কোনো ব্যাপার থাকে...মানে, বিয়ের আগে সুস্থ জোয়ান ছেলে—এমনি কতো লোকের কতো ব্যাপারই তো ঘটে যায়! তাই বলছি, সেই রকম যদি কিছু হয়ে থাকে তোমার, তাহলে ওসব চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। মানে—পরে যেন এই নিয়ে তোমাকে কিংবা তোমার স্ত্রীকে আফসোস করতে না হয়। ভগবান করুন—ওরকম যেন কিছু না হয়—তোমাদের কাউকেই পস্তাতে না হয়। তবে আগে থাকতে সাবধান হওয়া ভালো, পুরানো জিনিসের জের রাখতে নেই—ঝেড়ে-পুঁছে জঞ্জাল সাফ্ করে দিতে হয়—বুঝলে কি না!"

বলা বাহুল্য, ইউজিন বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিল এবং তক্ষুনি ধরতে পেরেছিল, মা কি বলতে চাইছেন। স্টীপানিডার সঙ্গে, গেল শরৎকালে তার যে ব্যাপার চুকে-বুকে গেছে, মা যে সেই গোপন সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, এটুকু বোঝবার মতন তার বুদ্ধি আছে। বিবাহিতা মহিলারা এসব ব্যাপারে তেমন নজর দেন না। কিন্তু যাঁরা একলা, বিধবা কিংবা আজীবন কুমারী—তঁাদের দৃষ্টিটা স্বভাবতই তীক্ষ্ম হয়ে থাকে। এইসব অবৈধ সম্পর্ক, হাজার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী হলেও, তাঁদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

তাই ইউজিন লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল, মেরী পাভ্‌লোভনা যেই কথাটার উল্লেখ করলেন। তবে লজ্জার চেয়ে অপ্রস্তুত আর বিরক্তির ভাবটাই যেন বেশি। কেন না, যদিও তিনি মা এবং মা হয়ে সন্তানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখের চিন্তায় মাথা ঘামানো খুবই ন্যায্য এবং স্বাভাবিক, তবুও তিনি অকারণে একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে উদ্‌ব্যস্ত হয়ে উঠছেন, এটা ইউজিনের মোটেই ভালো লাগলো না। এমন একটা ব্যাপার, যেটা ইউজিনের একান্ত নিজস্ব এলাকায়। ব্যক্তিগত জীবনের যে নগণ্য একটা অধ্যায় নিজ হাতেই শেষ করে মুড়ে ফেলেছে—তা নিয়ে অযথা চিন্তিত অথবা শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যে জিনিস মা বুঝেও ঠিক্ বুঝবেন না, ছেলের সামনে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ একটু অশোভন। ইউজিনের মন তাই এই আলোচনায় ঈষৎ বিরক্ত এবং সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

তবু, সরল ও সহজ গলায় ইউজিন বললে তার মাকে,

"এমন কিছু আমার জীবনে ঘটেনি, মা, যেটাকে গোপন করার প্রয়োজন হয়। অন্ততঃ এমন কোনো কাজ করেছি বলে মনে পড়ে না যেটা একদিন অস্বস্তির কারণ হতে পারে বলে লুকোচাপা করতে হয় এখন থেকে। বিয়ে করার বিপক্ষে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করিনি নিজে হাতে, এটুকু তোমায় বলতে পারি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা,—তা হলে তো ভালোই, বাবা। আমার আর চিন্তা কিসের! তুমি যেন কিছু ভেবো না, জেন্যা—মানে, আমার ওপর বিরক্ত হয়ো না—তোমার কথায় কথা বলছি বলে—" মেরী পাভ্‌লোভনা সহসা অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা সামলাবার জন্যে কৈফিয়ৎ দিয়ে কথা ঢাকবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু ইউজিন স্পষ্টই বুঝতে পারলে, মার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি। কথাটা চাপা দেওয়া হল মাত্র, নইলে আরো কী যেন বলবার ছিল......

ইউজিন যা ভেবেছিল তাই-ই ঠিক।

:কটু পরেই, ঈষৎ থেমে, মেরী পাভ্‌লোভনা লতে শুরু করেন। বলেন, ইউজিন যখন াড়ীতে ছিল না পেশ্‌নিকভ-রা ডেকে নিয়ে গয়েছিল তাঁকে ধর্ম-মা হবার জন্যে।

ইউজিনের মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে ওঠে। ঠক লজ্জা নয়—বিরক্তিও নয়। একটা জটিল নোভাব। মা তাকে যা বলতে চাইছেন, সেটা য বিশেষ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ, এটা সে বেশ ুঝতে পারছে। অথচ এ সম্বন্ধে তার নিজস্ব তামত ও ধারণা অন্য রকম। তবু, মনের মধ্যে একটা সচেতনতা ঘনিয়ে উঠছে—একটা কিছু জরুরী খবর আসছে—দ্বিধায়, সতর্কতায় আর প্রতীক্ষায় মনের সূক্ষ্ম তারগুলো থেকে থেকে কম্পিত হচ্ছে।

কথার পিঠে কথা আসে। মেরী পাভ্‌লোভনা বলে চলেনঃ

"এ বছরে দেখছি কেবল ছেলের পালা। সব বাড়ীতেই খোকা হচ্ছে শুনতে পাই। ভ্যাসিনদের বাড়ীর নতুন বৌয়ের খোকা হয়েছে......আবার পেশ্‌নিকভদের বৌ, তারও প্রথম ছেলে হয়েছে সেদিন......এবার যে রকম ছেলের দল জন্মাচ্ছে, তাতে মনে হয়, শীগ্‌গিরই বোধ হয় যুদ্ধ বাধবে, না?"

কথাচ্ছলে প্রসংগটা এসে পড়ে। মেরী পাভ্‌লোভনা এমন সহজ সুরে কথাগুলো বলেন যেন কিছুই হয়নি।

অথচ বেশ কিছুই' যে হয়েছে সেটা ইউজিনের মুখ দেখলেই মালুম হয়। ছেলের মুখখানা সংকোচ আর চাপা লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠছে দেখে মেরী পাভ্‌লোভনা মনে মনে কুণ্ঠিত হ'ন। আড়-চোখে দেখেন ইউজিনের অস্বস্তি—তার বিব্রত ভাবখানা। এটা নাড়ছে, ওটা সরাচ্ছে, টেবিলের ওপর অন্যমনস্ক আঙুল দিয়ে টক্‌টক্ আওয়াজ করছে। চোখ থেকে প্যাঁস-নেটা একবার খুলছে, আবার তখুনি চোখে লাগাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একটা সিগ্রেট ধরিয়ে খুব খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচল।

মেরী পাভ্‌লোভনা চুপ করে থাকেন। ইউজিন নিঃস্বব্ধ হয়ে বসে থাকে। ঘরের মধ্যে একটা চাপা অস্বস্তি। কেমন করে এই অস্বস্তিকর নিঃশব্দতা ভংগ করা যায়, ভেবে পায় না ইউজিন। কেউ-ই নিজে থেকে কথা বলতে আর ভরসা পাচ্ছে না। উভয় পক্ষই বুঝতে পারে, তারা পরস্পরের মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

"আসল কথা, কি জানো—সুবিচার। দেখতে হবে,—আর দেখাই উচিত—গ্রামের মধ্যে যেন কোনও অন্যায়-অবিচার না হয়। কারুর হয়ে পক্ষপাতিত্ব করাটা মোটেই সংগত নয়। মানে—তোমার ঠাকুর্দার আমলে যে রকম ব্যবস্থা ছিল, সেই রকম মেনে চলাই উচিত। নইলে, অকল্যাণ..." মেরী অনেকটা স্বগতই বলে চলেন, কথার জের টেনে অপ্রীতিকর অবস্থাটা দূর করতে চান।

"দেখ মা," ইউজিন হঠাৎ বলে উঠল, "তুমি যে কেন এসব বলছ, তা' আমি বুঝতে পেরেছি। তবে একটা কথা তোমায় বলি। তুমি শুধু শুধু চিন্তিত হয়ো না। তুমি এটুকু জেনো যে আমার চোখে ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চিন্ততা অর্থাৎ আমার দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতার মূল্য অনেকখানি। আর সেটাকে নষ্ট হতে আমি কোনো মতেই দেব না। আর তুমি যে কথা ভেবে অকারণে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হচ্ছ—আমার অবিবাহিত জীবনে যদি কোনো অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার ঘটে থাকে বলে'—তার উত্তরে বলতে চাই যে সেসব চুকে-বুকে গেছে। কখনো, কোনো দিনই কারুর সংগে আমার স্থায়ী সম্পর্ক গোছের কিছু গড়ে ওঠেনি। তাই আমার ওপরে কোনো দাবী-দাওয়া কারুর নেই, থাকতে পারে না।"

"বাঁচলুম," মেরী পাভ্‌লোভনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন। "শুনে সত্যিই খুশি হলুম। তোমার মন যে কতখানি উঁচু তা তো আমি জানি......"

ইউজিন চুপ করে রইল। এর পরে আর কোনও কথা কইল না। মা যা যা বললেন আর তার মহত্ত্বের যে প্রশংসা করলেন, সেটা সর্বতোভাবেই তার প্রাপ্য জেনে প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করল মায়ের উচ্ছ্বসিত জবাব।

পরের দিন ইউজিন যাচ্ছিল শহরে গাড়ীতে করে। মনে-মনে ভাবছিল তার বাগদত্তা বধূর কথা। স্টীপ্যানিডার কোনো প্রসংগ-চিন্তাই তার মাথায় তখন উদয় হয়নি। কিন্তু ইউজিনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যেই, যেন ইচ্ছাকৃত একটা অবস্থার সৃষ্টি হ'ল।

গির্জের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে ইউজিনের নজরে পড়ল, অনেক লোকের সমাবেশ হয়েছে। অধিকাংশ লোকই গির্জে থেকে গ্রামের দিকে ফিরছে—কেউ বা হেঁটে, কেউ বা গাড়ীতে ঘরমুখো চলেছে। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল বুড়ো ম্যাত্‌ভি আর সাইমনের সংগে—ওরা বাড়ী ফিরছে। আরো কয়েকজন ছেলে-ছোকরা...অল্পবয়সী মেয়ের দল, হাসা-হাসি আর গল্প করতে করতে চলেছে। ওই দলটির পিছনে পিছনে আসছে দুজন স্ত্রীলোক, ইউজিন দূর থেকে নজর করলে। ওদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া গোছের—আধা-বয়সী ও ভারিক্কি চালের। আরেক জনের বয়েস কাঁচা। বেশ সপ্রতিভ গতি-ভংগী—পরণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক। মাথায় টক্‌টকে লাল রেশমী রুমাল-বাঁধা। চেহারাটা খুব চেনা-চেনা মনে হল ইউজিনের। কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি বলে' ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

ইউজিনের গাড়ী যখন ওদের কাছাকাছি এগিয়ে এল, প্রৌঢ়া মেয়েমানুষটি রাস্তার এক পাশ ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। পুরানো প্রথা মত অনেকখানি মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালো ইউজিনকে। আর অল্পবয়সী স্ত্রীলোকটি—কোলে একটি শিশু নিয়ে যে এতোক্ষণ লঘু অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে আসছিল—সে শুধু একটিবার মাথা নত করল ঈষৎ হেলিয়ে। লাল রুমালটার নীচে থেকে দেখা যাচ্ছে—চক্‌চক্ করে উঠল একজোড়া পরিচিত চোখ, হাসিতে আর কৌতুকের দীপ্ত ছটায় উজ্জ্বল।

হ্যাঁ—ইউজিন যা আন্দাজ করেছিল—তাই। স্টীপ্যানিডাই বটে। কিন্তু ওর সংগে সেই পুরানো ব্যাপারটা তো চুকে-বুকে গেছে। এখন ঝাড়া হাত-পা, সব পরিষ্কার। স্টীপ্যানিডার দিকে তাকিয়ে আর লাভ কী?

'কিন্তু ছেলেটা তো আমারও হতে পারে!' ভাবে ইউজিন। এক লহমার জন্যে চিন্তাটা উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। পর মুহূর্তেই ঝেড়ে ফেলে দেয় ইউজিন। বলে আপন মনেই— 'যতো সব পাগলামি, মনের প্রলাপ! ওর স্বামী তো ছিলই বরাবর, এখনও আছে। দেখা-শুনো কি হত না পরস্পরের?'

এর বেশি আর কিছু ভাবতে চায় না ইউজিন। উৎকণ্ঠিত মনকে আশ্বস্ত করে তর্কে আর বিচারে। ও সম্বন্ধে চিন্তা শুরু হলে তার আর অন্ত থাকে না। জোর করে মুছে ফেলা দরকার। তা ছাড়া, ও ব্যাপারের শেষ-বেশ তো হয়েই গেছে। একটা বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। শরীরের জন্যে, স্বাস্থ্যের খাতিরে ওর প্রয়োজন ঘটেছিল একদিন। টাকা দিয়ে ইউজিন মিটিয়ে ফেলেছে যখন, তখন পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে। ও সম্বন্ধে বলার কিছু নেই আর থাকতেও পারে না। এই ধারণাটা বেশ দৃঢ়ভাবেই ইউজিনের মনের ভেতর গেঁথে গেছে। তাই সে ভাবে, স্টীপ্যানিডাব সংগে তার স্থায়ী সম্বন্ধ কোনও দিন হয়নি, হতে পারত না এবং নেইও। ভবিষ্যতেও তার কোনও সূত্র ধরে টেনে চলার প্রশ্ন আর উঠতে পারে না। দিন কয়েকের জন্যে নিতান্তই শরীর-ধর্ম পালনের জন্যে একটা ক্ষণিকের দেহ-সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছিল। এই পর্যন্ত।

এটা শুধু মনকে চোখ-ঠারা নয়, বিবেককে দাবিয়ে রাখাও নয়। কারণ ইউজিনের বিবেক এবিষয়ে নির্বাক, নিষ্কর্মা। তাই মেরী পাভ্‌লোভনার সংগে কথাবার্তার পর আর রাস্তায় হঠাৎ দেখা হওয়ার পর থেকে ইউজিন স্টীপানিডির সম্বন্ধে কোনও চিন্তাকেই মনে স্থান দিত না। একটা দিকের ' দরজা যেন

চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিলে। এর পরে অবিশ্যি দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ আর হয়নি।

*   *   *

ঈস্টারের পরের সপ্তাহে ইউজিনের বিয়ে হয়ে গেল শহরে। বেশ নির্বিঘ্নেই কাজ শেষ হল।

বিয়ের হাঙ্গামা মিটে যাওয়া মাত্রই ইউজিন নতুন বৌকে নিয়ে রওনা হল গাঁয়ের জমিদারীতে। মহালের কুঠীটা ইতিমধ্যে মেরামৎ করা হয়েছিল। বর-কনে এই বাড়িতে এসে উঠবে বলে তাদের বাসোপযোগী করবার জন্যে কুঠীটাকে যথাসাধ্য সংস্কার করে রাখা হয়েছিল। সবটা করা সম্ভব হয়নি। দুজনের পক্ষে যতটুকু দরকার, সেই মতই সারানো হয়েছিল। মেরী লাভ্‌লোভ্‌না, যা স্বাভাবিক নিয়ম, সেই অনুসারে ছেলে-বৌয়ের কাছ থেকে সরে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকবার। কিন্তু ইউজিন আর লিজা—কেউই তাঁকে ছাড়তে চাইল না। দুজনের মিলিত, সনির্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে মেরী রাজি হলেন। তবে কুঠীরেরই মধ্যে একটা স্বতন্ত্র অংশে তিনি উঠে গেলেন। সেটা আসল বাড়ি থেকে একটু দূরে, তার ব্যবস্থাও পৃথক্। উভয় পক্ষেরই কোনো অসুবিধার কারণ আর রইল না।

এইভাবে শুরু হল ইউজিনের নতুন জীবন ......নতুন জীবনের প্রথম পর্ব।

৭

বিয়ের প্রথম বছরটা কাট্‌ল, কিন্তু কষ্টে। ইউজিনের পক্ষে, নববিবাহিত জীবনের অ-ভূতপূর্ব সুখ-সম্পদ সত্ত্বেও, এক হিসেবে এটা দুর্বৎসরই বলতে হবে বৈ কি!

বিয়ের আগে, বাগ্‌দানের পর থেকে কোর্ট-শিপের সময়টা, ইউজিন চালিয়ে নিয়েছিল একরকম। অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে অপ্রীতিকর, সেগুলো ঠেলে-ঠুলে ধামা-চাপা দিয়ে রেখেছিল কোনো মতে। কিন্তু আর তা চল্‌ল না। হঠাৎ হুড়-মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল ঘাড়ের ওপর। তাল সাম্‌লাবার সময়ই পায় না ইউজিন।

দেনার দায় ঠেকানো অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। পৈতৃক ঋণ কতো দিন আর এড়িয়ে যাওয়া চলে! ঋণ শোধের মেয়াদ বাড়াতে গেলে শোধ আর হয় না, ঋণ থেকেই যায়। মাঝখান থেকে হয় অমূল্য সময়ের অপচয়। এই সাময়িক নিশ্চিন্ততার প্রতারক আরামটুকু ত্যাগ করতেই হবে—দাঁড়াতে হবে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের মুখোমুখি।

তাই বিক্রী করা হয়েছিল জমিদারীর খানিকটা অংশ। লাভবান্ তালুকের বারদিকের একটা অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। তা থেকে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল, কর্জের কিছুটা ভাগ তাই দিয়ে শোধ হয়েছিল। যেগুলোর জরুরী তাগিদ, সেইগুলো। কিন্তু আরো তো ঋণ আছে—অনেক বাকী এখনো! সেগুলোর কি উপায় হবে? ইউজিন ভেবে কূল পায় না।

তালুকটা রীতিমত দামী এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। খাজনা যা আসে, তা ভালোই। কিন্তু খরচ মিটিয়ে আদায়-বাবদ যেটুকু থাকে, তাই দিয়ে সংসারই বা চলে কি করে? আর তালুকটা বাঁচিয়ে রেখে তাকে বাড়ানো, তার উন্নতি সাধন করাই বা সম্ভব হয় কি করে? দাদাকে নিয়মমত বার্ষিক টাকা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। নিজের বিয়েতেও বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। হাতে নগদ টাকা নেই বললেই চলে। অথচ বিষয়-সম্পত্তির আনুষঙ্গিক অর্থব্যয় অনিবার্য। কারখানার পেছনে টাকা না ঢাল্‌লে, কারখানার কাজও অচল। বন্ধ করে দিয়ে চুপ্‌চাপ্ বসে থাকতে হবে। টাকা নেই ঘরে। অথচ নগদের প্রয়োজন এক্ষুনি। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাক্‌লেও এদিকে চলে না। কি করা যায়! মহা সমস্যার ব্যাপার!

একটা উপায় আছে অবিশ্যি। লিজার টাকা। তাই থেকে কিছু নিয়ে কাজে লাগানো চলে এখন। আপাততঃ এ দায় থেকে তা হলে উদ্ধার পাওয়া যায়। স্বামীর সংকট-অবস্থা দেখে লিজা নিজে থেকেই এগিয়ে আসে। প্রস্তাব করে, অনুরোধ জানায় ইউজিনকে। বলে টাকা তো পড়েই আছে, নাও না। নেবে না কেন, এতে আপত্তির কি থাক্‌তে পারে?' পেড়াপীড়ি শুরু করে দেয় লিজা, বলে 'টাকা তোমায় নিতেই হবে।'

শেষকালে ইউজিন রাজি না হয়ে পারে না। সম্মত হয়, নিমরাজি হয় টাকাটা নিতে। তবে একটা সর্ত আছে ইউজিনের। ও টাকা ধার হিসেবে নিতে পাবে সে। নইলে নয়। আর তার পরিবর্তে, বিষয়ের অর্ধেকটা বন্ধকী হিসেবে নিতে হবে লিজাকে। শেষ পর্যন্ত ইউজিন তার নিজের জেদ বজায় রেখে ছাড়ল। তবে, ইউ-জিন যে এতোখানি করল, অর্থাৎ সম্পত্তির অর্ধেক অংশ বন্ধক রাখল লিজার কাছে লেখা-পড়া করে, তার বিশেষ কারণও একটা ছিল। কারণটা স্ত্রী নয়। কেন না, এই লেন-দেনের ব্যাপারে লিজা রীতিমতই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কারণটা আসলে হল শাশুড়ীর মনস্তুষ্টি। স্ত্রীর টাকা নেওয়া তিনি কি চোখে দেখবেন, কে জানে!

এইসব ব্যাপারে প্রথম বছরটা কাটল দারুণ অশান্তির মধ্য দিয়ে। কখনো ভাগ্য মুখ তুলে চেয়েছে, কখনো বা মুখ অন্ধকার করেছে। লাভের সঙ্গে ক্ষতির অংকটাও সামান্য হয়নি। ভালোয়-মন্দয়, লাভে আর ক্ষতিতে, আশায় এবং দুর্ভাবনায়,—আর সব চেয়ে যেটা বিশ্রী, বিষয়-কারবার সবকিছু এক সঙ্গে ফেঁসে যাওয়ার নিত্য বিপদাশংকায়, দাম্পত্য জীবনের প্রাথমিক মিষ্টতাটুকুও তিক্ত এবং বিস্বাদ হয়ে উঠল।

এর ওপর আর এক দুশ্চিন্তা। স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ।

বিয়ের বছরেই, বিয়ের মাস সাতেক বাদে—শরতের এক সন্ধ্যায় এক দুর্ঘটনা ঘট্‌ল লিজার। স্বামী ফিরছেন শহর থেকে। তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার জন্যে লিজা বেরিয়েছিল গাড়ী নিয়ে। কিন্তু আগ্-বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে ঘট্‌ল এক বিপদ্। ঘোড়াটা এতোক্ষণ বেশ শান্তই ছিল, চলছিল ঠিক্ কদম ফেলে। হঠাৎ কি যে হ'ল তার—চঞ্চল হয়ে উঠল আর বজ্জাতি শুরু করে দিল। লিজা তো রীতিমত ঘাব্‌ড়ে গিয়ে গাড়ী থেকে মারল লাফ। লাফিয়ে পড়বার সময়ে গাড়ীর চাকায় যে জড়িয়ে যায় নি কিংবা মাটিতে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে কোনো বড় রকমের আঘাত পায়নি লিজা—এই যা রক্ষে।

কিন্তু বিপদ্ ঐখানেই শেষ হল না। শুরু হল মাত্র। লিজা এ সময়ে ছিল অন্তঃসত্ত্বা। বাড়ী ফিরেই অনুভব করল একটা অস্বাভাবিক বেদনার অস্বস্তি। 'পেন'টা বারে বারে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রক্ষা হল না। গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে গেল। আর এ ধাক্কা সাম্‌লে উঠ্‌তে অনেকদিন লাগ্‌ল লিজার। বহু-প্রতীক্ষিত আসন্নপ্রায় একটি সৌভাগ্যের সূচনা অকালেই বিনষ্ট হ'ল। প্রথম সন্তান সম্বন্ধে কতো আশা-ভরসা ছিল ইউজিনের। সব ভূমিসাৎ। তার ওপর স্ত্রীর শয্যাগ্রহণ। মনস্তাপ আর ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত হল বৈষয়িক গণ্ডগোল। সব যেন ওৎ পেতে বসেছিল, এই সময়টার জন্যেই। এককথায় বলা যায়—ভণ্ডুল। আর সেই ভণ্ডুলের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করলেন শ্বশ্রুমাতা। লিজা বিছানা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মা এসে হাজির হলেন। জামাইয়ের বাড়িতে কায়েম হয়ে বসলেন বেশ কিছুদিনের জন্যে, মেয়ের শুশ্রূষা এবং রোগের তত্ত্বাবধানের অজুহাতে।

এরপর মন আর ভালো থাকে কি করে? বিয়ের প্রথম বছরটা অন্ততঃ মানুষ পায় ও চায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। ইউজিনের বরাতে কি বিশ্রী চেহারা নিয়ে এসেই দাঁড়াল, একেবারে সামনে!

তবু—এ সমস্ত অসুবিধা, হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ একটু একটু করে কাটিয়ে উঠ্‌ল ইউজিন। বছরের শেষ দিক্‌টায় একটু যেন সুরাহা মনে হল। প্রথমতঃ ইউজিনের যেটা বহুদিনের আশা আর আকাঙ্ক্ষা—অর্থাৎ পিতামহের আমলের চাল-চলন নতুন যুগের উপযোগী করে ফিরিয়ে আনা, নষ্ট বিষয়-সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করা—সেটা সাফল্যের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। অবিশ্যি খুবই ধীরে ধীরে, বাধাবিপত্তি কাটিয়ে হুঁসিয়ার হয়ে এগুতে হয়েছিল ইউজিনকে। তবু অবস্থার একটু উন্নতি হ'ল। এখন আর

ঋণ শোধের জন্যে সমস্ত তালুকটাকেই বিক্রী করার প্রশ্ন বা প্রয়োজন হল না। আসল, দামী সম্পত্তিটা স্ত্রীর নামে লেখাপড়া করে দেওয়ার ফলে বে'চে গেল। এবার, যদি বিট্ ফসলটা ভালোমত ঘরে ওঠে, আর দামটাও চড়া থাকে, তাহলে আসছে বছরে এমন সময়ে, তার অভাব কষ্ট কিছুই থাকবে না। অনটন দূর হবে; সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে হবে পুষ্ট ও স্নিগ্ধ। এই গেল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইউজিনের স্ত্রীভাগ্য। স্ত্রীর কাছে যতই সে প্রত্যাশা করে থাকুক না কেন, এখন তার কাছে সে যতটা পাচ্ছে তা কোনোদিনই সে কল্পনা করতে পারেনি। ভাবতে পারেনি ইউজিন, লিজা তাকে এতোখানি পূর্ণ করে দেবে—ভরিয়ে রাখবে। লিজার কাছে যতোখানি প্রত্যাশা ছিল মনে, বাস্তব জীবনে আর ব্যবহারে ইউজিন দেখতে পেল,—এ তার ঢের বেশি। কামনার অধীর আবেগ কিংবা উচ্ছ্বসিত, ব্যাকুল আগ্রহ—এগুলো তেমন হত না লিজার, যদিও ইউজিন চেষ্টা করেছিল তাকে জাগাতে। আর হলেও, তা এতো কম যে ঠিক্ বোঝা যেত না। কিন্তু অন্য একটা জিনিস পেল ইউজিন তার বদলে—যেটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস, অপ্রত্যাশিত—দৈহিক আবেদনের অনেক ঊর্ধ্বে। মানসিক তৃপ্তি। এখন মনে হয় ইউজিনের—জীবন যেন অনেকটা সরল, সহজ হয়ে এসেছে। মনটা তার সন্তোষে ভরে থাকে, অকারণ খু'ত-খু'তুনি আর ঘনিয়ে ওঠে না। বেশ খুসি খুসি ভাবে, স্বচ্ছন্দ দেহ-মন নিয়ে সুস্থ জীবন যাপন আবার সম্ভব হয়। নির্বিরোধ জীবন-প্রীতি আর তৃপ্তির সুনিশ্চিত ছাপ পড়ে তার মুখে। ঠিক্ বুঝতে পারে না ইউজিন—এই পূর্ণতার ভাব কোথা থেকে এল, কেমন করে সম্ভব হল এই অনেক-পাওয়া হৃদয়ের ভরপুর সুখ! কিন্তু হয়েছিল তাই।

এটার সম্ভব হয়েছিল নানা কারণে। লিজার সরল, সহজ বুদ্ধি আর ছলনার লেশ-সম্পর্ক-হীন নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার হল প্রধান কারণ।

ইউজিনের কাছে নিজেকে সে উজার করে ঢেলে দিয়েছিল, নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছিল আপনার স্বতন্ত্র সত্তা। বিয়ের ঠিক্ পরেই লিজার মনে হ'ল—ইউজিন আর্ভেনিভের মতন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সাধু আর মহৎ লোক পৃথিবীতে নেই। এটা শুধু নব-পরিণীতার স্বাভাবিক, প্রাথমিক উচ্ছ্বাস নয়। পুরুষের বক্ষোলগ্ন কুমারী-হৃদয়ের সঞ্চিত ভালোবাসার ব্যাকুল প্রকাশ নয়, সর্বস্ব-সমর্পণের গভীর আত্মতৃপ্তিও নয়। এটা হ'ল বিচার-সিদ্ধ মনোভাব, অন্তরের দৃঢ় ধারণা।

লিজার মনে ধারণা জন্মালো যে, ইউজিন যখন এতো ভালো, এতো উ'চু আর কর্তব্য-পরায়ণ, তখন প্রত্যেকেরই কর্তব্য তাকে মেনে চলা, তার প্রভুত্বকে প্রসন্নচিত্তে স্বীকার করা।

ইউজিনকে খুসি করা, তার মন-জুগিয়ে চলা—এ ছাড়া অন্য কিছু করণীয় নেই কারুর। কিন্তু আর পাঁচজনকে দিয়ে তাই করানো, তাদের বিশ্বাস জাগানো যখন সম্ভব নয়, তখন লিজাকেই একলা সে কাজ করতে হবে। যতদূর তার সামর্থ্য, তাই দিয়ে ইউজিনকে সে সন্তুষ্ট করবে। অক্ষুণ্ন রাখবে স্বামীর অভ্রান্ত কর্তৃত্ব—অধিকার.................। (ক্রমশ)

নাটকীয় কাহিনী

শ্রীঅদ্বৈত মল্ল বর্মন

গ্রন্থকার, সমালোচক এবং জনসাধারণকে লক্ষ্য ক'রে এই প্রবন্ধের অবতারণা। থিয়েটারে নাট্যাভিনয় কি করে শুরু হয়,—রচনার শুরু থেকে প্রথম রজনীর অভিনয় পর্যন্ত তাকে কি কি রকমারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, এই প্রবন্ধে তাই বোঝাব। নাটক আমরা বুঝি এ ব'লে সত্যের অপলাপ আমরা করতে চাই না; সত্যি বলতে কি, থিয়েটার আদতে কেউ বোঝেই না, এমন কি যারা থিয়েটার করে' করে' হাড় পাকিয়েছে, তারাও না। যে-সব পরিচালক চুলদাড়ি পাকিয়েছেন, তাঁরাও না, এমন কি সমালোচকরা নিজেরাও না। আগে থাকতে নাটক-লেখক যদি জানতেন তাঁর লেখা সার্থক হবে, পরিচালক যদি জানতেন 'হাউস' প্রতিদিন 'ফুল' হবে, আর অভিনেতৃগণ যদি জানতেন নাটককে তাঁরা উৎরে দেবেন,—হায় হায়, নাটক মঞ্চস্থ করা যে তা হলে ছুতোর মিস্ত্রীর আর সাবান তৈরীর কাজের মতই সরল হয়ে যেত! তা হবার নয়। থিয়েটার জিনিসটা যুদ্ধবিগ্রহের মত একটা আর্ট-বিশেষ, আবার সাপ-সিঁড়ি খেলার মত জটিল। কি রকম হয়ে এটা আত্মপ্রকাশ করবে, আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। শুধু প্রথম রাত নয় রাতের পর রাত, এ যে হয়ে চলে, সেইটেই আশ্চর্য। শুরু থেকে একে সমাপ্তি অবধি চালিয়ে নেওয়া, সেও এক বিরাট আশ্চর্য। আগে থেকে ছক কেটে নিয়ে সেই ছাঁচে তাকে শেষ করা—থিয়েটারের বেলা এ নিয়ম খাটে না'ক; অসংখ্য অভাবিত বাধা-বিপত্তি ক্রমাগত জয় করে তবেই তার রূপায়ণ। সিনারির একটিমাত্র কাঠি, অভিনেতার একটি-মাত্র স্নায়ু কোন এক মুহূর্তে বিকল হলেই এ তাসের রাজ্য ধ্বসে যেতে পারে। তবে সাধারণত তা হয় না—কিন্তু হওয়ার ষোল আনা সম্ভাবনা নিয়েও মরিয়া হয়ে তাকে প্রতিদিন চালিয়ে নেওয়া হয়।

নাটকীয় 'কলা (art) ও তার রহস্য (misteries) নিয়ে কিছু বলতে চাই না, নাট্যশিল্প (craft) ও তার ঘরোয়া খবরের (secrets) কিছু পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। রঙ্গমঞ্চ আমাদের কেমন হওয়া উচিত, কিভাবে তাকে আদর্শানুরূপ করা যায়, সে সব বিবেচনা করা খুবই ভাল কথা। কিন্তু আদর্শ নিয়ে কথা বলচেন কি অমনি, এর জটিল বাস্তবের দিকটা ধামাচাপা দিতে হবে। কারণ এর যা ঝামেলা! বারোয়ারী নাটক বা গঠনমূলক রঙ্গ-মঞ্চের সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের কিছু বলবার নেই। রঙ্গমঞ্চে সব কিছুই সম্ভব। এ একটা আজব কারখানা। আর সবচেয়ে বড় আশ্চর্য—আদৌ নাটক যে হয়। সাড়ে ছ'টায় যখন পরদা উঠল, ভিতরের খবর জানলে একে স্বাভাবিক বলে ভাবতেই পারবেন না; মনে হবে কোন দৈবের ঘটনা।

নাটকের গোড়াপত্তন

নাটকের গোড়াপত্তন কিন্তু নাট্যশালায় নয় বাইরে—উৎসাহী লেখকের লেখবার টেবিলে। লেখক যখন বুঝবে যে এইবার সম্পূর্ণ হয়েছে,—নাটকের তখনই রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ।

নাটকের গোড়াপত্তন......লেখবার টেবিলে

অবশ্য শীঘ্রই (পাঁচ ছ'মাসের মধ্যেই) দেখা গেল—না ত, এ ত পূর্ণাঙ্গ নয়। ছোট করো, আরো ছোট করো, শেষ অঙ্কটা ছেঁটে ফ্যালো। লেখক নিজে অবাক হয়, আমরাও অবাক হই,—যত দোষ কি ঐ শেষ অঙ্কের? তাকে ছেঁটে কেটে পালটে ফেলতে হবেই—সব ক্ষেত্রে। এর কারণ রহস্যাবৃত। আবার এও কম রহস্যময় নয়—যে সব ক্ষেত্রে নাটক ব্যর্থ হয়, তাও ঐ শেষ অঙ্কেরই জন্য। নাট্য-সমালোচকরাও যত দুর্বলতা, যত পঙ্গুতা খুঁজে বার করে ঐ শেষ অঙ্কে। আমি বুঝি না এসব দেখে-শুনেও নাট্যকারেরা নাটকে কেন একটা শেষ অঙ্ক জুড়তে যায়। নাটকে শেষ অঙ্ক বলে একটা কিছু থাকাই উচিত নয়। আর থাকলেও যে উদ্দেশ্যে ডালকুত্তার ল্যাজ কেটে ফেলা হয়, তেমনিভাবে শেষ অঙ্কও কেটে বেমালুম আলগা করে ফেলা উচিত, যেন সারাটা জিনিসকে সে ধ্বংস করে দিতে না পারে। কিংবা আরও এক পথ ধরা যেতে পারেঃ নাটক শেষ অঙ্ক থেকে শুরু করে প্রথম অঙ্কে গিয়ে শেষ করুক—যখন শেষ অঙ্ক এত খারাপ আর প্রথম অঙ্ক এত ভাল। যাই হোক, শেষ অঙ্কের অভিশাপ থেকে লেখককে নিষ্কৃতি দেবার জন্য এমনি কিছু একটা ঘটানো দরকার।

এইভাবে কেটেকুটে, আবার লিখে আবার কেটে, আবার লিখে, শেষ অঙ্কের পালা শেষ হয়। শেষ অঙ্কের দশা শেষ হ'লে লেখক উপস্থিত হয় প্রতীক্ষার দশায়। এ একপ্রকার নির্বিকল্প সমাধির দশা—লিখতে পারে না, পড়তে পারে না—খেতে পারে না, ঘুমুতে পারে না—তার বইটা মঞ্চে যাবে—কি করে যাবে, কি করে হবে, কেমনটি হবে এসব আশা-নৈরাশ্যের ঢেউ এসে তার বুকের তটে তোলপাড় করে। এইরূপ কোন প্রতীক্ষমান নাট্যকারের কাছে যান তো দেখে অবাক হবেন, সে যেন আরেক জগতে পেঁছে আছে। তার সঙ্গে কথাই বলতে পারবেন না। একেবারে ঝানু নাটকলেখক যাঁরা, এই রকম হৃদয়াবেগ ও অস্থিরতাকে কেবল তাঁরাই কিছুটা চেপে রাখতে পারেন, আর কেউ পারে না ঝানুরাও অনেক সময় পারে না। জিজ্ঞেস করুন, "কি ভাবছেন?" বলবেন, "ভাবছি? ও হাঁ, এই দাঙ্গাহাঙ্গামার বাজার, চাকরটা সেই সকালে বেরিয়েছিল"......ইত্যাদি। দেখাতে চান যে, নাটকের কথা মোটেই ভাবছেন না।

আট ন'জনকে বেছে নিয়ে......নাটক রচনা করেছেন

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

মহড়া শুরু করার আগে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পালা। এইখানে নাট্যকার সত্যিকার বিপত্তির সম্মুখীন হন। তিনি হয়ত নাটকে পাঁচজন পুরুষ ও তিনজন মহিলার জায়গা করে রেখেছেন। এই আটজন হবেন নাটকের প্রধান কুশি-লব। থিয়েটারে যত অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছে, তার মধ্যে থেকে আট-নয়জনকে বেছে নিয়ে, তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়ে নাট্যকার তাঁর নাটক রচনা করেছেন, এই কয়জনা ছাড়া আর কারও কথা, নাটক লেখার সময় তাঁর মনেও ছিল না।

প্রযোজক বিজ্ঞতার সংগে বলতে শুরু করল

পার্ট বণ্টনের প্রাক্কালে প্রযোজককে তিনি এই আটজনের কথা জানালেন, প্রযোজক বললেন, "তথাস্তু।"

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—

ঐ আটজনের মধ্যে—

১. শ্রীমতী 'ক' নায়িকার পার্ট নিতে পারবেন না, কেননা এখন তিনি আরেক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছেন।

২. শ্রীমতী 'খ' বলে পাঠিয়েছেন তাঁর জন্য নাট্যকার যে পার্ট বরাদ্দ করেছেন, সে তাঁর যোগ্য পার্ট হয়নি—

৩. কুমারী 'গ'কে নাট্যকারের খুশীমত পার্ট দেওয়া গেল না, কেননা কুমারী গত সপ্তাহে কোন্ রাজকুমারের কাছে চাকরী নিয়ে চন্দনগড় চলে গেছেন। তাঁর স্থানে কুমারী 'ঘ'কে নিয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই।

৪. শ্রীযুক্ত 'ঙ'কে নায়ক করা চলে না; নায়ক করতে হবে শ্রীযুক্ত 'চ'কে: কারণ, গত বারের 'বাজ পড়ে রে ঘর পোড়ে' নাটকে শ্রীযুক্ত 'চ' নায়কের পার্ট চেয়েছিলেন, তাঁকে বঞ্চিত করে সে পার্ট দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত 'ছ'কে।

৫. তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপে শ্রীযুক্ত 'ঙ'কে ৫ম পার্টটি দেওয়া যেতে পারত, দুঃখের বিষয় নাট্যকারের উপর খাপ্পা হয়ে সে পার্ট ফিরিয়ে দিয়েছে। ৪র্থ পার্টটিই ছিল তাঁর যোগ্য ভূমিকা; সেটি তাঁকে কেন দেওয়া হল না, এই তাঁর উষ্মার কারণ।

৬. শ্রীযুক্ত 'জ'কে যা'ই দেওয়া হবে, সে তা-ই নেবে; কারণ, সম্প্রতি খোদ-মালিকের সংগে ঝগড়ার পর সে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

৭. শ্রীযুক্ত 'ঝ' ৭নং পার্ট নিতে পারবে না, কেননা যে ৫নং পার্ট ফেরৎ এসেছে, তার জন্য উপযুক্ত লোক আর কেউ না থাকায় তাঁকেই সেটি গ্রহণ করতে হবে।

৮. অষ্টম পার্ট (ডাক-পিয়নের ভূমিকাটি) ঠিক লেখকের খুশীমত লোককেই দেওয়া হবে; আর কাউকে নয়।

কাজেই, দেখতে পাচ্ছেন—অনভিজ্ঞ নাট্যকার যা ভেবে ঠিক করেছিলেন, ব্যাপার হয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্যরূপ; শুধু তাই নয়, অভিনেতৃবর্গের পছন্দমত ভূমিকা হয়নি বলে, নাট্যকারকে তাদের বিরক্তিভাজনও হতে হ'ল।

পার্ট দেওয়া-দেয়ি চুকে যাবার পর থিয়েটারের ভেতরে আবার দুরকম অনুযোগ শোনা গেল—একদল বলছে, নাটকে অত ভাল ভাল পার্ট থাকতে কেন, বেছে বেছে আমাদের দিয়েছে খারাপ পার্টগুলো। অন্য দল বলছে, নাটকের পার্টগুলোও হয়েছে যেমন, এ দিয়ে কিস্সু করা যাবে না, ঘাড়ে ঠ্যাং তুলে নাচলেও এর থেকে রসকস কিছু বেরুবে না।
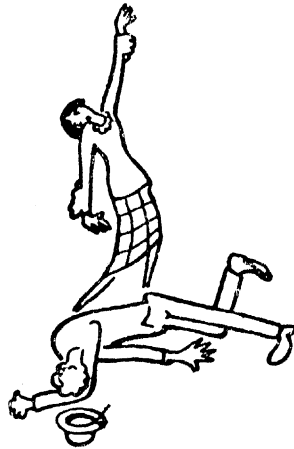
এইখানটায় মেঝেতে গড়িয়ে পড়বে—

প্রযোজনা

নাটক এবার দেওয়া হল প্রযোজকের হাতে। নাটক হাতে নিয়ে প্রযোজক গোড়াতেই বিজ্ঞতার সংগে, যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বলতে শুরু করল: নাটককে দাঁড় করাতে হলে একে সাহায্য করতে হবে, একে নাট্যকার যে ধারণায় খাড়া করেছেন, তার থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে খাড়া করে তুলতে হবে।

শুনে নাট্যকার বললেন, "কি আমার আইডিয়া, তা তো বুঝতেই পারছেন। দুঃখ, বেদনা ও মমতা মিশিয়ে গড়ে তুলেছি নাটকের আখ্যানবস্তু।"

প্রযোজক বললেন, "তা করলে তো মশাই চলবে না। একে পুরোপুরি একটা প্রহসন-রূপে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করাতে হবে যে।"

নাট্যকার বোঝাতে চেষ্টা করে, "দেখুন, নায়িকা উমাতারা হচ্ছে এক ভীরু গ্রাম্য বালিকা, তার বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না"—

"মোটেই না, মোটেই না। সে হচ্ছে খৃষ্টানী ঘেঁষা শহুরে মেয়ে। নাটকের ৪৭এর পাতায় এইখানটাতে দেখুন, দীনেশচন্দ্র তাকে বলছে, আমায় আর কষ্ট দিও না উমা; দীনেশ এখানটায় মেঝেয় গড়িয়ে পড়বে, আর উমাতারা হিস্টিরিয়ার ফিটের মত তার উপর 'স্প্রিং' করে দাঁড়াবে, বোঝেছেন? এই রকম করেছেন ত?"

"আজ্ঞে না। আমি এই রকম ভাবিও নি।"

"ভাবেন নি, অথচ এই দৃশ্যটি হবে সবচেয়ে জোরালো। এইরকম না করলে প্রথম অঙ্কের ভাল সমাপ্তি তো আর-কোনোরকমে হতেই পারে না।"

"দেখুন, এই দৃশ্যটা হচ্ছে সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বৈঠকখানা।" নাট্যকার আবার বললেন।

"তা হোক। কিন্তু সিঁড়ি থাকবে বেশ উঁচু। এক সারি বড় বড় সিঁড়ি।"

"সিঁড়ি? সিঁড়িতে কি হবে?"

"উমাতারা তার উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলবে 'কক্খনো না দীনেশ, কক্খনো না!' এই কথাটাকে জোরালো করার জন্য চাই সিঁড়ি, বুঝেছেন? সিঁড়ি হবে অন্তত দশ ফুট উঁচু, তৃতীয় অঙ্কে কালীচরণ এর উপর থেকে লাফ দেবে।"

"লাফ দেবে? লাফ কেন দেবে?"

"এইখানটায় আপনি লেখেন নি যে 'যেন ছিটকে এসে সে ঘরে ঢুকলো? বেড়ে লিখেছেন। ঐ, লাফ দিয়ে ছিটকে গিয়ে ঘরে ঢোকবে। এখানে ঢোকাটা যা 'স্ট্রাইকিং' হবে মশাই। আপনি তো জানেন, নাটকে কি চাই—কেবল প্রাণ চাই, প্রাণ। এমনি করেই নাটক প্রাণবান হয়ে ওঠে।"

নাট্যকলার গভীরে তলিয়ে যেতে যদি পারেন তো দেখবেন, মঞ্চের সংগে সংযোগ রাখবার বাসনা যাঁর নেই, তিনি হচ্ছেন
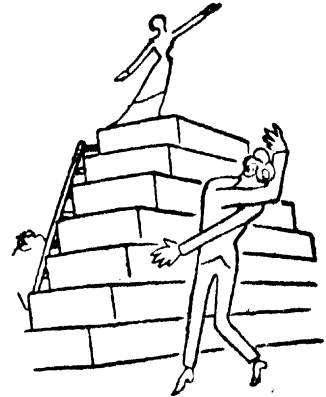
"কক্ষণো না—কক্ষণো না!"

সৃষ্টিশীল নাট্যকার, আর মূল গ্রন্থের সঙ্গে সংযোগ রাখবার বাসনা যাঁর নেই, তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টিশীল প্রযোজক। আর সৃষ্টিশীল অভিনেতা,—এ বেচারার মাত্র দুটি পথ বেছে নেবার আছে, হয় তাকে নিজের মনের মত অভিনয় করতে হয় (এরূপ ক্ষেত্রে নাটক ভুল পথে প্রযোজিত হচ্ছে বলে প্রযোজনাকে দায়ী করা হয়) নতুবা তাকে প্রযোজকের ধারণামাফিক চলতে হয় (এরূপ ক্ষেত্রে অভিনেতাকে দায়ী করা হয় যে, নাটক সে বুঝতেই পারে নি।

গ্রহ-নক্ষত্রের কোন এক অপূর্ব যোগাযোগের ফলে দেখা গেল অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে সংলাপ কারো মুখে ঠেকল না, খটখটে নড়বড়ে সিনসিনারিগুলো ধ্বসে পড়ল না, লাইটগুলোও 'ফিউজ' হল না, আর কোন বাধা-বিপত্তি এসেও পথ রোধ করল না। তখন সব কিছু প্রশংসা পায় প্রযোজক। সমালোচকরা তারই পিঠ চাপড়ে বলে 'বেড়ে মাল হয়েছে দাদা'! তবে এরূপ হওয়া কেবল দৈবের ঘটনা।

এবার শুরু করি, কেমন?

এই প্রথম রজনীর অভিনয়ে উপস্থিত হতে গেলে মহড়ার অনেক খুন-খারাবির মধ্য দিয়ে আমাদের এগুতে হবে।

প্রথম পাঠ

আপনি যদি নাট্যকার হন, কিংবা হতে চান, মহড়ার প্রথম দিন উপস্থিত না থাকতে আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি। সে বড় বিরক্তিকর ব্যাপার। সাত-আটজন অভিনেতা যাঁরা উপস্থিত হন, তাঁরা বেজায় ক্লান্ত; কেউ-বা বসে, কেউ-বা দাঁড়িয়ে, কারো আসে কাসি কারো বা হাঁচি, নিরতিশয় বিরক্তিতে তারা ভেঙে পড়ে। প্রযোজক এক সময়ে হাঁকে, "এবার শুরু করি, কেমন ?"

তাঁরা অনিচ্ছায় আসন গ্রহণ করেন।

"'উমার বর', চার অঙ্কের প্রহসন নাটিকা। এক গরীব মধ্যবিত্তের বৈঠকখানা। ডানদিকে দরজা, বাঁদিকে শোবার ঘর। দীনেশ এসে ঢুকল। কোথায় দীনেশ—দীনেশ।"

কে একজন বলল, "সে তো 'আতসবাজি' নাটকে স্টেজ রিহার্সেল দিতে গেছে!"

"তার পার্ট তাহলে আমারই বলতে হচ্ছে। দীনেশ ঢুকল, বলল, 'উমাতারা, কি যেন আমার হয়েছে।' উমাতারা ?"

কেউ সাড়া দিল না।

"কোথায় উমাতারা? গেছে কোন্ চুলোয়?"

কে একজন বলল, "সে যে বিক্রমপুরের এক জমিদার বাড়িতে নাচতে গেছল আজও ত' ফেরে নি।"

"তবে তারও পার্ট আমাকেই বলতে হচ্ছে।" সে উমাতারা আর দীনেশচন্দ্রের সংলাপ আবৃত্তি করে চলল। কেউ তার কথা শুনছে না। যে যার আলাপে মশগুল।

প্রযোজক—"এবার কালোশশী ঢুকবে। কুমারী অঞ্জুবালা, অ কুমারী অঞ্জুবালা, তুমি কালোশশী হয়েছ কিন্তু।"

"জানি গো মশাই জানি।"

"তবে পার্ট পড়। প্রথম অঙ্ক। কালীচরণ ঢুকল—"

"পার্ট আমি বাড়িতে ফেলে এসেছি।"

প্রযোজক এবার কালীচরণ-কালোশশীর পার্ট নিজেই পড়ে চলল। কেউ শুনছে না, একজন ছাড়া। সে নাট্যকার নিজে।

প্রযোজক—"এবার দুঃখহরণ সরকারের ইংরাজি-জানা গিন্নির পার্ট। কই, ইংরাজি জানা গিন্নি—ঘোমটা খুলে মুচকি হেসে বলবে, "আমার হাসবেণ্ড বাড়ি নেই—"

গিন্নি কপি হাতে নিয়ে তার পার্ট বলছে, "আমার সার্ভেণ্ট বাড়ি নেই।"

"হাসবেণ্ড।" প্রযোজক শুধরে দেয়।

"উঁহু, আমার কাগজে সার্ভেণ্ট লিখে দিয়েছে। এই দেখুন না।"

"ওটা নকল করার সময় ভুল হয়ে গিয়েছে।"

"ভুল হয়ে যায় কেন? খালি আমাদের ভুলই ভুল, ওদের বেলা সাত খুন মাপ।"

দেখে শুনে নাট্যকার একেবারে দমে গেল। মনে হল, তার মত অত খারাপ নাটক পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ লেখেনি।

প্রথম মহড়া

এবার পরবর্তী স্তর শুরু হয়। স্থান রিহার্সেল কক্ষ। প্রযোজক ও কুশিলবেরা।

প্রযোজক—"এই যে দেয়ালে ছবি ঝুলছে, ধরে নাও ও একটা দরজা। আর ওই ফাঁকা জায়গাতে আরেকটা দরজা। সামনে গোল টেবিল আর একটা হারমোনিয়াম। এদিকের দরজা দিয়ে উমাতারা ঢুকে হারমোনিয়ামে হাত দেবে, ওদিকের দরজা দিয়ে ঢুকবে দীনেশ। কই দীনেশ, আই মিন্ আলেখ্য বিশ্বাস?"

একসঙ্গে দুজনের কণ্ঠ শোনা গেল, "তিনি 'ভবতারিণীর খাট' চিত্রের মহড়া দিতে চন্দ্রাবলী স্টুডিওতে গেছেন।"

"আচ্ছা, তার পার্ট আমিই বলছি।" প্রযোজক কাল্পনিক দরজার দিকে এগিয়ে গেল : "উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা, এখন উমা, আই মিন লীনা বাগচি, আপনি তিন পা এগিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াবেন, আর বেশ অবাক হয়ে গেছেন এই ভাব দেখাবেন। উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা। এখন দীনেশ জানলার কাছে এগিয়ে যাবে। এই চেয়ারটাতে বসবেন না যেন, জানেন না, ও হচ্ছে জানলা। আচ্ছা, আবার। আপনি ঢুকবেন বাঁ দিক থেকে দীনেশ ঢুকবে বিপরীত দিক থেকে। 'উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা।'"

"বাবা, বাবা, সে চলে গেল, সে চলে গেল বাবা।"

প্রযোজক, "ও কি পড়ছেন?"

"প্রথম অঙ্কের দুয়ের পাতা।"
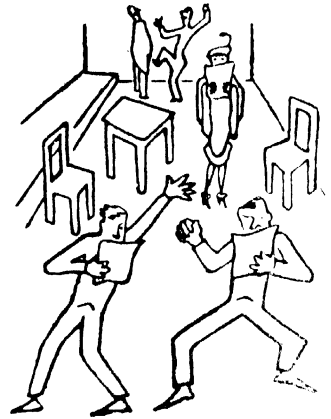
স্টেজ-রিহার্সেলের আগে

"প্রথম অঙ্কের দুয়ের পাতায় ও রকম কিছু লেখা নেই।" বলে প্রযোজক লীনার হাত থেকে পার্ট ছিনিয়ে নেয়, "কই দেখি। হায়রে হায়, এ তো এ বইয়ের পার্ট নয়, অন্য কোন বইয়ের।"

"ও হাঁ, ওরা—মানে ওরা কাল পাঠিয়েছিল। বদল হয়ে গেছে।"

"স্টেজ ম্যানেজারের বই দেখে আজকের মতো তো চালান। এই দেখুন, আমি ডান দিক থেকে ঘরে ঢুকছি।"

"উমা, আমার কি যেন হয়েছে উমা"—লীনা পড়তে শুরু করে।

"ও ত আপনার পার্ট নয়। উমা আপনি, আমি নই।"

এইভাবে এগিয়ে চলল। এল কালীচরণের পার্ট।

কালীচরণ ঘড়ি দেখে বলল, "মাই গড্। ান্তা স্টুডিওর গাড়ি বোধ হয় এসে গেছে। কি করব, আধ ঘণ্টা ধরে তো দাঁড়িয়েছিলাম। আচ্ছা চললুম, নমস্কার।"

নাট্যকার ভাবে, সব কিছু দোষ তার নিজের। দীনেশ অনুপস্থিত, কালীচরণ চলে গেল। সংলাপের কোনো মহড়াই হল না।

ঝি বলছে, "কালীচরণবাবু এসেছে।" আর উমা বলছে, 'তাকে ভেতরে নিয়ে এস," এইটারই সাতবার পুনরুক্তি করে প্রযোজক সবাইকে ছুটি দিল।

নাট্যকার বেদনাদগ্ধ মন নিয়ে ঘরে ফিরে এল। মনে মনে বলতে লাগল, এভাবে চললে সাত বছরেও মহড়ার কিছুই হবে না।

আরো মহড়া

রিহার্সেল-কক্ষ। এখানে দেয়ালে-টাঙানো ছবি হয় দরজা, ভাঙা টেবিল হয় হারমোনিয়াম, শোলার টুপি হয় তুলসী-মঞ্চ। মহড়া হয় বইয়ের শেষ দিক থেকে, এগিয়ে আসে গোড়ার দিকে। ছোট ছোট দৃশ্য বিশবার মহড়া দেয়, বড় বড় দৃশ্যে হাতও পড়ে না। অর্ধেক পাত্রপাত্রী সর্দিগরমীর দরুণ অনুপস্থিত, অনেকে পর্দায় মহড়া দিতে যায় বলে এদিকে আসতেই চায় না। তা সত্ত্বেও কাজ এগিয়ে চলে, নাট্যকার বুঝতে পারে, বিশৃঙ্খলার নীহারিকা পিণ্ড সত্যি সত্যি একটা আকার নিয়ে দানা বাঁধছে।

তিন-চার দিনের মধ্যে আরেক ব্যক্তির শুভাগমন হয়। তিনি প্রম্পটার। এখন থেকে কুশিলবরা পার্ট আর পড়ে না, অ্যাক্ট করে। অ্যাক্টে, পাকা পোক্তরূপে অঙ্গসঞ্চালনাদি দেখে নাট্যকারের আনন্দ ধরে না। সে ভাবে, প্রথম অভিনয় আজ রাতেই তো হতে পারে। অভিনেতারা বলে, আগে স্টেজে রিহার্সেল দিয়ে নিই, তবে তো প্রথম রজনী! অবশেষে অর্ধসমাপ্ত নাটক মঞ্চে দেখা দেয়। পর্দার ওপারে তারা তখনো মহড়া চালাতে থাকে। প্রম্পটার টেবিলে বসে বলে যায়। কিন্তু হচ্ছে না মোটেই।

তিন-চার মহড়ায় বাকি দোষ-ত্রুটি সারিয়ে নিয়ে প্রযোজক আদেশ দেয় প্রম্পটারকে প্রম্পটিং বক্স-এ গিয়ে বসতে। এই সময় ঝানু অভিনেতাদের মুখও আমসি হয়ে যায়। তার কারণ, সেই আদি ও অকৃত্রিম 'কিছুই হচ্ছে না।' এই সময় তারা কি বলছে, প্রযোজকের খেয়াল সেদিকে থাকে না, তারা কি করছে, খেয়াল থাকে সেদিকে।

ড্রেস-রিহার্সেল

ড্রেস-রিহার্সেল বড় মজার জিনিস। সবকিছুই তৈরি হচ্ছে, অথচ কোনটাই সম্পূর্ণ হচ্ছে না। নায়কের কোটে এখনো বোতাম লাগানো হয়নি, নায়িকার জন্য মোস্ট আপ-টু-ডেট্ ব্লাউজখানা দরজির এখনো মনের মতন হয়নি; সিনসিনারিতে রং লেগেছে, শুকোয় নি। কত কিছু দরকার—কোথায় সব? না, পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এল, অথচ পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থার মধ্যেই ড্রেস-রিহার্সেল শুরু।

কি যে ঘটবে, দেখবার জন্য নাট্যকার স্টলে চুপ করে বসল। অনেকক্ষণ ধরে কিছুই ঘটল না। মঞ্চ খালি পড়ে আছে। অভিনেতৃগণ আসছে, হাই তুলছে, আর ড্রেসিং-রুমে অন্তর্হিত হচ্ছে। কেউ কেউ বলছে, "পার্টে এখনো চোখ বুলতে পারিনি।" তারপর আসছে সিনারি, আর গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে মিস্ত্রিরা। নাট্যকার অধৈর্য—বড় ঢিমে তেতালায় চলছে, পারতুম যদি নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে হাত মেলাতুম, তবু একটু এগুত। পান-চিবানো পায়জামা-পরা একটি ছেলে একখানা ক্যাম্বিসের দেয়াল টেনে আনল। আনা হল আরেকখানা। চমৎকার। তৃতীয় দেয়ালখানা এখনো পেণ্টিং-রুমে; কাজেই আপাতত ওদিকে একখানা

প্রযোজক চটেমটে ভেতরে ঢোকে

কাপড় টানিয়ে দাও, কাজ ত চলুক, প্রযোজক বলে দেয়।

"হাঁ, কাজ চলুক।" নাট্যকারের গলা।

প্রযোজক, "ওহে প্রম্পটার, স্টেজ ম্যানেজার প্লিজ।"

স্টেজ ম্যানেজার, "রেডি।"

পরদা পড়ল। ঘরময় আঁধার। নাট্যকারের বুক লাফাচ্ছে—এতক্ষণে, এতক্ষণে তার নাটক সে দেখতে পাবে।

স্টেজ ম্যানেজার প্রথম বেল বাজালেন।

যা ছিল শুধু কথার সমষ্টি, এতক্ষণে তা শরীরী রূপ নেবে।

দ্বিতীয় বেলও বাজল; কিন্তু পরদা তো কই উঠছে না। তার বদলে পরদা ভেদ করে ইথারে ভেসে আসছে ভিতরে দুই কণ্ঠের কোন্দল-ধ্বনি।

"আবার ওরা তর্ক বাধিয়েছে," বলে প্রযোজক চটেমটে ভেতরে ঢোকে।

এবার ভেসে আসছে তিন কণ্ঠের তুমুল ঝগড়ার কলরব।

অবশেষে আবার বেল বাজল এবং ঝাঁকুনি খেয়ে পরদাটাও উঠল।

সম্পূর্ণ নূতন একজন মঞ্চে এসে দেখা দেয়, বলে, "উমা, আমার কি যেন হয়েছে, উমা!"

একজন মহিলা ওদিক থেকে এগিয়ে আসে, "কি হয়েছে দীনেশ?"

"থামো!" এই জানলায় চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে না, চাঁদের আলো কই?"

মঞ্চের তলা থেকে কে বলে ওঠে, "চাঁদের আলো ত দিয়েছি!"

"একে তুমি চাঁদের আলো বলছ! আরো আলো চাই; বেশি করে ঘুরিয়ে দাও।"

রঙ্গমঞ্চের অন্তরাল একদম ঝামেলায়-ভরতি। প্রযোজকের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আরো অনেকে যার যার স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। যেমন সিন্-আর্টিস্ট, স্টেজ ম্যানেজার, বড়ো মিস্ত্রি, বিদ্যুৎ বিভাগের বড়ো মিস্ত্রি, কারুকৃৎ, প্রপার্টিম্যান, প্রম্পটার, মাস্টার টেলর, মাস্টার ড্রেসার, ফার্নিচারম্যান, স্টেজ ফোরম্যান ও আরো অনেক যান্ত্রিক বিশারদ ব্যক্তি। সজ্জনদের এই সম্মেলনে কেবল ধারালো অস্ত্র ব্যবহার ছাড়া সব কিছুই ব্যবহার হয়, যেমন চীৎকার, ফোটে পড়া, দাঁত কিড়মিড় করা, চাপা গলায় গালি দেওয়া, গলা ছেড়ে গালি দেওয়া, এক মুহূর্তে চাকুরী খাওয়া, আত্মসম্মানে ঘা খেয়ে টগবগ করে ফোটা, পরিচালকের কাছে নালিশ করা, কথায় রঙ লাগিয়ে শ্লেষ করা এবং হিংসা ও ক্রোধোদ্রেককারী আরো অনেক কিছু করা। এতে আমি বলতে চাই না যে, থিয়েটারের আবহাওয়া নিতান্ত বুনো কিংবা ভয়ঙ্কর। সে সব কিছু নয়। এর আবহাওয়া একটু খিটখিটে আর খ্যাপাটে ধরণের, এই যা। বড় বড় থিয়েটারগুলো নানা বিরুদ্ধমনা লোক আর বিপরীতধর্মী কাজের সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। পরচুলা পরাবার লোক থেকে শুরু ক'রে, যার প্রযত্নে নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হয় সেই প্রযোজক পর্যন্ত সকলের মধ্যে এক দুরতিক্রমনীয় বিরুদ্ধ মতের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রপার্টিম্যান আর ডেকরেটারের মধ্যে রুচির এক চিরন্তন সংঘর্ষ বিদ্যমান। টেবিলে কাপড় বিছানো ডেকরেটারের কাজ, আবার ঐ টেবিলেই প্লেট কাপ রাখার কাজ পড়ে প্রপার্টিম্যানের কাজের আওতায়। আবার ঐ টেবিলেই যদি ল্যাম্প রাখতে হয় তো সে কাজ বিদ্যুৎ মিস্ত্রির দায়িত্বাধীন। [আগামী বারে সমাপ্য]
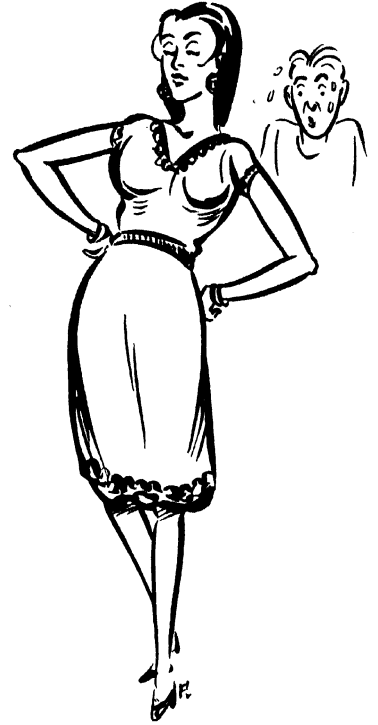
মশাই, বিপদে পড়েছেন ত ছেলেকে নিয়ে। তা বিপদ হবারই কথা। যা দিনকাল পড়েছে, আমাদেরই মাথা ঘুলিয়ে উঠবার উপক্রম হয়েছে, যুবকদের কথা বাদই দিলাম। —চিংড়ী মাছ দর করছিলাম, পাশ থেকে হঠাৎ মিহি কণ্ঠে ধ্বনিত হয় "আমায় এক সের দাও ত?" চমকে দেখি ভ্যানিটী ব্যাগ। ছেয়ে ফেলেছে মশাই, চারিদিকে ছেয়ে ফেলেছে। সিনেমা, রেস্টুরেন্ট, ট্রাম, বাস সর্বত্র এ'রা একা ও দোকা ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিপদ দেখুন এর ওপর বাতাসে পর্যন্ত উড়ু উড়ু ভাব কিলবিল করছে। সবার চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার আপনার ছেলে কম্পার্ট-মেণ্টালে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। পথে ঘাটে এই রকম দুর্ঘটনা দেখতে দেখতে যদি আপনার পুত্রের দৃষ্টি মাঝে মাঝে উদাস হয়ে পড়ে তার জন্যে তাকে আর কি করে দোষ দিই বলুন। যাক্ আপনাকে অভয় দিচ্ছি আপনার সব দুশ্চিন্তা দূর করে দেবো। সোজা চলে আসবেন আমার কাছে, তিলমাত্র দেরী করবেন না। না হলে কোনদিন দেখবেন ভ্যানিটী ব্যাগ সমেত ছেলে "জয় হিন্দ" বলতে বলতে জোড়ে হাজির হয়েছেন। তখন আর তাদের ফেরাতে পারবেন না। ফেরাতে গেলে পাড়ার বেকার ছেলেরা "জয় হিন্দ" বলতে বলতে আপনাকেই তেড়ে আসবে। বৃটিশ সিংহই স্রেফ এই চিৎকারে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে সমুদ্রপারে চম্পট দিল, আপনি নিজেকে যত বেশী রাশভারী ভাবুন না কেন, আপনিও এর দ্বারা নির্ঘাৎ কাবু হয়ে পড়বেন। তাই বলছিলাম মশাই, সময় থাকতে চলে আসুন আমার কাছে।

তিন ডোজ, বুঝলেন, স্রেফ তিন ডোজে আপনার ছেলের সব রোগ সারিয়ে দেবো। কিছুই বুঝলেন না ত'? তিন ডোজ মানে তিনটী আধুনিকা। আহা, নার্ভাস হবেন না। গল্পটা শুনলে আপনিই এদের ঠিকানার জন্য —মানে ভুল বুঝবেন না আমায়, ছেলের মঙ্গলের জন্যই—চঞ্চল হয়ে পড়বেন। আমি কে এ সম্বন্ধেও বোধহয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে। আমি হচ্ছি এ গল্পের নায়ক নিধিরামের মামা।

১৫ই আগস্টকে সকাল বেলায় চা দিয়ে Celebrate করছি এমন সময় গুণধর ভাগ্নে শ্রীমান্ নিধুরাম পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে হাজির। আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে আমার দিকে একটা চিঠি এগিয়ে দিল। দেখি দিদি লিখেছেন "রোজগারে গার্জেন ছেলে বিধবা মাকে আর মানতে চায় না।" কুমারি খেঁদীকে দিদি পাত্রী হিসাবে মনোনীত করেছেন। কিন্তু তার অপূর্ব সৌন্দর্য ও কর্মনৈপুণ্য নিধুর সংস্কৃতি-মার্কা মনকে টলাতে পারে নি। খেঁদীর হয়ে ওকালতি করতে উদ্যত হই—নিধু নাসা কুঞ্চিত করে বাধা দেয়। "খেঁদী, আরে ছোঃ। এখনই ঐ নাম-মাহাত্ম্যে নিজের নাম ভোলবার উপক্রম হয়েছে, ওকে বিয়ে করে কি পুরোপুরি জ্ঞান হারাতে বল।" বলে কি মশাই, তাজ্জব হয়ে যাই। কালকের ছোড়া, তোদের এত ফড়ফড়ানি কিসের! মা বাবা পছন্দ ক'রে যাকে ঘাড়ে তুলে দেবেন, সানন্দে তাকেই ত সারা-জীবন ঘাড়ে ক'রে বইবি। যদিও আমার বেলা মনে হয়, বিয়ের আগে আরও দু চার বছর ঘাড়ের কসরৎ করা দরকার ছিল।

যাক্ যা বলছিলাম। তিথিনক্ষত্র দেখে সেদিন ভাগ্নেকে এক নম্বর ডোজ দিলাম—অর্থাৎ মিস অজন্তা সোমের সঙ্গে ভাগ্নের পরিচয় করিয়ে দিলাম। মিস-এর বিশেষত্ব—তিনি সভুল ইংরাজী অনর্গল বলে যান, ক্ষিপ্ত হলে ফিরিঙ্গী ইংরাজীতে অশ্রান্ত গালাগালি করেন। আর বয়স তার আনুমানিক ২৪ হলেও তিনি সর্বদা গাউন পরিধান করেন। মিস অজন্তার গৃহপ্রবেশের সময়ে মামা ভাগ্নেতে দেখলাম "Pretty Swine" বলে মিস তার দ্বাদশবর্ষীয় ভৃত্যকে আদর করছেন। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় দেখি ভাগ্নের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে,

শ্রীমতীর হাতে ভাগ্নেকে স'পে দিয়ে চলে এলাম। পরে শুনলাম শ্রীমতী ভাগ্নেকে

তিনি সর্বদা গাউন পরিধান করেন

সাইকেলের কেরিয়ারে বসিয়ে সারা লেকটা সাতবার চক্কর দিয়েছে। দু নম্বর ডোজ মিস পাপিয়া রায়কে চেনেন? প্রখ্যাতা নৃত্যনিপুণা। কাগজে যার নামে বিজ্ঞাপন দেয় উর্বশী নৃত্যের পূর্বে ৫৫৫-র ধূম্রযান যার চরণকে নৃত্যচঞ্চল করে তোলে? ইনি সেই প্রথিতযশা। এ'র দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রাণ খোলা বৈঠকি-হাস্য। বাবরি চুল। কাব্যিক যুগে বৈঠকি-হাস্য আজ দুর্লভও বটে তবে এর একটা নমুনা আপনি এখানে এলে পেতে

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রাণ খোলা বৈঠকি-হাস্য

যে পরিমাণ মিষ্টি চায়ে দেয়, গানে সেই পরিমাণ মিষ্টতা কমিয়ে দেয়—

পারেন। হায়না-হাসাও একে বলতে পারেন। কারণ এ হাসি শোনবার পর আপনার মনে জাগবে শ্বাপদসংকুল আফ্রিকা-জঙ্গল-বাসিন্দা হায়নার কথা।

এই হাসি আর ধোঁয়া খেয়ে শ্রীমান্ যখন ফিরলেন মনে হল বেচারির মাথা ঘুরছে, পা টলছে। আড়চোখে ওর দিকে চেয়ে একটা ট্যাক্সি করে ফিরলাম।

দেখলাম ভাগ্নের জ্ঞানচক্ষু খুলব খুলব করছে। যেটুকু বাকি ছিল সেটা অমিতা বসুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে সম্পূর্ণ করে দিলাম। ধনীকন্যা, পেণ্টচর্চ্চিতা অমিতা ভাগ্নের চোখে রঙ লাগাতে সক্ষম হয়। দেখি শ্রীমান্ গদগদ হয়ে পড়েছেন। বার দুয়েক চুপি চুপি দেখতে থাকে। অর্বাচীনদের লজ্জাও নেই। আরে আমি মামা রয়েছি বসে খেয়ালই নেই। অবস্থা একেবারে জরজর। বুঝুন মশাই আস্পর্দ্ধা। দেরী করলাম না, দিলাম তিন নম্বর ঠুকে, মানে অমিতাকে বললাম "মা একটা গান শোনাও ত?" অমিতার বিশেষত্ব সে যে পরিমাণ মিষ্টি চায়ে দেয়, গানে সেই পরিমাণ মিষ্টতা কমিয়ে দেয়। শ্রোতা মাত্রেরই তার কণ্ঠকে 'সুর বদলে 'শ্রী' কণ্ঠ ব'লে অভিহিত করার তীব্র বাসনা জাগ্রত হয়। এর ওপর অমিতার স্বর চাঁচাছোলা—। রাস্তার এক মোড় থেকে আর এক মোড় অবধি ঘোটককুলকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। গাড়োয়ানকে রীতিমত বেগ পেতে হয় তাদের সংযত করতে।

গীতিরতা অমিতাকে দেখেছেন কোন দিন! আচ্ছা কল্পনা করুন আপনার তীব্র কলিক পেন হচ্ছে, সারা মুখ বেদনায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে। ভেবে নিন আপনার সেই মুখ। এবার দেখুন গায়িকা অমিতাকে। দু চোখ বোজা, স্ফীত নাসা, একপার্শ্বে ঘাড় ফেরানো অমিতা হিন্দী ভজন ধরেছে। ওর মুখে আপনারই কলিক বেদনা মিষ্টি মুখের ছাপ ফুটে উঠেছে। বেজায় হাসি পায় নিধিরামের। এর সঙ্গে যখন নিধু অমিতার গানের সঙ্গে তার পার্শ্বোপবিষ্ট রমেনকে ভাবাবেশে টেবিল বাজিয়ে তাল দিতে দেখে তখন সে আর হাসি চাপতে পারে না। সম-এর ঝোঁকে তার মুখ থেকে খুক খুক খিক খিক করে হাসি বেরিয়ে পড়ে। রমেনের বিরক্ত দৃষ্টির দিকে চেয়ে হতভাগা ঠিক বুদ্ধি করে বলে ওঠে "বড্ড কাশি হয়েছে। আমি না হয় বাইরে যাচ্ছি।"

এর পরবর্তী ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। প্রণাম করে নিধু বলে " মামা, তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাচ্ছি না। নির্ভেজাল খেঁদীকেই আমি গ্রহণ করব।" বাঁদরটার শিক্ষা হল তা হলে—মনে মনে হাসি। আপনিও মানে আপনার ছেলেও যদি অনুরূপ বিপদে পড়ে থাকে, চলে আসবেন সোজা আমার কাছে। আর মুহূর্তও দেরী করবেন না। 'ভদ্র' মশায়ের কাছে আমার ঠিকানা নিয়ে হাতের কাছে ট্রাম্ বা ট্যাক্সি যা পান তাতেই উঠে পড়ুন। আর যদি কিছুই না পান ত আমার বাড়ীর দিকে এখনই পা চালিয়ে দিন মশাই, পা চালিয়ে দিন।

এই তো জীবন

শ্রীসুধা চক্রবর্তী

জীবনে বিতৃষ্ণা জাগে,
ধরণী বিস্বাদ লাগে;
জগতের বিসর্পিল পথ—
ছুটে চলে জীবনের রথ।
সে ছোটায় নেই কোনো বেগ,
নেই গতি, নেই তো আবেগ।
জীবনের মাদকতা নেই,—
ঘূর্ণিপাকে হারিয়েছে খেই।
শূন্য চারিদিক,—
নিঃসীম প্রান্তর মাঝে আমি যেন নিঃসঙ্গ পথিক।

নৈরাশ্যের মূক অন্ধকারে
আমার জীবন-পথ অবলুপ্ত হয় বারে বারে।
এরই মাঝে এতটুকু সান্ত্বনার সুর
জাগায় বিফল প্রাণে স্মৃতিটি মধুরঃ
ফেলে-আসা জীবনের রিক্ততায় আজিকে সম্বল—
কবে কা'র দেখেছিনু আঁখিযুগ পুলক বিহ্বল,—
বলেছিল দুটি কথা—আজি তার মধুর উচ্ছ্বাস
ক্ষণে ক্ষণে আনে মনে স্বপনমাখা স্মৃতিটি উদাস।
স্তিমিত জীবন মোর এইটুকু পাথেয় সম্বল,
যৌবনের বৃন্ত হতে খসে-পড়া রক্তশতদল॥

রসিকমোহন

এই মনস্বী পুরুষের তিরোধানে, বাঙলার প্রাচীন যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা যাঁহারা আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মর্ত্যসম্বন্ধ হইতে আমরা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে বঞ্চিত হইলাম বলা চলে। পণ্ডিত রসিকমোহন বহুশ্রুত ব্যক্তি ছিলেন। বহু শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং মনীষা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিত। শুধু ভারতীয় শাস্ত্র এবং দর্শনেই নয়, বিভিন্ন শাস্ত্রে ও পাশ্চাত্য দর্শনেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং মনীষা যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনে তিনি সমস্ত ভারতে সর্বজনবিদিত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব সাধনায় সমুজ্জ্বল জীবনের মহিমায় তিনি গুরু-গৌরবে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙলা দেশে যাঁহারা বৈষ্ণব সাধনা ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন, পণ্ডিত রসিকমোহন তাঁহাদের অন্যতম। স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের তিনি সহকর্মী ছিলেন। তাঁহার এই সাধনা বাঙলার সর্বজনীন সংস্কৃতির সঙ্গে মৌলিকভাবে সঙ্গতি লাভ করিয়াছিল; এজন্য বাঙলা দেশের উন্নতিমূলক সব আন্দোলনের সঙ্গে পণ্ডিত রসিকমোহনের সাধনা বিজড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পর্যায়ের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তিনি সর্ব-প্রথম সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুত এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং আধুনিকতার সমুদার সামঞ্জস্য আমরা তাঁহার জীবনে বিকশিত দেখিতে পাই। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পণ্ডিত রসিকমোহনের অবদান সামান্য নহে। তিনি বৈষ্ণব দর্শন এবং সংস্কৃতিমূলক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। তিনি তাঁহার অনাড়ম্বর সুদীর্ঘ জীবন একান্ত-ভাবে জ্ঞান-সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন এবং জ্ঞান বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তাঁহাকে অতন্দ্রিত এবং অনলসভাবে এই ব্রত প্রতিপালন করিতে দেখিয়াছি। তিনি যে আয়ুষ্কাল লাভ করিয়া-ছিলেন, বাঙালীর পক্ষে সচরাচর তাহা ঘটে না। এই সুদীর্ঘ জীবন সাধনার প্রভাবে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সার্থক জীবনের সমন্বিত মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিতেছি।

গত ৯ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যা ৭॥টার সময় বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যা-ভূষণ তাঁহার ২৫নং বাগবাজার স্ট্রীটস্থ বাসভবনে সাধনোচিতধামে মহাপ্রয়াণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১০৯ বৎসর হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বর্তমানে তিনিই কলিকাতায় প্রাচীনতম নাগরিক ছিলেন। গত ৩।৪ দিন যাবৎ তিনি সামান্য জ্বর ও হৃদরোগে অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু এত শীঘ্র যে তাঁহার দেহাবসান ঘটিবে তাহার কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই। মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা পর্যন্ত তিনি অন্যান্য দিনের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে বসিয়া বেদান্তদর্শন অধ্যাপনা করিতেছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন যে, বুকে শ্লেষা আটকাই-বার জন্য তাঁহার কথা বলিতে কিছু অসুবিধা হইতেছে মাত্র, নতুবা বিশেষ কিছুই নহে। অথচ তিনি সকলকেই বলিতেছিলেন যে, তিনি ঐ দিবসই দেহত্যাগ করিবেন। সন্ধ্যার পর তিনি ভাগবত শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের কোন স্থান হইতে পড়া হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে কোন স্থান হইতে পড়িতে বলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি বলেন যে, তিনি কীর্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন। এবং দুইটি বালককে নাচিতে দেখিতেছেন। ইহার কিছুকাল পরে ভগবানের নাম করিতে করিতে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

তিনি একাধারে বৈষ্ণব সাধক, দার্শনিক, সাংবাদিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঙলা ১২৪৫ সালে বীরভূমের একচক্রা গ্রামে রসিকমোহন জন্মগ্রহণ করেন। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত নাগরপাড়া গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর দৌহিত্রবংশজাত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বৈষ্ণবাচার্য গৌর-মোহন চক্রবর্তী এবং মাতার নাম হরসুন্দরী দেবী। নিজের মেধাগুণে এবং পরিশ্রমে গৃহেই তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। তিনি কোন স্কুল বা কলেজে শিক্ষালাভ করেন নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি ঢাকায় যান। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। তথায় তিনি নানারূপে সমাজ সেবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। তথা হইতে ২০ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং ক্যাজুয়েল ছাত্র হিসাবে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। চিকিৎসক হিসাবে তিনি যশ অর্জন করেন। কিন্তু তখনও তাঁহার জ্ঞানের পিপাসা মেটে নাই, যখনই অবসর পাইতেন, তখনই বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নে রত হইতেন।

রসিকমোহন তাঁহার সময়ের সকল প্রকার সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্ম সম্পর্কিত আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ক্রমে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, শিশিরকুমার ঘোষ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়। তিনি মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের অনুরোধে কিছুকাল "আনন্দবাজার বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি 'শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া' 'পারিজাত', 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক' 'প্রেমপুষ্প' প্রমুখ কয়েক-খানি মাসিক ও সাময়িক পত্রিকাও সম্পাদন করেন। ১৯৪৪ সালে ১০৫ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে রসিকমোহনের ভক্ত ও গুণগ্রাহিবৃন্দ তাঁহার জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যা জামাতাদ্বয় এবং বহু নাতি-নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন।

ভক্তবৃন্দের শেষ দর্শনের জন্য আত্মাবিমুখে দেহ পরদিন বেলা ১০টা পর্যন্ত রক্ষিত হয়। বেলা ১০টার পর কীর্তন দল সহ শব-শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং বাগবাজার স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, বিডন স্ট্রীট হইয়া নিমতলা শ্মশানে উপনীত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃতদেহ যে স্থানে সৎকার করা হইয়াছিল, তাহার দক্ষিণে বহু ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শবের সৎকার করা হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ২৫, বাগবাজার স্ট্রীটে অথবা নিমতলা শ্মশানে শেষ দর্শনলাভের জন্য উপস্থিত ছিলেনঃ—রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর দাস, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায় চৌধুরী, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ জীবন-কৃষ্ণ মিত্র, কুমার মুরারিচরণ লাহা।

চোরাবাজার

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

দেশ যে কতদূরে নৈতিক অধঃপতনে নেমে গেছে, "চোরাবাজার" শব্দটার যথাতথা যখন তখন নিঃসংকোচ সহজ ব্যবহারেই তার প্রমাণ। এ পাপও বলা হবে ব্রিটিশ রাজত্বের আমদানী। কিন্তু এর দ্বারা আত্মকর্তব্যের দায় কিছু কমে না। এর উচ্ছেদ যত বিলম্বিত হবে, ততই দোষ চাপবে দেশবাসীদেরই ঘাড়ে। ধরে নেওয়া হবে, এই পাপের বীজ এদেশের স্বভাবেই রয়েছে নিহিত, ব্রিটিশ শাসন উপলক্ষ্য মাত্র।

আগে চলত এই চোরাবাজারের কাজ ঘুষে। ভদ্রভাবের নাম ছিল তার উপরি বা পান-খাবার পয়সা কামাই। কিন্তু বেশিদিন আর ভদ্রসমাজে সেটা বুক ফুলিয়ে চলতে পারেনি—আনাচে-কানাচেই গা-ঢাকা দিয়ে তাকে চলতে হচ্ছিল পিচ্ছিল অন্ধকার এঁদো পথে। এখন আবার উপদংশ রোগের ঘায়ের মতো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের মতো, দিবালোকেই তার রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে মহামহিমান্বিত দোর্দণ্ড প্রতাপে। সমগ্র জাতি এখন এর খপ্পরে।

এর কাছে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই; আর্থিক স্বার্থের কাছে বৃহৎ দলগত স্বার্থ বিশ্বাসঘাতকতায় বিসর্জন দিতেও লোকের ভ্রূক্ষেপ নেই। মানুষ হয়েছে বাঘের মতো। রক্তের স্বাদ পেলে যেমন বাঘ মানুষের পিছন ধরেই থাকে, তেমনি যারা চোরাবাজারে গিয়ে একবার কাঁচা টাকা হাতাতে পেয়েছে, এ পথে তারাই ঝুঁকেছে আরও বেশি করে। ধনীরাই চোরাবাজারের সব কিছু—তারাই আগলে রেখেছে এর সব ঘাঁটি। সাধারণ শ্রেণীর লোককে এতে ভিড়িয়ে নিয়ে আসে তারা, চালান যুগিয়ে এ কাজে তাদের দীক্ষাগুরুও তারাই।

পরিশ্রম করে খেটেখুটে শস্য এবং শিল্প-সম্পদ তৈরি করে চাষী ও কারিগররা। কেনে তাই সর্বসাধারণ তাদের প্রয়োজন-মতো। ব্যাপারটা দুপক্ষের। কিন্তু মাঝখানে বাজার তৈরি করে দেবার নামে তৃতীয়পক্ষ একদল লোক বরাবরই লাভের কড়ি গুণে গুণে টেঁকে পুরছে দু'পক্ষেরই পকেট মেরে। সৃষ্টি যারা করে না, আর প্রয়োজনে যাদের জিনিস ব্যবহারেও আসে না, তারা সৃষ্টির দুঃখ ও অভাবের বেদনা বা অসুবিধা কিছু কমই বোঝে। যে টাকাটা ফাঁকতালে মেরে নেয়, সেটা যথেচ্ছ উড়াতেও তাদের মায়া থাকবার কথা নয়। এজন্যই কথায় বলে, কাঁচা পয়সার মা-বাপ নেই, ও আসেও যে পথে যায়ও সে পথেই। এই কাঁচা পয়সার মালিক হচ্ছে মজুতদার, দালাল, ফড়েজাতীয় লোকেরা। এরাই জিনিসের দাম বাড়িয়ে দাও মারবার তালে ফেরে অষ্টপ্রহর। এদের বাদ দিয়ে বা এদের কাজ-কারবার নিয়ন্ত্রিত করে চাষী-কারিগর প্রভৃতি উৎপাদক শ্রেণীর সঙ্গে সোজা কারবারের পথ দেখতে হবে এখন দ্রব্য-ব্যবহারক ক্রেতা সাধারণের। এই অর্থের বাজারেও তাই ব্যবসা প্রণালীর পরিবর্তন দরকার, পুরোণো পথে ঘুণ ধরেছে, পচন লেগেছে।

জমিদার মহাজন এরাও সবাই মাঝখানকার ঐ তৃতীয়পক্ষেরই অন্তর্গত। এককালে এদের নৈতিক দায়িত্ববোধ কিছু ছিল। এরা সম্ভবমতো কর, সুদ বা মুনাফা নিয়ে কিছু কিছু দান-খয়রাতও করত, তবে সেটাও তাদের অনেক-স্থলেই ছিল খুশির ব্যাপার। অনেকস্থলে আবার দেওয়াটাকে দেখতো তারা ধর্মকৃত্য বলে। এই পুণ্য নিয়েই আবার পাল্লাপাল্লি চলত। এখন পুণ্য চুলোয় যাক, দশের জন্য দেওয়াটাই গেছে বাজে খরচের খাতে পড়ে। কেবল থলি-ভর্তিতেই এখন সবার ঝোঁক। দেওয়া-থোওয়া না থাকলে পাওয়ার পথটাও আসে শুকিয়ে। কানে জল দিয়েই যেমন জল বের করতে হয়, অর্থের ক্ষেত্রেও কাজ চালাবার সেই একই নিয়ম। বড়দের দেখে দেখে সাধারণ প্রজা এবং খাতকশ্রেণীও শেষে একদিন হাত-উপুড় করা বন্ধ করেছে। দেশ ছাড়া হয়ে বাবুরা হয়েছেন শহরবাসী। সেখানে কেবল সুদ বা খাজনার টাকাটির জোগান ছাড়া প্রজাখাতকের সঙ্গে সুখের-দুঃখের ব্যাপারে কোনখানে নেই কর্তাদের কোন যোগ। লাটের খাজনা, সে আইনের ঠেলায় পড়ে। শিক্ষা-কর, পথ-কর—এর কোনটাই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে জমিদাররা ঘাড়ে পেতে নেয়নি, সবই এর প্রায় প্রজারা দেয়। খাওয়া-পরার বাস্তব প্রয়োজনের বেলা বা কাছাকাছি থাকার মানসিক মমতায়, কোনদিক দিয়েই সাধারণ লোক পায়নি ঐ তৃতীয় পক্ষ ব্যবসাদারদের। আর এমনিতেও এই সাধারণ লোকের পুঁজিপত্র যা ছিল, বৈদেশিক রাষ্ট্রের শাসনে ও শোষণে অবিচারে অব্যবস্থায় পিঁপড়ের-খাওয়া বাতাসার মতো ঠেকেছে গিয়ে দিনে দিনে তা কণামাত্র। কোষে মধু নেই তো মৌমাছি জোগাবে তা কোথা থেকে। দুর্দিনে এই কর্তাবাবুদের উদাসীন দেখে বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘায়ে ঘায়ে বিচার ঢুকেছে ক্রমে সাধারণের মনেও। তারা সমাজের বাবু শ্রেণীর পরগাছার স্বভাবটা বুঝে নিয়ে, ভক্তিশ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা, এখন তাদের বরবাদেই তারা বদ্ধপরিকর। দেশে বামপন্থীয় চাষী-মজুর-শ্রমিক-কেরাণী আন্দোলনের সৃষ্টির মূলে রয়েছে এই কর্তৃপক্ষীয় কারসাজির ক্রমিক সচেতনতার মধ্যে।

কংগ্রেস সাধারণের হয়ে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-মজুররাজ প্রতিষ্ঠারই সংকল্প নিয়েছে। যারা করে-কর্মে ফলিয়ে তুলবে, দ্রব্যের কর্তৃত্ব সোজা তাদেরই এবং তাদেরই হাতে যাতে তার বার আনা মূল্য সোজাসুজি চলে আসে, কংগ্রেসের দৃষ্টি সেইখানে।

দালাল বনাম তৃতীয়পক্ষের কাজ যদি আদৌ কেউ করে, সে করবে দেশের সর্ব-সাধারণের স্বার্থরক্ষক সর্বসাধারণীয় রাষ্ট্র। দ্রব্য-মূল্যের যে অংশটুকু তার হাতে সে কেটে রাখবে, তা দেশবাসী সকলের মতানুসারেই এবং তা রাখবে সকলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-বাণিজ্য, পূর্ত, দেশরক্ষা ইত্যাদি বিভাগের কাজে লাগাবার জন্যই। সে অর্থ যক্ষপুরী বনাম ধনীঘরের ব্যাংকজমার কোঠায় বসে অথর্ব হয়ে থাকবে না, বা ফট্‌কাবাজির হাতবদলের খেলায় সে অর্থ অহর্নিশ ছুটাছুটির উপরেও চলবে না। দেশের শ্রীসম্পদ বাড়ানোই হবে তার একমাত্র কাজ।

তবে ভয় আছে একদিক দিয়ে। মানুষই তো থাকবে কংগ্রেসের হালে। সংসারের এক মানুষই তারা। জমিদার, মহাজন, মজুতদার, দালাল,—যারাই এতদিন চোরাকারবারে রক্ত শুষেছে সাধারণের, তারাও তো গোড়ায় এক জায়গায় মানুষ। তারা যখন অবস্থায় পড়ে বিগড়েছে, তখন কংগ্রেসের ভালো মানুষগুলিরও মানবস্বভাব ক্রমেই একদিন যদি বিগড়োবার পালা আসে, তবে রক্ষা করবে কে? লোভের দেবতা শয়তান, শয়তানকে স্বয়ং ভগবান পারেন নি বাগ মানাতে। তবে কিনা ভরসা ভগবান নয়, মানুষের ভরসা যে মানুষই, এ কথাটা সাধারণ মানুষেও আজ এদেশেও কিছু কিছু যেন বুঝতে শুরু করেছে, অন্তত তাদের সেটা আরো ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সাধারণের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেললে, সাধারণকে ধাপ্পা দিতে গেলে আগের মতো ভয়ে বা ভক্তিতে বেশিদিন সে অন্যায় কেউ বরদাস্ত করবে না। এখন কাজের পরিচয় হাতে-কলমে আদায় করে তবে লোকে ছাড়ে, ভাবের পরিচয়ের দিন নেই। যুক্তি ও তথ্যবাদী হয়ে উঠছে সাধারণের মন—এইখানেই যা ভরসা। দেশের প্রয়োজন মিটানো চাই, তাতে অক্ষমতার পরিচয় দিলে কংগ্রেসকেও গদি থেকে ঠেলে ফেলতে জনসাধারণ ফিরবে না।

কংগ্রেসের কার্যপ্রণালীটি আজকে খুবই ধীর বিবেচনাযুক্ত হওয়া চাই। সুখের বিষয়

যে, সে তারই পরিচয় দিচ্ছে। কেননা প্রথমেই দেশবাসী বলে স্বীকার করেছে সে সর্ব-সাধারণকে। সেখানে অধিকারও দিয়ে রেখেছে সর্বসাধারণকেই। ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, উচ্চ-নীচ বড়-ছোট,—এ সবের কাউকে হাতে রেখে কাউকে সে ত্যাগ করেনি। সকলের দায়-দাবীর ন্যায্য সমাধানই তার কর্তব্যের অন্তর্গত করে সে গ্রহণ করেছে। এমন কি, চোরাকার-বারীও একজন দেশবাসী বলে বিচারের বেলায় এই যুক্তি সে উত্থাপন করতে সাহস পেয়েছে যে, ব্যাপারটা দোষের বটে; কিন্তু একা তাকে দোষী করলে তো হবে না, এর মূলে যে শাখা-প্রশাখায় তলে-তলে সমস্ত সমাজব্যাপী: এতে যোগ আছে ক্রেতাসাধারণেরও। কেননা, তারা জিনিস বেচতে পীড়াপীড়ি না করলে তো আর চোরাবাজার চলত না। বিচার হলে তাদেরও বিচার হোক্; কিন্তু তাদের এ যুক্তি সেই পুরোণো কাজির বিচারের গল্প মনে করিয়ে দেয়। ধরা প'ড়ে চোরও সেদিন কাজির দরবারে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিল এই বলে যে, 'হুজুর, আমার স্বভাব,—সে তো সকলেরই জানা। গৃহস্থের কি উচিত ছিল না সজাগ থাকা?' চোরের স্বভাব চুরি করা, কিন্তু গৃহস্থের উচিত সাবধান থাকা,—এই যুক্তি কিছুটা না মেনেও পারা যায় না বটে এবং সেই-জনাই প্রথমবারের মতো ধরা পড়েও শাস্তির হাত এড়াতে পারল চোরাকারবারী দল। কিন্তু এর পরে চোর গৃহস্থ দুদিকেরই সংশোধনের পালা। সেখানে কারও অকর্তব্যই প্রশ্রয় পাবে না বিনা শাস্তিতে—কংগ্রেস তৈরি হচ্ছে সেই কঠিন ব্যবস্থায়। আর, সে ব্যবস্থার তৎপরতায় কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখালে উল্টো চোরাকারবারী সাজতে হবে কংগ্রেসের নিজেকেই, সাজতে হবে সোজাসুজি সাধারণের কাছে,—এ কথা ভুললে চলবে না। এজন্য সতর্কতা দরকার এখন পদে পদে।

সকলকে শোধ্‌রাবার সময় দিয়ে সকলের দাপাদাপি সয়ে নিয়ে অবস্থাকে হাতের মুঠোয় রেখে চলেছে কংগ্রেস—এইখানেই তার সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বিচারশীলতার পরিচয়। সে যে সত্যিকার বলী, তারও লক্ষণ এই স্থলেই। নানা কঠিন কাজের দিক দিয়েও ক্রমে ক্রমে তার সে বীর্যবত্তার সত্যতা লোকের অধীর বুদ্ধিকে শান্ত ক'রে ফিরছে। আর্থিক সমস্যার ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম ঘৃণ্য পাপ এই চোরাবাজার দমাতেও কংগ্রেস দুর্বলতা দেখাবে না, এটা বুদ্ধিমানমাত্রেই বুঝতে পারে। অর্ডিন্যান্স জারি শুরু তো হয়েওছিল। বিল করে এ সম্বন্ধে আইন পাশের পরিকল্পনাও দেশে আজ অগোচর নেই। এমন কি ভারতে কোনো কোনো প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে তা চালু হবারও উপক্রম হচ্ছে। এখন যে সেই সব কিছুই ধনী-পুঁজিবাদীদের ঘুষ বা হুমকির তলায় তলিয়ে গেছে তা মনে করবার কারণ নেই। বিবেচকরা জানেন, আপাততঃ হৈ-চৈ জিইয়ে না রাখার অর্থ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভালোয় ভালোয় শোধরাবার সময় দেওয়া মাত্র। আর, তা ছাড়াও কংগ্রেসের একটি আদর্শনিষ্ঠা রয়েছে এই তুষ্ণীম্ভাবের পিছনে। বাইরে থেকে শাসন করে করে শোধরাবার পক্ষপাতী কোনক্রমেই সে নয়। কংগ্রেসের মূলগত নীতিই হচ্ছে, ভিতরের স্বভাব হতে যাতে লোক আপনা থেকেই সংশোধিত হয়ে ওঠে তার অনুকূল কাজ করে যাওয়া, সেরকম পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করা, লোককে সংশোধনের পথে যেতে সাহায্যকারী হওয়া মাত্র। তাই যেমনমাত্র অর্ডিন্যান্সের প্রস্তাব তোলা, অমনি কংগ্রেসের নৈতিক পরিচালক মহাত্মাজী কংগ্রেসকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তার নৈতিক দায়িত্ব। নীতিগতভাবে সে যেমন অহিংসার পথ সম্ভবমতোই চায় অনুসরণ করে চলতে, সেজন্যেই যেমন তার সম্ভবপর হিংসাত্মক আক্রমণ বা আত্মরক্ষার পথও সে এড়িয়ে চলতেই চেষ্টিত, তাতে তার বিরুদ্ধে দুষ্ট সমালোচনা প্রশ্রয় পেলে বা নানা দুঃখ-বিপত্তির মাত্রা দীর্ঘায়িত হলেও তার ইতস্তত নেই, তেমনি চোরাবাজারের ক্ষেত্রেও কী করে ক্রেতা-বিক্রেতা দু'পক্ষেই লোকের শুভবুদ্ধি জাগে, সেই অপেক্ষায় এবং উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় অর্ডিনান্স পাশ তার স্থগিত আছে। এতেও তার দুর্ভোগ কিছু দীর্ঘকালব্যাপী হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু কংগ্রেসের অসুবিধা এইখানেই যে, সাধারণের ন্যায় চোরাবাজারের ব্যবসায়ী, রাজা, জমিদার, মহাজন—তারাও যে সবাই দেশেরই লোক, এ সত্যটি কংগ্রেস ভুলতে পারে না। মানুষকে মেরে নয় বাঁচিয়ে রাখাকেই করেছে সে মুখ্য আদর্শ। মানুষের সব সংশোধন ও সংগঠন হচ্ছে বাঁচিয়ে রাখার পরের কথা। এইজন্যেই মারধোর হিংসার পথে শাসনটা রাষ্ট্র-দণ্ড হাতে থাকায় এখন অনেকটা সহজ হলেও তার পক্ষে তার আশ্রয় নেওয়াটা কঠিন। সে-পথ অন্যের পক্ষে সহজ বলেই হয়তো কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনায় ইচ্ছামতো বিষোদ্গারে আবহাওয়া বিষিয়ে তুলতে অন্য সকলের বাধছে না।

এই বিরুদ্ধবাদী বা বিরুদ্ধপন্থীদের মধ্যে দেশের সত্যিকার হিতকামী নিষ্ঠাবান চিন্তা-নায়ক এবং সাধক বীর কর্মীদলও আছেন। তাদের মত বা পথ ভুল হতে পারে,—অবশ্য তাও কংগ্রেসেরই মতো সমান বিচারসাপেক্ষ,—কিন্তু তাদের সংকল্পের সাধুতা ও কর্মনিষ্ঠা অনেকস্থলে স্বীকার করতেই হবে। তবে তাঁরা যেখানে দলের প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায় প্রচারের পথ নেন, সেখানে নিশ্চয় তাঁরা নিন্দার্হ, এইরূপ একটি দলের কথা কিছুদিন আগে খুবই শোনা গেছে।

বামপন্থী কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কংগ্রেসী-দের বাধে—নীতি ও কর্মপ্রণালীতে। কমিউনিস্টদের সবুর সয় কম আর তাঁরা তত পরমতসহিষ্ণুও নন, তাড়াতাড়ি কাজ এগোবার তাড়ায় তাঁরা হিংসার আশ্রয় নেবেন বিনা দ্বিধায়,—আর বিরুদ্ধবাদীদের সমূলে কোতোল করতেও তাঁদের মুহূর্ত লাগে না,—এই সাক্ষ্য জোগায় তাদের বিরুদ্ধে তাদের গোড়াঘরের রাশিয়ান ঐতিহ্য। কংগ্রেসের কাজে দীর্ঘ-সূত্রিতার অপবাদ লাগে বটে, কিন্তু সে ডাইনে বাঁয়ে তার দক্ষিণ-বাম সকল দল ও মতকে নিয়ে যথাসাধ্য শান্তিতে চলতে চায়, এইখানেই তার অসুবিধা ও তার মহত্ত্ব দুইই রয়েছে অনুস্যূত। ক্ষতি বরণ করেও সেই মহত্ত্ব রক্ষাতেই কংগ্রেস দৃঢ়সংকল্পে অগ্রসর। তার কাজের সুবিধার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার আদর্শের বিশুদ্ধিতা।

মন পরিষ্কার থাকলে এবং সত্যিকার কাজ করতে চাইলে, এমন অনেক ক্ষেত্র মিলবে, যেখানে কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট, কমিউনিস্ট ইত্যাদি সব দলই একযোগে দেশের সেবা করতে পারবেন। চোরাবাজার উৎখাত সেইরূপ একটি কাজের ক্ষেত্র। সবারই এটা বাস্তব প্রয়োজনের বিষয়;—কারণ দরিদ্র দুর্গত দেশবাসী সাধারণকে ভাতকাপড়ে খাইয়ে পরিয়ে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার প্রাথমিক কাজটা সকলেরই দলপ্রাধান্য বিস্তারের পক্ষে সমান দরকার। মানুষ বাঁচলে তবে তো দলকে ভোট দেবে। তারপরে হবে স্থির কোন্‌দলীয় পথে দেশের মঙ্গল। সব দল মিলে-মিশে একযোগে কাজ করলে সুফল যে কত শীঘ্র পাওয়া যায়, নেতাজীর "আজাদ হিন্দ ফৌজ," ছাত্রমহল থেকে কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের এই সেদিনকার রক্তরাঙা স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আধুনিকতম শান্তিমিশনের কাজই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

চোরাবাজার সর্বনাশী হয়ে সর্বসাধারণের রোজকার পরবার কাপড় ও মুখের ভাত নিচ্ছে কেড়ে। মানসম্ভ্রম, সতীত্ব, মায়ামমতা, সংস্কৃতি, —মনুষ্যত্বের কিছুর আর কিছু বাকি রইল না, এর কবলে পড়ে। এর কাছে জাত নেই, ধর্ম নেই, দেশ নেই,—আত্মপর বিচারের মাথা খেয়ে নির্লজ্জ নির্মম শোষণ চালিয়ে মানুষকে এ ধ্বংস করে চলেছে। হিন্দু-মুসলমান সবাইকেই সমভাবে পথে বসিয়ে এ মজা লুটছে দিনদুপুরে। সকলে তেমনি এর পিছনে লেগে আগে একে ধ্বংস করা দরকার।—দলাদলি তারপরে। বলা বাহুল্য এর নীতিরই ধ্বংস সাধতে হবে, মানুষের নয়। কলকাতার শান্তি-মিশনে এ-ও প্রমাণিত হয়েছে যে, যৌথ শুভ-কাজে মর্যাদা বাড়ে প্রত্যেকেরই, সেটা সকলের পক্ষেই লাভজনক।

নূতন ছবির পরিচয়

নতুন খবর—আওয়ার ফিল্মসের প্রথম বাঙলা বাণীচিত্র। রচনা ও পরিচালনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র; সংগীত পরিচালনা : কালিপদ সেন; বিভিন্ন ভূমিকায় : ভারতী দেবী, পূর্ণিমা, কুমারী কেতকী, বেলা বোস, পরেশ ব্যানার্জি, ধীরাজ ভট্টাচার্য, অমর মল্লিক, ইন্দু মুখার্জি, কৃষ্ণধন মুখার্জি প্রভৃতি।

সাংবাদিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা দ্বন্দ্ব সংঘাত নিয়ে কোন সার্থকনামা বাঙলা চলচ্চিত্র এ পর্যন্ত আমরা নির্মিত হতে দেখিনি। খ্যাতনামা সাহিত্যিক-পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র 'নতুন খবর'এ সাংবাদিক জীবনের এই আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন এবং আমরা অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি যে, এ প্রয়াসে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভও করেছেন। কিন্তু এই বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই 'নতুন খবর'-এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। নিছক বিষয়বস্তুর জোরেই কোন চলচ্চিত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারে বলে আমি মনে করি না। বিষয়বস্তুকে যথাযথ শিল্পরূপ দেবার জন্যে পরিচালকের নৈপুণ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন। এদিক থেকেও 'নতুন খবর'কে সার্থক চিত্র বলে অভিনন্দন জানাতে বাধে না। বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরূপে প্রেমেন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। ইতিপূর্বে চলচ্চিত্রক্ষেত্রেও তাঁর একাধিক কাহিনীর অভিনবত্ব আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করেছি। তাঁর যে কয়টি চিত্রকাহিনী এ পর্যন্ত দর্শদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আহুতি', 'সমাধান', 'ভাবীকাল' ও 'অভিযোগ'। কিন্তু কাহিনীকার প্রেমেন্দ্রবাবু পরিচালকরূপে এ পর্যন্ত আশানুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। মনে হয় যে 'নতুন খবর'-এর পরিচালনা-নৈপুণ্য তাঁকে সেই বহু প্রত্যাশিত জনপ্রিয়তার অধিকারী করে তুলবে।

ধনতন্ত্রের অক্টোপাশ আজকের দিনের সমাজ জীবনকে নানা দিক থেকে আঁকড়ে ধরেছে। এই বৈষম্য-পীড়িত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত আদর্শবাদ নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে যাঁরা নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সাংবাদিক আদর্শকে অম্লান রেখে বেঁচে থাকতে চান, তাঁদের পক্ষে এই দূষিত সমাজব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক। 'নতুন খবর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার পরিচালক নিবারণবাবু ছিলেন এমনই একজন আদর্শবাদী সংবাদপত্রসেবী। তাঁর একমাত্র মেয়ে প্রণতিরও চরিত্র গড়ে উঠেছিল বাপের আদর্শে। ঘটনাচক্রে এ'দের সংগে এসে যোগ দিল আদর্শবাদী তরুণ জয়ন্ত। অপরপক্ষে ৭।৮টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার কর্ণধার বিরাট ধনী ধরণীধর চৌধুরী হলেন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতীক। টাকার জোরে কাগজের মুখ বন্ধ করে তিনি তাঁর সমাজ-বিরোধী কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে চান। এঁর সহায় সম্বলও প্রচুর—যোগজীবন সমাদ্দারের মত নির্বাচনপ্রার্থীরা এঁর কৃপাভোগী আবার দৈন্যপীড়িত অর্থগৃধ্নু কুঞ্জবাবুর মত সাংবাদিকও এঁর পদলেহী। একদিকে নিঃসম্বল নিবারণবাবু, প্রণতি ও জয়ন্ত—অপরদিকে এঁরা সবাই। এই আদর্শগত দ্বন্দ্বই হল মূল আখ্যায়িকার প্রধান প্রাণ। কিন্তু নিবারণবাবু নিঃসম্বল হলেও তিনি নিঃসহায় ছিলেন না। তাঁর প্রধান সহায় ছিল ত্যাগব্রতী মহান্ সাংবাদিক আদর্শ, জয়ন্তের মত আদর্শবাদী যুবক, ছোটেলালের মত আদর্শ চরিত্রের মেসিনম্যান। এ সবের জোরেই তিনি শেষপর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধবাদী কুচক্রীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে পারলেন, তাঁর 'নতুন খবর'-এর নির্ভীক নিরপেক্ষ আদর্শ হল বিজয়ী। এরই মধ্যে আবার জয়ন্ত ও প্রণতির প্রেমের চিত্রও আছে। কিন্তু তাদের এই প্রেমকাহিনীকে সুনিপুণভাবে প্রেমেন্দ্রবাবু গৌণব্যাপার করে রেখেছেন বলে ছবির আদর্শগত দ্বন্দ্বের দিকটাই প্রয়োজনানুযায়ী প্রাধান্য পেয়েছে।

'নতুন খবর'-এর কাহিনীতে একটা জিনিস সহজেই চোখে পড়ে। সেটা হল কাহিনীর গতিবেগ। চিত্রকাহিনী যেরূপ দ্রুততালে আবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, 'নতুন খবর'-এর কাহিনী সেইরূপ দ্রুতবেগেই প্রথম থেকে শেষ অবধি আবর্তিত। 'ভাবী কালের' মধ্যেও আমরা এমনই দ্রুত গতিবেগের সন্ধান পেয়েছিলাম। তাই 'ভাবীকালে' যে একখানা মাত্রও গান ছিল না, সেটা আমাদের নজরে পড়েনি। 'নতুন খবর'এ অবশ্য দুখানা গান সংযোজনা করা হয়েছে। কিন্তু এই গান দুখানি না থাকলেও চিত্রকাহিনীর কোন অঙ্গহানি হত বলে মনে হয় না। বিশেষ করে পার্টি উপলক্ষে বেদেবেদেনীদের যে নাচ ও গান দেওয়া হয়েছে, সেটা না দেওয়াই উচিত ছিল বলে মনে করি। সাধারণ দর্শকদের সন্তুষ্ট করার জন্যেই এই নাচ ও গান পরিবেশিত হয়েছে বলে মনে হয়। ছবির সমাপ্তির দিকটা অন্য ধরণের হলে বোধ হয় ভাল হত। বিশেষ করে ধরণীধরকে মেয়ের পোষাক পরিয়ে জনতার মধ্য দিয়ে পার করে নিয়ে যাবার দৃশ্যটা সস্তা স্টান্ট বলে মনে হয়।

'নতুন খবরে' যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই উচ্চাঙ্গের অভিনয়-কলার পরিচয় দিয়েছেন। নায়িকা প্রণতির ভূমিকায় ভারতী দেবী অত্যন্ত সংযত ও সুন্দর অভিনয় করেছেন। নায়কের ভূমিকায় পরেশ ব্যানার্জির অভিনয়ও স্বচ্ছ ও সাবলীল। কিন্তু অভিনয়নৈপুণ্যে সবচেয়ে আমাদের বেশী মুগ্ধ করেছে ধীরাজ ভট্টাচার্য। তিনি সাংবাদিক আদর্শচ্যুত চালবাজ কুঞ্জবাবুর ভূমিকাটিকে নিজের অভিনয়ের গুণে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। ছোটেলালের ভূমিকায় অমর মল্লিক, খুসীর ভূমিকায় কুমারী কেতকী ও ভবানীপ্রসাদের ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জিও বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। চাকরের ভূমিকায় নবদ্বীপ হালদার আমাদের প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণের কাজ ভাল হয়েছে। আবহসংগীত ও কণ্ঠসংগীত দুখানির সুরসংযোজনা প্রশংসার দাবী করতে পারে।

স্টুডিও সংবাদ

পরিচালক শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণীকে' ছায়াচিত্রে রূপায়িত করার ভার গ্রহণ করেছেন। নবগঠিত রূপায়ণ চিত্রপ্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তিনি এই ছবিখানি তুলবেন।

* * * *

লীলাময়ী পিকচার্সের প্রথম বাণীচিত্র 'দেবদূতের' পরিবেশনার ভার গ্রহণ করেছেন অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন। 'দেবদূতের' কাহিনী ও চিত্রনাট্যের রচয়িতা শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানাংশে অভিনয় করেছেন অভি ভট্টাচার্য ও অমিতা বসু।

* * * *

ওরিয়েণ্ট পিকচার্সের 'বিচারক' শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ, অলকা, সুধা রায় প্রভৃতি।

* * * *

কে, সি, দে প্রোডাকসন্সের সংগীতমুখরিত চিত্র 'পূরবী' আসন্ন মুক্তিপ্রতীক্ষায় আছে। অনেকদিন পরে এই ছবিতে চন্দ্রনাথের ভূমিকায় অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দেকে দেখা যাবে। সন্ধ্যারাণী একটি প্রধান ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও প্রণব দে।

* * * *

টালিগঞ্জের ইন্দ্রলোক স্টুডিওতে ওরিয়েণ্টাল সিনেটোনের প্রথম বাঙলা ছবি 'রিক্তা ধরিত্রী'র শুভ মহরৎ সম্পন্ন হয়ে গেছে। চিত্রকাহিনী

রচনা করেছেন বিনয় সাহা এবং পরিচালনার ভার নিয়েছেন সুধীর চক্রবর্তী ও সুধাংশু বক্সী। সুরশিল্পী প্রফুল্ল রায় এবং ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছেন শৈলেন মজুমদার।

* * *

এ এল প্রোডাকসন্সের 'ঘরোয়া' এই সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে। 'ঘরোয়া'র কাহিনীকার খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক প্রবোধকুমার সান্যাল এবং পরিচালক মণি ঘোষ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কালোবরণ দাস। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মলিনা, শিশির মিত্র, অশোকা, শ্যাম লাহা, সুপ্রভা প্রভৃতি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—দ্বিতীয় খণ্ড। ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। বুক স্ট্যান্ড, ১।১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

"ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে"র প্রথম খণ্ডের সমালোচনা আমরা যথাসময়ে করিয়াছি। ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের উৎস-মূল ও প্রাণ প্রবাহ সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে যে রকম লেখনী-নিঃসৃত গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজন, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় বঙ্গ ভাষায় সেইরূপ একখানা গ্রন্থের অভাব পূরণ করিয়া বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তরের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় হইতে এই স্তরের আরম্ভ এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচার এবং শাসনতন্ত্রের অনাচার ও উৎপীড়নমূলক পরিণতিতে এই স্তরের পরিসমাপ্তি। গ্রন্থবর্ণিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কিত অংশে জাতীয় ভাববন্যার বিকাশধারা বহু তথ্যসহযোগে চিত্রিত করিয়া লেখক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়কে উজ্জ্বল রূপে দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বিপ্লবী আন্দোলনের অধ্যায়টির সংযোজন ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়াছে। লেখক অত্যন্ত সংযতভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাহাতে কোনরূপ আবেগ বা প্রবণতা প্রকাশ না পাওয়ায় খাঁটি ইতিহাসের মর্যাদা পূর্ণরূপে রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। সম্ভবত তৃতীয় খণ্ডেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইবে। আমরা শেষ খণ্ডের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব।

রাজনীতির ভূমিকা—শ্রীপরিমলচন্দ্র ঘোষ বি-এস-সি (ইকন্) লণ্ডন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এইচ চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের রাষ্ট্ররঙ্গমঞ্চে বিরাট বিরাট পরিবর্তনাদির ফলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রচেতনা বিকাশলাভ করিতেছে। কিন্তু রাজনীতির মূলবস্তুর বিষয়ে পর্যাপ্ত সাধারণ-জ্ঞানে বঞ্চিত লোক—ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির কর্তব্য ও পথনির্ণয় ব্যাপারে অংশ গ্রহণে সমর্থ হয় না। বাঙলা ভাষায় উপযুক্ত রাজনীতির পুস্তকের অভাব বিশেষভাবেই চোখে পড়িবে। 'রাজনীতির ভূমিকা' বইখানা পড়িয়া সুখী হইলাম। রাজনীতির বিশদ চর্চার সোপান হিসাবে বইটি সকলেরই বিশেষ কাজে আসিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রাজনীতির তাৎপর্য, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, এই কয়টি পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়া লেখক রাজনীতির ভূমিকা আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ে লেখকের প্রগাঢ় জ্ঞান লেখককে উহার সহজ প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। বাঙলা ভাষায় এই বইটি লিখিয়া তিনি বাঙালী পাঠকগণের ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। ১২৭।৪৭

প্রথম প্রশ্ন—শ্রীরাইমোহন সাহা প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য চারি টাকা।

সমাজ ও দেশের সমস্যা নিয়া কথা সাহিত্য সৃষ্টি হইবে, অথচ তাহা জটিল হইবে না, রসের দিক দিয়া ইহার অঙ্গহানি হইবে না, উপন্যাস হিসাবে উৎরাইবে—ইহা যথার্থ শক্তিমান কথা-সাহিত্যের লেখনীতেই সম্ভবপর। শ্রীযুত রাইমোহন সাহার 'প্রথম প্রশ্ন' এইরূপ একখানি সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশের পরই উহা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণে ও প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়। এখন ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে বইটির সার্থকতা ও জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইল। ব্রাহ্মণকন্যা মায়া ও অব্রাহ্মণ পরেশের মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার, সমাজ কর্তৃক তাহাদের মিলনে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে নানাবিধ জটিল সমস্যার মধ্য দিয়া গল্পাংশ পরিণতি লাভ করিয়াছে। গল্পাংশের মাঝে মাঝে নানাবিধ সমস্যা মাথা তুলিয়াছে এবং লেখক দরদের সহিত সেগুলির সমাধানের স্পৃহা জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের সে সকল শুভ কামনা আজ সময়ক্রমে সাফল্যের দিকে চলিয়াছে—সমাজের জটিলতার বাঁধ কালের প্রয়োজনে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চলিয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য আজ সাফল্যের মুখে। এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাই। ২০৬।৪৭

সাঁঝ সকালের রূপকথা—শ্রীবিকাশ দত্ত লিখিত ও শ্রীসুবোধ গুপ্ত চিত্রিত। চারু সাহিত্য কুটির, ১৯২।২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা আট আনা

ডাইনী পরী, চার বন্ধু, ঘুঁটে-কুড়ুনীর মেয়ে প্রভৃতি বারোটি রূপকথা বইটিতে চিত্রাদিসহ পরিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা রূপকথা বলার উপযোগী। ছবিগুলিও শিশুদের চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। প্রচ্ছদপট সুন্দর। বইটি শিশুদের ভালো লাগিবে সন্দেহ নাই। ২০৮।৪৭

এসিয়া—সম্পাদক শ্রীপীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যালয় ১৮ গড়িয়াহাটা রোড, সাউথ, ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা। প্রথম ও পূজা সংখ্যা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

আলোচ্য পত্রখানার "প্রথম ও পূজা সংখ্যা" খানা বিশেষ আকর্ষণযোগ্য হইয়াছে। নামজাদা লেখক ও শিল্পিগণের রচনা ও চিত্রের প্রাচুর্যে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। ২৪২।৪৭

মরণজয়ী বীর—শ্রীসুধীরকুমার সেন প্রণীত। প্রকাশক—ঘোষ এণ্ড সন্স, ৩৬নং ব্রজনাথ দত্ত লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

সংক্ষেপে এই গ্রন্থে কিশোর-কিশোরীদের জন্য বাঙলার বিপ্লবী বীরদের জীবনকাহিনী সঙ্কলিত হইয়াছে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন মুখার্জি, চিত্তপ্রিয়, গোপীনাথ সাহা, যতীন দাস, সূর্য সেন প্রভৃতির জীবন-চরিত অল্পের মধ্যে এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। লেখক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পের মত সরস করিয়া লিখিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের জীবনকথা একসঙ্গে গ্রন্থন বোধ হয় এই প্রথম। ২৫১।৪৭

কয়েকটি বিদেশী গল্প—শ্রীগোপাল ভৌমিক অনূদিত। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, সি ১৮—১৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানা কয়েকটি বিদেশী গল্পের বঙ্গানুবাদের একত্রে সংগ্রন্থন। অনুবাদকের ভাষা জোরালো এবং অনুবাদ স্বচ্ছ ও 'নির্ভরযোগ্য'—এজন্য গল্পপ্রিয় পাঠক মাত্রেরই নিকট বইটি হৃদয়গ্রাহী হইবে। অনুবাদের সাহায্যে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার সুষ্ঠু প্রচেষ্টা অধুনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে। তবে সে প্রচেষ্টার পূর্ণ সার্থকতা নির্ভর করে অনুবাদ 'নির্ভরযোগ্য' হওয়ার মধ্যে। তবেই পাঠক তাহার মাতৃভাষার মারফতে বিভিন্ন দেশের প্রাণস্পন্দন সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। আলোচ্য পুস্তকে পৃথিবীর নানা সাহিত্যের ভাল ভাল লেখকের ষোলোটি গল্প অনূদিত হইয়াছে। এই সংগ্রহের সব গল্পই প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধারার মানুষ, তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ চাল-চলন ও জীবনযাত্রা নিয়া এই বইটিতে ধারা দিয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের, প্যালেস্টাইনের, দক্ষিণ আফ্রিকার, ব্রাজিলের ও আমেরিকার গল্প সাহিত্য হইতে (অবশ্য ইংরাজির মধ্যস্থতায়) গল্প চয়ন করা হইয়াছে। এজন্য বইটির আখ্যানবস্তুর বিভিন্নতা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য পাঠকদের নিকট মনোজ্ঞ বিবেচিত হইবে। ২৩১।৪৭

মনোতোষিণী — শ্রীমনোজচন্দ্র সর্বাধিকারী প্রণীত। প্রকাশক—বিদ্যায়তন, ১৬ ডাঃ জগবন্ধু লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

'মনোতোষিণী' কতকগুলি গল্পের সমষ্টি। লেখকের তরুণ মনের স্বপ্ন ও রঙীনতা গল্পগুলিতে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছে। অবশ্য আঙ্গিক ও কলানৈপুণ্যের দিক দিয়া সব কয়টি গল্প রসোত্তীর্ণ হইয়াছে বলা চলে না। তবে মোটামুটিভাবে গল্পগুলি পড়িতে ভালই লাগে। চরিত্রাঙ্কনে লেখকের সহানুভূতি ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। ২২৮।৪৭

উদ্বাস্তু—শ্রীদেবদাস ঘোষ প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

'উদ্বাস্তু' নূতন ধরণের যুগোপযোগী উপন্যাস। এ যুগের সর্বাপেক্ষা দুস্তর সমস্যায় পীড়িত লোকেদের দৃষ্টি এই উপন্যাসটির প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইবে। উপন্যাসের আঙ্গিক ও অন্যান্য কলাকৌশল অপেক্ষাও লেখকের সুতীব্র অনুভূতি ও মানবতার বেদনাবোধ অধিকতর প্রশংসনীয়।

অমরার অমৃত সাধনা—শ্রীদেবদাস ঘোষ প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কয়েকটি সর্বত্যাগী আদর্শবান নরনারীর মুক্তি-সংগ্রামমূলক কার্যকলাপের মধ্য দিয়া এই বইটির আখ্যান ভাগ পরিণতি লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা-ব্রতী কর্মীদের অবশ্য-লভ্য পুরস্কার—কারাবরণ এবং বিচারের প্রহসন ও দণ্ড গ্রহণ বেশ চিত্তাকর্ষক-ভাবে এই উপন্যাসে দেখান হইয়াছে।

জয়-কিশোর—মুকুল সংগঠনের মুখপত্র। সম্পাদক—শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য। কার্যালয়—১০-বি, মলংগা লেন, কলিকাতা—১২। মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই আনা। বার্ষিক ১৷৷০, সডাক ১৸৵০।

জয়-কিশোর তরুণদের উপযোগী মাসিক সাহিত্যপত্র। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। আমরা পত্রখানার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

২৩৩।৪৭

জাগরণী—শ্রীপ্রসাদ বসু প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

'জাগরণী' জাতীয় ভাবোদ্দীপক কতকগুলি সঙ্গীতের সমষ্টি। ছন্দ ও ভাষার ঝঙ্কার গান-গুলিকে প্রাণবান করিয়াছে। গ্রন্থশেষে সব কয়টি গানেরই স্বরলিপি দেওয়ায় সঙ্গীতচর্চাকারীদের সুবিধা হইল।

২৩৪।৪৭

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন:—শ্রীনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনীরেন লাহিড়ী, প্রগতি প্রকাশভবন, গৌহাটী, আসাম। মূল্য আট আনা।

পুস্তকের বর্ণিতব্য বিষয় উহার নামেই সপ্রকাশ। 'স্বাধীন ভারতের ন্যূনতম কর্মতালিকা', 'কৃষক বিপ্লব', 'শিল্প বিপ্লব', 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই চাই কেন', 'সমাজতন্ত্রবাদ কেন', এই কয়টি পরিচ্ছেদে লেখক মোটামুটিভাবে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বইটিতে লেখকের চিন্তাশীল মনের ছাপ সুস্পষ্ট।

২৩২।৪৭

ফ্রীড্‌রীশ্‌ লিস্ট ও জার্মানী—শ্রীবিনোদ-বিহারী চক্রবর্তী প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

জার্মানীর কর্মবীর ও চিন্তানায়ক ফ্রীড্‌রীশ লিস্টের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বহু 'বাণী'ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৪৭।৪৭

বাঘা যতীন—শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। অশোক লাইব্রেরী, ১৫।৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে এই পুস্তিকায় আলোচনা করা হইয়াছে।

২১৭।৪৭

সমীক্ষণ—সাংস্কৃতিক সংকলন। ভার্সিটি স্টুডেন্টস কালচারাল ব্যুরোর সভ্যবৃন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার বিমল সিংহ ও অন্যান্য লেখকগণের রচনায় আলোচ্য সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

২৩৯।৪৭

পাহাড়

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রীবিনায়ক মাসোজির সৌজন্যে

খেলাধুলা

সন্তরণ

নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতার তৃতীয় অনুষ্ঠান সম্প্রতি বোম্বাইতে প্রাণ শুকলাল মফৎলাল হিন্দু বাথে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের সন্তরণ স্ট্যাণ্ডার্ড যে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হইয়াছে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় সন্তরণের ৯টি বিষয়ে নূতন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় যে, অন্যান্য বারের অনুষ্ঠানের ন্যায় এই সকল রেকর্ড বাঙলার সাঁতারুগণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ৯টির মধ্যে ৬টি রেকর্ড প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করিয়াছে বোম্বাইর পুরুষ ও মহিলা সাঁতারুগণ। এমন কি বোম্বাইর সাঁতারুগণ দীর্ঘকালের অর্জিত গৌরব হইতে বাঙালী সাঁতারুগণকে বঞ্চিত করিয়াছে। বাঙলা দলকে পুরুষ কি মহিলা উভয় বিভাগেই বোম্বাইর সাঁতারুগণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। বোম্বাই বাঙলাকে পুরুষ বিভাগে ৫৩—৪২ পয়েণ্টে ও মহিলা বিভাগে ৩৭—৩ পয়েণ্টে পরাজিত করিয়াছে। বাঙলার সাঁতারুগণের এই শোচনীয় পরিণতি খুবই দুঃখের বিষয়, তবে ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বাঙলা দল যে অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে না ও বোম্বাইর নিকট পরাজিত হইবে ইহা আমরা দুই বৎসর পূর্বেই উপলব্ধি করি এবং বাঙলার সন্তরণ পরিচালকদের সাবধান করিয়া দিই। কিন্তু আমাদের সাবধান বাণী কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। পরিচালকগণ থাকেন দলাদলি লইয়া ব্যস্ত আর সাঁতারুগণ থাকেন আকাশ কুসুম চিন্তায় মগ্ন। সকল সময়েই তাঁহারা মনে করেন "আমাদের কেহই মারিতে পারে না।" একনিষ্ঠ সাধনার ফল আছে, ইহা যে কত বড় সত্য কথা তাহা এইবারের ফলাফল হইতেই বাঙলার সাঁতারুগণ উপলব্ধি করিবেন। বোম্বাইর এমন কতকগুলি সাঁতারু নিজ প্রদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন যাঁহাদের নাম ইতিপূর্বে কেহই শুনে নাই। এই সকল অখ্যাত সাঁতারু নীরবে সাধনায় লিপ্ত ছিলেন এবং সেইজন্যই যখন সময় হইয়াছে তখন ইঁহারা সকলকে চমৎকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তবে এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে যে, বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ নাগ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন নাই। আকস্মিক দুর্ঘটনা বর্তমানে ইহাকে সম্পূর্ণভাবে সন্তরণ হইতে দূরে রাখিয়াছে। তবে আশা আছে শীঘ্রই ইনি সুস্থ হইবেন ও ভারতীয় সাঁতারু দল বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে প্রেরিত হইবার পূর্বে পুনরায় নিজ অর্জিত গৌরব অনুযায়ী সন্তরণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন।

প্রফুল্ল মল্লিকের কৃতিত্ব

বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির বিশিষ্ট সাঁতারু প্রফুল্ল মল্লিক বুক সাঁতারে দীর্ঘকাল হইতেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। মাঝে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে শরীর অসুস্থ থাকায় ইনি শ্রীমান হরিহর ব্যানার্জির নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। কিন্তু এই পরাজয় ইঁহাকে হতাশ করে নাই। পুনরায় নিজ অর্জিত গৌরব কিরূপে ফিরিয়া পাইবেন এই চিন্তা প্রবল হইয়া থাকে। গত বৎসর দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় যখন সকলে সন্তরণ অনুশীলন ত্যাগ করেন তখন দেখা যায় প্রফুল্ল মল্লিক নিয়মিতভাবে অনুশীলন করিতেছেন। দীর্ঘ একনিষ্ঠভাবে অনুশীলন করার ফলেই ইনি বুক সাঁতারে নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় দুইটি বিষয়ে নূতন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি বিরাট সংসার জালে জড়িত এবং কয়েকটি পুত্রকন্যার পিতা, তাহা সত্ত্বেও সন্তরণে কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার উৎসাহের অভাব ইঁহার মধ্যে নাই। বাঙলার সাঁতারুগণ ইঁহার আদর্শ অনুসরণ করিলে সুখী হইব।

পরিচালনা দ্বন্দ্ব

বাঙলার সন্তরণ পরিচালনা দ্বন্দ্বের অবসান কবে হইবে, ইহাই আমাদের বিশেষভাবে চিন্তিত করিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব যতদিন বর্তমান থাকিবে ততদিন উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। বাঙলার সুনামের কথা স্মরণ করিয়া উভয় পরিচালকমণ্ডলী যদি নিজ নিজ স্বার্থ ত্যাগ করেন তবেই সকল গণ্ডগোলের অবসান হইতে পারে। নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বাঙলা সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না, ইহা দেখিয়াও কি দুইটি পরিচালকমণ্ডলী একত্র হইয়া কার্য করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন না?

নিম্নে গত নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যে কয়েকটি নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

নূতন ভারতীয় রেকর্ড

(১) ২০০ **মিটার বুক সাঁতারঃ**—প্রফুল্ল মল্লিক (বাঙলা) সময়—৩ মিঃ ৫·৫ সেকেণ্ড।

(২) ৪০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেঃ**—বোম্বাই দল সময়—৪ মিঃ ৩১·৪ সেকেণ্ড।

(৩) ১৫০০ **মিটার ফ্রি স্টাইলঃ**—বিমল চন্দ্র (বাঙলা) সময়—২২ মিঃ ৩৬·৭ সেকেণ্ড।

(৪) ২০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল (মহিলাদের)ঃ**—মিস পি ব্যালেণ্টাই (বোম্বাই) সময়—৩ মিঃ ২·৪ সেকেণ্ড।

(৫) ১০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল (মহিলাদের)ঃ**—মিস পি ব্যালেণ্টাই (বোম্বাই) সময়—১ মিঃ ২৩·৬ সেকেণ্ড।

(৬) ১০০ **মিটার বুক সাঁতার (মহিলাদের)**—মিস ডি নাজির (বোম্বাই) সময়—১ মিঃ ৩৯·১ সেকেণ্ড।

(৭) ১০০ **মিটার পিঠ সাঁতার (মহিলাদের)**—মিস জে ম্যাকক্লাম্প (বোম্বাই) সময়—১ মিঃ ৩৯ সেকেণ্ড।

(৮) ৩×১০০ **মিটার মিডলে রিলে (পুরুষদের)ঃ**—বোম্বাই দল। সময়—৩ মিঃ ৪৯·২ সেকেণ্ড।

(৯) ১০০ **মিটার বুক সাঁতার (পুরুষদের)**—প্রফুল্ল মল্লিক (বাঙলা) সময়—১ মিঃ ২০·৬ সেকেণ্ড।

বুক সাঁতারে দুইটি নূতন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠাকারী শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার মল্লিক

দেশী সংবাদ

২৪শে নবেম্বর—ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এক আদেশে বলা হইয়াছে যে, প্রথমে ভারতের কোন বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ না করিয়া কোনও বিমানকে ভারতবর্ষের উপর দিয়া সরাসরি উড়িয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

২৫শে নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশীয় রাজ্য দপ্তর ও হায়দরাবাদ প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে।

ভারতীয় আইন সভার অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। উহাতে তিনি বলেন যে, কাশ্মীর আক্রমণের সমস্ত আয়োজনই যে অভিসন্ধিমূলক এবং পাকিস্থান সরকারের পদস্থ কর্মচারীদের দ্বারাই যে সকল আয়োজন হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার মত যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে আছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট ১লা ডিসেম্বর হইতে চিনির নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ তাঁহার বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১০৯ বৎসর হইয়াছিল।

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, করাচীতে ১৪ই, ১৫ই নবেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার পরিবর্তে পাকিস্থান ন্যাশনাল লীগ গঠন করা হইবে।

২৬শে নবেম্বর—কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যদল অদ্য কোটলিতে প্রবেশ করিয়াছে। আক্রমণকারীদল কয়েকদিন ধরিয়া উহা দখল করিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে গভর্নমেণ্ট হইতে উত্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ গৃহ দখল ও নিয়ন্ত্রণ সাময়িক ব্যবস্থা বিল (১৯৪৭) কিছু আলোচনার পর বিনা বিরোধিতায় গৃহীত হয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসচিব শ্রীযুত ষণ্মুখম চেট্টি অদ্য ভারতীয় আইন সভায় স্বাধীন ভারতের প্রথম বাজেট পেশ করেন।

ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত সত্যব্রত মুখার্জি সম্প্রতি পদত্যাগ করাতে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীযুত এস এন রায়, আই সি এস উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, গত ২২শে নবেম্বর হেণ্ডারসন রোডস্থিত শ্রীহরিপদ কুণ্ডু ও শ্রীবলাই কুণ্ডু মহাশয়ের বসতবাটী হইতে পুলিশ জোর করিয়া স্ত্রীলোক ও অন্যান্য লোককে বাহির করিয়া দিয়াছে।

২৭শে নবেম্বর—অবিলম্বে জাতীয় সৈন্য বাহিনী গঠন ও ব্যাপক অস্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্পর্কিত ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার প্রস্তাবটি অদ্য ভারতীয় আইন সভায় বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচিত হয়। দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং বলেন যে, স্থায়ী সৈন্যদলের সাহায্যার্থে একটি আঞ্চলিক বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ সীতারামিয়া তাঁহার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন।

ডাঃ সৈয়দ হোসেন কায়রোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন।

মণিপুরের মহারাজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আইন সচিব ডাঃ আম্বেদকর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, পাকিস্থান ও হায়দরাবাদ রাজ্যের তপশীলীদের নিকট হইতে তিনি অসংখ্য অভিযোগপত্র পাইয়াছেন। পাকিস্থানের তপশীলীগণকে হিন্দুস্থানে আসিতে দেওয়া হয় না; তাঁহাদিগকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হইতেছে। ডাঃ আম্বেদকর তাঁহাদিগকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

২৮শে নবেম্বর—জম্মু প্রদেশের অন্যতম বৃহৎ শহর মীরপুর বহুসংখ্যক হানাদার কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে। মীরপুর অধিকার করার জন্য হানাদাররা সর্বশক্তি নিয়োগ করিতেছে। পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে মীরপুর যাত্রার পথে যে সব গ্রাম পড়িয়াছে, হানাদাররা সেই সব গ্রামে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ করিয়াছে। শত শত লোক নিহত হইয়াছে এবং বহুলোক আহত হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে গুরু নানকের জন্মতিথি উপলক্ষে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, ভারত ও পাকিস্থান ডোমিনিয়নের মিলন সুনিশ্চিত। তিনি বলেন যে, এই ঐক্য শক্তির সাহায্যে আসিবে না, পারস্পরিক স্বার্থ ও ঘটনার স্রোতেই উহা সাধিত হইবে। অতএব উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

গতকল্য কলিকাতায় ইষ্টার্ণ ষ্টেটস এজেন্সীর রাজন্যবর্গের পরিষদে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠাই রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহারা জনসাধারণের সাহায্যে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদ গঠনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব অর্থসচিব এবং খোদাই খিদমদগার পার্লামেণ্টারী পার্টির সেক্রেটারী শ্রীযুত মেহেরচাঁদ খান্নাকে গতকল্য পেশোয়ার সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট অস্ত্র আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

২৯শে নবেম্বর—ভারতের পক্ষ হইয়া বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন অদ্য ভারত-নিজাম চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

হায়দরাবাদের এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, নিজামের মন্ত্রী পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪ জন মনোনীত সদস্য এবং বর্তমান সরকারের ২ জন নির্বাচিত মন্ত্রীসহ ৪ জন মুসলমান ও ৪ জন হিন্দুকে লইয়া একটি নূতন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইবে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, নূতন প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলি অদ্য কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

অদ্য গণ-পরিষদে (আইন সভা) আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, আশ্রয়প্রার্থী সমস্যাটি এত বিরাট ও জটিল যে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। পণ্ডিতজী বলেন যে, আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি যে নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন, যদিও তাহার কোন কোন অংশ বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে বলিয়া বলা হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই নীতিও অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন।

একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থানের সহিত স্থিতাবস্থা চুক্তি সমাপ্ত হইবার পর ১৯৪৭ সালের ৩০শে নবেম্বর মধ্যরাত্র হইতে ভারত হইতে পাকিস্থানে প্রেরিত তারবার্তা এবং ট্রাঙ্ক টেলিফোনের মাশুল বর্ধিত হইবে।

৩০শে নবেম্বর—জম্মুর সংবাদে প্রকাশ, আখনুরের ২০ মাইল পশ্চিমে ভারতীয় টহলদার বাহিনীর সহিত চার ঘণ্টাব্যাপী এক যুদ্ধে প্রতিপক্ষের ৩০ জন নিহত এবং ৫০ জন আহত হইয়াছে। শত্রুরা ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ও মেসিনগান ব্যবহার করে। গিলগিট অঞ্চল হইতে একদল সশস্ত্র আক্রমণকারী লাদাখ জেলার স্কার্দু অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কোটলী, পুঞ্চ ও নওসেরা হইতে অবরুদ্ধ কাশ্মীরী সৈন্যদের উদ্ধার করার পর ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্থান সীমান্তের বরাবর পালন্দরী হইতে আখনুরের দক্ষিণ পর্যন্ত ৯০ মাইল রণাঙ্গনে হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে।

খাদ্যশস্য সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশগুলি সম্পর্কে ভারত সরকার কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে উপরোক্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবেঃ—(ক) চাউল (ধান সহ), (খ) গম (আটা ও ময়দা সহ), (গ) বাজরা ও জোয়ার, (ঘ) ভুট্টা।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে নবেম্বর—নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজ গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থায় ইন্দোনেশিয়ার ডাচ অধিকৃত অঞ্চল হইতে ডাচ সৈন্য অপসারণ করা হইবে না।

নূতন ফরাসী মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয় বিশেষভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। রিপাবলিক্যান দলের মঃ রবার্ট সুমান মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

২৫শে নবেম্বর—প্যালেস্টাইনে স্বতন্ত্র আরব ও ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব অদ্য নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের প্যালেস্টাইন কমিটিতে ২৫—১৩ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

২৬শে নবেম্বর—লণ্ডনে কমন্স সভায় সিংহল স্বাধীনতা বিল বিনা আলোচনায় গৃহীত হইয়াছে। এই বিলে সিংহলকে বৃটিশ উপনিবেশের মধ্যে স্বাধীন দেশ হিসাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

২৯শে নবেম্বর—উত্তর চীনের পিপিং, তিয়েনসিন ও পাওটিং শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কম্যুনিষ্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য চীনের প্রেসিডেণ্ট জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক স্বয়ং সরকারী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রশ্ন সম্পর্কে সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে চূড়ান্ত ভোট গ্রহণ গতকল্য রাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে স্থগিত রাখা হইয়াছে। এই ঘটনার পর অদ্য পর্যবেক্ষকরা মনে করিতেছেন যে, প্যালেস্টাইন প্রশ্ন সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রগুলি শেষ মুহূর্তে ইহুদীদের সহিত আপোষের চেণ্টা করিতে পারে।

সাহিত্য-সংবাদ

কর্ম-মন্দিরের রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ২৫শে অক্টোবর কর্মমন্দিরের বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়ঃ—

কবিতা

১ম স্থান—নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ১০ম শ্রেণী, কর্ণেলগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, এলাহাবাদ।

২য় স্থান—হিমাংশুকুমার কর, ১০ম শ্রেণী, দুমকা জিলা স্কুল, সাঁওতাল পরগণা।

গল্প

১ম স্থান—কুমারী আই ভি সরকার, ৯ম শ্রেণী, বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা।

২য় স্থান—রাধাগোপাল বসাক, ১০ম শ্রেণী, ইষ্ট বেঙ্গল স্কুল, ঢাকা।

ছোটদের বিশেষ পুরস্কার—অজয়কুমার বর্মণ রায়, ১১ বৎসর, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, হেয়ার স্কুল, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌ... প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং ... ষ্ট্রীট, কলিকাতা।